সূচিপত্র
Acc No. 9358
6.2.79

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ—শ্রীদিলীপ দাশ

NELCO
তৃপ্তি
দাম ১৭৫৲ অন্তঃশুল্ক সমেত
স্থানীয় কর স্বতন্ত্র

NELCO

খেটে খেটে সারা!

সংসারের যাবতীয় কাজে গৃহিণীর শরীরের গ্লুকোজ প্রতিমুহূর্তে ক্ষয় হচ্ছে

ক্লান্তির মানে হ'ল, শরীরে গ্লুকোজের প্রয়োজন। আর গ্ল্যাক্সোজ-ডি হল এমন বিশুদ্ধ গ্লুকোজ পাউডার, যা খেলে মুহূর্তে দেহের শক্তি ফিরে আসে।

আপনার শরীরের গ্লুকোজ অনবরত ক্ষয় হ'য়ে যাচ্ছে। আর সেই গ্লুকোজ যখন একেবারে কমে যায় তখন আপনার ক্লান্তি আসে। সেই সময়ে আপনার একটু গ্লুকোজ খাওয়া বিশেষ দরকার। মনে রাখবেন যাঁরা গ্লুকোজ ব্যবহার করেন তাঁদের প্রায় সবারই পছন্দ মিষ্টি স্বাদের গ্ল্যাক্সোজ-ডি। এতে মুহূর্তে আপনার শরীরে শক্তি ফিরে আসে। আপনি একে জলে, দুধে, ফলের রসে কিম্বা সোজাসুজি প্যাকেট থেকে খেতে পারেন।

নিমেষে শক্তি অথচ কত কম দাম

গ্ল্যাক্সোজ-ডি

গ্ল্যাক্সোর তৈরী গ্লুকোজ পাউডার

GLAXOSE-D

প্রকাশিত হল

দাম ৫·০০

চল্লিশে পৌঁছনো এক মানুষ—সুস্থ, স্বাভাবিক, সুপ্রতিষ্ঠ। আর সকলের মত শুরু হয়েছিল তারও জীবন অনেক পুঁজি নিয়ে : পবিত্রতা, সারল্য, বিশ্বাস, ভালোবাসা, এবং আরও অনেক, অনেক পুঁজি। শৈশব এবং বাল্যের সেই প্রায়-অসীম মূলধনে প্রথম ক্ষয় ধরলো কৈশোরের সীমানায়। তারপর সারাটা যৌবন কোন্ এক অচেনা অদৃশ্য গুপ্তঘাতকের চোরাগোপ্তা আঘাতে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত পৃষ্ঠদেশ থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়তে থাকা শোণিতধারার মত তার সকল পুঁজি অনিবার্যভাবে একটু একটু করে হারিয়ে যেতে থাকল। চল্লিশে পৌঁছে সেই প্রায়-নিঃস্ব এবং নিরুপায় মৃতপ্রায় মানুষটি তখন যে সরল সত্যে উপনীত হল সেটি কী? নির্মম অথচ অপ্রতিরোধ্য গুপ্ত-আঘাতজনিত অবিরত রক্তক্ষরণের মত সকল

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের

নতুন এবং অভিনব উপন্যাস

সরল সত্য

আত্মিক মূলধনের ধীর ও অনিবার্য অপহরণের নামই জীবন, অথবা সেই অদৃশ্য ঘাতকের সকল আঘাত প্রাণপণ প্রতিরোধের দ্বারা আপন সম্পদ অক্ষয় রাখার অসম্ভব ও হাস্যকর প্রচেষ্টার নাম? তরুণ ঔপন্যাসিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, যিনি ইতিমধ্যেই জনপ্রিয়তা এবং প্রতিষ্ঠার আসরে নিজের স্থায়ী আসনটুকু করে নিয়েছেন, তাঁর এই নতুন এবং অভিনব উপন্যাসে এমন একটি জটিল প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে পাঠকদের।

● এই লেখকের অন্যান্য উপন্যাস ●

আত্মপ্রকাশ ৬·০০ অরণ্যের দিনরাত্রি ৪·০০

'সম্পাদকের বৈঠকে' গ্রন্থে শ্রীসাগরময় ঘোষ সাহিত্যিকদের বৈঠকের কিছু উপভোগ্য গল্প পরিবেশন করেছেন। শ্রীঘোষ দীর্ঘদিন 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত এবং বাংলা দেশের বিশিষ্ট সাহিত্যসেবীদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে সংশ্লিষ্ট থাকার ফলে তিনি বিভিন্ন বৈঠক ও ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে এই মূল্যবান তথ্যগুলি সংগ্রহ করতে পেরেছেন। 'সম্পাদকের বৈঠকে' অনেক খ্যাতনামা লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের টুকরো টুকরো অন্তরঙ্গ ছবি পাঠকের চোখে ধরা পড়ে। সাধারণ পাঠকেরা লেখকের পোশাকী জীবন দেখতে অভ্যস্ত। লেখক যখন তাঁর গ্রন্থের মাধ্যমে পাঠকের সামনে আসেন তখন তাঁর সঙ্গে পাঠকের সম্পর্ক যেন অভিনেতা ও দর্শকের। পাঠক তাঁর নকল জরির পোশাক দেখে অভিভূত হন, তাঁর মুখস্থ

সাগরময় ঘোষের

সাহিত্যিকদের ব্যক্তিগত জীবনের অন্তরঙ্গ ছবি

সম্পাদকের বৈঠকে

করা সংলাপ শুনে কখনও দুঃখে বিগলিত হন, কখনও বা হেসে গড়িয়ে পড়েন। কিন্তু গ্রীন-রুমে যদি কেউ হঠাৎ ঢুকে পড়ে, সেখানে আর একটি জগতের দেখা পাবে। বলা বাহুল্য, গ্রীন-রুমের ভেতর নাটকের যে অলক্ষ্য উপাদান ছড়িয়ে আছে তা মঞ্চের নাটকের চেয়ে কম উপভোগ্য নয়। সম্পাদকের বৈঠকে যেন সাহিত্যিকদের জীবনের গ্রীন-রুমে লেখক হঠাৎ ঢুকে পড়েছেন ও সেখান থেকে মণিমুক্তো কুড়িয়ে এনে পাঠককে উপহার দিয়েছেন ॥ দ্বিতীয় আনন্দ মুদ্রণ (পরিবর্ধিত সংস্করণ) প্রকাশিত হল ॥ দাম ৬·০০ ॥

● সাগরময় ঘোষের 'সম্পাদকের বৈঠকে'র পরিপূরক গ্রন্থ ●

ঝরাপাতার ঝাঁপি ৪·০০

দ্বিতীয় মুদ্রণ

প্রকাশিত হল

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড

অফিস : ৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলিঃ ৯ ॥ ফোন ৩৪-৮২৪৭
বিক্রয়-কেন্দ্র : ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা ৯

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

৩৭ বর্ষ ॥ সংখ্যা ২
শনিবার ২২ কার্তিক ১৩৭৬

*

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার

সংযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

*

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীশীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

*

টেলিফোন
২৩-২২৮০ ২৩-৮৫৪১

*

চাঁদার হার
কলিকাতায়

বার্ষিক	২৫.০০
ষাণ্মাসিক	১২.৫০
ত্রৈমাসিক	৬.২৫

ভারতে

বার্ষিক সডাক	৩০.০০
ষাণ্মাসিক "	১৫.৫০
ত্রৈমাসিক "	৮.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	৩০.০০
ষাণ্মাসিক "	১৫.৫০
ত্রৈমাসিক "	৮.০০

ভারতের বাইরে
(জাহাজ ডাকে)

বার্ষিক সডাক	৫২.০০
ষাণ্মাসিক "	২৬.০০
ত্রৈমাসিক "	১৩.০০

আসাম অঞ্চলে
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	৩৯.০০
ষাণ্মাসিক	১৯.৫০
ত্রৈমাসিক	১০.০০

*

দাম ৫০ পয়সা
উত্তরবঙ্গ ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাসুল ৭ পয়সা

*

DESH

Saturday, 8th Nov. 1969

কলকাতার পানীয় জল

কলকাতা শহরে মাঝে মাঝেই বিচিত্র ঘটনা ঘটে। কখনও কখনও এগুলি নাকি ঐতিহাসিক ঘটনাও হয়ে যায়। গত সপ্তাহে, পঁচিশ এবং ছাব্বিশ অক্টোবর —কলকাতা শহরে এ-রকম একটি ঘটনা ঘটে গেছে বললে অত্যুক্তি হবে না। এই দুটি দিন কলকাতা শহরের পঞ্চাশ ষাট লক্ষ মানুষ ব্যবহার্য জল পায়নি। শহর-বাসী মাত্রেই এ সময় অনুভব করেছেন বাড়ি ঘর, রাস্তা এবং অন্যান্য স্থান থেকেও কলের জল উধাও হয়ে গেলে অবস্থাটা কেমন দাঁড়ায়। জল উধাও হবার ঘটনাটি নিশ্চয় রসিকতা বা পরিহাস নয়, তবু ভাব গতিক দেখে মনে হল যেন, অলক্ষ্যে বসে কলকাতার ভাগ্যবিধাতা এই মজাটি দেখবার চেষ্টা করে বিশেষ প্রীত হয়েছেন। দু দিনের ভোগান্তি মোটামুটি ভালই হয়েছে। এর পর অবশ্য আবার ক্রমে ক্রমে জলের আবির্ভাব দেখা গেছে।

কলকাতা শহরের পানীয় জল প্রধানত আসে টালা ট্যাঙ্ক থেকে। টালার জল উঠতি এবং বাড়তি শহরের পক্ষে পর্যাপ্ত হচ্ছিল না বলে—গত কয়েক বছরে পাড়ায় পাড়ায় বেশ কিছু গভীর নলকূপ বসানো হয়েছিল। এর সংখ্যা এক শোরও বেশি। টালার জল এবং গভীর নলকূপের জল মিলে শহর কলকাতাকে কোনো রকমে জলদান করা যাচ্ছিল। গত সপ্তাহে আচমকা টালা বিকল হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে গভীর নলকূপগুলিও অকেজো হয়ে গেল প্রায়। পরিণামে লক্ষ লক্ষ লোকের স্নানাহার বন্ধ, পানীয় জলের জন্যে হাহাকার, পাড়ায় পাড়ায় ছেলে ছোকরারা জল সংগ্রহের জন্যে স্বেচ্ছাসেবক সেজে গেল। দু দিনেই শহর-বাসীর যে রকম অবস্থা হয়েছিল তাতে মনে হয়—আরও দু একদিন অবস্থা একই রকম চললে কলকাতা ছেড়ে লোক পালানোর হিড়িক পড়ে যেতে পারত।

টালা ট্যাঙ্ক বিকল হয়ে গিয়েছিল কেন তার সঠিক কারণ জানা যায় নি। তবে বলা হয়েছে, নিতান্ত একটি ইঁদুরের দৌরাত্মে এতবড় ঘটনা ঘটেছে। এই ইঁদুরটি নাকি আত্মদান করে (নাশকতামূলক কাজ নিশ্চয় নয়) এমন বিদ্যুৎ-বিভ্রাট ঘটিয়ে দেয় যে, টালা-ব্যবস্থা একেবারে নানচাল হয়ে যায়। সামান্য ইঁদুরের এতটা শক্তি কে জানত? যাই হোক, ইঁদুরেই যদি এতবড় ক্ষতি করে থাকতে পারে তবে অন্যে চেষ্টা করলে আরও কতবড় ক্ষতি সম্ভব তা অনুমান করাও দুঃসাধ্য।

টালা ট্যাঙ্ক শুনেছি একটি দ্রষ্টব্য বস্তু। এ-রকম নাকি দেখা যায় না। আবার কেউ কেউ বলেন, এত বড় মূর্খতাও নাকি কদাপি ঘটে না। কলকাতা শহরের মতন এতবড় একটি শহরের পানীয় জলের ব্যবস্থা এভাবে একঠাঁই করা উচিত নয়। প্রকাশ্যে মাথা উঁচু করে যেভাবে বিশাল চেহারা নিয়ে টালা দাঁড়িয়ে আছে তাতে আপদকালে এই টালাই হবে সবচেয়ে বড় উদ্বেগ। তা ছাড়া ওয়াটার ওয়ার্কস মাত্র একটা থাকবে কেন? যদি কোনো কারণে এর ক্ষতি হয় সমস্ত শহর জলাভাবে মরবে। তার চেয়ে বিভিন্ন [illegible] আরও ওয়াটার ওয়ার্কস থাকা দরকার। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিশেষজ্ঞরা শুনেছি তিন কি চারটি স্বতন্ত্র ওয়াটার ওয়ার্কস তৈরির সুপারিশও করেছিলেন। সে সুপারিশের কতদূর কী হয়েছে আমরা জানি না কিন্তু এই শহরে এক এবং অদ্বিতীয় টালাই আমাদের জলদানের ব্রত নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

একা বুদি সব সময়ই যে গড় রক্ষা করতে পারবে তার কোনো স্থিরতা নেই। সাম্প্রতিক ঘটনা সে-কথাই প্রমাণ করেছে। টালা বিকল হল তো শহর কলকাতা নিরম্বু হয়ে গেল। তা ছাড়া টালারই বা দোষ কোথায়! টালা-পলতা পাম্পিং স্টেশনের বয়েস তো কম হল না। বয়স প্রায় একশো, নড়বড়ে নিরানব্বুইতে চলছে। এনজিন নষ্ট হয়ে গেছে, পাইপের জরাজীর্ণ অবস্থা। মাঝে মাঝেই এখানে সেখানে পাইপ ফেটে যায়।

টালার ওপর নির্ভর করার দিন আমাদের ফুরিয়েছে। একশো বছরের পর তার অবসর নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু তার বিকল্প কি? বিকল্প অবশ্য অন্যান্য ওয়াটার ওয়ার্কস তৈরি করা। তার জন্যে টাকাও দরকার প্রচুর। কেমন করে ওই টাকা আসবে, কার দায়িত্বেই বা নতুন ওয়াটার ওয়ার্কস তৈরি হবে সেও বড় কম সমস্যা নয়। আমরা জানি না এসব সমস্যার সমাধান কী হতে পারে, তবে কলকাতা শহরের পানীয় জলের সমস্যার এখন যে হাল তাতে অনতিবিলম্বে একটি ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

মনে আছে, কলকাতা

তারাপদ রায়

তোমার কি মনে আছে, কলকাতা,
আমার সেই সবুজ পাশপোর্ট সবুজ পাঞ্জাবি:
মূল শেয়ালদা স্টেশনে
সেদিন সীমান্তের ট্রেন থেকে ভিজতে ভিজতে নেমে
জীবনে প্রথম জুতো পালিশওয়ালা দেখলাম।

সেই আমার রোমাঞ্চ, আমার স্বপ্নের শহর
জীবনে সেই প্রথম ট্রামগাড়ি সেই প্রথম ফার্স্ট ক্লাস,
ফার্স্ট ক্লাশ কলকাতা,
তোমার প্রত্যেক বাড়ির ছাদে একটু করে পোষা মেঘ
প্রত্যেক জানলায় আলো-অন্ধকারের রহস্যময়তা।

আমার সেই সবুজ জামা, ছেঁড়াতালি জুতো
সেই পায়ে পায়ে ঘোরার বিস্ময়
ভিখিরির সঙ্গে পাগল, পাগলের সঙ্গে মাতাল
রামধনুকের মত দিগন্ত ছোঁয়া শোভাযাত্রা
চায়ের দোকানের ভিড় থেকে রাস্তায় অর্থহীন জটলা
দুপুর বেলা ঘূর্ণি হাওয়ায় শুকনো পাতা ছড়িয়ে পড়ে নিচে
রোদ্রে বাঁকানো হাতীর দাঁতের মত ট্রামলাইন
কাউকে কোথাও পৌঁছে দেয় না।
মধ্যে মধ্যে মনে হয়, আমি আর তোমার সীমানার মধ্যে নেই
আজ কোথাও নেই আমার সেই শহর
যেখানে দুই ল্যাম্প-পোস্টের মধ্য দিয়ে লম্বা পেনাল্টি কিকে
কে যেন শূন্যে পাঠিয়ে দেয় চাঁদের ফুটবল
গ্যালারিতে অস্পষ্ট ছায়াচ্ছন্ন মানুষেরা চেঁচিয়ে ওঠে, 'গোল, গোল!'

এই কুড়ি বছরেও তোমার সঙ্গে আমার কিছুই মিললো না,
আমার ছেঁড়া স্বপ্ন, আমার শতছিন্ন কবিতার টুকরো
ময়লা কাগজের ঝোলায় ভবঘুরেরা
কুড়ি বছর ধরে প্রতিদিন কুড়িয়ে নিয়েছে
নিক্তিতে ওজন করে বিক্রি হয়ে গেছে
আমার স্বপ্নের শব্দগুলি।

একটিও রহস্যের জানালা কোথাও কেউ খুলে দিলো না
কোনো বাড়ির ছাদে মেঘের কাছাকাছি পৌঁছানো গেলো না
শুধু শুধু জামার রঙ, জুতোর নম্বর বদলিয়ে গেলো।

ভাঙনের পথে

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিও যে দ্রুত কেরলের পথে এগোচ্ছে, মারকসবাদী কমিউনিসট পারটির কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশন এবং বাংলা কংগ্রেসের সম্মেলনের পর সেটা আরও পরিষ্কার।

মারকসবাদী কমিউনিসট পারটি এখন রাজনৈতিক সত্য হিসাবেই যুক্ত ফ্রন্টগুলির ভাঙন অনিবার্য বলে ধরে নিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, কংগ্রেসের ভাঙনের ফলে যুক্ত ফ্রন্টগুলির ভাঙনও অবশ্যম্ভাবী।

সি পি এম-এর যুক্তিটা মোটামুটি এইরকম : এতদিন কংগ্রেসই ছিল শাসক শ্রেণীর একমাত্র দল। তাঁদের হাতে ছিল একচেটিয়া সরকারী ক্ষমতা। সেই অবস্থাটা দ্রুত পালটাচ্ছে। কংগ্রেসের হাতে আর একচেটিয়া সরকারী ক্ষমতা থাকছে না। কংগ্রেস দলও দু ভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। এর দু ভাগেরই মূল লক্ষ্য বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা হলেও কিভাবে সেই কাজ হাসিল করা যায় তা নিয়ে দু দল দু মত। এক দল বলেছেন, বুর্জোয়া ডিকটেটরশিপ চাই, অর্থাৎ কঠোর হাতে হাল ধর, পুলিশ মিলিটারির সাহায্য নিয়ে মানুষের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করে বুর্জোয়া শ্রেণীর শাসন কায়েম রাখ। আর এক দলের বক্তব্য, না, তাতে আর হবে না—বরং বুর্জোয়া ডেমোক্রেসির পথ ধর, অর্থাৎ গণতন্ত্রের মুখোশের আড়াল থেকে বুর্জোয়া স্বার্থ রক্ষা কর।

এর পরই সি পি এম বলছেন : কংগ্রেসের এই ভাঙনের ফলে যুক্ত ফ্রন্টগুলিতেও ভাঙন দেখা দিতে বাধ্য। কারণ এই ফ্রন্টগুলি গড়ে উঠেছিল কংগ্রেসের একচেটিয়া শাসনক্ষমতার বিরুদ্ধে। কংগ্রেস যখন দু টুকরো হচ্ছে তখন ফ্রন্টগুলিও দু টুকরো হবেই। কংগ্রেসের যে অংশ বুর্জোয়া ডেমোক্রেসির পক্ষে কথা বলবে, যুক্তফ্রন্টগুলির একটা অংশও সেই দিকে যাবে। বিশেষ করে ফ্রন্টের তাঁরাই কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলাবেন যাঁরা শ্রেণী-সংগ্রামের পরিবর্তে শ্রেণী-সমন্বয়ে বিশ্বাস করেন, যাঁরা শুধু শ্রমিক-কৃষক মেহনতী মানুষের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার কথা না ভেবে বুর্জোয়াদের স্বার্থরক্ষারও ইচ্ছুক এবং যাঁরা মনে করেন কংগ্রেসের মধ্যেও একটা সত্যিকারের প্রগতিশীল অংশ আছে।

মারকসবাদী কমিউনিসটরা মনে করেন : এইজন্য ও এইভাবেই যুক্তফ্রন্ট ভেঙেছে এবং এইজন্য ও এইভাবে পশ্চিমবঙ্গের যুক্ত ফ্রন্টও ভাঙবে। অর্থাৎ যুক্ত ফ্রন্টের ভাঙন অনিবার্য।

ভাঙন অনিবার্য—ঠিক এই কথাটা অবশ্য বাংলা কংগ্রেস খোলাখুলি বলছেন না। তবে, বাংলা কংগ্রেসের সম্মেলনে শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় এবং দলের অন্যান্য নেতারা যেসব কথা বলেছেন তারও একমাত্র অর্থ আর এক সঙ্গে চলা যাচ্ছে না; বত্রিশ দফা কর্মসূচী রূপায়ণে সচেষ্ট হওয়ার পরিবর্তে সি পি এম পশ্চিম বাংলায় যে তাণ্ডব শুরু করেছে তা অসহ্য। তাঁদের আরও বক্তব্য : সি পি এম যতই প্রতিশ্রুতি দিক, যতই চুক্তি করুক তা মানবে না, মানছে না। তারা যেভাবে চলছিল সেইভাবেই চলছে এবং চলবে। তারা প্রশাসনিক পুলিশকে সম্পূর্ণভাবে দলের কাজে লাগাচ্ছে। এইসব কথারও একমাত্র অর্থ, ভাঙন অনিবার্য।

পশ্চিমবঙ্গের যুক্ত ফ্রন্টের দুই প্রধান প্রতিপক্ষ শুধু একটা কথা নিশ্চিতই বলছেন না। সেই মহামূল্যবান কথাটা হল, এই অনিবার্য ভাঙন কবে চূড়ান্ত হবে। কবে তাঁরা এই রাজ্যের দ্বিতীয় যুক্ত ফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটাবেন।

কথাটা বলছেন না, কারণ সেটা কেউই বলতে পারেন না। বললেই বিপদ। তাঁরা মনে করেন, যিনিই দিনখানি আগে থাকতে বলে দেবেন, লোকে তাঁকেই ফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটাবার জন্য দায়ী করবেন। এই দায়িত্বটা কেউই ঘাড়ে নিতে চান না। দু পক্ষই এখন একে অপরের ঘাড়ে দোষ চাপাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন। লক্ষ্য দুজনেরই এক। জনগণকে দু পক্ষই বোঝাতে চান, আমরা ফ্রন্ট রাখতে বহু চেষ্টা করেছি, কিন্তু ওদের জন্য পারলাম না।

আর তাছাড়া কেই বা চূড়ান্ত লড়াইয়ের আগে তার রণকৌশল শত্রুকে জানিয়ে দিতে চান! কে কবে পতন চান, ঠিক কবে পতন ঘটাতে উদ্যোগী হবেন সেকথা বলে দেওয়া মানেই তো সবটা শত্রুকে জানিয়ে দেওয়া।

*

এছাড়া, আর একটা জিনিস চলছে ভেতরে ভেতরে। সেটা হল, চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য জোটবাঁধা। অর্থাৎ, কে কাকে সঙ্গে পাবেন কে কাকে দলে টানতে পারেন সেই লড়াই। এই লড়াইটা গোপনে গোপনে চলতে বাধ্য। চলছেও তাই।

গোপনে গোপনে ব্যাপারটা চললেও কিন্তু তেমন গোপন আর কিছুই নেই। সি পি আই, ফরওয়ারড ব্লক, এস এস পি, এস ইউ সি, গোর্খা লীগ, ফ্রন্টপন্থী পি এস পি এবং বলশেভিক পারটি যে এখন বাংলা কংগ্রেসের মতই সি পি এম-এর বিরুদ্ধে এটা আজ পরিষ্কার। আবার, আর সি পি আই, ওয়ারকারস পারটি এবং আর এস পি যে সি পি এম-এর পক্ষে তাও সবাই জানেন। মারকসবাদী ফরওয়ারড ব্লক এবং লোকসেবক সঙ্ঘ এখনও কোন পক্ষে যান নি।

যুক্তফ্রন্টের যে আটটি দল আজ সি পি এম-এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন তাঁরা যে ইতিমধ্যেই কোনও জোট বেঁধে ফেলেছেন তা অবশ্য নয়। এঁরা যে বিকল্প কিছু একটা ঠিক করে নিয়ে এগোচ্ছেন তাও নয়। এঁদের ঐক্য (যদি তাকে ঐক্য বলা যায়) শুধু একটি ক্ষেত্রে—সেটা হল সি পি এম বিরোধিতায়। সকলে যে একই কারণে সি পি এম বিরোধী তেমনও নয়। তবে, সি পি এম-এর বিরুদ্ধে

প্রশাসন যন্ত্র ও পুলিশ ব্যবহারের অভিযোগ মোটামুটি সকলেই তুলেছেন।

এঁদের রাজনৈতিক মতাদর্শও সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা। যেমন ধরুন, সি পি আই, এস ইউ সি, বলশেভিক পারটি পুরোপুরি মারকসবাদী। বাংলা কংগ্রেস আবার গোঁড়া গান্ধীপন্থী। ফরওয়ারড ব্লক একই সঙ্গে কার্ল মারকস এবং সুভাষচন্দ্রের অনুগামী বলে নিজেদের দাবি করেন। এস এস পি এবং পি এস পি গণতান্ত্রিক সমাজবাদে আস্থাবান। গোর্খা লীগের মূলমন্ত্র গোর্খা-তন্ত্র। সি পি এম-এর পক্ষে যাঁরা আছেন তাঁরা অবশ্য সকলেই নিজেদের অভ্রান্ত মারকসবাদী বলে দাবি করেন। নিরপেক্ষ লোকসেবক সঙ্ঘ আবার বাংলা কংগ্রেসেরই মত গান্ধীবাদী।

দেখে শুনে মনে হয় এখানের সি পি আই ঠিক কেরলের সি পি আই-র মত সি পি এম বিরোধী গোষ্ঠীর নেতৃত্ব গ্রহণে উৎসাহী নন। তাঁরা নানা কারণেই এখানে একটু পিছিয়ে থাকতে চান। এখানের সি পি আই-র ইচ্ছা, সি পি এম বিরোধিতার ফ্রনট রোতে এসে দাঁড়াক বাংলা কংগ্রেস এবং ফরওয়ারড ব্লক। এস ইউ সি এবং এস এস পির উগ্র সি পি এম বিরোধিতায়ও তাঁরা খুবই খুশী। সি পি এম অবশ্য প্রাণপণে এটা সবাইকে বোঝাতে চাইছেন যে, নাটের গুরু হলো সি পি আই-ই।

*

পশ্চিমবঙ্গের যুক্ত ফ্রনটের ভাগাভাগি বিশ্লেষণ করে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, সি পি এম ঠিক যেভাবে ফ্রনটের ভাগাভাগিটা অবশ্যম্ভাবী ধরে নিয়েছেন তা হচ্ছে না। এস ইউ সি এখানে সি পি এম বিরোধী গোষ্ঠীতে। ওঁদের থিওরি, থিসিস বা ক্রিয়া-কলাপ দেখে কিন্তু কেউ বলবেন না যে, এস ইউ সি সি পি এম-এর চেয়ে কম বিপ্লবী। তা হলে এস ইউ সি কেন সি পি এম বিরোধী গোষ্ঠীতে গেল?

আবার, কেরল ও পশ্চিমবঙ্গে আর এস পি এবং এস এস পির ভূমিকা একেবারে ভিন্ন। ওখানে আর এস পি সি পি আই-র সঙ্গে, এখানে সি পি এম-এর পক্ষে। এস এস পি ওখানে সি পি এম-এর সঙ্গে, এখানে বিরুদ্ধে।

গান্ধীবাদী লোকসেবক সঙ্ঘের ভূমিকাটাও ঠিক সি পি এম-এর প্রস্তাবমত ব্যাখ্যা করা কঠিন। ওই ব্যাখ্যা মত লোকসেবক সঙ্ঘের ঘোরতর সি পি এম বিরোধী হওয়া উচিত। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি তা নয়।

তাই, আমার মনে হয়, কেরল ও পশ্চিমবঙ্গের ফ্রনট রাজনীতি কেউ যদি খোলা মন নিয়ে বিচার করেন তা হলে দেখবেন ঝগড়াটা ভাগাভাগিটা মোটেই আদর্শগত নয়, আসলে সব কিছুর মূলে রয়েছে দলগত স্বার্থসিদ্ধির নোংরামি।

নবারুণ গুপ্ত

আমাদের দেশে কমিউনিস্ট দুনিয়ায় স্বন্দ্ববাদ বর্তমানে কোন তুরীয় পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে, তার খবর বুরজোয়া প্রেসে ভাল পাবেন না। তার কারণ বুরজোয়া প্রেস কমিউনিস্টদের খবর বুরজোয়া ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করে বলে কমিউনিস্ট দুনিয়াটার স্বরূপ ঠিকমত ফুটে ওঠে না। এটা যে স্বেচ্ছাকৃত এবং কায়েমি স্বার্থের সুগভীর ষড়যন্ত্র, সে বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই।

তাই আমি ঠিক করেছি, কমিউনিস্টরা কমিউনিস্টদের সম্পর্কে কি ধরনের বার্তাচিত করে তার কিছু অবিকৃত নমুনা এবার দেব। পাঠক পাঠিকা অবধান করুন।

নকশালী লবজ : এক দিকে যখন সি পি এম ও সি পি আই মন্ত্রিত্বের গদি ও ক্ষমতা নিয়ে কুকুরের মত কামড়াকামড়ি করছে, অন্য দিকে তখন তারা গলাগলি হয়ে গ্রামাঞ্চলে জোতদারশাহীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র কৃষক সংগ্রামকে প্রচন্ড পুলিসী দমন নীতিতে স্তব্ধ করতে চাইছে। মেদিনী-পুরের ডেবরা-গোপীবল্লভপুরে জোতদার রক্ষার প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তুলছে সি পি আই সি পি এম একই সঙ্গে। জ্যোতি বসু গ্রামে গ্রামে পুলিস ক্যাম্প বসিয়েছে। সম্প্রতি জ্যোতি বসুর উদ্যোগে কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা ও বিহার—এই তিন রাজ্যের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে সশস্ত্র কৃষক সংগ্রাম দমনের একটি যুক্ত পরিকল্পনা তৈরি হয়, এবং তারপর থেকেই শুরু হয় সমগ্র এলাকা জুড়ে কৃষক জনতার উপর নৃশংসতম পুলিসী অত্যাচার; কিশোরী কৃষক মেয়েকে উলঙ্গ করে বেত্রাঘাত করতে পর্যন্ত পুলিস দ্বিধা করছে না।... জানা গেল মেদিনীপুরের জোতদাররা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, উপমুখ্যমন্ত্রী এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে 'বাঁচাও' বলে জরুরি তারবার্তা পাঠিয়েছে।—দেশব্রতী, ৩০ অকটোবর।

সি পি এম কথামৃত : অবশেষে কেরালায় চক্রান্তকারীরা তাদের অভিযানে সাফল্য অর্জন করেছে। কেরালার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রি-সভার পতন ঘটেছে। ভিতর থেকে যুক্ত-ফ্রনটকে ভাঙো—প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের এই রণকৌশল সফল হয়েছে। এই সাফল্যের মূলে যাদের বিরাট অবদান রয়েছে তারা হচ্ছে দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট।...দক্ষিণ-পন্থী কমিউনিস্টরা এতদিন কমিউনিস্টের মুখোশ পরে, কমিউনিস্ট সাইনবোরড ঝুলিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করে আসছিল, কিন্তু এবার তাদের মুখোশ খুলে পড়তে আরম্ভ করেছে। কেরালার সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতেই তাদের আসল স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হতে থাকে। সেখানে দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট পারটি, মুসলিম লীগ, আই এস পি এবং আর এস পি মিলে যুক্তফ্রনটের মধ্যেই গঠন করেছিল অ-মারকসবাদী ফ্রনট আর এই অ-মারকসবাদী ফ্রনটের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিল দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্টরা।... প্রকৃতপক্ষে তাদেরই নেতৃত্বে পরিচালিত ঐ অ-মারকসবাদী ফ্রনট কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কমরেড নাম্বুদিরিপাদের নেতৃত্বে পরিচালিত যুক্তফ্রনট সরকারের পতন ঘটিয়েছে। দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্টদের মারকসবাদ বিরোধিতা এতই উগ্র হয়ে উঠেছে যে, তারা মারকসবাদী কমিউনিস্ট পারটির বিরুদ্ধে জেহাদে বুরজোয়া শাসক শ্রেণীর রাজনৈতিক দল কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলাতেও দ্বিধা করেনি।...

তাই তো নাম্বুদিরিপাদ মন্ত্রিসভার পতনে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছেন কংগ্রেস সভাপতি নিজলিঙ্গাপ্পা। শুধু নিজলিঙ্গাপ্পা নন, উৎফুল্ল হয়ে উঠেছেন কংগ্রেসের সিন্ডিকেট-পন্থী এস কে পাতিল, আর জনসংঘ ও স্বতন্ত্র দলের নেতৃবৃন্দ। এ এক অপূর্ব ঐকতান! কংগ্রেস, জনসংঘ, স্বতন্ত্র দল আর দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট নেতারা... মারকসবাদের বিরোধিতায়...এখন একই নৌকার যাত্রী।—দেশহিতৈষী, ৩১ অকটোবর।

সি পি আই রস-মাধুরী : সি পি এম-এর শ্রেণী-সংগ্রাম যত গর্জে তত বর্ষে না বরং বিভেদ সৃষ্টি করে।...এর অবশ্যম্ভাবী ফল হল শরিকী সংঘর্ষ, হানাহানি ও রক্তপাত। আর এই দুষ্কর্মকে ঢাকবার জন্য তাঁরা এক তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন। সেই তত্ত্ব হল শরিকী সংঘর্ষ নাকি ক্রমবর্ধমান শ্রেণী-সংগ্রামের প্রতিফলন। তাঁদের তত্ত্ব অনুসারে শরিকী সংঘর্ষ হবেই, অবশ্যম্ভাবীও বটে। তাঁদের তত্ত্ব, রাজনীতি, কৌশল ও কর্মপদ্ধতি এই বিষাক্ত বিভেদের বিষে জর্জরিত শ্রেণী-সংগ্রামের এই বিকৃত তত্ত্ব যুক্তফ্রনটেও প্রতিফলিত হচ্ছে। কায়েমি স্বার্থের বিরুদ্ধে সংগ্রাম তাঁদের কাছে গৌণ বিষয়। বর্তমানে মুখ্যবস্তু হচ্ছে সহযাত্রীদের বিলোপ করে সি পি এম-এর একক শক্তি প্রতিষ্ঠা করা এবং এই সাধু উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কুৎসা থেকে পুলিস পর্যন্ত সব কিছুকে ব্যবহার করতে কার্পণ্য না করা।

সি পি এম-এর সাধারণ সম্পাদক শ্রীসুন্দরায়া বলেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে বাংলা কংগ্রেস, ফরোয়ারড ব্লক, এস ইউ সি এবং কমিউনিসট পারটি এবং কেরালায় আর এস পি, আই এস পি, মুসলিম লীগ এবং কমিউনিস্ট পারটি ইত্যাদি দলগুলো পুঁজিপতি ও জাতীয় বুরজোয়া জোতদার ও ধনী কৃষকদের স্বার্থে কাজ করছে।... অতএব এদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে অবতীর্ণ না হলে মারকসবাদকে আর বিশুদ্ধ রাখা অসম্ভব।... ডান্ডা থেকে পুলিস, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে শ্রমমন্ত্রী, শহর থেকে গ্রাম—কোথাও যেন ধর্মযুদ্ধের অগ্নি নির্বাপিত না হয়।—সাপ্তাহিক কালান্তর, ১৮ অকটোবর।

বাঁচা গেল

বিবেকপন্থী প্রধানমন্ত্রীর ডান হাত কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী বাবু জগজীবন রাম দশ বছর ধরে আয়কর ফাঁকি দিয়ে এসেছেন, ব্যাপারটা ধরা পড়ায় বড়বাবু ভীষণ রকম সাজা পাবেন বলে যাঁরা আশঙ্কায় দিন গুনছিলেন, তাঁরা শুনে স্বস্তি পাবেন, বাবুজী খুব একটা সাজা পাচ্ছেন না। আয়কর বিভাগের বড় বড় কর্তারা বিস্তর মাথা খাটিয়ে একটা আইনের ফাঁক বের করে ফেলেছেন। এখন জানা গিয়েছে, জগুবাবু যা করেছেন তাকে আয়কর ফাঁকি দেওয়া বলে না। বেশী আয় করে কম আয় দেখালে তাকেই আয়কর ফাঁকি বলে এবং তার সাজা খুবই কড়া। বাবু জগজীবন দশ বছর ধরে তাঁর আয়ের হিসাবই দাখিল করেন নি। এটা তেমন মারাত্মক কোনও অপরাধই নয়। উফ, আমাদের যা দুশ্চিন্তা হয়েছিল!

স্বন্দ্ববাদী সুসমাচার

সি পি আই (এম এল)-এর জনৈক নেতার মতে ওঁদের (অর্থাৎ সি পি আই এম এল অর্থাৎ নকশালপন্থীদের) 'বহু সমর্থক' এখনও সি পি এম-এর মধ্যে আছেন। 'সময় উপস্থিত' হলে সি পি এম-এর মধ্যেকার 'বিপ্লবী অংশ' এবং বাইরের 'বিপ্লবী অংশ' ঐক্যবদ্ধ হয়ে শ্রেণী-শত্রুর বিরুদ্ধে 'শেষ আঘাত' হানবেন। ওঁরা মনে করেন শ্রীবসু (জ্যোতি) 'পাকা শোধনবাদী' (অতএব শ্রেণী-শত্রু) শ্রীদাশগুপ্ত (প্রমোদ) 'পাকা সুবিধাবাদী' (অতএব শ্রেণী-শত্রু) ও শ্রীকোঙার (হরেকৃষ্ণ) 'বিশ্বাসঘাতক' (অতএব শ্রেণী-শত্রু)।"—কালকেতু সেন, সাপ্তাহিক কালান্তর, ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯, পৃঃ ২।

লেকিন কর্মাল নেহি ছোড়তা!

"আমরা কংগ্রেসের সমর্থন চাই না, কিন্তু তারা আমাদের পিছু পিছু এলে আমরা কি করতে পারি।"—শ্রীঅচ্যুত মেনন

দেবরাজ

ভিন্ন গোঠ

কানা গর, বলে অন্য আরব দেশগুলো লেবাননকে যে গালাগালি দিচ্ছে, তা অনেকটা আক্রোশের বশে হলেও তার গোঠ কিন্তু ভিন্ন। লেবাননের সঙ্গে তার আশ-পাশের আরব দেশগুলোর বিস্তর গরমিল। দেশটা ছোট হলে কি হবে তার আর্থিক অবস্থা খুবই ভাল। জীবনযাত্রার মান আর কোনও আরব রাষ্ট্রে এত উঁচু নয়। আরব দেশগুলোর মধ্যে শিক্ষাতেও সে সবচেয়ে এগিয়ে। তার উপর দেশটায় ইসলামের একাধিপত্য নেই। লেবাননই হচ্ছে একমাত্র আরব দেশ যেখানে মুসলমানেরা হচ্ছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় — সংখ্যাগুরু হচ্ছে খৃস্টানেরা। খৃস্টধর্ম সে দেশে হালে আসেনি—এসেছে তেরো শো বছর আগে। তাই ক্যাথলিকরাই এখানে সংখ্যায় বেশি, প্রোটেস্ট্যান্টরা সংখ্যায় অনেক কম। খৃস্টান আর মুসলমান ছাড়া ইহুদিও লেবাননে কিছু আছে। তবে তারা সংখ্যায় এতই কম যে ধর্তব্যের মধ্যে নয়। মোটের উপর, প্রতি-পত্তি সেখানে খৃস্টান আর মুসলমানদেরই যদিও তাদের মধ্যে শাখা-উপশাখা বিস্তর।

বিবিধের মধ্যে মহান মিলনের চেষ্টা হয়েছে লেবাননের সংবিধানে। তার বিধান হচ্ছে প্রেসিডেন্ট অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি হবেন খৃস্টান, প্রধানমন্ত্রী হবেন একজন সুন্নি মুসলমান আর সংসদের অধ্যক্ষ হবেন এক-জন শিয়া। এমনিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে তেমন রেষারেষি কিংবা মন-কষাকষি নেই। লেবাননে মিলে মিশেই বরং তারা এতদিন ছিল—এখনও যে নেই তাও ঠিক বলা যায় না। লেবাননের লোকেরা বলে তাদের দুটো জাত। একটা থাকে দেশে আর একটা প্রবাসী। একটা আল মুকিম আর একটা আল মুঘতারিব। প্রবাসীর দল ছড়িয়ে আছে নানা পশ্চিমী দেশে, বিশেষ করে আমেরিকায়। সেখানে তো তাদের একটা বেশ বড় রকমের উপনিবেশই আছে। প্রচুর টাকা তারা দেশে পাঠায় মাঝে মাঝে। লেবাননের সমৃদ্ধির ভিত্তি হচ্ছে ওই প্রবাসীদের পাঠানো টাকা। সে টাকা তারা কারুর অনুগ্রহে পায় না—পায় রীতিমত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে। তবুও পশ্চিমী রাষ্ট্রজোট, বিশেষ করে আমেরিকার সঙ্গে তাদের সম্পর্কটা যে ঘনিষ্ঠ হবে তা তো খুবই স্বাভাবিক।

লেবানন তাই মোটের উপর পশ্চিম-ঘেঁষা। ফি বছরই বিস্তর টুরিস্ট ও-দেশে আসে। বেরুট তো মার্কিন পর্যটকদের একটা প্রধান আকর্ষণ। ফুর্তির এমন জায়গা দুনিয়াতে খুব বেশি নেই। মার্কিন টুরিস্টরা সাধারণত দিলদরিয়া লোক, যেখানেই তারা যায় সেখানেই তারা টাকা ছড়ায়। লেবাননের তো তারা লক্ষ্মী। সে লক্ষ্মী যাতে বিরূপ না হন তার জন্য লেবাননের চেষ্টার অন্ত নেই। তার ওপর একটা চমৎকার বিশ্ববিদ্যালয় বানিয়ে দিয়েছে বেরুটে আমেরিকানরা। তার নামও চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। কাজেই, আমে-রিকার সঙ্গে লেবাননের বেশ সদ্ভাব, সঙ্গে সঙ্গে আরও পাঁচটা পশ্চিমী দেশের সঙ্গেও। সে সদ্ভাব আরও বেড়েছে বছর এগারো হলো। লেবাননে ১৯৫৮ সনে যে গৃহযুদ্ধ বাধবার উপক্রম হয়েছিল তা আর বাধেনি তখনকার সরকারকে আমেরিকা সামরিক সাহায্য দেওয়ার ফলে। সেই থেকে আমেরিকার প্রভাব লেবাননে প্রকট। নইলে বেশির ভাগ আরব রাষ্ট্রগুলোর মত সেখানেও রুশিয়ার প্রভাবই বেশি হবার কথা—আমেরিকার নয়।

এগারো বছর আগে যে ঘরোয়া লড়াইয়ের সূচনা দেখা দিয়েছিল লেবাননে, তার উপ-লক্ষ্য প্রত্যক্ষভাবে ছিল প্যালেস্টাইন থেকে ভিটেছাড়া আরব শরণার্থীরা, আর পরোক্ষ-ভাবে ইজরায়েল। ওই ইহুদি রাষ্ট্র সম্পর্কে আর পাঁচটা আরব দেশের যে কঠোর মনো-ভাব, লেবাননের তা নয়। তাই বলে ইজ-রায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক সে পাতায়নি, তাকে স্বীকৃতি তো দেয়ইনি, তবুও তাকে পুরোপুরি একঘরে লেবানন করেনি। এতেই তার ওপর আশপাশের আরব রাষ্ট্রগুলি ভীষণ খাপ্পা, বিশেষ করে সিরিয়া। লেবাননের মাথার ওপর সিরিয়া, পায়ের দিকে ইজরায়েল। ওদের কাউকে চটানো মানে সাধ করে বিপদ ডেকে আনা। কিন্তু দু পক্ষকে একসঙ্গে খুশি রাখা সম্ভব নয়। সিরিয়া চায় আরব-জোটের সঙ্গে মিলে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করুক লেবানন, ঠাঁই দিক তার দেশে আরব ফেদায়ীনদের আর ঘাঁটি গড়তে দিক তাদের যাতে তারা দিব্যি হামলা চালাতে পারে ইজরায়েলের উপর। আর ইজরায়েল চাচ্ছে ঠিক এর উলটোটা—তার পাশে লেবানন যদি দাঁড়াতে নাও পারে যেচে তার পেছনে লাগতে যেন না আসে। লেবানন সরকার পড়েছেন দো-টানায়। সে টান আবার বাইরেও যেমন ভেতরেও তেমন। আমেরিকান মুরুব্বিরা পরামর্শ দিচ্ছে খবরদার আর পাঁচটা আরব দোস্তের সঙ্গে জুটে ইজরায়েলের সঙ্গে লড়তে যেও না, পস্তাবে। আরব লীগের বন্ধুরা ওদিকে চাপ দিচ্ছে, আর দোনামোনা না করে তাদের দলে ভিড়ে যেতে। কী তাঁরা করবেন তাঁরা ঠাওর করে উঠতে পারছেন না। তবে এটুকু বুঝছেন আরব দোস্তদের কথা শুনে ইজরায়েলের সঙ্গে পাঞ্জা কষতে গেলে নাকের জলে চোখের জলে হতে হবে যেমন দু বছর আগে মিশরের হয়েছে। মুশকিল বাড়িয়েছে তাঁদের দেশের লোক। তারাও এককাট্টা নয় যে, তাদের মত মেনে নিয়ে তাঁরা একদিকে ঝুঁকে পড়বেন। লেবাননের মুসলমানেরা চায় আরব উগ্র-পন্থীদের দলে ভিড়তে, নাসেরের নেতৃত্ব মেনে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে, প্যালেস্টাইন গেরিলা বাহিনীর শক্ত ঘাঁটি দেশে গড়ে তুলে সমানে ইজরায়েলের এলাকাতে হামলা করতে। এতটা উগ্র হতে রাজী নয় সেখানকার খৃস্টানেরা। গেরিলা-দের আশ্রয় দিতে তারা প্রস্তুত, কিন্তু এমনধারা কিছু করতে দিতে রাজী নয় যাতে ইজরায়েল তাদের দেশে পালটা হামলা চালায়।

লেবাননের সৈন্যদলে খৃস্টানদেরই প্রাধান্য। ইদানীং তাদের সঙ্গে লেগে গেছে আরব গেরিলাদের। সীমান্তের সামান্য একটু এলাকা ছাড়িয়ে তাদের ভিতরে এগুতে দিতে সেনারা নারাজ। ফলে রক্তপাত শুধু হয়নি, প্রাণহানিও হয়েছে। গেরিলারাও ছেড়ে কথা কইছে না। লেবা-ননের শহরে শহরে চলেছে সংঘর্ষ। শোর-গোল শুরু করে দিয়েছে চারদিকে আরব রাষ্ট্রগুলো। সকলে তারা শাসাচ্ছে লেবা-ননকে। সিরিয়া লেবাননের সঙ্গে সীমান্ত বন্ধ করে দিয়েছে, লিবিয়া তার রাষ্ট্রদূতকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছে, আলজিরিয়াও তাই করবে বলে ভয় দেখিয়েছে, মিশরও লেবাননে সেনাবাহিনীর কাজের নিন্দা করেছে। তবে মিটমাটের চেষ্টাও চলেছে নাসেরের তরফ থেকেই। ওদিকে লেবাননের প্রধানমন্ত্রী ইস্তফা দিয়েছেন তাঁকে কিছু না জানিয়েই সেনাবাহিনী আরব গেরিলাদের শায়েস্তা করার ব্যবস্থা করেছে বলে। ইস্তফা তিনি অবশ্য আগেই দিয়েছিলেন, তবে নতুন মন্ত্রিসভা না হওয়া পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। প্রেসিডেন্ট হেলু কিন্তু নির্বিকার। তাঁর ভরসা সম্ভবত আমেরিকা। কিন্তু ১৯৬৯ আর ১৯৫৮-তে বেশ তফাত। ভিয়েতনামে আমেরিকার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। আবার কী বিদেশে সেনাসামন্ত পাঠিয়ে সে যেচে মান খোয়াতে আসবে?

'বেকেট প্রসঙ্গে আত্মচিন্তা'

নাট্যকার হিসেবে কৃতিত্বের জন্যে 'গোদো'র স্রষ্টা ('গোদো'ই তাঁকে বেশি খ্যাতি আর সাফল্য এনে দিয়েছে) স্যামুয়েল বেকেট এবারে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। যদিও বেকেট মাত্র নাট্যকারই নন, কবি-ঔপন্যাসিক-সমালোচকও বটেন—কিন্তু নাটকেই প্রধানতঃ তাঁর পরিচিতি, নাটকের মাধ্যমেই তাঁর বিতর্কিত জীবন-জিজ্ঞাসা।

আমি কমনম্যান সুনন্দ, বাংলা দেশের আরো অসংখ্য পাঠকের মতো সামান্য কিছু পড়তে চেষ্টা করি, রসিক কিংবা বোদ্ধা হওয়ার কোনো দাবি রাখি না। বেকেটের অগণিত মুগ্ধ ভক্তের কাছে মার্জনা চেয়ে আমি লজ্জিতভাবে স্বীকার করতে বাধ্য যে আমি তাঁর একান্ত অনুরাগী হতে পারিনি। তাতে বিশ্বসংসারের কোথাও ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই, একমাত্র আমিই অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবে থাকব।

নোবেল পুরস্কার সমিতি বেকেটকে নির্বাচিত করে কাল-চেতনাকে স্বীকৃতি দিলেন কিনা এ-সব জ্ঞানগর্ভ আলোচনার মধ্যে আমি নেই। ওর জন্যে পণ্ডিতেরা এরই মধ্যে কলম শানিয়ে বসে রয়েছেন। 'ডক্টর জিভাগো' পড়ে আমার খুব খারাপ লাগল'—বেফাঁস এই কথাটা বলে ফেলবার পরে একজন বিদ্বান্ বয়স্ক ব্যক্তি আমাকে এমন এক কড়া ধমক লাগিয়েছিলেন যে, এত বছর পরেও আমার বুকের কাঁপুনি থামেনি। না—বেকেট সম্পর্কে আমি কোনো মন্তব্য করব না—অতি সাধারণ একজন পাঠকের ভালো-লাগা মন্দ-লাগা তার নিজের জন্যেই থাকুক।

কিন্তু রসবোধের ব্যাপারে সুইডেন প্রাচীনপন্থী, এমন অপবাদ কে দেয়! যাঁরা সুইডিশ চলচ্চিত্র দেখেছেন, তাঁরাই জানেন যে কতগুলো বিশেষ ব্যাপারে ও দেশ কী পরিমাণে অগ্রসর—একমাত্র জাপান ছাড়া প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী! যে ফরাসীরা পৃথিবীতে নিজেদের সর্বাধুনিক বলে দাবি করে থাকে, সুইডীশ বিদ্যালয়গুলোতে বালক-বালিকাদের একটি পাঠ্যবস্তুর উন্মুক্ত উদারতায় তাদেরও যে হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে আসতে চায়—এবংবিধ তথ্য ফরাসী পত্রিকা থেকেই আমি আহরণ করেছি। সুতরাং স্যামুয়েল বেকেট যদি এ যুগের জীবনশিল্পী হয়ে থাকেন, তা হলে তার স্বীকৃতি সর্বাগ্রে সুইডেনেই হওয়া উচিত, এবং তা-ই হয়েছে।

এ-সব খুব ভালো কথা, কিন্তু আমি ভাবছি, ১৯০০ সালে অস্‌কার ওয়াইল্‌ডের মৃত্যু এবং সেই বছরেই স্যামুয়েল বেকেটের জন্ম। নাকি ১৯০৬-এ বেকেটের জন্ম? দু-রকমই দেখেছি। যাই হোক, এই দুই আইরীশের মাঝখানকার সেতুটি বোধ হয় জেম্‌স জয়েস। আর একটা সাদৃশ্য এই: দুজনেই দ্বৈভাষিক লেখক। 'সালোমে' লেখা হয়েছিল ফরাসীতে, বেকেট বোধ হয় ইংরিজির চাইতে এখন ফরাসী ভাষাতেই বেশি খ্যাতিমান।

প্রুস্তের লেখা থেকেই বেকেট ফরাসীর দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন কিনা জানি না। কিন্তু আইরীশরা দেখছি ফরাসীতে লিখতেই বেশি অনুপ্রেরণা লাভ করেন। কোনো মনস্তাত্ত্বিক কারণ আছে নাকি? ইংরেজের সুশাসনে এক সময় তো আয়ার্ল্যাণ্ডের হাড়-চামড়া ছাড়া কিছু আর অবশিষ্ট ছিল না। সেই অবচেতন বিরূপতাই হয়তো আইরীশ লেখকদের ফরাসীর দিকে টানে, দাস্ মনোবৃত্তি থেকে মুক্তি দেয়।

কিন্তু নোবেল-প্রাইজের ব্যাপারে বেকেটের ভেতরে আইরীশ আর ফরাসী মেজাজের একটা সমন্বয় দেখা যাচ্ছে। হয়তো বার্নার্ড শ'র মতো তিনিও ভাবছেন—এ সব তুচ্ছ পুরস্কার তাঁর অনেক আগেই পাওয়া উচিত ছিল; কিংবা ফরাসী জাঁ পোল সার্ত্রের

নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়া এই লেখক ভারতের জন্য দুর্লভ বৈদেশিক মুদ্রা আমদানী করিয়াছেন। ঐ বৈদেশিক মুদ্রা যাহাতে এদেশের ব্যাঙ্কেই গচ্ছিত রাখেন ও তাঁহার গ্রন্থাবলী যাহাতে স্টেট ট্রেডিং করপোরেশনের মাধ্যমে বিদেশে বিক্রয় হয় তজ্জন্য তাঁহাকে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা হইল

[illegible] বলুন, নোবেল পুরস্কার চাইনে

আসল তাঁর মনে হচ্ছে এ-সব পুরস্কারের কোনো মানেই হয় না। কারণ, সংবাদে প্রকাশ, নোবেল পুরস্কার নেবেন কিনা, এ বিষয়ে স্যামুয়েল বেকেট এখনো চিন্তা করে দেখছেন।

কিন্তু তাঁরা করুন, পাস্তেরনাক কিংবা সার্ত্র মতো যা খুশি সিদ্ধান্তে পৌঁছোন। ও-সব উচ্চ ভাবনা ওঁদেরই পোষায়। কারণ ওঁরা বাঙালী লেখক নন—বইয়ের আয়তনের ওপর ওঁদের অর্থাগম নির্ভর করে না, পুজো সংখ্যায় অন্ততঃ খানচারেক উপন্যাস লিখতে না পারলে ওঁদের বছরের বাজেট আপসেট হয়ে যায় না। নোবেল প্রাইজের টাকা না হলেও ওঁদের চলে।

কিন্তু আমরা? এই সব আদিখ্যেতা দেখলে আমাদের গা জ্বালা করে। আমাদের বাঙালী রবীন্দ্রনাথও নোবেল-পুরস্কার পাওয়ার পরে কী বলেছিলেন? মস্ত একটা স্বস্তির নিশ্বাস পড়েছিল তাঁর : শান্তি-নিকেতনের ড্রেনগুলো পাকা করবার একটা ব্যবস্থা হল এতদিনে।

পুরস্কার পাওয়া-টাওয়া আমাদের নেসেসিটি—একেবারে স্থূলে বাস্তব প্রয়োজনেই আমরা পাঁচ হাজারী থেকে পাঁচ শতকী—যে-কোনো পুরস্কারের জন্যে আসমুদ্র-হিমাচল আলোড়িত করতে পারি। লক্ষ টাকার একটি দূর নক্ষত্রলোকের দিকে তাকিয়ে আমাদের প্রতিদিন দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

নোবেল-কমিটি কেন যে সচ্ছল সৌভাগ্যবান লেখকদের পুরস্কার দিয়ে নিউ ক্যাসলে কয়লার গাড়ী টেনে নিয়ে যান কিংবা পাস্তেরনাক-সার্ত্র-বেকেট কোম্পানীকে তোয়াজ করতে গিয়ে অপমানিত হন, এ-সবের কোনো অর্থই খুঁজে পাওয়া যায় না। আমাদের পাঁচ হাজারী থেকে পচ শতকীর জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা যদি তাঁরা জানতে পারতেন, তা হলে বছর বছর বাঙালী লেখকদের পুরস্কৃত করে তাঁরাও চরিতার্থ হতেন, আমরাও বোধ হয় আপত্তি করতুম না। এমন কি—আমি স্বনন্দ—সপ্তাহে সপ্তাহে এই যে "অনবদ্য" জার্নাল লিখে থাকি, আমাকেও যদি এর জন্যে তাঁরা নোবেল প্রাইজ অফার করেন (দোহাই, চটবেন না—স্বপ্ন দেখবার মৌলিক অধিকার আমারও আছে—সেদিনও, টিকিট না কিনেই স্বপ্নে আমি লটারীতে পাঁচ লাখ টাকা পেয়েছি), তা হলে আমিও তাঁদের অবলাইজ করব—এমন প্রতিশ্রুতি এই মুহূর্তেই দিতে পারি। এবং—একটু উৎসাহ পেলেই কোনো ফরাসী-বিদের হাতে-পায়ে ধরে অনুবাদ করিয়ে—মহাভারত সদৃশ একটি জার্নাল তাঁদের কাছে উপস্থিত করতে আমি সদা-প্রস্তুত।

আমার কথা থাক—পৃথিবীতে আমি (এবং 'দেশ'-এর সর্বংসহ সম্পাদক) ছাড়া আমার গুণগ্রাহী আর কেউ আছেন কিনা সন্দেহ। সুতরাং আমার কোনো চান্স্ নেই। কিন্তু নোবেল-কমিটির ধারে কাছে কি এমন কেউ নেই যে বাংলাদেশের বিদগ্ধ ব্যক্তিদের মতামত এবং প্রজ্ঞাবান সমালোচক-দের বক্তব্য তাঁদের কাছে পৌঁছে দিতে পারে? সেই সব অভিজ্ঞত আর আলোচনা থেকে তাঁরা জানতে পারতেন—বাংলাদেশের কত লেখক বিদেশী লেখকদের ম্লান করে দিয়ে মধ্যাহ্ন-সূর্যের মতো জ্বলজ্বল করছেন। বিশেষ করে বাংলা উপন্যাস। নিতান্তই একটা আঞ্চলিক ভাষায় লেখা হয় বলে আমাদের মহান্ স্রষ্টারা কল্কে পাচ্ছেন না এবং এক চক্ষু হরিণের মতো নোবেল-কমিটির দৃষ্টি একান্তভাবে পশ্চিমের দিকে নিবদ্ধ বলেই তাঁরা টের পান না যে, আমাদের কোনো-কোনো লেখককে একবার কেন—তিন-তিনবার নোবেল প্রাইজ দেওয়া উচিত!

আমরা বেকেটদের মতো নাক উঁচু করব না—প্রাইজ পেলেই নিয়ে ফেলবো। পশ্চিমী লেখকদের মতো আমরা ছোটলোক নই। বিদেশের এমব্যাসিগুলোতে যে-সব দেশ-প্রেমিক বাঙালী আছেন, এ ব্যাপারে তাঁদের কিঞ্চিৎ সক্রিয় হতে অনুরোধ করছি।

নোবেল ছাড়া আর কি কি পুরস্কার পেয়েছেন? আমরা গোপনসূত্রে খবর পেয়েছি, আপনি পুলিটজার ও ম্যাগসেসে পুরস্কারও গোপনে গ্রহণ করেছেন ও সরকারকে ট্যাক্স ফাঁকি দিয়েছেন

ডানদিকে বালিকা বয়সে মীরা দেবী, উপবিষ্টা জ্যেষ্ঠা ভগিনী মাধুরীলতা, দাঁড়িয়ে রেণুকা (রাণী)। বাঁয়ে কনিষ্ঠ ভ্রাতা শমীন্দ্রনাথ

জন্মায় না। রানীদি ছিলেন সেই ধরনের মেয়ে। বাবা যদি রানীদিকে অল্প বয়সে বিয়ে না দিয়ে লেখাপড়া করাতেন তা হলে বোধ হয় ভাল করতেন। রানীদিকে বেশির ভাগ সময় বই পড়তে দেখতুম। গল্পগুজব খুব কমই করতেন। তবে ওঁকে পড়াবার জন্য কোনো শিক্ষককে আসতে দেখিনি যেমন দিদি ও দাদাদের জন্য ছিল। ওঁর মনটা ছিল খুব দয়ালু। কেউ ভিক্ষে করতে এলে কখনও ফেরাতেন না। হাতের কাছে যা পেতেন দিয়ে দিতেন।

দিদির বিয়ের কথা অল্প অল্প মনে পড়ে—বাড়িতে অনেকের যাওয়া-আসা ও হাসিগল্প। আত্মীয়স্বজন সকলে খুব খুশী। এই প্রথম কাজ মায়ের। শ্বশুর-বাড়ির সবাই মাকে খুব ভালবাসতেন, কাজেই তাঁর মেয়ের বিয়ে হচ্ছে আনন্দ তো হবেই। দিদির বিয়ে হয়েছিল কবি বিহারী-লাল চক্রবর্তীর ছেলে শরৎ চক্রবর্তীর সঙ্গে। শরৎবাবু মজঃফরপুরে ওকালতি করতেন। দিদির বিয়ের কিছু দিন পরে বাবা নিজে দিদিকে মজঃফরপুরে পৌঁছে দিয়ে এলেন। দিদি তখন ঘরকন্নার কাজ কিছুই জানতেন না। বাবা শুধু ভাল করে লেখা-পড়া শিখিয়েছিলেন দিদিকে। পণ্ডিত রেখে সংস্কৃত শিখিয়েছিলেন। ঘরকন্নার কাজকর্ম না জানাতে শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে দিদিকে পদে পদে ঠেকে শিখতে হয়েছে। আমি দিদিমার কাছে ঘরকন্নার কাজ শিখছি দেখে দিদি আমাকে বলতেন—তোর কেমন মজা, সব শিখে নিচ্ছিস। আমার মত পরে কষ্ট পেতে হবে না। দিদি খুব বুদ্ধিমতী ছিলেন—চট করে জানতে দিতেন না যে, এই কাজটা জানেন না।

শরৎবাবুদের বাড়িটা ছিল দু মহলা; মাঝখানে উঠান। সামনের দিকের মহলে দিদিরা থাকতেন, পিছন দিকের মহলে শরৎবাবুর দাদা হৃষিকেশবাবু ও তাঁর স্ত্রী থাকতেন। শরৎবাবু সুন্দরী বউ এনেছেন কথাটা তাঁর বন্ধুমহলে প্রচার হয়ে পড়ায় তাঁদের স্ত্রীরা দিদিকে দেখবার জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়লেন। একে একে অনেকে এসে দিদির সঙ্গে আলাপ করে গেলেন। তাঁদের সঙ্গে শুধু যে আলাপ পরিচয় হল তা নয়, অল্প দিনের মধ্যে কারো কারো সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠতাও হয়ে গেল। এঁদের মধ্যে লেখিকা অনুরূপা দেবী ছিলেন দিদির বিশেষ বন্ধু। দিদির তখন আর সঙ্গীর অভাব রইলো না। মজঃফরপুর শহরটি তখনকার দিনে শুধু আইনব্যবসায়ীদের শহর ছিল বলা যেতে পারে। কি করে যে এত উকিল এক জায়গায় জড় হয়েছিলেন এবং সকলেই বেশ জমিয়ে বসেছিলেন ভাবলে আশ্চর্য লাগে। মনে হয় ওখানকার স্থানীয় অধিবাসীরা ঝগড়াঝাঁটি হলেই আদালতে নালিশ করতে ছুটতেন! দিদিদের বাড়ির পিছন দিকে যে বস্তি ছিল সেখানে রাতদিন দাঙ্গাহাঙ্গামা লেগেই থাকত। আমি মানুষ হয়েছিলুম শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ায়, তাই ওদের মারামারি কাটা-কাটি দেখে দেখে বড় অশান্তি লাগত।

তখন পশ্চিমে ফল কি শস্তাই না ছিল! শরৎবাবু যখন সের হিসাবে আঙুর প্রভৃতি ফল কিনে টুকরি বোঝাই করতেন, আমি অবাক হয়ে চেয়ে থাকতুম আর ভাবতুম, এত ফল নিয়ে কি হবে! আমি গিয়েছি শান্তিনিকেতনের ফাঁকা মাঠ থেকে, তখনও শান্তিনিকেতনের কারো বাগানে ফলের গাছ হয়নি বা বাজারে এখনকার মত ফলের দোকানও হয়নি। শরৎবাবু একটা প্লেটে অনেকগুলো আঙুর ঢেলে দিয়ে বলতেন—খেয়ে দেখ মিষ্টি কিনা। সেই সঙ্গে নিজেও খেতে আরম্ভ করে দিতেন। মজঃফরপুরের লিচু হল বিখ্যাত। লিচুর সময়ে শরৎবাবু ঝুড়ি ভরতি করে লিচু আমাদের জন্য বোলপুরে পাঠিয়ে দিতেন। এঁদের ওখানে আর একটি প্রথা দেখেছিলুম যা আর কোথাও দেখিনি। দুপুরে ভাত খাবার সময় বড় এক থালা ভরতি করে তখন যা যা ফল পাওয়া যেত সব দেওয়া হত—আম লিচু তো থাকতই, তা ছাড়া বড় বড় টুকরো তরমুজ খরমুজ ইত্যাদি কিছুই বাদ যেত না। ভাতটা ওঁরা নামমাত্র খেতেন, ফল খেয়েই পেট ভরাতেন। জিজ্ঞেস করলে বলতেন—ভাত তরকারি তো বারো মাস খাচ্ছি, কিন্তু এসব ফল তো বারো মাস পাওয়া যাবে না। দিদিদের মহলে তিনখানা ঘর ছিল। দু পাশে দুটি শোবার ঘর আর মাঝেরটি ছিল বসবার ঘর। প্রথম ঘরটি ছিল দিদিদের শোবার ঘর। সব শেষের ঘরটি আমাকে দেওয়া হয়েছিল। এখনও

মনে পড়ে একলা ঐ ঘরে শুতে কিরকম ভয় করত। যখনই ঘুম ভেঙে যেত মাঝখানের অন্ধকার হলটির কথা মনে হলে কিছুতেই আর ঘুম আসত না। ঐ ঘরের পিছনের দরজা খুললে খোলা ছাদ, ছাদ পার হয়ে দিদির ভাশুরদের মহল। এখনকার মত তখন বৈদ্যুতিক আলো হয়নি। আমার শোবার ঘরের পাশে একটি ছোট বারান্দা ছিল। সেখানে টিম্‌টিম্‌ করে একটি লণ্ঠন জ্বলত। অন্ধকার ছাদটার কথা মনে করে গা ছম্‌ছম্‌ করত। দিদির ওখানে দিনের বেলাটা বেশ থাকতুম। যত সন্ধ্যে হয়ে আসত, রাত্তিরের কথা মনে করে মন খারাপ হয়ে যেত। তখন মনে হত বাবা কবে এসে নিয়ে যাবেন। রাত্তিরে শুতে যাবার আগে হল-ঘরে বসে শরৎবাবুর সঙ্গে দিদি সংস্কৃত নাটক পড়তেন—কখনো মেঘদূত, কখনো বা শকুন্তলা। শরৎবাবুর সংস্কৃত সাহিত্যে খুব অনুরাগ ছিল। যতক্ষণ না আমার ঘুম আসত, শরৎবাবুর গম্ভীর গলায় সংস্কৃত শ্লোকের ধ্বনি মানে না বুঝলেও শুনতে খুব ভাল লাগত। দিদিরা হল-ঘরে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়বার চেষ্টা করতুম।

দিদিদের প্রসঙ্গ ছেড়ে এইবার রানীদি ও সত্যবাবুর বিষয় বলি। রানীদির বিয়ে দিয়েছিলেন বাবা সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে।

সত্যবাবুর কাছে বাবা যখন শুনলেন যে, তিনি আমেরিকায় গিয়ে হোমিওপ্যাথি শিখতে চান তখন বাবা খুব খুশী হয়েছিলেন ও রানীদির সঙ্গে তাঁর বিয়ে দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। সত্যবাবুও তাতে রাজী হয়ে গেলেন। বাবা তিন দিনের মধ্যে রানীদির বিয়ের দিন স্থির করে ফেললেন। এত তাড়াহুড়ো করে রানীদির বিয়ে হল যে, পাঁচজন বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়স্বজন সবাইকে নেমন্তন্ন করবার পর্যন্ত সময় হয়ে ওঠেনি। এরকম করে বিয়ে দেওয়াতে মা মোটেই খুশী হননি। দিদির বিয়ে যেমন ঘটা করে হয়েছিল, রানীদির বিয়ে তেমনি চুপচাপ করে হয়ে গেল। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাতে বাবার খুব বিশ্বাস ছিল, তাই আর কেউ হোমিওপ্যাথি শিখতে চায় শুনলে ভারী খুশী হতেন। বাবার মনে মনে বোধ হয় আশা ছিল যে, সত্যবাবু বিদেশ থেকে একজন যশস্বী হোমিওপ্যাথ হয়ে আসবেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁর সে আশা পূর্ণ হল না।

আমেরিকায় গিয়ে সত্যবাবুর ভাল লাগল না, অল্প দিনের মধ্যে ফিরে এলেন। সত্যবাবু অকৃতকার্য হয়ে ফিরে এলেন বলে রানীদির মনটা খুব ভেঙে গিয়েছিল। সত্যবাবু ফিরে আসতে চান শুনে বাবা তখনই তাঁকে দেশে ফেরবার টাকা পাঠিয়ে

মাধুরীলতা (বেলা)
(১৮৮৬—১৯১৮)

শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী
(রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ জামাতা)

দিলেন। সত্যবাবুর ফিরে আসা নিয়ে মেয়ে-মহলে খুব সমালোচনা শুরু হল। বাবা কিন্তু একটি কথাও বললেন না।

সত্যবাবু দেশে ফেরবার অল্প দিনের মধ্যে রানীদির টি বি ধরা পড়ল। তখন এখনকার মত টি বি-র ভাল ওষুধ বের হয়নি; তাই ধরে নিতে হত যে, সারবে না। কিছু দিন আগে থাকতে রানীদির অল্প অল্প জ্বর হচ্ছিল, কিন্তু কাউকে কিছু বলেনি। বোধ হয় বাঁচার ইচ্ছা ছিল না। সত্যবাবু বাবার এতগুলো টাকা নষ্ট করে এলেন, কিছু শিখে এলেন না বলে রানীদির মনটা খুব ভেঙে গিয়েছিল। কয়েক মাস পরে মা মারা গেলেন, তার কিছু দিন পরে বাবা আমাদের নিয়ে হাজারিবাগ গেলেন। সেখানে কিছু দিন থাকার পরেও যখন রানীদির রোগের কিছু উপশম হল না তখন বাবা আমাকে ও আমার ছোট ভাই শমীকে মেজমার (সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী) কাছে রেখে রানীদিকে নিয়ে আলমোড়ায় চলে গেলেন, সঙ্গে গেলেন দিদিমা। রানীদিকে নিয়ে আলমোড়ায় যেতে বাবা অনেক কষ্ট ভোগ করেছেন। আলমোড়ায় যেতে জায়গায় জায়গায় কুলি বদল করতে হত। কুলির জন্য আগে থাকতে খবর দেওয়া থাকত, তবুও অনেক সময় সেখানে গিয়ে দেখা যেত যে, কোনো কারণে কুলি আসেনি। তখন খুব মুশকিলে পড়তে হত। এইরকম ঘটনা একবার হওয়াতে তাদের অপেক্ষায় বসে না থেকে বাবা রানীদির রুগ্ন শরীর বহন করে নিয়ে চললেন যতক্ষণ না আর একদল কুলির দেখা পেলেন। দিদিমার কাছ থেকে এই ঘটনার কথা শুনেছিলুম। তা ছাড়া বাবা প্রতিদিনই রানীদির ডান্ডির পাশে পাশে হেঁটে যেতেন মাইলের পর মাইল। বাবার শরীরে তখন কি আশ্চর্য শক্তি ছিল।

পাইনের হাওয়া যক্ষ্মা রোগীর পক্ষে উপকারী বলে রানীদিকে সারা দিন পাইন গাছের ছায়ার নীচে রাখা হত; কিন্তু সেখানেও কিছু হল না, বরং দিন দিন রোগ বৃদ্ধি পেতে লাগল। তখন আবার কলকাতায় ফিরিয়ে আনতে হল। আবার সেই অভিশপ্ত লাল বাড়িতে, যেখানে বাড়ি শেষ হতে না-হতে নীতুদা গেলেন, কয়েক মাসের মধ্যে মা গেলেন। সেইজন্যে ঐ বাড়িটাকে আমার বড় অপয়া মনে হয়। রানীদিরও ক্ষীণ জীবন প্রদীপ ঐখানে নিবে গেল। রানীদি কলকাতায় এসেছেন শুনে দেখতে গিয়েছিলুম। সে কি জীর্ণ শীর্ণ চেহারা ও ম্লান হাসি! আজও তা ভুলতে পারিনি। তার ঠান্ডা হাতখানি বাড়িয়ে আমাকে কাছে ডেকে এক বাক্স খেলনা দিলেন—কলকাতায় আসবার সময় লখনউ স্টেশনে কিনেছিলেন আমার কথা মনে করে।

রানীদির সঙ্গে দেখা করে মেজমার ওখানে ফিরে গেলুম। তারপরে কবে যে বেচারী রোগযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেল সেটা আমার জানা নেই। শুনেছি রানীদি যাবার সময় বাবার হাত চেপে ধরে বলেছিলেন, "বাবা, ওঁ পিতা নোহসি বল।" হাজারিবাগে যাবার আগে অল্প কিছু দিন আমরা শান্তিনিকেতনে ছিলুম। বাবা রোজ সকাল বেলায় রানীদিকে নিয়ে বারান্দার এক কোণে বসে উপনিষদ থেকে মন্ত্র পাঠ করে তার মানে বুঝিয়ে দিতেন। এমনি করে ধীরে ধীরে তাঁর মনকে সংসারের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করবার পথে অনেকটা এগিয়ে দিয়েছিলেন যাতে ছেড়ে যেতে বেশী কষ্ট না পায়। এই সময় বাবা যেন রানীদিকে বেশী কাছে টেনে

নিয়েছিলেন। রানীদিকে বিয়ে দিয়ে ভুল করেছেন। সেটার জন্য হয়তো অনুতাপ হয়ে থাকবে।

অতি অল্প বয়েসেই রানীদি চলে গেলেন।

আমাদের ভগিনীপতি সত্যবাবু অত্যন্ত সাদাসিধে মানুষ ছিলেন। মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পরিবারে মানুষ হয়েছিলেন, তাই জন্যে বিদেশে গিয়ে তাদের আদবকায়দা তাঁর ভাল লাগল না। বাবা যখন সত্যবাবুর কাছে তাঁর চলে আসার কারণ শুনলেন তখন তার জন্য বিরক্ত না হয়ে বরং সত্যবাবুর জন্য একটা মায়া হল সফল হয়ে আসতে পারলেন না বলে। পরে বাবা তাঁকে শান্তিনিকেতনে কাজ দিয়েছিলেন। সেখানে সত্যবাবু বেশ খুশিতে ছিলেন। তখন রানীদি বেঁচে নেই; তা হলেও আমাদের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তার বন্ধন কখনও ছিন্ন হয়নি। দুঃখের বিষয়, তিনিও খুব অল্প দিনের মধ্যে মারা যান। তিনি যাবার পরে তাঁর নামে ছাত্রদের বাসের জন্য একটি বাসগৃহ তৈরী হল।

(ক্রমশ)

স্বয়ম্ভু

কালীপদ কোঙার

মাঝে মাঝে বিশ্বাসের মাটি আলগা হয়ে যায়
তখন আর চেষ্টা করেও
সেই ফলন্ত গাছকে রক্ষা করা যায় না।

কখনো কখনো বিশ্বাসের আলগা মাটিতে
আবার নূতন করে জল হাওয়া লাগলে
বিশ্বাসের শিকড় হৃদয়ের
আমূলে গভীরে ঢুকে যায়।

ইচ্ছে করলে কেউ, কোনো দিন, কোনো সময়ে
বিশ্বাস গড়তে পারে না, ভাঙতে পারে না;

সময়ের শক্ত জমিতে পা ডুবিয়ে
নিরবধিকাল দাঁড়িয়ে থাকে
অটল, অজেয়, স্বয়ম্ভু ঃ বিশ্বাস।

অধিকাংশ সন্ধিই

বিকাশ বসু

না: কোন নিয়ম নেই
অধিকাংশ সন্ধিই নিপাতনে সিদ্ধ
কোথায় গোছানো সংসার
কখন লণ্ডভণ্ড হবে
কার বৃক্ষহীন বাগানে হঠাৎ
জুঁইচাঁপা ফুটবে
কেউই বা বলতে পারে ?

এদিকে হায় হায় লোহিতসাগরেও কুটো
মহোপাধ্যায়ের ছেলে পরীক্ষায় ফেল
ফকির ছেলে বাদশাদার
এই তো সংসার হে।
আড়াই ঘণ্টার অপেক্ষায়
একেবারে খালি বাস
ভাবা যায় ?
আমি তাই দাঁড়িয়েই থাকি
ভয়ঙ্কর রাতের মাথায় কখন ভীম
ঝরঝর হেসে ফেলবে।

তোমার সহিষ্ণু চোখ

বিজয়া মুখোপাধ্যায়

সারাদিন ভ্রষ্ট হতে হতে ফিরে আসি।
কাকে বলে আত্ম-অবলেপ চিত্তস্থিতি, প্রার্থনা প্রার্থনা
আমাকে শিখিয়ে দাও।
কী করে পাখির মত বুক পেতে নিতে হয় তীর
মতজাল, স্প্রিং-এর শরীর
বেঁকেচুরে খেলা যায় পুতুল-পুতুল
আমাকে শেখাও।

জলের ভেতরে জল অথবা বরফ
যেভাবে একান্ত মগ্ন হয়
তেমনি অস্তিত্বহীন প্রাণ—নিঃস্ব রক্ত বিশ্বচরাচর—।
এর নাম নিশ্চিন্ত কল্যাণ, স্বগম, দিগ্বিজয় ?
কোনদিন উদ্‌বৃত্ত আলোতে
গোপন দর্পণে দেখি তোমার সহিষ্ণু চোখ—প্রগাঢ় অশোক
ক্ষতচিহ্ন লুকিয়েছ কীসের প্রলেপে অলৌকিক
আমাকে শেখাও, মা।

লেকমে
আল্ট্রা
গ্লো

মদনভস্ম

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

'এমন চুপ করে আছো কেন?'—প্রশ্ন করল মেয়েটি।

ছেলেটি বললে, 'ভাবছি।'

'কী ভাবছ?'

'অত্যন্ত আনপ্র্যাকটিক্যাল মনে হচ্ছে নিজেকে। বাবাকে এমন একটা কথা বলে ফেললুম—'

'মন খারাপ করবার কী আছে সেজন্যে?'—মেয়েটি সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করল: সংসারে থাকতে গেলে কখনো কখনো দু-একটা কথা বেরিয়ে পড়েই। ঠিক হিসেব করে তো চলা যায় না।'

একটু চুপ করে রইল ছেলেটি। গাছের ছায়া, অন্ধকার। এদিকেও ইলেকট্রিক আলোর বন্দোবস্ত ছিল, বাল্বগুলো ভেঙে দিয়েছে কিংবা খুলে নিয়েছে কেউ। সামনে স্তব্ধ জলের ওপর তারার স্নান। ওপারের রাস্তা দিয়ে মোটরের আনাগোনা। এখানে ছায়া-সন্ধ্যা-নিঃসঙ্গতা। কোনো একটা গাছে ফুল ফুটে আছে, মিষ্টি নরম গন্ধের একটা আবরণ চারদিকে। গাছের ফাঁকে ঝুলে রয়েছে একফালি সপ্তমীর চাঁদ। দূর থেকে কথার টুকরো—হাসির আওয়াজ। ওদিকে কোথাও ছেলেদের একটা দল এসে আছে হয়তো। দেখা যায় না তাদের—একটা আভাস পাওয়া যায় যেন।

এই সন্ধ্যা—এই নির্জনতা। জলের ওপর তারার ছায়া। ছেলেটিকে আসতে হয়েছে দূর থেকে। মেয়েটির বাসা থেকে না বেরুলেই হয়তো ভালো ছিল, কারণ বিকেলে দেখেছে তার ছোট ভাইটির জ্বর এসেছে। কিন্তু তবু আসতে হয়েছে, কারণ এই সন্ধ্যাটির জন্যে এক সপ্তাহ ধরে আয়োজন করতে হয়েছিল।

সময় নেই কারোও সময় নেই। ছেলেটির স্কুল মাস্টারি আছে, টিউশন আছে দু-তিন আবার কোচিং ক্লাসে পড়াতেও হয়—একটা মধ্যবিত্ত সংসারের অনেকখানি দায় তার কাঁধের ওপর। মেয়েটি চাকরিতে ঢুকেছে শর্টহ্যান্ড আর টাইপিং শেখে। পরিবারের দায়িত্ব অনেকটা বইতে হয় তাকেও।

এই সন্ধ্যাটি সহজে আসেনি, তাকে তৈরী করে নিতে হয়েছে। ছেলেটি যায়নি কোচিং ক্লাসে, মেয়েটি পালিয়েছে শর্টহ্যান্ডের ক্লাস থেকে। এই সন্ধ্যাটি ছিল নির্ভাবনার জন্যে, সব ভুলে যাওয়ার জন্যে, কিছুক্ষণ কাছাকাছি একান্তে বসবার জন্যে। অথচ বসতে না বসতেই ছেলেটি গম্ভীর হয়ে গেল। অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাবে কাকার কথা মনে পড়ল তার, মনে হল সে আনগ্রেটফুল।

ছেলেটি আবার বললে, 'তুমি তো সবই জানো।'

তা জানি।'

'বাবা মারা গেলেন ছেলেবেলায়—মা চলে গেলেন তার বছর তিনেকের ভেতরেই। কাকার কাছেই বড়ো হয়েছি, লেখাপড়া শিখেছি, মা বাবার অভাব জানতে পারিনি কোনোদিন। অথচ—'

এ আলোচনার কোনো দরকার ছিল না, এ-সব খবরই মেয়েটির জানা। আর এ-ও জানা কথাই যে, এই জীবনের ভেতরে--চার দিকের নানা ঝঞ্ঝাটে সব সময় মন মেজাজ কারো ভালো থাকে না, থাকতে পারে না। অহেতুক আমরা বিস্বাদ হয়ে যাই, সামান্য কারণে এ ওকে আঘাত করি। সেই সব তিক্ততাকে ভোলবার জন্যেই এই ছায়া, এই সন্ধ্যা, এই নির্জনতার দরকার ছিল আজ। কিন্তু কী আশ্চর্য, প্রতি মুহূর্তের বিস্বাদগুলো কেউ সঙ্গ ছাড়ে না—এই যে দুজনে শরতের ভিজে ভিজে ঘাসের ওপর পাশাপাশি বসে রয়েছে—মাঝখানে আধ হাতের বেশি যখন জায়গা নেই, তখনও তারই ভেতরে ঘেঁষাঘেঁষি করে ভীড় জমিয়েছে তারা।

ছোট একটা নিশ্বাস ফেলল মেয়েটি।

'ছেড়ে দাও ও কথা। ও-রকম হয়ই। কালই মিটে যাবে আবার।'

ছেলেটি চুপ করে রইল একটু। তারপর :

'আমরা যেন কি রকম হয়ে যাচ্ছি, তাই না?'

'একথা কেন?'

'কাউকে শ্রদ্ধা করতে পারছি না, বিশ্বাস করতে পারছি না, বোধ হয় ভালোবাসতেও পারছি না—রাতদিন কেবল বিরক্ত হয়ে যাচ্ছি।'

মেয়েটি একবার আলতো ভাবে কামড়ে ধরল নীচের ঠোঁটটা। এই কথাটা মনে না করিয়ে দিলেও কোনো ক্ষতি ছিল না। বিকেলে ছোট ভাইটার জ্বর এসেছে আজ। ছেলেটা শান্ত আর দুর্বল, অসুখ-বিসুখ করলে ছটফট করে না—ঝিম মেরে পড়ে থাকে, আরো মায়া হয় দেখলে। মা বলেছিল, তুই একটু কাছে বসবি খুকু? অসুখের সময় তোকে কাছে দেখলে ভারী খুশি হয়।'

আজ বাড়ি থেকে না বেরুলেই ভালো হত। একশো দুইয়ের মতো জ্বর, গা ধাঁ ধাঁ করছে এখনো, হয়তো পরে আরো বাড়বে। পাশে বসে কপালে হাত রাখতে ছোট নিশ্বাস ফেলল। কিন্তু আজ মায়া হল না, অদ্ভুত বিরক্তি বোধ হল একটা। এখন সীজন-চেঞ্জের সময়—যখন তখন ঠান্ডা লাগতে পারে, কী ক্ষতি হয় সকালে-সন্ধ্যায় একটা গেঞ্জী পরলে? তার না হয় অফিস আছে, শর্টহ্যান্ডের ক্লাস আছে, কিন্তু মা-ও কি এ-সব দিকে একটু নজর রাখতে পারে না?

ঠিক এই মুহূর্তে ছেলেটিকে বলা যায় না, কিন্তু বিরক্তি তারও লাগছিল। কী দরকার ছিল ভাইটার অকারণে জ্বর বাধিয়ে বসবার? কী দরকার ছিল আজ সন্ধ্যায় এখানে এই অ্যাপয়েন্টমেন্ট করবার? জীবনে কোন্ বাড়তি কথা আজো অবশিষ্ট আছে যা কলকাতার ফুটপাথে ধরা দেয় না, কোনো চায়ের দোকানে ফুটে ওঠে না—জলের ধারে, গাছের ছায়ায়, এক মুঠো ফুলের গন্ধে, শরতের ভেজা ঘাসের ওপর, সপ্তমীর ঝলে-পড়া চাঁদটার দিকে তাকিয়ে যাকে নতুন ভাবে আবিষ্কার করতে হয়?

বলা গেল না, বাড়ি থেকে বেরুতে বিরক্তি লাগছিল; বিরক্তি লাগছিল পাড়ার সেই চেনা ডাক্তারকে খবর দিতে, যিনি বাবার বন্ধু ছিলেন, আর সেই সুবাদে যিনি এ বাড়িতে কখনো ভিজিট নেন না।

রোগীর ভিড়ে বিরক্ত ছিলেন ডাক্তার। তারই মধ্যে মাথা তুলেছিলেন একবারের জন্য।

'কিছু ভাবতে হবে না, ইনফ্লুয়েঞ্জা। আথছার হচ্ছে এখন। পারি তো রাত্রে যাব একবার। নইলে কাল সকালে।'

'ওষুধ দেবেন না কিছু?'

'গিয়ে দেখি আগে। বললাম তো, ভাবতে হবে না কিছু। চারদিকেই ইনফ্লুয়েঞ্জা আজকাল।'

একবারের জন্যে মনে হয়েছিল ভিজিট নেন না বলেই কি কোনো গরজ নেই ডাক্তারের? আজ হোক, কাল হোক দেখে এলেই হবে যে-কোনো সময়? ওষুধ দিলেও চলে, না দিলেও ক্ষতি নেই? বাড়িতে গিয়ে যদি হাত পেতে আটটা টাকা নিতে পারতেন, তা হলেও কি অন্যের জন্যে প্রেসক্রীপশন লিখতে লিখতে, একবার মাত্র মাথা তুলে, আলতো ভাবে ছেড়ে দিতে পারতেন এই কথাটা : "ও কিছু না—ইনফ্লুয়েঞ্জা?"

ছেলেটিকে বলা যায় না যে সেও মনের সঙ্গে সঙ্গে একটা ভিড় নিয়ে এসেছে—ক্লান্তির অবসাদের বিরক্তির। কিছুতেই ভোলা যাচ্ছে না দুর্বল শান্ত ছোট ভাইটার মুখ টকটকে লাল ছিল জ্বরের ধমকে। আসবার সময় একশো দুইয়ের মতো টেম্পারেচার দেখেছিল এতক্ষণ আরো বেড়েছে হয়তো। আজ বিকেলে বাড়ি থেকে

না বেরিয়ে ওর পাশে একটুখানি বসলে, মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিলে—

কিন্তু এই সব ভিড়, এই সব ভার আজকে বয়ে আনবার কথা ছিল না। এই সন্ধ্যাটার জন্যে একজনকে চলে আসতে হয়েছে শর্টহ্যাণ্ডের কোর্স ফেলে, আর একজন পালিয়েছে তার কোচিং ক্লাস থেকে। মনে হয়েছিল, অনেক কথা আজকের জন্যে জমে আছে, প্রত্যেকটা ক্লান্ত দিন—প্রতিটি অবসন্ন রাত্রের ধুলো-মেঘ-ধোঁয়া সরিয়ে দিয়ে কয়েকটা নতুন তারা জন্ম নেবে আজকে, পাঁচ বছর আগে যে মেয়েটি গান ছেড়ে দিয়েছে আজ কয়েকটা সুর রিনরিনিয়ে উঠবে তার গলায়, কথার ফাঁকে ফাঁকে ছেলেটি আবৃত্তি করবে কবিতার লাইন। কিন্তু দেখো, মেয়েটি ভাবল : আমরা দুজনেই কেমন বিরক্ত আর বিস্বাদ হয়ে বসে আছি। অথচ এখন সপ্তমীর চাঁদটা ঝুলে রয়েছে গাছপালার ভেতর দিয়ে, সামনের জলটায় তারারা স্নান করছে, নির্জন গাছের ছায়ায় জমাট বাঁধছে ফুলের গন্ধ—এখন, দুজনের ভিতরে আধ হাতের বেশি জায়গা খালি নেই যখন—এই সময়, ঘাসের ওপর বসে ও ভাবছে নিতান্তই এক বাড়ো কাকার কথা, আমি ছোট ভাইটার মুখে জ্বরের রং ভুলতে পারছি না কোনোমতেই।

কাকার সঙ্গে একটু ঝগড়া হয়েছে, কালই মিটে যাবে; ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভাববার কী আছে—ওষুধ না খেলেও দিন তিনেক পরে আপনিই নেমে যাবে টেম্পারেচার। তবু আমরা আজকের জন্যে আশ্চর্য আর নতুন সেই কথাগুলোকে খুঁজে পাচ্ছি না—সামনের জলটায় তারারা স্নান করছে, তবু আমাদের নতুন তারারা এখনো ধুলো-মেঘ-ধোঁয়ার আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে না।

মেয়েটি আর একবার নীচের ঠোঁট চেপে ধরল দাঁতে।

'এই, শোনো?'

যেন অনেক দূরের ডাক শুনল ছেলেটি।

'অ্যাঁ, কী বলছিলে?'

'সেই কবিতার বইটার কী হল?'

'কোন্ কবিতার বই?'

আবার সেই বিরক্তি, সেই অবসাদের স্বাদ। তৎক্ষণাৎ মেয়েটির মনে হল, দুজনের মাঝখানে আধ হাত জায়গাটুকুতে যারা ভিড় করে বসে রয়েছে, আজকের সব কথাগুলোকে কেড়ে নিয়েছে তারা। কোনো মানেই হয় না জোর করবার, যে কুঁড়িরা কোথাও নেই, তাদের ফোটানোর চেষ্টা করবার। মাটিতে দাঁড়িয়ে কে কবে আকাশের ধোঁয়াকে—মেঘকে সরিয়ে দিতে পেরেছে।

তবু মেয়েটি হাসল।

'বারে, ভুলে গেলে?'

'কী ভুলে গেছি?'

• একটা চাপা দীর্ঘশ্বাসে মেয়েটি ভেজা-ভেজা কয়েকটা ঘাসের শীষ ছিঁড়ে আনল মুঠোর ভেতরে। আর হাসির জেরটা টানতে চেষ্টা করল।

'তুমি যে একটা কবিতার বই ছাপবে বলেছিলে।'

'ও—আমার কবিতা।'

ছেলেটির স্বরে নিরুত্তাপ অনাসক্তি। আরো খারাপ লাগল মেয়েটির। কোথাও একটা কিছু আঁকড়ে ধরা যাচ্ছে না—আঙুলের ফাঁক দিয়ে ঝরে পড়ে যাচ্ছে এই সন্ধ্যা, এই ছায়া, এই নির্জনতা, সামনের জলটা। উত্তেজনা বোধ করল সে, কপালের একটা একটু একটু শিরা কাঁপতে লাগল তার।

'কবিতাগুলো সম্পর্কে এত নিরুৎসাহ হয়ে গেল কেন তুমি? তোমার বন্ধুরা তো—'

'লিট্‌ল ম্যাগাজিনের বন্ধুরা? ওদের কথা ছেড়ে দাও।'

'তোমার কী হয়েছে বলো তো?'—আবার এক মুঠো ঘাস মেয়েটির থাবার আক্রোশে ধরা পড়ল : 'ওদের কোনো রসবোধ নেই বলতে চাও? তা ছাড়া কয়েকটা কাগজেও তো প্রশংসা বেরিয়েছিল।'

ছেলেটি শুকনো ভাবে হাসল : 'বন্ধুরা ভদ্রতা করেছিল। কাগজগুলো পিঠ চাপড়ে দিয়েছিল।'

'তুমি এত সিনিক হয়ে যাচ্ছ কেন?'

'সিনিসিজ্‌ম নয়, আত্মদর্শন ঘটছে। পৃথিবীতে—বাংলা সাহিত্যে অনেক ভালো কবিতা লেখা হয়েছে, আরো অনেক হবে। আমি না লিখলেও কিছু আসে যায় না।'

'বাজে কথা। তুমি বইটা ছাপো।'

'অর্ধেক প্রেজেণ্ট্ করতে হবে, অর্ধেক জমে থাকবে উইয়ের জন্যে।

'তা হোক, তুমি ছাপো।'

'শুধু টাকাই নষ্ট।'

'আমি দেব টাকা।'

এতক্ষণে হাসিটা একটু স্বচ্ছন্দ হল ছেলেটির : 'বড়লোক হয়ে গেলে নাকি হঠাৎ? তা হলে মধ্যে মধ্যে ধার পাওয়া যাবে তোমার কাছ থেকে।'

'ঠাট্টা নয়। বইটা প্রেসে দাও।'

'দেখি ভেবে।

'না, ভাববার কিছু নেই। ছাপতে দাও তুমি, কবিতাগুলো আমি বেছে দেব।'

'আচ্ছা।'

আবার একটু চুপ। এ আলোচনার আর জের টানা যায় না। অনেকখানি জোর করা উৎসাহের জের টেনে মেয়েটি শ্রান্তি বোধ করল। একটা হাই তুলল ছেলেটি।

'তোমার শর্টহ্যাণ্ড্ কতদূর?'

'এগোচ্ছে।'

'টাইপের স্পীড?'

'কিছু না। চল্লিশও হয়নি এখনো।'

'আরো অনেক এগোতে হবে।'

"জানি-আমার এবয়সে মুখে ব্রণ উঠবেই। কিন্তু এই মুখ নিয়ে রবির পার্টীতে যাবো কি করে?"

"সবাই আসবে রবির ওখানে-কতো মজা করবে ওরা। -কি ভীষণ আশা ছিল পার্টীতে গিয়ে আমিও খুব হৈচৈ করবো।

ক্লিয়ারাসিল্ ব্রণ'র মুখগুলোকে ফাটিয়ে দিয়ে পরিষ্কার করে বলেই সেরে যাবার পর সে ব্রণর চিহ্নমাত্র মুখে আর থাকে না।

কৈশোর থেকে যৌবনের পথে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে মুখে ব্রণ উঠবেই। কিন্তু সে ব্রণ আপনার সামাজিক জীবনে আনন্দের যাতে ব্যাঘাত না করে। তার ব্যবস্থা আপনি নিজে নিশ্চিত করে তুলতে পারেন। ক্লিয়ারাসিল্ ব্যবহার করুন—নিয়ম মতো ঠিকমতো। প্রতিদিন সকালে ও রাত্রে একটু সাবান ও অল্প গরম জলে মুখটা পরিষ্কার করে নিয়ে ব্রণর ওপর ও আশে পাশে হাল্কা করে সমানভাবে লাগিয়ে দিন। ক্লিয়ারাসিলের বিশেষ ঔষধিগুলো আপনার মুখের ব্রণ পরিষ্কার করে দেবে।

সব সময় ক্লিয়ারাসিল্ কাছে রাখবেন— মুখের ব্রণ কিম্বা তাই নিয়ে দুর্ভাবনা কিছুই আর থাকবে না।

ক্লিয়ারাসিল এইভাবে কাজ করে:

১। ব্রণগুলিকে কাটিয়ে দেয় কেরাটোলিটিক্ গুণ থাকার জন্যে ক্লিয়ারাসিল্ লাগাবার পরই ব্রণ'র মুখটা আলগা হয়েই খুলে যায়— যাতে ওষুধটা পুরোপুরি ভেতরে প্রবেশ করতে পারে।

২। ব্যাক্টেরিয়া রোধ করে জীবাণু নষ্ট করবার ক্ষমতা থাকার জন্যে ক্লিয়ারাসিল্ ত্বককে বিভিন্ন ব্যাক্টেরিয়ার আক্রমণ থেকে বাঁচায়।

৩। ব্রণগুলিকে পরিষ্কার করে লোমকূপগুলির মুখে তেল-জাতীয় কিছু জমলেই তার থেকে ব্রণ'র উৎপত্তি হয়। ক্লিয়ারাসিল্ সেই অতিরিক্ত তৈলাক্তভাবকে শুষে নিয়ে লোমকূপগুলিকে পরিষ্কার রাখে।

আমেরিকার সবচাইতে ভালো পিম্পল্ ক্রীম্।

'হ্যাঁ—অনেক।'

বৈষয়িক আলাপে ছেলেটি ক্রমে সহজ হতে থাকল এতক্ষণে।

'জানো, এবার আমাকে বি-টিতে পাঠাবে স্কুল থেকে।'

মেয়েটি নিশ্বাস ফেলল। এ কথাটা ফুটপাথে বলা যেতে পারত দু মিনিটের জন্যে কোনো বাস স্টপে দেখা হলে সেখানেও বলে ফেলা অসম্ভব ছিল না। অথচ সামনের জলে এখন সাঁতার কাটছে তারারা; ফুলের একটা গন্ধ ঘিরে আছে চারদিকে। দূরের থেকে যাদের হাসি আর কথার আভাস আসছে, এখান থেকে দেখা যায় না তাদের।

অনেক দিন থেকে একরাশ নতুন তারা—এক ঝাঁক নতুন পাখির মতো অনেকগুলো কথা জমে আছে বলে মনে হয়েছিল কিন্তু তাদের একটাকেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এখন।

'এবার আমাকে বি-টিতে পাঠাচ্ছে—' ছেলেটি জানালো আর একবার।

'দু বছর আগেই তো পাঠানোর কথা ছিল।'

'জানো তো, তদ্বিরের ব্যাপার। তার ওপরে [illegible]।'

'সে তো বটেই।'

'বি টিটা হয়ে গেলে গ্রেড পাওয়া যাবে।'

'খানিকটা রিলিফ হবে তোমার।'

'আশা তো করছি।'

মেয়েটি এর পরে খুব ভালো একটা কথা খুঁজতে লাগল [illegible] আরো কিছু অনুপ্রেরণা দিতে চাইল। কিন্তু সকলের [illegible] ভবিষ্যৎ উন্নতি, গ্রেড পাওয়ার সম্ভাবনা কোনোটাই খুশির রেশ রাখতে পারছে না বেশিক্ষণ।

ছেলেটি যেন একটু সজীব হল। সিগারেট ধরালো একটা।

'ন-দশ মাসের কোর্স। খুব এগজ্যাকটিং।'

'তাই বুঝি?'—কৌতূহলী না হলে খারাপ দেখায়।

'পাশ করা কিছু না, চোখ বুজেই হতে পারে—' ছেলেটি বি-টি সম্পর্কে তথ্য বিতরণ করতে লাগল : 'কিন্তু ফার্স্ট ক্লাস পেতে হলে বেশ খাটতে হয়।'

'তোমার ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া উচিত। ভালো ছাত্র ছিলে।'

'মোটেই না—একেবারে মাঝারি। তবে এবার একটু চেষ্টা করব।'

'নিশ্চয় করবে।'

'হয়তো তোমার সঙ্গে ভালো করে দেখাই হবে না এ ক'মাস।'

না দেখা হলে কী ক্ষতি? মেয়েটি ভাবতে চেষ্টা করল। একটা জবাব দিতে হল তারপরে।

'কী আর করা। উন্নতি তো দরকার!'

'আমার ইচ্ছে আছে, এর পরে যদি এম-এড্‌টা করে নেওয়া যায়—'

মেয়েটি শুনল অথচ শুনতে পেলো না। এম-এড্ হতে পারে, আরো অনেক কিছু হওয়াও অসম্ভব নয়। কিন্তু—মেয়েটি ভাবল : কিন্তু এই সন্ধ্যায়, এই জলের ধারে, গাছের ফাঁকে ঝুলন্ত চাঁদ আর ফুলের গন্ধের ভেতরে, এইখানটিতে তাদের আগে অনেকে বসেছে জোড়া বেঁধে, আরো অনেকেই বসবে। কিন্তু তারাও কি নতুন কথা, নতুন তারা, কবিতার লাইন, গানের সুর খুঁজতে এসে কিছুই পায়নি, কিছুই পাবে না? তাদেরও কি কাকার জন্যে মন খারাপ, বি-টির আশা, এম-এড্-এর স্বপ্ন? তাদেরও কি শর্টহ্যান্ডের ক্লাস থেকে পালিয়ে এসে মনের ভেতরে অস্বস্তির কাঁটা, তাদেরও কি বেরুবার সময় ছোট ভাইটার মুখ জ্বরের ধমকে টকটকে লাল, তাদেরও কি দুজনের মাঝখানে—আধ হাতের চাইতেও কম ফাঁকটুকুতে, এই রকম একটা ভিড় জমে থাকে, জমে থাকবে? এই আজকের নিয়ম, অথবা আজকের নিয়তি?

এম-এড্ পাশ করবার পরে কোনো ট্রেনিং কলেজে চাকরী পাওয়ার কথা বলছিল ছেলেটি। তবু আবছা অন্ধকারে এক সময় বুঝতে পারলে, মেয়েটি তলিয়ে আছে নিজের মধ্যেই।

'কী ভাবছ?'

'কিছু না। তোমার কথা শুনছি।'

'—না, শুনছ না।'

মেয়েটি মিথ্যে বলবার চেষ্টা করল না আর। একটু পরে বললে, 'আসবার সময় দেখে এলুম বাদলের জ্বর এসেছে।'

ছেলেটি চমকালো একটু।

'বলো নি তো এর আগে।'

'ডাক্তার বলছিলেন, ইনফ্লুয়েঞ্জা। ভাববার কিছু নেই।'

ছেলেটি টোকা দিয়ে সিগারেটটা উড়িয়ে দিলে জলের দিকে : 'হুঁ, সীজন-চেঞ্জের সময়। যখন-তখন ঠান্ডা লেগে যাচ্ছে। এই তো আজ বিকেলেই গা ম্যাজ-ম্যাজ করছিল আমারও মনে হচ্ছিল জ্বর আসবে। দুটো বাজার চলতি ট্যাবলেট গিলে বেরিয়ে পড়লুম।'

হঠাৎ যেন মুক্তির আলো দেখল মেয়েটি।

'তা হলে তো এখানে আর বসা উচিত নয় তোমার।' হিম পড়ছে।'

'ও কিছু না। শরীর ঠিক হয়ে গেছে এখন।'

'না—রিস্ক নিতে নেই। চলো, উঠি।'

'এত ব্যস্ত কেন?'—ছেলেটি মেয়েটির হাত ধরল : 'আটটাও তো বাজেনি এখনো।'

হাত ধরবার কথাটা মনে পড়ল এতক্ষণ পরে। কিন্তু রোমাঞ্চ জাগল না, ছোট্ট একটুকরো বিদ্যুৎও বয়ে গেল না শরীরে। অভ্যাস। তাকে একেবারে বুকের ভেতরে টেনে নিলেও এখন এতটুকুও কেঁপে উঠত না মেয়েটি।

তবু ছেলেটির একটা কিছু মনে হল। খানিক দূরে একটা ট্রানজিস্টার রেডিয়ো খুলে চলে যাচ্ছিল কেউ, রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজছিল : 'তোমার আমার মাঝে বিরহের অন্তরালে কত আর সেতু বাঁধি—'। একটু কান পেতে শুনল দুজনে।

'তুমি আর গান গাইবে না পণ করেছ?' ছেলেটির যেন ঘোর লেগেছে একটু।

'সময় কোথায়?'

'সময় কোথাও নেই। তাকে খুঁজে নিতে হয়।'

খুঁজলেই পাওয়া যায় তাকে? নিঃশব্দে হাসল মেয়েটি। আজকের এই সময়টুকুকে পাওয়ার জন্য প্ল্যান করতে হয়েছিল সাত দিন আগে। কিন্তু পাওয়া তো গেল না। কখন ছড়ানো আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে অদৃশ্য বিন্দুতে বিন্দুতে, সে ঝরে পড়ে গেল, এই ছায়া-সন্ধ্যা-নির্জনতা কিছুই তাকে ধরে রাখতে পারল না। বি-টি। এম-এড্। ছোট ভাইটার জ্বর। ভিড়ের মধ্য থেকে হাত বাড়িয়ে সবটুকু কেড়ে কুড়িয়ে নিয়ে গেল কারা।

ছেলেটি আবার বললে, 'খুব অন্যায়। গান তুমি ছাড়তে পারো না।'

'পৃথিবীতে—বাংলা দেশে অনেক ভালো গান গাওয়া হয়েছে, অনেক হবে—' মেয়েটির চোখ যন্ত্রণাভরা কৌতুকে জ্বলে উঠল একবার : 'আমি না গাইলেও কোনো ক্ষতি হবে না।'

'ও—ঠাট্টা?'—ছেলেটি হেসে উঠল : 'আমার কথা আমাকেই ফিরিয়ে দিলে?'

'না—নিজের কথাই বলছি।'

'তা হলে কবিতার বইটা ছাপতেই হয় এবার।'

'বেশ, ছাপো।'

'একটা শর্তে। গানের চর্চা আবার শুরু করতে হবে তোমাকে।'

'রিসার্চ করে আবিষ্কার করতে হবে তানপুরোটা।'

'আমি খুঁজে দেব।'

'আচ্ছা।'

ট্রা ন জি স্টা রে রবীন্দ্রসঙ্গীতের টুকরোটা। এখনো ঘোর লেগে আছে ছেলেটির মনে।

'মনে আছে, একদিন বাবুঘাট থেকে নৌকো ভাড়া নিয়ে আমরা গঙ্গায় বেড়িয়েছিলুম?'

ছোট্ট একটুকরো ব্যথা চিনচিন করে উঠল মেয়েটির বুকে।

'মনে আছে।'

'তুমি অনেকগুলো গান গেয়েছিলে। একটা লঞ্চ থেকে কা'রা বার বার সার্চ লাইট ফেলেছিল আমাদের ওপর।'

'মনে আছে।'

'কিন্তু খারাপ লাগেনি।'

'না।'

'আমি বলেছিলুম, আমাদের ঐশ্বর্য দেখে ওরা হিংসে করুক।'

'হ্যাঁ।'

'আশ্চর্য'—' ছেলেটি উদাসভাবে নিশ্বাস

ফেলল : 'সেই দিনগুলো কোথায় চলে গেল।'

দিনগুলো কোথাও চলে যায় না—কেবল দিনগুলোর কাছ থেকে আমরাই সরে যাই—মেয়েটি ভাবল। বি-টি। এম্-এড্-এর স্বপ্ন। শর্ট হ্যান্ড্। ছোট ভাইটার জ্বর। মা বলছিল—

'তোমার ওই গানটার কথাই মনে পড়ছে আমার'—ছেলেটি গুন গুন করে উঠল : 'সজনী, আমার মন মানে না'—

বেসুরো গাইছিল। সেটা ঠিক করে দিতে অভ্যাসেই সুর ধরল মেয়েটি। সেই গঙ্গা নয়, সেই রাত নয়, জোয়ারের নদীর মতো ছলছল করছিল না বুকের ভেতরে, শুধু অভ্যাসেই সুর এল গলায় : 'আমার মন মানে না দিন-রজনী—'

এখন ওরা এল। ওরা তিনজন। মুখের ওপর শাদা রুমাল। হাফ শার্ট আর সরু ট্রাউজার পরা। একজনের হাতে একটা ছোরা ঝকমক করছিল।

ভঙ্গিটা খুব বিনীত। বললে, 'দাদা, আমরা তিনজন বেকার। কিছু সাহায্য করতে হচ্ছে।'

সামনের জলটা, ঝলমলে চাঁদ, ফুলের গন্ধ, সন্ধ্যার নিঃসঙ্গতা—একটা অসীম বিস্ময় আর বেদনা আতঙ্কে কিছুক্ষণের জন্যে সাদা হয়ে গেল সব।

'গোলমাল করবেন না দাদা, মিথ্যে চেঁচাবেন না বউদি। আমরা কটি বেকার যুবক। খুবই শান্তিপ্রিয়। কারো অনিষ্ট করতে চাই না, তবে ঝামেলা বাধালে বুঝতেই পারেন।'

পাথর হয়ে বসে রইল মেয়েটি। ছেলেটি আস্তে আস্তে বললে, 'বুঝেছি।'

'ঘড়িটা দেবেন দাদা। আংটিও নেই। বোতাম—না খুলতে হবে না, বুঝেছি, ও ছাই আপনার জিনিস। আর মানি ব্যাগটা। থ্যাংকিউ। বউদি কাইন্ডলি আপনার ব্যাগটা—হার নেই? বুঝি বিয়ের মালা? কী যে টেস্ট্ আপনাদের—এমন সুন্দর গলায় সোনা ছাড়া মানায়? যাক গে ঘড়িটা হলেই চলে যাবে। হাতে বালা-টালা নেই? স্রেফ কাচের চুড়ি? না বউদি, এত কৃপণ হওয়ার কোনো মানে হয় না—' ছোরাধারীর গলায় একটু সস্নেহ অনুযোগের সুর : 'আমাদের দশজনের কথা তো একটু ভাবতে হয়।'

মেয়েটি তেমনি পাথরের মূর্তির মতো বসে রইল। ক্লীব যন্ত্রণায় চোখ জ্বলতে লাগল ছেলেটির।

'আচ্ছা দাদা, চলি, সাহায্যের জন্যে ধন্যবাদ। এই নিন ব্যাগগুলো। বউদির ব্যাগে আনা বারো পয়সা রইল—ট্রামে বাসে বাড়ি ফিরতে পারবেন। বসুন তা হলে, মন দিয়ে আরো খানিক প্রেম-ট্রেম করুন। নমস্কার—'

যেমন ছায়ার ভেতর থেকে এসেছিল, তেমনি ছায়ার মধ্যেই মিলিয়ে গেল।

প্রায় দশ মিনিট পরে কথা খুঁজে পেল ছেলেটি। যেন নিজের ক্লীবত্বকে আড়াল করবার কৈফিয়ৎ দিতে চাইল একটা।

'ভেবেছিলুম, বাধা দেব। কিন্তু পাছে তোমাকে কোনো রকম—'

শান্ত গলায় মেয়েটি বললে, 'কী হত? ওদের সঙ্গে ছোরা ছিল। রিভলভারও ছিল হয়তো।'

'দেখেছ, কাছাকাছি একটা পুলিস পর্যন্ত নেই।'

'আলোও না।'

পয়সা দিয়ে এখানে গার্ড রাখে শুনেছি। কোথায় তারা? 'এখানে বসাই আমাদের ঠিক হয় নি।'

মেয়েটি জবাব দিল না।

'তোমার ঘড়িটা গেল।'

'তোমারও।'

'ব্যাগে কত ছিল তোমার?'

'বেশি না—গোটা পাঁচেক। তোমার?'

'টাকা বাইশের মতো।'

'অনেক ক্ষতি হয়ে গেল।'

'কিছু না।'—জোর করে সহজ হতে চাইল ছেলেটি : 'আমি তোমার ঘড়িটার কথাই ভাবছি।'

'তোমারও তো গেল।'

'আবার কেনা যাবে সুযোগ হলে।'

'তাই।'

'কিন্তু—' উত্তেজিত হয়ে ছেলেটি বললে, 'কোথায় আমরা আছি বলো তো? গুণ্ডার রাজত্বে? দেশে কি আইন বলে কিছুই নেই?'

মেয়েটি বললে, 'চলো, বাড়ি ফিরি।' —হাসল একটু : 'ওদের কিন্তু ভদ্রতা আছে। বারো আনা পয়সা রেখে গেছে আমাদের ট্রাম-বাসের খরচ।'

'থামো—' ঝাঁঝালো গলায় ছেলেটি বললে, 'সারা দেশ শুধু ক্রিমিনালে ছেয়ে গেছে এখন। একটু নিরিবিলি জায়গা কি কোথাও নেই আমাদের জন্যে? কোথাও না?'

মেয়েটি ছোট্ট করে বললে, 'না কোথাও না'।

মেয়েটিকে ট্রামে তুলে দিয়ে বাসের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল ছেলেটি।

আর জানলার পাশে সীটটায় বসে মেয়েটির চোখ অবসাদে বুজে এল। মনে হতে লাগল, ওই তিনজনের অমন করে আসাটাই খুব দরকার ছিল আজকে। এর পরে আর এই রকম নিরালা সন্ধ্যার জন্যে প্ল্যান করবার দরকার হবে না কখনো, আর কাজ নষ্ট হবে না, আর অসুস্থ ছোট ভাইকে ফেলে বেরুতে হবে না কোনোদিন।

যা নেই, যা আর আসবে না, যে তারারা কখনো আর নতুন করে জন্ম নেবে না, যে কথাদের ইচ্ছে করলেই তৈরি করা যায় না—কী হবে তাদের নিয়ে প্রহসন তৈরি করে? কী লাভ সেই আয়োজনে, যেখানে দিন-রাত্রির সব ভিড়, সব ভার দুজনের মাঝখানে আধ হাত জায়গাটুকুও দখল করে রাখে?

বিরক্ত অবসন্ন মেয়েটি বুঝি ওই তিনজনের জন্যেই অপেক্ষা করছিল।

কটা বেজেছে দেখবার জন্যে, অভ্যাসেই হাত তুলল একবার। মনে ছিল না, ঘড়িটা নেই। এখন কেবল একটা কালো দাগ কব্জিতে। গঙ্গার ওপর সেই রাত্রে গান গাইবার সময় ঘড়িটা নতুন ছিল একেবারে, থেকে থেকে ঝিকঝিক করে উঠেছিল চাঁদের আলোয়।

পৃথিবীর বুকে চাঁদের স্পন্দন

সোভিয়েত দেশের প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং পুলকোভো অধ্যাপক ডঃ নিকোলাই কোজিরেভ চাঁদের রহস্য উদ্ঘাটনের ব্যাপারে দীর্ঘকাল ধরে গবেষণা করে চলেছেন। কিছুদিন আগেও বেশ কয়েকজন বিজ্ঞানীর ধারণা ছিল চাঁদের ভূ প্রকৃতি জমাট পাথরে গড়া। সৃষ্টির আদি মুহূর্তে হয়ত একদিন সে উত্তপ্ত বাষ্প বা তরল অবস্থায় পৃথিবীর চারপাশে বিচরণ করত। বিচরণ আজও করে চলেছে। তবে এখন তার সেই তেজস্বিতা আর নেই। তার কেন্দ্র পর্যন্ত কঠিন জমাট পাথরের স্তূপ। চাঁদ এখন নিষ্প্রাণ, হিম শীতল।

কিন্তু হঠাৎ ঘটে গেল একটি নতুন আবিষ্কার। অবশ্য এ ধরনের ঘটনা আরও দু-একজন এর আগেও লক্ষ করেছেন। তবে ঠিক এত পরিষ্কারভাবে নয়। নভেম্বর ৩, ১৯৫৮। কোজিরেভ এবং ইয়েজারস্কি ওইদিন বিশ্ব-সময় রাত আড়াইটে থেকে রাত তিনটের মধ্যে ক্রিমিয়ার মানমন্দির থেকে চাঁদের আলফোনসাস গহ্বরের উপর পর্যবেক্ষণ চালাচ্ছিলেন। তাঁরা চমকে দেখলেন বিস্তৃত ওই গহ্বরের মাঝবরাবর পাহাড়ের চূড়ার কাছে যেন এক ঝলক ক্ষীণ আলোর বিন্দু। তার উপর একটা লালচে মেঘের স্তূপ। রাত তিনটে থেকে সাড়ে তিনটে পর্যন্ত ওই আলোর বর্ণালী পরীক্ষা করলেন তাঁরা। ওই বর্ণালীতে আণবিক কার্বন (C2) ধরা পড়ল। এবার আলোটিকে বেশ খানিকটা উজ্জ্বলও দেখাচ্ছিল। কতকটা ধূমকেতুর উদ্গার মত। বর্ণালীর ছবি পরীক্ষা করে দেখা গেল, আড়াইটে থেকে সাড়ে তিনটে, এই এক ঘণ্টার মধ্যে লালচে রঙের মেঘটি যেন প্রায় দুই ইঞ্চির মত সরে গেছে। এর অর্থ ওই মেঘ আগে যেখানে দেখা গিয়েছিল সেখান থেকে প্রায় চার কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে গেছে।

কার্বন অণুর অস্তিত্ব, লাল মেঘ এবং ধূমকেতুর মুখের মত উজ্জ্বল আলো, এগুলি থেকে ওঁরা সিদ্ধান্ত করেন, যা-কিছু ওঁরা দেখেছেন তার সবটাই একটি আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ। আলফোনসাসের ওই চূড়ায় নিশ্চয় কোন জীবন্ত আগ্নেয়গিরি ছিল। আর তার থেকে বেরিয়ে আসা ধোঁয়ার মধ্যে কার্বন-অণু থাকাটা স্বাভাবিক ঘটনা।

সম্প্রতি এ পি এন সংবাদ প্রতিষ্ঠানের সাংবাদিক ভালেরি কেন্তোচিসভ-এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে ডঃ কোজিরেভ বলেছেন, শুধু আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ নয়, ভূমিকম্প, জোয়ার-ভাটার প্রক্রিয়ার মত বহু সাময়িক ঘটনাই চাঁদের বুকে ঘটে চলেছে। সেই সব ঘটনার সঙ্গে পৃথিবীতে অনুরূপ যে সমস্ত ব্যাপার ঘটে থাকে তাদের মধ্যে বেশ একটা মিল দেখা যায়। দীর্ঘকাল পর্যবেক্ষণ চালানোর পর তিনি লক্ষ করেছেন, চাঁদে ভূ-কম্পন হবার পরপরই পৃথিবীতেও কম্পন অনুভূত হয়। মনে হয়েছে চাঁদ এবং পৃথিবীর জীবনস্পন্দন যেন সমসূত্রে গাঁথা।

ডঃ কোজিরেভ-এর সঙ্গে এ পি এন সংবাদদাতার মূল সাক্ষাৎকারটি এখানে উদ্ধৃত করলাম :

প্রঃ আপনাদের আবিষ্কারের উপর অন্যান্য বিজ্ঞানীদের প্রতিক্রিয়া কি হয়েছে, ডঃ কোজিরেভ?

উঃ আলফোনসাস-এর কেন্দ্রের পাহাড়ের চূড়া থেকে বাষ্প বের হতে দেখেছি, এ কথা প্রকাশ পাবার পর অনেকেই যথেষ্ট আগ্রহ নিয়ে চাঁদের উপর পর্যবেক্ষণের কাজ শুরু করেন। এ ব্যাপারে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থাও তৈরি হয়। আজ পর্যন্ত চাঁদের বুকে যতরকম সাময়িক ঘটনার কথা জানা গেছে তাদের নথিভুক্ত করার দায়িত্ব এঁরা গ্রহণ করেন। এঁদের রচিত প্রথম ঘটনা-সূচীতে এমন প্রায় ছ'শটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর একটিতে বলা হয়েছে, চতুর্দশ শতাব্দীতে যখন দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়নি তখন ফ্লোরেন্স শহরের লোকেরা আংশিক আলোকিত চাঁদের আঁধারি জায়গায় উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত একটি বস্তু দেখতে পান। মন্তব্য করা হয়েছে, সে রাতে যা তাঁরা দেখেছিলেন সেটা আসলে চাঁদের দীর্ঘরাত্রির অঞ্চলে অবস্থিত

আলফোনসাস গহ্বরের মাঝখানে সেই পাহাড়ের চূড়াটি দেখা যাচ্ছে

কোন আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণজনিত শিখা। পরবর্তী সময়ে প্রখ্যাত ব্রিটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী উইলিয়াম হার্সেল চাঁদের অ্যারিসটারকাস গহ্বরে নাকি একটি আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। কিন্তু সে সময়ে তাঁর এই পর্যবেক্ষণের কথা কেউ বিশ্বাস করতে চান নি। তবে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় হার্সেল এবং আরও বিভিন্ন বিজ্ঞানী যা দেখেছেন তা মিথ্যে নয়।

প্রঃ এ ধরনের ব্যাপারের স্বপক্ষে কি কোন প্রমাণ আছে?

উঃ পৃথিবীর চারপাশে পরিক্রমণ করার সময় চাঁদ যখন কাছে সরে আসে তখন তার বুকে কিছু কিছু সাময়িক ব্যাপার আমরা লক্ষ্য করেছি। নিকটতম স্থানে থাকার সময় পৃথিবীর আকর্ষণ তার বুকে একটা প্রচণ্ড টানের সৃষ্টি করে। কতকটা জোয়ারের টানের মত। এর ফলে তার অভ্যন্তরের ভূত্বকে রীতিমত আলোড়ন শুরু হয়ে যায়। এই আকর্ষণের টানে ভেতর থেকে কিছুটা বায়বীয় পদার্থও বেরিয়ে আসতে পারে।

মানুষ যখন মঙ্গল গ্রহে যাবে তখন তার মহাকাশযানের বাড়িটি হবে ঠিক এই রকম। অ্যাপলো প্রকল্পের শেষেই সূরু হবে মঙ্গল যাত্রা। সেই দীর্ঘযাত্রায় অন্তত বারোজন মানুষের দেহ এবং মন যাতে অটুট থাকে সেদিকটার প্রতি লক্ষ্য রেখেই এটার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এতে থাকবে খোবার ঘর, বৈঠকখানা, গবেষণাগার, ব্যায়াম করার ঘর, স্নানাগার, পড়ার ঘর এবং বাস করার মত আরও অনেক সুযোগ-সুবিধে। চাঁদে যাবার মত সেতো আর দু দশ দিনের ব্যাপার নয়? একবার যাতায়াত করতে হয়ত পুরো বছরটাই লেগে যাবে। তাছাড়া যাওয়াটাও এক জগত থেকে আর এক জগতে। তাই মঙ্গল-এর বিজ্ঞানীদের কাছে সব চাইতে বড় সমস্যা, মঙ্গলের বুকে একটি মহাকাশযানকে নামানর নয়, তার বুকে মানুষকে সুস্থ সবল করে বাঁচিয়ে রাখার

প্রঃ এই আকর্ষণ চাঁদের ভূ-ত্বকে বা অভ্যন্তরে কতটা প্রবল হওয়া সম্ভব?

উঃ চাঁদ যখন পৃথিবীর নিকটতম দূরত্বের মধ্যে এসে পড়ে তখন পৃথিবীর টানে চাঁদের ভেতরের অংশ সমুদ্রের বুকে জোয়ারের মত ফুলে ছয় মিটার পর্যন্ত সামনের দিকে এগিয়ে আসতে পারে। তারপর যতই সে দূরে সরে যায় এই উচ্চতা কমে আসতে থাকে। অবশেষে সুদূরতম অঞ্চলে প্রায় সাড়ে তিন মিটারের মত দাঁড়ায়। চাঁদের কঠিন স্তরের এই যে আলোড়ন তার মধ্যে যথেষ্ট সঙ্গতিভাব আমরা লক্ষ্য করছি। চান্দ্র-দিনের ঠিক যে সময়ে যতটা পরিবর্তন হওয়ার কথা নিয়মিতভাবে ঠিক ততটাই হয়ে থাকে। আর জোয়ারের টান যেখানে প্রভাব বিস্তার করে সেখানটার ভূ-ত্বক কতকটা ঢেউ-এর মত হয়ে পৃথিবীর দিকে এগিয়ে আসে।

ঠিক এমন ধরনের ব্যাপার পৃথিবীতেও দেখা যায়। চাঁদের আকর্ষণ-এ তারও ভূ-ত্বকের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে। তবে তুলনায় কম হওয়ায় পৃথিবীর ভূ-স্তর তাতে ফুলে ওঠে মাত্র কুড়ি সেণ্টিমিটারের মত।

পৃথিবী এবং চাঁদের আভ্যন্তরিক কার্যাবলীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বের করার জন্যে দীর্ঘ সময় ধরে আমরা পর্যবেক্ষণ চালিয়েছি। এর জন্যে ১৯০৪ খৃীস্টাব্দের পর যখন ভূকম্পন পরিমাপ যন্ত্রের বহুল প্রচলন শুরু হয় তখন থেকেই পৃথিবীর গভীরতম অঞ্চলের ভূকম্পন আমরা নিয়মিতভাবে লক্ষ্য করতে থাকি। পরে দেখা গেছে, পৃথিবী এবং চাঁদের ভূকম্পনের মধ্যে যেন একটি সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। দেখা গেছে, পৃথিবীতে কোন ভয়ংকর রকমের ভূকম্পন হওয়ার আগে চাঁদের ভূ-স্তরের মধ্যে কম করেও তিনবার সাময়িকভাবে ভূকম্পন হয়ে থাকে।

অমাবস্যা এবং পূর্ণিমার সময় পৃথিবীর উপর চাঁদ এবং সূর্যের যুগপৎ আকর্ষণ অনেক বেড়ে যায়। ঠিক এই সময়ে আমাদের এই গ্রহটির মধ্যে ঘনঘন ভূকম্পন চলতে থাকে।

প্রঃ অধ্যাপক, চাঁদের ভূকম্পন এবং অন্যান্য সাময়িক ঘটনার উপর নিয়মিত পর্যবেক্ষণ চালিয়ে অদূরে ভবিষ্যতে পৃথিবীতে কখন এবং কোথায় ভূকম্পন হতে পারে এবার সে কথা আগে থেকে জানা কি সম্ভব হতে পারে?

উঃ এর জন্যে আরও পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন আছে। তবে এ কথা ঠিক, ভবিষ্যতের বিজ্ঞানীরা পৃথিবী এবং চাঁদের পাহাড় পর্বতগুলির জন্ম-ইতিহাস সঠিকভাবে বের করতে পারবেন। বর্তমানে চাঁদ এবং পৃথিবীর পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার যথাযথ সম্পর্ক আমাদের আরও ভাল-ভাবে খুটিয়ে দেখে নিতে হবে। এতে করে জোতির্বিজ্ঞানীরা পৃথিবী এবং চাঁদের সৃষ্টিতত্ত্বই যে শুধু জানতে পারবেন তা নয়, এই বিশ্বজগতে প্রতিটি বস্তুকণার সঙ্গে অপর বস্তু-কণার সঠিক কি সম্পর্ক সে কথাও হয়ত আমরা জানতে পারব।

অ্যাপলো-১২র নভোচরদের আনা চাঁদের একখণ্ড পাথরের ছবি তুলছেন সৌখিন ফটোগ্রাফাররা। ওয়াশিংটনের স্মিথ-সোনিয়ান ইনস্টিটিউটে অত্যন্ত যত্নে বিশেষ এক ধরনের কাচের ঢাকনার মধ্যে পাথরটিকে রেখে দেওয়া হয়েছে

চাঁদ সম্পর্কে

চাঁদ দেখতে কতকটা গোলকেরই মত। ব্যাস প্রায় ২১৬০ মাইল। অর্থাৎ পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় চার ভাগের এক ভাগ। মাধ্যাকর্ষণ বল পৃথিবীর প্রায় ছয় ভাগের

এক ভাগ। ভর আশি ভাগের এক ভাগ।

প্রতি সাতাশ দিন আট ঘণ্টায় চাঁদ একবার করে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। এই সময়ে তার সম্মুখের শতকরা ঊনষাট ভাগ অঞ্চল চিরন্তনভাবে চেয়ে থাকে পৃথিবীর দিকে। এদিকটাতে আছে চাঁদের উত্তরমেরু। ওপাশে অর্থাৎ চিরদিনের অদৃশ্য অঞ্চলে আছে চাঁদের দক্ষিণমেরু। আপনাকে যদি পৃথিবীর উত্তরমেরুর আকাশে নিয়ে যাওয়া যায় পৃথিবী সর্বদা তার অক্ষের চারপাশে ঘুরলেও যেমন আপনি তার দক্ষিণ দিকটা কোন দিনই দেখতে পাবেন না, তেমনি চাঁদের উত্তরমেরু বরাবর পৃথিবী অবস্থান করায় চাঁদেরও দক্ষিণ দিক পৃথিবী থেকে চির অদৃশ্য।

চাঁদ পৃথিবীকে পরিক্রমণ করছে উপবৃত্তাকার পথে। এই পথে বিচরণ করার সময় যখন সে পৃথিবীর নিকটতম অঞ্চলে আসে তখন তার দূরত্ব ২২১৪৬০ মাইল। দূরবর্তী অঞ্চলে সরে গেলে এই দূরত্ব দাঁড়ায় ২৫২৭১০ মাইল। অতএব পৃথিবী থেকে এর গড় দূরত্ব ২৩৯০০০ মাইল।

বৃহস্পতি

মার্কিন মহাকাশ বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস, মঙ্গলে জীবনের অস্তিত্ব খুঁজে না পেলেও বৃহস্পতিতে আজও হয়ত প্রাণের চিহ্ন শেষ হয়ে যায় নি। সম্প্রতি কয়েকটি পরীক্ষা চালিয়ে এঁরা সিদ্ধান্ত করেছেন, ওই গ্রহে পৃথিবীর মতই প্রাণীজগতও পাওয়া যেতে পারে। মঙ্গল এবং শনির মধ্যবর্তী এই গ্রহটি সূর্যের চারপাশে একবার ঘুরে আসতে সময় নেয় ১১·৮ বছর। ব্যাস ১৪০,০০০ কিলোমিটার। অর্থাৎ পৃথিবীর এগারো গুণ বড়। আর অবশিষ্ট আটটি গ্রহ একত্র করলে যতটা ভর হয়, এর ভর তার চেয়েও প্রায় আড়াই গুণ বেশি। পৃথিবীর চাঁদ একটি। বৃহস্পতির বারোটি। ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে গ্যালিলিও প্রথম চারটে চাঁদ আবিষ্কার করেন। এদের নাম আইও, ইউরোপা, গ্যানিমেদ এবং ক্যালিসতো। এই চারটে উপগ্রহের মধ্যে সবচাইতে ছোট হল ইউরোপা। এর ব্যাস আমাদের চাঁদের ব্যাসের পাঁচ এর চার গুণ। সবচাইতে বড়টি গ্যানিমেদ। এটি আমাদের চাঁদের চেয়ে প্রায় দেড় গুণ বড়।

বাকি আটটি চাঁদের মধ্যে সবচাইতে ছোটটির নাম জুপিটার ১২। ব্যাস প্রায় বারো কিলোমিটার। সবচাইতে বড়টি হল জুপিটার ৫। ব্যাস এক শ পঞ্চাশ কিলোমিটার। পৃথিবীর মত বৃহস্পতিকেও ঘিরে রেখেছে ভ্যান অ্যালেন বেল্ট-এর মত আচ্ছাদনী। ফলে ক্ষতিকর বহির্জাগতিক রশ্মি বৃহস্পতির বুকেও অবারিত বর্ষণ সৃষ্টি করতে পারে না।

সমরজিৎ কর

এঞ্জেলা এলিজাবেথ

সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ার দিকে নিউ-ইয়র্কে পর্যটকের দর্শনীয় স্থান হিসাবে রাষ্ট্রসংঘের দপ্তর দেখতে গিয়েছিলাম। দেখবার মত বটে। রকফেলার সাহেব নাকি ঐ জমি রাষ্ট্রসংঘকে দান করেছিলেন। তাই মার্কিন মহানগরের বুকে আন্তর্জাতিক সংসদের আস্তানা। সংসদের ব্যাপক প্রভাব সম্বন্ধে সমালোচনা যথেষ্ট আছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে লীগ অব নেশন্স অনেক আশার আশ্বাস নিয়ে এসেও সফল হয়নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিসমাপ্তির প্রকাশ হিসাবে রাষ্ট্রসংঘ মানুষকে কি দেবে ভাবার অবকাশ আছে। তবু বলি বেশ লাগলো দেখতে। প্রয়াস হিসাবে প্রকাণ্ড আয়োজন। কার্যক্ষেত্রে বিশ্বের ছোটখাটো দেশ আজও প্রবলের প্রচণ্ড প্রতাপে বিভ্রান্ত। কিন্তু রাষ্ট্রসংঘের আবরণে সমন্বয়ের সামান্য রূপটুকুও সাধারণকে কিছু সুখ দেয়। গাইড আর গার্ড সব নানা দেশের মানুষ। দেখলাম ভারতীয় থেকে নিয়ে পৃথিবীর সব দেশের তরুণীরা পর্যটকের দল নিয়ে রাষ্ট্রসংঘের বিরাট সৌধ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাচ্ছেন। দর্শনের ফাঁকে ফাঁকে সবার মুখে এক খবর শুনেছিলাম। সমান উত্তেজনায় বলছিলেন এঞ্জেলা ব্রুক্সের কথা। এঞ্জেলা এলিজাবেথ ব্রুক্স। সংক্ষেপে সংক্ষিপ্ত ডাকে সবাই তাঁকে ডাকে এঞ্জি বলে। এঞ্জি নাকি এবার রাষ্ট্রসংঘের আমসভা অথবা জেনারেল অ্যাসেমব্লির সভাপতি হবেন। গরম গুজব। এঞ্জেলার খবর কিছুদিন আগে শুনেছিলাম লাইবেরিয়ার উপরাষ্ট্রপতির মুখে। উপ-রাষ্ট্রপতি মহাশয় ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন। তাঁর দেশের মেয়েরা কি করে না-করে জিজ্ঞাসা করায় বলেছিলেন, "আরে, আমাদের এঞ্জি যে এবার বিশ্ববিজয়িনী হতে চলেছে!" কথাটা ভাল করে মনে ছিল না। তাই নূতন করে আনন্দ পেলাম। একে মহিলা তার উপর কালো দেশের মেয়ে। মার্কিন মুলুকে কিছু ঘুরে তখন আমাকে সাদা-কালোর নেশায় পেয়েছে। কালোর জয় বড় ভাল লাগে। মহিলা হিসাবে এঞ্জি দ্বিতীয়া। প্রথম ছিলেন ভারতবর্ষের শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত।

এঞ্জেলা এলিজাবেথ ব্রুকস

এঞ্জেলা এলিজাবেথ ব্রুক্স্ কালো মেয়ে তার উপর লাইবেরিয়াবাসিনী। লাইবেরিয়ার বিচিত্র ইতিহাস আর তার পত্তন তাঁকে আরও মোহময়ী করেছে। আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের ছোট এই দেশ-এর জন্মই আমেরিকার মুক্তিপ্রাপ্ত নিগ্রো ক্রীতদাসদের নিয়ে। ১৮২২ সালে আমেরিকান কলোনাইজেশন সোসাইটি মুক্ত দাসদের জন্যই এদেশের পত্তন করেন। অবশ্য মুক্ত দাস ভিন্ন আরও আফ্রিকাবাসী নিগ্রো নরনারীর দেশ লাইবেরিয়া। ৩৫০ মাইল তটরেখা আর গভীর বন লাইবেরিয়াকে করেছে সচ্ছল। বনে আছে তাল গোত্রীয় নানা গাছ। তা থেকে হয় তেল আর বাদাম। তার উপর রবার, কোকো আর কফি সমৃদ্ধিকে করেছে সম্পূর্ণ। লাইবেরিয়াবাসীকে দিয়েছে উন্নতির ইঙ্গিত।

বিশেষ সম্পন্ন সংসারের মেয়ে এঞ্জেলা ব্রুকস্ রবারের আবাদের অধিকারিণী। ১৯২৮ সালের ২৪শে আগস্ট লাই-বেরিয়ার রাজধানী মনরোভিয়াতে তাঁর জন্ম হয় (মনরোভিয়া তদানীন্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জেমস্ মনরোর নামের শহর ও লাইবেরিয়ার রাজধানী)। তাঁর স্বামীর নাম ছিল হেনরিজ কিন্তু বিবাহবিচ্ছেদের পর এঞ্জেলা মিস্ ব্রুক্স্ নামেই পরিচিত। হেনরিজ লাইবেরিয়ার পার্লামেন্টের স্পীকার ছিলেন। এঞ্জেলার দুই পুত্র ওয়ান স্টোন এবং রিচার্ড হেনরিজ। কুমারী ব্রুকস্ আইনজীবী এবং সুশিক্ষিতা। মার্কিন দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারিণী এঞ্জেলা ১৯৫৬ থেকে ১৯৫৮ আন্তর্জাতিক মহিলা আইন ব্যবসায়ী সমিতির লাইবেরিয়া শাখার সহসভাপতি ছিলেন। এই আন্তর্জাতিক সমিতি, International Federation of Women Lawyers ১৯৫৯-৬০এর জন্য তাঁকে সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশের সহ-সভাপতি বরণ করেন। ১৯৬৪ থেকে ৬৭ সমগ্র ফেডারেশন তাঁকে সভাপতি নির্বাচন করে রেখেছিলেন।

রাষ্ট্রসংঘের সঙ্গে যোগও তাঁর আজকের নয়। UNএর আমসভার প্রশস্ত নীল আর সোনালী কক্ষ তাঁর নানাবর্ণরঞ্জিত আফ্রিকা দেশের পোশাক, নানা ছাঁদের গহনায় ঝলমল করেছে বহুদিন থেকে। ১২৬টি দেশের প্রতিনিধি-পূর্ণ আসরে এঞ্জেলা নজরে লাগতেন। আমাদের গাইড মেয়ে বলছিলেন সাজের

Cadbury's
MILK
CHOCOLATE

বর্ণাঢ্যতায়, চলনে বলনে সবেতেই চমক লাগিয়ে দিতেন এই কালো মেয়ে। বহুদিন তিনি অ্যাসেম্বলির ঔপনিবেশিক কমিটির সভ্য ছিলেন।

রাষ্ট্রসংঘের চতুর্বিংশতি অধিবেশনে ১২৬টি দেশের এই সমিতিকে উদ্দেশ্য করে এঞ্জেলা যে কথা ক'টি বলেছিলেন তাও মূল্যবান। মানুষের আশাকে ক্ষুণ্ণ করে রাষ্ট্রসংঘের প্রতিনিধি দেশগুলি রাষ্ট্রসংঘের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করেছে। স্পষ্টবাদী এঞ্জেলা ব্রুকস্ U. N. এর তীব্র আলোচনায় অনেককে অবাক করেছিলেন। U. N. এর বাস্তবতাবিরোধী সম্পাদনার কথা প্রায় পৌরাণিক কাহিনী বা Mythology-র মত। সংকল্প বা resolutionই সাধনার সব নয়, সংকল্পকে কাজে পরিণত করাই সাধনার সিদ্ধি। বহু দেশ মুখে যা বলে তা রাষ্ট্রসংঘের দপ্তর এলাকায় বদ্ধ থাকে। কর্মশক্তিপূর্ণ প্রগতির লক্ষণ কোথায়? দুনিয়ার যত কঠিন সমস্যা তার কতটুকু সমাধান হয়?

রাষ্ট্রসংঘের জেনারেল অ্যাসেম্বলির সভাপতিত্ব এক একবার এক এক এলাকার জন্য নির্ধারিত থাকে। গত বছর ছিল দক্ষিণ আমেরিকার, এবার সমগ্র আফ্রিকা। কুমারী ব্রুকস্ ৪১টি আফ্রিকার প্রতিনিধি দেশের বিরোধিতাহীন মনোনীতা। ব্যক্তিগত বিত্ত তিনি বহু পালিত পুত্রকন্যার জন্য ব্যয় করেন। পালিত সন্তানদের কেউ কেউ আমেরিকায় তাঁর অর্থে পড়াশুনো করছেন। এই মাতৃভাব রাষ্ট্রসংঘের সদরে অন্দরে প্রবেশ করে যদি আগামী দিনের দুনিয়াকে এতটুকুও শান্তি দিতে পারে পৃথিবীর প্রত্যেক মা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ হবে।

টুকিটাকি

আগুনের তাপে বা অন্য কোনভাবে কাপড় ঝলসে গেলে শিরীষ কাগজ ঘষে কিছু উপকার পাওয়া যায়। অবশ্য বেশীরকম ঝলসালে যেভাবে কাপড় সামান্য পুড়ে যায় তা থেকে উদ্ধার করা কঠিন। রেশম বা পশম হ'লেও কিছু করা অসম্ভব। মোটা সুতীর কাপড় এবং ঝলসানো সামান্য হলে কি করা চলে তাই বলছি। খুব মিহি শিরীষ কাগজ ঘষে জলে ডুবিয়ে রাখবেন আধ ঘণ্টা বা এক ঘণ্টা। তারপর যদি দাগ থাকে হাইড্রোজেন পেরক্সাইড ব্যবহার করে দাগ তোলার চেষ্টা করবেন।

হাইড্রোজেন পেরক্সাইড অনেকরকম দাগ তোলার কাজে ব্যবহার হয়। কাজেই ব্যবহার বিধি সম্বন্ধে সাধারণ সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। ধাতুপাত্রে কখনও হাইড্রোজেন পেরক্সাইড মেশাবেন না। তাতে যে রাসায়নিক ক্রিয়া হয় তার ফলে কাপড়ের ক্ষতি হতে পারে। সামান্যভাবে পেরক্সাইড ও জলের মিশ্রণ পরীক্ষা করে নিয়ে তবে ব্যবহার করবেন।

হাইড্রোজেন পেরক্সাইড পরীক্ষা করার জন্য ঝলসে যাওয়া কাপড়ের যে অংশ দেখা যাবে না এমন একটি কোণে সামান্য লাগাবেন। কাপড় এতটুকু বিবর্ণ হ'লে ব্যবহার করা ঠিক হবে না।

ঘামের দাগের জন্য কাপড় ধোবার সময় আলাদা করে পরিষ্কার বা detergent এবং গরম জল দিয়ে দাগের জায়গা বিশেষভাবে ধোবেন। বেশীরকম দাগ হলে অ্যামোনিয়া বা সাদা ভিনিগারে পরিষ্কার করা যেতে পারে। সদ্য সদ্য দাগ হয়ে থাকলে অ্যামোনিয়া এবং পুরোনো দাগ হ'লে সাদা ভিনিগার ব্যবহার করবেন। ভিনিগার বাজারে না কিনে এসেটিক অ্যাসিড জলে মিশিয়ে ব্যবহার করলে সস্তা হবে। রাসায়নিক ভিনিগার, যা বাজারে সাধারণত কিনে থাকি তা সেভাবেই করা হয়। তার উপর রং দিয়ে দেওয়া হ'লে বাদামী দেখায়, রং না থাকলে সাদা ভিনিগার হয়।

কোন কোন সময় ঘামের দাগ হলদেটে হয়। সে ক্ষেত্রে হাইড্রোজেন পেরক্সাইড দিলে কাজ হবে। গরম লবণজল ঘামের দাগ তোলায় প্রশস্ত। দাগের সাহায্য হয় এবং ঘামের দুর্গন্ধ দূর হয়। বেশী বেশী করে লবণ দিতে হবে। দশ বারো ছটাক জলে বড় চামচের চার চামচ লবণ দিতে হবে।

রক্তের দাগ তোলায় সর্বদা মনে রাখবেন যে ঠাণ্ডা জলের ব্যবহার প্রশস্ত। গরম, এমন কি ঈষদুষ্ণ জলও ভাল নয়। ঠাণ্ডা জলে ভিজিয়ে যখন দাগ হাল্কা মনে হবে তখন ঈষদুষ্ণ জল ও সাবান ব্যবহার করবেন। দাগ যদি উঠতে না চায় তবে অ্যামোনিয়ার সঙ্গে জল মিশিয়ে তাতে ডুবিয়ে দেবেন। এক গ্যালন বা পাঁচ লিটার জলে দুই বড় চামচ অ্যামোনিয়া—এই মাপ কাজে লাগে। অবশ্য রঙ্গীন কাপড়ের রং পাকা কিনা প্রথমে পরীক্ষা করে দেখবেন। যে কাপড় ধুতে পারা যাবে না তার উপর দাগের জন্য ঠাণ্ডা জলের প্রলেপ ভিন্ন উপায় নেই। সেক্ষেত্রেও গরম জল লাগাবেন না। ভালভাবে প্রলেপ দিয়ে রোদে রেখে দেখবেন দাগ যায় কিনা। মলিনতা দূর করা বা bleaching এর ক্ষমতা সূর্যের আলোতে থাকে।

পান খাবার চুন বা অন্য কোন alkali বা ক্ষারপদার্থ কাপড়ের নানারকম ক্ষতি করে। ক্ষারের প্রভাবে কাপড় নরম হয়ে যায়, রঙ্গীন কাপড় হ'লে বিবর্ণ হয়। কাজেই চুন ইত্যাদি লাগলে চট করে পরিষ্কার জলে ধুয়ে শতকরা ১০ ভাগ অ্যামোনিয়া বা সাদা ভিনিগার জলে মিশিয়ে ধুয়ে ফেলবেন। যত তাড়াতাড়ি করা হবে তত কম কাপড়ের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা। অন্তত জলও যদি হাতের কাছে থাকে, তখন তখন জল লাগিয়ে দেওয়া দরকার। বাকি প্রক্রিয়া পরে করে নিলেও হবে। অবশ্য বহু দেরী হ'লে চলবে না।

শ্রীমতী

(ত্রিশ)

আবার যেন সেই পুরোনো দিনে ফিরে গেছে ললিত। ক্লাস ঘরের নোংরা দেয়ালে পেন্সিলে লেখা জ্যামিতির উপপাদ্য, ইতিহাসের রাজারাজড়ার নাম আর সন-তারিখ, বিজ্ঞানের যন্ত্রের ছবি, কিংবা সরল অংক, ভূগোলের জলবায়ু। বহু দূর হাত পৌঁছেছে তত দূরই দেয়ালে যথাসম্ভব লিখেছে ছেলেরা। হাফ-ইয়ার্লি পরীক্ষা গেছে কিছুদিন আগেই।

পড়াতে পড়াতে মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে যায় ললিত। ছেলেদের মুখগুলি বাতাসে ভেসে ভেসে হঠাৎ কতগুলি শূন্য হয়ে যায়। পড়ানো থামিয়ে ললিত জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে থাকে। পশ্চিমের আকাশে মেঘস্তর। কখনও বা দেখে তিনতলার ছাদ থেকে উড়ছে মেরুন রঙের শাড়ি। কখনও বা জানালার পাশের দেয়াল বেয়ে একটা বেড়াল যেন নিঃশব্দে ছোট্ট লাফ দিয়ে কার্নিসে উঠে যায়। কত ছোটো দৃশ্য দেখা যায়।

আজকাল উঁচু ক্লাসে ছেলেরা বড় একটা কথা বলে না। আগে পেছন থেকে [illegible] খেপু, ও [illegible] [illegible]। ললিতস্যার ওদের বড় প্রিয় ছিল। কেউ হয়তো তাদের [illegible] দিয়েছে যে, ললিত স্যার [illegible]। তবু এখনও কখনও ললিত টের পায় মুখের ভিড়ের ভিতরে একটি-দুটি চোখ যেন তার দিকে চেয়ে ছলছলিয়ে ওঠে।

গৌরহরি হালদার ক্যাশ ক্লার্ক। জেলখানার কাউন্টারের ওপাশে বসে থাকে—তার গম্ভীর হিসাব-মনস্ক মুখ। আগে মাঝে মাঝে কাউন্টারের ঘুলঘুলির সামনে ক্লাসে যাওয়ার পথে ললিত দাঁড়িয়ে দেখত হালদার কালেকশনের টাকা গুনছে। সে ঘুলঘুলির ভিতরে হাত ঢুকিয়ে অদৃশ্য রিভলভার উঁচিয়ে বলত—হ্যান্ডস আপ। হালদার হাসত। কখনও বা অকারণে হালদারের সামনে রাখা রবার স্ট্যাম্প তুলে দেয়ালে ছাপ বসাতো। হালদার চেঁচিয়ে কপট রাগ দেখাত—পোলাপান আর কারে কয়? আপনে কি ছাত্রগো পড়াইতে আসেন, না ছ্যাবলামি করতে? তবু ললিতের ওই ছেলেমানুষি হালদারের প্রিয় ছিল। বিনা দরখাস্তে অনেকবার ললিতের ক্যাজুয়াল ছুটি মঞ্জুর হয়েছে, যা ললিত টেরও পায় নি। আজকালও ঘুলঘুলির সামনে দাঁড়ায় ললিত। হালদার শরীর ঠিক রাখার উপদেশ দেয়, চোখে চোখ রাখে না। রবার স্ট্যাম্প তুলে নিয়ে আগের মতোই দেয়ালে ছাপ বসায় ললিত, হালদার আপত্তি করে না, কেড়ে নিতে হাত বাড়ায় না। যত খুশি স্ট্যাম্প মারো, ইচ্ছেমতো মেরে নাও। আর কি কি করতে ইচ্ছে করে তোমার? খেলাটা তাই জমে না। রবার স্ট্যাম্পটা রেখে দেয় ললিত। মায়ের সঙ্গে সেই লুডো খেলাটাও জমে নি। এখন সবাই তাকে দান ছেড়ে দেয়।

তবু সেই পুরোনো স্কুল-বাড়িতে সেই পুরোনো দিনগুলির স্মৃতি ছায়ার মতো দেখা যায়। টিচার্স রুম-এর দেয়ালে বিখ্যাত মনীষীদের উইয়ে-খাওয়া ফটো। সেই আলমারির ওপরে গ্লোব। মেয়ে-দেখা চেয়ার—যে চেয়ারে বসলে রাস্তার পথ-চলতি মেয়েদের দেখা যায়। বিভূতিবাবুর সঙ্গে অনেকবার চেয়ারটা নিয়ে কাড়াকাড়ি করেছে ললিত। এখন চেয়ারটা তার জন্য খালি রাখা হয়। ললিত বসে না।

ক্লাস এইটের মাধব মুকুন্দ-বেয়ারার ছেলে। টিফিনে সে ক্লাস থেকে এসে মাস্টারমশাইদের চা দিয়ে যায়। ছেলেরা সেই কারণে তাকে খেপায়। মাধব এখন বড় হয়ে গেছে একটু। স্কুলের ফুটবল টিমে খেলছে। বাপ তাকে ক্রমশ সমীহ করছে। ললিত লক্ষ করে এ-সব।

ক্লাস নাইনের হরেনকে দেখে অনেক দিন আগেকার একটা দৃশ্য মনে পড়ে যায়। হরেনকে ভরতি করতে এসেছিল ফর্সা গোলগাল সুন্দর চেহারার এক ভদ্রলোক। পোশাকে বনেদিয়ানা, স্কুলের সামনে গাড়ি দাঁড়িয়ে। লোকটাকে চিনতে পেরেছিল ললিত। একসময়ের বন্ধু। ললিত পরিচয় দিতেই লোকটা একটু ঘাবড়ে গেল, হেসে-টেসে বলল—তুমি এই স্কুলে! বাঃ বেশ ভালই হল।

ললিত জিজ্ঞেস করল—কাকে ভরতি করতে এসেছো?

লোকটা খুব অপ্রস্তুত হয়ে, লাজুক অপরাধী গলায় বলল—আমি তো জানতাম না যে, তুমি এই স্কুলে আছো। আমি—

গলা খুব নীচু করে ললিতের কানে কানে বলল—যাকে ভরতি করতে এনেছি সে আমার ডোমেস্টিক সার্ভেন্ট। পড়াশুনোয় ঝোঁক আছে বলে—বলতে বলতে লাল হয়ে গেল লোকটা।

সাম্যবাদে বিশ্বাসী ললিত। তবু হঠাৎ তার মনে একটা কোথাও ধাক্কা লেগেছিল। সেটা নিশ্চয়ই দুর্বলতা। আমি শালা তোমার চাকরকে পড়াবো? পরমুহূর্তেই দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে অতিরিক্ত উৎসাহে ললিত চেঁচিয়ে উঠেছিল—খুব ভাল, এই তো চাই।

ললিত হরেনকে বেশীরকম নজরে রাখত। লাভ হয় নি। হরেনের মাথা ভাল না। বোকা। কিন্তু বহুকাল হরেনের কাছে সহজ হতে পারে নি ললিত।

মাঝে মাঝে শাশ্বতীর টেলিফোন আসে। ললিতকে ক্লাস থেকে ডেকে আনে বেয়ারা, হেডমাস্টার হাত বাড়িয়ে রিসিভার তার হাতে দেয়, তারপর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। নিয়ম হল, ফোন এলে কাউকেই ক্লাস থেকে ডেকে দেওয়া হবে না, তাতে ক্লাসের ক্ষতি। শুধু 'ফোন এসেছিল' এই খবরটা দেওয়া হবে। কিন্তু ললিতের বেলায় এ নিয়মটা ভাঙা হয়েছে। ফোনে মেয়েছেলের গলা শুনে হেডমাস্টারের যে চোখে ললিতের দিকে তাকানো উচিত ঠিক সেইভাবে উনি আজকাল তাকান না, বরং তাঁর চোখে একটা 'আহা' ভাব।

এ সবই হয়তো সত্য। কিংবা ললিত

কল্পনা করে। আজকাল সে বড় স্পর্শকাতর হয়ে গেছে।

ফোনে শাশ্বতীর মিষ্টি গলা প্রশ্ন করে —শরীর কেমন?

—ভাল।

—চেক-আপের সময়ে ডাক্তার কী বলল?

ললিত হাসে—বলেছে আমি নাকি সেণ্ট পারসেণ্ট ফিট। দৌড়-ঝাঁপ-লাফালাফি সব কিছু করতে পারি। তবে ওরা এটা সবাইকেই বলে।

শাশ্বতী কী যেন ভাবে। তারপর হঠাৎ বলে—ওরা ঠিকই বলছে। আপনি কেন খারাপটাই ভাবছেন!

—ভাবি না তো! খারাপ ভাবনাটা নিজে থেকেই মাথা জুড়ে বসে আছে।

শাশ্বতী একটু ইতস্তত করে বলে—অদিতার একটা চিঠি পেয়েছি। সুন্দর চিঠি। ও সব ভুলে গেছে, ক্ষমা চেয়েছে।

—ও। বলে চুপ করে থাকে ললিত।

অক্টোবরের প্রথম থেকেই শীতের আমেজ পাওয়া যাচ্ছে। সন্ধেবেলা কুয়াশা হয় আজকাল। রাত গভীর হলে জানালায় দাঁড়িয়ে বাইরে একটা বিদেশী রহস্যময়তাকে প্রত্যক্ষ করা যায়। পুজোর ছুটির আর দেরী নেই।

একদিন টিফিনের আগে তুলসী এসে হাজির।

—চল, একটা সিনেমায় যাই।

—সিনেমা!

ললিত সিনেমার কথা ভুলেই গিয়েছিল। কতকাল আর সিনেমা দেখা হয়নি।

তুলসী বিমর্ষ মুখে বলে—পলাশপুরের বাসার ভাড়া আগাম দিয়ে এলাম। পুজোর কটা দিন কাটিয়ে লক্ষ্মীপুজোর পর চলে যাচ্ছি। আর সিনেমা-কিনেমা দেখা হবেই না।

টিফিনেই বেরিয়ে পড়ল দুজন। ললিত হেডমাস্টারকে বলতেই উনি ঘাড় নেড়ে বললেন—হ্যাঁ চলে যান, ক্লাস ম্যানেজ করে নেওয়া যাবে।

ম্যাটিনিতে একটা বোম্বাই ছবি দেখল দুজনে। ললিতের মনটা খারাপ ছিল। তুলসীটা দূরে চলে যাচ্ছে। এখন কেউ একটু দূরে যাচ্ছে শুনলে কেমন যেন হাহাকারে ভরে যায় বুক। আর কয়েকটা মাস থেকে যেতে পারলি না তুলসী? আমার খাটের এক কোণে তোর কাঁধ দেওয়ার কথা ছিল যে! দিবি না? অতদূরে কে তোকে খবর দেবে সময়মতো?

পর্দার চলন্ত ছবির দিকে চেয়ে দু চোখ ভরে জল আসছিল। হয়তো বহুকাল পরে দেখছে বলেই পর্দার আলো চোখে সহ্য হচ্ছে না, কিংবা হয়তো মন অজান্তে তুলসীর চলে যাওয়ার কথা ভাবছে। চেয়ারের হাতলে রাখা তুলসীর রোগা হাতখানার ওপর নিজের হাতখানা রাখে ললিত। অন্যমনস্কভাবে বসে থাকে। অনুভব করে সুখে দুঃখে তাদের পুরোনো বন্ধুত্ব।

সিনেমার পর তুলসী বলল—চল্ একটু হাতিবাগানে গিয়ে পুজোর জামাকাপড় কয়েকটা কিনে আনি। সাউথে বড্ড দাম।

তুলসীর পকেট গরম। সিনেমা হলের সামনে ছুটার শোয়ের একটা দল নামছিল ট্যাক্সি থেকে। খোলা দরজা দিয়ে ফুড়ুত করে ট্যাক্সির মধ্যে চলে গিয়ে তুলসী ডাকল—আয়।

সেই পুরোনো দিনের মতো। অবিকল পুরোনো দিনের মতো।

ট্যাক্সি থামিয়ে মিষ্টির দোকানে তারা ছানার মিষ্টি খায়।

তুলসী খুশী গলায় বলে—খা। যা খুশি খা।

—ফাঁসীর খাওয়া খাওয়াচ্ছিস।

মৃদুলার জন্য একটা বিষ্ণুপুরী সিল্কের শাড়ি কিনল তুলসী। লাজুক গলায় বলল —আমি ওকে সোনাদানা কিচ্ছু দিইনি। প্রথম পুজোটা বিয়ের পর, তাই। নইলে তাত-ফাত দিতাম।

ললিতের মায়ের কথা মনে পড়ে যায় হঠাৎ। অনেককাল মাকে কাপড়চোপড় দেওয়া হয়নি। মা কখনো কিছু বলে না। আগেকার পাড়ওলা শাড়িগুলোই এখনো পরে।

কে জানে তার জীবনের এটাই শেষ পুজো কিনা। একটা সরু কালোপেড়ে কাপড় মায়ের জন্য কিনল ললিত। আর একটা সুন্দর ছাপা শাড়ি কিনল।

তুলসী অবাক হয়ে বলে—শাড়ি কার জন্য?

—তোর বউয়ের জন্য। চল, আজ তোর বউকে দেখে আসি। তুই তো শালা ডাকলিই না।

তুলসী ভীষণ খুশী হয়, বলে—চল শালা, মালটা দেখিয়ে দিই।

মাঝে মাঝে এক-আধটা সুন্দর দিন আসে। আনন্দে ভরে যায় ললিত। দিন সাতেকের জন্য বাইরে গিয়েছিল রমেন। কোথায় কোথায় ঘুরে ফিরে এল। রোদে পোড়া তামাটে চেহারা, চোখ জ্বলছে। সেদিন রাত্রে ললিতের পাশে শুয়ে আস্তে আস্তে বলল—মরবি কেন ললিত? তুই মরিস না!

রায়বাবুর শ্রাদ্ধের দিন ভিতরের উঠোনে কীর্তন দিল অবনীশ। নিমন্ত্রণ পেয়েই রমেন লাফিয়ে উঠে বলল—আমি যাবো।

সন্ধেবেলা ললিতকেও জোর করে নিয়ে গেল রমেন।

কয়েকজন রোগা চেহারার কালো লোক খোলে চাঁটি দিয়ে মিনমিন করে 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম' করছিল। ভিতরের বারান্দায় ভিড় করে বসেছে পাড়ার বুড়ো বুড়ী আর কচিকাচারা। শম্ভুদের দলটা ঘোরাফেরা করছে। তারা শ্মশানবন্ধু।

রমেন হঠাৎ ফিস্‌ফিস্ করে বলল—একে কি ছাই কীর্তন বলে!

তারপর একসময়ে নিঃশব্দে নেমে গেল রমেন। দেখা গেল সে কীর্তনীয়াদের মাঝখানে। তার শরীর দুলছে। কেঁপে উঠছে। তারপরই হুঙ্কার দিয়ে লাফিয়ে উঠল সে—হরে হরে...রাম রাম...

পলকেই পাল্টে যায় আসরের চেহারা। বিদ্যুতের মতো কী যেন একটা সবাইকে স্পর্শ করে। কেঁপে ওঠে ললিত। দূরাগত বজ্রের মতো গুরগুর করে ওঠে খোল।

এমনিতেই চমৎকার গলা রমেনের। সুন্দর গান গায়। তার সঙ্গে এখন এক

অপূর্ব বাহার

ফ্যাশানের শিখরে ব'সে অপরূপ ট্রিক্কা ও
রয়েল ভয়েল, এই দুই শাড়ী আপনাকে কেতাদুরস্ত রাখবে !
কখনো মুচড়ে যায় না, মুসড়ে যায় না ।
দিব্যি তাজা ও কড়কড়ে থাকে । নানা অভিজাত রকমারি
প্রিণ্ট ও প্যাটার্নে ও রঙে । ডিসিএম-এর
এই অপূর্ব হাল্কা বাহার শাড়ী !

ডিসিএম স্টোরে যখনই যাবেন নতুন কিছু না কিছু অবশ্য পাবেন

Lensons/2636-Ban

দুরন্ত ঝড় এসে যোগ দেয়। মানুষজন দুলে ওঠে। থির থির করে কাঁপে পায়ের তলার মাটি। রোগা কালো কীর্তনীয়ারা লাফিয়ে ওঠে রমেনের চারধারে। এরকম একজনের অভাবেই যেন এতক্ষণ বাধা হচ্ছিল তাদের গান। শম্ভু-সুবলেরা এতক্ষণ কোথায় ডুব দিচ্ছিল মাঝে মাঝে, এখন তারা আসর ঘিরে দাঁড়ায়। চিত্রার্পিত হয়ে থাকে।

শূন্যে লাফিয়ে ওঠে রমেন, হুঙ্কার দিয়ে মুহুর্মুহু বলে—হরে কৃষ্ণ হরে রাম... কীর্তনীয়াদের পা হরিণের পায়ের মতো দ্রুত বৃষ্টিপাতের মতো মাটি ছুঁয়ে যায়।

কী করে কী করে এত লোকের সামনে নাচছে রমেন, গান গাইছে? ওর লজ্জা করছে না? ললিতের শরীর কেমন ঝিম মেরে আসে।

কখন যেন শম্ভুর পেশীবহুল চেহারাটা কীর্তনীয়াদের দলে ভিড়ে যায়। সে গায়ের জামা খুলে ফেলেছে। পরনে প্যান্ট, গলায় খোল।

মানুষ বাস্তবতা ভুলে যেতে থাকে। কীর্তনের উদ্দণ্ড ঢেউ আগুনের মতো তাদের ভিতরে স্নায়ুগুলোকে যন্ত্রের তারের মতো বাজাতে থাকে।

দেখা যায় রমেন কাঁদছে।

নারীরা ফুঁপিয়ে উঠে চোখে আঁচল চাপে।

হঠাৎ ললিত দেখে তার সামনে রমেন। চোখ জ্বলছে। দু-হাত বাড়িয়ে হঠাৎ তাকে টেনে নেয় রমেন।

ললিত চেঁচিয়ে ওঠে—কী করছিস?

পরমুহূর্তেই সে দেখতে পায় যে, সে আসরের মাঝখানে। তার চারদিকে পাগল লোকগুলো চোখ বুজে নাচছে, গায়ে ঢলে পড়ছে। বিনা মদের মাতাল।

ললিত স্থিরভাবে দাঁড়াতে চেষ্টা করে। পারে না। রমেন তাকে এক পাক ঘুরিয়ে ছেড়ে দেয়। ললিত টলে পড়ে যেতে যেতে সামলায়। সুবল তাকে টেনে নিয়ে কি যেন বলে। দু হাত তুলে নাচে আর হাসে।

কীর্তনীয়াদের গানের বোল এখন আর স্পষ্ট বোঝা যায় না। কেবল 'জয় ...জয়' ধ্বনি শোনা যায়। কার জয়? কিসের জয়? বুঝবার চেষ্টা করে ললিত। এর ওর ধাক্কা খায়। টলে পড়ে যেতে গেলে কেউ একজন ধরে আবার দাঁড় করিয়ে দেয়।

তুলসীতলায় বাবা একা কীর্তন করত। কাঁদত। বাবার হাতে থাকত ছোট করতাল। বিষয়বুদ্ধিহীন বাবা কীর্তনের মধ্যে ভুলে থাকত তার বাস্তব জীবনের ব্যর্থতা। সেই দৃশ্য মনে পড়ে ললিতের। মনে পড়ে ছেলেবেলার হরির লুট। মনে পড়ে কীর্তন তার রক্তে রয়েছে। অথচ সে কখনো কীর্তন করেনি।

জয়-জয়-জয় গর্জন করে তার চারদিকের পাগল লোকেরা। মুহুর্মুহু শঙ্খধ্বনি হয়, উলুর শব্দ বন্যার মতো ভেসে আসে। আকুল কান্নার শব্দ শোনা যায়। হৃৎপিণ্ড টিপটিপ করে লাফিয়ে ওঠে।

'জয় জয়' ধ্বনিটা ধরে ললিত। তারপর ফিসফিস করে বলে—জয় জয়। সংকোচে লজ্জা ভয় ক্রমে কেটে যায়। এত ভিড়ের মধ্যে কে আর তাকে আলাদা করে দেখবে?

তারপর ললিতের আর কিছু খেয়াল থাকে না। সে শুধু মাঝে মাঝে দেখে তার চারধারে অবাস্তব ছায়ার মতো লোক দূরে সরে যাচ্ছে, কাছে আসছে। মাঝে মাঝে কে যেন বুকে টেনে নিচ্ছে তাকে, ছেড়ে দিচ্ছে।

'জয়-জয়' বলে দু হাত তুলে নাচতে থাকে ললিত।

কে জানে কখন শেষ হয়েছিল কীর্তন। ললিত শুধু শেষে টের পায় তার গা এক অদ্ভুত উত্তেজনায় কদমফুলী কাঁটা দিয়েছে। কার জয়ধ্বনি সে এতক্ষণ দিয়েছে কে জানে। তবু, জয় হোক—তার জয় হোক।

রমেনকে ঘিরে ভিড়। সবাই জানতে চাইছে রমেন আসলে কে।

পরের দিন পুজো কমিটির মিটিং-এ ঠিক হয় এবার বিসর্জনের দিন কীর্তন করে নিয়ে যাওয়া হবে প্রতিমা। মূল গায়েন থাকবে রমেন।

প্রায় দিনই সকাল বিকেলে দু-চারজন করে রমেনের প্রজারা আসে। হাতে করে নিয়ে আসে লাউ, শাকপাতা, ফল, কিংবা নগদ টাকা।

ললিত মাঝে মাঝে ধমক দেয়—এসব তুই নিস কেন?

রমেন হাসে—নিতে হয়। মানুষে

ভালবেসে দিলে নিতে দোষ নেই। মানুষের দান গ্রহণ করা এককালে ব্রাহ্মণের প্রফেশন ছিল।

—কেন সেরকম প্রফেশন থাকবে?

রমেন একটু ভাবে। তারপরে আস্তে আস্তে বলে—ললিত, আমার পূর্বপুরুষেরা মানুষের অনেক উপকার করেছিল। মানুষ কৃতজ্ঞ হয়ে সেই ঋণ শোধ করত। ক্রমে ক্রমে ঐভাবেই আমাদের জমিদারি তৈরি হয়েছিল। আবার আমার আমলে চলে গেল জমিদারি। আমি আবার ব্রাহ্মণের পুরোনো প্রফেশনে ফিরে এসেছি। ওরা আমাকে ভালবেসে দেয়, আমি নিই।

—কেন দেয়? তুই ওদের জন্য কী করিস!

রমেন অন্যমনস্ক হয়ে যায়, আস্তে আস্তে বলে—কী দিই তা ওরা জানে। আমার তো টাকা পয়সা নেই। তাই আমি গিয়ে কেবল ওদের পাশে দাঁড়াই। দেশ ছাড়ার পর ওদের আর কোনো মানসিক আশ্রয় নেই। এককালে শোকে দুঃখে ওরা আমাদের বাড়িতে ছুটে যেত। এখন তাই ওরা আমাকে দেখলে খুশী হয়। ছুটে আসে। দুঃখের কথা বলে আমাকে। আমি

ওদের দাওয়ায় বসি, ছেলেপুলেদের সংগে কথা বলি, কারো বাসায় গিয়ে কীর্তন গাই—লোকগুলো আবার ঝাঁকি দিয়ে ওঠে। ওদের মধ্যে কেউ কেউ এখন পয়সা করেছে, কেউ বা ডুবে গেছে। ওদের মধ্যে একটা সমতা আনার চেষ্টা করি। এর ওর কাছ থেকে চেয়ে এনে দিই। একে অন্যকে দেখার কথা বলি। কিন্তু এটুকুই তো মাত্র নয়। ওরা আমার কাছ থেকে টাকা পয়সার সাহায্য তেমন চায় না। ওরা এটুকু ভেবেই খুশী যে, আমি ওদের পাশে আছি। ছোটো-কর্তাকে ওদের দরকার একটা প্রতিমার মতো—যার মধ্যে বুড়োকর্তার ছাপ আছে। কাজেই আমি ওদের স্বার্থ—আমাকে বাঁচিয়ে রাখা ওদের দায়িত্ব।

ললিত তবু গুনগুন করে আপত্তি করে। রমেনের কথাগুলো সাম্যের বিরোধী। কেন একজন দেবতার মতো হয়ে উঠবে?

রমেন মৃদু হেসে বলে—এককালে তোকে দেখতাম রাত জেগে পোস্টার লিখছিস, ঘুরে ঘুরে পার্টির চাঁদা তুলছিস, মিটিং করছিস, মিছিল সামলাচ্ছিস। নিজের দিকে তোর খেয়ালই থাকত না। তখন তোর মনে একটা প্রকাণ্ড আদর্শ কাজ করেছে—সকলের ভাল করার আদর্শ। তুই হয়তো টেরও পেতিস না যে, সকলের ভাল করার চেষ্টা করছিস বলে তোকে বাঁচিয়ে রাখা সকলের কর্তব্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমি দেখতাম কেউ নিজে থেকেই তোর ঠোঁটে সিগারেট গুঁজে ধরিয়ে দিচ্ছে, কেউ এনে দিচ্ছে চা, রাত বারোটায় তোর জন্য দোকান খুলিয়ে নিয়ে আসছে পাউরুটি। তুই সেসব টেরও পাচ্ছিস না। এক মনে কাজ করে যাচ্ছিস। আমার ব্যাপারটাও অনেকটা তেমনি। লোকের সাথে হয়ে ওঠা। আমি কেন নিজের পেটের ধান্দায় ঘুরব—আমার পেটের ধান্দায় ঘুরবে অন্যেরা। কারণ, আমি তো তাদের ধান্দাতেই ঘুরছি।

—কিন্তু এই প্রফেশন মহৎ নয়। এর মধ্যে ভণ্ডামিপনা আছে।

—তবে কী করব! চাকরি? সে তো বাঁধা মাইনের ব্যাপার। মাইনের টাকা হাতে পেয়ে তার মাপে মাপে নিজেকে ছোটো করে ফেলব, খরচ কমাবো, জমাতে শিখবো।... দ্যাখ না, সেদিন সঞ্জয়ের কাছে গেলাম, পুরোনো দিনের কথা হচ্ছে—তার মাঝখানে হঠাৎ ও খুব অসহায়ভাবে লাজুক মুখে বলল—তুই আমার কাছে 'দা' তিন হাজার টাকা পাস, কিন্তু সেটা এক্ষুনি দিতে পারছি না রে। সদ্য গাড়িটা কিনেছি, ওভারহল করতে অনেক খরচ গেছে। বিজনেসেও লস দিলাম অনেক...এইসব কথা। ওর এয়ারকন্ডিশনড করা অফিস-ঘরে বসে আমার হঠাৎ মনে হয়েছিল—সত্যিই সঞ্জয়টা গরীব, ঠিক আগে যেমন গরীব ছিল। কী করে টাকা দেবে ও? ওর যে টাকার বড় দরকার। অথচ ও আমাকে বারবার বলছিল যে ও সন্ন্যাসী হতে চায়, আর কয়েক বছর পরেই ও সন্ন্যাসী হয়ে যাবে।

বলে রমেন হাসে। ললিত চুপ করে থাকে।

একটা চেনা জায়গায় মাঝে মাঝে বিকেলে শাশ্বতীর সংগে দেখা হয়। শাশ্বতী সুন্দর হাসে। নিশ্চিন্ত মুখ-খানা। যেন সে নিশ্চিত বুঝে গেছে যে ললিত বেঁচে থাকবে—অসুখ সেরে যাবে।

ললিত ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করেনি। কিন্তু ব্যাপারটা নিজে থেকেই হয়ে যায়। দেখা হতে থাকে, দুর্বলতা বাড়ে। কেমন যেন জ্বালা করে চামড়ার নীচে। মন অস্থির হয়। তবু শাশ্বতীর সঙ্গে এখনো কোনো ভালবাসার কথা হয় না। তারা কথা কম বলে। কাছাকাছি হলে, কাছাকাছি থাকে কিছুক্ষণ। চোখে চোখ পড়লে সরিয়ে নেয়। মাঝে মাঝে অকারণে হাসে। প্রাণপণে নিজেকে শাসনে রাখে ললিত। যাতে কোনোরকম দায়বদ্ধতার মধ্যে না গিয়ে তারা পরস্পর বন্ধু এবং শুভানুধ্যায়ী থাকতে পারে।

পুজোর কয়েক দিন আগে হঠাৎ একদিন আদিত্য এসে হাজির। সেদিন রবিবার, সঞ্জয় গাড়ি নিয়ে এসে মাকে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে গেছে, সঙ্গে রিনি আর পিকলু। ওরা ফিরবে রাত্রে। রমেন বাসায় ছিল না। ফাঁকা ঘরে দুপুরে শাশ্বতী এসেছিল। মুখোমুখি দুই চৌকিতে বসে ছিল ললিত আর শাশ্বতী।

ঠিক এরকম সময়ে এল আদিত্য। সে ভেজানো দরজা ঠেলে ঢুকে দাঁড়াতেই হঠাৎ বিবর্ণ হয়ে গেল শাশ্বতীর মুখ। কেমন গোপন একটা অপরাধবোধে কাঠহাসি হাসার চেষ্টা করে ললিত উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল। আদিত্য হইহই করে উঠল—ঠিক আমি যা আশা করেছিলাম—ঠিক আমি যা আশা করেছিলাম—

যেন মারের ভয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছিল শাশ্বতী। আদিত্য সেই আগের দিনের হাসি হাসল, বলল—চল লোলিটা, তোরা বিয়ে করবি। আমি সাক্ষী দেবো—মাইরি বলছি—আপন গড—ওঠ লোলিটা, সতী ওঠো—উঠে পড়ো—

হঠাৎ ললিতের চোখে জল এসে যায়। মরে যেতে ইচ্ছে করে। (ক্রমশ)

অবাবন ডহুরা'

"দণ্ডীরাম মণ্ডল, বাড়ি আছ নাকি হে?" আরো কয়েকবার হাঁক পাড়ার পর বাঁখারি-বোনা আগড়ের দোর খোলার জন্যে কে একজন বাঁশের হুড়কো খুলে খড়খড় করে শব্দ করলে। অন্ধকারে বোঝা গেল না, মেয়ে না পুরুষ। মূর্তিটি কিছুক্ষণ তীক্ষ্ম চোখে জন-তিনেক লোককে সদরের ছাঁচতলায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আবার 'বাকুলে' সেঁধিয়ে গেল।

আবার নিঃশব্দ। নিস্তব্ধ চারদিক। 'ঝিঁঝিঁ' পোকা ডাকছে ঝিঁ-ঝিঁ শব্দে। কু, কু, কু, শব্দে ডাকছে উইচিংড়ি। কর-কর-কররর শব্দ করে গলা ফুলিয়ে ডাকছে কুটুরে ব্যাঙ।

'এই দণ্ডী, শালা, ভয়ে লুকিয়ে আছে, আমরা কি ফাঁড়ির 'পুলিস' না সাস্ত্রী? তোর বউ উঁকি মেরে দেখে গেল কি তোর গলা জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়ল!'

পরিচিত গলা বুঝতে পেরে দণ্ডীরাম একটা লম্ফ হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল। খালি গা, লুঙ্গিপরা। কোমরে একটা গামছা বাঁধা।

মাথার ওপরে লম্ফটা তুলে ধরে লোকগুলোকে দেখে নিয়ে শুধোলো, 'কারা গা?'

'তোর ভগ্নিপতির বাবার ছেলে, শালার ভয় দেখ, ইঁদুরের গর্তে লুকিয়েছিলি বোধ হয় এতক্ষণ? মশার কামড়ে শালা দাঁড়ানো যায় না।'

'কালু-দা, বসো। এরা দুজন কে? এদের তো চিনি না।'

তালপাতার তিনটে চাটাই বিছিয়ে দিতে লোক তিনজন বসল। উবু হয়ে বসল দণ্ডীও। গায়ে বুকে পিঠে তার লোম ভর্তি—প্রায় বনমানুষের মতন। হাতের বাজুতে একটা ইয়া বড় মাদুলী বাঁধা লাল ঘুনসিতে। কানের ওপরের আধপোড়া বিড়িটা লম্ফের আলোতে ধরিয়ে নিয়ে নতুন লোক দুটোর দিকে সন্দেহভরা চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে থাকে দণ্ডী।

কালু সেখ বলে, 'এরা মোর আত্মীয়, ইনি দাদার শালা আর ইনি মোর আপন 'ভাসতো' বোনের দেওর। লও, ওঠো, তিন পাঁট মাল 'লেসো'।'

'না ভাই কালু, আমি ওসব কারবার বন্ধ করে দিইচি। জানো তো গত্ত মাসে কি কাণ্ডটা হল ঐ চাঁড়াল পাড়াতে। 'কমুনিস্টি'রা গোটা পাড়াটা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। কলকাতার কোন টাকাওলা মাড়োয়ারবাবু ভাটিখানা বানাবার জন্যে চাঁড়ালপাড়ার সবাইকে টাকা দিয়ে মাল তৈরি করতে বলে গেল। বাবু নাকি 'লাইসেন' বার করেছে। ভাটিখানা তৈরি

হল শ্মশানটার কাছে। কাজ আরম্ভ হতেই লালঝাণ্ডার লোকজন এসে মারপিট দিয়ে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিল সব। পাড়ার বহু লোকের ঘর পুড়ল, থানায় গেছে পুলিসের বা কেই। এখন ওদের রাজত্ব। ওরা খুন করলে পুলিস আসবে না। না ভাই, ওসবের মধ্যে আমি নেই। অন্যখানে দেখো, যদি পাও।'

'এই অ্যাদ্দিন পরে, কাদা ছেড়ে, খানা-ডোবা সাঁতরে এনু শালা, দণ্ডী, তুই ধর্মের দাদা মোর, ধর্মের বাপ—কে আছে, আত্মীয়-বন্ধুদের মুখ রাখ, কেউ জানবে না। এখানে বসেই আমরা গলায় ঢেলে যাব। মাইরি তোর মা কালীর দিব্যি! আল্লার কসম! যে শালা 'ফুটোচাব' করবে তার বাপ আঁটকুড়ো হবে।'

দণ্ডী মণ্ডলের দুটো পায়ে জড়িয়ে ধরে কালু সেখ। বাড়িতে গেলা তাড়ির নেশা তখনো তার কাটেনি। তার সঙ্গের বাবুমতো চেহারার গলায় রুমাল বাঁধা ছোকরাটি দশ টাকার দুখানা নোট বার করে হাতে গুঁজে দেয় দণ্ডীরামের, 'দাও না ভাই, একদিন এসেছি, বিশ্বাস করো আমরা 'পুলিসের চর' নই।'

দণ্ডীরাম হাতে টাকা পেয়ে একটু নরম হল যেন। ডাকলে, 'বিন্দে!'

বিন্দে এসে দাঁড়াল। বয়েস পঁচিশের ভিতর। বিধবা যুবতী বোন দণ্ডী মণ্ডলের। বললে দু' পাঁট 'সাদা জল' এনে দে তো বাবুদের।'

'মাইরি দণ্ডী-দা, তিনটে দাও, আমরা তিনজন।'

'তার দশ টাকা লাগবে তাহলে। অনেক কষ্টে লুকিয়ে মাল তৈরি করতে হয়। মাস্তরের এক হপ্তা আগে একবার থানাতল্লাসী হয়ে গেল। শালা, ফাঁড়ির পুলিসরা এসে ঘরের মেঝে উঠোন কোপালে। পুকুরে জাল ফেলে দেখলে, দেখল গোয়ালঘর, ঢেঁকিঘর, ধানের গোলা—সব! কোথাও কিছু না পেয়ে চলে গেল। দালালটা চোখ রাঙিয়ে তাকিয়ে গেল আমি তাকে হেসে বুড়ো আঙুল নেড়ে দেখাতে। শালাকে গাছ-

টারীর এক কোণে নোব একদিন ভালো লেই।'

'তিন পাঁটে তিরিশ টাকা—এ যে একেবারে বেরান্ডির দাম দাদা! দিশি 'জরাবন হুরো'—এত দাম কেন? একটু কমাও। চাঁতা বঁটিতে পেঁচিয়ে গলা কেটো না।'

'না, কম হবে না।'

বিন্দে 'সাদা জল'-এর বোতল এনে দিলে দাকে। দণ্ডী বোতলের মুখ খুলে তলায় হাতে একটা ঠোকা মেরে ঢকঢক শব্দে ঢেলে দিলে একটা গ্লাসে। প্রথমে কালু গ্লাস নিলে। পকেট থেকে ঝালবড়া বার করে চিবোতে লাগল। পর পর গ্লাস নিয়ে গলায় ঢালার পর দু' পাট মাল ফুরিয়ে গেল। আবার দশ টাকা দিলে, বিন্দে আর এক পাট এনে বোতলটা ধরে দাঁড়িয়ে রইল। বাবুমতো লোকটার গলায় রুমাল বাঁধা কেন? বিন্দে স্পষ্ট দেখেছে, একটা সোনার হার গলায় রয়েছে। তাই রুমাল চাপা? ঠোঁট টিপে হাসলে সে একটু।

দণ্ডী টাকা নিয়ে উঠে চলে গেল। বিন্দে বসল। বোতল খুলে মদ ঢেলে বাবুমতো লোকটির (যার নাম নাকি রতিকান্ত!) হাতে দিলে একটু হেসে ঢেলা দিয়ে। লোকটি বিন্দের পায়ে হাত দিয়ে গড় করলে। বললে, 'বন্দেরানী, পীরিতের দেবী, তোমার পায়ে গড় করি!' ওদের নেশা ধরে গেছে তখন। জল দেওয়া নয়, খাঁটি মাল। মাস দুয়েকের পুরোনো।

একটু দূরে হঠাৎ দুজন লোকের কথাবার্তা শুনতে পাওয়া গেল। কুকুর ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল। চট করে লম্ফটা নিবিয়ে দিলে বিন্দে। বললে, 'চুপ!'

অন্ধকারে চারটে প্রাণী! ঝোবড়া চালা-ঘরের অন্ধকার।

সবাই চুপচাপ বসে। সাড়া নেই, শব্দ নেই!

রতিকান্ত অন্ধকারে বিন্দের একটা হাত ধরলে। বিন্দে কিন্তু প্রতিবাদ করলে না। বরং একটু ঘন হয়ে সরে গেল। রতিকান্ত কি করছিল অন্ধকারে কে জানে!

কালু ফিসফিসিয়ে বললে, 'রতিদা, কানাই, চল পালাই। ধরে হবি কোথা? সব টাকা কড়ি মেরে নেবে। এ পাড়ায় বড় 'আকষা আকষি'।'

বিন্দে তখন লোকটার গলার হার খুলে নিচ্ছিল। আর লোকটা তার দেহ হাতড়ে বেড়াচ্ছিল পাগলের মতন। বলছিল, 'আহা সখি, গলায় কাতুকুতু দাও কেন?'

অকস্মাৎ দণ্ডী এসে পড়ে বললে, 'পালাও ভাই তোমরা। লোকজন এসে পড়েছে। ধরে খারাবি হয়ে যাবে হয়তো এখনি।'

লোক তিনজন পালিয়ে গেল।

বিন্দে আর দণ্ডী ভিতরে এসে দোর বন্ধ করে দিলে। ঘরের মধ্যে এসে বিন্দে বৌদি আর দাদার সামনে হেসে লুটিয়ে পড়ল।

বন্দেরানী, পীরিতের দেবী, তোমার পায়ে গড় করি

দেখালে, এই সোনার হার, আর দু'খানা দশ টাকার নোট!

দণ্ডী বললে, 'আমি আর নকুল ওদিকে কথা বলছিলুম এদিক দিয়ে গিয়ে। কুকুরটার পেটে লাথি মারতে তবে চেঁচাতে আরম্ভ করলে।'

বউ গৌরী বললে, 'ওরা গেছে তো?'

দণ্ডী আবার দোর খুলে কুকুরটাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে এল। খানিকটা এসে একটু দূরে তিনজনকে কি যুক্তি করতে দেখলে অন্ধকারে ফাঁকা রাস্তায় দাঁড়িয়ে। জোরে গুরুগম্ভীর গলায় হাঁক মারলে, 'কোন শালারা ওখানে? দাঁড়াও তো!'

কুকুরটাকে লেলিয়ে দিতে সে ঝাঁঝাঁ করে তেড়ে যেতেই লোক তিনটে দৌড় মারলে।

এবার নিঃসন্দেহ হল দণ্ডী।

ফিরে এসে বিন্দেকে শুধোলে, 'হার কোথা পেলি তুই?'

'কেন? ঐ ফরসা লোকটার গলায় ছিল। আড়াল করে রুমাল বাঁধা ছিল। আলো নিবিয়ে দিতেই লোকটা আমার হাত ধরলে। আর আমি একটু আসকারা দিয়ে সুযোগ মতন খুলে নিলাম। তুমি ঠিক সময়ে না এসে পড়লে আমার কি হাল যে করত মাতালরা কে জানে!'

গৌরী বলে, 'ধন্যি তোর সাহস ঠাকুরঝি! আমার লজ্জা লাগে, ভয় করে।'

'তোমার মতন ভাতমারা মেয়েমানুষ থাকলে শালা উপায় হবে অন্তরম্ভা আর জেল খেটেও মরতে হবে। বিন্দে আমার বোন হয়ে যে উপকার হয়েছে ভাই হলে ওকে দিয়ে মারামারি ছাড়া আর কি হত? তবে চেনাজানা খদ্দেরদের সাথে এমন 'বাড়াবাড়ি' করলে ব্যবসার ক্ষতি হবে। হারটা সোনার তো?'

বিন্দে আলোয় হারটা দেখলে বেশ চকচক করছে, নিশ্চয়ই সোনা!

তারা আলো নিবিয়ে আবার শুয়ে পড়ল যে যার।

মাঝরাত্রে আবার ডাক শোনা গেল কার যেন।

কান পাতলে দণ্ডী।

বিন্দে উঠে দেখতে এল অন্ধকারে, উদোম গায়ের কাপড় টানতে টানতে। শুধোলে, 'কে গা?'

টর্চ মারলে হঠাৎ লোকটা আগড়ের ওপরে।

বিন্দে চিনতে পেরে বললে, 'দূরে বেহায়া মিনসে!' গায়ে কাপড় দিয়ে দোর খুলে দিলে। ভূষণ সাহা এল বাড়ির মধ্যে। হ্যারিকেন জেলে নিয়ে বেরিয়ে এল দণ্ডী। বললে, 'বসো ভূষণ-দা।'

'বসব না। এখন রাত একটা। চার জায়গা থেকে মাল নিতে হবে। দেখি ক'বোতল আছে বার করো তাড়াতাড়ি।'

'দাঁড়াও দাঁড়াও দেখি। টর্চটা দাও।'

দণ্ডী একটা কাঠের বাক্স নিয়ে খিড়কীর দোর খুলে বাইরে চলে গেল। বাগানের পিছনে জলডোবা হিজলের আর জল-ডুমুরের বন। পোড়ো ঢিবির ওপরে খণ্ডনবোড়া, আশ-শ্যাওড়া, ঘেঁটু আর খেল-কদমের ঝোপ। সেখান থেকে বাক্সে করে কুড়িটা বোতল তুলে আনলে দণ্ডীরাম। এসে দেখলে তার বউ বুকে এলো করে বাচ্চাকে দুধ খাওয়াচ্ছে ভূষণ সাহার সামনেই। অবশ্য ভূষণ তাদের ভাগ্যপতি। বিন্দে হেসে গড়িয়ে পড়ছে কি কথা শুনে। বিন্দে বললে, 'দিদি আমাকে বলেছে তুমি নাকি 'বুড়ো' হয় গেছ!'

'তুমি পরীক্ষা করে দেখেছ তো, সত্যি কি তাই?'

'দূরে মিনসে! আমি করে পরীক্ষা করবু? গলায় গামছা দেব মিনসের। দেখি কত টাকা এনেছ—'

পকেটে হাত গলাতেই তার হাতে একটা মোচড় দিতে বিন্দে 'বাবারে' বলে চেঁচিয়ে উঠল। ভূষণ বললে, 'কেমন, আমি 'বুড়ো' কি জোয়ান এবার টের পেয়েছ তো বন্দে-রানী! বউদি 'রাধারানী'র তো সব করে গেল! দাদার জন্যে একটু মধু না থাকলে বেচারা যাবে কোথায়?'

গৌরী চোখ ঠারা করে গায়ে কাপড় দিলে। দণ্ডীর কাছ থেকে মালের পেটি নিয়ে বাইরে এসে একটা ঝোঁচকা মতন লোকের মাথায় তুলে দিয়ে টাকা গুণে দিলে সে দণ্ডীর হাতে। বিন্দে এসে হাত পেতে দাঁড়াতে তার হাতে একটা দু'টাকার নোট দিয়ে তার গাল টিপে দিয়ে চলে গেল সে। বলে গেল আসছে কালীপুজোর সময়ে যেন বেশি মাল তৈরি থাকে।

একশো টাকা দিয়ে গেল ভূষণ। পাঁচ টাকা বোতল। ওরা শহরের দোকানে খদ্দেরের ভিড় দেখলেই তাল বুঝে জল মেশাবে। খুব নেশা ধরে গেলে শুধু

সোডা জল খাওয়াবে! মোটা লাভ ওদের। দু-চারজন খদ্দের বাড়িতে আসে তাদের পাড়া-গাঁ থেকে। তারা র‍ুগ্ন গরিব খদ্দের। গলা কাটলে একবার আর 'ঘেড়োয়' না। আর বাইরের অচেনা খদ্দেরদেরও ভয় বেশি। বিশ্বাস করা যায় না, কে কখন ধরিয়ে দেবে তার ঠিক নেই।

রাত দুটোর পর উনুন জ্বালালে বিন্দে। গোয়ালের মধ্যে কলসীতে 'ভেলি গুড়' পচানো ছিল 'জল' দিয়ে। একসের গুড়ে চারসের জল। তাতে তাড়ির 'জাওয়া' দেওয়া হয়েছে। পনেরোদিন পচাবার নিয়ম। কিন্তু মালের টান আর ধরা পড়ার ভয়ে তাড়াতাড়ি মাল পচিয়ে তুলতে 'কারবাইড' দিতেই হয়। ফেনা উঠে গেঁজিয়ে ওঠা সেই পচানী ভাঁড়ে করে তুলে এনে কানা কাটা একটা অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়িতে ঢেলে দিলে বিন্দে। সেই হাঁড়ির ওপরে আর একটা হাঁড়ি বসালে। তার তলাটা এক ইঞ্চি পরিমাণ ফুটো। সেই ফুটোর চার পাশে ইঞ্চিখানেক করে চারটে 'ঠিকরে' কাট দিয়ে তার ওপরে তলালেপা মুখ 'চ্যাতরা' (বড়) ঘটি বসালে। ঘটিটা রইল দ্বিতীয় হাঁড়ির মধ্যে। পর পর দুটি হাঁড়ির ওপরে এবার কড়া বসালে। কড়ায় ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিলে কানায় কানায় ভরে। তারপর কাদা দিয়ে দুটো হাঁড়ির জড়েন-মুখ লেপে এঁটে দিলে।

এবার উনুনে জ্বাল দিতে লাগল চ্যালা কাঠ ধরিয়ে। হু-হু করে আগুন জ্বলতে লাগল। ভটভট করে ফুটতে লাগল তলার হাঁড়ির মধ্যেকার গুড়ের পচানি। বাষ্প উঠে মাঝখানের হাঁড়ির তলার ফুটো দিয়ে ঢুকতে লাগল। সেই বাষ্প ওপরের কড়ার তলায় ঠাণ্ডা পেয়ে জমতে লাগল। তারপর ঘামের মতো ঝরে ঝরে পড়তে লাগল ঘটির মধ্যে।

কড়ার জল গরম হয়ে উঠলে বদলে ঠাণ্ডা জল আবার দিতে হবে। সমানে আগুন জ্বলা চাই। নিচের হাঁড়ির পচানি শুকিয়ে 'কাই' হয়ে এলেই—যখন আর বাষ্প আদৌ উদ্ভব না তখন সব নামিয়ে ফেলতে হবে। ঘটির 'বাষ্প জল'টুকু বোতলে ঢেলে ছিপি এঁটে দাও। এই হল চোলাই মদ। স্রেফ গুড়, জল আর তাড়ির 'জাওয়া' পচানি বাষ্পজল!

পচানি আরো থাকলে আবার হাঁড়ি-পাতিল বসিয়ে জ্বাল দিতে হবে। মাল বেশি করতে হলে চার পাঁচটা উনুন এক সঙ্গে জ্বালালেও হবে। এই চোলাই মদের ব্যবসা চলে গোপনে। ফাঁড়ির পুলিস হানা দিয়ে মাঝে মাঝে দেখা যায়, কোমরে দড়ি বেঁধে প্রায়ই তাদের ভ্যানে তুলে নিয়ে চলে যায় ২৪ পরগণা জেলার দক্ষিণ অঞ্চলের কয়েকটি থানা এলাকা থেকে।

আসছে কালীপুজোয় চোলাই মদের খুব টান পড়বে। সুস্থ মানুষ বিকারগ্রস্ত হয়ে প্রেতনৃত্য করবে। তাদের নাচাবার গোপন 'সাদাজল' তৈরি হচ্ছে দণ্ডীরাম মণ্ডলদের ঘরে ঘরে। সাদাজল খেয়ে মানুষ 'রঙিন' হবে। দু পয়সা পাবে দণ্ডীরা। কিন্তু ভুষণ সাহারা পাবে যে তার কয়েক গুণ! তারা পাকা মালে কি কি 'ফেন্ট' বা 'ভেল' দিতে হয় তা জানে। বিলিতি মদের সঙ্গে দিশি মদ 'পাইল' দেয়। অ্যালকোহল, জল, সোডা কত কি দিয়ে তাদের কারবার। সরকারের দেওয়া তাদের 'পাকা লাইসেন্স' আছে।

সেদিন তোমার বোন আমার কেমিকেলের হারটা খুলে নিলে! আজ কি নেবে?

দণ্ডীদের লাইসেন্স নেই। তারা চোরের চাইতেও নাকি অধম। কিন্তু তারা খাঁটি মাল দেয়।

কালীপুজোর আগে একবার মহড়া দেবে পুলিস—এ সবারই জানা আছে। তাই সবাই সতর্ক। কিন্তু এত কান্ড করার পরও আবার কালু সেখ সেই দুটো লোককে নিয়ে এল। নেশার খেয়ালে সব ভুলে গেছে বোধ হয়।

দণ্ডী একেবারে হাঁকিয়ে দিতে চায়। সন্ধ্যার মুখোমুখি তারা এসেছে। বিন্দে বললে, 'দাও দাদা, চটিয়ো না। কালু সেখের যা মুখ, গালাগালি করবে। আর ওরা ভাল টাকা দেবে।'

তিনটে বোতল বার করে দিতে রতিকান্ত নামের লোকটি হেসে বললে, 'সেদিন তো তোমার বোন আমার কেমিকেলের হারটা খুলে নিলে! আজ কি নেবে?' তারপর সে হুইসেল টানতেই ডজনখানেক পুলিস ছুটে এসে হঠাৎ দণ্ডীরামের বাড়ি ঘেরাও করলে। কালু সেখ বললে, 'প্রতিশোধ নিলুম বলে দুঃখ করিসনি ভাই দণ্ডী! আমাদের পিছনে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিলি না?'

কোমরে দড়ি বেঁধে দণ্ডীকে নিয়ে চলে গেল পুলিসরা। দণ্ডীর বউ কাঁদতে লাগল।

কিন্তু বিন্দে বললে, 'কাঁদিস কেন বউদি? দাদার একটু 'জিরেন' হল। জেলখানায় মাস ছয়েক থাকলে শরীরটা তবু একটু সারবে। আমি তো রইচি। আমার নাম বিন্দে, মালের ভেয়ান আমি জানি।' আর রাতের মানুষ ভুষণ সাহা আছে আমাদের বাঁধা নাগর।'

আবদুল জববার
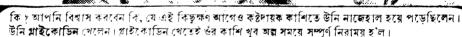
মস্কো ডায়নামো স্টেডিয়ামে খেলা শুরুর আগে ইস্টবেঙ্গল দলের খেলোয়াড়রা দাঁড়িয়ে। সাতজনের খালি পা। লেখক বাঁ দিক থেকে দশম স্থানে

॥ ২ ॥

হেড মাস্টার মশাই বললেন, 'তা হয় না'।

আমি বললাম, 'কেন হয় না স্যার? আমি তো অন্যায় বা বেশী দামের কিছু চাইছি না। সাওটা স্পোর্টসের প্রাইজের দাম কি একজোড়া ফুটবল বুটের দামের সমান নয়'?

উনি বললেন, 'এখানে দামের প্রশ্ন উঠছে না। জানো, এবার সভাপতি হচ্ছেন বাঙলা দেশের এক নামকরা লোক। তা ছাড়া অনেক ছাত্রের গার্জেনরাও আসবেন। সেখানে স্কুলের সেরা স্পোর্টসম্যান হিসেবে সভাপতি তোমার হাতে তুলে দেবেন কিনা একজোড়া জুতো! এ কথা ভাবতেও আমার গা শিউরে উঠছে। তুমি বরঞ্চ অন্য কিছু চাও'।

কিন্তু অন্য জিনিস আমি চাই কি করে?

ছোট বেলায় আমার খেলা দেখে ষষ্ঠী কাকা এক ইংরেজের লেখা ফুটবল খেলা-শেখার একটা বই আমায় উপহার দিয়েছিলেন। সে বই ছিল 'ইনস্ট্রাকশ্যনাল' ছবিতে ভর্তি। সেই থেকে একজোড়া ফুট-বল বুটের ওপর আমার দারুণ লোভ। তাই এ সুযোগ আমি কি করে হারাই!

অনেক তর্কাতর্কির পর রফা হল সভার আগেই বুট দেওয়া হবে। আর সভায় সভাপতির হাত থেকে আমি নেব খালি মানপত্র।

*

বাঘাদা (তেজেশ সোম) আমার দম এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে বললেন, 'তোর শরীরটাত ভালই দেখছি, তুই বুট পরে খেল'। বুট পরে খেলার প্রতি আগ্রহ থাকলেও, খালি পায়ে আর বুট পরে খেলায় কতটা তফাত এবং এতে শরীরে অতিরিক্ত কতটা ধকল লাগে, তার কোন ধারনাই তখন ছিল না। টের পেলাম লীগের খেলায় সে বছর। সেনটার হাফে খেলি, কিন্তু বিপক্ষের কোন ফরোয়ার্ডের সঙ্গেই গতিতে পেরে উঠছিলাম না। ৫০ মিনিটের খেলায় ৪০ মিনিটেই ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলাম। লীগের গুটিকয় ম্যাচ খেলেই এত ক্লান্ত হয়ে পড়লাম যে ক্লাব কর্তৃ-পক্ষকে নিজেই অনুরোধ করলাম আমায় বসিয়ে দিতে।

মহমেডান স্পোর্টিং-এর সঙ্গে খেলার পর ক্লাব সমর্থকরা ক্ষিপ্ত হয়ে, আমার বুট গঙ্গার জলে ফেলে দিতে চাইল। তাদের যুক্তি বাঙ্গালী ফুটবলারদের শারীরিক সামর্থ্য এত নেই যে বুট পরে খালিপায়ের ফুটবলারদের সঙ্গে সমান-তালে খেলতে পারবে।

বাঘাদার কাছে কেঁদে বললাম, 'বুট-পরে আর খেলব না। অনুমতি দিন খালি পায়ে আবার খেলি'।

উনি ধমক দিয়ে বললেন, 'বাজে বকিস না। বুট পরে খেলা তোকে চালিয়ে যেতেই হবে। আজ যারা বুট খুলে নিতে চাইছে তোর পা থেকে, একদিন দেখবি

ওরাই তোর পায়ে বুট পরিয়ে দেবে'।

এর ঠিক পরের বছর ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সঙ্গে রাশিয়া গিয়েছি। বিশ্ব-বিখ্যাত মসকো ডায়নামোর সঙ্গে আমাদের খেলা। দুদিন আগে থেকেই আমরা ভীত এবং সন্ত্রস্ত। তার ওপর এই দুদিন চলেছে একটানা ঝিরঝিরে বৃষ্টির সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া। খেলার দিন সকালে বৃষ্টি থেমে, অল্প রোদ উঠতেই ঠান্ডা গেল আরও বেড়ে। তিন চার জন ছাড়া দলের সবাই খালিপায়ের খেলোয়াড়। খেলার আগে লাইনে দাঁড়িয়ে দলের ক্যাপ্টেন আমেদ আমায় ঠাট্টা করে বলল, 'তুমিতো বেশ বুটপরে মজায় আছ। এদিকে ঠান্ডায় আমাদের পায়ের পাতা আর আঙুলগুলো জমে যাবার জোগাড়'

আমি বললাম, 'সবাইকে বুট পরতে বল না'। ও তাড়াতাড়ি মাথা নেড়ে বলল, 'আরে বাপ। একে ৯০ মিনিট খেলতে হবে, তার ওপর বুট! মর্ যায়গা।'

১৯৫৩ সালের সেপ্টেম্বরের সেই ম্লান অপরাহ্ণে, শোচনীয় পরাজয়ের গ্লানি দেহে এবং মনে জড়িয়ে, আমরা এগারো জন ফুটবলার একবাক্যে স্বীকার করলাম যে, আন্তর্জাতিক খেলায় খালিপায়ে ফুটবল খেলা এক কথায় অসম্ভব।

শীতের দেশের ছেলেদের প্রচণ্ড শীতের হাত থেকে বাঁচবার জন্য হরদম জুতো পরেই থাকতে হয়। এবং এই জুতো পরেই হাঁটা, দৌড়ানো, খেলা সব কিছুই করে বলে, উত্তর জীবনে ফুটবল-বুটের অতিরিক্ত ওজন টুকুর জন্য তারা আগে থেকেই অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

কিন্তু আমাদের মত গরম দেশে জুতো পরে সব সময় চলাফেরা করা বা পরে থাকা সম্ভব নয়। অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার জন্য ছেলেরা বছরে একজোড়ার বেশী জুতোও পায় না। তাই খেলোয়াড়-জীবনের শুরুতে বেশির ভাগ ছেলেকেই খালিপায়ে ফুটবল খেলা চালিয়ে যেতে হয়। কাজেই এ ব্যাপারে তাদের বিশেষ করে মনে রাখা দরকার যে, খালিপায়ে এবং বুট পরে খেলার ভেতর শুধু যে আঙ্গিকগত এবং কলাকৌশলেরই তফাৎ আছে তাই নয়, খাটুনির অনেক ফারাক আছে।

বুট পরে ফুটবল খেলা এদেশে আজ বাধ্যতামূলক। আগে খেলার সময় ছিল ৫০ মিনিট, এখন বাড়িয়ে লীগে করা হয়েছে ৭০ মিনিট এবং নক আউটে ৯০ মিনিট। এর ফলে আজকের ফুটবল আমাদের মত প্রচণ্ড গরমের এবং ঘাম প্যাচপ্যাচে আবহাওয়ার দেশে যে অতি শ্রমসাধ্য খেলা, সে বিষয়ে দ্বিমত নেই। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে একে 'ওভার এক্সারসাইজ' বলা চলে।

কাজেই যার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ নয়, তার এই ফুটবল খেলা শেখার চেষ্টা না করাই উচিত। কেন না এতে তার উপকারের বদলে অপকারের সম্ভাবনাই বেশী।

তাই অনুশীলন শুরু করার আগে রক্তের চাপ, হৃদপিণ্ড, ফুসফুস, লিভার এবং কিডনী ঠিকমত কাজ করছে কি না ডাক্তারের কাছে দেখিয়ে নেওয়া বিশেষ দরকার। চোখের এবং কানের যেন কোন দোষ না থাকে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত চশমা পরে ফুটবল খেলা রীতিমত ভয়ের কারণ ছিল। কিন্তু আজ 'কনট্যাক্ট লেন্স' ব্যবহারের ফলে যে কোন ফুটবলার চোখের দোষ নিয়েও ফুটবল খেলতে পারে। অবশ্য এটা কিছুটা ব্যয়সাপেক্ষ।

খারাপ দাঁত, পায়োরিয়া এবং দূষিত টনসিল ভবিষ্যতের জন্য খুবই খারাপ। বিশেষ করে এই রকম টনসিলের ক্ষেত্রে শুরুতেই অপারেশন করিয়ে নেওয়া ভাল। দাঁত যেন নিয়মিত পরিষ্কার এবং পেটের কোন গোলমাল যেন না থাকে।

এই ডাক্তারী পরীক্ষা খেলার সীজনেও ২।৩ মাস অন্তর একবার করিয়ে নেওয়া ভাল।

*

চল্লিশ জনের ভিতরও ছেলেটার জায়গা হল না। ক্যাম্প ছেড়ে বাড়ি যাবার সময়, আমার পায়ের ধুলো নিয়ে, জোড়-হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম 'কি চাও'?

ছেলেটি বলল, 'আপনি আমায় খালি প্র্যাকটিসের সুযোগটা দিন। এ ক্যাম্পের জলটুকুও খাব না'।

আমি বললাম, 'ক্যাম্পের ৪ জন গোলকীপারের পর তোমার চান্স কিন্তু, সেকথা মনে রেখ'।

ও তাতেই খুশী। ঘর ছেড়ে যাবার সময় ছেলেটিকে প্রশ্ন করলাম, 'তুমি এত মোটা হলে কি করে? বাবা মা মোটা?'

ছেলেটি বলল 'না'।

হেসে বললাম, 'খুব দুধ, ঘি, মিষ্টি-টিষ্টি খাও নাকি?'

ও মাথা নীচু করে বলল, 'আজ্ঞে আমাদের মিষ্টিরই দোকান'।

এর পরের বছর কটকে গিয়ে বিষ্টু বেহেরাকে প্রথমে চিনতেই পারিনি। সেই থলথলে চর্বি কোথায় গিয়ে একেবারে ছিপছিপে হয়ে গেছে। তার ওপর শুনলাম ও নাকি ওখানে এক নম্বর গোলকীপার হয়ে গেছে। অবাক হয়ে ওকে প্রশ্ন করলাম, 'কি ব্যাপার?'

পায়ের ধুলো নিয়ে, সেই রকম মাথা নীচু করে ছেলেটি হেসে বলল, 'আজ্ঞে দুধ, মিষ্টি, চিনি, আলু, এমনকি ভাতও আপনি বলার পর থেকে খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছি। খাওয়াও প্রায় অর্ধেক কমিয়ে দিয়েছি।'

ফুটবলারের কি রকম দেহ হওয়া উচিত? অর্থাৎ রোগা ছিপছিপে, না পেশীবহুল বলিষ্ঠ। থলথলে চর্বিওলা ছেলেদের দ্বারা কি ফুটবল খেলা সম্ভব? এই সব সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার আগে, দেহ বিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারে কি বলেন সেইটাই প্রথমে দেখা যাক।

দেহ বিজ্ঞানীরা বলেন, 'যদিও মানুষের 'বডি টাইপ' অর্থাৎ দেহ গঠনে অনেক রকমের শ্রেণী রয়েছে, তবু একে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যায়।

এক্টোমর্ফ:—

রোগা ছিপছিপে ধরনের। খেলার শরীরে অল্প আঘাত লাগলে এদের ভীষণ চোট লাগে। এরা তীব্র গতি-সম্পন্ন হয় বলে এবং শরীরের সংঘাতকে এড়িয়ে চলতে চায় বলে ফুটবলে উইং ফরোয়ার্ড হিসেবেই নাম করে।

মেসোমর্ফ:—

পেশী বহুল এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয় বলে এরা মোটামুটি আনন্দেই থাকে। এরা বেশী খেতেও পারে। তীব্র-গতি এদের না থাকলেও উইং ফরোয়ার্ড ছাড়া ফুটবল খেলার প্রায় সকল জায়গাতেই এদের দিয়ে খেলান যায়। এদের সম্বন্ধে একটা ভয়ের কারণ এই যে, এরা কিছুদিন খেলাধুলো থেকে বিশ্রাম নিলেই এদের শরীরে চর্বি লাগতে শুরু করে। যা এক্টোমর্ফদের ক্ষেত্রে দেখা যায় না।

এনডোমর্ফ:—

জন্ম থেকেই মোটা। বংশানুক্রমিক। চর্বির স্তর ভেদ করে শরীরে পেশীকে খুঁজেই পাওয়া যায় না। এদের দিয়ে ফুটবল খেলা এক কথায় অসম্ভব। তবে এদের স্বভাব সাধারণত হাসিখুশির হয় বলে, এরা ভাল ক্লাব কর্তৃপক্ষ হতে পারে। তবে এনডোমর্ফের ভিতরও মেসোমর্ফ লুকিয়ে থাকতে পারে। এবং এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ ছাড়া অন্যের পক্ষে বলা শক্ত।*

যদিও দেহের ওজন দ্বারা শারীরিক সুস্থতা ও দক্ষতা যাচাই করা হয়, তবুও বিজ্ঞান আজও সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এমন কোন নির্দিষ্ট মাপ দিতে পারেনি, যা দিয়ে বিচার করা চলে কে কম-ওজনী, আর কে বেশী-ওজনী। তার ওপর শীতের দেশের ফুটবলারদের ক্ষেত্রে যে

---

* ফিটনেস ফর স্পোর্ট—জি এ ম্যাকপার্টলীন।

মাপ মোটামুটি নির্দিষ্ট করা হয়েছে, ভারতের মত গরমের দেশের ফুটবলারদের ক্ষেত্রে সে মাপ অচল।

নীচের যে তালিকা দেওয়া হল—তাতে বয়সের কোন উল্লেখ নেই। শরীরের উচ্চতার সঙ্গে নিজের ওজন মিলিয়ে নিলেই বুঝতে পারা যাবে, শরীর সাধারণভাবে সুস্থ কি না।

ফুট	ইঞ্চি	পাউণ্ড সর্বনিম্ন	পাউণ্ড সর্বোচ্চ
৪	৯	৭৫	১৩০
৫	০	৮৪	১৪২
৫	৩	৯৩	১৫৪
৫	৬	১০২	১৬৯
৫	৯	১১১	১৮৪
৬	০	১২০	২০২

রেসের যে জকি'রা ঘোড়া চালায় তাদের দেহের ওজন সাত অথবা আট স্টোনের ভিতর প্রতি অবশ্যই রাখতে হয়। আবার যারা হেভিওয়েট মুষ্টিযোদ্ধা অথবা কুস্তিগীর তাদের দেহের ওজন ১২।১৩ স্টোনের নীচে হলে, তারা লড়তেই পারবে না। এইরকমভাবে প্রত্যেক খেলাকে আলাদা আলাদা ভাবে বিচার করলে দেখা যায় বিশেষ খেলাগুলোর জন্য বিশেষ ওজনের শরীর দরকার।

সেদিন ক্লাসে আলোচনার বিষয় ছিল কোচিং। ক্লাস নিচ্ছিলেন চেলসী ক্লাবের কোচ মিঃ উইলসন। ৪০-এর কাছাকাছি বয়স। দয়া করে আমাকেই ডেকে বসলেন। সত্যেই হল। আশা ছিল ভদ্রলোকের বয়স হয়েছে তার ওপর দৈহিক উচ্চতায় আমারই মত। কিন্তু কাজে দেখা গেল উল্টো। প্রত্যেকবার উনি আমার মাথার ওপর দিয়ে হেড দিলেন, সেই সঙ্গে তার বুকের ধাক্কায় প্রত্যেকবার আমি পড়ে যেতে লাগলাম। ক্লাসে হাসির মহড়া পড়ে গেল।

আমার লজ্জা কাটাবার জন্য শেষে উনি আমার পিঠ চাপড়ে বললেন, "বোকড়ে যেও না। তোমার শরীরের ওজন কত?" বললাম "দশ স্টোনের কাছাকাছি।"

হাত নেড়ে বললেন, "আন্তর্জাতিক মানের ফুটবলে বড় কম।" সাহস পেয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম "আপনার"?

উত্তর এল "এগারো স্টোনেরও ওপর।"

তখন মাটিতে পড়ে যাবার রহস্যটা পরিষ্কার হল আমার কাছে।

ফুটবলকে ইংরাজীতে বলা হয় বডি কনট্যাক্ট গেম। অর্থাৎ এ খেলায় একের সঙ্গে অন্যের দৈহিক সংঘর্ষের সম্ভাবনা সর্বদাই রয়েছে। যা ব্যাডমিন্টন, ভলি বা ক্রিকেটে নেই। তার ওপর এ খেলা শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সব ঋতুতেই খেলতে হয় বলে, খেলোয়াড়ের দেহের ওজনের গুরুত্বও অন্য খেলার চেয়ে অনেক বেশী।

যেমন ধরা যাক হকি খেলা। শুকনো মাঠে স্টিক দিয়ে, ছোট এবং ওজনে অনেক হাল্কা বল খেলা হয় বলে, এ খেলায় যে গতিবেগের দরকার, সেই তুলনায় শক্তির ভাগ অনেক কম। এর সঙ্গে জলকাদার মাঠে ফুটবল খেলার তুলনা করা যাক। বলের ওজন ১৪ থেকে ১৬ আউন্স। তার ওপর জলকাদায় ভিজে সেটা প্রায় দ্বিগুণ ভারী হয়ে যায়। তার সঙ্গে নরম কাদা মাঠে তীব্রবেগে ছোটবার দৈহিক প্রতিবন্ধকতাও রয়েছে। কাজে কাজেই এই যে প্রচুর শক্তি প্রয়োজনীয় মুহূর্তে দরকার হয়, সেটা পাওয়া সম্ভব তার শক্তির ভাঁড়ার ঘর—শরীরের ওজন থেকে। তাই শারীরিক দক্ষতা ও দেহের ওজন পরস্পর অঙ্গাঙ্গী-ভাবে জড়িত।

আগের তালিকায় সাধারণভাবে সুস্থ শরীরের ওজনের মাপ দেওয়া হয়েছে, যা দিয়ে ফুটবল অনুশীলন শুরু করা যেতে পারে। নীচের তালিকায় দেখানো হচ্ছে সার্থক ফুটবলার হতে হলে কতটা দেহের ওজন থাকা দরকার—

ফুট—ইঞ্চি		বয়স ১৫—১৯	বয়স ২০—২৪	বয়স ২৫—২৯
৪	১১	১০৬ পাঃ	১১২ পাঃ	১১৭ পাঃ
৫	০	১০৮ পাঃ	১১৪ পাঃ	১১৯ পাঃ
৫	১	১১০ পাঃ	১১৬ পাঃ	১২১ পাঃ
৫	২	১১৩ পাঃ	১১৯ পাঃ	১২৩ পাঃ
৫	৩	১১৬ পাঃ	১২২ পাঃ	১২৬ পাঃ
৫	৪	১১৯ পাঃ	১২৬ পাঃ	১২৯ পাঃ
৫	৫	১২৩ পাঃ	১৩০ পাঃ	১৩৩ পাঃ
৫	৬	১২৭ পাঃ	১৩৪ পাঃ	১৩৭ পাঃ
৫	৭	১৩১ পাঃ	১৩৭ পাঃ	১৪১ পাঃ
৫	৮	১৩৫ পাঃ	১৪১ পাঃ	১৪৫ পাঃ
৫	৯	১৩৯ পাঃ	১৪৫ পাঃ	১৪৯ পাঃ
৫	১০	১৪৩ পাঃ	১৪৯ পাঃ	১৫৩ পাঃ
৫	১১	১৪৮ পাঃ	১৫৩ পাঃ	১৫৮ পাঃ
৬	০	১৫৩ পাঃ	১৫৮ পাঃ	১৬৪ পাঃ

অনুশীলন চলাকালীন অথবা ফুটবল সীজনের সময় পনেরো দিন অন্তর এই মাপের সঙ্গে নিজের দেহের ওজন মিলিয়ে নিতে হয়। যদি দেখা যায় দেহের ওজন ৫ পাউণ্ড কমে গেছে, তা হলে উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই। আর এর থেকেও বেশি কমে, তাহলে বুঝতে হবে অতি পরিশ্রমের জন্য শরীরের ভিতর ক্ষয় শুরু হয়েছে। যার পূরণ হচ্ছে না। সে ক্ষেত্রে খেলা অথবা অনুশীলন কয়েকদিন বন্ধ করে শরীরকে পূর্ণ বিশ্রাম দিলেই শরীর আগের ওজনে ফিরে যাবে।

শরীরের ওজন যদি প্রচুর অনুশীলন ও যথা নিয়মিত খেলাতেও অপরিবর্তিতই থাকে, তা হলে চিন্তা করবার কোনও কারণ নেই। কেন না একেই ফুটবলে আদর্শ দেহ বলা হয়।

ক্রমশ

* লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া।

* প্রিন্সিপ্যাল অ্যাণ্ড প্র্যাকটিস অব মেডিসিন—স্যার স্ট্যানলী ডেভিডসন।

DOL 327 BEN

ভিন্ন ভিন্ন জাত সম্বন্ধে পৃথিবীর লোক কতগুলো ধারণা করে বসে আছে। যেমন স্কচ্ কিপ্টে, ফরাসী দুশ্চরিত্র, জর্মন ভোঁতা, ইংরেজ অবিশ্বাসী এমনকি প্রখ্যাত ফরাসী সাংবাদিকা মাদাম তাবুই-র একখানা বই আছে যার শিরোনামা "লা পেরফিড আলবিয়োঁ" (বিশ্বাসঘাতক ইংরেজ) দিয়ে আরম্ভ! (অবশ্য তিনি তাঁর পুস্তকে প্রমাণ করার চেষ্টা দিয়েছেন যে এ "কুসংস্কারের" জন্য ইংরেজ সম্পূর্ণ দায়ী নয়, ফরাসীও অনেকখানি)।

এ রকম ঢালাও "জাতবিচার" থেকে ঐ যে ধারকর্জ দেনেওলা আমাদের নিরীহ কলকাত্তাই পাঠানও (চলতি ভাষায় কাবুলী-ওয়ালা) মুক্ত নয়। আমাদের পার্ক সার্কাসের বাড়িতে আসতো দুই ঈদের দিনে এক পাঠান। একবার কথায় কথায় বললে, "আপকা কলকাত্তা শহরমে বহুৎ আচ্ছা আলু, চান্না হোতা হৈ।" আমরা তো অবাক—কলকাতা শহরের রাস্তার উপর যত লক্ষ লক্ষ গভীর গর্ত থাক না কেন কোনোটাতেই তো আজ অবধি আলু বা চানা ফলতে দেখিনি—সরকারের "অধিক ফসল ফলাও" কান ঝালাপালা-করা প্রপগাণ্ডা সত্ত্বেও! পাঠান ফের বললে, "ঘর ঘর মেঁ।" আমরা তো আরো সাত হাত পানীমেঁ। শেষটায় বোঝা গেল পাঠান "আলু, চান্না" বলাতে "আলোচনা" বোঝাতে চেয়েছিল।

পাঠানের এই ঢালাও জাতিবিচার কিন্তু এ-স্থলে ভুল নয়। রকবাজি আড্ডাবাজিতে কলকাত্তাইরা এখনো অলিম্পিকের গোল্ড মেডেল ধারণ করে। এই যে হালে আমরা নিউজীল্যাণ্ডের সঙ্গে ক্রিকেট "খেললুম" ঠিক তার উল্টোটি। ক্রিকেটের সঙ্গে তুলনা দিয়ে বলতে হলে আমাদের রক-আড্ডাবাজীর টীমে আছেন চারটে রণজী, তিনটে ব্র্যাডম্যান, দুটো লারউড, একটা নিসার আর গুরুগুলির জন্য ঐ একটা বসান্‌কে। তা সে-কথা থাক। পাঠান বাস করে খাঁটি বাঙালী পাড়ায়—সাম্‌-বাজারে। রাস্তার পর রাস্তা পেরুতে পেরুতে সুবো-শাম নিত্যি নিত্যি দু পাশে দেখে রকের পর রক—মহাসভা, কানে যায় আলু চান্না।

কিন্তু পাঠানের দ্বিতীয় জাত বিচারটা একদম ভুল বেরুলো। বললে, "কলকত্তেমে বহুৎ অচ্ছী ফার্সী বোলী জাতী—হর রাস্তে পর।" বলে কি? আলু আর চানা তবু না হয় বুঝি: হয়তো বা পাঠান কলকাতার মুদীর দোকানে ঐ দুই বস্তু অত্যুত্তম সরেস জাতের পেয়েছিল। কিন্তু কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় "অচ্ছী ফার্সী" বলা হয় এটা কেমনতর? পাঠান বোঝালে, দিনে অন্তত এক শ বার সে শুনতে পায় বহু কণ্ঠে, কিন্তু সর্বদাই অনবদ্য ফার্সী উচ্চারণে "ব্‌-তালাশে বক্রী"। এ-স্থলে বাঙালী পাঠককে বোঝাই "ব্‌"=with এবং for (যেমন ব্‌ কলমে-বকলমে শেখ ফিরোজ, বা ব্‌ হাল=বহাল তবিয়ৎ, ব্‌মাল= বমাল গ্রেফতার); "তালাশ"=তল্লাসি; এবং "বক্রী"=ছাগল। অর্থাৎ কোনো লোক বক্রীর তল্লাসীতে (for বক্রী) বেরিয়েছে।

এ কি কথা!! আমরা তো কখনো শুনি নি।

এমন সময় বাইরে ফেরিওলার হাঁক শোনা গেল। পাঠান লম্ফ দিয়ে সোল্লাসে বললে "ঐ তো বলছে ব্‌-তালাশে বক্রী।"

ওমা! ইয়াল্লা। ওহরি। ফেরিওলা চেঁচাচ্ছে "বোতল আছে বিক্রী!"

তাই বলছিলুম, এস্থলে পাঠানের জাত বিচারে ভুল হয়ে গেল।

*

এগুলোর নিষ্পত্তি তো সহজেই হয়ে গেল। কিন্তু অন্যগুলোর বেলা? যেমন মনে করুন, লোকে বলে ফ্রান্সের লোক অসচ্চরিত্র। এবং সেই সূত্রে বহু বহু চুটকিলা প্রচলিত আছে। তারই একটি:

এক ফরাসী নিমন্ত্রিত হয়েছে এক মার্কিন পরিবারে। বিস্তর হইহুল্লোড়। ফরাসী সঠিক বুঝতে পারেনি পরবটা কিসের। পাশে বসেছিল এক মার্কিন। তাকে কানে কানে শুধলো "ব্যাপারটা কি?" মার্কিন বুঝিয়ে বললে "ঐ যে দেখতে পাচ্ছেন বুড়ো বুড়ি—এঁরা পঞ্চাশ বৎসর সুখে সহবাস করার পর আজ তাঁদের "বিবাহের সুবর্ণজয়ন্তী" পালন করছেন।" ফরাসী বললে, "অ। বুঝেছি। এঁরা পঞ্চাশ বছর সহবাস করার পর এই এখন বিয়ে করতে যাচ্ছেন।" তারপর খানেকক্ষণ ঘাড় চুলকে বললো, "তা—তা—ঐ নিয়ে এত তুলকালাম কাণ্ড কেন? আমরা তো আকছারই করে থাকি।"

পাঠানের গল্প যে-রকম "জাতি-বিচারের" ব্যাপারে পরখ করা গেল, এখানে তো তা

করা যাচ্ছে না। তবে কি সত্যিই হুদো হুদো ফরাসী ত্রিশ চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর সহবাস করার পর বিয়ে করে? প্রধানত জারজ সন্তানদের আইনমত সন্তান রূপে স্বীকৃতি দেবার জন্য?

কিন্তু এ-বিষয়ে ফরাসীদের নিয়েই এ-গল্পটা তৈরি হল কেন?

আমরা একটি সত্য ঘটনা জানি, এবং সেটা অস্ট্রিয়া দেশের ব্যাপার।

জনৈক অস্ট্রিয়ার লোক, য়োহান গেওর্গ হিটলার যখন একটি "কুমারী"কে বিয়ে করলেন, তখন সেই "কুমারী"র একটি পাঁচ বছর বয়সের ছেলে ছিল। বিয়ের পাঁচ বছর পর ঐ মহিলার মৃত্যু হয়। সঙ্গে সঙ্গে য়োহান হিটলার অস্ট্রিয়া থেকে অন্তর্ধান করলেন। তার সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর পর তিনি আবার ফিরে এলেন মাতৃভূমিতে এবং একজন উকিল ও দুজন সাক্ষীর সামনে শপথ নিয়ে বললেন, তাঁর বিয়ের পাঁচ বছর পূর্বে ঐ যে সন্তান জন্মেছিল সে তাঁরই ঔরসের সন্তান।

এই লোকটিই জার্মানীর ফুরার আডলফ হিটলারের পিতা।*

*

এতক্ষণ ধরে আমি শুধু পটভূমি নির্মাণ করছিলুম। এই বারে দেখি, সেয়ানা পাঠক, তোমার পেটে এলেম কতখানি।

মার্কিনরা চাঁদে গেছে শুনে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের আত্মসম্মানবোধ হুঙ্কার দিয়ে বললে, "ভারতীয়েরাও যাবে।" কিন্তু শ্রীযুত সত্যেন বসু এ-বাবদে উদাসীন। এই কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন বেরুলো, "চাঁদে যাঁরা যেতে চান তাঁরা আবেদন করুন।" বিস্তর দরখাস্ত এল। শেষ পর্যন্ত মাত্র তিনজনকে ইন্টারভ্যুর জন্য ডাকা হল। একজন বাঙালী, বাকি দুজন দুই ভিন্ন প্রদেশের।

যে-কর্তা ইন্টারভ্যু নিচ্ছিলেন তিনি প্রথম ডেকে পাঠালেন বাঙালীকে। শুধোলেন, "চাঁদে যাওয়ার জন্য কত টাকা চান?"

"পাঁচ লাখ।"।

"অত কেন?"

"এজ্ঞে, বুড়ো মা বাপ রয়েছেন। বোনটির বিয়ে দিতে হবে। দুটো ছোট ভাই ইস্কুলে যায়। বিধবা পিসিও রয়েছেন। চাঁদ থেকে ফিরে না আসতে পারলে ঐ টাকাতেই তাদের চলে যাবে।"

কর্তা : "আচ্ছা, পরে জানাবো।" তার পর ডাকা হল দ্বিতীয় জনকে। সে-প্রদেশের লোক একটু ফুর্তিফার্তি করতে ভালোবাসে। সে বললে, "দশ লাখ।"

কর্তা "অত কেন?"

"হানজী, পাঁচ লাখ দিয়ে মদ্যপানাদি, কাবারে গমন, হেঁ হেঁ—রমণীসঙ্গ ইত্যাদি ইত্যাদি। ফিরে তো নাও আসতে পারি; তাই সর্বশেষ শখটাও। বাকি পাঁচ লাখ রেখে যাবো বুড়ো মা, বাপ, অবিবাহিতা ভগ্নী, দুই ভাই, বিধবা পিসির জন্য।"

কর্তা : "আচ্ছা, পরে জানাবো।"

এর পর এলেন তৃতীয় এক প্রদেশের লোক। ইনি চাইলেন পনেরো লাখ।

কর্তা তাজ্জব মেনে বললেন, "অত বেশী কেন"

সঙ্গে সঙ্গে লোকটি ডাইনে বাঁয়ে, দরজার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে, টেবিলের উপর ঝুঁকে ফিস ফিস করে বললে,

"বাবুজী, পনেরো লাখের পাঁচ লাখ তো তোমার। পাঁচ লাখ আমার। আর বাকি পাঁচ লাখ টাকা দিয়ে ঐ ব্যাটা বাঙালীকে চাঁদে পাঠিয়ে দেব।

*

এই বারে পাঠক, বের করো তো, দোসরা আর তেসরা ওমেদার কোন্ কোন্ প্রদেশের লোক? কিন্তু সাবধান! "দেশ" সম্পাদককে এ-বাবদে চিঠি দেবেন না। তিনি ছাপবেন না। আমাকেও লিখবেন না। আমো উত্তর দেব না।

*W. Shirer; Aufstieg unid Fall in S.W., পৃ. ৭।

সেদিন কথায় কথায় দিলীপ বলছিলো—
"আমি জেতাতে মার সেকি আনন্দ যদি দেখতেন!"
Cadbury's
Bournvita
the ideal food drink for strength and vigour
450g net
Q772-Ben

আন্তর্জাতিক খাদ্য ও কৃষি সংস্থার নতুন পরিকল্পনা

রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (F. A. O.) একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষায় প্রকাশ পেয়েছে যে, আগামী পনের বছরে জনসংখ্যা ২·৫ থেকে ৩ শতাংশ হারে বাড়বে। এই সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য অনগ্রসর দেশগুলিকে পাঁচটি জিনিসের উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। সেগুলি হচ্ছে, (১) বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা, (২) খাদ্যসামগ্রীর মান উন্নত করা, (৩) আরও বেশী করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা, (৪) কৃষিক্ষেত্রে আরও কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা করা, এবং (৫) জমি ও জলশক্তির ব্যবহার আরও নিবিড় করা। অনেকে মনে করেন, মহাসাগরের ভিতর রয়ে গেছে প্রোটিনযুক্ত খাদ্যসম্ভারের উৎস; কিন্তু খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সমীক্ষায় বলা হয়েছে, এই ধারণা অলীক। এই সমীক্ষায় বলা হয়েছে কলাকৌশল সংক্রান্ত বিপ্লবের (Technological Revolution) পক্ষে সবচেয়ে বেশী ভয়ের কারণ এই যে, কৃষি-অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল লোকের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যাওয়ায় একটি সামাজিক বিশৃংখলার সৃষ্টি হতে পারে। সমীক্ষায় আরও বলা হয়েছে, অনগ্রসর দেশগুলি যাতে বেশী করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারে সেজন্য উন্নয়মান দেশগুলিকে কৃষিজাত সামগ্রীর রপ্তানি বাড়াবার আরও সুযোগ দেওয়া উচিত, যাতে উন্নত দেশগুলির সঙ্গে তাদের প্রতিযোগিতায় হেরে যেতে না হয়। খাদ্য ও কৃষি সংস্থার মতে, ধনী দেশগুলিকে (কমিউনিস্ট দেশগুলি সহ) অনগ্রসর দেশগুলির রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য আরও সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

আন্তর্জাতিক খাদ্য ও কৃষি সংস্থার এই সমীক্ষা ভারতের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভারতে যে অর্থনৈতিক পরি-কল্পনার কাজ এগিয়ে চলেছে তার দীর্ঘ-কালীন লক্ষ্য হচ্ছে দেশের সুষম উন্নয়ন (balanced growth)। সুষম উন্নয়ন যাতে আসতে পারে সেজন্য স্বল্পকালীন ভিত্তিতে প্রয়োজনভিত্তিক উৎপাদন পদ্ধতিও ভারতে প্রযুক্ত হয়েছে। ভারতে আজ বেকার সমস্যা এবং খাদ্য সমস্যাই সবচেয়ে বড় সমস্যা। খাদ্য আমদানি করে হয়ত সাময়িকভাবে খাদ্য সমস্যার তীব্রতা কমানো যায়; কিন্তু বেকার সমস্যার সমাধান করতে হলে চাই দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সেই সঙ্গে কর্মসংস্থানের ব্যাপক সম্প্রসারণ। জনসংখ্যা বেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে কৃষির উপর অত্যধিক চাপ বাড়ছে, এবং তার ফলে এক দিকে যেমন বর্ধিত জনসমষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রীর চাহিদা বাড়ছে, অপর দিকে তেমনি নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির সমস্যাও তীব্রতর হচ্ছে। খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জন না করা পর্যন্ত আমাদের বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানি করতেই হবে। পি এল ৪৮০ অনুযায়ী যে খাদ্য আমদানি করা হয় তার জন্য বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করতে হয় না বটে; কিন্তু যে ঋণ ভারতকে পরিশোধ করতে হয়, তা ভারতীয় টাকায় ভারতের মধ্যেই পরিশোধ করতে হয় বলে মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা রয়ে গেছে। এই প্রকল্প বাদে অন্য যে-কোন প্রকার খাদ্য আমদানির জন্য ভারতকে বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করতে হয়; অথচ যে দুর্লভ বৈদেশিক মুদ্রা খাদ্যশস্য আমদানির জন্য খরচ করা হয় তার সাহায্যে শিল্পোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানি করা যেত। আন্তর্জাতিক খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সমীক্ষায় অনগ্রসর দেশগুলির জন্য যে পাঁচটি লক্ষ্যের কথা বলা হয়েছে সেগুলি ভারতের পক্ষে সর্বথা গ্রহণযোগ্য। কৃষি-উন্নয়নের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা যদি ভারত চালিয়ে না যায়, তবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন আরও পিছিয়ে যাবে। শুধু কত-গুলি ইস্পাত কারখানাই দেশের উন্নতির একমাত্র পরিচায়ক নয়। দেশের লক্ষ লক্ষ লোকের কাজের এবং আহার্যের ব্যবস্থা না করে কোনও উন্নয়নই সার্থক হতে পারে না। এজন্যই খাদ্য ও কৃষি সংস্থার এই সমীক্ষা ভারতের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের জাতীয় আয়ের সবচেয়ে বড় উৎস কৃষিক্ষেত্র। জাতীয় আয় যদি আরও বাড়াতে হয় এবং সেই সঙ্গে যদি দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাকে স্থায়ীভাবে কায়েম করতে হয় তবে কৃষির উন্নতিকে বর্তমানে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান অঙ্গ বলে গণ্য করতে হবে। খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সুপারিশ ভারতে গৃহীত হবে বলেই আশা করা যায়।

রপ্তানি সম্প্রসারণের প্রচার-কাজে আরও বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন

আমাদের রপ্তানি বাণিজ্য ক্রমেই সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং আশা করা যায়, চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে হয়ত শতকরা অন্তত আট হারে রপ্তানি বাড়ানো সম্ভব হবে। যদিও রপ্তানির সম্প্রসারণ আশা-ব্যঞ্জক, তবুও রপ্তানি বাড়াবার জন্য প্রচার-কাজের গুরুত্ব মোটেই কমেনি। ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলি রপ্তানি সম্প্র-সারণ সংক্রান্ত প্রচার-কাজ চালাবার জন্য আরও বৈদেশিক মুদ্রার পারমিটের জন্য বহু দিন ধরে আবেদন করছে। সম্প্রতি ভারতের ফলিত অর্থনীতিক গবেষণার জাতীয় পরিষদও (National Council of Applied Economic Research) এই প্রস্তাব সমর্থন করেছে। এই পরিষদের মতে, পাট, চা এবং তামাকের ক্ষেত্রে পূর্ব-বর্তী বছরের রপ্তানি-বিক্রয়ের শতকরা ০·৫ ভাগ, ইঞ্জিনিয়ারিং সামগ্রী, হস্ত-জাত সামগ্রী, রাসায়নিক সামগ্রী ও সেই-গুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সামগ্রীর ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের রপ্তানি-বিক্রয়ের শত-করা ২ ভাগ, এবং ইস্পাত, চিনি, হীরা এবং অনুরূপ সামগ্রীর ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের রপ্তানি-বিক্রয়ের শতকরা ১ ভাগ সাধারণভাবে রপ্তানি বৃদ্ধির প্রচার-কাজ চালাবার জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা বরাদ্দের ভিত্তি হওয়া উচিত। রপ্তানিকারীগণ যাতে এই বৈদেশিক মুদ্রার সাহায্যে বিদেশে রপ্তানি বাড়াবার কর্মসূচী গ্রহণ এবং প্রয়োজনীয় নমুনা সংগ্রহের জন্য আমদানির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন সেজন্য তাঁদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। পরিষদের মতে, এই ধরনের প্রচার-কাজের জন্য প্রতি বছর অন্তত ১২ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা খরচ হবে। বিভিন্ন শিল্প যৌথভাবে এই প্রচার-কাজে অংশ গ্রহণ করতে পারে কিনা তার সম্ভাব্যতার কথাও পরিষদ চিন্তা করছে। এজন্য প্রতি এক শত টাকা রপ্তানি-আয়ের উপর এক টাকা হারে সারচার্জ বসাবার প্রস্তাবও পরিষদ দিয়েছে, এবং পরিষদের হিসাব অনুযায়ী এভাবে ১৩ কোটি টাকা বর্তমানে পাওয়া যাবে; রপ্তানির পরিমাণ যত বাড়বে, তত এই টাকার পরিমাণও বাড়বে। কিভাবে বিদেশে প্রচার-কাজ চালানো হবে সেই সম্পর্কেও পরিষদ চিন্তা করছে। যে-কোন সাধারণ রপ্তানিকারী বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ছাড়া এ ধরনের প্রচার-কাজে সাফল্য অর্জন করতে পারবে বলে মনে হয় না। কিন্তু সবচেয়ে বড় অসুবিধা

হচ্ছে বিদেশের বাজারে প্রতিনিয়ত চাহিদার পরিবর্তন কিরূপ হচ্ছে এবং বিদেশে নতুন রপ্তানি বাজার খোলার জন্য জ্ঞাতব্য বিষয় যা যা আছে সে সম্পর্কে সর্বশেষ খবরাদি সংগ্রহের ব্যবস্থা আমাদের দেশে এখনও ভালভাবে চালু হয়নি। বিদেশে আমাদের যে বৈদেশিক দূতাবাসগুলি আছে তাদেরই উচিত রপ্তানি প্রচারের জন্য জ্ঞাতব্য বিষয় সম্পর্কিত সর্বশেষ তথ্যাদি নিয়মিতভাবে সরবরাহ করা। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় যোগদান করে ভারত যে লাভবান হয়নি তা নয়। তবুও অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশ নিজেদের রপ্তানি-বাজার সম্প্রসারিত করার জন্য প্রচার-কাজে যতটা অর্থ ব্যয় করে ভারত ততটা করতে পারছে না। কিন্তু যদি ভারত এই খাতে বৈদেশিক মুদ্রার বরাদ্দ বাড়াতে পারে তবে যে স্টল অথবা প্যাভিলিয়ন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় খোলা হয় সেগুলির অঙ্গসজ্জা, উপস্থাপনা আরও চিত্তাকর্ষক করা সম্ভব হবে। এ ক্ষেত্রে ভারত সরকার বিশেষজ্ঞদের উপদেশের উপর আরও বেশী নির্ভরশীল হতে পারেন।

—সুব্রত গুপ্ত

নোংরা, জরাজীর্ণ, অস্বাস্থ্যকর! কলকাতা শহর দেশ ও বিদেশবাসীর কাছ থেকে গত কয়েক বছর যাবৎ শুধু নিন্দাবাদই শুনে আসছে। সত্যিই কি কঙ্কাল ও জনারণ্য ছাড়া এ শহরে দেখবার বা উপভোগ করার কিছুই নেই? যাঁরা কলকাতায় আসেন তাঁদের চোখে এ শহরের অন্য কোনও রূপই কি চোখে পড়ে না? সম্ভবত এই শ্রেণীর দেশ ও বিদেশবাসীদের ভ্রান্ত ধারণা দূর করার জন্যই পূজোর সময়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন বিভাগ Festival of Calcutta বা কলকাতা উৎসবের আয়োজন করেন। সেইদিনের কার্যতালিকায় এতে লৌকিক বিভিন্ন গ্রাম্য ও লোকসঙ্গীত, নৃত্য, যাত্রা, সিনেমা ও থিয়েটার অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয় এবং সেই সঙ্গে পুষ্পসজ্জা ও চিত্রকলা প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়। এক কথায় পূজা উপলক্ষে আগত দেশী-বিদেশী অতিথিদের কলকাতা শহরের অন্য রূপ ও ঐশ্বর্য দেখাবার জন্য বাংলা দেশের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বিভিন্ন রস পরিবেশন করা হয়।

কথায় বলে বাংলা দেশে বার মাসে তের পার্বণ। তবে এগুলি পূজাপার্বণ কেবল মাত্র পুষ্প ও পত্রসজ্জার মধ্য দিয়ে কি ভাবে রূপায়িত করা যায় তথ্যকেন্দ্রে শ্রীমতী উমা বসু পরিচালিত কুসুমিকার প্রদর্শনীতে তার পরিচয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন লতাপাতা, ফুল ও প্রয়োজনমত অতি সাধারণ জিনিস সহযোগে নানা পূজাপার্বণের রূপদান কুসুমিকার ছাত্রীবৃন্দ যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তা দেখে অনেকেই মুগ্ধ হন। সব চেয়ে বড় কথা, প্রত্যেকটি পুষ্পসজ্জারীতির মধ্য দিয়েই বিশেষ কোনও পালপার্বণ যেন এক একটি প্রতীকের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। কাঠের খোদাইকরা পেঁচা ও গাছকৌটোর সঙ্গে কুনকে, ধানের শীষ ও ফুল এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে দেখামাত্রই মনে হয় বুঝি লক্ষ্মীপূজোর জন্যই এই বিশেষ সজ্জারীতির পরিকল্পনা। এই প্রসঙ্গে রথযাত্রা, হোলি, জামাইষষ্ঠী ও বিশেষ করে দীপাবলী উৎসবের জন্য রচিত কম্পোজিশন জাতীয় সজ্জা-নিদর্শন উল্লেখযোগ্য। গভীর কালো রঙের প্লাইউডের ওপর ঘাসজাতীয় শীষ ও ঘাসের সাধারণ ফুল নীচে থেকে ওপর পর্যন্ত নানাভাবে সাজিয়ে শ্রীমতী বসু অমানিশার অন্ধকার রাত্রির বুকে উড়ন্ত আতসবাজী ও জ্বলন্ত ফুলঝুরির আলোকচ্ছটার রূপ প্রকাশ করেছেন। সজ্জারীতি ও পরিকল্পনা হিসাবে এটি অপরূপ নিদর্শন। প্রত্যেকটি রীতির মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে শিল্পীর রুচি ও শুদ্ধ সৌন্দর্যবোধ। যাঁরা প্রবাসী তাঁরা বাংলা দেশের বিভিন্ন উৎসবের সময়ে এ জাতীয় পুষ্পসজ্জার মধ্য দিয়ে নিজ দেশের পূজো ও পাল পার্বণের বৈশিষ্ট্যটুকু বজায় রাখতে পারেন। বলা বাহুল্য, বাংলা দেশের নিজস্ব আলপনার রেখা-বৈচিত্র্যের সঙ্গে এ জাতীয় পুষ্পসজ্জারীতি পূজো তথা উৎসবের শোভা বহুগুণে বাড়িয়ে দেবে।

কলকাতা উৎসব উপলক্ষে অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে একটি চিত্র-প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা হয়। কার্যসূচিতে লেখা ছিল—দুর্গাপ্রতিমা ও পুরোনো কলকাতার ছবির প্রদর্শনী। নামকরণটি ঠিক হয়নি—কারণ প্রদর্শনীতে কোনও প্রতিমা চোখে পড়েনি, দ্বিতীয়তঃ, পুরোনো কলকাতার ছবির সংখ্যাও ছিল সামান্য।

রাজনীতির ক্ষেত্রে ও দেশের সামাজিক ও জাতীয় জীবনে কলকাতা শহরের একটি বিশেষ মূল্য আছে। সুতরাং এক বা দুই শতক পূর্বে এই কলকাতার কি রূপ বা বৈশিষ্ট্য ছিল অনেকেই সেটা জানতে আগ্রহী হন। তবে প্রদর্শনীতে যে ছবিগুলি দেখা যায় সেগুলি এনগ্রেভিং-এর প্রতিলিপি। ১৮ ও ১৯ শতকে কয়েকজন ইংরাজ ও ফরাসী শিল্পী এগুলি রচনা করেন। প্রদর্শনীতে এ জাতীয় ৫০টি প্রতিলিপি দেখা যায়। শিল্পীদের মধ্যে চার্লস ডাঅয়েল, জেমস ফ্রেজার ও জোহান জোফানির নাম উল্লেখযোগ্য। বাস্তবানুগ হলেও সূক্ষ্ম ও সুন্দর খোদাই কাজে তদানীন্তন ইউরোপীয় গ্রাফিক কলাধারার পরিচয় পাওয়া যায় ও এগুলি অনেকেরই ভাল লাগে। পুরানো আমলের গবর্নমেন্ট হাউস, সেন্ট পলস ক্যাথিড্র্যাল, ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীট, গঙ্গাতীরস্থ ব্যাণ্ডেল, সিরামপুর রোডের প্রিন্টে তদানীন্তন শহর ও আবেষ্টনীর বৈশিষ্ট্য দেখে অনেকেই কৌতূহল প্রকাশ করেন। তাছাড়া ভারতের বিভিন্ন শহর সেরিঙ্গাপটম, বাঙ্গালোর, জৌনপুর, দিল্লী ও এলাহাবাদের নানা মসজিদ ও দুর্গের প্রিন্টও দেখা যায়। বিশেষ করে লর্ড অকল্যান্ড ভগ্নী এমিলি ইডেন-এর আঁকা প্রতিকৃতি জাতীয় রচনা সকলেরই চোখে পড়ে।

প্রদর্শনীর অন্য দিকে দীপেন বসু ও চিত্তভূষণ রায়ের জলরঙে আঁকা কয়েকটি দুর্গা ও কালীর ছবি দেখা যায়। পরলোকগত দীপেন বসু দুর্গার বিভিন্ন আলেখ্য এঁকে সুনাম অর্জন করেন এবং ইতিপূর্বে অনেকেই এই নিদর্শনগুলি দেখে থাকবেন—তা সত্ত্বেও পূজা উপলক্ষে গণেশ জননী বা গঙ্গাবতরণ অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চিত্তভূষণ রায়ের কালী ও তারা উল্লেখযোগ্য।

প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে অবশ্য পর্যটন বিভাগের নতুন উদ্যম প্রশংসনীয়। তবে দেখে মনে হয় অল্প সময়ের মধ্যে প্রদর্শনীটির আয়োজন করা হয়েছে। পুরোনো আমলের ছবি হিসাবে উড ও ডেনীর রচনা-নিদর্শন এবং সেই সঙ্গে বাঁকুড়া ও বীরভূমের দুর্গার পুরোনো পটচিত্র থাকলে প্রদর্শনীটি সার্থকতর হয়ে উঠত। তাছাড়া একটি সমকালীন কলা ও ভাস্কর্য প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করলে পূজা উপলক্ষে আগত দেশী ও বিদেশী পর্যটকবৃন্দ দেশের সমসাময়িক চিত্রকলাধারার পরিচয় পেতেন—হয়ত বা কয়েকটি ছবি তাঁরা কিনতেও পারতেন। আশা করি ভবিষ্যতে উদ্যোক্তাগণ এ বিষয়ে অবহিত হবেন।

*

দিল্লী আর্ট স্কুলের ছাত্র সর্বজিৎ সিং ও এ কে পট্টিময়, সম্প্রতি অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। প্রদর্শনীতে ছবি, কাঠখোদাই ও ভাস্কর্যের মোট ২২টি নিদর্শন দেখা যায়।

দুজনেই ছাত্র সুতরাং উভয়ের কাজেই শিক্ষার্থীসুলভ দুর্বলতা চোখে পড়ে। সর্বজিৎ সিং তেল, জলরঙ ও প্যাস্টেল ব্যবহার করেছেন। তবে কোনও মাধ্যমই তিনি এখনও সঠিক আয়ত্ত করতে পারেননি। তাহলেও ইডেন গার্ডেন্স মন্দ লাগে না। তবে কাঠখোদাই ও ভাস্কর্যে তাঁর হাত অপেক্ষাকৃত ভাল মনে হয়। এই প্রসঙ্গে 'মাস্ক', 'সিলুয়েট'-এর নাম করা চলে। পট্টিময়ারও কাঠখোদাই-এ নৈপুণ্য দেখা যায়, যেমন চ্যারিয়ট ফেস্টিভ্যাল। তবে হর্স রেস আবার এই প্রদর্শনীতে কেন রাখা হল জানি না—কারণ বেশ মনে আছে, বিড়লা অ্যাকাডেমিতে অনুষ্ঠিত গত বছরের প্রদর্শনীতে এটি দেখেছি।

*

Amulspray

*

শিল্পী অশোক দেব সম্প্রতি অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে তাঁর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। প্রদর্শনীতে তেলরঙে আঁকা ২১টি ছবি দেখা যায়।

অশোক দেব যে উজ্জ্বল ও সোচ্চার রঙ ব্যবহার করতে ভালবাসেন তা তাঁর রচনা দেখলেই বোঝা যায়—বিশেষ করে লাল ও নীল রঙের প্রাধান্য কমবেশী প্রত্যেক ছবিতেই দেখা যায়। রীতির দিক থেকে বিচার করলে তাঁর রচনাকে সমকালীন বলা চলে। চিন্তাধারা ও পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি নানা বিষয়বস্তু এঁকে গেছেন, তবে তাঁর ছবিগুলিতে সমসাময়িক ধারার বৈশিষ্ট্য থাকলেও সেগুলিকে ঠিক বিমূর্ত বা রিয়ালিস্টিকও বলা চলে না। সাধারণত মোটা রেখার দ্বারা তিনি বিভিন্ন বস্তু বা মূর্তির বহিরবয়বের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন মাত্র, বাকিটুকু বিভিন্ন রঙ মিশ্রণে সমাপ্ত করেছেন। কয়েকটি ছবি দেখে মনে হয় রঙের ওপর প্রাধান্য দেবার ফলে অনেক স্থলে তিনি প্রাথমিক অঙ্কনধারার দিকে নজর দিতে পারেন নি—যেমন সঙ অব এন্টিনেস। আলোক-উদ্ভাসিত স্ফটিকের রঙীন কাচের মত কারুকার্যগুলি যেন কষ্টকল্পিত বলে মনে হয়। আবার দু' একটি ক্ষেত্রে অনুরূপ বা প্রয়োজনমত রঙ মনোনয়ন বা ব্যবহার না করবার জন্য শিল্পীর মনোভাব যেন ঠিক ফুটে ওঠে নি। এই প্রসঙ্গে ড্রিমল্যান্ড উল্লেখযোগ্য। তবে শিল্পীর দুটি রচনা অনেকের চোখে পড়ে—দ নিউ কোরাস ও নেচার। প্রথমটিতে গানরত তিনটি সমাহিত মূর্তির রূপ শিল্পী সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। রচনাটির সরলতা লক্ষণীয়। দ্বিতীয়টি দেখে শিল্পীর রঙ মাধ্যমে বক্তব্যটুকু প্রকাশ করার ক্ষমতা বোঝা যায়। গভীর রঙ ও রঙের স্তর-ভেদের মধ্য দিয়ে শিল্পী কয়েকটি গাছের মধ্যে প্রকৃতির শান্ত ও একান্ত বিশেষ রূপটি যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তা প্রশংসনীয়। অন্যান্য ছবির মধ্যে ব্রাইট ডেলাইট, আন-ট্যাচড্ ও বিশেষভাবে দেবীদুর্গার নাম করা চলে।

শিল্পী বিজয়কৃষ্ণ পালচৌধুরীর প্রদর্শনীও অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে অনুষ্ঠিত হয়। শিল্পী কলকাতা আর্ট কলেজে শিক্ষা শেষ করেন ও বর্তমানে দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকারের বাণিজ্য বিভাগে শিল্পী হিসাবে কাজ করছেন। প্রদর্শনীতে তেল, জলরঙ ও প্যাস্টেলের রচনার ৩০টি নিদর্শন দেখা যায়।

শিল্পীকে বিশেষ কোনও শ্রেণীভুক্ত করা কঠিন; কারণ তাঁর কাজের ধারা দেখে কোনও নির্দিষ্ট অঙ্কনরীতির সন্ধান পাওয়া যায় না। শহর ও বহির্জগতের নানা দৃশ্য থেকে

ল এগেন্স্ট ল —বিজয়কৃষ্ণ পালচৌধুরী

শুরু করে শিল্পী তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারাও নানাভাবে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন; তবে দুঃখের বিষয়, তিনি সব ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করতে পারেন নি। তার প্রধান কারণ শিল্পীর ড্রয়িং-এর মান আশানুরূপ নয়। ফলে যেখানেই তিনি কোনও মানবমূর্তির অবতারণা করেছেন সেখানেই তাঁর কিছু দুর্বলতা ধরা পড়েছে। অবশ্য বিভিন্ন মূর্তি অনেক সময়ে তিনি হয়ত প্রতীক হিসাবে অবতারণা করতে চেয়েছেন—কিন্তু সে ক্ষেত্রেও বলিষ্ঠ অথচ সংক্ষিপ্ত রেখা-বৈচিত্র্যের প্রয়োজন হয়। সুতরাং মূর্তি তথা প্রতীক মাধ্যমে তাঁর মনোভাব সঠিক ব্যক্ত হয়নি। রেখা আছে, রঙও আছে, অথচ ভাষা যেন কিছু অস্পষ্ট। তা ছাড়া কয়েক স্থলে শিল্পীর রঙ নির্বাচন সঙ্গত হয়নি। প্রসঙ্গত ডার্ক ওয়ার্লড-এর নাম করা চলে। সমকালীন সমাজজীবনে মানুষের সংঘাত, সংগ্রাম ও পরস্পরবিরোধী মনোভাবটুকুই সম্ভবত শিল্পী প্রকাশ করতে চেয়েছেন, কিন্তু দুর্বল রচনার জন্য ছবিটি রসোত্তীর্ণ হতে পারেনি।

তবে ভিন্ন শ্রেণী হিসাবে শিল্পীর দুটি রচনা প্রায় সকলেরই চোখে পড়ে—ব্রাইট ওয়ালর্ড ও এ মোমেন্ট। এই দুটি ছবিই এক শ্রেণীভুক্ত ও দুটির মধ্যেই তেল-রঙের প্রভাব চোখে পড়ে। আর একটি ছবিও কয়েকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—স্টারস্ ইন গ্রাউন্ড। সামান্য আড়ষ্ট ভাব ও কৃত্রিমতার ছাপ না থাকলে এটিও প্রশংসা অর্জন করত। তবে প্যাস্টেল ব্যবহারে শিল্পীর হাত যে পাকা তা কয়েকটি নিদর্শন দেখে বোঝা যায়। বিশেষ করে স্টাডি হিসাবে এ ফেস্টিভ্ ডে অনুষ্ঠানই নজরে পড়ে। দূরে নদীবক্ষে কয়েকটি নৌকা দেখা যাচ্ছে, সম্মুখে, প্রান্তরে গ্রামের মেলা বসেছে, সারি সারি ছোট ছোট দোকান, গ্রাম্যনরনারীর ভিড়—উচ্ছল আনন্দে যেন অপরিচিত কোনও পল্লীর জনারণ্য উদ্বেল হয়ে উঠেছে। ছবিটি সুন্দর। জলরঙের স্কেচ হিসাবে বেমবু মার্কেটও মন্দ লাগে না।

*

ইউথ পাপেট থিয়েটার, ইন্ডিয়া সেন্ট লরেন্স স্কুলে ছেলেমেয়েদের একটি সর্বসমক্ষে বসে অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন ও পরে শরৎ বোস রোডে নিজ শিক্ষাকেন্দ্রে উল্লেখযোগ্য ছবিগুলির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। ১০ বছর বয়স থেকে শুরু করে ১৮ বছরের ছেলেমেয়েরা এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। নির্দিষ্ট শ্রেণীবিভাগ ও বিশেষ করে উচ্চ মান বজায় রাখার জন্য যে উদ্যোক্তাগণ বিশেষভাবে চেষ্টা করেছিলেন তা প্রদর্শনী দেখেই বোঝা যায়। সত্যই, এত ছোট অথচ উচ্চমানের ছেলেমেয়ে-দের প্রদর্শনী খুব কমস দেখেছি। কয়েকটি ছেলেমেয়ের রচনাধার দেখে বোঝা যায় যে, তারা নিয়মিতভাবে শিল্পচর্চা করে থাকে। কয়েকটি জলরঙ ও প্যাস্টেলের কাজ সত্যই প্রশংসা দাবি করে। এই প্রসঙ্গে রিনা চক্রবর্তী, শশী বেরিওয়াল (বঃ ১০-এর নীচে), স্বাতী চন্দ, লীনা চক্রবর্তী অমিত দাশগুপ্ত, মধু বেরিওয়াল (বঃ ১০—১৩), ও আলোক দাশগুপ্ত (বঃ ১৪—১৮)র নাম উল্লেখযোগ্য।

পুজা উপলক্ষে 'নবমিলন' পুজাপ্রাঙ্গণে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। প্রদর্শনীতে শিল্পী ইন্দু দুগার, অবনী ঘোষ, দেবব্রত মুখোপাধ্যায় ও সুনীল চক্রবর্তীর ছবি দেখা যায়।

*

ভাস্কর শিল্পী সুরেন দে অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে তাঁর ভাস্কর্য ও লিথোগ্রাফের এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন। আগামী সংখ্যায় এ বিষয়ে আলোচনা করব।

চিত্রপ্রিয়

উস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁর জীবনে একটি অধ্যায়

তিমিরবরণ

যতদূর মনে পড়ে সেটা ১৯২৭ সাল। আমি তখন মাইহারে আমার সঙ্গীত গুরু আচার্য আলাউদ্দীন খাঁ সাহেবের কাছে থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি। সহযোগী আরও একজন ছিলেন ডাঃ যতীন ব্যানার্জি, বয়সে আমার চেয়ে কিছুটা বড়ই ছিলেন। ইনি থাকতেন সাতনায়—মাইহার থেকে ব্যবধান মাত্র দুটি স্টেশন। সপ্তাহে একবার কি দুবার ইনি বেহালা শিখতে আসতেন গুরুজীর কাছে। একদিন তালিম শুরু হবার আগে আমরা নানা আলোচনা করছি এমন সময় কথা প্রসঙ্গে খাঁ সাহেব একটি আশ্চর্য ঘটনার অবতারণা করলেন। অনেকের কাছে ঘটনাটা আজগুবি ঠেকতে পারে কিন্তু খাঁ সাহেব সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি। এ তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। বলা বাহুল্য গুরুজীর জীবনের এক রহস্যপূর্ণ ঘটনার আভাস পেয়ে আমরা উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলাম। তিনি তাঁর নিজের ঘরোয়া ভঙ্গীতে কাহিনী আরম্ভ করলেন।

আমি তখন রামপুরের ওস্তাদ উজীর খাঁ সাহেবের ছাত্র। সেখানে একটা বাড়ির দোতলায় একটা কামরা ভাড়া নিয়ে আছি। নির্ঝঞ্ঝাট জীবন। সন্ধ্যার পর খাওয়াদাওয়া সেরে নিয়ে রেয়াজ করতে বসতাম। তাইতেই কেটে যেত সারা রাত। ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়লে আসতো আমার বিশ্রামের অবসর। এটাই আমার নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

একদিন সারারাত বাজাবার পর প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। একটু একটু আলো ফুটেছে। চোখ বুজে বাজাচ্ছিলাম। আলোর আভাসে চোখ খুলে দেখি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে এক অপরূপ মূর্তি। আমি তো চমকে উঠলাম। ভাল করে চেয়ে দেখি তিনি একজন দীর্ঘদেহ সৌম্যদর্শন ফকীর। সারা অঙ্গ আলখাল্লায় ঢাকা। গায়ের রং সোনার মত। মাথার চুল অনেকখানি, মুখেও লম্বা দাড়ি। যন্ত্র রেখে আমি তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়লাম। তিনি আমাকে আশীর্বাদ করে বললেন—"সারা রাতই তোমার বাজনা আমাকে আকৃষ্ট করেছে। এই অঞ্চলেই খোঁজ করছিলুম কোথা থেকে ধ্বনিটা আসছে। এইবার হদিস পেয়ে একেবারে তোমার সামনে এসে দাঁড়ালুম। তোমার বাজনাটা দেখছি রবারের মত, ভারি

সঙ্গীতগুরু আলাউদ্দীন খাঁ

মিষ্টি ওর আওয়াজ। আমি আরও শুনতে চাই, তুমি আরও একটু বাজাও।"

আমি তাঁকে অভ্যর্থনা করে ঘরের ভিতরে এনে বসালুম। তারপর আবার শুরু করলুম সরোদে ভৈরবের আলাপ। তিনি নিশ্চল হয়ে শুনতে লাগলেন। প্রায় ঘণ্টাখানেক বাজিয়েছিলাম। তিনি খুব খুশী হলেন। এই যন্ত্রের বাজনা তিনি আগে আর শোনেননি।

ফকীর সাহেবের ইচ্ছা হল তিনি আমার কাছে কিছুদিন কাটাবেন। আহার তিনি সপ্তাহে দুদিন করেন—তাও মাত্র দুখানা করে রুটি। সসংকোচে আমাকে বললেন—"খাঁ সাহেবের পক্ষে কি খুব অসুবিধা হবে?" আমার অসুবিধা কিছুই ছিল না। একে ফকীর তায় অনুরোধ অতি সামান্য। আমি অনুগৃহীত হয়ে তাঁকে জানালুম তিনি যতদিন খুশী থাকতে পারেন, বরঞ্চ আমিই তাঁর সেবা করে ধন্য হব। অতঃপর ফকীর তো আমার এখানে রয়ে গেলেন। আমার সাধনাও চলল। কিন্তু অবস্থাটা তেমন সুখের হল না। কিছুদিনের মধ্যেই একটা অবাঞ্ছিত উৎপাত আরম্ভ হল।

রামপুরে তখন অনেক বিখ্যাত গায়ক, বাদক থাকতেন। এ ছাড়া গণ্যমান্য ব্যক্তিও বড় কম ছিলেন না। ফকীর সাহেবের সংবাদটা ছড়িয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা আসতে লাগলেন দর্শন এবং আশীর্বাদ লাভের বাসনায়। কিন্তু ক্রমে দেখা গেল সাধু সন্দর্শনই তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য নয় আরও একটা গভীরতর উদ্দেশ্য ছিল। কিভাবে জানি না একটা গোপন সংবাদ এঁদের কর্ণগোচর হয়েছিল যে ফকীর সাহেব সোনা তৈরি করবার প্রক্রিয়া জানেন। এই সংবাদটা প্রচার হবার সঙ্গে সঙ্গেই নানাভাবে ফকীর সাহেবের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হতে লাগল যাতে তিনি সোনা তৈরির গোপন সূত্রটি এদের শিখিয়ে দেন। ফকীর সব শুনে খুব বিস্ময় প্রকাশ করলেন। দু' একজনকে বললেন—"দেখ বাবা, সোনাই যদি তৈরি করতে পারব তাহলে এমন ফকীর হয়ে ঘুরেই বা মরব কেন? তাহলে তো একা আমিই পৃথিবীর সোনার বাজারে হুলস্থূল কাণ্ড বাধিয়ে দিতে পারতুম। চাই কি গোটা দুনিয়াটাই সোনায় মুড়ে দিতে পারতুম। তোমরা সব ভুল খবর শুনেছ।" তাঁরা চুপচাপ শুনে গেলেন বটে কিন্তু বিশ্বাস করলেন না। ভবী তো আর ভোলবার নয়? তাঁদের ধারণা হল ফকীর সাহেব তাঁর স্বাভাবিক বিনয় এবং মহত্ত্ব দিয়ে তাঁদের ভুলিয়ে রাখলেন। অনুরোধ, উপরোধ বাড়ল বই কমল না। এদিকে বাড়িতে এই রকম ব্যাপার ক্রমাগত ঘটতে দেখে আমারও

খুব খারাপ লাগছিল। লোভের এই নগ্নরূপটা আমি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছিলুম না। অথচ এরা সব মানী লোক— এঁদের কিছু বলবার ক্ষমতাও আমার ছিল না। ফকীর সাহেবেরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। একদিন নিরিবিলি পেয়ে তিনি আমাকে বললেন—"এরা দিন দিন আমার ওপর যে অত্যাচার শুরু করেছে তাতে আমার তো পাগল হয়ে যাবার যোগাড় হয়েছে। এখান থেকে এবার বোধ হয় আমাকে সরতে হল। কেবল তুমি যে এই লোভীদের দলে নেই তাইতে আমি খুব খুশী হয়েছি।" আমিও বুঝতে পারছিলুম ফকীর সাহেব আর বেশীদিন নেই; কিন্তু অস্বীকার করব না আমার লোভ না থাকলেও কৌতূহল ছিল এইটুকু জানবার যে ফকীর সাহেব সত্যিই সোনা তৈরির কৌশল জানেন কি না। ফকীর সাহেবকে জিজ্ঞাসা করবার ইচ্ছা অনেকবারই হয়েছিল কিন্তু জোর করেই সে ইচ্ছা দমন করেছিলুম।

সেদিন সন্ধ্যার পর যথারীতি রেয়াজ করতে বসেছি। ফকীর সাহেব খানিক আগে বেরিয়েছেন। জানতাম তিনি যথাসময়ে ফিরে আসবেন। রেয়াজ করতে করতে এক সময়

খেয়াল হল তাঁর আসবার সময়টা যেন পার হয়ে গেছে। আমার সাধনার দিকেই মন ছিল এদিকটায় তেমন গুরুত্ব না দিয়ে বাজিয়েই চললুম। কিন্তু যখন যথেষ্ট রাত হয়ে গেছে অথচ ফকীর সাহেব ফিরলেন না তখন দুশ্চিন্তা হতে লাগল। উৎকণ্ঠায় বাজনায় আর মন বসানো গেল না। কে জানে স্বর্ণলোলুপের অভাব নেই—তারা অনায়াসে ফকীর সাহেবকে গুম করে শারীরিক যন্ত্রণা দিতে পারে সোনা তৈরির সূত্রটা জানবার জন্য। মনটা এমনি অস্থির হল যে লণ্ঠন নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম ফকীর সাহেবকে খুঁজতে। যে সব স্বার্থসন্ধানীরা আমার বাড়িতে ফকীর সাহেবের খোঁজে আসতেন যতদূর সম্ভব তাঁদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে খবর নিলাম কিন্তু কেউই তাঁকে দেখেছেন বলে স্বীকার করলেন না। শেষ পর্যন্ত নিষ্ফল অনুসন্ধানের পর আমার বাড়ি ফিরে এলুম। আবার রেয়াজ করতে চেষ্টা করলাম কিন্তু ফকীর সাহেবের চিন্তা মনকে বিক্ষিপ্ত করে তুলতে লাগল।

শ্রান্ত, ক্লান্ত হয়ে ভোরের দিকে বুঝিবা একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছিলুম কিন্তু কি রকম একটা অনুভূতিতে ঘুমের ভাবটা কেটে গেল। চোখ খুলতেই চমকে চেয়ে দেখি ফকীর সাহেব পূর্বের মত দরজার সামনে দণ্ডায়মান। কিন্তু তাঁর পরিধেয় আলখাল্লাটা সম্পূর্ণ ভিজে। তা থেকে টস্ টস্ করে জল পড়ছে। তখন শীতকাল। আমি ধড়মড় করে উঠে প্রথমেই তাঁকে অনুরোধ করলেম জামাকাপড় বদলে ফেলতে। তিনি সুস্থ আছেন ভেবে আমার দুর্ভাবনা কেটে গেল। ফকীর সাহেব আমার অনুরোধ কর্ণপাত করলেন না। সিক্ত আলখাল্লার পকেট থেকে একটা মাদুলি বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন—"তোমার ওপর আমি খুব খুশী হয়েছি। কাল সারারাত নদীতে গলা অবধি ডুবিয়ে তোমার জন্য একটা বিশেষ সাধনা করেছি। আমার আশীর্বাদের সঙ্গে এই মাদুলিটা তুমি ধারণ কর। এতে তোমার মঙ্গল হবে। আমি আজই এখান থেকে চলে যেতে চাই নইলে এই স্বর্ণলোলুপেরা আমাকে রেহাই দেবে না। কিন্তু তার আগে আর একটু কাজ আছে। আমাকে বেশ কিছু কাঠ কয়লা যোগাড় করে এনে দাও।" কাঠ কয়লা পাওয়া মোটেই শক্ত ছিল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁকে সের [illegible] কাঠ কয়লা এনে দিলাম।

ফকীর সাহেব আমাকে বললেন—"দরজাটা বন্ধ করে ভাল করে খিল এঁটে দাও।" আমি তক্ষুনি তাই করলুম। ফকীর সাহেব ঝোলাটি খুললেন এইবার। তার ভিতর থেকে কয়েকটি অদ্ভুত জিনিস বেরুলো। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে একটি আধ ইঞ্চি ব্যাসের প্রায় দু ফুট লম্বা ধাতুর নল। ফকীর সাহেব এবার উনুনে আগুন তৈরি করলেন। তারপরে তাঁর নানারকম প্রক্রিয়া শুরু হল। নানাদ্রব্য সহযোগে তিনি যে কি করছিলেন কিছুই বোঝা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি, তবে এটুকু বুঝেলাম যে ওই নলের ভিতর নানা পদার্থ দিয়ে আগুনে তপ্ত করাই ছিল তাঁর প্রধান কাজ।

পাঁচ ছ ঘণ্টা সমানে চলল নানারকম রাসায়নিক প্রক্রিয়া। ফকীর সাহেব যখন থামলেন তখন তিনি নিরতিশয় ক্লান্ত। প্রায় আধ ঘণ্টা নিস্তব্ধভাবে বসে রইলেন তিনি। তারপর নলটা তুলে নিয়ে অনেক ঠোকাঠুকি করে যে বস্তুটি নির্গত করলেন তা দেখে আমি চমকে উঠলুম। দেখলাম একটা হরিদ্রাবর্ণের কঠিন বস্তু নল থেকে মেঝেতে ঠকাস্ করে এসে পড়ল। প্রক্রিয়া শেষ হয়েছিল। ফকীর সাহেব নীরবে তাঁর অ্যাপারেটাসগুলি ঝোলায় তুলে ফেললেন। মেঝে পরিষ্কার হয়ে গেল। কেবল পড়ে রইল সেই হরিদ্রাবর্ণের পদার্থটি।

ফকীর সাহেব তাঁর সব জিনিসপত্র নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। আমাকে বললেন—"আমি এখনই চলে যাচ্ছি, তোমার এখানে মাসখানিক থেকেছি, খেয়েছি। একটা ঋণ জমা হয়েছে কিন্তু আমি সেই ঋণ রেখে যেতে চাই না।" সেই হরিদ্রাবর্ণের বস্তুটি কুড়িয়ে নিয়ে আমার হাতে দিয়ে বললেন—"এটি খাঁটি সোনা। বাজারে বিক্রি করে এর যা দাম পাও, তুমি নিও।" তিনি প্রস্থানোদ্যত হলেন। আমি আপত্তি করবার চেষ্টা করলুম কিন্তু তাঁকে নিরস্ত করা গেল না। আমাকে আশীর্বাদ করে তিনি চলে গেলেন। আমি বস্তুটা হাতে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

ফকীর সাহেব তো চলে গেলেন কিন্তু আমি এই কৃত্রিম সোনা নিয়ে দ্বিধায় পড়লুম। বিক্রি করতে যাওয়া নিরাপদ নয়। বিশেষ করে যদি জাল প্রমাণিত হয় তাহলে কেলেঙ্কারির একশেষ হবে। কিন্তু ফকীরের কথা অবিশ্বাস করতে মন চাইল না। যা থাকে কপালে ভেবে এক স্যাকরার কাছে উপস্থিত হলাম। জিনিসটা তার হাতে দিলাম যাচাই করতে। বুকটা ঢিপ ঢিপ করছিল। সে কষ্ঠি পাথরে ঘষে ভাল করে পরীক্ষা করে বললে নিকষটা খাঁটি সোনাই বটে। সেটা বিক্রি করে দাম পেয়েছিলাম চল্লিশ টাকার মতন।

এ গেল সোনার ব্যাপার। মাদুলিটার কথা বলি। [illegible] মাদুলিটা তো ধারণ [illegible] দিন ভালই গেল। সন্ধ্যার পর সরোদ বাজাতে বসেছি। বাইরে বেশ জ্যোৎস্না উঠেছে। ঘণ্টাখানেক বাজনায় নিমগ্ন ছিলাম। এক সময় হঠাৎ বাইরে নজর পড়ল। তাজ্জব ব্যাপার। দেখলুম পাশাপাশি খুব মোটা দুটো কালো থাম জমি থেকে আকাশ পর্যন্ত উঠে গেছে। বার বার ভাল করে দেখতে লাগলাম। মনের ভুল নয়তো? কিন্তু না, সত্যিই দুটো বিরাট থাম বেশ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ ভারি ভয় করতে লাগল। বাজনা ফেলে একেবারে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু শুয়েও যেন কেমন অস্বস্তি হতে লাগল। মাথা থেকে আস্তে আস্তে লেপটা একটু সরাতেই যা দৃষ্টিগোচর হল তাতে আমার সংজ্ঞা লোপ হবার উপক্রম। দেখলাম কি জানো? দেখলাম দুজন একদম পাকা চুল দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ আমার দু পাশে শুয়ে কনুয়ের ওপর ভর দিয়ে একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে। কোনরকমে আবার মাথা পর্যন্ত লেপ মুড়ি দিয়ে সর্বাঙ্গ ঢেকে থর থর করে কাঁপতে লাগলুম। সারারাতের মধ্যে মুখ আর খুলিনি। ঘুমিয়েছিলুম কি অজ্ঞান হয়েই ছিলুম মনে নেই। যখন বুঝতে পারলুম ভোর হয়েছে তখন আস্তে আস্তে মুখ বের করে একটু চেয়ে দেখলুম। না, কেউ কোথাও নেই। দরজাতেও খিল লাগানই আছে। এইবার নির্ভয়ে উঠে পড়লুম। আমার ধারণা হল এই মাদুলিটাই যত নষ্টের মূল। আর কোনও দ্বিধা না করে সোজা নদীতে গিয়ে মাদুলিটাকে বিসর্জন দিয়ে এলাম। এর পর থেকে আর কোনও রাত্রে কিছু দেখিনি বা উপদ্রবও বোধ করিনি।

খাঁ সাহেবের কাহিনী শেষ হল। আমি রোমাঞ্চিত। এই ব্যাপারে গুরুজীর কি অনুমান জানার জন্য আমি প্রশ্ন করেছিলুম "আচ্ছা এই বৃদ্ধ দুটির কি রহস্য বলতে পারেন?" গুরুজী জানালেন এ বিষয়ে তাঁর কিছু ধারণা নেই। ডাঃ ব্যানার্জি কিন্তু হাসি হেসে আমাকে বললেন—"কিছুই বুঝতে পারলেন না? কিছু না?" আমি হতভম্বের মত চেয়ে রইলুম। সে কি বুঝেছে তাও আন্দাজ করতে পারলুম না। গুরুজীও চুপচাপ। শেষকালে তাকে বার বার অনুরোধ করাতে সে বললে—"এটা তো সোজা কথা। এরা হচ্ছে তাল, বেতাল, মহারাজ বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর এতকাল তো সেই দু বেচারা নিষ্কর্মা আর বেকার হয়েই বসে ছিল। এবার ফকীর দয়াপরবশ হয়ে গুরুজীর কাছে তাদের চাকরির একটা ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। কিন্তু গুরুজী নিষ্ঠুরভাবে মাদুলিটা বিসর্জন দিয়ে আবার তাদের বেকার করে দিলেন।

কণ্টকাকীর্ণ পথে

সেদিনের সাপ্তাহিক সাহিত্যসভার আলোচ্য বিষয় ছিল: লেখকসমাজে লেখিকা। সাবজেক্টটা কণ্টকিত ছিল খুব। আর যদি জিজ্ঞেস করেন, "কেন?" তবে বলি, শুনুন।

সভাসদদের মধ্যে আমার নামে এই গুজব রটেছিল যে, আমি নাকি—কেউ জানে কখন বা কে জানে—একদিন বলেছিলাম: "মেয়েরা লিখতে জানে না।" আমি ভদ্রলোকের ছেলে; ভদ্রলোকের ছেলে ঐ রকম কথা ভাবতে পারে, বলতে পারে না—আর যদিও ভেবেও থাকে, তা প্রকাশ না করাই তার ভালো। সুতরাং আমি বলি নি (ভাবিও নি)। [illegible]

তবে আমি যে একেবারে কিছুই বলি নি, এমন নয়। ঈশ্বর, আর পাঁচজনকে যেমন, আমাকেও একটা রসনা দিয়েছেন—আর, প্রয়োজনবোধে, ভেতরের সাহিত্যও তার সাহায্যে আমি প্রকাশ করি। ধৈর্য থাকে যদি, গোড়া থেকেই গল্পটা শুনে যান।

পদ্ম ও ছায়া আমার বন্ধু, অর্থাৎ সেই স্মরণীয় দিন—একুশে মে—পর্যন্ত আমার বন্ধু ছিল। আজ অবশ্য ছায়া আমার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করেছে, আর ছায়া যে ভদ্রসন্তানের সঙ্গে আড়ি করবে, পদ্মও—দেখুন, না কি অন্যায়—কোনো প্রশ্ন না করে শুধু তাঁর সঙ্গে কেন, তাঁর পিতৃকুল ও শ্বশুরকুলের চোদ্দ পুরুষের সঙ্গে সর্বপ্রকার সম্বন্ধ ছিন্ন করে দেবে। আমার পিতৃকুল ভাগ্যিস বেলজিয়ামে, আর শ্বশুরকুল [illegible]। পদ্মর [illegible] হয়েছে গত পরশু। হ্যাঁ, নেমন্তন্ন করেছিল বটে; নিমন্ত্রণপত্রে লিখেছিল "আপনার আসা চাই-ই-ই..."। আর ছায়ার বাবা-মা এখনো যাকে বলে খুঁজছেন; ভাবী পাত্ররা নাকি শুধু দেখতে আসে আর "পরে জানাব" বলে চলে যায়। আর কে এক হবু শাশুড়ী নাকি বলে বেড়ায়, "মেয়েটির কান ছোট।"

এই মাণিকজোড়কে উদ্দেশ করে—হ্যাঁ, শুধু এদেরই, নারীসমাজের আর কারুকেই নয়—আমি একদিন বলেছিলাম: "তোমরা অপূর্ব 'কথিকা', লেখিকা হবে না কোনো জন্মে।" ওরা সত্যি সুন্দর গল্প বলত, স্কুলের দিদিমণিদের কাছে শোনা গল্প, পাড়ার 'গরম মসলা' খিটখিটে বুড়ীর সব গল্প। কত মজার মজার বিশেষণ ওদের মুখ থেকে আমি খুঁটে নিয়েছি, টুকেছি নোটবইয়ে, টুকেছি ছেঁড়া পাতায় ডায়েরীতে। শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে শুনত, রাত দশটা বাজলেও হাই তুলত না, আঙুল মটকাত না, শুধু মাথা নেড়ে উপভোগের ভঙ্গিতে, কুকুর যেমন আনন্দে লেজ নাড়ে; এমন কি কেউই ভাবত না রান্নাঘরে ঠাণ্ডা হয়ে-আসা ঘি-ভাত আর মাংসের ঝোলের কথা।

ওদের বলেছিলাম, "লেখা লেখার চর্চা করো"। ওরা অবশ্য লিখত, লেখার চর্চা মোটেই করত না। পাণ্ডুলিপির পর পাণ্ডুলিপি নিয়ে আসত, বলত: "যত খুশি বদলে দিন; লেখাটা খারাপ হলে একেবারে পালটে নিজেই যা ইচ্ছে লিখুন...শুধু আমাদের নাম থাকলেই হল।" আমি তখন এক খ্রীষ্টীয় পত্রিকার সম্পাদক। পত্রিকাটি অধুনালুপ্ত বটে; তবে জানেন, চালিয়েছিলাম পুরো সাত বছর। আজকালকার দিনে—চালের যা দর আর সাহিত্যবাজারে যা মন্দা—পাঁচ বছরের বেশী যে-কেউ ঋণ না করে আর জেলে না গিয়ে একটা কাগজ যদি চালাতে পারে, সে প্রকৃত বীরপুরুষ। মেয়ে দুটির লেখা ছিল নীরস, নির্জীব, গৌড়ীয় ভাষায় যাকে বলে ফ্ল্যাট—সর্ষে-বাটা ছাড়া ইলিশ মাছের ঝোলের মতো ফ্ল্যাট। টেবিলের এক কোণে রেখে দিতাম, ভাবতাম: সময় পেলে দেখব...। একদিন কাল বৈশাখীর দমকা হাওয়ায় টেবিলের কাগজগুলো উড়ে যায়; কিছু দিন পরে আমাদের বাবুর্চির বিক্রি-করা একগাদা পুরোনো খবর-কাগজের তাড়ার মধ্যে ছায়ারই একটা লেখা নিরুদ্দেশ যাত্রা করে। উদ্দেশ পান ছায়ার মা ঐ ঘোর করাল দিনটিতে—একুশে মে তারিখে—মিনার্ভা সিনেমার সামনে চানাচুর কিনতে গিয়ে। তেলে ভেজা ছিল ঠোঙাটা, কিন্তু মেয়ের হাতের লেখা কোন্ মা চিনতে ভুল করেন? সবিস্ময়ে তাড়াতাড়ি পড়লেন কন্যার দুঃসাহসিক দাবি: মধুরিমা ভালো নাচ এবং সামান্য গান জানিত, তবে সে গানের চেয়ে নাচকে বেশী পছন্দ করিত, কারণ নাচে সে বেশ পারদর্শী হইয়াছে।

"ভেবে দেখুন তো ব্যাপার: সন্তোষবাবু যদি দেখতে পেতেন..." সন্তোষবাবু ছায়ার সাম্প্রতিকতম পাণিপ্রার্থী—তাঁর আবার চানাচুরের প্রতি অনবরোধনীয় লোভ।

সুধী পাঠক এবার বুঝবেন, আমি কেন লিখেছি—ঐ লেখকসমাজে লেখিকা সাবজেক্টটা কণ্টকিত ছিল খুব।

: একেবারে পালটে নিজেই যা ইচ্ছে লিখুন...শুধু আমাদের নাম থাকলেই হল :

ভিনদেশী ওরা

সরস্বতীর [illegible] এবং যে কাজটির [illegible] ছিলেন কালিদাস, তাঁরও কথা উল্লেখ না করে আমি বললাম খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর গ্রীক কবি সাফোর কথা। অন্য কোনো গ্রীক লেখিকা আছেন কি? বললাম লাতিন সাহিত্যের একমাত্র লেখিকার কথা: সুলপিসিয়া নাকি তাঁর নাম; তাঁর একমাত্র রচনা সাকুল্যে ছটি কবিতা। টিবুলুস-এর রচনাবলী গ্রন্থের অন্তর্গত, এবং অনেকের ধারণা—সুলপিসিয়ার নয়, টিবুলুস এরই রচিত! বললাম, অবশ্যই

বললাম ১৯০৯, ১৯৩৮ এবং ১৯৪৫ সালের নোবেল পুরস্কারের কথা।

স্পেনের এক প্রসিদ্ধ সাহিত্যেতিহাসে ১৭৫ জন লেখকের মধ্যে পেয়েছি তিনজন লেখিকার নাম : সেণ্ট তেরেজা, কবি রোসালিয়া কাস্ত্রো ঔপন্যাসিক এমিলিয়া পার্দো বাজান...। আমার কাছে যে জার্মান কাব্যসংকলন আছে, তার মধ্যে স্থান পেয়েছেন ১১৫ জন লেখক আর পাঁচজন মাত্র লেখিকা। ইতালীয় কাব্যসংকলনে ১২৮ জন কবির মধ্যে লেখিকা বলতে দেখলাম স্বর্গতা একজন [আন্তোনিয়া পজ্জি] আর জীবিতা তিনজন। না, তাঁদের জন্মকাল জানাতে পারব না, লেখকদের পরিচয়পত্রে সংকলয়িতা লিখেছেন nato nel...অর্থাৎ অমুক সালে জাত, লেখিকা-দের বেলায় তিনি রমণীরঞ্জক হয়ে শুধু লিখেছেন vive a...অর্থাৎ অমুক নগরের অধিবাসিনী। জে বি প্রিস্টলে, তাঁর 'সাহিত্য ও পাশ্চাত্ত্য মানব' গ্রন্থে, যে ১২৪ জন পরলোকগত লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনী দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে শুধু আছেন কলেৎ আর পুরুষনামের অন্তরালে লুক্কায়িতা জর্জ এলিয়ট। পুরুষনাম-ধারিণী অন্যতর জর্জ [ফরাসী জর্জ সাঁদ] তালিকাভুক্ত হননি।

...আমার সেই পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণাপ্রসূত ভাষণটা চলছিল নির্বিঘ্নে, অনুকূল স্রোতে যেমন দক্ষিণা হাওয়ায় ভেসে চলে উত্তরগামী নৌকো। হঠাৎ দেখি, পিছনের কোণে বসে এক ছোকরা ছটফট করছে, যেন কিছুক্ষণের জন্য কোথাও যেতে চায়, লজ্জায় বলতে পারছে না।

'কিছু বলবে?'

'হ্যাঁ, স্যার; আপনি তো গ্রীস-ফ্রান্স, রোম-টোমের কথা দিব্যি বলে যাচ্ছেন; আমি শুধু ভাবছি বাড়-বরেন্দ্রে পৌঁছোতে আর কতক্ষণ? টাকি-ফাকিতে তো আমার কোনো তাপমা ইণ্টারেস্ট নেই—অনুমতি দিন, একটু ঠাণ্ডা হাওয়া আর গরম চা খেয়ে আসি...

: অনুমতি দিন, একটু ঠাণ্ডা হাওয়া আর গরম চা খেয়ে আসি

তাহলে তো আর ভাবনা নেই বইটি হবে বেস্ট-সেলার। যাক্, আমার শ্রোতারা তাহলে—ওই পিছনের কোণে উপবিষ্ট ছোকরাটির সৌজন্যে—ফ্রাঁসোয়াজ সাগাঁ প্রভৃতি লেখিকার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত রইল।

ছোকরাকে বললাম, তার ঠাণ্ডা-গরম কিছুরই সেবনে আমার কোনো আপত্তি নেই, তবে এই যে মাসে রাঢ়-বরেন্দ্র দেশে ঠাণ্ডা হাওয়া সে যে কোত্থেকে আমদানি করবে, তা আমার জানা নেই—বিশেষভাবে আমাদের এই খাটালে বেষ্টিত পাড়ায়। আর চায়ের জন্য যদি সে একান্ত তৃষ্ণার্ত, আমাদের রান্নাঘরে তো চায়ের পাতার অভাব নেই—শুধু কয়লা ভেঙে উনুন ধরার অপেক্ষা।

চিত্তবিলাসিনী

অনন্যোপায় হয়ে বাঙালী লেখিকাদের কথা বলতে লাগলাম।

'চিত্তবিলাসিনী' (১৮৫৭) নাকি বাংলা সাহিত্যে বাঙালী নারীর প্রথম অবদান। লেখিকার নাম কৃষ্ণকামিনী দাসী। তিনি আসলে নারীনামধারী কোনো পুরুষ লেখক কিনা, এ বিষয়ে সন্দেহ করার অবকাশ আছে।

ব্রজাঙ্গনাছন্দে পয়ারে রচিত 'আত্মপরিচয়ে' তিনি জানান—শ্বশুরবাড়ি হুগলি জেলায়, সুখরিয়া গ্রামে। তাঁর শ্বশুরকুল 'কায়স্থ উপাধি মিত্র মুস্তোফীতে খ্যাত।' পুরো কুলজি নাই বা দিলাম, শেষাংশ শুধু তুলে দিঃ 'কনিষ্ঠের বংশধর নাম শ্রীশশিভূষণ/অধিনীর প্রাণের বল্লভ সেইজন/তাঁর অনুকূল্যে আমি করেছি যতন/'চিত্তবিলাসিনী' গ্রন্থ করিতে রচন।' ভূমিকায়ও তিনি লিখেছিলেন : 'এই ক্ষুদ্র পুস্তক রচনার সময় আমার প্রাণবল্লভ যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।' প্রাণবল্লভ কথাটা কি রকম শোনায়? আজকালকার দিনের বাঙালী স্বামীরা নাকি বিয়ের পর বলে 'আমার পরিবার', প্রথম সন্তানের প্রসবোত্তর কালে বলে 'আমার স্ত্রী', দ্বিতীয় সন্তান এলে বলে 'আমার ওয়াইফ [তৃতীয় সন্তানের পরে বলে 'আর না!']; কিন্তু তখনকার দিনের বউয়েরা স্বামী উল্লেখ করত কি-ভাবে? আমাদের প্রতিবেশিনীরা তো শুধু বলে 'উনি', কিংবা 'খোকার বাপ' কিংবা আধুনিক কায়দাতে 'মিঃ রায়'। থাক সে কথা; লেখিকার বক্তব্য এই যে 'অদ্যাপি অস্মদ্দেশীয় মহিলাগণের কোন পুস্তকই প্রচারিত হয় নাই, সুতরাং প্রথমতঃ এ বিষয়ে হস্তার্পণ করা কেবল লোকের হাস্যাস্পদ হওয়া মাত্র, কিন্তু আমার অন্তঃকরণে যথেষ্ট সাহস জন্মিতেছে যে সামাজিক মহাশয়েরা আপাততঃ স্ত্রীলোকের রচনা শুনিলেই বোধ হয় যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই, আর আমার পুস্তক রচনা করিবার এই এক প্রধান দৃষ্টান্ত পাইলে স্ত্রীলোক মাত্রেই বিদ্যানুশীলনে অনুরাগী হইবে।'

প্রশ্ন উঠতে পারে : নারীনামধারী লেখক হলে কি এতটা প্রবঞ্চনা করতে পারতেন?...এদিকে শুনুন 'বিরহবিধুরিতা কামিনীর' কথা : 'যামিনী আগতে কত ভাবে মনে মনে/পতি সহ আজি নিশি বঞ্চিব কেমনে/আমারে বিরলে নাথ পেয়ে একাকিনী/কি করিবে কি হইবে কিছুই না জানি.../ছলে বলে যদি পতি করেন কোলেতে...', কিংবা মৎ কর্তৃক প্রাণেশ্বর সমীপে লিপি প্রেরণ : কবিতাটির প্রথম পঙক্তির প্রথম অক্ষর শ্রী দ্বিতীয় পঙক্তির দ্বিতীয় অক্ষর ম, তৃতীয় পঙক্তির তৃতীয় অক্ষর তি... এমনিভাবে চতুর্দশপদী কবিতায় আড়াআড়ি ভাবে পড়া যায় : 'শ্রীমতী কৃষ্ণকামিনী দাসীর বিনয়'। বাংলা সাহিত্যের প্রথম বাঙালী লেখিকাকে এমন 'পাকা মেয়ে' ভাবতে কি রকম লাগে?

তিনি আবার ব্রিটিশদের পক্ষপাতী : 'ইতিপূর্বে অস্মদ্দেশে চৌর্যক্রিয়া প্রভৃতি দুষ্ক্রিয়ার প্রাবল্য হেতু কোন ব্যক্তি নিরুদ্বেগে কালক্ষেপণ করণে সক্ষম হইতেন না; এক্ষণে তদুপদ্রবের সহস্রাংশের একাংশও নয়নগোচর হয় না...। তাহা তাঁহাদিগের বুদ্ধির অপার ও অচিন্তনীয় মহিমা।'

শুনুন এবার 'মনের ক্রন্দন' : 'দেখি রেলওয়ে গাড়ি/ধূলায় ধূসর শাড়ি/যম-রাজা গড়াগড়ি/দেয় হায় হায় রে...' কিংবা 'বালবিধবা মাতঙ্গিনী ও সৌদামিনীর কথোপকথন : 'ভাবনা নাহিক আর, উপায় হয়েছে তার/কর ভঙ্গ সুশোভন নানা আভরণে লো/বিধবা সধবা হবে,

বৈধব্য যন্ত্রণা যাবে। হয়েছে আইন, হবে বিধবার বিয়ে গো / পতি বিনে যে দুর্গতি হরিবেন প্রজাপতি/ সানুকূল হয়ে বুঝি পুনঃ পতি দিয়ে গো।' এই বিধবা বিবাহ যাঁর পরিশ্রমের ফল, তাঁরও সশ্লেষ নামোল্লেখ আছে : 'শুনিচ না কি সে গুণের সাগরের নাম বিদ্যেসাগর!...—কি বললি, কি বললি? কিসের সাগর?—বিদ্যেসাগর।'

হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা

'হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা' নামক গদ্য-রচনাটি 'কৈলাসবাসিনী কর্তৃক প্রণীত এবং তৎস্বামী শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ গুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত' হয় ১৮৬৩ সালে। ভূমিকায় তিনি জানান :' 'আমি বাল্যাবস্থায় পিত্রালয়ে একটি বর্ণও শিক্ষা করি নাই, এবং শিক্ষা বিষয়ে আমার অভিলাষও ছিল না...। বিদ্যাভ্যাস করিলে যে অচিরাৎ বিধবা হয়, প্রাচীন পরম্পরাগত এই পুরাতন বাক্যটি অতি প্রযত্ন সহকারে হৃদয়-ভাণ্ডারে ধারণ করিতাম...।'

ভাষা আড়ষ্ট প্রায় যতিচ্ছেদহীন; কুড়ি লাইনের বাক্যও বিরলদৃশ্য নয়। তা সত্ত্বেও লেখিকার গদ্য উপভোগ্য : 'পুত্র জন্মাইলে যেরূপ বাদ্যবাদন, ব্রাহ্মণপূজা, দরিদ্র-ভোজন, স্বস্ত্যয়ন, এবং পুত্রের আয়ুর্বৃদ্ধি কারণ বহুবিধ দ্রব্যসামগ্রীদান ও দেশ-বিদেশস্থ আত্মীয় কুটুম্বগণকে জ্ঞাপনার্থে লিপিত প্রেরণাদি যে সকল মঙ্গলাচরণ হইয়া থাকে, কন্যা জন্মাইলে তাহার কিছুই হয় না, বরং তদ্বিপরীত কার্যই হইয়া থাকে। হা বিধাতঃ! আমরা কি এতই নিকৃষ্ট যে, আমাদিগের জন্ম মৃত্যু উভয় কালই সমান হইবে?'

লেখিকা স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী : 'উহারা কি চাকুরি করিয়া টাকা আনিবে?... হা বিদ্যা! তুমি কি কেবল অর্থের নিমিত্তই হইয়াছ, জ্ঞানের নিমিত্ত নহে?'

বাঙালী মেয়েদের বিভিন্ন ব্রত বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বৈশাখ মাসের দশপুত্তলিকা ব্রতের কথা বলেছেন। তার ফলে নাকি মেয়েরা লাভ করে 'রামের মত পতি, দশরথের তুল্য শ্বশুর, লক্ষ্মণ সদৃশ দেবর, কৌশল্যার ন্যায় শ্বশ্রু, সীতা সদৃশ সতীত্ব, দ্রৌপদী সদৃশ পাচনক্ষমতা...ধরণী সদৃশ ভারসহিষ্ণুতা!' শাশুড়ীদের দোষ প্রদর্শনের পর তিনি এই কথা বলতে ভুলে যান না যে, তাদের মেয়েরা 'ননদিনী হইয়া প্রায় সপত্নীর ন্যায় ব্যবহার করে'। বুঝতে হবে হিন্দু মহিলাগণের দোষেই হিন্দু মহিলাগণের এই হীনাবস্থা!

কবিতামালা

'কবিতামালা, অর্থাৎ নানাবিধ জ্ঞান-গর্ভ কবিতাসমূহ' প্রকাশিত হয় ১৮৬৫ সালে। লেখিকা 'কলিকাতাস্থ কোন সদ্বংশীয় কুলবধূ'। গ্রন্থের সংশোধক [হিন্দু কলেজের দ্বারকানাথ রায়] এক বিজ্ঞাপনে লিখেছেন : 'স্ত্রীলোকের নাম-সংবলিত কোন পুস্তক প্রকাশিত হইলে প্রায় অনেকেই তাহা স্ত্রীলোকের রচিত বলিয়া বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা বোধ করেন যে কোন পুরুষ ইহা রচনা করিয়া লাভের নিমিত্তই হউক, বা অন্য কোন উদ্দেশেই হউক, স্ত্রীলোকের নাম দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন...। তবে যে অবলাজাতি পিঞ্জরবদ্ধ বিহঙ্গমের ন্যায় অন্তঃপুরনিরুদ্ধ থাকিয়া যৎসামান্য শিক্ষা প্রভাবেই স্বাধীন গ্রন্থকর্ত্রী হইয়া উঠিবেন, ইহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে!' ভদ্রলোকের রায় : 'অন্তঃপুরনিরুদ্ধা কুলবধূর পক্ষে এ রচনা অতি উৎকৃষ্ট বলিতে হইবে। অনেক পুরুষ এরূপ সুগম রচনা করিতে সমর্থ হন না।'

সদ্বংশীয় কুলবধূটি বলেন : 'হাহা মাতঃ জন্মভূমি জননী আমার/দেখিয়া তোমার দশা করি হাহাকার/বর্তমান ভাব তব করিতে বর্ণন/ব্যাকুলিত হয় মন, ঝরে দু নয়ন...' তিনি জানেন, তাঁর রচনাভিলাষ 'বামনের যেন সাধ ধরিতে গগন চাঁদ... অন্ধ সাধ করে মনে নিজ মুখ দরশনে।' 'পাঠকগণের প্রতি গ্রন্থকর্ত্রীর নিবেদন' শীর্ষনামে তাঁর শেষ কবিতায় তিনি অনুরোধ করেন : 'অল্পবুদ্ধি আমি নারী, কিছুই বুঝিতে নারি, এতে মম না লইবে দোষ।'

এই গ্রন্থের প্রায় সমসাময়িক আর দুটি বই চোখে পড়েছে : লং সাহেবের নামে উৎসর্গিত, সৌদামিনী সিংহের 'নারীচরিত' এবং দ্বিজতনয়া নামে এক লেখিকার গদ্যপদ্যে রচিত 'উর্বশী নাটক'।

বামাবোধিনী পত্রিকা

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত 'বামাবোধিনী' পত্রিকার স্তম্ভে মাসে মাসে প্রকাশিত হত 'বামাদের রচনা'। পত্রিকাটির নামপত্রে সংস্কৃত ও বাংলা উভয় ভাষায় লেখা ছিল : 'কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক'। ১৮৬৫ সালে বামাবোধিনী 'নূতন কলেবর ধারণ পূর্বক নূতন পরিচ্ছদ পরিধান' করে। পত্রিকাটি নাকি বামাপ্রিয় ছিল : 'প্রকাশিত হইতে কিছু বিলম্ব হইলে অনেকে উৎসুক হৃদয়ে প্রকাশের দিবস প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন'। এদিকে কিন্তু 'বামাবোধিনী যেরূপ প্রচারিত হওয়া আবশ্যক অদ্যাপি সেরূপ হয় নাই' এমন কি 'এই গত বৈশাখ মাসে [১৮৬৫] প্রায় একশত অপ্রাপ্তমূল্য [না কি অদত্তমূল্য?] গ্রাহক ইচ্ছাপূর্বক পরিত্যাগ করা হইয়াছে'। সুতরাং 'কৃপালু গ্রাহক মহাশয়েরা যেরূপ আগ্রহ সহকারে বামাবোধিনী পত্রিকা গ্রহণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্ধন করেন, সেইরূপ আগ্রহ সহকারে ইহার সামান্য মূল্য উপযুক্ত সময়ে প্রদান' করুন।

পত্রিকাটি যেন 'বামাবোধিনী সভা'র মুখপাত্র। সেই সভার বদান্যতায় 'বাঙলা বালিকা বিদ্যালয়ে এক এক খণ্ড বামাবোধিনী বিনা মূল্যে বিতরণ' করা হয়। সভার আর এক হিতব্রত 'অন্তঃপুরস্থ বয়স্থা স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষার সুপ্রণালী সাধন ও পারিতোষিক দান...। ত্রিমাসে ত্রৈমাসিক শিক্ষা বিবরণ পাঠানো হয়,' বৎসরের শেষে পরীক্ষা।

নিজ জ্ঞানবর্ধনার্থে পত্রিকায় পড়ে দেখতে পারেন বিচিত্র বিষয়বস্তু অবলম্বনে নানান শিক্ষাপ্রদ সন্দর্ভ—সন্তান রক্ষা স্ত্রীদিগের কর্তব্য, মুসলমানদিগের বিবাহ প্রণালী, মানবজাতির সহিত চতুষ্পদ জন্তুদিগের তুলনা... এমন কি 'বঙ্গদেশের বর্তমান সময়ের পুরুষদিগের অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরা অনেক বিষয়ে প্রশংসনীয়' নামে এক প্রবন্ধ : তখনকার দিনে পুরুষদের প্রচলিত দোষ নাকি মাদকসেবন, বহুদার-সেবা এবং ধর্মক্ষেত্রে ভণ্ডামি।

...ছোকরা পুনঃপ্রবেশ করে ঘোষণা করল : 'চা রেডি'। সুতরাং বিরাম।

[ক্রমশ]

১৩

মা বেঁচে থাকতে দোতলায় সিঁড়ির পাশের ঘরটা ঠাকুরঘর। এ বাড়ির কারুরই দেব-দ্বিজে তেমন ভক্তি নেই। দীপুর বাবা রাসমোহন যৌবন থেকেই ঘোরতর নাস্তিক, এই একাত্তর বছর বয়েসে এসেও তা একটুও টলেনি। ঘোরতর বিপদ কিংবা মানসিক সঙ্কটের সময়ও তিনি কালীঘাটে পুজো দিতে যান না, গুরুদেব টুরুদেবের কাছে মন্ত্র নেওয়া তো দূরের কথা।

এ বাড়িতে কোনো গৃহদেবতা ছিল না, কিন্তু ভুলটা রাসমোহনই করেছিলেন। একবার বিন্ধ্যাচলে বেড়াতে গিয়ে একটা কষ্টিপাথরের কৃষ্ণমূর্তি কিনে এনেছিলেন। মূর্তিটা সুন্দর বলেই চোখে লেগেছিল তার। কিন্তু তখনও ঠাকুর দেবতার মূর্তি দিয়ে ড্রয়িংরুম সাজাবার রেওয়াজ হয়নি, রাসমোহনের পিসীমা-জেঠাইমারা একেবারে হই হই করে উঠলেন—বাড়িতে ঐ মূর্তি রাখলে পুজো করতেই হবে। রাসমোহন প্রবল আপত্তি করেছিলেন, কিন্তু তাঁর আপত্তির মধ্যে গোঁয়াতুর্মিই ছিল বেশী, অবিশ্বাসের দৃঢ়তা তেমন ছিল না।

রাসমোহনের স্ত্রী সুহাসিনী তখন এ বাড়িতে নতুন বউ, তিনিই সিঁড়ির পাশের ঘরটায় পুজোর ব্যবস্থা করলেন। সুহাসিনী পুজো-আচ্চা নিয়ে তেমন বাড়াবাড়ি করেন নি কখনো, কিন্তু শেষের দিকে দিনের অনেকটা সময়ই তাঁর ঠাকুর ঘরে কাটতো। সুহাসিনী কৃষ্ণমূর্তির কপালে একটা ছোট্ট সোনার মুকুট গড়িয়ে দিয়েছিলেন। বরাকিস্তুতে রাসমোহনদের দুটো কোলিয়ারি-তেই যেবার ভয়াবহ আগুন লাগলো, খবর পেয়েই বাড়ির পুরুষরা সবাই চলে গেল সেখানে, সেবার সুহাসিনী পুরো দেড়দিন কাটিয়েছিলেন ঠাকুর ঘরে। ঠাকুর অবশ্য সেবার কোলিয়ারি দুটো বাঁচিয়ে দিতে পারেন নি।

দীপুরা ভাইবোনেরা সবাই ছেলেবেলা থেকে মা-ঘেঁষা, বাবার সামনে কেউই পারতপক্ষে যেত না। তবু মায়ের ধর্মভাব ওরা কেউ পায়নি এমন কি মেজদি অপর্ণাও না, বাবার নাস্তিকতাই ওরা পেয়েছে। খুব ছেলেবেলায়, সকালে ঠাকুর মশাই পুজো করে যাবার পর, কলা আর সাগুদানা চটকানো প্রসাদ খেতে দীপুর ভালো লাগতো, একটা অদ্ভুত সুন্দর গন্ধ থাকতো তাতে। পরে দীপু বিধবা মহিলাদের গা থেকে ঐ গন্ধ পেয়েছে।

আশ্চর্য সুহাসিনীর মৃত্যুর পরও কিন্তু রাসমোহন বাড়ির পুজো বন্ধ করেননি। দীপুর বড় পিসীমা মাঝে মাঝে তখন এসে থাকতেন, তিনিই দেখাশুনো করতেন। তিনি মারা গেলেন বছর না ঘুরতেই। তারপরও পুজো বন্ধ হলো না, কিন্তু তখন সেটা হয়ে উঠলো এক বিড়ম্বনা। কে সব গুছিয়ে ব্যবস্থা করে তার ঠিক নেই। অথচ পুরুতমশাইয়ের ছেলে যখন পুজো করতে আসে তখন নজর রাখতে হয়, কেননা, সোনার মুকুট ছাড়াও আরও কিছু দামি জিনিস জমেছে ঠাকুরের সামনে। পুরুত-মশাইয়ের ছেলেটি যথেষ্ট চঞ্চলমতি, চেহারাটা সুন্দর, ধরন ধারন ভালো নয়। মেজদি দু চারদিন পুজোর জিনিসপত্র গুছিয়ে দিতে গিয়ে বাবার কাছে পুরুত-মশাইয়ের ছেলের নামে নালিশ করেছে। তখন বাবার হুকুমে দীপু কিংবা নীলাঞ্জনকে পড়া ছেড়ে সকালে পুজোর সময়টায় বাইরে দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে হতো। বিরক্তিতে গজগজ করতো ওরা।

তারপর এক রাত্তিরে বাড়ির অন্যান্য জিনিসপত্রের সঙ্গে ঠাকুরের সোনার মুকুট, গলার হার—সব চুরি যায়। কৃষ্ণ মূর্তিটাও পড়ে ছিল ঘরের মেঝেতে বাঁশী সমেত ডান হাতটা ভাঙা। ঠাকুরের ভাঙা মূর্তি জোড়া দেবার ব্যাপরে রামকৃষ্ণ-দেবের বিখ্যাত উক্তি সত্ত্বেও পরদিন সকালে রাসমোহন বলেছিলেন, ভেঙেছে, আপদ গেছে! একটা চোরকে আটকাতে পারে না, আবার বাবুগিরি করে রোজ পুজো খাবেন! দে ওটাকে ফেলে দে!

ফেলে দেওয়া হয়নি অবশ্য, পেতলের সিংহাসনের বদলে দেয়ালের তাকে তুলে রাখা হয়েছে। দীপুই রেখেছিল। দু'এক হাজার বছর পর প্রত্নতাত্ত্বিকরা ওটা খুঁজে পেলে আনন্দে লাফিয়ে উঠবে, এই তার ধারণা। সেই থেকে পুজো বন্ধ। পুরুত-মশাইয়ের ছেলে শ্যামবাজারের কাছে একটা গেঞ্জির দোকান খুলেছে, দীপুর সঙ্গে দেখা হয় মাঝে মাঝে। আগের মতন তার মুখখানা আর তেল চুকচুকে নেই, বেশ খেটে খেতে হয় তাকে। কিছুদিন বাদে একটা জায়গায় দীপু তাদের বাড়ির ঠাকুরের সোনার মুকুটটা দেখে ঠিক চিনতে পেরেছিল।

ঠাকুর ঘরটা বছর দুয়েক হলো খালিই পড়েছিল। যত রাজ্যের অকেজো জিনিস জমা হতো সেখানে। অবিলম্বেই যত রাজ্যের পোকা মাকড়ের বাসা হলো। একদিন একটা তেঁতুলে বিছেও বেরিয়েছিল। কয়েকদিন আগের সেই রাত্তিতে বাবা বাথ-রুমে অজ্ঞান হয়ে যাবার পর, মেজদি এই ঘরখানা আবার পরিষ্কার টরিষ্কার করিয়ে এখন এই ঘরেই শুচ্ছে টুলটুলকে নিয়ে। সিঁড়ির ওপাশেই বাথরুম, বাবার ঘরটাও পাশে।। রাত্তিরে বাবার হঠাৎ কোনো দরকার হলে কিংবা শরীর খারাপ হলে মেজদি তাড়াতাড়ি জানতে পারবে।

আগে মেজদি শুতো রাস্তার দিকে বারান্দার কাছে, দীপুর পাশের ঘরে। বাবার ঘর থেকে ডাকলে ওখান থেকে ভালো শোনা যায় না। ওদিকটায় এখন দীপু একেবারে একা।

মেজদি এমনিতেই ঘুমোয় অনেক রাত করে। টুলটুলকে পড়ায়, খাইয়ে ঘুম পাড়ায়, তারপর বাবার জন্য দুধ গরম করে দেয়। ঘুমোবার আগে এক গ্লাস গরম দুধ খাওয়া বাবার বহুদিনের অভ্যেস। বাবা আলো জেলে ঘুমিয়ে পড়লে মেজদি গিয়ে আলো নিবিয়ে দিয়ে আসে। তার পরও অনেকক্ষণ জেগে থাকে মেজদি। কোনো কোনো রাতে বাথরুমে যাবার সময় দীপু জানলা দিয়ে দেখেছে, মেজদি কি যেন লিখছে। কি লেখে মেজদি? আজকাল বুদ্ধদার চিঠিও আসে খুবই কম, রোজ রাত জেগে তার উত্তর লেখার কোনো প্রশ্নই

ওঠে না। তবু মেজদি মধ্যরাত্রির আলো পুড়িয়ে পাতার পর পাতা লিখে যায়।

নিচতলাটা পুরোটাই ভাড়া দিয়ে দেওয়া হয়েছে, দুটো দোকান ঘর—ভেতরের ঘরটা একটা কাগজ কোম্পানির গোডাউন। সন্ধ্যের পর বাড়িটা একেবারে নিঝুম হয়ে যায়। টুলটুল যতক্ষণ জেগে থাকে, ততক্ষণ তবু তার গলার আওয়াজ শোনা যায় মাঝে মাঝে, তা ছাড়া বাড়ির আর কেউ কারুর সঙ্গে প্রয়োজন ছাড়া কথা বলে না। মা বেঁচে থাকতে সন্ধেবেলা বিরাট আড্ডা হতো, ভেতরের বারান্দাটায় চেয়ার-মোড়াগুলো ভরে যেত, ছোট বড় কোনো ভেদ ছিল না। মেসোমশাই খুব ব্যস্ত ডাক্তার হলেও প্রায়ই এসে পড়তেন হাতে সন্দেশের বাক্স নিয়ে— মেসোমশাইয়ের গাড়ি দরজার সামনে থামলেই সবাই বুঝতে পারতো, সেদিন সন্দেশ খাওয়া হবে। তাও একটা দুটো করে নয়— মেসোমশাই চার-পাঁচ ডজনের কম সন্দেহ কিনতেন না কখনো। নিজে ডাক্তার হয়েও মেসোমশাই বাবার মিষ্টি খাবার দুর্বলতাটা প্রশ্রয় দিতেন—সে অভ্যেস বাবা এখনও ছাড়তে পারেন নি।

মায়ের মৃত্যুর পর বাবার একটা পরিবর্তন চোখে পড়েছিল দীপুর। বাবার খুব ঘুম কমে গেছে। রাসমোহন রজোগুণে সম্পন্ন পুরুষ। এক সময় খেলাধুলো করতেন খুব, মাছ-মাংস-মিষ্টি সবকটাই সমানরকম এবং বেশী পরিমাণে খেতে ভালোবাসেন, মানুষের সঙ্গে ধমকে কথা বলে আনন্দ পান, এই সব মানুষের ঘুমও হয় দুশ্চিন্তাহীন গাঢ়। তিনি আগে এগারোটা—সাড়ে এগারোটায় শুয়ে পড়তেন, এক ঘুমে সকাল, তাও আটটার আগে বিছানা ছেড়ে উঠতেন না। যখন খেলাধুলো করতেন, তখনও নাকি ভোরে ঘুম থেকে ওঠার ব্যাপারেই চিরকাল গড়িমশি করতেন। এক সময় ফুটবল খেলায় বেশ নাম ছিল তাঁর, পুরোনো কালের খেলোয়াড়রা এখনো অনেকে রাসু সরকারের নাম শুনলে চিনতে পারবেন।

এখন আর তাঁর সেই ঘুম নেই। দীপু প্রায়ই সকালে ঘুম ভেঙে দেখে বাবার ততক্ষণে মুখ ধোওয়া, চা খাওয়া হয়ে গেছে। দীপু মনে মনে বেশ অবাক হয়েছে।

বুড়ো বয়েসে এমনিতেই ঘুম কমে যায়, প্রায় সময়েই ঘুম পায়—কিন্তু কখনো গভীর হয় না। তা ছাড়া, আরও কি একটা অস্বস্তিতে যেন রাসমোহন বিছানায় বেশীক্ষণ থাকতে পারেন না। সেদিনও তাঁর ঘুম একেবারে চটে গেছে রাত সাড়ে চারটের সময়। তখনও ভোরের আলো অনেক দূরে। অনেকক্ষণ বিছানায় এপাশ-ওপাশ করলেন, সবে মাত্র অন্ধকার একটু পাতলা হতেই উঠে পড়লেন।

এই বয়েসেও একটাও দাঁত পড়েনি, চোখে ছানি পড়েনি, শরীরে কোনো পেটিং-গেস্ট অসুখ নেই। মাঝ মাঝে শুধু হাঁটুর কাছ দুটো একটু টনটন করে। একবার গৌহাটিতে খেলতে গিয়ে দু' পায়ে সাংঘাতিক চোট লেগেছিল, এতদিন বাদে সেটা আবার মাসুল দিচ্ছে। কোনো কোনো দিন সকালবেলা খাট থেকে প্রথম মাটিতে নামলেই এমন ব্যথা হয় যে, দাঁড়িয়ে থাকাই অসম্ভব মনে হয়। একটু বাদেই ঠিক হয়ে যায় অবশ্য।

আজও হাঁটুর কাছে ওরকম টনটনিয়ে উঠলো, টলে পড়ে যাচ্ছিলেন, খাটের বাজু ধরে সামলে নিলেন। একটুক্ষণ স্থির হয়ে থাকবার পর ব্যথাটা একটু একটু করে কমলো, তারপর আস্তে আস্তে একটা পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে ঠিক করে নিলেন। সোজা হয়ে দাঁড়ালেন ঘরের মাঝখানে। শুধু একটিমাত্র জানলা খোলা, সেখান দিয়ে অল্প আলোই এসেছে, এছাড়া বিশাল ঘরটার কোনায় কোনায় এখনও অন্ধকার দরজা খুলে বাইরে এলেন, কিছু না ভেবেই মুখ ধুয়ে ফেললেন। তারপরই একটু চা খেতে ইচ্ছে করলো। পাঁচটাও বাজেনি বোধ হয়, রাঁধুনী রাত্রে এখানে শোয় না, ছ'টার আগে সে আসবে না। এখন কি করা?

বাথরুমের পাশের চওড়া জায়গাটায় কয়েকটা ফুলের টব। রজনীগন্ধা ও দোপাটি ফুটেছে দু'চারটে, শিশিরে ভিজে আছে। একটা বেড়াল গুটিসুটি মেরে ঘুমিয়ে আছে টবগুলোর পাশে। রাসমোহন আকাশের দিকে তাকালেন। পূর্ব গোলার্ধে এখন ব্রাহ্ম মুহূর্ত, সূর্যের দেখা নেই, কিন্তু অতসী ফুলের মতন চাপা নীলচে আলো ফুটছে ক্রমে ক্রমে।

পার্কের পাশের চায়ের দোকানটা খুলে যাবে একটু বাদেই। মানিকতলার মোড়ের কাছে এই সময়টায় গরম গরম জিলিপি ভাজে। রাসমোহন একবার ভাবলেন নাতনীকে নিয়ে বেড়াতে বেরুবেন। ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ভাব জমাতে পারেন নি কোনোদিন, নিজের ছেলে মেয়েদের নিয়ে কোনোদিন বেড়াতে যান নি। কিন্তু টুলটুলের সঙ্গে এখন তাঁর বেশ ভাব। নিজের বাবাকে দেখেনি কখনো টুলটুল, জীবনে কখনো দেখবে কিনা সন্দেহ। এই বয়েসেই মেয়েটা বড় জেদী হয়ে উঠছে। পড়াশুনোয় ভালো, ব্যবহারও ভালো, কিন্তু একবার যদি কোনো কিছুতে বেঁকে বসে, পৃথিবীতে কার সাধ্য ওকে বোঝাবে! শিঙি মাছের ঝোল খাবে না তো কিছুতেই খাবে না, পৃথিবী উল্টে গেলেও সে একবারও ছুঁয়েও দেখবে না। অপর্ণা এক এক সময় মেজাজ সামলাতে পারে না, ঠাস্ ঠাস্ করে চড় কষায় টুলটুলকে। রাসমোহন নিজেও এক সময় ছেলেমেয়েদের খুব মারধোর করতেন, কিন্তু টুলটুলকে মারা একটুও সহ্য করতে পারেন না। অপর্ণা টুলটুলের গায় হাত তুললে এমন রেগে যান যে তখন প্রায় অপর্ণাকেই মারতে যান আর কি!

জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলেন, টুলটুল আর অপর্ণা দু'জনেই অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ঘুমোলে মানুষের মুখ একটু বদলে যায়, অপর্ণাকে এখন অনেক ছেলে-মানুষের মতন দেখাচ্ছে, মুখখানা একটু হাসি হাসি—কি যেন একটা স্বপ্ন দেখেছে। একটা হাত টুলটুলের গায়ের ওপর রাখা। বোধ হয় একটু একটু শীত করছে টুলটুলের, গুটি শুটি মেরে শুয়ে আছে বুক ঘেঁষে। বেশ সুন্দর এক মাথা চুল হয়েছে মেয়েটার।

রাসমোহন অনুচ্চ গলায় টুলটুলকে ডাকলেন, মা মনি, মা মনি! ভোর বেলার গাঢ় ঘুম, জাগলো না। আবার ডাকলেন দু'বার। টুলটুল পাশ ফিরে শুলো। অপর্ণার ঠোঁট এখনও হাসি হাসি, স্বপ্নটা এখনো চলছে বোধ হয়।

আর ডাকলেন না, থাক ঘুমোক আর একটু। জানলা দিয়ে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন ঘরের দিকে, মেয়ে ও নাতির পরিপূর্ণ ঘুম দেখতে লাগলেন। তিনি আর বাকি জীবনে কখনো এমন নিটোলভাবে ঘুমোতে পারবেন না।

ঘরখানায় হোয়াইট ওয়াশ করানো দরকার। অনেক কাল অব্যবহৃত হয়ে পড়েছিল, দেয়ালগুলো রীতিমতন ময়লা হয়ে গেছে। যখন ঠাকুর ঘর ছিল, তখন এ বাড়ির কারুর বিয়ের সময় এই ঘরেই যজ্ঞ হতো। দেয়ালে দু'তিনটে বসুধারার চিহ্ন, লম্বা লম্বা লাল রেখা। অপর্ণার বিয়ে হয়েছিল এই ঘরে। রণেনটা একটা হারামজাদা। জার্মানিতে গিয়ে বসে আছে তাই, নইলে হাতের কাছে পেলে রাসমোহন জুতিয়ে ওকে ঠাণ্ডা করে দিতেন। রণেনের সঙ্গেই যদি জোর জোর করে অপর্ণাকে পাঠানো যেত...

জানলার কাছ থেকে সরে এলেন। এখন তাঁর কিছুই করার নেই। খানিকক্ষণ ঘুরে ঘুর করতে লাগলেন এখানে সেখানে। অস্বচ্ছ আলোয় স্তব্ধ বাড়িতে তিনি একা শুধু জেগে।

একবার এসে দাঁড়ালেন রাস্তার ধারের বারান্দায়। রাস্তাটা সম্পূর্ণ নির্জন, ধাঙরয়াও এখনো বেরোয়নি, আসে নি দুধের গুমটির মেয়েরা। বড্ড আগে উঠে পড়েছেন আজ। কিন্তু উপায় কি, বিছানায় থাকতে যে আর একটুও ইচ্ছে করছিল না। বাঁধুনি আসবার আগে বাড়ি থেকে বেরুনোও মুশকিল, সদর দরজা খোলা থাকবে—যদি কেউ ঢুকে পড়ে...।

বারান্দাতেই পায়চারি শুরু করলেন

রাসমোহন। বারান্দার এক কোণে একটা ভাঙা তিন চাকার সাইকেল পড়ে আছে। ওটাকে আর এখানে রাখা কেন, ফেলে দিলেই তো হয়। সামনের চাকাটা তোবড়ানো, হ্যান্ডেলে মরচে পড়েছে—ওটা দিয়ে আর কোনো কাজ হবে না, তা ছাড়া টুলটুল সাইকেল চড়তে চায় না। বাড়িতে আর কোনো বাচ্চা তো নেই।

এই সাইকেলটা ছিল নীলাঞ্জনের। নীলাঞ্জন এ বাড়ির প্রথম ছেলে, তার মাসীদেরও কারুর কোনো ছেলে হয়নি, সব মেয়ে—খুব আদর ছিল নীলাঞ্জনের। তার ছেলেবেলার অনেক জিনিস এখনও সারা বাড়িতে ছড়িয়ে আছে। সে হতভাগা তো গত দেড় বছরের মধ্যে একবারও আর এ বাড়িতে পা দেয়নি। গত বছর পুজোর পর প্রণাম করতেও আসেনি। এলেও অবশ্য দূর করে তাড়িয়ে দিতাম! এক [illegible] বামুনের মেয়েকে বিয়ে করে... আমি বীরেন গুহকে কথা দিয়েছিলুম তার মেয়ের সঙ্গে...'

রাসমোহনের যত রাগ গিয়ে পড়লো ঐ তিনচাকার সাইকেলটার ওপর। শুধু শুধু জায়গা জুড়ে আছে একটা অকেজো জিনিস—দু'হাতে সেটাকে তুলে বারান্দা থেকে ফেলে দিলেন রাস্তায়।

একটা বিশ্রী ঝনঝনে আওয়াজ হলো। রাসমোহন একটু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন, একটু অপরাধীর মতন তাকালেন পাশের ঘরে। ওখানে দীপু ঘুমোয়, তার ঘুম ভাঙেনি তো? না। এই ছেলেটার শোওয়ার ধরন বড় বিশ্রী। কোথায় বালিশ থাকে তার ঠিক নেই, চাদর কুঁকড়ে যায়। উপুড় হয়ে ঘুমোনো স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ, তবু সেই উপুড় হয়ে মুখটা একেবারে গুঁজে ঘুমোবে। এই ছেলেটা যদি একটু খেলাধুলোর চর্চা করতো, চেহারাটা খারাপ নয়—তা না, খালি টো টো করে ঘোরা।

রাসমোহন পায়চারি করতে করতে বারান্দার এ পাশে চলে এলেন, আবার ওপাশে গিয়ে দীপুর ঘরের দিকে তাকালেন। দীপু ঘরের দরজাও বন্ধ করে না—রাস্তার ধারে ঘর, পাশের ঘরটাও এখন খালি—চোর চোর যদি আসে...কিন্তু কথা বললে কি আর শুনবে এ ছেলে!

কিছু না ভেবেই দীপুর ঘরে ঢুকে পড়লেন রাসমোহন। অনেকদিন পরে এ ঘরে এলেন। তাঁর নিজের কৈশোরে এই ঘরটাই ছিল তাঁর শোওয়ার ঘর। সারা বাড়ি তখন লোকজনে গম গম করতো। এখন তো অনেক ঘর কাজেই লাগে না। ছেলেটা কি বিশ্রী নোংরা করে রেখেছে ঘরটা। বালিশের ওয়াড় কতদিন কাচা হয়নি কে জানে। পানি এগুলো একটু দেখে না? টেবিলের ওপর বইপত্তর আলমারিতে কতকগুলো পাথরের মূর্তি—সাঁওতাল পরগনা-টরগনা থেকে নিয়ে এসেছে বোধ হয়। কোনো দেয়ালে কোনো ছবি বা ক্যালেন্ডার নেই। এক দেয়ালে ওদের মায়ের একটা ছবি ছিল এক সময়, নীলাঞ্জন সেটা নিয়ে গেছে।

পাশ বালিশটা মাটিতে পড়ে গেছে, রাসমোহন সেটা তুলে দিলেন। তারপর তিনি একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন বোধ হয়, এক সময় খেয়াল হলো, তিনি এক দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ ধরে দীপুর মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। উপুড় হয়ে শুয়ে আছে, মুখখানা সামান্য পাশ ফেরানো, দেখতে পাচ্ছেন কপালের খানিকটা অংশ, একটা বোজা চোখ ও চিবুকের রেখা আর এক মাথা এলোমেলো চুল। অবাধ্য সন্তানের মুখের ঐটুকু অংশে তিনি নির্নিমেষে কি দেখছেন? দীপু একটু নড়ে উঠতেই তিনি চমকে উঠলেন, অনেকটা যেন ধরা পড়ার ভয়েই দ্রুত কিন্তু নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

আর পায়চারি করতে ভালো লাগলো না, এবার তিনি সিঁড়ি দিয়ে নেমে সদর দরজা খুলে নেমে এলেন রাস্তায়। একটু চা খেতেই হবে।

এখন কিছু কিছু লোকজন চলাতে শুরু করেছে। ফটফট শব্দ করে জল দেওয়া হচ্ছে রাস্তায়। সিটি কলেজের মেয়েরা চলেছে দলে দলে, দুধের গুমটির সামনে লাইন। কলেজের ওপাশের চায়ের দোকানটার চা খেতে যাবেন, না মানিকতলার দিকে জিলিপির দোকানে যাবেন—এই নিয়ে একটু ইতস্তত করতে লাগলেন। জিলিপির দোকানেও ভাঁড়ে চা পাওয়া যায় অবশ্য।

একটা সরু গলির ঠিক মুখের কাছে দু'জন লোক দাঁড়িয়ে ছিল। শীত কবে শেষ হয়ে গেছে, তবু ওদের একজনের গায় একটা মুগার চাদর জড়ানো। রাসমোহন ওদের ভালো করে লক্ষ করেননি, ওদের পেরিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন। সেই সময় মুগার চাদর গায়ে লোকটি ডাকলো, রাসুদা।

রাসমোহন থমকে দাঁড়ালেন, লোকটিকে দেখে রীতিমতন অবাক হয়ে গেলেন। অস্ফুট গলায় বললেন, নিতাই?

লোকটি আবার ডাকলো রাসুদা!

লোকটির ডাকের ভঙ্গি এমন যে সে রাসমোহনের সঙ্গে কিছু জরুরি কথা বলতে চায়—কিন্তু সে নিজে এগিয়ে আসবে না, রাসমোহনকেই তার কাছে যেতে হবে। লোকটির বয়েস বছর চল্লিশেক হবে, মুখটা যে-কোনো সাধারণ মানুষেরই মতন, কিন্তু চোখ দুটো একটু ছোট আর লালচে ধরনের।

রাসমোহন এগিয়ে এলেন না। কিন্তু হঠাৎ [illegible] জোর বেলায় রাস্তায় বেরুবার জন্য আফসোস করতে লাগলেন। লোকটি আসলে [illegible] [illegible] ছেড়ে সরতে চায় না, সে রাসমোহনকে [illegible] [illegible] [illegible] অনুরোধ করলো। তার সঙ্গী দাঁড়িয়ে রইলো একই জায়গায়।

রাসমোহন জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আবার কবে এলে?

—পরশু দিন!

—কেন! এলে কেন? যেখানে ছিলে

—না এসে উপায় নেই। পয়সাকড়ি একদম শর্ট। রাসুদা, আমার কিছু টাকা দরকার।

—টাকা? আমার হাতে এখন একদম টাকা নেই।

লোকটি রাসমোহনের এই কথাটা যেন একেবারে শুনতেই পেল না। বস্তুত, এরপর থেকে সে যা বলতে লাগলো, তা নিছক এক তরফা, রাসবিহারীর উত্তরের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। সে বললো, আমি আছি শশাঙ্কর ওখানে। আপনার সঙ্গে আজই দেখা করতাম। আমার আজই দুশো টাকা দরকার।

—দুশো টাকা! আমি কোথেকে দেবো।

—বিকেলে ক'টার সময় টাকাটা আনতে যাবো!

—শোনো নিতাই, তোমার এভাবে এখানে আসা...তুমি ফিরে যাও, তারপর দেখি যদি

—টাকাগুলো সব এক টাকার নোটে পেলে ভালো হয়। আমি আপনার বাড়িতে যাবো, না আপনি কোথাও এসে

—নিতাই, বেশী তেঁড়েমি করো না! বলছি, আমার কাছে এখন টাকা নেই।

মুগার চাদর গায়ে নিতাই নামের লোকটি রাসমোহনের দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে রইলো, তারপর একটু হেসে বললো, রাসুদা, এতদিন বাদে কলকাতায় এলাম, আর আপনি আমাকে ধমকাচ্ছেন?

—কে তোমায় আসতে বলেছে?

—বাঁচতে হলে কিছু খেতে পরতে হবে তো! একদম পয়সা নেই হাতে। আজ বিকেলেই আমার দুশো টাকা চাই।

—তারপর আবার ফিরে যাবে?

—দেখি সেটা, কি করা যায়!

[ক্রমশ]

NEW KING SIZE
No.1
BEAUTY SOAP
গোদরেজ
নং১ সাবানে
ভরা রয়েছে
গোদরেজ নং ১—সৌন্দর্যের সাবান
যেটি অনেক দিন—সুগন্ধ ছড়িয়ে যাবে
Interpub . G. S. No. III A

রবীন্দ্রনাথের প্রথম হিন্দী বক্তৃতা

এ বৎসর শারদীয়া দেশ পত্রিকায় শ্রীনেপাল মজুমদার কর্তৃক সংকলিত 'রবীন্দ্রনাথের প্রথম হিন্দী বক্তৃতা' প্রকাশিত হয়েছে। সংকলকের প্রতি সাধারণ রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসু হিসাবে কয়েকটি প্রশ্ন সবিনয়ে নিবেদন করতে চাই।

প্রথম প্রশ্ন, এটি কি রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত প্রথম হিন্দী ভাষণ?

কবির মূল বক্তৃতার মধ্যে কোথাও এমন কোনো নির্দেশ নেই যে, এটিকেই তাঁর প্রথম হিন্দী বক্তৃতা বলে গ্রহণ করা যেতে পারে।

এটি যে রবীন্দ্রনাথের প্রদত্ত প্রথম হিন্দী ভাষণ এমন কথা রবীন্দ্র জীবনীকার শ্রদ্ধেয় প্রভাত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও কোথাও উল্লেখ করেননি।

সন্তোষচন্দ্র মজুমদার এই বক্তৃতাটি 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকায় 'আচার্য রবীন্দ্রনাথের হিন্দী বক্তৃতা' নাম দিয়ে প্রথম প্রকাশ করেন। এই বক্তৃতার সঙ্গে সন্তোষবাবু লিখিত যে নোটটি ছিল, নেপালবাবু সেটিও পুনর্মুদ্রিত করেছেন। সেই নোটে সন্তোষবাবু লিখেছেন, "ইহাই বোধ করি তাঁহার প্রথম হিন্দী বক্তৃতা। ইহার পরও তিন চারবার তিনি গুজরাটে হিন্দীতে বক্তৃতা দিয়াছেন।" সন্তোষবাবু সম্পূর্ণ নিশ্চিত ও নিঃসংশয় ছিলেন না বলেই 'বোধ করি' শব্দটি অত্যন্ত সচেতনভাবেই ব্যবহার করেছিলেন। সন্তোষবাবু সংকলিত হিন্দী ভাষণটিই নেপালবাবু পুনর্মুদ্রিত করেছেন এবং সন্তোষবাবু প্রদত্ত নোটই উদ্ধৃত করেছেন, কোনো নতুন প্রমাণ দেননি, তথাপি নেপালবাবু রবীন্দ্রনাথের এই ভাষণটিকে কিভাবে 'প্রথম হিন্দী বক্তৃতা' বলে নিঃসংশয়ে উল্লেখ করলেন, তা দেশ পত্রিকার পাঠকবর্গের প্রতি সংকলকের জানানো আবশ্যক বলে মনে করি।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, রবীন্দ্রনাথের এই ভাষণটি কি কবির স্ব-লিখিত? নেপালবাবু লিখেছেন: "বক্তৃতার পূর্বে কবি তাঁর ভাষণটি অন্য কাউকে দিয়ে হিন্দীতে তর্জমা করিয়ে নিয়েছিলেন; —না নিজেই লিখে তা সভায় পাঠ করেছিলেন, সন্তোষচন্দ্র তা পরিষ্কার লেখেননি।" দুঃখের বিষয় নেপালবাবু নিজেও এ বিষয়ে কিছু বলেননি। অথচ এ সম্পর্কে স্পষ্ট মন্তব্য আছে, 'রবীন্দ্র-জীবনী' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে রবীন্দ্রনাথের 'গুজরাট ভ্রমণ' বৃত্তান্তের মধ্যে। সেখানে অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই এই হিন্দী বক্তৃতা সম্পর্কে লিখিত আছে, "বলা বাহুল্য, ক্ষিতিমোহন সেন কবির বক্তব্যকে হিন্দীতে লিখিয়া দিয়াছিলেন।" রবীন্দ্রজীবনীকারের এই মন্তব্যটি নেপালবাবুর দৃষ্টিতে পড়েনি।

নেপালবাবু তাঁর প্রবন্ধে গান্ধীজীর যে পত্রগুলি ব্যবহার করেছেন, তার সবগুলিই Complete works of Gandhi গ্রন্থমালার মধ্যে ইংরাজিতে মুদ্রিত আছে। নেপালবাবু সেই চিঠিগুলির 'মর্মার্থ' না লিখে অনুবাদ করলে ভাল হতো।

প্রভাতবাবুর মন্তব্য অনুসারে এই হিন্দী ভাষণটি রবীন্দ্রনাথের স্বলিখিত নয়। তথাপি বলবো এই ভাষণটির একটি বিশেষ মূল্য আছে। গান্ধীজীর অনুরোধেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর বক্তৃতা হিন্দীতে তর্জমা করিয়ে নিয়েছিলেন এবং এই বক্তৃতায় যা কিছু কথা তা কবির নিজেরই বাণী। কবি মুখে মুখে বলেছিলেন এবং শ্রদ্ধেয় ক্ষিতিবাবু হিন্দীতে অনুবাদ করে নিয়েছিলেন, না, কবির লিখিত বাংলা ভাষণ ক্ষিতিবাবু অনুবাদ করেছিলেন জানা যাচ্ছে না। তবে এই হিন্দী বক্তৃতার কোনো মূল বাংলা রূপ পাওয়া যায়নি।

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য
শান্তিনিকেতন

ধানের নাম লক্ষ্মী

বাংলা দেশের মানুষ আমরা—মোদ্দা কথায় 'ভেতো' বাঙালী। অথচ ভাতের পূর্বপুরুষদের আমরা আদৌ 'চিনি' না—'জানি' মাত্র, সেটি কেবল 'ধান' এই নামে। এই ধান যে কত রকমের হতে পারে, তার পরিচয় আমাদের অন্নদাতা (!) মন্ত্রীরা তো জানেনই না, (জানলেও ঠিকমতো চেনেন কিনা সন্দেহ!) উপরন্তু পাসকরা এগ্রিকালচারিস্টরাও রীতিমতো জানেন না। বলতে পারি, গাঁয়ের অনেক অশিক্ষিত চাষীরা এর সার্থক হদিস যেমন দিতে পারেন, তেমনি অবলীলাক্রমে বাতলেও দিতে পারেন কোন জমিতে কোন ধান ভাল জন্মাবে। এগুলো তাদের অভিজ্ঞতার পরিমাপে অবশ্য স্বীকৃত হয়েছে। অথচ পাস-করা বাবুরা কেবল দু-চারটে বিদেশী ধানচাষের পদ্ধতিকে নিয়েই তম্বিহম্বি করে দেশে যেন 'বিপ্লব' আনতে হন্যে হয়ে উঠেছেন। কিন্তু স্বদেশী ধানের আপন পদ্ধতিতে চাষের প্রতি তাঁদের বীতশ্রদ্ধ মনোভাবটি যে কতখানি অদূরদর্শিতার পরিচায়ক হয়ে উঠেছে, তা আমাদের গ্রাম-বাংলার চাষীবাসীরাই ভালো বোঝেন, যত না বোঝেন শহুরে লালবাড়ির কর্তারা। তাই বলছি, জব্বার সাহেবেরই উপস্থাপিত লক্ষণ বাগ-এর কথায়—"দুজন বাঙালী সাহিত্যিক, দুজন বিজ্ঞানী, দুজন প্রফেসর, দুজন মন্ত্রী—এদের একমুঠো করে ধান নিয়ে দেখিয়ে শুধোও, এটা কি ধান বলো তো হে বাপু—বাপু তো চোখে সরষে ফুল দেখবেন। এই তো দেশের হাল! কিন্তু জাপানের একজন সাহিত্যিক একজন মন্ত্রী মাটির খবর সব জানেন।" বলা বাহুল্য, জব্বার সাহেবের লক্ষণ বাগ-ই গ্রাম-বাংলার আসল 'চাষা', যারা চাষ বোঝে, চাষকে যারা আশা-ভরসায় আবাস বানিয়ে নিয়েছে। যারা এ-সম্বন্ধে কিছু লেখে না তাদেরকে সে দোষারোপ করে বলে, "কচু লেখে। ...এই বাংলা দেশটা ধানের দেশ তো! কই বলো তো বাছা কোন "ল্যাখক" তোমাদের ধান সম্বন্ধে সঠিক কিছু লিখেছে?... জানালে তো বলবে।" লক্ষণ বাগ সত্যি কথা বলেনি কি?

অশিক্ষিত হলেও শিক্ষিতকে টিট করতে লক্ষণ বাগেরা কসুর করে না। দেশের কথা যারা জানে না, তাদের শিক্ষাও সু-শিক্ষা নয়, অসম্পূর্ণ—[illegible] কাজ করে না। সে একনাগাড়ে শতখানেক ধানের নাম করে যায়।

আমাদের চাষবাসের, বিশেষত ধান-চাষের এমত দুরবস্থা দেখে লক্ষণ বাগ দুঃখ পায়। সে ভাবে, কেবল বিদেশী কায়দা গ্রহণ করলেই এদেশ উন্নত হবে না। আমাদের দেশের মাটি আর ধানকেই সর্বাগ্রে ভাল করে জানতে হবে, কোনখানে কোন ধান ফলনের উপযোগী। তা না করে 'বিপ্লব বিপ্লব' চেঁচালেই 'বিপ্লব' হয় না, "বিপ্লব করতে হয় তো করো নিজের সঙ্গে, মাটির সঙ্গে, মনের সঙ্গে, মানের সঙ্গে, ধানের সঙ্গে। ...বাংলা দেশের আপদ তো তোমরাই হে!" তার আরও দুঃখ হয় যখন সে বলে, কি হবে এতো সব ভেবে "আর চাইতে রাত অনেক হল, পথ ছাড়ো ছাড়ো চলো ভূতের মতন ঘরে যাই—মেলা মার্কিন গমের গরুর চমৎকার ফসল ছুঁড়ো গো!" এই হল আজকের গ্রাম-

বাংলার চাষীদের মর্মবেদনা। দু' পাতা পড়ে "সাপের খোলসের" মতো জামা আর ষাট-সত্তর টাকার প্যান্ট পরে গরম গরম বুলিতে যারা দেশ ছেয়ে বেড়াচ্ছে, তাদের দ্বারা যে 'বিপ্লব' হয় না—একথা লক্ষণ বাগেরা জানে। কিন্তু তবুও তারা কিছু বলতে পারে না। তাদের প্রাণ কেঁদে ওঠে, ক্ষোভ করে বলে—

"গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু,
পুকুরভরা মাছ তোর কোথায় গেল
ওরে বাঙালী
তোর ধর্ম গেল কর্ম গেল
সব তো খোয়ালী
রাজনীতির শিকার হয়ে
হলি কাঙালী।"

হক কথা বলতে কি, "রাজনীতির শিকার হয়ে"ই আমরা দরিদ্র, ক্ষুধার্ত আর "কাঙালী" হয়ে দোরে দোরে 'হা—অন্ন' করে ঘুরে মরছি! এ-মরণ ঘুচবে সেইদিন যেদিন লক্ষণ বাগেদের মতো সমস্ত বাঙালীর মন আর চোখ সজাগ হয়ে উঠবে।

জব্বার সাহেবকে এই প্রসংগে জানিয়ে রাখি, তিনি যে সমস্ত ধানের নাম দিয়েছেন (বাংলার চাষীর—ধানের নাম লক্ষ্মী: দেশ, ৪৭ সংখ্যা, ১৩৭৬) সে-গুলি ছাড়াও গ্রামবাংলায় আরো অনেক ধরনের ধান প্রচলিত প্রথায় আবদ্ধ হয়ে আসছে। যেমন—মেটে, ঘুঙুরশাল, রঘুশাল, নামনকাঠি, বেগুনবিচি, হীরামতি, কালিন্দী, নেবুশাল, মোহনভোগ, কুর্বাজ, নোনা' সাজনোনা' পাশাকাটি প্রভৃতি।

শ্রীরজতকুমার পাঞ্জা
মেদিনীপুর

পুজা সংখ্যার লেখা

মহাশয়,

৪ অকটোবরের দেশ পত্রিকায় আমার ২৭-৯-৬৯ তারিখের পত্রে জানিয়েছিলাম, সেই পর্যন্ত আমি কোন কোন শারদীয় পত্রিকায় লেখা দিয়েছি। তারপরে আমি 'ধ্বনি' সাপ্তাহিকেও একটি উপন্যাস লিখেছি। 'অপরূপ' পত্রিকাকে একটি রচনা দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছিলাম। শেষ পর্যন্ত শারীরিক অসুস্থতার কারণে তা আর পারিনি। নমস্কারান্তে,

সমরেশ বসু
১৬-৯-৬৯

পূর্ব বাংলার লোকসংগীত

গত ১৭ই মে 'দেশ' পত্রিকায় সম্প্রতি প্রকাশিত একটি বইয়ের প্রশংসা করেছেন শ্রদ্ধেয় শার্ঙ্গদেব। বইটি দিনেশ চৌধুরী সম্পাদিত পূর্ব বাংলার লোকসংগীত। সংকলনটি প্রশংসনীয় উদ্যম সন্দেহ নেই, অনেক দিনের অভাব পূরণের প্রথম পদক্ষেপ। শার্ঙ্গদেব শুভেচ্ছাপূর্ণ মন্তব্যের জন্য হয়েছেন ধন্যবাদার্হ।

শার্ঙ্গদেব এক জায়গায় লিখেছেন প্রতিটি "সংগীত প্রতিষ্ঠানকে এই গ্রন্থটি তাদের গ্রন্থাগারে রাখবার অনুরোধ করি।" জানি না এর পিছনে কোন ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি আছে কিনা। তা যদি না থাকে, তবে বলব তার উপরোক্ত মন্তব্য সুচিন্তিত নয়। বইটির দোষত্রুটি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য নিম্নে

বুঝলাম। (১) প্রভাতী গান—প্রভাতী হিসাবে উল্লেখিত দুটি গান "কত সাধ করে কুঞ্জ সাজাইয়া" ও "উপায় কি সখী তোরা" কী করে প্রভাতী গান হল বুঝলাম না। উল্লেখিত গান দুটিকে কুঞ্জের গান বলা যায়। বিশেষ করে পূর্ব বাংলার শ্রীহট্ট অঞ্চলে ঝুলন যাত্রা এবং রামলীলায় এই ধরনের গান গাওয়া হয়। রাত্রের শেষ দণ্ডে প্রভাত হওয়ার পূর্বে কুঞ্জের গানস্বরূপ এই গানগুলির প্রচলন। এই ধরনের গানের সঙ্গে প্রভাতী গানের সম্পর্ক নেই। যদিও সুরের মধ্যে খানিকটা মিল আছে। প্রভাতী গানের কথা ও সুর সম্পূর্ণ আলাদা এবং এই গান শুধু প্রভাত কালে গীত হয়। আর কুঞ্জের গান সাধারণত মধ্য রাত্র হতে শেষ রাত্র পর্যন্ত গাওয়া হয়। প্রথম গানটির শেষে আছে "সুখময় বলে রাধে..."। লেখক সুখময় দাস এখনও জীবিত। বোধ হয় গোয়ালপাড়া জেলায় আছেন। উনি এটা কুঞ্জের পর্যায়ভুক্ত গান হিসাবে রচনা করেছিলেন। (২) গোষ্ঠ—সূচীপত্রে উল্লেখিত 'গোষ্ঠ' পরে কেন 'গোঠে'-তে রূপান্তরিত হল? পূর্ব বাংলায় গোষ্ঠকে গোঠে বলা হয় না। (৩) বিচ্ছেদ—"বিশখে শ্যাম শোকেতে আমারই মরণ" গান খানির কথা দিনেনবাবু নিজের ইচ্ছা মত বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন গানের কলি জোড়া দিয়ে তৈরি করেছেন। গানটির রচয়িতা রাধারমণ দত্ত। উল্লেখিত গানের তৃতীয় পংক্তিটি অন্য একটি গানের। দ্বিতীয় পংক্তিটিও এই গানের নয় (মরণের আর নাইগো বাকী...কৃষ্ণ নাম)। দ্বিতীয় পংক্তিটির মূল কথা "ছিলাম শ্যামের আদরিণী হইলাম এখন কলঙ্কিনী গো, এখন ডাক দিয়া শুধায় মোর নাই হেন জন।" (৪) নিমাই সন্ন্যাস—"সন্ন্যাসী বানাইলে তোরে কে" গানটি শ্রদ্ধেয় সুরেন চক্রবর্তীর কণ্ঠে আমরা অনেকবার শুনেছি। এখানে কথা ও সুর অদল বদল করা হয়েছে। (৫) ভাটিয়ালি—ভাটিয়ালির সঙ্গে নিম্নগামী নদী ধরার নিকট সম্পর্ক, তাই পূর্ব বাংলার যেখানে জলের প্রভাব অত্যধিক, সেখানেই ভাটিয়ালি পূর্ণ রূপ পেয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে পূর্ব বাংলার শ্রীহট্ট, ময়মনসিং ও ত্রিপুরা অঞ্চলের ভৌগোলিক কারণের জন্য ভাটিয়ালি এক বিশিষ্ট রূপ নিয়েছে। কিন্তু দিনেনবাবু নির্বাচিত তিনটি গান থেকে প্রকৃত ভাটিয়ালির স্বরূপ জানা যায় না। এই গানগুলি ভাটিয়ালি সুরাশ্রিত কিন্তু প্রকৃত ভাটিয়ালি নয়। কথা ও সুর বিচ্ছেদ পর্যায়ভুক্ত বলে মনে হয়। (৬) সারি—"রংয়ের নাও রং-এর বৈঠা" গান খানিতে সুখাইড়ের জমিদার পরিবারের গুণ কীর্তন করেছেন। দিনেনবাবুর সঙ্গে উক্ত পরিবারের কোন সম্পর্ক আছে কিনা জানি না, তবে বাংলাদেশের লোকগীতির ভাণ্ডার কি এত দীন যে সামন্ত প্রথার গুণ কীর্তন করে তখনকার জমিদার শ্রেণী যে সমস্ত গান রচনা করাতেন সেগুলি সারি গানের অন্তর্ভুক্ত হবে? (৭) জল ভরার গান—"হায়রে পিতলের কলসী" গানখানি প্রাচীন প্রচলিত গান। যতদূর মনে হয় [illegible] কোম্পানীর এই গানের একখানি রেকর্ড আছে। ছোটবেলায় রাজমিস্ত্রীদের মুখে ছাদ পেটানোর সময় এই গান শুনেছি। এটি জল ভরার গান বলে মনে হয় না। (৮)

কবিতা এই জন্য বোঝা যায় না, কিন্তু ছায়ায় রয়েছে সেই রহস্যের ব্যঞ্জনা, যার জন্যেই কবিতা কবিতা।

তিরিশ বছরের মধ্যেই হার্ট ক্রেনের স্বাস্থ্যের একেবারে বারোটা বেজে যায়। বন্ধুবান্ধবরা ক্রমশ তাঁর সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়ছিলেন। কিন্তু নিভে যাওয়ার আগে প্রদীপের সলতেটা অনেক সময়ই দপ্ দপ্ করে বেশী জ্বলে ওঠে। হার্ট ক্রেনের জীবনেও একটা পরিবর্তনের সূচনা দেখা গেল। চরম দারিদ্র্যের মধ্যে হঠাৎ কি করে যেন এক ব্যাংক মালিকের কাছ থেকে দু' হাজার ডলার ধার পেয়ে গেলেন। সমকামিতার নেশা ত্যাগ করে পেগি কাউলি নামের একটি বিবাহিতা মেয়ের প্রেমে পড়লেন। মেয়েটি ডিভোর্স পাবার পরই হার্ট ক্রেন তাঁকে বিয়ে করবেন—এই রকম যখন অবস্থা, জীবন আবার সহজ সীমানার কাছাকাছি চলে আসছে—সেই সময়েই সমুদ্রের জলে আত্মহত্যা। এই আত্মহত্যার কারণ আজও অজ্ঞাত, তবে তাঁর "লিজেণ্ড" কবিতার ঐ লাইনটিই আবার মনে পড়ে, I am not ready for repentance।

সনাতন পাঠক

বাঙালী ও ব্যবসা

লক্ষ্মীর কৃপালাভ : বাঙালীর সাধনা— বিশ্বকর্মা, পরিবেশক : আনন্দ পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯, মূল্য পঁচিশ টাকা।

এদেশে সাধুসন্তের পরই রাজনীতির নেতারা শ্রদ্ধা ও জনপ্রিয়তায় উচ্চস্থান অধিকার করে আছেন। অধুনা অভিনেতা ও চিত্রতারকারাও জনগণমনে প্রতিষ্ঠা অর্জন করছেন। কিন্তু শিল্পের অর্থাৎ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে যাঁরা স্রষ্টা ও পথিকৃৎ তাঁদের প্রতি আমাদের একটা প্রচণ্ড উপেক্ষা দেখা যায়। আমাদের চিন্তায় ও সাহিত্যে এই উপেক্ষার স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। ইংরেজী "ইন্ডাস্ট্রি"র কোনো প্রতিশব্দ আমাদের ভাষায় এখনও তৈরী হয়নি : শিল্প বলতে প্রথমেই আমাদের চারুশিল্পের কথা মনে পড়ে; ব্যবসায় বলতে আমরা যা বুঝি তার সমার্থক ইংরেজী শব্দ "ট্রেড"। আর আমাদের সাহিত্যিকেরা যদি কোনো শিল্পপতিকে কদাচিৎ উপন্যাসে স্থান দেন তো অমানুষের ভূমিকাই সেই অধমের জন্য ধার্য হয়।

এই অবস্থায় **লক্ষ্মীর কৃপালাভ : বাঙালীর সাধনা** লিখে "বিশ্বকর্মা" আমাদের একটি বড় অভাব কিঞ্চিৎ দূর করেছেন। এ জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ।

পুস্তকের মুখবন্ধে গ্রন্থকার লিখেছেন যে বহু পাঠকপাঠিকা যেমন তাঁর প্রচেষ্টায় আগ্রহ দেখিয়েছেন, "বেশ কয়েকজন তরুণ তরুণী তেমনই তাঁর নিন্দাও করেছেন। "কি করে একজন ধনী আরও বড়লোক হয়েছে সেই ইতিহাস লেখা গর্হিত কাজ— এই ছিল তাঁদের অনেকের রায়।" মনে হয় এই ব্যাপারে বিচারকেরা সমস্ত তথ্য ভালোভাবে না জেনেই রায় দিয়েছেন।

বাঙালীর ভিতর যাঁরা শিল্পের ক্ষেত্রে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন তাঁরা সকলেই ধনীর সন্তান ছিলেন না। শিল্পে সাফল্যের জন্য বড়লোকের ছেলে হওয়াটাই যথেষ্ট নয়। এদেশে অধিকাংশ ছেলেই যখন সরকারী চাকরীর দিকে ঝুঁকেছিলেন তখন শিল্প ও ব্যবসায়ের পথে কারা এগোলেন, কেন এগোলেন এবং কিভাবে তাঁরা সফল হলেন অথবা কি কারণে সাফল্য থেকে বঞ্চিত হলেন, এসব বিষয় সন্ধানীর দৃষ্টি নিয়ে দেখবার সময় এসেছে।

অন্য দেশের ইতিহাসে দেখা যায় যে, ব্যবসায়ীরা অনেক সময়েই এমন এক শ্রেণীর লোকের ভিতর থেকে উঠেছেন যাঁদের সমাজ এখনও সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেনি অথবা উন্নতির গতানুগতিক পথগুলো যাঁদের কাছে উন্মুক্ত ছিল না। বহিরাগতদের ক্ষেত্রে একথা স্পষ্টতই প্রযোজ্য; উদাহরণত ইয়োরোপে ইহুদী ও পশ্চিম ভারতে পার্সীদের উল্লেখ করা চলে। কিন্তু বাঙালী যখন বাংলাদেশেই শিল্পে ও ব্যবসায়ে কৃতিত্ব লাভ করেন তখনও কি তাঁর

ভিতর ঐ রকম কিছু বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করা সম্ভব? দ্বারকানাথ ঠাকুর জাতিভ্রষ্ট ছিলেন। একটিমাত্র উদাহরণে অবশ্য কোনো সাধারণ সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় না।

"বিশ্বকর্মা"র আলোচনার ক্ষেত্র সাম্প্রতিক ইতিহাস। এ সময়ে যে বাঙালীরা ব্যবসায়ে অগ্রণী হয়েছিলেন তাঁদের অনেকেই দেখি, হয় রাজনৈতিক "অপরাধে" সরকারী চাকরীতে প্রবেশাধিকার হারিয়েছেন নয়তো বাড়ির সঙ্গে ঝগড়া করে অল্প বয়সেই নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেয়েছেন। বহু উদাহরণের ভিতর বাছবিচার না করেই কয়েকটি তুলে ধরছি।

"অগ্নিযুগ ১৯১৬ সালে বরিশাল থেকে দুটি বিপ্লবী যুবক কলকাতায় এলেন। অধুনা পশ্চিম বাংলার রাজ্যসভার সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত ও লোকসভার সদস্য শ্রীঅরুণ গুহ। সঙ্গে ছিলেন যুগান্তর দলের আর একটি যুবক, ঢাকার শৈলেন গুহরায়। ১৯২৩ সালে সামান্য ৩০০০ টাকার মূলধন নিয়ে এ'রা শ্রীসরস্বতী প্রেস-এর প্রতিষ্ঠা করলেন বেনিয়াটোলা লেনে।" (পৃঃ ১৩)

"১৮৮০ সাল। কলকাতার কাছেই জয়নগর মজিলপুরের এক জমিদার মথুরামোহন চক্রবর্তীর ছেলে শরৎচন্দ্র গুরুজনদের সঙ্গে মতবিরোধ করে গৃহত্যাগ করলেন। ছেলে কলকাতায় এসে শরণ নিলেন মা লক্ষ্মীর। সম্বল বাড়ি থেকে আনা দুশোটি টাকা।" (পৃঃ ২৪) কালক্রমে এই শরৎবাবুই "কালিকা টাইপ ফাউন্ড্রী"র প্রতিষ্ঠাতা।

"ভুপেনবাবু মেট্রোপলিটান স্কুলের বড়-বাজার ব্রাঞ্চের ছাত্র ছিলেন। কিন্তু পড়া-শোনার চেয়ে তিনি "বায়োস্কোপ" দেখতে বেশী ভালবাসতেন। শেষে একদিন ধরা পড়ে বাবার কাছে প্রচণ্ড বকুনি খেলেন। দারুণ অভিমানে তিনি গৃহত্যাগ (করলেন)।

"মাস দুই বাংলা দেশের এ শহর সে-শহর ঘুরে বাড়ি ফিরে এলেন, কিন্তু লেখাপড়ায় একেবারে ইস্তফা দিলেন তিনি। স্বাধীন হবার জন্যে সেই চোদ্দ বছরের ছেলে চীনে বাজারের এক স্টীল ট্রাঙ্ক আর বালতির দোকানে সেলস বয়ের কাজ নিলেন।

"তারপরে ১৯৩০ সালে তিনি প্রথম পদক্ষেপ করলেন ওষুধ আর প্রসাধন সামগ্রীর ব্যবসায়।

"১৯৪১ সালে ভুপেনবাবু নিজস্ব দে'জ মেডিক্যাল স্টোর্সের স্থাপনা করলেন।" (পৃঃ ৩৪০-৩৪১)

"স্কুলে পড়ার সময় থেকেই ছাত্রনেতা হিসাবে বিভূতিভূষণ পুলিসের নির্যাতন ভোগ করতে আরম্ভ করেন। ১৯৩৩ সালে কৈশোরে উপনীত হওয়ামাত্রই তিনি গ্রেপ্তার হলেন। তেত্রিশ থেকে ছত্রিশ সাল পর্যন্ত তিনি বর্মার আকিয়াব শহরে থারাওয়াডি সেণ্ট্রাল জেলে আটক রইলেন।

"১৯৩৬-এ জেল থেকে বেরোবার দু'মাস পরেই ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে বিভূতিভূষণ ভালোভাবেই পাস করলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সাঙ্গ হবার পর তিনি আই-সি-সি ও ফাইনান্স পরীক্ষা দেবার অনুমতি প্রথমটায় পেয়েছিলেন, কিন্তু রাজনৈতিক অপরাধী ছিলেন বলে পরীক্ষার অব্যবহিত আগে সেই অনুমতি নাকচ হয়ে গেল।

"১৯৪৩ সালে বিভূতিভূষণ কৃষ্ণা গ্লাস কোম্পানির গোড়াপত্তন করলেন জনা বিশেক কর্মী নিয়ে।" (পৃঃ ১৭৯-১৮০)

ব্যক্তিবিশেষের উদ্যোগ যেমন আবশ্যক, ব্যবসায়ে উন্নতির জন্য তেমনই সহায়ক আরও একটি জিনিস। শিল্প পরিচালনায় এমন কয়েকজন সহকর্মী প্রয়োজন যাঁদের উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করা যায়; তা নইলে বেশীদূর এগোনো কঠিন। একক প্রতিভায় বড় কবি হওয়া যায়; শিল্প-প্রতিষ্ঠানে চাই সহকর্মী ও সহযোগিতা। যাঁরা সফল হয়েছেন তাঁদের অনেকেই এদিক থেকে ভাগ্যবান; যাঁরা বিফল হয়েছেন তাঁদের বিফলতার কারণও অনেক সময় এখানেই খুঁজে পাওয়া যাবে। তাছাড়া আবশ্যক, বিশেষত গোড়ার দিকে, ছোটবড় সব কাজ করবার জন্য মনের প্রস্তুতি। এই প্রস্তুতি যাঁর আছে তাঁর পক্ষে পরে সাধারণ কর্মীর আস্থা ও আনুগত্য অর্জন করা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়।

তত্ত্বকথা হিসাবে এসব কেমন ফাঁকা শোনায়; উদাহরণের ভিতর এরা সত্য হয়ে ওঠে। আলোচ্য পুস্তকের পাতায় পাতায় বহু উদাহরণ ছড়ানো আছে। আলোচনা সংক্ষিপ্ত করবার জন্য শুধু একটি উদাহরণের আশ্রয় নিচ্ছি—নিষ্ঠা সাফল্য ও বিফলতার সংমিশ্রণে স্মরণীয় একটি উদাহরণ।

"দুজন পরিশ্রমী বুদ্ধিমান যুবক বিভূতিবাবুর সহকারী হলেন। রামকুমার ঘোষ এলেন উৎপাদনের তত্ত্বাবধানে, আর শ্যামাপদ বল যোগ দিলেন বিক্রির সাহায্য করতে।

"দুপুর বেলায় কম্পানির ঠেলাগাড়িতে মাল চাপিয়ে বিভূতিভূষণ আর শ্যামাপদ যেতেন মুর্গীহাটায় মাল বেচতে। ফেরবার সময় কাঁচা মাল সওদা করে সেই ঠেলা-গাড়িতেই চাপিয়ে দেওয়া হতো।

"এ'রা কঠোর পরিশ্রম করে দিনে দিনে কৃষ্ণা গ্লাসকে বাড়াতে লাগলেন। অবশেষে প্রতিষ্ঠানের কিছুটা শ্রীবৃদ্ধি হবার পর ১৯৪৬ সালে কৃষ্ণা গ্লাস লিমিটেড কোম্পানিতে পরিণত হলো; নাম হলো কৃষ্ণা সিলিকেট অ্যাণ্ড গ্লাস ওয়ার্কস লিমিটেড।

"কোম্পানির প্রথম যুগে বিশ্বস্ত পরিশ্রমী কর্মীদের কর্তৃপক্ষ ভোলেননি। তাঁদের মধ্যে অন্তত একশ'জন আছেন যাঁরা এখন কম্পানির অংশীদার।" (পৃঃ ১৮০-১৮১)

তারপর সর্বাধুনিক পর্ব।

"কৃষ্ণা গ্লাসের একুশ বছরের নিরবচ্ছিন্ন শান্তি চুরমার করে দিয়েছে সাতষট্টির শ্রমিক আন্দোলন আর ঘেরাও।

"উনসত্তরের জুন মাসে কৃষ্ণা গ্লাসের আদি যাদবপুর কারখানা আবার অচল হয়েছে। দুই শ্রমিক ইউনিয়নের সংঘর্ষে অগ্নিকাণ্ড হয়ে কাজকর্ম বন্ধ।"

উদ্যোগী পুরুষের নেতৃত্ব ছাড়া যদিও নতুন শিল্প গড়ে তোলা কঠিন তবুও দেশের লোকের সহানুভূতি ও সহায়তা ছাড়া তাকে রক্ষা করা যায় না। কথিত আছে যে, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর ভিতর সম্পর্ক মধুর নয়। একথা যে-সমাজ বিশ্বাস করে সে কালক্রমে উভয়কেই হারায়। দুর্গতি-হারিণীর কৃপালাভ করতে হলে লক্ষ্মী ও সরস্বতী দুই কন্যারই উপাসনা প্রয়োজন। আলোচ্য গ্রন্থটির বহুল প্রচারের ফলে এ বিষয়ে যদি আমাদের কর্তব্য বোধ বাড়ে তবেই মঙ্গল।

বইটিকে সুখপাঠ্য করবার জন্য লেখক স্থানে স্থানে কিছু অবান্তর কাহিনী ও জল্পনাকল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন। একটি উদাহরণ দিই। "শ্রীরামচন্দ্রের সময়েও কাচের আয়না তৈরি হতো" এই অনুমানের স্বপক্ষে একটি মারাঠী গানের কয়েক লাইন বাংলায় অনুবাদ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এতে শুধু নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয় যে, ঐ গানের রচয়িতা কাচের আয়নার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। রামচন্দ্রের কালে ঐ বস্তু হয়তো ছিল অথবা হয়তো ছিল না; কিন্তু মারাঠী গানে তার প্রমাণ খোঁজা ভুল।

আয়তনের তুলনায় বইটির দাম বেশী বলা চলে না। প্রচ্ছদপট সুন্দর; ছাপা ভালো; ছাপার ভুল উল্লেখযোগ্যভাবে কম।

(অ. দ.)

প্রাপ্তি স্বীকার

The Mind of Morarji Desai: by Basant Chatterjee. Orient Longmons Ltd.: 17 Chittaranjan Avenue, Calcutta-12.

পঞ্চশিখা। শিশিরকুমার মাইতি। আশা-বরী পাবলিকেশন : ২৪ ঠাকুর রামকৃষ্ণ লেন, সাঁত্রাগাছি, হাওড়া। মূল্য ২·০০।

শেফালি। হরিহর আশ। আশ ব্রাদার্স : ৬৫ জি টি রোড, পোঃ রিষড়া, হুগলী। মূল্য ৩·০০।

নিঃশব্দ শঙ্কা। প্রদীপকুমার রায় চৌধুরী। পূর্বাশা প্রকাশন : ৩২ পটল-ডাঙ্গা স্ট্রীট, কালকাতা-৯। মূল্য ২·০০।

ব্যাডমিণ্টনের আইন-কানুন

আম্পায়ারের প্রতি উপদেশ

আম্পায়ারের প্রতি উপদেশের ২১ নম্বর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, যদি বাইরের কোন সাটল বা খেলার সঙ্গে সম্বন্ধ নেই এমন কোন বস্তু খেলা চলার সময়ে কোর্টের মধ্যে ঢোকে তবে 'লেট' ডাকতে হবে।

এখানে প্রশ্ন আসতে পারে খেলার সময় কোন খেলোয়াড়ের র‍্যাকেট হস্তচ্যুত হয়ে যদি প্রতিপক্ষের কোর্টে যায় তা হলেও কি 'লেট' ডাকতে হবে? না। সেক্ষেত্রে হবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি। আন্তর্জাতিক আইনের ৩ নম্বর ভাষ্যে বলা হয়েছে : ১৪ আইনের 'এক' ধারা ছাড়া যদি কোন খেলোয়াড়ের দেহের কোন অংশ বা খেলোয়াড়ের র‍্যাকেট প্রতিপক্ষের কোর্টে অনুপ্রবেশ করে তবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির অপরাধে 'ফল্ট' হবে। একমাত্র ১৪ আইনের 'এক' ধারা অনুযায়ীই র‍্যাকেট প্রতিপক্ষের কোর্টে চালনা করা যেতে পারে। বলা বাহুল্য, সেটা হচ্ছে নিজের কোর্ট থেকে সাটল স্ট্রাইক করার পর নেট ক্রস করে প্রতিপক্ষের কোর্টে র‍্যাকেট চালনা করা।

সুতরাং ওই ক্ষেত্র ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রে খেলার সময় খেলোয়াড়ের র‍্যাকেট প্রতিপক্ষের কোর্টে গেলে 'ফল্ট' হবে।

২২। নীচের লেখা বিবরণগুলির প্রতি আম্পায়ারকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।

(এ) যদি সার্ভিস জাজ না থাকে তবে সার্ভিস ফল্ট হচ্ছে কিনা : সার্ভার কোমরের উঁচু থেকে সার্ভিস করছেন কিনা, কিংবা সার্ভিস করার সময় তার হাতে ধরা র‍্যাকেটের মাথা হাতের উপরে উঠে যাচ্ছে কিনা। আম্পায়ারের উঁচু চেয়ার থেকে এই দুটি বিষয়ের ত্রুটি ধরা যায়। যদি আম্পায়ারের মনে সন্দেহ জাগে তবে খেলোয়াড়কে সতর্ক করে দেবেন এবং সার্ভিস জাজ নিয়োগের ব্যবস্থা করবেন।

(বি) সাটল স্ট্রাইক করার সময় সার্ভারের দুই পা সার্ভিস কোর্টের মধ্যে মাটির সঙ্গে মিশে আছে কিনা এবং ১৪ ডি আইন অনুযায়ী প্রতিপক্ষকে ভড়কি দেওয়া হচ্ছে কিনা, তা দেখার ভার সার্ভিস জাজের উপর থাকা উচিত যদি সার্ভিস জাজ পাওয়া যায়।

(সি) সার্ভিস না হওয়া পর্যন্ত রিসিভারের দুই পা তার কোর্টের মধ্যে মাটির সঙ্গে লেগে আছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখুন। এবং লক্ষ্য রাখুন সার্ভিস না হওয়া পর্যন্ত রিসিভার যেন জায়গা থেকে না নড়েন।

(ডি) ১৪ [illegible] আইন অনুযায়ী ডবল কিংবা ফাউল স্ট্রোকের দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখুন। ডাবল অথবা ফাউল স্ট্রোক হলে সঙ্গে সঙ্গে 'ফল্ট' ডাকুন।

(ই) কোন ক্ষেত্রে এবং কোনভাবে খেলোয়াড়দের 'নো শট', 'ফল্ট' ইত্যাদি ডাকতে দেবেন না। খেলোয়াড়রা এভাবে নিজেরা ডাকলে তৎক্ষণাৎ তাদের সতর্ক করে দেবেন। কারণ এতে প্রতিপক্ষের মনঃসংযোগ নষ্ট হয়।

(এফ) প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, যেমন নেটের নীচে কাত হয়ে অনুপ্রবেশ, প্রতিপক্ষের কোর্টে র‍্যাকেট ছুঁড়ে দেওয়া, খেলার সময় বাধার সৃষ্টি করা বা সার্ভিসের সময় প্রতিপক্ষের কোন খেলোয়াড়ের দৃষ্টির ব্যাঘাত সৃষ্টি করার ব্যাপারে ১৪ ডি, ১৪ জে, ১৬ ও ২০ নম্বর আইন এবং ২ নম্বর ভাষ্য অনুযায়ী সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন।

(জি) যখন যার সার্ভিস করার ও সার্ভিস রিসিভ করার কথা তখন তিনি সার্ভিস করছেন কিনা বা ঠিক খেলোয়াড় সার্ভিস রিসিভ করছেন কিনা, কিংবা ভুল কোর্ট থেকে সার্ভিস করা হচ্ছে কিনা এ সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্ত দেবার জন্য ১২ নম্বর আইন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জেনে রাখুন।

(এইচ) খেলার সময় নেট ক্রস করার আগেই সাটল হিট করা কিংবা খেলোয়াড়ের দেহের অংশ, র‍্যাকেট এবং পরিধেয় দ্বারা নেট স্পর্শ করা সম্পর্কে ১৪ এফ এবং ১৪ জি আইন ভালভাবে জেনে নিন।

(আই) ৭ নম্বর আইন অনুযায়ী লক্ষ্য রাখুন যে, সেটিং এর অধিকার যথাযথভাবে দেওয়া হচ্ছে। সেটিং সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়ের সিদ্ধান্ত জেনে নেওয়া—আম্পায়ারেরই কর্তব্য। সেটিং হলে সে সিদ্ধান্ত এমন উঁচু গলায় ঘোষণা করবেন যাতে দর্শকরা শুনতে পান। ২ পয়েন্ট, ৩ পয়েন্ট অথবা ৫ পয়েন্টে সেট করা হচ্ছে তাও জানিয়ে দিয়ে 'লাভ-অল' থেকে পয়েন্ট গণনা আরম্ভ করবেন।

(জে) ৮ নম্বর আইন অনুযায়ী তৃতীয় গেমে ঠিক পয়েন্টে কোর্ট বদল হচ্ছে কিনা সে দিকে লক্ষ্য রাখুন।

(কে) কোন খেলোয়াড় সাটল-এর গতিবেগ সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে অযথা ঝামেলা করলে তাকে সতর্ক করে দেবেন। আর সাটলই সাটল-এর গতিবেগে ত্রুটি দেখলে সাটল বাতিল করবেন।

গেম শেষ হলে

২৩। গেম শেষ হলে ঘোষণা করবেন কোন দলের কোন খেলোয়াড় গেম পেলেন; বা প্রতিনিধিমূলক খেলা হলে কোন দল, রাজ্য বা দেশ গেম পেল। পরে ঘোষণা করবেন গেমের স্কোর। যদি দুই দল একটি করে গেম পেয়ে থাকে, বলবেন, "ওয়ান গেম অল।"

দুটি দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলে সব সময় খেলোয়াড়ের নাম ঘোষণা না করে দলের নাম ঘোষণা করবেন। অবশ্য দলে কে কে খেলছেন তা বলা যেতে পারে।

মুকুল

॥ চিত্র-সমালোচনা ॥

মায়া

নায়িকার নামেই ছবির নাম "মায়া" (জয়া চিত্র)। মায়া (সুস্মিতা সান্যাল) শেষ পর্যন্ত যার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ সে একজন ট্যাক্সি ড্রাইভার—নাম দেবু (অজয় গাঙ্গুলি)। দেবু ট্যাক্সি চালায় ও খেটে খায় বলে মোটেই অশিক্ষিত নয় কিন্তু। নন-কলেজিয়েট হয়েও সে ইতিহাসে ফার্স্ট ক্লাস অনার্স পেয়েছে। যেহেতু আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতি বা য়ুনিভার্সিটির বিদ্যার কোন মূল্য তার কাছে নেই তাই সে প্রথমে এক বড়লোকের ড্রাইভার (অর্থাৎ বড়-লোকের চাকুরে) এবং পরে ট্যাক্সি ড্রাইভার। গালে দাড়ি রেখেছে, সব সময়ই যেন "অ্যাংরি" ভাব ("অ্যাংরি ইয়ং ম্যান" আর কি!) ট্যাক্সি চালাবার ফাঁকে ফাঁকে বই পড়ে, সমাজের গলদ ও মানুষের অধিকারের কথা বলে।

দেবু থাকার ফলে নায়িকাকে পরিবহণের কোন সমস্যায় পড়তে হয়নি। দেবুর ট্যাক্সি যেন নায়িকাকে অনুসরণের জন্যই, মায়ার যখনই প্রয়োজন তখনই ট্যাক্সি হাজির (কলকাতার এমন ট্যাক্সি-ভাগ্য ফিল্মের নায়িকা ছাড়া আর কার হতে পারে?)।

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত "অরণ্যের দিনরাত্রি" ছবিতে সিমি। ফটো—দেশ

মায়ার পরিবারে দুষ্টগ্রহের মত একদিন এসে উপস্থিত বড়লোক লম্পট যুবক নলিনী (শ্যামল ঘোষাল)। নলিনীকে চিনতে ভুল করে সবাই, বিশেষ করে মায়া। মায়া তার প্রেমে পড়েছে এবং প্রেমাস্পদের আসল পরিচয় পেয়েছে অনেক পরে। সে তখন কুমারী অবস্থায় অন্তঃসত্ত্বা। নলিনীকে শাসাতে গিয়েই মায়ার দাদা অজয় (সতীন্দ্র ভট্টাচার্য) বিপদে পড়ে। অজয় তারই অধীনে চাকুরি নিয়েছিল। টাকা চুরির মিথ্যা অপরাধে নলিনী তাকে পুলিসের হাতে ধরিয়ে দেয়, এবং অজয়ের দু' বছরের জেল হয়।

য়ুনিভার্সিটির সেরা ছেলে অজয়—অর্থনীতিতে এম এ পাস করে নলিনীর অফিসে অ্যাকাউন্টান্ট-এর চাকুরি নিয়েছে কেন সে প্রশ্ন অবান্তর। যে অজয় এত সুন্দর গান করে, এত সুন্দর সুর রচনা করে (সংগীত পরিচালনার কৃতিত্ব অনল চট্টোপাধ্যায়ের) এবং বোনকে গান শেখায় সে কেন ছবিতে সংগীতশিল্পী হল না তারও সদুত্তর দর্শক পাবেন না। কারণ, স্বাভাবিক কিছু ঘটলে হয়ত মেলোড্রামা সৃষ্টির ব্যাঘাত হত। অজয়ের জেলে যাওয়ার পরই তার বাড়িতে যত নাটক, যত অশান্তি। মায়াকে বাড়ি থেকে বের করে দিলেন তার বাবা (অসিতবরণ)। চরম আঘাতে বোধ হয় আদর্শবাদী শিক্ষকের চরিত্রেও এমন বৈসাদৃশ্য দেখা যায়। এই দিকে মায়ার সন্তান প্রসবের সময় উপস্থিত। ওই সময়েই সে ট্যাক্সি পেয়ে গেল, অর্থাৎ দেবু তাকে নার্সিং হোমে পৌঁছিয়ে দিল। এবং দেবু এত মহৎ যে, সে মায়ার সন্তানের পিতৃত্বও স্বীকার করে নিল। একটি কথা বলা হয়নি, নার্সিং হোমে যাওয়ার অল্প আগেই মায়া হোটেল থেকে ফিরেছে এক বড়লোকের কাছ থেকে টাকা নিয়েছে। খারাপ পথে যেতে যেতেও যে মায়া ফিরে এল সে বোধ হয় দেবুর প্রভাবে। সে যাক। যার সন্তান ডেলিভারির সময় সন্নিকট সে অর্থবান ব্যক্তিকে সান্নিধ্য দান করছে

রাত্রে হোস্টেলে কেমন করে যায় সেটা ভাবার বিষয়।

জননী মায়ার (কোলে শিশু) একমাত্র আশ্রয়স্থল যে দেবুর বাড়ি সেটা অবশ্য বুঝতে অসুবিধা হয়নি। পরে যখন জেল থেকে অজয় ফিরে এসেছে তখন ছবির ক্লাইম্যাক্স, মায়া দেবুকে স্বামীরূপে গ্রহণ করেছে। তখন মায়ার মা (অপর্ণা দেবী) আছেন, বাবা নেই।

বহুলাংশে অবাস্তব, অনেকাংশে সাজানো এই ছবির মেলোড্রামার (নির্মল সর্বজ্ঞ রচিত) আবার সমাজের অন্যায় ও মানুষের জন্মগত দাবির বক্তব্যও আছে। এই বক্তব্য সংশ্লিষ্ট চরিত্রের বোকামি ও আহাম্মকি দিয়ে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। চিত্র পরিচালনা করেছেন অরিন্দম, পরিচালনার কাজে বৈশিষ্ট্য কোথাও দেখা যায়নি। একবার যখন হঠাৎ হারমোনিয়মের সুর ছাপিয়ে মোটরের হর্ন শোনা গেল (মায়া দাদার কাছে গান শিখছে, তখন প্রেমিক দ্বারে উপস্থিত) তখন দর্শক চমকিত হবেন। ওই আইডিয়াটি ভাল। আর বিশেষ উপভোগ্য শেষের দৃশ্যটি—ছাদে দেবুর বিয়ে উপলক্ষে পাঞ্জাবী ও বাঙালী ট্যাক্সিচালকরা নাচ-গান (ভাঙড়া দিয়ে আরম্ভ) জুড়ে দিয়েছে। গানটিও ভাল, সমাপ্তিও সুন্দর—অন্তত চিরাচরিত নিয়মে মায়া ও দেবুর জড়াজড়ি নেই। চিত্রনাট্য ও কাহিনী দুর্বল, তাই শিল্পীদের কারোর অভিনয়ই মনে তেমন দাগ কাটে না। নাটকপ্রিয় দর্শকের যদি ছবি ভাল লাগে, সেও আবার তাঁদের নাটকীয় অভিনয়ের জন্যই ভাল লাগবে।

বাংলার ছৌ নাচ

ছৌ নাচ সম্পর্কে শহরবাসীদের ধারণা হয়ত খুবই অল্প। ছৌ নাচের সৌন্দর্য এর সরলতায়, অনেকটা জাপানের কাবুকি নাচের মত। মুখোশও আছে। ছৌ নাচের শিল্পীরা মুখোশ পরেই নাচেন। সাধারণত পৌরাণিক কাহিনীই তাঁরা নৃত্যছন্দে ফুটিয়ে তোলেন। কেউ সাজেন রাম, কেউ সীতা, কেউ শিব, কেউ পার্বতী। আবার সমসাময়িক বা সাজানো কাহিনী নিয়েও ছৌ নাচ দেখা যায়। বাংলা দেশের পুরুলিয়াতেই ছৌ নাচের প্রচলন বেশী।

ছৌ নাচ যে কত বর্ণময় ও সুন্দর তাই চমৎকারভাবে দেখিয়েছেন পরিচালক-চিত্রনাট্যকার গোপাল সান্যাল রঙিন তথ্যচিত্র 'ছৌ ডানস অব বেঙ্গল'-এ। পরিচালক শিল্পীর দৃষ্টি নিয়ে ছৌ নাচ দেখেছেন। তাই অল্প অবকাশে এই লোক-শিল্পকলার সৌন্দর্য তিনি ফোটাতে পেরেছেন। শুধুমাত্র ছৌ নাচ দেখানোই পরিচালকের কাজ নয়, তিনি পুরুলিয়া অঞ্চলের গ্রামবাসীদের

বাংলার ছৌ নাচ

জীবন ও সংস্কৃতির একটি পরিচয়ও যেন ছবিতে তুলে ধরেছেন। দৃশ্যগ্রহণ চমৎকার; ফটোগ্রাফিতেও গোপাল সান্যালের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। সংগীতের (অংশুমান রায়-কৃত) ব্যবহার অর্থবহ। এক কথায়, একটি চমৎকার ফিল্ম ওরিয়েণ্টাকার ডকুমেণ্টারি 'ছৌ ডানস অব বেঙ্গল'। বিদেশ সরকার এর প্রযোজক।

নানহা ফরিস্তা

হিন্দী ছবিতে সাধারণত যে-ধরনের ডাকাত বা ভিলেন দেখা যায়, 'নানহা ফরিস্তা'র প্রাণ, অজিত ও আনোয়ার সে-শ্রেণীর ডাকু নয়। এই তিন চরিত্রের নৃশংসতা হয়ত আর সব ছবির ডাকাতের মতই, হয়ত কিছুটা বেশীই নতুবা তারা নিরীহ নারী-পুরুষকে খুন না করেও সহজেই টাকা-গয়না লুঠ করতে পারত। আর সব ফিল্মী ভিলেনের মত তাদের নরহত্যা ও লুণ্ঠনও চলে অবাধে। সেদিক থেকে যে রোমাঞ্চ দর্শকরা হিন্দীচিত্রে আশা করেন তা একটু বেশী পরিমাণেই 'নানহা ফরিস্তা'য় (বিজয় ইণ্টারন্যাশনাল) রয়েছে। আবার নতুনত্বও আছে। একটি শিশুর কাছে ওই তিন নৃশংস ও দুধর্ষ ডাকাতের অন্তর কী-ভাবে বাঁধা পড়ে এবং তাদের হৃদয়ের পরিবর্তন কী করে ঘটে সেটাই 'নানহা ফরিস্তা'র আসল নাটক।

গল্পটি এক বাংলা ছবি ('সপ্তর্ষি') থেকে নেওয়া। বলা বাহুল্য, ওই কাহিনীর বিস্তর রূপান্তর ঘটেছে হিন্দী ছবিতে। ডাকাতদের উপর শিশু দেবদূতের (নানহা ফরিস্তা) প্রভাব কী প্রচণ্ড তা দেখাবার জন্য অনেক অবিশ্বাস্য ও সাজানো ঘটনার দরকার হয়েছে। অতিপ্রাকৃত ব্যাপারও আছে। শিশুর শিয়রে বিষধর সাপ ফণা উঁচিয়ে কী ভাবে তাকে বাঁচায় (দুরন্ত অবশ্য শিশুটিকে যখন একজন ডাকাত প্রথমে খুন করতে চেয়েছিল) তা-ও দেখানো হয়েছে। আরও আছে। ডাকাতরা আবার ব্যক্তিগত-জীবনে ঈশ্বর-ভক্ত, পুজো-অর্চনা করে। তাদের একজন হিন্দু (প্রাণ), একজন খৃষ্টান (অজিত), একজন মুসলমান (আনোয়ার)। শিশুটিকে ভক্তিমান ডাকাতরা প্রত্যেকেই ইশ্বররূপে দেখতে পেয়েছে।

শিশুর সঙ্গে ডাকাতদের এই সম্পর্ক যেন জন্মান্তরের। নচেৎ পাশের ঘরে শিশুটির বাবাকে খুন করে এসেই তিনজন ডাকাতের একজন তাকে দেখামাত্রই এমনভাবে মায়ায় জড়িয়ে পড়বে কেন? বাকি দুজনের অপত্যস্নেহ জেগেছে পরে। আর শিশুটি কিন্তু প্রথম থেকেই তাদের 'আংকল' বলে তাকে আপন করে নিয়েছে। ডাকাতদের ডেরায় এসে নিজের বাপের কথাও তার তেমন মনে পড়ে না কিংবা তার মুখে তেমন শোনা যায় না। 'আংকল'-রাই যেন তার সব। কেবল একবার সে বায়না ধরেছে আরা-মাকে এনে দিতে হবে। তা না-হলে ছবিতে পদ্মিনীর আগমন হবে কী করে। পদ্মিনীই মাতৃহারা শিশুর মায়ের মত। ডাকাতের ডেরায় পদ্মিনীর নাচগানের ব্যবস্থাও পরিচালক সুকৌশলে করে ফেলেছেন। শেষ পর্যন্ত ক্লাইমাক্সে ডাকাতরা বিরাট পুলিশ বাহিনীকেও হার মানাতে, কিংবা বোকা বানাতে পারত। তারা যে আত্মসমর্পণ করেছে তাও শিশুটিরই জন্য। শিশুর ডাক শুনেই তারা পুলিসের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। অলৌকিক বহু ব্যাপারই ছবিতে রয়েছে। কিন্তু জনমনোরঞ্জনের শর্তে পরিচালক টি প্রকাশ রাও ছবিটি এমনভাবে তৈরি করেছেন যে দর্শকের আমোদ-বাসনা ষোলকলায় পূর্ণ। তাছাড়া, শিশুর প্রভাবে ডাকাতদের মানসিক পরিবর্তন তো নতুন বটেই। অতএব হিন্দীচিত্রের দর্শকরা এই ছবির নাটকীয়তায় আরও উল্লসিত। তার উপর রয়েছে বেবী রানী (নানহা ফরিস্তা), সে সত্যিই দর্শকের মনের মায়ায় বিস্তার করে। এক কথায়, যাকে বলে 'ওয়াণ্ডার চাইল্ড'। ছবির গানের সুরও ভাল দিয়েছেন কল্যাণজী-আনন্দজী।

জিগরী দোস্ত

অভিনেতা জিতেন্দ্রই জিতেন্দ্রর 'জিগরী দোস্ত' তথা অন্তরের বন্ধু। অর্থাৎ জিতেন্দ্রর 'ডুয়েল রোল' ছবিটিতে। দুজন দেখতে কেন হুবহু একরকম প্রশ্নের উত্তর এই ছবিতে না খোঁজাই ভাল। এক জিতেন্দ্র উচ্চশিক্ষিত, আইন পাশ করেছে; অপর জিতেন্দ্র গোয়ালা, অল্পপড় বা অশিক্ষিত। সভ্য-ভব্য জিতেন্দ্রর জন্য যে-পাত্রী (মুমতাজ) নির্দিষ্ট, সে অশিক্ষিত

জিতেন্দ্রর প্রেমে পড়েছে (অবশ্য এই জিতেন্দ্রর শহুরে হতে ও ইংরেজি বলতে সময় লাগেনি)। আর অন্য জিতেন্দ্র (যে ওকালতি পাশ করেছে) ছবির ভিলেনের মেয়ের (কোমল) প্রেমিক হয়ে উঠেছে।

ছবির একদিকে দুই জিতেন্দ্রর দোস্তী ও রোমান্টিক নাটক, অপরদিকে ক্রাইমের গল্প। বস্তুত ক্রাইমের উপাদানই ছবিতে বেশী। পাপচক্রের কর্তা হলেন কে এন সিং; ওই ব্যক্তিই শিক্ষিত জিতেন্দ্রর বাবাকে খুন করেছিল। এই তথ্য পাবার পর উকিল জিতেন্দ্র পাপীকে (অর্থাৎ ভাবী শ্বশুরকে) শায়েস্তা করতে বদ্ধপরিকর। ছবির শেষাংশে খলনায়ক ও তার দলের সঙ্গে দুই জিতেন্দ্রর লড়াই—কখনও বুদ্ধির, কখনও বাহুবলের। শেষ পর্যন্ত তারা পাপিষ্ঠকে দমন করতে পেরেছে। হিন্দী-ছবির নিয়ম অনুযায়ী পুলিস এসেছে শেষ মুহূর্তে শুধু দুর্বৃত্তদের গ্রেপ্তার করতে। শয়তানের দমন করার ব্যাপারে পুলিসের যা করণীয় তা সাধারণত নায়করাই করে থাকে। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। পরিচালক রবি নাগাইচ দর্শকদের নিরাশ করার মত কিছুই করেননি। হিন্দী ছবির দর্শকদের যা কাম্য তা প্রায় সব কিছুই তিনি ছবিতে রেখেছেন।

'মল্লার'-এর বিচিত্রানুষ্ঠান

শিল্পী নৃত্যশিল্পীদের স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল ভঙ্গিমায় ভারতীয় নৃত্যকলার প্রধান শাখাসমূহের রূপবৈচিত্র্যের একটি সুন্দর সম্ভাব্য উপস্থাপনা গত ৪ঠা অক্টোবর রবীন্দ্র-সদনে আয়োজিত 'মল্লার'-এর বিচিত্রানুষ্ঠানের সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ ছিল। বিশেষত মণিপুরী নৃত্যে মধুমিতা কয়'র এবং পিয়ালী সেনগুপ্তের সপ্রতিভ অভিব্যক্তি আর নিখুঁত ছন্দবোধ সকলকেই মুগ্ধ করেছে। মণিপুরী ছাড়াও কথক, ভরত-নাট্যম, কথাকলি, লোক-নৃত্য এবং রবীন্দ্র-নৃত্যের ব্যাখ্যা সম্বলিত 'নৃত্যধারা'-নামক অনুষ্ঠানটির পরিকল্পনা এবং পরিচালনার কৃতিত্ব জ্যোতিভূষণ চাকীর।

সেদিন 'নৃত্যধারা' ছাড়া রবীন্দ্রসংগীত, সমবেত গীটার এবং ওস্তাদ কেরামতুল্লার সংগত-সহ ইমারৎ খাঁ-র সেতারের অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল। এর মধ্যে কয়েকটি রবীন্দ্র-সংগীত-সহযোগে 'আলোর গান' শীর্ষক গীতি-আলেখ্যটি সম্ভবত আরও সপ্রাণ হতে পারত। সুজিত নাথ ও প্রভাস দত্তের পরিচালনায় প্রায় ত্রিশজন শিল্পী-সম্বলিত গীটারের একতানে পিয়ানোয় সহযোগিতা করেন সুজিত নাথ স্বয়ং। এরা পাঁচটি বিদেশী রচনা পরিবেশন করেন। গীটারের সুবৃহৎ একতানে যতটুকু সামঞ্জস্য আনা সম্ভব, মল্লারের শিল্পীরা সেটুকু বেশ কৃতিত্বের সঙ্গে আয়ত্ত করেছেন। সর্বশেষ রচনা 'মেরিনা' বেশ উপভোগ্য হয়েছিল।

বৈঠকীর নাট্যাভিনয়

বৈঠকী সংস্থার সভ্যবৃন্দ গত ১১ই অক্টোবর একাডেমি অব ফাইন আর্টস ভবনে বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'অতএব' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। নাটকাভিনয় ছিল বার্ষিক অনুষ্ঠানের অঙ্গ। সভানেত্রীত্ব করেন শ্রীআশাপূর্ণা দেবী। প্রধান অতিথি ছিলেন লেডি রাণু মুখার্জী। দোলগোবিন্দের ভূমিকায় মঞ্জুশ্রী বোসের অভিনয় ব্যক্তিত্বমণ্ডিত। মনে রাখবার মত। অন্যান্য ভূমিকায় সুঅভিনয় করেছেন মঞ্জু মল্লিক (অনন্ত), লীলা মিত্র (চিত্রু), তৃপ্তি চ্যাটার্জী (নয়ন)।

"প্রথম বসন্ত" (পরিচালনা : নির্মল মিত্র) ছবিতে মাধবী মুখোপাধ্যায় ও বিকাশ রায়। ফটো—দেশ

টলি-টিপ্পনী

আশঙ্কার কথা, বাংলা সিনেমার নানা ক্ষেত্রে অনধিকারীদের আধিপত্য দিন দিন ক্রমবর্ধমান। নায়ক গল্প নির্বাচন করেন, নায়িকা স্ক্রিপ্টের রদবদল করেন, প্রযোজক সেটে বসে শট টেকিং নিয়ে কথা বলেন, এই জাতীয় অনধিকারচর্চার কথা বলছি না আমি। এগুলি তো আছেই। প্রযোজক যখন টাকা দেন, তার পাঁঠা তিনি লেজেও কাটতে পারেন, মুড়োতেও কাটতে পারেন, আর কী? তাঁদের ছবি যখন পয়সা দেয়, ওঁদের মতামত তো থাকবেই। দরকার হলে গাছের পর গাছ ওঁরা গাছে চড়াবেন, কারুর কিছু বলার নেই। আমার অবাক লাগে দেখে এত শত কম্প্রোমাইজের পরেও পরিচালকেরা কেমন করে কাজ করেন! অবশ্য বাংলা দেশে তেমন ভাগ্যবান পরিচালক অল্পই আছেন, যাঁরা স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন ভাবনা নিয়ে ছবি করতে পারেন। অথচ সিনেমা নাকি ক্রিয়েটিভ আর্ট।

আর্টের শর্তে ছবি বাংলা দেশে অল্পই হয়। যদিও বাংলার ছবি নিয়েই ভারতের গর্ব। বলা বাহুল্য, বছরে অন্তত একটা দুটো তেমন ছবির দেখা আমরা নিশ্চয়ই পাই, যা বিশ্ব চলচ্চিত্রের দরবারেও সম্মানের সঙ্গে চিহ্নিত হয়। কিন্তু ঐ একটা-দুটোই, [illegible] ভাল ছবি দেখেই রসিক দর্শকের মন ভরে না। তার কারণ নাকি বাণিজ্যের দিকে তাকিয়ে পরিচালককে ছবি করতে হয়। আমি বুঝতে পারি না, তাতেই বা ভালো ছবি তৈরি করতে অসুবিধে কোথায়? "পথের পাঁচালি", চারুলতা জাতীয় অনেক আর্ট ফিল্মও তো শুনেছি ভালো বাণিজ্য করতে পেরেছে। হলে প্রযোজকদের বাণিজ্যিক দিকও কি একটুকু মন্দ?

মন্দ আসলে আমাদের কপাল। ঐ যে বলেছি, স্বাধীন ভাবনা নিয়ে ছবি করতে পারেন তেমন ভাগ্যবান পরিচালক বাংলা দেশেই অল্পই আছেন।

আবার ফিল্মে অনেকে আসেন শিওর সাকসেস-এর শর্ট-কাট রাস্তা ভেবে। ক্রিয়েটিভ মন স্বভাবতই তাঁদের থাকে না। এই জাতীয় অনধিকারীর সংখ্যা বাংলা ফিল্মে কিছু কম নয়। ট্র্যাজিডি হল, সময় থাকতে কেউই সরতে চান না, সরাবার কোন লোকও নেই।

প্রসংগত একটি মজার ঘটনা মনে পড়ে গেল। কুমার প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া এমনিতে খুব রসিক লোক ছিলেন। ফিল্মে অরসিকের হস্তক্ষেপ কোন কারণেই তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না। তিন দশক আগেকার ঘটনা। বড়ুয়া সাহেবের "শাপমুক্তি" ছবি হচ্ছে। সংগীত পরিচালক নির্বাচিত হয়েছেন অনুপম ঘটক। গান লিখবেন অজয় ভট্টাচার্য। বড়ুয়া সাহেব ওঁদের সিচুয়েশন বুঝিয়ে দিয়েছেন। সেইমত কথা ও সুর রচনা করে গীতিকার ও সংগীত পরিচালক এসেছেন বড়ুয়া সাহেবকে গান শোনাতে। ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে সকলে বসেছেন। বড়ুয়া সাহেবের তিনজন অ্যাসিস্ট্যান্টও আছেন। অনুপম ঘটক পর পর গানগুলি গেয়ে শোনালেন। বিশেষ একটি গান নিয়ে কথা উঠল। গানটি বড়ুয়া সাহেব গীতিকারকে পড়ে শোনাতে বললেন। "শাপমুক্তি"র সেই বিখ্যাত গান—"বাংলার বধূ, বুকে তার মধু, নয়নে নীরব ভাষা...।" অজয়বাবু আবৃত্তির সুরে পড়ে গেলেন। একটা জায়গায় বড়ুয়া সাহেব তাঁকে একটু থামতে অনুরোধ করলেন। আগের দুটি কলি পুনরায় পড়তে বললেন।

"...বৈশাখে তার উদাস নয়ন,
আমের ছায়ায় বিছায় শয়ন।"

হঠাৎ একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন প্রমথেশ বড়ুয়া। সকলের দৃষ্টি ওঁর দিকে। অজয়বাবুকে তিনি প্রশ্ন করলেন, "কথাটার মানে পরিষ্কার হচ্ছে?" অজয়বাবু অবাক। আমতা আমতা সুরে জবাব দিলেন, "আমার তো মনে হয় ঠিকই আছে।" বড়ুয়া সাহেব অতঃপর সংগীত পরিচালককেও একই প্রশ্ন করলেন। অনুপমবাবুও বিব্রত কণ্ঠে অনু-

"উত্তরণ" (পরিচালনা : শান্তি চট্টোপাধ্যায়) ছবিতে সুচেতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও পার্থ মুখোপাধ্যায়। ফটো—দেশ

রূপ জবাব দিলেন, "ঠিকই আছে।" বড়ুয়া সাহেবের প্রশ্ন, অতঃপর তাঁর ইউনিটের কয়েক জনের প্রতি, "কি হে, তোমরা কি বল?" তাঁরা মনে প্রমাদ গুনলেন। ভাবলেন বড়ুয়া সাহেব যখন বলছেন নিশ্চয়ই গানের কোথাও গোলমাল আছে। একজন ভরসা করে বলেই ফেললেন, "ঐ আমের ছায়া কথাটা যেন একটু গোলমেলে। আমের আর কতটুকু ছায়া? আমগাছের ছায়া বললে বোধ হয় মানেটা আরো পরিষ্কার হতো" দ্বিতীয় জনও এবারে প্রথম জনের কথায় সায় দিলেন। বড়ুয়া সাহেব তেমনি অন্যমনস্ক। বললেন, "ঠিক, ঠিক।" গীতিকার ও সুরকার মনে মনে হাঁফাচ্ছেন তবে কি চেঞ্জ করতে হবে ছন্দ? হঠাৎ

"প্রতিদান" (পরিচালনা : অজিত গাঙ্গুলি) আগামী সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে

বড়ুয়া সাহেব বললেন, "চলুন, গাত্রোত্থান করা যাক। কাল আবার ভাবা যাবে।"

পরদিন সকাল বেলায় শুটিং ছিল। বড়ুয়া সাহেব ফ্লোরে আসার আগে ওই দুজন নোটিস পেলেন; ওদের চাকরি নেই। সারা ছবির কণ্ট্রাক্টের টাকাটাও সেই সঙ্গে ওঁদের হাতে ধরিয়ে দিলেন প্রোডাকশন ম্যানেজার। ওদিকে সন্ধেবেলায় গানের টেকিং। উৎকণ্ঠার সঙ্গে অজয়বাবু ফোন করছেন বড়ুয়া সাহেবকে, "আমের ছায়া কথাটা কি সিরিয়াসলি ভালো লাগছে না আপনার?" জবাবে প্রমথেশ বড়ুয়া বললেন, "আমাকে এত অ-কবি মনে করছেন কেন? শুকনো কাঠের ছায়ায় আমার দরকার নেই। অমৃতের দিকেই আমার ঝোঁক। আপনার ওই রসের আমের ছায়াই আমার দরকার।"

ফ্লোরে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট দুজনকে বড়ুয়া সাহেব উপদেশ দিলেন, "ফিল্মের এই বিভাগ তোমাদের জন্যে নয়। অন্য কোথাও চেষ্টা করো, উন্নতি হবে।" শোনা যায় পরবর্তী কালে ওই দুই ব্যক্তি অন্য ব্যবসায় প্রভূত উন্নতি করেছেন।

—বিচক্ষ

আউটডোরে বেশী কাজ

কলকাতায় এখন স্টুডিওগুলিতে খুব বেশী শুটিং হচ্ছে না, তবে আউটডোরে সম্প্রতি কয়েকটি বাংলা ছবির কাজ হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে।

তপন সিংহ এখন কার্শিয়াং-এর কাছাকাছি সাগিনা মাহাতো-র বহির্দৃশ্য

"প্রথম কদম ফুল" (পরিচালনা : ইন্দর সেন) ছবিতে সৌমিত্র চ্যাটার্জি ও তনুজা

তুলছেন। শিল্পীরাও প্রায় সব যোগ দিয়েছেন—দিলীপকুমার, সায়রা বানু, অনিল চ্যাটার্জি, স্বরূপ দত্ত, সুমিত্রা সান্যাল, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমার রায়, কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত প্রভৃতি।

আর ডি বনসালের চৈতালি-র কাজও শিলং-এ শুরু হয়েছে। পরিচালক সুধীর মুখার্জি রওনা হয়ে গেছেন শিল্পী ও কলাকুশলীদের নিয়ে। এই আউটডোরের কাজ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই নাকি ছবির কাজও শেষ। ছবির শিল্পীরা হলেন বিশ্বজিৎ, তনুজা, বসন্ত চৌধুরী, মনোমোহন (বোম্বে), তরুণকুমার, জহর রায়, সুনীলেশ ভট্টাচার্য, গোপেন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। শচীন দেববর্মণ সুরকার।

সম্প্রতি এস এস ফিল্মস-এর দুটি নম ছবির বহির্দৃশ্য গ্রহণের কাজ হয়ে গেল ডোপচাচি, গোমিয়া, বোকারো প্রভৃতি স্থানে। শিল্পী ছিলেন উত্তমকুমার (দ্বৈত ভূমিকা) ও নায়িকা-প্রযোজিকা সুপর্ণা সেন। ছবির অন্যান্য বিশিষ্ট শিল্পী ছায়া দেবী, কণিকা মজুমদার, অসিতবরণ, রবীন

বাসু ভট্টাচার্যের "অনুভব" হিন্দী চিত্রের নায়িকা তনুজা

মজুমদার, সুখেন দাস, পদ্মা দেবী, শ্যামল ঘোষাল প্রমুখ। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সংগীত পরিচালনায় ছবির কয়েকটি গান ইতিমধ্যে রেকর্ড করা হয়েছে।

বোলপুর ও সিউড়ি অঞ্চলে বেশ কয়েক দিন যাবৎ আউটডোরে শুটিং করে রূপশ্রীর পরিচালক অজিত গাঙ্গুলী গত সপ্তাহে তাঁর ইউনিট নিয়ে ফিরে এসেছেন। সন্ধ্যা রায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, সমিত ভঞ্জ, অনুভা ঘোষ, সুলতা চৌধুরী, তপেন চট্টোপাধ্যায় ("গুপী গাইন"খ্যাত), রবি ঘোষ, জহর বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিম ঘোষ প্রমুখ শিল্পীরা আউটডোরে গিয়েছিলেন। অনিল বাগচী ছবির সংগীত পরিচালক। প্রযোজনা করছেন অরুণ রায়চৌধুরী।

"কব, কিউ ঔর কাঁহা" ছবিতে ববিতা

সমসাময়িক জার্মান চিত্র

পশ্চিম জার্মানীর চলচ্চিত্রে নিউ ওয়েভ এসেছে বলে অনেকে মনে করেন। নতুন ধারার প্রবর্তক সাতজন তরুণ চলচ্চিত্রকারের ছবির এক বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসায়েটিজ অব ইণ্ডিয়া, ম্যাক্সমুলার ভবন এবং কলকাতার জার্মান কনসুলেট। এই ছবিগুলি হল : ইউ আর এ ম্যান, মাই বয়; লাস্ট ফর লাভ; কাম টু দি পয়েন্ট, ডার্লিং; টাটু; ওয়াইল্ড রাইডার লিমিটেড; সাইনস অব লাইফ; দি আর্টিস্টস আনডার দি বিগ টপ; ডিসওরিয়েন্টেড। জ্যোতি সিনেমায় ৭—২০ নভেম্বর এই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছে।

সান ফ্র্যান্সিসকো উৎসবে 'গুপী গাইন'...

ভারত সরকারের মনোনয়ন অনুযায়ী সত্যজিৎ রায়-কৃত "গুপী গাইন বাঘা বাইন" চিত্রটি সান ফ্র্যান্সিসকো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে দেখানো হচ্ছে। বেরুটেও ছবিটি দেখানো হয়েছে এবং সেখানে ইউনেস্কো আয়োজিত সিনেমা আলোচনা-চক্রেরও ব্যবস্থা ছিল। উৎসবে যোগদানের জন্য ছবির প্রযোজক নেপাল দত্ত গত সপ্তাহে সান ফ্র্যান্সিসকো রওনা হয়েছেন।

অরণ্যদেব
লী ফক

আশ্চর্য! থেকে তোমার পূর্বপুরুষরাই—তাহলে এই নতুন মহাদেশে পদার্পণ করেছিলেন?
হতে পারে, নাও হতে পারে। তাঁর আগে অন্য-কোনও স্পেনদেশের নাবিক আমেরিকার মাটিতে নেমেছিলেন কিনা, কে জানে।

'আমার পূর্বপুরুষদের লেখা বংশ-ইতিহাসে সবকিছুই লেখা আছে। আর সেই ইতিহাস রয়েছে অরণ্যের গুহায়।'

এই জায়গায়টায় তাঁরা কখন পৌঁছেছিলেন?
বলছি। সব বলছি।

'১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দ। উপকূল ধরে উত্তরে এগিয়ে যাচ্ছে বিংট আর ক্যারিবোর নৌকো।'
সোনার শহর শেষ পর্যন্ত আমরা খুঁজে পাবই। কী বলো ক্যারিবো?
নিশ্চয়ই বিংট।

'ইতিমধ্যে কলম্বাস একদিন সতেরোখানা জাহাজে বারো শো মানুষ নিয়ে স্পেন থেকে ফিরে এলেন...'
১/৭

'হিসপানিওলা—প্রথম বসতি! গরু...মুরগী...'
বিংট চলে গেছে?
ক্যারিবোও নেই।
নৌকোয় করে তাদের পশ্চিমে যেতে দেখা গিয়েছিল। সম্ভবত তারা বেঁচে নেই।

'কলম্বাসের সঙ্গে ঘোড়াও এসেছিল। স্থানীয় লোকেরা ইতিপূর্বে ঘোড়া দেখেনি।'
!!!

ক্যারিবো, একটি নদী। হয়ত এই নদী ধরে এগোলেই সোনার শহরে পৌঁছনো যাবে।
হয়ত।

তার হপ্তা কয়েক বাদে এই টিপিটা তাঁদের চোখে পড়ে। অস্ত-সূর্যের আভায় টিপিটা তখন সোনার মত জ্বলজ্বল করছিল।
দ্যাখো, ক্যারিবো, দ্যাখো!
!

মরুভূমির মধ্যে এই টিপিটা সেই তাঁরা প্রথম দেখলেন।
এবং এইটেকেই সোনার শহর বলে ধরে নিলেন।
১০

লী ফক

অস্ত-সূর্যের আভায় এই টিপি দেখে এঁদের মনে হয়েছিল, এইটেই সেই সোনার শহর!
ব্যারিবো, দ্যাখো, এই সেই সোনার শহর! চলো!
দাঁড়াও, কিট।

এখুনি অন্ধকার নামবে। এটা নতুন জায়গা, সে-কথা ভুলে যেও না।

বেশ, তাহলে ভোরে উঠেই ওখানে যাব।

১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দের এক আশ্চর্য কাহিনী—
'কিট আর ব্যারিবো টিপির দিকে চলেছেন—'
সকালে তো ওটাকে আর তেমন দেখাচ্ছে না, কিট।
যাই যে বলো ব্যারিবো, নিশ্চয়ই ওটা সোনা দিয়ে তৈরী।

'পথে অনেক অদ্ভুত জীবজন্তু তাঁদের চোখে পড়ল—'
সাপ! সরে এসো!
!

সর্বত্র ক্ষুধার্ত, হিংস্র, ভয়ংকর জন্তু!'
!

এদের ভাব-গতিক সুবিধের ঠেকছে না।
বুঝতে পারছি না, হয়ত আক্রমণ নাও করতে পারে।

স্বর্ণকেশ দেবতার কিংবদন্তী
আর সবাই শোনেনি!'

কোথায় সোনা! নেহাতই পাথুরে টিপি!
সোনার কথা পরে ভাবা যাবে কিট। এখন পালিয়ে প্রাণ বাঁচাও!

ভাগ্যিস, এইখানে একদিন বন্দুক গর্জে উঠেছিল।
ঠিক এইখানে;

অধুনা দ্বিধা-বিভক্ত কংগ্রেস দলের পরিস্থিতি বর্তমান সপ্তাহের উল্লেখযোগ্য আলোচনার বিষয়। কিছুদিন যাবত কংগ্রেস সিন্ডিকেট কর্তৃক শ্রীচবন, শ্রীজগজীবন, শ্রীফকরুদ্দিন এবং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে কংগ্রেস থেকে সাসপেনড করার তোড়জোড় চলছিল। ইতিমধ্যে হঠাৎ কংগ্রেস সভাপতি কমিটি থেকে শ্রীফকরুদ্দিন এবং সুব্রহ্মণ্যমকে ছাঁটাই করে দিলেন। এঁদের ছাঁটাই করার পর প্রধানমন্ত্রীর সমর্থকরা ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বয়কট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কমিটির ২১জন সদস্যের মধ্যে এগারজন রইলেন প্রধানমন্ত্রীর সমর্থক। এইভাবে দল দখলের দ্বন্দ্বে দুটি ওয়ার্কিং কমিটির সৃষ্টি হলো। ইন্দিরাপন্থীরা এ আই সি সি-র বিশেষ সভা ডাকছেন। তাঁদের উদ্দেশ্য সভাপতি বদল করা। ভারতের বৃহত্তম এবং প্রধানতম রাজনৈতিক দল কংগ্রেস কার্যত দু' টুকরো হয়ে গেল। প্রতিদ্বন্দ্বী দুই গোষ্ঠীর আপসহীন মনোভাবের দরুন কংগ্রেসের ৮৪ বছরের জীবনে এই অভূতপূর্ব সংকট দেখা দিয়েছে। ১ নবেম্বর নিজলিঙ্গাপ্পার সভাপতিত্বে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এ আই সি সি-র জরুরী সভা ডাকার দাবি বাতিল করে দেন। স্থির হয় ডিসেম্বরের শেষভাগে গুজরাটে এ আই সি সি'র নিয়মিত অধিবেশন ডাকা হবে। প্রধানমন্ত্রীর শিবির পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে ঘোষণা করেন যে, তাঁরাই ২২ ও ২৩ নবেম্বর দিল্লিতে এ আই সি সি-র জরুরী অধিবেশন ডাকবেন। বর্তমানে কংগ্রেসের দুই শিবিরের মধ্যে একটা মীমাংসার চেষ্টা করছেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিমলাপ্রসাদ চালিহা।

আজ কেরল রাজ্য গঠিত হওয়ার ত্রয়োদশ বার্ষিকী দিবস। এই দিন কেরলের পঞ্চম মন্ত্রিসভা (১৯৫৬ থেকে) আনুষ্ঠানিকভাবে অধিষ্ঠিত হলো। রাজভবনে শ্রীঅচ্যুত মেননের (সি পি আই—এম পি) নেতৃত্বে আট-জন সদস্যের কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করলেন।

২ নবেম্বর—আজ বাঁকুড়ায় বাংলা কংগ্রেস সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশনে ঘেরাওকে জনসাধারণের মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী বলে অভিহিত করে সর্বস্তরে ঘেরাও বন্ধ করার জন্য যুক্তফ্রন্ট সরকারের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে।

সোনারপুর থানার প্রসাদপুরে ৩ জন সি পি আই কর্মী খুনের ঘটনায় পুলিস সি পি এম-সমর্থক বলে অভিহিত ১৩ জনকে গ্রেফতার করেছে। আরও অনুসন্ধান চলছে।

দেশী সংবাদ

২৭ অকটোবর—প্রাক্তন স্বাধীনতা সংগ্রামী ও স্বতন্ত্র পার্টির রাজ্য শাখার ভূতপূর্ব সভাপতি শ্রীদর্শন সিং ফেরুমান চণ্ডিগড়ের পাঞ্জাব-ভুক্তির দাবিতে ৭৪ দিন ধরে অনশন করে আজ বিকালে মারা গিয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বৎসর।

সি পি আই আবার সি পি এম-কে আলোচনার জন্য ডেকেছে। কেরলে যুক্তফ্রন্টকে বাঁচানোর জন্যই এই প্রস্তাব। সি পি আই-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারিয়েট কেরলে আরেকটি যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের অনুকূলে সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা চালানোর পক্ষপাতী।

২৮ অকটোবর—মিনি-ফ্রন্টের প্রধান দল সি পি আই, সি পি এম-কে নিয়ে নতুন ভিত্তিতে কেরলের যুক্তফ্রন্ট ও তার সরকারকে পুনরুজ্জীবিত করতে চান। এবং তা যদি না হয় তবে সি পি আই প্রয়োজন হলে কেরল কংগ্রেসের সমর্থন নিয়ে সি পি এম-কে বাদ দিয়ে একটি অকংগ্রেসী সরকার গঠনের চেষ্টা করবেন। এই অভিমত-পোষণ করেন সি পি আই-এর চেয়ারম্যান শ্রী এস এ ডাঙ্গে।

উত্তর কলকাতার রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিটের একটি প্লাস্টিক কারখানায় আগুন লেগে পাঁচজন কর্মী পুড়ে মারা যান। ঐ কাণ্ডে আহত হন আরও চারজন। মৃত পাঁচজন হলেন কৈলাস দাস (১৯), স্বপন অধিকারী (২২), মিহির (২২), কাশীনাথ দে (২৩) এবং বাসুদেব দাস (২১)। এটাই ছিল যাদের প্রথম চাকরির প্রথম দিন।

২৯ অকটোবর—চাষীই জমির ধান কাটবে বলে রাজ্য সরকারের ভূমি ও ভূমিরাজস্ব দপ্তরের সার্কুলার আজ যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন মন্ত্রী ও দলের প্রতিনিধিদের বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে। ভূমি-রাজস্বমন্ত্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার জানান, গোর্খা লীগ ছাড়া যুক্তফ্রন্টের সকল দলের প্রতিনিধিই উপস্থিত ছিলেন।

পাঞ্জাব বিধানসভায় আজ বিরোধী দল অভিযোগ করেন যে, অনশনের ৭৪তম দিবসে অমৃতসরের একটি হাসপাতালে দর্শন সিং ফেরুমানের মৃত্যুর সংবাদ সত্ত্বেও পাঞ্জাব সরকার তাঁর মৃতদেহ সৎকারে দিতে যায়। সরকারি মুখপাত্রের [illegible] এই অভিযোগ [illegible] হয়। [illegible] এবং এর ফলে বিধানসভায় হট্টগোলের সৃষ্টি হয়।

৩০ অকটোবর—সিন্ডিকেট নেতৃবৃন্দের শীর্ষস্থানীয় মহল থেকে যে গুজব রটেছে তাতে জানা যায়, শ্রীমতী গান্ধী, শ্রীজগজীবন রাম এবং শ্রীফকরুদ্দিন আলি আমেদ—এই তিনজনকে কংগ্রেস সভাপতি শ্রী নিজলিঙ্গাপ্পা কংগ্রেস থেকে সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং নতুন নেতা নির্বাচনের জন্য তিনি কংগ্রেস পার্লামেন্টারি পার্টিকে অনুরোধ করেছেন।

সি পি আই, মুসলিম লীগ, আর এস পি এবং আই এস পি-র সমবায়ে গঠিত কেরল ফ্রন্টের ঘনিষ্ঠ মহলের সূত্রে জানা গিয়েছে—আনুষ্ঠানিক অথবা পরশু একটি অস্থায়ী মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করবে। মন্ত্রিসংখ্যা হবে, তিন থেকে পাঁচের মধ্যে।

৩১ অকটোবর—রেলকর্তৃপক্ষ ও রাজ্য সরকারের পদস্থ অফিসারদের বৈঠকে ট্রেনে ডাকাতি বন্ধ করা সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনার পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে—রাতের কতকগুলি ট্রেনে কড়া পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক শ্রী পি সুন্দরায়া আজ কলকাতায় এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন যে, শ্রীজ্যোতি বসুর হাত থেকে স্বরাষ্ট্র দপ্তরটি কেড়ে নেওয়া হলে পশ্চিম বাংলার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় চরম সংকট ঘনিয়ে আসবে।

১ নবেম্বর—আজ সকালে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে যোগ দিতে এসে কংগ্রেস সভাপতি শ্রী এস নিজলিঙ্গাপ্পা ও তাঁর সমর্থক [illegible] কংগ্রেসী বিক্ষোভকারীর হাতে নিগৃহীত হয়েছেন। শ্রী নিজলিঙ্গাপ্পাকে জোর করে গাড়ি থেকে টেনে নামিয়ে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া হয়।

বিদেশী সংবাদ

২৭ অকটোবর—পাকিস্তান সরকার ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী (মহারাজ) রচিত জেলে ত্রিশ বৎসর ও পাক-ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম বইখানি বাজেয়াপ্ত করেছেন। ১৯৬৮ সালে বইখানি ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।

২৮ অকটোবর—নিরাপত্তা পরিষদের সঙ্গে পরামর্শ করে সাধারণ পরিষদ বিশ্ব আদালতের জন্য পাঁচজন নতুন বিচারককে নির্বাচিত করেছেন। তাঁরা হলেন দাহোমির শ্রীলুইস ইগনাসিও পিনটো, যুক্তরাষ্ট্রের শ্রীহার্ডি ক্রস ডিলার্ড, উরুগুয়ের সেনর এডুয়ারডো জিমেনেজ দ্য আরেচাগা, নাইজিরিয়ার শ্রীচার্লস ডি ওনিয়েমা ও স্পেনের শ্রীফেদেরিকো দ্য কাস্ত্রো।

২৯ অকটোবর—আর এক বছরের মধ্যে [illegible] ১ লক্ষ ৫০ হাজার নতুন [illegible] এবং [illegible] এদের অধিকাংশই [illegible]।

৩০ অকটোবর—পাকিস্তানের [illegible] রাজনৈতিক নেতা [illegible] প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের [illegible] পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও সংহতি [illegible] পুনরুদ্ধারের জন্য যুক্তফ্রন্ট গড়ার চেষ্টায় আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন। পাকিস্তানী সংবাদপত্রের সূত্রে এ খবর জানা গেছে।

৩১ অকটোবর—ভারত রাষ্ট্রপুঞ্জে প্রস্তাব করেছে যে, বর্ণবিদ্বেষের বিষয়টি নিয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে আবার আলোচনা হওয়া উচিত এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের সনদের ধারা অনুসারে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

১ নবেম্বর—আজ ঢাকায় সারাদিন স্থানীয় বাঙালী ও ভারত-ত্যাগী বাসিন্দাদের মধ্যে সংঘর্ষ চলার পর রাত্রে পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানীতে সামরিক-বাহিনী সন্ধ্যা থেকে প্রত্যুষ পর্যন্ত সান্ধ্য আইন জারী করে।

২ নবেম্বর—পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক প্রশাসক ঘোষণা করেছেন যে, গতকাল ঢাকায় বাঙালী এবং ভারতীয় উদ্বাস্তুদের মধ্যে কতকগুলি সংঘর্ষ হওয়ায় ৬ জন নিহত এবং ৭১ জন আহত হয়েছে।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ ঃ শ্রীলক্ষ্মীকান্ত বসু

MACLEAN
Indigestion Powder
MACLEAN
Indigestion Powder

খুব কমে
ভারি চটকদার
পোশাক

প্রকাশিত হল

দাম ৪·০০

ওড্‌হাউসের যেমন জীভস্‌, শিবরামের তেমনি হর্ষবর্ধন। মজার মজার এবং অকল্পনীয় যত সব কৌতুককর ঘটনায় ঠিক এই রকম সর্বজনপরিচিত এবং সর্বজন-প্রিয় চরিত্র বাংলা সাহিত্যে বোধ হয় আর নেই। এখনকার শিশু বা বালকবালিকাদের বাবা-মায়েরাও যখন শিশু বা বালকবালিকা ছিলেন, সেই যে তখন হর্ষবর্ধন হাসির গল্প শোনাবার আসরে এসে বসেছেন, আজ পর্যন্ত সে আসরে তিনি সমানভাবে জাঁকিয়েই বসে আছেন — একক এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে। এবং, আশ্চর্যের কথা, তা সত্ত্বেও তাঁর আসরে উপভোক্তার সংখ্যা দিনের পর দিন বাড়ছে বই কমছে না। তাঁর এই অভূতপূর্ব কৃতিত্বের মূল কারণ : তাঁর গল্প কখনও একঘেয়ে হয় না, বা কখনও বিরক্তিকর লাগে না; উপরন্তু যেন চির-আনন্দের উৎসরূপে প্রতিভাত হয়।

শিবরাম চক্রবর্তীর

নূতন হাসির গল্পের বই

হর্ষবর্ধন নিত্যনূতন

তাই তিনি পুরাতন হয়েও চিরনূতন — নিত্যনূতন। বারোটি এমনই চিরনূতন হাসির গল্পের সংকলন বর্তমান বইটি। গল্পগুলির নাম : মাছ ধরা কি সহজ নাকি, দিল্লী দূর অস্ত্‌, হর্ষবর্ধন যুদ্ধে গেলেন না, হর্ষবর্ধনের দেবদর্শন, কয়েকক শিরঅলীক কাণ্ড, সিংহবাহিনী, পিসের বাড়িতে পিস নেই, আমার প্রথম গল্পের নায়ক, হর্ষবর্ধনের ওপর টেক্কা, আলী সাহেবের ভালো মন, হর্ষবর্ধনের অর্থলাভ, রিকসায় কোনো রিসক্‌ নেই!

● এই লেখকের অন্যান্য বই ●

হর্ষবর্ধন আর গোবর্ধন ২·৫০ ঘরণীর বিকল্প ৩·০০

ভালোবাসার অনেক নাম ৬·০০

● আমাদের প্রকাশিত ছোটদের কয়েকখানি অসাধারণ বই ●

শৈলেন ঘোষের

ছোট্ট সোনার গল্প শোনা

রূপকথার গল্প ॥ দাম ৪·০০

শিবরাম চক্রবর্তীর

ইতুর থেকে ইত্যাদি

মজার উপন্যাস ॥ দাম ৩·০০

শৈলেন ঘোষের

মিতুল নামে পুতুলটি

রূপময় রূপকথা ॥ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপ্ত ॥ দাম ৩·০০

শৈলেন ঘোষের

অরুণ বরুণ কিরণমালা

রূপকথা-নাটকা ॥ দাম ২·০০

সরলাবালা সরকারের

পিনকুর ডাইরি

কিশোর উপন্যাস ॥ দাম ২·০০

সত্যজিৎ রায়ের

বাদশাহী আংটি

গোয়েন্দা-উপন্যাস ॥ দাম ৪·০০

নকুল মুখোপাধ্যায়ের

দেবতার পাহাড়

রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস ॥ দাম ৩·০০

শংকরীপ্রসাদ বসুর

আমাদের নিবেদিতা

নিবেদিতা জীবনকথা ॥ দাম ৬·০০

বিমল ঘোষ (মৌমাছি) এর

রাজার রাজা

চিত্রে বিবেকানন্দ জীবনী ॥ দাম ৪·০০ ॥ প্রতি খণ্ড ১·৫০

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের

ছেলেদের বিবেকানন্দ

স্বামীজীর জীবনচরিত ॥ দাম ২·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড

অফিস : ৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলিঃ ৯ ॥ ফোন ৩৪-৮২৪৭
বিক্রয়-কেন্দ্র : ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা-৯

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৭ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৩
শনিবার ২৯ কার্তিক ১৩৭৬

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সংযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ
*
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীসীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
*
টেলিফোন
২৩-২২৮৩ ২৩-৮৫৪১
*
চাঁদার হার

কলিকাতায়

বার্ষিক	...	২৫.০০
ষাণ্মাসিক	...	১২.৫০
ত্রৈমাসিক	...	৬.২৫

ভারতে

বার্ষিক সডাক	...	৩০.০০
ষাণ্মাসিক „	...	১৫.০০
ত্রৈমাসিক „	...	৮.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	...	৩০.০০
ষাণ্মাসিক „	...	১৫.০০
ত্রৈমাসিক „	...	৮.০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ ডাকে)

বার্ষিক সডাক	...	৫২.০০
ষাণ্মাসিক „	...	২৬.০০
ত্রৈমাসিক „	...	১৩.০০

আসাম অঞ্চলে
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	...	৩৯.০০
ষাণ্মাসিক	...	১৯.৫০
ত্রৈমাসিক	...	১০.০০

দাম ৫০ পয়সা
উত্তরবঙ্গ ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাশুল ৭ পয়সা

DESH

Saturday 15 Nov. 1969

কংগ্রেসী কুরুক্ষেত্র

অবশেষে দূরে দিল্লিতে রণবাদ্য বেজে উঠেছে : কংগ্রেসের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষ এখন সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়েছেন, দুই পক্ষের রথী মহারথীদেরও নিজ নিজ পক্ষে দাঁড় করানো হয়েছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মতন এ-যুদ্ধ জ্ঞাতি-কলহ। অবশ্য বলা মুশকিল মহাভারতের সেই পৌরাণিক যুদ্ধের মতন এ যুদ্ধ ধর্ম ও অধর্মের কি না! শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কথাবার্তা থেকে মনে হতে পারে যে, কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা আগাগোড়া অধর্মের কাজে সায় দিয়ে যাচ্ছিলেন; আবার কংগ্রেস সভাপতির মতে শ্রীমতী গান্ধী যে পথে যাচ্ছিলেন তা স্বৈরাচারের পথ, অর্থাৎ এটাও ধর্মের পথ নয়। কুরু-পান্ডবের যুদ্ধের মতন কংগ্রেসের দুই জ্ঞাতির পারস্পরিক হানাহানিতে কার জয় হবে, কার বা পরাজয়, আপাতত আমাদের পক্ষে তা বলা সম্ভব নয়, তবে শ্রীমতী গান্ধীর দিকে পাল্লা ক্রমশই যে ভারি হয়ে উঠছে তাতে সন্দেহ নেই।

কংগ্রেসের মধ্যে ভাঙন নতুন কিছু নয়। নানা সময়ে নানা ভাবে এই বৃহৎ রাজনৈতিক দলটির মধ্যে ভাঙন ধরেছে। কিন্ত দেশের বর্তমান অবস্থায় যে ধরনের ভাঙন ঘটতে চলেছে তা বোধ হয় পূর্বে ঘটেনি। এটাও ঠিক, ইতিপূর্বে ভাঙন ধরলেও মূল কংগ্রেসের শীর্ষে যে-ধরনের শক্ত সমর্থ নেতারা ছিলেন তাতে সে-ভাঙনে কংগ্রেসের মারাত্মক ক্ষতি বাঁচানো গেছে। বর্তমানে কংগ্রেসের কোন পক্ষেই তেমন নেতা নেই, সেই জীবনীশক্তিও কংগ্রেসের মধ্যে আর দেখা যাবে না। স্বভাবতই আশঙ্কা করা যেতে পারে, কংগ্রেস যদি আসন্ন যুদ্ধে ভেঙে পড়ে তবে সে-ভাঙন সামলাবার উপায় থাকবে না।

কংগ্রেসের মধ্যে এই যে বিরোধ—একে আমরা নতুন বলতে পারি না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, নেহরুজী যতদিন জীবিত ছিলেন নিজের প্রচন্ড ব্যক্তিত্ব এবং দূর-দৃষ্টির কল্যাণে সেই বিরোধকে আয়ত্তে রাখতে পেরেছিলেন। নেহরুজীর মৃত্যুর পর অনেকেই মনে মনে জেনে নিয়েছিলেন—কংগ্রেসের অন্তর্বিরোধ জোড়াতালি দিয়ে আর বেশিদিন সামলানো যাবে না। রাজনৈতিকভাবে এই বিরোধ প্রায় তাঁর মৃত্যুর পর থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছে, যদিও শাস্ত্রীজীর স্বল্পকালের প্রধানমন্ত্রিত্বের সময়ে তা স্পষ্ট ছিল না। শ্রীমতী গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হবার পর কংগ্রেসের মধ্যে অনেকেই স্বস্তি অনুভব করেন নি। শ্রীমতী গান্ধী নিজেও করেছিলেন কি না সে সম্পর্কে সন্দেহ আছে। যাই হোক, এ যাবৎ জোড়াতালি দিয়ে কংগ্রেস তার অন্তর্বিরোধ চেপে রাখলেও ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সাম্প্রতিক ঘটনা থেকে সে বিরোধ একেবারে প্রকাশ্য হয়ে উঠেছে।

রাজনীতিতে নাকি দুর্বলতার স্থান নেই। শ্রীমতী গান্ধী তাঁর প্রতিপক্ষ সিন্ডিকেটের সঙ্গে প্রথম লড়াইয়ে যখন থেকে জিতে গেলেন (রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পর) তখন থেকেই বেশ শক্ত হাতে দন্ড ধরেছেন। কোথাও কোথাও তিনি একেবারে নির্মম হয়েছেন। আর এই জয়ের পরিণতি হিসেবে তাঁর পক্ষও ক্রমশই ভারি হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে সিন্ডিকেট সেদিনের অস্বস্তিকর পরাজয়ের পর থেকে মৌখিক একটা ঐক্য প্রস্তাব স্বীকার করে নিয়েও ভেতরে ভেতরে পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। সেদিনের কংগ্রেসী ঐক্য প্রস্তাবকে মূল্য দেবার মতন নির্বোধ কোনো পক্ষেরই রথীরা নন। তলে তলে দুপক্ষই একে অন্যকে একটা প্রকাশ্য রণাঙ্গনে এনে কাবু করার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন যে তাতে আর সন্দেহ নেই। অল্প সময়ের মধ্যে সেই সুযোগ এসে গেল। আপাতত দেখা যাচ্ছে, সিনডিকেট ধনুকে টঙ্কার দিচ্ছেন ঘন ঘন, অন্য দিকে শ্রীমতী গান্ধীর পক্ষও সমানে রণহুঙ্কার ছাড়ছেন। অগত্যা যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। শ্রীবীরেন্দ্র পাটিল শেষ সময়ে যুযুধান দুই পক্ষের মধ্যে একটা আপস রফার চেষ্টা করেছিলেন বটে, তবে তাঁর দৌত্যের দ্বারা শুভ কিছু হয়নি।

কংগ্রেসের এই জ্ঞাতি-যুদ্ধ অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি সাগ্রহে লক্ষ্য করছে। কারণ ভগ্নপ্রায় কংগ্রেস যে মুহূর্তে দু টুকরো হয়ে ভেঙে পড়বে সেই মুহূর্তটি এঁদের কাছে সুবর্ণ সুযোগ। তখন কোন কোন দল কীভাবে এদেশের রাজনৈতিক অবস্থাটি নিজেদের অনুকূলে আনতে পারেন তার ওপর তাঁদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। বলা বাহুল্য, কংগ্রেস যদি ভাঙে, এখন পর্যন্ত যার সম্ভাবনা উজ্জ্বল, তবে তাতে কংগ্রেসের কোন পক্ষেরই ততটা লাভ হবে না যতটা লাভ হবে বিরোধীদের। শ্রীমতী গান্ধী প্রগতিবাদীরূপে পরিচিত। এই প্রগতি ভারতের রাজনীতিকে কোথায় নিয়ে যায় আমাদের পক্ষে তা কৌতূহলের বিষয় হয়ে থাকল।

যুক্ত প্রচেষ্টা

কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা এবং কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে মান-ভঞ্জনের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর বৈষ্ণব রসশাস্ত্র মতে কংগ্রেসের আর একটি পালাই বাকি আছে, এবং সেটি কুঞ্জভঙ্গ। সেটি শেষ হওয়ামাত্র শত্রু মিত্র সব মহল থেকেই প্রথমে উঠবে হরি হরি বোল এবং শেষে বল হরি হরি বো-ও-ল!

সেই অন্তিমের কথা স্মরণ রেখে, হে পাঠক, হে পাঠিকে, আসুন আমরা উৎসবের আসরের পাশে একটু জায়গা করে নিই এবং কংগ্রেসী তরজার ওতোর চাপান শুনে শ্রবণ সার্থক করি। পালার নাম দেওয়া যাক 'সহমরণে যাত্রা' অথবা 'শ্রীমান-শ্রীমতীর দ্বন্দ্ব'।

(শ্রীমানের আক্ষেপ)

চিতান। শ্রীমতীজী, আমরা কংগ্রেসের যে ঐক্য এবং গণতন্ত্রের যে ঐতিহ্য গড়ে তুলেছিলাম, আপনার কার্যকলাপের ফলে তা ভেঙে পড়তে বসেছে।

পরচিতান। অতলস্পর্শী যে খাদের কিনারে আপনি নিজেকে টেনে নিয়ে গিয়েছেন, সেখান থেকে এখনও ফিরে আসুন।

ফুকা। ষড়যন্ত্র ও বিভেদ সৃষ্টির পথ পরিত্যাগ করুন।

মেলতা। কিন্তু আপনি সে কথায় কর্ণপাত করা প্রয়োজন মনে করছেন না।

মহড়া। আপনার নেতৃত্বে আপনি কয়েকজনকে নিয়ে সভা করলেন, আমার কিছু কিছু কাজকে গঠনতন্ত্রবিরোধী আখ্যা দিয়ে কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে সরাবার জন্য আপনারা এ আই সি সি-র জরুরী সভা ডাকতে উদ্যোগী হয়েছেন। এর কাজ শৃঙ্খলার পরিপন্থী এবং অগণতান্ত্রিক। কংগ্রেস গঠনতন্ত্র লঙ্ঘনের এ এক হীন উদাহরণ।

ধুয়া। এখনও সময় আছে, শোন মিনতি।

(শ্রীমতীর কোপ)

চিতান। শ্রীমানজী, নির্দিষ্ট কাজের জন্য এ আই সি সি-র জরুরী সভা ডাকার বিধান কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রে আছে।

পরচিতান। নির্দিষ্ট কাজের জন্যই এখানে এ আই সি সি-র সভা তলব করা হচ্ছে।

ফুকা। কংগ্রেস সভাপতির বিরুদ্ধে কুৎসা রটনার জন্য এ আই সি সি ডাকা হচ্ছে, আপনার এই অভিযোগ মিথ্যা।

মেলতা। ডিসেম্বর মাসে বর্তমান কংগ্রেস সভাপতির কার্যকাল শেষ হয়ে যাবার পর যাতে সভাপতি নির্বাচন করা হয় সেই কারণেই এ আই সি সি-র সভা তলব করতে হচ্ছে।

মহড়া। আমি এর মধ্যে অন্যায় কিছু দেখিনি। বিশেষত অধিকাংশ এ আই সি সি-র সদস্য এই জিনিসই চাইছেন।

ধুয়া। আমি ঢের সয়েছি, আর তো সয় না।

[দাশরথি রায় প্রণীত ধরতা]

শ্রবণে বড় আনন্দ, নারী-পুরুষের দ্বন্দ্ব
পেতে নানা রসের কথার ফাঁদ।

ঢোল কাঁসির আখড়াই। গিজতা গিজাং গিজতা গিজাং।

শ্রীমান (ওতোর)। ৮ সেপ্টেম্বর আপনার ও আপনার কয়েকজন বন্ধুর একখানা চিঠি পেয়ে আমি রীতিমত বিস্মিত হই। ওই চিঠিতে আপনারা অভিযোগ করেছিলেন, আমি শ্রীসুব্রহ্মণ্যমকে ওয়ারকিং কমিটি থেকে সরিয়ে দিয়েছি। আমি চিঠি পাওয়া মাত্র জানাই, এরকম কোনও ঘটনা ঘটেনি। আপনারা যথেষ্ট দায়িত্বশীল লোক হওয়া সত্ত্বেও, কোনও রকম যাচাই না করেই আমার বিরুদ্ধে এত বড় একটা অভিযোগ আনলেন, এইটেই আশ্চর্য, আরও আশ্চর্য চিঠিখানা আমার হাতে পৌঁছাবার আগেই খবরের কাগজে ছাপা হয়ে গেল এবং সব থেকে আশ্চর্য ঘটনা, সত্য নয় জেনেও আপনারা দুঃখ প্রকাশ করলেন না। (চাপান) রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ঠিক মুখেও আপনার মহল থেকে আমার বিরুদ্ধে জনসংঘ ও স্বতন্ত্র দলের সঙ্গে কল্পিত আঁতাতের কথা প্রচার করে আপনারা কংগ্রেস প্রার্থীর পরাজয়ের পথ সুগম করে দিয়েছেন।

ঢোলের বোল : ঘুষু থাক থাক, থাক চেপে থাক।

[দাশু রায়ের ধুয়া]

নারীর বুক ভারি তাজা, পুরুষকে হল নারী রাজা।

ঢোল : ঘুঘু থাক, তাক বুঝে থাক।

শ্রীমতী (ওতোর)। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার পর ২৫ আগস্টের ঐক্য প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন। অতএব এখন আর পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে লাভ নেই। (চাপান) আমার সমর্থক বুঝে এই কারণেই আপনি ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদ থেকে শ্রীসুব্রহ্মণ্যম, শ্রীফকরুদ্দীন আলি আহমদ প্রভৃতিকে সরিয়ে দিয়ে দলের ঐক্যে ফাটল ধরিয়েছেন।

শ্রীমান (ওপর চাপান)। আর আপনি? মোরারজী, রামসুভগ সিং এবং আর চারজন মন্ত্রীকে সরিয়ে দিয়ে দলের ঐক্য বুঝি সুদৃঢ় করেছেন? আপনিই না বলেছিলেন, দল থেকে দেশ বড়? আপনিই না দলীয় প্রার্থীকে হারাবার জন্য ডি এম কে এবং কমিউনিস্টদের সঙ্গে হাত মেলাতেও ইতস্তত করেন নি? আপনি তো জানেন, ব্যাংক জাতীয়করণ সহ কংগ্রেসের দশ দফা কর্মসূচী কয়েক বছর আগেই বাঙ্গালোর এ আই সি সি-তে কামরাজ, চবন, অতুল্য ঘোষ প্রভৃতির উদ্যোগে গৃহীত হয়েছিল। আর এখন আপনার অনুচররা বলে বেড়াচ্ছেন, ব্যাংক জাতীয়করণ আপনার মগজেরই সৃষ্টি। আপনি ও আপনার অনুচররা বলে বেড়াচ্ছেন, তাঁরা ছাড়া কংগ্রেসের আর সবাই সিনডিকেটপন্থী—প্রতিক্রিয়াশীল। আপনি তো জানেন, মোরারজীর বদলে লালবাহাদুর এবং আপনাকে এই সিনডিকেটই প্রধানমন্ত্রীর গদিতে বসিয়েছিলেন।

শ্রীমতী (চাপান)। সিনডিকেট সম্পর্কে আমি কিছুই বলিনি। ও কথাটাই আমি কখনও উচ্চারণ করি না। আমি কংগ্রেসের কর্মসূচীই বলিষ্ঠভাবে রূপ দিতে চাই। কংগ্রেসের উজ্জীবন চাই। ঐক্য চাই।

শ্রীমান (চাপান)। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংগঠনকে দুর্বল করে দিয়ে কোনও কাজ করা যায় না। আমরা কংগ্রেসের উজ্জীবন চাই। তার জন্য ঐক্য চাই।

শ্রীমতী : আপনাদের চাই না। ঐক্য চাই।

শ্রীমান : আপনাদের চাই না। ঐক্য চাই।

ঢোল : ঘুঘু থাক ঘুঘু থাক ঘুঘু থাক...

দেউলিয়া বামপন্থী রাজনীতি

ভারতের বামপন্থী রাজনীতির দেউলেপনা এবার পরিষ্কার ধরা পড়েছে। যাঁরা এতদিন বলে এসেছেন "কংগ্রেসকে জাহান্নামে পাঠাও", এখন যখন সত্যি সত্যিই কংগ্রেস জাহান্নামে যেতে বসেছে তখন তাঁরাই অনাথ শিশুর মত আচরণ শুরু করেছেন—এখন তাঁরাই কংগ্রেস রাজত্বকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সবচেয়ে বেশি সচেষ্ট।

আরও মজার ব্যাপার, এক নকশালপন্থীরা ছাড়া আর সবাই যে যত বেশি উগ্রবাম সেই যেন কংগ্রেস রাজত্বকে টিঁকিয়ে রাখতে তত বেশি ব্যগ্র। যেমন ধরুন, সি পি এম-এর কথা। তাঁরা আগে থেকেই বলে রেখেছেন, ইন্দিরা সরকারের বিরুদ্ধে কোনও অনাস্থা প্রস্তাব এলে আমরা তার বিরুদ্ধে ভোট দেব। প্রায় একই কথা কিছুটা জল মিশিয়ে বলেছেন সি পি আই। এস এস পি বা পি এস পি—যাঁরা তাত্ত্বিক-বিচারে দুই কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ে কম বামপন্থী তাঁদের মধ্যে কিন্তু এখনও দ্বন্দ্ব আছে। ওই দুই দলের পক্ষ থেকে এখনও এমন কোনও ঘোষণা করা হয়নি যা থেকে ধরে নেওয়া যায় যে ও'রা বিপদে ইন্দিরা সরকারকে সমর্থন করবেনই।

সি পি আই এবং সি পি এম-এর বক্তব্যে অবশ্য একটা মৌলিক তফাৎ আছে। সি পি আই বলছেন, আমরা ইন্দিরাকে সমর্থন করব; আর সি পি এম-এর বক্তব্য, আমরা যে কোনও দক্ষিণপন্থী মোরচার বিরুদ্ধে ভোট দেব। নিট ফলটা কিন্তু একই দাঁড়াচ্ছে, দুপক্ষই কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সরকারকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইছেন।

সি পি এম-এর নেতারা বলেন, তাঁদের সঙ্গে সি পি আই-র সবচেয়ে বড় পার্থক্য হল যে তাঁদের ইন্দিরা-সমর্থন নেতিবাচক, আর সি পি আইর সমর্থন ইতিবাচক। কংগ্রেসের "প্রগতিশীল" অংশের লেজ ধরে নিয়েই সি পি আই ইন্দিরার সমর্থক। সি পি আই মনে করেন, এখন প্রগতিশীল কংগ্রেসীদের সঙ্গে হাত মেলানো প্রয়োজন। তাঁরা ইন্দিরার সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গঠনেও আগ্রহী। মারকসবাদী পারটি বলেন : আমরা তা নই। আমরা মনে করি ইন্দিরাও বুর্জোয়াদের স্বার্থরক্ষাতেই উৎসাহী। তবে তাঁর পথটা ভিন্ন। সিণ্ডিকেট গোষ্ঠী চাইছেন পুলিসী রাজ কায়েম করে পুঁজিপতি ও জমিদারদের স্বার্থরক্ষা করতে; আর ইন্দিরা চাইছেন গণতান্ত্রিক মুখোস বজায় রেখে বুর্জোয়া স্বার্থ বজায় রাখতে। সি পি এম-এর বিচারে একদল বুর্জোয়া ডিক্টেটরশিপের পক্ষে আর একদল বুর্জোয়া ডেমোক্রেসির সমর্থক। মারকসবাদী নেতারা বলেন : আমরা ডিমিট্রভের নির্দেশ অনুসারেই এই লড়াইয়ে বুর্জোয়া ডেমোক্রেসির পক্ষে এবং বুর্জোয়া ডিক্টেটরশিপের বিরুদ্ধে।

যিনি যে ব্যাখ্যাই দিন, মোদ্দা কথাটা পরিষ্কার—দুই কমিউনিস্ট পারটিই ইন্দিরা সরকারকে বাঁচিয়ে রাখতে চান। এবং এই সমর্থন দেওয়ার বিনিময়ে তাঁরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে কোনও প্রতিশ্রুতিও চান না—তাঁদের সমর্থন মোটামুটি আনকন্ডিশনাল। কংগ্রেসের প্রধানমন্ত্রীকে ক্ষমতায় রাখার জন্য দুই কমিউনিস্ট পারটি এভাবে আন-কন্ডিশনাল সমর্থন জানাবেন, বছর দুতিন আগেও একথা বোধ হয় অনেকেই কল্পনা করতে পারেননি।

*

সি পি আই যে এরকম একটা কাজ করবে তা অবশ্য বেশ কিছুদিন থেকেই বোঝা যাচ্ছিল। ও'রা বহুদিন থেকেই বুঝেছেন দলের শক্তি বাড়িয়ে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে দেশে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব (অর্থাৎ কেন্দ্রে ক্ষমতা দখল) করা সম্ভব হবে না। তাই ও'রা "কৌশলের" পথ ধরেছেন। বহুদিন থেকেই তালে আছেন কিভাবে কৌশলে দিল্লির সিংহাসনে পৌঁছা যায়। সেইজন্য বহুদিন থেকেই সি পি আই কংগ্রেসের একটা অংশকে প্রগতিশীল অংশ বলে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন এবং সেই অংশটিকে নানাভাবে (মায় রাশিয়ার সাহায্য নিয়ে) তা দিতে শুরু করেছেন। সি পি আই মনে করছেন এখন তাঁদের সেই দীর্ঘ প্রচেষ্টা সফল হতে চলেছে। তাই এখন তাঁদের পক্ষে আহ্লাদে আটখানা হওয়া স্বাভাবিক।

সি পি আই নেতারা আরও মনে করছেন, সিণ্ডিকেটের ধাক্কায় ইন্দিরা তাঁদের ওপর বহুলাংশে নির্ভর করতে বাধ্য হবেন। শুধু লোকসভার ভোট নয়, সিণ্ডিকেট বিরোধী জনমত গড়ার জন্যও তাঁদের সাহায্য প্রধানমন্ত্রীকে নিতেই হবে। আর শুধু সিণ্ডিকেট নয়, সকল দক্ষিণপন্থী শক্তিও প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আক্রমণ তীব্রতর করবেই। সব মিলিয়ে ইন্দিরা সি পি আইর উপর অনেক বেশি নির্ভরশীল হয়ে উঠবেনই। সি পি আই নেতারা আশা করছেন, সেই সুযোগে প্রধানমন্ত্রীর উপর চাপ দিয়ে অনেক কিছু আদায় করে নেওয়া যাবে—সরকারী যন্ত্রের উপর তাঁদের আধিপত্য বৃদ্ধিও সম্ভব হবে। সি পি আই তাই এমন অবস্থা সৃষ্টি করতে উৎসাহী যাতে শ্রীমতী গান্ধীর তাঁদের উপর নির্ভর করা ছাড়া কোনও উপায় না থাকে।

সি পি. এম কিন্তু গোড়া থেকেই এই নীতির বিরুদ্ধে। তাঁরা বিশ্বাসই করেন না, কংগ্রেসের ইন্দিরা-অংশ প্রগতিশীল। তাঁরা তাই কখনও কংগ্রেসের কোনও প্রগতিশীল অংশকে তা দেওয়ার নীতি অবলম্বন করেননি। অন্তর্বর্তী নির্বাচনের পর তাঁরা কৌশল স্থির করেছিলেন, কেরল ও পশ্চিমবঙ্গের দুই ফ্রন্ট সরকারকে শক্তিশালী করে তোল এবং ক্রমে ক্রমে অন্যান্য রাজ্যেও নিজেদের শক্তি বাড়াও। কিন্তু তাঁরা হতাশ হয়ে দেখলেন, কেরলের ফ্রন্ট সরকার ভেঙ্গে গেল, তাঁদের বাদ দিয়ে সি পি আই নতুন সরকার গঠন করলেন। তাঁরা এখন দেখছেন, পশ্চিমবঙ্গের সরকারও ভাঙে ভাঙে। এখানেও ফ্রন্টের অধিকাংশ শরিকই তাঁদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। এখানেও তাঁদের বাদ দিয়ে নতুন যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের উদ্যোগ আয়োজন চলছে।

সি পি এম এও জানেন যে কেরল ও পশ্চিমবঙ্গের এই পরিণতির সঙ্গে দিল্লির রাজনীতি জড়িত। তাঁরা বুঝেছেন, ইন্দিরার জয় মানেই সি পি এম বিরোধী "প্রোগ্রেসিভ" রাজনীতির আরও শক্তিবৃদ্ধি। কিন্তু এ সব জেনেও তাঁরা ইন্দিরাকে সমর্থন করতে বাধ্য হচ্ছেন। কারণ, তাঁদের ভয়, ইন্দিরার প্রতিপক্ষ যদি জয়ী হয় তাহলে তাঁদের পারটিকেই হয়ত বেআইনী করে দেওয়া হবে। আর, তাঁদের আশা, ইন্দিরা জিতলে আর যাই করুন তাঁদের পারটিকে অন্তত বে-আইনী করবেন না।

পারটি বে-আইনী হওয়াটাকে সি পি এম নেতারা খুব বেশি ভয় করেন। কারণ, তাঁরা জানেন সঙ্গে সঙ্গে এর দুটো ফল হবেঃ (এক) পারটির আশপাশের বিশাল মধ্যবিত্ত বাহিনীর একটা বিরাট অংশ ভয়ে সরে যাবে। এবং (দুই) শাসনযন্ত্রের নিপীড়নের ফলে পারটির আর একটা বড় অংশ নকশালপন্থীদের পথে যাবে। নেতৃত্ব এর একটাও চান না। তাই সর্বদা তাঁদের এক চেষ্টা, আর যাই হোক পারটি যেন বে-আইনী না হয়। সেইজন্যই এবং সেই আশাতেই সি পি এম ইন্দিরা সরকারকে বাঁচিয়ে রাখতে চান। তাঁরা ভাবছেন, ইন্দিরা

...চলে তাঁরাও বাঁচার এবং বাড়ার সুযোগ ...বেন।

এ তো গেল দুই কমিউনিস্ট পারটির ...থা। দুই সোস্যালিস্ট পারটির অবস্থা ...রও শোচনীয়। এস এস পি এবং পি ...স পি বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ...দের দুই দলের ভূমিকা এখনও নির্ধারণই ...রতে পারেন নি। দু দলের ভেতরই তীব্র ...ভেদ আছে। এক পক্ষের বক্তব্য, ইন্দিরা ...রকারের বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে কংগ্রেসের ...কচেটিয়া অধিকারের অবসান ঘটাও। আর ...ক পক্ষ বলছেন, না, ইন্দিরা সরকারকে ...খন ফেললে তাল সামলানো যাবে না। ...তরাং ইন্দিরা সরকারকে বাঁচিয়ে রাখ। ...ই দুয়ের কোন্ মত জিতবে, না এই নিয়ে ...রটি দু ভাগ হয়ে যাবে—এখনই তা বলা ...ঠিন।

⁂

সব মিলিয়ে এটা কিন্তু পরিষ্কার, ...গ্রেসের এই ভাঙনের সুযোগ দেশের ...মপন্থী শক্তিগুলি তেমনভাবে নিতে ...রলেন না। তাঁরা আলাদা কোনও ভূমিকা ...লেই ব্যর্থ হলেন। তাঁরা কংগ্রেসেরই ...পাশে সমবেত হওয়ার কৌশল অবলম্বন ...রলেন। তাঁরা প্রমাণ করলেন, তাঁরা এখনও ...গ্রেসেরই উপগ্রহ।

এই ব্যর্থতার প্রধান কারণ, দেশের ...মপন্থী শক্তিগুলির অনৈক্য। তাঁরা পরস্পর ...স্পরের ঘোরতর শত্রু। তাঁরা যতটা না ...গ্রেস বিরোধী তার চেয়ে একে অপরের ...বেশি শত্রু। একজন আর একজনকে খতম ...রার চেষ্টায় সর্বদা ব্যস্ত। কংগ্রেসের ...রুদ্ধে সমবেত হওয়ার মত ইচ্ছা বা চেষ্টা ...দের মোটেই নেই।

অনেক বামপন্থী গাছের যে কাঁঠালটির ...শায় গোঁফে তা দিচ্ছেন সেটাও বোধ হয় ...ষ পর্যন্ত পাকবে না। ইন্দিরা গান্ধী ...সম্পর্কে ভবিষ্যতে সকল বামপন্থীর সব ...ধারণাই ভুল হতে বাধ্য। যাঁরা আশা ...রেন, ইন্দিরা তাঁদের উপর নির্ভর করে ...থাকতে বাধ্য হবেন এবং তাই তাঁদের বন্ধু ...বিনাওজরে তাঁকে মেনে নিতেই হবে—...তাঁরা ঠকতে বাধ্য। ইন্দিরা গান্ধী সে ...ধাতুরই গড়া নন। একদিন সিণ্ডিকেটের ...নেতারাও হাতের পুতুল করে রাখার ...আশাতেই মোরারজীর বিরুদ্ধে ইন্দিরাকে ...সমর্থন করেছিলেন। এখন তাঁরা হাড়ে হাড়ে ...বুঝছেন কি ভুল হিসাবই না করেছিলেন। ...ইন্দিরা যেমন সুযোগ পাওয়া মাত্র ...সিণ্ডিকেটকে বুড়ো আঙুল দেখিয়েছেন, ...সুযোগ পেলেই তেমনি ব্যবহার করবেন সি ...পি আই সহ অন্যান্য বামপন্থীদের সঙ্গে।

ইন্দিরা যদি শেষ পর্যন্ত জিতেই যান ...এবং যদি বিপদ আপদ কাটিয়ে উঠতে ...পারেন তাহলে তিনি যে খুব গণতন্ত্রের ...পূজারী হবেন তাও আমি মনে করি না।

বুড়োহাবড়াদের মত চক্ষুলজ্জা প্রধানমন্ত্রীর নেই। গণতন্ত্রবিরোধী বলে তিনি যাদের মনে করেন তাঁদের খতম করতে অগণতান্ত্রিক পন্থা অবলম্বনে প্রধানমন্ত্রী সামান্যও কুণ্ঠিত হবেন না।

প্রধানমন্ত্রী একটি জিনিস বোঝেন—সেটা হল তাঁর নিজের শক্তিবৃদ্ধি, তাঁর নিজের মত চলার পথ করে নেওয়া। এজন্য তিনি যে কোনও কাজ করতে, যে কোনও ব্যবস্থা অবলম্বনে কুণ্ঠিত নন।

৯।১১।৬৯

নবারুণ গুপ্ত

দেবরাজ

হিসেবের কড়ি

দৈবজ্ঞেরা ইদানীং পড়েছেন বিলেত নেতা নিয়ে। সেখানকার বড়ো প্রধান দল শ্রমিক আর রক্ষণশীল। তাদের কুষ্ঠি বিচারে তাঁরা মেতে গিয়েছেন, তার সংগে সেখানকার শ্রমিক সরকারেরও। আসলে তাঁদের লক্ষ্য হচ্ছে বিলিতী শ্রমিক সরকার—তার আয়ু ফুরিয়ে এসেছে কি না খড়ি পেতে সেটাই তাঁরা গুণে দেখছেন। অনবরত তাঁরা ছক কষছেন কোন দলের জন সমর্থন কতটা বাড়লো কিংবা কমলো। তাই দিয়ে স্থির করছেন নির্বাচন হলে কার জেতবার সম্ভাবনা কতটা, হারবার সম্ভাবনাই বা কতটা। এক একবার তাঁরা ছক কষেন আর যাচাই করে দেখেন সেটা এক একটা উপনির্বাচনের ফলের সংগে মিলিয়ে। কখনও কখনও স্থানীয় নির্বাচনের ফলাফলের সংগেও দৈবজ্ঞেরা তাঁদের রাজনৈতিক ভাগ্য বিচারের ফল মিলিয়ে দেখেন। এতদিন তাঁরা বলে এসেছেন শ্রমিক দলের এখন শনির দশা—তাদের অপমৃত্যু কেউ ঠেকাতে পারবে না; অর্থাৎ পুরো পাঁচ বছর প্রধানমন্ত্রীগিরি করা উইলসন সাহেবের ভাগ্যে নেই। গদি তাঁকে তার আগেই ছাড়তে হবে, সংগে সংগে অস্ত যাবে শ্রমিক দলের সৌভাগ্যলক্ষ্মী।

বিলেতে নির্বাচন হয় পাঁচ বছর অন্তর। সেখানে শেষ নির্বাচন হয়েছে ৩১ মার্চ ১৯৬৬। হিসেব মত আবার নির্বাচন হবে ১৯৭১ সনে—বড় জোর ১৯৭০এর শেষাশেষি। দৈবজ্ঞদের কিন্তু ধারণা অতদিন উইলসন সরকার টিকবে না, নির্বাচন হবে তার অনেক আগেই। এ অনুমান তাঁরা করছেন কেবল উপনির্বাচনে আর স্থানীয় নির্বাচনে শ্রমিক দলের হাল দেখে নয়, তাদের জনসমর্থনের মাত্রা হিসেব করে। বিলেতে উপনির্বাচনে কি স্থানীয় নির্বাচনে হারজিত দেখে অনেক সময় বলে দেওয়া যায় সাধারণ নির্বাচনে পরের বার কারা জিতবে, কারা হারবে যদিও সে অনুমান সব সময়ে নির্ভুল হয় না। এখন গণৎকারেরা কিন্তু কেবল উপনির্বাচন কিংবা স্থানীয় নির্বাচনের ফলাফল দেখেন না—তাঁরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে লোককে প্রশ্ন করে জেনবার চেষ্টা করেন হাওয়াটা কোন দিকে বইছে। তারপর লোকের মতের গতিকে ধরবার প্রয়াস পান গণিতের সাহায্যে। মাঝে মাঝে তাঁরা জানিয়ে দেন শ্রমিক দলের জনসমর্থন কত শতক কমেছে আর রক্ষণশীল দলের জনসমর্থন কত শতক উঠেছে। সেই হিসেব অনুযায়ী তাঁরা উপনির্বাচনে আন্দাজ করেন কার হবে জিত, কার হার।

দেখা যাচ্ছে শ্রমিক দলের ওপর ভোট লক্ষ্মী বিরূপ। উপনির্বাচনে তারা বিশেষ **সুবিধে করতে পারছে না, প্রায়ই হারছে।** সে হার যে সে হার নয়। যেসব কেন্দ্র শ্রমিকদের শক্ত ঘাঁটি বলে লোকে জানতো সেসব কেন্দ্রেও উপনির্বাচনে জিততে শ্রমিক দল হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে, নয়তো গোহারা-হারি হারছে। গণৎকারেরা মাথা নেড়ে বলছেন—হবেই তো, তাঁদের হিসেবেও তো তাই। শ্রমিক দলের জনসমর্থনের মাত্রা কমছে, ভোট কমছে, রক্ষণশীলদের জনসমর্থনের মাত্রা বাড়ছে, ভোটও বাড়ছে। হিসেবের কড়ি যে আর বাঘে খায় না। কাজেই শ্রমিকেরা হারছে আর রক্ষণশীলেরা জিতছে। এমন যদি আরও কিছুদিন চলে তা হলে পরের নির্বাচনে শ্রমিক দল নির্ঘাত হারবে, দেশ শাসনের অধিকার ফিরে পাবে রক্ষণশীল দল। দৈবজ্ঞদের এ অদৃষ্ট বিচারে শ্রমিক দলের নেতারা মুষড়ে পড়েছেন, আর খুশিতে ডগমগ রক্ষণশীলদের রথী অতিরথরা। তাঁরা দাবি তুলেছেন উইলসনের আর দেরী না করে ইস্তফা দিয়ে সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা উচিত, নইলে গণতন্ত্রের মর্যাদা থাকে না।

শ্রমিক দলের নেতা হ্যারল্ড উইলসন খানিকটা ঘাবড়ে গেলেও এত সহজে হাল ছেড়ে দেবার পাত্র নন। বরঞ্চ হাল তিনি আরও শক্ত করেই চেপে ধরেছেন। তাঁর নিজের দলের মধ্যেও বিরোধ দেখা দিয়েছে—দু চার জন বাঘা বাঘা নেতা শ্রমিক মন্ত্রিসভা ছেড়েও দিয়েছেন। ভাঙনের লক্ষণ মাঝে মাঝে পরিস্ফুট হয়ে উঠছে। উইলসন সাহেব তবুও কিন্তু অটল। তিনি বুঝতে চাইছেন গণদেবতা কেন বিমুখ হচ্ছেন, কী উপচারে পুজো করলে তিনি তুষ্ট হবেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর ধারণা দেশের আর্থিক সংকট কাটাবার জন্য যে সমস্ত কড়াকড়ি তিনি করেছেন যার ফলে লোককে বিস্তর কৃচ্ছ্রসাধন করতে হচ্ছে তাতেই লোকে তাঁর ওপর চটেছে। কিন্তু কষ্ট না করলে তো আর কেষ্ট পাওয়া যায় না। তাই তিনি লোকের কষ্ট লাঘবের দিকে নজর না দিয়ে চেষ্টা করছেন সাচ্ছল্যের কেষ্টকে তাদের হাতে তুলে দিতে। তার প্রমাণ এখন কিছু কিছু পাওয়া যাচ্ছে। বৈদেশিক লেনদেনে যে ঘাটতি ছিল তা পূরে এসেছে, পাউণ্ডের ওপরও আর চাপ নেই। **উইলসনের আশা দেশের সুদিন এলো বলে,** সংগে সংগে তাঁর দলেরও।

দৈবজ্ঞদের মতেও ইদানীং বেশ বদলেছে। এতকাল তাঁদের হিসেব ছিল রক্ষণশীলদের জনসমর্থন গেল নির্বাচনের পর এত বেড়েছে যে তা শ্রমিকদের চেয়ে বিশ শতক বেশী। তার মানে হচ্ছে সাধারণ নির্বাচন হলে শ্রমিক দল গো-হারান হারবে। যদি রক্ষণশীলদের জনসমর্থন দশ শতকও বাড়ে তা হলেও তারা শ্রমিকদের চেয়ে ২৩০-এর বেশী আসন পাবে। কিন্তু হঠাৎ শোনা গেল রক্ষণশীলদের জনসমর্থনের পারাটা হু হু করে নামতে আরম্ভ করেছে। কুড়ি শতক থেকে হলো দশ শতক তার পর ৪, তারপর মাত্র ২। গণৎকারেরা বলতে শুরু করলেন—হাওয়া ঘুরে গিয়েছে, শ্রমিকদের ওপর গণদেবতা আবার সদয় হয়েছেন, নির্বাচন হলে আবার শ্রমিকরাই জিতে ফিরে আসবে। এর পর শুরু হলো নানা জল্পনা-কল্পনা। দৈবজ্ঞেরা ধরে নিলেন সুবাতাস যখন বইছে নিশ্চয় তাকে কাজে লাগাবেন উইলসন সাহেব, নির্বাচনের পানসি চালিয়ে তিনি আবার ক্ষমতার ঘাটে গিয়ে উঠবেন। মাঝখানে পার্লামেন্ট ভেঙে দিয়ে নতুন নির্বাচন করার অধিকার বিলিতী প্রধানমন্ত্রীর আছে। তাই হ্যারল্ড উইলসন করতে চলেছেন একথাটাই চারদিকে রটে গেল।

কাঁচা কাজ করবার লোক উইলসন সাহেব নন। ভাগ্য নিয়ে জুয়ো খেলার ইচ্ছে তাঁর নেই। তিনি একটু অবস্থাটা যাচাই করে নিতে চাইলেন। অনেকগুলো উপনির্বাচন বাকী ছিল—তার পাঁচটা একদিনেই করবার তিনি দিলেন নির্দেশ। ওই থেকে সাধারণ নির্বাচনের ফল দেখে আন্দাজ করা যাবে হাওয়া কোন দিকে বইছে। ও পাঁচটি শ্রমিক দলের আসন হলেও তারা যে জিতবেই তার কোন স্থিরতা ছিল না। কেননা অনেকগুলো বাঁধা আসন তারা এর আগে খুইয়েছে। সে নির্বাচনপর্বটা চুকে গিয়েছে ৩০ অক্টোবর। গণৎকারদের থোঁতা মুখ আবার ভোঁতা হলো। শ্রমিকরা চারটে আসন পেলেও তাদের জনসমর্থন আগের চেয়ে অনেক কমলো। শুধু তাই নয় একটা নিরাপদ আসন তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিল রক্ষণশীলরা। প্রমাণ হলো দৈবজ্ঞদের গণনা ভুয়ো। রক্ষণশীলদের জনসমর্থন দিব্যি আছে। এখন যদি নির্বাচন হয় তা হলে তাদের জিত কেউ ঠেকাতে পারবে না। অবশ্য নির্বাচন তো আর এখনই হচ্ছে না—তা হবে কখন সেটা নির্ভর করছে উইলসন সাহেবের মর্জির ওপর। তবে হাড়িকাঠে গলা বাড়িয়ে দেবেন সে বান্দা উইলসন সাহেব নন। কাজেই **বিলেতে নির্বাচন আপাতত বিশ বাঁও জলের নিচে।**

সে ও অন্যেরা

বুদ্ধদেব বসু

বালক, সে স্বপ্নে দ্যাখে অনেক অস্পষ্ট মূর্তি —
একদল কিমাকার বাজিকর।
লম্বা দাড়ি, কারো ঢোলা আলখাল্লা পরনে,
বাবরি-চুলে চাঁছাছোলা তীক্ষ্ণ মুখ,
গাল-ভাঙা ন্যাড়ামুণ্ডি, কারো হাতে ডুগডুগি, করতাল,
কারো হাতে বাঁদর ডিগবাজি খায়, ভেংচি কাটে আহ্লাদি ভালুক;
মস্ত ঝোলা সকলেরই কাঁধে :
'যা দেয় পাগল ক'রে, এই সেই ধুতুরার বীজ,
আর এই সর্বরোগনিবারক সপ্তধাতুঘটিত তাবিজ,
এই যে বাঘের থাবা, মৃগনাভি, তিব্বতি মৌচাক,
সাপের খোলশে বোনা এটা বাদশাজাদির শেমিজ —'
দেখায়, হুমকি ছাড়ে, চোখ টিপে ফুশলে নিতে চায়,
ফুশমন্তরে ফোটায় আমের বোল, মেখে দেয় নিশ্বাসে চাঁপার গন্ধ,
অদ্ভুত ভেঁপুর শব্দে হেলে-দুলে ব'লে যায়, 'আয় —
আয়, হবি আমাদের চেলা,
এই মেলা, নাচ গান খেলা
সারাবেলা বেছন্দ স্বাধীন,
অফুরান এই গান, যাতে সব শব্দ মিশে যায়,
অফুরান এই মেলা, সব খেলা যাতে ঠাঁই পায় —
শোন, সবই তোর জন্য, তোরই জন্য, আয় চ'লে আয়।'
সে ঈষৎ ভয় পায় — একলা, ছোটো — অন্ধকারে শুয়ে;
হাত বাড়িয়ে মাকে খোঁজে, আঁকড়ে ধরে মুঠোতে চাদর।
'না, আমি যাবো না' বলতে চায়। কিন্তু তার মুকতা অনেক বড়ো।
কান পেতে, চোখ দেয় ডুবিয়ে স্বপ্নের তলে,
আর তার ভবিষ্যৎ, যার নাম এখনো জানে না —
অন্ধকারে জ্বলে নেভে ছোট্ট এক জোনাকির মতো।

এখন সে জানে, তাই সশঙ্কিতঃকরণে
শৈশবের স্বপ্নে দেখা সেই সব মুখের রেখায়
আঁকে দেবলক্ষণ — অবশ্যমান্য — আক্ষরিক।
যেন কোনো জীবন্ত মন্দিরে
সারি-সারি বিগ্রহ — নির্বাক নাম — সমাচারে সোচ্চার, রহস্যময় —
অনেকেরই অশ্রুত যদিও।
চ'লে যায় সন্নিধানে, দুই হাতে পুষ্পিত বিনয়,
ক্লান্তিহীন কম্পন বুকের তলে — নতজানু — অথচ নির্ভয়,
কেননা জাগর-মন্দ্রে সদা-ফোটা তার হৃদয়েরে
নিত্য দান দিয়ে যান তাঁরা
ঠোঁটের প্রান্তিক হাসি, আঙুলের ভঙ্গির ইশারা,
মোহময়, নিষ্পলক দৃষ্টির পাহারা,
আর অন্ধকারে শোনা কণ্ঠস্বর — অবিরাম ধ্বনি, প্রতিধ্বনি।

কিন্তু আজ তাঁরাই প্রধান শত্রু — সেই দয়াবান দেবতারা।
সে নামে উজ্জ্বল যুদ্ধে, প্রত্যাখ্যানে, কুট আক্রমণে।
ঠাকুর্দার জামিয়ার, বাবার আলবোলা,

আটশিঙা হরিণ, বরাহমুণ্ড — কোনো-এক ধূসর জ্যাঠার স্মৃতি,
কোনো দূর প্রপিতামহীর স্পৃষ্ট এক টুকরো ঢাকাই মস্লিন —
এই সব ফেলে দেয়, কিংবা রাখে গুদোমে লুকিয়ে;
দূর করে পুরোনো আসবাবপত্র, চালায় নির্মম কাঁচি বাগানের ঘনিষ্ঠ পল্লবে;
ছুটি দেয় ভৃত্যদের, তাকে যারা দেখেছিলো ছোটো।
মনে হয় সুবিস্তীর্ণ বাস্তুভিটা থেকে
পালিয়ে, তবে সে খুঁজে পাবে তার সম্পন্ন নিজেকে।
যায় দেশান্তরে, শেখে অন্য ভাষা, ভিন্ন লোকাচার,
বৈদেশিক ফুলেদের নাম শেখে অতি যত্নে,
কখনো বিপুল ধৈর্যে ভজে শুধু গভীর গণিত,
কখনো বা সীমান্ত পেরিয়ে গিয়ে করে সম্প্রচার
রাজদ্রোহ, গুপ্ত নেশা, অশ্লীল সংগীত: —
ক্রমে যেন নিরাপত্তা লব্ধ হয়, তার অতি দুর্ভর অতীত
বিন্দু-বিন্দু স'রে যায় — ছিপি-খোলা চৌবাচ্চার ফুটো দিয়ে
যেমন বেরিয়ে যায় নোংরা জল। অন্তত সে তা-ই ভাবে।

'বলো, এই অভিযান কৃতকার্য
করেছো কি সন্তোষজনকভাবে পিতৃহত্যা?
বার-বার নিজেকে নিধন ক'রে জন্মেছো কি নতুন মাতার গর্ভে?
বলো, কোন দূর দেশে পেয়েছিলে আকাঙ্ক্ষিত দু-কাঠা শুকনো জমি,
সেখানে একটি রোগা, প্রতিকূল গাছে
অনাবৃষ্টি, অবসাদ, সাহায্যের অভাব সত্ত্বেও
ভালোছলে ফলিয়ে অনেক কষ্টে
দু-একটি মৌলিক ফল, যার স্বাদ এখন বিখ্যাত?'

সে রয় উত্তরহীন, ইদানীং কানে কম শোনে।
অথবা বাদানুবাদে ইচ্ছে নেই আর,
যেহেতু সে প্রত্যাবৃত্ত — যেখানে যাত্রার শুরু সেখানেই।
ভাবে: শুধু এরই জন্য এত ধুন্ধুমার,
যাতে সেই পরিত্যক্ত বাস্তুভিটায়
পরিণামে সেও স্থান পেতে পারে — স্বাধিকারে — একটি ছোটো ঘরে?
ম্লান হ'য়ে আসে আলো, সন্ধ্যা নামে। আর অন্ধকারে
তাকে ঘিরে বসেন অন্যেরা — যাঁরা তার সংগী সর্বদা ছিলেন
অতিবাদে, প্রতিবাদে, ভ্রমণে, মননে,
যদিও পায়নি টের, যেমন কখনো কারো
অনুভূত হয় না শিরার মধ্যে শোণিতের গতি,
কিংবা যকৃতের কাজ, খাদ্যকে যা শুদ্ধ তেজে পরিণত করে।
তবে কি তাঁরাই সার, বীজ, বৃষ্টি — আমি শুধু তৃষ্ণাপিপাসিত জমি?
তবে কি আমার মধ্যে তাঁরাও ছিলেন পরিশ্রমী?
কিন্তু তা-ই যদি, তবে কোন দূর স্ফুলিঙ্গে তাঁদের জন্ম?
কবে কোন প্রতিশ্রুত অরণি ও শমী
তমসাকে দীর্ণ ক'রে জ্বেলেছিলো আদিম আগুন?'
— এই সব চিন্তা তাকে ক্লান্ত করে, রাত্রি হয় গাঢ়;
চেয়ে দ্যাখে, তাঁদের মুখাবয়ব
কেমন বদলে যায় থেকে-থেকে, পরস্পরে লীন হ'তে চায় যেন।
কখনো বা মনে হয় সে বুঝি আসলে ঐ অন্যজন,
কিংবা ঐ অন্যজন তারই এক পূর্বলেখ — প্রায়।
তারপর একটি প্রাচীনতম উক্তি তার মুখে উঠে আসে:
'হে সূর্য, তোমারই আমি কণামাত্র রশ্মির স্ফুরণ,
হে অনাদি উৎস, আমি একবিন্দু নিঃসরণ শুধু।
আমাকে ফিরিয়ে নাও।'

এইভাবে চলে বংশপরম্পরা।

সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
(রেণুকা দেবীর স্বামী)

॥ ২॥
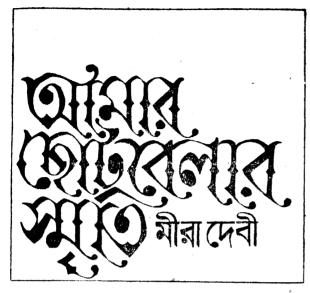
আমার স্মরণশক্তির অত্যন্ত অভাব। তা নইলে আমার যে বয়সে মা গেছেন তাঁকে আরো মনে থাকার কথা। মাকে আমার স্পষ্ট মনে না থাকলেও অস্পষ্ট ছায়া-মত মনে পড়ে। খানিকটা হয়তো বাস্তবে ও কল্পনায় মিশে গেছে, যেটুকু মনে আছে তাই বলছি।

মায়ের সুনাম ছিল রান্নার। বাবা তাঁকে দিয়ে নানারকম রান্না ও সরবতের পরীক্ষা করাতে ভালবাসতেন। এক সময় বাবা শিলাইদায় পদ্মার চরে আমাদের নিয়ে "পদ্মা" নামে বজরাতে ছিলেন। তখন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও নাটোরের মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় প্রায়ই শিলাই-দায় যেতেন। তাঁরা পদ্মার উপর বোটে থাকতে খুব ভালবাসতেন। আমাদের দুটি বজরা ছিল তাই তাঁরা গেলে কোনো অসুবিধা হতো না। একটি বোটের নাম আগেই উল্লেখ করেছি অপরটির নাম ছিল 'আত্রেই।' আমাদের আর একটি পরগনাতে আত্রাই নদী ছিল তার থেকে আত্রাই নামকরণ করা হয়েছিল।

মনে পড়ছে আচার্য জগদীশচন্দ্র কচ্ছপের ডিম খেতে খুব ভালবাসতেন। পদ্মার চরে বালির মধ্যে গর্ত করে কচ্ছপ ডিম পেড়ে রেখে যেত। বালির উপর তাদের পায়ের দাগ অনুসরণ করে যে লোকে ধরে ফেলবে তারা কোথায় ডিম পেড়ে গেছে—বেচারীরা কি করে আর বুঝবে। কচ্ছপের ডিম জগদীশবাবুর এত প্রিয় ছিল যে কলকাতায় যাবার সময় অনেকগুলো করে ডিম নিয়ে যেতেন।

জগদীশচন্দ্র ও জগদিন্দ্রনাথ যখন শিলাই-দায় যেতেন, বাবা তখন মাকে দিয়ে নূতন নূতন রান্না করাতেন। মায়ের হাতের রান্না খেয়ে তাঁরা খুব খুশী হতেন। পরে বড় হয়ে তাঁদের মুখে মায়ের রান্নার প্রশংসা অনেক শুনেছি। মায়ের যে শুধু রান্নার সুনাম ছিল তা নয় তাঁর ভাগ্নে ভাগ্নীরা, ভাইপোরা ও তাদের বউরা সকলে তাঁকে খুব ভালবাসতেন। আমার এক পিসতুতো বোন দুঃখ করে আমার কাছে বলেছিলেন যে মামী গিয়ে মামাবাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচে গেছে।

শিলাইদা থেকে আমরা শান্তিনিকেতনে ফিরে এলাম। সেখানে অতিথিশালায় ছিলুম। সেখানকার একটা ছবি মনে পড়ে। সরু এক ফালি বারান্দায় একটা তোলা উনুন নিয়ে মা বসে রান্না করছেন আর তাঁর পিসিমা রাজলক্ষ্মী দিদিমা তরকারী কুটতে কুটতে গল্প করছেন।

আর একটা ছবি মনে পড়ে শান্তি-নিকেতনের দোতালার বাড়ি বারান্দায় ছাতে একটা টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে, মার হাতে একটা ইংরিজী নভেল, তার থেকে বাংলায় অনুবাদ করে দিদিমাকে পড়ে শোনাচ্ছেন। গল্প শোনবার লোভে কোনো কোনো সময় তাঁদের গল্পের আসরে গিয়ে বসতুম। তাই বার বার শুনতে শুনতে বইটার একটি মেয়ের নাম কি করে যে মনের মধ্যে গাঁথা থেকে গেছে খুবই আশ্চর্য লাগে। আমার তখন ইস্টালিনের রোমান্সে আকৃষ্ট হবার বয়স নয়। তবু বোধ হয়, মার গল্প বলার ধরনে ও তাঁর কণ্ঠস্বরে যে বেদনা ফুটে উঠতো তাতে আমার শিশুমনে একটা

রবীন্দ্রনাথের পত্নী মৃণালিনী দেবী
[১৮২৯—১৩০৯ বঙ্গাব্দ]

বেদনার ছাপ রেখে গিয়েছিল। তাই Barbara নামটা মনে রয়ে গেল।

কিছুদিন পরে মার অসুখ করলে তাঁকে কলকাতায় আনা হল। এখন যেটাকে বিচিত্রা বলা হয়। আমরা ওইখানে থাকতুম। তখন আমরা ওই বাড়িকে হয় লালবাড়ি নয় নূতন বাড়ি বলতুম। একটা বড় হলকে কেমন করে তিন ভাগ করা হয়েছিল পরে বলছি। লাল-বাড়ির ঘরের একটু বিশেষত্ব ছিল। এক ধারের দেয়াল অবধি মস্ত বড় আলমারি প্রায় ছাত অবধি উঁচু। আলমারির কাচের পাল্লায় টুকটুকে লাল রং-এর সালু আঁটা। আলমারিগুলো এক ধারের দেয়াল অবধি। আর এক ধারে একটু ফাঁক ছিল সেখানে পাতলা কাঠের দরজা তার মাথার উপর এবং নীচের দিকে ফাঁকা (অনেক সময় রেস্তোরাঁয় এরকম দরজা দেখা যায়) হাত দিয়ে ঠেলা দিলে খুলে গিয়ে তখুনি আবার বন্ধ হয়ে যেত। একটা বড় ঘরকে এইভাবে তিন ভাগে বিভক্ত করে তিনটি ঘরে পরিণত করা হয়েছিল। একটা ঘরে আমরা থাকতুম। সবচেয়ে শেষের পশ্চিমের ঘরে মাকে রাখা হল নিরিবিলি হবে বলে। আমাদের বাড়ির সামনে গগনদাদাদের বিরাট অট্টালিকা থাকাতে নূতন বাড়ির কোনো ঘরে হাওয়া খেলে না। তখন বৈদ্যুতিক পাখা ছিল না তাই একমাত্র তালপাতার পাখা দিয়ে বাতা করা ছাড়া গতি ছিল না। ওই বাতাসহী ঘরে অসুস্থ শরীরে মা না জানি কত ক পেয়েছেন। কিন্তু বড় বউঠান হেমলত দেবীর কাছে শুনেছি যে বাবা মার পা বসে সারারাত তাল পাখা নিয়ে বাতা করতেন। এবার আমার ছোট ভাই শমী কথা বলি। শমী যখন স্কুলে যেত গা

"পদ্মা"
এই বোটে চৈতালি ও ছিন্নপত্রের অধিকাংশ লিখিত হয়

গাইতে গাইতে যেত। তার গলা মনে হয় যেন বাড়ির আশেপাশে এখনও দূর থেকে শুনতে পাচ্ছি। তার গলাটি ছিলো ভারি মিষ্টি। শরীরটা তার বেশী সবল ছিল না। আমরা যখন মেজমা জ্ঞানদানন্দিনীর কাছে ছিলুম, তখন নতুন জ্যাঠামশায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাকে "পুরাতন ভৃত্য" আবৃত্তি করতে শিখিয়েছিলেন। যখনি নতুন জ্যাঠামশায়ের বন্ধুবান্ধবরা আসতেন শমীকে দিয়ে "পুরাতন ভৃত্য" আবৃত্তি করে তাঁদের শোনাতেন। শমী যখন হাতের ভংগী করে "কেষ্টা ব্যাটাই চোর" বলত তখন তাঁরা তার অভিনয় ভংগী দেখে না হেসে পারতেন না। তাছাড়া "বিসর্জন" নাটকের কিছু কিছু পাঠ তার মুখস্থ ছিল। শান্তিনিকেতনে দাদারা একবার "বিসর্জন" নাটক অভিনয় করেছিলেন সেই অভিনয় দেখে শমী একাধারে দু-তিনটা পাঠ আয়ত্ত করে নিয়েছিল। সমী কতকটা বাবার গুণ পেয়েছিল। মনে হয় বড় হলে ও বাবার মতো ভালো অভিনয় করতে পারতো। শমী মুঙ্গেরে বেড়াতে গিয়ে কলেরা হয়ে অসময়ে চলে গেল।

আমরা যখন পদ্মার চরে বোটে ছিলুম তখন বোধ হয় আমার ৮।৯ বছর বয়স হবে। আমাদের দুটো বোট ছিল, বড়টার নাম "পদ্মা"। ছোট বোটের নাম "আত্রাই"। আমরা যখন বোটে থাকতুম রান্না ও চাকরদের থাকবার জন্যে একটা পান্সি ভাড়া করা হত। বাজার-হাট করার জন্য ওপারে শিলাইদায় যেতে হত সেইজন্যে ওপারে যাতায়াতের জন্য একটি ছোট ডিংগি নৌকো ছিল তাতে করে দাদা অনেক সময় আমাদের অনেক দূর অবধি নিয়ে যেতেন।

শুনেছি ছোটবেলায় দাদা রোগা ছিলেন। দাদার শরীর যাতে বলিষ্ঠ হয় সেই জন্যে বাবা দাদাকে নানারকম ব্যায়াম, সাঁতার কাটা, দাঁড় টানা ইত্যাদি করিয়েছিলেন। তার ফলে দাদার শরীর ফিরে গেল। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে পড়বার সময় কুয়ো থেকে জল তুলে স্নান করতে হত। তা ছাড়া ঘর ঝাঁট দেওয়া নিজেদের থালা বাটি মাজা প্রভৃতি সব কাজ অন্য ছাত্রদের যেমন করতে হত, দাদাও তাই করতেন। রামকৃষ্ণ মিশনের কয়েকজন সন্ন্যাসী তীর্থ করতে বদরিকাশ্রমে যাচ্ছেন শুনে বাবা দাদাকে তাঁদের সংগে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বদরিকাশ্রমে যাওয়ার বিষয় দাদা তাঁর বইতে সবিস্তারে লিখেছেন,

রথীন্দ্রনাথ ১৯০৬ সালে

তাই আমি আর বেশী লিখলুম না। সাধুদের সংগে দাদা সমানে হেঁটে গেছেন, কম পরিশ্রমের কথা নয়। কষ্টসহিষ্ণু হবেন বলে বাবা ইচ্ছে করে খুব অল্প বয়সে দাদাকে সাধুদের সংগে পাঠিয়েছিলেন। পায়ে হেঁটে যাওয়ার পরিশ্রম তো ছিলই তার উপর রাত্তিরে যে আরামে ঘুমোবেন তারও উপায় ছিল না। যে সব চটিতে রাত কাটাতে হত পিসু বা এক রকমের উকুনে কাপড় ছেয়ে যেত। চটিতে নানারকম যাত্রীর সমাবেশ হত, শীতের ভয়ে তারা স্নান করত না। তারা এত নোংরা কাপড় পরে থাকত যে তাদের গায়ে উকুন চলে বেড়াত। পথ হেঁটে যাত্রীরা এত ক্লান্ত হয়ে আসতেন যে অত পিসু বা উকুনের কামড়েও তাঁদের ঘুমের ব্যাঘাত হত না। দাদা যখন বদরীনাথ থেকে ফিরে এলেন তখন শান্তিনিকেতনে না গিয়ে সোজা দিদির কাছে গিয়েছিলেন। আমি তখন দিদির কাছে মজঃফরপুরে ছিলুম। দাদার কালিবর্ণ চেহারা দেখে আমাদের খুব খারাপ লেগেছিল। দাদা আসবামাত্র দিদি দাদাকে ময়লা কাপড় ছাড়িয়ে ছাতের এক কোণে কাপড়গুলো ফেলে রাখালেন যাতে দাদার কাপড় থেকে ঐ সব উকুন আমাদের কাপড়ে না লাগে।

বোটে বাস করার সময় মাঝে মাঝে বড় বড় স্টিমার যেত তখন তার ঢেউ লেগে আমাদের বোটকে দুলিয়ে দিয়ে যেত। সেইটিতে আমার বড় ভয় ছিল। কোনো রকম দোলানো আমি সহ্য করতে পারিনে, গা বমি করে। সেজন্য আমি কখনো দোলনায় চড়তে রাজী হতুম না। স্টীমার যতক্ষণ না চলে যেত আমি ঢেউ লাগার ভয়ে বোট থেকে নেমে ডাংগায় গিয়ে বসে

প্রজাগণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ

থাকতুম। আমাদের বোটের পাশ দিয়ে যখন মাল বোঝাই করা বড় বড় বজরাতে দেখতুম বারো চৌদ্দজন মিলে একসঙ্গে দাঁড় টেনে চলেছে, কারোর দাঁড় টানা আগে-পরে হচ্ছে না দেখতে ভারি ভাল লাগত। এসব নৌকো অনেক দূর থেকে মাল মশলা বাংলা দেশে বিক্রি করতে আসত। বিক্রি হয়ে গেলে আবার দেশে ফিরে যেত। তখন নদী পথে বেশীর ভাগ ব্যবসা বাণিজ্য চলত। এরা বেশীর ভাগ পশ্চিম থেকে আসত, তাদের চেহারা দেখলেই বোঝা যেত। মাঝে মাঝে রাত্রিতে তাদের একঘেয়ে সুরে সবাই মিলে খঞ্জনী বাজিয়ে গান ধরত। আর একদল আসতো পূর্ববঙ্গ থেকে খড় ও ধান বোঝাই করে। দেখলে মনে হত জলের উপর ভাসছে, একটু ঢেউ দিলে জলে ডুবে যাবে। ইলিশ মাছের সময় জেলেরা যখন জল থেকে জাল তুলত রূপালী মাছগুলি রোদ পড়ে ঝকঝক করত। কোনো কোনো সময় ওদের কাছ থেকে মাছ কিনে নেওয়া হতো তখন কি সস্তা ছিল। গরিব দুঃখী সকলেই দুবেলা মাছ-ভাত খেয়েছে।

বাবা ভাল সাঁতার জানতেন। সাঁতরে নদী পার হতে পারতেন। বাবা যখন নদীতে স্নান করতে নামতেন শুধু তাঁর গৌরবর্ণ পিঠটি জলের মধ্যে দেখা যাচ্ছে সেই কথা মনে পড়ে, তিনি ভাল সাঁতার জানতেন বলে ঝড়ের সময় বোটে থাকতে ভয় পেতেন না। নিজে ভাল সাঁতার জানতেন বলে দাদাকেও সাঁতার শিখিয়েছিলেন শুধু পারেননি আমাদের দুই বোনকে শেখাতে। দিদিমা কোনো রকমে ডুব দিতে শিখিয়েছিলেন। আমাদের স্নানের জন্য অনেক দূরে অবধি দরমা দিয়ে ঘিরে তার ভিতরে একটা বড় পাটাতন পাতা থাকত যাতে সেটার উপর বসে মুখ ধোয়া যেত বা স্নান করে পরবার কাপড় চোপড় রাখা যেত। আমাদের স্নানের ঘরটি গরমের সময় কি সুন্দর ঠাণ্ডা লাগত। গল্প গুজব পান সাজা সবই হত আর যখন খুশি জলে নেমে পড়তুম। গলা জলে নেমে স্নান করতে ভয় পেতুম না। কিন্তু পা মাটি থেকে তুলতে হলে বিষম ভয় পেতুম। তাহলে আর কি করে সাঁতার শেখা হয়।

রাত্তিরে বোটে শুয়ে বোটের গায়ে ছলক ছলক ঢেউয়ের শব্দ শুনতে শুনতেই ঘুমিয়ে পড়তুম। এইগুলি আমার পদ্মার উপর বাসকালীন স্মৃতি।

বোটে থাকতে বাবার কাছে অনেক প্রজারা হোমিওপ্যাথি ওষুধ নিতে আসত। বাবার হোমিওপ্যাথিতে বেশ হাত ছিল, যাকে যাকে ওষুধ দিতেন বেশ সেরে যেত। পদ্মার চরে মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রাম দেখা যেত এরা সেখান থেকে আসত। ওখানে বেশীর ভাগ প্রজারা মুসলমান। মুসলমান মেয়েরা বড় একটা পুরুষের সামনে বেরোয় না কিন্তু ওখানে দেখতুম অনেক মুসলমানী মেয়েরা বাবার কাছে ওষুধ নিতে আসত। আমাদের প্রজারা বাবাকে বাপের মত ভক্তি করত এবং তাঁর কাছে তাদের যত কিছু নালিশ জানাতে কিছুমাত্র দ্বিধা করত না কেননা জানতো যে তাঁর কাছে সুবিচার পাবে। তাই ভাবি কোথায় গেল সেই সব প্রভুভক্ত মুসলমান প্রজা যাদের হিন্দুর উপর কোনো বিদ্বেষ ছিল না।

(ক্রমশ)

বেশ খানিকটা অবাক হলো। শ্যামবাজারের সিনেমা হাউসের সামনে পেঁয়াজি-ফুলুরির ভাজার গন্ধ। আর একটা বকুল-ফুল গাছ থেকে ফুটপাথে-ঝরা মানুষের পায়ে-পেষা বকুলের গন্ধ। গন্ধগুলো মিশে হয়তো কোনো রকম একটা গন্ধ উঠতে পারে। কিন্তু স্টেট বাসের ডিজেল ইঞ্জিনের কালো ধোঁয়ার গন্ধে আকাশ-বাতাস একাকার।

ঝাল-মুড়ি চিবোতে-চিবোতে অবাক হয়নি। খবরের কাগজে যে-লেখাটা ছাপা হয়েছে, তার জন্যে দক্ষিণা চাইতে গিয়ে পঁচিশের জায়গায় পঁয়ত্রিশ টাকা সংগে সংগে পেয়েও অতটা অবাক হয়নি। অবাক হলো সিনেমার সামনে ট্যাক্সিটা দেখে। কিন্তু ট্যাক্সি দেখে কারুরই অবাক হবার কথা নয়। তা হলে? সে-কথাটাই বলছি। অবাক হলো সেই মেয়েটিকে দেখে। কিন্তু ট্যাক্সি থেকে কোনো মেয়েকে নামতে দেখলে কারুরই অবাক হবার কথা নয়। অবাক হবার কথা সন্ধ্যার শো-তে ট্যাক্সি থেকে নেমে মেয়েটিকে রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে দেখে। অবাক হবার কথা ফুটপাথে মেয়েটিকে নেমে রুমালে চোখ মুছতে দেখে আর তারপর তার স্বামীকে ট্যাক্সি থেকে ফুটপাথে নেমে ট্যাক্সি-চালককে ভাড়া বাবদ করকরে নোটগুলো দিতে দেখে।

না। কিছুতেই গুছিয়ে বলতে পারা যাচ্ছে না। আসলে এগুলো অবাক হবার মতো কিছুটা হলেও ততটা নয়। সেই ব্যক্তিটি তার স্ত্রীর পিঠে আলগোছে হাত বুলিয়ে কী যেন বলে একটা আধ-চলন্ত ভিড়-ঠাসাঠাসি দক্ষিণমুখী বাসে উঠে পড়ে অদৃশ্য হলেন। মেয়েটির কান্না-কান্না মুখে ঠাণ্ডা নিওন বাতির মতো মৃদু হাসিতে ভরে উঠলো।

সবকিছু গুছিয়ে বলা ভারি শক্ত। বিশেষ করে সহজ ঘটনাকে সহজ করে গুছিয়ে বলা। এই অর্থে ঘটনাগুলি সহজ—একটি মেয়ে শ্যামবাজারের একটি সিনেমা হলের সামনে রুমালে চোখ মুছতে-মুছতে ট্যাক্সি থেকে নামলো, তার স্বামী করকরে নোট ট্যাক্সি-চালকের হাতে দিয়ে একটা আধ-চলন্ত ভিড়-ঠাসা দক্ষিণমুখী বাসে উঠে হাওয়া হলো। কিন্তু অবাক—সেই সূর্যাস্তের মতো কান্না কান্না মুখে কেন হঠাৎ ঠাণ্ডা নিওন বাতির মতো মৃদু হাসি ভরে উঠলো?

যে ব্যক্তি অবাক হবে কি হবে না ভাবছিলো, যে পেঁয়াজি-ফুলুরি, মাড়ানো বকুল ফুল আর স্টেট বাসের ডিজেল ইঞ্জিনের কালো ধোঁয়া একসংগে নিশ্বাসের সংগে নিজের ফুসফুসের মধ্যে টানছিলো, পঁচিশের জায়গায় পঁয়ত্রিশ টাকা পেয়ে নিজের উপর বেশ একটা জমকালো বড় রকমের উঁচু আশা পোষণ করছিলো—সে ঝাল-মুড়ির ঠোঙাটা ডান হাতের সব আঙুলগুলো দিয়ে মুচড়ে ফুটপাথে ফেলে দিলো। অবাক হলে বিবিধ লোকের মধ্যে বিবিধ অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে। এই যে হাতে মুচড়ে ঠোঙাটা ফেলে দেওয়া—এটাই তার অবাক হবার অভিব্যক্তি। এর মধ্যে সূক্ষ্মতাও নেই, স্থূলতাও নেই। ঘাড়ের উপর একটা মশা কামড়ালে হঠাৎ যেমন আপনা থেকেই ঘাড় চুলকোবার সাধ যায়, তার অবাক হওয়াটা সেই পর্যায়েরই।

কারণ মেয়েটিকে সে চেনে, তার স্বামীকেও। কারণ কলকাতার দক্ষিণপাড়ার সেই বড় রাস্তার পর মেজো রাস্তা ছাড়িয়ে গলির মতো আর একটা যে রাস্তায় সে থাকে তার প্রায় গা-ছোঁয়া একতলার দুটো ঘরে এই কান্না-কান্না হাসি-হাসি মেয়েটি আর দক্ষিণমুখী চলন্ত বাসে ওঠা স্বামীটিও থাকে। তাদের সে চেনে, কিন্তু কোনো দিন আলাপ হয়নি।

বিজলি-বাতিতেও মেয়েটির মুখ এখন কোজাগরী চাঁদের মতো হয়ে উঠেছে। বছরের প্রথম শীতের রাতে যে ছাতিম গাছগুলো যেমন শিউরে উঠে পাতা ঝরিয়ে দেয়—কোজাগরী

প্রাচীন ভারতের হার্প
শততন্ত্রী ঔদুম্বর বাণ

বর্তমানে আমরা বীণা নামক যে যন্ত্রটি দেখি একমাত্র সেই আকৃতিই যে বীণার যথার্থ চেহারা হবে আমাদের

সুপ্রাচীন যুগের হার্প

শাস্ত্র এমন কথা বলে না। এটি আসলে লিউট অর্থাৎ শব্দ প্রকোষ্ঠ থেকে এর দণ্ডটি সরু লম্বা হয়ে উঠে গেছে। এতে বাজাবার সুবিধা হয় আর সামলাতেও কষ্ট হয় না। হার্প বস্তুটি এমন নয়। লম্বায় চওড়ায় এর বেশ দশাসই চেহারা হয়, তারগুলিও অনেকখানি জায়গা জুড়ে থাকে। তবে অবশ্য সব হার্পই যে বড় আকারের হত এমন নয়, ছোটও ছিল কিন্তু সম্মানিত ছিল বড় আকারের হার্পগুলি। লায়ারও হার্পেরই সদৃশ কিন্তু একটাতে তারগুলি সোজাসুজি শব্দ প্রকোষ্ঠের আস্তরণ ভেদ করে চলে যেত, আর একটিতে তারগুলি বিস্তৃত হত ধ্বনি প্রকোষ্ঠের ছাউনির ওপর থেকে। আমাদের শাস্ত্রে তারের যন্ত্র মাত্রই বীণা তা তার আকার যেরকমই হোক না কেন। সুদূর অতীতে সভ্য বিশ্বের সর্বত্র হার্পের প্রচলন ছিল এবং ভারতেও তার ব্যবহার বেশ ভালই ছিল বলে মনে হয় নানা উল্লেখ থেকে। এই রকম একটি ভারতীয় হার্প হচ্ছে "ঔদুম্বর বাণ"। সম্ভবত খুব প্রাচীন যুগে হার্প জাতীয় যন্ত্রকে বোঝাবায় জন্য "বাণ" শব্দেরই প্রচলন ছিল। সংস্কৃত বাণ শব্দের সঙ্গে এর সম্বন্ধ নির্ণয় করাটা যুক্তিযুক্ত কিনা জানি না তবে শব্দটি অন্যান্য দেশেও প্রচলিত ছিল। ভাষাতত্ত্ব নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেন তাঁরাই এর সঠিক উত্তর দিতে পারবেন তবে অনুমান ছাড়া আর কিছু তাঁরাও যে করতে পারবেন তা মনে হয় না। তবু এ নিয়ে একটা ভাল রকম আলোচনা হওয়া উচিত।

লাট্যায়ন শ্রৌতসূত্রে (সামবেদীয়) আমরা কয়েকটি বীণার উল্লেখ পাই এবং ঔদুম্বর বাণের বেশ ভালরকম বর্ণনাও এই গ্রন্থে পাওয়া যাচ্ছে যা বেশ চিত্তাকর্ষক। উদুম্বর হচ্ছে যজ্ঞ ডুমুরের গাছ। এই বিশাল এবং সুউচ্চ বৃক্ষটি আমাদের দেশের যত্রতত্র দেখা না গেলেও দুর্লভ নয়। বৈদিক যুগের অতি পবিত্র বৃক্ষগুলির মধ্যে এটি একটি। ঔদুম্বর বাণ এই যজ্ঞ ডুমুরের কাঠ দিয়েই তৈরি হত। উদুম্বর কাঠ না পাওয়া গেলে এটি অন্য কাঠ দিয়েও তৈরী করা যেত কিন্তু তার পবিত্রতা স্বীকৃত হওয়া আবশ্যক ছিল। এর যেটি শব্দ প্রকোষ্ঠ সেটি ছাওয়া হত লালরঙের বৃষচর্মে এবং তন্ত্রীগুলিকে এই আস্তরণের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করিয়ে নীচের দিকে বাধা হত দশটি ছিদ্রে। তন্ত্রী পাওয়া সম্ভব না হলে মুঞ্জাঘাস বা দাভি [illegible] দিয়েও তন্ত্রীর মত সূত্র তৈরি করা হত। এই দশটি ছিদ্রের প্রত্যেকটিতে দশটি দশটি করে তন্ত্রী বদ্ধ থাকত। প্রতি

প্রাচীন ভারতের হার্প

ছিদ্রে যে দশটি তন্ত্রী থাকত তার ব্যবধান কি রকম ছিল তা জানা যায় না এবং দশটি করেই বা কেন নির্বাচন করা হয়েছিল তারও কোনও কারণ নির্দেশ করা হয়নি। মত-ভেদও ছিল। আচার্য শাণ্ডিল্য যে বাণের উদ্ভাবন করেছিলেন তাতে দশটি ছিদ্র ছিল না, ছিদ্র ছিল তিনটি। এই তিনটি ছিদ্রের পথায় এবং [illegible] দশটি করে

প্রাচীন ইয়ান ও মধ্যপ্রাচ্যের হার্প

তন্ত্রী বাঁধা হত আর মাঝের ছিদ্রে বাঁধা হত চৌত্রিশটি। লাট্যায়ণ শ্রোতসূত্রে বলছেন—"ত্রিশ্বিন্তি শাণ্ডিল্যশ্চতুস্ত্রিংশন্মধ্যমে ত্রয়স্ত্রিং শতাবভিতঃ।" এই ধরণের হার্পে তারগুলি বাঁকা ধরণে সজ্জিত হওয়াতে এর আকার ছিল বিচিত্র। এইটিই হচ্ছে বহু কথিত শততন্ত্রী বীণা। এর ধ্বনি প্রকোষ্ঠটি ছিল নীচের দিকে (horizontal) এবং যে দণ্ডের সঙ্গে তন্ত্রীগুলি সংলগ্ন থাকত সেটি সোজাভাবে (Vertical) ধ্বনি-প্রকোষ্ঠের সঙ্গে যুক্ত থাকত।

ঔদুম্বর বাণ লৌকিক গীতে কিভাবে বাজানো হত তার পরিচয় পাওয়া যায় না, তবে সামিক রীতি অনুসারে যখন এর ব্যবহার হত তখন এর তারগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করে স্বরক্ষেপ করা হত। আচার্য শাণ্ডিল্য এই উদ্দেশ্য নিয়েই দশটি ছিদ্রের বদলে তিনটি ছিদ্রে তারগুলিকে আবদ্ধ করেছিলেন। "ভূর্ভুবঃস্বঃ প্রভৃতি মন্ত্র এই তিনটি পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত তারের ঝঙ্কারের সঙ্গে আবৃত্তি করা হত। এ ছাড়া আরও মন্ত্র ছিল; যথাঃ—"বদো বদ বদা", 'বাক্ সর্বং মনজ্যোতির্মা নো ভদ্র"। শেষের মন্ত্রটি উচ্চারণ করে ইন্দ্র এই যন্ত্রে ধ্বনি তুলতেন। তিনি আঘাত করতেন কোণ অর্থাৎ plectrum দিয়ে। এটি তৈরি হত কুশ দিয়ে অথবা বেতসশাখা বা পলাশের কাঠ থেকে। সূত্র বলছেন—"বাক্ সর্বং মনোজ্যোতির্মা নো ভদ্র ইতি জপিত্বা বাদয়েদিন্দ্রণ ভূয়েষী-কয়া বেতসশাখায়া চ মপলাশয়া মূলতঃ। এই যন্ত্রের সঙ্গে দুন্দুভিঃ বাজত সময়-বিশেষে। তখন গাওয়া হত "আহত দুন্দুভীন্ প্রবদন্তু বীণা",

ঔদুম্বর বাণের সঙ্গে সুপ্রাচীন ঔদুম্বর জাতির কোনও সম্বন্ধ আছে এমন উল্লেখ বা প্রমাণ পাইনি। কলকাতা সংস্কৃত কলেজ থেকে প্রকাশিত ডক্টর কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত মহাশয়ের 'The Audumbaras' নামক গবেষণা নিবন্ধ থেকে জানা যাচ্ছে ঔদুম্বর জাতি ভারতের উত্তরাঞ্চলে বসবাস করত খৃীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকের অনেক পূর্বকাল থেকেই। তারা এই জাতীয় যন্ত্র বিশেষভাবে ব্যবহার করত কিনা সে সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না বা তাদের নামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে ঔদুম্বর বাণ নাম প্রচারিত হয়েছে এমন তথ্যও পাওয়া যায় না।

অপরাপর উল্লেখ থেকে একটা আভাস পাওয়া যাচ্ছে যে এই জাতীয় হার্প ভারতের বাইরে মধ্যপ্রাচ্যে ছিল। Farmer সাহেব তাঁর Studies in Oriental Musical Instruments (second series) গ্রন্থে এ সম্বন্ধে যা বলেছেন সেটি উদ্ধৃত করছিঃ—

It is true that we have a fair Palhavi, Persian and Arabic texts that give us a number of names of instruments of music, and of recent years the subject has been discussed by Dr. J M. Unvalla in the Palhavi Text : King Husrav and his Boy (Paris 1921) .. .. The enlargements from Pope's photographs enable us to get a closer view of some of these Sasanian instruments, although they may not be so clearly defined as in other Sasanian art remains. The first of the plates show the two species of harps in the boar hunt scene, viz. one with a lower sound chest and two others with upper sound chest. The former is more interesting because it is older and the more infrequent instrument. The horizontal sound chest consisted of an oblong wooden box whilst the vertical arm which carried the tuning pegs was solid. From fixtures or "pins" in the sound chest the strings were stretched in a diagonal fashion to the tuning pegs. It is precisely the same species of harp as that found in Sumerian Royal tomb (3rd millenium B.C.) in the same museum and in the Sasanian (?) silver dish in the collection of Archaeological Commission at Leningrad.

Elsewhere I have assumed (The survey of Persian Art) that the Persian name for the species of harp was Van, a word which equates with the Arabic wann....The Persian Van would be the Palhavi Von or Vun, a word which can be equated with the Sanskrit Vina, the coptic boine or boini and the ancient Egyptian bain-t or bant. Both the name and instrument have long since fallen into disuetude in Persia and the middle East.

এটা Farmer সাহেবের অনুমান হলেও সংগত অনুমান বলেই মনে হয়, কেননা উভয় হার্পের মধ্যে সাদৃশ্য বর্তমান। স্টাইনগাসের ফার্সী অভিধানে "ওয়াও" আর "নূন" সহযোগে এই শব্দটি পাওয়া যায়। তিনিও এই "ওয়ান" শব্দটি সংস্কৃত বাণ শব্দের সঙ্গেই যুক্ত করেছেন।

এই জাতীয় হার্প ছাড়া আরও সুপ্রাচীন বীণার উল্লেখ এই শ্রোতসূত্রগুলিতেই পাওয়া যাচ্ছে। এইগুলি হচ্ছে— মহাবীণা,

বা শীলবীণা (শৃঙ্গবীণাও একে বলা হত), অলাবুবীণা, কান্ডবীণা এবং পিচ্ছোরা। শেষোক্ত দুটি বীণা মেয়েরাও বাজাতেন। পিচ্ছোরা সম্বন্ধে ভাষ্যকার অগ্নিস্বামী বলছেন উপগাতৃণাং পশ্চিমে প্রদেশে উপবিষ্টা দেব দেব বীণে একৈকা পত্নী বাদয়েৎ। বাত্তাসং কিং বীণে কান্ড বীণাং পিচ্ছোরাঞ্চ বক্তায়াং বেণুময্যাঞ্চ পিচ্ছোরা বৈণবী।

গাতৃগণ ব্যতীত তাঁদের পত্নীরাও একবার কান্ডবীণা এবং একবার পিচ্ছোরা বাজাতেন। কান্ডবীণা বোধ করি যে কোন পবিত্র বৃক্ষের কান্ডে নির্মিত হত। অথবা এও সম্ভব যে এর দণ্ডটি কান্ডের মত দীর্ঘ বলেই এর নাম ছিল কান্ডবীণা। পিচ্ছোরাকে বেণুময়ী অর্থাৎ বাঁশের তৈরি বলা হয়েছে। এটি হার্প জাতীয় কিনা বলা যাচ্ছে না। যদি এর দণ্ড (যার সঙ্গে তন্ত্রীগুলি বাঁধা থাকত) বাঁশের হত এবং সেটিকে বেঁকিয়ে এনে একটি তন্ত্রী সহযোগে শব্দপ্রকোষ্ঠের সঙ্গে যোগ করা হত তাহলে সেটিকে একপ্রকার হার্পই বলতে হবে। পিচ্ছোরা নামটি সংস্কৃত কিনা সে বিষয়েও সন্দেহের উদ্রেক হয় কারণ এই ধরনের নাম সংস্কৃতে বড় একটা দেখা যায় না। সূত্রাদির উক্তি থেকে মনে হয় কান্ডবীণা এবং পিচ্ছোরা এই দুটি বীণাই ছিল অপঘাটিলা (অপঘাতিলা) জাতীয় বীণের অন্তর্ভুক্ত। একটি সূত্রে বলা হয়েছে ...পিচ্ছোলাং বাদয়েন কান্ডময়ীম্ এবং তার পরের সূত্রেই বলা হয়েছে—তা অপঘাটিলা ইত্যাচক্ষতে। অলাবুবীণা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা হয়নি। ... ... শব্দপ্রকোষ্ঠটি ছিল ... ... বক্রা এবং কাপিশীর্ষ্ণী (কপিশীর্ষ) এই দুই প্রকার বীণারও উল্লেখ পাওয়া যায়। এগুলি অলাবুবীণারই প্রকার ভেদ কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

তৎকালীন তন্ত্রীবদ্ধ যন্ত্রগুলির মধ্যে "শততন্ত্রী বৈণুদেব" বাণ-এর আয়তন যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ছিল এ সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। অনুমান হয় ধ্বনির দিক থেকে এই বীণায় বিচিত্র সমারোহ থাকলেও লৌকিক সঙ্গীতে সর্বক্ষেত্রে এর প্রয়োগ নানা কারণেই সম্ভব হত না। এই কারণেই ক্রমে ক্রমে লিউট জাতীয় বাজনার প্রচলন লোকে বেশী পছন্দ করেছে এ কথা আগেই বলেছি। অবশ্য ছোটখাট হার্পের প্রচলনও ছিল এবং সেগুলি সাধারণ সঙ্গীতের সঙ্গে ব্যবহৃত হত। শেষ পর্যন্ত টিকে রয়েছে স্বরমণ্ডল যার নাম ছিল মত্তকোকিলা। এই বীণায় থাকত একুশটি তার এবং এটি মুখ্যবীণা বলে স্বীকৃত ছিল। এর সঙ্গে বাজত বিপঞ্চী, চিত্রা প্রভৃতি বীণা। এটিও সাধারণভাবে সম্মেলক তারের বাজনায় (স্ট্রিং অর্কেস্ট্রা) ব্যবহৃত হত।

অবশেষে বক্তব্য, আমাদের মিউজিয়ামগুলিতে প্রামাণিক স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী প্রাচীন ভারতীয় হার্প এবং বীণার মডেল তৈরি করলে ভাল হয়। আসল যেখানে পাওয়া যায় না সেখানে কেতাবী প্রমাণকেই গ্রহণ করতে হবে। এমন আরও কয়েকটি বীণার গঠননির্দেশ আমাদের শাস্ত্রাদিতে আছে। কলকাতা মিউজিয়ামে বাদ্যযন্ত্রের একটি আলাদা সংগ্রহ আছে। এখানে এই জাতীয় কাজের উদ্যোগ করলে বোধ হয় একটি যথার্থ ঐতিহাসিক উদ্ঘাটন সম্ভব হয়।

আকাশবাণী সঙ্গীত সম্মেলন

২৬ এবং ২৮ অক্টোবর রবীন্দ্রসদনে অনুষ্ঠিত আকাশবাণী সঙ্গীত সম্মেলনে এবার একজন অসাধারণ শিল্পীর পরিচয় পাওয়া গেল। ইনি হচ্ছেন বীণবাদক আসাদ আলী খাঁ। কল্যাণ এবং দেশ দুটি রাগেই তিনি অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন মীড়ে, গমকে, বিস্তারে এবং সামগ্রিকভাবে বাদনশৈলীতে। কায়দা মাফিক ধীর মন্থরগতিতে আলাপচারণ তিনি করেননি বটে তবে তাতে বিশেষ কিছু ক্ষতিও হয়নি। অপর কণ্ঠসঙ্গীতের শিল্পী গোলাম মুস্তাফা খাঁর মত তিনি যদি পঞ্চমে এসে আটকে যেতেন তাহলে আর উপায় থাকত না। তিনি প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন তাই গতানুগতিক পন্থায় চলেননি। বীণার গাম্ভীর্য তাঁর বাজনায় অক্ষুণ্ণ রয়েছে—অথচ তিনি বিশেষভাবে প্রগতিশীল। এই স্রষ্টা শিল্পীর গুণপনায় মুগ্ধ হয়েছি। এঁর সঙ্গে পাখোয়াজে চমৎকার

সম্পাত করেছেন শ্রীগোপাল দাস। শ্রীমতী শরণরাণীর সরোদে বাগেশ্রী ভালই লাগল। শ্রীমতী গিরিজা দেবীর কেদারায় খেয়াল সাধারণ স্তরের এবং একই কাজের পুনরাবৃত্তি দেখা গেল। তবে তাঁর ঠুংরী বেশ ভাল। তবলায় ওস্তাদ কেরামতুল্লা খাঁ, শ্রীশংকর ঘোষ এবং সারেঙ্গীতে মোহম্মদ সাগীরুদ্দীন উত্তম সহযোগিতা করেছেন। আকাশবাণীর সঙ্গীত সম্মেলন ভাল লাগে এই কারণে যে, এখানে বিদগ্ধ শ্রোতার উপস্থিতি দেখা যায়, অবাঞ্ছিত উচ্ছ্বাস থাকে না এবং সর্বোপরি সময়ের সুযোগ্য শাসন থাকে যার জন্য পুনরাবৃত্তি অবাধে চলতে পারে না।

পরলোকগত ওস্তাদ মৈনুদ্দীন ডাগরের স্মৃতি বাসর

২৪ অকটোবর পরলোকগত ওস্তাদ মৈনুদ্দীন ডাগরের স্মরণে ধ্রুপদ মিউজিক সার্কেল বিড়লা একাডেমী অফ আর্ট অ্যান্ড কালচার ভবনে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এই অনুষ্ঠানে শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ মহাশয় মৈনুদ্দীনের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্বন্ধের উল্লেখ করেন এবং সাধারণভাবে দেশের সাঙ্গীতিক পরিস্থিতির আলোচনা করেন। সভায় মৈনুদ্দীনের শিষ্য এবং ভ্রাতা ওস্তাদ নাসির আমিনুদ্দীন ডাগর বেহাগে ধ্রুপদ গেয়ে শোনান। তাঁর আলাপটি মনে রাখবার মত। বেহাগের করুণ মধুর রসটি তিনি তাঁর সংগীতে ঢেলে দিয়েছিলেন বললে অত্যুক্তি হয় না। এ ছাড়া প্রতিটি পর্দায় ক্রমিক সুরের অবস্থিতি এবং সমগ্রভাবে রাগরূপায়ণ অসাধারণ কৃতিত্বের নিদর্শন। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, ধ্রুপদ সময়ের সঙ্গে তাল রেখেই বেঁচে থাকবে, লুপ্ত হয়ে যাবে না। অনুষ্ঠানে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

শার্ঙ্গদেব

বরোদা রাজ দরবারের সঙ্গীতশিল্পী মৌলাবক্স

দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত "ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট" প্রতিষ্ঠান থেকে ডাঃ শ্রীকৃষ্ণনারায়ণ রতণ ঝংকারের দ্বারা লিখিত তাঁর সঙ্গীত গুরু, পণ্ডিত ভাতখণ্ডের ৬১ পৃষ্ঠা ব্যাপী একটি জীবনী গ্রন্থ ইংরাজী ভাষায় ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বইটির প্রকাশক বুকট্রাষ্টের পরিচালক প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী বি ভি কেশকর। বইটির ৩১ পৃষ্ঠার শ্রীরতন ঝংকার ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে বরোদারাজ শয়াজীরাও গায়েকবারের সভাগায়ক প্রফেসর মৌলাবক্স গিসে খাঁর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত জ্ঞানের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন :—

"The Baroda State used to run a music school under Moula Baksh Glsse Khan who, apart from Hindusthani music, had some knowledge of the Karnatic system also as he came from the South. He was a man of progessive and liberal views. He was, probably, not a concert singer as such, but was quite and able organizer of musical education. He invented and introduced a notation system of his own and published a few musical compositions."

তখনকার দিনের খ্যাতনামা গায়ক হিসেবে মৌলাবক্সের পরিচয় দিতে গিয়ে শ্রীরতন ঝংকার কেন যে এইরূপ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন তার সঠিক কারণ বোঝা গেল না। সে যুগের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ইতিহাস জানতে গিয়ে মৌলাবক্সের প্রকৃত পরিচয়ের যে সব তথ্য আমরা এ পর্যন্ত পেয়েছি তাতে কিন্তু এ ধরনের কোন সন্দেহের অবকাশ নেই, কোনখানেই। মৌলাবক্সের বিষয়ে ঐতিহাসিক তথ্য পরিষ্কার ভাষায় ভিন্ন কথাই আমাদের শোনাচ্ছে। ইতিহাস জানাচ্ছে, তাঁর মধ্যে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ হিন্দী সঙ্গীত ও কর্ণাটি সংগীতের শাস্ত্রজ্ঞান যেমন গভীর ছিল তেমনি তিনি ছিলেন সে যুগের কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীতের একজন খ্যাতনামা গায়ক ও বাদক। বাংলা দেশের উচ্চাঙ্গ হিন্দী সঙ্গীতের আন্দোলনের নেতা, সংগীতগুণী পণ্ডিত রাজা শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মৌলাবক্সের বিষয়ে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের সংক্ষিপ্তাসারে যে পরিচয়টুকু লিখে গিয়েছিলেন তাতে আছে :

"The court of Baroda is noted for number of efficient musicians it included in its establishments. One of the distinguished musician of this court, Mowla Buksh, made a tour of India, and won the admiration of all who could appreciate music, by his performances on the Vina and Jaltaranga. He visited Calcutta in 1874 and 'was awarded a gold medal by the President of the Bengal Music School at a public meeting held at the school on the 28th November of that year. He is equally conversant with the music of North and South India, and sings Sanskrit hymns with a remarkably correct pronounciation of the language."

জানা যায় কলিকাতায় মৌলাবক্সকে নিমন্ত্রণ করে আনেন রাজা শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় আসার পর তিনি ধনীদের বহু আসরে গান গাইবার জন্যে নিমন্ত্রিত হয়ে গান গেয়ে এবং বাজনা বাজিয়ে কলিকাতাবাসী সংগীতরসিকদের মুগ্ধ করেছিলেন। এ বিষয়ে সমসাময়িক সংবাদপত্রের যেটুকু সংবাদ আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি তার দ্বারা মৌলাবক্সের গানের ও বাজনা পারদর্শিতার পরিচয় সুস্পষ্ট।

১২৮১ বাংলা সালের কার্তিক মাসে প্রকাশিত বাংলা সংবাদপত্রের খবরে জানা যাচ্ছে :—

"কয়েক মাসের অবকাশ লইয়া ইঁনি (মৌলাবক্স) আপাতত বিখ্যাতনামা রাজা শ্রীযতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রমোদভবনে বাস করিতেছেন। ২৮শে নভেম্বর একটি প্রকাশ্য সভা হইবে এবং সমস্ত বিখ্যাত গায়ক এবং সঙ্গীতশাস্ত্রবিদ্ এবং সঙ্গীতরসগ্রাহী মহাশয়গণকে আহ্বান করিয়া শোনান হইবে। তৎপর তিনি কলিকাতা হইতে ফিরিয়া যাইবেন।.....অনেকগুলি যন্ত্র বাজাইতে এবং গাইতে পারেন। বীণাবাদক ও গায়ক বলিয়া...প্রসিদ্ধ। ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী, সংস্কৃত ভজন, কীর্তন, ইঁনি সকল প্রকার গীত গাইতে পারেন। চৌদ্দ সপ্তক সুর গলা হইতে স্পষ্টরূপে নির্গত করিতে পারেন। যে কোন গ্রামের যে কোন স্বর ব্যক্ত করিতে সক্ষম এবং সকল প্রকার সুর অনুকরণে পটু। তালজ্ঞান অতি চমৎকার। বিলম্বিত লয় হইতে ধ্রুপদের তালের গতিও দ্রুত যাইতে থাকে।"

অগ্রাণ মাসের আর একটি সংবাদে জানছি :—"(মৌলাবক্স) জলতরঙ্গ এত দ্রুত বাজাইয়াছিলেন যে, করতালি সবার চেষ্টা এবং যার পর নাই জলদ বাজাইয়াও তাঁহার সহিত তাল রাখিতে পারে নাই।"

"মৌলাবক্সের সঙ্গীত শুনিবার জন্য অনেক সম্ভ্রান্ত বাঙালী এবং ইংরেজ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সঙ্গীত শেষ হইলে বিচারপতি ফিয়ার সাহেব রাজা শ্রীযতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রদত্ত একটি স্বর্ণপদক মৌলাবক্সের গলদেশে অর্পণ করেন।"

পরবর্তী পৌষ মাসের সংবাদে পাচ্ছি :—

"প্রফেসর মৌলাবক্স তাঁহার সঙ্গীতশাস্ত্রের

বিশ্ব বিজ্ঞান

অ্যাপলো-১২

অতঃপর। অ্যাপলো-১১-এর পর মার্কিন দেশের দ্বিতীয় মানববাহী চন্দ্রযান অ্যাপলো-১২ চাঁদের দেশের আর এক বন্দরের উদ্দেশে যাত্রা করল। এবারকার অভিযাত্রী অ্যালেন বীন, রিচার্ড গর্ডন এবং চার্লস কনরাড (জু.)। যাত্রাকাল, ভারতীয় সময় রাত নটা বেজে বাইশ মিনিট, নভেম্বর চোদ্দ। অ্যাপলো-১১কে যখন চাঁদের দেশে পাঠান হয়েছিল তখন তার কক্ষপথটি এমনভাবে স্থির করা হয় যাতে করে মাঝপথে কোন বিপদ দেখা দিলে সে আপনা থেকেই পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারত। এমন কি চাঁদের কক্ষপথের কাছে পৌঁছেও যদি চাঁদকে ঘিরে একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে বিচরণ করতে সে অসমর্থ হত তাহলে চাঁদই তার নিজস্ব মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে বাধ্য করত তাকে নিজের চারপাশে কয়েকবার পাক খাইয়ে ঘুরিয়ে পৃথিবীর দিকে ঠেলে দিতে। সে ক্ষেত্রে নভোচরেরা কোনরকম ঝুঁকি না নিয়ে অনায়াসে পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারতেন। কিন্তু এবার সে ধরনের কোন পন্থা ধরে অ্যাপলোর যাত্রীরা উড়ান হচ্ছেন না। ঠিক হয়েছে যাত্রার প্রায় আটাশ ঘণ্টা পর, যখন তাঁরা তাঁদের গন্তব্য স্থলের অর্ধেক পথ অতিক্রম করে যাবেন তখন তাঁরাই নিজেদের বুদ্ধি-বিবেচনা এবং চেষ্টাকে কাজে লাগিয়ে মূল যানটিকে একটি স্বতন্ত্র কক্ষপথে স্থাপন করবেন। এটা করতে পারলে ওঁরা সোজা পথে এবং কম সময়ে চাঁদে পাড়ি দিতে পারবেন। তবে এটা করতে গিয়ে একটা মস্ত ঝুঁকিও নিতে হবে তাঁদের। সেটা হল—আগের বারে স্বয়ংনিয়ন্ত্রিত যন্ত্রগণক যেমন আপনা থেকেই যে কোন বিপদের হাত থেকে অ্যাপলো-১১কে উদ্ধার করে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনতে পারত, এবার সেটা সম্ভব নাও হতে পারে। যদি কোন গোলযোগ ঘটে নিজেদের নিরাপদে ফিরিয়ে আনার দায়িত্বের বেশ কিছু অংশ গিয়ে পড়বে নভোচরদেরই উপর।

আগের বারে যে মহাকাশযানটি কলিন্সকে বহন করে চাঁদের চারপাশে পরিক্রমণ করেছিল তার নাম কলাম্বিয়া, এবার গরডন থাকবেন ক্লিপারের ভিতরে। যে মূলযানটি তাঁকে বহন করে সেখানে পরিক্রমণ করবে তার নাম রাখা হয়েছে ইয়াংকি ক্লিপার। এতে বসে গর্ডন চাঁদের পিঠের উপর জরীপের কাজ করবেন। আর এই সময়ে চাঁদের ভেলা ইনট্রেপিড-এ চড়ে কনরাড এবং বীন গিয়ে নামবেন চাঁদের ঝঞ্ঝা সাগরের এমন একটি জায়গায়, যেখানে আজ থেকে প্রায় দু বছর আগে মার্কিন দেশ থেকে সার্ভেয়ার নামে একটি মানববিহীন মহাকাশযানকে চাঁদে নামিয়ে অবতরণ করানো সম্ভব হয়েছিল। সম্ভব হলে ইনট্রেপিডকে নামান হবে সার্ভেয়ারের একেবারে এক হাজার ফুটের কাছাকাছি কোন স্থানে।

চাঁদে নেমে ওঁরা কাজ করবেন প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা। ঐ সময়ে ওঁরা চাঁদের বুকে প্রোথিত করবেন কয়েকটি বৈজ্ঞানিক তথ্য-জ্ঞাপক যন্ত্র। এদের মধ্যে একটি যন্ত্রের কাজ হবে নিয়মিত চাঁদের দেশে সূর্যের নিয়মিত বিস্ফোরণজনিত প্রতিক্রিয়া সংগ্রহ করে পৃথিবীতে জানান। একটি যন্ত্র চুম্বক ক্ষেত্রের উপর গবেষণা চালাবে। কিভাবে সেখানকার চৌম্বিক-পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে থাকে, সেই পরিবেশের উপর দূর মহাকাশ থেকে ছুটে আসা নানা রকমের বিকিরণ কি ধরনের প্রভাব বিস্তার করে—এই গবেষণার এটাই হল মূল লক্ষ্য। এ সম্পর্কে পরিষ্কার তথ্য সংগ্রহ করতে পারলে ভবিষ্যতে মহাকাশ-যাত্রার বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করে তোলা সম্ভব হবে। সেই সঙ্গে পৃথিবীতেও দূর করা সম্ভব হবে দূরাঞ্চলে বেতার সংকেত পাঠানোর নানারকম খুঁটিনাটি অসুবিধে।

এ ছাড়াও আরও বেশি পরিমাণ মাটি বা চাঁদের পাথর খুঁড়ে নিয়ে আসবেন নভোচরেরা, যা চাঁদের ভিন্ন অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি সম্পর্কে আরও বিস্তৃত তথ্য জানতে বিজ্ঞানীদের সাহায্য করবে। কিছুটা সময় ওঁরা ব্যয় করবেন সার্ভেয়ারটিকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করার কাজে। দীর্ঘ দুই বছর আগে পাঠান এই স্বনিয়ন্ত্রিত গবেষণাগারটির যন্ত্র [illegible] এক সময় সরব ছিল। সেদিন মাটি থেকে প্রায় বারো ডিগ্রির মত পাড় উঁচু একটি গহ্বরের মধ্যে অবতরণ করে কয়েক শ' ছবি এবং নানা রকম তথ্য পাঠানোর পর এক সময়ে এটি নীরব হয়ে যায়। তারপর এর মাথার উপর দিয়ে বয়ে গেছে পর্যায়ক্রমে একটানা দীর্ঘ দিনের প্রচণ্ড উত্তাপ এবং অন্ধকারের হিম প্রবাহমাত্রার স্পর্শ। তাপমাত্রার এই প্রচণ্ড ব্যবধান এর যন্ত্রপাতি বা ধাতব বা অধাতব কাঠামোর উপর কি ধরনের প্রতিক্রিয়া করেছে সেটা পরীক্ষা করে দেখার জন্য এর কিছু কিছু অংশ এবারকার নভোচরেরা সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন পৃথিবীর গবেষণাগারে। সেই সঙ্গে আনবেন

বাঁ পাশের তীর চিহ্নিত স্থানে মানুষের দ্বিতীয় চন্দ্ররথ অ্যাপলো-১২ অবতরণ করছে এবার চাঁদের ঝঞ্ঝা সাগরে। আজ থেকে প্রায় দু' বছর আগে এখান থেকে মাত্র তিন শ' ত্রিশ মিটার দূরে অবতরণ করেছিল মার্কিন দেশের স্বনিয়ন্ত্রিত গবেষণাগার সারভেয়ার-৩। চাঁদের পিঠে নেমে চাঁদ সম্পর্কে বহু ছবি এবং তথ্য পাঠিয়েছিল পৃথিবীর গবেষণাগারে। তার পরই সে নিশ্চুপ হয়ে যায়। চাঁদের ভেলা থেকে নেমে এবারকার অভিযাত্রী চার্লস কনরাড (জুনিয়র) এবং অ্যালেন বীন হেঁটে যাবেন সারভেয়ার-৩-এর কাছে। ওঁরা সেখানে দাঁড়িয়েই পরীক্ষা করবেন নীরব ঐ যন্ত্রযান। তারপর তার কিছু যন্ত্রপাতি তাঁরা সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন পৃথিবীতে। পরীক্ষা করে দেখা হবে এই দীর্ঘ সময় চাঁদে থাকার পর যন্ত্রগুলিতে কোন পরিবর্তন এসেছে কিনা

স্যাটার্নের গায়ে জুড়ে থাকা মহাজাগতিক জন্য।

এবারকার অভিযানের আর একটি বড় লক্ষ্য হল, ঠিক সময় মত অর্থাৎ পূর্ব নির্ধারিত সময়মত নির্দিষ্ট গন্তব্য স্থানে অবতরণ করা। অ্যাপলো ১২র ক্ষেত্রে কলাম্বিয়া থেকে ঈগল যখন চাঁদের পিঠে নামার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল ঠিক সেই মুহূর্তে সামান্য যান্ত্রিক ত্রুটি হয়েছিল। ফলে ঈগলের ঠিক যেখানটায় নামার কথা ছিল সেখান থেকে পাশ বরাবর প্রায় দেড় মাইল সরে গিয়ে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে গিয়ে অবতরণ করেছিল। কারণ স্বরূপ বলা হয়েছে, সেবার কলাম্বিয়া থেকে ঈগলকে আলাদা করার দশ ঘণ্টা আগে যানটির মধ্যে রেখে দেওয়া জঞ্জাল এবং আবর্জনা সরানোর সময় খানিকটা ঝাঁকুনি লেগেছিল। পরে ঈগলটি পৃথক হয়ে এসে যখন সামান্য সময়ের জন্যে কলাম্বিয়ার কাছ বরাবর অবস্থান করছিল তখন ঘাত সৃষ্টিকারী জেটের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যথাযথ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় নি। এই দুটি কারণেই সঠিক লক্ষ্য স্থলে পৌঁছনোর ব্যাপারে অমন বিভ্রাট ঘটে।

এবার আরও সতর্ক হচ্ছেন অ্যাপলো-১২-র নভোচররা। ঠিক হয়েছে চাঁদের ভেলা নামানর অনেক আগে থেকেই তাঁরা জল বা আবর্জনা নিয়ে যানটির মধ্যে টানা-হ্যাঁচড়া করবেন না। তা ছাড়া চাঁদের ভেলাটিকে সরাসরি বাইরে বের করে পৃথক করে না নিয়ে প্রথমে সেটিকে বাইরে এনে মূল যানটির সঙ্গে আটকে রাখা হবে। পরে অত্যন্ত মৃদুভাবে সেটির জোড় আলগা করে মহাশূন্যে ছেড়ে দেবেন। আরমস্ট্রং অবতরণ করার প্রায় এক ঘণ্টা আগে চাঁদের দেশে ঠিক কোথায় রয়েছেন সেটি ঠিক করে নিয়েছিলেন যন্ত্রগণকের সাহায্যে। কিন্তু এবার কনরাড এই কাজটি সারবেন মাত্র চার মিনিট আগে।

এর পর তিনি এবং বীন উভয়েই চিত হয়ে শুয়ে থাকবেন। ফলে বেশ কিছুক্ষণ তাঁরা চাঁদের দিকে চাইতেই পারবেন না। উদ্দেশ্য, রেডার যন্ত্রটিকে চাঁদের লক্ষ্য-স্থানটির দিকে সরাসরি মুখ করিয়ে রেখে দেওয়া। আর ঠিক যখন তাঁরা চাঁদের পিঠ থেকে মাত্র তিন কিলোমিটার ঊর্ধ্বাকাশে থাকবেন তখন আপনা থেকেই ভেলাটি উল্টে যাবে। যখন মাত্র দেড় শ মিটারের মত উপরে তখন কনরাড সম্পূর্ণ নিজের তত্ত্বাবধানে ভেলাটিকে আরও নিচু পথে চালিয়ে ঠিক যেমন যেমন তার নিজস্ব অবতরণস্থানে গিয়ে পৌঁছিয়ে তেমনি করে তাঁর ভেলাটিকেও নিজে নিজে অবতরণ করাবেন। অর্থাৎ অ্যাপলো-১২র সাফল্য পরবর্তী অভিযানগুলিকে যে যথেষ্ট সুগম এবং সহজ করে তুলতে সক্ষম হবে সে কথা বলাই বাহুল্য।

ভারতের আবহাওয়া নির্ণয়ে

যন্ত্রগণক

সম্প্রতি বিশ্ব আবহাওয়া-বিজ্ঞানে অংশ গ্রহণ করতে চলেছেন নতুন দিল্লীর আঞ্চলিক আবহাওয়া গবেষণা কেন্দ্র। এর জন্যে অল্পদিনের মধ্যেই এখানে বসান হবে অত্যন্ত আধুনিক এক ধরনের যন্ত্রগণক, যা প্রতি সেকেণ্ডে দশ লক্ষেরও বেশি জটিল আবহাওয়া বিষয়ক সমস্যার সমাধান করে দেবে। সেই সঙ্গে জানা যাবে সারা ভারত এবং তার আশপাশের সঠিক আবহাওয়া সংকেত। বলা হয়েছে, এই সমস্ত সংকেতের সাহায্যে ভারতীয় আবহাওয়া-বিশারদরা প্রতি বারো ঘণ্টার একটি করে চার্ট তৈরি করবেন। পরে সেটা হয়ত প্রতি ছয় ঘণ্টারও হতে পারে। এই চার্টের সাহায্যে খুব অল্প সময়ের মধ্যে ভারতের কোথায়, কখন এবং কতটা পরিমাণ বৃষ্টি হতে পারে সে সম্পর্কে খুঁটিনাটি তথ্য তাঁরা অনেক আগে থেকেই জানিয়ে দিতে পারবেন। সেই সঙ্গে জানাতে পারবেন সমস্ত অঞ্চলের আপেক্ষিক আর্দ্রতা বাতাসের গতি এবং স্বরূপ, যেমন ঘূর্ণি, তাপমাত্রার হ্রাস বৃদ্ধি প্রভৃতির উপর মূল্যবান তথ্যও।

অ্যাপলো-১২ মানুষের দ্বিতীয় চন্দ্রযাত্রা। ডান দিক থেকে নেতা চার্লস কোনরাড (জুনিয়ার), মূল যানের চালক রিচার্ড গর্ডন (জুনিয়ার), ভেলার চালক অ্যালেন এল বিন। সামনে বাঁ দিকে রয়েছে চাঁদের চুম্বকক্ষেত্র মাপার যন্ত্র, ডান দিকে সূর্য থেকে বিচ্ছুরিত শক্তি কণিকা মাপার যন্ত্র। পেছনে চাঁদের ভেলা

বস্তুত, আজকের দিনে আবহাওয়া-সম্পর্ক তথ্যাবলী যে কতখানি প্রয়োজনীয় সে কথা সকলেই আমরা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি। যদি আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে বেশ কিছু সময় আগে সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায় তাতে করে আমাদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ছাড়াও অর্থ-নৈতিক অপচয়ের হাত থেকে দেশ অনেক বেশি উপকৃত হবে। যথাযথ আবহাওয়া বার্তা আগে থেকে জানা সম্ভব হলে, বিমান চলাচল ব্যবস্থা বিপদ মুক্ত করা যেতে পারে। সেচ এবং কৃষি ব্যবস্থাকে সুন্দরভাবে রূপায়িত করা যেতে পারে এবং সেই সঙ্গে শস্য সংরক্ষণ ব্যবস্থাগুলি আরও সুনিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব হবে।

যথাযথ আবহাওয়া বার্তা প্রচারের ব্যাপারে ভারতীয় কুশলীরা এখনও মুখ্যত যন্ত্রের চেয়ে নিজেদের উপরই বেশি দায়িত্ব রাখতে বাধ্য হয়েছেন। দৈনিক চার্ট এবং আনুষঙ্গিক যন্ত্রাদির যেটুকু সাহায্য আমরা পেয়ে থাকি, দেশের চাহিদা মেটাতে তারা যথেষ্ট নয়। এই যন্ত্রগণক আমাদের এতদিনের দীর্ঘ অসুবিধেকে দূর করার ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়ক হবে। এর ফলে সমসাময়িক ছাড়াও ভবিষ্যতে প্রতি দু বছর সময়ের অগ্রিম আবহাওয়া বিষয়ক তথ্যাবলীও আমরা জানতে পারব। আর এই তথ্য ভারত ছাড়াও এশিয়া এবং আফ্রিকার আরও বিভিন্ন অঞ্চলও যাতে সংগ্রহ করতে পারে তার জন্যে বিশ্ব আবহাওয়া নিরূপক সংস্থা সুষ্ঠুভাবে কাজ করে যাবেন। যন্ত্রগণক তৈরি করবেন ভারতে অবস্থিত আই বি এম কোম্পানি।

সমরজিৎ কর

(একত্রিশ)

রাস্তায় রাস্তায় এখন খুব ভিড়। পুজোর বাজার। দোকানের শো-কেসে সাজানো পুতুল-মেয়ের মুখ চোখে চোখ রেখে হাসে। সুন্দর সব শাড়ির রঙ রাস্তা আলো করে দেয়। তাদের গায়ে লটকানো অঙ্কের দাম লেখা টিকিট। স্কুলের পর দোকান দেখতে দেখতে ললিত অনেক দূর হাঁটে। ইচ্ছে করে দোকানে ঢুকে অনেক কিছু সওদা করে নিয়ে যায়। অনেক দিন পর এবার মায়ের জন্য একটা সাদা থান কাপড় কিনেছে সে, তারপর আর কারো জন্যই কিছুই কেনার নেই। তবু দোকানের দিকে চেয়ে পথ হাঁটে ললিত, মানুষের কেনাকাটা দেখে! কখনো ফুটপাথের দোকানে চওড়া পাড় আর সুন্দর নকশার শাড়ি দেখে দাঁড়িয়ে যায়। দাম জিজ্ঞেস করে, শাড়ির গায়ে হাত বুলিয়ে বলে—কত?

দোকানদার সাগ্রহে বলে—পঁয়ত্রিশ। নিন, কিছু কমে দেবো।

ললিত মাথা নেড়ে বলে—থাক।

ছোটো ঝকঝকে স্বাবলম্বী ট্র্যানজিস্টর রেডিও তিন ঠ্যাঙে দাঁড়ানো ভুতুড়ে ক্যামেরা, শিশুর মুখের মতো নিষ্পাপ আপেল, এই দেখতে দেখতে যায় ললিত। পকেটের সামান্য কিছু টাকা হাতের আঙুলে অনুভব করে। সক্রেটিসের মতো মনে মনে বলে—হায়, এত জিনিসের কোনোটাতেই আমার কোনো প্রয়োজন নেই।

আশ্চর্যের বিষয় আজকাল রাস্তায় মেয়েরা তার দিকে তাকায়। আগে প্রায়ই মেয়েরা তাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছে। কিন্তু এখন ললিতের চোখ মাঝে-মধ্যে অচেনা পথ-চলতি মেয়ের চোখে আটকে যায়। মেয়েটা চোখ সরায় না, তাকে দেখে, পেরিয়ে গিয়েও এক আধবার ঘাড় ফেরায়।

দোকানের আয়নায় নিজের মুখখানা মাঝে মাঝে দেখে ললিত। সুন্দর মুখ। অসুস্থতার কোনো ছাপ নেই। মা বলে ছেলেবেলায় তার রঙ ছিল দেখবার মতো, রোদে পুড়ে আর ঘুরে ঘুরে সে রঙ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ললিত এখন ভাবে, বোধ হয় সেই শিশুবয়সের গায়ের রঙ আবার ফিরে এসেছে তার।

বোধ হয় মৃত্যুর আগে মানুষের কয়েকটা সুদিন আসে। সে ক'দিনে তাকে ভোগ করে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। একদিন স্কুল থেকে ফিরে সে-ঘরে শুয়ে আছে বিছানায়, এমন সময়ে 'মাসীমা, ও মাসীমা' বলে ডেকে খোলা দরজা দিয়ে পালের নৌকোর মতো ভেসে ঘরে এল একটি মেয়ে। সাবলীল লম্বা মেয়েটি, পরনে তাঁতের রঙীন শাড়ি। বাঁ কোলে একটি বাচ্চা।

প্রথমে ললিত চেনে নি, মাও না। দুজনেই একটু অবাক হয়ে চেয়ে ছিল। মেয়েটি কোলের বাচ্চাটিকে মেঝেয় দাঁড় করিয়ে মাকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই অহংকারের সেই পুরোনো ভঙ্গীটি, ঘাড় পিছনে হেলানোর মিষ্টি মুদ্রাদোষটি দেখে চিনতে পারল ললিত। মিতু। স্বেচ্ছায় মিতু কখনো এ বাসায় আসেনি। এই প্রথম তার স্বেচ্ছায় আসা। এখন তার সিঁথিতে সিঁদুর, কোলে—বোধ হয় দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় সন্তান।

হাসিমুখে বলল—আমি মিতু।

মা গলায় ঘরঘর শব্দ করে বলল—অ। বোসো। কবে এলে?

—কাল এসেছি। বম্বে তো অনেক দূর। আসাই হয় না। চার বছর পর এলাম।

সবসময় সেরা জায়গাতেই দেখতে পাওয়া যায়-ডিসিএম!

বলুন দেখি, সুন্দর ক'রে পর্দা সাজাবার সময় কার ডাক পড়ে? নিঃসন্দেহে, ডি সি এম-এর। ডি সি এম ভারতে সবচেয়ে বেশী কাটতির পর্দার কাপড় ও আসবাবপত্রের আবরণীয় কাপড় তৈরী করে। কারণ অবশ্য সোজা নয়! ডি সি এম-এর তৈরী ঘর সাজাবার কাপড় পাওয়া যায় চমৎকার রকমারি জ্যাকার্ড ও ডবি প্যাটার্নে, নানা প্রিন্ট ও রঙীন ডিজাইনে এবং অত্যন্ত সুবিধাজনক দামে। আজই দেখে আসুন। কালই আপনার বাড়ীতে ঝুলিয়ে দিন!

ডি সি এম স্টোরে যখনই যাবেন নতুন কিছু না কিছু অবশ্য পাবেন

পুজোর পরই শ্বশুরবাড়ি যাবো ব্যারাকপুরে।

শোয়া থেকে আস্তে আস্তে উঠে বসল ললিত। এখন আগের চেয়েও সুন্দর হয়েছে মিতু। মসৃণ গা, সতেজ শরীর। দেখলেই বোঝা যায় বড়লোকের ঘর করে। ললিত একবার দুবারের বেশী তাকাতেই পারল না। ভীষণ লজ্জা করছিল। কেন এসেছে মিতু!

মা রান্নাঘরে গেল, মিতু গেল পিছু পিছু। ললিত একবার ভাবল ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়, যাতে মিতুর সঙ্গে দেখা না হয় আর। উঠে সে জামা গায়ে দিল, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একটু ইতস্তত করল। হঠাৎ মনটা বড় ভাল লাগছিল তার। মিতু আসাতে বহুদিনের পুরোনো একখানা কাঁটা সরে গেছে। শেষবার এ বাড়িতে যখন এসেছিল মিতু তখন মায়ের ওপর রাগ করে কেটেকেটে মাকে অপমান করে চলে গিয়েছিল। ভেবেছিল মা তাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে ললিতের সঙ্গে বিয়ে করাতে চায়। সেই লজ্জায় এতদিন কাঁটা হয়ে ছিল ললিত। মিতু নিজে থেকেই এসেছে বলে বড় ভাল লাগছিল ললিতের। জীবনের শেষ কয়েকটি দিন ভরে যাচ্ছে। [illegible]। মরতে মরার সময়ে সে ভরা মন নিয়ে যাবে। কোনো দুঃখ থাকবে না। পৃথিবীর কাছে সব দাবিদাওয়া শেষ হয়ে গেলে মরা কত সহজ হয়ে যায়!

মায়ের কাছ থেকে আবার ফিরে এসে চৌকিতে বসল ললিত। সিগারেট ধরাল। শুনতে পেল উঠানের ওপাশের রান্নাঘরে মা আর মিতুর গলা পরস্পর কথা বলছে। ললিত কান পেতে শোনবার চেষ্টা করছিল।

এখন ঘরটা অন্ধকার হয়ে এসেছে। সামনের সন্ধ্যা একটু মরা আলোর ছায়ার মধ্যে একা একটা কুঁজো হয়ে বসে আছে ললিত। এ সময় উঠান পার হয়ে চলে যাবার জন্য ঘরের মধ্যে এল মিতু। ললিত মোটে না তাকিয়েও বুঝতে পারছিল মিতু চলে যাচ্ছে। জীবনে কোনো দিন মিতুর সঙ্গে ভালো করে কথা হয়নি। আজও হবে না কি? হে ভগবান......

মিতু দরজার মুখ থেকে আস্তে ঘুরে দাঁড়াল। কোলের বাচ্চাটা কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে আছে। অস্পষ্ট অন্ধকারে মিতুর সুন্দর অহংকারী মুখখানা বিষণ্ণ দেখাল আজ। মৃদু গলায় হঠাৎ মিতু সোজা তার সঙ্গে কথা বলল—এখন কেমন আছেন?

কেমন হঠাৎ কাঠ আড়ষ্ট হয়ে গেল হাত পা, গলা বুজে আসছিল। ললিত আস্তে বলল—ভালই।

মিতু এক পাও কাছে এল না, কিন্তু গলার স্বর অনেক নিকটজনের মতো শোনাল। [illegible] কি হয়েছে!

ললিতের ইচ্ছে ছিল না রোগের নামটা বলে। কী হবে মেয়েটার মন খারাপ করে দিয়ে! পরমুহূর্তেই ইচ্ছেটা পালটে গেল আবার। কেন মিতু চিরকাল সুখী থাকবে? দেখি না ক্যান্সার শুনে ওর মুখটা কেমন পালটে যায়!

ললিত মৃদু গলায় বলল—ক্যান্সার।

প্রথমটায় বুঝতেই পারল না মিতু, বলল—কী!

ললিত আবার বলল।

মিতুর চুড়ি-পরা হাত হঠাৎ ঝনাৎ শব্দ করে পড়ে যায়। নিঃশ্বাসের সঙ্গে মিতু বলে—যাঃ! মিথ্যে কথা।

এত আপনজনের মতো শোনায় মিতুর গলা যে, ফের কথাটা শুনতে ইচ্ছে করে।

—সত্যিই। ললিত বলে।

—কিন্তু আমি যে শুনলাম আপনি শীগগীরই বিয়ে করছেন!

ললিত অবাক হয়—কে বলল?

—পাড়ায় সবাই বলছে। শাশ্বতী না কী যেন নাম মেয়েটির!

ললিত অন্ধকারেই মাথা নেড়ে বলে—না।

—না?

মিতু একটু চুপ করে থাকে। তারপর আপন মনে বলে—আমি তো জানতাম না। মাসীমা বলছিলেন কলিক পেন।

—মা জানে না।

মিতুর কোলের বাচ্চাটা নড়ে উঠে 'অঃ' শব্দ করল। মিতু চঞ্চল হয়ে বলে—ওকে মশা কামড়াচ্ছে এবার যাই।

—আচ্ছা।

মিতু একটু দ্বিধা করে বলে—কয়েকদিন আছি। মাঝে মাঝে এসে দেখা করে যাব।

ললিত বলল—আচ্ছা।

চলেই যাচ্ছিল মিতু। যখন ঘরের দরজার বাইরে তার এক পা তখনই হঠাৎ ললিত জিজ্ঞেস করল—কেন এসেছিলেন?

মিতু থেমে যায়। তারপর মাথা নীচু করে প্রায় ফিসফিস করে বলে—জানি না।

ঘরটাকে খুব নির্জন করে দিয়ে মিতু চলে গেল।

ললিত জানে যে তাকে সুখী করা ছাড়া মিতুর এই আসার কোনো দরকারই ছিল না। এইভাবেই শেষ কয়েকটা দিন সে সুখেই কাটাবে।

রাতে এক ডাকেই রমেন সাড়া দেয়। যেন এতক্ষণ না ঘুমিয়ে ললিতের ডাকটারই অপেক্ষায় ছিল। জেগে উঠে বসে রমেন, তার গায়ে হাত রেখে গভীর গলায় বলে—কী রে!

ললিত কী বলবে ভেবে পায় না। ভিতরটা অস্থির লাগে। সারাদিন সে জীবন্ত মানুষজনের ভিতর ঘুরে বেড়িয়েছে, দেখেছে দোকান [illegible] চেহারা, দোকানে সাজানো ফল, বইয়ের মলাট, অচেনা মানুষের মুখ, [illegible] গাছ—এইরকমই সব তুচ্ছ বিষয়গুলির জন্য হঠাৎ ব্যথিয়ে ওঠে বুকে, দম বন্ধ হয়ে আসে। সামনের পুজোয় শরৎকালে সে এসব দৃশ্য হয়তো আর দেখবে না। এই বাস্তু জগৎ ছেড়ে সে কি কোনো অবাস্তব জগতে চলে যাবে! নাকি কোনো অস্তিত্বই তার থাকবে না তার? সে কি আবার জন্ম নেবে? নাকি একবারই ললিত এসেছিল, আর আসবে না?

ললিত শ্বাস ফেলে বলে—রমেন, আমি আর বেশী দিন বাঁচবো না রে, তুই দেখিস।

রমেন সান্ত্বনা দেয় না, উত্তরও দেয় না। কেবল চুপ করে জেগে বসে থাকে। অনেকক্ষণ ধরে ললিতের বুকে হাত বোলাতে থাকে। তারপর কখন আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ে সে।

ললিত ঘুমিয়ে পড়লে রমেন জেগে থাকে। তার ঘুম আসে না। মাঝে মাঝে একটা বুড়ো ময়ূর আর একটা পুরোনো মোটরগাড়ির কথা রমেনের মনে পড়ে। তাদের বারবাড়ির উঠান ছিল কচ্ছপের পিঠের মতো ঢালু, সেই সবুজ মাঠে ধূসর রঙের ময়ূরটা একবোঝা পেখম টেনে আস্তে আস্তে চরে বেড়াচ্ছে। কিংবা লক্কড়ে পুরোনো কার্নিশ সব হুডওয়ালা তাদের গাড়িটা বাড়ির দিকে শালগাছের তলায় দাঁড়িয়ে ভিজছে। কখনো বা মনে পড়ে প্রকাণ্ড ভাঙা পিয়ানোর ওপর ধুলোর আস্তরণ তার ওপর আঙুল দিয়ে রমেন তার নাম লিখছে—রায় রমেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। কিংবা মনে পড়ে তাদের ভগ্নস্তূপ প্রকাণ্ড বাড়িটার পশ্চিমের ভিত-এর কাছে একটা আতসকাচ হাতে দাদু বসে আছেন। চোখাচোখি হলে দাদু হেসে বলতেন—দেখ রমেন, পিঁপড়ে কেমন মাটি তুলেছে। তারপর চিন্তিতমুখে মাথা নেড়ে বলতেন—দেখো পশ্চিমের ভিত থেকেই বাড়িটার ভাঙন শুরু হবে। এই দিক থেকেই বাড়িটা গাঁথা শুরু হয়েছিল আমার মনে আছে।

রমেন অবাক হয়ে বলেছে—সে তো একশ' বছর আগেকার কথা। তুমি তখন কোথায়?

দাদু বিব্রতমুখে আতস কাচখানা রেখে দু হাতে চোখ মুছে নিয়েছেন। তারপর তৃপ্তিভরা হাসিমুখে বলেছেন—আমার মনে হয় আমি তখনো ছিলাম। এইখানেই। আমি দেখেছি এই বাড়ির ভিত গাঁথা হতে।

—কি করে?

পশ্চিমের নির্জন চত্বরে তারা দুজন—[illegible] দুটি শিশুর মতো পাশাপাশি বসে [illegible]। দাদু বলতেন—তখন আমি এসেছিলাম ব্রহ্মপুত্রের ওপার থেকে নৌকোয় পার হয়ে। আমার ছিল মাটি-মজুরের কাজ। মুকুন্দর ঘানি-ঘরের পাশের মাঠ থেকে মাটি কেটে এনে [illegible] এই ভিত গাঁথার সময়ে—এরকম একটা ঘটনা আমার

"দুধ আর চিনি দিই ?"
"তা কেন ?
মিল্কমেড
দিলেই তো হয় !"

মনে পড়ে। তখন মাঝে মাঝে আমার ইচ্ছে হত যে এইখানে যে বড় বাড়িটা তৈরি হবে আমি যেন সেই বাড়িতে একদিন জন্মাই।

—সত্যি? রমেন ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞেস করেছে।

দাদু হেসে বলেছেন—কি জানি! আমার এরকম মনে হয়।

দাদুর চোখ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেলে রমেন তাঁকে হাত ধরে নিয়ে যেতো পাশের দালানের বারান্দায় খুব ভোরবেলা সূর্য প্রণাম করতে। কখনো নিয়ে যেতো ছাদে সন্ধ্যেবেলায় খোলা আকাশের নীচে। দাদু কখনো ক্বচিৎ চারদিকের পরিবর্তমান জগতের কথা তার কাছে জানতে চাইতেন। কিন্তু দাদুকে অন্ধ বলে কখনো মনে হত না রমেনের। বরং মনে হত খুব গভীর ধ্যানস্থ মানুষটি চারপাশের দৃশ্যমানতার অনেক গভীরে ডুবে আছেন তাই তার অন্যমনস্ক হাত তামাকের নলটা খুঁজে পাচ্ছে না।

একদিন সন্ধ্যেবেলা দাদু হাতড়ে তার হাতটা খুঁজে নিয়ে ডান হাতখানা মাথায় রেখে জিজ্ঞেস করলেন—রমেন খুব ছেলেবেলার কোনো কথা তোমার মনে পড়ে?

রমেনের বয়স তখন বারো কি তেরো, সে একটু ভেবে বলল—পড়ে।

—কি রকম?

রমেনের মনে পড়েছিল তার বাবার যাত্রার কথা। বয়ড়ার আবাদ থেকে ফেরার পথে ঘোড়সুদ্ধ বাবাকে ধরেছিল কানাওলায়। বড় হয়ে রমেন জেনেছে কানাওলা আসলে ভূত নয়, এক ধরনের আবর্তা, মানুষের বোধবুদ্ধি কিছুক্ষণের জন্য নষ্ট করে দেয়। বয়ড়া থেকে ফেরার পথে কালীজয়দের বৈঠকখানায় কিছুক্ষণ পাশা খেলে রাতে ফিরছিল বাবা। ঘোড়া ছুটেছিল কিন্তু কোথাও পৌঁছতে পারছিল না। তখন মাঠের মধ্যে মাঠে মাঠে কাটা হয়েছে আঁকাবাঁকা দীর্ঘ ট্রেঞ্চ রাস্তার আলো নেই। ঘোড়া রাস্তা চিনত। ক্ষীণ দৃষ্টি বাবা ঘোড়ার ভরসায় সওয়ার হয়ে বসেছিল কোনোদিকে ঘোড়াকে চালানোর চেষ্টা করেনি। কিন্তু ঘোড়াটা রাস্তা ঠিক করতে পারছিল না। তাকে ধরেছিল কানাওলা। কেউ কেউ দেখেছে মেজোকর্তার ঘোড়া সে রাতে বড় রাস্তা ছেড়ে কেওটখালির মাঠে নেমে যাচ্ছে। তারা চীৎকার করে ডেকেছে বাবাকে দূর মাঠ থেকে বাবা উত্তর দিয়েছে। কিন্তু অন্ধকারে তাকে আর দেখা যায়নি। বাবা চেঁচিয়ে বলেছিল যে রাস্তা ঠিক করতে পারছে না। যারা দেখেছিল মেজোকর্তাকে তাদের কেউ এসে খবর দিয়েছিল বাড়িতে। মুহূর্তে বাড়িতে শোরগোল পড়ে গেল—কানাওলা কানাওলা রমেনের মনে পড়ে সে তখন খুব ছোটো, কাছারি বাড়ির উঁচু বারান্দায় উদ্ধবের হাত ধরে দাঁড়িয়ে দেখছে রক্ষাপুরের ঢালু পার দিয়ে মুকুন্দের ঘানিঘরের পিছনের মাঠ দিয়ে অনেক হ্যারিকেন দুলতে দুলতে যাচ্ছে বাবাকে খুঁজে বের করতে। বিশাল চরাচর জুড়ে অন্ধকার অসহায় টিমটিমে হ্যারিকেনগুলো চলে যাচ্ছে দূরে, দূরাগত মানুষের কণ্ঠস্বর হাহাকারের মতো ডাকছে—মেজোকর্তা—আ—। বাবাকে পাওয়া গিয়েছিল একটা অগভীর ট্রেঞ্চের মধ্যে, ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে ছিল ট্রেঞ্চের ধারে। বাবার মৃতদেহ কিরকম দেখেছিল তা রমেনের মনে নেই কিন্তু মনে আছে পরদিন সকালবেলায় সে দেখেছিল সেই অপরাধী ঘোড়াটাকে, সকালের আলোয় যখন তাকে বাইরের উঠোনে হাঁটিয়ে আনা হল। কী লজ্জিত বিমর্ষ ছিল তার চলার ভঙ্গী!

দাদুকে সে সেই ঘটনার কথা বলতেই দাদু তামাকের নল টেনে অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—তখন তোমার বয়স পাঁচ কি ছয়। ও বয়সের অনেক কথাই মানুষের মনে থাকে। তোমার আরো ছেলেবেলার কথা মনে নেই?

রমেন আবার ভেবেছিল।

তখন সে কত ছোটো কে জানে, তার একবার অনেক ছোটো বয়সে—তার মনে পড়েছিল—ভীষণ জ্বরের ঘোরে সে শুয়ে আছে। চারপাশটা অবছা দেখাচ্ছিল। কেউ একজন তার জিবের তলায় থার্মোমিটার গুঁজে দিয়েছিল, আর সে কড়মড় করে চিবিয়ে ফেলেছিল সেটা। তারপর তাকে উপুড় করে বমি করানো হয়েছিল।

সেই ঘটনার কথা শুনে দাদু প্রসন্ন হাসলেন—হ্যাঁ, তখন তোমার বয়স তিন। বাঃ রমেন, তোমার স্মৃতিশক্তি সুন্দর। কিন্তু আরো ছেলেবেলার কথা তোমার মনে পড়ে কি?

এরপর রমেনকে প্রাণপণ চেষ্টা করতে হয়েছিল। আরো ছেলেবেলা! আরো ছোটো বয়সের কথা!

তারপর তার হঠাৎ মনে পড়েছিল খুব ছেলেবেলার হয়তো স্মৃতি, হয়তো বা কল্পনা—কিন্তু বহুদিন আগে সে যেন তার মায়ের হাতে একটা নীল রঙের কেটলী দেখেছিল।

শুনে দাদু নড়ে চড়ে বসলেন। তামাকের নল নামিয়ে রেখে উত্তেজিত গলায় বললেন—তোমার দু বছর বয়সে সেই কেটলিটি ভেঙে যায়। কিন্তু সেটা কল্পনা নয়, সত্যিই একটা নীলরঙের কেটলী আমাদের ছিল রমেন, তোমার ভুল হয়নি। কিন্তু তুমি আর একটু চেষ্টা করো, দেখ তো আরো ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে কি না।

রমেন আবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল। চোখ বুজে দাঁতে দাঁত চেপে হাত শক্ত মুঠো করে। সে দেখতে পেয়েছিল সেই ছেলেবেলা যেন এক কুয়াশার জগৎ, আবছায়ার মায়ারাজ্য। কিছুই মনে পড়ে না, কিন্তু কেমন যেন আভাষ পাওয়া যায়।

দাদু উগ্র আগ্রহে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। জিজ্ঞেস করছিলেন—মনে পড়ে না রমেন। কিছুই মনে পড়ে না?

রমেন মাথা নেড়ে হেসে বলল—না।

—খুব তুচ্ছ সামান্য কিছুও না?

রমেন বলল—না তো।

দাদু মৃদু হাসলেন। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—আমি আজকাল এই খেলাটা খেলি। এই মনে পড়ার খেলা।

—তোমার কত ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে?

দাদু একটু গম্ভীর হয়ে বললেন—অনেকদূর পর্যন্ত মনে পড়ে।

—কত দূর?

দাদু একটু দ্বিধা করলেন, তারপর আস্তে আস্তে বললেন—অনেক দূর। রমেন, মানুষ চেষ্টা করলে তার জন্মমুহূর্তটিও মনে করতে পারে।

—তোমার মনে আছে?

দাদু হেসে চুপ করে রইলেন।

—কেমন ছিল তোমার জন্মমুহূর্ত?

দাদু ধীর গম্ভীর গলায় বললেন—অন্য রকম। সেই মুহূর্তটি অন্য সব দিনের মতো নয়।

শুনে গায়ে কাঁটা দিয়েছিল রমেনের।

—বলো, বলো।

দাদু মাথা নেড়ে বললেন—বললে তুমি ঠিক বুঝবে না রমেন, কিন্তু তুমি নিজে কোনোদিন সেই মুহূর্তটির কথা মনে করার চেষ্টা কোরো। তুমি নিরন্তর স্মৃতিমগ্ন থেকো, তাহলে কোনোদিন না কোনোদিন তোমার ঠিক মনে পড়বে। তোমার মন যদি স্বচ্ছ থাকে, যদি তুমি কখনো পাপবোধে কষ্ট না পাও, যদি তোমার মন কখনো কারো অনিষ্ট চিন্তা না করে, যদি তুমি অসদাচরণ না করো তাহলে সেই পবিত্র মুহূর্তটি একদিন ঠিক তোমার কাছে ধরা পড়বে।

বহুকাল ধরে সেই চেষ্টা করেছিল রমেন। বহুবার। যখন নদীতে সাঁতার দিত, বল নিয়ে দৌড়োতো, গান গাইত, কিংবা চালাতো মোটরগাড়ি, যখন একা থাকত কিংবা ঘর অন্ধকার করে বসত মাঝে মাঝে তখন হঠাৎ এই খেলা খেলতে বসত। তারপর আপন মনে হেসে উঠেছে। কখনো তার ফাঁকা মাথার ভিতর দিয়ে গড়িয়ে গেছে ছেলেবেলায় হারানো গুলি মার্বেল মনে পড়েছে ছেলেবেলায় কিশোরীদের প্রিয় মুখগুলি যাদের সঙ্গে আর দেখা হয়নি।

অবশেষে একদিন সেই মুহূর্তটি ধরা পড়েছিল রমেনের কাছে।

(ক্রমশ)

বিদেশের খবর

ব্রিটেনের মহিলা সমাজের তত্ত্বীয় জয় বা কাগজে কলমে আপন অধিকার প্রতিষ্ঠার খবরটি বেশ। তাঁরা বহুদিন থেকে সমান কাজের জন্য পুরুষের সমান পারিশ্রমিক দাবী করে এসেছেন। যে দেশের মহিলা ভোটাধিকার আন্দোলনের তীব্রতা ইতিহাসে জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা সে দেশে এটুকু অধিকার প্রতিষ্ঠায় এত দেরী হওয়াও আশ্চর্যজনক। ব্রিটিশ সরকার এতদিনে অঙ্গীকার করেছেন প্রস্তাবিত আইনের খসড়াখানা পার্লামেণ্টের আগামী অধিবেশনে পেশ করা হবে। মহিলা কর্মী চিরকাল সমান কাজের জন্য অনেক কম পারিশ্রমিক বা বেতন পেয়েছেন, হয়তো তার একটা সুরাহা হতে পারে। কিন্তু অঙ্গীকার এবং অঙ্গীকারকে কার্যে পরিণত করায় পার্থক্য আছে। সংকল্প কতটা তাঁরা সম্পাদন করবেন ভবিষ্যতে বোঝা যাবে। ব্রিটেনের কর্মসংস্থান এবং উৎপাদন মন্ত্রী শ্রীমতী বারবারা ক্যাসল্ কেবলমাত্র মহিলাই নন, তাঁর উপর জাতির অগাধ আস্থা। তাঁর যোগ্যতায়, রাজনৈতিক সফলতায় ব্রিটেনের নারীসমাজ গর্বিত। শ্রীমতী বারবারা বলেছেন এই সমান পারিশ্রমিক ব্যবস্থা হয়তো ১৯৭৫ সাল শেষ হবার আগেই কার্যকরী হবে। আপাতত বহু অর্থের দায়িত্ব সরকার নিতে চাইবে না। কাজেই পাঁচ বছরের মেয়াদী ব্যবস্থার প্রস্তাবনা।

দীর্ঘ পাঁচ বছর কোন দেশেরই জাতীয় জীবনে কম সময় নয়। শ্রম সরকার অর্থাৎ ব্রিটেনের লেবার গভর্নমেণ্ট যদি সত্যই মনে করেন মেয়েদের এ অধিকারের দাবী ন্যায্য অধিকারের দাবী তবে এত দেরী করার কারণ বোঝা কঠিন। যদি তাঁরা বলেন, বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতি দেরী করার কারণ, তবে পাঁচ বছর পরে যে পরিস্থিতি এর চেয়ে ভাল হবে এমন কোনও কথা জোর করে বলা চলে না। সে সময় দেশে যে সরকার বহাল থাকবে তাঁরা বা পূর্বগামী সরকার যা প্রস্তাব করেছেন তা গ্রহণ করবেন এমনও কিছু বলা যায় না।

জন স্টুয়ার্ট মিল-এর দেশ ব্রিটেন। ১৮৬৯ সালে তিনি যখন "The subjection of women" নামক বইখানা প্রকাশ করেছিলেন, তদানীন্তন পুরুষ সমাজ তো বটেই, নারী সমাজের অনেকাংশ হতবাক হয়েছিল। সে সময় মহারানী ভিক্টোরিয়া নিজেই নারী সমাজের শিক্ষা ও সমান অধিকারবাদকে বড় একটা প্রশ্রয়

দিতেন না। ঘরে ঘরে মায়েরা মেয়েদের তদানীন্তন নারীসুলভ চর্চার বাইরে আর কোনওদিকে মন দিলে আতঙ্কিত হয়ে উঠতেন! The subjection of women-এ মিল সাহেব নারীর অধিকার নিয়ে আলোচনা করেছেন। নারী ও পুরুষের সাম্য তাঁর মূল বক্তব্য ছিল। সামাজিক ক্ষেত্রে এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তারা সমান এ কথা তিনিই প্রথম পাশ্চাত্ত্য জগতকে জানাতে চেয়েছিলেন। তখন আপত্তি যাই হোক, উত্তরকালে আমেরিকা, ইউরোপ এবং ব্রিটেনে স্টুয়ার্ট মিল-এর প্রভাব পর্যাপ্ত হয়েছিল। ব্রিটেনের নারী-সমাজ তাদের ভোটাধিকার আন্দোলন বা suffarge movement প্রায় সম্পূর্ণভাবে The subjection of women-এর প্রেরণা।

মিল সাহেবের বইখানার পর ঠিক একশ বছর কেটে গেছে। ব্রিটেনের মাঠে ও কলকারখানায় মেয়েদের ভূমিকা বেড়েছে বই কমেনি। ঘর সামলিয়ে যাঁরা উপার্জন করেন, শীতে, তুষারপাতে, জল আর কুয়াশায় পুরুষের সঙ্গে সমান তালে কর্মক্ষেত্রে ছোটেন তাঁদের দাবী কেন মানা হয় না, আশ্চর্য! ব্রিটেনের ঘরণী, বিশেষত মধ্যবিত্ত ঘরণীর রান্নাঘরে আজও গ্যাজেটের প্রাচুর্য কম। প্রচুর পরিশ্রম করে দুদিক রক্ষা করে চলতে হয়। কাজেই এ বৈষম্য তাঁদের প্রতি অবিচার। আমাদের দেশের বর্ণ বৈষম্য বা জাতিভেদের চেয়ে কম নয়। এও একরকম মর্যাদাক্রম বা পদপর্যায়ের প্রবঞ্চনা।

নার্সারি স্কুল

শিশুশালা বা শিশু শিক্ষা ও পালনের প্রতিষ্ঠান, যাকে আমরা নার্সারি স্কুল বলি তার পত্তন খুব বেশী আগের নয়। শিশুর সাধারণ স্কুলে যাবার আগে যে শিক্ষা ও মানসিক গঠন তা সংসারের সবার সঙ্গে মিলে মিশেই হতো। তাতে ফল যে খারাপ হতো এমন কথা বলবার সাহস আমাদের নেই। বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে জার্মানিতে ফ্রোয়েবেল সাহেব এবং তারও অনেক পরে ইটালির মারিয়া মণ্টেসারি শিশু শিক্ষার নূতন যুগের সূচনা করলেন। ফ্রোয়েবেলের শৈশব সুখের ছিল না। এক বছর বয়সের আগে মাকে হারান। বিমাতার কাছে আদর যত্ন পাননি। তাই পরে লিখেছিলেন :

"at the beginning of my boyhood, I already felt utterly lonely and my soul was filled with grief."

বাল্যেই আমার জীবন নিঃসঙ্গ ও দুঃখে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এই দুঃখ থেকে উত্তরকালে Kindergarten বা শিশু উদ্যানের জন্ম। খেলার মাধ্যমে শিশু তার প্রথম শিক্ষার দিনগুলি কাটাবে তাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। তাঁর নিজের জীবদ্দশায় শিশু উদ্যানের সফলতা দেখে যেতে পারেননি, কিন্তু সেই শিশুশিক্ষার ধারা পরে সারা জগৎ মেনেছিল।

ডাঃ মারিয়া মণ্টেসারির কাহিনী ভিন্ন। তিনি ইটালীতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসার ডিগ্রি লাভ করেন। সে দেশের চিকিৎসার ডিগ্রিতে প্রথম মহিলা তিনি। পিছিয়ে পড়া বাচ্চাদের শিক্ষায় তাঁর সফলতা দেখে casa del bambwi বা ছোটদের ক্রেশে স্কুল-এর ভার তাঁকে দেওয়া হয়। সেখানেও তাঁর প্রণালীর কার্যকারিতা দেখে ডাঃ

মণ্টেসরির শিশু শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ হলো। মণ্টেসরিকে ফ্রোয়েবেলের মত নিষ্ঠুর প্রতিবাদ সহ্য করতে হয়নি সত্য, কিন্তু তাঁরও প্রচুর সমালোচনা আছে। শিশুকে আত্মবিকাশে সাহায্য করা শিক্ষয়িত্রীর কাজ। তিনি পিছনে থাকবেন, কিন্তু শিশু নানা জিনিসের সাহায্যে আত্মবিকাশ করবে, জীবনের আগামী দিনের জন্য নিজের প্রস্তুতিই তাকে স্বাবলম্বী করবে, মারিয়া মণ্টেসরীর মত তাই। দৈনন্দিন করণীয় যা কিছু, শিশু ধীরে ধীরে আয়ত্ত করবে তবে শিক্ষার ভিত সম্পূর্ণ হবে।

নিন্দা বা প্রশংসা যাই হক নার্সারি এবং কিণ্ডারগার্টেন আজকের শিশু শিক্ষায় বিশেষ স্থান লাভ করেছে। এমনকি কোথাও কোথাও নার্সারির পূর্বাবস্থায়ও শিশু play group-এ সবার সঙ্গে মিলে মিশে থাকবার শিক্ষা পাবে এমন ব্যবস্থার বিশেষ সমর্থক।

আমাদের দেশের বড় বড় শহরে বহু নার্সারি স্কুল হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে নার্সারি স্কুলের যা দক্ষিণার বহর তাতে ধনী সমাজের শিশু ভিন্ন অন্যের স্থান হওয়া শক্ত। শুনেছি নার্সারি স্কুল সম্বন্ধে সরকারের আইনকানুন কড়া নয়। কাজেই একটা ব্যবসায়ী মনোভাব নিয়ে নার্সারির শিশু শিক্ষার সূত্রপাত অন্তত কোন কোন ক্ষেত্রে অসম্ভব নয়। অথচ নার্সারির প্রয়োজনীয়তা যদি মেনে নি তবে নার্সারিই মানব জীবনের প্রথম দায়িত্ব গ্রহণের শিক্ষক। নার্সারির শিক্ষয়িত্রী মায়ের স্থান পূর্ণ না করলেও, প্রায় মার মতই তাঁর দায়িত্ব। কোন ক্ষেত্রে তার চেয়েও বেশী। সার্থক শিক্ষয়িত্রী শিশুর ঘরের খবর, তার সুখ দুঃখ, বাপ মায়ের খবর জানবেন, তবেই শিশুর আচরণ সম্বন্ধে সম্যক উপলব্ধি করতে পারবেন। যত আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাই হক না কেন, শিশুদের ভালবাসতে পারাই শিক্ষাদানের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্য চিরকালের। স্বাভাবিক, সহজাত স্বভাব। যে কালে মানুষ ফ্রোয়েবল বা মণ্টেসরিকে জানেনি, সেকালেও তাই ছিল শিশুপালনের সবচেয়ে বড়কথা। শিশুর তত্ত্বাবধানের ধারা নিয়ে যাঁরা নিয়ত নিযুক্ত তাঁদের উপর মন্তব্য প্রকাশের অধিকার কতটা আমাদের আছে জানি না, কিন্তু তাঁরা মায়ের দায়িত্বের অংশী বলেই আমরা অনুরোধ করি গতানুগতিকভাবে আর পাঁচটা প্রতিষ্ঠানের মত শিশুশিক্ষাকে ফর্মুলায় ফেলা অনুচিত। সেখানে সহৃদয় মানবতার দাম বড় বেশী। কেবলমাত্র শিক্ষয়িত্রী বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়, মায়েরও মনে রাখা দরকার শিশুকে নার্সারিতে পাঠাতে পারলেই তাঁর কর্তব্য শেষ হয় না। নার্সারি সহায় মাত্র। মা মা-ই থাকেন। বড় শহরের চমক লাগানো বাহুল্য নিয়ে শিশু-শিক্ষার প্রতিষ্ঠানই যে সব সময় শিশুর মনের সবটা সংগ্রহ করতে পারে তাও নয়। মা এবং শিক্ষয়িত্রী দুয়ের যোগে শিশুর বিকাশ হবে এই আশা করা যায়।

ঘরে একটু বাড়তি জায়গা আছে অথবা অবসরের ব্যবহারে একটু উপার্জন, এরকম মনোভাব নিয়েই আজ পাড়ায় পাড়ায় নার্সারি স্কুল গড়ে উঠছে তা বলতে চাই না, কিন্তু দুটো টুল টেবিল পাততে পারলেই শিশু গড়া যায় না। মায়েরাও যেন না ভাবেন মোটা মাইনের নার্সারি স্কুলে শিশুকে পাঠালেই তাঁর গুরু-দায়িত্বের শেষ। শিক্ষার বহু পর্যায়েই বেচাকেনা এসেছে, শিশুমহলটুকু যেন বাঁচে।

টুকিটাকি

রুপোর জিনিসে দাগ ধরলে নরম কাপড়ে টুথপেস্ট লাগিয়ে ঘষবেন। তারপর গরম জলে সাবানের গুঁড়ো দিয়ে খুব ভাল করে ধোবেন। ঠাণ্ডা জলে ডুবিয়ে মুছে নেবেন।

Porcelain বা চীনা মাটিতে দাগ ধরলে ভিজে কাপড়ে খাবার সোডা লাগিয়ে ঘষবেন। তাতে উপকার না পেলে ভিজে কাপড়ে কয়েক ফোঁটা হাইড্রোজেন পেরক্সাইড কার্যকরী হতে পারে।

গজদন্তের জিনিসে অনেক সময় দাগ হয়ে যায়। সেই দাগের উপর লবন ছিটিয়ে আধখানা কাটা লেবু দিয়ে ঘষবেন।

স্ফটিক বা Crystal-এ দাগ হলে যখন কিছুতেই তোলা যায় না তখন তার্পিন মেশানো বস্ত্রখণ্ড ব্যবহার করে দেখবেন। অনেক ক্ষেত্রে খুব সহজেই সাফ হয়ে যাবে।

আসবাবে জলের দাগ অনেক সময় খুব বিশ্রী দেখায়। ফুলদানি, চায়ের পেয়ালা, জলের গ্লাস ইত্যাদি পালিশ করা কাঠে সাদা দাগ লাগায়। চায়ের চামচের আট চামচ ভিনিগার এক পেয়ালা ঠাণ্ডা জলে দিয়ে তাতে নরম বস্ত্রখণ্ড ডুবিয়ে দাগের উপর ঘষবেন। আর একটি উপায় পরীক্ষা করতে পারেন। জলে ভিজিয়ে ব্লটিং কাগজ দাগের উপর চিপ্টে দেবেন। ঐ Blotting Paper-এর উপর কম গরম ইস্ত্রি আস্তে আস্তে চালাবেন। তা সত্ত্বেও দাগ থেকে গেলে কয়েক ফোঁটা অ্যামোনিয়া মেশানো গরম জলে কাপড় ডুবিয়ে দাগ ঘষে চট করে আসবাব পালিশ করার তেলাক্ত জিনিসে কাপড় ডুবিয়ে ঘষে নেবেন।

রংএর উপর থেকে দাগ তোলার কাজ কঠিন নয় যদি দাগ পুরোনো না হয়। সাবানের গুঁড়ো গরম জলে গুলে দাগ ঘষবেন। তাতে দাগ না উঠলে সাবান জলে সামান্য অ্যামোনিয়া সংযোগ করবেন। সাবান জল ব্যবহার করে পরিষ্কার জলে ধোবেন এবং নরম বস্ত্রখণ্ডে মুছে ফেলবেন।

শ্রীমতী

রপ্তানি আয়ের লক্ষ্য ধরা হয়েছে ১৯০০ কোটি টাকা এবং তার মধ্যে নতুন ধরনের জিনিস রপ্তানি করে ৫০০ কোটি টাকা আয় হবে বলে ধরা হয়েছে। কিন্তু এ জাতীয় রপ্তানি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বড় সমস্যা হচ্ছে, প্রথমত শিল্প-বিরোধ হেতু উৎপাদন হ্রাস এবং দ্বিতীয়ত রপ্তানি সামগ্রী এবং দেশের আভ্যন্তরীণ জিনিসের মধ্যে কারিগরি সামঞ্জস্যের অভাব। নতুন ধরনের জিনিস রপ্তানি করতে হলে সংশ্লিষ্ট জিনিসের বৈচিত্র্য এবং উপযোগিতা সম্পর্কে বিদেশী ক্রেতাদের সচেতন করা দরকার এবং এজন্য প্রয়োজন উপযুক্ত পরিমাণে প্রচার কার্য। ভারতীয় শাড়ী, হাতের তৈরী জিনিস, ছোটখাটো ইঞ্জিনিয়ারিং যন্ত্রপাতি, বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতির চাহিদা যদি বিদেশে বাড়াতে হয়, তবে বিদেশীদের পছন্দ অপছন্দ এবং বিভিন্ন ধরনের রুচি সম্পর্কে ভারতীয় উৎপাদকদেরও ওয়াকিবহাল থাকা দরকার। বৈদেশিক বাণিজ্য দপ্তর যে এ ব্যাপারে সচেষ্ট হয়েছেন তা ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের সম্প্রসারণের পক্ষে আশাব্যঞ্জক।

—সুব্রত গুপ্ত

জেলে। নদীর ধারেই বাস করত। তার একটা ছিপ ছিল এত বড় যে সে এপারে বসে ছিপ ফেলত আর ছিপের ডগাটা সেই ওপারের চড়ায় ঠেকে যেত।'

বক্কে বলে, 'তাহলে তোর বাপ ছিপটা রাখত কোথায়?'

শঙ্কর বলে : 'কেন? তোর বাপের গোয়ালে!'

দুই বন্ধু

বর্ষা নামলে প্রতি বছর চামনের মল্লিক সাহেব আসতেন খেপলো জাল বুনে দেবার জন্যে। তিনি আরবী ফারসী ইংরেজি সংস্কৃত বলে যেতেন জলের মতন। সুন্দর চেহারার বৃদ্ধ। এককালে নাকি তাঁদের জমিদারী ছিল। তিনি 'কেড়ে নালি' চালিয়ে জাল বুনতেন, আর আমাদের পড়া বলে দিতেন। বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতার এক গল্প পড়ছিলাম। তিনি বললেন, 'আমি একটি গল্প বলি শোন। জায়গাটা মনে কর মিশর দেশ। কাল হল ফেরাউন বা রাজা ফারাও-এর সময়। দুজন বন্ধু ছিল। একজনের নাম আক্কাশ, অন্যজনের নাম ছিল সাজ্জাদ। সাজ্জাদ মক্কায় তীর্থ ভ্রমণে যাবার আগে একশো সোনার মোহর বন্ধু আক্কাশের কাছে গচ্ছিত রেখে গেল। কথা ছিল সে দেশে ফিরে এলে তখন ফেরত দেবে। একথা কেউ জানত না। তীর্থ সেরে বছরখানেক বাদে এল সাজ্জাদ। এসে বন্ধুর কাছে গচ্ছিত রাখা অর্থ ফেরত চাইতে সে বললে, সে টাকা তো তোমাকে দিয়ে দিয়েছিলাম—তোমার মনে নেই।'

আক্কাশের কথায় সাজ্জাদের চোখ তো [illegible] গেল। বন্ধু বলে কী! তারপর তর্ক—[illegible] হাতাহাতি। সেই বিচার শেষ পর্যন্ত রাজদরবারে উঠল। রাজা সব [illegible]। কিন্তু বিচারের ফয়সালা করতে পারলেন না। অবশেষে পীর চাহার [illegible] কাছে শরণাপন্ন হলেন রাজা। পীর সাহেব সব শুনে বললেন, 'কাল এসো [illegible] নদীর ধারে, লোকজন সঙ্গে [illegible]।'

পরদিন চাহার দরবেশের হুকুমমত সকলে [illegible] বাদশা স্বয়ং এসেছেন [illegible]। দরবেশ মাঠের মাঝখানে এসে আকাশের দিকে হাত তুলে প্রার্থনা করতে [illegible], 'হে আল্লাহ্, তুমি এর বিচার কর [illegible]। আসমান থেকে তোমার শিকল [illegible]। আর দুজন বিচারপ্রার্থীর মধ্যে যে মিথ্যাবাদী তাকে আসমানে তুলে নিয়ে [illegible]।'

[illegible] হতে লাগল আকাশে—তারপর গড়গড় করে একটা মোটা শিকল [illegible] এল মাটি পর্যন্ত। সবাই বিস্মিত! [illegible] মাঝিক শনোনী শুরু হল। সাজ্জাদ [illegible] সেই শিকল ছুঁয়ে বললে, 'আল্লাহ্‌র [illegible] শপথ, আমি একশো স্বর্ণ মোহর আমার বন্ধু আক্কাশকে দিয়েছিলাম গচ্ছিত রাখার জন্য তীর্থে যাবার আগে। তীর্থ থেকে ফিরে সেই টাকা ফেরত চাইতে সে বলছে তোমাকে ফেরত দিয়েছি, কিন্তু আমি টাকা পাইনি। বন্ধু বিশ্বাসঘাতকতা করছে।'

শিকল নড়ল না। কাজেই আক্কাশের পালা এবার। সাজ্জাদ মিথ্যাবাদী নয় তাহলে। এইবার আক্কাশকে আসমানের শিকল তুলে নিয়ে যাবে। হাজার হাজার লোক অধীর প্রতীক্ষায় আছে। পীর সাহেব ইঙ্গিত করলেন আক্কাশকে। সে বন্ধুর হাত ধরে তাকেও শিকলের কাছে আনলে। তার হাতের লাঠিটা সাজ্জাদের হাতে ধরতে দিয়ে আক্কাশ শিকলে শুধু হাত কেন মাথা পর্যন্ত ঠেকিয়ে বলতে লাগল : 'হে আল্লাহ্‌, তুমি সর্বশক্তিমান, তুমি মহাজ্ঞানী, তোমার অবিদিত নেই কিছুই। বন্ধু সাজ্জাদের একশত সোনার মোহর আমি নিয়েছিলাম এবং তা তাকে দিয়েও দিয়েছি। সে টাকা এখন তার কাছেই।'

গড়গড় করে শিকল উঠে চলে গেল আসমানে—আক্কাশকে শুধু একটা সাপটা মেরে মাটিতে ফেলে দিয়ে গেল—তাকেও নিয়ে গেল না। মাটি থেকে উঠে পড়েই সাজ্জাদকে ধরতে দেওয়া লাঠিটা ছিনিয়ে নিয়ে আক্কাশ মিথ্যা সন্দেহের অপমানের শোধ নেবার জন্যে পীর সাহেব অথবা বাদশাহ কাউকেই সালাম অভিবাদন না জানিয়েই নিজের ঘরে চলে গেল অবজ্ঞা দেখিয়ে।

তাজ্জব ব্যাপার! কে তাহলে দোষী? পীর সাহেব মাথা হেঁট করে ভাবতে লাগলেন। দুজনেই তো অপরাধী নয় দেখা গেল। আগের ঘটনায় অপরাধীকে শিকল জড়িয়ে ধরে তুলে নিয়ে যেতে দেখা গেছে।

কোনো মীমাংসা হল না। কিন্তু ফারাও ছিলেন ধূর্ত। তিনি আক্কাশকে ডেকে পাঠালেন এবার। বললেন, 'আক্কাশ তুমি শিকলের সাপটা খেয়েছিলে, কাজেই দোষ গেল সেটা আল্লাহর তরফ থেকে তোমার প্রতি তিরস্কার। গোপন ব্যাপার কী এমন ঘটিয়েছিলে আমাকে বলতে হবে। যদি সত্যিবাদী হও তবে অবশ্যই পুরস্কার পাবে।'

আক্কাশ তখন বললে, 'হুজুর, টাকা আমি নিয়েছিলাম। কিন্তু যখন শিকলে হাত দিই তখন একশো মোহর আমি যে লাঠির মধ্যে পুরে রেখেছিলাম সেই টাকা-ভরা লাঠি বন্ধুর হাতে দিয়েছিলাম। কাজেই গচ্ছিত টাকা যে তার কাছে ফেরত গেছে তখন সেটা সত্য। অবশ্য সে তা জানত না বলেই আল্লাহর তিরস্কার খেলাম। আমি মিথ্যাবাদী নই জাঁহাপনা! পরে আমি লাঠিটা নিয়ে নিই।'

রাজা ফারাও হা হা করে হেসে উঠে আক্কাশকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।—'বাহবা বেটা! এমন লোকই তো আমার চাই—রাজনীতি তোমার দ্বারা হবে। তোমাকে প্রধান উজির করে দিলাম আজ থেকে।'

পীর চাহার দরবেশ এ ঘটনা শুনে আকাশে হাত তুলে বললেন : 'হে আল্লাহ্‌, তুমি আর মানুষের বিচার পৃথিবীতে করো না—করো কিয়ামতের পর হাসরের ময়দানে। মানুষ ফেরেববাজ। রাজা এবং রাজনীতি সেই ফেরেববাজি, শয়তানীকে প্রশ্রয় দিয়েছে—কাজেই মানুষের পাপেই মানুষ মরুক।'

মল্লিক সাহেব বলেছিলেন, 'সেই থেকে আসমান হতে যে শিকল নামত তা নামা বন্ধ হয়ে গেল। মানুষ বিশ্বাসঘাতকতার চালাকিতে আজ উজির নাজির হয়ে নিজের পাপকে লুকিয়ে রেখে অন্যের দ্বারা মিথ্যা মহত্ত্বের ইতিহাস লিখে রেখে যাচ্ছে। পৃথিবীর অনেক দলিল তাই মিথ্যার পাহাড়। সেসব বেছে বেছে পুড়িয়ে ফেলা দরকার॥

আবদুল জব্বার

॥ ৩ ॥

শরীর যদি এন্‌জিন হয়, তাহলে তার জ্বালানী হল খাদ্য। এন্‌জিন যদি থেমে থাকে, অর্থাৎ না চলে, তাহলে জ্বালানীর অভাবে কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু শরীরের বেলাতে তা নয়। শরীরের ভেতর প্রতিনিয়তই অসংখ্য কোষের মৃত্যু ঘটছে। তাই কিছু না খেয়ে বিছানায় চুপ-চাপ শুয়ে থাকলেও মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। আবার যে দেহ যত পরিশ্রম করছে, তার দেহের ভাঙা কোষের সংখ্যাও তত বেশী। এবং তা পূরণ করতেও খাদ্যের পরিমাণ লাগবে বেশী।

খাদ্যে এবং খাদ্যে অন্তর্লীন শক্তিই, শরীরের মধ্যে পদার্থ ও শক্তি সঞ্চারের উৎস। তাই দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রমের সঙ্গে খাদ্যের হার সমানুপাতিক হওয়া অবশ্যই দরকার।

পৃথিবীর নামকরা ফুটবলের দেশ ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, বা পর্তুগালের ক্লাব-কর্মকর্তারা যখন দেশের একোণ ওকোণ থেকে উঠতি ফুটবলার খুঁজে পেতে ধরে নিয়ে আসেন, তখন প্রথমেই এই সব ফুটবলারদের অপুষ্ট দেহ নিয়ে তাদের ভীষণ সমস্যায় পড়তে হয়। কেননা এই অপুষ্ট দেহ আন্তর্জাতিক ফুটবলের পথে এক বিরাট অন্তরায়। তাই তখন কোন ফুটবল ট্রেনিং না দিয়ে, এদের শারীরিক অপুষ্টতা দূর করবার প্রয়াস আগে শুরু হয়।

এদেশে এরকম কোন ব্যবস্থা নেই। কিন্তু ফুটবলারের জীবনে খাদ্যের যে বিশেষ ভূমিকা আছে তা উপলব্ধি করার প্রয়োজন আছে। একজন ফুটবলারের জানা উচিত কখন, কতটা এবং কি কি খাদ্য তার শরীরের জন্য দরকার। যার অভাবে সে শুরুতেই ঝরে যেতে পারে।

খাদ্যের বিষয়ে আলোচনার শুরুতেই রসনা, সংস্কার, ধর্মের নির্দেশ, প্রাকৃতিক আবহাওয়া, এবং বিশেষ কোন খাদ্যে জন্ম-গত অভ্যাস ইত্যাদির কথা ভেবে দেখতে হবে। খাদ্য-বিজ্ঞান যতদূরই আজ এগোক, এগুলোকে কিন্তু কিছুতেই অস্বীকার করতে পারছে না।

আমার নিজের কথাই বলি।

বাজার আপত্তি সত্ত্বেও বিস্কুটের প্যাকেট, রসগোল্লার টিন, আমের আর লেবুর আচার, শুকনো ফল—সব কিছু স্রেফ আমার মাকে খুশী করতে, ট্রাঙ্কে ভর্তি করতে হল। বিরাট কালো রঙের স্টীলের ট্রাঙ্কটাও মায়ের অর্ডারে করান। জাহাজ ধরব কলম্বো থেকে। যাব মার্সাই পর্যন্ত। প্রায় চোদ্দ দিনের মত জাহাজে থাকতে হবে। জাহাজে কয়েকজন ভারতীয় সহযাত্রীকে আমার

অত বড় ট্রাঙ্কটার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে, নিজেকে কেমন যেন গাইয়া-গাইয়া লাগছিল।

প্রথম দিনেই খাবার টেবিলে, যা মুখে দিই তাতেই গন্ধ গন্ধ লাগে। বমি বমি পায়। দু তিন দিন একরকম কিছু না খেয়ে কাটাবার পর, চীফ স্টুয়ার্ডকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম যে ইটালিয়ান জাহাজ বলে এখানে সব কিছু রান্না হয় অলিভ তেলে। সবাই মিলে অনুযোগ করেও অলিভ তেলকে হটানো গেল না। সে যাত্রায় প্রায় চোদ্দ দিনের না খেতে পাওয়ার মাঝে ওয়েসিস ছিল ট্রাঙ্কের ভেতর মায়ের দেওয়া খাবার-গুলো। আর ঐ বিরাট স্টীল ট্রাঙ্কেরই বা তখন কি খাতির। আমি চাবি ঘুরিয়ে আস্তে আস্তে ট্রাঙ্কটা খুলছি, আর ৫।৬ জন উৎসুক নয়নে ট্রাঙ্কটাকে ঘিরে বসে আছে, কখন ট্রাঙ্কটা পুরো খোলা হবে।

বিশেষ খাদ্যে জন্মগত অভ্যাসের এ দৃষ্টান্তের পর ধরা যাক হিন্দুর গরু ও মুসলমানের শুওর খাওয়ার ব্যাপারটা। খাদ্য বিজ্ঞান যদিও বলছে, এ দুটোতেই সবচেয়ে বেশী প্রোটিন আছে এবং দামেও অন্য মাংসের চেয়ে আমাদের দেশে সস্তা। তবু ধর্মের নির্দেশ, সমাজের ভ্রূকুটি ও নিজের সংস্কার এড়িয়ে সে কিছুতেই তার খাদ্য তালিকায় এ মাংসকে স্থান দিতে পারছে না।

খাদ্যের আর একটা দিক রসনা। রান্না যদি রসনাকে উদ্দীপ্ত না করে, তাহলে খাদ্যে যতই গুণ থাকুক—তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। তাই বলে শুধু স্বাদের জন্য প্রচুর তেলমশলা যুক্ত রান্না, আমাদের পাকস্থলীর ও হজমের ব্যাঘাত ঘটাক, এটাও হতে দেওয়া উচিত নয়। এক কথায় খাদ্যগুণকে পুরো-পুরি বজায় রেখে রান্না সুস্বাদু হক। এবং এই স্বাদ সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত রুচির ওপর নির্ভরশীল।

আমাদের সমস্ত ব্যয়িত শক্তি শেষ পর্যন্ত পরিণত হয় তাপে। এবং এই তাপের পরিমাপকে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় বলা হয় ক্যালরী। আমাদের দেশে যারা দৈহিক পরিশ্রম মোটেই করেন না, তাদের শরীর সুস্থ রাখতে ২৫০০ ক্যালরীর খাদ্যতেই চলে। কিন্তু একজন ফুটবলারের ব্যয়িত দৈহিক পরিশ্রম পূরণ করতে লাগে ৩৫০০।৪০০০ ক্যালরী খাদ্যের। এবং এই খাদ্য বলতে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট, ভিটামিন, নানান রকমের লবন এবং জলকেই বোঝান হয়।

খাদ্যে এসবের পরিমিত এবং সম্মিলিত যোজনাকেই বলা হয় সুষম খাদ্য।

৩০০০ ক্যালরী খাদ্যের একটা তালিকা দিয়ে দেখানো হচ্ছে, কি খাদ্য কত পরিমাণে লাগবে।

কার্বোহাইড্রেট—৪১০ গ্রাম = ১৬৪০ ক্যালরী
প্রোটিন —১১০ গ্রাম = ৪১০ ক্যালরী
ফ্যাট (চর্বি)—১০৩ গ্রাম = ৯৩০ ক্যালরী

৬২৩ গ্রাম = ২৯৮০ ক্যালরী

এর সঙ্গে অল্প ভিটামিন, নানান রকমের এক আউন্স লবণ ও ৪ থেকে পাঁচ পাইট জল যোগ করলেই ৩০০০ ক্যালরী দাঁড়াবে।

কার্বোহাইড্রেট—উনুনের আঁচ পেতে হলে যেমন কয়লার দরকার তেমনি শরীরের সব রকমের নড়াচড়ার মূলে রয়েছে যে এনার্জি, তার প্রায় সবটুকুই পাই আমাদের খাদ্যের কার্বোহাইড্রেট থেকে। সঙ্গে সঙ্গে দেহের দরকারি উত্তাপও জোগায়।

গমের আটা, পাঁউরুটি, চাল, ভুট্টা, বার্লি, আলু, মুসুরে ডাল, মটর, বীন, সবরকমের শাকসবজি, শুকনো ফল, এবং অল্প পরিমাণে গরুর দুধ থেকে কার্বোহাইড্রেট পাওয়া যায়। এর প্রধান গুণ সহজপাচ্যতা এবং এর সবটুকুই শরীরের ভিতর দ্রুত এনার্জিতে রূপান্তরিত হয়। অনেক রকম খাদ্যের থেকেই এটা পাওয়া যায় এবং দামেও সস্তা বলে, আমাদের মত গরীব দেশে এবং গরম আবহাওয়ায় এই কার্বোহাইড্রেটই আমাদের মূল খাদ্য হওয়া উচিত।

প্রোটিন—একমাত্র প্রোটিন শ্রেণীর খাদ্য

জীবন যে-রকম

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ১৪ ॥

রাসমোহনের মুখখানা আড়ষ্ট হয়ে গেছে, এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন নিতাইয়ের দিকে। নিতাইয়ের গালে পাঁচ ছ দিনের দাড়ি, ছোট ছোট চোখ দুটো অনিদ্রা রোগীর মতন লালচে। নিতাইয়ের কিন্তু তেমন কোনো চাঞ্চল্য নেই, চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে দেয়ালে ঠেস দিয়ে। মাঝে মাঝে শুধু দেখে নিচ্ছে রাস্তার দু'দিক।

রাসমোহন বললেন, তোর শরীরটা বড্ড খারাপ হয়ে গেছে নিতাই। কি করে হলো?

মুগার চাদরের তলা থেকে নিতাই বাঁ হাতটা বার করলো, মেলে ধরলো রাসমোহনের মুখের সামনে। রাসমোহন শিউরে উঠলেন। নিতাইয়ের দুটো আঙুল বিকৃত, ভয়ংকরভাবে কুঁকড়ে আছে। সমস্ত হাতটাই অস্বাভাবিক শুকনো। কাঁধের সঙ্গে কোনো রকমে ঝুলছে।

রাসমোহন চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন একি, এখনো সারে নি?

—না। আর সারবে না। গ্যাংগ্রিন হতে যাচ্ছিল, অতিকষ্টে তার থেকে বেঁচেছি।

—ডাক্তার দেখিয়েছিলি?

—দেখিয়েছিলাম। অপারেশন করাতে বলেছিল, বলেছিল আঙুল দুটো কেটে বাদ দিতে। আমি রাজি হইনি।

—ইস, কি বিচ্ছিরি চেহারা হয়েছে তোর হাতটার!

—মানুষের দাঁতের বিষ বড় সাংঘাতিক।

রাসমোহনের মনটা খারাপ হয়ে গেল। ভোরবেলা ঘুম ভেঙে আজ একটু অন্যরকম লাগছিল, বুকের মধ্যে একটা বেশ হালকা হালকা ভাব এসেছিল তারপরই রাস্তায় বেরিয়ে এই বিশ্রী কাণ্ড।

—নিতাই, তোর এখানে ঘোরাফেরা করা ঠিক নয়। শেষকালে কি সবাইকে বিপদে ফেলবি?

—আমি আর পারছি না, রাসুদা। কাঁহাতক আর মাসের পর মাস এরকম ঘাপটি মেরে থাকা যায়! আমি জীবনটা বদলে ফেলতে চাই। ইচ্ছে করে বিয়ে থা করে ঠাণ্ডা হয়ে সংসার পেতে বসি!

—এখন না। আরও অন্তত একটা বছর যাক!

—এই এক বছর আমি করবো কি? আঙুল চুষবো?

—তুই ইয়ে ঐ বিহার টিহার সাইডে কোনো চাকরি বাকরি জোটাতে পারিস না? ওখানেই ফ্যামিলি পাততে পারিস!

—আমায় চাকরি দেবে কে? আমি কি কোনো কাজ জানি! তা বলে কি কুলিগিরি করবো? ভালো হয়ে থাকতে চাইছি বলে কি কুলিগিরিতে নামতে হবে?

—একটা দোকান টোকান তো খুলতে পারিস! ছোটখাটো হোটেল

—কে ক্যাপিটাল দেবে, আপনি দেবেন? ছাড়ুন না হাজার পাঁচেক টাকা। আর কলকাতায় আসবো না কক্ষনো!

—আমার টাকা কই রে! আমি তো ঝাঁঝরা হয়ে গেছি। যে-কটা দিন বাঁচবো, যদি কোনোরকমে চলে যায়

—আপনাদের হাত ঝাড়লেই দু' পাঁচ হাজার টাকা বেরোয়

—এখনো ও কথা বলছিস? তোদের জন্যই তো সর্বস্বান্ত হয়েছি আজ। প্রায় লাখখানেক

—আমার জন্যে?

—তবে কার জন্যে?

—দেখুন রাসুদা, আপনি কি কচি খোকা! যে আমার কথায়—

রাসমোহন তাড়াতাড়ি হাত তুলে বললেন, থাক থাক, যা হবার হয়ে গেছে। ওসব কথা আর তোমার দরকার কি? আমি তোর ভালোর জন্যই

বলছিলুম, এখানে তোর বেশী ঘোরাঘুরি করা—

—আমার ভালো আমি বুঝবো। কাল আপনার ছেলের সঙ্গে দেখা হলো। ও কোথায় চাকরি করছে?

রাসমোহন সচকিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আমার কোন্ ছেলে?

—ছোট ছেলে। দীপু। হাওড়া ব্রিজের কাছে. একটা মেয়েকে নিয়ে যাচ্ছিল, আমি দেখতে পাইনি—ও-ই আমার সঙ্গে ডেকে কথা বললো।

—কি বললো?

—এমনি মামুলি কথা, অনেকদিন আমাকে দেখেনি—আমি কোথায় ছিলাম—এইসব।

রাসমোহন হঠাৎ রেগে উঠলেন, বললেন, কিচ্ছু করে না, কোনো কাজ করে না। আমার ঘাড়ে বসে খাচ্ছে! আমার একটা ছেলেও মানুষ হলো না! কোনোরকম দায়িত্বজ্ঞান নেই—কি বললি, একটা মেয়ের সঙ্গে ঘুরছিল? লম্বা ঢ্যাঙা মেয়ে একটা?

—হ্যাঁ বেশ লম্বা। বউ হলে আপনার ছেলের সঙ্গে বেশ মানাবে।
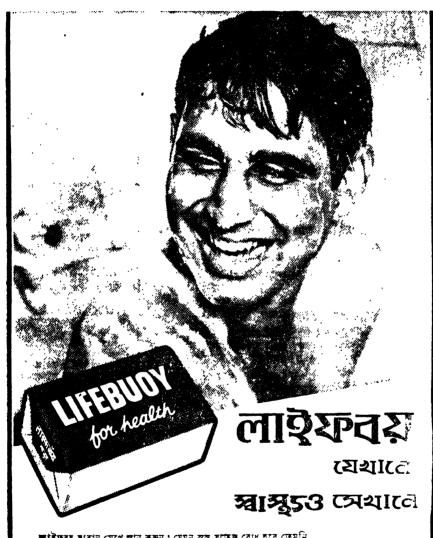
—দূরে দূরে দূরে! একটু লজ্জা ঘেন্নাও নেই আজকালকার ছেলেগুলোর! এক পয়সা রোজগারের নাম নেই, আর মেয়েছেলের সঙ্গে...বাপের পয়সায় কাপ্তেনি...এটাকেও দূর করে দেবো বাড়ি থেকে—চরে খাক, বুঝুক কত ধানে কত চাল! আমি ওর চাকরির জন্য চেষ্টা করছি, তাও বাবু...

নিতাই মৃদু মৃদু হাসছে। বুড়ো-মানুষেরা একবার বকতে শুরু করলে আর সহজে থামতে চায় না. কেউ শুনছে কিনা তাও খেয়াল নেই। নিতাইয়ের সঙ্গী একটু দূরে দাঁড়িয়ে আগাগোড়া নিঃশব্দে সিগারেট টেনে যাচ্ছে।

রাসমোহন হঠাৎ ছেলের সম্পর্কে কথা থামিয়ে বললেন, ঠিক আছে, আমি চলি এখন!

—তাহলে আমার সেই দুশো টাকা কখন পাচ্ছি?

রাসমোহন ঝাঁঝিয়ে উঠে বললেন, টাকা ফাকা কিছু হবে না! জ্বালাসনি, যা!

—রাসুদা, আমি—

—তোর যা খুশী করগে যা! আমি আর পারি না! কি কুক্ষণে যে তোদের সঙ্গে... ওঃ! এমন মুখপুড়িও করে মানুষ!

—দুশো টাকা আমার চাই-ই—

রাসমোহন মুখখানা এগিয়ে এনে দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, বলছি তো দেবো না! যা খুশী কর না! ইচ্ছে হয়তো এখানে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে সবাইকে শোনা—

রাসমোহন হনহন করে এগিয়ে চলে গেলেন। নিতাই তাঁকে থামাবার চেষ্টা করলো না. চাপা হাসি মুখে সেখানেই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। অদূরে দাঁড়ানো তার সঙ্গীটি এবার একটু চঞ্চল হয়ে তাকালো নিতাইয়ের দিকে। নিতাই কিন্তু এক দৃষ্টিতে দেখছে রাসমোহনের চলে যাওয়া।

কি চুম্বক আছে নিতাইয়ের চোখে। বেশ খানিকটা চলে গিয়েও রাসমোহন থমকে দাঁড়ালেন. যেমন দ্রুত গতিতে যাচ্ছিলেন, সেইরকম দ্রুতগতিতেই আবার ফিরে এলেন। ব্যস্তভাবে জিজ্ঞেস করলেন, আমার ছেলে তোকে চিনলো কি করে?

—বাঃ. দীপু তো আমাকে অনেকদিন ধরেই চেনে!

—কি করে চেনে, তাই তো জিজ্ঞেস করছি!

—এমনি পাড়ার ছেলে হিসেবে মুখ চেনা।

—কাল কি কথা হলো তোর সঙ্গে?

—বললুম তো, বিশেষ কিছু না। অত হুজ্জোর করছেন কেন? এমনিই, কেমন আছেন, অনেকদিন দেখিনি—এই সব!

—আমি তোকে একটা কথা বলে দিচ্ছি! তুই আমার ছেলের সঙ্গে কক্ষনো কথা বলবি না। দেখা হলেও কোনো কথা বলবি না।

—আপনি যা ভাবছেন, সে-রকম কোনো মতলব আমার নেই।

—চুপ করে থাক্! আমার ছেলেটা এমনিতে বেয়াড়া হলেও, স্বভাব-চরিত্র ভালো। তোদের মতন আজে-বাজে লোকের সঙ্গে সে মেশে আমি তা চাই না!

নিতাই এ কথাতেও রাগলো না। হালকা-ভাবে হেসে বললো, আপনার ছেলে কি আমার ফ্রেন্ড হবে নাকি? এমনি মুখ চেনা, দেখা হলে দু'-একটা কথাও বলবো না?

—না!

—ঠিক আছে. আপনি যা বললেন!

—টাকা পেলে তুই এখান থেকে চলে যাবি?

—তাই তো ভাবছি!

—দুশো পারবো কিনা জানি না। যা পারি কাল সকালে দেবো। খবরদার, আমার বাড়িতে যাবি না!!

—কাল সকালে আপনি এখানে আসবেন?

—আসবো। টাকা যোগাড় না করতে পারলে কালের বদলে পরশু। আবার বলে দিচ্ছি, বাড়ি যদি যাস্ তো— ...ভাবিস না বুড়ো হয়েছি বলে সব ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেছে! এখনও যা কব্জির জোর আছে।

—রাসুদা, আপনি রাগ করছেন! কিন্তু আমার টাকার ভীষণ দরকার। অন্য জায়গা থেকে যদি যোগাড় করতে পারতুম, তা হলে আর আপনাকে বিরক্ত করতুম না!

—যাঃ যাঃ! বুঝেছি! যে-ক'টা দিন বাঁচবো, তোদের হাত থেকে ছাড়া পাবো না! জ্বলে পুড়ে মরছি!

রাসমোহন চলে গেলে, নিতাইয়ের সঙ্গীটি কাছে এগিয়ে এলো। নিতাইয়ের দিকে একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কি মনে হলো, বুড়ো মালকড়ি দেবে তো?

—দেবে। ঠিক দেবে।

—বুড়ো কিন্তু ঝাণ্ডু আছে। বেশ হেঁকোড় বাজি করছিল। তোর ওপর চোখ রাঙালো কি রকম!

—রাসুদা আমাকে ন্যাংটোবেলা থেকে দেখছে। আমার বাবা ওর ফ্রেন্ড ছিল।

- বাবার ফ্রেন্ড হোক আর যাই হোক, টাকা যদি না দেয়

—দেবে, দেবে, না দিয়ে যাবে কোথায়।

—না দিলে তুই আমার ওপর ছেড়ে দিস্। আমি দেখাবো। বুড়ো ম্যানেজ করতে আমার খুব ভালো লাগে মাইরি।

সিগারেট টানার জন্য নিতাই চাদরের তলা থেকে এবার ডান হাতখানা বার করেছে। অস্বাভাবিক তফাত তার দুটো হাতের চেহারায়। বাঁ হাতটা গাছের মরা শুকনো ডালের মতন ঝুলেছে কাঁধের সঙ্গে, আর তার ডান হাত পেশীবহুল দৃঢ় শক্তিমান। চওড়া কব্জি, শক্ত মাসল। সে

সিগারেট এক সঙ্গে এক একটা বড় টান দিয়ে একটু সময় নিয়ে ধোঁয়া ছাড়ে।

নিতাই বললো, না, তোকে কিছু করতে হবে না। রাসুদাকে আমি চিনি, কথা দিলে কথা রাখে। তবে, আর ভাল্লাগে না ছাই! ইচ্ছে করে এসব ছেড়ে ছুড়ে এবার একটু ভদ্দরলোকের মতন থাকি।

—লাইন ছেড়ে দিবি?

—তাই তো ভাবছি। রাসুদা'র কাছে টাকা চাইবার আমার ইচ্ছে ছিল না। বড়ো-মানুষ, ওর অনেক গচ্চা গেছে।

—দ্যাখ নিতাই, সক্কালবেলা ওরকম ম্যাদামারা কথা বলিস্ নি! হাঁস যদ্দিন ডিম পাড়ছে, তদ্দিন ডিম না খাবার কোনো মানে হয়?

—তোরা খেগে যা ডিম। আমি এখন থেকে নিরিমিষ্যির লাইনে চলে যাবো। এই ঝামেলাটা যদি চুকে যায়।

নিতাইয়ের সঙ্গী হি-হি-হি করে অবহেলার হাসি হাসলো। নিতাই দিকে তাকিয়ে আপন মনে বললো, তো হাসবিই—তোদের দুটো দুটো আস্তো আছে। তা ছাড়া, মানুষের কি, তা তো টের পাস্ নি! জগন্নাথ

আমার হাতটা এমন কামড়ে ধরেছিল, ছিঁড়েই নিত দুটো আঙুল, ঐ রাসুদাই ওকে টেনে ছাড়ায়! কি সাংঘাতিক দাঁত মানুষের দাঁতে।

—ওসব কথা ভাবি নি! তোর একটা হাতই যথেষ্ট।

নিতাই সস্নেহে নিজের অক্ষত ডান হাতখানার দিকে তাকিয়ে রইলো। আস্তে আস্তে বললো, তোদের মতন দু' তিনটেকে ঘায়েল করার জন্য আমার একটা হাতই যথেষ্ট। জগন্নাথ যদি আমায় কামড়ে না ধরতো, তাহলে আমি হয়তো ওকে...

—ওসব পুরোনো কথা বাদ দে।

নিতাই সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললো, ইচ্ছে তো করে, ওসব ভুলে গিয়ে সাধারণ গেরস্তদের মতন ভালো হয়ে যাই, কিন্তু কোনো উপায় নেই, কোনো উপায় নেই!

রাসমোহন নিজের মনে বিড়বিড় করতে করতে হাঁটছেন। ভুরু দুটো কুঁকড়ে গেছে, চোখে মুখে একটা বিরক্তি। ভোরবেলার ভালো-লাগা ভাবটুকু আর একদম নেই! এখন যে-দিকে তাকাচ্ছেন, যা কিছু দেখছেন সব কিছুর ওপরই রাগ হচ্ছে।

—রাসুদা, এত—সকালে কোথায় চললেন?

বহুকাল থেকে এ পাড়ায় আছেন, পাড়ায় সবাই তাঁকে চেনে। ফুটবল খেলতেন, পাড়ার ক্লাবে এক সময় কোচ ছিলেন, তাই পাড়ার সবারই তিনি রাসুদা, অনেক বাড়ির বাবারাও তাঁকে রাসুদা, ছেলেরাও ওকে তাই।

ফিনফিনে ধুতি পাঞ্জাবি পরা ছেলেটা সকাল বেলায় মেয়ে-কলেজে পড়ায়। বছর পাঁচেক ধরে এসেছে এ পাড়ায়। রাসমোহন তার ডাক শুনেও শুনলেন না। আপন মনেই হাঁটতে লাগলেন। কিন্তু, মেয়ে-কলেজের অধ্যাপকদের পাড়ার লোকজনের সঙ্গে ভালো খাতির রাখা উচিত—এই নিয়মেই ছেলেটি আবার ডাকলো, ও রাসুদা, এত সকালে কোথায় যাচ্ছেন!

রাসমোহন এবার থেমে খুব কড়া গলায় বললেন, যাচ্ছি একটা কাজে। পিছু ডাকলে তো!

—এঃ হে, আমি বুঝতে পারি নি!

—তা তো বাপু, তোমার দাড়ি গোঁপ গজায় না। সকালবেলাতেই মাকুন্দ দর্শন।

ছেলেটির ফর্সা মুখখানা চুপসে গেল। রীতিমতন অপমানিত হয়েছে সে। কিন্তু মেয়ে-কলেজের অধ্যাপকদের বেশী রাগও দেখাতে নেই, এই নিয়ম অনুযায়ী সে আর কিছু না বলে চলে গেল।

ছেলেটি রাসমোহনের বড় ছেলে নীলাঞ্জনেরই বয়সী হবে। তাকে খানিকটা আঘাত দিতে পেরে রাসমোহন খানিকটা তৃপ্তি পেলেন। তবু রাগ অবশ্য কমলো না। নিতাইয়ের সঙ্গে দেখা হওয়ার ব্যাপারটা ভুলতে পারলেন না।

জিলিপির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে একবার ভাবলেন, এক টাকার জিলিপি কিনে বাড়িতে নিয়ে যাবেন। তারপরই মত বদলে ফেললেন। কি হবে ওদের খাইয়ে! সারা-জীবন ধরেই তো এই জোয়াল টানতে হচ্ছে। মেয়েটাকে বিয়ে দিয়েও ঘাড় থেকে নামলো না। দশটি হাজার টাকা খরচ হয়েছিল মেয়ের বিয়েতে আর সেই বাঁদর জামাইটি এখন জার্মানিতে বসে মেমসাহেব নিয়ে ফুর্তি মারছে! ওঃ, দুর্ভাগ্য কি মানুষের একটা আসে! ছেলে দুটোর একটাও বাপের কথা একবারও ভাবে না। খরচ পত্তর করে লেখাপড়া শিখিয়ে শুধু ভস্মে ঘি ঢালা হয়েছে। পাড়ারই প্রমথবাবুর তিনটি ছেলে, তিনজনই হীরের টুকরো, ভালো চাকরি করছে—বাপ-মায়ের যত্ন করে, বাড়ির দোতলার ওপর তিনতলা তুলছে, তিনজনেরই বিয়ে দিয়েছেন প্রমথবাবু নিজে দেখে শুনে। আর তাঁর নিজের—

একখানা দুখানা করে রাসমোহন গোটা চারেক জিলিপি খেয়ে ফেললেন। চা নিলেন দু' ভাঁড়। গরম গরম কচুরিও ভাজছে, সেই কচুরির ঝুড়ির দিকে কয়েকবার চোখ ফেলে খাবেন কি খাবেন না—এই নিয়ে কিছুক্ষণ দোনামনা করলেন। তারপর দুটো খাওয়াই মনস্থ করে ফেললেন, ঠিক কচুরির জন্য নয়—সঙ্গের গরম ছোলার ডালটুকুর লোভে। এক গেলাস জল খাবার পর মনটা খানিকটা ঠাণ্ডা হলো।

পাঁচ টাকার নোট ভাঙাতে গিয়ে হঠাৎ মনটা উদার হয়ে গেল। টুলটুল জিলিপি খেতে ভালোবাসে—ছেলেমেয়ের জন্য নয়, নাতনীর কথা ভেবেই এক টাকার জিলিপির অর্ডার দিয়ে বসলেন।

শালপাতার ঠোঙাটা হাতে নেবার সঙ্গে সঙ্গেই খানিকটা রস ঝরে পড়লো জামায়। আবার চড়াৎ করে রাগ চড়ে গেল! হারাম-জাদা, দেখে দিতে পারো না! নিজের ছেলে-মেয়ে, নিতাই—সবার ওপরে যে-রাগ ছিল সবটা গিয়ে পড়লো দোকানদারের ওপর। এমন চেঁচামেচি করতে লাগলেন রাসমোহন যে দোকানের সামনে ভিড় জমে গেল।

(ক্রমশ)

সৌন্দর্য আর সতেজতা সিন্থল দিয়ে অনুভব করুন

আপনি পাবেন নিখুঁত ও রমণীয় ত্বকের যাদুময়ী অঙ্গকান্তি

আপনি পাবেন দ্বিবিধ ক্রিয়াশীল সাবান — সিন্থল দিয়ে

সারাদিনের সতেজ প্রফুল্লতা সিন্থল সাবানে আছে

জি-১১ (হেক্সাক্লোরোফিন)

দুনিয়ার সবথেকে ফলপ্রদ বীজাণুনাশক

একমাত্র জি-১১ যুক্ত সিন্থল

আপনাকে সুন্দর ও সতেজ রাখে

সিন্থল হচ্ছে একটি প্রকৃত দুর্গন্ধনাশক সাবান

MEDIUM

CINTHOL

DEODORANT AND COMPLEXION SOAP

Interpub. GS/20 BN

না জাগিলে যত বঙ্গললনা......

বাঙ্গালী লেখিকা লেখনী ধরার অনেক আগেই একাধিক বাঙ্গালী-নারী সমাজ-বিষয়ক গ্রন্থ রচিত হয়—যেমন বড় বড় অক্ষরে মুদ্রিত 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক', যার তৃতীয় সংকলনের প্রকাশকাল ১৮২৪। এই গ্রন্থে সংগৃহীত হয়েছে 'পুরাতন ও ইদানীন্তন এবং বিদেশীয় স্ত্রীলোকের শিক্ষার দৃষ্টান্ত ও কথোপকথন'। ভাষাটা চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর পরে প্রকাশিত সেই 'হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা' গ্রন্থের গদ্যের চেয়ে অনেক সহজ সরল, অনেক প্রাঞ্জল।

পুস্তকের দ্বিতীয় অংশে স্ত্রীলোকের বিদ্যাভ্যাসের প্রমাণ। আমরা দেখি : 'দুষ্মন্ত রাজা যে নামাক্ষরের সহিত অঙ্গুরীয় দিয়াছিলেন, তাহা (শকুন্তলা) আপনি পড়িয়া তাহার অর্থ আপন সখী অনসূয়া ও প্রিয়ংবদাকে বুঝাইয়াছিলেন—ইহা কালিদাসকৃত অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাম নাটকে প্রমাণ আছে।' প্রথম ভাগে যে কথোপকথন পাই সেগুলি অত্যন্ত সরস, গ্রাম্য প্রবাদে পরিপূর্ণ : 'এ কি ছাগলের যব মাড়া?...কাকের বাসায় কোকিলের ছা...ঘরের খাইয়া বনের মহিষ কে তাড়াইবে?...আগে তুলা দিয়া সহাই, পাছে লোহা দিয়া বহাই......' এ সব কথাবার্তায় পূর্বোল্লিখিতা কৈলাসবাসিনীর শ্লেষও অনুপস্থিত : 'ওগো দিদি, আমরা তো গাইনী নই যে যা করিব তাই সাজিব; আমরা কোনার বৌঝি, সকলেরই পায়ের কাদা।'

আসল বিষয়টা হল নারী শিক্ষা। মেয়েদের যুক্তি শুনুন : 'ওলো, এক্ষন যে অনেক মেয়্যা মানুষে লেখা পড়া করিতে আরম্ভ করিল এ কেমন ধারা? কালে কালে কতই হবে ইহা তোমার মনে কেমন লাগে?' স্ত্রীলোক বিদ্যাভ্যাস করলে বিধবা হয় না? না, 'কোন শাস্ত্রে এমত লেখা নাই যে মেয়্যা-মানুষ পড়িলে রাড় হয়। কেবল গুরুর-লোগা মাগীরা এ কথার সৃষ্টি করিয়া তিলে তাল করিয়াছে।' কিন্তু সময়ে যে কুলোয় না : "ঘরের পাইট-ঝাইট কুটনা-বাটনা রাঁধা বাড়া দেওয়া থোয়া করিতেই দিন যায়, তবে কখন শিখিব?" উত্তর : "ওলো, যে রাঁধে

: আপনি ভারি হিংসুটে তো। শ্বেতকায় বাঙ্গালী লেখক আপনি...

সে কি চুল বাঁধে না? অতএব উহারই মধ্যে মাড়ানের গরুর ঘাস খাওয়ার মত একটু২ শিখিলে রক্ষা নাই?"

'ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা' নামে এক পুস্তিকায় বৈধব্যের কথা ছাড়া আরও তিনটি আপত্তির উল্লেখ রয়েছে : স্ত্রীজনের বিদ্যানুশীলন শাস্ত্রসম্মত নহে... পূর্বকালেও ও প্রথা ছিল না, অতএব স্ত্রীগণের বিদ্যানুশীলন লোকাচারবিরুদ্ধ... স্ত্রীলোকের এতাদৃশ বুদ্ধি নাই যদ্বারা তাহারা বিদ্যোপার্জন করিতে শক্ত হয়।'

'স্ত্রীশিক্ষাবিধানে' (১৮৫৭) দ্বারকানাথ রায় আরও কিছু ওজর-অজুহাতের কথা তুলেছেন : 'স্ত্রীলোকরা তো মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া চাকরী করিতে পারিবে না, তবে তাহাদিগের বিদ্যাভ্যাসের ফল কি? ... কামিনীগণ বিদ্যাবতী হইলে গোপনে পত্র প্রেরণপূর্বক পরপুরুষ আনিয়া মনোরথ পূর্ণ করিবে, এবং বিদ্যাভিমানে প্রমত্ত হইয়া স্বকীয় স্বামী ও পিতামাতা প্রভৃতি সমস্ত গুরুজনকে তাচ্ছিল্য করিয়া স্বেচ্ছাচারিণী হইবে..." এ ছাড়া 'কোন্ সময়ে রন্ধনাদি গৃহকর্ম সমস্ত নির্বাহ করিতে অবকাশ পাইবে?'

১৮৫১ সালে বেথুন সাহেব ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কাছে এক ইংরেজি চিঠিতে লেখেন : 'মেয়েদের স্কুল যাঁরা চালান, তাঁদের কাছ থেকে প্রায়ই এই অভিযোগ আসে, মেয়েদের উপযোগী একটিও বাংলা কবিতা নাকি নেই। (...) অনেকের মুখে শুনেছি, জীবিত বাঙ্গালী কবিদের মধ্যে আপনি অন্যতম অগ্রণী লেখক—এই উদ্দেশ্যে কিছু কবিতা রচনায় আপনি যদি আত্মনিয়োগ করেন, তবে মহদুপকার সাধিত হয়। (...) বলাই বাহুল্য, এ ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার শ্লথ বা দূষিত চিন্তা, কিংবা অশোভন উক্তি সর্বপ্রযত্নে বর্জন করা বিধেয়। আপনাদের খ্যাতনামা লেখকদের কেউ কেউ উক্ত স্খলন থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত নন বলে শুনেছি—এজন্যেই কথাটা উল্লেখ করলাম।'

পরিশিষ্ট হিসেবে এমন সব গ্রন্থের কথা বললুম যেগুলো নারী-সমাজকে উদ্দেশ করেই রচিত হয়েছে, যেমন 'অনুতাপিনী নবকামিনী নাটক'; নামপত্রে নিবেদন : 'কত্ত সহ্য করিয়াছি গ্রন্থ বিরচনে। কত্ত সহ, রসমারি, কর অধ্যয়ন/ পাঠান্তে যদ্যপি হয় পাঠক প্রীতি মতি/সফল হইল শ্রম, ভাবিব, সুবন্ধি।'

এই পর্যন্ত বলে থামলাম—করতালির অপেক্ষায়। আর এগোতে ইচ্ছে ছিল না, অন্তত আপাতত নয়। আধুনিকাদের সমাচার আধুনিক কালের ছেলেমেয়েরা কি আর রাখে না? আমি শুধু আমাদের প্রপিতামহীদের কথা আজকের শ্রোতাদের কাছে বলতে চেয়েছিলাম : এঁদের কাছে দুদণ্ড বসে থেকে এখনো আনন্দের ভাগ মেলে, মেটে অনেক কৌতূহল, ঘটে বিচিত্র রসোপভোগ।

করতালি কিন্তু এল না, এল এক অভিযোগ : "আপনি ভারি হিংসুটে তো! শ্বেতকায় বাঙ্গালী লেখক আপনি—দক্ষিণরঞ্জনের মতো আপনার পূর্বসূরী ●

প্রতিদ্বন্দ্বী হল। ম্যালেন্সের নাম পর্যন্ত **উল্লেখ করবেন** না?...জেনে রাখবেন বাংলা সাহিত্যে প্রথম য়ুরোপীয় লেখক আপনি নন; প্রথম য়ুরোপীয় লেখক হলেন এক লেখিকা: 'করুণা ও ফুলমণি'র ইংরেজ লেখিকা।' অভিযোগকর্তা, বলা বাহুল্য, আসলে এক অভিযোগকর্ত্রী।

করুণা ও ফুলমণি

মিসিস ম্যালেন্স অবশ্য পুরোপুরি ইংরেজ নন; তিনি ছিলেন এক সুইস পাদ্রির কন্যা, হয়ে উঠলেন এক ইংরেজ পাদ্রির বউ। তাঁর জন্ম কলকাতায় ১৮২৬ সালে; মৃত্যুও কলকাতায়। তাঁর পঞ্চত্রিংশৎ বৎসরব্যাপী জীবনের মাত্র পাঁচ বছর তিনি কাটিয়েছেন বাংলা দেশের বাইরে। 'করুণা ও ফুলমণি'র রচনাকালে (১৮৫২) তাঁর বয়স ছিল ছাব্বিশ। বইটা খৃস্টীয় সমাজে এত জনপ্রিয় হয়ে উঠল যে, ইংরেজী ছাড়া আরও বারোটি ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হল। মূল গ্রন্থকে দেখার সুযোগ পেলাম উত্তরপাড়ার লাইব্রেরিতে, গ্রন্থাগারের অমায়িক অধ্যক্ষের পরোপকারী সৌজন্যে।

এক ইংরেজী ভূমিকায় লেখিকা তাঁর এই উপদেশমূলক পুস্তকটির অন্তর্গত কুড়িটি শেখার বিষয় উল্লেখ করেছেন, যেমন—স্বামীর প্রতি ব্যবহার, কুসংস্কার বর্জন ঋণগ্রহণের কুফল, বাইবেলের ব্যক্তিগত অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা তথা মিতব্যয়ের উপকারিতা ইত্যাদি...। এই ইত্যাদিটা লেখিকার মূল রচনাতেই বর্তমান। 'করুণা ও ফুলমণি' শুধু [অনেক ক্ষেত্রে অবান্তর] ছোট ছোট ছবির দ্বারা অলংকৃত নয়, তাঁর কর্মজীবনে লেখিকা নিজেই যা দেখেছেন এবং তাঁর বিভিন্ন বন্ধু পাদ্রি-বউয়ের কাছে যা শুনেছেন সেই সব ছোট ছোট ঘটনা দিয়েও চিত্রিত। আর সেগুলো যদিও এক কাল্পনিক যোগসূত্রে শৃংখলিত, তবুও বইটাকে বোধহয় উপন্যাস বলাটা যুক্তিযুক্ত নয়। মিসিস ম্যালেন্সের রচনাকে তৃতীয় কিংবা দ্বিতীয় শ্রেণীর উপন্যাস না বলে [আর, য়ুরোপে প্রকাশিত প্রথম সত্যকার উপন্যাসের দেড় শো বছর পরে মুদ্রিত সেই নীতিগর্ভ বইটি যদি উপন্যাসও হয় তা হলে নিশ্চয় নড়বড়ের উপন্যাস হতে পারে না], বরং সুলিখিত, সুচিন্তিত চিত্তাকর্ষক, গল্পচ্ছলে রচিত এক সার্থক পাঠ্যপুস্তক বললে তার যথার্থ মর্যাদা নির্ণীত হয়।

লেখিকার ভাষার প্রধান গুণাবলী নেতিবাচক: নেই আরবী-ফারসী কিংবা আভিধানিক শব্দ, নেই দীর্ঘ সমাস ও জটিল সন্ধি, নেই গুরুচণ্ডালী দোষ...। সবচেয়ে আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য কিন্তু লেখার ভঙ্গী— অর্থাৎ গদ্যছন্দ। লোকে নাকি বলে বিদ্যা-

: আমি উত্তর দিই : কষ্ট করে

সাগরই বাংলা গদ্যছন্দের শ্বাসপর্ব-স্বার্থ-পর্বের আবিষ্কারক। মিসিস মালেন্স কিন্তু সেই আবিষ্কারের জন্য অপেক্ষা করেননি। তাঁর লেখার ভঙ্গি সম্পূর্ণ আধুনিক: পড়তে কোথাও বাধে না, কোনো বাক্য একবার ছাড়া দু-বার পড়তে হয় না [বাইবেলের উদ্ধৃতি ছাড়া]। যে-কোনো একটা সুদীর্ঘ বাক্য ধরুন, যেমন প্রথম অধ্যায়ের শেষ বাক্যটা: 'ইংকালে আমার স্বামী পল্লীগ্রামে তাম্বুতে আছেন, ইহা জানিয়া আমি শোকাকুল ও ভাবিতা হইতে লাগিলাম, কিন্তু ঈশ্বরীয় যে-বাক্য সুন্দরী আপন মাতাকে স্মরণ করিতে বলিয়াছিল, তাহা আমার মনে পড়িলে আমি তদ্দ্বারা সান্ত্বনা পাইয়া স্বচ্ছন্দে শয়ন করিলাম...' স্বচ্ছন্দেই আমরা কি পড়ি না বাক্যটা—এক শত বর্ষাধিক পূর্বে এক বিদেশিনীর হস্তে রচিত এই কথামালা?

তিন শো পাতার বইটিতে অনাবধানতা-জনিত অসামঞ্জস্য অতি বিরল: সাত আর দশ বছরের বাচ্চার মুখে 'অত্যুত্তম' এবং 'আশ্চর্যান্বিতা' এই দুটি দুরূহ শব্দ বসানো হয়েছে; সাধারণ ও সম্মানাত্মক সর্বনামের যুগ্ম ব্যবহারে বউ মুমূর্ষু স্বামীকে সম্বোধন করে, 'আপনি কি জন্য নরকে যাইবেন? না, না, ঈশ্বর তোমাকে নরকে ফেলিয়া দিবেন না...' এদিকে 'শত্রুর প্রতি প্রেম করা' এবং 'ঈশ্বরের স্থানে প্রার্থনা করা' ধরনের বাক্য অধুনা অপ্রচলিত।

লেখিকা মোটেই রক্ষণশীল নন; তাঁর মতে শ্বশুর ও ভাশুরের প্রতি যে অত্যন্ত লজ্জা করা, ইহা বাঙ্গালী স্ত্রীদের একটি বড় মন্দ রীতি'। তাঁর বাইবেলের ব্যাখ্যাতেও তাঁর প্রগতিশীলতা সুস্পষ্ট: 'ঈশ্বর যখন আদমের নিমিত্তে হবাকে সৃষ্টি করিতে চাহিলেন, তখন তিনি এমত বলিলেন না, 'আমি আদমের গৃহকর্ম চালাইবার কারণ একজন দাসী সৃষ্টি করিব', কিংবা তাঁহার পক্ষে সন্তান উৎপত্তি করিতে এক স্ত্রীকে সৃষ্টি করিব। তিনি এমন কথা না বলিয়া ইহা বলিলেন, 'আমি আদমের নিমিত্তে একজন উপযুক্ত সহকারিণীকে সৃষ্টি করিব'।"

গ্রন্থটির পাত্রপাত্রীরা অশিক্ষিত খ্রীষ্টীয় গ্রামবাসী। লেখিকার ধারণা [অবশ্যই ভ্রান্ত তবু তখনকার দিনে কোনো কোনো খ্রীষ্টান মহলে প্রচলিত ধারণা]: 'দেবপূজক' প্রভৃতি অখ্রীষ্টান মাত্রই নরকগামী; তাদের মধ্যে যাদের সত্যকার সুমতি আছে—যেমন প্যারী বলে সেই হিন্দু ধাই, আর মেমের সেই মুসলমান আয়া—তারা নাকি খ্রীষ্টের বাণী অবগত হওয়ার সুযোগ পেলে খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করবেই। এদিকে 'করুণা ও ফুল-মণি' একান্ত প্রচারধর্মী হলেও তাতে কৌতুক রসের অভাব নেই: স্ত্রীর কাছে অপ্রত্যাশিত-ভাবে আন্তরিক অভ্যর্থনা পেয়ে 'মাতাল স্বামী আহাকে কিছু মাত্র চিনিতে না পারিয়া বিছানাতে শুইয়া আপনা আপনি বলিতে লাগিল: এ বেটী বড় ভালো মানুষ, ইহার ঘরে বরাবর আসিব।'

এই উদ্ধৃতির সঙ্গেই বোধ হয় ভাষণে ইতি টানা উচিত ছিল। আর একটা কথা কিন্তু উল্লেখ না করে পারলাম না; কথাটা লেখিকা কাহিনীর বিদেশিনী মুখপাত্রীর মুখে বসিয়েছেন, কিন্তু আসলে তাঁর ক্ষেত্রে—আর আমারও ক্ষেত্রে—খাটে: 'অতিশ্রম-পূর্বক বাঙ্গালী ভাষা শিক্ষা করিয়াছি...।'

আর সত্যি, যখনই কেউ আমাকে শুধোয়, 'এত সুন্দর বাংলা লিখতে শিখলেন কি করে?...' আমি উত্তর দিই, 'কষ্ট করে'।

বনে ভূত না মনে ভূত

আমাকে অনেকেই জিজ্ঞেস করেন, দেশ-বিদেশ তো অনেক ঘুরলেন, বয়সও হয়েছে, অতিপ্রাকৃত অলৌকিক কিছু দেখেছেন কি? সোজা বাঙলায় ভূত, প্রেত, মামদো (মানুষ মরে ভূত হয় এটা ইসলাম অস্বীকার করে কিন্তু কোনো কোনো হিন্দুর বিশ্বাস "অয়, অয় Zানতি পারো না। মুহম্মদী মানুষ—অর্থাৎ মুসলমান—মরে গিয়ে মামদো হয়—মুহম্মদী শব্দ গ্রাম্য বাঙলায় হয়ে গিয়েছে মামদো"। এ-স্থলে Zানতি কথাটা ঠিক ঠিক ব্যবহৃত হয়েছে—কারণ মামদো বলুন, ভূত বলুন, এনাদের তো চট করে চোখে দেখা যায় না—অতএব এনারা আছেন, ওনারাও আছেন, শুধু আমরা Zানতি পারি না। এবং অন্যান্য বিভিন্ন জাতবেজাতের ভূতের কোনো একটা আমি দেখেছি কি না?

জর্মন ভাষার দুটি শব্দ বাঙলায় বেশ চালু হয়ে গিয়েছে। একটা "কিনডারগারটেন" আরেকটা—যদিও অতখানি চালু না—"কিনডারপেসট্", পশুচিকিৎসক মাত্রই চেনেন। আরেকটি শব্দ প্রচলিত হওয়ার বড়ই প্রয়োজন—"পলটারগাইস্ট্"। ভূতুড়ে বাড়িতে যে দমাদ্দম ইঁটপাটকেল এবং মাঝে মধ্যে কচু পাতায় মোড়া নোংরা বস্তুও বর্ষিত হয় সেটি করেন পলটারগাইস্ট। "পলটারনে" ক্রিয়ার অর্থ দুদ্দাড় দুমদাম শব্দ করা আর গাইস্ট্=ইংরিজি গোস্ট্ (ghost)।

এর থেকে আরেকটা তত্ত্ব সুস্পষ্ট হয়। ভূত প্রেত সম্বন্ধে দেশবিদেশের যেখান থেকেই হোক না কেন, কোনো গুজব, জনরব—এক্ষুনে গুজোরব—পৌঁছন মাত্রই সরল মানুষ সঙ্গে সঙ্গে সেটা বিশ্বাস করে ফেলে এবং সেই নয়া ভূতকে অবিচারে জাতে তুলে নেয়। ইংরেজের মত অবিশ্বাসী (অনবিলীভিং টমাস) জাতও তাই তার দুশমন জরমন জাতের পলটারগাইস্ট্কে আলিঙ্গন করে আপন ভাষায় স্থান দিয়েছে। বিশ্বাস না হয়, যে কোনো ইংরিজি দিক-সুন্দরীর (যে সুন্দরী নারী দিক দেখিয়ে দেন, অর্থাৎ ডিক্শনারী) আশ্রয় গ্রহণ করে সন্দেহ ভঞ্জন করুন। প্রেতসিদ্ধ কোনো কোনো গুণিন নাকি ভূতপ্রেতকে দিয়ে অনেক-কিছু কাজকর্ম করিয়ে নেন। মহাত্মা কালীপ্রসন্ন তাঁর নকশাতে এঁদের সম্বন্ধে সবিস্তর তাজ্জব বয়ান দিয়েছেন। কোনো কোনো পীর সাহেবও নাকি এখনো এই অলৌকিক তিলিসমাৎ দেখাতে পারেন। শীতকালে বোম্বাই আম, যে-কোনো কালে কাবুলী মেওয়া পয়দা করতে পারেন।

দুঃখের বিষয়, মহাকবি গ্যোটের সেই সুন্দর কবিতাটি আমি ভুলে গিয়েছি। যদ্দুর মনে পড়ছে তাতে এক চেলা পরিপূর্ণ ভূতসিদ্ধ হওয়ার পূর্বেই উচাটন মন্ত্রে ভূতকে আবাহন জানায়। তারপর কি একটা হুকুম করে—খুব সম্ভব জল আনতে—তারপর ভূত জল আনছে তো আনছেই, জলে জলে ছয়লাপ। ওদিকে বিপদ হয়েছে কি, চেলা কিন্তু গুরুর কাছ থেকে শেষ উচাটন মন্ত্রটি যেটি দিয়ে ভূতকে ঠেকাবে, সেটি শেখার পূর্বেই চলে এসেছে। এখন বন্যার জলে ডুবে মরে আর কি!... শেষটায় কাতরকণ্ঠে সে গুরুকে স্মরণ করলো। গুরু এসে ভূতকে হুকুম দিলেন, "আমি এসব চ্যাংড়াদের গুরু। প্রথমে আমার মোক্ষম হুকুম শোনো। তারপর অন্য কাজ।" এই বলে তিনি ভূতকে অন্য হুকুম দিয়ে বন্যা বন্ধ করলেন।

কিন্তু এ-বাবদে আমাদের দেশে প্রচলিত গল্পটি এর চেয়ে ঢের ঢের ভালো।

সে-গল্পের গোড়াপত্তন ঐ একই। আমাদের গল্পেও গুরুর কাছ থেকে সম্পূর্ণ বিদ্যা আয়ত্ত করার পূর্বেই চেলা তার ভূতকে আবাহন করেছে। ভূতের সঙ্গে তার কিন্তু একটা শর্ত ছিল। ভূতকে সর্বক্ষণ কোনো-কিছু একটা কাজ দিতে হবে। সে বেকার থাকতে পারে না। কাজ না দিতে পারলে সে ওর ঘাড়টি মটকে দেবে।

অস্মদ্দেশীয় কাহিনীতে চেলা ভূতকে ডেকে বললে, "আমার জন্য একটা রাজপ্রসাদ তৈরী করে দাও।" দু মিনিট যেতে না যেতেই রাজপ্রাসাদ চোখের সামনে তৈরি। ভূত বললে "তার পরের হুকুম?" চেলা তো তাজ্জব। তাড়াতাড়ি বললে, "গোটা দশেক সুন্দরী রমণী।" ভূত কটমটিয়ে তাকিয়ে বললে, "সে তো প্রাসাদে অলরেডি রয়েছে। বুদ্দু! হেরেম ভিন্ন প্রাসাদ হয় নাকি? চেলা বললে, "তা হলে প্রাসাদের সামনে একটা হ্রদ তৈরি করে দাও।" এক মিনিটে তৈরি। ভূত শুধোলে, "তার পরের কাজ?" চেলা তখন আরো মেলাই অর্ডার দিলে। সেগুলোও ঝটপট হয়ে গেল। আর প্রতিবারেই ভূত তার কাছে এসে কটমটিয়ে তাকায়। ভাবখানা সুস্পষ্ট। কাজ না দিতে পারলে শর্তানুযায়ী তোমার ঘাড়টা কটাস করে ভাঙব। চেলা তখন পড়েছে মহা সংকটে। নূতন অর্ডার আর খুঁজে পায় না। কবি গ্যোটের চেলার মতই সে ভূতকে বিদায় দিতে জানে না। তখন হন্নে হয়ে, না পেরে, কবি গ্যোটেরই চেলার মত সে তার গুরুকে স্মরণ করলে।

এইখানেই আমাদের কাহিনী গ্যোটের কাহিনীর চেয়ে ঢের সরেস।

আমাদের গুরু তাঁর প্রাচীনতার, ফারস্ট প্রেফারেনসের দোহাই পাড়লেন না। চেলাকে বললেন, "ভূতকে হুকুম দাও, একটা বাঁশ পুঁতে।" সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেল। গুরু চেলাকে বললেন, "এবারে ভূতকে হুকুম দাও, সে যেন ঐ বাঁশ বেয়ে উপরে ওঠে। এবং উপরে ওঠা মাত্রই যেন নিচে বেয়ে নামে। ফের উপর। ফের নিচ। ফের উপর। ফের নিচ।"

গুরু চেলাকে কানে কানে বললেন, "ঐ করুক, ব্যাটা অনন্ত কাল অবধি। অবশ্য যখন তোমার অন্য-কিছুর প্রয়োজন হয় তখন

তাকে ওঠানামা ক্রমাগত করে যেতে দিয়ে সে-কাজ করাতে বলবে। তারপর ফের হুকুম দেবে, ওঠো নামো, ওঠো নামো।"

*

কিন্তু এই রহস্য।

এ-গল্পের একটা গভীর অর্থ আছে।

মানুষের মন ঐ ভূতের মত। তাকে সর্বক্ষণ কোনো কর্মে নিয়োজিত না করতে পারলে সে তোমার ঘাড় মটকাবে। ইংরিজিতে তাই প্রবাদ "অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা।" অতএব যখন যা দরকার মনকে দিয়ে তাই করিয়ে নিয়ে ফের তাকে একটা বাঁশে ওঠানামার মত মেকানিকাল কাজে লাগিয়ে দিতে হয়। মানুষ সর্বক্ষণ মনের জন্য নূতন নূতন কাজ সৃষ্টি করতে পারে না।

এইবারে, সর্বশেষে, আমি শান্তন, পাঠকের হাতে থাবো কিল।

মহাত্মাজী চরকা কাটতেন।

রবীন্দ্রনাথ আপন লেখার কপি করতেন। গোরার মত বিরাট গ্রন্থ তিনি তিন তিনবার কপি করেছেন। যদিও ঐ মেকানিকাল কর্ম করার জন্য আশ্রমে লোকাভাব ছিল না।

আইনস্টাইন ব্যালা বাজাতেন॥

ভাস্কর-শিল্পী সুরেন দে অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে সম্প্রতি তাঁর ভাস্কর্য ও লিথোগ্রাফি প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। কলকাতায় এটি তাঁর দ্বিতীয় প্রদর্শনী।

শান্তিনিকেতনে কলাবিদ্যা শিক্ষালাভ করার পরে সুরেন দে ১৯৫১ সালে ভাস্কর্য বিভাগে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন ও তারপর ১৯৬৭ সালে এক বছর জাপানের কিওটো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাস্কর্য শিল্পে গবেষণায় রত থাকেন। ভাস্কর হিসাবে দেশে ও বিদেশে তিনি নানা কাজ করেছেন—তাদের মধ্যে জাপানে ওসাকা ইবারাকি বিশ্ববিদ্যালয়, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ অ্যাকাডেমি ও গান্ধী ইনস্টিটিউট, বিশ্ব-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতার মহাজাতি সদন ও জব্বলপুরের শহীদ স্মারক নিধির কাজ উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে তিনি বিশ্ব-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাস্কর্য বিভাগের অধ্যাপক হিসাবে কাজ করছেন। প্রদর্শনীতে ২৩টি ভাস্কর্য ও ২২টি লিথোপ্রিন্টের নিদর্শন দেখা যায়।

ইণ্টারলকিং ফর্ম

কাঠ ও রঙের কাজ চোখে পড়লেও সুরেন দে প্রধানতঃ সিমেণ্ট, কংক্রীট ও প্লাস্টার অব প্যারিস ব্যবহার করেন। ভাস্করের নিদর্শনগুলি আকারে ছোট, প্রায় সবগুলিই আভ্যন্তরীণ গৃহসজ্জার উপ-যোগী—উন্মুক্ত স্থানে রাখার মত বিরাট বা মনুমেণ্টাল কোনও নিদর্শন প্রদর্শনীতে দেখা যায়নি। সুরেন দের পরিকল্পনা ও গঠনরীতিও মিশ্র, কারণ আদিম যুগের সরলতা, দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যধারা ও সম-কালীন গঠনরীতি বিভিন্ন নিদর্শনে নানা-ভাবে যেন ফুটে উঠেছে। সুতরাং ভাস্কর হিসাবে তাঁকে বিশেষ কোনও শ্রেণীভুক্ত করা কঠিন। অধিকাংশ গঠননিদর্শন দেখে মনে হয়, ভাস্কর দেশের বিভিন্ন প্রাচীন মন্দিরের গায়ে নানা খোদাই কারুকার্য তথা রিলিফের উদাহরণ দেখে বিশেষভাবে অনু-প্রাণিত হয়েছেন এবং সম্ভবতঃ সে জন্যই তাঁর ভাস্কর্যে এ জাতীয় কাজই অধিক দেখা যায়। বলা বাহুল্য, এক হিসাবে এগুলি দ্বি-আয়তনিক কারণ ঠিক ত্রি-আয়তনিক বৈশিষ্ট্য এ জাতীয় কাজে চোখে পড়ে না। এগুলি খোদাই করা ও দেওয়ালে বা প্রাচীরে প্রাচীর ভাস্কর্য হিসাবেই শোভা পেতে পারে। ভাস্করের খোদাইয়ের হাত পাকা। কয়েকটি কাজে আবার সমকালীন ধারার পরিচয় পাওয়া যায়। কেবলমাত্র আকারের ওপর প্রাধান্য দিয়ে আকারকেই বিভিন্নভাবে ভেঙে ও পুনর্গঠন করে ভাস্কর তাঁর মনোভাব প্রকাশ করতে চেয়েছেন—যেমন ইণ্টারলকিং ফর্ম। কয়েকটি কাজে শিল্পীর কমপোজিশন বোধের সন্ধান মেলে। এগুলির অধিকাংশই সিমেণ্ট কংক্রীট গঠিত ও একাধিক মূর্তি ও সুসমবদ্ধ কমপোজিশনের মধ্য দিয়ে শিল্পী এগুলির রূপদান করেছেন। এই প্রসঙ্গে টুওয়ার্ডস কসমস, প্রসেসন, মে ডে এবং বিশেষ করে উই আর ফর পীস উল্লেখ-যোগ্য। বর্তমান জটিল ও নানা সংঘাত-জর্জরিত জীবনে সকলেই মনেপ্রাণে শান্তি কামনা করেন। একটি ছোট পরিবারের সকলেই ভগবানের উদ্দেশে আকাশের দিকে বাহু মেলে যেন এই শান্তিলাভের জন্যই আকুতি জানাচ্ছে—শেষোক্তটিতে ভাস্কর এটিই ব্যাখ্যা করেছেন। ওপরের অংশবিশেষ ঈষৎ দুর্বল হলেও পরিকল্পনা, আয়তনিক বৈশিষ্ট্য ও গঠনরীতির দিক থেকে এটি সকলের চোখে পড়ে। আর একটি ছোট নিদর্শন অনেকের ভাল লাগে—দি ইউনিয়ন। ম্যাকোরেট জাতীয় হলেও ছোট এই রঙের কাজ পরিকল্পনা এবং কোণ ও রেখাভিত্তিক গঠনরীতির দিক থেকে প্রশংসা দাবি করতে পারে। তবে বার্ড ও ডেভিলস আইজ—সম্পূর্ণ পৃথক শ্রেণীর এবং দুটিই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথমটির আলংকারিক বৈশিষ্ট্য চোখে পড়লেও দুটির মধ্যেই আদিম যুগের গঠনধারার পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যান্য নিদর্শনের মধ্যে ভেজি-টেবল ফর্মস ও সাঁওতালের নাম করা যায়, যদিও দ্বিতীয়টিতে রামকিংকরের কিছু প্রভাব ধরা পড়ে।

সুরেন দে-র লিথোপ্রিন্টগুলিও মিশ্র শ্রেণীর—অর্থাৎ বিমূর্ত, সবিমূর্ত ও

মনোলাইট রিফ্লেকশন

ফিগারেটিভ জাতীয় রচনা প্রিন্টগুলিতে ফুটে উঠেছে। বিশেষ করে গভীর লাল রঙের পরিপ্রেক্ষিতে কালো, প্রতীকমূলক ও রেখাপ্রধান প্রসেশন প্রিণ্ট হিসাবে প্রদর্শনীতে একটি প্রাচীর চিত্র ছাড়া দশটি প্রধান মনোলাইট রিফ্লেকশনও উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন প্রিণ্টের মধ্য দিয়ে শিল্পীর সম-

কালীন রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। পরিকল্পনার দিক থেকে কয়েকটি বাস্তবিকই সুন্দর—যেমন দি কিস, ডান্স ও বিশেষ করে টর্সো। আরও একটি পিসের নাম করা চলে—ল্যাণ্ডসকেপ।

*

শিল্পী অরূপ মুখার্জিও আকাডেমি গ্যালারীতে তাঁর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। প্রদর্শনীতে একটি প্রাচীর চিত্র ছাড়া দশটি কম্পোজিশন দেখা যায়।

অরূপ মুখার্জির অংকনরীতি মুখ্যত: বিমূর্ত ও তাঁর রচনা দেখে মনে হয়, তিনি আকারের ওপর অধিক প্রাধান্য দেন। তবে আকারের ক্ষেত্রেও তিনি সব স্থলে 'বিমূর্ত' রীতির আশ্রয় নেননি। কয়েকটি কম্পোজিশন দেখে মনে হয়, দেশের প্রাচীন মসজিদ বা ইমারত থেকেও তিনি এ বিষয়ে উৎপ্রেরণা লাভ করেছেন। এই জাতীয় আকারকেই তিনি নানাভাবে সাজিয়ে নতুনতর সুসম্বদ্ধ আকার সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন। রঙ যেন তাঁর কাছে গৌণ—সেজন্য অধিকাংশ স্থলেই তিনি নানা চাপা রঙ ব্যবহার করেছেন, অর্থাৎ রঙের মায়াজালে আকারের প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ হতে দেননি। অতএব শিল্পীর অংকনধারা দেখে তাঁর নিজস্ব একটা মতবাদের পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, কয়েক স্থলে আয়তনিক বৈশিষ্ট্যও প্রকাশ করেছেন। ফলে কয়েকটিতে প্রচ্ছন্নভাবে যেন স্থাপত্যকলার রূপ ও বৈচিত্র্য ফুটে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে

কম্পোজিশন-৬ উল্লেখযোগ্য। বিশেষ প্রথায় রঙ সূক্ষ্মভাবে ব্যবহার করে শিল্পী দু' এক ক্ষেত্রে বিচিত্র আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছেন, যেমন কম্পোজিশন-৮। মধ্যস্থলে কোলাজ হিসাবে ব্যবহৃত ছোট চতুর্ভুজ কাপড়ের টুকরা, লাল ও সাদা রঙের সূক্ষ্ম ব্যবহার প্রণালী ও পশ্চাদ্ভূমির কয়েক স্থলে গভীর কালো গহ্বর জাতীয় অংশ এ'কে শিল্পী কম্পোজিশনটির মধ্যে যেন প্রাচীন, পরিত্যক্ত এক আবেষ্টনীর অবতারণা করেছেন। ছবিখানির একান্ত নিঃসঙ্গতার রূপ যেন দর্শকমনকে অভিভূত করে তোলে।

শিল্পীর দুটি রচনায় অন্য রীতির সন্ধান পাওয়া যায়। তরল রঙ ফেলে বা ছড়িয়ে দিয়ে শিল্পী এ ক্ষেত্রে ইমেজারী সৃষ্টি করেছেন—অনেকটা পোস্টারের মত। এ হিসাবে ১ ও ৫নং কম্পোজিশনের শেষেরটিই চোখে পড়ে। শিল্পীর প্রাচীর চিত্রখানি নেহাত মন্দ লাগে না। এটিও আকারপ্রধান; শিল্পী নানা আকারের সঙ্গে বিভিন্ন রঙ হাল্কাভাবে ব্যবহার করে সমন্বয়ের রূপ ফুটিয়েছেন।

শিল্পীর অঙ্কনরীতি ভাল সন্দেহ নেই। তবে স্থাপত্যবৈচিত্র্য যদি তিনি রচনায় বজায় রাখতে চান, তাহলে আকার বিষয়ে তাঁকে আরও সচেতন হতে হবে। প্রাচীন স্থাপত্য গঠনধারা তথা আকারকে যদি তিনি নতুনভাবে ভেঙে বিভিন্ন আকারে প্রকাশ করতে পারেন, তবেই তাঁর রচনায় নতুনত্ব ও উৎকর্ষের সন্ধান মিলবে।

চিত্রপ্রিয়

শিল্পী জগদীশ ধর

বোম্বাইয়ের প্রখ্যাত কমার্শিয়াল আর্টিস্ট জগদীশ ধর ফরাসী সরকারের বিশেষ বৃত্তি লাভ করে উচ্চশিক্ষার্থে সম্প্রতি প্যারিস গিয়েছেন। ওখানকার ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন ইনস্টিটিউটে তিনি তিন বছর অধ্যয়ন ও গবেষণা করবেন।

শ্রীধর ফরিদপুরের প্রাক্তন নির্যাতিত দেশসেবক এবং কলকাতার দেশবন্ধু আর্ট কলেজ ও ক্যালকাটা সাইন সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীজিতেন্দ্র চন্দ্র ধরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৯৫২তে বড়বাজার শাখা মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউট থেকে স্কুল ফাইনাল পাশ করে জগদীশ ধর গভর্নমেন্ট কলেজ অফ আর্টস অ্যান্ড ক্র্যাফটে ভর্তি হন এবং ১৯৫৭তে সেখানে শেষ পরীক্ষায় কমার্শিয়াল আর্ট বিভাগে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। পরবর্তী কালে তিনি বোম্বাইয়ের কয়েকটি সুপরিচিত অ্যাডভার্টাইজিং সংস্থায় কাজ করে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। কলকাতা ও বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত একক প্রদর্শনীতে তাঁর পেইন্টিং বিশেষ প্রশংসা লাভ করেছে।
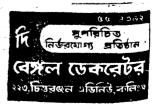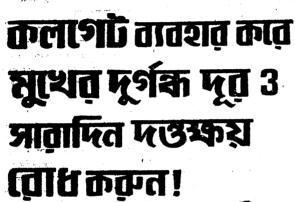
শান্তিনিকেতনের হাওয়া এবং বিশ্বভারতীর ভবিষ্যৎ

একটা মহৎ আদর্শের এবং সম্ভাবনার প্রতি বাঙালী জাতির নিঃসীম ঔদাসীন্যের এবং দায়িত্ববোধহীনতার কথা নির্দেশের জন্যে শ্রীঅশোক রুদ্র ধন্যবাদার্হ। বিশ্ব-ভারতীর বর্তমান অবস্থাকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে এবং তার কারণসমূহকে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে তিনি ভবিষ্যতের বিশ্বভারতীর রূপ সম্পর্কে যে প্রস্তাব দান করেছেন তাতে রবীন্দ্রাদর্শের প্রতি তাঁর আনুগত্যের এবং বিশ্বভারতীর বিকৃত অবস্থার জন্যে তাঁর মনস্তাপের চিহ্ন তাঁর লেখার সর্বত্র বিদ্যমান। অনেকদিন যাবৎ আমিও এ বিষয়ে ভেবে এসেছি এবং রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য কয়েকজনের সাথে কথা বলেছি যাঁরা বিশ্বভারতীর সাথে যুক্ত ছিলেন বা আছেন। মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি রবীন্দ্রাদর্শকে এঁরা যথার্থ ভালবেসে এসেছেন বলেই বিশ্বভারতীর বর্তমান অবস্থার জন্যে এঁদের অন্তর্দাহ কত গভীর। ঠিক কি কারণে রবীন্দ্রনাথের ধ্যানের শিক্ষামন্দির তার উপযুক্ত মূল্য পায়নি শিক্ষিত বাঙালীর কাছে এটা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে শ্রীঅশোক রুদ্রের মত আমারও একই কথা মনে হয়েছে—শিক্ষার বাণিজ্যিক মূল্যের প্রতি আমাদের মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্বদান। শিক্ষার বাণিজ্যিক মূল্যকে অস্বীকার নিশ্চয়ই করতে চাই না, আমার আপত্তি হল তাকেই সর্বস্ব বলে মনে করায়। যে ধারণার বশে আমরা (সংখ্যায় খুব কম নয়) Technical Institution-গুলিতে ragging-কে সমর্থন করে থাকি, একই ধারণায় বিশ্ব-ভারতীর শিক্ষাপদ্ধতি আমাদের কাছে ভুল বলে মনে হয়। সার্থক শিক্ষাকেন্দ্র হবার সর্বপ্রকার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বিশ্ব-ভারতীর শিক্ষাদর্শ যখন শিক্ষিত বাঙালীর কাছে কোন সাড়া জাগাতে পারেনি, তাতে আমাদের ধ্যান-ধারণার দিগন্ত দৈন্যই সূচিত হয়েছে অত্যন্ত প্রকটভাবে! মানসিক পূর্ণতালাভ আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়।

বিশ্বভারতীর শিক্ষাদর্শের প্রতি সাধারণ শিক্ষিত বাঙালী যেসব অভিযোগ পোষণ করে থাকেন তাদের যৌক্তিকতা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথম অভি-যোগ, বিশ্বভারতীতে শিল্পচর্চার উপর যত জোর দান করা হয় তার ফলে অধ্যয়নের স্পৃহা কমতে বাধ্য। তাহলে শিল্পসাধনার সাথে জ্ঞান সঞ্চয়ের সহাবস্থান কি অস্বীকার করব? কত জ্ঞানতাপসকে শিল্পবোধে সমান পারদর্শী হতে দেখা গেছে সে যে সংখ্যাতীত। প্রত্যেক মানুষেরই অবসর আছে এবং তার প্রয়োজনও আছে। যদি তাকে শিল্পবোধে পূর্ণ করা না যায়, সে তার দাবি অন্যভাবে মেটাবেই। তাতে সামগ্রিক ক্ষতি কার—শুধু তার একার, না তার সাথে তার সমাজেরও? বর্তমান যুগের মানুষের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা তার রুচি-বিকৃতি। এর হাত থেকে উদ্ধারের সঞ্জীবনী মন্ত্র রবীন্দ্রনাথের প্রদর্শিত সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা যা মানুষের জ্ঞানের আলোকের কাঠিন্য হরণ করবে ধ্যানের দীপ্তি দিয়ে। জীবনের সাথে শিল্পকে মেলানোই চিত্ত-বিকার থেকে মুক্তির একমাত্র পথ।

দ্বিতীয় অভিযোগ, সহশিক্ষার প্রভাবে ছেলেদের পৌরুষের প্রভাব এবং মেয়েদের প্রগলভতা। পৌরুষ বা নারীত্বের সংজ্ঞা নিয়ে মতান্তরের অবকাশ আছে নিশ্চয়ই। আর যাই হোক, টেডি বয়দের মত ব্যবহারকেই যৌবনোচিত পৌরুষের চূড়ান্ত নিশ্চয়ই বলা চলে না বা বলা চলে না গৃহকর্মনিপুণা মেয়েদের লজ্জাশীলতাকে নারীত্বের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। তবুও এই অভি-যোগের অসারতার সূক্ষ্ম বিচারে আমি যাব না, যেহেতু এই অভিযোগের সত্যতা আংশিক মেনে নিলেও একে এমন কিছু বলা চলে না যা প্রতিরোধযোগ্য নয়।

তৃতীয় অভিযোগ, শিক্ষার পরিবেশ মনোনয়নে প্রকৃতির অধিক প্রাধান্য। আমি জানি, এমন স্থলে বিচারকারীর সংখ্যা নগণ্য নয় যারা আকাশছোঁয়া অট্টালিকার শ্রীবৃদ্ধি বিস্তৃতি প্রাচুর্য দিয়ে শিক্ষায়তনের মান স্থির করে। কৃত্রিম আচ্ছাদনের বেড়াজালে মনের নিজস্ব স্বভাবকে বন্দী করায় হয়তো বা অধ্যয়নে মনোনিবেশ বাড়ে এও আংশিক সত্য। কিন্তুই এটাই একমাত্র কথা নয়, কারণ এটাই নয় শেষ কথা। অনেক মনস্তত্ত্ববিদের গবেষণার ফল, আধুনিক নগর থেকে প্রকৃতির সংস্পর্শকে যতই নির্মূল করা হচ্ছে, নগরাধিবাসীদের অপরাধপ্রবণতা ততই বৃদ্ধি পাওয়া স্বাভাবিক। সুকুমার মনের অধিকারী ছাত্রছাত্রীদেরকে প্রকৃতির স্পর্শবঞ্চিত করায় তাদের মানসিক বিকাশ কতটা রুদ্ধ হতে পারে এতো খুব বেশী অনুমানসাধ্য নয়।

বিশ্বভারতীর সম্ভাব্য প্রকৃতি নিয়ে শ্রীরুদ্র যে আলোচনা করেছেন এবার তার অবতারণা করা যেতে পারে। সাধারণ শিক্ষা-বিতরণে বিশ্বভারতীর কার্যকারিতা এবং সাফল্য সম্পর্কে লেখক যা বলেছেন তা আমি সর্বান্তকরণে স্বীকার করি। এই শিক্ষার ফলপ্রসূতা তার সর্বাঙ্গীণতা এবং ছাত্র-ছাত্রী-অধ্যাপক-কর্মীদের পারস্পরিক ভাববিনিময় ও একত্ববোধের মধ্যে দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে। অবশ্যই এই প্রমাণ হাতে-কলমে বা কাগজে-কালিতে দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু যাঁরা বিশ্বভারতীর মর্ম-কেন্দ্রে পৌঁছবার চেষ্টা করেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করে থাকবেন যে জীবন সম্পর্কে সার্বিক মূল্যবোধ এখানকার প্রত্যেক অধিবাসীর স্বভাবে-চরিত্রে, চাল-চলনে, ধ্যান-ধারণায় কিভাবে মূর্ত হচ্ছে বা হয়েছে এখানকার প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রায় এবং কর্মসূচীতে। আমার অনেক এমন দৃশ্যের কথা মনে পড়ে যেগুলোর সব বিবৃত করার অবকাশ এখানে নেই। আমি মাত্র দু একটার উল্লেখ করব। সায়াহ্নান্তে এখানকার বালক বালিকারা একত্রে কল-কাকলিতে মুখর হয়ে যখন নৈশভোজন সমাধা করতে যায়, এমন নির্মল স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দোল্লাস তো কচিৎ অন্য স্থানের এই বয়সীদের মধ্যে দৃষ্ট হয়। একইরকম আনন্দের সুর বাজে ছুটির দিনের প্রভাতী উপাসনায়, বা প্রথম প্রভাতে সংগীত ভবন

থেকে উত্থিত গানের সুরসাধনায়, বা শান্ত নিবিড় সন্ধ্যায় দ্রুত তার যন্ত্রের কোমল মূর্ছনায়। আবার ভ্রমণকারী অভ্যাগতদের প্রতি ব্যবহারেও প্রকাশ পায় একইরকমের স্বভাবমাধুর্য। শ্রীরুদ্রের সংস্কৃত দৃষ্টি প্রশংসার্হ যখন তিনি বিশ্বভারতীর ছাত্র-ছাত্রীদের পারস্পরিক সম্পর্কের মর্যাদা অনুভব করতে পারেন। ভারতবর্ষের অন্য সব বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে আমার যা অভিজ্ঞতা তাদের কোথাও সহপাঠী ছেলে-মেয়েদের মধ্যে এমন সহজ মধুর সুস্থ মেলামেশা আছে বলে আমার জানা নেই। সদ্যযৌবনপ্রাপ্তা মেয়েদের নিজেদের sex সম্পর্কে যে এক ধরনের কৃত্রিম অতি সচেতনতা বা সদ্যযৌবনপ্রাপ্ত ছেলেদের মনে নারী-পুরুষের স্থূল সম্পর্ক নিয়ে পরস্পরের মধ্যে কৃত্রিম অতিব্যবধানবোধ যা আজকাল সর্বত্রই দৃষ্ট হয় বিশ্বভারতীতে তার উল্লেখযোগ্য রকমের অনুপস্থিতি খুবই মুগ্ধ করে।

তৃতীয় মার্গের শিক্ষাক্ষেত্রে শিল্পসাধনা এবং গবেষণার স্থান হিসেবে বিশ্ব-ভারতীর যোগ্যতা নির্ধারণকল্পে শ্রীরুদ্র যে চিন্তাশীলতার স্বাক্ষর রেখেছেন তা নির্দ্বিধায় গ্রহণযোগ্য।

কিন্তু তবু সব প্রশ্নের সমাপ্তি এখানেই ঘটে না। দ্বিতীয় মার্গের শিক্ষা যার মূল্যায়ন হয় বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গীতে তার পরিবেশ বিশ্বভারতীতে হওয়া সম্ভব নয়, এ কথা মেনে নিলেও এর জন্যেই বিশ্বভারতীর বর্তমান রূপবিকৃতি এমন কথা কেউই বলবেন না, বিশেষত কারিগরী শিক্ষা যখন এখনও এখানে দেওয়া হয় না। সুতরাং বর্তমানের স্নাতকোত্তর পঠন-পাঠন বন্ধ করে দিলেই যে বিশ্বভারতী তার প্রাপ্য মর্যাদালাভ করবে এতটা আশাবাদী না হওয়াই ভাল। কারণ মূলে কথা হল, শিক্ষা এবং জীবন সম্পর্কে আমাদের মূল্যবোধের স্থূলত্বই বিশ্বভারতীর বিকৃতির মূলে দায়ী। এর সাথে আর যা সব কারণ আছে তা মূল কারণেরই রূপান্তরমাত্র। প্রথমত, বিশ্বভারতীর সাথে অধ্যাপনা এবং কর্মসূত্রে এখন যাঁরা জড়িয়ে আছেন তাঁদের অধিকাংশের নিজেদেরই এখানকার শিক্ষা-দর্শের প্রতি কোন অনুরাগ নেই। এর জন্যে এঁদের দোষ দেওয়াও চলে না। কারণ এঁরাও বর্তমান যুগেরই মানুষ এবং তাঁরা বিশ্ব-ভারতীতে নিতান্তই জীবিকার্জনের খাতিরে এসেছেন, কোন আদর্শের প্রেরণায় নয়। দ্বিতীয়ত, ছাত্রছাত্রী হিসেবে এখন যারা এখানে আসছে তাদের যোগ্যতা প্রশ্নাতীত নয়। সত্যি কথা বলতে, তাদের একটা বড় অংশ অন্যত্র প্রবেশের সুযোগ না পাওয়ার জন্যেই বিশ্বভারতীতে আসতে বাধ্য হচ্ছে। এই যেখানে অবস্থা, সেক্ষেত্রে বিশ্বভারতীকে প্রথম শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে দেখার আশা কি করে চলতে পারে? এখানে শ্রেষ্ঠ পরিবেশ আছে, মহৎ শিক্ষা পদ্ধতি আছে; শুধু প্রয়োজন কৃতী ছাত্র-অধ্যাপক (যা পাওয়া যাবে না যতদিন না আমাদের মূল্যবোধ আরও পরিশীলিত হয়)। ততদিন পর্যন্ত আমাদের মত কিছু লোক শুধু অন্তর্দাহেই দগ্ধ হতে পারি।

রবীন্দ্রাদর্শ যাদের জীবনের পাথেয় পরিশেষে তাদের পক্ষ থেকে শ্রীঅশোক রুদ্রকে কৃতজ্ঞতা জানাই গভীর এক সমস্যার সমাধানে তাঁর মহৎ প্রয়াসের জন্য।

সুনীল দাস

DEQUADIN
DEQUADIN® LOZENGES
DEQUALINIUM CHLORIDE B.P.
DEQUADIN® LOZENGES
DEQUALINIUM CHLORIDE B.P.

বিশ্ব বিজ্ঞান

৪-১০-৬৯ তারিখের "দেশ"-এর 'বিশ্ব বিজ্ঞান'-এ সুইডেনের বিজ্ঞানীর গাছের দ্রুত বৃদ্ধি ব্যাপারে নতুন আবিষ্কারের সম্পর্কে আলোচনা পড়লাম। আবিষ্কারক ডঃ বেজারকম্যান-এর মতে অক্সিজেনের স্বল্পতা হেতু উদ্ভিদ আলোক সংশ্লেষণের কাজ আরো ভালভাবে করতে পারে, তাই তার বৃদ্ধিও দ্রুত হয়।

এ-বিষয়ে আমার একটি অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরছি। ছোটবেলায় আমার বিভিন্ন রকম গাছ নিয়ে নাড়াচাড়া করার অভ্যাস ছিল। ছোট ছোট পাত্রে মাটি ভরতি করে তাতে গাছ লাগাতাম; এতে কোনো বাছ-বিচার ছিল না, জংলা গাছ থেকে আরম্ভ করে যা হাতের কাছে পেতাম, তাই লাগাতাম। তারপরে চলত তাদের ওপর আমার পরীক্ষা।

একদিন পাত্রে মাটি ভর্তি করে সেই মাটিতে ইঞ্চি তিনেক মত গভীর গর্ত করলাম, এর ব্যাস করলাম প্রায় এক ইঞ্চি। মাটি ভালভাবে ভিজিয়ে গর্তের মধ্যে কিছু সর্ষে-বীজ ফেলে দিলাম; তারপর একটা ছোট পেতলের গ্লাস উপুড় করে গর্তের মুখে চাপা দিয়ে দিলাম, গ্লাসটা মাটিতে একটু চেপে গেঁথে দিলাম যাতে হাওয়া না ঢুকতে পারে।

দু-তিন দিন পরে (অনেক দিন আগের ব্যাপার তো তাই ঠিক কদিন পরে মনে নেই।) গ্লাস তুলে দেখি গাছ বেরিয়ে গেছে, এবং তা প্রায় আধ ইঞ্চি লম্বা; কিন্তু পাতা তখনো বেরোয়নি, বীজের খোসার ভেতরেই রয়ে গেছে। কাণ্ডের রং একটু হলুদ মত; সর্ষে গাছের কাণ্ডের রং সাধারণত সবুজ কিম্বা খয়ের রঙের হয়।

আর একদিন ঐ রকম সর্ষে ফেলে গ্লাস চাপা দিয়ে রাখলাম। বেশ কয়েক দিন পরে গ্লাস তোলার পরে দেখি গাছ অন্তত চার ইঞ্চি লম্বা হয়ে গেছে, বীজপত্র দুটোও বেরিয়ে গেছে; তবে পাতার রঙও একটু হলুদ, সবুজ নয়। সাধারণভাবে এ-কদিনে আমার হাতে গাছ বড় জোর দু ইঞ্চি বাড়তো, কিন্তু এ-গাছগুলি বেড়েছিল প্রায় চার ইঞ্চির ওপর, কোন কোনটি তারও বেশী। গাছ লম্বা হলেও পাতার সংখ্যা এই দুটোই ছিল, অর্থাৎ বীজপত্র দুটো।

এখন কথা হচ্ছে, ডঃ বেজারকম্যানের মতে আলোক-সংশ্লেষণ ভাল হওয়ার জন্যই এই দ্রুত বৃদ্ধি; কিন্তু আমি গ্লাস চাপা দেওয়ার ফলে ভেতরে তো আলো ঢুকতে পারতো না, অবশ্য আমি গাছ সমেত পাত্রটা কড়া রোদেই রাখতাম। অন্ধকারে কি আলোক-সংশ্লেষণের কাজ চলে?

—স্নেহাংশু দাস
কলকাতা—৩৪

সাহিত্য পরিষদ

দেশ-এর ~ ৪৫ সংখ্যায় সনাতন পাঠক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চরিত্রের আধুনিকীকরণের যে সংবাদ পরিবেশন করেছেন তা নিঃসন্দেহে আশাব্যঞ্জক। এতদিন ধরে তরুণ সাহিত্যিকরা সাহিত্য পরিষদকে এক জরাজীর্ণ পেনসেনভোগী বৃদ্ধের মত গতিহীন বলেই মনে করতেন। আজ সেখানে প্রাণের স্পন্দন জেগে উঠছে দেখে নতুন কালের সাহিত্যিকরা উৎসাহী হবেন সন্দেহ নেই। এই প্রসঙ্গে একটা বক্তব্য রাখা যেতে পারে। সনাতন পাঠক সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত তরুণ সাহিত্যিকদের আলোচনা সভায় অংশ গ্রহণকারী যেসব সাহিত্যিকদের নাম উল্লেখ করেছেন তাঁরা সকলেই কলকাতাবাসী বলেই মনে হয়; শুধু তাই নয়, তাঁরা কোন-না কোন বৃহৎ সংবাদপত্রগোষ্ঠীর সঙ্গে চাকরিসূত্রে বা অন্যভাবে জড়িত বলেও শুনেছি। সাহিত্য পরিষদের নূতন জীবনধারা যদি মাত্র এঁদেরই মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তবে পরিষদ স্বচ্ছন্দ মুক্তগতির অধিকারী কোন দিন হতে পারবে বলে মনে হয় না। কলকাতা ও সংলগ্ন শহরগুলির সীমার বাইরে বৃহত্তর গ্রামবাংলায় অনেক তরুণ সাহিত্যসেবী আছেন, যাঁরা যেহেতু কোন বৃহৎ পত্রিকাগোষ্ঠীর দাক্ষিণ্য বা আনুকূল্য লাভ করতে পারেননি, ভাল লিখলেও সাহিত্যিক পদবাচ্য হয়ে উঠতে পারেননি। সাহিত্য পরিষদকে জীবন্ত ও জনপ্রিয় করতে গেলে এঁদেরও কোলে টেনে নিতে হবে। নইলে নগরকেন্দ্রিক সাহিত্যচিন্তার প্রতিনিধি এইসব সাহিত্যিককুলের সহস্র সাহিত্যসূচিকাভরণ প্রয়োগেও পরিষদের তথা বাংলা সাহিত্যের কালব্যাধি সারবে কি না সন্দেহ। এ সম্পর্কে সনাতন পাঠকের উক্তি প্রণিধানযোগ্য : "আর একটি ব্যাপার এই, বাংলা সাহিত্য এখন বড় বেশী নগরকেন্দ্রিক। গ্রাম বা শহরের বাইরের বৃহত্তর
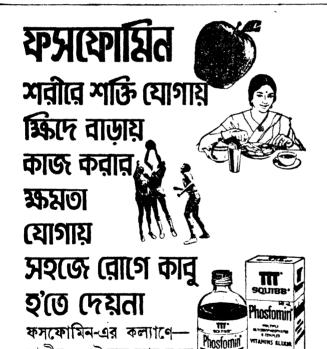
দেশ সাহিত্যে এখন অনুপস্থিত। সাহিত্য ও সাহিত্যিক এখন নগর-বন্দী। এবং নিঃসঙ্গতা মূলত শহুরে অসুখ।" মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন আশা করি।

রণজিৎ ভট্টাচার্য
কলানবগ্রাম, বর্ধমান

বাংলার চালচিত্র

বাংলার চালচিত্র-র মতন আকর্ষণীয় ফীচার, বলতে দ্বিধা নেই, এক সংখ্যা দেশ পড়া সাঙ্গ হলেই পরবর্তী সংখ্যা পড়বার জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করি। আবার সেই সঙ্গে ভয়ও হয়, এই বুঝি জব্বার সাহেব তাঁর সমগোত্রীয় কাউকে অহেতুক খোঁচা মেরে বাধা দিলেন।

এতদিন, কেন জানি না, তিনি বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলের প্রতি কটাক্ষ করতেন কিন্তু একবার ছোবল খেয়ে আলোচনা বিভাগে চিঠির মাধ্যমে দুঃখ প্রকাশ করে ও পথ প্রায় পরিত্যাগ করেছেন। তাঁর আক্রমণের পাত্র দেখছি নিরীহ সাহিত্যিকরা শ্রদ্ধেয় তারাশঙ্কর, মুস্তাফা সিরাজের পালা সাঙ্গ করে মুজতবা আলীকে ধরেছেন।

অভিযোগ, তিনি পবিত্র কোরআন শরীফের অনুবাদে ভুল করেছেন। ভুল সকলেরই হতে পারে, কিন্তু যাঁর থিসিসের বিষয়বস্তু ছিল তুলনামূলক ধর্ম; পাণ্ডিত্য সর্বজন স্বীকৃত এবং যাঁর সম্বন্ধে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'Languages and Literatures of Modern India' বইয়ে লিখেছেন, 'A volume of his experiences as a Professor in Kabul during the stormy days of Bacca-i-Saqao's coming to power after expelling Amanullah from the rulership of Afghanistan by Dr. Saiyad Mujtaba Ali (Dese-Videse), and his essays on all sorts of topics in light vein as well as his beautiful short stories all written in a language which would be the envy of any Hindu writer, are among the best things produced in Bengali in recent years' (Page 191)

তিনি সামান্য অনুবাদককর্মে ভুল করবেন বলে বিশ্বাস হয় না। বরং জব্বার সাহেব আর একবার দেখুন বহুবচনগুলি গৌরবার্থে ব্যবহৃত হয়েছে কি না।

পরিশেষে নিবেদন, জব্বার সাহেব যেন আপন লেখার প্রতি একটু বেশী নজর দেন। 'জাতিতে অর্জুন মুসলমান' (৪৪ সংখ্যা) হয় কি করে? অবশ্য অজ্ঞ মানুষ অনেক ক্ষেত্রে জাতি ও ধর্ম গুলিয়ে ফেলে, কিন্তু জব্বার সাহেব তো অজ্ঞ নন।

সোমেন চক্রবর্তী
কলিকাতা-৬

পূর্ব বাংলার লোকসংগীত

৮ নভেম্বর দেশ পত্রিকায় আলোচনায় শ্রীশরদিন্দু চৌধুরী একটি পত্রে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে কোনও একটি পুস্তক সমালোচনায় আমার ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি ছিল কিনা। পত্রলেখককে জানাই আমাদের কাছে বহু পত্রে অনেকেই জানতে চান নানা বিষয়ের সংগীত গ্রন্থ কোথায় পাওয়া যায়। এর মধ্যে লোকসংগীত সম্বন্ধীয় প্রশ্নও কম নয়। আমাদের গ্রন্থাগারগুলিতে সাধারণত সংগীত সম্বন্ধীয় বই অল্পই থাকে সুতরাং উল্লেখযোগ্য বই হাতে এলে সেগুলি যাতে গ্রন্থাগার মারফৎ প্রচারিত হয় সে অনুরোধ করলে যে এবম্বিধ শ্লেষ আমার ওপর বর্ষিত হতে পারে এমন ধারণা আমার ছিল না। কোনও বই প্রশংসা করলেই যদি তার মধ্যে কেউ উদ্দেশ্য দেখতে পান তাহলে বোধ হয় যে কোনও পত্রিকার সমালোচনা বিভাগকেই উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলতে হয়। বরং আমি ভাবছি সংগীত ব্যবসায়ীদেরই কেউ আমাকে "ভিক্টিমাইজ" করছেন না তো?

শার্ঙ্গদেব

আপনার সৌন্দর্যকে ধ'রে রাখা কি কষ্টকর ?
একেবারেই না—যদি বসন্ত মালতী আপনার প্রতিদিনের সঙ্গী হয়। ল্যানোলিন, চন্দন তেল ও নানান উপাদানে সমৃদ্ধ বসন্ত মালতী আপনার ত্বকের সব রকম ক্ষয় রোধ করে। ত্বকের ছিদ্রপথগুলি বন্ধ হ'য়ে গেলে ত্বকের পক্ষে তা'র খাদ্য গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তাই ক্রমে ত্বক শুকিয়ে আপনার সৌন্দর্য ম্লান ক'রে দেয়। বসন্ত মালতীর ব্যবহারে ত্বকের ছিদ্রপথগুলি খোলা থাকে, আর ত্বক তা'র উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করতে পেরে আপনার সৌন্দর্যের কমনীয়তা বহু বছর ধ'রে অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়। বসন্ত মালতীর সুগন্ধ সারাদিন ধ'রে আপনার মনে এক অপূর্ব মূর্চ্ছনা জাগায়।
Basant Malati
বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ, জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২
Kalpana.CKS.87.B

সমাজ চিন্তা

শতবর্ষের বাংলা। সংঘগুরু মতিলাল। প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-১২। ছয় টাকা।

'শতবর্ষের বাংলা' গ্রন্থখানি এক অর্থে বাঙালী জাতির ইতিহাস হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের প্রতিষ্ঠা তথা রামমোহন রায়ের আবির্ভাব থেকে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে বাংলা দেশের বিপ্লবী অভ্যুত্থান পর্যন্ত—সুদীর্ঘকালের বাঙালীর জাতীয় জীবনের একখানি উল্লেখযোগ্য আলেখ্যরূপে গ্রন্থখানির মূল্য অপরিসীম। আজ থেকে প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে ১৩৩০ সালে 'প্রবর্তক' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় 'শতবর্ষের বাংলা' প্রথম প্রকাশিত হয়। তারপর এই রচনার অংশ বিশেষ গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়ে তৎকালীন জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সম্প্রতি এই রচনা সামগ্রিকভাবে নতুনতর আকারে প্রকাশিত হয়েছে। এবং এই সঙ্গে বর্তমান সংস্করণের অন্তর্গত শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পালের ভূমিকাংশও সন্নিবেশিত হয়েছে।

[illegible] বাঙালী জাতির কর্ম-সাধনা এবং বাংলা দেশের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রচনায় লেখক শ্রদ্ধেয় সংঘগুরু মতিলাল যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন জাতীয় ইতিহাস রচনার পদ্ধতি হিসাবে তার একটা বিশেষ মূল্যের কথা প্রাসঙ্গিক-ভাবে প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রচলিত ইতিহাস গ্রন্থগুলিতে [illegible] বর্ণনায় যে নিরপেক্ষ তথ্যনিষ্ঠা এবং তথ্যব্যবহারে অতিরিক্ত মনোযোগ লক্ষ করা যায়—সে তুলনায় 'শতবর্ষের বাংলা' সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতিতে রচিত। তথ্য ব্যবহারের আতিশয্য এবং নিরাসক্ত বর্ণনার ক্ষেত্রে পরিহার করে বরং উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর জাতীয় জাগরণের প্রাণোত্তাপকে স্ফুটতর করতে লেখক অধিকতর মনোযোগী হয়েছেন। প্রাসঙ্গিকভাবে নানা ঘটনার উল্লেখ লেখক করেছেন, কিন্তু তিনি প্রধানত আমাদের জাতীয় ভাব ও কর্মের উদ্গাতা মহাপুরুষদের কর্মকৃতির বিচার ব্যাখ্যায় বেশী পরিমাণে আত্মনিয়োগ করেছেন। আমাদের জাতীয় জাগরণের উৎসে ধর্ম, লোকহিতৈষণা, সমাজ সংস্কার, দেশপ্রেম প্রভৃতির ভূমিকা বিষয়ে লেখকের ব্যাখ্যা সুগভীর পাণ্ডিত্য এবং মনস্বিতার পরিচায়ক। দেশের জাগরণের ইতিহাসের কথা বলতে গিয়ে স্বল্প কথায় সংঘগুরু মতিলাল রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র পাল, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ মহাপুরুষ এবং দেশপ্রেমিকের কর্মসফলতা এবং দার্শনিকভাবনা সম্পর্কে যে সব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন তা একদিকে যেমন সমগ্র জাতির কর্ম ও ভাবজীবনের আলেখ্য রচনায় সফলতা পেয়েছে, অন্য দিকে তেমনি এই সব মহাপুরুষের ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্রের অবধারণে সাহায্য করেছে। শতবর্ষের বাঙালী জীবনের ইতিহাস প্রণয়ন প্রসঙ্গে লেখক এদেশে ধর্মান্দোলন সম্পর্কে

যেসব মতামত প্রকাশ করেছেন তা লেখকের দূরদর্শিতা এবং ধর্মসম্পর্কিত স্বচ্ছ ধারণার পরিচায়ক। রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের বিচারের ক্ষেত্রেও লেখক উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক বিচক্ষণতার স্বাক্ষর রেখেছেন। ইংরেজ শাসনের সূচনাকাল, উনিশ শ পাঁচের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, এদেশের সহিংস রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মের স্বরূপ এবং তার প্রকাশ, ইত্যাদি বিষয়ে লেখকের ব্যাখ্যা একাধারে রাজনৈতিক বিবেচনাপ্রসূত এবং যুক্তিসহ। বিভিন্ন আলোচনা প্রসঙ্গে লেখক এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ লুপ্ত তথ্য পরিবেশন করেছেন যেগুলি ভাবীকালের ঐতিহাসিকদের কাজে লাগবে। এ গ্রন্থের আরেকটি বড় সম্পদ এর ভাষা। ভাষা ব্যবহারে এমন এক জাতীয় দার্ঢ্য, উচ্চকিত আবেগ এবং ঐকান্তিকতা রয়েছে যা প্রশংসাযোগ্য।

২৯৭/৬৯

পুরাতত্ত্ব

Studies in Museum and Museology in India. by D. P. Ghosh, Indian Publications, Calcutta-1. Rs. 18.00.

মোট এগারটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত আলোচ্য গ্রন্থখানিতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন যাদুঘর এবং পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। আলোচক শ্রীযুক্ত ডি-পি-ঘোষ, যিনি সুদীর্ঘকাল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা আশুতোষ মিউজিয়ামের অধ্যক্ষ ছিলেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিকভাবে যাদুঘর প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও লেখক দীর্ঘদিন নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাছাড়া, ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন সংগ্রহের ক্ষেত্রেও শ্রীযুক্ত ঘোষের ভূমিকা অনেকখানি। এই বিপুল অভিজ্ঞতার ফসল আলোচ্য গ্রন্থখানি।

বিষয়বস্তুর দিক থেকে আলোচনা-সমগ্রকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম ভাগের আলোচনা মুখ্যত ভারতবর্ষীয় যাদুঘর এবং পুরাতত্ত্ব বিষয়ে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে রচিত। ভারতবর্ষে যাদুঘর প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ও বিকাশের ধারা, এদেশে পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন সংগ্রহের প্রয়াস, এবং প্রাসঙ্গিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং উদ্যোগ ইত্যাদি যাদুঘর বিষয়ক বহুবিধ দিক নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এসব আলোচনা যাদুঘর বিষয়ে কৌতূহলী শিক্ষার্থীর কাছে আদরণীয় বলে বিবেচিত হলেও সাধারণ পাঠকও এসব রচনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়তে আগ্রহ বোধ করবেন। কেননা সব দেশের প্রাচীন কীর্তি এবং তার সংরক্ষণ বিষয়ে কিছু জানার আগ্রহ পাঠক-মাত্রেরই রয়েছে। দ্বিতীয় ভাগের বিষয়বস্তু সাধারণ পাঠককে অধিকতর আকর্ষণ করবে। এই অংশে লেখক প্রধানত পূর্ব ভারতের পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। নিম্ন বঙ্গের স্থাপত্য শিল্প, সুন্দরবনের গুপ্ত পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন, উড়িষ্যার প্রাচীন শিল্পকলা ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা লেখকের অভিজ্ঞ এবং বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় জীবন্ত চিত্রাবলীর মর্যাদা পেয়েছে। তাম্রলিপ্তের পোড়ামাটির কাজ, চন্দ্রকেতু গড়ের স্থাপত্যশিল্পের বৈশিষ্ট্য সুন্দরবন অঞ্চলের প্রাচীন কীর্তি, উড়িষ্যার শিল্পকলার বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি বিষয়ে লেখকের আলোচনারীতি একাধারে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিজাত এবং সুগভীর পাণ্ডিত্য ও মনীষার পরিচায়ক। প্রত্যেকটি আলোচনাই প্রাসঙ্গিক ইতিহাস, সমসাময়িক সাহিত্য এবং সমাজবিন্যাস পদ্ধতির পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হওয়ায় পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে মূল কীর্তির রেখাচিত্র রচনা করে লেখক আলোচনাকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। প্রাচীন নিদর্শনস্থলের মানচিত্র যোজিত হওয়ায় সাধারণ পাঠকও মোটামুটিভাবে পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা গড়ে তুলতে সক্ষম হবেন। বহুচিত্র
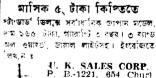
সম্বলিত এই গ্রন্থের বহুল প্রচার স্বদেশের প্রাচীন কীর্তি সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল বৃদ্ধিতে যথেষ্ট সহায়তা করবে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ২৯৭/৬৮

লোকসংস্কৃতি

লোকায়ত বাংলা। শ্রীসুনীল চক্রবর্তী। কল্যাণী প্রকাশন, ৩-ব্রিটিশ মিউজিয়াম স্ট্রীট, কলকাতা-১। আট টাকা।

সাম্প্রতিককালে বাংলা দেশে লোক সংস্কৃতি বিষয়ে বিস্তর অনুসন্ধান এবং গবেষণা চলছে। স্বদেশের প্রাচীন ঐতিহ্যের অবধারণে লোক সংস্কৃতির ব্যাপক চর্চার মূল্য অপরিসীম। লোকায়ত জীবন ধারা, সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার, পুরাতত্ত্ব, পাল পার্বণ, শিল্পকলা, ভাষাতত্ত্ব—দেশের মানুষের আত্মবিকাশ এবং অভিব্যক্তির বিগত সূত্রটিকে সন্ধান করতে হলে লোক সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা একান্তই প্রয়োজনীয়। এদিক থেকে বিচার করলে শ্রীযুক্ত সুনীল চক্রবর্তীর 'লোকায়ত বাংলা' গ্রন্থখানির একটি বিশেষ মূল্য রয়েছে। চারটি খণ্ডে বিভক্ত গ্রন্থখানিতে লেখক বাংলার লোক সংস্কৃতির একখানি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা অংকনে প্রয়াসী হয়েছেন। এই প্রয়াস সর্বাঙ্গীণ নয়। সম্ভবত, বাংলার লোক সংস্কৃতির সামগ্রিক চলচ্চিত্র রচনা লেখকের অভিপ্রেতও নয়। তবে, লোকায়ত সংস্কৃতির যেটুকু অঞ্চলে তিনি আলোকপাত করেছেন, সেক্ষেত্রে লেখকের নিষ্ঠা, পাণ্ডিত্য এবং বিচার সামর্থ্যের চমৎকার পরিচয় পাওয়া যায়। লোক সংস্কৃতির সংজ্ঞা নিরূপণে লেখক বিভিন্ন প্রখ্যাত আলোচকের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। এক্ষেত্রে নিজস্ব মতামত প্রদানে লেখক ততটা সোচ্চার হননি। ফলে এ অংশের আলোচনা লোকবৃত্তের শিক্ষার্থীর কাছে যতটা আদরণীয় হবে, সাধারণ পাঠকের কাছে ততটা আকর্ষণীয় বলে বোধ হবে না। লোক সংস্কৃতির পরিভাষা-বিষয়ক অংশটিও সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীর কাছে প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হবে। দ্বিতীয় খণ্ডে বাংলার লোক সংগীতের আলোচনায় লেখক স্বীয় বিচার শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। লোকসংগীতের উদ্ভবের উৎসে মেহনতী মানুষের আত্মপ্রকাশের ইচ্ছার যে সূত্র লেখক আবিষ্কার করেছেন তা তর্কাতীত না হলেও লেখকের বলিষ্ঠ ব্যাখ্যায় লোকসংস্কৃতির বিচারে নতুন দিগন্তের সন্ধান দেবে। তৃতীয় খণ্ডে 'রাঢ়ের পৌষ আগলানো' আলোচনাটি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। লোকচিত্রকলার আলোচনা প্রসংগে লেখক কালীঘাটের পট সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। পট নামের উৎস সম্পর্কে শ্রীচক্রবর্তী প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম সাধনা এবং তার বিবর্তনের যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাসটুকু বিবৃত করেছেন তাতে লেখকের মনস্বিতার পরিচয় রয়েছে। কালীঘাটের পটের আদি ইতিহাস, পটের বৈশিষ্ট্য, চিত্ররীতির অনন্যতা বিষয়ে লেখকের মতামত যথেষ্ট আকর্ষণীয়। এই প্রসংগে বাংলার লোকায়ত সমাজজীবনের বর্ণনা এবং ব্যাখ্যা আলোচনাকে সমৃদ্ধ করে তুলতে সাহায্য করেছে। লেখক মূলত বস্তুবাদী সমালোচক। ফলে, লোকসংস্কৃতির বিচারে বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ সমগ্র রচনায় সুস্পষ্ট। এই বিচার পদ্ধতি সর্বত্র সহিষ্ণু বা প্রশ্নাতীত নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে অতি বস্তুবাদী ব্যাখ্যা আলোচনাকে এক-দেশদর্শী করে তুলেছে। তথাপি, এই বিচার বাংলার লোকসংস্কৃতির মূল্যায়নে এক নতুনতর পদক্ষেপ। যে-কারণে লেখক সাধুবাদের যোগ্য। গ্রন্থস্থ চিত্রাবলী রচনার আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে।

২৫৩/৬৯

কার্শিয়াং অঞ্চলে 'সাগিনা মাহাতো'-র আউটডোরে (বাঁয়ে) তপন সিংহ ও সায়রা বানু (ডাইনে) দিলীপকুমার ও সায়রা বানু (নীচে) অনিল চট্টোপাধ্যায়

ফটো—দেশ

রঙ্গজগৎ

আধুনিক জার্মান চিত্র

ফিল্মে নিউ ওয়েভ এসেছে প্রায় সব দেশেই। পশ্চিম জার্মানীও বাদ নয়। আর সব দেশের নিউ ওয়েভ ফিল্মের পরিচয় মোটামুটি আমরা পেয়েছি। দেখা হয়নি শুধু পশ্চিম জার্মানীর গত দশকের ছবি। অ্যাসোসিয়েশন অব দি ফিল্ম সোসাইটিজ অব ঈস্টার্ন ইন্ডিয়াকে ধন্যবাদ, তাঁরা কলকাতায় আধুনিক জার্মান চিত্রের উৎসবের আয়োজন করেছেন। তাঁরা সহযোগিতা পেয়েছেন ম্যাক্সমুলার ভবন এবং পশ্চিম জার্মানী দূতাবাসের। গত শুক্রবার ৭ নভেম্বর জ্যোতি সিনেমায় জার্মান চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন হয়।

শ্রীসত্যজিৎ রায় ওই অনুষ্ঠানে বলেন, তরুণ জার্মান চলচ্চিত্রকারদের ছবি আমি খুব বেশী দেখিনি। সম্প্রতি বার্লিনে দুটি ছবি দেখেছি। একটি ছবি য়ুনিভার্সিটির ছাত্রদের নিয়ে, অপরটি বার্নহার্ড ভিকির। দুটি ছবিই "ভেরি ভেরি ইনটারেস্টিং"। জার্মান ছবিতেও যে নানা এক্সপেরিমেন্ট চলছে তা-ই দেখে এলাম।

ম্যাক্সমুলার ভবনের পরিচালক ডঃ জেগনার বললেন, আধুনিক জার্মান চলচ্চিত্রে নিউ ওয়েভ এসেছে সত্যি, পরীক্ষা-নিরীক্ষাও হচ্ছে বহু রকমের। কিন্তু তরুণ চলচ্চিত্রকাররা সবাই একটি বিষয়ে একমত। সে হল, 'কমিটমেন্ট টু সোসাইটি'। সমাজের প্রতি তাঁদের একটা কর্তব্য আছে। নানা রকম 'থিম' ও টেকনিকের ভিতর দিয়ে তাঁরা সেই কর্তব্য পালন ক'রে চলেছেন।

প্রারম্ভে পশ্চিম জার্মানীর কনসাল শ্রীকক স্বাগত ভাষণ দেন। পরে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শ্রীঅরুণ প্রামাণিক।

ফিল্ম সোসাইটি ও ফিল্ম ক্লাব মহলে সমসাময়িক জার্মান চিত্র নিয়ে প্রচুর উদ্দীপনা ও উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে। এবার প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও সুষ্ঠু। প্রতি ছবি দুদিন ধরে দেখানো হবে। উদ্বোধন অনুষ্ঠানের পর দুটি অল্প দৈর্ঘ্যের ছবি দেখানো হয়। একটি "ওয়াণ্ডারফুল লাইফ", অপরটি "আলাস্কা"। টেকনিকের দিক থেকে দুটি ছবিই দর্শককে নতুন অভিজ্ঞতা দিয়েছে। "ওয়াণ্ডারফুল লাইফ" আধুনিক অস্থিরতা, সুখ-অন্বেষণ ও নর-নারীর সম্পর্কের উপর একটি প্রতিভাস-চিত্র। "আলাস্কা" বুঝি মানুষের অবচেতনের ছবি। এর ক্যামেরার কাজ দেখবার মত।

নাট্য-সমালোচনা

রঙমহলে "আমি মন্ত্রী হব"

রঙমহলে "আমি মন্ত্রী হব" নাটকে বাসবী নন্দী ও জহর রায়   ফটো—দেশ

রঙমহলে আবার হাসি। অর্থাৎ "আমি মন্ত্রী হব" (রচনা : সমীর চক্রবর্তী) নামে যে নতুন নাটকটি রঙমহলে মঞ্চস্থ তার প্রধান উপজীব্য হাস্যরস। বিষয়বস্তু কী তা নামেই প্রকাশ। যাদের ব্যবসায়ী, প্রায়-অশিক্ষিত যদু দত্তর মন্ত্রী হবার সাধ নিয়েই নাটকের প্রহসন। টাকা দিয়ে ভোট কেনা ছাড়া তার গত্যন্তর নেই। প্রতিপক্ষ একটি বামপন্থী রাজনৈতিক দল। তাদের প্রচার-কার্য ও আদর্শনিষ্ঠার দরুন নাটকে অবশ্য একটা পলিটিক্যাল পরিবেশ তৈরি হয়েছে। তবে সেটা গৌণ। মুখ্য বস্তু হল কৌতুক।

এবং যেহেতু জহর রায় প্রধান চরিত্রের অভিনেতা (যদু দত্ত) তাই রঙ্গ যে বেশ জমেছে নাটকে তা বলাই বাহুল্য। স্বপ্নে ভোটেশ্বরী দেবীর দর্শন পেয়েই যদু দত্ত নির্বাচনে দাঁড়াবার প্রেরণা পান। তাঁর স্ত্রীর (সাধনা রায়চৌধুরী) মন্ত্রী-পত্নী হবার উচ্চাভিলাষ নিয়েও কমেডির উপকরণ গঠিত। তা-ছাড়া, পয়সার লোভে যাঁরা যদু দত্তর কাছে হাজির (তার শ্যালক, পাড়ার মস্তান, সেক্রেটারি, বন্ধু ইত্যাদি) তাদের নিয়েও নানা রঙ্গ। নির্বাচনে যদু দত্ত পরাজিত। দুঃসংবাদ পাবার মুহূর্তে সে একা, পুরাতন ভৃত্য কেষ্টারাম (অজিত চট্টোপাধ্যায়) ছাড়া তার কোন সঙ্গী নেই। এই সময় যদু দত্তর সংলাপে ও বিলাপে ট্র্যাজেডির সুর। কমেডির মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা জহর রায়ের আছে। দরকার হলে হাসির পার্টেও তিনি দর্শকের আবেগ ফুটিয়ে তুলতে পারেন। করেছেনও তাই। অর্থাৎ শেষের দিকে যদু দত্তকে "ট্র্যাজিক ফিগার"-এ পরিণত করতে চেয়েছেন। কিন্তু তা খুব কার্যকর হয়েছে কি? এই চরিত্র নিয়ে এত প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ ও সমালোচনা রয়েছে কিংবা চরিত্রটির উপর এত বেশী কালি ছোঁড়া হয়েছে যে পরাজিত ও প্রবঞ্চিত যদু দত্তর প্রতি দর্শকের সহানুভূতি জাগে না।

চরিত্রটি যে মন্ত্রিত্ব-প্রার্থী নয় তা বলার প্রয়োজন নেই। মন্ত্রীর যে ইমেজ তৈরি করা হয়েছে নাটকে তাতেই সেটি আরও স্পষ্ট। প্রহসনে নাকি বাস্তবের বালাই থাকে না। নতুবা এই প্রসঙ্গে অনেক প্রশ্নই করা যেত। সে যাক। বিশেষ দলের নির্বাচনপ্রার্থী ও মন্ত্রীদের নিয়ে লোকমুখে যে রসাল আলোচনা শোনা যায় "আমি মন্ত্রী হব" তারই অনুসরণে সৃষ্ট বিদ্রূপাত্মক। এই বিষয়টি তো প্রায় পচে গিয়েছে, লোককে আর কত হাসাতে পারে! তা ছাড়া নাটকের বিষয়বস্তু অকিঞ্চিৎকর, তার সামাজিক বক্তব্যও (পরোক্ষভাবে যা রয়েছে) কি দর্শককে ভাবাতে সক্ষম? তবু যে নাটকটি দেখতে দেখতে দর্শক হাসিতে ফেটে পড়ে তার মূলে রঙমহল শিল্পিগোষ্ঠীর অভিনয়-ক্ষমতা। অভিনয়ের গুণেই নাটকটি উতরে গেছে, অর্থাৎ উপভোগ্য হয়েছে। দর্শককে হাসিয়েছেন (অভিনয়ের নৈপুণ্যও দেখিয়েছেন) সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, সাধনা রায়চৌধুরী, হরিধন মুখোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, মিণ্টু চক্রবর্তী, নমিতা দে প্রমুখ। অ-কমেডি অংশে সুন্দর অভিনয় করেছেন বাসবী নন্দী। তাঁর গানও শ্রোতাদের

মৃত), অমরনাথ মুখোপাধ্যায়, তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়, মানস ঘোষ প্রমুখ।

আগেই বলেছি, অভিনয়ই নাটকটির বড় দিক, পরিচালনাও (জহর রায়-কৃত) সুষ্ঠু। গানের সুরও (শৈলেশ রায়ের দেওয়া) ভাল। আসলে নাটকটি অকিঞ্চিৎকর, মূল প্রসঙ্গ তো হাটে-বাজারে অতি আলোচিত—তাই নতুনত্বের "সারপ্রাইজ" নেই। তার উপর রয়েছে সেই সার্বিক উপাদান। যেমন, সুদখোর কষাই ধর্মদাস বৈরাগী (সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনীত) অন্তরে মহৎ, গোপনে বিপ্লবী দলকে টাকা দেয়, একটি ছেলের চিকিৎসার জন্যও অকাতরে অর্থ দান করে। এবং চরিত্রটির মহত্ত্ব বোঝাবার জন্যই বুঝি বরাবরের প্রথা অনুযায়ী ধর্মদাস নিজেকে বার বার এত খারাপ বলে।

শীশমহলে "বিদ্যাসুন্দর"

ভারতচন্দ্র তাঁর যুগে অতি নির্ভয়েই আদিরসের "বিদ্যাসুন্দর" রচনা করতে পেরেছিলেন। এ যুগের নাট্যকারের পক্ষে "বিদ্যাসুন্দর" নিয়ে মঞ্চনাটক রচনার কাজ [illegible] কঠিন, ভয়েরও বটে। ভারতচন্দ্র "বিদ্যাসুন্দর" রচনা করে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের [illegible] নির্ভয়ে দান করে গিয়েছিলেন অতি [illegible]। এ কালের নাট্যকার দর্শকের সংস্কার [illegible] করে? অতএব শীশমহলে "বিদ্যাসুন্দর"-এর নাট্যকার - পরিচালক [illegible] ভট্টাচার্যকে খুবই সন্তর্পণে আদিরস [illegible] হয়েছে। শৃঙ্গারের ছায়া একেবারেই তিনি মাড়ান নি তা নয়; এর আভাস আছে হীরা মালিনীর গানে, রাজকুমারী বিদ্যার তর্কযুদ্ধে—"আশ্লেষ কাহাকে বলে?" এই জাতীয় প্রশ্নে প্রশ্নে।

আদিরস যথাসম্ভব ছেঁটে দিয়ে নাট্যকার-পরিচালক কৌতুকের আশ্রয় নিয়েছেন, বলা যেতে পারে, আঁকড়ে ধরেছেন। এটা তেমন [illegible] হয়নি। "বিদ্যাসুন্দর" হাল্কা [illegible] কাহিনী, ভারতচন্দ্র এতে শৃঙ্গার [illegible] রসই ঢেলেছেন। তবে [illegible] এতে রয়েছে অভিশাপগ্রস্ত [illegible] ও সুন্দরের মর্ত-মিলন কাহিনী। [illegible] শুরুতে পর্দার উপর ছায়া ফেলে [illegible] সুন্দরভাবে দেখানো [illegible]—একটি চমৎকার মুখবন্ধ।

আগেই বলেছি, "বিদ্যাসুন্দর" মুলত [illegible] তাই হাসির মাত্রাও বেশী। এত বেশী যে, বিদ্যা ও সুন্দরের প্রেমকাহিনীকে [illegible] করে ফেলেছে। বর্ধমানে সুন্দরের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই নগর-সুন্দরীদের উতলা হওয়া এবং তাদের স্বামীদের কান্নাকাটি, ক্ষোভ ও দুঃখ এবং [illegible] পতিদের সংস্থা গঠনের ব্যাপারগুলি [illegible] এত বেশী বাড়াবাড়ি করা হয়েছে যে, আদিরস না হোক অন্তত বিদ্যা ও সুন্দরের কাহিনীর প্রেমরসও তেমন আস্বাদ করা গেল না। অর্থাৎ হাস্যরসাশ্রয়ে একটি সুন্দর রোম্যান্টিক নাটক দর্শকরা পেতে পারতেন, তাও পেলেন না।

শশধর মুখার্জির রঙিন হিন্দীচিত্র "সম্বন্ধ" (পরিচালনা : অজয় বিশ্বাস) এ সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে—ছবির একটি দৃশ্যে দেব মুখার্জি ও প্রদীপকুমার

নাটকে ভক্তিরসও রয়েছে, সুন্দরের উপর তাঁর ইষ্টদেবী কালীর করুণা কত বেশী তা কয়েকটি অলৌকিক ঘটনার মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। অন্য দিকে রয়েছে বর্ধমান রাজ-পরিবারের নাটক—সুন্দর ও বিদ্যার গোপন সম্পর্ক প্রকাশ হয়ে যাবার পর। সব মিলে "বিদ্যাসুন্দর" খুব সুগ্রথিত হয়েছে বলা চলে না।

দর্শকের প্রাপ্য আমোদ বলতে যা বোঝায় তা বেশি মিলেছে গানে ও নাচে। "বিদ্যাসুন্দর" মিউজিক্যাল নাটক বলা চলে, গানের সূত্রে এতে রস পরিবেষণের চেষ্টা রয়েছে। সংগীত পরিচালক সুকুমার মিত্র গানের (রাগাশ্রয়ী ও কীর্তন) সুরও দিয়েছেন সুন্দর।

চরিত্র বিশ্লেষণ কিন্তু প্রত্যেকেরই সন্তোষজনক হয়নি। বিদ্যায়ী বিদ্যা চরিত্রে প্রথম দিকে যথাযথ গাম্ভীর্য রয়েছে। পরে যখন তার মনে পূর্বরাগ, তখন চটুলতার অংশ কম থাকলে ভাল হত। অবশ্য সাধারণভাবে শমিতা বিশ্বাস এই চরিত্রে খুবই ভাল অভিনয় করেছেন। রাজকুমারীর বেশভূষায় তাঁকে দেখিয়েছে সুন্দর। রূপক মজুমদার হয়েছেন সুন্দর; সুন্দর রাজপুত্র, বিদ্বান। সুন্দর নাটকের শর্ত অনুযায়ী হীরা মালিনীর সঙ্গে রসিকতা করতে পারে, কিন্তু তা এমন হাল্কা হবে না যা সুন্দরোচিত নয়। এই ত্রুটির দিক বাদ দিলে রূপক মজুমদার রোম্যান্টিক সুন্দরকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন। সুন্দর যখন কালীভক্ত, তখন তাঁর অভিব্যক্তি স্বাভাবিক।

চমৎকার অভিনয় [illegible] মনোরঞ্জের রূপসজ্জায়। তিনি যখনই মঞ্চে উপস্থিত তখনই দর্শক উল্লসিত, তাঁর স্বাভাবিক রঙ্গব্যঙ্গ দেখে উৎফুল্ল। তার বিশেষ প্রশংসনীয় জয়শ্রী সেনের অভিনয়। হীরা মালিনীর হাস্যে লাস্যে, গানে ও নাচে তিনি জীবন্ত করে তুলেছেন। চরিত্রটির সহৃদয়তাও তাঁর অভিনয়ে ফুটে উঠেছে।

অন্যান্যদের মধ্যে সাধুবাদের উপযুক্ত অভিনয় করেছেন ভানু চট্টোপাধ্যায় (বর্ধমানের রাজা), অঞ্জলি চট্টোপাধ্যায় ও রত্না দত্ত (রাণী)। স্বাভিনয়ের জন্য কালী দাস গাঙ্গুলি, সতীশ চক্রবর্তী, অনু দত্ত, বেলা দাস প্রভৃতি প্রশংসা পাবেন।

রেকর্ড সমালোচনা

আধুনিক গান

লিভিং সাউন্ড একটি নতুন রেকর্ড কোম্পানির নাম। লিভিং সাউন্ড রেকর্ডে এবার পুজোয় আধুনিক বাংলা গান পরিবেশন করা হয়েছে। গেয়েছেন দুজন নতুন শিল্পী—শ্রাবন্তী মজুমদার (কোন্ ডেকে/আমার মনের মাঝে) ও নন্দিতা সান্যাল (কেন যে আমায়/যে মোরে ভালবাসি)। [illegible] আধুনিক গানের সুর দিয়েছেন [illegible]। শ্রাবন্তী মজুমদারের "[illegible] ডেকো" গানটির সুরে অবশ্য ভাল [illegible] পশ্চিমী ঢঙের ব্যবহার এর মধ্যে দেশী মেলোডির আমেজ আছে। শ্রীমতী মজুমদার গেয়েছেনও বেশ। শ্রীমতী সান্যালের গানও মোটামুটি একরকম।

মেগাফোন রেকর্ডে আরতি দাশগুপ্তের দুটি আধুনিক গানের (আকাশকে প্রশ্ন কর/এতখানি পথ) কথা আগের বার বলা হয়নি। গানের সুর দিয়েছেন অনুপম মুখোপাধ্যায়। "আকাশকে প্রশ্ন কর" গানে সেই সংলাপ-মেশানো টেকনিক। গানের সুরে এমনিতেই সুন্দর হয়েছিল, সংলাপ দিয়ে কারোর মেজাজ আনবার চেষ্টা না করলেও চলত। এই গানটি শ্রীমতী দাশগুপ্তা দরদ দিয়ে গেয়েছেন।

একটি অভিজ্ঞতা

অনুকূল পরিবেশে আগ্রহী সমঝদার শ্রোতৃবৃন্দের সমাবেশ ঘটলে একজন জাতশিল্পী যে নিজেকে পরিপূর্ণরূপে উদ্‌ঘাটিত করতে পারেন তার দুর্লভ পরিচয় পাওয়া গেল সেদিন কলামন্দির প্রেক্ষাগৃহের একটি মনোরম আসরে। একক শিল্পী ছিলেন ওস্তাদ আমজাদ আলী খাঁ, সংগতে ছিলেন পণ্ডিত শান্তাপ্রসাদ।

'কনোয়সরস' নামের আড়ালে আত্মপ্রচার-বিমুখ কতিপয় যুবক এই আসরের আয়োজন করেছিলেন। আমরা তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ এইজন্যে যে, একজন তরুণ গুণী শিল্পীকে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গেই তাঁরা শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে উপস্থিত করেছিলেন এবং শিল্পীও চার ঘণ্টাব্যাপী স্বতঃস্ফূর্ত মেজাজী সরোদ বাজনায় আসরকে সার্থক সাফল্যে গর্বিত করেছিলেন।

আমজাদ আলীর বাজনায় চার পুরুষের ঘরানার ঐতিহ্য প্রবহমাণ, সুতরাং তাঁর কাছে আমাদের প্রত্যাশা কিছু থাকবেই। সুখের বিষয়, সে প্রত্যাশাকে মেটাবার জন্য বিন্দুমাত্র কার্পণ্য তিনি করেননি।

প্রথমে তিনি দুর্গা রাগে আলাপ শুরু করলেন। এই রাগের একটা গাম্ভীর্যের দিক আছে, সে দিকের অল্প একটু আভাস দিয়ে তিনি দুর্গা রাগের ভাবমাধুর্যকে তাঁর মোহন অঙ্গুলীস্পর্শে ছোট ছোট কাজের মধ্য দিয়ে রূপায়িত করে চলেছিলেন। সুরের মায়াজালে একটি শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশ সৃষ্টি করে যখন তিনি শান্তাপ্রসাদের সংগতে গত ধরলেন তখন এক ঘণ্টা সময় পার হয়ে গেছে। গতের অংশে শিল্পীকে কিছুটা অস্বস্তি বোধ করতে দেখেছি। তরফের 'সা' সুরে বলছে না অনুমান করে জমে-ওঠা বাজনায় ছেদ এনে বারংবার তাঁকে সুর বাঁধতে হচ্ছিল, এক সময় তিনি তানপুরাকে থামিয়ে দেবার নির্দেশও দিলেন। আমার অনুমান, শ্রোতাদের অনুরোধে মাইক্রোফোনে তবলার আওয়াজকে আরেকটু প্রাধান্য দেবার ফলেই এই বিপত্তি। গতের অংশে জমজমা ভাব প্রায়ই ব্যাহত হচ্ছিল বলেই মনে হয়। আমজাদ আলী সোয়া এক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁর প্রথম আসরে বিরতি টানলেন। ইণ্টারভেলের পর তিনি শুরু করলেন মালকোষ।

তিন ঘণ্টাব্যাপী তিনি বাজালেন মালকোষ। ভাবগম্ভীর রাগ মালকোষ, বাজাচ্ছেন ধ্যানগম্ভীর শিল্পী আমজাদ আলী। শ্রোতাদের কাছে চিরস্মরণীয় একটি অভিজ্ঞতা। সুরের সুরধনীতে অবগাহন করে কখনো তলিয়ে যাচ্ছেন গভীরে, আবার কখনো তুলে আনছেন মীড় মূর্ছনা গমক—ছোটো ছোটো নকশায় যেন আলপনা দিয়ে চলেছেন শিল্পী।

সবচেয়ে বিস্ময়কর মনে হয়েছে আমজাদ আলীর হাতে গমকের কাজ। গমকের কাজে এঁর ঘরানা বিখ্যাত—যা অন্য ঘরে সচরাচর পাওয়া যায় না। কলাকৌশলের দিকে আমজাদ আলী যে নিষ্ঠার সঙ্গে পরিশ্রম করেছেন তার পরিচয় পাওয়া গেল তাঁর আঙুলের নানাবিধ কাজে। মালকোষের আলাপে তাঁর নিজস্ব ঘরানার ধ্রুপদী চাল তিনি তুলে ধরেছিলেন আস্থায়ী অন্তরা আভোগ সঞ্চারী দেখিয়ে। সোজা ঝালা এবং উল্টা ঝালায় তাঁর নিপুণ আঙুলের কাজ বোদ্ধা শ্রোতাদের তারিফ পেয়েছে মুহুর্মুহু। সরোদে সাধারণত অন্তরার 'সা' লাগাতে হলে অনেক পাঁয়তাড়া কষে লাগাতে হয়। কিন্তু আমজাদ আলী অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে বারে বারে ফিরে ফিরে আসছিলেন অন্তরার 'সা'-এ।

আমজাদ আলী খাঁ ফটো—দেশ

গতের অংশে সাথসঙ্গতে আসর প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল, দুনিতে তবলার না ধিন-ধিন-না-র সঙ্গে অদৃশ্য আঙুলের ঝালার কাজ যেন যাদু খেলে গিয়েছে। আমজাদ আলীর বৈশিষ্ট্য এখানেই। টেকনিক তাঁর আয়ত্তে, রাগের ভাবরূপ তাঁর অন্তরে বিরাজিত। এখন প্রয়োজন শুধু বয়স ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে যে মেজাজ আসে সেই মেজাজের—অর্থাৎ ম্যাচিওরিটির। তার উজ্জ্বল সম্ভাব্য প্রতিশ্রুতি সেদিনের আসরে তিনি রেখে গিয়েছেন।

দিকশূন্য অর্ণব

টলি-টিপ্পনী

বাংলা দেশে আজও ভাঙা ক্যামেরায় ছবি তোলা হয়। সাউণ্ড মেশিনও চল্লিশ দশকের। এই নিয়েই আমরা পৃথিবীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আজও অপরাজিত। তাই বলে অবস্থা আমাদের ফেরেনি। টেকনিসিয়ানরা যেই তিমিরে, সেই তিমিরে। শিল্পীদের মধ্যেও কি সবাই সুখে আছেন? নিশ্চয়ই না। বাংলা দেশে এমন অনেক শিল্পী আছেন যাঁদের "ড্র নেই" (ডিস্ট্রিবিউটারদের ভাষায়) বলে হাতে কাজও নেই। দিনের পর দিন স্টুডিওতে স্টুডিওতে ঘুরে বেড়ান, অনেক চটির হাফসোল ক্ষয়ে যায়, তবু ছবিতে একটা ছোটখাটো "রোল" মেলে না। ছোটখাটো শিল্পীদের কথা না-হয় ছেড়েই দিলাম, অনেক নায়ক-নায়িকার হাতেও কোন কাজ নেই। ইণ্ডাস্ট্রির এই নৈরাশ্যের পরিস্থিতির মধ্যেও কিন্তু কয়েকজন আবার রীতিমত বহালতবিয়তে আছেন। তাঁদেরই কথা যাঁরা বিশ্বাস করেন, চলচ্চিত্র হচ্ছে নিছক আমোদের উপকরণ। শুধুমাত্র "ইল্যুশান"।

প্রতিবাদ করুন আর যাই করুন, অস্বীকার করার উপায় নেই, এই ইল্যুশানে আচ্ছন্ন হয়েই আমরা বিশেষ একটা বয়সে রূপালী পর্দার নায়ক-নায়িকাকে ঘিরে অনেক অনেক রঙিন স্বপ্ন দেখি। অনেক কল্পনা, অনেক ইচ্ছা পূরণের স্বপ্নের মধ্য দিয়ে দিনে দিনে শিল্পী আমাদের আপনজন হয়ে ওঠেন। "আপন মনের মাধুরী মিশায়ে" শিল্পীকে আমরা তারকা করি। তারকার জনপ্রিয়তার উৎস আসলে এখান থেকেই। আর এখান থেকেই ফিল্মের "ক্রেজ" আমাদের মনে প্রবল হয়ে ওঠে। অনেকের সাধ হয়, "আমিও যদি রূপালী পর্দার বুকে এমনি করে হেসে-কেঁদে-ভালোবেসে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারতাম!" অনেকে আবার নামের মোহেও ফিল্মে আসতে চান। তাঁদের ধারণা, সহজে নাম-যশ-প্রতিপত্তি অর্জনের রাস্তা

পৃথিবীতে এই একটাই আছে। যে কোন কারণেই হোক, ফিল্মে অভিনয় করতে ইচ্ছুক এমন লোকের সংখ্যা বাংলা দেশে অসংখ্য। অনেক শিক্ষিত সদবংশের ছেলে-মেয়েও তাই "একস্ট্রা"-র খাতায় নাম লেখান। একস্ট্রা থেকে বড় শিল্পী হয়েছেন এমন নজিরও অবশ্য কম নেই। সেই ভরসাতেই সম্ভবত একস্ট্রার সংখ্যা বাংলা ফিল্মে দিন দিন ক্রমবর্ধমান।

—বিচক্ষ

অরণ্যদেব

লী ফক

'কিটের বন্দুক গর্জে উঠতেই
আক্রমণকারীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।
এর আগে এমন অদ্ভুত অস্ত্র
তারা দেখেনি।
ক্র্যাক্!

প্রায় পাঁচ শতাব্দী
আগেকার ব্যাপার!
ভাবতেও আশ্চর্য
লাগে!

১৪৭৪ খ্রীষ্টাব্দের অজানা ইতিহাস
ওরা পালাচ্ছে, কিট!
আবার ফিরে
আসতে পারে।
এই টিপিটার উপরে
ওঠা যাক।

অনেক কষ্টে,
এই টিপিটার উপরে
তাঁরা উঠলেন।
কাজটা যে কত
কঠিন তা আমি
নিজেই জানি,
সায়ানা।
উঃ, কত
উঁচু...
3/23

এখানে সোনা নেই ক্যারিবো। এটা নেহাতই
একটা পাথুরে টিপি। উপরটা সমতল।
তোমার নামে এই টিপির
নাম রাখলুম 'ওয়াকার্স
টেবল।'

'আক্রমণকারীরা আবার
ফিরে এসেছিল। আবার
গর্জে উঠেছিল কিটের
বন্দুক—'
বুম!
!!!

'তারপর আর কেউ এই টিপির কাছে
ঘেঁষেনি... ক্রমে একে কেন্দ্র করে
ছড়িয়ে পড়ল কিংবদন্তী...'
ভুতুড়ে
টিপি!
এখানে
যারা থাকে,
তারা...
মানুষ
নয়!

'বেশ কয়েক বছর এখানে ছিলেন
তাঁরা। গোটা অঞ্চলটাকে খুঁটিয়ে
খুঁটিয়ে দেখেছিলেন—'

'তারপর একদিন এল ফিরে
যাবার পালা—'
ক্যারিবো, এবারে
ফিরতে হবে। ক্যাপটেন
কলম্বাসকে গিয়ে জানাতে
হবে যে, সোনার শহরের
খোঁজ আমরা
পাইনি।
১১

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কংগ্রেসের ভাঙন—	-	৩২৫
ব্যঙ্গচিত্র—	-	৩২৬
রূপদর্শীর সংবাদভাষ্য—	-	৩২৭
দৃশ্যপট—শ্রীনবারুণ গুপ্ত	-	৩২৮
বৈদেশিকী—দেবরাজ	-	৩৩০
সুনন্দর জার্নাল—	-	৩৩১
আমার ছোটবেলার স্মৃতি—মীরা দেবী	-	৩৩৩
আমরা কে—কীভাবে (কবিতা) —শ্রীশরৎকুমার মুখোপাধ্যায়	-	৩৩৭
হে নিষাদ (কবিতা)—শ্রীফণিভূষণ আচার্য	-	৩৩৭
পাথরবীজ (কবিতা)—শ্রীঅমল ভৌমিক	-	৩৩৭
সারাবেলা কোথা যাও (কবিতা)—শ্রীবেণু দত্ত রায়	-	৩৩৮

সূচিপত্র

সূচিপত্র

প্রচ্ছদ—শ্রীমতী শেফালি দে

হৈ হুল্লোড়ের
ধকল সইতে
ধ্রুব'র তৈরি—
প্যাটন্স
পার্পল হেদার*
PATONS
Purple Heather
ধকল সহ্য করার মত পোশাক চাইলে
প্যাটন্স পার্পল হেদার বেছে নেবেন।
পরলে যেমন সুন্দর দেখায় তেমনি
অদ্ভুত মজবুত—বারবার ধুলেও ঠিক
নতুনের মত ভারি চমৎকার
আরামদায়ক গরম লাগে।
PURE NEW WOOL
REGISTRATION TRADE MARK
APPLIED FOR
ধ্রুব উলেন মিলস্ প্রাইভেট লিমিটেড,
বোম্বাই-১৩
সোল সেলিং এজেন্টস্:
জে. অ্যাণ্ড পি. কোটস (ইণ্ডিয়া)
প্রাইভেট লিমিটেড
*পৃথিবীর সুবিখ্যাত নিটিং উল নির্মাতা, প্যাটন অ্যাণ্ড বাল্ডউইনস্ লিঃ, ডার্লিংটন, ইউ. কে.-এর সঙ্গে ব্যবস্থা অনুযায়ী ধ্রুব তৈরি করছে।

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৭ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৪
শনিবার ৬ অগ্রহায়ণ ১৩৭৬

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার

সংযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

*

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীশীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

*

টেলিফোন
২৩-২২৮৩ ২৩-৪৫৪১

*

চাঁদার হার

কলিকাতায়

বার্ষিক	... ২৫.০০
ষাণ্মাসিক	... ১২.৫০
ত্রৈমাসিক	... ৬.২৫

ভারতে

বার্ষিক সডাক	... ৩০.০০
ষাণ্মাসিক "	... ১৫.৫০
ত্রৈমাসিক "	... ৮.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	... ৩০.০০
ষাণ্মাসিক "	... ১৫.৫০
ত্রৈমাসিক "	... ৮.০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ ডাকে)

বার্ষিক সডাক	... ৫২.০০
ষাণ্মাসিক "	... ২৬.০০
ত্রৈমাসিক "	... ১৩.০০

আসাম অঞ্চলে
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	... ৩৯.০০
ষাণ্মাসিক	... ১৯.৫০
ত্রৈমাসিক	... ১০.০০

*

দাম ৫০ পয়সা
উত্তরবঙ্গ ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাসুল ৭ পয়সা

*

DESH

Saturday 22 Nov. 1969

কংগ্রেসের ভাঙন

গত তেরোই নভেম্বর, বৃহস্পতিবার, ঠিক বারবেলায় নয়—তার বেশ কিছু আগেই কংগ্রেসের ভাঙন শেষ হয়েছে। ঘটনাটি অপ্রত্যাশিত কিছু নয়; বরং শেষ পরিণতি যে এই রকমই হবে তা অবধারিত হয়ে উঠেছিল। তবু মুমূর্ষুর শেষ নিশ্বাস না পড়া পর্যন্ত একটা ক্ষীণ আশা যেমন থেকে যায়—সে-রকম শেষ আশা কারও কারও মনে ছিল; অবশ্য সে-আশা অচিরেই দুরাশা হয়ে দেখা দেয়।

কংগ্রেসের এই ভাঙন শুভ না অশুভ তা বলা কঠিন। অনেকের মতে এটি শুভ; আবার কারও কারও মতে এটি ঘোরতর অশুভ ঘটনা। যাঁরা মনে করেন এটি শুভ—তাঁদের সাধারণ যুক্তি এই যে, কংগ্রেসের মধ্যে সর্বশক্তিমানরূপে বিরাজমান সিনডিকেট গোষ্ঠী এই রাজনৈতিক দলটিকে ক্রমশই ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছিল। অবিবেচনা, অসহিষ্ণুতা, গোঁড়ামী, ক্ষমতার লোভ, একাধিপত্যের চেষ্টা ইত্যাদিই ছিল সিনডিকেটের গলদ। এই গোষ্ঠীর হাতে ক্ষমতা এতই বেশি ছিল যে, অন্য পক্ষের দ্বারা যথার্থভাবে দলের ভাল এবং স্বদেশের উন্নতির জন্যে কিছু করার উপায় ছিল না। কংগ্রেসের ভাঙনে সিনডিকেট দুর্বল তো হয়েছেই উপরন্তু তার পরাজয়ের গ্লানি তাকে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে প্রায়। আপাতত, এই ভাঙনের ফলে কংগ্রেসের অন্য পক্ষ, যাঁরা সিনডিকেট বিরোধী, অর্থাৎ যাঁরা নাকি প্রগতিবাদী, সমাজবাদী, গণতন্ত্র-বিশ্বাসী তাঁরা কংগ্রেসকে পুনরুজ্জীবন দিতে পারবেন। এই অর্থে ভাঙনটি শুভ।

অন্য পক্ষ, যাঁরা মনে করেন, কংগ্রেসের এই ভাঙন অশুভ তাঁদের সাধারণ যুক্তি, গত নির্বাচনের পর নড়বড়ে একটা সংখ্যাধিক্য নিয়ে কংগ্রেস এখন ক্ষমতায় রয়েছে। এ-সময় দলের ভাঙন দলের পক্ষে তো বটেই—দেশের পক্ষেও ক্ষতিকর হবে। এমন কি, বলা যায় না, শ্রীমতী গান্ধী যে-ধরনের সমর্থনের ওপর ভরসা করে দলের ভাঙন স্বীকার করে নিলেন আপদকালে সে-সমর্থন কতটুকু থাকবে। দুর্বল কংগ্রেস দুর্বলতর হল যদি তবে অশুভ বই শুভ হল কোথায়!

কংগ্রেসী রাজনীতির যাঁরা খোঁজ খবর রাখেন তাঁরা অবশ্য বরাবরই মনে করে আসছেন, কংগ্রেসের এই অন্তর্বিরোধকে যেভাবে প্রচার করা হচ্ছে ব্যাপারটি মোটেই তা নয়। আদর্শের কারণে অথবা নৈতিক কারণে মোটেই কংগ্রেসের দল ভেঙে গেল না। লড়াই আদর্শ নিয়ে নয়, যদিও শ্রীমতী গান্ধীর তরফ থেকে তার প্রচারটাই বেশি হয়েছে। তাহলে কি কলহের মূল কারণ ক্ষমতার দ্বন্দ্ব? অনেকের মতে যথার্থ কারণ নাকি তাই। আরও স্পষ্ট করে বললে বলতে হয়, সরকারী শাসনের কর্ণধার হয়ে যাঁরা বসে আছেন তাঁদের ক্ষমতা বেশি, নাকি সংগঠনের কর্ণধার হয়ে যাঁরা আছেন তাঁদের ক্ষমতা বেশি—লড়াইয়ের মূল কারণ এখানেই। শ্রীমতী গান্ধী যদি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পার প্রভুত্ব না মানতে চান তবে ঝগড়াটা ঠিক ব্যক্তিগত না হয়েও শাসন এবং সংগঠনের মধ্যে হতে পারে। যাই হোক, বলতে আপত্তি নেই, কংগ্রেসের দুপক্ষ যে যাই বলুন একেবারে পরিষ্কার আদর্শের জন্যে এই ভাঙন আসে নি। কেউই দাবি করতে পারেন না, তাঁর দলের সকলেই আদর্শবাদী, নীতিবাদী। শ্রীমতী গান্ধীর মন্ত্রিসভার জনৈক প্রবীণ মন্ত্রী (প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ আস্থাভাজন নিশ্চয়ই) দশ বছরের আয়করের হিসেব দাখিল না করে যদি দুর্বল একটা কৈফিয়ত খাড়া করতে পারেন তবে আর যাই হোক এঁকে আমরা আদর্শবাদী বা নীতিজ্ঞান-বিশিষ্ট ব্যক্তি বলতে পারি না। এই রকম আরও আছেন অনেকে যাঁরা কংগ্রেসী পুনরুজ্জীবনের ধারক হলে বলাই বাহুল্য শুভ কিছু হবে না। স্বভাবতই সন্দেহ হয়, মন্ত্রীদের মধ্যে যাঁরা, এবং কংগ্রেস সংসদীয় দলের মধ্যে যে তিনশো দশ বিশজন আজ প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আনুগত্য ও সমর্থন প্রকাশ করলেন তাঁদের সকলের জামার তলা ঠিক ততটা পরিষ্কার নয় যতটা আমরা মনে করছি। এঁরা আজ সকলেই প্রগতিবাদী হয়ে গেছেন বটে তবে সেটা কিসের কারণে তা বলা কঠিন।

এসব সত্ত্বেও যদি এমন হয় যে, শ্রীমতী গান্ধী চাপে পড়ে এবং কংগ্রেসের ভবিষ্যত চিন্তা করে কংগ্রেসকে উজ্জীবিত করতে পারেন তবে আমরা খুশী হব। যদিও সে আশা তেমন কিছু দেখা যাচ্ছে না। শ্রীমতী গান্ধী ইদানীং বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে পড়েছেন, ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের পর তিনি অন্যান্য অর্থনৈতিক প্রগতিমূলক কাজ আর কী করেন, আমরা তা দেখার অপেক্ষায় থাকলাম। একথা নিশ্চয় স্বীকার করা যায়, সৎ কাজের কিছু প্রতিদান আছে।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সিন্ডিকেট-পন্থী এবং ইন্ডিকেটপন্থী জ্ঞাতি-গণের কলহ যখন আত্মবিনাশকে অবশ্যম্ভাবী এবং অনিবার্য করে তুলেছে, ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে একদল ঐক্যপন্থী কংগ্রেসী বিবদমান দুই শিবিরের ভিতর মিলনের সেতু রচনা করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। আন্দাজ করা যায়, সেই নেপথ্য নাটক এইভাবে রচিত হয়েছিল।

[যবনিকা উঠল। ইন্ডিকেট শিবির। সিংহাসনে দেবী সমাসীনা। মন্ত্রণার জন্য ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত সখা, সুহৃদ ও শুভানুধ্যায়িগণ উপস্থিত। ভাট গাদা গাদা অভিনন্দন বার্তা পড়ে যাচ্ছে।]

ভাট (সোৎসাহে) **:** দেবী, সি পি আই অভিনন্দন জানাচ্ছে। বলছে, প্রতিক্রিয়াশীল সিন্ডিকেট চক্রকে আস্তাকুঁড়ের আবর্জনায় ছুঁড়ে ফেলে দিন।

দেবী : থাক, ওটা আর চেঁচিয়ে পড়তে হবে না এখন।

ভাট : ডি এম কে বলছে, প্রতিক্রিয়াশীল কামরাজ গোষ্ঠীকে এমন শক্ত আঘাত হানুন, যেন জীবনে আর উঠে দাঁড়াতে না পারে। এ কাজে চিরদিন আমাদের সহায়তা পাবেন।

দেবী : তথাস্তু।

তরুণ-তুর্কি-নেতা : দেবী! পরিবহন দল, আবকারী মুখ্যমন্ত্রী আমাদের হাতের মুঠোয়। অর্থাৎ এ আই সি সির বৈঠকে সংখ্যাও আমাদের হাতে এসে যাবে। কায়েমি স্বার্থের পা চাটা অন্ধকারের জীবগুলো ইঁদুরের মত গর্তে ঢুকতে পথ পাবে না।

বিপ্লবী কংগ্রেসী : হবে না! কার মেয়ে দেখতে হবে তো।

দেবী : কিন্তু কামরাজ প্রতিক্রিয়াপন্থী লোকে এ কথা বিশ্বাস করবে?

বিদূষক : করবে মানে, করে বসে আছে। ইউ ডি, খবরের কাগজ কদিন ধরে আপনার নামে ইমেজ আইসা গড়ে তুলেছে যে, লোকের চোখে আপনিই এখন প্রগতি, আপনিই অগতির গতি।

দেবী : হ্যাঁ, সমাজতান্ত্রিক বক্তব্য প্রচারে আকাশবাণী অনেক তৎপর হয়েছে। আমি সেটা লক্ষ করছি।

তথ্যমন্ত্রী : আপনার কৃপায় আকাশবাণী এখন দৈববাণী হয়ে উঠেছে।

[হাঁফাতে হাঁফাতে দূতের প্রবেশ]

দূত : দেবীজী, দেবীজী! চবন—

দেবী : (বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল) চবন! চবন কী?

দূত : ওঃ দম বেরিয়ে গেছে। ছুটতে ছুটতে আসছি কি না?

তরুণ-তুর্কি : আরে ধ্যাৎ। মোদ্দা কথাটা কি তাই বল না। চবন বলে আটকে গেলে কেন?

দূত : চবন জানিয়েছেন, দেবীজীকেই পুরো সাপোর্ট দেবেন।

[দেবী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন]

বিদূষক : জয় মা। বন্দে মাতরম।

তরুণ-তুর্কি : আরে ধ্যৎ। বন্দে মাতরম নয়, বন্দে মাতরম নয়। ওটা তো সিন্ডিকেটি শ্লোগান। কথাটা সেকুলারও শোনায় না, সোস্যালিসটিকও নয়। আমাদের শ্লোগান হবে ব্যাংক জাতীয়করণ জিন্দাবাদ। দেবীজী যুগ যুগ জিও।

[বাইরে বন্দনাগীতি শোনা গেল]

ইয়া দেবী সর্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

[দ্বাররক্ষীর প্রবেশ]

রক্ষী : দেবীজী! ঐক্যপন্থী কংগ্রেসীগণ দ্বারে সমাগত। আপনার দর্শনপ্রার্থী।

দেবী : ওরা আবার কোন দলের?

তরুণ-তুর্কি : দেখে আসব।

দেবী : থাক। ওদের আসতে দাও।

[ঐক্যপন্থী কংগ্রেসীদের প্রবেশ]

দেবী : আসুন। অনুগ্রহ করে বসুন। এবং বলুন, কি চান?

ঐক্যপন্থী মুখপাত্র : আজ্ঞে, আমরা ঐক্য চাই।

দেবী : আপনারা কারা?

ঐক্যপন্থী মুখপাত্র : আজ্ঞে, আমরা কংগ্রেসী।

দেবী : আপনারা কি রকম কংগ্রেসী?

ঐক্যপন্থী : আমরা আজীবন কংগ্রেসী।

দেবী : বুঝেছি। আপনারা ওবাড়ির দালাল।

ঐক্যপন্থী মুখপাত্র : আজ্ঞে, ও'রাও বললেন, আমরা এ বাড়ির চর।

দেবী : ওরাও বললেন মানে? আপনারা ও বাড়িতে গিয়েছিলেন নাকি?

ঐক্যপন্থী মুখপাত্র : শুধু ও বাড়ি। ও বাড়ি, সে বাড়ি, বড় বাড়ি মেজো বাড়ি, ছোট বাড়ি, বাড়াবাড়ি—আজ্ঞে সারা দিন ধরে সব দরজাতেই গড়াগড়ি যাচ্ছি।

দেবী : তা ওরা কি বললেন?

ঐক্যপন্থী মুখপাত্র : বললাম, বাবা-সকল, আমরা ঐক্য চাই। তা ওরা জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কারা? বললাম, বাবা সকল আমরা কংগ্রেসী। তারপর ওরা জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি রকম কংগ্রেসী। বললাম, বাবারা আমরা জন্মে ইস্তক কংগ্রেসী। যখন ইংরেজের রাজত্ব ছিল, তখন গান্ধীবাবা এসে ডাক দিলেন, গোলামী আমরা মানব না। চলে এস, আইন অমান্য কর। ইংরেজের কাজকর্ম অচল করে দাও। তখন কেউ পড়তে ঢুকেছিলাম, কেউ চাকরিতে ঢুকেছিলাম। সব ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। জেলে গেলাম। পুলিশের লাঠি খেলাম। আবার ডাক এল, বিলাতি কাপড় বর্জন কর, মদ বেচতে দিও না। কাপড়ের দোকানের সামনে, মদের দোকানের সামনে দলে দলে মেয়েপুরুষে শুয়ে পড়লাম। চোখের সামনে মেয়েদের বেইজ্জত করল পুলিশ, আমাদের গায়ের উপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল পুলিশ। গান্ধীবাবা বলেছিল, তোমরা সত্যাগ্রহী, অহিংস, হাত তুলবে না। হাত তুলিনি। জেল খেটেছি। বিয়াল্লিশ সালে হুকুম এল, ঝাঁপিয়ে পড়। কার হুকুম? কংগ্রেসের। ঝাঁপিয়ে পড়লাম। বাপ ভাই মারা পড়ল গুলিতে। আধমরা হয়ে জেল খাটলাম। স্বাধীন হলাম। হুকুম এল, জোড়া বলদে ছাপ দাও। কেন? কংগ্রেসের রাজ হবে। কার হুকুম? কংগ্রেসের। এখনও জোড়া বলদে ছাপ দিচ্ছি। লাল ঝাণ্ডার অত্যাচার সহ্য করেও ছাপ মেরে যাচ্ছি জোড়া বলদে। আমরা এম এল এ-ও হতে চাইনি, মন্ত্রীও হতে যাই নি, প্রেসিডেন্ট না, সেক্রেটারি না, কিছু না। আমরা শুধু কংগ্রেসী থাকতে চাই। এ কথা বাবা-সকলদের বললাম। বললাম, বাবারা জোড়া বলদে অভ্যাসটা বসে গেছে। এখন গাই বলদ ভিন্ন হয়ে গেলে বড় আতান্তরে পড়ে যাব। কার পিঠে ছাপ দেব? ওটা তাই জোড়াই রেখে দাও। সেই প্রার্থনা নিয়েই মা আমার, জগজ্জননী আমার, তোমার কাছেও এসেছি। ঐক্য চাই।

দেবী : তোমরা ব্যাংক জাতীয়করণ মানো?

ঐক্যপন্থী মুখপাত্র : কংগ্রেস বললেই মানি।

দেবী : তোমরা সমাজতন্ত্র, প্রগতি, নতুন হাওয়া, বিবেকের আহ্বান মানো?

ঐক্যপন্থী মুখপাত্র : কংগ্রেস মানতে বললে মানি।

দেবী : মানো? বাঃ! ওদের কিছু খেতে দাও।

তরুণ-তুর্কি : আর দলীয় শৃংখলা? ডিসিপ্লিন?

ঐক্যপন্থী মুখপাত্র : তা কংগ্রেস হুকুম দিলে মানতে হবে বইকি!

দেবী : বটে! তা হলে তোমরা এখন আসতে পার। প্রহরী!

প্রহরী : হুকুম দেবীজী!

দেবী : এদের বিদায় কর!

নয়া গণতন্ত্রের বুনিয়াদ

শীতকালীন অধিবেশন শুরু হতেই দেখা গেল, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী আর লোকসভার নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা নন—তাঁর দলে সভার অর্ধেক সদস্যও নেই।

এমন ঘটনা আমাদের দেশে এই প্রথম। এর আগে বরাবরই ভারতের প্রধানমন্ত্রীরা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃত্ব করেছেন। আমরা তাই অনেকেই জানি না, প্রধানমন্ত্রী অর্থাৎ সভার নেতা হঠাৎ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারালে তখন কী হওয়া উচিত।

সংসদীয় গণতন্ত্রের রীতি এ সম্পর্কে পরিষ্কার। সেই রীতি হল, এই অবস্থায় অন্য সব কিছুর আগে রাষ্ট্রপ্রধান প্রধানমন্ত্রীকে ডেকে বলবেন : দয়া করে আমাকে দেখান, আপনি কার কার সমর্থনে সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা দাবি করছেন। প্রধানমন্ত্রী এর কোনও সদুত্তর দিতে না পারলে অর্থাৎ সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখাতে না পারলে রাষ্ট্রপ্রধানের সামনে একটি মাত্র পথ খোলা তিনি তখন সেই প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে বলতে বাধ্য।

এর পর রাষ্ট্রপ্রধান কী করবেন? সে নির্দেশও সংসদীয় গণতন্ত্রে রয়েছে। এর পর তিনি সভার দ্বিতীয় বৃহত্তম দলের নেতাকে ডেকে পাঠাবেন। তাঁর কাছে জানতে চাইবেন : আপনি কি সভার সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন সংগ্রহ করে মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারবেন?

তিনি যদি না পারেন, তাহলে রাষ্ট্রপ্রধান সভার তৃতীয় বৃহত্তম দলকে ডেকে
পাঠাবেন। তিনিও যদি ব্যর্থ হন এবং এইভাবে যদি দেখা যায় যে কেউই মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারছেন না, তাহলে রাষ্ট্রপ্রধান সভা ভেঙে দিয়ে নতুন নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে বাধ্য।
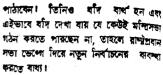
আমাদের দেশে প্রথম পরীক্ষারই কিন্তু সংসদীয় গণতন্ত্রের এই রীতির মূলে কুঠারাঘাত করা হল। সভায় আপনার নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা কই, শ্রীমতী গান্ধীকে ডেকে একথা জিজ্ঞেস করার কোনও প্রয়োজনীয়তাই আমাদের রাষ্ট্রপতি অনুভব করলেন না।

আমি মনে করি, এই বিচারে শ্রীবরাহগিরি ভেঙ্কটগিরি গণতান্ত্রিক রীতিনীতি লংঘন করলেন—তিনি তাঁর দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করলেন না।

✻

কেউ কেউ হয়ত বলবেন, কেন তা হবে কেন—লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী বা সরকার পক্ষ কোনও ভোটে না হারলেই হল।

সংসদীয় গণতন্ত্রের রীতি কিন্তু তা বলে না। ভোটাভুটিতে আত্মরক্ষা করতে পারলেই যে কোনও সংখ্যালঘিষ্ঠ দল সরকার চালিয়ে যেতে পারেন, এ রীতি সংসদীয় গণতন্ত্রের কোনও কেতাবে লেখা নেই। সরকার যখন গঠিত হবে বা কোনও সরকারী দলে হঠাৎ যখন ভাঙন দেখা দেবে—তখন সরকার পরিচালনে অভিলাষী দল বা নেতাকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখাতেই হবে। এক্ষেত্রে দলীয় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখাবার কোনও প্রয়োজন নেই। দেখাতে পারলেই হল, কার কার সমর্থনে তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ অর্থাৎ কিভাবে তিনি সভার অর্ধেকের বেশি সদস্যের সমর্থন দাবি করছেন। তিনি নিজ, নির্দল সদস্যের সমর্থনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখাতে পারেন। তিনি অন্য কোনও দলের সাহায্য নিতে পারেন। সেইসব ব্যক্তি বা দলকে যে সরকারে নিতে হবে তেমনও কোনও কথা নেই। তাঁদের সরকারে নিয়ে একাধিক দলের সরকার অর্থাৎ কোয়ালিশন গঠন করা যেতে পারে। সরকারে না নিয়ে শুধু তাঁদের সমর্থন পুষ্ট সরকারও গঠন করা চলে। যাই করুন, যে ব্যবস্থাই হোক, সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন তাঁকে প্রমাণ করতেই হবে—এইটাই গণতন্ত্রের রীতি।

হয়ত এরপর অনেকে বলবেন, এক্ষেত্রেও তো তাই হয়েছে—ওই যে সি পি আই, ডি এম কে, সি পি এম বলেছেন, আমরা ইন্দিরা সরকারের পতন ঘটাতে দেব না, দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠী কোনও অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে এলে তার বিরুদ্ধে ভোট দেবই।

সংসদীয় গণতন্ত্রের রীতি অনুসারে কিন্তু এতেও হয় না। কারণ এটা নেতিবাচক সমর্থন। চাই ইতিবাচক সমর্থন। যেমন কেরলে হয়েছে। মিনি ফ্রনট ও কেরল কংগ্রেসকে ওখানে রাজ্যপাল সরকার করতে দিয়েছেন কারণ তার আগেই কেরল প্রদেশ কংগ্রেসের নয়জন এম এল এ এসে তাঁকে জানিয়ে গিয়েছেন—মিনি ফ্রনটের সরকার গঠন প্রচেষ্টাকে আমরা সমর্থন করছি। ওই নয়জনের সমর্থন সহ রাজ্য বিধানসভায় মিনি ফ্রনট ও কেরল কংগ্রেসের সরকারের পেছনে অর্ধেকের বেশি সদস্য আছেন। তাই কেরলের অচ্যুত মেনন সরকার গণতান্ত্রিক রীতিসম্মত।

শ্রীমতী গান্ধীও যদি ওইরকম কিছু দেখাতে পারতেন তাহলেই আর কারু কিছু বলার থাকত না। কিন্তু তিনি তা দেখান নি। রাষ্ট্রপতিও তাঁকে এই রকম কিছু দেখাতে বলেননি। প্রধানমন্ত্রী যে নেতিবাচক সমর্থনের উপর ভিত্তি করে বা "ইস্যু টু ইস্যু" ভোটে জিতে সরকার রাখার পথ ধরেছেন সেটা আর যাই হোক গণতন্ত্রসম্মত নয়।

গণতান্ত্রিক রীতি অনুসারে সব কিছুর আগে প্রধানমন্ত্রীর দেখান উচিত কিভাবে তিনি সভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ—কে কে তাঁকে সমর্থন করছেন।

*

কেউ কেউ বলছেন, প্রধানমন্ত্রী এই "অগণতান্ত্রিক" ব্যবস্থার অবসান ঘটাবেনই—হয় তিনি লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখাবেন, না হয় সভা ভেঙে দিয়ে অন্তর্বর্তী নির্বাচনের সুপারিশ করবেন। আমার কিন্তু মনে হয়, প্রধানমন্ত্রী প্রথম কাজটা করতে পারেন—দ্বিতীয় কাজটা কিছুতেই করবেন না।

প্রথম কাজটা করতে গিয়ে অর্থাৎ সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখাতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী সবচেয়ে আগে নজর দেবেন দল ভাঙানোর উপর এবং নির্দল সদস্যদের দলে টানার দিকে। এই কাজ তিনি শুরুও করেছেন। ইতিমধ্যেই স্বতন্ত্র পার্টি এবং জনসংঘ থেকে কয়েকজন সদস্য তাঁর দলে এসেছেন। এসেছেন কয়েকজন নির্দলও।

কিন্তু কেউ কি দাবি করতে পারেন যে সংসদীয় গণতন্ত্রে দল ভাঙানোটা সুষ্ঠু রীতি? আর তাছাড়া প্রধানমন্ত্রী আছেন বলেই না শ্রীমতী গান্ধী এই দল ভাঙানোর বা দলে ভেড়ানোর সুযোগ পাচ্ছেন। কোনও সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের নেতাকে সরকারী ক্ষমতায় থাকতে দিয়ে দল ভাঙানোর বা দলে ভেড়ানোর সুযোগ করে দেওয়াও কি গণতান্ত্রিক রীতিনীতি সম্মত? এমন সুযোগ পেলে তো বিহারে একাধিক ব্যক্তি মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারেন!

এর চেয়ে যদি প্রধানমন্ত্রী সোজাসুজি ডি এম কে বা সি পি আই বা পি এস পির সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গঠন করতেন তাহলে সেটা অনেক বেশি গণতন্ত্রসম্মত হত। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী তা করতে চান না। কারণ ডি এম কের সঙ্গে দিল্লিতে কোয়ালিশন করলে গোটা দক্ষিণে তাঁর দলের ভরাডুবি হয়। আর সি পি আইর সঙ্গে হাত মেলালে তাঁকে "কমিউনিসট" দুর্নাম কিনতে হয়। শ্রীমতী গান্ধী এর কোনটাতেই রাজি নন।

যাঁরা বলছেন প্রধানমন্ত্রী লোকসভা ভেঙে দিয়ে অন্তর্বর্তী নির্বাচন করতে পারেন তাঁরাও সম্ভবত ভুল করছেন। প্রধানমন্ত্রী জানেন, এম পিদের বা এ আই সি সির সদস্যদের দলে টানা এক জিনিস, আর গোটা দেশের নির্বাচনে জেতা আর এক জিনিস। প্রধানমন্ত্রী এও জানেন যে, শুধু টাকায় বা হাওয়ায় নির্বাচন হয় না—নির্বাচনে সংগঠনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই শক্তিশালী নিজস্ব সংগঠন গড়ে তোলার আগে নেহাত বাধ্য না হলে শ্রীমতী গান্ধী নির্বাচনের পথে পা বাড়াবেন বলে আমি মনে করি না।

তাছাড়া এখনই নির্বাচনে নামতে হলে প্রধানমন্ত্রীকে সেই কমিউনিসট পার্টি, সেই ডি এম কের সঙ্গে যুক্তফ্রনট গড়তেই হবে। সেই কাজই যদি তিনি করতে রাজি হবেন তাহলে ও'দের সঙ্গে কোয়ালিশন করে সরকারকে বাঁচাবার চেষ্টা করবেন না কেন?

*

আমাদের প্রধানমন্ত্রীর আর যাই থাক, নীতিফিতির গোঁড়ামী তেমন নেই। তিনি নিজের চলার পথ করে নিতে ব্যগ্র এবং সেজন্য যে কোনও কাজ করতে রাজি। যখন তিনি বোঝেন, হাওয়া খুব খারাপ, তখন থেমে যান। তখন তিনি যে কোনও পরিস্থিতির সঙ্গে রফা করতে উৎসাহী। আবার যখনই বোঝেন, সুযোগ হয়েছে, তখনই সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাপিয়ে পড়েন। তিনি চরমতম নির্দয় হতে পারেন। আবার যে কোনও বিপদের ঝুঁকি নিতেও সামান্য কুণ্ঠিত নন।

গণতান্ত্রিক রীতিনীতি বা শিষ্টাচার লঙ্ঘিত হচ্ছে বলে তিনি আজ সরকারী ক্ষমতা ছেড়ে দেবেন, আমি একবারও তা মনে করি না। তিনি আজ কয়েকটি দলের অপ্রত্যক্ষ সাহায্য নিতে বাধ্য হচ্ছেন বলেই ভবিষ্যতে তাঁদের সঙ্গে প্রকাশ্যে হাত মেলাবেন তাও আমি বিশ্বাস করি না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শ্রীমতী গান্ধী যে-কোনও উপায়ে এই সংকট কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করবেন এবং তারপর ধীরে ধীরে ভারতে এক নতুন "নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র" কায়েম করার কাজে হাত দেবেন। এবং সে গণতন্ত্রের রূপ দেখে আজকের উৎসাহী কমিউনিসটরাও বিমর্ষ না হয়ে পারবেন না!

১৭।১১।৬৯

নবারুণ গুপ্ত

দেবরাজ

গরীব রাণী

দুয়োরাণীর যে দারুণ কষ্ট তা রূপকথার পড়ুয়ারা সবাই জানে। মেগে পেতে খেয়ে তাঁকে অতি কষ্টে বেঁচে থাকতে হয়। কিন্তু সুয়োরাণীকেও যে ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে বেরুতে হতে পারে তা কে জানতো? তাই কিন্তু হয়েছে বিলেতে। সেখানকার রাণী মোটেই দুয়ো নন, তিনি হচ্ছেন রীতিমত সুয়ো। গণতন্ত্রের আদ্যাপীঠ বলে নিজেদের দেশকে জাহির করলে কি হয় রাজতন্ত্রে ইংরেজদের অচলা ভক্তি। এখন সেখানে রাজা নেই, আছেন রাণী। তাঁকে তো বিলেতের লোকেরা একরকম মাথায় করে রেখেছে। শাসনতন্ত্রের তো তিনি মাথার মণি, আবার সমাজের অর্থাৎ অভিজাত সম্প্রদায়েরও। যারা মধ্যবিত্ত কিংবা গতরে খেটে খায় তারাও রাজারাণী বলতে অজ্ঞান। তিনশো সত্তর বছর আগে বিলেতে জন্মেছিলেন দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের মত রাজতন্ত্রে ঘোর অবিশ্বাসী অলিভার ক্রমওয়েল। তাঁর দাপটে বছর বারো বিলেতে রাজারাণীর কোনও বালাই ছিল না। কিন্তু তিনি মারা যাওয়ার পর সেই যে রাজার শাসন সে দেশে ফিরে এসেছে তারপর এই তিন শতাব্দীতে তাতে আর কোনও ছেদ পড়েনি।

রাজারাণী অবশ্য বিলেতে শাসনযন্ত্রের নৈবিদ্যির মোণ্ডা। তাঁদের দায়-দায়িত্ব বলতে কিছু নেই, ক্ষমতাও আছে কেবল দলিল-পত্রে। তাই বলে তাঁদের পুষতে খরচ কিছু সরকারের কম হয় না। পার্লামেন্টে রীতিমত আইন পাস করে সে খরচ বরাদ্দ করা হয়েছে। ১৯৫২ সনে রাণী (কিংবা রাজার) সালিয়ানা নজরানা ঠিক হয়েছে পৌনে পাঁচ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ কিনা সাড়ে পঁচাশি লক্ষ টাকা। সে টাকায় তো এ যুগেও ছোটখাটো একটা রাজ্য চালানো যায়। তা ছাড়া রাজবাড়ির পাওনা শুধু ওই নয়। রাণীর স্বামী ডিউক অব এডিনবরার জন্যেও আলাদা বন্দোবস্ত। তিনি পান বছরে মোট ৪০০০০ পাউণ্ড। (অর্থাৎ সাত লক্ষ বিশ হাজার টাকা)। রাণীর মা মহারাণী এলিজাবেথেরও ভিন্ন ব্যবস্থা। তিনি যতদিন বাঁচবেন ততদিন তাঁকে দেওয়া হবে বছরে ৭০০০০ পাউণ্ড (অর্থাৎ বারো লক্ষ ষাট হাজার টাকা। রাণীর খুড়ো ডিউক অব গ্লস্টার আর যোনও বাদ যাননি। ডিউককে দেওয়া হয় বছরে ৩৫০০০ পাউণ্ড (ছ লাখ ত্রিশ হাজার টাকা) আর বোন রাজকুমারী মার্গারেটকে ১৫০০০ পাউণ্ড (অর্থাৎ দু লাখ সত্তর হাজার টাকা)।

এ তো গেল আইনের ছকে বাঁধা বরাদ্দ। উপরি পাওনাও রাণীর বেশ কিছু আছে। আর যেসব খাতে তিনি দেশের হয়ে খরচ করেন তারও খানিকটা ইদানীং যোগানো হচ্ছে সরকারী তহবিল থেকে যাতে বাড়তি খরচপত্রের চাপটা রাণীর ওপর গিয়ে না পড়ে। ফি বছর সিভিল লিস্টের বাঁধাধরা বরাদ্দ ছাড়া বাড়তি পঁচানব্বই হাজার পাউণ্ড রাজারাণীর অতিরিক্ত খরচখরচা বাবদ আলাদা করে রেখে দেওয়া হয়ে থাকে। সে টাকাটা তো আর সিন্দুকে পচে না সুদে খাটানো হয়। তাই থেকে দরকার পড়লে ২৫০০০ পাউণ্ড রাজপরিবারের খরচ চালাবার জন্যে দেওয়া হচ্ছে রাণীকে। তার ওপর রাণীর দেশে-বিদেশে শফরের দরুন কিংবা রাজকীয় অনুষ্ঠানের খরচা মেটাবার জন্যে দেওয়া হয় বছরে ৪০০০০ পাউণ্ড ওই জমানো টাকার আয় থেকে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যদিও ইদানীং জিনিসপত্র মাগ্গি হওয়ার দরুন রাণীর খরচখরচা বেড়েছে তাঁকে বাড়তি টাকাও বেশ দেওয়া হয়েছে আর খরচের বোঝা যাতে তাঁর ঘাড়ে না চাপে তার ব্যবস্থাও সরকার করেছেন।

রাণী কিন্তু এতে পুরোপুরি খুশী নন। আর রাণীর চেয়ে অনেক বেশী অখুশী তাঁর স্বামী এডিনবরার ডিউক। হাটে হাঁড়ি ভেঙেছেন তিনিই। তাও আবার দেশে নয়—আমেরিকায়। টেলিভিসনে এক সাক্ষাৎকারে তিনি রাণীর আর্থিক অবস্থা নিয়ে যে সব মন্তব্য করেছেন তা মৌচাকে ঢিল ছোঁড়ার শামিল। তা নিয়ে বিলেতে দারুণ হইচই শুরু হয়েছে। কাগজে কাগজে টিকা-টিপ্পনী বিস্তর তো হয়েছেই হুলুস্থূলে পড়ে গেছে তিনটে প্রধান রাজনৈতিক দলের মধ্যেও। একদল বলছে—রাজকুমার ফিলিপ তো ঠিকই বলেছেন। রাণীর ভাতা তো সতেরো বছরে মোটে বাড়েনি। কাজেই এই মাগ্গি গণ্ডার দিনে তাঁর যে টানাটানি হবে সে আর এমন আশ্চর্য কী? আর একদল বলছে—লাখ লাখ টাকা যিনি নয় ছয় করছেন তাঁর আবার কষ্ট কিসের? তাঁকে আরও টাকা দেওয়া আর ফুটো পাত্রে জল ঢেলে তেষ্টা মেটাবার চেষ্টা সমান বৃথা। যতই বাড়াও রাজারাণীর অভাব কখনও মিটবে না।

রক্ষণশীল দল চিরকালই অতিরিক্ত রাজভক্ত। রাণীর কষ্টে তাদের অনেকের চোখে জল এসে গিয়েছে। তারা চায় এখনি একটা এ ব্যাপারের হেস্তনেস্ত হোক। তাদের ভয় হয়েছে এডিনবরার ডিউকের একটা টিপ্পনিতে। আমেরিকায় তিনি বলে বসেছেন এত কষ্ট করে রাণীগিরির ঝামেলা পোয়ানোর চেয়ে ও পাট চুকিয়ে ফেলাই ভাল বলে নাকি রাণী মনে করছেন। পরে অবশ্য তিনি বলেছেন রাণী যে রাজত্ব ছেড়ে দিতে চাচ্ছেন সেটা একটা গুজব মাত্র—তাতে কান দেওয়া ঠিক নয়। আর রাণীর জায়গায় প্রিন্স অব ওয়েলস যদি বা গদিতে বসেন তাতেই বা কী এমন সুরাহা হবে? বোঝা যাচ্ছে রাজপুরী থেকে বিদেয় নেবার কোনও ইচ্ছে রাণীর বা রাজপুত্রের নেই! ওটা একটা ভয় দেখানো মাত্র। কিন্তু এতে কাবু হয়েছেন বিরোধী রক্ষণশীল দলের নেতারা। উইলসন সাহেবকে টলাতে তাঁরা অবশ্য পারেননি তবে তাঁকে দিয়ে এটুকু কবুলে করিয়ে নিয়েছেন যে রাণীর ভাতার কথাটা বিবেচনা করার জন্যে একটা সিলেক্ট কমিটী আসছে পার্লামেন্টে বসানো হবে।

রাণীর জন্যে রক্ষণশীল দল আর উদারনৈতিকেরা দরবার করলেও তামাসা করেছেন বেশীর ভাগ শ্রমিক দলের সদস্য। এডিনবরার ডিউকের ওপর শ্রমিক দলের অনেকেই তেমন প্রসন্ন নয় তার ওপর তিনি রাণীর ভাতার কথাটা আমেরিকায় তোলাতে তারা আরও খাপ্পা হয়েছে। তাদের কথা হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতিতে ভুগছে খেটে খায় যারা। তাদের কষ্ট কমাবার জন্যে সরকার যখন কিছু করতে পারছেন না তখন রাজা-রাজড়াকে সাহায্য করার প্রশ্ন ওঠে কোথা থেকে? একজন তো টিপ্পনি কেটেছেন সম্রাট পঞ্চম জর্জ নাকি বলেছিলেন রাজা-রাণী-গিরি একটা পেশা আর ব্যবসা। তাঁদের হীরে মুক্তোর প্রদর্শনী খুলে কিংবা চড়া দক্ষিণা নিয়ে (মাথা পিছু শো টাকা) রাজকীয় চা-চক্রের আয়োজন করে তাঁরা বেশ টাকা কামাতে পারেন; এখন তাই করা হোক না কেন? এসব অবশ্য ছেঁদো কথা। গণতন্ত্রের ঠাট ইংরেজরা যতই ফলাও করুক না কেন রাজভক্তি তাদের রক্তে। কাজেই ডিউক অব এডিনবরার জবানিতে রাণীর আবেদন বৃথা যাবে না বলেই মনে হয়। ভাতা তাঁর খুব শীগগিরই বাড়বে। রাণীর কষ্ট ইংরেজরা সইতে পারবে না।

'পতন-নিবারক বিছানা'

আমাদের এই ভারতবর্ষে খাট, খাটিয়া কিংবা তক্তপোষ থেকে ভূপতিত হয়ে কতজনের ঊর্ধ্বলোক-প্রাপ্তি, সাধনোচিত-ধামে প্রস্থান বা এন্তেকাল ইত্যাদি ঘটে থাকে?

— ঠিক জানি না, কারণ এ সম্পর্কে কোনো স্ট্যাটিটিক্‌স্ কখনো নেওয়া হয়নি। এত বিবিধভাবে আমরা এতই বেশি মারা যেতে অভ্যস্ত যে এ-সব তুচ্ছ ব্যাপারে আমরা কখনো মাথা ঘামাই না। যতদূর মনে পড়ছে আজ পর্যন্ত আমার পরিচিত, অর্ধ-পরিচিত বা শ্রুত—কেউ-ই কোনো খাট-খাটিয়া-তক্তপোষ থেকে জাগরণে, তন্দ্রায়, নিদ্রায়, রসস্থতায় কিংবা অন্যবিধ কোনো কারণে নিপতিত হয়ে নিপাতিত হননি। আমিই এ ব্যাপারে এগ্‌জাম্পল সেট করব কিনা—সে বিষয়ে নিশ্চিতভাবে এখনো কিছু বলতে পারছি না।

কিন্তু পশ্চিম জার্মানীতে পতন-নিরোধক বিছানা তৈরী হচ্ছে। অর্থাৎ বিমানের সেফ্‌টি বেলটের মতো খাটের সঙ্গেও একটি নিরাপত্তা-বন্ধনী থাকবে। খুব সম্ভব শোওয়ার সময় আলো নেবাতে না নেবাতে আর একটি রক্তিম লেখন দেখা দেবে দেওয়ালেঃ 'খাটিয়া পেটী বাঁধিয়ে!'

দড়ির কিংবা টেপের খাটিয়া থেকে পড়ে যাওয়া খুব স্বাভাবিক ব্যাপার নয়—কারণ শয়নের সংগে সংগেই তারা ঝোলার মতো ঝুলিয়ে নেয়—কখনো কখনো ওঠাই শক্ত, তখন সবেগে উৎক্ষিপ্ত হতে হয়; আর যদি একটু বেশি মাত্রায় পিশু-ছারপোকা থাকে (এ-সব খাট-খাটিয়া তাদের অতি প্রিয় সুখাবাস), তা হলে সেই আত্মোৎক্ষেপণ ঘটে রকেটের স্পীডে। কিন্তু তাতে কেউ নিহত হন না—বরং জিঘাংসু হয়ে জীবহত্যায়ই তৎপর হন।

খাট-তক্তপোষ থেকেও অনেকে পড়েন—মশারি বালিশ ইত্যাদির সমভিব্যাহারে বেশ ঘটা করেই অবতীর্ণ হন তাঁরা। তাতে মধ্যরাত্রে পারিবারিক কৌতুক রস ছাড়া অন্য কোনো রস উৎপন্ন হয় বলে জানা যায় না। এইসব পতনের অনেক কারণ থাকে। কেউ কেউ ঘুমিয়ে পড়লেই চোর ধরতে থাকেন, কেউ বা ফুটবল খেলেন, কেউ কেউ চক্রাকারে আবর্তিত হয়ে বোধ হয় নানা রকম যোগ-ব্যায়াম অভ্যাস করতে থাকেন; এবং এ-রকম কোনো প্রক্রিয়াই খাটের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে যথেষ্ট হয় না, ফলে বিশাল পৃথিবী স্বভাবতঃই তাঁদের ডাকতে থাকে। নিতান্তই সদ্যোজাত শিশু, অথবা অসুস্থ অথবা অতি দুর্বল হার্টের রোগী না হলে খাট থেকে পপাত এবং মমার—এ রকম অঘটন বঙ্গদেশে ক্বচিৎ আমরা শুনতে পাই—আমি অন্তত এখনো শুনিনি।

এবং কী আশ্চর্য, এই দুঃসংবাদ একেবারে পশ্চিম জার্মানী থেকে! জার্মানরা তো চিরকাল বীরের জাত।—ফিক্‌তে-নীৎশে প্রমুখ দার্শনিকরা তাদের বরাবর বীর মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে আসছেন। একবার নীৎশের

অনেক সময় খাটের তলাও নিরাপদ

একখানা বই মেলে ধরবামাত্র যে বাণীটি আমার সামনে জ্বলজ্বল করে উঠেছিল সেটি এবংপ্রকারঃ 'জার্মান জাতির সমগ্র

ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে পৃথিবীর দুর্ধবাজদের অপত্যগণের হাতে।' (দূরে স্মৃতি থেকে লিখছি—উদ্ধৃতি নিখুঁত না হতে পারে,

ঘুমের ঘোরে কেউ বল খেলেন

নির্গলিতার্থ এই।) এবং নীট্শের বাণী যে সম্পূর্ণ হাওয়ায় মিলিয়ে যায়নি—ইতিহাসই তার জ্বলন্ত এবং রক্তাক্ত সাক্ষী।

এ হেন বীর জাতির এই দুর্গতি! একটি নয়, দুটি নয়—ছশোর বেশি লোক খাট থেকে পড়ে ভবলীলা সাংগ করেছেন এক বছরে! নীট্শের আত্মা পরলোকে যদি থাকেন, তা হলে এই খবরে তিনি চুল ছিঁড়ছেন। বিসমার্ক নিশ্চয় (হিণ্ডেনবুর্গ তো বটেই) গোঁফগুলো উপড়ে ফেলছেন আর স্বয়ং হিটলার তাঁর কবরের ভেতর (যদি কবরের অস্তিত্ব থেকে থাকে) নড়ে উঠে তারস্বরে বলছেন: "গট্ ইন্ হিম্মেল! এদের নিয়েই আমি পৃথিবীকে নতুন করে গড়তে চেয়েছিলুম! মিলিটারী বেয়নেটের বদলে এদের কিনা 'গেলেণ্ডেল'—অর্থাৎ রেলিং বেঁধে বিছানার হাত থেকে বাঁচাতে হচ্ছে!" এবং ফ্রেডারিক দি গ্রেট যে কী বলছেন, তা অনুমান না করাই ভালো।

বীরকুলোদ্ভবেরা খাট থেকে পড়ে এভাবে মারা যাচ্ছেন কেন? হার্টের দোষে? জর্মান জাতির হার্ট এত পলকা? তাঁদের শৌর্য-বীর্য নিপুণতা (জর্মান প্রেসিশন), নিষ্ঠা আর কর্মোদ্যম—এ-সব দেখে তো আমরা জানতুম তাঁদের হৃদয় লোহার গড়া। পটকার আওয়াজে না হয় আমাদের হৃৎস্পন্দন থেমে যেতে পারে, কিন্তু তাঁরা তো পারমাণবিক বোমাকেও পরোয়া করেন না—অন্ততঃ দু-দুটো মহাযুদ্ধকে গিলে খেয়েছেন। মত্ত অবস্থায় খাট থেকে পড়ে গিয়ে প্রাণ হারাচ্ছেন? আমরা যেমন চলতে-ফিরতে ডাবের জল পান করে থাকি, তাঁদের বীয়র সে-রকম নিত্য-নিরন্ত পানীয়—ডাবের জল অত্যুক্তি হয়ে গেল, জলবৎ, কারণ জল আর ইয়োরোপে কে পান করে? আর তা ছাড়া মত্তাবস্থায় কিঞ্চিৎ উচ্চস্থান থেকে উড্ডয়নের চেষ্টা না করলে—অনেকের দু-এক পাত্র পেটে পড়লেই নিজেকে পাখি বলে বিশ্বাস হতে থাকে—সাধারণভাবে পতন এবং উত্থান তো স্বাভাবিক আনন্দময় ব্যাপার! আমার ধারণা তখন তাঁদের শরীরে বাড়তি তেজ আসে, ঢের বেশি ঘাতসহ হয়ে যান; সাধারণ অবস্থায় যে ধরনের একটা আছাড় খেলে তিনদিন শয্যায় থাকতে হয়, সে রকম গোটা দশেক আছাড়ও তাঁরা অনায়াসে হজম করেন, খোঁয়াড়ি ভাঙলেই সিংহ বিক্রমে উঠে পড়েন। বুড়ো মানুষেরা আচমকা পড়ে গিয়ে সামলাতে পারেন না? নাঃ—তা-ও মানা যাচ্ছে না। নব্বুই বছরেও যে-সব দেশে লোকে বিয়ে করে সেখানে ওটা কোনো কাজের কথাই নয়।

তবু জর্মানরা খাট থেকে পড়ে মারা যাচ্ছেন এবং পতন-নিবারক বিছানা তৈরী করতে হচ্ছে! মাইন গট্, লিবের গট্—হোয়াট এ ফল!

কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছে, আসল ব্যাপারটা কেউই ফাঁস করছেন না। খাট্চ্যুত হয়ে যাঁরা লোকান্তরিত হচ্ছেন, সংবাদে যদিচ প্রকাশ নেই—তথাচ আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে তাঁরা প্রত্যেকেই বিবাহিত। এবং তাঁদের খাটের অর্ধাংশ যাঁদের আইন-সম্মত অধিকারে, তাঁরা হয় চার্চ অথবা ম্যারেজ রেজিস্ট্রার প্রমুখাৎ সে অধিকার লাভ করেছেন। আর কে না জানেন, জীবন এবং শয্যার সেই অর্ধাংশভাগিনীদের সমস্ত উৎকৃষ্ট বক্তব্য শোনার সময়টির জন্যেই সঞ্চিত থাকে।

না, হার্ট নয়, মদ্যপান নয়, বার্ধক্য নয়। অফিসে একটি প্রিয়দর্শিনী অন্তরঙ্গা সেক্রেটারী থাকতে পারে, একটি বান্ধবী জুটতে পারে, একটি মনোরমা সংগিনীর আবির্ভাব হতে পারে এবং সে সংবাদ গৃহিণীদের কানেও পৌঁছুতে পারে। তারপর—তারপর একটি ফরাসী রসিকতা স্মরণ করি:

ঘুমের ঘোরে স্বামী বলছিলেন, 'মাদ্‌লিন—মাদ্‌লিন।' স্ত্রীর নাম মারী। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করলেন, 'এই মাদ্‌লিনটি কে?'

চমকে স্বামী বললেন, 'ও মাদ্‌লিন? রেসের ঘোড়া। শনিবারের বাজীতে পাঁচ হাজার জিতিয়ে দিয়েছিল।'

'বুঝেছি।'

পরদিন সকালে ফোন বাজছিল। স্ত্রী এসে শান্তমুখে স্বামীকে জানালেন, 'সেই রেসের ঘোড়াটা তোমায় ফোনে ডাকছে!'

হার্টফেলের রহস্য বোধ হয় মাদ্‌লিন—না-না, গ্রেট্‌চেনেরাই। জর্মানদের দোষ নেই, এ অবস্থায় স্বয়ং জুপিটারও হার্টফেল করতেন—খাট থেকে পড়বার আগেই। বেলটে কী হবে?

॥ ৩ ॥

[illegible]র্ষিদেব জোড়াসাঁকো বাড়ির তিনতলায় [illegible]তেন। ছাদের [illegible] দিকে ঘরটি ছিল [illegible] ঘর। তারপরে ছিল তাঁর [illegible] ঘর। সব শেষের ঘরটি ছিল স্নানের [illegible]। সেই ঘরটিতে তাঁর কাপড়-[illegible] থাকত। স্নানের ঘরের পরেই ছিল এক টুকরো ছাদ আর এই ছাদের ধারেই ছিল তাঁর পরিচারকদের থাকার জায়গা। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পরিচারকেরা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। এমন মনিব তারা আর কোথায় পাবে?

মহর্ষিদেবের মৃত্যু দিনটি আমার স্পষ্ট মনে আছে। কিছুক্ষণের জন্যে তাঁর দেহ একতলার প্রাঙ্গণে রাখা হয়েছিল। সেখানে দলে দলে তাঁর ভক্ত ব্রাহ্মরা ও অন্যান্য লোকেরা আসতে লাগলেন। তাঁকে যখন নিয়ে যাওয়া হল তখন কতো লোক তাঁর মৃতদেহের সঙ্গে গিয়েছিলেন। কতো বড়ো যে একজন মহাপুরুষ চলে গেলেন সেটা বোঝবার মতো বুদ্ধি আমার তখন হয়নি।

মহর্ষিদেবের সম্বন্ধে একটি কথা খুব মনে পড়ে। তিনি যখন বিকেল বেলা ছাদে এসে বসতেন তখন লেমনেড খেতেন। আমাদের মন লোভ ছিল সেইটির উপর। তিনি দু চার চুমুক খেতেন আর বেশীর ভাগটা পড়ে থাকত গেলাসে। মহর্ষির ভৃত্যটির নাম মনে পড়ছে না, তবে লোকটির মনটা ভালো ছিল, মহর্ষিদেবের প্রসাদ থেকে আমাদের বঞ্চিত করত না। পালা করে সবাইকে ভাগ করে দিত।

ছেলেমেয়ে নাতিনাতনি এবং তাদের ছেলেমেয়ে নিয়ে বৃহৎ পরিবারের মাথার উপর ছিলেন মহর্ষিদেব। তিনি যতো দিন বেঁচে ছিলেন তাঁর ইচ্ছানুযায়ী সকলকে চলতে হতো। তাঁকে না জিজ্ঞেস করে কোনো কাজ হতো না তাঁর পরিবারে। যদিও আমার জ্যাঠামশায়দের ও আমার বাবার বয়েস তখন যথেষ্ট হয়েছিল, তবু কর্তা-দাদামশায় বেঁচে থাকতে সাংসারিক কোন বিষয় কাউকে কিছু ভাবতে হয়নি। সেই

জোড়াসাঁকো-ঠাকুরবাড়ি

জন্যে তাঁর মৃত্যুতে বাড়িসুদ্ধ লোক যেন অসহায় হয়ে পড়লেন।

কর্তাদাদা মশায়ের আমলের যদুনাথ চাটুয্যের কথা মনে পড়ে গেল। দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ, প্রসস্ত ললাট। পরনে শুভ্র থান ধুতি, পায়ে তালতলার একজোড়া চটি। তিনি এসে রোজ খাজাঞ্চি ঘরের তালা খুলতেন। অনেক দিনের বিশ্বস্ত কর্মচারী, তাঁর উপরই সব টাকাকড়ির ভার ছিল। পরিবারের প্রতিটি ব্যাপারে মহর্ষিদেবের কি রকম দৃষ্টি ছিল সে কথা বলি। কোন এক বিবাহ উপলক্ষে কাদের নিমন্ত্রণ করা হবে সত্যদাদা মহর্ষিদেবকে সেই তালিকা শোনাতে এসেছেন। আগেই বলেছি যে আমাদের বাড়ির কোন অনুষ্ঠান বা ক্রিয়াকলাপ মহর্ষিদেবকে না জিজ্ঞেস করে হত না। তালিকা পড়া শেষ হলে তিনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সত্যদার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "একটি নাম দেখছিনে ফর্দে। যদু চাটুয্যের নাম ধরা হয়নি কেন?" পারিবারিক কোন অনুষ্ঠানে পাছে সামাজিক কোন ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটে সেই দিকে তাঁর খুব লক্ষ্য ছিল। মহর্ষি এক জায়গায় বসে বাড়িতে কোথায় কি হচ্ছে সব খবর নিতেন। তাঁর অগোচর কিছু ছিল না। একটি বৃহৎ

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরিবারের কাণ্ডারী ছিলেন তিনি।

আমার বড় পিসিমা সৌদামিনী দেবী চিরকাল বাপের বাড়িতে ছিলেন ও শেষদিন পর্যন্ত বাপের সেবা করেছিলেন। বাপের শোক সামলাতে তাঁর অনেকদিন লেগেছিল। পিতার মৃত্যুর পর সেই যে এসে নিজের ঘরে ঢুকলেন, বোধ হয় মাসখানেকের বেশী তাঁকে ঘর থেকে বেরোতে দেখা যায়নি। মনে আছে মহর্ষিদেবের মৃত্যুর অনেক দিন পরে যেদিন দেখলাম বড় পিসিমা আমাদের ঘরের দিকে আসছেন সেদিন কি আনন্দ হয়েছিল। বড় পিসিমা বাড়ির সকলের খোঁজ খবর নিতেন। আমরাও তাঁকে খুব ভালবাসতুম। কর্তা দাদামশায়ের জন্যে রোজ আমের অম্বল হত। যদিও অম্বল বলছি কিন্তু তাতে অম্লরসের সম্পর্ক মাত্র থাকত না। আমাদের ওই আমের অম্বলটি খুব ভাল লাগত। কি করে যে বারো মাস আম সংগ্রহ করা হতো ভাবতে আশ্চর্য লাগে। বড় পিসিমার নিয়ম ছিল মহর্ষিদেবের থালায় যা অবশিষ্ট থাকত বাড়ির ছোটদের জন্য এক একদিন এক একজনের ঘরে দিয়ে যেতেন। মহর্ষিদেবের সব রান্নায় চিনির ভাগ একটু বেশী থাকত তাই আমাদের খুব ভাল লাগত তাঁর প্রসাদ খেতে।

সৌদামিনী দেবী

রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগিনী সৌদামিনী দেবীর পুত্র সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

সত্যদাদা ছিলেন বড় পিসিমার ছেলে। তিনি বাড়ির সব ছেলেমেয়েদের খুব প্রিয় ছিলেন। তাঁর ঘরের সামনে একটি লম্বা সিন্দুক ছিল; সকাল বেলায় মুখ হাত ধুয়ে আমরা সেই সিন্দুকটির ওপর বসবার জন্য ছুটতুম। সবাই মিলে সেখানে সারি হয়ে বসতুম সত্যদাদা কখন তাঁর ঘর থেকে বেরোবেন সেই প্রতীক্ষায়। সত্যদাদার কাছে নানারকম লজেনস থাকত, আমরা সেই লোভে যেতুম। সে সব জিনিস এখন নিউ মার্কেট খুঁজেও পাওয়া যায় না। সত্যদাদা যে শুধু আমাদের প্রিয় ছিলেন তা নয়। তাঁকে নইলে বাড়ির বউদের চলত না। কোন শৌখিন জিনিস আনতে হলে সত্যদাদা মার্কেট থেকে এনে দিতেন। নিউ মার্কেটে সত্যদাদার কয়েকটি পরিচিত দোকান ছিল। তিনি ওদের বাঁধা খদ্দের ছিলেন। সত্যদাদা কলকাতা ছেড়ে তাঁর মেয়ের কাছে এলাহাবাদে যাবার পরে নিউ মার্কেটে কিছু কিনতে গেলে সত্যদাদার পরিচিত দোকানদারেরা আমাদের আগ্রহ করে ডেকে নিয়ে বসাত ও সত্যদাদার খবর নিত।

সেই আমলের একজন বৃদ্ধ ভৃত্যের নাম ছিল কুঞ্জ। তাকে আমরা সর্বদা কুঞ্জ বুড়ো বলে উল্লেখ করতাম। কুঞ্জর হাতের মেঠাই যে কি চমৎকার হত সে স্বাদ ভোলবার নয়। কারিগরের সন্দেশ তার কাছে লাগে না। মহর্ষিদেবমশায়ের সময়ে আমাদের বাড়ির মাঘোৎসবের খুব নাম ছিল। যাঁরা উপাসনায় উপস্থিত থাকতেন সকলকে রীতিমত জলখাবার না খাইয়ে যেতে দেওয়া হত না। কুঞ্জ বুড়োর মেঠাই ছিল মাঘোৎসবের জলখাবারের প্রধান আকর্ষণ। আমাদের বাড়ির পিছন দিকে খানিকটা জমি ছিল, সেখানে একসার টিনের ঘরবাড়ি ছিল। সেটি ছিল কুঞ্জর রান্নাঘর। নাম ছিল সরকারী রান্নাঘর। কেন যে সরকারী রান্নাঘর বলত জানিনে। সরকারী হোটেলের মত খোরাকী দিলে খেতে পাওয়া যেত। কোনো সময় রান্নার ঠিক না থাকলে কুঞ্জর সরকারী হোটেলে অনেকেই খেয়েছেন। আমরাও হয়তো দরকার হলে খেয়ে থাকব তবে তার মেঠাই-এর যে রকম সুনাম ছিল রান্নার সে রকম সুনাম ছিল না। বড় পিসিমা আর সোম জ্যাঠামশায় কুঞ্জর বাঁধা খদ্দের ছিলেন। ওঁদের জন্যই বোধ হয় বিশেষ করে সরকারী রান্নার ব্যবস্থা ছিল।

আমার ছোটবেলার স্মৃতির সঙ্গে মেজমার সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর উনিশ নম্বর স্টোর রোডের স্মৃতি এমন ভাবে জড়িত যে সেখানকার কথা বাদ দিলে আমার এ কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ঐ উনিশ নম্বরের বাড়ি আর নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথের ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ির উপর আমার যে মায়া, জোড়াসাঁকো বাড়ির জন্যে আমার ততটা মমত্ব বোধ ছিল না। তার কারণ আমরা বেশীর ভাগ শান্তিনিকেতনে ও শিলাইদায় কাটিয়েছি। সুরেনদা স্টোর রোডের বাড়ি বেচে দিয়েছেন শুনে ভারি দুঃখ হয়েছিল। সেখানে যে আমার কত স্মৃতি জড়িত আছে লিখতে গেলে শেষ হবে না। বড় আনন্দে ও মেজমার আদর যত্নে সেই বাড়িতে দিন কাটিয়েছি। প্রকাণ্ড বাগান, তার এক ধারে একটা মস্ত বড় গাছের তলা গোল করে বাঁধানো ছিল। সন্ধ্যার আগেই সেখানে বসে মেজমা আমাদের খাইয়ে দিতেন ঘুমিয়ে পড়ব বলে। মেজমাদের একটা বড় পুকুর ছিল, তাতে খুব পদ্ম হত। একটা বোট ছিল তাতে করে গিয়ে অন্যরা পদ্ম তুলে নিয়ে আসতেন। পদ্মের চেয়ে আমাদের বেশী লোভ ছিল পদ্মঝাঁঝির উপর। মোটা মোটা দানাগুলি ছাড়িয়ে খেতে খুব ভাল লাগত। শান্তিনিকেতনে যেমন বকুলতলায় আমাদের সারাদিন লেখার জায়গা ছিল, স্টোর রোডেও তেমনি দুটো বড় বড় বকুল গাছ ছিল। তার একটাতে দোলনা খাটানো ছিল। তাতে চড়ে আমার সঙ্গীরা খুব দুলত। এক একবার কত উঁচুতে উঠে যেত দেখলে আমার মাথা ঘুরত। সেইজন্য আমি কোনোদিন দোলনায় চাপিনি তা ওরা যতই সাধাসাধি করুক। বিকেল বেলায় অনেক সময় নাটোরের মহারাজার ছেলে যোগীন্দ্রনাথ আমাদের খেলার আসরে যোগ দিতেন। একবার দোলের দিন মেজমা জোড়াসাঁকো বাড়ির সবাইকে দোল খেলতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। রং খেলা হয়ে গেলে সবাই গেলেন পুকুরে স্নান করতে। স্টোর রোডের বাড়িতে দুটো পুকুর ছিল। একটা পুকুর ছিল একটু পিছন দিকে বাইরে থেকে দেখা যেত না। বউঠানরা এইখানে স্নান করবেন ঠিক করলেন। সেদিন বউঠানদের খুব আমোদ হয়েছিল। জোড়াসাঁকো বাড়িতে থাকেন তাঁরা পুকুরে স্নানের এ রকম সুযোগ পাবেন কেমন করে। স্নানের পরে মেজমা ছেলেদের ও বউদের সবাইকে নতুন কাপড় দিলেন পরতে। একতলার একটা বড় ঘরে খাওয়ার আয়োজন করা হয়েছিল। সাদা মার্বেল পাথরের মেঝের উপর কলাপাতার বদলে দিয়েছিলেন বড় বড় পদ্মপাতা। কি সুন্দর লেগেছিল দেখতে, সেটি আজও আমার বিশেষ করে মনে আছে। এর পরে আরও দু একবার দেখেছি মেজমা পদ্মপাতার উপর খাওয়াতে ভালবাসতেন। আগেই বলেছি যে নাটোরের মহারাজকুমার যোগীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে আমাদের বকুলতলার আসরে আসতেন। তাঁকে আমরা মনু বলে ডাকতুম, এখনও তাই বলি। মনু আর বিভা দুই ভাই বোন। বিভা আমার প্রিয় বন্ধু ছিল। মেজমার ওখান থেকে কিছুদিন বিভাদের বাড়িতে ছিলাম। নাটোরের মহারাজার সঙ্গে বাবার বন্ধুত্ব ছিল। তিনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন। বিভাদের ওখানে আমরা তিন ভাইবোনের মত ছিলাম। চিত্তরঞ্জন দাশের বোন অমলাদি ছিলেন সে বাড়ির আসল কর্ত্রী। অমলাদি ভালমানুষ রানীমা। সংসারের যাবতীয় ভার অমলাদির হাতে অর্পণ করে নিশ্চিন্ত ছিলেন। বিভার মা রানীমাকে আমরা মামণি বলে ডাকতুম। ছোটখাটো মানুষটি, চাঁদের মত তাঁর ছোট কপালে সিঁদুরের টিপটি জ্বলজ্বল করত। এমন লক্ষ্মী শ্রী যাঁর তাঁর কপালের সিঁদুর যে কখনো ম্লান হবে তা ভাবিনি। নাটোরের [illegible] তার ভাগ্যশালাও দেখতে হল। বড় দুঃ

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী

সুসজ্জিত হলঘরে আজ দু চারটে অযত্ন রক্ষিত আসবাবপত্র বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে আছে বছরের পর বছর। দেউড়িতে ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে চার ধারে তাকিয়ে আমার বুকের মধ্যেটা হাহাকার করে উঠল—কি দেখেছিলাম আর আজ কোথায় এলাম! অনেক খালি ঘর পার হয়ে একটা ঘরে মা মণি বসেছিলেন। কাছে যেতে আদর করে পাশে বসালেন। কোথায় গেল আমার ছোট-বেলার সেই লক্ষ্মী-প্রতিমা মূর্তি, আজ তাঁর এ কি নিরাভরণা বৈধব্যের সাজ দেখতে এলাম।

অমলাদি সুগায়িকা ছিলেন, বোধ হয় অনেকেই জানেন। দুঃখ হয় তখন গ্রামোফোনে বা টেপ রেকর্ডে কণ্ঠস্বর ধরে রাখবার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। তিনি যেমন ছিলেন সুকণ্ঠ তেমনি ছিলেন রন্ধনে সিদ্ধহস্ত। বড় বড় পিতলের গামলায় রসে-ভরা পানতুয়া ভাসছে, সে সব যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। বিকেল হলে সুরেনদাদারা টেনিস খেলতে আসতেন। তা ছাড়া কত অতিথি অভ্যাগত আসতেন। তখন অমলাদি তাঁর নিজের হাতে প্রস্তুত মিষ্টান্ন দিয়ে তাঁদের পরিতৃপ্তি সহকারে খাওয়াতেন। বলা বাহুল্য আমরাও তার থেকে বাদ পড়তুম না। এতো গেল মিষ্টান্নের কথা, কিন্তু আমার মুশকিল হোত দুবেলা খেতে বসে। অমলাদিরা পূর্ববঙ্গের লোক, ভীষণ ঝাল খেতেন। আমাদের বাড়িতে আবার ঠিক উল্টো, সব মিষ্টি তরকারি। একটা পাথরের বারান্দায় প্রকাণ্ড বড় থালায় রাশিকৃত ভাত নিয়ে অমলাদি খাওয়াতে বসতেন বাড়ির যত ছেলে মেয়েদের। আমরা সবাই থালার চারপাশে গোল হয়ে বসতুম। অমলাদির কাছে ফাঁকি দেবার যো ছিল না। খেতে পারছি না বলে যে মুখের মধ্যে ভরে রাখব তারও যো ছিল না। তাঁর খাওয়াবার কায়দা ছিল এক হাতে আমাদের ঘাড় ধরে আর এক হাতে বড় বড় থাবায় মুখের মধ্যে ভাত ঠুসে দিতেন, খেতেই হতো।

নাটোরের রাজবাড়ি থেকে বাবা আমাকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে গেলেন। এবার পড়াশোনার পালা শুরু হলো। আমাকে ইংরেজী পড়াতেন মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি অনেকদিন অবধি শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতা করেছেন। তাঁর কাছে আমার ইংরেজী শিক্ষার গোড়াপত্তন ইসাপ্ ফেবলসের গল্প থেকে। তাঁর কাছে পড়তে খুব ভাল লাগত, নানারকম গল্প করে পড়াতেন। তাঁর নামটি সার্থক ছিল তিনি সত্যিই মনোরঞ্জন করতে জানতেন।

আমরা তখন এখনকার পুরোনো Guest House-এ ছিলুম। সেখানে থাকতেই বোধ হয় চার পাঁচটি ছাত্র নিয়ে বিদ্যালয়ের গোড়াপত্তন হয়। বাবার অন্তরঙ্গ বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদার তাঁর ছেলে সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে পাঠিয়ে দিলেন পড়তে। সন্তোষদার কথা বিশেষভাবে মনে আছে, লম্বা চওড়া গৌরবর্ণ, বেশ চোখে পড়বার মত চেহারা। তারপরে তিনি আমাদের ঘরের লোকের মত হয়ে গিয়েছিলেন। দাদার সতীর্থ, দুজনে এক সঙ্গে আমেরিকায় যান। দাদারা আমেরিকায় চলে যেতে আমার কেউ সঙ্গী রইল না, বড় একলা বোধ করতুম। তখনও ওখানে দিনেন্দ্রনাথের স্ত্রী কমলা বা বড় বউঠান (হেমলতা দেবী) আসেননি। পরে ওঁরা যখন নীচু বাংলোয় বাস করতে এলেন তখন কমলা আমার একজন সঙ্গী হলো। তা ছাড়া জগদানন্দ রায় তাঁর দুটি মেয়ে ও ছেলেকে নিয়ে এলেন। শালবীথির কাছে জগদানন্দ-বাবু একটি কুটিরে থাকতেন। আমরা তখন Guest House ছেড়ে শালবীথির কাছে আমাদের নতুন বাড়িতে উঠে এসেছি। আশ্রমে তখনও পাকা বাড়ির চল হয়নি। শুধু নীচু বাংলো ও পুরোনো Guest House ছাড়া। আশ্রম তখন সত্যিকার আশ্রমের মত ছিল। ছেলেদের ছাত্রাবাস, তারও ঐ রকম মাটির দেওয়াল ও খড়ের চাল। অধ্যাপকদের জন্য তখনও "গুরু পল্লী" তৈরি হয়নি। তাঁরা ছাত্রদের সঙ্গেই থাকতেন ও খাবার ঘণ্টা পড়লে ছাত্রদের নিয়ে রান্না ঘরে খেতে আসতেন। ছাত্রদের তখন নিজের থালা-বাসন মাজা প্রভৃতি সব কাজ নিজের হাতে করতে হতো। বাবা বলতেন ছোট বেলায় একটু কষ্ট করে মানুষ হওয়া ভাল। বড় হয়ে যদি বিলাসিতা করতে চায় তো সে কাউকেও শেখাতে হবে না।

আমাদের নূতন বাড়ির পশ্চিম দিকে একটি বড় ঘর ছিল, এখনও আছে, সেইটি ছিল আমার পড়বার ঘর। শাল ফুল ফুটলে তার মিষ্টি গন্ধে ঘর ভরে যেত। সেই ফুলের গন্ধে বোধ হয় কিছু মাদকতা আনতো, দুপুর বেলার পড়তে বসে ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসত।

এর অনেক পরে আমাকে ও আরো চার পাঁচজন মেয়েকে নিয়ে প্রথম মেয়ে বোর্ডিং স্থাপন করা হোল। ঢাকা থেকে দুই বোন এলেন। একজন হিরণদি আমাদের চেয়ে বড়, তাঁর বোন ইন্দু, বয়েসে আমার চেয়ে একটু ছোট। দুই বোনেরই বেশ গানের গলা ছিল। তখনকার স্বদেশী আমলের গান হিরণদিরা খুব গাইতেন। হিরণদির খুব চড়া গলা ছিল। আমার মনে হয় তেজেশবাবুর সঙ্গে হিরণদিরা এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে কি যেন আত্মীয়তা ছিল হিরণদিদের। দেহলীর একতলাটা মেয়েদের বাসের জন্য দেওয়া হলো। মাত্র ৫।৬ জন মেয়ে কাজেই ওরই মধ্যে বেশ ধরে গেল। উপর তলায় মোহিতবাবুর স্ত্রী থাকতেন আমাদের দেখা-শুনা করবার জন্য। তরুণ রায়ের স্ত্রী প্রতিভা আমাদের সঙ্গে কিছুদিন ছিল। তরুণ রায় আমাদের একজন প্রাক্তন ছাত্র। আমার জ্যাঠতুতো ভাই অরুণেন্দ্রনাথের ছোট মেয়ে সাগরিকা আমাদের মধ্যে সব চেয়ে ছোট ছিল। তাকে আমি বেশীর ভাগ দেখাশুনো করতুম। বেশীদিন আমাদের ওখানে ছিল না। শরীরটা বেশী মজবুত ছিল না, বোর্ডিং এর খাওয়া সহ্য হল না। ক্ষিতিমোহনবাবুর শালী হেমলতা সেন ক্ষিতিমোহনবাবুর সঙ্গে প্রথম যেদিন এলেন মনে রাখবার মত। ওকে এইবার টুলু বলেই উল্লেখ করবো। টুলু নামেই বেশী পরিচিত। টুলুর মা বাবা তখন বক্সারে থাকতেন। একে টুলুর রং ফর্সা তাতে পশ্চিমের জল হাওয়া, রং যেন ফেটে পড়ছে। টুলুর বয়সআন্দাজে ওকে খুব ছেলেমানুষ দেখাত। মুখখানা কচি, ঘাড়ের কাছে ছোট করে কাটা চুল। প্রথম দর্শনে হাঁ করে তাকিয়ে রইলুম যে একে আবার ক্ষিতিমোহনবাবু কোথা থেকে পেলেন। টুলু এখন শান্তিনিকেতনের বাসিন্দা হয়ে গেছে। ওর তিন মেয়ে শান্তিনিকেতনে পড়েছে ও ছোট মেয়ে ক্ষমা এখন ওখানে গানের শিক্ষয়িত্রী। আমাদের এই প্রথম মেয়েদের বোর্ডিং বেশীদিন টেকেনি।

(ক্রমশ)

আমরা কে—কীভাবে

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

আসলে সবাই ছুটছে, অর্থাৎ পলাচ্ছে: ধাবমান
কোনো গন্তব্যের দিকে নয়।
যেন পিছনে কোথাও
ছুরি চলছে, অসহ্য ধোঁয়ার মধ্যে বন্দুকের গুলি,
যেন ঠেলাঠেলি ভিড়ে
অদৃশ্য শত্রুর হাত পকেট হাতড়াচ্ছে, যেন
গলা বুক কব্জি থেকে ছিঁড়ে নিচ্ছে গোপন সম্পদ।
কিংবা ভেবে নিন।
রাস্তার মাঝখানে একটা বোমা ফাটলো, সেই শব্দ শুনে
ছুটলো সব, অর্থাৎ পালালো লেংড়ে ঘষটাতে ঘষ্টাতে
যেদিকে দু-চোখ যায়। —এমনি এক ছবি।

আপনি যে নিবিষ্ট মনে কাজে ডুবে আছেন: এবং
আপনার আত্মীয়—যিনি প্রাতিস্বিকতায় মগ্ন, ঘুমে,
কিংবা শিল্পে কবিতায়:
অলৌকিক সুস্থতার দিকে হয়তো আপনার বন্ধুটি
টানছেন: তিনিও
আপনারা সবাই কিন্তু আসলে ছুটছেন তপ্ত কেন্দ্র থেকে
কেন্দ্রহীনতার দিকে—বৃত্তাকার
ছড়িয়ে যাচ্ছেন দূরে সুশীতল।
কল্পনা করুন—
বিশ্বের গলিত নাভি ফেটেছে হঠাৎ
যা দেখি নি, কিন্তু তার শব্দটা শুনেছি,
শ্রবণ মাত্রই ভয়ে যাত্রার আসর থেকে ছিট্‌কে ঊর্ধ্বশ্বাস
দৌড়তে লেগেছি—একা
একটা দল, দিগ্বিদিক; এমনি কোনো ছবি।

আমরা কে কীভাবে ছুটছি সেইটেই দ্রষ্টব্য, দৃশ্য,
আসলে তো কোথাও যাচ্ছি না।

হে নিষাদ

ফণিভুষণ আচার্য

অবশেষে ঘৃণা দিয়ে জ্বালতে হবে এ ধ্বনিটা।
অন্ধকার শব্দের টাওয়ারে
একটি শব্দও নেই, শুধু নিষ্ঠুরের তীরে বেঁধা
রুপোলী ডানার এক ছিন্নভিন্ন খর স্রোতস্বিনী
আঁধারে লুকালো মুখ, হে পৃথিবী, হে মহাপৃথিবী, দ্বিধা হও—
বহু শত বছরের ইন্দ্রধনু ভেঙে গেল,
ভেঙে ভেঙে গেল।

এ এক গোপন যুদ্ধ, হৃদয়ে বারুদ
কপালের কাটা দাগে জারুল কাঠের চিতা জ্বলে
বাগানে গোলাপ তুলে নখে তার পাপড়িগুলো
ছিঁড়তে ছিঁড়তে আজ
হে প্রেমিক, অন্ধকারে এবার অরণ্যে ফিরে চলো।

তবুও আকাশে মেঘ ভেসে যায়, কতবার ভেসে গেছে
অলকানন্দায়
অমার্জিত কাঁটাবনে বুক চিরে কতবার রক্তের আরতি
কলকাতার আঁচলেই ঝড় লাগে, ঝড়ের দোলনায়
শিশুরা কান্নার মতো ইদানীং ভয় ভুলে গেছে

আত্তিলা চেঙ্গিস ওরা আমাদের কেউ ছিল ?
হয়তো বা ছিল
হয়তো আমরা আর আমাদের কেউ নই,
আমরা অন্য ঘর—
বংশলতিকায় শুধু অগণিত শতাব্দীর পাপ
সেই পাপে ধ্বংস হবো, নিজেদের ধ্বংস করে যাবো।

পাথরবীজ

অমল ভৌমিক

সন্ধ্যে হয়ে এলে
নদীর বুক থেকে
ছিনিয়ে নিই সমুদ্র।
পাহাড়ের বুকে রোপণ করি
পাথরবীজ।
দিগন্তের অন্ধকারে
পাহাড় হয়ে
সমুদ্র থেকে কুড়িয়ে আনি
ভবিষ্যৎ।

সারা বেলা কোথা যাও

বেণু দত্ত রায়

সারা দিন তোমাকে খুঁজি ইতস্তত। রাস্তায়
কোথায় যাও, ঘর থেকে বাইরে যাও, বাড়ি
ছুটি নিতে ভুলে যাও, সারা বেলা
কোথায় যাও, প্রহর আগলাও গিয়ে। জানালা
দরজা সব খোলা রেখে যাও। পাহারাওলা
খোঁজে তোমাকে। তোমার নামের টিকিট লাগানো
চিঠি পোস্টম্যান ছিঁড়ে ফেলে দেয়। অনাদরে
তোমার নামের লেবেল ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলে, ফুটপাথে
হাওয়ায় ওড়ে, ধুলোয় রোদ্দুরে, তুমি
কোথায় যাও, কোথা থেকে আস

সারা দিন তোমাকে খুঁজি ইতস্তত। তুমি
পরোয়া কর না। কোথায় যাও, কোথা থেকে
ফিরে আস—
এয়ার হোস্টেসের মত নীল মেঘ
একরাশ সোনালী রোদ্দুরে তুমি কোথা পেলে
আমি জাফরানী আঙুলে ভালোবাসা বলে
ডেকেছি, আংটিতে কার নাম দেখে
লটারীর টিকিট কেটেছি, তুমি কিছুই বোঝো না
তোমার আয়তী নেই, তুমি কুমারীও নও
অথচ বুকের কাছে ভয়ংকর কলকা ফুলে পাড়
শাড়ির আঁচল দোলাও প্রলয়ের মেঘ মনে আসে

আমি তাই
সারা বেলা তোমাকে খুঁজি ইতস্তত। রাস্তায়
সারা বেলা কোথা যাও, ছুটি নিতে ভুলে যাও

দ্বিজত্বে

প্রফুল্লকুমার দত্ত

এখন দ্বিতীয় জন্মে, ভালোবাসা, চিনলাম তোমাকে।

অথচ প্রথম জন্মে তোমাকে না-চেনার জন্যেই
শিশুকে মেরেছি টুঁটি টিপে,
পাখিকে ছুঁড়েছি তীক্ষ্ণ তীর,
ফুলকে রেখেছি ছিঁড়ে ফেলে
দু পায়ে মাড়িয়ে চলে গেছি, রমণীকে
মদের শামিল ভেবে অন্ধকারে প্রত্যহ টেনেছি
এখন দ্বিতীয় জন্মে শিশুকে দারুণ ভালো লাগে, ভালো লাগে
এখন পাখিকে, ভালো লাগে
ফুলকে, এখন
যে-কোনো রমণীকেই মায়ের মতন ভালো লাগে।

ভালোবাসা, তোমার ছোঁয়ায়
দ্বিজত্ব ঘটার পরে শিশু, পাখি, ফুল ও রমণী
আমার জানলায় এসে উঁকি মারে প্রত্যহ। এখন
সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা, রাত
নির্ভার আমার বুকে। এখন আমার
সকালে শিশুর কণ্ঠে তুমি জাগো, এখন আমার
দুপুরে পাখির গানে তুমি ভাসো, এখন আমার
সন্ধ্যায় ফুলের গন্ধে তুমি হাসো, আর
এখন আমার রাতে রমণীর কমনীয় স্পর্শে তুমি মায়ের মতন
স্বর্গমর্তরসাতল জুড়ে স্বপ্রকাশ।

এখন দ্বিতীয় জন্মে, ভালোবাসা, চিনলাম তোমাকে॥

এমন করে তিলে তিলে

বিশ্বরূপ মণ্ডল

এমন করে তিলে তিলে খুন করার কি কোনো দরকার ছিলো?
তোমার উচ্ছ্বসিত হাসির আড়ালে গোপন হাতিয়ার যখন
নিশ্চয়ই আছে, পায়রার পালকের মতো নরম এই মন
কেটে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করতে ভণিতার চেয়ে অনেক ভালো
সোজাসুজি নাথুরাম গড়সে কিংবা ওসওয়াল্ডের মতো তোমার
নিষ্কম্প হাতে
একটা অব্যর্থ পিস্তল; আমার সমস্ত উত্তাপ মমি হতো তাতে।

এমন করে তিলে তিলে খুন করার কি কোনো দরকার ছিলো?
আমার ধমনীতে উদ্দাম রক্তকণিকার রঙটা বীভৎস কালো
করার স্পৃহা যখন দানা বেঁধে উঠলো তোমার মনে, নিটোল
তোমার বুকের পাত্রগুলিতে অঢেল সুতীব্র হলাহল
যেখানে যথার্থই আছে, কানে তার তীব্রতা ঢেলে দিলে
সৃষ্টি হয় নতুন হ্যামলেট, নাই বা খুন করলে তিলে তিলে।

আমার জীবনচর্চা

ইন্দ্রজিৎ

অনেক মানুষ আছেন যাঁরা ধর্মের ব্যাপারে কোন প্রকার রিচুয়েল বা আচারে বিশ্বাস করেন না। মুখের কথা, মনের ভাবনা, নিত্য দিনের কাজকর্মের মধ্যেই প্রকৃত ধর্মাধর্মের প্রকাশ বলে তাঁরা মনে করেন। অর্থাৎ আচারের চাইতে আচরণকে তাঁরা বড় স্থান দেন। আমার পিতৃদেব সেই জাতীয় মানুষ ছিলেন। দেব ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামাতেন না, পূজার্চনা সন্ধ্যাহ্নিক কোন কালে করতে দেখিনি। গায়ে পড়ে কোনদিন কোন প্রকার ধর্মোপদেশও আমাদের দেননি। কিন্তু আমাদের বালক বয়সে তিনি আমাদিগকে একটি প্রার্থনা মন্ত্র শিখিয়েছিলেন। আমরা ভাইবোনরা সেটি দিনান্তে একবার মনে মনে উচ্চারণ করতাম। বলা প্রয়োজন, সে মন্ত্র সংস্কৃত ভাষায় লেখা নয়, লেখা রবীন্দ্রনাথের বাংলা ভাষায়—

> আমার বিচার তুমি কর তব আপন করে
> দিনের কর্ম আনিনু তোমার
>
> বিচারঘরে—ইত্যাদি

ব্রহ্মসংগীত গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত এই গান বা কবিতাটি অনেকেরই পরিচিত। সকলেই স্বীকার করবেন যে, এই প্রার্থনাটি বড় সাধারণ প্রার্থনা নয়; অতিশয় কঠিন প্রস্তাব বলতে হবে। প্রার্থনাটি যতই কঠিন হোক, পিতৃদেব খুব সহজভাবেই, বলা যেতে পারে, খুব আলগোছে এটিকে আমাদের সম্মুখে তুলে ধরেছিলেন। সারা দিনে যা-কিছু করি না-করি দিনের শেষে একবার যেন তা ভেবে দেখি। ব্যস্ ওই-টুকুই, তার বেশী কিছু নয়। বলা নিষ্প্রয়োজন যে 'দিনের কর্ম আনিনু তোমার বিচারঘরে' ইত্যাদি কথার গুরুত্ব আমি তখন কিছুমাত্র বুঝতে পারিনি, ওই বয়সে বুঝবার কথাও নয়। ভাগ্যিস বুঝিনি, বুঝলে জীবনের আনন্দ অনেকখানি কমে যেত। কারণ, এ কথা নিশ্চিত যে, দণ্ডনীয় অপরাধ প্রতিদিনই কিছু না কিছু করেছি কিন্তু তাই নিয়ে আমার মনে কোন দুর্ভাবনা ছিল না। প্রার্থনামন্ত্রটি উচ্চারণ করবার সময় সারা দিনের কার্যাবলীর কথা অবশ্যই মনে হত কিন্তু খুব স্বাভাবিক কারণেই সারা দিনে বিশেষ বিশেষ মজার ব্যাপার যে ক'টি ঘটেছে আমার চোখে তাই বড় হয়ে দেখা দিত। সারা দিনের ঘটনা চলচ্চিত্রের মত চোখের সম্মুখে একের পর এক ভেসে উঠত, আর আমি মনে মনে আর এক দফা হেসে নিতাম, দিনের আনন্দ দ্বিগুণিত হত। ওই গুরু-গম্ভীর প্রার্থনা-সংগীত আমার মনে কোন গুরুভার চাপায় নি, আমার আনন্দে কখনও বাদ সাধেনি বরং আমার কিশোর জীবনের আনন্দ অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছে। ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাইনি, বিচারালয়ের কথা মনেই হয়নি, কোন বিচারকের উপস্থিতিও কখনও অনুভব করিনি। আমার নিজের বিচারে যা কৌতুক-কর মনে হয়েছে তাকে নানাভাবে নেড়ে-চেড়ে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে সেই কৌতুকটুকু পুরোপুরি উপভোগ করেছি। ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন বড়দের কাছে যতখানি জটিল, ছোটদের কাছে ততখানি নয়। 'না বলিয়া লইলেও' যে সব সময়ে চুরি হয় না, ছোটরা তাদের সহজ বুদ্ধিতে দিব্যি বুঝতে পারে কিন্তু বড়রা কিছুতেই বোঝে না। শিশুরা তাদের নির্মল বুদ্ধিতে জানে যে, সদা সত্য কথা না বললেও চলে। পাপ মনে কিছু করে না বা বলে না বলে তাদের মিথ্যাও নিষ্পাপ। বড়রা মুখে এক, মনে আর। সেজন্যে তাদের সত্য কথারও সততা যাচাই করে নিতে হয়।

যাক, যে কথা বলছিলাম। ওই প্রার্থনা-সংগীতটির কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। তার মানে এই নয় যে, আমি খুব একজন ধর্মভীরু, ভগবৎ-ভক্ত মানুষে পরিণত হয়েছি। ধর্মকর্মে আমার মতি নেই। কৃতজ্ঞ এই কারণে যে, আমার স্বভাবগত কৌতুক-প্রিয়তাকে সে সঞ্জীবিত রেখেছে। সেই মন্ত্রোচ্চারণের দিন থেকে জীবনের কত বৎসর কেটে গেল। কৈশোর কাটিয়ে যৌবন, যৌবন পার করে প্রৌঢ়ত্ব, প্রৌঢ়ত্বের সীমা পেরিয়ে এখন বার্ধক্যে উপনীত হয়েছি। Conscience-এর মতো বার্ধক্য makes cowards of us all. এই বয়সে কেউ যদি মনে করিয়ে দেয়, শুধু দিনের কর্ম নয়, সমগ্র জীবনের কর্ম আনিনু তোমার বিচারঘরে তখন ব্যাপারটা আর কৌতুকপ্রদ থাকে না, ভীতিপ্রদ হয়ে ওঠে। ইংরেজিতে যাকে বলে Day of Reckoning কিংবা আমাদের ভাষায় 'শেষের সেদিন কী ভয়ঙ্কর'—এ জাতীয় ভাব মনে এসে যেতে পারে। কিন্তু স্বভাব যায় না মলে, সে কি বয়স হলেই যাবে? সত্যি বলছি, জীবনের বহু অক্ষমতা, নিষ্ফলতা, আশাভঙ্গের ঘটনাকে আমার কিশোর জীবনের ঘটনাবলীর মত আমি জীবনের কৌতুক হিসাবেই দেখেছি। আমি যেমন কৌতুক-বিলাসী, জীবন-বিধাতাও তেমনি। যে বিধাতা মানুষ সৃষ্টি করেছেন মানবিক গুণাগুণ নিঃসন্দেহে তাঁর মধ্যে বর্তমান। আমরা শুধু তাঁর sense of Justice-এর কথাই ভাবি, তাঁর sense of humour-এর কথা মনে রাখি না। লক্ষ্য করবার বিষয় যে, সকল জীবনের মধ্যে এক-মাত্র মানুষই হাসতে জানে। এটিই মানুষের সব চাইতে বড় গুণ এবং সেই কারণে বিধাতাপুরুষেরও। কারণ, নিজের সর্বশ্রেষ্ঠ গুণাবলী তিনি মানুষকেই দিয়েছেন। প্রকৃত রসিকজনের ন্যায় বিধাতাপুরুষ রহস্যপ্রিয়, পরিহাসপ্রিয়। কখনও কখনও ওই পরিহাস-প্রিয়তা একটু কঠিন আকার ধারণ করে, তখন তাকে নিছক হিউমার না বলে বলি আয়রনি। ইংরেজিতে যাকে বলে Irony of fate সেই হচ্ছে বিধাতার চরম রসিকতা, সেখানে মানুষের চরম পরীক্ষা। যিনি অদৃষ্টের পরিহাসকে হাসি মুখে গ্রহণ করতে পারেন তিনিই প্রকৃত জীবন-রসিক।

এখন আমি যে বয়সে উত্তীর্ণ হয়েছি সেখানে মানুষ স্বভাবতই পেছন ফিরে তাকায়। জীবনটা কি হয়েছে, কিন্তু কি হতে পারত তাই নিয়ে মনে মনে হা-হুতাশ করে না এমন মানুষ সংসারে কমই আছে। বললে কেউ বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, কিন্তু সত্যি বলছি, এ নিয়ে আমার মনে কোন প্রকার অনুশোচনা নেই। যদিচ সার্থক জনম আমার বলবার মতো কোন কৃতিত্বের গৌরব দাবি করতে পারিনে তথাপি ছোট-খাট চরিতার্থতা যেটুকু জুটেছে তার সঙ্গে নিজের অনেক রকমের ভুল ত্রুটি মূর্খতা মিলিয়ে জীবন আমার কাছে বেশ উপ-ভোগ্যই মনে হয়েছে। ভাগ্যবিধাতার রসিকতার সঙ্গে নিজের রসবোধকে মিলাতে পারলে জীবনের দুর্ভাগ্যও উপভোগ্য হয়ে ওঠে। এইটুকু আমি বুঝেছি যে, আমি মানুষটা স্বভাবে রুচিতে যতক্ষণ ঠিক এরকম আছি—খামখেয়ালী, বদমেজাজী, অলস প্রকৃতির, ঢিলেঢালা স্বভাবের—ততক্ষণ অসম্ভব বড় রকমের একটা কিছু আমার জীবনে কিছুতেই ঘটতে পারত না। অন্য

কিছু যদি ঘটত তা হলে এ কথাই প্রমাণিত হত যে, সে মানুষটা আমি নই, অন্য কেউ। আমি অন্য কেউ হতে রাজি নই। জওহরলালের এমন জীবন, জীবনে যা-কিছু মানুষের আকাঙ্ক্ষিত তার সমস্তই বিধাতা দু-হাত ভরে তাঁকে দিয়েছিলেন, তথাপি জীবনের শ্রেষ্ঠ কাল কাটিয়েছেন জেলে, রুগ্না স্ত্রীর শয্যাপার্শ্বে সব সময় থাকতে পারেন নি, একমাত্র সন্তানকে আপন স্নেহসঙ্গ থেকে বঞ্চিত করেছেন। আত্মচরিতের উপসংহারে বলেছেন, এই তো আমার জীবন: মনে হতে পারে জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছি। আজ যদি জীবন বিধাতা এসে বলেন, মানুষ জীবনে যা চায় সবই তোকে উজাড় করে দিয়েছিলাম। তুই তার মর্যাদা রাখিসনি, সব নিজ হাতে নষ্ট করেছিস। এই নে, তোকে আবার সব ফিরিয়ে দিচ্ছি, তুই গোড়া থেকে আবার শুরু কর। বলেছেন, এমন যদি হত তা হলেও জানি, আমার জীবনে ঠিক ঐ একই জিনিস ঘটবে। জীবনকে নিয়ে আবার সেই ছিনিমিনি খেলব। কারণ আমার স্বভাবের মধ্যে এমন কিছু আছে যা আমাকে নিশ্চিতরূপে আবার ঐ পথেই টেনে নিয়ে যাবে।

ওটাই হল আসল কথা। চেষ্টা করলে আর সব কিছু থেকে আত্মরক্ষা করা যায় কিন্তু নিজের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করবে কে? আমরা যাকে অদৃষ্ট বলি সে আমার নিজের স্বভাব, আমার মনের গড়ন যা আমাকে অমোঘ শক্তিতে বিশেষ এক দিকে টেনে নিয়ে যায়। মনের গড়নই জীবনকে গড়ে। মন একবার গড়ে উঠলে দ্বিতীয় ভাঙা আর সম্ভব হয় না, জীবন আর নতুন করে শুরু করা যায় না। আমার জীবনবিধাতা আমাকে তেমন কোন সুযোগ যদি দিতেন তাহলে লাভের মধ্যে আমার স্বভাবসুলভ আলস্য এবং খামখেয়ালিপনা শুধু দ্বিগুণিত হত, এ ছাড়া আর কোন লাভ হত না।

আমার মনে কোন অনুশোচনা নেই এই কারণে যে আমি জীবনে যা চেয়েছি পুরোপুরি না হলেও কিছু পরিমাণে তা আমি পেয়েছি। পুরোপুরি কেউ পায় না। তাছাড়া যা পেয়েছি তার বেশি চাইতে গেলেও সে আমার সাধ্যে কুলোত না। আবার যেটুকু পেয়েছি তাও ঠিক সময়মতো পাইনি। জীবনে যা কিছু চরিতার্থতা যথাসময়ে না হলে তার সার্থকতা খানিকটা নিঃসন্দেহে কমে যায়। বলা বাহুল্য, এর জন্যেও আমি নিজেই দায়ী। দীর্ঘসূত্রতা আমার স্বভাবগত। ঠিক সময়ে ঠিক কাজটি জীবনে কখনো করিনি। যে মানুষ দীর্ঘসূত্রী তার জীবনবিধাতাও দীর্ঘসূত্রী। তিনিও রয়ে সয়ে দেন। ফলে হয়েছে কি, যখন যা পেয়েছি, দেখেছি তখন তার প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছে। এও জীবনের এক কৌতুক। আগেই বলেছি, আমি যেমন কৌতুকপ্রিয়, আমার জীবন-দেবতা তেমনি আমাকে নিয়ে অনেক কৌতুক করেছেন।

আমাদের দত্তকুলোদ্ভব কবি বলেছিলেন —আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়। আশার ছলনা শুধু আপাতদৃষ্টিতে, আসলে ব্যাপারটা জীবনেরই ছলনা। তা সে ছলনা যারই হোক, ফলটা তো কিছু খারাপ হয়নি। জীবনের ছলনায় ভুলে সংসারে ক'জন মানুষ মধুসূদনের মতো অমর হয়েছেন? মধুসূদনের সঙ্গে এক জায়গায় অন্তত আমার একটি মিল আছে। আমিও দত্তকুলোদ্ভব লেখক, অতএব অমরত্ব লাভের দাবি আমারও কিঞ্চিৎ আছে। তবু এখনও যে অমর হইনি, তার কারণ আমি এখনও মরিনি। অমর হতে হলে আগে মরতে হয়। কিন্তু অমরত্ব অর্জনের পথে প্রধান বাধা হল জীবন আমাকে তেমনভাবে ছলনা করেনি। বরং উল্টোটা করেছে, আমাকে প্রশ্রয় দিয়েছে অর্থাৎ প্রাপ্যের অধিক দিয়েছে। যেটুকু আমার গুণপনা তার তুলনায় গুণকীর্তনটা বোধকরি একটু বেশিই হয়েছে। সেদিক থেকে জীবন আমাকে ছলনা করেনি, আমিই জীবনকে ছলনা করেছি, ফাঁকি দিয়েছি এবং সেই কারণেই আমি হয়েছি সাধারণ। জীবনের পূর্ণ মূল্য আমি দিইনি। জীবনের ছলনা সহনের শক্তিই জীবনের যথার্থ মূল্য। 'অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে' সে মানুষই জীবনের সর্বোত্তম পুরস্কার লাভের অধিকারী। 'এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বেরে করেছ চিহ্নিত।' রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষ বাক্যে জীবনের এই ছলনারই জয়গান করেছেন। জীবনের সৌন্দর্য মাধুর্য মাহাত্ম্য সবই ঐ ছলনার মধ্যে। ছলনা তো নিন্দার কথা নয়। নারীকে আমরা যখন ছলনাময়ী বলি, সে কি তার নিন্দা করে বলি? একেবারে উল্টো। ঐটিই তার সর্বপ্রধান আকর্ষণ। নারী যদি ছলনাময়ী না হত তবে সে ভালোবাসার অযোগ্য হত। জীবন যে এত সুন্দর তারও মূলে ঐ ছলনা। ছলনাই তাকে রহস্যময়ী করেছে, তাকে মনোহর করেছে।

যে জীবন প্রবঞ্চনামুক্ত সে জীবন বিরস, একঘেয়ে, গতানুগতিক। যথেষ্ট পরিমাণে প্রবঞ্চিত হইনি বলেই আমি নিজেকে বঞ্চিত মনে করছি। জীবনের ছলাকলা কঠিন প্রবঞ্চনার সম্মুখীন হলে আমার যৎসামান্য শক্তি সামর্থ্য আরো কিঞ্চিৎ উদ্দীপিত হতে পারত। আগেই বলেছি যে জীবন আমাকে প্রবঞ্চনা করেনি বরং প্রশ্রয় দিয়েছে; কিন্তু সে প্রশ্রয়েরও মর্যাদা আমি রাখিনি। বিধাতা শক্তি সামর্থ্য যেটুকু দিয়েছিলেন তারও যথাযথ ব্যবহার করিনি। সোজা কথায় জীবন আমাকে ঠকায়নি, আমিই জীবনকে ঠকিয়েছি। সংসার বা জীবন আমাদের যা দেয় তা আবার তাকে ফিরিয়ে দিতে হয়। আমি যতখানি পেয়েছি ততখানি দিইনি। এত বেশি কুঁড়েমি করেছি যে অত্যাবশ্যক কাজেও ফাঁক পড়েছে, নিজের কাছে নিজেকেই ফাঁকি দিয়েছি। আমার মতে অবশ্য কুঁড়েমি করাটাও একটা কাজ এবং মস্ত বড় কাজ, তবে সংসারের চোখে সেটা কাজ বলে গণ্য নয়। এ কথা নিশ্চিত যে শুধু কাজ দিয়েই জীবনের পরিমাপ নয়। কতখানি হেসেছি খেলেছি গেয়েছি সেটাও জীবনের মস্ত বড় একটা অংশ। এসব জিনিসে কমতি পড়লে জীবনে অনেকখানি ঘাটতি থেকে যায়। তারও উপরে মানুষ কতখানি ভালোবেসেছি। রাগরঙ্গ করেছি। এখানে মানুষের আরো অন্তরঙ্গ পরিচয়। কোন কোন মানুষের থাকে ভালোবাসার infinite capacity, ভালো মন্দ নির্বিশেষে সকলকে তাঁরা ভালোবাসেন। বলা বাহুল্য, ওরকম নির্বিচার ভালোবাসায় আমার মন ওঠে না। যে ভালোবাসায় অনুরাগের রং লাগেনি সে ভালোবাসা পুজোআর্চনার মত রিচুয়েল জাতীয়, তার মধ্যে প্রাণের আবেগ নেই। ভালোবাসার ব্যাপারে আমার অনেক রকম বাছবিচার। আমি ব্যক্তিমাত্রকেই ভালবাসি না, বিশেষ ব্যক্তিকে ভালোবাসি। আবার যে ভালোবাসতে জানে সে যথার্থভাবে ঘৃণা করতেও জানে। আসলে ঘৃণা করবার ক্ষমতা মানুষের মস্ত বড় গুণ। কোন মানুষ কোন জিনিসকে ঘৃণা করে তাই দিয়ে তার অনেকখানি পরিচয়। ডক্টর জনসন যে বলেছিলেন Sir, he is a very good hater —এটি তাঁর একটি বিশেষ প্রশংসাসূচক উক্তি। তিনি নিজেও ঐ গুণটির অধিকারী ছিলেন। ঘৃণাকে তিনি মূল্য দিতে জানতেন। এই জনসনীয় গুণটির চর্চা আমিও যৎকিঞ্চিৎ করেছি, এই গর্ব আমার আছে। সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে ভালোবাসার যতখানি প্রয়োজন, ঘৃণারও ততখানি। কিছু দিন আগে আমার একজন বিদেশী বন্ধু বলেছিলেন, আপনাদের সমাজে একটি জিনিস লক্ষ করেছি, এখানে sense of indignation-এর বড় অভাব অর্থাৎ লজ্জার ব্যাপার ঘটলে খুব বেশি মানুষ লজ্জা বোধ করে না, ঘৃণার ব্যাপারে ঘৃণা বোধ করে না। এই কারণে বহু অবাঞ্ছনীয় ব্যাপার সমাজে নির্বিবাদে চলতে থাকে। আমি আমার সমাজকে যথাসাধ্য ভালোবেসেও অনেক সময় তাকে আঘাত করে কথা বলেছি, লিখেছি। ইংরেজ কবি-সমালোচক কাব্যকে বলেছিলেন, criticism of life। এই নিয়ে অনেকে অনেক আপত্তি তুলেছেন। আমার যৎসামান্য সাহিত্যকর্মকে আমি বিনা দ্বিধায় criticism of life আখ্যা দিয়ে থাকি। তবে এইটুকু বলব যে বিরাগের কথাও অনুরাগের সঙ্গেই বলেছি।

জেনারেল আউটরাম

বিমল মিত্র

মতিহারীর ছেলে শিউশরণ মিশির চমকে উঠলো। পার্ক স্ট্রীট থানার পুলিশ কনস্টেবল শিউশরণ মিশির এমনিতে বড় চমকায় না। হাতে একটা মোটা লাঠি নিয়ে শিউশরণ নিয়ম করে নিজের ডিউটি করে। আর যখন ডিউটি থাকে না, তখন নিজের কোয়ার্টারে বসে 'রাম-চরিত-মানস' পড়ে।

বড় দারোগাবাবু শিউশরণকে খাতির করেন খুব।

বলেন—মিশিরজী খুব সাচ্চা মানুষ হে, ওকে কিছু বলো না—

সাচ্চা মানুষ হওয়ার একটা কারণ বড় দারোগাবাবু জানতেন শিউশরণ মিশির 'রাম চরিত মানস' পড়ে। আর দ্বিতীয় কারণ শিউশরণ মিশিরের বাবা সীয়ারাম মিশিরও সাচ্চা লোক ছিল। সীয়ারাম মিশির ছিল পুলিশের হেড-কনস্টেবল, সীয়ারাম চাকরি থেকে রিটায়ার করবার সময় মতিহারী যাবার আগে বড়-দারোগাবাবুকে বলে গিয়েছিল—আমার ছেলে শিউশরণকে চাকরিতে বসিয়ে দিয়ে গেলাম হুজুর, একটু দেখবেন—

তা শিউশরণ বাবার সুনাম বজায় রেখেছে এখন পর্যন্ত। এখন পর্যন্ত কেউ বলতে পারবে না শিউশরণ মিশির ঘুষ খায় ট্যাক্সিওয়ালাদের কাছ থেকে। অনেককাল বাঙালীরা পুলিশ লাইনে এসেছে। এসে পুলিশের চাকরির বদনাম করে দিয়েছে। সে-জন্যে শিউশরণের দুঃখ হয়। কিন্তু তা বলে নিমক-হারামি করে না সে কখনও। বলে—ওরা আমাদের ইজ্জত ডোবাচ্ছে—

গীর্জার ঘণ্টায় ঢং ঢং করে দুটো বাজলো। রাত দুটো। পার্ক স্ট্রীট আর চৌরঙ্গীর মোড়ে টহল দিতে দিতে এক সময় সে পাথর-বাঁধানো বেদীটার ওপর বসলো। চারদিকে নির্জন নিরিবিলি। অথচ দিনের বেলা এখানে ডিউটি পড়লে শিউশরণের নিঃশ্বাস ফেলবার সময় থাকে না। চোখ দুটো বুজে একটু ঢুলে এলো তার।

হঠাৎ মাথার ওপর একটা আওয়াজ শুনে সে চমকে উঠলো।

মাথার ওপর বিরাট আর একটা বেদী। সেই বেদীটার ওপর গান্ধীর একটা মূর্তি। ছোট্ট এক টুকরো একটা কাপড় পরে লাঠি নিয়ে বুড়ো মানুষ হেঁটে চলেছে!

—নামো, নামো শিগ্‌গির!

শিউশরণ চমকে উঠে ওপরের দিকে তাকালো! কে অমন কথা বলছে! কে কাকে নামতে বলছে!

—কই, নামলে না? নামো বলছি শিগ্‌গির!

শিউশরণ দাঁড়িয়ে উঠে লাঠিটা বাগিয়ে ধরলে! দেখলে ঘোড়ার ওপর বসে একটা ইংরেজ সাহেব গান্ধীর দিকে চেয়ে চিৎকার করে বলছে—নামো শিগ্‌গির, নামো!

গান্ধীর হাতের লাঠিটা যেমন ছিল

তেমনিই রইল। মুখে একটু মৃদু হাসি ফুটে উঠলো শুধু।

বললেন—কেন, নামবো কেন আমি?

সাহেব বললে—ওটা আমার জায়গা, আমি ঘোড়ায় চড়ে ওর ওপরে বসে ছিলুম, ওটা আমার জায়গা!

—তুমি কে? নাম কী তোমার?

সাহেব বললে—আমার নাম স্যার জেমস আউটরাম। আমাকে সবাই জেনারেল আউটরাম বলে জানে! তুমি আমার নাম শোননি?

গান্ধী বললেন—তোমার নাম কে না জানে জেনারেল! কিন্তু তুমি তো মারা গিয়েছিলে, এখানে কী করে এলে?

জেনারেল আউটরাম বললে—এতদিন আমাকে একটা ঘরের মধ্যে ওরা আটকে রেখেছিল। হঠাৎ আমি আমার ঘোড়াটা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি। এখানে এসে দেখছি তুমি আমার জায়গায় উঠে বসেছ। তুমি নামো, নামো শিগ্‌গির—আমার জায়গায় আমি বসবো, নামো তুমি, আমার জায়গা ছেড়ে দাও—

গান্ধী চারদিকে চেয়ে দেখলেন। সামনের রাস্তাটা খাঁ-খাঁ করছে।

বললেন—এটা কোন্ সাল জেনারেল?

জেনারেল আউটরাম বললে—উনিশ শো উনসোত্তর—

—কোন্ মাস?

—নভেম্বর।

—ও, তা হলে তো এক শো বছর বয়েস হলো আমার। তোমার কত?

জেনারেল বললে—আমার হলো একশো ছেষট্টি বছর। কিন্তু এ বয়েসও আমি তরোয়াল ঘোরাতে পারি আগেকার মত! দেখবে?

—কিন্তু ব্রিটিশ এম্‌পায়ার তো শেষ হয়ে গেছে। এখন আর তরোয়াল ঘুরিয়ে কী হবে? তরোয়াল দিয়ে আর কিছু ফল হবে না জেনারেল। আমি অহিংসা দিয়ে তোমাদের তাড়িয়ে দিয়েছি ইণ্ডিয়া থেকে। আমি বলেছিলুম কুইট ইণ্ডিয়া, এখন তোমরা ইণ্ডিয়া কুইট করেছ—

জেনারেল আউটরাম যেন খবরটা শুনে রেগে গেল। এক ঝটকায় ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়লো। তারপর তরোয়ালটা ডান হাতে উঁচু করে ধরে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। বললে—কী বললে তুমি? আর একবার বল?

গান্ধী বললেন—ব্রিটিশরা ইণ্ডিয়া কুইট্ করে চলে গেছে।

—চলে গেছে? কবে?

—উনিশ শো সাতচল্লিশ সালে। পনেরোই আগস্ট।

জেনারেল আউটরাম হো হো করে হাসতে লাগলো।

শিউশরণ মিশির কী করবে বুঝতে পারলে না। গান্ধীর সামনে সাহেবের এত হাসি তার ভালো লাগলো না। একবার ভাবলে লাঠিটা তুলে নিয়ে সাহেবের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে বলে—ভাগো, ভাগো ইহাঁসে—

কিন্তু একটু পরেই জেনারেল সাহেবের তরোয়ালটার দিকে চেয়ে কেমন থমকে দাঁড়ালো। সাহেবের তরোয়ালের ধার লেগে তার লাঠি দুখানা হয়ে যেতে পারে।

সাহেব শিউশরণকে দেখতে পায় নি। চিৎকার করে বলে উঠলো—নামো তুমি, নেমে এসো, ন্যাংটো ফকির কোথাকার—চার্চিল তোমাকে গালাগালি দিয়েছিল, মনে নেই?

গান্ধী হাসলেন।

বললেন—তুমিও তা জানো দেখছি—

—জানি, আমি সব জানি!

—কিন্তু তুমি কী করে তা জানলে জেনারেল?

জেনারেল আউটরাম বললে—আমি সব জানি। আমি এত বড় এম্‌পায়ারটা শায়েস্তা করলুম আর এটা জানবো না? কিন্তু এম্‌পায়ার যাক, এম্‌পায়ার চলে গেলেও আমি চলে যাইনি, আমি তো আছি! আমি এত দিন এই পার্ক স্ট্রীটের মোড়ের মাথায় ঘোড়ায় চড়ে সব কিছু পাহারা দিচ্ছিলাম, এখন আমাকে নামিয়ে দিয়ে তুমি কেন আমার জায়গায় চড়ে বসেছ, নামো!

গান্ধীর তখনও সেই প্রশান্ত স্থির মূর্তি।

বললেন—কিন্তু আমি তো এখানে কোনও দিন চড়ে বসতে চাইনি জেনারেল—ওরাই জোর-জবরদস্তি করে আমাকে চড়িয়েছে—

জেনারেল আউটরাম বললে—ওরা মানে আপনার ভক্তরা? কংগ্রেসের মেম্বাররা?

হ্যাঁ, কংগ্রেসের মেম্বার বটে কিন্তু আমার ভক্ত নয় ওরা!

—ভক্ত নয়?

জেনারেল আউটরাম যেন ঠিক বিশ্বাস করতে পারলে না কথাটা।

বললে—কংগ্রেস মেম্বাররা আপনার ভক্ত নয়?

গান্ধী বললেন—না জেনারেল, না।

জেনারেল আউটরাম হাসলো। বললে—বুঝেছি। তোমার ঘাড়ে বন্দুক রেখে ওরা হাওয়া গরম করতে চাইছে। যত সব স্টুপিড শিষ্য তুমি রেখে গেছ এখানে—

—আবার শিষ্য বলছো কেন? আমি কি কংগ্রেসের কেউ? কখনও কি কংগ্রেসের কেউ ছিলুম আমি? আমাকে কি কখনও কেউ মেনেছে? আমি তো কংগ্রেসে চাঁদাও দিতুম না। জহর আমাকে কত করে বলেছিল মেম্বার হতে, কিন্তু আমি মেম্বার হইনি। তা জহরকে এবার ডেকে দিতে পারো জেনারেল আমার কাছে?

—ইউ মিন্ নেহরু? জওয়াহার লাল নেহরু? সে তো মারা গেছে!

—সে কী? মারা গেছে? কবে? কী হয়েছিল?

জেনারেল বললে—সে অনেক কথা! আমি সব খবর নিয়েছি। এখন মিসেস গান্ধী ইণ্ডিয়ার প্রাইমমিনিস্টার যে। তার কাছেও আমি গিয়েছিলুম!

—মিসেস গান্ধী মানে?

—মিসেস ইন্দিরা গান্ধী! আপনি চেনেন না তাকে?

গান্ধী এতক্ষণে চমকে উঠলেন। বললেন—আমার ইন্দু?

—হ্যাঁ! আমি আমার কেসটা নিয়ে দিল্লিতে গিয়েছিলুম। বলতে গিয়েছিলুম যে আমাকে কেন ডি-থ্রোন করলে? কেন আমার জায়গা থেকে আমাকে নামিয়ে দিলে? কিন্তু......

গান্ধীর তখনও চমক কাটে নি। বললেন—সত্যি বলছো আমার ইন্দু এখন প্রাইম-মিনিস্টার হয়েছে? সে তো এতটুকু বাচ্চা মেয়ে, সে পলিটিকসের কী জানে? শেষ কালে তাকে বসিয়ে দিয়েছে প্রাইম-মিনিস্টারের চেয়ারে? দেশ চলছে? তাকে যে সবাই পিষে মেরে ফেলবে। দেশের লোকজন তাকে মানছে?

জেনারেল বললে—না মানছে না, আমি দিল্লি গিয়ে তাই দেখে এলুম। আপনি যা বলছেন মিস্টার নিজলিঙ্গাপ্পাও তাই বললে—

—নিজলিঙ্গাপ্পা? সে আবার কে? আমি তো তার নামও শুনিনি! কে সে?

জেনারেল বললে—সে কী? আপনার কংগ্রেসের অত বড় পাণ্ডা, আপনি চেনেন না? এখন সে-ই তো কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট?

গান্ধীর যেন বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। বললেন—বলছো কী তুমি? তুমি ঠিক জানো? কেন, আর কোনও লোক ছিল না? আমার বেয়াই রাজাগোপাল কোথায় গেল?

—মাদ্রাজের রাজাগোপালাচারী?

—হ্যাঁ! তার তো বুদ্ধিসুদ্ধি ছিল। আমি সব সময়ে তার সঙ্গেই তো পরামর্শ করতুম! তাকে কেন প্রেসিডেণ্ট করা হলো না? দেশে কি আর লোক পাওয়া গেল না? কেন, মেদিনীপুরের অজয় কোথায় গেল? তাকে প্রেসিডেণ্ট করা হলো না কেন? সেও কি মারা গেছে নাকি?

জেনারেল বললে—না, শুনলুম তাকেও তাড়িয়ে দিয়েছে ওরা—

—ওরা মানে? ওরা কে?

—মানে অতুল্য ঘোষ।

সেটা আবার কে? দেখছি আজকাল

আজেবাজে অনেক লোক কংগ্রেসের মধ্যে ঢুকে পড়েছে—

জেনারেল বললে—আমি অত খবর জানি না। আমাকেও ওরা এতদিন বন্দীবন্দী করে আটকে রেখেছিল কিনা—এইটুকুর মধ্যে যা শুনলুম তাই তোমাকে বলছি। তুমি তো ব্রিটিশদের তাড়িয়ে দিয়েছিলে, তারা বেনে বলে। তারা চোর-ডাকাত বলে। এখন কী হলো? এখন যে আমাদের চেয়েও তোমার দলের লোকেরা বেশি বাটপাড়ি করছে। এরা যে এক-একজন ছিনে জোঁক। ওর বেলায়? এদের তুমি তাড়াও তো দেখি তোমার কত ক্ষমতা—

—তাড়াতে পারি না ভেবেছ?

—কই তোমার ইন্দু তো হাজার চেষ্টা করেও তাদের তাড়াতে পারছে না।

গান্ধী বললেন—তা হলে দেখছি আমাকে আবার আগেকার মত হাঙগার-স্ট্রাইক করতে হবে, অনশন করতে হবে—

—হাঙ্গার স্ট্রাইক?

বলে জেনারেল আউটরাম হো হো করে রাতের অন্ধকার কাঁপিয়ে অট্টহাসি হাসতে লাগলো। সে হাসিতে পার্ক স্ট্রীটের বাড়ির দেয়ালে প্রতিধ্বনি উঠলো হা হা শব্দে।

বললে—হাঙ্গার স্ট্রাইকের কথা আর বলো না হে গান্ধী! এখনকার লোকে শুনলে হাসবে। হাঙ্গার-স্ট্রাইকে ব্রিটিশরা ভয় পেয়েছে। কিন্তু এখন ইণ্ডিয়ার ঘরে ঘরে সবাই হাঙ্গার-স্ট্রাইক চালাচ্ছে। এখন রাম-শ্যাম-যদু-মধু পর্যন্ত হাঙ্গার-স্ট্রাইক করে হাঙ্গার-স্ট্রাইকের ওপর ঘেন্না ধরিয়ে দিয়েছে। তোমার চেলা মোরারজী দেশাই থেকে শুরু করে পুরীর জগৎগুরু শঙ্করাচার্য পর্যন্ত হাঙ্গার-স্ট্রাইক করে করে স্বাস্থ্যটা ফিরিয়ে নিয়ে গায়ে-গতরে বেশ মোটা হয়ে গেছে। অনশনের নাম আর করো না তুমি, এখন যদি আবার ওই কাজ করো তো সবাই তোমাকে ধরে তোমার মুখে গোলাপ পুরে দেবে—এটা উনিশ শো উনসত্তোর সাল, নাইনটিন সিক্সটিনাইন—

গান্ধীর মুখটা গম্ভীর হয়ে উঠলো হঠাৎ।

বললেন—তাতে কি আমি ভয় পাই ভেবেছ জেনারেল? আমার বই পড়ে কি তারা তাই-ই বুঝেছে? আমাকে তারা কি একটুও চেনেনি?

—তোমার বই? তোমার কী বই?

গান্ধী বললেন—কেন, আমার বই তারা পড়েনি? আমার 'The story of my experiment with Truth'?

জেনারেল আবার আগেকার মত হেসে উঠলো হো হো শব্দ করে।

বললে—তোমার বই পড়বে এত সময় তাদের নেই হে—

—কেন, সময় নেই কেন? একজন সাধারণ

মানুষ আমি, কী করে ব্রিটিশদের মত দুর্দান্ত প্রতাপশালী শক্তিকে দেশ থেকে তাড়িয়েছি, তা তাদের জানতে ইচ্ছে হবে না?

জেনারেল আউটরাম বললে—না হে তাদের অত সময় নেই। আপনি তো আপনি, তুচ্ছ একজন নেটিভ, যীশু খৃস্টও যদি এখন আবার ফিরে আসেন তো লোকে এখন আর তাকে ক্রুসিফাইও করবে না, তাকে আর খুনও করবে না। খুন করবার সময়ই তাদের নেই। এলে বলবে—কী বলবার আছে তোমার বলো, এক পেগ হুইস্কি দিচ্ছি খাও আর যত খুশী উপদেশ দাও শুনি—

গান্ধী যেন খানিকটা চিন্তিত হলেন। বললেন—সত্যি বলছ জেনারেল?

জেনারেল বললে—আমার কথা বিশ্বাস না হয় একবার সারা ইন্ডিয়াটা ঘুরে এসো। যেমন করে আগে একবার ট্রেনে থার্ড ক্লাসে ঘুরে এসেছিলে, তেমনি করে। দেখবে এই বাইশ বছরে মানুষ আস্তে আস্তে কমে এসেছে, আর কেবল জানোয়ার বেড়ে গেছে—মানুষ না থাকলে তোমার বই পড়বে কে?

—কিন্তু আমি কি আমার বইতে খারাপ কথা লিখেছি কিছু?

—না, খারাপ ভালোর কথাই নয়। আসল কথা তাদের সময় নেই!

—কেন সময় নেই? কী এত তাদের কাজ?

জেনারেল বললে—তারা ততক্ষণ হো-চি-মিনের লাইফ পড়বে, লেনিনের লাইফ পড়বে, তোমার লাইফ পড়ে সময় নষ্ট করতে যাবে কেন? আর তা ছাড়া বুঝতেই পারছ তোমার ইন্দুর মত মেয়ে যখন ইন্ডিয়ায় প্রাইমমিনিস্টার তখন কী করে লোকে সময় পাবে?

গান্ধী কী যেন ভাবলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন—তা হলে তো গড়্‌সে আমায় খুন করে ঠিকই করেছে জেনারেল। আমার উপকারই করেছে সে। না মারলে তো আমাকে এই সব দেখতে হতো—তখন আত্মহত্যা করতে হতো—

জেনারেল বললে—জানো, তোমার ওই থিওরির জন্যে আজ সারা দেশ কমিউনিসট হয়ে গেছে!

গান্ধী বললেন—কমিউনিসট হয়ে গেছে তাতে খারাপ কী হয়েছে?

—কমিউনিসট হওয়া কি ভালো? তুমি বলছো কী?

—তা আমার থিওরির সঙ্গে কমিউনিজম-এর তফাতটা কোথায়? ওরা শুধু হিংসে চায় আর আমার হলো অহিংসার পথ। তা আমার বইতে তো আমি লিখেইছি যে ভীরুতা আর হিংসার মধ্যে আমাকে যদি বেছে নিতে বলা হয় তো আমি হিংসেই বেছে নেব—

জেনারেল বলে উঠলো—সেই জন্যেই তো বলছি তুমি নেমে এসো, তোমার দ্বারা কিছু হবে না, আমি তরোয়াল চালিয়ে সকলকে শায়েস্তা করে দেব—নামো—

—নামি, দেখছি আমার নামাই ভালো, তুমি আমার জায়গায় চড়ে বসো জেনারেল। যেমন করে সিপাই-মিউটিনির সময় তুমি সারা ইন্ডিয়াকে কাবু করেছিলে, তাই করো আবার। আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে—আমি বুড়ো হয়ে গিয়েছি, আমার হাতটা একটু ধরো—

বলে হাতটা বাড়িয়ে দিলেন জেনারেলের দিকে। জেনারেল আউটরামও হাত দিয়ে গান্ধীর হাতটা ধরলে।

—থামো!

হঠাৎ পেছন থেকে কড়া গলায় আওয়াজ হলো—থামো—

মতিহারীর শিউশরণ মিশির এতক্ষণ এক পাশে দাঁড়িয়ে সব কিছু দেখছিল। এবার আওয়াজটা হতেই পেছন ফিরে দেখলে। দেখলে মিলিটারি পোশাক পরা দুজন লোক পিস্তল উঁচু করে তাগ করে আছে জেনারেল আউটরামের দিক।

—কে? কে তুমি? তোমরা কে?

টাক মাথা লোকটা বলে উঠলো—খবরদার বলছি, ওকে ওখান থেকে নামাতে পারবে না ও থাকবে। এক পা নড়েছ কি আমরা তোমাকে গুলি করবো, তোমার ঘোড়াটাকেও গুলি করে মারবো—

পাশের লোকটাও শাসিয়ে উঠলো—আমিও ছেড়ে কথা বলবো না—

—কিন্তু তোমরা কে? হু আর ইউ বুরেজ?

মতিহারীর শিউশরণ মিশির তখন পাশে দাঁড়িয়ে থর থর করে কাঁপছে। একটা মাত্র লাঠি তার ভরসা। পার্ক স্ট্রীট থানাটা এখান থেকে অনেক দূরে। আসতে যেতে প্রায় আধ ঘন্টার বেশি লাগবে। তার ওপরে এ-অঞ্চলের শান্তি রক্ষার ভার দিয়ে বড় দারোগাবাবু বোধহয় এখন নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে।

বললে—হুজুর, আপনারা থামুন—

—চোপরাও—

জেনারেল আউটরাম তরোয়ালটা উঁচিয়ে তেড়ে এল শিউশরণের দিকে। শিউশরণ ভয়ে দশ-পা পিছিয়ে এল। আর একটু হলেই তার বুকে তরোয়ালের খোঁচা লাগতো।

বললে—সাহেব, আপনারা ঝগড়া করছেন কেন? আপনারা থানায় ডায়রী করুন গিয়ে।

সাহেব বলে উঠলো—চুপ কর বেটা, আজকাল থানায় ডায়েরী করলে কিছু হয়? পুলিশ কেস নেয় আগেকার আমলের মত? এখন পুলিশের কথা কেউ শোনে?

শিউশরণ বললে—আজ্ঞে শোনে।—

—আবার মিথ্যে কথা!

গান্ধী এতক্ষণে আবার কথা বলে উঠলেন। বললেন—কেন, পুলিশ কেস নেয় না আজকাল?

জেনারেল বললে—কেন কেস নেবে? তুমিই তো তার জন্যে দায়ী! তুমিই তো প্রথম পুলিশের আইন ভেঙেছো। তোমার জন্যেই তো দেশে এখন অরাজকতা বেড়েছে। তুমিই তা হাঙ্গার-স্ট্রাইক শিখিয়েছো, তুমিই তো আইন ভাঙা শিখিয়েছো! এখন তা বেড়ে বেড়ে এই অবস্থায় এসেছে। সেই জন্যেই তো আমি বলতে এসেছি তুমি নামো—এখনও নামো, নইলে সর্বনাশ হবে, তখন আর সামলানো যাবে না—

টাক-মাথা লোকটা এতক্ষণে ধমকে উঠলো। বললে,—না নামবে না, ও থাকবে—ওকে আমি নামিয়ে দেব—

জেনারেল কথাটা শুনে মুখ ফেরালে। বললে,—দেখ, কথা হচ্ছে আমাদের দুজনের মধ্যে, তুমি কেন ফ্যাচ্‌-ফ্যাচ্‌ করছো মাঝ-খান থেকে? তুমি কেন এখানে এসেছ? তুমি কে?

টাক-মাথা লোকটা বললে—আমাকে চেন না তুমি? দুনিয়ার সব লোক চেনে আর তুমি চেন না? আমার নাম মাও সে-তুং!

—আর এ?

—এ আমার দোস্ত! পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান—

—তা তোমরা এখানে কেন?

মাও সে-তুং বললে—আমরা আসবো না? ইন্ডিয়া যে বেওয়ারিশ মাল। এর যে কোনও গার্জেন নেই—! আমরা না দেখলে ইন্ডিয়াকে দেখবে কে? তাই আমরাই এর গার্জেন সেজেছি—

জেনারেল আউটরাম তরোয়াল উঁচিয়ে ধরলো।

বললে—খবরদার! গার্জেন তোমরা নও, গার্জেন আমি। মনে করো না ব্রিটিশরা চিরকালের মত চলে গেছে। এখানে আমাদের কোটি কোটি পাউন্ড বিজনেসে খাটছে—

মাও সে-তুং ভেঙচে উঠলো। বললে—রেখে দাও তোমাদের কোটি কোটি পাউন্ড, তোমরা তো আমেরিকার দালাল, কথা বলতে তোমাদের লজ্জা করে না?

—কী, আমাদের দালাল বলা?

মাও সে-তুং পিস্তলটা বাগিয়ে ধরলে। বললে—দালালকে দালাল বলবো না তো কি প্রভু বলবো? তোমরা আর কোশিগিনরা তো ইমপিরিয়ালিজম্‌-এর দালাল। আমে-রিকার এঁটো খেয়ে খেয়ে পেট চালাচ্ছো আবার কথা! বেরোও এখান থেকে, বেরিয়ে যাও—

জেনারেল আউটরাম আরো এগিয়ে মুখে দাঁড়ালো—তুমি আমাকে এখনও চেন

মি. মুখ সামলে কথা বলো, আমাকে তুমি তোমাদের এশিয়ান পাওনি—

মতিহারীর শিউশরণ মিশির হঠাৎ দুজনের মধ্যে গিয়ে দুহাত বাড়িয়ে থামিয়ে দেবার চেষ্টা করলে—থামুন আপনারা থামুন, মারামারি করবেন না—

কিন্তু তার কথা শেষ হওয়ার আগেই জেনারেল আউটরাম তরোয়াল উঁচিয়ে তেড়ে এল। শিউশরণ মিশির ভয়ে দৌড়ে পালাতে গেল, কিন্তু পেছন থেকে একটা পিস্তলের গুলি এসে মাথায় লাগতেই সে মাটিতে পড়ে গেল। খানিকক্ষণ যন্ত্রণায় ছটফট করলে সে। তারপর আস্তে আস্তে স্থির হয়ে এল। মতিহারীর সীয়ারাম মিশির জানতেও পারলে না যে তার ছেলে শিউশরণ মিশির তার কোন্ অপরাধে কোন্ আততায়ীর হাতে প্রাণ খোয়ালে।

*

পরদিন ভোরবেলা একে একে সবাই দেখতে পেলে পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে মহাত্মা গান্ধীর স্ট্যাচুর নিচের একটা পুলিশ খুন হয়ে মরে পড়ে আছে। রক্তে জায়গাটা ভেসে যাচ্ছে। আর কয়েকটা পুলিশ-কনস্টেবল তাকে ঘিরে পাহারা দিচ্ছে। কে যে তাকে খুন করেছে, কেন খুন করেছে, তা কেউ জানতে পারলে না। ট্রাম-বাস-ট্যাক্সি থেকে মুখ বাড়িয়ে সবাই একবার মৃতদেহটা দেখে নিলে। তারপর আবার যে-যার কাজে চলে গেল। কলকাতার প্রাত্যহিক জীবনের গোলক-ধাঁধায় পড়ে ব্যস্তবাগীশ মানুষ কিছুই মনে রাখবার সময় পেলে না। কলকাতা যেমন চলছিল আবার তেমনিই চলতে লাগলো!

কিন্তু সবচেয়ে অদ্ভুত কাণ্ড ঘটলো তারপর!

দু-একদিনের মধ্যেই দিল্লীর এক কাগজে একটা অদ্ভুত সংবাদ প্রকাশিত হলো। সংবাদটা এই :

'আমাদের কলিকাতাস্থ বিশেষ সংবাদ-দাতার খবরে প্রকাশ যে আজকাল পশ্চিম-বঙ্গে শান্তিপ্রিয় অধিবাসীদের জীবন ও সম্পত্তি সম্বন্ধে নিরাপত্তার একান্তই অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। ভদ্র গৃহস্থ মহিলা-গণ গৃহের বাহির হইতে ভয় পাইতেছেন। তাঁহারা সারা দিন-রাত ঘরের ভিতর অর্গল-বদ্ধ অবস্থায় বসবাস করেন। কমিউনিস্ট কর্মীদের ভয়ে সারা শহর আতঙ্কগ্রস্থ অবস্থায় দিন কাটাইতেছে। কয়েকদিন আগে রবীন্দ্র সরোবরে অশোককুমার নাইটে কমিউনিস্টরা দল বাঁধিয়া প্রকাশ্য রাস্তার উপর দশ হাজার নারীকে বলাৎকার করিয়াছিল, আর প্রায় দু'হাজার নারী সরোবরের জলে আত্মবিসর্জন করিয়া লজ্জার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিল। এবার তাহা অপেক্ষাও ঘোরতর কাণ্ড ঘটিয়াছে। কয়েক বছর আগে পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে জেনারেল আউটরামের মর্মর মূর্তিটা সরাইয়া তাহার জায়গায় মহাত্মা গান্ধীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ গান্ধী জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে যে উৎসব অনুষ্ঠিত হয় সেই সময়ে অধিক রাত্রে প্রায় দশ হাজার কমিউনিস্ট কর্মী গান্ধী-মূর্তিটি উক্ত স্থল হইতে অপসারণ করিয়া উহার উপর মাও সে-তুং-এর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়। যথাসময়ে পুলিশ আসে। ধবস্তাধবস্তিতে বহু লোক আহত হয়। এবং একজন কর্তব্যরত পুলিশ কনস্টেবল গুলি বিদ্ধ হইয়া ঘটনাস্থলেই প্রাণত্যাগ করে। সৌভাগ্যক্রমে মহাত্মা গান্ধীর প্রতিমূর্তিটির কোনও ক্ষতি হয় নাই। পুলিশের উচ্চ-পর্যায়ে জোর অনুসন্ধান কার্য চলিতেছে।'

যৌবনের কমনীয়তা...কোমল লাবণ্য
কোমল লাবণ্যের জন্য
জয়
সৌন্দর্য সাবান
আপনার প্রিয় সুগন্ধযুক্ত
Jai
BEAUTY SOAP
টাটার
তৈরী

জাতি উন্নত হয়, আর উচ্চবর্ণের মেয়ের নিম্নবর্ণের পুরুষের সঙ্গে বিয়ে হলে জাতি অধঃপতিত হয়। তুমি নিম্ন সহবাস করেছ। তোমার ছেলেমেয়েরা বর্ণশংকর। আমি তাদের প্রতি নিষ্ঠুর নই, কিন্তু সকলের ভালর জন্য আমি তাদের বিচ্ছিন্ন করে রাখতে চাই। তাতে ওদের হয়তো একটু কষ্ট হবে, কিন্তু বৃহত্তর কারণে ওরা সে কষ্টটুকু মেনে নেবে।

এর পর নরেন্দ্রনারায়ণ মেমোরিয়াল স্কুলে ঢনঢন করে ঘণ্টা বাজাত অশ্বিনী। একা থাকত স্কুলঘরের পিছনের দিকে খুপরিতে। বউ বা ছেলেমেয়ের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু তাতে তাকে অসুখী মনে হত না। বরং কায়স্থের ঈশ্বরকে নষ্ট করার জন্য যে পাপবোধে সে কষ্ট পাচ্ছিল তা থেকে বেঁচে যাওয়ায় সে বড়োকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করত।

সেই কায়স্থ বিধবাটি বাড়ির পিছন দিকে যে ছোট্ট দাতব্য ডিসপেনসারিটি ছিল তার শিশি বোতল ধোয়ার কাজ করত। মাঝে মাঝে সে বাড়ির ঝি-দাসীদের কাছে তার [illegible] বিতাড়িত জীবনের গল্প করত।

ওদের দুই ছেলেমেয়ের মধ্যে ছেলেটি ছোট মেয়েটি বড়, বছর দশেক বয়স তখন [illegible]। তারা সারা বাড়িতে ঘুর ঘুর করত। জল বা খাবার ছোঁয়া তাদের বারণ ছিল। [illegible] বাইরে যাওয়া। রমেনের মাঝে মাঝে চোখে পড়ত মেয়েটি তার পড়ার ঘরের দরজার ফাঁক দিয়ে তাকে দেখছে। কখনো বা পেছনের বারান্দা ঝাঁট দিতে দিতে হঠাৎ থেমে হাঁ করে চেয়ে থেকেছে। পিছনের দিকে পাঁচিলের দিকে যার ওপর দিয়ে দু হাত দু দিকে ছড়িয়ে টালমাটাল হাঁটছে রমেন।

উদ্ধব মাঝে মধ্যে চেঁচিয়ে বলত—ঐ মেয়েটা ছোট কর্তার দিকে চেয়ে থাকে কেন! ঐ রে মেয়েটা, এই, হটে যা—

কিন্তু মেয়েটা ছিল স্বভাবে বাধ্য। রমেন যা করতে বলত তা তৎক্ষণাৎ করত, তার মুখে খুশির আভা দেখা যেত। ক্রমে সে রমেনের পোষা কুকুরের মত হয়ে গেল। যেখানে রমেন সেখানেই ইরাবতী। পায়ে পায়ে ফিরত সে। তার করুণ, কৃশ, শ্যামলা এবং সুন্দর মুখখানায় রমেনের প্রতি একটা কাঙাল ভাব ফুটে থাকত। ড্যাঙ ড্যাঙে রোগা হাত পা আর মস্ত খোঁপায় তাকে একই সঙ্গে ছেলেমানুষ আর বয়স্ক দেখাত। আর তার দু চোখে সব সময়েই বাস করত একটা হরিণের মত সন্ত্রস্ত ভাব।

দাদু মাঝে মাঝে পায়ের শব্দ পেয়ে ডেকে জিজ্ঞেস করতেন—রমেন, তোমার সঙ্গে কে?

—ইরা।

দাদু ভ্রূ কুঁচকে চুপ করে থাকতেন।

মুখ-বেঁকা লব ছিল রমেনের খাস চাকর। তার ছিল নাড়ী-জ্ঞান, আর জানা ছিল হোমিওপ্যাথি। সে ইরাকে প্রায়ই রমেনের কাছ থেকে সরিয়ে দিয়ে বলত—বামন হয়ে চাঁদ ধরার মতলব, অ্যাঁ? কেন তুমি পায়ে পায়ে ঘোর?

একা খুব সুখেই ছিল অশ্বিনী। সে বউ ছেলেমেয়ের নামও করত না। ছুটির পর ব্রহ্মপুত্রের দিকে চেয়ে বসে থাকত। মাঝে মাঝে গভীর রাত্রে তার ভাঁড়ি-খাওয়া মেজাজী গানের রেশ শুনতে পাওয়া যেত। ইরার মার সঙ্গে কখনো দেখা হলে দূরে থেকে হাতজোড় করে নমস্কার করত সে। রমেন তার কাছে সাঁতার শিখেছিল।

মাঝেমধ্যে ইরার মার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেলে কখনো সখনো চমকে উঠত রমেন। মনে হত এই মহিলার চোখ কথা বলে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ বছরে দাদু মারা গেলেন। খুব শান্তভাবে। সন্ধ্যাবেলা ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে খড়মের শব্দ তুলে দরদালানের ভিতর দিয়ে চলে গেলেন শোওয়ার ঘরে। তারপর শুয়ে পড়লেন। খুব অল্পক্ষণের মধ্যেই মারা গেলেন তিনি। সেই সময়ে রমেন বাবার সাদা ঘোড়াটায় চড়ে কেওটখালির মাঠে ট্রেঞ্চের গর্তগুলো লাফিয়ে পার হওয়ার চেষ্টা করছিল।

যুদ্ধের পর বিশাল পরিবর্তন এসেছিল পৃথিবীতে।

বাবার মৃত্যুর পর থেকে মা মাঝে মাঝে ভূত দেখতেন। ঐ দেখাটা তার নেশার মতো ছিল। সাতচল্লিশ সালের শেষ দিকে যখন রমেন কাশীপুরে আসে তখন মাকে জোর করে নিয়ে আসতে হয়েছিল। তার ধারণা ছিল কলকাতায় গেলে বাবার আত্মা আর তাকে দেখা দেবেন না।

নিঃসন্তান জ্যাঠামশাই মারা গিয়েছিলেন বাবারও আগে। জ্যাঠাইমা চলে গেলেন গোবরদিতে তার বাপের বাড়িতে। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল মা ছাড়া রমেনের আর কোনো আত্মীয় নেই। তখন তার দুধারে দাঁড়াল প্রাচীন গাছের মতো দুজন লোক। উদ্ধব আর লব। চারা গাছটিকে তারা বেড়ার মতো ঘিরে রাখার চেষ্টা করেছিল। পারেনি।

অম্বিকনী থেকে গিয়েছিল। নরেন্দ্রনারায়ণ মেমোরিয়াল স্কুলের পিছনের খুপরিতে বসে রঙ্গপত্রে দেখার নেশা তাকে ছাড়েনি। একা সে তখন সুখী ছিল। বড়কর্তার দয়ার কথা লোককে বলত। ইন্দ্রার মা তার দুই ছেলেমেয়েকে নিয়ে চলে এসেছিল। কাশীপুরের বাড়ির রান্নাঘরের পাশে তাদের জন্য টিনের ঘর তুলে দিয়েছিল উদ্ধব আর লব, শাসিয়ে দিয়েছিল যেন তারা ভিতর বাড়িতে না আসে। কিন্তু ইরা আসত। মাঝে মাঝে ইন্দ্রার মা থানকাপড়ের ঘোমটার ভিতর থেকে অতীব তীব্র চোখে দেখত রমেনকে। তার ছেলেমেয়েকে বড়োকর্তা সকলের সামনেই বর্ণসঙ্কর বলে আলাদা করে দিয়েছিল, নিষেধ করেছিল বিয়ে দিতে। সেই অপমান বোধ হয় সে ভোলেনি।

তখন কলেজে পড়ে রমেন। ম্যাগাজিনে ললিত ব্যানার্জি নামে একজনের প্রবন্ধ বেরোলো—ভারতে সাম্যবাদ এবং কয়েকটি অসুবিধা। সেই প্রবন্ধে খুব জোরালো যুক্তিতে দেখানো হয়েছিল কিভাবে প্রাচীন আর্যরা অর্থনৈতিক কারণে মানুষকে

বর্ণাশ্রমে ভাগ করেছিল। আপাতদৃষ্টিতে বর্ণাশ্রমকে বিজ্ঞানসম্মত বলে মনে হতে পারে। কিন্তু আসলে তা নয়। এ ছিল শোষণের দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থা। যে ব্যবস্থা আজও কার্যকরী রয়েছে ভারতবর্ষে। ইত্যাদি।

তখন ইরার বয়স বোধ হয় ষোলো সতেরো। স্নিগ্ধ শরীর। শ্যামলা নরম রঙ। ঘরের কাছে বসে দুপুরে ফ্রেমে আঁটা সাদা কাপড়ে গোলাপ ফুলের নকশা তোলে। রমেনের পায়ের শব্দ পেলে নিঃসাড়ে উঠে আসে। জামাজুতো ঠিক করে দেয়। রমেনের মাঝে মাঝে তাকে দয়া করতে ইচ্ছে হত। মাঝে মাঝে ভালবাসতেও। তাই ললিত ব্যানার্জির সেই প্রবন্ধটা বড় ভাল লেগেছিল রমেনের। সে তখন নিজের সমর্থনে একটা যুক্তি দাঁড় করাতে চাইছিল। আলাপ হওয়ার পর ললিত নামে সেই ছেলেটি আবেগতপ্ত স্বরে মানুষের মুক্তির কথা বলত। সেগুলো বিশ্বাস করেছিল রমেন। ক্রমে সে নিজেও মানুষের মুক্তির কথা বলতে শুরু করে।

বছর দুয়েক বাদে পাকিস্তান থেকে চলে এল অশ্বিনী। সে খুব একা বোধ করছিল সেখানে, তাছাড়া বুড়ো বয়সের চিন্তাও ধরেছিল তাকে। সে কালীপুরের বাড়িতে কয়েকদিন থেকে তারপর যাদবপুরের দক্ষিণে কোথায় খানিকটা জমি পেয়ে গেল, তুলে ফেলল দুখানা ঘর। একদিন উদ্ধব চেঁচিয়ে রমেনের কাছে নালিশ করল, অশ্বিনী লুকিয়ে ইরার মার সঙ্গে দেখা করে, তাকে নিয়ে যেতে চায়। বুড়োকর্তার নিষেধ মানছে না অশ্বিনী, তার নাকি একা একা লাগে, বউ ছেলেমেয়ের জন্য প্রাণ কাঁদে। ইরার মাও পালাবার তালে আছে।

তখন মানুষের মুক্তির কথা ভাবে রমেন। তাই উদারভাবে বলল—ওর বউ ছেলেমেয়ে, ওর তো নেওয়াই উচিত। যদি যেতে চায় তবে ইরার মাকে ছেড়ে দিও।

তখন রমেন আর ছোটো নয়। বিশাল লম্বা তার চেহারা, গলার স্বর গুরুগম্ভীর। উদ্ধব আর লব তাকে তখন সমীহ করতে শুরু করেছে। তারা দু একবার বুড়োকর্তার দোহাই দিল, কিন্তু তারপর একদিন অশ্বিনী তাদের চোখের সামনে দিয়েই নিয়ে গেল ইরার মাকে তার দুই ছেলেমেয়ে সহ।

তখন প্রজারা আসত রমেনের কাছে। রমেন তাদের চেয়ারে বসতে বললে বসত না, উবু হয়ে মাটিতে কিংবা পিঁড়িতে বসে কথা বলত। তারা রমেনকে সম্মান করতে ভালবাসত। রমেন অনেকদিন ভেবেছে ওটা অন্তর্নিহিত [illegible] না সত্যিই ভালবাসা! প্রজারা আসত হাজার সমস্যা নিয়ে। কখনো জমি কিনবার আগে সেই জমি কেনা উচিত কি না তা জানতে, কখনো মেয়ের বিয়ে ঠিক করার সময়ে

পরামর্শ চাইতে। অসুখে ডাক্তারের যে প্রেসক্রিপশন তা ঠিক হয়েছে কিনা তাও দেখাতে আসত কেউ কেউ। এ ছাড়া টাকার সাহায্য, ছেলের চাকরি কিংবা নিছক পেটের কিছু না জুটলে খাদ্যপ্রার্থী প্রজারা আসতই। দাদু বেঁচে ছিল বলে এতকাল প্রজাদের সঙ্গে সরাসরি দেখা হয়নি রমেনের। কিন্তু রমেন দেখেছে তাদের দেশের বাড়িতে প্রজাদের নিরন্তর আনাগোনা। তারা কত বিষয়-সমস্যা নিয়ে আসত দাদুর কাছে। দাদু তাদের বরাবর সঠিক পরামর্শ দিয়েছে। পাকিস্তান হওয়ার পরও কাশীপুরের বাড়িতে প্রজাদের আনাগোনা দেখে সে অবাক হয়েছিল। কিন্তু সে বুঝতে পারত যে প্রজারা তাদের পুরোনো অভ্যাস মতো আসে, বুড়ো কর্তার জায়গায় ঠিক ঐরকমই একজন সর্বজ্ঞ লোক চায় যে সঠিক পথ বলে দেবে। দাদু কখনো ভুল পরামর্শ দিতেন না। তবে কি দাদু সর্বজ্ঞ ছিলেন? না, তা নয়। দাদু তাঁর পূর্ব পুরুষের কাছ থেকে প্রজাপালন শিখেছিলেন। ফলে যুবাবয়স থেকেই তিনি প্রজাদের সংস্পর্শে আসতে শুরু করেন। প্রজাদের যা সমস্যা তা তিনি জানতে শুরু করেন। আর সব কিছুর সমাধানের জন্য তিনি শেখেছিলেন চিকিৎসাবিদ্যা, চাষ বাস, কামার কুমোরের কাজ, তাঁত চালানো, তিনি জানতেন মাছের গতিবিধি, তা ছাড়া জানতেন জমিজমা সংক্রান্ত এবং ফৌজদারী আইন, সর্বোপরি মনু, পাতঞ্জল, গীতা ভাগবত, তাঁর প্রায় মুখস্থ ছিল বছরকার পাঁজি। আরো বোধ হয় অনেক কিছুই জানতেন দাদু—তাঁর না জানা বিষয় ছিলই না। প্রজাদের মঙ্গলের জন্য দাদু অতখানি শিখেছিলেন, তাই প্রজাদের কাছে তিনি ছিলেন অপরিহার্য। এখন প্রজারা সেই অপরিহার্য বড়োকর্তার খোঁজে রমেনের কাছে আসতে লাগল। রমেন প্রথমে দিশেহারা বোধ করত খুব। কিন্তু সে সবাইকেই সৎ এবং আন্তরিক পরামর্শ দিতে চেষ্টা করত। কিন্তু দেখতে পেত তার সাংসারিক জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা বড় কম। তাছাড়া প্রজাদের সমস্যা হাজার রকমের। জমিদারী না পেলেও একটা বিপুল সংখ্যক প্রজাকে সে পেয়েছিল, আর পেয়েছিল দায়িত্বের উত্তরাধিকার। মানুষগুলোকে সে ফিরিয়ে দিতে পারত না, বরং সে দেখতে চাইত দাদুর কাছে এই বিপুল সংখ্যক মানুষ কী পেয়েছিল, এবং সে সেটা দিতে পারে কিনা। ফলে অবসর সময়ে বা ছুটির দিনে রমেন গাঁ গ্রামে ঘুরতে শুরু করে, প্রজাদের বাড়ি বাড়ি যেতে থাকে, জমি চেনে, তাঁত চেনে, রাত জেগে লবের কাছে শেখে হোমিওপ্যাথি, পড়ে আইনের বই। আর প্রতি সকালে বিকেলে কারো না কারো কোনো না কোনো সমস্যার সমাধান তাকে দিতে হয়। প্রজারা প্রায়ই আনত তরিতরকারী, প্রণামী দিত টাকা, এক নিঃসন্তান বুড়ো তার বিঘা তিনেক জমি উইল করে দিয়ে গেল মরার আগে। যাদবপুরের দক্ষিণে একটা জায়গায় রমেনদের প্রজারা বেশী জোট বেঁধে ছিল। সেখানে রমেন গিয়ে দাঁড়ালে একটা হৈ-চৈ পড়ে যেতো। এই অভিভাবকত্ব আস্তে আস্তে ভাল লাগতে শুরু করে রমেনের। প্রজাদের দুঃখ দুর্দশা দৈন্যের বিরুদ্ধে সে নিজেকে তৈরি করিতে থাকে। এই সময়ে কলেজ ইউনিয়নের চোখা চালাক জেনারেল সেক্রেটারী ললিত আসত তাদের বাড়িতে। তাকে দেখত ঘুরে ফিরে, দেখত আসবাব, শুনত পিয়ানো বাজিয়ে রমেনের গান, তারপর মৃদু হেসে বলত—তোমার গা থেকে এখনো গন্ধ গেল না। এখনো তোমাকে সবাই ছোটো কর্তা ডাকে।

রমেন লজ্জা পেত। অন্যদিকে রমেন তখন সাম্যবাদের ইশতেহার পড়েছে, কলেজ ইলেকশানে পোস্টার এঁকেছে রাত জেগে, চেঁচিয়ে বক্তৃতা করেছে, জিতিয়ে দিয়েছে ললিতকে। সে তখন মানুষের সাম্যের কথা, মুক্তি ও স্বাধীনতার কথা ভাবে, তর্ক উঠলে কথায় কথায় ললিতের মতোই বলে—রাশিয়ার দিকে তাকিয়ে দেখ।

এই দুই রকম বোধ তাকে কিছুদিন খুব দোলাচলে রাখল। একদিকে তার মধ্যে ক্রমে ক্রমে বুড়োকর্তার ছাপ পড়ছে, অন্যদিকে ললিতের। দুটোকে মেলাবার একটা চেষ্টা করছিল সে। পারছিল না।

ঠিক এরকম সময়ে একদিন হারু দত্ত নামে এক প্রজা এসে জানাল যে অশ্বিনীর মেয়ে ইরাবতী ওদের পাড়ার ছেলেগুলোর মাথা খাচ্ছে। তার ছেলে পরাণ ধরেছে ইরাকে বিয়ে করবে। অশ্বিনী আর সেই কায়স্থের বিধবাও সেই তালে আছে, মেয়েকে কারো ঘাড়ে গছাতে চায়। অথচ বুড়োকর্তার নিষেধ ছিল। ওদের জন্মের দোষ...

শুনে হঠাৎ রেগে গেল রমেন। 'জন্মের দোষ' কথাটা সে সহ্য করতে পারল না। এই লোকগুলো সেই কবেকার কথা মনে রেখেছে। বুড়োকর্তার কথা, তাই এরা ভুলতে পারছে না।

সেই মুহূর্তে রমেনের মন দাদুর দিক থেকে সরে এসেছিল। সে ভেবেছিল মানুষ জন্মমাত্রই স্বাধীন, মুক্ত, তার আবার শ্রেণী ভাগ কিসের! তার মন দুলছিল। কতগুলো বিষয়ে সে দাদুকে স্বীকার করতে পারছিল না। ইরার মায়ের প্রতি দাদুর নিষ্ঠুর আদেশ এবং কয়েক বছর আগের সেই সন্ধ্যায় মেয়েটির ম্লান মুখখানা তার মনে পড়েছিল।

হঠাৎ একটা আবেগবশতঃ সে হারু দত্তকে বলল—তোমরা কি ওদের ঘেন্না করো? কিন্তু আমি যদি ইরাবতীকে বিয়ে করি?

হারু সঙ্গে সঙ্গে হাতজোড় করে বলল—কর্তা, আপনি বিষ খেলেও কিছু হবে না। পাপ আপনাদের ছোঁয় না। কিন্তু আমরা কি তা পারি!

শুনে সামান্য একটু অহংকার বোধ করেছিল রমেন।

তারপরই একদিন সে সোজা গিয়ে হাজির হল অশ্বিনীর বাড়িতে। তখন দুপুরবেলা। রমেনকে দেখেই অশ্বিনী গা ঢাকা দেওয়ার জন্য পিছু-দরজা দিয়ে পুকুরঘাটের দিকে রওনা হয়েছিল। রমেন প্রচণ্ড হাঁক মেরে ডাকল তাকে। সে কম্পমানভাবে সামনে দাঁড়াতেই বলল—আমি তোমার মেয়েকে বিয়ে করব।

কপাটের আড়াল থেকে লালপেড়ে শাড়ির ঘোমটায় ঢাকা একখানা মুখ খুব উদগ্রীব ভাবে কথাটা শুনল, হাত চুড়িপরা হাতের একটা ঝনাৎ শব্দ শোনা গেল শুধু।

কেন যেন তখনই রমেনের মনে হয়েছিল সে কাজটা ভাল করল না।

বিয়েটা খুব সহজ হল না। রমেনের মায়ের তড়রোগ থেকে তখন মাথায় ছিট দেখা দিচ্ছে। তবু মা শুনে কেঁদে কেটে একসা করলেন। শেষ গম্ভীর হয়ে বলল তোমার সঙ্গে বুড়োকর্তার তফাৎ এই যে, তুমি বেশী দূর দেখতে পাও না, বুড়োকর্তা অনেক দূর দেখতে পেতেন।

প্রজারাও শুনে খুশী হল না কেউ। কেবল তাদের ছেলেদের মধ্যে যারা কলেজ টলেজে পড়ছিল তাদের মধ্যে কেউ কেউ রমেনকে খুব বাহবা দিল।

উদ্ধব খুব বিরস মুখে জিজ্ঞেস করল—অশনা তাহলে তোমার শ্বশুর হচ্ছে! দেখো, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম কোরো না যেন।

সকলেরই অসন্তোষের কারণ ঘটিয়ে একদিন বিনা সমারোহে ইরাকে বিয়ে করে আনল রমেন। আর সেই সঙ্গে প্রজাদের মধ্যে তার জনপ্রিয়তা কমে গেল অনেক। তারা দেখল বড়োকর্তা—যিনি অনেক দূরে দেখতে পেতেন—তার কথা রমেন শুনল না।

বিয়ের পরেই রমেন ইরাকে সঠিক বুঝতে পারে। এ সেই নিরীহ অবোধ কিশোরী নয় এ অন্যরকমের। ঝাঁঝালো শরীর ছিল ইরার, যতখানি ঝাঁঝ রমেনের ছিল না। প্রথম অমিল হল সেইখানে। আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছিল এই যে প্রতিদিন সকালে উঠে রমেন কেমন অবসাদ বোধ করত।

রমেন একদিন ইরাকে জিজ্ঞেস করেছিল—তোমার কি কোনো অসুখ আছে?

—না তো! কেন?

—কি জানি! আমার কেমন দুর্বল লাগে। মনে হয় একটা সংক্রামক কিছু তোমার কাছ থেকে এসেছে। আমার এরকম হত না তো।

আর একটা ব্যাপার রমেন লক্ষ্য করত, ইরা কখনো কারো 'মা' ডাক সহ্য করতে পারত না। প্রজারা তখনো কিছু আসে, তারা 'মা' বলে ইরাকে ডাক দেয়, আর ইরা কেমন কুঁকড়ে যায়। অস্থির বোধ করে। রমেন জিজ্ঞেস করলে বলত—মাটা শুনলে আমার কেমন যেন নিজেকে অপরাধী লাগে।

ইরার মা বুদ্ধিমতী ছিল। বিয়ের পর শাশুড়ি সেজে কখনো এ বাড়িতে আসত না। অশ্বিনী মাঝে মাঝে চুপি চুপি এসে বাইরে দেখা করত। রমেনের সঙ্গে দেখা হলে সে মাটি ছুঁয়ে প্রণাম করে ডাকত 'ছোটো কর্তা'। সম্পর্কটা ছিল আগের মতোই। কিন্তু একটা অসম্ভব হাস্যকর সম্পর্ক। লোকে এ নিয়ে বলাবলি করত।

ইরা সারাদিন অস্থির বোধ করত। একটু নির্বোধ ছিল সে, স্বভাব ছিল ঢিলাঢালা কথা বুঝতে সময় নিত। কিন্তু সে কিছুতেই নিজেকে রমেনের স্ত্রী বলে বিশ্বাস করতে পারত না। সম্ভবত ছেলেবেলায় ছোটো-খাটো জিনিস চুরি করার অভ্যাস ছিল ইরার। একদিন উদ্ধব এসে নালিশ করল যে ইরা গোপনে কিছু জিনিসপত্র অশ্বিনীকে দিয়েছে। তার নিজের চোখে দেখা। সে ইরাকে ধরতেই ইরা কেঁদে ফেলেছে, আর অশনা পালিয়েছে।

রমেন শান্তভাবে উদ্ধবকে বলল—তাতে কী! ও ওর নিজের জিনিস দিয়েছে।

কথাটা উদ্ধব বিশ্বাসই করতে পারল না। ঠোঁট উল্টে বলল—ওঃ! নিজের জিনিস!

এক বছর এরকমভাবেই রইল ইরা। তখন রমেন খুব ব্যস্ত মানুষ। আইন পড়ে, আর পার্টি করে, প্রজাদের মধ্যে ঘরে ঘরে কমিউন তৈরীর চেষ্টা করে। কখনো প্রবীণ প্রজাদের মধ্যে কেউ তার বিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করলে সাম্যের কথা শোনায় রমেন। কিন্তু সে স্পষ্টই বুঝতে পারত তার জনপ্রিয়তা অনেক কমে গেছে। সাধারণ মানুষেরা বুঝেছিল যে বড়োকর্তার মুখ থেকে যা বেরোয় তা বেদবাণী। কিন্তু রমেন বড়োকর্তার আদেশ লঙ্ঘন করেছে।

রমেন খুবই হতাশ বোধ করত। প্রজাদের মধ্যে প্রথম নিজের নেতৃত্ব বোধ করতে শুরু করে তার নেশা লেগে গিয়েছিল। সে বুঝতে পেরেছিল তার পূর্ব পুরুষদের মতো, দাদুর মতো সেও এদের সুখে দুঃখে নেতৃত্ব দিয়ে যাবে। মাঝে মাঝে প্রজারা তাকে বলেছে—আমাদের এলাকা থেকে আপনি ইলকশনে দাঁড়ান। আমরা জিতিয়ে দেবো।

ঠিক যে সময়ে সে দাদুর আসন নিতে যাচ্ছিল সেই মুহূর্তেই ইরাকে বিয়ে করায় তার ছবি ম্লান হয়ে গেল। অথচ ওদিকে সাম্যবাদের প্রতি বিশ্বাসও তার দানা বেঁধে ওঠেনি।

তখন দাদুর ক্ষমতা আস্তে আস্তে বুঝতে পারছে রমেন। যার মুখের কথার একটু অনুশাসন ভেঙে একজন একঘরেকে উদ্ধার করতে গিয়ে তার জনপ্রিয়তা কমে গেল। সে আশ্চর্য হয়ে সেই বিশাল গাছের মতো মানুষটির কথা ভাবত—যার ডাল-পালায় প্রজারা নিরাপদ নীড় বেঁধে আছে। যিনি জমিদার এবং নেতা। যিনি প্রজাদের সব ভালমন্দ জানতেন। রমেন এও বুঝতে পারে যে প্রজারা তাকে যেটুকু মানে তা তার পূর্বপুরুষদের সুকৃতির গুণে। সে নিজে থেকে কিছুই অর্জন করেনি। তাই আজ যদি সে পূর্ব পুরুষদের অনুশাসন ভাঙে তবে প্রজারা আর তার কথা শুনবে না।

রমেন তাই তখন মাঝে মাঝে মধ্যরাতে ঘুম থেকে জেগে উঠত। অস্থির বোধ করত। সাধারণ মানুষের জীবন, স্ত্রীর সঙ্গে বিছানা ভাগ করে শুয়ে সন্তান পালন করে, ঘর গোছানো সংসার করে জীবন কাটানোর কথা মনে করলেই তার মন খারাপ হয়ে যেত। সে কিছুতেই ভাবতে পারত না যে সে তার পূর্বপুরুষের মতো জীবন যাপন করবে না। বরং তার মনে হত একটা বৃহত্তর জীবনই তার জন্য অপেক্ষা করছে। যে জীবন বিশাল, যে জীবনের সঙ্গে হাজার হাজার মানুষের স্বার্থ জড়িয়ে রয়েছে। মানুষের ভালবাসা না পেলে সে বাঁচবে না। কে তাকে সেই অসাধারণ জীবন দেবে? কে তাকে দেবে সেই সর্বজ্ঞত্ব? রমেন মনে মনে সেইরকম একজনকে খুঁজত। দাদু তাকে খুঁজতে বলেছিল।

বিয়ের এক বছর বাদে যখন ইরা মাত্র মাসদুয়েকের গর্ভবতী তখনই একদিন সে পালিয়ে গেল। উদ্ধব খবর দিল হারু দত্তর ছেলে পরাণ মাঝে মাঝে আসত এ বাড়িতে। ইরার সঙ্গে বসে গল্প করত অনেক। খোঁজ নিয়ে জানা গেল পরাণও নেই।

সব তার বিষণ্ণতা আর লজ্জা দেখে বলল—তোমার নারীজ্ঞান নেই। যে উদ্ধার পেতে চায় না তাকে জোর করে উদ্ধার করেছিলে। বড়োকর্তা কি মিছে বলেছিলেন? তিনি জানতেন।

তিনি জানতেন। ঐ কথাই ছড়িয়ে গেল চারদিকে। রমেন দেখতে পেল প্রজাদের চোখ অন্ধ করে দাদুর ছবি ঝুলেছে। তিনি জানতেন।

তারপর সেই জানাটাকেই অনেকভাবে জানতে চেষ্টা করেছে রমেন।

ইরাকে কেউ খুঁজল না। সে নিজেও নয়। তেমন কোনো অস্থিরতাও প্রকাশ করল না রমেন। তখন তার মন জুড়ে দাদুর ছবি।

কেবল মাঝে মাঝে সে প্রচণ্ড জোরে তার পুরোনো মোটর গাড়িখানা চালিয়ে নিয়ে যেতো উদ্দেশ্যহীনভাবে। ঐ সময়েই একবার সে দুর্ঘটনায় পড়ে

(ক্রমশ)

নোনা নয়, সবাই মিষ্টি। কেউ বা লীলাবতী নোনা, কেউ বা সুমনাবতী নোনা।

নোনার প্রভাব বরং উলটে ইংরাজী সাহিত্যে লেগেছে। অলিভিয়া র‍্যাফলসকে ১৮০৫ সালে কবি জন লেডেন লিখেছিলেন:

"Nona, may all the woodland powers,
That stud Malaya's clime of flowers,
Or on the breeze their fragrance fling,
Around thee form an angel ring,
To guard thee ever gay and free,
Beneath thy green Banana tree."

মালয়ের কুসুমিত বনের সব শক্তি, সুরভিত মলয় সমীর, তোমার চার পাশে রচনা করুক দেবদূতের পরিবেষ্টক বৃত্ত, রক্ষা করুক শ্যামকদলীতলে হে নোনা, তোমার স্বচ্ছন্দ, স্বাধীন সত্তা।

সুন্দর কবিতা, সুন্দরীর উদ্দেশ্যে নিবেদন কিন্তু মলয়সমীরে সে-সুন্দরীর নাম হয়েছিল নোনা। নোনার অমিত প্রভাব সুদূরে দেশের কবিকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছিল। অলিভিয়া থাকতেন তখন পেনাং-এ। পেনাং মালয়দেশের অতি সুন্দর অংশ। সে সময় ইংরেজ কবি টম মুরের প্রেমের কবিতার যুগ। মুরও এই নোনা শব্দটি অনেকবার ব্যবহার করেছেন। নোনা কবিমানসী, রূপসী। নোনার সেই নামই কি তবে লেডেন প্রয়োগ করেছেন? লর্ড মিন্টো তখন ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল। ১৮১১ সালে তিনি মালাক্কা গিয়েছিলেন। সেখানে অনেক কৌতূহল নিয়ে মিন্টো সাহেব দেখা করেছিলেন অলিভিয়া র‍্যাফলসের সঙ্গে। জানি না সুন্দরী সম্বন্ধে তাঁর কি ধারণা হয়েছিল, তবে নিজের স্ত্রীকে লিখেছিলেন, 'শুনেছি মুরের অনেক ছন্দ এ'কে ঘিরে রচিত হয়েছে, তবে জানি না ইনিই সেই সুন্দরী কিনা। বলা কঠিন এই সেই নারী কিনা।' হতে পারে লাটসাহেবের চিঠিখানা সুবিবেচনাপূর্ণ সতর্কতা কিনা। স্ত্রীর কাছে অন্য রূপসীর আলোচনা সাবধানে করাই ভাল! কবি মুর কিন্তু নিজের কন্যার নাম রেখেছিলেন অলিভিয়া! কেউ বলে অলিভিয়া নিজেই লেডেনকে বলেছিলেন মুরের নোনা তিনিই। হতে পারে তাও অলিভিয়ার কল্পনাবিলাস।

সারং কাবায়ার মহামূল্য সাজ। ঠিক যেন আমাদের বেনারসীর জরি আর রেশমের কাজ

কিন্তু কল্পনাবিলাস নয় আজকের হাজার হাজার নোনা। আধুনিক সিঙ্গাপুরের প্রতিষ্ঠাতা স্যার স্ট্যামফোর্ড র‍্যাফলেসের পত্নীর সৌন্দর্যের খ্যাতি ছিল। প্রভাবশালী ইংরাজ সমাজে তাঁর কদর হবে এ আর বেশী কথা কি? তবে নোনা যদি তিনি কারও কাছে হয়ে থাকেন তবে সেটা মালয় রূপসীর কাছ থেকে সংগ্রহ করা আখ্যা। মালয়ের সঙ্গীতে, মালয়ের ভাষায় ও সাহিত্যে নোনা একান্ত আপন। মালয়বাসী ভারতীয় তামিলের ঘুমপাড়ানী গানে পর্যন্ত নোনা স্থান পেয়েছে।

জিংলি নোনা, জিংলি নোনা,
সিপু কোণ্ডাই করি
পার্থপারকল আসাই পাদুম
পাম্বু কোণ্ডাই করি
এই তামিল নোনা সুন্দরী ছোট্ট মেয়ে।
'জিংলি নোনা, জিংলি নোনা,
সুন্দরীর মাথায় আছে খোঁপাতে চিরুনি,
যে দেখে তার মন ভুলে যায়,
ওরে রূপসী, তোমার মানায় যে গোল খোঁপা।'

সেই যে গণপতি ড্রাইভার আমাকে ঘুরিয়ে দেখাতো মালয় দেশের এ-কোণ ও-কোণ, সেও তামিল। তার ঘরেও ঘুম পাড়াতে মা কন্যাকে ঐ জিংলি নোনার ছড়া সুর করে গেয়ে থাকেন।

একটি মালয় রান্না

উদং সম্বল অর্থাৎ চিংড়ির চাটনি। লাগবে—এক চায়ের চামচ মৌরি, এক চায়ের চামচ জিরা, এক চায়ের চামচ গোলমরিচ, দুই কোয়া রসুন, একটি বড় পেঁয়াজ টুকরো করে কাটা, পাঁচটি শুকনো লঙ্কা, হলুদ গুঁড়ো এক চামচ, আদা আন্দাজমত, নুন সরু করে কাটা, দুটি কাঁচা লঙ্কা, ধনেপাতা, কারিপাতা, তেঁতুল, নারকেল দুধ এক পেয়ালা এবং আধ সের ছাড়ানো চিংড়ি মাছ। প্রণালী:

(১) পেঁয়াজ, তেঁতুল ভিন্ন সব মশলা বাটুন;
(২) একটি পাত্রে তেঁতুল গোলা করে নিন;
(৩) লঙ্কা কেটে রাখুন;
(৪) পাত্রে তেল চড়িয়ে কারিপাতা ও পেঁয়াজ লাল করে ভাজুন;
(৫) বাটা মশলা দিয়ে আবার একটু ভেজে তেঁতুল ও চিংড়ি দিন ও কিছুক্ষণ মাঝামাঝি তাপে রাখুন ও নারকেল দুধ দিন ও দেবার পর আরও একটু রেখে নামিয়ে নিন।

এ রান্না বেশ কয়েকদিন ভাল অবস্থায় থাকবে।

শ্রীমতী

খাদ্য অপচয় রোধে ভারত

ভারতে বর্তমানে খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ নয় কোটি ছাপ্পান্ন লক্ষ টন। এর মধ্যে দু' কোটি চল্লিশ লক্ষ টন শুধু চলাচল এবং গুদামজাত করার দরুন নষ্ট হয়ে যায়। এ ছাড়াও আরও বিভিন্ন ধরনের যে-সমস্ত খাদ্যবস্তু নির্বাচিত দেশের খাদ্য-সমস্যা দূরীকরণের ব্যাপারে কাজে লাগানো হয়ে থাকে তাদের সংরক্ষণ এবং ব্যবহার সম্পর্কে যদি আরও কিছুটা তৎপর হওয়া যেত তা হলে আরও অতিরিক্ত সাতাশ লক্ষ টনের মত প্রোটিন জাতীয় খাদ্য সংগ্রহ হত। বিশ্ব খাদ্য এবং কৃষি সংস্থার একটি সাময়িক পত্রিকায় সম্প্রতি এই তথ্যটি পরিবেশন করেছেন মহীশূরের কেন্দ্রীয় খাদ্য-কারিগরী গবেষণাগারের অধ্যক্ষ ডঃ এইচ এ বি পারপিয়া।

মহীশূরের এই জাতীয় গবেষণাগারটি বিগত কয়েক বছর ধরে দেশের খাদ্য অপচয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলির অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছেন এবং কিভাবে এই অপচয় দ্রুত প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় তার উপর নানা রকম গবেষণাও। এঁদের সমীক্ষায় বলা হয়েছে, শতকরা আশি ভাগ ভারতীয়েরই খাদ্য আসে মূলত ধান, গম, যব, ভুট্টা, ডাল প্রভৃতি দানা জাতীয় শস্য থেকে। আর এই সমস্ত শস্য-কণার বেশির ভাগই সংরক্ষিত রাখা হয় সম্পূর্ণ গ্রামাঞ্চলে এবং অবিজ্ঞানসম্মত গতানুগতিক পদ্ধতিতে। কোন কোন অঞ্চলে শস্যের ফলন হয় বছরে মাত্র একবার। ফলে ঐ অঞ্চলবাসীরা তাঁদের শস্যকণা পুরো একটি বছরের জন্য জমিয়ে রাখেন তাঁদের ভাঁড়ারে। এই শস্যের বেশ কিছু পরিমাণ নষ্ট করে ইঁদুর এবং বিভিন্ন পোকামাকড়। সেই সঙ্গে ছত্রাক এবং বিভিন্ন ধরনের বীজাণু তাদের ওপর প্রতিকূল রাসায়নিক বিক্রিয়া করে তাদের খাদ্য-মূল্য দারুণভাবে কমিয়ে দেয়। আর সবচাইতে মুশকিল হল এই অপচয়ের শতকরা নব্বই ভাগই ঘটছে গ্রামাঞ্চলে। সরকার তার নিজস্ব পরিচালনায় যে দশ ভাগ খাদ্যশস্য আদান-প্রদান করে থাকেন তার চলাচল এবং গুদামজাত করার ব্যাপারে যথেষ্ট আধুনিক পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু গ্রামবাসীদের পক্ষে সেই ব্যবস্থার ব্যাপকতর প্রচলন সীমাবদ্ধ অর্থ-নৈতিক গণ্ডীর মধ্যে থেকে করা আপাতত প্রায় অসম্ভব। সম্প্রতি প্রকাশিত 'সায়েন্স ইন ইনডিয়ান ফিউচার'-এর একটি প্রবন্ধে ডঃ পারপিয়া মন্তব্য করেছেন, বাইরে থেকে খাদ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে দেশ যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে তার শতকরা দশ ভাগ যদি আমরা দেশেরই খাদ্য-কণার অপচয় প্রতি-রোধের জন্যে ব্যয় করতে পারতাম ত হলে বাইরে থেকে সংগ্রহের মাত্রাটা অনেক কমিয়ে ফেলা যেত। আর এরই দিকে লক্ষ্য রেখে মহীশূরের ঐ গবেষণাগারটি ইতিমধ্যেই সাড়া জাগানর মত বেশ কিছু দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন।

কাচ কেটে এবং পালিশ করে বিভিন্ন ধরনের লেনস তৈরি করার এই যন্ত্রটির উদ্ভাবক আম্বালায় অবস্থিত ভারতের কেন্দ্রীয় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি বিষয়ক গবেষণাগার। চণ্ডীগড়ের কোন একটি শিল্প সংস্থা ইতিমধ্যে যন্ত্রটি অণুবীক্ষণ যন্ত্র, ম্যাজিক লণ্ঠন বা চলচ্চিত্রের প্রক্ষেপক এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্রের লেন্স তৈরি কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন। জাতীয় গবেষণাগারের সঙ্গে শিল্প সংস্থার এমন সহযোগিতা শুধু যে দেশের অর্থনৈতিক দিকটিকেই সমৃদ্ধ করবে তা নয়, কুশলী বা প্রযুক্তি-বিদদের উৎকর্ষও বাড়িয়ে তুলবে

শস্যকণা সংরক্ষণের প্রাথমিক কাজ শুরু পাটের থলে থেকে। ঐ বীক্ষণাগারের বিশেষজ্ঞরা থলের মধ্যে খাদ্যকণা ভরে নেওয়ার আগেই থলেগুলিকে সম্পূর্ণভাবে বীজাণুমুক্ত করার ব্যাপারে বেশী জোর দিয়েছেন। একটি পদ্ধতিতে এঁরা ইথিলিন ডাইব্রোমাইড এবং মিথাইল ব্রোমাইডের মিশ্রণ শস্যকণা বা থলের উপর ছড়িয়ে দিয়ে ভাল ফল পেয়েছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে ঐ মিশ্রণের সঙ্গে আরও দু'-একটি রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে শস্য-বোঝাই থলের পাঁজার উপর ছড়িয়ে এক বছরের বেশী সময় ভাল-ভাবে সংরক্ষণের কাজটি সারা সম্ভব হয়েছে। এতে খরচ যথেষ্ট কম পড়ে। প্রতি মেট্রিক টনে মাত্র ষাট পয়সা।

শস্য শোধন করার কাজ খামারবাড়িতেই সেরে নেওয়া হয়। তারপর বস্তা-বোঝাই শস্য এনে তোলা হয় গোলাঘরে। দীর্ঘ সময় ধরে সংরক্ষণ করতে হলে বস্তার গাদার ওপর আর এক ধরনের রাসায়নিক যৌগ যন্ত্রের সাহায্যে স্প্রে করা হয়ে থাকে। সম্পূর্ণ দেশীয় শ্রম, উপাদান এবং পদ্ধতি ব্যবহার করে ঐ রাসায়নিক যৌগ এবং স্প্রে করার যন্ত্র তৈরি করেছেন ভারতীয় কুশলীরা। আপাতত একটি যন্ত্রের জন্যে খরচ পড়ছে আড়াই হাজার টাকা। দিনে তিন হাজার বস্তার গায়ে এক একটি যন্ত্র স্প্রে করতে পারে এবং তাতে বস্তা প্রতি খরচ পড়ছে মাত্র দশ পয়সা। বর্তমানে মহীশূর রাজ্যে এ ধরনের ন'টি যন্ত্র কাজে লাগান হয়েছে এবং কেরালায় একটি। সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি এই গবেষণাগারের উদ্ভাবিত পদ্ধতি এবং রাসায়নিক পদার্থ কাজে লাগিয়ে কীট-পতঙ্গ, বীজাণু প্রভৃতির হাত থেকে এরই মধ্যে প্রচুর পরিমাণ খাদ্যকণা অপচয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে শুরু করে দিয়েছেন।

বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে শস্যকণা সংরক্ষণের জন্যে আরও কিছু কিছু সামগ্রীর বহুল প্রচলন দেখা যায়। অনেক সময় চাষীরা কাঠকয়লার গুঁড়ো, এক ধরনের শুকনো মাটি বা ছাই এবং ডি ডি টি বা পারদ-ঘটিত বিষাক্ত পদার্থেরও সাহায্য নিয়ে থাকেন। সম্পূর্ণ গ্রামভিত্তিক এবং বহুল প্রচলিত এই পদ্ধতিগুলির উপর গবেষণা চালিয়ে আরও সস্তায় এবং খাদ্যবস্তুকে দূষিত করার কোনরকম ঝক্কি না নিয়ে যাতে সহজে কাজ সারা যায় তারও অনুসন্ধান চালান হচ্ছে। এ ব্যাপারে এ'দের মূল লক্ষ্য, এমন পদ্ধতি বের করা, যাতে করে সাধারণ দরিদ্র চাষীও সুদূর গ্রামাঞ্চলে বসে থেকে কম খরচায় শস্য বা খাদ্যকণা সংরক্ষণের দিক দিয়ে পিছিয়ে না থাকেন। আর এর জন্যে চাই পুরনো পদ্ধতিগুলির সুবিধে-অসুবিধেগুলি খুঁটিয়ে দেখা। সম্প্রতি এই গবেষণাগার মেট্রোহাইড্রোজেন হ্যালোসাইট-ঘটিত মৃত্তিকা ব্যবহার করে সুন্দর ফল পেয়েছেন। এই মাটি চাষীরা দীর্ঘকাল ধরে কাজে লাগিয়ে আসছিলেন। কিন্তু তাকে মেট্রোহাইড্রোজেন হ্যালোসাইট মিশিয়ে আরও সক্রিয় করে তোলায় সাধারণ মাটি থেকে তার কার্যক্ষমতা প্রায় তিন শ' গুণ বেড়ে যায়। খাদ্যকণা সংরক্ষণের সময় মোট খাদ্যের শতকরা আধ থেকে এক ভাগ এ ধরনের মিশ্রণ ব্যবহার করে দেখা গেছে সমস্ত রকম সংক্রামণ থেকে তাদের রক্ষা করা সম্ভব। এবং তা দীর্ঘকাল ধরেই করা সম্ভব। এতে খাদ্যকণা দূষিত হয় না এবং সংরক্ষিত খাদ্য মানুষ বা কোন কোন জন্তুর কোন ক্ষতিও করে না। ভারতের কোন কোন অঞ্চলে এই পদ্ধতিটি অনেকেই কাজে লাগাতে শুরু করেছেন। এই গবেষণাগারের আর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান, ট্রাই ক্যালসিয়াম ফসফেটের সাহায্যে খাদ্য সংরক্ষণের অভিনব উদ্ভাবন। নতুন এই পদ্ধতিতে এ'রা খাদ্যকণাকে দশমিক দুই শতাংশ পরিমাণ ট্রাই ক্যালসিয়াম ফসফেটের সঙ্গে সামান্য গ্লুকোজ এবং পাইরোজ অকসাইড-এর মিশ্রণ সংরক্ষিত খাদ্যকণার সঙ্গে মিশিয়ে থাকেন। এর ফলে কীটপতঙ্গ ঐ খাদ্যের কোন ক্ষতি করতে পারে না। বরং উপরি লাভস্বরূপ সংরক্ষিত ঐ খাদ্যের মধ্যে বেশ কিছু পরিমাণ ক্যালসিয়াম এবং ফসফেট মিশে যাওয়ায় খাদ্যবস্তুর পরিপূরক হিসেবে তাদের আমরা পেয়ে যাই। অথচ সাধারণভাবে দেহের পুষ্টিসাধনকারী এ দুটি খনিজ পদার্থ অনেক খাদ্যশস্য থেকেই যোগান সম্ভবপর হয় না।

এ ছাড়া সোয়াবীনের তেলের পরিপূরক হিসেবে চালের তুষ থেকে তেল উৎপাদনের ব্যাপার নিয়েও মাথা ঘামাচ্ছেন কেন্দ্রীয় এই গবেষণা-কেন্দ্রটি। বর্তমানে দেশের চাহিদা মেটানর জন্যে এই সোয়াবীনের তেলের একটি মোটা অংশ এখনও পর্যন্ত আমাদের আমদানি করতে হয় বিদেশ থেকে। গবেষণাগারের হিসেবে ধানের তুষকে যথা-যথ কাজে লাগাতে পারলে বছরে ঐ তুষ থেকেই উঁচু প্রোটিন-বিশিষ্ট দু' লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মেট্রিক টন তেল সংগ্রহ করা যেতে পারে। শুধু তাই নয়, তেল নিষ্কাশনের পর তুষের যে অবশিষ্টাংশটি পড়ে থাকবে তারও মধ্যে থেকে যাবে প্রায় শতকরা পঁচিশ ভা প্রোটিন-জাতীয় খাদ্য। একে দেশের পশু-খাদ্যরূপে আমরা কাজে লাগাতে পারি। ফলে পশুজ প্রোটিনের যথেষ্ট সুরাহা করা অসম্ভব হবে না।

চাল এবং ডালের কলগুলির যথেষ্ট সংস্কারসাধন করে ইতিমধ্যে আরও লক্ষ লক্ষ টন খাদ্যের অপচয় দূর করারও চেষ্টা করা হচ্ছে। পুরনো পদ্ধতিতে কলে খোসা ছাড়ানর সময় দেখা গেছে—বেশ কিছুটা খাদ্যকণা গুঁড়ো হয়ে অপচয়ের স্তূপে জমা হয়। তা ছাড়া ডালের খোসার সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট প্রয়োজনীয় খাদ্যবস্তুও নিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। এ দিকটার দিকে লক্ষ্য রেখে এখানকার কুশলীরা সম্পূর্ণ নতুন ধরনের ধান বা ডাল ছাটাই কলের নকশা তৈরি করে ফেলেছেন। সেই সঙ্গে কিছু কিছু কলও তৈরি করা হয়েছে। এ'রা মনে করেন—আধুনিক এই কলে কাজ করতে পারলে আরও কয়েক কয়েক লক্ষ টন খাদ্যের সাশ্রয় করা অসম্ভব হবে না।

ভারতের বাৎসরিক তৈল-বীজের উৎপাদন প্রায় এক কোটি মেট্রিক টন। এর প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টন চীনেবাদাম। চেষ্টা করা হচ্ছে তৈলবীজের খাদ্য উপাদান বাড়ানর। সেই সঙ্গে এদের থেকে নতুন ধরনের খাদ্যবস্তু তৈরির ফরমুলা। যাতে করে ঐ খাবার ছোট বড় সকলেরই স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপারে ভাল-ভাবে কাজ করতে পারে। এ ধরনের পরীক্ষার দুটি বিষয়ের উপর বেশী লক্ষ্য রাখতে হয়। এক—যে খাদ্যটি তৈরি করা হবে

সেটা স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপারে যাতে যথেষ্ট উপযোগী হতে পারে। দুই—ঐ খাদ্য গ্রহণ করার অভ্যেসটি যাতে তাড়াতাড়ি সাফল্যের মধ্যে তৈরী হয়ে যায়। খাদ্যবিজ্ঞানীদের কাছে এই শেষোক্ত লক্ষ্যটি চট করে পূরণ করা কিন্তু খুব সহজসাধ্য নয়। প্রকৃতির নিয়মেই হোক বা সামাজিক প্রথার প্রভাবেই হোক, মানুষের খাদ্য নির্বাচন যেন অলিখিত এক নিয়মে আপনা থেকেই স্থির হয়ে যায়। ভৌগোলিক পরিবেশের পরিবর্তন এবং জল-হাওয়ার প্রভাবেই হোক, কিভাবে এবং কেন বিশেষ বিশেষ খাদ্যে মানুষ অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, সময়ের পরিবর্তন হয়, আচার-অনুষ্ঠানের পরিবর্তন হয় তবু কোন এক অলিখিত বিধানে ভিন্ন ভিন্ন পাকশালার সেই মেনু প্রায় অপরিবর্তিতই থেকে যায়, সমাজবিজ্ঞানী থেকে শুরু করে মনোবিজ্ঞানী, শারীরতত্ত্ববিদ থেকে শুরু করে খাদ্যবিশারদ—এ'রা কেউ আজ পর্যন্ত তার সঠিক উত্তর যোগাতে সমর্থ হননি। অতএব যে খাদ্য গ্রহণে যে মানুষ অভ্যস্ত নয়, যে খাবার প্রচুর খাদ্য-উপাদান সমন্বিত হয়েও তাকে গ্রহণ করার সময় তার রুচিতে বাধে সেই খাবারে কাউকে অভ্যস্ত করে তোলা খুব যে সহজ ব্যাপার তা বলা চলে না। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে হয়ত সম্ভব হলেও সমষ্টিগতভাবে তো নয়ই। পৃথিবীর সর্বত্র খাদ্যচিন্তার এই দিকটি নিয়ে অনেকেই আজ মাথা ঘামাচ্ছেন। সেই সঙ্গে মহীশূরের গবেষণাগারের গবেষকরাও। সুখের কথা, এরই মধ্যে তাঁরা বাদাম এবং তার সঙ্গে আরও কিছু সামগ্রী মিশিয়ে 'বাল-আহার' নামে যে খাবারটি তৈরি করেছেন অনেকেই তাকে সাদরে গ্রহণ করেছেন। এতদিনে যে-সমস্ত খাদ্যবস্তুকে উপেক্ষা করে দেশের অপচয়ের কোঠাই আমরা বাড়িয়ে এসেছিলাম তাদের উপর গবেষণা চালিয়ে আরও কয়েকটি খাদ্য-তালিকা এ'রা তৈরি করে ফেলেছেন এবং শিল্পপদ্ধতিতে তাদের উৎপাদন করে বাজারে ছাড়ার ব্যবস্থাও হয়ে গেছে। এই-সমস্ত খাবারের বেশির ভাগই তৈরি করা হবে তৈলবীজ থেকে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, দেশের প্রোটিন-জাতীয় খাদ্যের ঘাটতি মেটাতে এই খাবার যথেষ্ট সাহায্য করবে।

গোরুর দুধ থেকে যথেষ্ট উচ্চ মানের শিশুখাদ্য তৈরির ব্যাপারে ভারতের ভূমিকা প্রথম। এবং এই উল্লেখযোগ্য অবদানের পেছনে যাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন তাঁরা ভারতের কেন্দ্রীয় খাদ্য এবং কারিগরী বিষয়ক গবেষণা-কেন্দ্রেরই বিজ্ঞানী এবং ভারতের কিছু কিছু শিল্প-প্রতিষ্ঠান। এই শিল্প-প্রতিষ্ঠানের একটি এরই মধ্যে মধ্যে বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম শিশুখাদ্য উৎপাদকরূপে আজ পরিগণিত। শুধু এই একটি প্রতিষ্ঠান থেকেই দেশ প্রতি বছর ছয় কোটি টাকার মত বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের সুযোগ পেয়েছে। এ ছাড়াও ফল সংরক্ষণ এবং ফল থেকে বিভিন্ন খাদ্যবস্তু তৈরির সময় যে অপচয় ঘটে তার নিরোধের ব্যাপারেও উল্লেখযোগ্য কাজ করা হয়েছে। ব্যারাকপুর, উড়িষ্যা এবং দক্ষিণ ভারতের কোন কোন অঞ্চলে মাছ-চাষের কৃত্রিম পদ্ধতির উপর যে-সমস্ত গবেষণা হচ্ছে, আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে তাদের মান যে যথেষ্ট উঁচু তাই নয়, ঐ-সমস্ত পদ্ধতি সামগ্রিকভাবে কাজে লাগাতে পারলে দেশের প্রোটিন সমস্যা অল্প সময়ের মধ্যেই দূর করা অসম্ভব হবে না। ভারতের সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলও প্রচুর পরিমাণ মৎস্যসম্ভারের আকর। কিন্তু সেই মাছ দেশের অভ্যন্তরে দূরবর্তী অঞ্চলে পাঠানটাই আজকের সবচাইতে বড় সমস্যা। এর জন্যে চাই বিশেষ ধরনের যানবাহন ব্যবস্থা, শীততাপনিয়ন্ত্রিত গাড়ি, সংরক্ষণাগার প্রভৃতি। কম খরচে যাতে এদের তৈরি করা যায় তার উপরও পরীক্ষা চালান হচ্ছে। তবে এর সঙ্গে যেটা দরকার সেটা হল জনসাধারণের ব্যক্তিগত আগ্রহ এবং সহযোগিতা। শিশিখাদ্য শিল্পের মত অন্যান্যরা যদি মৎস্য সংগ্রহ বা দেশের মধ্যে মৎস্য পরিবহণ প্রভৃতি নিয়ে কেন্দ্রীয় গবেষণাগারগুলির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করেন তাহলে প্রকৃতির বিশাল প্রোটিনের আকরটিকে দেশের স্বার্থে সহজে এবং আরও দ্রুত কাজে লাগান সম্ভব হত। বস্তুত খাদ্যের ব্যাপারে এবং নতুন খাদ্য-চিন্তার উদ্ভাবনায় কেন্দ্রীয় খাদ্য গবেষণা এবং কারিগরী কেন্দ্র এ পর্যন্ত যা করেছেন তা শুধু প্রতিশ্রুতিপূর্ণই নয়, আশাব্যঞ্জকও বটে। দ্রুত খাদ্য দুশ্চিন্তা দূর করার ব্যাপারে এখনই যেটা দরকার তা হল তাঁদের উদ্ভাবিত বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানর প্রয়াস। এর জন্যে চাই ঐ-সমস্ত গবেষণাগারের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবেই হোক বা সঙ্ঘবদ্ধভাবেই হোক, যোগাযোগ স্থাপন করা। এটা করতে পারলে শুধু খাদ্যের অপচয় দূর করাই নয়, হয়ত খুব কম সময়েই আমরা দেশকে অন্তত খাদ্যের ব্যাপার স্বয়ম্ভর করে তুলতে পারব।

সমরজিৎ কর

মোল্লা এবং মল্লিক সাহেব

ইলাহিকাণ্ড :

ইলাহি বক্সের বউকে নাকি জীন ধরেছে!

সে গান করছে, নাচছে, বগল বাজাচ্ছে, ডিগবাজি খাচ্ছে আর অশ্লীল ভাবভঙ্গি করে শুনে...আও...দিসে পালাতে হবে এমন আদিরসাত্মক কথাবার্তা বলছে। ইলাহি বক্সের বাড়িতে লোক তবু ধরে না। মেয়েরা হাসছে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে। পুরুষেরা একচোখ দেখেই সরে যাচ্ছে লজ্জায়। ইলাহি বক্সের মা সাধেমন বিবি 'বড়কান গাজি', 'মাদার সাহেব' 'শা ফরিদ', 'গুনুজের মল্লিক', 'ওলা বিবি'—এই পাঁচটা পীর-পীরিনীর থান ধুইয়ে এনে খাইয়েছে বউকে —থানে মাটির ঘোড়া বসিয়ে দিয়ে এসেছে একুশটা করে—বাতাসা মানসিক করে বিতরণ করেছে। কেউ শত্রুতা করে 'বাণ' মেরেছে মনে করে কল্পিত মস্তকের নামে মাটির মালসা উপুড় করে দিয়ে আকাশে হাত তুলে 'বদ্‌দোওয়া' করে এসেছে : 'হে আল্লা আমার বউয়ের যে সর্বনাশ করেছে সে যেন নির্বংশ হয়।'

কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। পাঁচজনের যুক্তিতে এবার ইলাহি বক্স গেল মোল্লা মোগলজানের কাছে। মোল্লা সাহেব এলেন হাতে একটা বাঁকা লতার লাঠি নিয়ে। তাঁর গলায় 'দোওয়া তাবিজে'র লম্বা মালা ঝুলছে—লাল নীল সবুজ সাদা কালো কাঁচের দানা গাঁথা। গায়ে কালো রঙের জোব্বা। মাথায় বাবরি ছাঁট চুলের ওপর ...চিরে-চিরে-বোনা ফুটো ফুটো জালি টুপি। মেহেদি পাতার রসে রাঙানো লাল দাড়ি, নাভিতক লম্বা। মোল্লা সাহেব এসে দাঁড়ালেন 'আস্‌সালামো আলায়কুম' বলে। সবাই উত্তর দিলো (মেয়েরা বাদে) 'ও-আস্‌সালামো আলায়কুম।'

ইলাহি বক্সের বউ মোল্লাকে মিলিটারী কায়দায় সালাম জানালে। মোল্লাও হেসে উত্তর দিলেন। বললেন, 'বসো।'

বউটি বসল। মোল্লা তার সামনে বসে শুধোলেন, 'আমি কে বলো তো?'

'তুমি পুঁথিপড়া মোল্লা, দুটো টাকা দিলে একজনের বউয়ের তালাকনামা লিখে দাও। পাঁচসিকে দিলে পাঁচ ছেলের মায়ের নিকে পড়াও। ভূত ছাড়াও, জীন ছাড়াও। ওলা-উঠো অম্বলশূলের পানিপড়া দাও। আল্লার নামে তোমার সব ফক্কিবাজীর ব্যবসা।'

'চোপ!' হাঁক মারলেন মোল্লা সাহেব। মেয়েটি উঠে পড়ে তখন বগল বাজাতে শুরু করলে। মোল্লার মাথার টুপি খুলে নিতেই তাঁর টাক বেরিয়ে পড়ল। মোল্লা রেগে গিয়ে উঠে পড়ে বউ হালিমার নড়া ধরে

চেপে বসিয়ে দিয়ে টুপিটা মাথায় গলিয়ে নিয়ে বললেন, 'ধরো একে, খচ্চর 'কালা-জিন' ধরেছে! 'এসম আজম' পড়তে হবে।'

বিড়বিড় করে কী সব আরবী আওড়াতে লাগলেন মোল্লা। হালিমার ঘাড় গুঁজে ধরা আছে। সে গোঁগোঁ করছে। মাঝে মাঝে ঝেড়ে ঝেড়ে উঠতে চাচ্ছে। মোল্লা ফুঁ-ফাঁ করে মুখের হাওয়া দিচ্ছেন ঝাড়ন মন্তর ছোঁড়ার মতো করে। থুথু ছিটকে পড়ছে তাঁর মুখ থেকে।

ঘণ্টাখানেক এই রকম করার পর মেয়েটা জখম হয়ে যায়। সংজ্ঞা হারিয়ে গেলে শুইয়ে দেওয়া হয়। মুখ থেকে তার গাজা উঠতে থাকে। মোল্লাজী মাটিতে চিক কেটে তাকে গণ্ডী দেন। বাঁ হাতটা হালিমার বুকের ওপর রেখে মোল্লা আকাশের দিকে মুখ তুলে বলতে থাকেন : 'ইয়া আলী, ভেঙ্গ মাওলা, পীর জাহান্দার, আমেল-কামেল, আল্লার নামে সবাই মাথা নোয়াও কাবায়, তার নামে ভূত মামদো, কালা জীন, পেত্নী, শাকচুন্নি—দানো দক্ষিণে—সব পালা—যদি না পালাস তোর নামে আল্লার কসম!'

মোল্লা মাটিতে চাপড় মারতে লাগলেন। হলুদ পুড়িয়ে নাকে চেপে ধরতে লাগলেন হালিমার। একটা তামার পয়সা পুড়িয়ে কপালে বসিয়ে দিতেই মেয়েটি আঃ আঃ শব্দ করলে একবার, পরে সংজ্ঞা হারাল।

মুখে জলের ছিটে মারতে মারতে জ্ঞান ফিরলে মেয়েটি বসল। তাকে মোল্লা শুধোলেন, 'তোর নাম কি?'

'আমার নাম কাদের বক্স। ঐ 'আমুলি' (তেঁতুল) গাছে থাকি।'

মোল্লা মাথা নাড়লেন। ঠিক ঠিক। বললেন, 'আচ্ছা, জীনের তো শুনি অনেক ক্ষমতা, কই তুই এক ডাবর পানি দাঁতে করে করে নিয়ে যা দেখি!'

এক ডাবর জল এনে দিতেই মেয়েটা উঠে নিচের পাটির দাঁত দিয়ে তার কানার তলাটা চাগিয়ে তুলে তিন বেড় ঘুরিয়ে এনে ফেলে দিলে। তারপর সে পড়ে মুখ ঘষড়াতে লাগল। মোল্লা তার গর্দানটা চেপে ধরে পিঠে পাছায় চাপড় মারতে লাগলেন। মেয়েটির আবার জ্ঞান হারিয়ে গেল। তখন মোল্লা বললেন, 'ঐ দেখ ঐ দেখ, জীন পালালো, ঐ শোঁ শোঁ করে আকাশ ঘেঁষে উড়ে পালাচ্ছে!'...

মোল্লা এরপর ইলাহি বক্সের বাড়ি-বন্দনা করে নিশান পুঁতে, দোওয়া-তাবিজ-মাদুলী দিয়ে গেলেন। 'সরা পড়া' দিয়ে গেলেন দুয়ার জানালার মাথায় টাঙিয়ে দেবার জন্যে। পঁচিশটা টাকা নিয়ে চলে গেলেন মোল্লা সাহেব।

কিন্তু জীন ছাড়ল না। আবার দু'চার-দিন বাদে বাদে বউ হালিমার অমনি উপসর্গ হতে লাগল। মোল্লা বললেন, 'হবে না কি হবে, বাসিছুঁত গায়ে দোওয়া-তাবিজ রাখলে ভূত-জীন এসে আরো জুটবে।'

কিন্তু গ্রামের প্রাইমারী স্কুলের মাস্টার ইউসুফ মিয়া বললেন, 'ভূত মানুষকে ধরে না, মানুষই আসলে ভূত! ইলাহি বক্সের বউকে হিস্টিরিয়া রোগে ধরেছে। ভাল ডাক্তার দেখাতে বলো—সেরে যাবে।' কিন্তু একথা কানে গেলে মোল্লা সাহেব তাঁকে প্রকাশ্যে ইংরিজি-শেখা 'কাফের' 'বেদ্দীন' বলে গালাগালি করলেন। শুধোলেন, 'কোরআন শরীফে কি জীনের উল্লেখ নেই?' মাস্টার সাহেব তখন একেবারে চুপ!

কিন্তু দিনচারেক পরে হঠাৎ শোনা গেল ইলাহি বক্সের বউ হালিমা খাতুন পুকুরে পড়ে ডুবে মারা গেছে। সে নাকি আবার পোয়াতি ছিল।

হালিমার লাস আর সদরে চালান গেল না। কাফন দাফনের হুকুম পাওয়া যেতে আবার মোল্লা সাহেবকেই ডাকতে হল।

মোল্লা শুধোলেন : তোর নাম কি?

HAZELINE
BEAUTY TALC

এটি এতো মিহি যে অক্লেশে মুখেও মাখতে পারেন!

ভারতের প্রথম প্রকৃত শৌখীন ট্যাল্ক সর্বাঙ্গে মেখে অপার আনন্দ উপভোগ করুন।

সহযোগিতার জন্য

ধন্যবাদ

আপনি আমাদের দেশী ব্র্যাণ্ডের সিগারেট খান, ওটা ভাল বলেই এবং আপনার অন্তরেরও তাতে সায় রয়েছে। নানাভাবের সূক্ষ্ম চাপ ও নিরুৎসাহ করার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আপনি যেটা একবার বেছে নিয়েছেন সেইটেই ধরে রেখেছেন গর্বের সঙ্গে এবং আপনার বিচারবিবেচনার ফলে।

আপনি চতুর প্রচারের ঘটায় বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন নি এবং এটা নিঃসন্দেহে বুঝতে পেরে গেছেন যে, ভারতে প্রস্তুত সিগারেট অথচ যাকে ভুল করে বিদেশী সিগারেট বলেই মনে হয়—সেগুলির দাম বেশী বলেই সত্যি-সত্যি গুণেও সেরা হয়ে ওঠে না। আর, তাছাড়া একথাও আপনি নিঃসন্দিগ্ধভাবেই জানেন যে ভারতে সেরা সিগারেট তৈরী করবার মতন জনবল, অর্থ ও কাঁচামাল পর্য্যাপ্তই রয়েছে এবং সত্যিকারের দেশী সিগারেটই এখানে তৈরী হতে পারে যাতে ভারতের অতি প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রাও বহুপরিমাণে বাঁচান যেতে পারে।

আপনার এই আদর্শের ওপর এবং আপনার অনুকারী ক্রমবর্দ্ধমান বহুসংখ্যক ধূমপায়ী যাঁরা দেশী সিগারেটই খান, তাঁদেরই ওপর নির্ভর করে দেশের এই শিশু সিগারেট শিল্পের ভবিষ্যৎ।

আমাদের দিক থেকে আমরা আপনাদের সেবায় পূর্ণভাবে নিয়োজিত এবং দেশীয় শিল্পের উন্নতিই আমাদের স্থির লক্ষ্য।

গোল্ডেন টোব্যাকো কোং প্রাইভেট লিমিটেড
বোম্বাই-৫৬

ভারতের এই ধরণের বৃহত্তম জাতীয় উদ্যম

GT.61.BNG Greens' Advtg.

মোল্লা সাহেব চুপ। ব্যাটা পাগলা বলেছে মন্দ কথা নয়।

মল্লিক সাহেব শুধোলেন, 'যদি মুসলমান মেয়েরা এই বলে অভিযোগ আনে যে, তারা একটি পুরুষ-শাসিত সমাজে বন্দী হয়ে রয়েছে এবং ব্যর্থ জীবনযাপন করছে, তা হলে তাদের কি উত্তর দেবে? মুসলমান নারীদের সামাজিক অধিকার নেই কেন? কেন তারা ময়দানে নামাজ পড়তে যাবে না, কেন তারা স্বামীর বা পুত্রের কবর পর্যন্ত দিতে যাবে না? অবশ্য বলবে, কেউ কেউ যুদ্ধক্ষেত্রে গেছেন, রাজ্য চালিয়েছেন, সেটা ব্যতিক্রম, শতকরা দশজনও নয়। গোটা মুসলমান মেয়ে-জাতটা হারেমে পর্দার বন্দী কেন?'

মোগলজান বললেন, 'তবে কি বেপর্দা হতে বলো?'

'না, তা বলি না। এর মূলে পুরুষ-শাসিত সমাজ বলে এই মত দাঁড়িয়েছে। আমাদের এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর গত হয়েছেন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে কি কেউ মেয়েলোক ছিলেন?'

মোল্লা বললেন, 'মেয়েছেলে পয়গম্বর হয়ে ধর্মপ্রচারে বেরুলে তাঁকে বেদুইনরা বা দস্যুরা চুরি করে নিয়ে পালাত!'

'না বলেছিস বেটা। পুরুষেরা বড় ভালবাসে নারীদের! যা হোক, আল্লা নারীদের ফুলের মালা করে মুসলমানদের গলার পরিয়ে দিয়েছেন, তারা অন্তরে-অন্দরেই থাক। কিন্তু তাদের প্রতিনিধি দেন নি আল্লা এটা সত্য। দিলে তাকে রক্ষা আল্লাই করতে পারতেন। কোনো পয়গম্বরের জীবনই সুখের ছিল না। কেউ যদি তর্ক করে বলে যে, এক লক্ষ চব্বিশ হাজার জন পয়গম্বরের সব নাম আমরা জানি না যখন, তখন তাঁদের মধ্যে মহিলা আসেননি এমন কথা বলাও কঠিন। কিন্তু বাবা, এক আধজন যদি বা আসেনও তাঁদের নামের উল্লেখ আছে কি কোরআন শরীফের মধ্যে? আর সব চাইতে গুরুতর কথা যদি জিজ্ঞাসা করি আল্লা কোন্ জেন্ডার? মানে কোন্ লিঙ্গ?'

মোল্লা সাহেব উত্তর দিলেন, 'তিনি কোনো জেন্ডার বা লিঙ্গ নন। তিনি নিরাকার। তাঁর আবার জেন্ডার-জেন্ডার হবে কেন?'

'তবে বাবা নিরাকারটা মাকে বিচারবান, শক্তিমান, সম্পূর্ণ, দয়াশীল, প্রেমময় বলো কেন? কেন পুংলিঙ্গ ব্যবহার করো? ভুলেও বলো না কেন তিনি বিচারবতী, প্রেমময়ী, দয়াশীলা? এতে প্রমাণ হয় মুসলমানদের পুরুষ-শাসিত সমাজ। আর তাই পুরুষমানুষ তার স্ত্রীকে যে কোনো মুহূর্তে তিন তালাক দিয়ে তাড়িয়ে দিতেও পারে। আবার পাঁচ সিকে পয়সা দিলেই মোল্লা মোগলজানরা সেই মেয়ের একটা নিকে দিয়ে দিতে পারে 'ইদ্দৎ' পালনের পর—পেটে সন্তান আছে কি না দেখে মাস তিন-চারেক পরেই অন্যের সঙ্গে। আর অন্যের পুরুষটি আবার বিয়ে করতে পারে, আবার তালাক দিতে পারে; আবার বিয়ে করতে পারে, আবার তালাক দিতে পারে; আবার বিয়ে করতে পারে, আবার তালাক দিতে পারে...' ক্রমাগত মিনিট খানেক ধরে একই কথা উচ্চারণ করতে থাকেন পাগলা মল্লিক সাহেব।

সবাই হাসিতে ফেটে পড়তে রাগে মোল্লা সাহেব উঠে টরটর করে চলে গেলেন। কলকে বাজাতে লাগলেন নাদির সাহেব।

সবাই থামলে মল্লিক সাহেব মোল্লা মোগলজানের উদ্দেশে বললেন, 'না বেটা, মেয়েদের ভূত-ছাড়িয়ে জীন ছাড়িয়ে, দোওয়া তাবিজ বেচে, ওলাউঠোর পানি-পড়া দিয়ে, 'ওলা' তাড়িয়ে, আল্লার নামে মিথ্যার বেসাতি করে গিয়ে—কিয়ামতে যেন সাজাই হয় তোদের জন্যে। এই লোকদের পয়দা করে আল্লা নিজেই পড়েছেন বিপদে। এরা না বোঝে নিজেদের, আর না বোঝে আল্লাকে। আর ৯৯ নামের আল্লার জায়গায় এখন ৯৯৯ নামের শয়তান এদের মগজে আর মনে চিরস্থায়ী বাসা বেঁধেছে। এরা আলোর ফরসা কাপড় দেখে ঈর্ষান্বিত, নিজেদের ময়লা কাপড় পরিষ্কার করবার কথা বললেই ক্ষেপে যাবে।'

রাত হয়েছে দেখে মাস্টার সাহেব চাঁদনের মল্লিক সাহেবকে হাত ধরে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। যাবার আগে তিনি সবুজ কোলকে বার করে গাঁজা টেনে গেলেন। কটু গন্ধে চারদিকটা ভরে গেল।

মোল্লা মোগলজান এবং নাদির মল্লিক দুটি মানুষ—এঁদের মধ্যে কে ভাল, কে মন্দ সে বিচারে কাজ নেই, কিন্তু পথে ফেরার সময় কেন জানি না দুজনেরই ভাবমূর্তি মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলল। একজন আচার-তান্ত্রিক, বুদ্ধিহীন, আধা শিক্ষিত আর তিনি ভার নিয়েছেন ধর্মের মাধ্যমে জন-কল্যাণের। সেখান থেকে আহরণ করেন জীবিকা। তাঁর দেওয়া সমাজক্ষেত্রে অপাংক্তেয় হলেও মানুষ তাকে নিষ্প্রয়োজনীয় ভাবে না আর সেই দেওয়ার মাঝে তুকতাক বিধি-নিষেধের কল্পিত রং চড়ান মোগলজান, কিন্তু তার 'দেওয়াটা' আদৌ কোনো শিক্ষা নয় তেমনি বিজ্ঞানও নেই জোর করে আদায় করার যদিও তা অপ্রচুর। বটবৃক্ষের ডাল-পালায় বহু কাক কোকিল তোতা ময়না চিল শকুন বাস করে তার মধ্যে মোগলজান তো একটা ছোট্ট টুনটুনি মাত্র।

আর পাগলা নাদির মল্লিক সংসারছাড়া প্রগল্ভ ব্যক্তি। ছিদ্রান্বেষী। তার্কিক তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি শিক্ষিত মানুষ হলেও তাঁর মধ্যে আচারনিষ্ঠা নিয়মনীতি বা সামাজিক দায়ের বালাই নেই। তিনি কতকটা উদাসীন সন্ন্যাসী ধরনের। তাঁর কথার ওজন আছে, ধার আছে, আছে গভীরতা, [illegible] তিনি জানেন অনেক, কিন্তু পালন করেন না কিছুই। তবু তাঁর মধ্যে সত্য-অন্বেষা আছে কিছু, আলোর ঝিকিমিকি আছে। পবিত্র কোরআন, হাদিস, হজরতের জীবন তাঁর ভাল জানা আছে—কিন্তু মোগলজানের তেমন জানা নেই।

আল্লা সম্বন্ধে দুজনের বোধ দু-রকম। মোল্লা সাহেব সম্মোহিত। নাদির সাহেব মুক্তবুদ্ধি।

মোল্লা হিস্টিরিয়া রোগকে কালা-জীন-ধরা বলে বিশ্বাস করেন আর চাঁদনের মল্লিক সাহেব সব জেনেশুনেও গাঁজা খান, অশ্লীল কথা বলেন।

মোল্লা মোগলজানের বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছিলাম, সেখান দিয়েই আমার পথ। উচ্চকণ্ঠে তাঁর পুঁথি পড়া শুনতে পেলাম। প্রায়ই যেমন শোনা যায় :

মুস্কিলে ত্রিশ মণ করে জল পান।

আশি মণ খানা ফের খায় সোনাভান॥'

বাস্তব জীবনের দুঃখকষ্টকে ভুলবার জন্যে অশিক্ষিত আধা-শিক্ষিত লোকদের কাছে পরম প্রিয় বোধ হয় অলৌকিক গল্প-কাহিনী।

তাই 'মোজেজা' বা অলৌকিক ভূতপ্রেত জীনপরী অপদেবতার কাহিনী অথবা পড়া অশিক্ষিত জাতিসম্প্রদায়ের বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। বাস্তবভিত্তিক বিজ্ঞানকে তাই এই সব লোক শত্রুর যমদণ্ড মনে করে। যেমন মোল্লা সাহেব বলেন : 'তোমরা যেমন জীনপরীতে বিশ্বাস করো না, আমরা তেমনি তোমাদের চাঁদে যাওয়াকেও বিশ্বাস করি না।'

পরদিন পাগলা নাদির সাহেব চাঁদে যাবার প্রসঙ্গ উঠতে বললেন, 'মানুষকে আল্লা কতখানি ক্ষমতা দিয়েছেন চাঁদে পৌঁছানোই হল তার প্রমাণ। পরে পরে অন্য সব গ্রহেও সে যাবে—আর আঠারো হাজার আলম অর্থাৎ ভুবনের খবর পেয়ে সে হবে বিস্মিত! প্রশ্ন করবে, কে ঐ মহাবিশ্বলোকের ধারক? ভাবতে ভাবতে তারাও একদিন আমার মতন পাগলা হয়ে যাবে।'

আবদুল জব্বার

॥ ৪ ॥

রথীন আমার বন্ধু এবং সহপাঠীই শুধু নয়, সহ খেলোয়াড়ও ছিল। অল্প বয়সেই বড় ফুটবলারের লক্ষণগুলো ওর মধ্যে দেখা দিচ্ছিল। সেবার ক্লাশ টেনের সঙ্গে খেলা। শুনলাম রথীন খেলতে পারবে না। ওর বাড়ি গিয়ে দেখি কম্বল-মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। গায়ে বেশ জ্বর। আমায় চিন্তিত দেখে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, "তুই ঘাবড়াস না। কাল ঠিক খেলব।"

ওর প্রস্তাব উড়িয়ে দিয়ে বললাম, "তোর মা হরদম এ ঘরে আসছেন, বেরোবি কেমন করে?"

লম্বা পাশ বালিশটার ওপর কম্বলটা বিছিয়ে ও বলল, "এমনি করে ধোঁকা দিয়ে।"

পরদিন খেলায় জিতে আমরা যখন নাচানাচি করছি, ও তখন আমায় বলল, "ছুট্ করে একটু টিঞ্চার আয়োডিন দিতে পারিস? এক্ষুনি আবার বাড়ি ফিরতে হবে, না হলে মার কাছে ধরা পড়ে যাব। জানিস তো মা আমার ফুটবল খেলা দু চক্ষে দেখতে পারে না।"

ওর পায়ের দিকটায় অনেকটা কেটে গিয়ে ঝর ঝর করে রক্ত পড়ছে। টিঞ্চার না পেয়ে, পানের দোকান থেকে চুন এনে দেখি ও বাড়ি চলে গেছে।

তিনদিন পর স্কুলে খবর এল রথীন টিটেনাসে মারা গেছে। ওদের বাড়ি গিয়ে দেখি, সবাই বিমূঢ় হয়ে একটা প্রশ্নই করছে : ওর পায়ের কাছে ওই রকম কাটল কেমন করে—যার থেকে টিটেনাস হল? আর ওটা ও শেষ পর্যন্ত গোপন করল কেন?

সেদিন এ প্রশ্নের জবাব একমাত্র আমিই দিতে পারতাম, কিন্তু খুন না করেও, খুনীর ধিক্কৃত বিবেক নিয়ে সারাটা জীবন আমায় নীরব থাকতে হবে।

চল্লিশ বিয়াল্লিশ সালে, অর্থাৎ প্রাক-স্বাধীনতা যুগে আমরা যখন ছোট ছিলাম, তখন দেখেছি খেলাধুলো করাটা ছিল অপরাধ বিশেষ। বাড়ির এবং পাড়ার গুরুজনরা বলতেন, "ছেলেটা বয়ে গেছে—ওটার দ্বারা কিসসু হবে না।"

বাড়ির মেয়েদেরও দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। এই বুঝি হাড়-গোড় ভাঙব, কিংবা মাথা ফাটিয়ে বাড়ি আসব! স্কুলের মাস্টার মশাইরা উপদেশ দিতেন, "যারা অধ্যয়ন ছেড়ে এইসবে মাতে মা সরস্বতী তার কাঁধে কোনদিনই ভর করেন না। তার অশেষ দুর্গতি। রিক্‌শা ঠেলে, কিংবা মুটেগিরি করে তাকে সারাজীবন বাঁচতে হবে।"

কেরানী গড়বার সেই আদর্শ পরিবেশ থেকে শুধু খেলাধুলোই রেহাই পেত না, গান-বাজনা, সাহিত্য, শিল্পচর্চা, সবকিছুর প্রতিই একই রকম সামাজিক মনোভাব ছিল। অর্থাৎ এগুলো নষ্ট হয়ে যাওয়ার পথ।

স্বাধীনতার পর, পদ্মশ্রী, অর্জুন পুরস্কার থেকে আরম্ভ করে, ভাল ভাল চাকরী পর্যন্ত যখন খেলোয়াড়েরা খেলার দৌলতে পেতে শুরু করল, সেই সঙ্গে সিনেমা শিল্পী এবং রাজনৈতিক নেতার পরই জনপ্রিয় হয়ে উঠল, তখন থেকে সমাজ এবং সংসারের ভিতরের বাধাটা আস্তে আস্তে কেটে যেতে লাগল।

যে কোন বিষয়ে কৃতী হতে হলে, বেশ কিছু পরিমাণে স্বার্থপরতা ছাড়া উপায় নেই। আজ বোধ হয় সময় হয়েছে পরিবার-বর্গের সচেতন হবার; কোন ছেলের যদি খেলার প্রতিভা থাকে, তাহলে তার জন্য পরিজনের দিক থেকে কিছু কিছু ত্যাগ স্বীকার আবশ্যক। যেমন আমাদের সমাজে লেখাপড়ায় ভাল ছেলেদের ক্ষেত্রে যে রকম ত্যাগ স্বীকার বরাবর করা হয়।

তাই কিছুটা সঙ্কোচের সঙ্গে দৈনন্দিন খাদ্যের একটা তালিকা দেওয়া হল—যা ফুটবলারের অতি প্রয়োজনীয় ক্যালরী পূর্ণ করবে। ভোরে প্রাতঃকৃত্য সেরে, অনুশীলনের আগে, একমুঠো ভিজে ছোলা গুড় দিয়ে, কিংবা বিস্কুটে খানিকটা মধু মিশিয়ে খাবে। খালিপেটে অনুশীলন অথবা খেলা অনুচিত। অনেক ফুটবলার এ সময়ে চা খেয়ে থাকে। চায়ে যে 'ক্যাফিন' থাকে, তা আমাদের স্নায়ুতন্ত্রে কিছুটা উত্তেজনা আনলেও, চায়ে 'ট্যানিক' নামে অপর এক বিষাক্ত অ্যাসিড থাকায়, এ আমাদের শরীরের ক্ষতিই করে। অনুশীলন অথবা খেলার পর বরফ খাওয়াও সমান ক্ষতিকর। এক-গ্লাস চিনির জলে খানিকটা পাতিলেবুর রস মিশিয়ে খেলেই, ফুটবলার শরীরের কর্ম-ক্ষমতা ফিরে পাবে।

যাদের আর্থিক সচ্ছলতা আছে, তারা যবের ছাতুর সঙ্গে পাতিলেবুর রস, টক-দই ও আখের গুড় মিশিয়ে এক গ্লাস খেলে, একদিকে যেমন শরীরে দ্রুত এনার্জি ফিরিয়ে আনবে, সেই সঙ্গে পেটও ঠাণ্ডা রাখবে।

ব্রেকফাস্ট :—হাতে গড়া রুটি চারখানা, সিদ্ধ আলু, আধসেদ্ধ ডিম একটা, একপো দুধ কলা অথবা খেজুর। সেই সঙ্গে ভেজানো একমুঠো কাঁচা চিনেবাদাম।

দুপুরের খাওয়া :—তিন ছটাক ভাত (ফেন সমেত), ডাল, তরকারী, কাঁচা

পেঁয়াজ (লেবুর রসে মিশিয়ে), এক ছটাক মাছ এবং টক দই। সঙ্গে সেই সময়ের যে কোন একটা শস্তা দামের ফল।

বৈকালিক জলযোগ :—চা, বিস্কুট। অথবা মুড়ি নারকেল দিয়ে। চিড়ে-দই সহযোগেও ভাল জলযোগ হয়। কিংবা দুধ-ফল সহ-যোগে।

রাতের খাওয়া :—তিন ছটাক থেকে একপো আটার রুটি। ঘি মাখান হলে হজমের পক্ষে সুবিধের হয়। মুসুরির ডাল—যে কোন শাক দিয়ে। তরকারি (আলুর ভাগ যেন বেশী থাকে)। শশা এবং পিঁয়াজ দিয়ে স্যালাড। এক ছটাক মাছ অথবা মাংস। কেউ যদি পাঁঠার মাংসের উচ্চ মূল্যের জন্য সাহস করে গরুর মাংস খায় তাহলে সে বেশী লাভবান হবে।

প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে খাওয়ার অভ্যাস করা ফুটবলারের অতি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য।

চার ঘন্টা অন্তর খাওয়াই নিয়ম। অর্থাৎ দিনে চারবার। খেলার দিন সকাল ১২টায়

...ভাত খাওয়া সেরে নিতে হবে। ...খাদ্য পাকস্থলীতে তিন ঘণ্টার বেশী ...থাকে না। কাজেই খেলার আগে অল্প ...সহজপাচ্য খাবার খেলে পেটের ...গোলমালে টান ধরবার সম্ভাবনা থাকে না।

...রোভার্স কাপে সবাই ...করেছিল কলকাতার জুনিয়ার টীমটা বেশ ভালই খেলবে। কলকাতায় সে বছর ওরা সাতটাই ভাল খেলেছিল। বম্বেতে প্রথম খেলায় জিতল। কিন্তু দ্বিতীয় খেলার বিরতির পর, টীমের সব খেলোয়াড়ই কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়ল। হেরে যাচ্ছে, তবু যেন গোল শোধ করতে কারও গা নেই। খেলার শেষে ওদের এক খেলোয়াড়কে জিজ্ঞাসা করলাম: "কি ব্যাপার, তোমাদের টীমের এ রকম অবস্থা কেন?" ছেলেটি বলল, "আমাদের ম্যানেজার আজ খেলার আগে সবাইকে মাত্র দুখানা করে রুটি খেতে দিয়েছেন। আমরা রোজ যেমন ভাত খেয়ে খেলি, সেই রকম খেতে চাওয়াতে উনি বললেন, 'বিদেশের খেলোয়াড়রা কেউ ভাত খায় না। খালি ব্রেকফাস্ট খেয়ে খেলে, তাই ওরা এত খাটতে পারে।' আর এদেশে

আমরা খেলার আগে গাদা গাদা ভাত খেয়ে খেলার মাঠে লড়তেই পার না।' আচ্ছা আপনিই বলুন, দুখানা হাতে গড়া রুটি আর একটু মাংসের স্ট্যু খেয়ে, ৯০ মিনিট মাঠে লড়া যায়? খেলার আগে জানেন, শরীরটা বেশ হাল্কা আর ঝরঝরে লেগেছিল। কিন্তু খেলার মিনিট দশেক পরই, আমাদের সবাইকারই পেটের ভেতরটা এমন খামচে ধরল যে আপনাকে কি বলব। মনে হচ্ছিল তক্ষুনি মাঠ থেকে বেরিয়ে আসি।"

এদেশে আজও অনেকের ধারণা খেলার দিন অল্প করে খেলে শরীর হাল্কা থাকে। এতে নাকি খেলা ভাল হয়। এটা একটা মস্ত ভুল ধারনা। এতে শরীর হয়ত খানিকটা হাল্কা থাকে, কিন্তু খেলার সময় খেলার প্রয়োজনীয় শক্তির অভাবে ফুটবলার নিস্তেজ হয়ে পড়ে ও সেই সঙ্গে পেটের মাংসপেশীর সঙ্কোচন হয়।

অল্প আহারের মত আবার অতি ভোজনও ভাল নয়। এতে পাকস্থলী এত ভারী থাকবে যে ফুটবলার তার 'ফিট্‌নেস' হারাবে, খেলার সময় গলা শুকিয়ে আসবে এবং ঘন ঘন জল তেষ্টা পাবে। কাজেই প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে যে খাওয়ার ফুটবলার অভ্যস্ত, খেলার দিনও তাই খাওয়াই উচিত।

দেখা গেছে, আমাদের দেশের অধিকাংশ ফুটবলার খেলার ঠিক পরই গুরুপাক (প্রোটিন জাতীয় বেশী) খাদ্য খেতে অভ্যস্ত যা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভীষণ ক্ষতিকর। এদের ধারণা—খেলার অতি-পরিশ্রমজনিত দেহের ক্ষয়, এই খাদ্যে তৎক্ষণাৎ পূরণ করে দেবে।

আসলে খেলার সময়, শরীরের সব রক্ত হাত এবং কর্মরত পেশীগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে এবং এ রক্ত স্বাভাবিক হয়ে পাকস্থলীতে ফিরে আসতে ২।৩ ঘণ্টার মত সময় লাগে। এই সময়ের ভিতর কেউ যদি চপ-কাটলেট-মাংসের মত গুরুপাক খাদ্য খায়, তাহলে হজমের জন্য পাকস্থলীতে যে রক্তের দরকার, তা আর তখন পাওয়া যায় না। এর ফলে ফুটবলারকে প্রায়ই আমাশয় এবং লিভারের দোষে ভুগতে দেখা যায়।

তাই খেলার পর সহজপাচ্য খাদ্য খাওয়া দরকার। যেমন চিনি দিয়ে লেবুর সরবৎ। কিংবা ফলের রস। টোস্ট কিংবা আধসেদ্ধ ডিম। কিংবা সন্দেশ ও ছানা জাতীয় মিষ্টি।

দিনে আটঘণ্টা ঘুম ফুটবলারের অবশ্যই দরকার। অনুশীলন যদি দুবেলা করা হয়, তাহলে একে বাড়িয়ে দশ ঘণ্টা করতে হবে। প্রতিদিন একই সময়ে খাওয়া যেমন খিদের উদ্রেক করে এবং হজমেরও সহায়ক, তেমনি প্রতি একই সময়ে বিছানায় শুতে যাওয়ার অভ্যাসও ফুটবলারকে ঘুমিয়ে পড়তে অনেকটা সাহায্য করে। খেলার পর কিংবা খেলার আগের দিনও স্নায়ুর উত্তেজনার জন্য, শারীরিক ক্লান্তি থাকা সত্ত্বেও, অনেক সময় বিছানায় শুয়ে ফুটবলারের ঘুম আসতে চায় না। সে সময়ে ঘুমের জন্য অযথা দুশ্চিন্তা না করে শুয়ে শুয়ে বই পড়লে ভাল হয়, কিংবা শরীর এলিয়ে শুধু শুয়ে থাকলেও পরের দিন ফুটবলারের শরীরের ওপর ঘুমের এই অভাব তেমন কোন ক্ষতি করে না।

দেখা গেছে রাত বারোটার পর বিছানায় গেলে যে ঘুম হয় তার দু' ঘণ্টার সমান ১২টার আগের একঘণ্টা ঘুমের। কাজেই রাত দশটার ভিতর ফুটবলারদের শুয়ে পড়া দরকার। দিনের বেলা ফুটবলারদের ঘুমনো উচিত কি উচিত নয় এ বিষয়ে নানা মত। তবে আমাদের মত গরম দেশে সকালবেলায় অনুশীলন যদি বেশী হয় তাহলে দুপুরে বিশেষ করে ভাত খাওয়ার পর ঢুলুনি আসাটাই স্বাভাবিক এবং সেই সময়ে একঘণ্টা ঘুমলে শরীরের পক্ষে ভালই। ঘুমের পর ক্লান্ত ভাবটা কেটে গিয়ে শরীর ঝরঝরে হয়ে যায় ও বিকেলে কাজে উৎসাহ আসে।

ধূমপান:—সাধারণের পক্ষে পরিমিত ধূমপান ক্ষতিকর হয়তো নয়। কিন্তু ফুটবলারের দেহে এ বিষের মত কাজ করে, তার শারীরিক কর্মদক্ষতার পথে বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ধূমপান ফুসফুসের ক্ষতি করে শুধু যে নানারকম অসুখ ডেকে আনে তাই নয়, কার্ডিয়াক, শ্বাস-প্রশ্বাস, গ্যাসট্রিক সিস্টেমের, এমন কি চোখের অপ্‌টিক নার্ভেরও যথেষ্ট ক্ষতি করে। কাজেই ফুটবলারের সব সময় ধূমপান থেকে বিরত থাকা পবিত্র কর্তব্য। অবশ্য যারা ধূমপানে বিশেষ অভ্যস্ত এবং একেবারে এ অভ্যাস ছাড়া সম্ভব নয়, তাদের পরিমাণ কমিয়ে দিনে দুটো অথবা তিনটে সিগারেটে সীমাবদ্ধ করতে হবে। এবং এ সিগারেট অবশ্যই ভাল তামাকের হওয়া দরকার।

অল্পবয়সী ফুটবলারদের সঙ্গে যৌন সমস্যা নিয়ে বিশদ আলোচনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে হয়ত দ্বিমত থাকতে পারে, কিন্তু এ বিষয়ের প্রাথমিক জ্ঞানও ফুটবলারকে তার বর্তমান ও ভবিষ্যতের অনেক মানসিক ও দৈহিক সমস্যার হাত থেকে রক্ষা করবে, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দিগ্ধ

১৪।১৫ বছর বয়সেই এ দেশের ছেলেদের যৌন চেতনা অর্থাৎ মেয়েদের প্রতি আকর্ষণ বোধ ও তাদের সম্পর্কে সব কিছু জানবার ইচ্ছে মনে আসে। বেশীর ভাগেরই এ বয়সে দাড়ি গোঁফ বেরোতে শুরু করে। গলার স্বর ভারী হয়। এই বয়সে স্বমেহন বা হস্তমৈথুন এবং স্বপ্নে শুক্রপাত প্রতি একশোজনের ক্ষেত্রে একশোজনেরই জীবনে অতি স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু এদেশে শুক্রের ওপর অহেতুক শ্রদ্ধা থাকায় এবং গুরুজনদের সঙ্গে এ সমস্যা নিয়ে আলোচনা ভীষণভাবে নিষিদ্ধ বলে ছেলেরা স্বপ্নে শুক্রপাত বা হস্তমৈথুনকে মারাত্মক এক নৈতিক অপরাধ মনে করে, হয় চেপে যাবার চেষ্টা করে, না হয় জোর করে একে ভোলবার চেষ্টা করে। আর যত সে প্রাণপণে চেষ্টা করে ততই তার মনে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়। এবং শেষ পর্যন্ত এর পরিণতি পাগলামিতে পর্যন্ত পৌঁছতে দেখা যায়। অথচ আজকের যৌনবিজ্ঞান বলে—খাওয়া, ঘুম এবং তৃষ্ণা যেমন মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, তেমনি এই বয়সে এই কামচেতনা প্রকৃতির নিয়মেই মানুষের দেহে আসে। একে অস্বাভাবিক বা অন্যায় বলে ভাবাটাই অন্যায়। এ ব্যাপারে ফুটবলারের বিশেষ করে জানা দরকার যে, সপ্তাহে একবার বা দুবার স্বপ্নে শুক্রপাত হলেও উদ্বিগ্ন হবার দরকার নেই। কেননা আমাদের প্রতিদিনের খাদ্য থেকেই এর পূরন হয়ে যায়। তবে ঘনঘন শুক্রপাত হলে লজ্জা না করে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

এই প্রসঙ্গে এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার যে দেহে শক্তি সঞ্চয় যত সহজ, তত শক্ত তাকে দেহে দীর্ঘদিন ধরে রাখা। কেননা শক্তি তার আপন নিয়মে বাইরে আসবার অর্থাৎ বিকেন্দ্রীভূত হবার জন্য চেষ্টা সর্বদাই করবে। এবং এই কামচেতনা তার বাইরে আসার প্রধান রাস্তা।

এবং এই রাস্তা ধরেই অন্যান্য নেশার মত হস্তমৈথুনও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বেড়ে থাকে। যার ফলে ফুটবলারের দেহকে দুর্বল করে খেলার যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করতে পারে। কাজেই এই অভ্যাস থেকে ফুটবলার যতটা মুক্ত থাকতে পারে ততই তার খেলোয়াড়ীজীবনের মঙ্গল।

যৌন উত্তেজনাপূর্ণ সিনেমা, ছবি অথবা আলোচনা থেকেও ফুটবলারের দূরে থাকা উচিত। কেননা, এর প্রভাবে চেতন মন থেকে অবচেতন মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে স্বপ্নে ঘনঘন শুক্রপাত ঘটানোতে বিশেষ সাহায্য করে।

প্রয়োজনের বেশী ডিম, মাছ অথবা মাংস খাওয়া বা বিছানায় পাশ বালিশ ব্যবহার করা যৌন উত্তেজনায় সাহায্য করে। এ বদ-অভ্যাস থেকেও ফুটবলারের বিরত থাকা দরকার।

(ক্রমশ)

যে মুখখানির দিকে
সবাই তাকিয়ে আছে
তিনিই বলবেন

কারণটা ঃ

হেজ্‌লীন স্নো

HAZELINE SNOW

হেজ্‌লীন স্নো-তরুণের স্বপ্নমাখানো স্বাভাবিক কান্তির উৎস

ধর, দশ মিনিট। দশ মিনিট থেকেই আমরা বেরিয়ে পড়বো!

—কি করে বুঝবো দশ মিনিট? তুমি তো ঘড়ি পরোনি!

—ওদের দোতলার বারান্দাতেই তো একটা মস্ত বড় ঘড়ি আছে।

—সে তো খারাপ! দুটো কাঁটাই লম্বা হয়ে শুয়ে থাকে!

—গত মাসে খারাপ ছিল বলে কি আর এ মাসেও খারাপ থাকবে। এর মধ্যে নিশ্চয়ই সারিয়েছে।

—যদি না সারায়? তার আগের মাসেও খারাপ ছিল!

—আচ্ছা ঠিক আছে, আন্দাজ দশ মিনিট হয়ে গেলেই আমি তোকে চোখের ইশারা করবো। তুই তখন বলবি, দীপুমামা, বাড়ি নিয়ে চলো! বাড়ি নিয়ে চলো! কাঁদতে পারবি না? মায়ের কাছে যাবো, বলে কাঁদতে পারবি না? আগে যেমন কাঁদতিস!

—মোটেই আমি আগে কাঁদতুম না!

—বছর দু'-এক আগেও কেঁদে ভাসাতি! এখন বড় হয়ে গেছিস!

—দীপু মামা, মিথ্যে মিথ্যি করে কাঁদবো?

—মিথ্যেমিথ্যি কাঁদবি কি রে? এর মধ্যেই অভিনয় করা শিখেছিস নাকি? চোখে জল আনতে পারবি?

—হ্যাঁ পারবো!

—থাক দরকার নেই! ধরা পড়ে যাবি—সেটা বিচ্ছিরি হবে। আমি ঠিক ম্যানেজ করে দেবো এখন!

সত্যিই দোতলার বিরাট ঘড়িটা এখনো সারানো হয়নি। পৌনে তিনটে বেজে দুটো কাঁটা প্রায় সরল রেখায় রয়েছে, ঠিক গত মাসে যেখানে দেখেছিল। এতক্ষণায় কেউ নেই, টুলটুলকে নিয়ে সরাসরি দোতলায় উঠে এসেছে দীপু। এ বাড়ির সবই তার চেনা। রণেনদা যতদিন ছিল, এ বাড়িতে তখন প্রায়ই আসতো দীপু। সব মিলিয়ে এখনও ঠিক রণেনদার ওপর দীপু রাগ করতে পারে না, কারণ রণেনদার সঙ্গে তার দিদির বিয়ে না হলে শান্তার সঙ্গে তার আলাপই হতো না।

রণেনের মা ওদের দেখে খুশী হবার বদলে রীতিমত ভুরু কুঁচকে ধমকের সুরে বললেন, আজ এলে? কেন, কাল আসতে পারোনি? কাল কি হয়েছিল?

দীপু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, কেন, কাল আসবার কথা ছিল নাকি?

—কথা কেন থাকবে? তোমরা নিজেরা একটু খেয়াল করতে পারো না?

কারুর কাছ থেকে ধমক শুনে সহ্য করে যাওয়া দীপুর স্বভাব নয়। সেও উল্টে রণেনের মাকে একটা ধমক দেবার জন্য তৈরি হচ্ছিল। এসব ক্ষেত্রে বয়েসের তফাৎও সে গ্রাহ্য করে না। যে-দোষ সে করেনি, তার জন্য বকুনি খেতে যাবে কেন? মাসে একদিন টুলটুলকে নিয়ে আসার কথা, কোনো নির্দিষ্ট দিনের তো কথা নেই। কিন্তু ভদ্রমহিলা কাল আসবার জন্য অত জোর দিচ্ছেন কেন?

রণেনের মা আবার আক্ষেপ করে বললেন, কাল আমি সারাক্ষণ মেয়েটাকে দেখার জন্য ছটফট করেছি। নিজের হাতে পায়েস রেঁধেছিলাম।

রণেনের মা যখন নিজের হাতে কিছু রান্না করেছিলেন, তার মানে একটা কিছু সাংঘাতিক ব্যাপার ছিল নিশ্চয়ই। দীপু মুখের হাসি বজায় রেখেই বললো, আপনাদের বাড়িতে কোনো উৎসব আছে কি না জানবো কি করে? আপনারা তো নেমন্তন্ন করেননি!

—নেমন্তন্ন? তা বলে নিজের বাবার জন্মদিনের কথাটাও মনে রাখবে না?

—জন্মদিন?

—কাল রণেনের জন্মদিন ছিল না?

—ওঃ, রণেনদার জন্মদিন! সে জন্য আপনাদের বাড়িতে কোনো উৎসব হয় তা জানবো কি করে! ছেলেদের আবার জন্মদিন কি? আমার জন্মদিনে তো কিছু হয় না কখনো!

রণেনের মা সম্ভবত আর একটা কিছু কঠিন কথা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু নিজেকে সামলে নিলেন। স্থির জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন দীপুর দিকে। দীপু চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিল না। তার একবার মনে হলো, আসলে রণেনদার মা কিংবা বাবা তেমন খারাপ লোক নয়, তবে ছেলে ওঁদের ভুলে গিয়ে বিদেশে গিয়ে ঘাপটি মেরে বসে আছে, সেই রাগে ওঁরা পুড়ছেন, কিন্তু ছেলের ওপর সম্পূর্ণ রাগ করতে পারছেন না, যত দোষ পড়েছে মেজদির ওপর। ওঁদের ধারণা রণেনের বউ তাকে আটকাতে পারেনি।

মেজদিও কি রণেনদার জন্ম দিনটা মনে রাখেনি? একবারও তো উচ্চবাচ্য করেনি কাল। অবশ্য, মেজদি আজকাল রণেনদা প্রসঙ্গে একটা কথাও বলে না বাড়িতে। কোনো মানুষেরই স্বাধীনভাবে কোনো কিছু করার উপায় নেই। একটা মানুষের একটা কাজ বা ব্যবহারের জন্য আরও কত মানুষ দুঃখ পায়!

এসব মনে হওয়া সত্ত্বেও, রণেনের মায়ের কথার ধমক দেওয়া সুরটা তার ঠিক সহ্য হচ্ছিল না, ওঁকে একটা আঘাত দেবার ইচ্ছে ও সামলাতে পারলো না। খুব নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে সে জিজ্ঞেস করলো, আপনার জন্মদিনে রণেনদা আপনাকে চিঠি লেখে?

—কি?

—আপনার জন্মদিনে তো এ বাড়িতে উৎসব হয়। আমিও একবার দু'বার নেমন্তন্ন পেয়ে গেছি। রণেনদার মনে আছে সে কথা? সেদিন আপনাকে প্রণাম জানিয়ে চিঠি লেখে?

রণেনের মায়ের মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। অস্ফুটভাবে তিনি কি যেন বললেন, দীপু বুঝতে পারলো না। দীপু এবার খুব নরমভাবে টুলটুলকে বললো, টুলটুল যাও, ঠাকুমাকে প্রণাম করো!

টুলটুল এক পা দু' পা করে এগিয়ে গিয়ে ঝুপ করে নিচু হয়ে পায়ে হাত দিয়েই উঠে দাঁড়ালো। শিশুরা যখন কোনো ঘটনা বা কথার মর্ম বুঝতে পারে না, তখন তাদে

মুখে ভারী অসহায় ধরনের বিস্ময় খেলা করে। টুলটুলের সেই মুখখানা তার ঠাকুমা জড়িয়ে ধরলেন। পরমুহূর্তেই তাঁর চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়তে লাগলো।

দীপু মুখ নিচু করে রইলো। কান্না সে একদম সহ্য করতে পারে না। রণেনদার মায়ের কান্নার জন্য সে তো আর দায়ী নয়, রণেনদাই দায়ী।

ঘরের মধ্যে রণেনদার একটা বড় ছবি, তাতে আবার মস্ত একটা মালা পরানো। টুলটুলকে সেটার সামনে প্রণাম করাবার জন্য নিয়ে গেলেন রণেনদার মা। সেদিকে চেয়ে দীপুর আবার মজা লাগলো। মরা মানুষের ফটোতে তো ছবি দেয়। রণেনদা কি মরে গেছে নাকি? যত সব অদ্ভুত ব্যাপার! মিউনিখের ঘিঞ্জি পাড়ার মেম বউ নিয়ে সংসার পেতে আছে রণেনদা। তার খেয়াল হবার কথা নয়, তার জন্মদিনে কলকাতার তাঁর ফটোতে মালা পরানো হচ্ছে, পায়েস রান্না হচ্ছে তাঁর নামে, মায়ের চোখের জল পড়ছে, এবং তার মেয়ে—যার মুখও দেখেনি রণেনদা—সে ভ্যাবাচ্যাকা ভাবে প্রণাম করছে একটা ছবির সামনে।

টুলটুলকে ওপরে নিয়ে যাওয়া হলো। দীপু মৃদু আপত্তি করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সেটা টিঁকলো না। দীপুর দিকে তাকাতে তাকাতে অনিচ্ছুক পায়ে চলে গেল টুলটুল। একটা বিবর্ণ বিশাল গ্র্যান্ডফাদার আর্মচেয়ারে বসে রইলো দীপু। সে জানে, একটু বাদে থালায় করে চারটে মিষ্টি চাকরের হাত দিয়ে পাঠানো হবে তার জন্য, এবং এক কাপ চা। দীপু খাক বা না খাক, পাঠানো হবেই, এ বাড়ির রেওয়াজ। কেউ তার সামনে দাঁড়িয়ে তাকে খাওয়ার জন্য অনুরোধ করবে না অবশ্য।

কিন্তু সেদিন মিষ্টির থালা আসার একটু পরেই নেমে এলো রণেনের খুড়তুতো ভাই দীনেন। যথারীতি এ বাড়ির আর সবারই মতন ফর্সা দীর্ঘকায়, কিন্তু অল্প বয়েসেই টাক পড়তে শুরু করেছে এবং সেই টাক চাপা দেবার জন্য এমন ভাবে চুল আঁচড়ায় যে দেখলেই হাসি পায়। দীনেন এমনিতে বেশ চালাক ও চালু ধরনের লোক, কিন্তু চুল সম্পর্কে ঐ দুর্বলতাটুকুর জন্য যে কি বোকা বোকা দেখায়, তা সে বুঝতে পারে না।

দীনেন প্রায় দীপুরই বয়েসী হবে, দু-এক বছরের বড় হয়তো, কিন্তু কথাবার্তা বলে বেশ ভারিক্কী চালে। একটা ফাঁকা বড়লোকি চাল বেশ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চায়।

পাশের চেয়ারটায় বসে বললো, কি দীপু, কি খবর? আজ অফিসে যাবে না?

দীনেনের সঙ্গে যতবার দেখা হয়েছে, দীনেন এই কথাটাই প্রথম জিজ্ঞেস করেছে। সে খুব ভালো রকমই জানে যে, দীপু কোনো চাকরি করে না। দীনেন নিজেও কোনো চাকরি করে না—কিন্তু সে নিজেদের তিন খানা ফ্ল্যাট বাড়ির ভাড়া আদায় করে, এটাই তার প্রধান কাজ।

দীপু বললো, না, আজ যাবো না।

—ছুটি নিয়েছো?

—না, ডুব দিয়েছি।

—বাঃ! নাও, মিষ্টিগুলো খেয়ে নাও!

—না, আমি মিষ্টিফিষ্টি খাই না

—চা-টা খেয়ে নাও তা হলে!

—আমি এ সময় চা-ও খাই না!

—আমিও চা খাই না বেশী। সিগারেট খাবে নাকি?

—তা খেতে পারি।

—তা হলে চলো, নিচে গিয়ে বসি। এখানে জেঠিমা এসে পড়তে পারেন।

দীনেনের সঙ্গে নিচে চলে এলো দীপু। একটা সিগারেট ধরালো। খুব আরাম করে ধোঁয়া ছেড়ে দীনেন জিজ্ঞেস করলো, তোমার দিদির খবর কি?

এ বাড়িতে একমাত্র দীনেনই অপর্ণার কথা জিজ্ঞেস করে। কিন্তু দীপুর সামনে সে কক্ষনো অপর্ণাকে বউদি বলে উল্লেখ করে না, সব সময় বলে তোমার দিদি।

—ভালোই আছে।

—বড়দা গত সপ্তাহে আমাকে একটা চিঠি লিখেছিলেন, তাতে তোমার দিদির কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন।

দীপুর বুঝতে এক মিনিটও দেরি হলো না যে দীনেন মিথ্যে কথা বলছে। এরকম সে প্রায়ই বলে। রণেনদা আর কারুকে চিঠি না লিখে শুধু দীনেনকে চিঠি লিখবে, এ হতেই পারে না। কিন্তু দীনেনের অন্য কি যেন একটা মতলব আছে। সে দীপুকে অন্য কিছু বলতে চায়।

দীপু নিরাসক্তভাবে বললো, তাই নাকি? দেখি রণেনদার চিঠিটা।

—সে চিঠিটা কোথায় রেখেছি, এখন বোধ হয় আর খুঁজে পাবো না। বাই দি ওয়ে, তোমার দিদি আবার বিয়ে করছেন নাকি?

—তার মানে?

—এ রকম একটা কথা শুনেছিলাম যেন!

দীপুর মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে রাগেও তার শরীরটা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠলো। বললো, আমি কিছু শুনিনি, আর তুমি শুনে ফেলেছো?

—আমি খুব রিলায়েবল সোর্স থেকে শুনেছি!

দীপু এবার রীতিমতন চেঁচিয়ে বললো, যদি করে বেশ করবে। করাই তো উচিত!

(ক্রমশ)

CINTHOL
এখন
আরো বেশী
সুগন্ধে ভরা—
আরো বেশী
মোলায়েম
কোমল, সদ্যফোটা ফুলেরমত তাজা—
সৌরভে ভরপুর
সিন্থল টয়লেট পাউডারের চমৎকার মিষ্টি গন্ধ আরো সুকোমল পরশ আপনার দেহকে যে শুধু সারাদিন সুবাসিত রাখবে তাই নয়—এর অপূর্ব বীজাণু-নাশক জি-১১ আপনার ত্বকাকে সারাদিন রক্ষা করবে।
CINTHOL
DEODORANT
LUXURY
TOILET
জি-১১ দেওয়া
সিন্থল যেভাবে
আপনাকে রক্ষা
করে অন্য কোনো
পাউডার তা
পারেনা।

শিল্পী জি কে পণ্ডিত অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে তাঁর প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। শিল্পী ইন্দোরের বাসিন্দা এবং অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। পরে তিনি ইন্দোর আর্ট স্কুলে চিত্রকলাবিদ্যা শিক্ষা করেন ও বোম্বাই থেকেও এ বিষয়ে ডিপ্লোমা লাভ করেন। শিল্পী ইতিপূর্বে বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছেন। প্রদর্শনীতে তেলরঙে আঁকা ২৫ খানি ছবি ও সেই সঙ্গে কয়েকটি ড্রয়িং নিদর্শন দেখা যায়।

বহিরাগত শিল্পী হিসাবে পণ্ডিত প্রথমেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন প্রধানত তাঁর রঙ ব্যবহার কৌশলের জন্য। তাঁর অঙ্কন-রীতি বিমূর্ত ও সমবিমূর্ত জাতীয় এবং আকার অপেক্ষা তিনি রঙের ওপর অধিক প্রাধান্য দেন। বাস্তবিক তাঁর রঙের পাত্র উজ্জ্বল—বিশেষ করে লাল, হালকা সবুজ ও বেগুনী রঙ তিনি মনের আনন্দে প্রায় সব স্থলেই ব্যবহার করে ক্যানভাসগুলি ভরে ফেলেছেন। তাই প্রদর্শনীকক্ষে প্রবেশ করা মাত্রই দর্শকবৃন্দ যেন রঙের মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়েন। দৃশ্যমান জগতের নানা বস্তু তাঁর মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে তাই তিনি নানা রঙের ভাষায় প্রকাশ করেছেন। তাঁর ছবিতে বিশেষ করে রঙের স্তরভেদ লক্ষণীয়। বলা বাহুল্য, অধিকাংশ রচনাই তাই অনুভূতিসাপেক্ষ। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই সামার ভিলেজ-এর নাম করতে হয়। যাঁরা ছবিটির মধ্যে বিশেষ কোনও গ্রামের সন্ধান করেছেন তাঁরা সম্ভবত বিফল-মনোরথ হয়েছেন। কারণ হলুদ ও বেগুনী রঙের সুকৌশল ব্যবহারের মধ্য দিয়ে শিল্পী গ্রীষ্মকালীন কোনও গ্রামের প্রতীকরূপ-টুকুই ফুটিয়ে তুলেছেন। যাঁদের উপভোগ করার মত চোখ ছিল তাঁরা সকলেই এটি মনে রাখবেন। কয়েক ক্ষেত্রে রঙবৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে শিল্পী ইমেজারীর অবতারণা করেছেন—যেমন লাল ও হলুদ রঙ প্রধান ভিলেজ-১ বা কম্পোজিশন ইন গ্রীন অ্যাণ্ড গ্রে। আবার কয়েক স্থলে শিল্পী রঙের সঙ্গে আকারের সমন্বয়ও করেছেন। এসব ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে প্রতীক হিসাবে নানা মূর্তির অবতারণা করে শিল্পী বিষয়-বস্তুটিকে অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য করতে চেয়েছেন—যথা টক। দুটি রমণী পরম আনন্দে আপনার মনে কথা বলে চলেছে—তাদের মুখ ও অবয়ব হয়ত একেবারে স্পষ্ট নয়, তাহলেও রেখা, আকার, রঙ ও অঙ্কন-রীতির মধ্য দিয়ে শিল্পী এই অতি পরিচিত বিষয়বস্তুটিকে সুন্দরভাবে প্রকাশিত করেছেন। তবে এ জাতীয় ছবি সবক্ষেত্রেই রসোত্তীর্ণ হয়নি, তার কারণ রেখা বা আকারের প্রতি শিল্পী সব সময়ে সুবিচার করতে পারেননি; ফলে সেগুলি যেন আড়ষ্ট বলে মনে হয়, যেমন স্ট্রীট ড্যানসারস। অঙ্কনরীতির দিক থেকে বিচার করলে ছবি নির্বাচন ব্যাপারে শিল্পীর অধিকতর সচেতন হওয়া উচিত, কারণ এ কথা সত্য যে, রঙবৈচিত্র্য থাকলেও কয়েক স্থলে পৌনঃপুনিকতা দোষ ধরা পড়ে। এ বিষয়ে মনোযোগী হলে শিল্পী লাভবান হবেন।

*

রুশ শিল্পী এস পোটাবেঙ্কোও অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে তাঁর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। প্রদর্শনীতে বহু স্কেচ ও গ্রাফিক প্রিণ্ট নিদর্শন দেখা যায়।

শিল্পী ভারতের বিভিন্ন স্থানে ঘুরেছেন এবং যেখানে যে বস্তু বা দৃশ্য তাঁর ভাল লেগেছে সেটিই তিনি কাগজের ওপর এঁকে ফেলেছেন। শিল্পীর রেখার গতি বা প্রকাশ-ভঙ্গী দেখে মনে হয় যে, প্রাথমিক অঙ্কন-বিদ্যায় তিনি সিদ্ধহস্ত। মনে হয় কয়েকটি স্কেচে তিনি ক্রোমাস্টার বা ফেলট পেন ব্যবহার করেছেন। সামগ্রিক রেখা স্তরভেদের পরিচয় এগুলিতে না পাওয়া গেলেও, শিল্পীর দ্রুত স্কেচ করার ক্ষমতার অভাব পাওয়া যায়। শিল্পীর পরিপ্রেক্ষিতবোধও আশানুরূপ। স্কেচগুলির মধ্যে দিল্লী, কথাকলি নৃত্য বা মথুরার রাস্তার দৃশ্য উল্লেখযোগ্য। কলকাতার মার্বেল প্যালেস বা জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির স্কেচ দেখে ডেসমণ্ড ডইগ-এর অঙ্কনরীতি মনে পড়ে যায়। তবে রেখার ওপর যে শিল্পীর অসাধারণ দক্ষতা আছে তা কয়েকটি স্কেচেই সুস্পষ্ট। বিশেষ করে মাত্র তিন চারটি বলিষ্ঠ ও পরিমিত রেখার মধ্য দিয়ে জওহর-লাল নেহরুর যে বিশিষ্ট দাঁড়াবার ভঙ্গীটি তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তা প্রশংসনীয়। শিল্পীর কয়েকটি গ্রাফিক প্রিণ্টও ভাল লাগে। রুশ শিশুদের পাঠ্য কয়েকটি গল্পের বই তিনি গ্রাফিক শিল্প মাধ্যমে অলংকৃত করেছেন—তা দেখে গ্রাফিক শিল্পে তাঁর ব্যুৎপত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন ম্যাজিক বক্স, কিকিমোরা, পার্ক, উইণ্ড। এই সঙ্গে রুশ ভাষায় অনূদিত বীরবলের গল্পের বইয়ের কয়েকটি ছবিরও নাম করা চলে।

*

চন্দননগর উষাঙ্গিণী বালিকা বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীতে পাঁচ বছর বয়স থেকে শুরু করে ১৭ বছর বয়স্ক ছেলেমেয়েদের আঁকা ছবির নানা নমুনা দেখা যায়। ছোট ছেলে বা মেয়ের হাতে রঙ ও তুলি দিলে তারা যেভাবেই হোক সেগুলি কাগজের ওপর ব্যবহার করবে। সবগুলিই ছবি হবে বা, বিশেষ করে প্রদর্শনীতে স্থান পাবার উপযুক্ত হবে কিনা তা বিচার করা সত্যই কঠিন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় ঠিক-মত বিচার না করেই ছবিগুলি প্রদর্শনীভুক্ত করা হয়েছে—এ বিষয়ে উদ্যোক্তাদের সচেতন হওয়া উচিত, কারণ তাহলে অবাঞ্ছিত অনেক ছবির স্থলে প্রশংসাযোগ্য রচনাই প্রদর্শনীতে স্থানলাভ করবে। এ বিষয়ে ইউথ পাপেট থিয়েটার ইণ্ডিয়া পরিচালিত ছেলেমেয়েদের চিত্র প্রদর্শনীর কথা প্রথমেই মনে পড়ে। সুখের বিষয়, এই প্রদর্শনীর উদ্যোক্তাগণও এ বিষয়ে সচেতন বলে মনে হল। প্রদর্শনীতে যাঁদের আঁকা ছবি ভাল লাগে তাঁদের মধ্যে শ্রীকান্ত দত্ত, পুলক সেন, সুকান্ত ঘোষ, সুনীতি দাস, মনোরঞ্জন দাস, সমীরণ মুখোপাধ্যায় ও স্বপন নিয়োগীর নাম উল্লেখযোগ্য।

*

সম্প্রতি সরকারী আর্ট কলেজে খ্যাতনামা জার্মান শিল্পী অটো এলগাউ-র রঙীন গ্রাফিক শিল্পের প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়ে গেল। আগামী সংখ্যায় এ বিষয়ে আলোচনা করব।

চিত্রপ্রিয়

থাইল্যান্ডের সভ্যতা সংস্কৃতি

সবিতা ঘোষ

শ্যামদেশ—অধুনা থাইল্যান্ড একান্ত-ভাবেই কৃষি-প্রধান। শতকরা পঁচাশী, নব্বই ভাগ লোক চাষী, আর অধিকাংশেরই নিজের জমি। ব্যাঙ্কক শহরটিকে প্রাচ্যদেশের ভেনিস বলা হয়, কারণ শহরে বড় বড় রাস্তার পাশে পাশেই সমান্তরাল ভাবে অসংখ্য খাল চলে গেছে, এদেশে বলে 'ক্লং'। এই ক্লংগুলিই যোগ রক্ষা করে শহরের সঙ্গে গ্রামের। শহরকে ঘিরে চারদিকেই ধানজমি আর চাষীদের বসতি। বলাই বাহুল্য, এদের প্রধান খাদ্য ভাত। এরা দিনে তিনবার খায়, তিনবারই ভাত। থাইল্যান্ডকে যদিও অনুন্নত দেশের ভেতর ধরা হয়, আর্থিক দিক থেকে এরা বেশ সচ্ছল। দারিদ্র্য আছে, বস্তি আছে, ভিখারীও আছে, কিন্তু ভারতবর্ষের কাছে সে কিছুই নয়। ব্যাঙ্কক প্রকান্ড ছড়ান শহর। অভিজাত অঞ্চলগুলি পাশ্চাত্য দেশের বড় শহরের মতই প্রায়। থাইল্যান্ড শতকরা কুড়ি ভাগ চাল রপ্তানি করে। ভারত মাঝে মাঝে সে চাল আমদানি করে থাকে। আখ, পাট, তুলো, তামাক আর রবারের চাষও হয়। সারা পৃথিবীর রবারের চাহিদা প্রধানত দক্ষিণ থাইল্যান্ড ও মালয় মেটায়। পৃথিবীর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট সেগুন কাঠ (বর্মাটীক) এদেশে প্রচুর জন্মায়—এবং রপ্তানী হয়। টিন আর একটি খনিজ সম্পদ, বহুলাংশে বিদেশে চালান যায়।

খাদ্যের মধ্যে সবজির চল তত বেশী নেই যত ফলের। এখানকার আনারস ও কলা সবচেয়ে বিখ্যাত। আকারে, স্বাদে, গন্ধে অতুলনীয়। আবহাওয়া ভারতবর্ষের মতই গরম ও বৃষ্টিপ্রধান। সুতরাং ফুল, ফল, পশুপ্রাণী একই ধরনের। তরমুজ, আম, কাঁঠাল সবই জন্মায়। কাঁঠাল জাতীয় আর একটা ফল আছে, 'দুরিয়ান' থাইদের ভীষণ প্রিয় খাদ্য। এর গন্ধ অত্যন্ত উগ্র, দামও খুব বেশী। একটা খুব বড় ভাল জাতের দুরিয়ানের দাম নব্বই বাট (থাই মুদ্রা) অর্থাৎ প্রায় তিরিশ টাকা হতে পারে।

থাইরা খুব শৌখিন জাত। জাপানী-দের মত এদের ফুল-সাজানোও একটি চারুকলা। সারা দেশে ফুলের ছড়াছড়ি, রাস্তার ধারে বসে বেলফুলের কুঁড়ি বিক্রি করে—স্তূপের মত করে রাখে, কৌটো মেপে দেয় চাল ডাল মাপার মত। এদেশের 'অর্কিড' ফুল পৃথিবী খ্যাত। এতো বিচিত্র রকমের, এতো সুন্দর রং-এর অর্কিড আছে, দেখলে অবাক হতে হয়। ইংল্যান্ডের রাণী থেকে শুরু করে তাবৎ বিশিষ্ট লোকদের এরা অর্কিড ভেট পাঠায়।

পশু সম্পদ বলতে দক্ষিণ পেনিনসুলার জঙ্গলে ও উত্তরের পাহাড়ী অঞ্চলে বাঘ আছে। ছোট ছোট ভালুকও আছে। এরা জঙ্গলে আফিমের ফুল খেয়ে অনেক সময় ঝিমিয়ে থাকে। নদীতে কুমির আছে। কুমিরের চামড়া দিয়ে বেল্ট, ব্যাগ ইত্যাদি তৈরি করা এখানকার কুটির শিল্প। থাই-ল্যান্ড গরম দেশ বলে এখানে প্রচুর বিষাক্ত সাপ আছে। আর আছে হাতি। গভীর জঙ্গলে এখনো যন্ত্রপাতি ব্যবহার না করে হাতি দিয়ে কাটাগাছের গুঁড়ি টেনে নিয়ে গিয়ে নদীতে বা ক্লং-এ ভাসান হয়। জল-পথে এইসব কাঠ শহরে, বন্দরে পৌঁছয়। ব্যবসাদাররা বাঁদরদের শিখিয়ে নেয় কি করে গাছে চড়ে তাল, সুপারী, নারকেল পাড়তে হয়। শ্বেত হস্তী থাইদের কাছে খুব সুলক্ষণা। তাই শ্বেতহস্তী কোথাও পাওয়া গেলেই তা রাজাকে দিয়ে আসা নিয়ম।

এদেশের রাজা আছেন। তাঁর অবশ্য বিশেষ ক্ষমতা নেই, পার্লামেন্ট আছে। যদিও আসল ক্ষমতা নাকি মিলিটারির হাতে। মহিষ দিয়ে চাষ আবাদ হয়। থাইরা সাধারণ ভাবে গরু মহিষের দুধ খায় না। দুগ্ধ পানের অভ্যাস কোনদিন ছিল না। বর্তমানে, আধুনিক সংসারে ছেলে, মেয়েদের ছাত্রছাত্রীদের দুধ খেতে দেওয়ার রেওয়াজ হয়েছে। থাইরা প্রচন্ড রকম আমিষাশী। নেহাত বিষাক্ত সাপ, বিষাক্ত প্রাণী ছাড়া সমস্ত রকম সামুদ্রিক জন্তু পোকা মাকড় খায়। এখানকার মাছের

ক্লং-এর ধারে থাইদের জীবনযাত্রা

ওয়াট বেঞ্চামাবোপিৎ (মার্বল টেম্পল)-এর একাংশ

ব্যবসায়ও উল্লেখযোগ্য। বাঙালীর মতই এদের প্রধান খাদ্য মাছ ভাত। শুয়োরের মাংসও প্রিয় খাদ্য।

ভারী শিল্প বলতে থাইল্যাণ্ডে প্রায় কিছুই নেই। ব্যাঙ্ককে একটি সিমেণ্টের বড় কারখানা আছে। সমগ্র থাইল্যাণ্ডে মাত্র একটি ছোট ইস্পাতের কারখানা আছে। ছোট ছোট কিছু ব্যবসায় ও কুটির শিল্প আছে। যেমন স্বর্ণকারের ব্যবসায়, আসবাবপত্র তৈরি, খেলনা, খেলার তাস ইত্যাদির, জুতো ও ছাতা তৈরির ছোট ছোট কারখানা আছে। ব্যাঙ্কক তথা থাইল্যাণ্ডে ৬০,০০০ ভারতীয়ের বাস। তার মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়জন অাপিসে উচ্চপদে চাকরি করেন। বিহারীরা দরোয়ানের ও গোয়ালার ব্যবসায় একচেটিয়া করে নিয়েছেন। পাঞ্জাবীরা কাপড়ের ব্যবসায় বেশ বড় অংশীদার। থাইসিল্ক খুব উৎকৃষ্ট জিনিস। এদের সাবেক পোশাক হল লুঙ্গি ও ব্লাউজ। লুঙ্গিকে এরা বলে 'পাসিন' বা 'সারং'। ছেলেদের পোশাকও লুঙ্গি, মেয়েদেরও তাই। মেয়েদের পোশাক খুবই বর্ণাঢ্য। এখনকার যুবকরা প্রায় সকলেই ইউরোপীয় পোশাক পরেন। তরুণীদের মধ্যে আধুনিকারা শতকরা নব্বইজন পুরো-পুরি পাশ্চাত্ত্য সাজে সজ্জিতা।

এদেশের ধর্ম হল প্রধানত বৌদ্ধ। শতকরা চুরানব্বই জনই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী দুজন মুসলমান, বাকী চারজন অন্যান্য ধর্মের। থাইল্যাণ্ডে কয়েক হাজার বৌদ্ধ মন্দির আছে। এক ব্যাঙ্কক শহরেই দুই-শতের ওপর মন্দির। মন্দিরগুলি খুবই সুন্দর। চৈনিক ও ভারতীয় স্থাপত্যের ও ভাস্কর্যের সাক্ষ্য দেয়। কয়েকটি বিশিষ্ট মন্দির আছে যা ট্যুরিস্টরা দেখে বেড়ায়। ব্যাঙ্ককের রাস্তায় বের হলেই সাধারণত আধুনিক কেতাদুরস্ত পাশ্চাত্ত্য ধরনে সজ্জিত লোকের ভীড়ে ইতস্তত গেরুয়া-পরা, মুণ্ডিত মস্তক থাই ভিক্ষু চোখে পড়ে। গৃহী জীবনেও প্রত্যেক পুরুষকে কুড়ি বছর বয়সের পর যে-কোন সময়ে এক-বার সন্ন্যাস নিতে হয়, যত অল্পদিনের জন্যেই হোক। সাধারণত অন্তত তিন মাসের জন্যে গৃহীরাও বৌদ্ধ শ্রমণ হন। এখানকার বৌদ্ধ ধর্ম হিন্দু ধর্মের সঙ্গে মিলে মিশে গেছে। বৌদ্ধধর্ম প্রচার করতে প্রথম যখন ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা এদেশে আসেন, তখন একদল হিন্দু ব্রাহ্মণও এসেছিলেন। এদের অনেক ধর্মোৎসব আছে যাতে ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে ব্রাহ্মণদের বিশিষ্ট স্থান আছে। যেমন—হলকর্ষণ উৎসব। বৈশাখী পূর্ণিমায় বুদ্ধ-জন্ম তিথিতে উৎসব হয়। 'কাথিন' বলে একটা খুব আড়ম্বরপূর্ণ উৎসব আছে। বর্ষাকালের শুরুতে দলে দলে লোকে শ্রমণ হয় তিন মাসের জন্যে। তখন তাদের নতুন গৈরিক বস্ত্র দিতে হয়। রাজা নিজে সূর্য-মন্দির—'ওয়াটঅরুণ'-এ গিয়ে ঐ বস্ত্র বিতরণ করেন। রাজা নৌকা করে চাওপিয়া নদীর ধারে সূর্যমন্দিরে যান। তখন ময়ূরপঙ্খীর মত সুন্দর সাজানো বহু নৌকার মিছিল বের হয়। পুরোভাগে থাকে রাজার 'নৌকা—সুপর্ণহন্—অর্থাৎ সুবর্ণ হংস।

ভারতীয় সৌজন্য সংস্কৃতির সঙ্গে থাই সভ্যতার অনেক মিল পাওয়া যায়। এরাও হাত জোড় করে আমাদের মত নমস্কার করে। মাটিতে পা মুড়ে বসে। এরাও পান খায় ভারতীয়দের মত। ফুলের মালা পরিয়ে অতিথিকে অভ্যর্থনা করে। কিন্তু ফুলের মালার দুটি প্রান্তভাগ একত্র করে জুড়ে গোল করা থাকে না। দুধারে দুটি ফুলের থোপ্না ঝোলান থাকে। গলায় চাদর ঝোলানোর মত করে পরিয়ে দেয়। কাঁধের ওপর দিয়ে সামনে এসে দুপাশে দুটি থোপ্না ঝোলে।

মন্দিরে পুজার জায়গায় ধূপধুনো ব্যবহার করে। নাচের পোশাক, নাচের ভঙ্গী, হাতের মুদ্রার খুব সাদৃশ্য আছে। এদের নাটক ও নৃত্য বেশীর ভাগই রামায়ণ ও পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে। দক্ষিণ চীন থেকে থাইরা নেমে এসে স্থানীয় অধিবাসী 'মন'দের সঙ্গে মিশে গেছে। 'খেমার' জাতি থেকে এই থাইজাতির উৎপত্তি। ভাষা ও শিক্ষা সংস্কৃতিতে অবশ্যই চৈনিক প্রভাব খুব বেশী। কিন্তু প্রাচ্যদেশের মধ্যে ভারতবর্ষ সেকালে খুবই উন্নত ছিল তাই বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে পালি-ভাষা ও ভারতীয় সভ্যতাও বহুল পরিমাণে থাইল্যাণ্ডে, তখনকার শ্যামদেশে বিস্তার লাভ করেছিল। ১৯৩৯ সালে শ্যামদেশের থাইল্যাণ্ড নামকরণ হয়।

শ্যামদেশ ভারতের মতই সামন্ততন্ত্র প্রধান দেশ ছিল। বহুদিন পর্যন্ত ক্রীতদাস প্রথার চল ছিল। তখন মনিবের সামনে দাসেরা, জমিদারের সামনে প্রজারা মাটিতে বসে বসে কিম্বা হাটুগেড়ে অগ্রসর হত। এই সেদিন পর্যন্ত রাজসভায় কারো হেঁটে প্রবেশ করার অধিকার ছিল না। খুব সম্ভব রাজা চুলালংকর্ণ এই হীনপ্রথা তুলে দেন। টেলিভিশনে থাই নাটক দেখার সময় আজও লক্ষ করা যায় সম্ভ্রান্ত ঘরের ঝি-চাকরেরা মনিবের সামনে হাটু ঘষে ঘষে এসে জল, পান ইত্যাদি দিয়ে গেল। এতে বোঝা যায় সেকেলে গোঁড়া পরিবারে এখনো এসবের চল আছে। ব্যাঙ্ককে যে-সব ভারতীয় পরিবার কমপক্ষে চোদ্দ, পনর বছর ধরে বাস করছেন তাঁদের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে প্রথম প্রথম তাঁদের বাড়িতে ঝি, চাকর রাখলে তারা কিছুতেই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তাঁদের সামনে আসতে চাইত না।

বর্মা অঞ্চলের মত বহুদিন থেকেই থাইল্যাণ্ডের মাতৃতন্ত্র প্রধান সমাজ ব্যবস্থা Matriarcial Society - ছিল। বিয়ে হয়ে মেয়ে শ্বশুর ঘর করতে যায় না। মেয়ের বাপের বাড়িতেই তার ছেলে, মেয়ে মানুষ হয়। থাইরা শিশুদের খুব ভাল-বাসে। গ্রামাঞ্চলে কৃষিজীবীদের অন্নচিন্তা নেই বললেই চলে। খাওয়া-পরা ও থাকার ভাবনা না থাকায় স্বভাবতঃই জন্মনিয়ন্ত্রণের আবশ্যকতা নেই। অবশ্য সব দেশেই নাগরিক সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে এসব প্রশ্নও ক্রমে আসছে। থাই পরিবারে এখনো সাত, আটটি সন্তান খুবই স্বাভাবিক। অনেক পরিবারে বারো-চোদ্দটি সন্তানও দেখা যায়। রাস্তা-ঘাটে প্রায় কখনো দেখা যাবে না বড়রা, মা বাবারা, ছোট ছেলে, মেয়েদের তাড়না করছেন বা মারধোর করছেন। সন্তান স্নেহ খুব বেশী।

ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদেরও সম্পত্তিতে সমানাধিকার। ছেলেদের মতই সহজে মেয়েরাও বিবাহ বিচ্ছেদ করতে পারে। ভারতবর্ষের মত এসব প্রাচ্যদেশেও ছোটরা গুরুজনদের ভক্তিশ্রদ্ধা করে। গুরুজনের প্রতি ভক্তি, বিনয় ও ভদ্রতার জ্ঞান ছোট থেকেই এদের শিক্ষা দেওয়া হয়। গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠদের এরাও ঠাকুর্দা, দাদামশায় ইত্যাদি বলে। বহু বিবাহে আইনত বাধা ছিল না, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আর্থিক কারণে রাজপরিবার বা ধনী সম্প্রদায় ভিন্ন মধ্যবিত্ত সংসারে বহু বিবাহের তত চল ছিল না। বর্তমান রাজার কিন্তু একটি-ই মাত্র স্ত্রী। থাইদের দাম্পত্যজীবন চিরদিনই শিথিল। অর্থাৎ বিবাহিত পুরুষের পক্ষে একাধিক স্ত্রীলোকের সঙ্গে সহবাস এমন কিছু বিরল নয়। মেয়েরাও তাই যখন যার সঙ্গে খুশী থাকতে পারে। ওদের সমাজে এগুলি কিছু নিন্দনীয় নয়। পাশ্চাত্ত্যদেশের এমন কি এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় এদের পারিবারিক বন্ধন অনেক শিথিল। একটা তথ্য জানলে এ কথাটা পরিষ্কার হবে। থাইদের বংশ পরিচয়, অর্থাৎ পদবী গ্রহণ শুরু হয় মাত্র ১৯১৬ সাল থেকে। কোন মেয়ের সন্তান জন্মালে তার পিতৃ পরিচয়ের দরকার ছিল না। সে সন্তান স্বভাবতই মেয়ের বাপের বাড়িতে মানুষ হত। এর থেকেই বোঝা যাবে সমাজব্যবস্থা কি রকম ছিল। অন্ন সংস্থানের অসুবিধে না থাকায় ও মায়ের সম্পত্তিতে সমানাধিকার থাকার কোন গণ্ডগোল ছিল না। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংস্পর্শে এসে এদের এখন এক বিবাহ আইন স্বীকৃত। (কিন্তু তবু বহু পুরুষেরই 'মাইনর' ওয়াইফ থাকে।) রাজা বাজীরায়ুধের সময় থেকে এই জন্যেই পদবী গ্রহণ শুরু হয়। রাজা একটি পদবীর

তালিকা প্রস্তুত করে দেন। প্রত্যেক পরিবার তা থেকে নিজেদের পদবী বেছে নেন। সেই পরিবারে বংশ পরম্পরায় সেই পদবী চলবে। সাধারণ নামকরণেরও তেমন রেওয়াজ ছিল না গ্রামাঞ্চলে। ছেলেমেয়েদের বহুকাল পর্যন্ত খোকা, বড়খোকা, নেবু খোকা ইত্যাদি বলা হত। ভাল নাম রাখার সময় মন্দিরের কোন বৌদ্ধ ভিক্ষু জন্ম রাশি লগ্ন দেখে কোন নাম-নির্দিষ্ট ছেলে বা মেয়ের পক্ষে শুভ হবে ঠিক করে দিলে তবে নামকরণ হয়। এরাও নানা কুসংস্কারে বিশ্বাস করে। ভাগ্যগণনা, তুক্‌তাক্‌, ঝাড়-ফুঁক, সমস্ততে অন্ধবিশ্বাস। ভূত, প্রেত সবাইকে তুষ্ট রাখার জন্যে তাদের পূজো করে। আশ্চর্য ব্যাপার বৌদ্ধ হয়েও এরা এই নানান রকম বিরোধী বিশ্বাসের সঙ্গে আপোস করে বেশ কাটায়। প্রত্যেক গৃহস্থ বাড়ির সামনে বা বাগানে একটি কাঠের খাম্বার ওপর একটি ছোট বাহারি মন্দির মত থাকে। সেখানে প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় ধূপ জ্বালায়। ফুলের মালা দেয়। এগুলি কিন্তু গৃহদেবতা বা তুলসীমঞ্চ গোছের কিছু নয়। এগুলি 'ইভ্‌ল্‌ স্পিরিট' তাড়াবার বিশেষ ব্যবস্থা—যাতে ভূত বা দুষ্ট আত্মার কুদৃষ্টি গৃহস্থের ওপর না পড়ে। এই ছোট স্পিরিট হাউসটি বাড়ির কাছে এমনভাবে বসাতে হবে যাতে কোন সময়েই এই জিনিসটার ছায়া বাড়ির কোন অংশ স্পর্শ না করে। প্রতি মন্দিরে ভাগ্য-গণনার নানান রকম ব্যবস্থা আছে লটারি ধরনের। মন্দিরের দরজার পাশে রাশি রাশি ছোট ছোট পাখি বিক্রি হয় খাঁচায় করে। পুণ্যার্থীরা সেই পাখি দাম দিয়ে কিনে, খাঁচা খুলে তাকে মুক্তি দিয়ে পুণ্যঅর্জন করে।

পর্দাপ্রথা কোন দিনই ছিল না। এখনও নেই। ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশা, নিজেরা নিজেদের জীবনসঙ্গী বা সঙ্গিনী বেছে নেওয়ার চল এ দেশে ছিলই। আনুষ্ঠানিক বিয়েও যে সব ক্ষেত্রে হত, এমনও নয়। অনেক সময়েই ইচ্ছামত ছেলে ও মেয়ে মিলে কোথাও চলে গিয়ে অনায়াসে একত্র বসবাস করতে পারত। মেয়েরা বড় হলেই মাঠে ক্ষেতের কাজ করতে চলে যেত। সেখানে বয়স্ক ছেলেদের সঙ্গে স্বভাবতই তাদের অবাধ মেলামেশার সুযোগ ছিল। বিবাহ অনুষ্ঠান যে তাই বলে অজানা ছিল —তাও নয়। বহু ক্ষেত্রে বিবাহোৎসবও হত। আধুনিক যুগে ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশায় যেমন পাশ্চাত্ত্য দেশে সামাজিক বাঁধন আলগা হয়ে যাচ্ছে, ও ধীর মন্থর গতিতে (?) হলেও প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্য দেশেও সে হওয়া বইতে শুরু করেছে, সেই রকম আধুনিক থাই-সমাজ জীবনেও এই ধারা বিনা দ্বিধায় চলছে। ভিয়েতনামের যুদ্ধের জন্যে হাজারে হাজারে আমেরিকান সৈন্য ব্যাংকক শহর ভরিয়ে ফেলেছে। এদের জন্যে পতিতালয়, বারাঙ্গনারা তো আছেই, এ ছাড়াও সাধারণ ঘরের মেয়েরা, যারা স্কুল কলেজে পড়ে, বহু ক্ষেত্রে তারাই এদের সাময়িক সঙ্গিনী হয়। একটি জ্ঞাতব্য তথ্য — অধুনা এখানে ব্যাংকক শহরে মন্দির আছে দুই শতের ওপর আর নাইট ক্লাব, 'বার' আর 'মাসাজ ক্লিনিক' আছে দু হাজার! যদিও থাইল্যান্ডে সামাজিক বাধা নিষেধের গণ্ডি যাকে বলা হয় "টাবু"—তা অনেক কম, তবু বর্তমানে অনেক সমস্যা দেখা দিচ্ছে। "ব্যাংকক পোস্ট" ও "ব্যাংকক ওয়ার্ল্ড" বলে দুখানি ইংরাজী দৈনিক খবরের কাগজ আছে—তা পড়ে দেশের উচ্ছৃংখল আবহাওয়ার কথা খুব ভাল করেই বোঝা যায়। থাইদের স্বাস্থ্য বেশ ভাল। কিন্তু গত সাত, আট বছরে "ভেনারিয়াল" রোগ ভয়াবহরূপে বেড়ে গিয়ে নাকি পৃথিবীতে শীর্ষস্থান নিয়েছে। দৈনিক কাগজে অনেক আন ল্যান্ডার নিয়মিত চিঠিপত্রের জবাব লেখেন। তা থেকে বহু তথ্য উদ্ঘাটিত হয়। যেমন—একটি ষোল বছরের মেয়ে আন ল্যান্ডারের কাছে চিঠি লিখছে—আমার জন্মদিনে আমার মা আমায় "বার্থ কন্ট্রোল পিল"-এর একটি বাক্স উপহার দিয়েছেন। এটা কি ভাল হয়েছে?" এখানে সোশাল ওয়েলফেয়ার সেন্টার আছে সেখানে মেয়েরা নিজেদের নানা সমস্যা নিয়ে যায়। বিবাহের প্রয়োজনীয়তাটাই এরা স্বীকার করত না, কাজেই 'অবৈধ সন্তান' কথাটাই এদের অভিধানে ছিল না। এখন অন্য সব দেশের সংস্পর্শে এসে থাইরা অবৈধ সন্তান সম্পর্কে লজ্জা বোধ করে। চাকুরে, অবিবাহিত মেয়েদের সন্তান হলে, অরা

থাইমন্দিরে চৈনিক স্থাপত্যের নমুনা : দ্বাররক্ষী

পালন করতে না চাইলে এই প্রতিষ্ঠান সেই অবাঞ্ছিত সন্তানদের পালনের ব্যবস্থা করেন। হয় কেউ তাদের পোষ্য নেয়, নয়তো কোন অনাথ আশ্রমে দিয়ে দেওয়া হয়। সম্প্রতি এমনি একটি সন্তানসম্ভাবনা কুমারী মেয়ে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে বিজ্ঞাপন দিতে অনুরোধ করেছে যে, এর সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পরই এ তাকে বিক্রি করতে চায় আন্দাজ তিন শ' পঞ্চাশ টাকায়।......

বর্তমান সামাজিক অবস্থাটার আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের মতে যাকে নৈতিক ত্রুটিবিচ্যুতি বলে সেগুলিই বড় হয়ে দেখা দিল। আসলে যুক্তিতর্ক দিয়ে সামাজিক ব্যবস্থার ভালমন্দ নিয়ে দু তরফেই এত কথা বলবার আছে যে সে আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। এদের সদ্গুণও অনেক আছে। মোটের ওপর এরা হাসিখুশী সাদামাটা লোক—স্ফূর্তিবাজ ... মেজাজের। আমাদের দেশের লোক ... বিমর্ষ। এটা শুধু ভগ্ন স্বাস্থ্য বা আর্থিক অভাবের জন্য নয়। আমাদের দার্শনিক মতবাদের জন্যেই। কর্মক্ষেত্রে স্ত্রী, পুরুষ প্রায় সকলেই, সব সময়েই অতিরিক্ত বিরক্তি ও অসন্তোষে ভরা। সব সময়েই তারা নানান অভিযোগ নিয়েই আছে। কিন্তু থাইল্যান্ডে স্বাস্থ্যে ভরপুর হাসিখুশী যুবক, যুবতীরা মনের আনন্দে কাজ করছে, মুখে হাসিটি লেগেই আছে। লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে বেড়াচ্ছে। এরা প্রাণ প্রাচুর্যে ভরা। জীবনটাকে প্রতি মুহূর্তে উপভোগ করছে।

মৃতদেহ সংকার বিষয়েও ভারতবর্ষের হিন্দুদের সঙ্গে মিল আছে। থাইরাও মৃতদেহ দাহ করে। চীনেরা কিন্তু কবর দেয়। মৃতের সংকার এদের ভারী আড়ম্বর পূর্ণ। অনেক রকম নিয়ম কানুন আছে। এই গরম দেশ—কিন্তু মারা যাবার পর তৃতীয় দিনে মৃতদেহ দাহ করা হয়, দু রাত্রি মৃতদেহ ঘরে রাখাই বিধি। থাইরা কফিনের মত বাক্স করে মৃতদেহ দাহ করে। প্রথম রাত্রে মঠ থেকে কয়েকজন ভিক্ষু এসে প্রার্থনা করেন। মৃতের আত্মীয় বন্ধুরা উপস্থিত থাকেন। মৃতের নিকট আত্মীয়-দের সেই ঘরে সমস্ত রাত জেগে বসে থাকতে হয়। তখন তাঁরা জেগে থাকার জন্যে গল্পগুজব করতে, পান তামাক খেতে, তাস, পাশা খেলতে সবই করতে পারেন। দ্বিতীয় দিন যাঁরা মৃতদেহ দেখতে আসেন, তাঁরা সংকারের খরচের জন্যে কিছু কিছু অর্থদান করেন। দ্বিতীয় দিনটি সমস্ত দিনই সংকারের যোগাড় যন্ত্র, আয়োজন করতেই কেটে যায়, দ্বিতীয় রাত্রেও ভিক্ষুরা এসে প্রার্থনা করেন। আত্মীয়রা সারারাত্রি জাগরণে কাটান।

বহু বৌদ্ধমন্দিরের প্রাঙ্গণে মৃতদেহ দাহ করার প্রশস্ত জায়গা আছে। আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী সংকারের আয়োজন হয়। বাঁশ, কাঠ ইত্যাদি দাহ্য পদার্থ দিয়ে একটি প্রকাণ্ড মন্দির বা মুসলমানের তাজিয়ার মত জিনিস তৈরি করে তাকে খুব সুন্দর করে সাজায়। তার ভেতর কফিনটি রাখে। তারপর সমস্ত জিনিসটিতে আগুন ধরিয়ে ভস্মীভূত করে ফেলে। মৃত ব্যক্তির কফিনের ভেতর পার্থিব অনেক সামগ্রী দিয়ে দিতে হয়। অল্পদিন আগে "ব্যাঙকক ওয়ার্ল্ড" পত্রিকার ম্যাগাজিন বিভাগে একটি ইংরেজ ভদ্রলোক লিখেছেন, তাঁর প্রতিবেশী এক বৃদ্ধ থাই-এর মৃত্যুতে তার সংকার দেখতে গিয়েছিলেন—সেখানে একটি দুটো পয়সায় সুতো বেঁধে পয়সাটি মৃতের মুখে পুরে দিয়ে সুতোটি হাতে ধরিয়ে দেওয়া ছিল। মৃত্যুর পর সপ্তম দিনে জনকয়েক ভিক্ষুকে ভোজন করিয়ে শ্রাদ্ধশান্তি হয়। হিন্দুদের ব্রাহ্মণ ভোজন করানোর মত ব্যাপার। শ্রাদ্ধের দিনে শিক্ষিত পরিবারে কোন বিখ্যাত ভাল বই-এর পুরোটা অথবা কিছুটা অংশ ছাপিয়ে শ্রাদ্ধবাসরে বিলি করার প্রথা। বই-এর প্রথম পাতায় মৃত ব্যক্তির যৎসামান্য পরিচয় লিপি থাকে। এই ভাবে বহু নাম-করা জনপ্রিয় বই—যা আর ছাপা নেই বলে বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না, তা লোকে পড়বার সুযোগ পায়।

শ্রাদ্ধবাসর উপলক্ষ্যে পুনর্মুদ্রিত এই বই দেখতে কেমন হবে তার বিশেষ নির্দেশ আছে।

ধনী লোকেরা আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুতে অনেক সময় ব্রোঞ্জের বুদ্ধমূর্তি গড়িয়ে কোন মন্দিরকে উপহার দেন। তাই কোন কোন মন্দিরের ঢাকা বারান্দাতে শত শত বুদ্ধ মূর্তি দেখা যায়। কেউ বা মন্দির প্রাঙ্গণে মৃতজনের নামে খুব কারুকার্য করা একটি স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করেন। এগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন গঠন অনুযায়ী 'চেদী' অথবা 'ফ্রাং' বলা হয়।

আকাশের চাঁদ : মর্ত্যের রবি

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

সপ্তবিংশতি নক্ষত্র নারী লইয়া আমার অন্তঃপুর। তাহারা প্রত্যেকেই সমস্ত রাত্রি অনিমেষ নেত্রে জাগ্রত থাকিয়া আমার গতিবিধি নিরীক্ষণ করিয়া থাকে, তথাপি এ পর্যন্ত নক্ষত্রলোকে কোনোরূপ অশান্তির কারণ ঘটে নাই। সপ্তবিংশতির উপর আর-একটি যোগ করিতে ভীত নহি।'

একটি দুটি নয়, সাতাশটি ঘরণী নিয়ে ঘর করেন যিনি সেই আকাশের চাঁদ স্বয়ং একথা বলেছিলেন 'স্বর্গীয় প্রহসন'-এ। অসীম সাহস চাঁদ মশায়ের। লোকে একটিতে পাগল হয়ে যায়, উনি সাতাশকে আটাশ করতেও ভীত নন। তবে একটি কথা তিনি কবুল করেন নি। যদি কোনো-দিন মহাশূন্যের দুস্তর বাধা অতিক্রম করে এ মর্ত্যলোক থেকে মানব-মানবীরা তাঁর সংসারে গিয়ে হাজির হয়, তখন তিনি কি করবেন?

এর উত্তর নেই। সব থেকে সরস উত্তর যিনি দিতে পারতেন, তিনি আটাশ বছর আগে চোখ বুজেছেন। সে এক শেষ শ্রাবণের পূর্ণিমা রাত। আকাশে ভরা চাঁদ। চাঁদের মায়ায় তিনি বারবার ভুলেছেন। আজ সেই চাঁদে যখন মানুষ গিয়ে পৌঁছল, জীবিত থাকলে তিনি কি চুপ করে থাকতে পারতেন? পৃথিবীর যে-কোনো প্রান্তে সামান্য একটু ধ্বনি জাগুক না কেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বীণার তারে তা ধরা পড়ত। আকাশের জিজ্ঞাসা তাঁর কলমে যে নতুন বেগ এনে দিত, একথা অতি সহজেই বলা যায়। তা যদি না হত, তাঁর লেখা তবে অমন করে চাঁদে মাখামাখি কেন?

কোনো শিল্পীই চাঁদ সম্পর্কে উদাসীন নয়, তিনিও না। চাঁদ ও জ্যোৎস্না তাঁর কাব্যে গানে ও নাটকে কত ভাবেই না ধরা দিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, 'এই বঙ্গদেশের সাহিত্যে চন্দ্রদেব অনেক কার্য করিয়াছেন। বর্ণনায়, উপমায়, বিচ্ছেদে, মিলনে,—অলঙ্কারে, খোশামোদে—তিনি উলটপালট খাইয়াছেন।' এখানে 'বঙ্গ-দেশের সাহিত্যে' কথাটি বদলে কেবল 'রবীন্দ্র সাহিত্যে' বললে চাঁদের প্রসঙ্গে একটুও বাড়িয়ে বলা হয় না। এখানেও চাঁদের পেয়ালা ছাপিয়ে দিয়ে উপচিয়ে পড়েছে স্বর্গীয় মদের ফেনা। এ মদে সকলেই বিভোর। হাসি কান্নার খেলা ঘর মুখর। পথ চলতে চলতে আঁধার তরু-শিরে সহসা দেখা গেছে আকাশে চাঁদ আঁকা। গৃহবধূ থমকে দাঁড়িয়েছে। প্রেমিক প্রেমিকা সে দৃশ্য দেখে হয়েছেন রোমাঞ্চিত। তবে ভরা জ্যোৎস্নার রাতে দুঃখজনক ঘটনাও কম ঘটেনি। 'কঙ্কাল' গল্পের নায়িকা যখন আত্মহত্যা করেছিল, তখন 'বড়ো সুন্দর রাত্রি। ফুটফুটে জ্যোৎস্না। সুপ্ত জগতের ক্লান্তি হরণ করিয়া দক্ষিণে হাওয়া বহিতেছে।' —গ্রীষ্মকালের মেঘমুক্ত আকাশে মানুষের মনে জ্যোৎস্না যে ভাব আনে, বর্ষাকালে সে ভাব কি সে আনতে পারে? এ শান্ত মানুষও কি আর বেপরোয়া হয় না। সতীদাহের চিতাশয্যা থেকে মহামায়া তার ঝলসানো দেহটা নিয়ে উঠে এসেছিল প্রণয়ী রাজীবের ঘরে। শর্ত করেছিল, রাজীবের ঘরে সে থাকবে, কিন্তু রাজীব যেন কোনো দিন তার মুখ না দেখে! যে মুহূর্তে সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে, মহামায়া চলে যাবে। কিন্তু বর্ষার চাঁদ রাজীবকে পাগল করে দিল—'একদিন বর্ষাকালে শুক্লপক্ষ দশমীর রাত্রে প্রথম মেঘ কাটিয়ে চাঁদ দেখা দিল। নিস্পন্দ জ্যোৎস্না রাত্রি সুপ্ত পৃথিবীর শিয়রে জাগিয়া বসিয়া রহিল। সে রাত্রে নিদ্রাত্যাগ করিয়া রাজীবও আপনার জায়গায় বসিয়াছিল। গ্রীষ্মক্লিষ্ট বন হইতে একটা গন্ধ এবং ঝিল্লির শ্রান্ত রব তাহার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিতেছিল। রাজীব দেখিতেছিল, অন্ধকার তরুশ্রেণীর প্রান্তে শান্ত সরোবরে একখানি রূপার পাতের মতো ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছে। মানুষ এরকম সময় স্পষ্ট একটা কোনো কথা ভাবে কিনা বলা শক্ত। কেবল তাহার সমস্ত অন্তঃকরণ একটা কোনো দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে—বনের মতো একটা গন্ধোচ্ছ্বাস দেয়, রাত্রির মতো একটি ঝিল্লি ধ্বনি করে।' —মোট কথা, ঐ শুক্লা দশমীর রাত্রেই তার জীবনের ভয়ঙ্কর কাজটি করেছিল রাজীব। ওরকম রাত না হলে, সে বোধ হয় প্ররোচিত হত না।

চাঁদ কখনো কখনো আবার বিষম ভৌতিক পরিবেশও সৃষ্টি করেছে। দক্ষিণাচরণ তার রুগ্না ও মৃত্যুপথযাত্রী স্ত্রীকে যে জ্যোৎস্নালোকে দেখেছিল, তার মধ্যে ভৌতিক বিষণ্ণতা আছে—'অন্ধকার ঝাউগাছের শিখরদেশে যেন আগুন ধরিয়া উঠিল: তাহার পরে কৃষ্ণপক্ষের জীর্ণ শ্রান্ত হলুদবর্ণ চাঁদ ধীরে ধীরে গাছের মাথার উপরকার আকাশে আরোহণ করিল; সাদা পাথরের উপর সাদা শাড়ি-পরা সেই শ্রান্ত-শয়ান রমণীর মুখের উপর জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িল।'

না, আলোচনা বাড়িয়ে লাভ নেই, মর্ত্য-রবির কাব্যধারার প্রতি প্রবাহে চাঁদের মায়া। এ মায়াকে ভেদ করে রহস্য উন্মোচন করা কঠিন। রবীন্দ্র-সাহিত্যে চাঁদ তাই কখনো কখনো অসম্ভব অভীপ্সা হয়ে দেখা দিয়েছে। মেঘ ও চাঁদের প্রতীকটার ভিতর দিয়ে তিনি নিজেও সেকথা অকপটে বিবৃত করেছেন:

চাঁদেরে করিতে বন্দী
মেঘ করে অভিসন্ধি
চাঁদ বাজাইল মায়া শঙ্খ।
মন্ত্রে কালী হল গত
জ্যোৎস্নার ফেনার মতো
মেঘ ভেসে চলে অকলঙ্ক।

সাহিত্যের বৃন্দাবনে চাঁদ মশাই যে লীলাখেলা করলেন, এ গেল তার কথা। বিজ্ঞান-মথুরায় বেচারীর সব জারিজুরি যে ধরা পড়ে গেল, তা আর একটু এগোলেই দেখা যাবে। রবীন্দ্রনাথ যখন কিশোর, বঙ্কিমচন্দ্র তখনই বিজ্ঞানের দূরবীন এঁটে তাকে নাকাল করে ছাড়লেন। চাঁদকে নিয়ে রসিকতা করে লিখলেন—'কখন স্ত্রীলোকের স্কন্ধোপরি হুড়াহুড়ি, কখন তাঁহাদিগের নখরে গড়াগড়ি গিয়াছেন; সুধাকর হিমকর-করনিকর, মৃগাঙ্ক, শশাঙ্ক, কলঙ্ক প্রভৃতি অনুপ্রাসে, বাঙালী বালকের মনোমুগ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে এইরূপ কেবল সাহিত্য-কুঞ্জে লীলাখেলা করিয়া, কার সাধ্য নিস্তার পায়? বিজ্ঞান-দৈত্য সকল পথ ঘেরিয়া বসিয়া আছে। আজি চন্দ্রদেবকে বিজ্ঞানে ধরিয়াছে, ছাড়াছাড়ি নাই। আর সাধের সাহিত্য-বৃন্দাবনে লীলাখেলা চলে না—কুম্ভভাবে সাহেব অক্রূর রথ আনাইয়া দাঁড়াইয়া আছে; চল, চল, বিজ্ঞান-মথুরায় চল।' —এ মথুরায় চাঁদের আকৃতি প্রকৃতি, গোপন ব্যাধি—যার জন্মরহস্য পর্যন্ত সকলের কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেল।

আকাশে ওড়বার ইচ্ছে মানুষের অনেক কালের। মনে-মনে সে চাঁদে গেছে অনেকবার। কাঠের পাখি চড়ে কেউ কেউ লাফ মেরেছে ছাদ থেকে। পরে এলো বেলুন। মানুষের ইতিহাসে সে এক মহা আনন্দের দিন। শহর কলকাতাও সে আস্বাদ থেকে বঞ্চিত হল না। এক বাঙালী লেখক 'বেলুনে বাঙালী বিবি' বলে একটি নাটক পর্যন্ত লিখে ফেলল। আর আমেরিকার ওয়াইজ সাহেব যেদিন ব্যোমযানে আমেরিকা হতে আটলাণ্টিক পেরিয়ে ইউরোপে আসার পরি-কল্পনা পেশ করলেন, এ সংবাদে বাঙালীদের কাছা খুলে যাওয়ার উপক্রম।

'বঙ্গদর্শন'-এ এক-একটি করে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বেরোতে আরম্ভ করল। —কৌতূহলীরা তার প্রতিটি শব্দ গিলে খেল। হক্সলী, টিন্ডল, প্রক্‌টর, লকিয়র, উইলিঅম টমাস, স্লেমর ও নায়েল প্রমুখ পণ্ডিতদের লেখা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পড়ে সেকালের

শিক্ষিত বাঙালীরা কৌতূহল মেটাল। অ্যাস্তেদেশী, মিলানি, পিয়াতি প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষার কথা হাঁ করে এরা পড়তে থাকল। —ওঁদের বক্তব্য নিয়েই বঙ্কিমচন্দ্র 'বিজ্ঞান-রহস্য' ফাঁদলেন। রূপকথা বা পুরাণের চাঁদকে সরিয়ে দিয়ে প্রকৃত চাঁদের পরিচয় তিনি তুলে ধরলেন তাঁর 'চন্দ্রলোক' প্রবন্ধে। তিনি জানালেন, এ চাঁদ রমণীয় কিছু নয়, 'এ দগ্ধ মরুভূমি মাত্র।' আরও জানালেন—'পৃথিবী ও চন্দ্র যুগল গ্রহ।' এর পর চন্দ্রের ব্যাস, পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব, তার গঠন—এমন কি সেকালে চাঁদের যে ম্যাপ তৈরী করা হয়েছিল, তার পরিচয়ও তুলে ধরলেন। তিনি লিখেছিলেন, চাঁদের ব্যাস এক হাজার পঞ্চাশ ক্রোশ। পৃথিবীর ব্যাসের এক-চতুর্থাংশ। —এ তথ্য আজ চলছে। পৃথিবীর থেকে চাঁদের দূরত্ব লিখেছিলেন—এক লক্ষ বিশ হাজার ক্রোশ। আধুনিক আবিষ্কার এ-মত আজো পোষণ করে। ত্রিরিশটা পৃথিবী গায়ে গায়ে সাজালে ট্রেনে করেই চাঁদে পৌঁছান যায়। সূর্যের আলোতেই যে এর আলো এবং চন্দ্রগাত্র যে আগ্নেয় পাহাড়ে সমাকীর্ণ, এ তত্ত্ব সেদিন সুবিদিত ছিল। —সেকালে চাঁদের একটি ম্যাপও মোটামুটি ছকে ফেলা হয়েছিল। দুজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী বেয়র ও মাড্লার এক হাজার পঁচানব্বইটি চান্দ্র পর্বতের উচ্চতা পর্যন্ত মেপে ফেলেছিলেন। সব থেকে খাড়াই পাহাড় যেটি পাওয়া গিয়েছিল, তার উচ্চতা বলা হয়েছিল—'বাইশ হাজার আটশ' তেইশ ফিট'। ঐ পাহাড়টিকে নিউটনের নামে চিহ্নিত করা হয়েছিল। —যাই হোক, বঙ্কিমচন্দ্রের আলোচনাটি যে মোটামুটি ভালো, একথা স্বীকার করতেই হয়। তবে একটু আধটু ভুলও আছে। বায়ুহীন চাঁদে যে জীবের বাস সম্ভব নয়, তা তিনি জানিয়ে গিয়েছেন। সর্বোপরি রিক্ত নিঃস্ব চাঁদের পরিচয় তুলে কৌতুক করে তিনি খেদ করেছেন—'হায়! এমন চন্দ্রের সঙ্গে কে সুন্দরীদিগের মুখের তুলনা করার পদ্ধতি বাহির করিয়াছিল?'

বঙ্কিমচন্দ্র যে বিজ্ঞানের পাঠ দিয়ে ছিলেন—সে উত্তর সাধনা যদি একজনও কেউ করে থাকেন, তিনি রবীন্দ্রনাথ। তবে ছেলেবেলা থেকেই বিজ্ঞান সম্পর্কে কৌতূহল ছিল এই মত্য রবির। যখন বয়স ন-দশ, মাঝে মাঝে রবিবারে ঠাকুর বাড়িতে আসতেন সীতানাথ দত্ত। শিশুদের কাছে ফাঁদতেন তিনি বিজ্ঞানের গল্প। সে কাহিনী রূপকথার থেকেও রোমাঞ্চকর। —এর পরে মহর্ষির সঙ্গে বালক রবি গেল ডালহৌসি পাহাড়ে। সেখানে ডাকবাংলোয় মহর্ষির পাশেই বসত ছোট্ট ছেলেটি। সন্ধ্যাবেলায় পাহাড়ের বেড়া দেওয়া নীল আকাশের স্বচ্ছ অন্ধকারে তারারা আসত নেমে। পিতৃদেব তাঁর শিশুপুত্রকে গ্রহ-নক্ষত্র চেনাতেন। বালক রবি মেতে উঠত উৎসাহে। সে সন্ধ্যার সে উত্তেজনার কথা রবীন্দ্রনাথ অনেক পরে লিপিবদ্ধ করে জানিয়েছিলেন—'শুধু চিনিয়ে দেওয়া নয়, সূর্য থেকে তাদের কক্ষচক্রের দূরত্ব মাত্রা, প্রদক্ষিণের সময় এবং অন্যান্য বিবরণ আমাকে শুনিয়ে যেতেন। তিনি যা বলে যেতেন, তাই মনে করে তখনকার কাঁচা হাতে আমি একটা প্রবন্ধ লিখেছি। স্বাদ পেয়েছিলুম বলেই লিখেছিলুম—জীবনে এই আমার প্রথম ধারাবাহিক রচনা, আর সেটা বৈজ্ঞানিক সংবাদ নিয়ে।'

বিজ্ঞানের আলোতেই কবি প্রথম বিশ্বরূপ দেখলেন। ফলে, সহজবোধ্য জ্যোতির্বিজ্ঞানের বই পেলেই, কবি তাতে ডুবে যান। গাণিতিক দুর্গমতায় পথ মাঝে মাঝে বন্ধুর হয়ে ওঠে, কিন্তু তিনি তা পরোয়াই করেন না। স্যার রবার্ট বল-এর বড়ো বইখানি এই ভাবেই একদিন শেষ হয়ে গেল। নিউ কোম্বস্, ফ্লামারিয়াঁ প্রমুখ লেখকের বই তিনি গলাধঃকরণ করলেন শাঁস ও বীচি সমেত। হক্সলি সাহেবও বাদ গেলেন না। এইভাবে পড়তে পড়তে একদিন মনের ভেতর বৈজ্ঞানিক মেজাজ তৈরী হয়ে গেল। —বঙ্কিমের কালে এদেশে বিজ্ঞানসাধনা তেমনভাবে বিকশিত হয়নি। তখন কোথায় জগদীশচন্দ্র, এবং কোথায় বা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এবং তাঁর বিখ্যাত ছাত্রমণ্ডলী? রবীন্দ্রনাথ এঁদের সাধনা ও সান্নিধ্যের সঙ্গে খুব প্রত্যক্ষ জড়িয়ে ছিলেন, তাই বিজ্ঞানকে উপেক্ষা করার উপায় ছিল না তাঁর। বিজ্ঞান-সাধনা যে মানুষের ধর্ম, এ সত্য তিনি অতি সহজেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। দুরূহ তাত্ত্বিক প্রবন্ধের ফাঁকে ফাঁকেও তাই বিজ্ঞানের রস নির্ঝর উদ্বেলিত হয়ে উঠল। কেবল জাগতিক কৌতূহল নয়, এ জিজ্ঞাসা আকাশেও পাখা মেলল। তিনি লিখলেন, 'দূরতম তারায় মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজন, সেই তারার যে আলোক রশ্মি চার-পাঁচ হাজার এবং ততোধিক বৎসর ধরে ব্যোমবিহারী গৃহত্যাগী, তারই দৌড় মাপতে মানুষের দিন যায়, তার রাত কাটে।'— 'দৃশ্যত বিজ্ঞানচর্চা এক কঠিন সাধনার সমতুল্য। সে সাধনায় বাধা কি কম? সে প্রসঙ্গে কবি লিখলেন—'জ্যোতির্বিদ দূরবীন নিয়ে জ্যোতিষ্কের পর্যালোচনা করতে চান, কিন্তু তার বাধা বিস্তর। আকাশে আছে পৃথিবীর ধুলো, বাতাসের আবরণ, বাষ্পের অবগুণ্ঠন, চারদিকে নানা প্রকার চঞ্চলতা। যন্ত্রের ত্রুটিও অসম্ভব নয়, যে মন দেখছে তার মধ্যে আছে পূর্ব সংস্কারের আবিলতা।'

হঠাৎ পড়তে পড়তে মনে হয়, এ বাক্য কোনো বৈজ্ঞানিকের সতর্কতা। প্রশ্ন জাগে, এই বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ছিল বলেই কি তিনি 'ল্যাবরেটোরী' লিখতে পেরেছিলেন? —এই বাহুল্য। ল্যাবরেটারী তো গল্প, তিনি হঠাৎ একটি বিজ্ঞানের বই-ই লিখে ফেললেন। বইটির নাম, 'বিশ্ব-পরিচয়।' একদা বঙ্কিম যা করেছিলেন, তিনিও তাই করলেন। পরমাণুলোক, নক্ষত্রলোক, সৌরজগৎ, গ্রহলোক, ভূলোক—না কোনো লোকের কথাই তিনি বাদ দিলেন না। বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথের হাতে তুলে দিলেন এ বিজ্ঞানসাধনা।

যে চাঁদকে নিয়ে আজ আমাদের জয়োল্লাস এবং যে চাঁদের আলোয় তাঁর সাহিত্য মাখামাখি, তার নির্মম চিত্রটিও তুলে ধরলেন এখানে। বঙ্কিম যুগ থেকে রবীন্দ্র যুগে বিজ্ঞান এগিয়ে এসেছে অনেক। চন্দ্রের জন্ম রহস্য, উল্কাবর্ষণ এবং তার আত্মিক গতির নিখুঁত ইতিহাস, মহাকর্ষের মাপ, উষ্ণতা ও শৈত্যের ডিগ্রী পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ নিবেদন করলেন। চাঁদের জন্ম সম্পর্কে চার্লস ডারউইনের পুত্র জর্জ ডারউইনের তত্ত্ব তিনি পরিবেশন করে লিখলেন—'আদি সূর্য থেকে যেমন পৃথিবী বেরিয়ে এসেছে তেমনি বাষ্পদেহী আদিম পৃথিবী থেকে বেরিয়ে এসেছে চাঁদ।' আর আর খবরের ভেতর আছে—'আশিটি চাঁদ একসঙ্গে ওজন করলে পৃথিবীর সমান হয়।' 'আপন মেরুদণ্ডের চারদিকে ঘুরতে চাঁদের এক মাসের সময়টি লাগে।' জল-বাতাস না থাকার দরুন অগ্নি উৎস থেকে বেরিয়ে আসা চান্দ্র শিলারা যে পৃথিবীর মত পরিবর্তিত হয়নি, রবীন্দ্রনাথের চাঁদে তার উল্লেখ আছে। চাঁদের প্রভাব সম্পর্কে লিখলেন—'চাঁদ পৃথিবীর কাছের উপগ্রহ। তার টানের জোর প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করি পৃথিবীর সমুদ্রগুলিতে, সেখানে জোয়ার-ভাটা খেলতে থাকে; আর শুনেছি আমাদের শরীরে জ্বরজারি বাতের ব্যথাও ওই টানের জোরে জেগে ওঠে। বাতের রোগীরা ভয় করে অমাবস্যা পূর্ণিমাকে।'

রবীন্দ্রনাথ যখন বিজ্ঞানের হয়ে কলম ধরেন, তিনি তখন রীতিমত গম্ভীর। পক্ষান্তরে বঙ্কিম রসিকতা ও কাব্যরস সরস করে তোলেন বিজ্ঞানকে। তবে কাব্যের ভেতর বিজ্ঞান করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমকে ছাড়িয়ে যান। নিজের কাব্যের সঙ্গে বিশুদ্ধ বিজ্ঞান মিশলে সেখানা যে কি উপাদেয় হয় তিনি তা দেখিয়েছেন। আজ যে চন্দ্র জয়ে আমরা পার্থিব মানবকুল—উল্লসিত, ঐ চাঁদই যে পৃথিবীর মহাকর্ষের টানে ঢুঁ মেরে খতম করে দিতে পারে আমাদের সকলকে, সে বিষয়ে তিনি একদা হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন।

জানিনা, এ কালের বৈজ্ঞানিকরা এমনতরো কোনো ভয়ংকর দিনের ভবিষ্যৎবাণী করে কিনা। যদি করেন, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাই—মানুষের পৃথিবীতে সেদিন দূরবর্তী হোক!

তরাই অরণ্যে বাঘের সন্ধানে

বিশ্বনাথ বসু

তরাই অঞ্চলের হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল গভীর অরণ্যের মধ্য রাত্রি। নিকটে কোন লোকালয় নেই। শিলিগুড়ি স্টেশন থেকে গাড়ি না ফেরা পর্যন্ত শিকার তো দূরের কথা বাংলোতে ফেরারও উপায় নেই। কিন্তু অদৃষ্টের ফেরে গাড়ি ফেরার পূর্বেই মিঃ বাগচীর এলো প্রবল কাঁপুনি দিয়ে জ্বর। বলা যায় না—ডুয়ার্সের কুখ্যাত ম্যালেরিয়াও হতে পারে। সে যাই হোক —আপাতত উপায়ন্তর না দেখে শিকার সহযাত্রীগণসহ শালবনের মধ্যে আগুন জেলে তারই পাশে বাগচীবাবু অগত্যা একটি ওয়াটারপ্রুফ মুড়ি দিয়ে ধুঁকতে লাগলেন।

গাড়ির দেরি দেখে সবাই উৎকণ্ঠিত। নিশ্চিত পথে কিছু একটা হয়ে থাকবে। রাত তখন প্রায় ১২টা কি ১টা হবে। কিছু সময় গবেষণা করতে করতে বনের নির্জনতা ভেদ করে দূরে মোটরের ইঞ্জিনের শব্দ ভেসে এলো। সর্পিল বন পথে ঘুরপাক খেতে খেতে গাড়িটি এসে পৌঁছতেই পেছনের দরজা খুলে মিঃ সেন হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন এবং সরবে ঘোষণা করলেন—"সাহেবের ভাগ্য আজ সুপ্রসন্নই ছিল। যাবার সময় সন্ধ্যায় মধ্যপথ থেকে একটি প্রকাণ্ড বাঘ মেরে নিয়ে গিয়েছেন তিনি।

খবর শুনে মিঃ বাগচী খুশীই হলেন। তবে মনে মনে ভাবলেন—"সাহেব আর আমি দুজনেই কলকাতার আগন্তুক। সাহেব তো বাঘ মেরে নিয়ে হই হই করতে করতে কলকাতায় গেলেন। আমি এখন জ্বরে হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে কোন রকমে ক্যাম্পে ফিরতে পারলে বাঁচি।"

এই প্রবল দৈহিক গ্লানির মধ্যে তখন কি কোন শিকারীর পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব ছিল যে একটু পরে তাঁকেই হয়ত পথিমধ্যে এক লোমহর্ষক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে জঙ্গলে নেমে অন্য একটি দুর্দান্ত বাঘের মোকাবিলা করতে হতে পারে?

১৯৪২ সালের ইস্টারের ছুটি আগত প্রায়। ক্যানিং-এর ডেপুটি ফরেস্ট রেঞ্জার শ্রীঅনিলকান্তি মিত্র জানালেন যে মিলিটারীর ক্যামোফ্লেজ নেট সংগ্রহের জন্য ইস্টার্ন ইণ্ডিয়ার ভারপ্রাপ্ত অফিসার মেজর হার্ডএকার সাহেব ডুয়ার্সে বাঘ শিকারে যেতে চান। প্রয়োজন বোধে আক্রমণমুখী বাঘের হাত থেকে তাঁকে রক্ষা করতে সমর্থ এরূপ একজন সাহসী ও দক্ষ সহ-শিকারী তাঁর দরকার। "যাবেন আপনি?" শ্রীমিত্র প্রস্তাবটি রাখলেন শিকারী শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ বাগচী মশায়ের নিকট।

১৮৯৩ সালে নাটোরের বিশিষ্ট জমিদার বংশে জন্ম। দশ বছর বয়স থেকে বন্দুক চালনা শুরু করে কৈশোর ছেড়ে যৌবনের একটি অধ্যায় পর্যন্ত দেশ গাঁয়ের চিতাবাঘ ও শুয়োরের উপর হাত পাকিয়ে ১৯২২ সালে প্রথম বহুনী তাঁর সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। তারপর থেকে এক নাগাড়ে কুড়ি বছর ধরে মানুষ খেকোর পেছনে সুন্দরবন চুড়ে বেড়িয়েছেন মিঃ বাগচী। ডুয়ার্সের জঙ্গলের নূতনত্বের লোভে এক কথায় রাজী হয়ে গেলেন তিনি।

জলপাইগুড়ির রাজাদের মালিকানা—বিখ্যাত বৈকুণ্ঠপুর ফরেস্ট। রাজা শ্রীপ্রসন্ন-দেব রায়কতের জামাতা কলকাতা নিবাসী ডাঃ এস কে বসুর আমন্ত্রণে উক্ত জঙ্গলেই শিকার প্রোগ্রাম নির্দিষ্ট হলো। মাত্র তিন দিনের প্রোগ্রাম। মেজর হার্ডএকার সস্ত্রীক রওনা হলেন। সাথে তাঁর এক বক্তৃতাবাগীশ ফিরিঙ্গী বন্ধু, নাম মিঃ বেলচেম্বার। মিসেস হার্ডএকার সোজা দার্জিলিং চলে গেলেন। বন্ধুসহ শিকারী সাহেব সরস্বতী-পুর চা-বাগানের বাংলোয় এসে উঠলেন। মিঃ বাগচীও পৌঁছে গেলেন যথা সময়ে। ডাঃ বসুর বন্ধুবান্ধবও এসেছেন কয়েকজন।

রাজাদের খাস এলাকার শিকার-অতিথি। ব্যবস্থাদির ত্রুটি নেই। বাঘের 'টোপ' হিসাবে জঙ্গলের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে মোষ বাঁধা শুরু হয়ে গিয়েছে। স্থির হলো সাহেব তিন দিন এখানে থাকবেন। চতুর্থ দিন সন্ধ্যার তিনি মোটর পথে শিলিগুড়ি পৌঁছে পূর্ব ব্যবস্থা মত সস্ত্রীক কলকাতা রওনা হবেন। সরস্বতীপুর চা-বাগান জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ি রেল স্টেশন থেকে যথাক্রমে ১৮ মাইল ও ৩১ মাইল।

দ্বিতীয় দিন ভোরে চায়ের টেবিলেই খবর এসে গেল গত রাতেই একটি মোষ মারা পড়েছে বাঘের হাতে। শিকারীদের মধ্যে মহা চাঞ্চল্য। সরস্বতীপুর চা-বাগানের ম্যানেজার মিঃ চক্রবর্তী উৎসাহী ও করিৎকর্মা লোক। হাঁক ডাকে লোকজন যোগাড় করে মাচান বাঁধতে পাঠিয়ে দিলেন দেরি না করে। জঙ্গল এলাকার লোকজন, শিকারের কায়দা-কানুন বিলক্ষণ জানে। বেশী পরামর্শ দেবার দরকার হলো না তাদের। তবে ক'জন শিকারীর উপযোগী মাচান হবে প্রশ্ন উঠলো। মুখ্য শিকারী বন্ধুসহ তো 'কিল'-এর উপর বসবেনই। তবে তাঁর পৃষ্ঠ রক্ষক হিসাবে মিঃ বাগচী মাচানে থাকবেন কিনা কথা উঠতেই বাক্যবাগীশ মিঃ বেলচেম্বার বলে উঠলেন—"আমি যখন আছি, তখন ও'র আর দরকার হবে না। তবে, মাচানের উচ্চতা যেন কোন ক্রমেই ১৮ ফুটের কম না হয়। কারণ—'ডুয়ার্স' টাইগার ভেরী ফেরোসাস'। ভদ্রলোকের কথা শুনে তো স্থানীয় লোকেরা মুখ চাওয়া চাওয়ি করলে। মিঃ বাগচীর মুখেও কৌতুকের হাসি।

শিকার সরঞ্জাম, খাবার, চা পানীয় ইত্যাদি সব কিছু নিয়ে সাহেবরা গিয়ে বিকেলে মাচায় বসলেন। বাংলোয় সবাই মধ্য রাত্রি পর্যন্ত গুলির শব্দের আশায় উৎকর্ণ হয়ে থেকে শেষ পর্যন্ত নিরাশ হৃদয়ে শয্যা গ্রহণ করলেন। ভোরে নিদ্রা-

নিহত বাঘ সহ শিকারী

হীনতাজনিত বিবর্ণ মুখে সাহেবরা ফিরে এলেন বাংলোয়। খবর কি? না—বাঘের কোন সাড়া শব্দ পাননি তাঁরা সারা রাত জেগেও।

তবে, কম করে ১৮ ফুট উচ্চতায় উপবিষ্ট শিকার সাথী মিঃ বেলচেম্বারের সচল জিহ্বার অনর্গল প্রলাপ যে মোষের মৃতদেহ থেকে অদূরে ঝোপের আড়ালে লুক্কায়িত কৌতূহলী বাঘের সতর্ক কানে প্রবেশের অসুবিধা হয়নি সে কথা পরবর্তী গোপন পর্যবেক্ষণে আবিষ্কৃত হলেও ভদ্রতার খাতিরে ঐ সময় তা অনুল্লেখই রইল।

দ্বিতীয় রাতেও একটি মোষ 'কুল' হলো। শিকার ব্যবস্থা পূর্ববৎ। ফলাফলও পূর্ববৎ। পরবর্তী দিনে ব্যর্থ মেজর সন্ধ্যায় পৌঁছুলেন শিলিগুড়ি স্টেশনে পূর্ব ব্যবস্থানত স্ত্রীর সাথে মিলবার আশায়। এ যাত্রায় আর বাঘ শিকার হলো না। মিঃ মাখন সেন নামে স্থানীয় শিকারী ভদ্রলোক একজন চললেন মোটরে সাহেবকে তাঁর বন্ধুসহ শিলিগুড়ি স্টেশনে পৌঁছে দিতে। বিকেলে ওঁরা রওনা হয়ে গেলেন।

মিঃ বাগচী ও ডাঃ বসুর কলকাতার বন্ধুরা দু' এক দিনের জন্য থেকে গেলেন পরবর্তী শিকারের আশায়। ব্যবস্থা হলো ওঁরা কাঠ টানা একটি ট্রলিতে চেপে আট দশ মাইল দূরে বনভ্যন্তরে একটি নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে অপেক্ষা করবেন। মেজর হার্ডএকারকে শিলিগুড়ি পৌঁছে দিয়ে মিঃ সেন পথিমধ্যে ওঁদের তুলে নিয়ে অন্য একটি ঘুরপথে বাংলোয় ফিরবেন, যদি কোন জানোয়ারের সাক্ষাৎ মেলে এই আশায়। জঙ্গল মধ্যে ট্রলি চলাচলের লাইন পাতা। শিকারে যাত্রীদের নিয়ে সেই লাইনের উপর দিয়ে ট্রলিটি গড়িয়ে চললো জঙ্গল পথে নির্দিষ্ট দিকে।

ফোর্ড গাড়ি-শক্তিশালী ইঞ্জিন। দ্রুত বেগে ছুটে চলেছে শালবনের ভিতর দিয়ে শিলিগুড়ি অভিমুখে। সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে এসেছে। জঙ্গল সীমানা এখনও অনেক দূরে। আকাশচুম্বী বিশাল হিমালয় পর্বত ভারতের উত্তর সীমানার অতন্দ্র প্রহরীরূপে দণ্ডায়মান। তারই কোলে হিংস্র বন্য জন্তু অধ্যুষিত দীর্ঘ বিস্তৃত এই বিখ্যাত তরাই অরণ্য। চতুর্দিকে নিস্তব্ধতার পরিবেশ। যাত্রীদের মনেও রোমাঞ্চের শিহরণ। মিঃ সেনের সুপরিচিত জঙ্গল। বন্য-প্রাণী চলাচলের স্পটগুলিও তাঁর অজানা নয়। তারই পরামর্শে মেজর হার্ডএকার টর্চযুক্ত গুলি-ভরা রাইফেল রেখেছেন হাতের ধারে। বলা যায় না—হঠাৎ প্রয়োজন হতে পারে।

আঁকা বাঁকা পথ। এক একটি মোড় ঘুরলে মোটরের হেড লাইটের তীব্র আলোক রেখা দীর্ঘকাণ্ড শাল গাছের ভিতর দিয়ে বহুদূরে পর্যন্ত আলোকিত করছে। কোন এলাকায় চোখের দৃষ্টি বেশী সতর্ক রাখতে হবে সে হিসাব মিঃ সেনের কাছে। সম্মুখের বাঁকটি ঘুরলে জঙ্গল একটু হালকা হবে। কিন্তু বাঘ চলাচলের বিখ্যাত এলাকা ওটি। কাজেই সাহেবের ভাগ্যে থাকলে 'দর্শন' মিলতেও পারে। অন্ধকারের জঙ্গল ফুঁড়ে হুড় খোলা গাড়িটি দ্রুতবেগে এগিয়ে যাচ্ছে সামনের বাঁকের দিকে। মিঃ সেন ফিস্ ফিস্ করে ড্রাইভারকে বললেন—গাড়ির স্পিড বেশ কিছুটা কমিয়ে ধীরে ধীরে বাঁক ঘুরতে। মিঃ বেলচেম্বারকে অনুরোধ করলেন—তাঁর সচল জিহ্বাকে এবার কিছু সময়ের জন্য বিশ্রাম দিতে।

বাঁকটি এখানে ঠিক ধনুকের মত বাঁদিকে ঘুরে গিয়েছে। ফলে গাড়ি ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে হেডলাইটও পথের দক্ষিণপার্শ্বের জঙ্গলের অন্দর মহল পর্যন্ত পরিষ্কার দেখিয়ে দিল। শিকারে শিক্ষিত ড্রাইভার। মোটরের লাইট বরাবর নজর রেখেছে সে নিজে। কিছু দেখলে ঠিকই ইশারায় জানিয়ে দেবে। মিঃ সেন নিজের বন্দুক ও টর্চ সঙ্গে এনেছিলেন। তিনি সামনের সীটে বসে টর্চের আলোয় বাঁ দিকের জঙ্গলের কোণে তল্লাসী চালাচ্ছেন।

হঠাৎ মিঃ সেন মুখে একটি বিশেষ ধরনের চুক চুক শব্দ করলেন—জঙ্গলের কৃত্রিম ইশারা। ইশারার অর্থ ড্রাইভার বোঝে। সঙ্গে সঙ্গে সে গাড়ির ব্রেক কষলো। সবাই মিঃ সেনের টর্চের নিশানা বরাবর তাকিয়ে দেখেন—একটি হালকা ঝোপকে কিছুটা কোনাকুনিভাবে সামনে রেখে একটি প্রকাণ্ড ডোরাকাটা বাঘ ফাঁকায় বসে আছে। কৌতূহলী দৃষ্টি তার সোজা গাড়ির দিকে। পেছনের সীট থেকে মিঃ বেলচেম্বারের মৃদু কণ্ঠ কানে এলো—"হোয়াট এ বিগ টাইগার? মাস্ট বি ভেরী ফেরোসাস"। হিস্ হিস্ শব্দ করে মিঃ সেন ভদ্রলোককে থামালেন।

মেজর হার্ডএকার, বোঝা গেল, সাহসী ও ক্ষিপ্র শিকারী। মিঃ সেন টর্চের ফোকাস ও নিজের দৃষ্টি বাঘের উপর নিবদ্ধ রেখেই বুঝতে পারছেন সাহেব বাঘের দিকে তাঁর রাইফেল নিশানাবদ্ধ করেছেন। রাইফেলের সাথে ক্ল্যাম্প বাঁধা ছিল হান্টিং টর্চ। অবিলম্বে সেই টর্চের ফোকাস বাঘের উপর নিক্ষিপ্ত হোল। সঙ্গে সঙ্গে মিঃ সেনও আলো নেবালেন। কয়েক সেকেণ্ড সময় মাত্র। বজ্রনির্ঘোষে সাহেবের রাইফেল গর্জে উঠলো। পরমুহূর্তেই দেখা গেল বাঘ মাটিতে পড়ে লুটোপুটি খাচ্ছে। সাহেবের দ্বিতীয় গুলি বাঘকে একেবারে নিঃসাড় করে দিল। ০·৩৭৫ বোরের ম্যাগনাম—শক্তিশালী রাইফেল। এর প্রচণ্ড আঘাত হজম করা দুঃসাধ্য।

মেজর হার্ডএকারের আনন্দ আর ধরে না। বাঘটি গাড়িতে বেঁধে নিয়ে ছুটে চলেছেন তাঁরা শিলিগুড়ি স্টেশনের দিকে। স্টেশনে বাঘ নামাতেই লোকে লোকারণ্য। একেতো যুদ্ধের সময়, তায় মিলিটারী সাহেব—দোর্দণ্ড প্রতাপ তাঁর। কাজেই বাঘ সম্বন্ধে পরবর্তী ব্যবস্থাদি করতে তাঁর অসুবিধা হবে না বুঝে মিঃ সেন মেজরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে এলেন মিঃ বাগচীদের অবস্থান স্থলে। সবাইকে তুলে নিয়ে অলি গলি পথে গাড়ি আবার এগিয়ে চললো বনের গভীরে।

রাজা প্রসন্নদেব রায়কত শিকারপ্রিয় ব্যক্তি। শিকারের অন্বেষণের সুবিধার জন্য জঙ্গলটিকে মোটর চলাচলের উপযোগী পথের জালে ছেয়ে দিয়েছেন। প্রতিটি পথের দু' পাশে পনর বিশ হাত পরিমিত জমি আগাছামুক্ত। বোঝা গেল এও রাজা সাহেবের সুচিন্তিত শিকার কৌশলের অঙ্গ।

সাপের মত এঁকে বেঁকে মোটর চলেছে। জ্বর না কমলেও কাঁপুনী কমেছে মিঃ বাগচীর। তবে শিকার আগ্রহের চাইতে বিশ্রামের প্রয়োজনবোধ করছেন বেশি। তবু গতিশীল গাড়ির উপরে বসে অভ্যস্ত চোখে নজর রেখেছেন তিনি জঙ্গলের দিকে।

মেজর হার্ডএকারের কথা মনে হচ্ছে মধ্যে মধ্যে। সত্যই ভদ্রলোকের 'টাইগার লাক' আছে বলতে হবে। মাচানে বসেও হয়ত তিনি শিকার পেতেন, যদি না বক্তৃতাবাগীশ বন্ধুটি তাঁর সাথে থাকতো। একটু অন্যমনস্কই হয়ে পড়েছিলেন হয়ত মিঃ বাগচী। হঠাৎ তিনি দেখলেন—সম্মুখে মোটরের হেড লাইটের আলোকোজ্জ্বল বনপথ অতিক্রম করে একটি প্রকাণ্ড রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার জঙ্গলের দিকে এগিয়ে গেল। সংযত মধ্যম লয়ের পদক্ষেপ তার। মধ্য পথে ঘাড় ঘুরিয়ে একবার কটাক্ষ হেনেছিল সে। জোড়া চোখের রক্তিম ঝিলিক আরোহীদের কারো নজর এড়ায়নি। সড়কের দু' দিকের কিছু অংশ ফাঁকা। একেবারে সামনাসামনি গাড়ি থামানো সঙ্গত নয় মনে করে সতর্ক অভিজ্ঞ ড্রাইভার বাঘ যে স্থানে রাস্তা অতিক্রম করেছে, সেই স্থান পেরিয়ে আন্দাজ পনর বিশ গজ দূরে গিয়ে গাড়ি থামাল।

ব্যাঘ্র দর্শনের উত্তেজনায় নিজের অসুস্থতা ভুলে গিয়েছেন মিঃ বাগচী। অবিলম্বে গাড়ি থেকে নেমে একলা পায়ে হেঁটে এগিয়ে গেলেন তিনি সড়ক ধরে। হাতে টর্চযুক্ত ০·৪২৩ বোরের রাইফেল। দীর্ঘ দিনের প্রিয় ও বিশ্বস্ত শিকার সাথী তাঁর। নির্দিষ্ট স্থানটি আন্দাজ করে নিয়ে জঙ্গলের দিকে স্পট করলেন। শিকার কিছুই দেখা গেল না। রাস্তা ছেড়ে আগাছামুক্ত ফাঁকায় নামলেন—আলো ফেললেন ডাইনে, বাঁয়ে, সম্মুখে। আচমকা একজোড়া চোখের প্রতিফলন ধরা পড়লো দুটি গাছের ফাঁক দিয়ে। ঠিক সেই সময়েই আরো কয়েকটি টর্চের ফোকাস বাগচীবাবুর পেছনের রাস্তা থেকে নিক্ষিপ্ত হ

সম্মুখের জঙ্গলের দিকে। শিকারী চমকে উঠলেন আলো দেখে। কি বিপজ্জনক হঠকারিতা? নিশ্চয়ই অন্যান্য সঙ্গীরা গাড়ি ছেড়ে পেছনের রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছেন।

মিঃ বাগচী এইরূপ গুরুতর জরুরী পরিস্থিতির মধ্যে স্বীয় টর্চের তীব্র জ্যোতিতে বাঘের দৃষ্টি বেঁধে রেখে সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে বললেন—"এ কি ছেলেমানুষী করছেন আপনারা? বাঘ অদূরে সামনে বসে। আমারই পেছন থেকে আলো ফেলে আমার দৈহিক অবস্থান স্পষ্ট করে বাঘকে দেখিয়ে দিচ্ছেন আপনারা? বলিহারী আপনাদের শিকারী বুদ্ধি"। তৎক্ষণাৎ সঙ্গীরা আলো নেবালেন। কিন্তু ওদিকে অধিক লোকের সাড়া পেয়ে সন্দিগ্ধ [illegible] জঙ্গলে প্রবেশ করেছে।

কি দুর্ভাগ্য! অনভিজ্ঞ মিঃ বাগচী [illegible] বিপজ্জনক শিকার-প্রোগ্রামে অধিক [illegible] পরিণাম কি? অসুস্থ [illegible] দুঃখে মাথা গরম হয়ে উঠল। অতি কষ্টে নিজেকে সংযত করলেন [illegible]। কিন্তু এখন উপায়ই বা কি? বাঘ [illegible] পূর্ব-বর্ণিত আগাছামুক্ত [illegible] ছিল। এখন তো ঝোপঝাড়ের [illegible] দিয়েছে। তাকে খুঁজে [illegible] সম্ভব হবে না। তবুও [illegible] জঙ্গলে চরম প্রতি-[illegible] বাঘ শিকারে অভ্যস্ত [illegible] শিকারী মিঃ বাগচী [illegible] স্বীয় সাহসের [illegible] পুনরায় প্রলুব্ধ হলেন। [illegible] এক পা দু' পা করে ঝোপ [illegible] এগিয়ে গেলেন তিনি। [illegible] সংযত ও সতর্ক। [illegible] শব্দে বোঝা যাচ্ছে সঙ্গীরা [illegible] দূরত্ব রেখে তাঁকেই অনুসরণ [illegible] আসছেন। শিকারী বিরক্ত ও [illegible]। কিন্তু উপায় নেই। এই [illegible] তিনি মুখে বিরক্তি প্রকাশ করে [illegible] আর বাঘকে সন্ত্রস্ত করতে [illegible]।

টর্চের আলোর জঙ্গল তন্ন তন্ন করে [illegible] শিকারী। বাঘের কোন হদিস নেই। মোটা মোটা শালের গুঁড়ি আলো [illegible]। ফলে একটু এদিক ওদিক নড়াচড়া করতে হচ্ছে তাঁকে। বাঘ যদি নিকটে থেকে থাকে, পূর্বাপেক্ষা সতর্ক হয়েছে নিশ্চয়ই এবং সেক্ষেত্রে তাকে অধিক [illegible] ও দুঃসাহসী বুঝতে হবে। সে [illegible] আপাততঃ অত গবেষণা অবান্তর। [illegible] দুঃসাহসী হোক, বা ভীরুই হোক—[illegible] দেখা হলে মাত্র একটি গুলিরই [illegible] প্রয়োজন হবে তার জন্যে। কারণ আজ [illegible] কোন বাঘের ক্ষেত্রেই দ্বিতীয় গুলির দরকার হয়নি মিঃ বাগচীর—তাও তো সবই সুন্দরবনের মানুষখেকো।

গম্ভীর রোমাঞ্চে ভরা রাতের শব্দহীন। ঊর্ধ্বে পত্রশাখায় দূরাগত পাহাড়ী হাওয়ার দোলা পথিকের মনে জাগায় অজানা শিহরণ। জ্যোৎস্নাস্নাত অতি পরিচিত এই পারিপার্শ্বিক কখন কোন দুর্বল মুহূর্তে হয়ত দুর্দান্ত কোন নিশাচর শিকারীর যাত্রা পথে করে ভীতির সঞ্চার। আলো ছায়ায় ঘেরা প্রতিটি বৃক্ষতল তখন হয়ে ওঠে গোপন আবরণে চক্রান্তের কল্পিত পীঠস্থান।

কিন্তু এই মুহূর্তে যে হিংস্র শ্বাপদ সম্মুখে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল, তার কি মানুষ সম্বন্ধে কোন বিশেষ কৌতূহল আছে? বিনা প্ররোচনায় স্বাভাবিক প্রবণতায় সে কি মানুষের বিরুদ্ধে অলক্ষ্য কৌশলে অভ্যস্ত? সুন্দরবন শিকারী মিঃ বাগচীর মনে হঠাৎ এই মুহূর্তে, কি জানি কেন, এই প্রশ্ন অত্যন্ত জরুরী হয়ে দেখা দিল। প্রশ্ন নিজের—উত্তরও আবিষ্কার করতে হবে তাঁকে নিজেকেই।

নির্ভীক শিকারী টর্চ নিবিয়ে দিলেন। কেন? বাঘ একটু পূর্বেই মানুষের সাড়া পেয়েছে। মানুষ সম্বন্ধে উদাসীনতা বা ভীতি থাকলে এতক্ষণ হয়ত সে বহুদূরে সরে গিয়েছে। কৌতূহলী হলে সে নিশ্চিতই অদূরে লুকিয়ে আছে। আর কৌশলী হলে এক্ষেত্রে মনে হয় আলোর আড়ালে থাকার চেষ্টা করবে—আঁধারে উঁকি দিয়ে দেখবার ঝোঁক নেবে। কারণ, প্রথম চোটে আলো তার চোখে সয়ে গিয়েছে এবং আলোর পেছনে যে মানুষ আছে, তা সে পূর্বেই বুঝে নিয়েছে।

কয়েক সেকেণ্ড মাত্র। টর্চ পুনরায় জ্বললো। তীব্র আলোর ঝলকে সম্মুখের জঙ্গল উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। একটি কাঁটা ঝাড়ের পাতার ফাঁক দিয়ে দেখা গেল একটি রক্তাভ গোলক জ্বলন্ত অঙ্গারের মত জ্বলছে। অভিজ্ঞ শিকারীর বুঝতে অসুবিধা হলো না যে, ওটি নিশ্চিতই বাঘের চোখ।

কিন্তু মুশকিল হলো—একটি চোখের প্রতিফলনে তো দুটি চোখের কেন্দ্রবিন্দু ও নাসিকার মধ্যে লাইন ধরা যায় না। তাছাড়া, রাত্রিকালে একটি চোখের আবিষ্কার লুক্কায়িত গোটা মুখমণ্ডলের সঠিক অ্যাঙ্গেলও নির্দেশ করে না—যা কিনা গুলির গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যস্থল নির্ণয়ের প্রয়োজনে একান্তই অপরিহার্য। কাজেই আন্দাজে গুলি না ছুঁড়ে রাইফেল দক্ষিণ স্কন্ধে স্থিরবদ্ধ রেখে শিকারী সম্মুখের দিকে একটু ডাইনে চেপে কয়েক পা এগিয়ে গেলেন। এবার জ্বলন্ত দুটি চোখই নজরে এল।

অতি ক্রূর হিংস্র দৃষ্টিতে বাঘ তার প্রতিপক্ষকে দেখছে। পশ্চাদ্ভাগে শুকনো পাতার ঘড় ঘড় শব্দে উত্তেজিত বাঘের অবাধ্য লেজের মৃদু আস্ফালনের সংকেত। শিকারী রাইফেলের নল বরাবর লক্ষ্য করছেন। বাঘের চোখ দুটির উচ্চতা যেন ধীরে ধীরে মাটির দিকে নেমে যাচ্ছে। বাঘ নিশ্চিতই লাফ দিতে উদ্যত—এইতো চরম মুহূর্ত। 'গুড়ুম'—চতুর্দিকের বনভূমি প্রকম্পিত করে শক্তিশালী রাইফেল সক্রিয় হলো।

'গুড়ুম'—'গুড়ুম'—'গুড়ুম'। এ কি? শিকারী ভাবছেন—হয়ত বা তাঁরই রাইফেলের শব্দ জঙ্গলে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। কিন্তু না, তাতো নয়। এতো সম্মুখের জঙ্গল লক্ষ্য করে পেছনের শিকারীদের এলোপাতাড়ি গুলি ছোঁড়ার শব্দ। লক্ষ্যহীন এই গুলিবৃষ্টি থেকে স্বীয় প্রাণ বাঁচানর তাগিদে মিঃ বাগচী মুহূর্ত দেরি না করে মাথা নিচু করে মাটিতে বসে পড়লেন। কি দুর্দৈব। সম্মুখে গুলিবিদ্ধ অরণ্যের হিংস্রতম শ্বাপদ—পেছনে গুলিবর্ষণরত দায়িত্বজ্ঞানহীন নির্বোধ বন্দুকধারীরা। শিকারী বিস্মিত ও বিহ্বল। বীরপুরুষদের প্রথম ঝাঁক গুলিবর্ষণ থামলে পর মিঃ বাগচী রুদ্ধস্বরে চিৎকার করে উঠলেন—"মশায়রা, ফায়ারিং বন্ধ করুন। এক মুহূর্ত দেরি না করে কোন কিছুর আড়াল নিন আপনারা। এদিকে বাঘ কোথায় কিভাবে আছে জানি না। যদি আহত অবস্থায় চার্জ করে বসে, এই রাত্রিকালে আমি তো মরবই—আপনাদেরও সব কয়টিকে মেরে রেখে যাবে।"

মিঃ বাগচীর গলায় কঠোর ভর্ৎসনার আওয়াজে এবং হয়ত বা আহত বাঘের ভয়ে বীরপুরুষেরা সবাই শাল গাছের আড়ালে সরে গেলেন। তাঁদের বন্দুক রি-লোডিংএর শব্দে বোঝা গেল সন্ত্রস্ত তাঁরা দ্বিতীয় রাউণ্ডের জন্য তৈরি হচ্ছেন।

যাই হোক, এদিকে মিঃ বাগচী টর্চের আলো ঘুরিয়ে আশপাশের সর্বত্র লক্ষ্য করে দেখছেন। কোথাও বাঘের চিহ্ন নেই। বনের ভিতরে শুকনো পাতার আস্তরণ। সরে যাবার কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। অবশ্য সঙ্গীদের গুলির আওয়াজে সেই মুহূর্তে কিছু শোনাও যায়নি। শট-গানধারী একজন সঙ্গীকে বললেন, নির্দিষ্ট ঝোপের দিকে দু' একটি ছররার গুলি ছাড়তে। তাতেও বাঘের সাড়া পাওয়া গেল না। তখন মিঃ বাগচী সন্তর্পণে রাইফেল বাগিয়ে [illegible] চেয়ে দেখেন বাঘটি ঠিক ঝোপের পেছনেই পড়ে আছে। স্পট ডেড। শিকারীর নিক্ষিপ্ত গুলিটি দুই চোখের মধ্যস্থল ভেদ করে মস্তিষ্ক চূর্ণ করে [illegible] পশ্চাতের চামড়া ঠেলে উঁচু হয়ে রয়েছে। গুলির একটি স্প্লিন্টার বাঘের মুখের নীচের চোয়াল ভেদ করে বেরিয়ে গিয়েছে। বিশাল দেহ বাঘ—প্রায় সাড়ে নয় ফুট লম্বা ছিল।

ভাতে ভেতো, নামে টাঁশ

না, ভদ্রলোকটি সাহেবও নন, আধা-[illegible]ও নন। ওঁর স্ত্রী শাড়ি পরেন, [illegible] পরেন, পরেন পায়ে আলতা, মাথায় সিঁদুর। নিজেও উনি পান খেয়ে পিচ [illegible] ইলিশ-ভাত খেয়ে ঢেঁকুর তোলেন, [illegible] বাড়িতেই হাত [illegible]। [illegible] পাকের। আর [illegible] ভদ্রলোকের নাম আর্নেস্ট গোমেস।

"[illegible] প্রটেস্টান্ট [illegible] [illegible] নয়, [illegible]"। সাড়ে তিন [illegible] আগে ওঁর পূর্বপুরুষ [illegible] কে আসলেন নবাব দত্ত চৌধুরী [illegible] কোনো পর্তুগীজ [illegible] খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। আর সেই দিন থেকে পুরুষানুক্রমে, যেমন, [illegible] প্রভৃতি খ্রীষ্টীয় নামে ওঁরা [illegible] সন্তানসন্ততির নামকরণ করে [illegible]। ওঁদের মতো আরও অনেকেই [illegible] কেউ হন ল্যুকাস [illegible], কেউ হন জোসেফ রোজারিও। [illegible] ঐসব বিদেশী নাম-[illegible] একান্ত বেমানান তথা বাঙাল-[illegible] কমসে কম দশ হাজার [illegible] মিলবে।

প্রটেস্টান্ট সমাজের কথা কিছুটা [illegible]। ওঁদের পদবী পুরোপুরি বাঙালী; [illegible] ওঁদের মণ্ডল হল Mundle, [illegible] হল Sandel—এইটুকু সাহেবিয়ানা। খ্রীষ্টীয় নাম [অর্থাৎ স্বর্গস্থ কোনো [illegible], সেন্টের নাম] কোনো দিন ওঁরা আবশ্যক বলে মনে করেননি। বলা [illegible], দুর্গাচরণ, দেবীপ্রসাদ, শিব-[illegible] ধরনের দেবদেবীজ্ঞাপক নাম সবা-[illegible] কর্ণশূলে।

১৮৫২ সালে প্রকাশিত 'করুণা ও ফুলমণি' গ্রন্থের পরিশিষ্টে হ্যানা ম্যালেন্স খ্রীষ্টানদের পক্ষে গ্রহণীয় এক খাঁটি বাঙালী হিন্দু অনুষঙ্গ-রহিত নামাবলী রচনা করেছিলেন; তাতে স্থান পেয়েছে সদ্গুণার্থক নাম [অস্তিবাচক : প্রেম, ক্ষমা...; নেতিবাচক : নির্মল, অভয়...], পুষ্প, ধাতু, রত্নের নাম [পদ্ম, স্বর্ণ, মণি...], এমন কি সংস্কৃত সাহিত্যের নাম [বিক্রম, দময়ন্তী...]। তাঁর সংকলিত অনেক নামই [অক্রূরচন্দ্র, আশ্রয়চাঁদ, শিশুপাল...] আমাদের আধুনিক সমাজের ড্রেন-পাইপ-পরা ছেলে পছন্দ করবে কি না সন্দেহ। আর আশ্চর্য! [illegible] নিরোদবরণী, [illegible], [illegible]কারিণী প্রভৃতি তালিকা-ভুক্ত নাম [illegible] কোনো মেয়ে যদি আজীবন অনূঢ়াই থেকে যায়, তবে কারণ বুঝতে হবে : নাম—শুধু নাম, শুধু নাম। বালিকা নামের কথা [illegible] দিনমণি নামটা...ক্ষতি কি, দিনমণিও যে-দেশে স্ত্রীলিঙ্গ হয়! বিদেশিনী লেখিকা লক্ষ্য করেছেন অন্ত্যানুপ্রাসিত নামের জুড়ি বাঙালীদের বড় প্রিয় : অনাথ, [illegible], শান্তি, কান্তি, পদ্মিনী, রঙ্গিনী। কতক-গুলি উদাহরণ অবশ্য কষ্টকল্পিত, যেমন—বিক্রম, ঘনশ্যাম, বিরাজ, তেজ, লতা চিন্তা।

আমার এক ক্যাথলিক বন্ধু [তিনিও ভিনদেশী] সম্প্রতি প্রকাশিত এক পুস্তকে খ্রীষ্টীয় নামের অনুবাদের প্রতি পক্ষপাত দেখিয়েছেন : Victoria বিজয়া, Ambrose অমৃত...। মুশকিল এই যে, অনেক খ্রীষ্টীয় নামের ব্যুৎপত্তি অনির্দিষ্ট [Ferdinand-এর অর্থ কি 'সাহসী রক্ষক' না 'যাত্রা সংকট'?], অনেক সমাসবদ্ধ নামের শেষ পর্যন্ত কোনো অর্থ হয় না [যেমন Frithwulf শান্তি-নেকড়ে]।

ভদ্রলোকের নাম-তালিকা মিসিস ম্যালেন্সের লিস্টের চেয়ে অনেক বেশী চিত্তাকর্ষক : Philip [গ্রীকে অশ্বপ্রিয়] হয়েছে অশ্বঘোষ, George [গ্রীকে কৃষক] হয়েছে [illegible], [illegible] [ইব্রুতে 'ঈশ্বর আমার বিচারক'] হয়েছে ন্যায়মূর্তি। অসুবিধে এই—ঐসব অতি জনপ্রিয় খ্রীষ্টীয় নাম অতি সেকেলে বাঙালী রূপ ধারণ করেছে, এদিকে আবার কমল, উষা প্রভৃতি অধুনা জনপ্রিয় বাংলা নাম যথাক্রমে Rufus, Aura প্রভৃতি অধুনা-অচলিত খ্রীষ্টীয় নামের রূপান্তর।

আমার নিজস্ব ধারণা, খ্রীষ্টীয় নামের অর্থ অনেক ক্ষেত্রে অবান্তর, ধ্বনিই আসল, আমাদের প্রকৃত সমস্যা হল তাৎপর্যের অনুবাদ নয়, বিদেশী ধ্বনির বাঙালীকরণ। যাদের মুখে Artichoke-এর উচ্চারণ হাতি চোখ, Hospital-এর উচ্চারণ হাসপাতাল, তাদের কাছে Michel হবে মুকুল, Philomena ফুলমণি, Cyprian সুপ্রিয়, Bertha বার্তা, Simon সুমন, Nelly নীলা, Angela অঞ্জলি, Antony অনন্ত...। আমার নিজের নাম (Paul) করেছি উৎপল, পদবীটাকে (Detienne) বানিয়েছি দত্ত রায়। হ্যাঁ, যা ভেবেছেন তা-ই, প্রতিযোগিতার অনিচ্ছার জন্যই এই রায়-এর সংযোজন।

অনেকে নাকি জিজ্ঞেস করেছে, "ফাদার দ্যতিয়েন কি আসলে কোনো ছদ্মনামধারী বাঙালী লেখক?" মোদ্দা কথা কিন্তু এই যে, বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাদির লেখক উৎপল দত্ত রায়-ই ফাদার দ্যতিয়েনের ছদ্মনাম। আমার আর এক নাম আছে : সুশীল পাল [পদবী আর নাম উল্টিয়ে]। একদিন—বলব কি—বালিকা বিদ্যালয়ের এক পত্রিকায় একটি গল্প লিখেছিলাম, সই করেছিলাম, শেফালি সোম। অবিলম্বে [illegible] এক কিশোর পাঠকের কাছ থেকে এল এক প্রস্তাব : "ডিয়ার শেফালি, তোমার সঙ্গে আমি ভাব করতে চাই..." কি আর করি? প্রধান শিক্ষয়িত্রীকে বললাম, "ছেলেটিকে পুরোপুরি হতাশ করে কি হবে? বরং লিখে দিন : শেফালি ইদানীং মাথা-কাথা মুড়িয়ে-টুড়িয়ে সিস্টার হয়ে গেছে।"

উপরোধের ঢেঁকি

বাংলা দেশে প্রবাসী ফাদার-ব্রাদার, মাদার-সিস্টারদের কাছে আমার এক পরামর্শ আছে : বাঙালীদের বাড়িতে যাবেন যখন, বাঙালীদের দুটো দাবির জন্য প্রস্তুত হয়ে যেন যান।

প্রথমটি হল : রবীন্দ্রসংগীত গাইতে হবে...। বিশ্বাস করুন, আপনাদের হাজার কৈফিয়ত সত্ত্বেও [যেমন—পাড়াময় পড়শীরা হো হো করে হাসবে, হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে মারা যাবে...কিংবা, সুন্দরবনের

যাবতীয় শেয়াল কর্ণেন্দ্রিয়ের যন্ত্রণার আতিশয্যে সমুদ্রে লাফ দেবে...কিংবা, এলাকার সবকটা সেতারের তন্ত্রী আর তবলার চামড়া ফটাস করে ফেটে যাবে...] বাঙালীরা ছাড়বেন না, আপনাদের গান গাইতেই হবে। ঃ অনেক দিন হল আমি হার মেনে নিয়েছি, "গলা বসেছে, মাথা ধরেছে" গোছের কোনো অছিলা আমি আর শোনাই না [একদিন বাঁড়ুয্যে পাড়ার এক গৃহস্থ ভদ্রলোক আমার যুক্তি খণ্ডন করে মুখের উপরই বলে ফেলেছিলেন, "আরে ফাদার, গলা থাকলে তবে তো গলা বসবে, মাথা নেই তার আবার মাথা ব্যথা। গান দির্কিন মস্করা না করে..."]; আজকাল গানের অনুরোধ আসামাত্র আমি সোজাসুজি ধরি আমার শেখা এক নম্বর গান ঃ 'সংকটের বিহ্বলতা...'। আর একটা গানও শিখে রেখে দিয়েছি—'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে' —কোনো তালকানা আধা-কালা গৃহস্বামী যদি কোনো দিন দৈবাৎ ভুল করে "আর একটা" বলে ওঠেন, এই দুঃসম্ভাবনার আশংকায়। গত কুড়ি বছর অবশ্য ওরকম দুর্ঘটনায় আমাকে পড়তে হয়নি ঃ আজ পর্যন্ত বাংলা দেশ আমার ঐ 'আনন্দ-লোকের' শ্রবণসুখ থেকে বঞ্চিত।

সত্যি কথা বলি, আমার এক নম্বর গান শুনে কেউ কখনও বলেনি [আর আমার নিজের মা-ও বলতেন কি না সন্দেহ] দু' নম্বর গানটা শোনাতে; বলেছে শুধু, একটু যেন অপ্রস্তুত হয়ে ঃ "আর একটা মিষ্টি খান না..." কিংবা "কর্পোরেশনের অ্যাক্টি-ভিটি আপনার কেমন লাগে?" কিংবা ঐ ধরনের নিরাপদ আর-কিছু।

বাঙালী পরিবারের দ্বিতীয় দাবি হল [আর শুধু সেইটে উপস্থাপিত করার জন্যই প্রথমটির উল্লেখ] "আমাদের বেবীর একটা নাম দিয়ে দিন তো..."। আপনারা জানেন, মশু আপনাদের আবির্ভাবের আগে বাচ্চার মামা, কাকা, জেঠা, মায়ের মাসতুতো ননদ, বড়দির মামাশ্বশুর সব্বাই একটা করে ভারি শ্রুতিসুখকর নাম রেখে গেছেন আর তবু শেষ পর্যন্ত সব নাম ঝরে গিয়ে বহাল থাকবে হয়তো বাবার দেওয়া ভালো নাম যতীন আর মায়ের দেওয়া ডাকনাম ভুতো; আপনারা জানেন আপনাদের দেওয়া নামটিও তাঁরা রাখবেন না—তাঁরা তো রাখবেন বলে আপনাদের নাম দিতে বলেননি, আপনাদের মুখে শুনবার জনাই শুনতে চেয়েছেন।

আমি কিভাবে এই নামকরণের সমস্যা সমাধান করেছি, এবার শুনুন ঃ বাবা আর মা-র নাম মিলিয়ে আমি নাম বানাই—যেমন ধরুন, কোন্নগরবাসী সেই ভদ্রলোকের নাম ছিল মাধব আর স্ত্রীর নাম দেবী; ও'দের বাচ্চা মেয়ের নাম রচনা করেছি জনকের প্রথম অক্ষর আর জননীর শেষ অক্ষরের মধ্যে স্বতন্ত্র এক অক্ষর বসিয়ে দিয়ে মালবী। আর আমার গড়িয়াহাট-নিবাসী বন্ধু কুমার ও নালন্দার ছেলের নাম দিয়েছি কুণাল, বাপ-মায়ের নামের আদ্যক্ষর জুড়ে।

কুণাল ও মালবীর যদি বিয়ে হয়, ওদের মেয়ের নাম রাখব ঃ বীণা।

পূর্ব বাংলার লোকসংগীত

গত ৮ নভেম্বর সংখ্যায় শচীন্দ্র চৌধুরী আমার সম্পাদনায় সম্প্রতি প্রকাশিত 'পূর্ব বাংলার লোকসংগীত' সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় শার্ঙ্গদেবের প্রশংসায় আপত্তি প্রকাশ করেছেন। সেই সূত্রে গ্রন্থটির অনেকগুলি ত্রুটি নির্দেশ করে তিনি লোকসংগীতের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগের পরিচয় দিয়েছেন বলে তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। তবে তাঁর ভ্রান্ত মন্তব্যগুলি ব্যক্তিগত জ্ঞান থেকে উৎসারিত। তাই পূর্ব বাংলার লোক-সংগীত সম্পর্কে সেগুলি গুণী ও বিশেষজ্ঞ-দের আলোচনাবিরোধী ও পাঠকদের ধারণাকে বিভ্রান্ত করতে পারে বলে এই ক্ষুদ্র পত্র দিচ্ছি।

(১) প্রভাতী গান ও কুঞ্জের গান—'কুঞ্জ' শব্দ ব্যবহার দেখেই পত্রলেখকের প্রভাতী গানকে কুঞ্জের গান বলে মনে হয়েছে। প্রভাতী কালনির্দেশক শব্দ, কুঞ্জ বিষয় নির্দেশক শব্দ। তিনি নিজেই লিখেছেন, কুঞ্জের গান সাধারণত মধ্যরাত্র হতে শেষরাত্র পর্যন্ত গাওয়া হয়। তার বিষয় কুঞ্জভঙ্গ হতে পারে কিনা লোকসংগীত সম্পর্কে যে-কোনো গ্রন্থ পড়লেই তিনি জানতে পারবেন। 'রাই জাগো রাই জাগো/প্রভাতকালে রাধায় বলে ও/শ্যাম বুঝি মোর কুঞ্জে এলো না'। গানগুলি কুঞ্জ বিষয়ক কিন্তু এগুলি প্রভাতী কিনা, বাংলা দেশের পথের মানুষও তা জানে। শ্রীহট্ট জেলায় ঝুলনযাত্রার অনুষ্ঠান সীমাবদ্ধ—সেই উপলক্ষে কোনও গানও বিশেষভাবে নির্ধারিত নেই। আর শ্রীহট্টে রামলীলা? সেই রামলীলায় কুঞ্জের গান গাওয়া হয়? এই অপূর্ব তথ্য জানি না বলে সত্যিই দুঃখিত।

(২) গোষ্ঠ শব্দটি গানে গোঠে হয়েছে কেন, ভাষাবিজ্ঞানীরা তার উত্তর দিতে পারবেন। তবে আমার সংগ্রহে পূর্ব বাংলার বহু গানেই শব্দটি আছে।

(৩) বিচ্ছেদ পর্যায়ের 'বিশখে শ্যাম শোকেতে আমারই মরণ' আমি পরিবর্তিত করিনি, সম্ভবত পত্রলেখক এর বিকৃত পাঠান্তর কোনো নাগরিক গায়কের কাছ থেকে সংগ্রহ করে পাঠ মেলাতে গিয়ে বিভ্রান্ত হয়েছেন। আমি যখন রচয়িতা রাধারমণ দত্তের উল্লেখ করেছি, তখন স্বাভাবিক যে, আমার সংগ্রহসূত্র যথাযথ।

(৪) নিমাই সন্ন্যাস 'সন্ন্যাসী বানাইল তোরে কে' গানটিও গ্রামাঞ্চল থেকে সংগৃহীত। পত্রলেখক এখানকার কোনো গায়কের মুখে তার অন্য পাঠ শুনেছেন। লোকসংগীত তো রবীন্দ্রসংগীত নয়—অশিক্ষিত গায়কের মুখে মুখে তা স্বাভাবিক কারণেই বিকার লাভ করে। এই তো লোকসংগীতের মূল সংজ্ঞা—এ কথা কি স্মরণ করিয়ে দিতে হবে? শ্রদ্ধেয় সুরেন চক্রবর্তীর কণ্ঠে শ্রুত গানটির সঙ্গে আলোচ্য সংকলনের গানটির মৌলিক কোনো পার্থক্য তো নেই। যেটুকু অদলবদল তা সংগ্রহস্থান পরিবর্তনের জন্য প্রাকৃতিক কারণেই হয়েছে।

(৫) ভাটিয়ালী একটি সুররূপে তা ব্যাপকভাবে পূর্ব বাংলার সর্ব শ্রেণীর গানকে প্রভাবিত করেছে—ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্যের আলোচনা থেকে এই শিক্ষা পেয়েছি। ভাটিয়ালিতে বিচ্ছেদও আছে, বৈরাগ্যও আছে। নৌকা, নদী, মাঝি প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার না থাকলে তা ভাটিয়ালী হয় না এমন আবিষ্কার তিনি কেমন করে করলেন? এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞের মতামত জানলে তিনি উপকৃত হতেন।

(৬) সারি গানে কোনো জমিদার পরিবারের গুণকীর্তন করা হয়েছে বলে পত্রলেখক উষ্মা প্রকাশ করেছেন। উদ্দেশ্য প্রশস্তি সারি গানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আর এ গানের যে বক্তব্য তাও আজ ইতিহাসের সামগ্রী লোকসংগীতে ফসিল হয়ে আছে। তাতে সামন্ততন্ত্রের ইঙ্গিত পেয়ে তিনি আঁতকে উঠলে তো ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হবে।

(৭) জল ভরার একটি গান প্রসঙ্গে পত্রলেখক বলছেন, তিনি এটিকে রাজমিস্ত্রীদের মুখে শুনেছেন। অতএব এটি ছাদ পেটানো গান। আবার টুইন কোম্পানীর রেকর্ডে তিনি শুনেছেন বলে জানিয়েছেন। তা হলে কি রাজমিস্ত্রীরা টুইন কোম্পানীর রেক

থেকে গানটি শিখেছিল? লোকগীতি গ্রামের মাটি থেকে উঠে আসে, শহরের ছাদে জন্মায় না। ছাদ-পেটানো মিস্ত্রীরা লঘু বিষয়ের গানই তাদের কর্মোদ্দীপনার জন্য গেয়ে থাকে।

(৮) পূর্ব বাংলার ধামাইল গান ও নাচের সঙ্গে লোচন দাসের ধামালি বা পশ্চিম বাংলার কৃষ্ণধামালির কোনো সম্পর্ক নেই; এ কথা সংগীতের ছাত্র মাত্রই জানেন। পত্রলেখক নিজেই তা স্বীকার করেছেন। ধামাইল গান ও নৃত্য শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলার একান্ত নিজস্ব সম্পদ। এর কোনো আদিম উৎস অনুমেয়। গানটির বিষয় সম্পর্কে পত্রলেখকের আপত্তির কারণ ব্যাখ্যাত হয়নি। নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাওয়া রেকর্ডের কথা যে বদলে গেছে, সেটা গানটির রচয়িতা রাধারমণ দত্তেরই দুর্ভাগ্য। আমি মূল রচনাই রক্ষা করেছি।

শুধু রাধারমণ বিরচিত ঐ গানটিই নয়, এমন অনেকগুলি গান আছে, যে গানগুলি বিভিন্ন লোকসংগীতশিল্পী মাধ্যমে বেতার প্রচারে আমার প্রয়াস যুক্ত আছে। এবং গানগুলির স্বকীয়তা সম্পর্কে আমি নিঃসন্দেহ। বেতারে বহুল প্রচারের ফলে বহু গানের রূপান্তর আমার শ্রুতিগোচর হয়েছে। তেমন কিছু কিছু রূপান্তরিত গান (কথা ও সুরের) গ্রামোফোন রেকর্ডেও পরিবেশিত হয়েছে। ট্রাডিশনাল গানের কথা অন্যের নামে চালানোর অপচেষ্টার নজিরও আছে। এখন লোকসংগীত-রসিকেরাই বিচার করবেন, গ্রামোফোন কোম্পানীর গানই অকৃত্রিম, নাকি সংকলকের ভূমিকা?

(৯) আরতি করে গিরিরানীকে নগর-কীর্তনের গান বলা হয়েছে। গানটির কথা-গুলি পাঠ করলে এই উক্তি হাস্যকর মনে হয়। এর রচয়িতা প্রমোদচন্দ্র পুরকায়স্থ—এই তথ্য তিনি কোথায় পেলেন? "এই গান শ্রীহট্টের ভাটি অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই ধরনের গান লোকগীতির পর্যায়ে আসে না।"

দুর্গাপূজায় দেবীবন্দনায় আরতির গান, যা বাংলার লোকজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত, পুরুষ-পরম্পরায় প্রচলিত—তাকে লোকগীতি বলা যাবে না ভেবে প্রশংসা না করে উপায় নেই।

(১০) পত্রলেখক বাইদ্যার গান সম্পর্কে বলেছেন, "পূর্ববঙ্গের বাইদ্যা বা বেদেরা প্রতি বৎসর মুন্সীগঞ্জ হতে নৌকাযোগে ভাটি অঞ্চলে আসে।"

যাযাবর বেদেরা মুন্সীগঞ্জেই স্থায়ীভাবে বাস করে—সম্ভবত এই বৈপ্লবিক তথ্যে অনেকেই চমকে উঠবেন। "এদের গানের সুর ও কথা সাধারণ লোকগীতি থেকে অনেক তফাত।" কিন্তু কেন তা বলেননি! লোকগীতিতে বৈচিত্র্য আছে বলেই তো সেই জাতের গানও আলোচ্য সংকলনে সংগৃহীত হয়েছে।

(১১) কাশীনাথ যোগীর বাউল সম্প্রদায়ের গানকে ত্রিনাথের গান বলে নির্দেশ করা অজ্ঞতা মাত্র। ত্রিনাথের গান যে-কোনো উপলক্ষেই গাইবার রীতি আছে। অনেকের সমাবেশে আসর করে গাওয়া হয় বলেই তা আসরগীতি।

(১২) গুরু তোরে কি ধন দিল গানটি গোপাল নন্দী মহাশয়ের রচিত জেনে সুখী হলাম। গানটি যেখান থেকে সংগৃহীত সেখানকার গায়ক কবির নাম জানতেন না। আর ভণিতায় কোনো নামের উল্লেখ না থাকায় ভূমিকায় স্বীকৃতিদান সম্ভব হয়নি।

(১৩) তত্ত্ব মানেই কি দেহতত্ত্ব? রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বনাটা মানেই কি দেহতত্ত্বের নাটক? জন্মমৃত্যুবিবাহকে কেন্দ্র করে লোকগীতির কবি যে লোকায়ত দর্শন গড়ে তুলেছেন তার ইঙ্গিত দেওয়ার জন্যই উক্ত তিন ধরনের গান এই পর্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে।

(১৪) পরিশেষে পূর্ব বাংলার লোক-সংগীত গ্রন্থে কেবল শ্রীহট্ট অঞ্চলের গানই পত্রলেখক লক্ষ করেছেন। কিন্তু তিনি নিজেই দেখেছেন মুন্সীগঞ্জ থেকে সংগৃহীত বেদের গান, ময়মনসিংহের দীন শরতের গান, কুষ্টিয়ার লালন ফকিরের গান, ঢাকার মুর্শিদ্যা এতে আছে। বোধ করি শ্রীহট্ট কথাটি অসতর্কভাবেই তিনি লিখে ফেলেছেন।

তবে পূর্ব বাংলার বিপুল সংগীত-সম্পদের তুলনায় এই গ্রন্থে সংগৃহীত গান নিতান্তই সামান্য, এ সত্য সংকলকেরও জানা আছে। সেইজন্য প্রয়োজন আরও উদ্যম ও গবেষকের। আমি তারই দীন সূচনা করেছি মাত্র।

দিনেন্দ্র চৌধুরী
কলকাতা-৬

[এপ্রসঙ্গে আর কোনো বাদানুবাদ প্রকাশিত হবে না]

ধানের নাম লক্ষ্মী

শ্রদ্ধেয় আবদুল জব্বার মহাশয়ের "ধানের নাম লক্ষ্মী" প্রবন্ধের আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীরজতকুমার পাঞ্জা মহাশয় যা বলেছেন (দেশ ৮ই নভেম্বর) সে সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন মনে করছি।—

(১) বাংলাদেশে এত বেশী জাতের ধান বিভিন্ন জেলায় চাষ হয়ে আসছে যে ধান দেখেই তার নাম বা পরিচয় বলে ফেলার কাজটিকে খুবই কঠিন মনে হয়।

গ্রাম বাংলার একজন চাষীর সঙ্গে ধানের আবাল্য যে যোগ গ্রাম বাংলার একজন স্কুল-কলেজে পড়া ছাত্রের সঙ্গে তা অনেকটা ক্ষীণ। একান্তভাবেই কৃষি উপ-জীবিকার জন্য আমাদের দেশে স্কুল-কলেজের শিক্ষার এখনো ব্যবস্থা হয়নি; বিভিন্ন জাতের ধান চেনার বিষয়টি অবশ্য-

শিক্ষণীয় হিসাবে শেখানো হয় না। কাজেই পাসকরা এগ্রিকালচারিস্ট যে একজন চাষীর মত বিভিন্ন জাতের ধানের বিষয় বলতে পারবেন না, এটা স্বাভাবিক নয় কি? এটা সত্যি নয় কি যে একমাত্র ধানের বিষয় ছাড়াও একজন এগ্রিকালচারিস্টকে অনেক-কিছু পড়তে ও জানতে হয়েছে? একমাত্র ধানের বিষয় নিয়েই তাঁর সময় ও শ্রম নিয়োজিত হয় না?

(২) ধান সম্বন্ধে বাংলার গ্রামের একজন চাষীকে শ্রীপাঞ্জা কিভাবে 'অশিক্ষিত' মনে করেন তা বুঝতে পারছি না।

(৩) "অবলীলাক্রমে বাতলেও দিতে পারেন কোন জমিতে কোন ধান ভাল জন্মাবে"—এবিষয়ে লেখকের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। তবে এ প্রসঙ্গে ডাক্তারি পাশ করার পর নাপিতের অস্ত্রোপচারের হার কমে আসার গল্প মনে পড়ে।

পাসকরা এগ্রিকালচারিস্ট 'অবলীলাক্রমে' যে বলতে পারবেন না তার কারণ হতে পারে তাঁর যথেষ্ট অভিজ্ঞতার অভাব এবং/অথবা কৃষিকে তিনি কৃষি-বিজ্ঞান হিসাবে বোঝার কিছুটা জ্ঞান লাভ করেছেন।

(৪) বিজ্ঞানের সাফল্যে দেশ বা বিদেশ বলে নিশ্চয় কিছু নেই। একদেশের একটি শস্য বা তার চাষ পদ্ধতি বিদেশে অনুরূপ বা ততোধিক সাফল্য যে আনতে পারে, এ বিশ্বাস ও প্রমাণ আছে। অনুসন্ধিৎসা ও চেষ্টার মাধ্যমে চাষ-পদ্ধতির পরিবর্তন হয়ে আসছে। বলা বাহুল্য, বিভিন্ন চাষ-পদ্ধতির চেষ্টা যত হবে, তুলনামূলক সুবিধা-অসুবিধাগুলোর সঙ্গেও আমরা তত বেশী পরিচিত হব এবং সেরা পদ্ধতিটি জানা যাবে।

'হম্বিতম্বি-করা পাস করা বাবুরা বলতে শ্রীপাঞ্জা যদি চাকুরিজীবি সাধারণ কৃষি-কর্মীদের কথা বোঝাতে চান তবে বলতে চাই যে এই 'হম্বিতম্বি' তাঁরা নিজেরা স্বেচ্ছায় সব ক্ষেত্রে করেন না; তাঁদের উপরে অনেক বিজ্ঞানী রয়েছেন—তাঁদের পর্যবেক্ষণ ও ফলের উপর নির্ভর করেই এই 'হম্বিতম্বি'র নির্দেশ আসে এবং এই 'হম্বিতম্বি' মাঝে মাঝে স্থায়ী ফল দিতে কার্পণ্য করে না। তবে এই 'হম্বিতম্বি' যে সব ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ সার্থক হবে এটা নিশ্চয় আশা করা যায় না।

দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি বিচার করে 'হম্বিতম্বি'র কারণ শ্রীপাঞ্জাকে কিঞ্চিৎ অনুভব করতে অনুরোধ জানাই।

(৫) শহুরে লালবাড়ির কর্তারা প্রকৃত চাষী নন। স্বাভাবিকভাবেই চাষে অদূর-দর্শিতার পরিচয় তাঁদের কিছুটা থাকবেই, যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রকৃত চাষী লালবাড়িতে বসে কৃষিকার্যের তদারক করছেন। বলা বাহুল্য, এমন লোক যতশীঘ্র বেশীসংখ্যক কৃষিকাজ পরিচালনায় আসবেন ততই দেশের মঙ্গল।

পরিশেষে বলতে চাই যে, এই লাল-বাড়ির কর্তারা শহুরে হলেও সবাই নিশ্চয় একান্তভাবে শহর-বাসী নন; গ্রামবাংলার অনেকে নিশ্চয় শহরের লালবাড়িতে বসে কাজ করছেন। কাজেই লালবাড়ির কর্তাদের এবং অন্যান্য এগ্রিকালচারিস্টদের প্রতি উপেক্ষা বা অসহযোগী মনোভাব অপেক্ষা সহানুভূতি ও সহায়তা বেশী কাজে আসবে।

অমলকৃষ্ণ রায়
নদীয়া

গ্রন্থ সমালোচনা

গত ১লা কার্তিক শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যো-পাধ্যায় লিখিত রাগ-অভিজ্ঞান গ্রন্থটির যে সমালোচনা আপনার বহুল প্রচারিত "দেশ পত্রিকায়" প্রকাশিত হয়েছে তা' গ্রন্থটির মূল বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে যথাযোগ্য হয়নি বলে আমার মনে হয়েছে। বহু চিন্তা ও জ্ঞানলব্ধ এই পুস্তকের মধ্যে একটি উদ্ধৃতির সামান্য ত্রুটি উল্লেখ করে যে ভাষায় লেখকের উপর মন্তব্য করা হয়েছে, এবং "এই ধরনের বহু ভ্রান্ত উক্তি গ্রন্থের নানা স্থানেই ছড়িয়ে রয়েছে" এইরূপ উক্তি করে সামগ্রিকভাবে এই সঙ্গীত-পুস্তকটির যে মর্যাদাহানি করা হয়েছে তা' করার কোন প্রয়োজনই ছিল না।

রাগ-অভিজ্ঞান গ্রন্থটি গভীর মনোনি-বেশ সহকারে পাঠ করে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তাতে নিঃসংকোচে বলতে পারি শাস্ত্রীয়-সঙ্গীতের সত্য সংরক্ষণের এবং সঙ্গীতের বিবিধ তত্ত্ব বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই গ্রন্থটি মূল্যবান।

পঞ্চানন দে
কলিকাতা—১২

গানের আসর

গত ১৫ই কার্তিক, ১৩৭৬ (১-১১-৬৯ ইং) তারিখের দেশ পত্রিকায় শার্ঙ্গদেবের "গানের আসর" পর্যায়ে এক দেশীয় রাজ্যের উল্লেখ দেখে আমার এই চিঠি লেখার সাহস পেলাম। অনধিকার চর্চা হলে শার্ঙ্গদেব নিজগুণে সেটা মার্জনা করবেন।

গান-বাজনায় আমি পারদর্শী নই। কিন্তু উপরোল্লিখিত দেশীয় রাজ্যের যে আবহাওয়ায় শার্ঙ্গদেব মানুষ হয়েছেন সেটা ত্রিপুরা রাজ্য এবং তার রাজধানী আগর-তলার উল্লেখ যদিও তিনি করেন নি তবু সেটা বুঝে নিতে এ রাজ্যের সংস্কৃতি সম্পর্কে সামান্য সচেতন কারো পক্ষে অসু-বিধে হওয়ার কথা নয়। এই আগরতলার বর্তমান গান-বাজনার সম্পর্কেই দুয়েকটা কথা বলতে চাই।

এখানে আজ বছর দুয়েক যাবত আকাশবাণীর একটি কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। বিকাল ৫টা থেকে রাত ১০॥টা পর্যন্ত আগরতলা বেতারকেন্দ্র চালু থাকলেও তার আসল কাজ হল কলকাতা-দিল্লী-গৌহাটি কেন্দ্রের অনুষ্ঠান প্রচার করা। সন্ধ্যে ৭টা থেকে ৭॥টা পর্যন্ত থাকে আগরতলা কেন্দ্রের নিজস্ব অনুষ্ঠান "কৃষিকথার আসর"। ওই আসরে মিনিট পনর সময় দেওয়া হয় স্থানীয় শিল্পীদের জন্যে যাতে তাঁরা লোকগীতি, শ্যামাসঙ্গীত, এবং কীর্তনই মাত্র গাইতে পারেন। আমার অনুরোধ শার্ঙ্গদেব আকাশবাণীর আগর-তলা কেন্দ্রের এই নিজস্ব অনুষ্ঠান (মিঃ ওয়েভ ২৩৬ মিটারে) একটু ধৈর্য ধরে শুনতে চেষ্টা করবেন। এই আগরতলাতেই শার্ঙ্গদেবের গান শেখার হাতেখড়ি হয়েছিল এবং এখানে তিনি এমন মধুর এসরাজবাদন শুনেছিলেন যা আর শোনেননি—এ সমস্তই তিনি ভুলে যাবেন আকাশবাণীর আগরতলা কেন্দ্রের বর্তমান স্থানীয় শিল্পীদের দুয়েকজন বাদে আর অন্যদের গাওয়া লোক-গীতি, শ্যামাসঙ্গীত আর কীর্তন শুনলে। সঙ্গীত পরিবেশনের নামে আকাশবাণীর আগরতলা কেন্দ্রের ছেলে খেলার বিরুদ্ধে স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় যথেষ্ট প্রতিবাদ করা হয়েছে। কিন্তু সবই আমলাতান্ত্রিক নিষ্পৃহতার দেওয়ালে মাথা খুঁড়ে মরছে। কোন কাজ হয়নি।

শার্ঙ্গদেবের লেখনী আকাশবাণীর কল-কাতা কেন্দ্রের অনুষ্ঠানগুলোকে ঠিক পথে চালিত করার ব্যাপারে অনেক সাহায্য করেছে। আগরতলার কথা-ও তিনি এখনো ভুলে যাননি? আগরতলার গান-বাজনার সেই পুরাতন পরিবেশ আর মান হয়ত ফিরবে না, কিন্তু বর্তমান নিদারুণ পরি-স্থিতির হাত থেকে আমরা হয়ত একটু রেহাই পেতে পারি।

প্রতুল মজুমদার
কৃষ্ণনগর, আগরতলা।

পুনঃ—অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটা ব্যাপার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। এখানকার রাজবাড়ির যে পুজো দুর্গামণ্ডপ ('দুর্গাবাড়ি' নামে পরিচিত) হত বলে শার্ঙ্গদেব লিখেছেন তা এখনো হয় এবং এর বিশেষত্ব হল দশ হাতের পরিবর্তে দেবীর মাত্র দুহাত গড়া হয়। অন্যান্য মূর্তিগুলো যথারীতি গড়ে থাকে। কিংবদন্তী কোন এক রাণী নাকি দেবীর দশ হাত দেখে ভয় পেয়ে মারা যান এবং তারপর থেকেই দুহাত গড়া হয়ে আসছে।

সাম্প্রতিক ইংরেজি ছোটগল্প

[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়

সাম্প্রতিক ইংরেজি ছোটগল্পের বাজার মন্দা, এ অভিযোগ গল্পকারেরা অনেকেই করে থাকেন। 'লণ্ডন ম্যাগাজিনে' ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত ছোটগল্পের যে সংকলন বার হয়েছিল, তাতে প্রবীণ লেখক ভি এস প্রিচেট্ বলেছেন, ছোটগল্প রচনার জন্যে ইংল্যাণ্ডে যে টাকা পাওয়া যায়, তা স্বল্প এবং লজ্জাকর। খ্যাতিমান লেখকেরাও একটি ভাল গল্পের জন্যে কয়েক মাস ব্যয় করেও গোটা ষাটেক পাউণ্ডের বেশী কিছুতেই আশা করতে পারেন না। সাত হাজার শব্দের বেশী হলে গল্প ছাপানো শক্ত হয়ে পড়ে, দশ হাজার শব্দের বেশী হলে ছাপানো একেবারে অসম্ভব। উক্ত সংকলনে উইলিয়াম স্যান্‌সাম্ বলেছেন, আর্থিক দিক থেকে শুধু ছোটগল্প রচনা প্রায় নিরর্থক: তবে অন্যান্য রচনার ফাঁকে ফাঁকে ছোটগল্প রচনা চলতে পারে। এবং সর্বশেষে ফ্রান্সিস কিং-এর হতাশা-ভরা উক্তি : কেউ ছোটগল্প পড়ে না, কেনার প্রশ্ন তো ওঠেই না; ছোটগল্প রচনা করে কেউ অর্থোপার্জন করেন না। নবীন লেখকেরা নাকি সকলেই এই কঠোর সত্যটি উপলব্ধি করেছেন।

তবে এ'রা সকলেই প্রাচুর্যপূর্ণ পাশ্চাত্ত্য জীবনযাত্রার মানদণ্ডেই ছোটগল্পের বাজার যাচাই করছিলেন। নতুন ফ্রান্সিস কিং যে বলেছেন, এখনও কোন কোন মাসিক পত্রিকায় বা ছোটগল্পের কোন বিশেষ সংকলনে অথবা পেপার-ব্যাকের পাঁচ-মিশালী সংকলনে একটি ভালো ছোট-গল্পের জন্যে কুড়ি থেকে এক শো গিনি পর্যন্ত পাওয়া যায়, তা প্রিচেট্-উল্লিখিত ষাট পাউণ্ডের মাত্রা অতিক্রম করে যাচ্ছে। আর আমাদের দেশের পত্র-পত্রিকার দক্ষিণার মাত্রাকেও বহুগুণ পেছনে ফেলে গেছে।

সাম্প্রতিক পত্রিকাগুলির মধ্যে "দা আরগসি"তে কেবলমাত্র ছোটগল্পই ছাপা হয়। এ ছাড়া "স্যাটার্ডে ইভনিং পোস্ট", "লণ্ডন ম্যাগাজিন", "লেডিজ্ হোম জার্নাল", "হার্পার্স বাজার", "দা রিপোর্টার", "উওম্যানস মিরার", "এরিনা", "হরাইজন্", "দা লিসনার", "এভরি উওম্যান", "লিলিপুট", "সাসপেনস্" ইত্যাদি পত্রিকায় ছোটগল্প নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে থাকে। উইলিয়াম স্যানসাম পর্যন্ত এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, আজকের ছোটগল্প প্রকাশের পথগুলি সংখ্যায় সীমাবদ্ধ হলেও বৈচিত্র্যপূর্ণ। পত্র-পত্রিকা ছাড়াও ছোট-গল্পের বিশেষ সংস্করণ, পেপার-ব্যাক সংস্করণ এবং সর্বশেষে টেলিভিশনে নাট্য-রূপের সম্ভাবনা ত রয়েছেই, তার উপর ভালো গল্প হলে ইংল্যাণ্ডে এবং আমেরিকার তা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকাভুক্ত হওয়া সম্ভব এবং অন্য ভাষায় অনুবাদ হওয়াও বিচিত্র নয়।

ছোটগল্পের আঙ্গিক যে অত্যন্ত গুরুত্ব-পূর্ণ, এ কথা সাহিত্যরসিক মাত্রেই স্বীকার করবেন। কবিতার মত ছোটগল্পেরও পরিসর সীমাবদ্ধ—এই কারণে গল্পকারকে কবির মত আঙ্গিকের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয়। ভাষা ব্যবহারেও মুন্সিয়ানার প্রয়োজন রয়েছে—ঢিলেমির অবকাশ কম। উইলিয়াম স্যানসাম্ বলেছেন, কবিতার মত ছোট-গল্পও শুরু থেকেই দৃশ্যমান একটা পটের মত চোখের সামনে টাঙানো হয়ে যায়। ছোটগল্প, তাঁর মতে, এক নিশ্বাসে লিখে ফেলবার মত। পরে মাজা-ঘষার প্রয়োজন থাকতে পারে। তাতে লাভ বই ক্ষতি নেই। কিন্তু মূল কাঠামোটা ভেবেচিন্তে ঢিলে-ঢালাভাবে লিখবার নয়। ফ্রান্সিস কিংও কবিতার সঙ্গে ছোটগল্পের তুলনা করেছেন: হাউস্‌ম্যান উদ্ধৃত করে বলেছেন, ছোটগল্প হ'ল স্বর্গের সঙ্গে মানুষের এক অপরূপ নিভৃত আলাপ। ফ্রান্সিস কিং ছোটগল্পে আঙ্গিকের প্রাধান্য উল্লেখ করেছেন এবং একটিমাত্র ভুল কবিতার মত ছোটগল্পও যে পণ্ড হতে পারে, সে-কথার উপর জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে, কবিতা এবং ছোটগল্প, দুই-ই ভেতরকার কোন খেয়ালী প্রেরণার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে—কখন তার দেখা মেলে এই ভরসায়। এই প্রেরণা হল, ক্যাথারিন ম্যানস্‌ফিল্ড যাকে বলেছেন, পর্দা ওঠার পূর্ব-মুহূর্তে দর্শকের হৃদয়ে যে অদ্ভুত নিঃশব্দতা নেমে আসে, তারই সমতুল্য। প্রিচেট্ কিন্তু ছোট-গল্পের আঙ্গিকের এই প্রাধান্যকে কিছুটা সন্দেহের চোখে দেখেন। তাঁর মতে, কিপলিং এবং মোপাসাঁর শেষ দিককার ছোটগল্প আঙ্গিক এবং ফর্মুলার উপর জোর দেওয়ায় কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাঁর মতে, আঙ্গিক নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে ছোটগল্পের বিষয়বস্তু ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। প্রকৃত প্রস্তাবে আঙ্গিকসমৃদ্ধ ছোটগল্পও যেমন ইংরেজিতে যথেষ্ট রচিত হচ্ছে, কেবল বিষয়বস্তুসর্বস্ব সাদামাঠা গল্পেরও তেমন [illegible] নেই। সাম্প্রতিক [illegible] ছোটগল্প-কারদের মধ্যে প্রিচেট্ শ্রীমতী মেরী লেভিনের নামোল্লেখ করেছেন, ফ্রান্সিস কিং উল্লেখ করেছেন এলিজাবেথ্ বাওয়েন, এলিজাবেথ্ টেইলার, উইলিয়াম স্যানসাম্ এবং অ্যাঙ্গাস উইলসনের কথা।

অ্যাঙ্গাস উইলসন ঔপন্যাসিক হিসেবে সমধিক পরিচিত হলেও তাঁর ছোটগল্পেও সমান মুন্সিয়ানার ছাপ রয়েছে। তাঁর তিনখানি গল্পগ্রন্থ—"দা রং সেট", "সাচ ডার্লিং ডোজেজ" এবং "এ বিট অফ দা ম্যাপ"—এর মধ্যে তৃতীয়টিই সর্বাধুনিক, উক্ত গ্রন্থের "এ বিট অব দা ম্যাপ", "এ ফ্ল্যাট কান্ট্রি ক্রিসমাস, মোর ফ্রেণ্ড দ্যান লজার" এবং "হায়ার স্ট্যাণ্ডার্ডস" গল্পগুলি উল্লেখযোগ্য। "সাচ ডার্লিং ডোজেজ" গ্রন্থের "রেক্স ইম্পেরাটর" "এ লিট্‌ল কম্প্যানিয়ন" এবং "মিস্টার সুপারিয়র" গল্পগুলির পরিবেশ রচনা আশ্চর্যভাবে বাংলা গল্পের পরিবেশকে মনে পড়িয়ে দেয়। সম্ভবত এর দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, গল্পগুলি আঙ্গিকপ্রধান নয়, বরঞ্চ গভীর মানবিকগুণে সমৃদ্ধ।

একই কথা জন ওয়েইনের রচনা সম্পর্কেও বলা চলে। তাঁর 'অ্যাক্স্‌ল অ্যাণ্ড আদার স্টোরিজ' নামক প্রথম গল্পগ্রন্থে প্রতিভার স্বাক্ষর থাকলেও ওটি তাঁর দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ "ডেথ অব দা হাইণ্ড লেগস অ্যাণ্ড আদার স্টোরিজ"-এর মত বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে, গভীর মানবীয়তায় এবং মনস্তাত্ত্বিক অন্তর্দৃষ্টিতে সমৃদ্ধ নয়। তাঁর "ম্যানহুড" গল্পটির পরিবেশ পুনরায় আমাদের সমাজকে মনে পড়িয়ে দেয়। মিস্টার উইলিসন নিজের দুর্বল কৈশোরের কথা স্মরণ করে সংকল্প করেছেন তাঁর ছেলে রথকে পালোয়ান করে গড়ে তুলবেন, তার জন্য নিত্য নূতন ব্যায়াম এবং কসরতের ব্যবস্থা করেন তিনি। শ্রীমান রথের এদিকে কোন আগ্রহই নেই। প্রতিবাদ করে যখন ফল হল না, তখন সে অগত্যা মিথ্যার আশ্রয় নিলে। বাবাকে বলল, সে স্কুলের বক্সিং টিমে স্থান পেয়েছে। দ্বিগুণ উৎসাহে বাবা তাকে কসরত করাতে লাগলেন; কিন্তু চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াই-এর দিনে রথ্ বলে বসল, তার পেটে ভীষণ ব্যথা। বাবা স্কুলে ফোন করে অবশেষে প্রকৃত তথ্য টের পেলেন—স্কুলে আসলে কোন বক্সিং টিমই নেই।

নূতন গল্পকারদের মধ্যে আইরিশ লেখিকা জুলিয়া ও-ফাওলাইন-এর গল্প আঙ্গিকের বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। আর ভারতবর্ষ থেকে শ্রীমতী রুথ প্রাওয়ার জভ্‌ভালার গল্প মাঝে মাঝেই পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়—যদিও তাঁর গল্পের মান শ্রীমতী ও-ফাওলাইনের গল্পের সঙ্গে তুলনীয় নয়।

ডি সি এম বিপ্লব এনে দিয়েছে

নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছেন না?
আবার দেখুন! ডি সি এম-এ ফ্যাশানের ছড়াছড়ি—
বর্ণবৈচিত্র্যের এক নতুন জগৎ, ডিজাইনের
এক নতুন পরিধি। ডি সি এম-এর ওয়াশ 'এন' ওয়্যার পপলিনের ওপর
প্রিন্ট এবং অপরূপ ট্রিকা ক্রবাইয়ার আয়োজন-সম্ভার তোলপাড়
ক'রে তুলেছে। এ আন্দোলনে আপনিও স্বচ্ছন্দচিত্তে যোগদান করুন।

স্টোরে যখনই যাবেন নতুন কিছু না কিছু অবশ্য পাবেন

Bensons/3637-Ben

জীবনানন্দ দাশের গল্প

শোনা যায়, জীবনানন্দ দাশ একবার টমাস হার্ডির বিপরীত ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন। অর্থাৎ টমাস হার্ডি যেমন গল্প-উপন্যাস লিখে খ্যাতির তুঙ্গে থাকার অবস্থায় হঠাৎ গদ্য লেখা ছেড়ে শুধু কবিতা লেখার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন সেই রকম জীবনানন্দও বাংলা দেশের একজন প্রখ্যাত সম্পাদককে একবার বলেছিলেন, আর কবিতা লিখে কোনো লাভ নেই, এবার থেকে আমি গল্প-উপন্যাস লিখবো। সেই ব্যবস্থা করুন!

বলাই বাহুল্য, জীবনানন্দ দাশ কবিতা লেখা ছাড়েন নি, মৃত্যুর আগে পর্যন্ত কবিতাই লিখেছেন, কবিতাই ছিল তাঁর [illegible]-নিদর্শন। কিন্তু তিনি এক সময়ে যে কয়েকটি গল্প ও অসমাপ্ত একটি বা দুটি উপন্যাসও যে লিখেছিলেন, সে কথা আমরা পরে জানতে পেরেছি। জীবনানন্দের উপন্যাস এখনো পর্যন্ত কোথাও ছাপা হয় নি—এ কথা কল্পনা করা যায়? জীবনানন্দের অপ্রকাশিত রচনার পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে তাঁর পারিবারিক মহলে একটা চাপা চাপা ভাব আছে, এ রকম কানাঘুষো শুনেছি। অথচ, এই রকম একজন কবির সৃষ্টির এক লাইন রচনাও জাতীয় সম্পদ হিসেবে গণ্য হওয়া উচিত। তাঁর পাণ্ডুলিপি অপ্রকাশিত রাখা বাংলার পাঠকদের প্রতি একটি দারুণ অবিচার বলে মনে করি।

জীবনানন্দ দাশের কয়েকটি গল্প এক সময় প্রকাশিত হয়েছিল সুনীলকুমার নন্দী সম্পাদিত 'অনুক্ত' পত্রিকায়। সম্প্রতি ঐ পত্রিকাতেই তাঁর একটি গল্প পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। গল্পটি পড়ার সময় আমার কি প্রতিক্রিয়া হয়েছে, অন্যান্য পাঠকদের জানাতে চাই।

গল্পের নাম 'গ্রাম ও শহরের গল্প'। সম্পাদকের নোটে জানা গেল, গল্পটি রচিত হয়েছিল তিরিশের যুগে। তবুও গল্পটি এখন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অটুট আগ্রহ নিয়ে পড়া যায়। অবশ্য, এই গল্পের লেখকের নাম জীবনানন্দ দাশ না হয়ে অন্য কিছু হলেও গল্পটি পড়তে ইচ্ছে করতো কিনা আমি জানি না, কারণ আমি তো সে পরীক্ষা করিনি, জীবনানন্দের গল্প হিসেবেই পড়েছি।

তবে এ কথা বলা যায়, গল্পটি অবিশ্বাস্য রকমের কাঁচা। যে-কোনো নতুন লেখকও গল্প লেখার সময় যে-কয়েকটি যুক্তি বা ধারাবাহিকতা মানে—জীবনানন্দ তাও মানেন নি, কিংবা জানতেন না। গল্পটিকে অস্পষ্ট ভাবে বলা যায় ত্রিভুজ প্রেমের। স্বামী, স্ত্রী ও স্ত্রীর প্রাক্তন প্রেমিক। তা হলে, গল্পের নাম 'গ্রাম ও শহরের গল্প' কেন? ব্যাপারটা এই, স্ত্রী অর্থাৎ শচী ছিল এক সময় বাংলাদেশের গ্রামে, সেইসব বাংলার পল্লী প্রকৃতি তার ভালো লাগতো, ঘুরে বেড়াতো "[illegible]মোহনার নদীর পাড়ে ভাঁট স্যাওড়া জিউলি ময়না কাঁটা, আলোকলতার জঙ্গলে" এবং তখন সে ভালোবাসতো সেখানকার সোমেনকে। তারপর তার সঙ্গে বিয়ে হয় প্রকাশের, প্রকাশ খুব বড় চাকরি করে, দারুণ সাহেব, দিল্লি-সিমলাতে বদলীর চাকরি তার সব সময় সাট টাই পরে লক্ষ্ণৌ, আমেদাবাদ, মীরাট, এলাহাবাদ—এসব ও রকম সব দারুণ জায়গা, কিন্তু কলকাতা সম্পর্কে সে নাক সিঁটকে কথা বলে।

সেই প্রকাশ বদলি হয়ে এসেছে কলকাতায়। শচী অবশ্য প্রকাশকে খুব ভালোবাসে, কোনো অভাব বোধ নেই তার, খুবই আধুনিকা মহিলা সে, বাড়িতে একা একা খেতে বসেও কাঁটা চামচ ব্যবহার করে (যদিও খাবার সময় কাসুন্দি না হলে তার চলে না!)। সোমেন প্রকাশেরও বন্ধু, একদিন পথে দেখা, দোকানে বসে হুইস্কি ও চিংড়ির বড়া খাওয়া হলো—প্রকাশ খেলো হুইস্কি, সোমেন বারোটা চিংড়ি খেলো—ল্যাজা সুদ্ধু!—তারপর প্রকাশ সোমেনকে বাড়িতে নিয়ে এলো।

এইখান থেকে গল্প আরম্ভ হচ্ছে। অবিশ্বাস্য ভাবে গল্পের আরম্ভ। প্রকাশ সোমেনকে নিয়ে স্ত্রীর কাছে এসেই বললো, কফি বানাও, তারপর সে পাশের ঘরে গিয়ে একা বসে বসে সিগারেট খেতে লাগলো। আর শচী বাজাতে লাগলো গানের রেকর্ড। ঘণ্টাখানেক বাদে প্রকাশ এসে ঠাণ্ডা কফি খেলো, এবং সোমেনকে বললো, অনেক রাত হলো, এবার বাড়ি যাও! পড়তে পড়তে আমি হাসি সামলাতে পারি নি। কি অপূর্ব গল্পের শুরু, শচী, প্রকাশ ও সোমেনের মধ্যে একটাও বাক্য বিনিময় হলো না প্রথম দু'পাতায়। সোমেন এলো, চুরুট খেলো, কফি খেলো, চলে গেল।

পরের দিন শচী বসে বসে আবার রেকর্ড বাজাচ্ছে, সোমেন এসে ঢুকলো। এবং স্টেটসম্যানে শচীর একটা দু লাইন চিঠি বেরিয়েছিল সিন্ধি-গুজরাটীদের সঙ্গে বাঙালী মেয়েদের বিয়ে হওয়া উচিত কিনা এই বিষয়ে, সোমেন সেই প্রসঙ্গে দু চারটে কথা বলে রাগ করে চলে গেল। শচী তখন চিঠি লিখতে বসলো এক বান্ধবীকে।

যথারীতি সোমেন পরদিন আবার এলো, "যতখানি রাত করে এলে স্বামীদের ঘরে পাওয়া যায়" সেই সময়ে। তখনও অবশ্য স্বামী ঘরে নেই। আজ সোমেনের আসার একটা উদ্দেশ্য পাওয়া গেল। সে প্রকাশের অফিসে একটা চাকরি চায়—তাও মোটে ষাট টাকা মাইনে। (প্রকাশ মাইনে পায় হাজার টাকার বেশী, সেই যুগে) শচী মর্মাহত, প্রাক্তন প্রেমিকের একি পরিণতি! এমন সময় প্রকাশ বাড়ি ফিরে সোমেনকে বললো, "বেডরুমে নয়—চলো ড্রয়িংরুমে গিয়ে কথা বলি!"

প্রকাশ অনেক চেষ্টা করেও সোমেনকে তার অফিসে চাকরিতে ঢোকাতে পারলো না, এ জন্য খুব আফসোস তার। এই সময় আমরা জানতে পারছি, সোমেন গ্রামের ছেলে হলেও নেহাৎ ফেলনা-ফেলনা নয়, প্রকাশের চেয়ে সে পড়াশুনোয় ভালো ছাত্র ছিল, এক সময় বাংলা খবরের কাগজে চাকরি নিয়েছিল এই তার দোষ, এবং একটি বার মাত্র উল্লেখ আছে, সোমেন কবিতা লেখে। (সোমেনের প্রতি লেখকের সহানুভূতি বড় প্রখর। আমি অনেক বার লক্ষ্য করেছি, কবিরা যখন গল্প-উপন্যাস লেখেন, তখন সাধারণত ব্যর্থ প্রেমিকের চরিত্রের সঙ্গে তাদের খুব আইডেন্টিফাই করা যায়।) সোমেনের আর একটা পরিচয় আছে, সে বাউণ্ডুলে!

সোমেন চাকরি পায় নি, শচী তাকে পাত্তা দেয় নি, অনেক দিন সে শুধু এসে চুরুট টেনে চলে গেছে, তা বলে সে ছেড়ে দেবে নাকি? একদিন সে আবার হঠাৎ এসে ঢুকলো শচীর ঘরে দুপুরে। শচী তখন সেলাই কল নিয়ে ব্যস্ত, অনবরত চাকা ঘুরিয়ে যাচ্ছে। আজ সোমেনকে [illegible] খুব ম্লান। মফস্বলের বউদের ন্যাকড়াপনা তার সহ্য হয় না—তা হলে [illegible] যাবে

কোথায়? রেকর্ড বাজানোও তার ঘোরতর অপছন্দ। প্রকাশ ও শচীর সুখী জীবনের প্রতি সে অবজ্ঞা জানায়। কথায় কথায় ওঠে সেই পাড়াগাঁর কথা, জেগে ওঠে রূপসী বাংলা, শচী উতলা হয়ে ওঠে। সোমেন তীব্র ভাষায় তাকে জানিয়ে দেয়, সেখানে শচীর আর ফেরার উপায় নেই। তাজমহল দেখতে যাবার মত, সেখানে গেলে হয়তো কিছুক্ষণের জন্য বিহ্বল হয়ে পড়বে, কিন্তু পরের দিনই আবার ফিরে ফিরে আসতে হবে বারো-চোদ্দ বছরের এপারে।

কিন্তু শচী আবার সেই শচী হতে চায়, সোমেনের কাছ আজ সে সব দিতে প্রস্তুত। কিন্তু সোমেন তা নেবে কেন! "এই সোফার ওপর? বকমোহনার নদীর ধারে যা একদিন হয়েছিল বন জঙ্গলের আবছায়ায় নক্ষত্রের নিচে জলের গন্ধের কাছে!" সোমেন তৎক্ষণাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

আমি ইচ্ছে করেই গল্পটাকে একটু হালকাভাবে বর্ণনা করেছি। এবার এ কথা বলতে চাই, গল্প হিসেবে নয়, জীবনানন্দের কবিতা বা মনোভঙ্গি বোঝার জন্য এটি একটি অসাধারণ রচনা। এর ভাষা যুক্তিহীন রহস্যময়, তীব্র এবং লাইনে লাইনে কবির রচনা। ভাষার জন্যই গল্পটি বারবার পড়তে ইচ্ছে করে। আজকাল বহু লিট্‌ল্‌ ম্যাগাজিনে অনেকে এক ধরনের ধোঁয়াটে পারম্পর্যহীন ভাষায় গল্প লেখার চেষ্টা করছেন—তাঁরা পড়লে বুঝবেন, জীবনানন্দ এ ব্যাপারে তিরিশ বছর আগেই সবাইকে হারিয়ে দিয়েছেন। আমি এ গল্পের গল্পত্বে নয়—বর্ণনা ভঙ্গি ও ভাষা ব্যবহারে অভিভূত ও মুগ্ধ হয়েছি। সেই ভাষা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে পাতার পর পাতা লিখতে হয়। কলকাতার মধ্য রাত্রির বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন, "নক্ষত্রগুলোর মানে আছে এখন। কোথাও নদীর জলে এই তারাগুলোর ছবি; তার মানে?" দ্বিতীয়বার সোমেন এসে চলে যাবার পর (সোমেনের সামনে সে গ্রামোফোনে রেকর্ড চড়িয়েছিল শুধু, সোমেন বেরিয়ে যায় দরজা ধাক্কা দিয়ে) শচী জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলো সে হাওড়ার বাসে উঠছে। হাওড়ার বাসে ওঠা গল্পের পক্ষে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক, কিন্তু এর পরের লাইনটা—"তখন সে নিস্তার পেয়ে ফিরে এসে, ধীরে ধীরে দরজা বন্ধ করে দিল"। 'নিস্তার' শব্দটা এখানে কি অসম্ভব সুপ্রযুক্ত!

আর জায়গা নেই, গল্প থেকে আমি বিনা মন্তব্যে আর দুটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি: "বাস্তবিক পৃথিবীতে বোধসম্পন্ন মেয়েমানুষ এত কম—কিন্তু সে সব কথা আরেক সময় হবে।" এবং শচীর প্রতি লেখকের ভর্ৎসনা: কোনো ভ্যাগাবণ্ডকে তার ন্যায্য জায়গা দিতে পারে না মেয়েরা—যে কোনো ভ্যাগাবণ্ডের সঙ্গেই গুলিয়ে ফেলে..."।

সনাতন পাঠক

লোকসংস্কৃতি

বাংলার লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি। দুলাল চৌধুরী। লোকায়ত প্রকাশন, ১৪৮/৪৯ প্রিন্স আনোয়ার শা' রোড, কলকাতা-৪৫। ৬·০০ টাকা।

লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে মূলত তত্ত্বগত আলোচনাই দুলাল চৌধুরীর বর্তমান গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে। ভূমিকায় তিনি জানিয়েছেন: লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে বিশ্বে যে নতুন বৈজ্ঞানিক চিন্তা-চেতনার উন্মেষ ঘটেছে তার সঙ্গে তরুণ ছাত্র-ছাত্রী বন্ধুদের, যারা লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে উৎসাহী, অনুসন্ধিৎসু তাদের পরিচয় করিয়ে দেবার প্রাথমিক প্রয়াস এই গ্রন্থে করেছি।...এই গ্রন্থটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক বাংলা সাম্মানিক শ্রেণীর, স্নাতকোত্তর 'লোকসাহিত্য' বিশেষ পত্রের ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ছাত্র-ছাত্রীবন্ধুদের বিশেষ সহায়ক হবে বলে আমার বিশ্বাস।...জানি না গ্রন্থটি কোনও বিশেষ পাঠ্যসূচীর দিকে চোখ রেখে রচিত কিনা, কারণ স্বয়ংসম্পূর্ণ বিভিন্ন অধ্যায় গ্রন্থটির সামগ্রিকতাকে পরিস্ফুট করে তোলে নি। যেমন 'বাংলার লোকশিল্প' শীর্ষক অধ্যায়ে শ্রীচৌধুরী শুধুই মুখোশ নিয়ে আলোচনা করেছেন। আলোচনাটি তথ্য সমৃদ্ধ ও সরস সন্দেহ নেই, কিন্তু 'লোকশিল্প'-এর সম্পূর্ণ পরিচয় এর মধ্যে আশা করা অনুচিত। 'লোকসাহিত্য' পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-সমালোচনাও বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত বলে মনে হয়, যদিও স্বতন্ত্র নিবন্ধরূপে অধ্যায়টি মূল্যবান।

শ্রীচৌধুরীর উদ্দেশ্য যাই থাক, তাঁর পাণ্ডিত্য, পরিশ্রম ও রচনাভঙ্গি অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য। 'ফোকলোর ও ভারতীয় প্রতিশব্দ' পর্যায়ে তিনি বিশেষ প্রযত্নে প্রতিটি প্রতিশব্দের সীমাবদ্ধতা ও যাথার্থ অনুসন্ধান করে 'লোকায়ন' ও 'লোকযান' শব্দ দুটি নির্বাচন করেছেন। 'লোকায়নের স্বরূপ' নির্ণয়েও তিনি অনুরূপ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এক্ষেত্রে, তাঁর আলোচনা ঈষৎ গবেষণাধর্মী মনে হতে পারে, কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে এর প্রয়োজনীয়তাও অস্বীকার করা যায় না। 'বাংলার লোক-সাহিত্যে নারী' স্বল্পপরিসরে একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র। লোকসাহিত্যে সামাজিক পটভূমির পরিচয় কতটা লভ্য এ-সম্পর্কে প্রায় পুরোপুরি তাত্ত্বিক আলোচনা 'সমাজ জিজ্ঞাসা' নামক অধ্যায়। এই আলোচনাটিতে 'নির্বিশেষ' অংশ 'বিশেষ' অংশকে ছাপিয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে।

পরিশিষ্টে শ্রীচৌধুরী লোক সাহিত্য ও সংস্কৃতির যে-সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিভাজন করেছেন তা ছাত্রবন্ধু রূপে গ্রহণীয়। এই পর্যায়ের আলোচনায় 'পরিভাষা'গুলি বিশেষ মূল্যবান রূপে বিবেচিত হবে।

৩১৫/৬৯

অভিযান

কাঞ্চনজঙ্ঘার পথে। বিশ্বদেব বিশ্বাস। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা-৯। ৫·০০ টাকা।

পর্বত অভিযান সম্পর্কে ভারতবর্ষে নতুন উৎসাহ উদ্যম ও আগ্রহের সঞ্চার হয়েছে মাত্র বিগত দশকে। এভারেস্ট অভিযানের সাফল্যের অংশীদার রূপে ভারতের কৃতিত্ব স্বীকৃত হবার পরই পত্তন হয়েছে পর্বত অভিযান সম্পর্কে শিক্ষাদান কেন্দ্রের। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত হিমালয়ের বুকে

পড়েছে বহু নিঃশঙ্ক অভিযাত্রীর পদক্ষেপ। এভারেস্ট, নন্দাদেবী, নন্দাঘুণ্টি, নীলকণ্ঠ, নীলগিরি, কাবরুডোম, মানা, কামেট, ত্রিশূলো রাণ্টি প্রভৃতি আরোহণ বিশ্বের পর্বতারোহণ তথা হিমালয় অভিযানের ইতিহাসে এক একটি ল্যান্ডমার্ক বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এ-পর্যন্ত শিক্ষালয়ের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় ৪০টি অভিযান হয়েছে।' (ভূমিকা : লেখক)

শ্রীবিশ্বদেব বিশ্বাস দার্জিলিঙের হিমালয় মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের প্রথম দিকের ছাত্র। পঞ্চম কোর্সের ছাত্র রূপে ১৯৫৬ সালে তিনি পর্বত অভিযানশিক্ষা সমাপ্ত করেন। পরবর্তীকালে হিমালয়ের বিভিন্ন পর্বত অভিযানের সকল অভিযাত্রী ও অধিনায়কের সম্মান লাভ করেন। আলোচ্য গ্রন্থটি মূলত তাঁর শিক্ষার্থী জীবনেরই দিনলিপি। বলা-ই বাহুল্য গ্রন্থটির এই পরিচয় মুখ্য হতে পারে না। কারণ, ব্যক্তিগত দিনলিপি মাত্র হলে এ-গ্রন্থের সর্বজনীন আবেদন থাকার কথা নয়।

পর্বত আরোহণ শিক্ষার্থীর যে-দিনপঞ্জী শ্রীবিশ্বাস উপস্থাপন করেছেন তা নিঃসন্দেহে যে-কোনও রোমাঞ্চকর কাহিনীর থেকে কোনও অংশে ন্যূন নয়। বরং বাংলায় এই জাতীয় অভিজ্ঞতাপূর্ণ কাহিনী কমই আছে। কাঞ্চনজঙ্ঘার অভিযাত্রী রূপে তিনি তথাকথিত ভ্রমণকাহিনী (পরোক্ষে যা নিকৃষ্ট ধরনের উপন্যাস) ফেঁদে বসেন নি, এ-জন্য তাঁকে ধন্যবাদ। তরুণ পর্বতারোহীর জ্ঞাতব্য তথ্য যেমন এ-গ্রন্থে প্রচুর, সাধারণ পাঠকের জন্য সরস প্রাঞ্জল বর্ণনাও তেমনি অনায়াসে উপহার দিয়েছেন শ্রীবিশ্বাস। বস্তুত, সহজেই যা নীরস টেকনিক্যাল গাইড' হতে পারত, শ্রীবিশ্বাসের রচনার গুণে তা হয়নি। তাঁর অভিজ্ঞতা, অনুভূতি, উচ্ছ্বাস অকপটে পাঠকের চিত্তে সঞ্চারিত করে দিতে পেরেছেন তিনি। বইটি যাতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় সেদিকে যে তাঁর দৃষ্টি ছিল, 'কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযানের পূর্বে কথা তার প্রমাণ দেয়। স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর এ আশা নিশ্চয়ই পূর্ণ হবে : আমি বিশেষভাবে চাই যে, আমাদের দেশের ছেলেরা এবং মেয়েরাও আমাদের এই যুগযুগান্তের দুর্ধর্ষ সাথীদের পুঙ্খানুপুঙ্খে পরিচয় সংগ্রহ করুক এবং তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করুক। এর দ্বারা তারা যে শুধু শারীরিক শক্তি এবং তেজ লাভ করবে তাই নয়, জীবন সম্বন্ধেও বিস্তৃততর দৃষ্টিভঙ্গী অর্জন করবে।

পত্রিকা

পূর্ব ভারতী। সম্পাদক : বিভা বসু শাস্ত্রী। লাবান, শিলং ৪, আসাম। মূল্য ২·৫০।

শিলং থেকে বাঙলা ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকা এই প্রথম নয়। সদ্য-প্রকাশিত আলোচ্য পত্রিকাখানির বৈশিষ্ট্য আছে ভিন্ন দিক থেকে। পত্রিকাখানি সিরিয়াস ধরনের এবং এটা সদিচ্ছাপ্রণোদিত। কারণ এঁদের আদর্শ হচ্ছে 'পাঠককে তাঁর স্বদেশের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে উদ্বোধিত করা।' এবং এই আদর্শ রক্ষায় যে এঁরা সিরিয়াস, তার দৃষ্টান্ত এই প্রথম সংখ্যাখানিতেই যথেষ্ট পাওয়া যায়। প্রতিবেশী ভাষা, সাহিত্যও সংস্কৃতি প্রসঙ্গে, বিশেষ করে পূর্বাঞ্চলের সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ে পাঠকের আগ্রহ সৃষ্টি করার মতো মূল্যবান সুলিখিত প্রবন্ধাবলী পত্রিকাখানির সমাদর বাড়াবে। স্বাগত জানাবার মতো একটি মহৎ প্রচেষ্টা।

সংবর্ত—সম্পাদক, সৌমেন ভট্টাচার্য—৩।২৩ অশোক এভেনিউ, দুর্গাপুর-৪, বর্ধমান। দাম দু টাকা।

মহামতি লেনিনের শতবর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজতন্ত্র বিষয়ক ত্রৈমাসিক সংকলনের আলোচ্য সংখ্যাখানি লেনিন বিশেষ সংখ্যা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। লেনিনের সামগ্রিক জীবনালেখ্যই এই বিশেষ সংখ্যাখানির একমাত্র উপজীব্য। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তরুণ সান্যাল, অমিতাভ দাশগুপ্ত, অসীমকৃষ্ণ দত্ত, পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি লেখকগণের কবিতা, মুকুলেশ চট্টোপাধ্যায়ের গান, চিন্মোহন সেহানবিশ, টি এন সিদ্ধান্ত, প্রভাস সেন, রবীন্দ্র গুহ, সোমেন ঘোষ প্রভৃতির প্রবন্ধে লেনিনের জীবনেতিহাসের স্বল্পায়তন চিত্র সংশ্লিষ্ট পাঠকবর্গের চিত্তাকর্ষণে সমর্থ হবে। লেনিনের ছবি এবং স্কেচ সংখ্যাখানির অন্যতম আকর্ষণ।

বাণী বিতান—সম্পাদনায় রেখা নন্দী ও নবকুমার সরকার। ৩ মদনমোহনতলা স্ট্রীট, কলকাতা-৫। দাম ১·০০।

আলোচ্য সংখ্যাখানিতে আছে, কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, ছোট গল্প, নাটক। লেখকগণের মধ্যে আছেন—নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, নচিকেতা ভরদ্বাজ, ভবানী মুখোপাধ্যায়, রেখা নন্দী, চিত্তরঞ্জন রায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, নবকুমার সরকার প্রভৃতি।

উদ্বোধন—সম্পাদক স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৩। মূল্য ১·৫০ পয়সা।

গল্প, নাটক, নভেল ইত্যাদি বর্জিত লব্ধপ্রতিষ্ঠ পত্রিকার আলোচ্য শারদীয় সংখ্যাখানি ধর্মসংক্রান্ত বহু সুচিন্তিত প্রবন্ধ ও কবিতার সমন্বয়। প্রবন্ধ লেখকদের মধ্যে রয়েছেন স্বামী বীরেশ্বরানন্দ, স্বামী আদিনাথানন্দ, ডঃ অমিয়কুমার মজুমদার, ডঃ মুরলীমোহন চৌধুরী প্রভৃতি। কবিতা লিখেছেন শ্রীবনফুল, শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, শ্রীনবেন্দু দেব এবং আরও অনেকে। সংখ্যাখানি বেশ সুখপাঠ্য হয়েছে। প্রচ্ছদপট অনাড়ম্বর। প্রারম্ভে দেবী কন্যাকুমারির মূর্তি অনিন্দ্যসুন্দর।

চিত্রাঙ্গদা—সম্পাদক অজিতমোহন গুপ্ত। পত্রিকা সিন্ডিকেট, কলিকাতা। মূল্য ২·০০ টাকা।

আলোচ্য সংখ্যাখানি প্রবন্ধ, উপন্যাস, স্মৃতিকথা, কাহিনী, কাব্য কাহিনী, ভ্রমণ কাহিনী, একাঙ্কিকা, গল্প, কবিতা প্রভৃতি রচনাসম্ভারে সমৃদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ের লেখকগণের মধ্যে আছেন মনোজ মিত্র, নরেশচন্দ্র ঘোষ, সুনীলকুমার নাগ, মন্মথ রায়, পরেশ ভট্টাচার্য, বেলা দেবী, অচ্যুত গোস্বামী, গোপাল ভৌমিক, শান্তশীল দাস, নচিকেতা ভরদ্বাজ প্রভৃতি। ভিনসেন্ট ভ্যানগগের একখানি ত্রিবর্ণ চিত্র, চারখানি ঐতিহাসিক চিত্র এবং পরিশিষ্টে বহু চিত্রশিল্পীর ছবির সংযোজন সংখ্যাখানির বিশেষ আকর্ষণ।

রূপমঞ্চ—সম্পাদক কালীশ মুখোপাধ্যায়। মূল্য ৩·০০ টাকা।

বহু প্রখ্যাত চিত্রাভিনেতা ও চিত্রাভিনেত্রীর চিত্র সম্বলিত এই সংখ্যাখানির বিশেষ আকর্ষণ দুটি ছোট সম্পূর্ণ উপন্যাস। এ ছাড়া মঞ্চ সম্পর্কিত কয়েকটি প্রবন্ধ। উমাপ্রসাদ মৈত্র ও তারাপ্রণব ব্রহ্মচারীর উপন্যাস দুখানি ক্ষুদ্রায়তন হলেও সুখপাঠ্য হয়েছে। প্রচ্ছদ ফটো বেশ মনোরম এবং আকর্ষণীয়।

ব্যায়াম চর্চা—সম্পাদক হারাধন চক্রবর্তী। ৪বি ঘোষ লেন, কলকাতা ৬। মূল্য ২·৫০।

ব্যায়াম এবং শরীর চর্চার বিবিধ প্রকরণাদি সম্পর্কিত এই সংখ্যাখানি বেশ কতকগুলি উপাদেয় রচনাসম্ভারে সমৃদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। লেখকগণের মধ্যে আছেন শ্রীবিষ্ণুচরণ ঘোষ, ভূপেশ কর্মকার, শ্রীব্রজরঞ্জন রায়, শ্রীশান্তিরঞ্জন সেনগুপ্ত, স্বামী প্রেমানন্দ প্রভৃতি। প্রচ্ছদ ফটো আকর্ষণীয়।

প্রাপ্তি স্বীকার

ছন্দে ছড়ায় বিজ্ঞান। সুধাংশু সরকার। গ্রন্থলোক : কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। মূল্য ১·৭৫।

মধ্য যুগে গৌড়। শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার ঘোষ। এশিয়ান পাবলিকেশনস্ : পি১২ সি আই টি রোড, স্কিম-৫২, কলিকাতা-১৪। মূল্য ১৫·০০।

Lahiri's Indian Ephemeris of Planet Positions. (for 1970 A.D.) Astro Research Bureau: 57/6, Raja Dinendra Street, Calcutta-6, Price Rs. 4.00.

নাহার সাগর। নীলোৎপল। ডি লাইট বুক কোম্পানী: ১৭৩।৩, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬। মূল্য ৩·০০।

বৈতানিক। চিররঞ্জন রায়। ডি লাইট বুক কোম্পানী: ১৭৩।৩, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬। মূল্য ৩·০০।

মাটির কুটিরে। সিহাইল সাদোভেয়ানু। সাহিত্য অকাদেমী: নিউ দিল্লী। মূল্য ৩·৫০।

নব বসন্ত। যোগেশচন্দ্র মজুমদার। ডি লাইট বুক কোম্পানী: ১৭৩।৩, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬। মূল্য ২·৫০।

অনিকেত। মীরা দেবী। ডি লাইট বুক কোম্পানী: ১৭৩।৩, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬। মূল্য ৩·০০।

লীলা বধূ। মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়। ডি লাইট বুক কোম্পানী: ১৭৩।৩, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬। মূল্য ৩·৫০।

কুমার-সম্ভব। প্যারীমোহন সেন। শ্রীহরিপদ সেন: শ্রীরামপুর। মূল্য ২·০০।

ভজনমালা। শ্রীমতী বিজন ঘোষ দস্তিদার। গ্রন্থ প্রচার: ২০এ, গোবিন্দ সেন লেন, কলিকাতা-১২। মূল্য ৪·০০।

শুকনো জল। কেদার ভাদুড়ী। ডি লাইট বুক কোম্পানী: ১৭৩।৩, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬। মূল্য ৩·০০।

প্রফেসর। যোসেফ মুণ্ডশশেরি। সাহিত্য অকাদেমী: নিউ দিল্লী। মূল্য ৪·৫০।

শিখাময়ী নিবেদিতা। উষা দেবী সরস্বতী। প্রদীপ পাবলিশার্স: ১০বি, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য ৬·০০।

দশরথ। চিত্রভানু। রুচিরা প্রকাশন: ৫০, সন্তোষপুর অ্যাভিনু, কলিকাতা-৫০। মূল্য ২·৫০।

অবরে সবরে। রবি গুহ মজুমদার। ডাক পাবলিশার্স: ১।১।১, হাজরা রোড, কলিকাতা-২৬। মূল্য ৩·০০।

খুঁজি খুঁজি নারি। রবি গুহ মজুমদার। ডাক পাবলিশার্স: ১।১।১, হাজরা রোড, কলিকাতা-২৬। মূল্য ২·৫০।

চারা গল্প। রবি গুহ মজুমদার। ডাক পাবলিশার্স: ১।১।১, হাজরা রোড, কলিকাতা-২৬। মূল্য ৩·৫০।

তরাই। শৈলেন রায়। বাক-সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড: ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯। মূল্য ১০·০০।

নূতন আলো। দীপেন রাহা। ৩১।৩১ডি, হরিনাথ দে রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য ২·০০।

বঙ্কিমচন্দ্র সেন। সংকলক: শ্রীরাইমোহন ভট্টাচার্য। ৭ডি, রামকৃষ্ণ লেন, কলিকাতা-৩। মূল্য ০·৫০।

সহজ আসন ও মুদ্রা। শ্রীনিরঞ্জন ঘোষ। শ্রীনৃপেন ঘটক: ১।১।১সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ২·০০।

ঈশ্বরের চোখে সকলেই সমান। পাবলিকেশনস ডিভিশন, মিনিস্ট্রি অব ইনফরমেশন অ্যান্ড ব্রডকাস্টিং: নিউ দিল্লী। মূল্য ১·৫০।

গল্পের মতো। অমিতাভ চৌধুরী। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড: ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য: ৪·০০।

রূপে রূপান্তরে। ব্রজমাধব ভট্টাচার্য। অরণ্য প্রকাশনী: ৭ যুগলকিশোর দাস লেন, কলিকাতা-৬। মূল্য: ৮·০০।

উলু স্টেশন। সুনীতিকুমার মুখোপাধ্যায়। ডি আর ডি পাবলিকেশনস: ২/১এ ইউরোপীয়ান অ্যাসাইলাম লেন, কলিকাতা-১৬। মূল্য: ১·৭৫।

গান্ধী চরিত। নির্মলকুমার বসু। মেরিট পাবলিশার্স: ৫১ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬। মূল্য: ৬·০০।

কৃষ্ণকলি। অলকা চট্টোপাধ্যায়। বাক্-সাহিত্য প্রাঃ লিমিটেড: ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯। মূল্য: ৮·৫০।

ভারতবর্ষের আদিবাসীর পরিচয়। শ্রীননীমাধব চৌধুরী। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ: পি-২৩ রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য: ৫·০০।

মহাকাশ পরিচয়। শ্রীজিতেন্দ্রকুমার গুহ। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ: পি-২৩ রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য: ৫·০০।

মানব-কল্যাণে রসায়ন। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। প্রকাশ ভবন: ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য: ৭·৫০।

আমি তোমাদের। কানাই গঙ্গোপাধ্যায়। নমিতা গাঙ্গুলী: কিংসঘাট, জলপাইগুড়ি। মূল্য: ১·০০।

গিরায়া মন্যা—বীর ভদ্র। করুণা প্রকাশনী: ১১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—৭·০০।

মূক-বধির শিশুর অভিভাবক-সহায়িকা (১ম খণ্ড) শ্রীনির্মলেন্দু চক্রবর্তী। মূক-বধির বিদ্যামন্দির: বরানগর, কলিকাতা-৩৬।

ঈশ্বরের জন্ম। সুব্রত রুদ্র। গ্রন্থ জগৎ: ১৯ পণ্ডিতিয়া টেরেস, কলিকাতা-২৯। মূল্য ৩·০০।

এখনো সেই মুখ। সঞ্জীব সরকার। সাহিত্য সদন: ৬৫ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য ৩·০০।

অঞ্জলি। এন মুখোপাধ্যায়। দি বুক হাউস: ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২। মূল্য ৫·০০।

বাংলা ভাষা কী ভূমিকা (হিন্দী)। রজনন্দন সিংহ। মালঞ্চ প্রকাশন: কোটরা, পোঃ রাণীগঞ্জ বাজার জিলা বালিয়া, উত্তরপ্রদেশ। মূল্য ১০·০০।

অপারিণীতা। এন মুখোপাধ্যায়। দি বুক হাউস: ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২। মূল্য ১৪·০০।

সোনালী রূপকথা। সম্পাদক: বিশ্বনাথ দে। এশিয়া পাবলিশিং কোং: এ ১৩২/১৩৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৪·০০।

ভানুমতীর কৌটো। সম্পাদক: সরল দে। এশিয়া পাবলিশিং কোং: এ ১৩২/১৩৩ কলেজ স্ট্রীট, মার্কেট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৩·৫০।

গৌড় কাহিনী। শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার ঘোষ। ডি এম লাইব্রেরী: ৪২ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য ১১·০০।

A Guide to the West Bengal Societies Registration Acts, 1961. by Panchanan Mukhopadhyay. Yugayatri Prakasak Ltd.: 41A Baldeopara Road, Calcutta-6. Price Rs. 3.00.
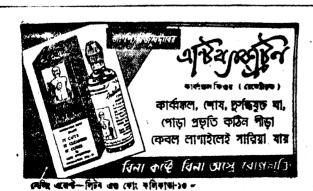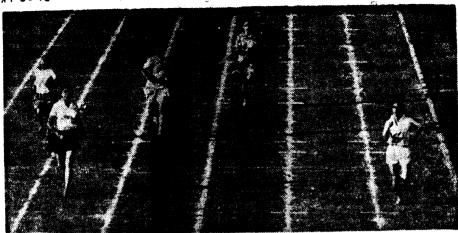
অ্যাথলেটিক স্পোর্টস মরসুমের শুরু হয়েছে। উপরের ছবিটি পোস্ট এন্ড টেলিগ্রাফ বিভাগের স্পোর্টসে মহিলাদের ১০০ মিটার দৌড়ের ছবি

টেস্ট ক্রিকেটে নবাগত পাকিস্তানের অফ স্পিন বোলার মহম্মদ নাজিরের বোলিংই নিউজিল্যান্ডের এই বিপর্যয়ের কারণ। প্রথম টেস্ট খেলতে নেমে মহম্মদ নাজির প্রথম ইনিংসে ২৯ রানে নট আউট থাকেন। পরের দিন ৯৯ রানে দখল করেন ৭টি উইকেট। জীবনের প্রথম টেস্টে অনেকে অবশ্য ৭টিরও বেশী উইকেট পেয়েছেন কিন্তু মহম্মদ নাজিরের কৃতিত্ব ৭ জনের উইকেট দখলের মধ্যে ৬জনকে করেছেন ক্লিন বোল্ড। সম্ভবত এটা বিশ্ব রেকর্ড। রেকর্ড-বইয়ে এই বিষয়ের উল্লেখ থাকলে নিশ্চিত করেই বলা যেত বিশ্ব রেকর্ড কিনা। তবে আর কেউ যে জীবনের প্রথম টেস্টে এক ইনিংসে ৬জনকে বোল্ড আউট করেছেন এমন নজির দেখছি না।

যাই হোক প্রথম ইনিংসের খেলায় ৫৪ রানে পিছিয়ে থেকে পাকিস্তান দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে তৃতীয় দিনের শেষে ৫ উইকেটে ১৮৬ রান সংগ্রহ করে। হানিফ ও সাদিকের শুভ সূচনার পর আবার অল্প রানে ৩টি উইকেট পড়ে যায়। কিন্তু ইউনিস আমেদের দৃঢ়তায় পাকিস্তান বিপদ কাটিয়ে ওঠে।

চতুর্থ ও শেষ দিন মধ্যাহ্ন-ভোজের ৩৫ মিনিট পরে ৮ উইকেটে ২৮৩ রান উঠলে পাকিস্তান দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। উল্লেখ করবার বিষয় নবাগত মহম্মদ নাজির দ্বিতীয় ইনিংসেও ১৭ রান করে নট আউট থাকেন।

জয়ের জন্য ২৩০ রানের দরকার। অথচ হাতে সময় মাত্র ১৯৩ মিনিট—এই অবস্থায় নিউজিল্যান্ড দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করে মাত্র ৪৪ রানের মধ্যে ৪টি উইকেট হারায়। এবার সংহারমূর্তি ধরে বল করেন পাকিস্তানের আর এক তরুণ ন্যাটা স্পিন বোলার
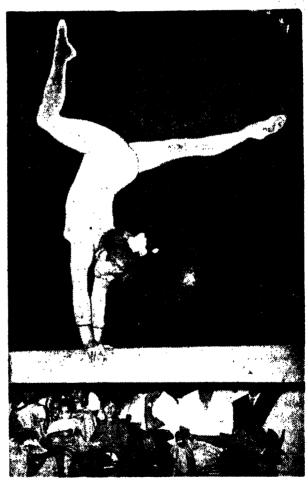
পূর্ব জার্মানীর এক জিমন্যাস্টিকস দল ভারতে এসে কয়েকটি দেশে জিমন্যাস্টিকসের উন্নত কলাকৌশল দেখিয়ে গেলেন। কলকাতায় ইডেন গার্ডেন্সের ইনডোর স্টেডিয়ামে কুমারী [illegible]

পারভেজ সাজ্জাদ। পারভেজ একাই এই ৪টি উইকেট পান এবং এক সময়ে মাত্র ১ রানে পান ৩টি উইকেট। ভিক্টর পোলার্ড ও মাইক বার্জেসের দৃঢ়তায় নিউজিল্যান্ড অবশ্য পরাজয়ের আশংকা কাটিয়ে ওঠে। স্টাম্প তোলার সময় পর্যন্ত তাদের ৫ উইকেটে ১১২ রান সংগৃহীত হয়। পরের উইকেটটিও দখল করেন পারভেজ সাজ্জাদ।

সংক্ষিপ্ত স্কোরঃ—

পাকিস্তান—প্রথম ইনিংস ২২০ (সাদিক মহম্মদ ৬৯, মহম্মদ নজর নট আউট ২৯, হানিফ মহম্মদ ২২, আসিফ ইকবাল ২২; হেডলী হাওয়ার্থ ৮০ রানে ৫ উইকেট, আর কানিস ২৭ রানে ৩ উইকেট, বি ইউল ৩৫ রানে ২ উইকেট)।

নিউজিল্যান্ড—প্রথম ইনিংস ২৭৪ (ডেল হেডলী ৫৬, ব্রুস মারে ৫০, গ্রাহাম ডাউলিং ৪০, বি ইউল ৪৭; মহম্মদ নাজির ৯৯ রানে ৭ উইকেট, পারভেজ সাজ্জাদ ৭১ রানে ২ উইকেট)।

পাকিস্তান—দ্বিতীয় ইনিংস (৮ উইঃ ডিক্লেঃ) ২৮৩ (ইউনিস আমেদ ৬২, ইন্তিখাব আলম ৪৭, সাদিক মহম্মদ ৩৭, হানিফ মহম্মদ ৩৫, জাহির আব্বাস ২৯; কানিস ৩৮ রানে ২ উইকেট, হাওয়ার্থ ৬০ রানে ২ উইকেট, ইউল ৬৬ রানে ২ উইকেট)।

নিউজিল্যান্ড—দ্বিতীয় ইনিংস (৫ উইকেট) ১১২ (মাইক বার্জেস ৪৫, ভিক্টর পোলার্ড নট আউট ২৮; পারভেজ সাজ্জাদ ৩৩ রানে ৫ উইকেট)।

(খেলা অমীমাংসিত)

দ্বিতীয় টেস্ট—লাহোর

অক্টোবরের ৩০ তারিখে লাহোরের দ্বিতীয় টেস্টেও পাকিস্তান টসে বিজয়ী হয়ে প্রথম ব্যাট করার সুযোগ পায়। কিন্তু চা-বিরতির আগেই মাত্র ১৪৪ রানে পাকিস্তানের প্রথম ইনিংস শেষ হয়ে যায়। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে এটা পাকিস্তানের সবচেয়ে ছোট রানের ইনিংস। ৪৩ রানের মধ্যে পাকিস্তানের প্রথম ৪টি উইকেট দখল করেন নিউজিল্যান্ডের পেস বোলাররা। পরের ৬টি উইকেট ভাগাভাগি করে নেন দুই স্পিন বোলার হাওয়ার্থ ও পোলার্ড। দিনের শেষে নিউজিল্যান্ডের ১ উইকেটে ৫২ রান ওঠে।

দ্বিতীয় দিন ২৪১ রানে নিউজিল্যান্ডের ইনিংস শেষ হবার পর পাকিস্তান দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় কোন উইকেট না হারিয়ে ১৭ রান করে। নিউজিল্যান্ডের ২৪১ রানের মধ্যে ব্রুস মারের ৯০ এবং

মেক্সিকো অলিম্পিক লংহর্সে ব্রোঞ্জ পদকের অধিকারী পূর্ব জার্মানীর গুন্ডার বিয়ারের রোম্যান রিং-এর দৃশ্য

মত। মারের ৯০ তার টেস্ট খেলার সর্বোচ্চ রান।

এক সময়ে নিউজিল্যান্ডের অবস্থা খুবই ভাল ছিল। ২ উইকেটে উঠেছিল ১৭২ রান। তারপর আবার সেই ন্যাটা স্পিন বোলার পারভেজ সাজ্জাদের সংহার-মূর্তি। নিউজিল্যান্ডের ৭টি উইকেট দখলের মধ্যে তিনি ৬টি উইকেটই দখল করেন ১৪ ওভারে মাত্র ২০ রান দিয়ে।

তৃতীয় দিন পাকিস্তান মাত্র ৮৫ রানের মধ্যে ৫টি উইকেট হারায়। কিন্তু মারমুখী তরুণ ব্যাটসম্যান সাফাকাত রানা অনমনীয় দৃঢ়তায় এবং উজ্জ্বল ক্রিকেটের পরিচয়ে দিনের শেষে ৯৩ রান করেও নট আউট থাকেন। পাকিস্তান সংগ্রহ করে ৮ উইকেটে ২০২ রান।

মাত্র ৭৫ রানের লীড। হাতে মাত্র ২টি উইকেট। সুতরাং পরাজয়ের সম্ভাবনা ষোলো আনা। তবু পাক সমর্থকদের আশা ছিল সাফাকাত রানা জীবনের প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরী করতে পারবেন। কিন্তু পারেননি। পরের দিন আর ২ রান করে আউট হয়ে যান। ২০৮ রানে পাকিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হবার পর নিউজিল্যান্ড ৫ উইকেটের বিনিময়ে জয়ের প্রয়োজনীয় ৮২ রান সংগ্রহ করে ৫ উইকেটে জিতে যায়। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এটা তাদের প্রথম টেস্ট জয়। নিউজিল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের পাঁচটি উইকেটও ভাগাভাগি করে নেন মহম্মদ নাজির ও পারভেজ সাজ্জাদ। নাজির ১৯ রানে ৩টি, পারভেজ ৩৮ রানে ২টি। সংক্ষিপ্ত স্কোরঃ—

পাকিস্তান—প্রথম ইনিংস — ১১৪ (মুস্তাক মহম্মদ ২৫; পোলার্ড ২৭ রানে ৩ উইকেট, হাওয়ার্থ ৩৪ রানে ৩ উইকেট, কংডন ১৫ রানে ২ উইকেট)

নিউজিল্যান্ড—প্রথম ইনিংস — ২৪১ (ব্রুস মারে ৯০, ব্রায়ান হেস্টিংস নট আউট ৮০; **পারভেজ সাজ্জাদ** ৮০ রানে ৭ উইকেট)।

পাকিস্তান—দ্বিতীয় ইনিংস — ২০৮ (সাফাকাত রানা ৯৫, আসিফ ইকবাল ২৩; হেডলী ২৭ রানে ৩ উইকেট, টেলর ২৪ রানে ২ উইকেট, পোলার্ড ৩২ রানে ২ উইকেট)

নিউজিল্যান্ড—দ্বিতীয় ইনিংস (৫ উইকেটে) ৮২ (মাইক বার্জেস নট আউট ২৯; মহম্মদ নাজির ১৯ রানে ৩ উইকেট, পারভেজ সাজ্জাদ ৩৮ রানে ২ উইকেট)।

(নিউজিল্যান্ড ৫ উইকেটে বিজয়ী)

তৃতীয় টেস্ট—ঢাকা

নভেম্বরের ৮ তারিখে ঢাকার তৃতীয় টেস্টের প্রথম দিনে নিউজিল্যান্ড টসে জিতে সারাদিনে সংগ্রহ করে ৪ উইকেটে ১৭৫ রান। সম্ভবত লাহোর টেস্ট জয়ের সাফল্য রাখার লক্ষ্যের উদ্দেশ্যেই নিউজিল্যান্ড খেলোয়াড়রা কোন ঝুঁকি নিয়ে রান করতে চাননি। নেতিমূলক ক্রিকেটে সময় কাটাতে চেয়েছে। প্রথম দিনের খেলার উল্লেখযোগ্য ঘটনা ওপেনিং ব্যাটসম্যান গ্লেন টার্নার নট আউট ৯৯ রান। পরের দিন টার্নার জীবনের প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরী পূর্ণ করে। নিউজিল্যান্ড ২৭৩ রানে ইনিংস শেষ করার পর পাকিস্তান করে ৩ উইকেটে ৯২ রান।

তৃতীয় দিন ৭ উইকেটে ২৯০ রান তুলে পাক অধিনায়ক ইন্তিখাব আলম ইনিংস সমাপ্তি ঘোষণা এবং দ্বিতীয় ইনিংসে নিউজিল্যান্ডের বিপর্যয় শুরু। ইন্তিখাব এবং পারভেজের স্পিন বোলিংয়ে মাত্র ২৫ রানের মধ্যে ৪ জন ভাল ব্যাটসম্যান আউট। শেষ পর্যন্ত দিনের শেষে ৪ উইকেটে ৫৫ রান।

জয়পরাজয়ের আশা-নিরাশার দোলার মধ্যে চতুর্থ ও শেষ দিনের খেলা আর

খেলাধুলোর অগ্রগতির জন্য পশ্চিম জার্মানীর প্রতিটি স্কুলে বাধ্যতামূলক স্পোর্টস ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা আছে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে স্কুলের পড়ার শেষে একটি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা একজন শিক্ষকের অধীনে নানা ধরনের শারীরিক কসরৎ করছে

নিউজিল্যান্ডের অবশ্য জয়ের আশা ছিল না, ছিল পরাজয়ের আশংকা। জয়ের আশায় রঙীন স্বপ্নে বিভোর ছিল পাকিস্তান। কিন্তু মাইক বার্জেস একা পাক দলের সব আক্রমণ প্রতিহত করে ১১৯ রানেও নট আউট থাকেন। ঠিক ২০০ রানে যখন নিউজিল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয় তখন পাকিস্তানের জয়ের জন্য ১৮৪ রানের দরকার, হাতে সময় ১৪৮ মিনিট। সিরিজ ড্র করার জন্য, নিউজিল্যান্ডকে রাবার লাভে বঞ্চিত করার জন্য পাক খেলোয়াড়রা জয়ের ঝুঁকি নিয়ে বিপদে পড়ল। তাড়াতাড়ি রান তুলতে গিয়ে ৪৬ রানের মধ্যে হারালো ৪টি উইকেট। এবার পরাজয়ের ভয়। সুতরাং ব্যাট তাদের স্তব্ধ হয়ে গেল। কিন্তু স্তব্ধ হল না দর্শক সমর্থকদের কণ্ঠ। তাদের দাবী হয় জয়, না হয় পরাজয়। কোন মধ্যপন্থা নয়, নেতিমূলক ক্রিকেট তো নয়ই। এদিকে পাকিস্তানের ব্যাটসম্যানরা মাটি কামড়ে আত্মরক্ষায় নিয়োজিত। ফলে দর্শক হামলা এবং দর্শকদের মাঠে প্রবেশের ফলে শেষ ঘণ্টার খেলা বন্ধ। ফলাফল অমীমাংসিত। সংক্ষিপ্ত স্কোর :—

নিউজিল্যান্ড—প্রথম ইনিংস — ২৭৩ (গ্লেন টার্নার ১১০, মাইক বার্জেস ৫৯, ব্রায়ান হেস্টিংস ২২; ইন্তিখাব আলম ৯২ রানে ৫ উইকেট, পারভেজ সাজ্জাদ ৬৬ রানে ২ উইকেট)।

পাকিস্তান—প্রথম ইনিংস—(৭ উইকেট ডিক্লেয়ার্ড) ২৯০ (আসিফ ইকবাল ৯২, সাফাকাত রানা ৬৫, আফতাব গুল ৩০; হাওয়ার্থ ৮৫ রানে ৪ উইকেট, পোলার্ড ৪৯ রানে ২ উইকেট)।

নিউজিল্যান্ড—দ্বিতীয় ইনিংস—২০০ (মাইক বার্জেস নট আউট ১১৯, গ্লেন টার্নার ২৬; পারভেজ সাজ্জাদ ৬২ রানে ৪ উইকেট, ইন্তিখাব আলম ৯১ রানে ৫ উইকেট)।

পাকিস্তান—দ্বিতীয় ইনিংস (৪ উইকেট) ৫১; (বি কানিন ২০ রানে ৪ উইকেট)।

[খেলা অমীমাংসিত]

রিটায়ার্ড হার্ট

নিউজিল্যান্ডের কাছে পাকিস্তানের 'রাবার' হারানোর মূলে ক্রিকেট-সংসারের পঙ্কিলতা দায়ী কিনা কে জানে! পাকিস্তান ক্রিকেটের প্রধান স্তম্ভ হানিফ মহম্মদ, যিনি ও দেশে ক্রিকেটের সূচনা থেকে কোন খেলা থেকে বাতিল হননি এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পাকিস্তানকে বহু গৌরব দান করেছেন, করাচী টেস্টের পর তাঁকে শুধু অধিনায়কের আসন থেকেই সরিয়ে দেওয়া হয়নি—টেস্ট খেলা থেকেই বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। ক্রিকেট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতদ্বৈধের ফলে হানিফও নিয়েছেন ক্রিকেট থেকে অবসর। তাঁর এই রিটায়ার করাকে রিটায়ার্ড হার্ট বলা যেতে পারে।

একটি সিরিজ চলাকালে ক্রিকেট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ক্রিকেট খেলোয়াড়দের ঝগড়া বিবাদের ফল কোন দিন শুভ হয় না। খেলোয়াড়দের মনের উপরও নানা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ভারতে এর বহু প্রমাণ। পাকিস্তানেও হয়তো আরম্ভ হয়েছে।

অবশ্য হানিফ প্রচুর ক্রিকেট খেলেছেন। ১৭ বছর ধরে পৃথিবীর মাঠে মাঠে ছড়িয়ে রেখেছেন ব্যাট থেকে ঝরে পড়া মণিমুক্তার ডালি। অনেক বিশ্ব রেকর্ডের পাশে তাঁর নাম। পাকিস্তানে যখন প্রতি বছর নতুন নতুন খেলোয়াড়ের সন্ধান মিলছে তখন হানিফ চিরদিন অপরিহার্য হয়ে থাকবেন সেটাও ঠিক নয়। তবু যেভাবে হানিফকে ক্রিকেট থেকে বিদায় নিতে হল সেটা সত্যিই দুঃখের।

একলব্য

ব্যাডমিণ্টনের আইন-কানুন

লাইন্সম্যান

২৯। লাইন্সম্যান যে লাইনের জন্য নিযুক্ত সেই লাইনের সিদ্ধান্তের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী। যদি সাটল লাইনের বাইরে পড়ে তবে তখনই উঁচু গলায় 'আউট' ডাকতে হবে যাতে খেলোয়াড় এবং দর্শক তা শুনতে পায়। তা ছাড়া আম্পায়ারের দেখার জন্য দুই দিকে দুই হাত প্রসারিত করে 'আউট'-এর সংকেত জানাতে হবে। সাটল লাইনের কতটুকু বাইরে পড়ল তা দেখার প্রয়োজন নেই। বাইরে পড়লেই আউট ডাকতে হয়। সাটল ভিতরে পড়লে কিছু বলার বা নির্দেশ দেবার দরকার হয় না। যদি কোন কারণে ঘটনা দৃষ্টির আড়াল হয় তবে আম্পায়ারকে তখনই জানাতে হবে।

৩০। আম্পায়ারের বিপরীত দিকে এবং কোর্টের লম্বালম্বি দুই দিকে লাইন বরাবর কাল্পনিক রেখা ধরে লাইন্সম্যান কোর্টের বাইরে চেয়ারে বসে সিদ্ধান্ত জানাবেন।

৩১। যদি তিনজন লাইন্সম্যান নিয়োগ করা হয় তবে দুইজনের দুই ব্যাক বাউণ্ডারী লাইনের ভার নেওয়া উচিত। ডাবলসের খেলা হলে নেওয়া উচিত লং সার্ভিস লাইনের ভার। তৃতীয় জন আম্পায়ারের বিপরীত দিকের সাইড লাইনের ভার নেবেন।

যদি তিনজনের বেশী লাইন্সম্যান পাওয়া যায় বা নিয়োগ করতে হয়, তবে আম্পায়ার পরিচালনার সুবিধার জন্য নিজের ইচ্ছামত তাদের উপর অন্যান্য লাইনের ভার অর্পণ করতে পারেন।

ব্যাখ্যা

৩২। ১৬ এবং ১৪ (সি) আইন অনুযায়ী সার্ভিস হবার আগে যদি নড়াচড়ার জন্য রিসিভারের ফল্ট হয়, কিংবা রিসিভার তার যথাযথ কোর্টের মধ্যে না থেকে থাকেন এবং ১৪ (এ) (সি), (এইচ) এবং ১৬ আইনের ব্যতিক্রম সার্ভারও 'ফল্ট' করেন তবে সার্ভারের বিরুদ্ধেই 'ফল্ট' ডাকতে হবে।

অবশ্য যদি ১৪ (ডি) আইনের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে সার্ভার রিসিভার কিংবা যে কোন খেলোয়াড় ভড়াক দেবার চেষ্টা করেন বা ইচ্ছে করে প্রতি পক্ষের বাধা সৃষ্টি করেন। তবে 'ফল্ট' ডাকতে হবে সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে। এমন কি সার্ভিস হবার আগেও এই অপরাধের জন্য ফল্ট ডাকতে হবে।

ব্যাখ্যা—প্রশ্ন উঠতে পারে সার্ভিস হবার আগে 'ফল্ট' ডাকা হলে কিভাবে খেলা আরম্ভ হবে? যার সার্ভিস ছিল তার 'ফল্টে' কি সার্ভিস করার অধিকার চলে যাবে? কিংবা রিসিভারের ফল্টে সার্ভার এক পয়েণ্ট পাবে?

আইন বলছে, হ্যাঁ সার্ভারের ফল্ট হলে সার্ভিস করার অধিকার যাবে, রিসিভারের ফল্টে সার্ভার পাবে পয়েণ্ট। 'ফল্ট'—সংক্রান্ত ১৪ নম্বর আইনে বলা হয়েছে : 'ইন' সাইডের কোন খেলোয়াড়ের 'ফল্ট' হলে সার্ভারের সার্ভিস করার অধিকার চলে যাবে। আর 'আউট' সাইডের কোন খেলোয়াড়ের 'ফল্ট' হলে 'ইন' সাইড একটি পয়েণ্ট পাবে।

কিন্তু সার্ভিসের আগে ভড়াক দেওয়া বা প্রতিপক্ষের বাধা সৃষ্টির অপরাধ 'ফল্ট' হিসাবে গণ্য হওয়া উচিত কিনা এ সম্পর্কে বহু ব্যাডমিণ্টন বিশেষজ্ঞের মনে সন্দেহের অবকাশ আছে। কারণ সার্ভিস না হওয়া পর্যন্ত সাটল খেলার মধ্যে বলে (ইনপ্লে) গণ্য হয় না। সুতরাং সাটল খেলার মধ্যে গণ্য হবার আগে সার্ভারের অপরাধে সার্ভিস করার অধিকার নষ্ট হওয়া সমর্থনীয় হলেও রিসিভার বা রিসিভারের সহ খেলোয়াড়ের অপরাধে ইন সাইডের পয়েণ্ট অর্জন আইনের সঙ্গে ঠিক সঙ্গতিপূর্ণ নয়। অনেকের অভিমত অন্ততঃ প্রথম অপরাধে সতর্ক করার ব্যবস্থা থাকা উচিত ছিল।

যাই হোক আন্তর্জাতিক ব্যাডমিণ্টন ফেডারেশন সার্ভিসের আগে ভড়াক দেওয়া এবং বাধা সৃষ্টির অপরাধকে 'ফল্ট' হিসাবেই ধরার নির্দেশ দিয়েছেন।

৩৩। ১৬ নম্বর আইনের ব্যাখ্যা জানতে চেয়ে ফেডারেশনের কাছে যে চিঠি এসেছে তার উত্তরে ফেডারেশন যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন নীচে তা দেওয়া হল।

জানতে চাওয়া হয়েছে :

(এ) আইন বলছে সার্ভিস না হওয়া পর্যন্ত সার্ভার ও রিসিভারের দুই পায়ের কোনো না কোনো অংশ মাটি বা প্লাটফর্মের সঙ্গে অনড় অবস্থায় মিশে থাকবে।

এর অর্থ কি এই যে, পায়ের যে অংশ ফ্লোরের সঙ্গে মিশে আছে সেই অংশই মিশে থাকবে? না পায়ের অপর অংশ মিশে থাকলে চলবে?

(বি) যদি সার্ভারের পেছনের পায়ের আঙ্গুল ও গোড়ালীর নীচের অংশ ফ্লোরের সঙ্গে মিশে থাকে এবং সাটল স্ট্রাইক করার মুহূর্তে গোড়ালী উঠে গিয়ে শুধু আঙ্গুলের উপর পায়ের ভর থাকে তবে সেটা আইন সম্মত হবে কি?

(সি) কিংবা যেমন সাধারণত পায়ের গোড়ালী উঠে গিয়ে ৯০ ডিগ্রী অ্যাঙ্গেলে থাকে এবং পায়ের আঙ্গুল ফ্লোরের সঙ্গে সংলগ্ন রেখে অথচ পা ঘুরিয়ে সার্ভিস করা হয়। এটা কি আইন সম্মত?

উপরের এই তিনটি প্রশ্নের উত্তরে আন্তর্জাতিক ব্যাডমিণ্টন ফেডারেশনের উত্তর হ্যাঁ, তিনটি পদ্ধতিই আইন সম্মত।

সুতরাং সার্ভিস করার সময় খেলোয়াড়ের দুই পায়ের পাতার যে কোন অংশ ফ্লোরের সঙ্গে লেগে থাকলেই হল। এমনও দেখা গেছে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন খেলোয়াড় ফ্লোরের সঙ্গে আঙ্গুল মিশিয়ে রেখেছেন কিন্তু সার্ভিস করার মুহূর্তে পা অনড় না রেখে পা ঘষে টেনে এনে সার্ভিস করছেন। আম্পায়ার 'ফল্ট' ডাকছেন না।

সত্যি কথা বলতে কি, সার্ভিস করার সময় এ ভাবে পা-টানা আইনের বয়ানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। আইনের বয়ানে আছে :
'. . . Some part of both feet of these players must remain in contact with the ground in a stationary position till the service is delivered. . . .

স্টেশনারী পজিশনের অর্থ স্থির বা নিশ্চল অবস্থায় অবস্থান। কিন্তু আন্তর্জাতিক ফেডারেশন ব্যাখ্যাতেই বলছেন : গোড়ালী কিংবা আঙ্গুল নড়তে পারে।

ব্যাডমিণ্টন খেলার মূল আইনের ধারা আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে। আম্পায়ারের প্রতি উপদেশ সংক্রান্ত বিধানে সার্ভিস জাজ ও লাইন্সম্যানের করনীয় এবং ব্যাখ্যাও শেষ হল। এখন বাকি ব্যাডমিণ্টন হল সম্পর্কে কিছু লেখা এবং কয়েকটি প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আইনের অস্পষ্টতা আরও স্পষ্ট করার চেষ্টা করা।

মুকুল

রঙ্গজগৎ

পাণ্ডুলিপি অর্পণ

রবীন্দ্রনাথের "বিসর্জন" নাটকের পাণ্ডু-
লিপি যে লালবাজার পুলিশের দপ্তরে দীর্ঘ ৪৬ বছর ধরে আবদ্ধ ছিল সে সংবাদ [illegible] কয়েক দিন আগে পাওয়া যায়। [illegible] করে বিসর্জন-এর পাণ্ডুলিপি [illegible] গেল এ নিয়ে গবেষণা হয়েছে [illegible] জানা গেল, ১৯২৬ সালে শ্রীশিশির-
কুমার ভাদুড়ির নাট্যমন্দির থিয়েটারের [illegible] অভিনয়ের অনুমতির জন্য ওই পাণ্ডুলিপি পুলিশের কাছে পাঠান। তখন-
কার দিনে অভিনয় করার আগে নাটকের পাণ্ডুলিপি পুলিশের কাছে পাঠাবার নিয়ম ছিল। নাট্যমন্দিরে অভিনয়ের জন্য রবীন্দ্র-
নাথ নাটকটিতে কয়েকটি নতুন গান যোগ করে দিয়েছিলেন। ওই পাণ্ডুলিপি এতদিন লালবাজারে ফাইলে চাপা ছিল। ফাইলে [illegible] একজন পুলিশ অফিসারের [illegible] কিছু কিছু অংশ [illegible]।

"চিরাগ" (রাজ খোসলা) হিন্দী চিত্র এ সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে—একটি দৃশ্যে আশা পারেখ

"ওয়ান্স বিফোর আই ডাই" চিত্রে উরসুলা অ্যানড্রেস

কলকাতা পুলিশ বহু দিন পর ওই পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেটি বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের হাতে অর্পণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সেই অনুযায়ী গত শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) নিউ এম্পায়ারে "বিসর্জন" পাণ্ডুলিপি অর্পণ-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এবং এই উপলক্ষে পুলিশ কর্মচারীরা নাটকটি সুন্দরভাবে অভিনয় করেন। কলকাতা পুলিসের নাট্যাভিনয় ও নাট্যচর্চার কথা সুবিদিত। এর আগেও তাঁরা নাটক অভিনয় করে রসিকজন ও সমালোচকদের প্রশংসাভাজন হয়েছেন। তাঁদের এবারের অভিনয় ছিল যেন আরও প্রাণদীপ্ত।

নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন, অম্বিকা ভট্টাচার্য (গোবিন্দমাণিক্য), নৃপেন্দ্র-
নাথ [illegible] সরকার (জয়সিংহ), বিজন বিশ্বাস (নক্ষত্র-
রায়), নিরঞ্জন মৈত্র (নয়নরায়), উমাদাস মৈত্র (চাঁদপাল), বীরেন্দ্র সাহা (মন্ত্রী) ফণী দে (নেপাল), শ্রীপতি লাহিড়ী (গণেশ), প্রাণাঞ্জন গাঙ্গুলী (হারু), সোমনাথ মুখার্জি (ধ্রুব) এবং অপর্ণা ও গুণবতীর ভূমিকায় যথাক্রমে মমতা চট্টোপাধ্যায় ও শেফালী বন্দ্যোপাধ্যায়। নাটকটি পরিচালনা করেন নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ওই অনুষ্ঠানে শহরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও কলারসিক উপস্থিত ছিলেন। উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু, বিসর্জন-এর পাণ্ডুলিপি বিশ্বভারতীর উপাচার্য ডঃ কালিদাস ভট্টাচার্যের হাতে অর্পণ করেন। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন মুখ্যমন্ত্রী

॥ চিত্র-সমালোচনা ॥

সম্বন্ধ

"প্রথম প্রেম" নামে একটি বাংলা ছবি হয়েছিল। তখনই মনে হয়েছিল, কাহিনীর দিক থেকে এর সঙ্গে হিন্দীচিত্রের কী যেন একটা 'সম্বন্ধ' বা সম্বন্ধ আছে। ওই ছবির কাহিনীই এখন হিন্দীতে "সম্বন্ধ" নামে ছবি হয়েছে। হিন্দী চিত্রেই এই গল্প (মূল রচনা : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত) ভাল জমবার কথা। তা ছাড়া পরিচালক অজয় বিশ্বাস সম্ভবত হিন্দী ছবির বিরাট দর্শক-গোষ্ঠীর কথা ভেবে "প্রথম প্রেম"-এর (বাংলা ছবিটি তিনিই পরিচালনা করেছিলেন) কিছু অদল-বদল করেছেন। নায়কের (দেব মুখার্জি) বীরত্ব তো দেখাতেই হয়েছে—নায়ক মানব একাই হাতে লাঠি নিয়ে বেশ কয়েকজনকে (তাদের হাতেও লাঠি) শায়েস্তা করেছে। বিরাট জমিদার বাড়িতে কি আগুন লাগাবার প্রয়োজন ছিল? এত অল্পতেই এত বড় প্রাসাদ কি পুড়ে ছাই হতে পারে? তা হোক, এখানে দেখবার বস্তু হল কীভাবে মানব আগুনে ঝাঁপ দিয়ে নায়িকা সন্ধ্যাকে (নবাগতা অঞ্জনা) উদ্ধার করেছে। এইসব বাহাদুরি নায়কের থাকতেই হবে। বোঝা যায়, এ ছাড়া পরিচালকের উপায় ছিল না। যে কারণে যেখানে-সেখানে তাকে গানেরও যোগান দিতে হয়েছে। বারো কী তেরো বছরের ছেলেকে প্রৌঢ়া জননীও (সুলোচনা) গান শোনাচ্ছেন, মঞ্চে দাঁড়িয়ে প্রায়-বৃদ্ধ শিল্পপতিও (প্রদীপকুমার) নায়ক মানবকে উৎসাহ দেবার জন্য গান গাইছেন। কীসের ফাংশান জানি না, তবে তাতে ছবির প্রায় সব পাত্র-পাত্রীই উপস্থিত। শিল্পপতি তখনও জানেন না, জীবনযুদ্ধে ভেঙ্গে-পড়া ওই যুবক তাঁরই একমাত্র পুত্র। অথচ মানবের প্রতি তাঁর কী প্রচণ্ড স্নেহের আকর্ষণ—একেই বুঝি বলে সম্বন্ধ, যা আসল পরিচয় জানার অপেক্ষা রাখে না।

গল্প যে দুই পুরুষের তা সম্ভবত আর বলার প্রয়োজন নেই। জমিদার (প্রদীপকুমার) একদিন কীভাবে স্ত্রী ও নাবালক পুত্রের হাত ধরে পথে এসে দাঁড়ালেন তাই ছবির প্রথম ভাগে ফ্ল্যাশব্যাকে বর্ণিত, নায়ক মানবের আত্মকাহিনী বলার মাধ্যমে।

ফ্ল্যাশব্যাকের ভিতর আবার ফ্ল্যাশব্যাক, গল্পের ভিতর গল্প। ছবির চরিত্রও অনেক, নাট্যঘটনাও প্রচুর—এর সঙ্গে তার সম্বন্ধ, তার সঙ্গে ওর ইত্যাদি। মোদ্দা কথা, মানুষের ভাগ্যবিপর্যয় ও ভাগ্যোন্নতি এবং ঘটনার আকস্মিক যোগাযোগের ভিত্তিতে একটি আবেগঘন নাটক সৃষ্টির প্রয়াস এই ছবিতে। এবং ভাগ্যদেবী যেখানে নিজে ঘটনা রচনার ভার নেন সেখানে কে লজিক খুঁজতে যাবে! আসলে পুরুষের কপাল এবং নারীর স্বভাব যে দেবতাদেরও অজ্ঞাত, এই তত্ত্বের উপরই মেলোড্রামাটি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। নতুবা যে নিঃসন্তান মহিলা (অচলা সচদেব) কিশোর নায়ককে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনে বারো বৎসর নিজের সন্তানের মত লালন-পালন করেছেন (নায়ক মানব তাঁকে ডাকত মা-মণি বলে) তিনিই বেশী বয়সে সন্তান প্রসবের পর মানবের প্রতি বিরূপ হবেন কেন? মানবের পালক-পিতা (অভী ভট্টাচার্য) অবশ্য সহৃদয়।

ছবির শুরুতে দেখি মানবকে—দার্জিলিং অঞ্চলে চা-বাগানের (?) ম্যানেজার। চাকুরি-স্থলে ভুল বোঝাবুঝিতে তার মন অশান্ত, তার উপর সে খবর পেয়েছে প্রেমিকা সন্ধ্যার বিয়ে হচ্ছে অন্যের সঙ্গে—নিমন্ত্রণপত্রও হাতে এসে গেছে। মানব তার মহিলা মনিব মিসেস সেনের (অনীতা গুহ) হাতে রেজিগনেশন পত্র দিয়ে এসে রাতে মদ খেতে শুরু করেছে এবং করুণ সুরের গান ধরেছে। ওই গান শুনেই মিসেস সেন (তিনিও যুবতী) এসে হঠাৎ কেন জানি না প্রায় পুত্রস্নেহে নায়ককে জড়িয়ে ধরে তাঁর দুঃখ জানতে চাইছেন এবং সেই থেকেই ফ্ল্যাশব্যাক এবং চিত্রকাহিনী শুরু। ফ্ল্যাশব্যাক শেষে মিসেস সেনই টেলিফোন করে বলছেন শিল্পপতিরূপী প্রদীপকুমারকে (তিনি তখনও জানেন না মানব তাঁর ছেলে) যেন যেভাবেই হোক তিনি মানবের শিল্পপতির কাছে তার ছদ্ম নাম অমিত) বিপদে তার সহায় হন, অর্থাৎ মানবের সঙ্গেই যেন সন্ধ্যার বিয়ে হয়। জমিদারি যাবার পর প্রদীপকুমারের দুঃস্থ অবস্থা থেকে শিল্পপতি হবার মূলে মিসেস সেনে (তখনও তার বিয়ে হয়নি) ... আর এক মধুর নাট্যকাহিনী। সে যা পরিশেষে পিতা-পুত্রের মিলন, এবং মানব ও সন্ধ্যার মিলন। তাদের মাঝখানে নেই শুধু তখন মানবের মা, তিনি এর আগে ছেলের কোলে মাথা রেখে মারা গেছেন পিতা-পুত্রের মিলন শেষ মুহূর্তে ঘটে বলেই হয়ত তিনি মরবার আগে স্বামী সঙ্গে মিলিত হতে পারেননি। নতুবা মানব তো দুজনেরই ঠিকানা জানত।

কাহিনী নাটকীয় সেণ্টিমেণ্ট-এর, যাঁদে ভাল লাগবার তো লাগবেই। এবং যাঁ হিন্দী ছবিতে ক্রাইম ও ক্যাবারে নাচ দেখে দেখতে অভিস্ত তাঁদের নাট্যসুখ পাব মতই ছবি। পরিচালক অজয় বিশ্ব বিভিন্ন নাট্যঘটনার ক্লাইম্যাক্স তৈরি সত্যিই রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন—ও সব মুহূর্তে দর্শকের মনে যুক্তি-তর্ক বালাই থাকে না। ছবিতে কথা বড্ড বে সংলাপও কেতাবী। তবে প্রথম ভা বিশেষ করে জমিদার-বাড়ির ঘটন শ্রীবিশ্বাস যে পরিচালনার কাজ দেখিয়ে সে খুবই প্রশংসনীয়। এই অংশে

অদেকেন্দ্রে "বড়ী দিদি" (পরিচালক : নরেন্দ্র সুরি) চিত্রের নায়ক-নায়িকা জীতেন্দ্র ও নন্দা

বর্ধমানে প্রদর্শিত বলাকা পিকচার্সের "কৃষ্ণলীলা" চিত্রের একটি দৃশ্য

ছাড়া আরও কয়েকটি দৃশ্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে পরিচালকের কল্পনাশক্তির পরিচয় পাই। আসলে গল্পটিই পরিচালনার কাজে প্রচণ্ড বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অভিনয় মোটামুটি সকলেরই ভাল। বিশেষ প্রশংসার যোগ্য প্রদীপকুমার, অনিতা গুহ ও দেব মুখার্জি'র চরিত্রচিত্রণ। রোমান্টিক হিরো দেব মুখার্জি'কে কিছুটা অস্বচ্ছন্দ মনে হলেও চরিত্রটির নৈরাশ্য তিনি ভালভাবেই প্রকাশ করেছেন। নবাগতা সন্ধ্যাকেও ভাল লাগে। গান (ও পি নায়ার সুরারোপিত) ছবির একটি মূল্যবান সম্পদ। অনেকদিন বাদে হিন্দী ছবিতে হেমন্তকুমারের সুন্দর গান শুনলাম। অন্যান্য গানগুলিও সুগীত।

নাট্য-সমালোচনা

"আমি এ চাইনি

(রূপকার)

আমি এ চাইনি—তীব্র অনুশোচনায় সঙ্গে সন্তু এ কথা জানিয়েছে দর্শককে। সন্তুর অনুতাপ তার বুকে যেমন করে বিঁধে আছে, ঠিক তেমনি গভীরভাবেই আচমকা এসে আঘাত করে দর্শকের মনকেও। সেটা সম্ভব হয়েছে সবিতাব্রত দত্তর শক্তিসম্পন্ন অভিনয়ের গুণে। নাটকে সন্তু তখন অপ্রকৃতিস্থ, তার অবচেতনে কী এক তীব্র অপরাধবোধ। সহজ ও সুস্থ মানুষ সন্তু তার অপরাধবোধের কথা দর্শককে এমনভাবে জানাতে পারত না। এর জন্যই প্রয়োজন ছিল অপ্রকৃতিস্থতার আবরণ, যার ভিতর থেকে একটু একটু করে বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে সন্তুর অন্তরের গ্লানি ও যন্ত্রণা ঠিকরে বেরিয়ে আসছিল। অবচেতনের এই বিশ্লেষণ কোন শিল্পীর পক্ষেই খুব সহজ কাজ নয়। সবিতাব্রত দত্ত 'আমি এ চাইনি' নাটকে (রচনা : সুধাংশু দাশগুপ্ত) কঠিন কাজটি অবলীলায় সম্পন্ন করেছেন।

মনোবিকারগ্রস্ত সন্তু কখনও তার বউদিকে নিজের প্রিয়া ভেবে জড়িয়ে ধরেছে। এইখানে সন্তুর আর এক যন্ত্রণার পরিচয়। বউদি (অরু) চায়, যেভাবেই হোক সন্তু সেরে উঠুক। সেরে যখন ওঠে সন্তু, অর্থাৎ যখন তীব্র এক মানসিক আঘাতের পর গোপন পাপের কথা সে বলে ফেলে তখন পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করার জন্য এসে দাঁড়িয়েছে। ওই গ্রেপ্তারেই কি সন্তুর মুক্তি? অন্তত এই মুহূর্তে সন্তুর মুখে ক্ষীণ হাসির রেখা দেখে মনে হয়, সে যেন প্রায়শ্চিত্তের মধ্য দিয়ে মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছে। পুলিশের হাতে ধরা না পড়লে সন্তু যেন কিছুতেই নিজেকে ক্ষমা করতে পারত না।

শ্রীশমহলে অভিনীত "বিদ্যাসুন্দর" নাটকে বিদ্যা ও সুন্দরের ভূমিকায় শমিতা বিশ্বাস ও রূপক মজুমদার

সন্তুর ট্র্যাজেডি নিয়েই 'আমি এ চাইনি' নাটক। সম্পূর্ণত পোলিটিক্যাল ড্রামা হয়ত নাটকটি নয়, তবে রাজনীতিক প্রসঙ্গের আলোকেই একটি চরিত্রের ভুল-ভ্রান্তি, নৈরাশ্য ও যন্ত্রণার চিত্র এতে আঁকা হয়েছে। সন্তু তো বড় কিছু করবে বলেই বিপ্লবীদের দলে যোগ দিয়েছিল। কিন্তু সন্তু জানত না, ব্যক্তিগত চিন্তা ও

আর্ট মুভীজের "প্রতিবাদ" (পরিচালনা : তপেশ্বর প্রসাদ) চিত্রের মহরতে ক্যাপস্টিক দিচ্ছেন সন্ধ্যা রায়। ছবিটির নায়ক-নায়িকা বিশ্বজিৎ ও মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় ফটো—দেশ

চেতনার বিলোপই বিপ্লবের পথ, দলীয় নীতি। দলীয় সত্যকে জানতে বুঝতে হলে যে কোন প্রশ্ন করা চলবে না ও বুদ্ধিকে যন্ত্র করে তুলতে হবে সেটা সন্তু জানত না। জানত না, এর ব্যত্যয় ঘটলে কোন ক্ষমা নেই; নেতাও যে কোন মুহূর্তে বাতিল হয়ে যেতে পারেন, অন্ধকারে অপমানে তার নির্বাসন ঘটতে পারে। মানুষের ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধির এই নৈতিক হত্যা সন্তু প্রত্যক্ষ করেছে। আর দেখেছে গোঁড়ামি, মস্ত বড়

মূকাভিনেতা যোগেশ দত্তর নতুন ফিচার "চাঁদে মানুষ"-এর একটি মুহূর্ত
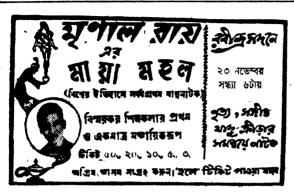
একটা হিসাবের ভুলকে অভ্রান্ত করে চালাবার অন্ধ প্রবণতা, 'ঐতিহাসিক মুহূর্তে' আসার আগেই রণহুংকার। এই ভ্রান্তির বিষময় ফল ভোগ করতে হয়েছে সন্তুকে। সময়ের ভুলে একটি যাত্রিবাহী ট্রেন সে উড়িয়ে দিয়েছে, হাজার হাজার মানুষ মরেছে। সন্তুর বিবেক তখনও মরেনি, তাই গুরুতর অপরাধের বোঝা বইতে না পেরে সে মনোবিকারগ্রস্ত।

এ-দিক থেকে নাটকটি শুধু সন্তুর ট্র্যাজেডিই নয়; গোষ্ঠীগত জীবনের, একটি যুগের ট্র্যাজেডি। অন্ধ নীতি ও কর্মপ্রচেষ্টার ভুলের জন্য কী মর্মান্তিক ঘটনা ঘটতে পারে ব্যক্তির জীবনে, কত মানুষ প্রাণ দিতে পারে, তারই একটি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত বা সমালোচনা এই নাটকে। অথচ নাটকটি প্রচারধর্মী নয়, 'প্রোপাগ্যান্ডা'র নাটক নয় 'আমি এ চাইনি'। এতে বক্তব্য চমৎকারভাবে নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে।

এই নাটক রচনার কাজে যেমন সাহস দেখিয়েছেন নাট্যকার, তার চেয়েও বেশী সাহস দেখিয়েছেন রূপকার নাটকটি অভিনয় করে। একান্তভাবে যুগোপযোগী, আধুনিক প্রসঙ্গের এই নাটক রস ও রোমাঞ্চের ভিতর দিয়ে পরিবেষণ করে রূপকার-গোষ্ঠী তথা পরিচালক সবিতাব্রত দত্ত বিদগ্ধজনের সাধুবাদার্হ হয়েছেন। নাট্যপরিচালনা শুধু সুষ্ঠু বললে কম বলা হয়। পরিচালনার গুণে নাটকে মূল বক্তব্যের অতিরিক্ত রসও এসেছে, কখনও তা রোমাণ্টিকতার, কখনও সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণের।

রূপকারের টিম ওয়ার্ক এক কথায় চমৎকার। প্রধান শিল্পী সবিতাব্রত দত্তর অভিনয়ের কথা আগেই বলা হয়েছে। তাঁর সঙ্গে সমানভাবে পাল্লা দিয়ে বউদি অরু

চরিত্রকে কখনও অস্ফুট নিরাশায় এবং কখনও বা স্পষ্ট আবেগে জীবন্ত করে তুলেছেন গীতা দত্ত। শ্রীমতী দত্তর অভিনয়ে হঠাৎ করে এক ভাব থেকে অন্য ভাবে চলে যাওয়া লক্ষ করার মত। অন্য চরিত্রগুলিও সুঅভিনীত। শিল্পীদের মধ্যে দেবব্রত দে, মধু দত্ত ও সুধাংশু মুখার্জি বিশেষ প্রশংসা পাবেন।

ভি বালসারার সংগীত অনেক মুহূর্তেই নাটকের ভাব অনুসরণ করেছে। তবে তা আরও পরিমিত হতে পারত। তাপস সেনের আলোকসজ্জা ও সুরেশ দত্তর মঞ্চসজ্জা সন্তোষজনক।

"ঈশ্বরবাবু আসছেন"

প্রসিদ্ধ বিদেশী নাটকের অনুসরণে রচিত বাংলা নাটকের অভিনয় আমরা আগেও অনেক দেখেছি। কিন্তু নাটক অভিনয়ের আগে নাট্যকার এবং তাঁর নাটক সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা শোনবার সুযোগ বিশেষ হয় না। মাইমেসিস নাট্য সংস্থাকে ধন্যবাদ তাঁরা গত ১৩ নভেম্বর এই সুযোগ করে দিয়েছেন। ম্যাকসমূলার ভবনে স্যামুয়েল বেকেটের 'ওয়েটিং ফর গোদো' অবলম্বনে তাঁরা 'ঈশ্বরবাবু আসছেন' অভিনয়ের আগে আলোচনা-চক্রের ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রথমে মঞ্চে আসেন ডঃ শচীন গাঙ্গুলী। তিনি বেকেটের সাহিত্যে "আনসার্টেন কম্যুনিকেশন"-এর কথাই বিশেষভাবে বলেন। তাঁর পরের বক্তা ছিলেন ডঃ নরেশ গুহ। তিনি বেকেটের রচনার উপর আলোকপাত করেন। খুব চিত্তাকর্ষকভাবে, অনেকটা সাক্ষাতে আলাপের ঢঙে, বেকেটের 'ওয়েটিং ফর গোদো' সম্বন্ধে বলেন অধ্যাপক পি লাল। নাটকটির নামকরণের তাৎপর্য, বেকেটের মানসিকতা, তাঁর বক্তব্য এবং এক কথায় বেকেট-রহস্য উদ্‌ঘাটন করেন অধ্যাপক পি লাল। তাঁর আলোচনার ফলে শ্রোতারা বেকেটকে যে নতুন দৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলেন তা বলাই বাহুল্য। তারপর অভিনীত হয় 'ঈশ্বরবাবু আসছেন'। অধ্যাপক পি লাল বলেই দিয়েছিলেন, 'ওয়েটিং ফর গোদো' নাটকের 'ট্রানস্লেশন' বা অনুবাদ সম্ভব নয়, 'ট্রানসক্রিয়েশন' হয়ত সম্ভব হতে পারে। তবে গোদোর পরিবর্তে 'ঈশ্বরবাবু' নাম যে সার্থক সে কথা তিনি বলেছেন। গোদো বলতে বেকেট কি 'গড' বুঝিয়েছেন? কিছুটা কৌতুক, কিছুটা ব্যঙ্গের সুরে? সে যাই হোক, আমরা 'ঈশ্বরবাবু আসছেন' দেখলাম। ঈশ্বরবাবু কখনও আসেন না, তার অপেক্ষায় মানুষ একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে, চলে যেতে চাইলেও চলতে পারে না, যখনই এগোবে বলে পা বাড়ায় তখনও সে পিছন দিকে

"তালাশ" (পরিচালক : ও পি রালহান) হিন্দী চিত্রে শর্মিলা ঠাকুর

চলতে থাকে—বেকেটের নাটকে এই বক্তব্য ও ভাবনার আভাষ বাংলা নাটকটিতে আছে। আবার ভিন্ন সুরও এসে গেছে। যেমন, নাটকের শুরুতে পরিচিত ভাটিয়ালি সুর, রবীন্দ্রনাথের গানের কলি, কবিতার লাইন ইত্যাদি। কাজেই 'ঈশ্বরবাবু আসছেন' অবিকল অনুবাদ নয়, একই ভাবের ও রসের একটি বাংলা নাটক—বেকেটের খুব কাছাকাছি এই নাটকে রস যত নেই তার চেয়ে বেশী হচ্ছে কথা, ঘটনা যত নেই তার চেয়ে বেশী হচ্ছে ধারণা। সামান্য ক্লান্তি দর্শকদের প্রাপ্য নিশ্চয়ই, তবু তাঁর বুদ্ধি উত্তেজিত।

শিল্পীদের অভিনয় ভাল হয়েছে বলে নাটকটি দেখতে ভাল লেগেছে। বেশ ভাল অভিনয় করেছেন অশোক সরকার (গদাই), হরিহর দাশগুপ্ত (ভুতো), অরিজিৎ গুহ (হরিপদ)। অন্যান্য চরিত্রে সুঅভিনয়ের জন্য প্রশংসা পাবেন কমল ঘোষ দস্তিদার (নিবারণ) ও স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় (ছেলেটি)। নাটকটি পরিচালনা করেছেন কমল ঘোষ দস্তিদার এবং বাংলায় রূপান্তর করেছেন প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রযোজনাটি সামগ্রিকভাবে প্রশংসনীয়।

"বর্গেবগী" নাটকাভিনয়

ইছাপুর মেটাল অ্যান্ড স্টিল ফ্যাক্টরির ইলেকট্রিক রিপেয়ার রিক্রিয়েশন ক্লাবের প্রযোজনায় নিশিকান্ত বসুরায় রচিত "বর্গেবগী" নাটকটি গত ১৫ নভেম্বর এ টি এস হলে মঞ্চস্থ হয়। নাটকটি পরিচালনা করেন বিশ্বনাথ বসু। ভাস্কর পণ্ডিতের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় দর্শকদের মুগ্ধ করে। এ ছাড়া আলিবর্দীর ভূমিকায় সুখেশচন্দ্র নন্দী, মোহনলালের ভূমিকায় বিকাশচন্দ্র সেন ও গোলাম হোসেনের ভূমিকায় দিলীপ মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় দর্শকদের মনে রেখাপাত করে।

টলি-টিপ্পনী

শ্যাম বিনা ব্রজধাম রে হায় হায়। 'ফ্যান' বিনাও চিত্রতারকার টি'কে থাকা দায়। অথচ এই 'ফ্যান'-এরই দৌরাত্ম্যে সময়ে সময়ে শিল্পী জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। রাস্তায় বের হবার উপায় নেই, স্ত্রী পুত্র পরিবার নিয়ে সন্ধ্যায় একটু সিনেমা-থিয়েটারে যাবার জো নেই, সামাজিকতা রক্ষা করতে আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে যাবেন সেখানেও বিপত্তি, ভিড়ে ভিড়াক্কার। আউট-ডোর লোকেশানে সারাদিন শুটিং-এর পর দিনান্তে একটু বিশ্রাম নেবেন শিল্পী, তখনো দেখা যায় অটোগ্রাফের খাতা হাতে স্বাক্ষর-শিকারীর দল ভিড় করছেন। শিল্পীদের নিশ্চয়ই এক সময় মনে হয়, 'চিড়িয়াখানায় জন্তু-জানোয়ার দেখতেও তো মানুষে ভিড় করে?' এই ট্র্যাজিক প্রশ্নটি কিন্তু অবশ্যই আমার মনে লাগেনি। বাস্তব

কস্তুরী ফিল্মসের "প্রথম প্রতিশ্রুতি" (পরিচালক : দীনেন গুপ্ত) চিত্রে বসন্ত চৌধুরী, কাজল গুপ্ত ও কুমারী বাবুই

ফটো—দেশ

অভিজ্ঞতা থেকে একজন বিখ্যাত নায়িকা দুঃখ করে আমায় বলেছিলেন কথাটি।

এদিকে দেখুন, বিশ্ববিশ্রুত চার্লি চ্যাপলিন একবার খ্যাতির বিড়ম্বনায় হাঁপিয়ে উঠে লণ্ডন শহর থেকে দূরে এক নিভৃত মফস্বল অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছিলেন কিছুদিন। উপলক্ষ, এখানে কেউ তাঁকে চিনতে পারবে না, বিরক্ত করতে পারবে না। রাস্তায় মনের আনন্দে উনি হেঁটে চলে বেড়াতে পারবেন। কয়েক দিন মন্দ কাটল না

সেখানে। কিন্তু তারপরই নাকি শুরু হল অদ্ভুত এক অস্বস্তি। 'এ কি কথা, আমি চার্লি চ্যাপলিন, আর আমার দিকে কেউ একবারও তাকিয়ে দেখছে না!' একদিন আর থাকতে না পেরে সন্ধ্যাবেলার বার কাউন্টারে'-এর পাশের টেবিল থেকে এক-জনকে টেনে এনে নিজের টেবিলে বসালেন। বলেই ফেললেন, জানো আমি কে?' লোকটি তো অবাক। চ্যাপলিন ঘোষণা করলেন, 'আমি চার্লি চ্যাপলিন।' চ্যাপলিনের কথা শুনে লোকটি হেসেই খুন। বললেন, 'ক' পেগ চড়িয়েছ? এরই মধ্যে নিজেকে চ্যাপলিন ভাবতে শুরু করেছ।'

আত্ম-জীবনীতে চ্যাপলিন স্বীকার করেছেন অত্যন্ত মর্মান্তিক সেই মানসিক পরিস্থিতি। শিল্পী-জীবনে 'ফ্যান-প্রভাব'-এর মূল্য যে অপরিসীম, এমন কথা আরো অনেক শিল্পীই অনেক ভাবে বলে গেছেন, কিন্তু চ্যাপলিনের আত্ম-জীবনীর এই ছোট্ট ঘটনাটির বুঝি কোন তুলনা হয় না।

আসলে রজধামে শ্যামের মতই শিল্পী-জীবনে 'ফ্যান'-এর ভূমিকা দুর্বার, অপ্রতিরোধ্য। হরেক রকমের শিল্পীর আবার হরেক রকমের 'ফ্যান' হয়। প্রেসলে-র 'ফ্যান'রা নিশ্চয়ই পিটার ওটুলের 'ফ্যান'দের থেকে আলাদা ধরনের। বাংলা দেশে ছবি বিশ্বাসের অনুরাগীরা নিশ্চয়ই 'গুরু' 'গুরু' রবে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেন না।

নায়িকাদের 'উগ্র অনুরাগী' আবার বেশির ভাগই ছেলে। এবং ওদের বয়স অধিকাংশেরই কুড়ির নীচে। নিজেদের প্রিয় শিল্পীকে ওরা দূর-দূরান্তর থেকে চিঠি লেখে। নানা ধরনের চিঠি, অসংখ্য কৌতূহল: 'আপনি ভাত খান কিনা? আমাকে ভালোবাসেন কিনা, আপনার একটা অটোগ্রাফ করা ফটো পেলে জীবন ধন্য হয়ে যায়' ইত্যাদি-প্রভৃতি ছাইপাঁশ আরো কত কি!

ইদানীং মেদিনীপুর থেকে মাধবী মুখার্জির কাছে একটি অভিনব চিঠি এসেছে। পত্রবাহকের বয়স পনেরোর বেশী নয়, ক্লাস সিক্সের ছাত্র। চিঠির বয়ান: 'শুনলাম, আপনি মা হতে চলেছেন। মা হওয়ার আগে আমার একটি প্রশ্নের জবাব দিন, আপনার কী সাধ—পুত্র-সন্তান, না কন্যা-সন্তান?'

'পনেরো বছরের ছেলের এই প্রশ্ন!' লজ্জায় লাল হয়ে সেদিন বলেছিলেন মাধবী।

*

নিউ থিয়েটার্স এক নম্বর স্টুডিওতে সুচিত্রা সেনের জন্যে আলাদা মেক-আপ রুম। অনেক দিন বাদে আবার স্টুডিও পাড়ায় সুচিত্রা সেনকে দেখলাম। শেষ দেখেছিলাম মাস কয়েক আগে, "মেঘ কালো"র সেটে। এই ক' মাস ছবিটির শুটিং বন্ধ ছিল, গত সপ্তাহে পুনরায় শুরু হ'ল। নীহাররঞ্জন গুপ্তের কাহিনী অবলম্বনে এ ছবির চিত্রনাট্য রচনা করে দিয়েছেন প্রণব রায়। পরিচালনা সুশীল মুখার্জির। প্রযোজনা করছেন সংগীত-পরিচালক পবিত্র চ্যাটার্জি। শ্রীমতী সেনের বিপরীতে "মেঘ কালো"র নায়ক হয়েছেন বসন্ত চৌধুরী। ভদ্রমহিলার হাতে এখন এই একটাই ছবি।

তবে নতুন ছবির কথাবার্তা নাকি চলছে একাধিক। ইতিমধ্যে উনি সইও করেছেন একটা ছবিতে। আশুতোষ মুখার্জির "নতুন তুলির টান" অবলম্বনে ছবির নাম-করণ হয়েছে "নবরাগ"।

—বিচক্ষ

বর্তমানে প্রদর্শিত "চন্দা ঔর বিজলী" (পরিচালক : আত্মারাম) চিত্রে সঞ্জীবকুমার ও পদ্মিনী

মঞ্চে "গুপী গাইন বাঘা বাইন"

একটি প্রখ্যাত কাহিনীর ভিন্ন মাধ্যমে দুটি সমকালীন প্রযোজনায় একটা তুলনা-মূলক বিশ্লেষণ-প্রবণতা যেন অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। 'মলয় গীতবীথি' যে সময়ে শিশুশিল্পীদের দিয়ে উপেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরীর "গুপী গাইন বাঘা বাইন" কাহিনীটি নৃত্যনাট্যের আঙ্গিকে উপ-স্থাপনা করলেন (১২ই অক্টোবর, রবীন্দ্র সদনে), সেই সময়ে সত্যজিৎ রায়ের ছবির কথা বিস্মৃত হয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠানটির পর্যালোচনা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। সত্যজিৎবাবুও এই কাহিনীকে অনেকটা গীতিনাট্যের আশ্রয়ে পরিস্ফুট করেছেন, আর সেইজনাই আলোচ্য অনু-ষ্ঠানের গানগুলির বাণী ও সুর গ্রন্থনার অসারতা আরও বেশী প্রকট হয়ে ধরা পড়ে। 'ধনী-জ্ঞানী-মানী জানি একজনাতেই গড়ে' কিংবা 'সুখ পাথর সুখ দিলে না' জাতীয় গুরুগম্ভীর বাণী-ভারাক্রান্ত এই প্রযোজনার গানের দিকটি সরল-সহজ শিশুচিত্তের মধ্যে কতটুকুই বা সাড়া জাগাতে পারে? আসলে শিশুদের জন্য গানে যে সারল্য থাকা চাই, "গুপী গাইন বাঘা বাইন" নৃত্যনাট্যে তার একান্ত অভাব। দরবারের কালোয়াতী গান (বাগেশ্রী রাগে) কোনো দিক থেকেই সুশ্রাব্য তো হয়ই নি, তার ওপর অকারণ দীর্ঘকাল ধরে ওই গান চলতে থাকায় অনেকেরই ধৈর্যচ্যুতি ঘটবার উপক্রম হয়েছিল।

অথচ নাচে কিংবা অভিনয়ে শিশুরা আশ্চর্য কৃতিত্বের পরিচয় রেখেছে। নিজের চেয়ে আকারে বৃহৎ একটি ঢোলক-সহ বাঘার অভিনয় সুন্দর সপ্রতিভ এবং সার্থক অভিব্যক্তিতে পরিপূর্ণ। গুপীকেও সকলের ভাল লাগবে। সমগ্র অনুষ্ঠানে যে কয়েকটি উপভোগ্য মুহূর্ত সৃষ্টি হয়েছে, তার কৃতিত্ব বস্তুত এদের প্রাপ্য। এই নৃত্য-নাট্যের গান ও সুরারোপ শ্রীশ্যামলেশ ঘোষের। প্রযোজনা করেছেন শ্রীমতী শেলী সান্যাল।

—আনন্দবর্ধন

নতুন বাংলা ছবি

এক সপ্তাহের মধ্যে আবার কয়েকটি নতুন বাংলা ছবির কাজ শুরু হয়েছে। দীনেন গুপ্তের পরিচালনায় কস্তুরী ফিল্মসের প্রথম প্রতিশ্রুতি-র (কাহিনী : আশাপূর্ণা দেবী) শুটিং আরম্ভ হয়েছে। এবারেও তাঁর ছবির চিত্রনাট্যকার অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। শিল্পী : সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, কাজল গুপ্ত, বসন্ত চৌধুরী, ছায়া দেবী, আরতি গাঙ্গুলি, সমিত ভঞ্জ, পার্থ মুখোপাধ্যায়, জহর রায়, নির্মল ঘোষ এবং নবাগতা

সত্যবতী। নীহার রায় সংগীত-পরিচালক।

গত ৮ নভেম্বর আর্ট মুভীজ-এর **"প্রতিবাদ"** ছবির মহরৎ ও শুটিং হয়েছে। তপেশ্বর প্রসাদ ছবির পরিচালক। নায়ক-নায়িকা বিশ্বজিৎ ও মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়।

গান রেকর্ডিং-এর ভিতর দিয়ে প্রগতি চিত্রমের **আবিরে রাঙানো** ছবির কাজ শুরু হয়েছে। অমল দত্ত ছবির পরিচালক। সংগীত-পরিচালনার দায়িত্ব সত্যদেব চট্টোপাধ্যায়ের।

শরৎচন্দ্রের **বিরাজ বৌ** আবার ছবি হচ্ছে। কে সি দাস প্রোডাকশন্স ছবিটি তৈরি করছেন।

ভবানী প্রোডাকশন্স-এর **ছায়াবিষঙ্গ** (পরিচালনা : দিশারী) ছবির কাজ ও গান রেকর্ডিং-এর ভিতর দিয়ে আরম্ভ হয়েছে।

গত ৭ নভেম্বর অনুপম মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় ছবির কয়েকটি গান রেকর্ড করা হয়।

গত ৭ নভেম্বর নিউথিয়েটার্স ২নং স্টুডিওতে অ্যাপোলো পিকচার্স-এর প্রথম প্রয়াস তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের "মঞ্জরী অপেরা"-র মহরৎ সম্পন্ন হয়। ছবিটি পরিচালনা ও সংগীতের দায়িত্ব নিয়েছেন যথাক্রমে অগ্রদূত ও সুধীন দাশগুপ্ত। ছবির প্রধান নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করবেন উত্তমকুমার।

নৃত্যাঙ্গনের "চিত্রাঙ্গদা"

নৃত্যাঙ্গন নিবেদিত রবীন্দ্রনাথের "চিত্রাঙ্গদা" (রবীন্দ্র সদনে ১২ নভেম্বর অনুষ্ঠিত) কলারসিকদের সর্বাংশে খুশী করতে পেরেছে বলে মনে হয় না। প্রতিষ্ঠানটি নতুন, এটি তাঁদের প্রথম বার্ষিক উৎসব. কিন্তু অনুষ্ঠানে যাঁরা যোগ দিয়েছেন তাঁদের অধিকাংশই লব্ধপ্রতিষ্ঠ, স্বনামখ্যাত। তাঁদের ক্ষমতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করি না. কিন্তু প্রাপ্যটুকু না পেলে আশাভঙ্গের বেদনাটুকু বড় বেশী করে বাজে। এ ক্ষেত্রে অবশ্য প্রস্তুতির অভাবটুকুই মুখ্য কারণ বলে মনে হলো।

মণিপুরদুহিতা চিত্রাঙ্গদা শৌর্যে বীর্যে পুরুষের সমকক্ষ। তাঁর বহিঃপ্রকৃতিতে পুরুষের সব লক্ষণ প্রকাশ পেলেও অন্তরে তিনি ছিলেন পুরোপুরি রমণী। তাই অর্জুনকে দেখে তিনি চঞ্চল হয়ে উঠেছেন, প্রত্যাখ্যানে ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন। চিত্রাঙ্গদার ভূমিকায় সুনন্দা সেনগুপ্ত এই ভাবটি পুরোপুরি ফুটিয়ে তুলতে পারেননি। মদনের বরে সুরূপা লাভের পর ওই চরিত্রের চপলতা, আকুলতা এবং লাস্যময়তা সঠিকভাবে প্রকাশ পেয়েছে জয়শ্রী লাহিড়ীর নাচে এবং অভিনয়ে। অর্জুনের চরিত্রে শান্তি বসু, নৃত্য-পরিচালনার দায়িত্বও তাঁরই। নাচের ব্যাকরণে নিখুঁত, কিন্তু একটি চরিত্রের প্রকাশে ব্যাকরণই কি সব? অভিব্যক্তি প্রকাশের দিক থেকে তাঁর ব্যর্থতা প্রকাশ পেয়েছে। অবশ্য ব্রহ্মচারীর তপঃক্লিষ্ট রূপ এবং ক্ষত্রিয়ের বীর্যবান রূপটি তিনি অতি স্বচ্ছন্দে প্রকাশ করেছেন। নাচের অংশে অন্যান্য শিল্পীরা মোটামুটি।

গানের অংশে প্রথম কিছুক্ষণ শিল্পীরা বোধ হয় মুড আনতে পারছিলেন না। সুচিত্রা মিত্রের (তিনিই সংগীত পরিচালক) মত শিল্পীও মনে দাগ কাটতে পারছিলেন না। কিন্তু অল্প পরেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটালেন তিনি। যেন কোন মন্ত্রবলে হঠাৎ তাঁর পুরোনো মেজাজ ফিরে পেলেন। তারপর থেকে শ্রোতারাও মন্ত্রমুগ্ধ। তাঁর কণ্ঠে "রোদনভরা এ বসন্ত", "আমার এ রিক্ত ডালি" এবং ধীরেন বসুর সঙ্গে যুগ্ম কণ্ঠে "কেটেছে একেলা বিরহের বেলা" সানন্দে উপভোগ করা গেছে। ধীরেন বসু গেয়েছেন অর্জুনের গানগুলি। তাঁর গান এবং মদনের কণ্ঠে অর্ঘ্য সেনের গান সেদিন বেশ ভালই উতরেছে।

আবহসংগীতে দীনেশচন্দ্র এবং আলোকসম্পাতে কণিষ্ক সেন তাঁদের পূর্বখ্যাতি, ক্ষুন্ন হতে দেননি।

আর একটি কথা "চিত্রাঙ্গদা" নৃত্যনাট্যে "ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে শুনি অতল জলের আহ্বান" গানটির সঙ্গে পশ্চাৎপটে একটি স্রোতস্বিনী নদীর ছায়াছবি কি সঠিক ভাবপ্রকাশের দ্যোতক?

একক সংগীতের অনুষ্ঠানে দেবব্রত বিশ্বাসের শেষ গানটি স্মরণীয়। "মনে কেন দিলে নাড়া ওগো মানিনী।" সবারই মন ভরিয়ে দেয়।

দিবাকর বর্মা

অল্প দৈর্ঘ্যের চিত্র-প্রদর্শনী

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের "ছোট ফু[illegible] ডালি", "অর্ঘ্য", "পশ্চিমবঙ্গ" "বিবেকানন্দ"—এই চারটি অল্প দৈ[illegible] চিত্র বেহালায় গত ৮ নভেম্বর এক কা[illegible] পূজা প্রাঙ্গণে (নস্করপুর পাঠাগা[illegible] পরিচালনায় ১-এর পল্লী সংঘ আয়োজি[illegible] দেখানো হয়। পরে স্থানীয় শিল্পীরা ভ[illegible] মূলক গান পরিবেশন করেন। ওইদি[illegible] প্রতিমার আবরণ উন্মোচন করেন শ্রীঅশো[illegible] ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্র[illegible] অতিথি ছিলেন চিত্র পরিচালক শ্রীমৃণ[illegible] সেন ও অভিনেতা-গায়ক শ্রীসবিতাব্রত দ[illegible]

অরণ্যদেব লী ফক

‘ভুতুড়ে টিপির উপরে ----
যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, কোম্বাসের মতন এইখানে দাঁড়িয়ে চতুর্দিক দেখে নিয়েছিলেন কিট আর ক্যারিব --

‘তারপর, দড়ি ধরে, পাথরের খাঁজে পা রেখে, নীচে নেমে গিয়েছিলেন।’

আর তিনি ফিরে আসেন নি? তুমি তাহলে এ-জায়গার সন্ধান পেলে কী করে?
বলব, সবই তোমাকে বলব, ডায়ানা।
১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ ... বিদায়ের দিন ...
বিদায়, ওয়াকারুস টেবুক!
আমার এখানে একদিন ফিরব, ক্যারিবো।

দ্যাখো, এখান থেকে টিপিটাকে সেই প্রথম দিনের মতই সোনালী দেখাচ্ছে।
ক্যাপটেন কলম্বাসের সঙ্গে দেখা হবে কিনা কে জানে। তাঁকে সব বলতে হবে।

‘কলম্বাস ইতিমধ্যে অ্যাডমিরাল হয়েছেন। নতুন-বিশ্বে আরও একবার তিনি এসেছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, সোনার শহরের সন্ধান তিনি পাবেনই।’
৪/১০

‘চতুর্থ যাত্রায় দক্ষিণ আমেরিকার আরও অভ্যন্তরে তিনি ঢুকেছিলেন। কিন্তু সোনার শহরের সন্ধান তিনি পেলেন না। এও তিনি জানতেন না যে, এক নতুন পৃথিবী তিনি আবিষ্কার করেছেন।’

ভাসকো ডা গামা ওদিকে ভারতে পৌঁছে সেখান থেকে প্রচুর ধনরত্ন নিয়ে পর্তুগালে ফিরে এলেন।’
‘সকলের মুখে তখন ভাসকো ডা গামার প্রশংসা, আর কলম্বাসের নিন্দা। কলম্বাস তো আর ধনরত্ন নিয়ে ফিরতে পারেন নি।’
মশা-মরা অ্যাডমিরাল!
হা-হা-হা-

কলম্বাসের সঙ্গে কিটের কি আর দেখা হয়েছিল?
হয়েছিল, কিন্তু করুণ সেই সাক্ষাৎ!
১৩

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

কন্যাকুমারী ৬, সূর্যতপস্যা ১০, মেঘ কালো ৪, লালুভুলু ৪॥০ হাসপাতাল ৮॥০ শ্রাবণী ৬, বাদশা ৫, রাত্রি নিশীথে ৭, স্মৃতির প্রদীপ জ্বালি ৯, কাজললতা ৬, তালপাতার পুঁথি ১৫, কিরীটী রায় ১১, ঝড় ১০, অপারেশন ৭॥০ অরণ্য ৬॥০ অস্তি ভাগীরথী তীরে ৭॥০ ধূসর গোধূলি ৫, উত্তরফাল্গুনী ৭॥০ কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী ৭॥০ কালো ভ্রমর ৫॥০ ঐ ৬, কালোহাত ৬॥০ ঘুম নেই ৫॥০ নীলতারা ৫, [illegible] ৮, নূপুর ৪, নিশিপদ্ম [illegible] ৫॥০ রতিবিলাপ ৪॥০ ম[illegible]ষয় [illegible] রজনীগন্ধা ৫, হীরা চুনি [illegible] ৩, ছিন্নপত্র ৫ বহ্নিশিখা ১০, মল্লার ৪, পিয়া মুখচন্দা ৪॥০ রাত্রিশেষ ৩,

প্রবোধকুমার সান্যাল

নগরে অনেক রাত ৪॥০ কাচকাটা হীরে ৪, মহাপ্রস্থানের পথে ৬, আঁকাবাঁকা ৫॥০ আগ্নেয়গিরি ২॥০ উত্তরকাল ৫, জলকল্লোল ৫॥০ তুচ্ছ ৪॥০ নদ ও নদী ৬, বন্যাসঙ্গিনী ৩॥০ বিবাগী ভ্রমর ৮, বেলোয়ারী ৭, শ্রেষ্ঠগল্প ৫, ছোটদের মহাপ্রস্থানের পথে ৩, উত্তর হিমালয় চরিত ১১, মনে রেখো ৮, এক চামচ গঙ্গা ৪,

প্রমথনাথ বিশী

বিপদে সুন্দর তুমি যে ৭॥০ প্রাচীন পারসিক হইতে ৫॥০ লালকেল্লা ১৪, রবীন্দ্র সরণী ১০, অনেক আগে অনেক দূরে ৪॥০ কেরী সাহেবের মুন্সী ৮॥০ গল্পপঞ্চাশৎ ৮, নিকৃষ্ট গল্প ৫, মাইকেল মধুসূদন ৪॥০ রবীন্দ্র কাব্যপ্রবাহ (দুই খণ্ড একত্রে) ১০, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ৫॥০ চিত্রচরিত্র ৬, বিচিত্র উপল ৪, এলার্জী ৩, প্রাচীন আসামী হইতে ৪, বঙ্কিম সরণী ১০,

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

অদৃষ্ট রহস্য ৩॥০ তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ ১ম—৮, ২য়—৮, অবধূত ও যোগিসঙ্গ ৭,

প্রফুল্ল রায়

সমুদ্রে ৫, তাটিনী তরঙ্গে ৬, প্রথম তারার আলো ১০, নাগমতী ৫, কিন্নরী ৪॥০ পূর্বপার্বতী ১১, আলো-হাওয়ার ৬॥০ অন্য ভুবন ৪॥০

প্রশান্ত চৌধুরী

কান পেতে শুনি ৫, নদী থেকে সাগরে ৮, ঘণ্টাফটক ৪, ডাকো নতুন নামে ৪, আলোকের বন্দরে ৪॥০ গোধূলি রঙ্গীন ৫, সেই মেয়ে সুজাতা ৭,

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

মেঘ ও মৃত্তিকা ৫, পূর্বাচল ১১, চন্দনবাঈ ৫, তরঙ্গের পর ৫, উপকূলে ৩, অন্য দেশ অন্য দাহ ১৫, নায়িকার মন ৪॥০ ক্লান্তবিহঙ্গী ১১, শহরে বন্দরে ৪॥০

প্রেমেন্দ্র মিত্র

পা বাড়ালেই রাস্তা ৫॥০ স্বপ্নতনু ৪॥০ অমলতাস ৫,

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

স্বর্গাদপিগরীয়সী ১ম—৫, ২য়—৫॥০ ৩য়—৬, দোলগোবিন্দের কড়চা ৬, কথাচিত্র ৩, কবি ও অকবি ৩॥০ ক্ষণ অন্তঃপুরিকা ২॥০ গল্পপঞ্চাশৎ ৯, নয়ান বৌ ৬, মিলনান্তক ৪॥০ আর এক সাবিত্রী ৫,

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পথের পাঁচালী ৬॥০ অপরাজিত ১০, ইছামতী ৮, বিভূতি-বিচিত্রা ১২॥০ আরণ্যক ৬॥০ অভিযাত্রিক ৫॥০ আদর্শ হিন্দু হোটেল ৪॥০ ঐ নাটক ২, উৎকর্ণ ৪, কিন্নর দল ৩, কুশলপাহাড়ী ৫, গল্পপঞ্চাশৎ ৯, দেবযান ৬, মুখোশ ও মুখশ্রী ৩॥০ মেঘমল্লার ৪, যাত্রাবদল ২॥০ শ্রেষ্ঠগল্প ৫॥০ অরণ্য মর্মর ৭, অশনি সংকেত ৫, অনুবর্তন ৬, অথৈজল ৫॥০ লবটুলিয়ার কাহিনী ৩, দৃষ্টি প্রদীপ ৭, নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব ৪,

বিমল কর

বাড়ীবদল ৪, সীমারেখা ৪॥০ খোয়াই ৩, পান্থশালা ৩॥০ জীবনায়ন ৫, পরবাস ৪॥০ যাদুকর ৫॥০ সঙ্গিনী ৪,

বিমল মিত্র

কলকাতা থেকে বলছি ৬, তিন ছয় নয় ৬॥০ একক দশক শতক ১৭, বেনারসী ৬, কড়ি দিয়ে কিনলাম ৩০, শ্রেষ্ঠগল্প ৫, সখী-সমাচার ৬,

মনোজ বসু

বন কেটে বসত ১০, গল্পপঞ্চাশৎ ১০, সাজবদল ৫॥০

মহাশ্বেতা দেবী

সুভগা বসন্ত ৪, বায়স্কোপের বাক্স ৬, সন্ধ্যার কুয়াশা ৫॥০ অঞ্জনা ৪॥০ আঁধার মানিক ১২॥০

শঙ্কু মহারাজ

উত্তরস্যাং দিশি ১০,
নীলদুর্গম ৬॥০ পঞ্চপ্রয়াগ ৫, বিগলিত করুণা জাহ্নবী-যমুনা ৭, গহন গিরি কন্দরে ৬, গিরি কান্তার ৯,

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

শ্রীমান শ্রীমতী ৭, নিবেদনমিদং ৭,

মিত্র ও ঘোষ : ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ফোন : ৩৪-৩৪৯২, ৩৪-৮৭৯১

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ : শ্রীদিলীপকুমার দাশ

মেয়েদের কি-মাসে
কয়েকটা দিন ভারি অস্বস্তি
ও যন্ত্রণায় কাটাতে হয়।
সারিডন এ অবস্থায়
অস্বস্তি কাটিয়ে
শুধু যে আরাম এনে দেয়
তা-ই নয়—
শরীরটিও ঝরঝরে
চাঙ্গা ক'রে তোলে।
সারিডন

তিরিশ
উনি
আনন্দের সঙ্গে
পার্লে বিস্কুট খাচ্ছেন
৩০ বছর ধরে...
...এখন অবশ্যি উনি নানা রকমারি বেছে নিতে পারেন—আর ওঁর পরিবারেও বিস্কুট খাবার লোক বেড়ে উঠেছে। উনি খান জেকস্, ওরলে, চীজলিংস্, গ্লিন-এইচ—ভারতের প্রথম মজাদার স্বাদের বিস্কুট—আর বিশেষ ক'রে গ্লুকো ও মোনাকো-ভারতের সবচেয়ে বেশী কাটতির মিষ্টি ও নোন্তা বিস্কুট।
কিন্তু ওঁর মতটাকেই আপনি মেনে নেবেন না যেন—নিজেই সবগুলি যাচাই ক'রে দেখুন। দেখুন কোন পার্লে বিস্কুট আপনার সবচাইতে ভাল লাগে। এই সব বিস্কুটই চমৎকারভাবে তৈরী হয়েছে ভারতের অন্যতম অতি আধুনিক বিস্কুট ফ্যাক্টরীতে।
পার্লে
বিস্কুট
আজই এক প্যাকেট পার্লে কিনে নিন!
গ্লুকো
MONACO
মোনাকো
ORLE
ওরলে
গ্লিন-এইচ
জেকস
CHEESLINGS
চীজলিংস
everest/565 a/PP bn

Binaca
Talc
FREE
Binaca
new

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৭ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৬
শনিবার ২০ অগ্রহায়ণ ১৩৭৬

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সংযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

*

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীশান্তিরঞ্জনকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

*

টেলিফোন
২৩-২২৮৩ ২৩-৮৫৪১

*

চাঁদার হার

কলিকাতায়

বার্ষিক	... ২৫·০০
ষাণ্মাসিক	... ১২·৫০
ত্রৈমাসিক	... ৬·২৫

ভারতে

বার্ষিক সডাক	... ৩০·০০
ষাণ্মাসিক „	... ১৫·৫০
ত্রৈমাসিক „	... ৮·০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	... ৩০·০০
ষাণ্মাসিক „	... ১৫·৫০
ত্রৈমাসিক „	... ৮·০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ ডাকে)

বার্ষিক সডাক	... ৫২·০০
ষাণ্মাসিক „	... ২৬·০০
ত্রৈমাসিক „	... ১৩·০০

আসাম অঞ্চলে
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	... ৩৯·০০
ষাণ্মাসিক	... ১৯·৫০
ত্রৈমাসিক	... ১০·০০

দাম ৫০ পয়সা
উত্তরবঙ্গ ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাসুল ৭ পয়সা

DESH

Saturday 6 Dec., 1969

পশ্চিমবঙ্গে শীতের লড়াই

শীতের শুরুতে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক আবহাওয়ার মধ্যেও একটা পরিবর্তন এসে গেছে। ওপর মহলে পরিবর্তনটা ঠাণ্ডা লড়াইয়ের, আর নীচু মহলে লাঠালাঠি আর খুনোখুনির। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলা কংগ্রেস সত্যাগ্রহ ও অনশন পালন করছেন। কিছুটা বিচিত্র হলেও ব্যাপারটি উপেক্ষা করা চলে না। হিংসাত্মক ঘটনা ও অরাজকতা এই রাজ্যে এমন একটা অবস্থায় এসে পৌঁছেছে যে, এর পরও তাকে সহ্য করা বা চলতে দেওয়া উচিত নয় বলে বাংলা কংগ্রেস যদি মনে করে থাকেন তবে আমরা তাঁদের কোনো দোষ দিতে পারি না। তবে কথা হল, এই অনশনে কিবা লাভ ?

শুধু বাংলা কংগ্রেসই বা কেন, যুক্তফ্রণ্টের অন্য বড় শরিকরাও অনেকে মনে করেন, মার্কসিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি দলীয় স্বার্থ সাধনের দিকে নজর রেখে যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছিলেন তাতে অবস্থা এই রকমই হতে বাধ্য। জ্যোতিবাবু এবং হরেকৃষ্ণবাবু যতই মনে করুন না কেন রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা ঠিকই বজায় আছে, তাঁদের সহযোগী শরিক দলের অনেকেই তা মানতে রাজী নয়। পরিণামে যুক্তফ্রণ্টের সরকারী মহলে এবং নেতাদের মধ্যে মতপার্থক্য ও মনোমালিন্য বাড়ছে বই কমছে না। বাংলা কংগ্রেসের সত্যাগ্রহ নিশ্চয় এই রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা এনে দেবে না, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে একটা চাপ যে সৃষ্টি করবে তাতে সন্দেহ নেই। কয়েকটি বড় শরিক দল যে এর পেছনে নৈতিক সমর্থন জানাচ্ছেন তাও তো দেখা যাচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গের লোকজন বেশ সুখে শান্তিতে আছে, এখানে কোনো হাই হামলা হচ্ছে না, বা যা হচ্ছে সবই কংগ্রেস তথা প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্ত এই ছাঁদো কথা এখন আর সবাই শুনতে চায় না। একমাত্র সি পি এম-এর মন্ত্রীরা ছাড়া অন্য কোনো মন্ত্রীও সেকথা তেমনভাবে বলছেন না। বরং প্রত্যহ খবরের কাগজে যে সব হিংসাত্মক ঘটনার বিবরণ প্রকাশ পাচ্ছে তাতে দেখা যায়, লড়াইয়ের একটি পক্ষ প্রায় সর্বদাই সি পি এম সমর্থক। এই অবস্থায় নেহাত অন্ধ না হলে এই রাজ্যের শান্তি শৃঙ্খলা সম্পর্কে উদ্বেগের কারণ ঘটাই সম্ভব।

সামনে ফসল কাটার দিন। ইতিমধ্যেই ফসল কাটা নিয়ে ছোট বড় সংঘর্ষ ঘটে গেছে। যেমন গত দু সপ্তাহে এক মেদিনীপুর জেলাতেই দুশোটি সংঘর্ষ ঘটে গেছে। ধানকাটার লড়াইয়ে নিহত ও আহতের সংখ্যা নিয়ে মতভেদ যতই থাক তাকে উড়িয়ে দেওয়া এবং এ-ব্যাপারে নিরুদ্বিগ্ন থাকা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। স্বভাবতই আজ প্রশ্ন উঠেছে, ফসল কাটার এই মরসুমে অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। বাংলার গ্রামাঞ্চলে আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায় যদিও যথারীতি পুলিসের তবু পুলিস-দপ্তরের মন্ত্রী একাই যে এই দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবেন তেমন মনে হয় না। তাঁর দায়িত্ব নিশ্চয় বেশী কিন্তু সেই সংগে সমস্ত রাজনৈতিক দল ও দলীয় সাঙ্গপাঙ্গদের সংযত ও আইনের প্রতি কিছুটা অনুগত হওয়া দরকার। যদি আইনকে প্রথমাবধি অমান্য করার প্রবণতা থেকে যায়, যা ইতিমধ্যেই এসে গেছে, তবে মনে হয় না পুলিসের পক্ষে এই সব সংঘর্ষ নিবৃত্ত করা সম্ভব হবে। তাছাড়া, ইদানীং পুলিসের ভোল পালটে গেছে, তারা নাকি বিশেষ বিশেষ হুকুমে বিশেষভাবে চলে। এ অভিযোগ আমাদের নয়, যুক্তফ্রণ্টের শরিকরাই সরকারীভাবেই হামেশা অভিযোগটি তোলা হয়।

প্রকৃতপক্ষে এই শীতের মরসুমে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা বলা যায় না। মনে হয় না, আমরা বিশেষ কোনো উন্নতি দেখতে পাব। বরং অনেকেই সন্দেহ করছেন, শরিকী শান্তির জন্যে যে সব নানা প্রস্তাব কাগজে কলমে গড়ে তোলা হয়েছিল তা রাখার মতন মন বা ইচ্ছা সি পি এম-এর নেই। উপরন্তু গত আট মাসে এই দলের মন্ত্রীরা যে সমস্ত প্রধান প্রধান দপ্তর হাতে করে নিয়ে বসেছিলেন তাতে তাঁরা যতটা পেরেছেন দলীয় স্বার্থ বিস্তার করেছেন। আপাতত সেই স্বার্থ আরও প্রবলভাবে রক্ষা করা ছাড়া তাঁদেরও উপায় নেই। মজার কথা, ইতিমধ্যেই সি পি এম জনসাধারণকে হুঁশিয়ার করে দিতে শুরু করেছেন যে, তাঁদের ক্ষমতাচ্যুত করলে পথে পথে লড়াই শুরু হয়ে যাবে। এখন থেকেই নাকি সমর্থকদের শেখানো হচ্ছে কিভাবে তার প্রতিক্রিয়া জানাতে হবে। তবে কি আরও কোনো নতুন পালা শীতের মধ্যেই দেখা যাবে ? কে জানে।

মুখোমুখি

পিছিয়ে গেল তবু কেন এত উত্তাপ

মাস দেড়েক আগে [illegible] পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকারের [illegible] হয়ে গেল। এই সরকারও [illegible] হল। এখন [illegible] না, এ সরকার [illegible] [illegible] ফ্রন্টের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে [illegible]।

বাইরে থেকে কিন্তু মনে হচ্ছে [illegible] গেল। ভেতরের [illegible] অবস্থা আগের চেয়েও অনেক খারাপ। সি পি এম তো তার দলের কর্মীদের যে কোনও অবস্থার জন্য প্রস্তুত থাকতে জরুরী নির্দেশই দিয়ে রেখেছেন। বলেছেন : আমাদের বাদ দিয়ে সরকার গঠনের জন্য সি পি আই [illegible] চক্রান্তে প্রবৃত্ত। যে কোনও মুহূর্তে এখানেও আমাদের বাদ দিয়ে সরকার গঠিত হতে পারে। ওদের সঙ্গে আছে ইন্দিরাপন্থী কংগ্রেসীরা। সুতরাং, আপনারা প্রস্তুত থাকুন। জনগণকে প্রস্তুত করুন। ওরা আঘাত হানলেই [illegible] আঘাত হানব। প্রশাসনকে অচল করে দেব। মাঠে ঘাটে লড়াই চলবে। কলকারখানা বন্ধ হবে। [illegible]

বাংলা কংগ্রেসের [illegible] নিয়েও [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] ধর্মিক দলগুলি এখনই যেন প্রস্তুত হন।

দেড় দু' মাস আগেও অনেকেই অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এখন নানা অসুবিধা দেখা দিয়াছে। তাই, হঠাৎ বড় রকমের একটা কিছু অভাবনীয় ঘটনা না ঘটে গেলে এই ফ্রন্ট সরকার এখনই ভেঙেগ যাচ্ছে না।

*

সি পি এম-এর সাম্প্রতিক কাণ্ডকারখানা দেখে অনেকেই একটু আশ্চর্য হয়ে গিয়েছেন। সি পি এম হঠাৎ এভাবে "গেল, গেল" বলে চিৎকার শুরু করেছেন কেন? হঠাৎ কেন দলের নেতৃত্ব এইভাবে কর্মীদের নির্দেশ দিচ্ছেন? কেন এভাবে কলে কারখানায় মাঠে-ঘাটে প্রত্যাঘাত হানার জন্য সকলকে প্রস্তুত হতে বলছেন? কেন বাংলা কংগ্রেস, সি পি আই এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের অসংখ্যবারের প্রকাশ্য [illegible] সত্ত্বেও বলছেন : ওরা জ্যোতিবাবুর [illegible] থেকে স্বরাষ্ট্র দপ্তর কেড়ে নিতে চাইছে, আমাদের বাদ দিয়ে ইন্দিরাপন্থী [illegible] সঙ্গে হাত মিলিয়ে সরকার গঠনের [illegible] চালাচ্ছে? তবে কি সি পি এম [illegible] ভুল করে গেছে? এভাবে [illegible] উঠেছেন? তাঁরা কি সত্যিই [illegible], তিন শরিক এখন যে কোনও [illegible] বাদ দিয়ে সরকার গঠন করতে প্রস্তুত?

সি পি এম-এর সাধারণ সম্পাদক শ্রী পি সুন্দরাইয়া প্রকাশ্যে বলেছেন, আমাদের হাতে প্রমাণ আছে যে ওরা তিন দল আমাদের বাদ দিয়ে সরকার গঠন করতে উদ্যত। শ্রীসুন্দরাইয়া যদি তার প্রমাণও [illegible] সঙ্গে সঙ্গে হাজির করতেন তা হলে অবশ্য আমাদের বুঝতে সকলেরই খুব সুবিধা হত। তা করেননি। শুধু হুমকি দিয়েছেন। আমার কিন্তু মনে হয় না সি পি এম-এর হাতে তেমন কোনও প্রমাণ আছে। প্রমাণ থাকাও সম্ভব নয়। ধরুন সত্যিই বাংলা কংগ্রেস, সি পি আই এবং ফরওয়ার্ড ব্লক সি পি এমকে বাদ দিয়ে ইন্দিরাপন্থী-দের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিকল্প সরকার গঠনের পরিকল্পনা করে ফেলেছেন। ধরুন, [illegible] এই প্ল্যান অনুযায়ী দিন দশ-বারোর মধ্যে বিকল্প সরকার গঠন করতেও যাচ্ছেন। কিন্তু এমন প্ল্যান করে থাকলেও কি তাঁরা সেটা কাগজপত্রে লিখে-জুখে সইসাবুদ করে রাখবেন? তা নিশ্চয়ই করবেন না। কারণ, এমন কাজ এ দেশের রাজনীতিতে বড় একটা হয় না। হ্যাঁ, মুখে মুখে একটা প্ল্যান তৈরি হতে পারে এবং সেই প্ল্যান অনুযায়ী কাজও হতে পারে। কিন্তু সে প্ল্যান মুখে মুখেই থাকবে, তা নিয়ে লেখাপড়ি হবে না। তাই এ জিনিস হলেও তা প্রমাণ করা কঠিন।

পারিপার্শ্বিক ঘটনা দিয়েও প্রমাণ করা যেতে পারে কোনও জিনিস। কিন্তু এক্ষেত্রে তেমন পারিপার্শ্বিক ঘটনাটিবা কই? অজয়বাবু, রণেনবাবু, অশোকবাবু সকলেই বলেছেন, না, সি পি এমকে বাদ দিয়ে সরকার গঠনের কোনও ইচ্ছা তাঁদের নেই। রণেনবাবু এবং অশোকবাবু এমনও বলেছেন যে, সি পি এমকে বাদ দিয়ে এখানে সরকার গঠন রাজনৈতিকভাবে সম্ভবও নয়। বলতে পারেন, ওরা মনে যা ভাবছেন মুখে তা বলছেন না। তা হতেও পারে। কিন্তু ওরা সবাই মুখে যা বলছেন এখনই কাজে তার বিরুদ্ধাচরণ করবেন, এটাও আমি বিশ্বাস করি না। বাংলা কংগ্রেস তা করলেও করতে পারেন। অন্তত ১৯৬৭ সনে অজয়বাবু তেমন কাজই করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সি পি আই বা ফরওয়ার্ড ব্লক তা করবেন বলে মনে হয় না। এর কারণ এই নয় যে, ওই দুটি দল বাংলা কংগ্রেসের চেয়ে সৎ। এর কারণ, এ দুই দল "জনগণের রাজনীতি", অর্থাৎ "পিপলস পলিটিকস" কিছুটা বোঝেন। তাই জনগণকে বলব এক কথা আর সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ্যে উল্টো কাজ করব—এ নীতি ওই দুটি দলের হাতেই পারে না। ওঁরা যখন সত্যি সত্যিই সি পি এমকে বাদ দিয়ে সরকার গড়তে এগোবেন তখন তার আগে পারিপার্শ্বিকও গড়ে নেবেনই। যেমন প্রস্তুতি গড়েছেন কেরলে দীর্ঘকাল ধরে।

আমি জানি, সি পি এম নেতারাও বিশ্বাস করেন না যে, এখনই সরকার পড়ছে। কিন্তু তাঁরা এটা বিশ্বাস করেন যে, এ সরকারের অকালমৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তাঁদের বাদ দিয়ে বিকল্প সরকার গড়ার চেষ্টা হবেই। তাই তাঁরা আগে থেকেই প্রত্যাঘাত হানা শুরু করেছেন। সেই চিরপুরাতন নীতি—অফেনসিভ ইজ দি বেস্ট ডিফেন্সিভ, আক্রমণই আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ কৌশল। এই অভিযানে যে তাঁরা প্রথম বেশ কিছুটা সাফল্য অর্জন করেছেন তাতেও সন্দেহ নেই। সি পি আই, ফরওয়ার্ড ব্লক এবং বাংলা কংগ্রেস আজ সত্যিই ডিফেনসিভ লড়তে বাধ্য হয়েছেন। বার বার এই তিন দলের নেতাদের ঘোষণা করতে হচ্ছে : না, আমরা কোনও ষড়যন্ত্র করছি না, আমরা সি পি এমকে বাদ দিয়ে বিকল্প সরকার গঠনের কথা ভাবছি না।

আরও জ্যোতিবাবুর হাত থেকে স্বরাষ্ট্র দপ্তর কেড়ে নেওয়ার [illegible] প্ল্যান তৈরি হয়েছিল। দু'তিন মাস আগেও তাঁদের এ চেষ্টা হয়েছিল। তখনও তাঁরা প্রায়ই অভিযোগ তুলেছিলেন সি পি এম এর বিরুদ্ধে: ওরা আইন ও শৃংখলা বিপন্ন করে তুলেছে এবং দলের স্বার্থে প্রশাসন-পুলিসকে ব্যবহার করছে, ওরা মারধোর করে অন্য দলের সংগঠন ভাঙছে। তখন ডিফেন্সিভে ছিলেন সি পি এম।

মনে হয়, এই সুযোগে দলের ভেতরের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক সংকট চাপা দেওয়ার একটা উদ্দেশ্যও আছে সি পি এম নেতাদের। কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে দলের গতি বিধি নিয়ে আগের থেকে সি পি এম এর ভেতরে একটা তীব্র প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। দলের সম্পাদক আগেই শ্রীমতী গান্ধীকে সমর্থন করার ব্যাপারে অত্যন্ত [illegible] তাঁদের ধারণা, এ ব্যাপারে সি পি এম নেতৃত্ব "সংশোধনবাদীদের" পথেই চলেছেন। এনিয়ে দলের নেতৃত্বের ভেতরেও [illegible] মতভেদ আছে। মতভেদ আছে কর্মীদেরও। আর যদি এ নিয়ে প্রকাশ্যে আলোচনা শুরু হয় তা হলে দলের সর্বস্তরে একটা বড় রকমের সংকট দেখা দেওয়ার আশংকা আছে। সি পি এম নেতৃত্ব জানেন [illegible] এ ব্যাপারেও সি পি এম নেতৃত্ব কিছুটা সফল হয়েছেন। [illegible] চক্রান্ত বর্ণনা করছে।

✻

বাংলা কংগ্রেস, সি পি আই এবং ফরওয়ার্ড ব্লক নেতৃত্ব যে আজ সি পি এম এর [illegible] প্রধানত কর্মী এবং সমর্থকদের চাপেই। এই চাপটা বাংলা কংগ্রেসের উপর সবচেয়ে বেশি। সি পি এম এর জোতনীতির ফলে গ্রামাঞ্চলে বাংলা কংগ্রেসের কর্মী ও সমর্থকরা আক্রান্ত হয়েছেন। বাংলা কংগ্রেস প্রধানত গ্রামাঞ্চলের দল। গ্রামাঞ্চল থেকে তাই বাংলা কংগ্রেস নেতৃত্বের উপর বিরাট চাপ পড়ছে।

বার বার আবেদন আসছে "একটা কিছু করুন" "একটা কিছু করুন।"

চাপটা কিছু অন্য ধরনের হলেও তা প্রচণ্ডভাবে আসছে সি পি আই এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের উপরও। সরকারী সাহায্য সি পি এম-এর পিছনে এসে দাঁড়ানোর এরা সবচেয়ে বেশি ক্ষিপ্ত। সরকারী সাহায্যপুষ্ট হয়ে সি পি এম কর্মীরা প্রতিটি এলাকায় যেভাবে এগোচ্ছেন এরা তা আর সহ্য করতে পারছেন না। তাই এরাও নেতৃত্বের উপর চাপ দিচ্ছেন, "একটা কিছু করুন" "একটা কিছু করুন"।

কিন্তু মুশকিল হয়েছে, এই তিন দলের নেতৃত্ব এখনই কিছু করার ব্যাপারে একমত হতে পারছেন না। সি পি আই এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতৃত্বের একটা বড় অংশ মনে করছেন, গত দু মাসে গোটা দেশের রাজনীতি এমনভাবে পাল্টেছে যে, এখনই কিছু করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়, উচিতও নয়। তাঁরা আরও সময় চান, আরও প্রস্তুতি নিতে চান। তাঁরা শ্রীমতী গান্ধীর আন্দোলন আরও কিছুটা দেখে নিতে চান। তাঁরা বিধানসভায় অচ্যুত মেনন সরকারের পরিণতি দেখে নিতে ইচ্ছুক। এবং সবচেয়ে বড় জিনিস এখানে মানুষের মধ্যে সি পি এম বিরোধী মনোভাবটা আরও বাড়িয়ে নিতে চান। সি পি আই নেতৃত্ব ভেবেছিলেন, ইন্দিরা-গোষ্ঠী কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসবেন এবং বামপন্থীদের সঙ্গে প্রকাশ্যে হাত মেলাবেন। কিন্তু সেটা হল না দেখে তাঁরাও চিন্তিত—তাঁরা প্রধানমন্ত্রীর রাজনীতির পরিণতি আরও কিছুটা দেখে নিতে চান।

ইচ্ছা থাকলেও বাংলা কংগ্রেস একা কিছু করতে পারেন না। কারণ, বিধানসভার পরিস্থিতি গতবারের মত নয়। এবার কিছু করতে হলে সঙ্গে অন্তত সি পি আই ও ফরওয়ার্ড ব্লককে পেতেই হবে। ওদের সাহায্য ছাড়া বিকল্প সরকার গঠন সম্ভব নয়। তাই বাধ্য হয়েই বাংলা কংগ্রেসকেও পিছোতে হচ্ছে। কিন্তু চূড়ান্ত কাজটা পিছিয়ে দিলেই যে চুপচাপ হয়ে যেতে হবে তা নয়। বরং চূড়ান্ত মারটা এখন মারা যাচ্ছে না বলেই মুখে বেশি বলতে হচ্ছে।

১-১২-৬৯

নবারুণ গুপ্ত

দেবরাজ

ধর্মের কল

মানুষ ভাবে এক, হয় আর এতো নিত্যিই হচ্ছে দুনিয়ার রাজনীতিতে। কথাটা হয়তো মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সনের মনে পড়েছিল যখন তাঁর এত পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও সুপ্রীম কোর্টের অ্যাসোসিয়েট জজ হিসেবে ক্লেমেণ্ট হেন্সওয়ার্থকে নিয়োগ করার যে সুপারিশ তিনি করেছিলেন তা সিনেট বাতিল করে দিলে। হেন্সওয়ার্থকে সুপ্রীম কোর্টে নিক্সন বসাতে চেয়েছিলেন, আবে ফর্টাসের জায়গায়। ফর্টাস ইস্তফা দেন তাঁর কেলেংকারি ধরা পড়ায়। ফর্টাস চলে যেতে নিক্সন খুশি হয়েছিলেন এই ভেবে যে, এবার তিনি মনের মত লোককে সুপ্রীম কোর্টে পাঠাতে পারবেন। বিস্তর তোড়জোড় তিনি করেও ছিলেন, ধরেও নিয়েছিলেন তাঁর চাল এমন পাকা যে তা ভেস্তে যাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। ইদানীং ডেমোক্র্যাটরাই তো সুপ্রীম কোর্টের জজদের নিয়োগ করার সুযোগ পেয়েছে। তাদের পছন্দ প্রেসিডেন্ট নিক্সনের মনের মত হওয়ার কথা নয়—হয়ও নি। তিনি এখন চান সুপ্রীম কোর্টকে আস্তে আস্তে নতুন করে গড়ে তুলতে।

সুপ্রীম কোর্টের জজদের আমেরিকায় নিয়োগ করেন প্রেসিডেন্ট নিজেই, কিন্তু সিনেট সে নিয়োগ মঞ্জুর করলে তবেই সেটা পাকা হয়। ইচ্ছে করলে সিনেট সে নিয়োগ বাতিল করতেও পারে, আবার মঞ্জুর করতেও পারে। তবে মঞ্জুর করাই হচ্ছে রেওয়াজ। কদাচিৎ সিনেট বেঁকে বসে প্রেসিডেন্টের সুপারিশ মেনে না নিয়ে তাকে জব্দ করে। অন্তত গত ত্রিশ বছর সিনেট তা করে নি। কোনও কোনও জজের চাকরি নিয়ে টানাটানি হয়েছে, তর্কবিতর্ক চলেছে, তুমুল আপত্তি উঠেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেন্টের মান সিনেট রেখেছে, তাঁর পছন্দ মত লোককেই জজের পদে বহাল করেছে। বোধ হয় সে কথা ভেবেই নিক্সন হেন্সওয়ার্থকে সুপ্রীম কোর্টে বসাবার চেষ্টা করতে সাহস পেয়েছিলেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল যত হইচই তাঁর সুপারিশ নিয়ে হোক না কেন, নতুন কোনও নজির তৈরি হবে না—বিস্তর কথাকাটাকাটির পর সে সুপারিশ সিনেট মেনেই নেবে।

তাঁর সে আশায় ছাই পড়েছে। হেন্সওয়ার্থকে নিয়ে শুধু বচসাই হয়নি সিনেটে, রীতিমত ভোটাভুটিও হয়েছে। মুখ কালো করে নিক্সনের জুটি ভাইস প্রেসিডেন্ট অ্যাগ্নিউকে বলতে হয়েছে সিনেটের অধ্যক্ষ হিসেবে প্রেসিডেন্টের সুপারিশ বাতিল, কেননা হেন্সওয়ার্থকে সুপ্রীম কোর্টে জজিয়তি করতে দিতে বেশীর ভাগ সদস্যেরই আপত্তি। প্রেসিডেন্টের দলবল এত তদ্বির করেও তাঁর পক্ষে ৪৫ জনের বেশী সদস্যকে ভোট দেওয়াতে পারেনি। ওদিকে বিপক্ষে ভোট পড়েছে ৫৫ জনের। অথচ ভোট নেওয়ার আগে পর্যন্ত নিক্সনের ধারণা ছিল ভোটের পাল্লাটা তাঁর দিকেই ঝুঁকবে। যদি তা নাও হয় পাল্লা দুদিকেই হবে সমান—তখন অধ্যক্ষ অ্যাগ্নিউ তাঁর কাস্টিং ভোট দিয়ে জিতিয়ে দেবেন তাঁর বাছাই করা প্রার্থীকে। চেষ্টার ত্রুটি তাঁর দিকে ছিল না। কাউকে মিষ্টি কথা বলে, কাউকে চোখ রাঙিয়ে, কাউকে বা লোভ দেখিয়ে তিনি কেল্লা ফতে করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তেই কিন্তু কিছু হলো না। ডুবলেন হেন্সওয়ার্থ, সঙ্গে সঙ্গে নিক্সনও।

কেন সিনেট প্রেসিডেন্টকে এভাবে একটি চপেটাঘাত করলো তার অনেক ইতিহাস। এর পেছনে আছে রাজনীতি তো বটেই, আছে সুপ্রীম কোর্টের মর্যাদা বজায় রাখার চেষ্টাও। সুপ্রীম কোর্টের ওপর আমেরিকানদের অনেক ভরসা। জেনেশুনে সেখানে এমন কোনও লোককে তারা পাঠাতে চায় না যার কোনও দুর্নাম রটেছে। জজ হিসেবে আবে ফর্টাস তো মন্দ ছিলেন না। তাঁকে যেতে হলো তাঁর আচরণ সন্দেহের অতীত ছিল না বলে। এমন কোনও লোককে যদি নিক্সন তাঁর জায়গায় বসাতে চাইতেন যাঁর আচার ব্যবহার নিয়ে একটি কথাও কখনও ওঠেনি তা হলে সিনেট কোনও আপত্তি জানাতো না—সারা দেশে তুমুল বাদবিতণ্ডা হলেও। কিন্তু গোল বাধালো হেন্সওয়ার্থের দুচারটে পুরোনো কেলেংকারি। কারখানায় যারা কর্মী তারা তাঁর ওপর প্রসন্ন ছিল না তাঁর সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির জন্যে। তারা জোর প্রচার চালিয়েছিল তাঁর বিরুদ্ধে। কিন্তু তাতেও হয়তো কিছু এসে যেতো না যদি না প্রমাণ পাওয়া যেত যে জজ হিসেবে তিনি সব সময়ে সোজা পথে চলেন নি।

যে ধরনের অভিযোগ উঠেছিল আবে ফর্টাসের বিরুদ্ধে তেমন অভিযোগ শোনা গেল হবু জজের বিরুদ্ধেও। দেখা গেল এমন একটা কোম্পানির পক্ষে একটা মামলায় তিনি রায় দিয়েছেন যার একটা শাখা প্রতিষ্ঠানে তাঁরই টাকা খাটছে। তারপর এ খবরও বেরিয়ে পড়লো যে একজন নামকরা জোচ্চরের সঙ্গে তাঁর খুব দহরম-মহরম। এ সব হয়ে দাঁড়ালো নিক্সনের বিপক্ষদের হাতে মোক্ষম অস্ত্র। আমেরিকার সবচেয়ে বড় শ্রমিক সংগঠন স্পষ্ট বলে দিল সিনেটের মেম্বারদের যাঁরা হেন্সওয়ার্থের পক্ষে ভোট দেবেন তাঁদের তারা দেখে নেবে পরের বারের নির্বাচনে। নিক্সন কিন্তু দমলেন না। তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরাও সকলকে জানিয়ে দিলে প্রেসিডেন্টকে যিনিই অপদস্থ করবেন তাঁর সুপারিশ নামঞ্জুর করে রিপাবলিকান দলে তাঁর আর ঠাঁই হবে না। ঘাবড়ে গেলেন অনেক রিপাবলিকান দলের সদস্য। কিন্তু ধর্মের কল বাতাসে নড়লো। হার হলো রিপাবলিকান দলের। তাদের জারিজুরি কিছুই টিঁকলো না। সুপ্রীম কোর্টের জজের আসন খালিই রইলো।

নিক্সনের কেবল ইজ্জতই গেল না গেল আরও অনেক কিছু। এর পরে তাঁর ইচ্ছে মত লোককে তিনি আর সুপ্রীম কোর্টে পাঠাতে পারবেন কিনা সন্দেহ। তার চেয়ে আরও বেশী ক্ষতি হবে তাঁর দলের। হেন্সওয়ার্থকে জজ করতে চেয়েছিলেন নিক্সন দলের স্বার্থে। দিগ্‌গজ আইনবিশারদ বলে হেন্সওয়ার্থের কোনও নাম আমেরিকায় নেই। আছে মুরুব্বির জোর। সে মুরুব্বি যে সে নয়—মার্কিন দেশের দক্ষিণ অঞ্চলের ধুরন্ধর চাঁই স্টর্ম থার্মণ্ড। দক্ষিণ কারোলিনার ওই সব নেতারা তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন বলেই নিক্সন নির্বাচনে বাজীমাত করতে পেরেছিলেন। তাদের ধার শোধ খানিকটা তিনি করতে চেয়েছিলেন তাদের অনুগ্রহভাজন লোককে সুপ্রীম কোর্টে জজিয়তির জন্যে সুপারিশ করে। যোগ্যতা অযোগ্যতার প্রশ্ন তিনি তোলেনও নি, বিচার করে দেখেনও নি। কিন্তু তিনি না দেখলেও দেশের সাধারণ লোকেরা দেখেছে, দেখেছে শ্রমিকরা। তারই ফলে নিক্সনের এত ছলাকলা চাতুরি সব ব্যর্থ হলো। জয় হলো জনমতের, অক্ষুণ্ণ থাকলো ন্যায়ের মর্যাদা।

চেন-ওয়র্ক

আবার সেই চিঠি।
[illegible]মালয়-পর্বতের বাবা ওঁ ওঁ স্বামী [illegible] ভৈরবের নাম প্রচারের জন্য এই [illegible] লিখেছেন যে—" বাক্যটা অনাবশ্যক। [illegible] বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই জানেন যে, এর পরে [illegible] অর্থাৎ অবিলম্বে এই চিঠির নকল, পনেরোটি বা কুড়িটি কপি [illegible] বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে পাঠিয়ে দিতে [illegible] প্রত্যেকেই আবার একই মহৎ [illegible] কুড়িক [illegible] চিঠি লিখতে বসে যাবেন। এইভাবে [illegible] বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে যাবে, [illegible] প্রতিষ্ঠিত হবে। এই দৈবাৎক্রমে

বাবার কৃপায় যদি লটারীর .....

[illegible] বিলম্ব করবেন না, তাঁরা হঠাৎ পাঁচ হাজার টাকা পাবেন বা ওই রকম অতি [illegible] কিছু তাঁদের ঘটে যাবে—যথা অমুক জায়গার শ্রীঅমুক; আর যে সন্দিগ্ধ নাস্তিক ব্যক্তি চিঠি পাওয়ার পরেও অবহেলা করবেন—নাম-প্রচারের শৃঙ্খল ভঙ্গ করবেন, তাঁদের নানা রকম ভয়াবহ দুর্বিপাক ঘটবে, যথা শ্রীঅমুকের—

তারপরেই হৃৎস্তম্ভনকারী এক ভয়ংকর সংবাদ।

আপনাদের মতোই আমিও বছরে কয়েকবার এই রকম চিঠি পেয়ে থাকি। কতদিন থেকে এগুলো আসছে ঠিক মনে করতে পারি না—অন্তত বছর পনেরো হবে মনে হয়। এবং অনুতপ্ত চিত্তে স্বীকার করছি—প্রতিবারই আমি ওঁ ওঁ স্বামী, কিংবা শ্রীমৎ বোম-বোম পরমহংস কিংবা মহাঘোরা ভৈরবীর আদিষ্ট নাম-শৃঙ্খল ভেঙেছি, অর্থাৎ প্রাপ্তিমাত্রে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি। এই ঘোর পাপের ফলে 'পাঁচ হাজার টাকা পাইবার' অব্যর্থ সুযোগ হেলায় হারিয়েছি এবং ভয়াবহ পরিণামের [illegible]—

কী কী ঘটেছে ঠিক বলতে পারি না। আমার মতো অতি তুচ্ছ প্রাণীর জন্যে ওঁ ওঁ স্বামী অথবা মহাঘোরা ভৈরবী কোনো দারুণ দুর্বিপাক পাঠাননি, ওগুলো তাঁরা আরো জাঁদরেল ব্যক্তিদের ওপরেই বর্ষণ করেছেন—কিন্তু লঘুদণ্ড কি আর দেননি? নইলে একটা নড়া দাঁত তোলাতে গিয়ে ডাক্তার পটপট করে একসঙ্গে চারটেই তুলে দিলেন কেন? আমার ঘন-নিবিড় চুলের অরণ্যে একদা চিরুনির দাঁত ভাঙত (হায় সেই কেশ-গৌরবের দিন!), আজ সেখানে টাকের ওপর চাঁদের আলো ঝিকমিক করে কেন? বছর চারেক আগে চানের ঘরে আছাড় খেয়ে বাঁ-পায়ের হাড়ে ছোট একটা ক্র্যাক হল কেন? কিছু টাকা ধার দেওয়ার পরে টাকা এবং বন্ধু দুই-ই হারাতে হল কেন? অকস্মাৎ জনৈক প্রাচীন ব্যক্তি—যাঁর কিছুমাত্র ক্ষতি আমি করিনি—তিনি আমাকে 'এনিমি—নাম্বার ওয়ান' টাইটেল দিলেন কী কারণে?

বুঝতে পারছি, এগুলো সব গুরু পাপে লঘু দণ্ড—আমার 'নয়ন-মেলক', ইংরেজী মতে 'আই-ওপেনার'। কিন্তু আমার বিমূঢ় নেত্র কিছুতেই উন্মীলিত হতে চাইছে না।

অতএব আবার আমি ওঁ ওঁ স্বামীর অমোঘ নির্দেশটি ছিঁড়ে, জানলা গলিয়ে—রাস্তায় ক্রীড়ারত কয়েকটি উলঙ্গ এবং উলঙ্গপ্রায় শিশুর মস্তকে বর্ষণ করলুম।

বাস্তবিক, পাপ মনের সংশয় যায় না। কিছুতেই আমি হিমালয় কিংবা বিন্ধ্যাচল অথবা জ্বালামুখীর কোনো জ্বালাময় (বা ময়ী) মহামানব-মানবীকে এদের ওরি-

অবিশ্বাসী জোতদারদের কাছে ঐ চিঠি পাঠাও বাবা, খতম হয়ে যাক তারা

জিনেটর বলে ভাবতে পারি না। এক সময় সন্দেহ হত, এ-সব নিশ্চয় ডাক-বিভাগের চক্রান্ত: তাঁরা পোস্ট-অফিসের আয় বাড়ানোর জন্যে এই রকম এক-একটি উট্‌কো চিঠি ছেড়ে দেন, আর যে পায় সে তৎক্ষণাৎ হন্তদন্ত হয়ে কুড়িখানা পোস্ট-কার্ড কিনতে ছোটে। কিন্তু তারপরেই মনে হল, পোস্ট-অফিস কি লুজিং কনসার্ন? আর সরকারী আয় বাড়াবার জন্যে এ-সব ঘোরপ্যাঁচেরই বা কী দরকার, যখন-তখন ট্যাক্স বাড়িয়ে তো দিলেই হল। হাতের কাছে অন্য কিছু না থাক, সিগারেট আর মোটরগাড়ির তেল তো আছেই, এবং টেলি-ফোনধারীরা তো প্রায় মরিয়া হয়ে রবীন্দ্র-গীতি গাইছেন: "দেখি, কেমনে কাঁদাতে পারো।"

না—পোস্ট-অফিস নয়। তবে কি এক-এক সময় কারো উর্বর মস্তিষ্কে কিছু কিছু নিরীহ-নির্ঝঞ্ঝাট লোককে বিব্রত করবার সদুদ্দেশ্যে এই সব রসিকতা চাগিয়ে ওঠে? কিন্তু ধর্ম নিয়ে এরকম বেয়াড়া রসিকতা করবার সাহস কারো আছে নাকি ধর্মপ্রাণ ভারত-পাকিস্তানে (নইলে আমেদাবাদ-

যদি হারানো মস্তিষ্ক ফিরে পাওয়া যায়

খুলনা-জগদ্দল এমন করে দাপিয়ে ওঠে?)? তা ছাড়া প্রায়ই এসব চিঠিতে ভাষা এবং ব্যাকরণের যে নমুনা থাকে, তা থেকে অন্তত রসিকের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় মেলে না। যথা:

"এই বিষয়ে যখন একজন লোক জানিতে পারিল যে, বোম্বাইয়ের একজন লোক ৫০ খানা বণ্টন করিয়া দুই হাজার টাকা পাইলেন। আলিপুরের একজন লোক এই বিষয় জানিয়া ৪০০ পত্রিকা ছাপাইয়া বণ্টন করিলেন এবং প্রতিফলে পাঁচিশ দিনের মধ্যে ৮০০০ টাকা পাইলেন।"

না—ঊনবিংশ শতাব্দীর নিরক্ষরী বাংলা নয়, ১৯৬৯ সালের নভেম্বর মাসে এটি প্রচারিত। এ ভক্তির বিহ্বল ভাষা—এর মধ্যে কোথাও দন্তবিকাশের জায়গা নেই।

কিন্তু যাঁরা এ-সব লিখে (এবং সম্প্রতি ছেপে) ওঁ ওঁ বাবাদের আদেশ প্রচার করছেন (কখনো কখনো ভুল ইংরিজীতেও পেয়ে থাকি), তাঁরা সম্পূর্ণ সফল হচ্ছেন বলে মনে হয় না। আমার মতো অনেক পাষণ্ডের পাল্লায় পড়ে নাম-শৃঙ্খল বার বার ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। সত্যি কথা বলতে কী, দু-একবার পাঁচ হাজার-আট হাজার টাকা অচমকা পেয়ে যাবার এবং কোনো কোনো বন্ধুকে আনন্দিত করবার প্রলোভন আমারও জেগেছে। কিন্তু চিঠি লিখতে আমার নিদারুণ আলস্য আছে—একসঙ্গে দশখানা চিঠি লেখা এ কাঠামোয় নৈব নৈব চ।

আমি এই প্রচারকারীদের একটি সৎ-পরামর্শ দিই। সারা পৃথিবীতে আজ যেটা হয় সবচেয়ে জনপ্রিয় 'পপ' গান: 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।' রেকর্ডটি আমিও শুনেছি। এই গানে আজ আমেরিকা নাচছে, ইয়োরোপ নাচছে, জাপান নাচছে, ইন্দোনেশিয়া-মালয় নাচছে—কলকাতাও কি নাচছে না? যাঁরা বিশ্বব্যাপী মহাবাণী প্রচার করতে চান—তাঁদের পক্ষে এই হল সবচেয়ে ভাল রাস্তা—শর্টকাট! বোম-বোম বাবাদের আদেশটা বেশ 'কাটি' সুরে বেঁধে ফেলুন, তারপর বীটল্‌-ভাইয়েদের কানে একবার পৌঁছে দিন। আর দেখতে হবে না—নর্থ পোল থেকে সাউথ পোল পর্যন্ত মহাবাণী ধ্বনিত হতে থাকবে।

আচ্ছা—আমাদের দু-একজন বড় মস্তানকে এ-রকম একটা চিঠি ঝাড়া যায় না? "কৈলাসের শ্রীমৎ হুং হুং স্বামীর আদেশে সাত দিনে মস্তানি বন্ধ না করিলে, তাহার প্রতিফল—"

এক মস্তান থেকে দশ মস্তান। নির্ভেজাল চেন-ওয়র্ক। কিছু কাজ হতে পারে বোধ হয়—কী বলেন?

ভারতের কর ব্যবস্থায় পরিবর্তনের ইঙ্গিত

সম্প্রতি কর-বিশেষজ্ঞদের সম্মেলনে ভারত সরকারের মন্ত্রী শ্রী পি সি শেঠী ঘোষণা করেছেন যে, ব্যাংক জাতীয়করণের ফলে করভার মোটেই কমবে না। কারণ ব্যাংক জাতীয়করণের ফলে যদি ব্যাংকের আমানত বাড়ে এবং সরকারের হাতে বিনিয়োগ-যোগ্য সম্পদের পরিমাণ বাড়ে, তবে তা কৃষি, শিল্প ও রপ্তানি ক্ষেত্রের প্রয়োজন মেটাতেই কাজে লাগবে। সরকারের অন্যান্য খাতে ব্যয় নির্বাহ করার মত টাকা ব্যাংকগুলির কাছ থেকে পাওয়া যাবে না। সুতরাং যাঁরা আশা করছেন, ব্যাংক জাতীয়করণের ফলে সরকারের হাতে অতিরিক্ত টাকা আসবে এবং সেজন্য করের বোঝা কমতে পারে, তাঁদের নিরাশ হতে হবে। বরং, সরকারের দিক থেকে আরও অর্থ সংগ্রহ করার জন্য করের পরিমাণ হয়ত বাড়াতে হতে পারে। আয়ের বৈষম্য কমাবার জন্য করের হার পরিবর্তিত হতে পারে বলে অনেকে মনে করছেন। কিন্তু নীতিগতভাবে যদিও বড়লোকের উপর বেশি কর ধার্য করে এবং গরীবদের কর প্রদান করার দায় থেকে রেহাই দিয়ে আয় ও ধনের বৈষম্য কমাবার চেষ্টা করা যায়, তবু এ ব্যবস্থায় উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা যে অব্যাহত থাকবে, এরূপ আশা করার কোন কারণ নাই। বেসরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগের অনুপ্রেরণা এবং উৎপাদন বাড়াবার প্রচেষ্টাকে অব্যাহত রাখতে হলে করের প্রান্তিক হার (Marginal rate of taxation) কমানো দরকার। সমাজতান্ত্রিক নীতি অনুসরণ করার যৌক্তিকতা স্বীকার করেও বলা যায়, দেশের জনসাধারণের অবস্থা উন্নত করতে হলে উৎপাদন বৃদ্ধির হার দ্রুততর করতে হবে এবং সেজন্য প্রয়োজন হলে এমনভাবে কর বিন্যাস করতে হবে, যাতে বেসরকারী বিনিয়োগ ব্যাহত না হয়।

ভারতে কর ব্যবস্থায় পরিবর্তন যে আগামী বাজেটে আসন্ন তার ইঙ্গিত এখন থেকেই পাওয়া যাচ্ছে। প্রথমত, গ্রামীণ আয়ের পরিমাণ যে হারে বেড়েছে, গ্রামাঞ্চল থেকে সে পরিমাণে সম্পদ আহরিত হয়নি। সঞ্চয় বৃদ্ধির হার জোরদার করতে হলে এবং চতুর্থ পরিকল্পনার লক্ষ্য অনুযায়ী জাতীয় আয়ের শতকরা বারো ভাগ সঞ্চয় করতে হলে কর-কাঠামোর পরিবর্তন করতেই হবে। দ্বিতীয়ত, সম্প্রতি ভারত সরকার ঘোষণা করেছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের বেতন-কাঠামো পুনর্বিন্যাসের জন্য তৃতীয় পে কমিশন (Third Pay Commission) গঠিত হবে। দশ বছর আগে দ্বিতীয় পে কমিশনের রায় কার্যকর হয়েছিল। এখন তৃতীয় পে কমিশন যে রায় দেবেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের বেতন বেড়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। এই বাড়তি খরচের টাকা কেন্দ্রীয় সরকারকে সংগ্রহ করতে হবে অতিরিক্ত রাজস্ব থেকে। তার ফলে কর-কাঠামোর পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। তৃতীয়ত, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের দশ দফা অর্থনৈতিক কর্মসূচী কার্যকর করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগী হয়েছেন। দশ দফা অর্থনৈতিক কর্মসূচীর অন্যতম অংশ হল শহরাঞ্চলে আয়ের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করা। আয়ের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারিত হলে উদ্বৃত্ত আয় নিশ্চয়ই করের আওতায় পড়বে। দেখা যাচ্ছে, এ ক্ষেত্রেও কর-কাঠামোর পরিবর্তনের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। চতুর্থত, চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার কিছু অদল-বদল বর্তমান আর্থিক বছর শেষ হবার আগেই হতে পারে। পঞ্চম ফিনান্স কমিশনের চূড়ান্ত রিপোর্টও ইতিমধ্যে বেরিয়ে গেছে। পঞ্চম ফিনান্স কমিশনের রিপোর্ট এবং চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার অর্থসংস্থান করার প্রয়োজনীয়তা, এই উভয় পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা কর-ব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন আশা করতে পারি।

এখন দেখতে হবে, কর ব্যবস্থার এই সম্ভাব্য পরিবর্তনের ফলে সাধারণ মানুষের উপর কী প্রতিক্রিয়া হবে। গত কয়েক বছর ধরেই পরোক্ষ করের উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা ভারত সরকার দেখিয়েছেন। রাজ্য সরকারগুলির পক্ষে অবশ্য পরোক্ষ করের উপর বেশি করে নির্ভর করা ছাড়া বিকল্প উপায় নেই। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার পরোক্ষ করগুলির মধ্যে প্রয়োজনীয় জিনিসের উপর অন্তঃশুল্ক (exise duties) ধার্য করার ক্ষেত্রে বেশি উৎসাহ দেখিয়েছেন। তার ফলে করের বোঝা বেশি পড়ছে গরীব জনসাধারণের উপর। যদিও ভারতে জাতীয় আয়ের মাত্র শতকরা ১৪ ভাগ করের মাধ্যমে সংগৃহীত হয়, তবুও এই করের বোঝা বেশি করে বহন করতে হয় গরীব জনসাধারণকে। কর-কাঠামোর যে পরিবর্তন আমরা আশা করছি, তাতে সাধারণ মানুষের যে খুব উপকার হবে, তা মনে হয় না। কালো টাকা (Black money) খুঁজে বার করার মত ব্যবস্থাই সরকার গ্রহণ করে থাকুন না কেন—এক্ষেত্রে প্রশাসন ব্যবস্থা খুব সাফল্যের নিদর্শন দেখাতে পারেননি। অথচ ভারতে কর-বহির্ভূত যত কালো টাকা আছে তার তিন-চতুর্থাংশও যদি সরকার বাজেয়াপ্ত করতে পারতেন তবে গরীব জনসাধারণের উপর থেকে করের বোঝা কমানো যেতে পারত। সমাজতন্ত্রের বুলি আমরা যতই আওড়াই না কেন, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সুদৃঢ় বুনিয়াদ গঠন করার জন্য যে নিষ্ঠা ও দক্ষতা থাকা দরকার, তা না থাকলে কর-কাঠামোর সুষ্ঠু সংস্কার হবে না বলেই বিশ্বাস। ভারতে সম্প্রতি যে রাজনৈতিক পরিবর্তন হয়েছে অর্থাৎ জাতীয় কংগ্রেসে যে দুইটি শিবিরের সৃষ্টি হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনৈতিক কর্মসূচীর রূপায়ণের গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দ্রুত পরিবর্তিত অবস্থার একটি সুফল হল, আজ সাধারণ মানুষও সরকারের অর্থনৈতিক কর্মসূচীর তাৎপর্য বোঝার চেষ্টা করেন। অর্থনৈতিক কর্মসূচী, কর-কাঠামো, ব্যাংক জাতীয়করণের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া—এ বিষয়গুলি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের কৌতূহল আগে খুব বেশি ছিল না। এখন কর-ব্যবস্থার পরিবর্তন হলে কতটা বাড়তি কর সবাইকে দিতে হবে, কর-কাঠামোর পরিবর্তনের ফলে জিনিসপত্রের দাম বাড়বে কিনা অথবা বেসরকারী বিনিয়োগ ও বাণিজ্য ব্যাহত হবে কিনা এবং একজন সাধারণ মানুষকে কতটা ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে, সে সম্পর্কে ভারতের জনসাধারণ এখন অনেক বেশি সতর্ক হয়েছেন। ১৯৬৬ সালে যখন মুদ্রামূল্য হ্রাস করা হয় তখনও সাধারণ মানুষের মধ্যে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছিল। আমাদের জাতীয় আয় খুব অল্প; জীবনযাত্রার মানও খুব অনুন্নত। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন করতে হলে এখন প্রয়োজন দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সম্ভাব্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা। সুতরাং শুধু কর-কাঠামোর পরিবর্তনই নয়, দেশের অর্থনৈতিক কর্মসূচীর সুষ্ঠু রূপায়ণ কিভাবে হবে, সেদিকে সবাই এখন তাকিয়ে আছেন। যেভাবেই অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন হোক না কেন, সাধারণ মানুষের উপর তার কী প্রতিক্রিয়া হবে, তা দেখবার বিষয়। আসছে বছর নতুন বাজেট তৈরি হলে এই প্রতিক্রিয়ার পূর্ণাঙ্গ রূপ ধরা পড়বে।

—সুব্রত গুপ্ত

স্বাভাবিক লাবণ্যের আভা আনবে...
Pond's
Angel Face
পণ্ডস এঞ্জেল ফেস
তরল মেক-আপ
Angel Face
NATURAL ANGEL
MADE IN INDIA
চীজব্রো-পণ্ডস ইনকরপোরেটেড
—আপনাকে পরীর মত অপরূপ ক'রে তুলবে

কং / গ্রেস

সন্তোষকুমার ঘোষ

[যে-ঘটনা দৈনিক তা নিয়ে সাপ্তাহিকে লেখার মুশকিল এই যে, নূতন আনতে পান্তো ফুরোয়; অথবা তপ্ত ভাত পান্তো হয়ে যায়। মজার বিষয়, আপনারা দেখেই নিয়েছেন কং/গ্রেস, ওদিকে কং, এদিকে গ্রেস, যদিও এই টানাপোড়েনে গ্রেসফুল বস্তু অবশিষ্ট সামান্যই।]

[এক]

এ বলবে, বাপু হে, কংগ্রেসের বিষয়ে তোমার লেখার এক্তিয়ার কী, তৎক্ষণাৎ জবাব দেব, কস্মিনকালে কংগ্রেসের চার-আনা সদস্যও ছিলুম না কিনা—সেই আমার অধিকার। যে-বিষয়ে যে যত কম জানে, সে-বিষয়ে সে তত বাগাড়ম্বর করে। রক্তসম্পর্ক থাকলে গীবন রোমক সাম্রাজ্যের উত্থান আর পতনের কথা রচনা করতে পারতেন কি? বাড়ির ভিতরে বসে গোটা বাড়ি দেখা অসম্ভব, বাইরে থেকেই বরং তার চেহারাটা বোঝা যায়।

আজ দলটি যখন দশ আনা ছ আনা ছাঁটে ছাঁটাই হয়ে গেছে, তখন গোড়াতেই বলে দেওয়া ভাল, কংগ্রেসের গোড়াতেই গলদ বিলক্ষণ ছিল। যেকালে শিকপ-মাগকোট থেকে মফস্বলের মোক্তার, সবাই এই দলে সেঁধুতে পেতেন কেননা, দুয়েরই স্বরূপ এবং স্বরূপের প্রয়োজনে পরশাসনের অবসান চাই—সেদিন যথেষ্ট দেখে, আমরা জেনেও জানিনি। জানলেও মানিনি। মানিনি যে, একই সঙ্গে বিশাল অট্টালিক এবং বাখারির দুর্গ সমেত সাধের বোটানিক্যাল বাগানটি বরাবর বজায় রাখা চলে না। সাজানো বাগান শুকিয়ে যায়, জোতদারির অজস্রাধিক দেখে, ছিঁড়েছেও।

আজকে দু' দশক আপত্তি কংগ্রেসের পতাকায়। সাজকথা জাতীয়কে ওইটি যখন দর্পণ করলেনই, তখন কৃপণের মত তারই একটা দুর্ভিক্ষেই অনুকরণ নিজেদের চরকাতে রেখে দিলেন কেন? তীর্থে দেবতাকে যে-ফল নিবেদন করা হয়, সে ফল পরে কি কখনও মুখে দাঁত বসাতে আছে? চরখা আর অশোক-চক্রের দুঃসম্ভাবিতম পার্থক্য সাধারণকে অনুবীক্ষণ দিয়ে দেখতে হয়। ফলে এই দুই দশক ধরে এই পতাকা অনেককেই করেছে বিভ্রান্ত। রাষ্ট্রীয় পতাকাও তার প্রাপ্য সম্মান পায়নি।

এবার প্রতীক হিসাবে জোড়া বলদ। দুটি বলদ অতঃপর দুই গোয়ালে গিয়ে ঢুকবে, এই শঙ্কা রসিকতা বৃথা। অন্তত বাংলা দেশে আমরা অভিজ্ঞতা থেকে জানি, প্রতীক হিসাবেও দুটি এই মুলুকের হাটে বিশেষ বিকোয়নি। প্রগতির প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ দলের প্রতীক আর একটু কালোচিত হলে ভাল হত।

যা হবার, তাতো হয়ে গেল, অতঃপর গান্ধিনগর, অতঃপর বোম্বাই। গোড়ার গান্ধিনগরের কথা ছিল না, ছোট তরফের (যাকে রেসিডুয়ারি কংগ্রেসও বলতে পারি) বৈঠকের স্থান ধার্য করেছিল সুরাট। সুরাটের নামে ইতিহাসের ছাত্রদের স্মৃতি শিহরিত হবে। সেই সেখানেই বঙ্গভঙ্গের পর সুরাট। চরমপন্থীদের সঙ্গে নরমপন্থীদের প্রথম মুখোমুখি কলিশন। যা এক ছিল, তা যদি দুই হয়-হয়—স্পষ্টতই সভা পণ্ড। তবু নরমপন্থীরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে চরমপন্থীদের ঠেকিয়ে রাখলেন, রাখলেন ১৯১৬ সন পর্যন্ত। ইতিহাসের সাক্ষ্য এই। ইতিহাস, কথায় বলে, আপনা মেরুর চারপাশে ঘোরে। কখনও আবার ঘোরেও না।

[দুই]

দুই অঙ্কের মাঝখানে এখন নাটকের বিরতি। বিরতির সময়ও সাজঘরে অবশ্যই অলক্ষিততর কর্মচাঞ্চল্য থাকে, তবে সেদিকে উঁকি দেব না। শুধু দৃশ্য যেটুকু উন্মোচিত হয়েছে, তার বিশ্লেষণে রত থাকি।

সন্দেহ নেই, সন্দেহ নেই শ্রীমতী গান্ধী জিতেছেন, জিতেছেন। চুম্বকের বড় আকর্ষণী, সেই ক্ষমতার চুম্বক তাঁর হাতে। আলোকের দিব্য জ্যোতি, সেই জ্যোতি তাঁর চক্ষু, তাঁর প্রিয়দর্শিনী ব্যক্তিত্বে। তবু তিনি যখন বলছেন, "তিষ্ঠ তিষ্ঠ ক্ষণকালম্", তখন আমরাও হিসাবটা খতিয়ে নিই। এই লেখাপড়া তাঁরই সহায়ক হবে, যেহেতু সামনে লড়াই। লড়াইয়ের পর লড়াইয়ে জয়মাল্য তাঁরই গলায় পড়েছে, কিন্তু ইতিহাসের ছাত্রেরা এ-ও জানেন, লড়াই অর্থাৎ 'ব্যাট্‌ল' মানে গোটা 'ওয়ার' নয়। লড়াইয়ের পর লড়াইয়ে যোগফল মিলিয়ে হয় যুদ্ধ আর সেই যুদ্ধ—এই শতকে আমরা অন্তত দুবার দেখেছি—দীর্ঘস্থায়ী হতে বাধ্য। ম্যাজিনো লাইনের অনেক দূরে কোথাও একটা স্টালিনগ্রাড থাকে।

এক লড়াইতেই কেল্লা ফতে হতে পারে, যদি পারমাণবিক অস্ত্র থাকে হাতে। দিল্লিতে তলবী এ-আই-সি-সি'র সভায় এটা স্পষ্ট যে, পারমাণবিক অস্ত্র এঁদের

হাতে নেই, থাকলেও সদ্য-সদ্য প্রয়োগে ইচ্ছা নেই। ধূম অবশ্য উদ্‌গীরিত হচ্ছে যথেষ্টই, কথার ধোঁয়া, এবং ধূম সব ক্ষেত্রেই বহ্নির প্রমাণ নয়।

এই দেখুন না, কোথায় ছিলেন টি-টি-কে, রাজনৈতিক বানপ্রস্থে চলে গিয়েছিলেন কবে, তিনি হঠাৎ দড়বড়ি ঘোড়া চড়ি ফিরে এলেন রঙ্গস্থলে। যিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে, তাঁর অর্থ-মন্ত্রিত্ব কালে টাটাদের কপালে মারসেডিজ ট্রাকের লাইসেন্‌স মেলে, বিড়লাদের ভাগ্যে রিহান্দ-অ্যালুমিনিয়াম কারখানার শিকে ছেঁড়ে, তিনিই কিনা আজ মনোপলি ক্যাপিটালের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নাইট-ক্যান্ডেলিয়ার! তিনিই প্রগতিপন্থী শিবিরের বৈষয়িক পরামর্শদাতা—নব কৌটিল্য! ফুটন্ত সমাজতন্ত্রীকরণের তারুণ্যের উপরে এক ঘড়া ঠান্ডা জল ফেলে টি-টি-কে বললেন, ধীরে, রজনী ধীরে। হায় যা চক্‌চক্ করে তা-ই স্বর্ণ নয়, প্রবলতর শিবিরে আশ্রয় গ্রহণই প্রগতিবাদ নয়।

তরুণ তুর্কীরা, ইতিমধ্যেই, হতাশ, তিক্ত। জোয়ারের টানে যতদূর সম্ভব এগোনো গেছে, এখন অমল ধবল পালে মন্দমধুর

চালে তরী ভাসাই—প্রধানমন্ত্রীর এই যদি হয় মনের কথা, তবে সবাই মিলে যারা বৈঠা নিয়েছে, তাদের নিসপিস হাত থামিয়ে রাখা শক্ত হবে। তবে অবাক জনমত বলবে, তথাকথিত সিন্ডিকেটের আর দোষ ছিল কী! রয়ে-সয়ে এগোনো, তাঁদেরও তো মনের কথা ছিল এই? "রেডিয়ো-সোস্যালিজম", এই সমাজতন্ত্র কাজে ততটা নয় যতটা তারে বেতারে ঘোষিত।—এই অভিযোগেরও জবাব দিতে হবে।

ইতিমধ্যে অবশ্য সিন্ডিকেটেরও বদলে গেছে মতটা। মত বদল না হলেও রণকৌশল, শ্রীমতী গান্ধীর শিল-নোড়া আর মুষল তাঁরা নিয়েছেন নিজ হাতে। গা থেকে দক্ষিণমার্গী দুর্গন্ধ ঘুচিয়ে দিতে এঁরা বদ্ধপরিকর। এই তরফের নীতিঘটিত বয়ান ঘাঁটলে পিলে-চমকানো সব পটকা ফটাফট ফাটতে থাকে,. তাতে পাবলিক সেকটরের প্রতি ভক্তি, মনোপলির প্রতি কটূক্তি সব আছে। এক কথায় "আউটহেরডিং হেরড" কৌশল. প্রধানমন্ত্রীর চালেই তাঁকে মাৎ করার বাসনা। তবে একটু বেশি দেরি হয়ে গেছে, প্রচার যুদ্ধে একেবারে নাস্তানাবুদ হবার পর। যখন একে একে নিবেছে দেউটি, বংশে বাতি দিতে অতি অল্পই বাকি। কাঠগড়ার কোণঠাসা হবার পর বেকসুর খালাস হয়ে যাবার কপাল সকলের হয় না। মাঝে মোটে এক মাস, ইতিমধ্যে ভাঁটার টানে আরও কিছু পাড় ভাঙা, এবং ভূমিক্ষয় অসম্ভব নয়।

মাঝে মোটে এক মাস, অতঃপর পট উঠছে যেখানে তার নাম শহর বোমবাই। ইংরেজিতে যাকে বলে বিবরে প্রবেশ করে সিংহের সঙ্গে মোকাবিলা,, এ প্রায় তাই। বোমবাই ছিল শ্রী এস কে পাতিলের শক্ত ঘাঁটি। দাঁতের পাটি তেমন মজবুত যদিও নেই, তবু এবে বুড়া হলেও কিছু গুঁড়ো তো রয়ে গেছেই!

সমস্যা শুধু সেখানেই নয়। প্রধানমন্ত্রীর নিজের মন্দুরাতেও লক্ষ অম্বুকুয়ে থরথর উঠিছে বাজিয়া! তরুণ তুর্কীরা অস্থির, অন্তত দিল্লির তলবী সভার সেই অস্থিরতার ছাপ ফুটে উঠেছে। যেন কীর্তনের শেষে কথা ছিল হাতে হাতে বাতাসাও বিলোনো হবে, শেষ পর্যন্ত দিল্লির লাড্ডু বৈ কিছুই জুটল না। শুধু কথা আর কথা, কেবলই দুর্ভাবিতাবলী।

তরুণেরা চান কী? শ্রীমতী গান্ধীকে তাঁদের সাধ ইচ্ছা ইত্যাদির পরিমাপ নিতে হবে। একে তো ব্যাংক জাতীয়করণের সন্তোষলাভই হয়নি, ইতিমধ্যে উপরন্তু সম্পত্তির অধিকারঘটিত মৌল সাংবিধানিক আশ্বাসটি রদ করার দাবি উঠেছে। হয় প্রধানমন্ত্রী এঁদের দাবিতে সায় দিন, নতুবা সবাই মিলে পথচলা দায় হয়ে উঠবে। অধীর নবীনদের বোঝানো কঠিন হবে যে, সম্পত্তির মায়া জড়ানো মানুষের স্নায়ুতে, রক্তে। চট্ করে রদ করে ইনসটিংট-এর চিকিৎসা হয় না। উত্তরাধিকারসূত্রে নিজের ঘরে নিজের অধিকার না হয় লুপ্ত হল, ফিরিয়ে দিলুম ঘরের চাবি, রইল না আর কোনও দাবি, তবু বসবাসের কয়েকটা ন্যূনতম প্রত্যাশা ও শর্ত তো থেকেই যায়! লোকে রুচি এবং স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ চেয়ে ভাড়াটে বাড়িও তো সাজায়! মূলে সেই মায়া। এই মায়া নামক গ্ল্যান্ডটিকে ছেদন না করলে মুক্তি নেই। এবং ছেদন করার সাধ্য নেই কোনও আইনের।

শহরাঞ্চলে সম্পত্তির সীমা নির্ধারণ আর একটি শ্রুতিসুখ শ্লোগান। উত্তম প্রস্তাব, কিন্তু এখানেও বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার বখেড়া। নির্ধারণের নিক্তি কী হবে—আকার না মূল্য। এই মূল্য সারা দেশে এক নয়, শহরে শহরে আলাদা, এমন-কি আলাদা পাড়ায় পাড়ায়ও। শ্যামবাজারে যে বাড়ির দাম এক লক্ষ টাকা, নিউআলিপুরে তার দাম অন্তত তার দ্বিগুণ, আর চৌরঙ্গীতে তো নির্ঘাৎ দশগুণ। যদি সরকার বলেন, পাঁচতলার উপর বাড়ি রাখা চলবে না. চলবে না, তৎক্ষণাৎ ন-দশতলার বাড়ি যে ধনপতি তুলেছেন, তিনি বলবেন, তথাস্তু। নিচের পাঁচতলা আমার নিজের বলে রাখলুম। সরকার বাহাদুর! উপরের চার-পাঁচতলার দখল নিয়ে আপনি প্রসন্ন হোন।

সাধে আর সাধ্যে সুতরাং ফারাক বিস্তর। উপরন্তু সুপ্রিম কোরট হাইকোরটে দৌড়-ঝাঁপের সম্ভাবনা তো আছেই।

যাঁরা দ্রুত খেয়াল চান, তাঁদের বিলম্বিত লয়ে গান শুনিয়ে প্রধানমন্ত্রী খুশী করতে পারবেন কি?

[তিন]

প্রধানমন্ত্রীর আঙিনায় আজ বড় ভিড়। কিন্তু সততার খাতিরে ক্রমে ক্রমে কে-কী-কেন'র আন্দাজও নিতে হবে। কতজন প্রগতির পরমার্থের প্রত্যাশী, কতজন রাজনৈতিক রেফুজি বা শরণার্থী, তার হিসাব চাই। যেহেতু শ্রীমতী গান্ধী বড় বেশি ঝুঁকি নিজের উপর নিয়েছেন—বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি তাঁর সতত-আপসে সম্মত পিতা নন। সবুরে মেওয়া ফলানোর অপেক্ষা তাঁর ধাতে নেই। এবারে তো নিজ দলের উপরও তাঁর নিঃসপত্ন অধিকার, কোনও সিনডিকেটের দিকে চেয়ে "হেডস আই উইন, টেলস ইউ লুজ" বলা তাঁর সাজবে না। এর পরেও যদি সমাজতন্ত্রী যজ্ঞে বাধা পড়ে তবে সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞ-বিঘ্নকারীদের সনাক্ত করে দিতে হবে। বলতে হবে, কে কবে কিসে কোথায় বাগড়া দিয়েছেন। প্রবীণ নেতৃচক্রের বেলায় যেমন অনির্দিষ্ট অভিযোগেই কাজ হয়েছে, ("গত বছর জল ঘোলা করেছিলি, তুই না করিস, তবে তোর" ইত্যাদি) অতঃপর সেই ধরনের নালিশে কাজ হবে না। আজকের ঢিলে কালকের পাখি মরবে না। (বৃহৎ একটি শিল্পগোষ্ঠীর সঙ্গে তৎকালীন বাংলার নেতৃত্বের যে সংঘর্ষ ঘটেছিল, আজকের জোয়ারের তোড়ে গতকালের সেই কথা কিন্তু সম্পূর্ণ বিস্মৃত।)

প্রগতিবাদের মাপকাঠি কী, তারও একটা সাফ সাফ সংজ্ঞা নিরূপিত হয়ে যাওয়া ভাল। যথা কামরাজ। এই সেদিনও যিনি বিরাট সমাজতন্ত্রী হিসেবে মসকোয় তুমুল তারিফ পেয়ে এলেন, তিনি রাতারাতি প্রগতিবিরোধী বনে গেছেন, এরকম রূপান্তর সম্ভব কিনা, তারও বিশ্বাস্য ব্যাখ্যা প্রয়োজন। শোনা যায় ডিভ্যালুয়েশন হয়েছিল কামরাজের অমতে। ডিভ্যালুয়েশনের মূলে মার্কিনী শক্তির চাপ ছিল কি ছিল না, ভাবী ইতিহাসের স্বার্থে অতীতের এই রহস্যের উদ্ঘাটনও প্রয়োজন।

আর কামরাজ-প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীসুব্রহ্মণ্যম। এই সেদিনও খাদ্যমন্ত্রিত্ব নিয়ে তিনি প্রায় বে-ইজ্জত, তাঁর গোঁড়ামিকে তাক করে তীর-ন্দাজদের কত তীর। তিনি কি সেই ছাপ মুছে ফেললেন শুধু খেলার কোরট বদল করে? তাঁকে লক্ষ্য করে কামরাজ অনায়াসেই বলতে পারেন—"তুমি মহারাজ, সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে!

সেছেন প্রাণের দায়ে। বাঙ্গালোরে নেট-প্র্যাকটিসের সময় ঠিক এই চিত্রটি ছিল না, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পহেলা টেসট খেলার সময়ও না। দুই কংগ্রেসের উপর ইদানীং আবির্ভূত হয়েছে তৃতীয় একটি, "নির্দল কংগ্রেস।" দলের মধ্যে নির্দল, এর চেয়ে সোনার পাথর বাটিও কম অলীক। অনুমান করি, নির্দলেরাও ছুটকো ব্যবস্থার ভক্ত হয়েছেন বিবেকের তাড়নায়। সেই বিবেক! সেই অন্তরের নির্দেশ, কোন্ জহুরী বলে দেবে, কার বিবেক সাচ্চা আর কারটা ঝুটা। পাথর একবার গড়াতে দিলে কেবলই ভাঙে।

[চার]

প্রধানমন্ত্রী পরিবর্তন চান, চান গতি। কয়েকদিন ছবিতো তোলা হয়ে গেল, এবার দর্শকের আসনে বসে তিনি দোষত্রুটি যাচাই করে নিন। মঞ্চে এই সুবিধা নেই, চলচ্চিত্রে আছে, আর দেশের রাজনীতি হালে অত্যন্তই চলৎ, এবং চিত্রও বটে।

শ্রীমতী গান্ধী হাতে তুলে নিন তাঁর ওয়ার্কিং কমিটির নতুন বোতলটি, পরখ করুন। সবটাই কি নতুন, না নতুন শুধু লেবেলটি, আর অনেকটাই পুরনো মদ? মুখ্যমন্ত্রীদের অনেকে ইতিমধ্যে ক্ষুব্ধ, কারণ তাঁদের স্থান হয়নি, ক্ষুব্ধ তরুণেরাও, কারণ এই বোতলে তাজা হেমোগ্লোবিন কম, ঝাঁজও বিশেষ নেই। উপরন্তু কী ক্যাবিনেটে, কী কমিটিতে আছে এমন-কিছু মুখ যা পরিণামে তাঁর লায়াবিলিটি। যথা, আয়কর ফাঁকির ব্যাপারে যাঁর দুর্নাম তিনি কেন আসন পাবেন প্রথম সারিতে? আমি সংসদে এই মান্যবর মহোদয়কে দেখেছি। ঝড় বয়ে যাচ্ছে, তখনও তিনি মনে মনে জপছেন, বোবার শত্রু নেই। পুত্তলিকার চক্ষু আছে, দেখিতে পায় না, কর্ণ আছে, শুনিতে পায় না—হুবহু সেই বর্ণনা। কৃষক সমাজ, সাধু সমাজের লেন-দেন নিয়ে যখন অট্টরোল, প্রধানমন্ত্রী নিজে থেকে উঠে বলেও তো দিতে পারতেন, মন্ত্রীদের এত সামাজিকতা সাজে না। কৌশল হিসাবে সেটা হয়ত কাঁচা কাজ হত, কিন্তু নীতির দিক থেকে হত অভিনন্দিত।

রাষ্ট্রপতি-নির্বাচনের আগে যে-জনসঙ্ঘের সঙ্গে বাক্যালাপ করায় শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পার জাত গিয়েছিল, শ্রীমতী গান্ধী, ভেবে দেখুন, সেই সঙ্ঘ সত্যই একেবারে অচ্ছুৎ কিনা। হলে সি-পি-আই বিহারে এবং অন্যত্র এই সঙ্ঘের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধত না। হায়, রাজনীতি শুধু কূট নয়, কৌতুকপ্রিয়ও বটে।

তা-ছাড়া বরাবর সি-পি-আই তাঁর তালে তাল দিয়ে চলবে, মনে হয় না। বামপন্থী মহলে-এই দল আজ আপনার বাম-রঙটি যাতে টিঁকে থাকে, সেই জন্যে যুঝছে।

সি-পি-আইয়ের দায় অবশ্য শ্রীমতী গান্ধীর নয়, কেননা তিনি কম্যুনিস্ট নন, আসলে কেন্দ্রমার্গী, সোশ্যালিস্ট। নতুন ওয়ার্কিং কমিটির বাটনহোলে তিনটি ফিকে লাল গোলাপ থাকা সত্ত্বেও সোশ্যালিস্ট। নজির আছে, তাঁরই পরামর্শে কেরলের প্রথম বামপন্থী সরকার ভাঙে।

নতুন কমিটির একাধিক মুখপানে চেয়ে দেখি, ভয় হয় মনে! যাঁরা আগেও ছিলেন তাঁরা সবাই কোর্তাকামিজের রঙ ফিরিয়ে প্যাঁট বসে।

ভাবীকালের যিনি ইতিহাসকার, তিনি দেখান, প্রগতির নিমতলার ঘাটও চেনেন, কাশীমিত্তিরের ঘাটও চেনেন। সরদার প্যাটেল, আজ কিনা কোন-কোনও মহলে যাঁর পরিচয় দক্ষিণমার্গী প্রতিক্রিয়ার পেট্রন-সেইন্ট বলে, অল্পসময়ের মধ্যেই কিন্তু গোটা ভারতকে এক রাষ্ট্রপাশে বেঁধে দিয়েছিলেন, মানচিত্রের রাজন্যচিহ্নগুলি মুছে ফেলে। সেটা যদি প্রগতি না হয়, তবে প্রগতি কি শুধু নন-অ্যালাইনমেন্টের ত্রিভঙ্গ ঠামটিকে মস্কোর বুকে এলিয়ে দেওয়াকে বলে? হতে পারে, প্রগতির সে-ও একটা অর্থ। তা হলে "ইনিও-ভাল, উনিও-ভাল"-র ঘোরপ্যাঁচ ঘুচিয়ে মনের কথাটিকে অকপট ঠোঁটের ডগায় আনতে হবে।

এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য প্রধানমন্ত্রীকে হেয় করা নয়, কলঙ্কের-অঙ্কন সত্ত্বেও জ্যোৎস্না জ্যোৎস্না-ই। প্রবন্ধের উদ্দেশ্য এটা প্রমাণ করা ছিল না যে, পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই, আয়তনটা অচল হয়ে থাকুক। জনগণের সঙ্গে যদিও সেতুবন্ধ না থাকে, যদি সাধ্য না থাকে তাদের ভিতরে গিয়ে দাঁড়াবার, তবে শুধু ঘরে বসে 'পুশ-বাটন পলিটিক্স' করলে কাজ হয় না। ঘর কৈনু বাহিরের রাস্তা দেখিয়েছেন শ্রীমতী গান্ধী, অসংখ্যের মনে নতুন আশার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন। ক্ষমতার যে-অয়কিডগুলি দুলছে শূন্যে সেগুলিকে শিকড় পাইয়ে দেবার ভরসা দিয়েছেন। তার উপায় শুধু কৌশল নয়, সেই সঙ্গে প্রয়োজন ন্যূনতম সততা। সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর—এই বিশ-বাইশ বছরে কতই তো কথা শুনেছি, কিন্তু "আমি পারি, আমি পারি"র উচ্চ রোলে একজনকেও সততার মুখ চেয়ে আজ অবধি এ-কথা কবুল করতে শুনিনি যে, ফরমাস করা সহজ, কিন্তু পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন কোটি মানুষের রাতারাতি নসীব বদল কঠিন। ফেরিওয়ালার মত রাস্তা দিয়ে "জামা-শেমিজ চাই" হাঁকলেই চলে না, পুঁটুলিটা খুলে বিছিয়ে বসতে হয়, দেখিয়ে দিতে হয়, ভিতরে কী আছে। আজ অথবা আগামী কালের কাণ্ডারীরা যেন মনে রাখেন, এটা সেই কাল যখন শুধু "চাঁদ পেড়ে এনে দেব" বলেই ভোলানো যায় না, পৌঁছেও দিতে হয় চাঁদে।—১-১২-৬৯

ঠিক স্নানের পর মাখালে
আপনার গায়ে একদম মিলিয়ে যায়।

তাহলে বিশেষত্বটা কোথায়? এটাই তো বিশেষত্ব।

এটি এতো মিহি যে অক্লেশে মুখেও মাখতে পারেন!

ভারতের প্রথম প্রকৃত শৌখীন ট্যাল্ক সর্বাঙ্গে মেখে অপার আনন্দ উপভোগ করুন।

Wellcome

পিছে ফিরে দেখা

বাবা ■ নরেন্দ্রনাথ মিত্র

গায়ে কালো রঙের কোট, পরনে ধুতি, পায়ে ফিতে বাঁধা কালো রঙের জুতো এক ভদ্রলোক সকালবেলায় কাজে বেরোবার আগে স্ত্রীপুত্রের কাছ থেকে হাসি মুখে বিদায় নিচ্ছেন—বাবার এই রকম একটি ছবিই আমার বাল্যস্মৃতির দূরতম দিগন্তে ফুটে ওঠে।

আমি দক্ষিণের ছোট বারান্দায় মায়ের পিছনে দাঁড়িয়ে আছি। তাঁর আঁচল আমার মাথায়। ঈষৎ পুরু গোঁফের আড়ালে বাবার মুখে পরিতৃপ্তির হাসি।

তিনি বললেন, 'অমন করে লুকোচ্ছিস কেন পন্টু? আয় সামনে আয়।'

সে কথা শুনে আমি আরো পিছনে সরে দাঁড়ালাম।

বাবা মার দিকে তাকালেন, 'কী ছেলেই এখন তৈরি করছ মেজো বউ। একেবারে আঁচল ধরা হয়ে রইল।'

মা বাবার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন, 'প্রথম প্রথম আঁচল অমন অনেক মহাপুরুষই ধরে। তাতে কী হয়?'

দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। নিঃশব্দে তাঁদের মধ্যে কী কথা হল শুনতে পেলাম না। শুনতে পেলেও কি তখন বুঝতে পারতাম?

বাবা বললেন, 'মেজো বউ, আমার খুতি দিয়ে যাও।'

খয়েরী রঙের ছোট থলি। তাতে নোট আর রুপোর টাকা থাকত, খুচরো পয়সাও থাকত। সেই থলিকে বলা হত খুতি। চামড়ার মানিব্যাগও বাবার ছিল। পরে তাঁর একটি পুরোন ব্যাগের আমি উত্তরাধিকারী হয়েছিলাম। কিন্তু ব্যাগের চেয়ে বাবা খুতিই বেশি ব্যবহার করতেন। মক্কেলদের মামলা মোকদ্দমার খরচ—কাঁচা টাকা পয়সা রাখবার পক্ষে থলিতেই সুবিধে হত বেশি।

ঘরের মধ্যে পশ্চিমের দিকের দেয়াল ঘেঁষা বড় একটি কাঠের আলমারি।

আঁচলের চাবি দিয়ে আলমারি খুলে মা টাকার থলিটি এনে বাবার হাতে তুলে দিলেন।

কোটের পকেটে থলিটি ভরে রাখবার আগে বাবা সুতোর বাঁধনটি খুলে ফেললেন। তারপর ভিতর থেকে একটি একআনি বের করে আমার দিকে এগিয়ে দিলেন, 'এই নাও।'

আমি আনিটি নিয়ে আবার সরে দাঁড়ালাম।

মা বললেন, 'আমাকে কিছু দিয়ে গেলে না?'

'তোমাকে আবার কী দেব। সবই তো দিয়েছি।'

মা বললেন, 'বাজে কথা। নিজে থেকে তুমি কীই বা দাও। আমি জোর করে কেড়ে নিই, তাই।'

বাবা বেরিয়ে গেলেন। দেড় মাইল দূরে ভাঙ্গা শহর। সেখানে উকিলের সেরেস্তায় মহুরিগিরি করেন। এ সব বৃত্তান্ত পরে জেনেছি।

সেই ছেলেবেলায় বাবা বাড়িতে না থাকলেই যেন বেশি স্বস্তি বোধ করতাম। যেদিন শুনতাম রাত্রে বাবা বাড়ি ফিরবেন না, জমিজমা তদারকের কাজে মানিকদি যাবেন—সেদিন মনে মনে বেশ খুশি হতাম।

অথচ বাবা তো শাসন করতেন না, আদরই করতেন। দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন পুরুষ। কেউ কেউ তাঁকে ভয় করত বইকি। কিন্তু আমার কাছে তিনি ছিলেন স্নেহের আধার। আমি যতবার বাবা বলে ডাকতাম তার চেয়ে বেশিবার তিনি আমাকে পিতৃসম্বোধন করতেন। তবু প্রথম প্রথম তাঁকে এড়িয়ে চলার ইচ্ছা আমার মন থেকে নড়তে চাইত না।

তারপর কী করে যে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়তে লাগল বলা শক্ত। দিনক্ষণ প্রসঙ্গ কিছুই মনে পড়ে না। শুধু মনে পড়ে আমি কখনো তাঁর বুকের সঙ্গে মিশে আছি, কখনো পিঠের সঙ্গে। পাশে শুয়েই তিনি বলতেন, 'আমাকে জড়িয়ে ধরে শোও।'

আত্মজকে শিশু বয়সেই এমন একাত্ম করা যায়। বয়স বাড়ে আর অনাত্মীয়তা বাড়ে।

সকালে বিছানায় শুয়ে শুয়ে তিনি আমাকে সংস্কৃত শ্লোক শেখাতেন।

প্রথমে সূর্যস্তব

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি
দিবাকরম্॥

তারপর গুরু বন্দনা

অজ্ঞানাতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ
শ্রীগুরবে নমঃ॥

তারপর পিতৃপ্রণাম

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতাহি
পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে
সর্বদেবতাঃ॥

এমনি আরো অনেক ছিল। শ্লোকগুলির অর্থ তখন বোধগম্য হত না। বাবা যে সব বুঝিয়ে দিতেন তাও নয়। পরে বড় হয়ে জেনেছি তাঁর শেখানো শ্লোকগুলি সর্বাংশে বিশুদ্ধ ও ব্যাকরণসম্মত ছিল না। কিন্তু সেই যে ছন্দোময় ধ্বনির ভিতর দিয়ে দিন শুরু হত তার যেন মাধুর্যের শেষ ছিল না। দান আর গ্রহণ, প্রত্যাশা আর অনুচ্চারিত প্রতিশ্রুতি যেন এক একটি শ্লোক গড়ে উঠত।

কোনদিন তিনি শুয়ে শুয়ে গান গাইতেন। বেশির ভাগই প্রাচীন বাংলা গান। শুনে শুনে অনেক গানের পদই আমার মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল। মনে আছে কিনা দেখবার জন্যে তিনি জিজ্ঞাসা করতেন, 'বলতো তারপরে কি।'

আমি পদ বলে দিতাম। তিনি তাতে সুরসংযোগ করতেন। কিন্তু আশ্চর্য, কোনদিনই তিনি আমাকে গান শেখাননি। কি গাইতে বলেননি। আমি হয়তো শৈশব থেকেই কণ্ঠহীন ছিলাম।

কিন্তু আমি গাইতে পারিনে বলে বাবার মনে কোন উৎকণ্ঠা ছিল না। পরে আমার আরো হাজার রকমের অক্ষমতা তাঁকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল।

সবাই যা পারে আমি তা পারিনে। গাঁয়ের ছেলেরা কত অল্প বয়স থেকে গাছে ওঠে, নৌকো বায়, তারা কিরকম চালাক চতুর আটপিঠে হয়, আমি তেমন হলাম না।

বুদ্ধির দিক থেকেও জড়তা ধরা পড়তে লাগল। আমি অস্পষ্ট ভাবে অনুভব করি, আমি আমার বাবার মত নই, ভাইদের মত নই, বন্ধুদের মত নই, তবে কার মত? আমি ঈর্ষ্যাতুর চোখে দেখি বাবা আমাকে দুর্বল বলে আদর করেন, কিন্তু কদর করেন কান্দুকে। তার বুদ্ধির দীপ্তিতে বাবা দীপ্ত হন।

মুসলমান পাড়ার বসির শেখ বেশ সম্পত্তি প্রতিপত্তিশালী চাষী। মামলা মোকদ্দমার পরামর্শ নিতে প্রায়ই

হাতে গড়া এ গর্ব আমার নেই। পাঁচজনের হাতের ছাপ স্পষ্ট দেখছি গায়ে পিঠে।

লেখাপড়া আরম্ভ হয়ে গেল। শ্লোক শেখাবার ভার নিজের হাতে রেখে বর্ণ-পরিচয়ের জন্যে বাবা অন্য শিক্ষক নিয়োগ করলেন।

প্রথম শিক্ষা গুরু হলেন অক্ষয়কুমার শীল। আমাদের প্রতিবেশী। দুই বাড়ির মাঝখানে একটি এঁদোপুকুর চারদিকে বাঁশের ঝাড়। তারই ভিতর দিয়ে যাতায়াতের পথ। সেই পথে আমাদের বাড়িতে আসতেন। অক্ষয় মাস্টার। গায়ের রঙ কালো। ছিপছিপে চেহারা। বয়স কত বুঝবার জো নেই। বাবার চেয়ে বছর তিনেকের বড় শুনেছি। বাবা তাঁকে মাস্টার বলে ডাকেন। তিনি ডাকেন 'ভাই মহেন্দ্র।' দু ভাইয়ের মধ্যে প্রতিবেশী সুলভ রেষারেষি যেমন আছে, সদ্ভাবেরও তেমনি অভাব নেই।

বাবা বললেন, 'মাস্টার, তোমার হাতে দিলাম পল্টুকে। দক্ষিণা কি দিতে হবে বল?'

অক্ষয় মাস্টার বললেন, 'কী হে বল মহেন্দ্র। তোমার কাছ থেকে টাকা নেব তবে তোমার ছেলে পড়াব? আমাদের কি সেই সম্পর্ক? তবে কোর্ট কাছারিতে দরকার টরকার যদি কখনো হয় তুমি উদ্ধার করে দিয়ো ভাই।'

এই বার্টার সিসটেমে বাবা যে খুব খুশি হলেন তা নয়। তবে তখনকার মত ব্যবস্থাটা মেনে নিলেন।

অক্ষয় মাস্টারের নিজের স্কুল আছে শ্রীধরচরে। গাঁয়ের লোকের রসনায় ছিলাদরচর। আমাদের গ্রাম থেকে মাইল দেড়েক উত্তরে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের আপার প্রাইমারি স্কুল। অক্ষয় শীল সেই স্কুলের হেডমাস্টার।

স্কুলের কাজ ছাড়াও সকাল সন্ধ্যা দুবেলা টিউশনি করেন মাস্টার মশাই। ছাত্রদের বাড়িতে গিয়েও পড়ান আবার নিজের বাড়িতে বসেও পড়ান।

আমার সম্বন্ধেও সেই ব্যবস্থা হল।

উত্তরের ঘরের বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে তার ওপর ছাত্র আর মাস্টারের অধ্যয়ন অধ্যাপনা চলে। বাবা আর কাকা তাই দেখে মৃদু হেসে কাছারিতে বেরিয়ে যান। কান্দু বাঙ্কু খেলাধুলোয় মত্ত। ওদের তখনো আমার মত এই বন্দীদশা আসেনি।

যেদিন মাস্টার মশাইর আমাদের বাড়িতে আসার সময় হয় না সে-দিন শ্লেট-পেনসিল আর বর্ণপরিচয় নিয়ে আমি নিজেই গুরু-গৃহে গিয়ে হাজির হই। দিদিভাই একা যেতে দেন না। নিজে সঙ্গে করে রেখে আসেন। মাঝখানে একটা পুকুর আছে। পড়েটড়ে যেতে পারি। বাঁশ বন থেকে শেয়ালটেয়াল বেরোনও বিচিত্র নয়।

মাস্টার মশাইর বাড়িও এক পাঠশালা। সেখানে ও'র পুত্রেরাও তখন ছাত্র। তাছাড়া আরো অনেক ছাত্র এসে জুটেছে। আমি তাদের পিছনে গিয়ে বসতাম। তারপর সেই ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যেতাম।

মাস্টার মশাইর মন বড় চঞ্চল। পড়াতে পড়াতে প্রায়ই উঠে যেতেন। সাংসারিক কাজে কোন অব্যবস্থা দেখলে স্ত্রীকে কি বাড়ির অন্য লোকজনকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল করতেন। আবার বাইরের ঘরে গিয়ে মিষ্টি গলায় দু-চার কলি পদাবলীও গেয়ে আসতেন। বইয়ের দিকে চোখ রেখে আমি সেই গানের দিকে কান রাখতাম।

মাস্টার মশাইর বার-বাড়ির সেই ঘরখানায় কীর্তনিয়াদের ভিড় থাকত। খোল করতাল বাজত। অক্ষয় মাস্টার কীর্তনের দলেরও মাস্টার ছিলেন।

তারপর একদিন এক কাণ্ড ঘটল।

সেদিন বেশ একটু বেলার দিকে মাস্টারমশাই আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন, 'কী করছিস বসে বসে? লিখেছিস?'

বললাম, 'হুঁ।'

শ্লেটখানা হাত থেকে টেনে নিয়ে তিনি বললেন, 'কই দেখি'।

তারপর খুশি হয়ে বললেন, 'বাঃ এই তো হয়েছে।'

হঠাৎ মাস্টারমশাই অতগুলি ছেলের সামনে আমাকে কোলে তুলে নিলেন। বললেন, 'শ্লেট পেনসিল শক্ত করে ধরে রাখ। পড়ে যায় না যেন।'

তারপর তিনি সেই বাঁশ ঝাড়ের ভিতর দিয়ে পুকুরের পাড় দিয়ে দ্রুত পায়ে আমাকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে এসে হাজির হলেন। দূর থেকে ডাকতে ডাকতে এলেন, 'মহেন্দ্র, ও ভাই মহেন্দ্র।'

বাবা সেরেস্তায় বেরোবার জন্যে তৈরি হচ্ছিলেন। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, 'কী মাস্টার, কী হয়েছে।'

মাস্টার মশাই বললেন, 'পল্টু ক খ লিখতে শিখেছে।'

আমি তখন কোল থেকে নামবার জন্যে ব্যাকুল। কিন্তু মাস্টার মশাই আমাকে নামতে দিচ্ছেন না।

আমার হাতের শ্লেটখানায় বাবা একটু চোখ বুলিয়ে নিয়ে মাস্টার মশাইর দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'ক শুধু লিখতেই শিখেছে? তোমার ছাত্র ক দেখে কেষ্ট বলে কাঁদতে শেখেনি?'

অক্ষয় মাস্টারের ভক্তিরসের আতিশয্য নিয়ে বাবা মাঝে মাঝে ঠাট্টা করতেন। তা শুধু পরিহাস। উপহাস নয়।

মাস্টারমশাই কোন জবাব দিলেন না। হেসে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

আমি কোল থেকে নেমেই ছুটে চলে যাচ্ছিলাম, বাবা বাধা দিয়ে বললেন, 'ও কি,

যাচ্ছিস কেন। জ্যেঠামশাইকে প্রণাম কর, পায়ের ধুলো নে।'

প্রথম লেখকের সেই প্রথম অভ্যর্থনা।

নিরক্ষরতা থেকে সাক্ষরতায় উত্তরণ। শ্লেট-পেনসিলের পর ক্রমে কাগজ-কলমও হাতে এল। তারপর কত কীই তো লিখলাম। কিন্তু সব লেখাই সেই শ্লেটের লেখা। লেখা আর ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে মুছে ফেলা। নিজের যদি মুছতে মমতা হয়, অদৃশ্য নির্মম হাত অসংখ্য রয়েছে।

শিলালিপি লিখতে অমর কজনে আসে। তবু যে-কোন লিপিকরেরই অক্ষরের পর অক্ষর রচনার নিজস্ব আনন্দ আছে। অক্ষয় মাস্টারের আশীর্বাদ সেখানে অফুরন্ত।

বছরখানেক কি বছর দুই বাদে মাস্টার মশাই বললেন, 'ওকে এবার আমার স্কুলে ভর্তি করে দাও মহেন্দ্র।'

বাবা বললেন, 'তোমার স্কুল তো বহুদূরে। দেড় মাইল পথ রোজ হেঁটে যাওয়া আসা। ও কি পারবে?'

অক্ষয় মাস্টার বললেন, 'খুব পারবে। ওই বয়সী কত ছেলে যায়। আমার ছেলেরাও তো পড়ে। তুমি ভেব না। আমি ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব, সঙ্গে করে নিয়ে আসব।'

গাঁয়ের মধ্যে কাছেই আর একটি প্রাইমারী স্কুল আছে। পোস্ট অফিসের কাছে রায়বাড়িতে সেই স্কুল বসে। সেখানেও দুজন মাস্টার, মতি গুহ আর কার্তিক নাগ। নাগমশাই পোস্টমাস্টারও। স্কুলে প্রতাপ-প্রতিপত্তি তাঁরই বেশি। ছেলেরা তাঁকে খুব ভয় করে। পোস্ট অফিসে খাম-পোস্টকার্ডের ওপর যেমন সশব্দে তাঁর হাতের সীল পড়ে, কাঁচ কাঁচ ছেলের গালে তেমনি চড়, এবং পিঠেও সজোরে তেমনি কিল পড়ে।

মতি গুহ অনেক ঠাণ্ডা মেজাজের। কিন্তু কার্তিক নাগের ক্লাসগুলি ডিঙিয়ে তবে মতি মাস্টারের এলাকায় পৌঁছতে চায়।

দিদিভাই বললেন, 'না-না, কার্তিক মাস্টারের হাতে দিয়ে দরকার নেই। তার চেয়ে আমাদের অক্ষয়ই ভালো। তাছাড়া স্কুলে পাঠাবার দরকার কি। আরও দু-এক বছর বাড়িতে পড়ুক না।'

কিন্তু অক্ষয় মাস্টার আমাকে স্কুলে নিয়ে যাওয়ার জন্যে উদ্‌গ্রীব। আমিও তাই চাই। বাড়িতে পড়া কি আর পড়া? স্কুলে না পড়লে কি আর ছাত্র বলে পরিচয় দেওয়া যায়? প্রেস্টিজ থাকে? পাড়ায় আরও কত ছেলে স্কুলে পড়ে। আমিও যাব না কেন?

বাবা অনুমতি দিলেন, 'আচ্ছা, নিয়ে যাও স্কুলে। কিন্তু মাস্টার খুব সাবধান। ও কিন্তু ভারি নরম। আর পাঁচটি ছেলের মত নয়।'

অক্ষয় মাস্টার বললেন, 'সেইজন্যেই ওকে ছেড়ে দিতে হবে মহেন্দ্র। পাঁচজনের সঙ্গে না মিশলে কি আর পাঁচজনের একজন হওয়া যায়? তুমি ভেব না ভাই, আমি ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব, আবার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যাব। তোমার কোন চিন্তা নেই।'

প্রথম প্রথম তাই যেতাম। মাস্টার-মশাইর সঙ্গেই বই-শ্লেট নিয়ে যেতাম স্কুলে। সাড়ে দশটা-এগারোটার আগে স্কুলে পড়ানো আরম্ভ হত না। বাড়ির কাজকর্ম সেরে ছেলেদের প্রাইভেট পড়িয়ে, কীর্তনের দলকে তালিম দিয়ে স্কুলে পৌঁছতে মাস্টার-মশাইর আরও বেলা হত।

আমার ক্লাসের ছেলেরা বলত, 'তুই এত দেরি করে আসিস যে?'

আমি বলতাম, 'মাস্টারমশাই যে দেরি করে আসেন।'

'তিনি আর তুই? তিনি কি তোর সঙ্গে পড়েন?'

কী করে ওদের বুঝাই তিনি সহপাঠী নন কিন্তু সহযাত্রী।

বই-শ্লেট হাতে নিয়ে আমি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতাম। প্রথমে নদীর পাড় দিয়ে ঢালু পথ। ঝোপঝাড়, আমবাগান, বাঁশ-বাগান, ফাঁকে ফাঁকে গৃহস্থের বসতি। বাড়ির উঠোনে কাজ করতে করতে বউরা ঘোমটার ফাঁকে অচেনা পথিকদের দিকে এক পলক তাকিয়ে নেয়।

তারপর কাপুড়ে সদরদি ছাড়িয়ে আমরা উঠে পড়তাম জেলা বোর্ডের উঁচু বাঁধানো রাস্তায়। অক্ষয় মাস্টারের হাঁটার বেগ আরও বেড়ে যেত। রোগা শীর্ণ ইক্ষুদণ্ডের মত চেহারা। কী জোরেই না হাঁটতে পারেন মাস্টারমশাই। আমি তাঁর সঙ্গে পারব কেন?

'অনেক পিছনে পড়ে থাকতাম। কপাটি করার জন্য আমাকে ছুটতে হত। একদিন তো আছাড় খেয়ে পড়ে নতুন কেনা শ্লেট-খানাই ভেঙে ফেললাম। পকেটের পেনসিল কোথায় যে গড়িয়ে পড়ল তার আর খোঁজ পেলাম না।

মাস্টার মশাই থেমে দাঁড়ালেন। ফিরে এসে গায়ের ধুলো ঝেড়ে দিলেন। তারপর হেসে সস্নেহে পিঠে হাত রেখে বললেন, 'অত দৌড়চ্ছিস কেন। আস্তে আস্তে আয়। তুইতো পথ চিনে গেছিস। হ্যাঁরে কোথাও লাগেনি তো?'

আমি কাঁদো কাঁদো ভাবে বললাম, 'না। কিন্তু শ্লেটটা যে ভেঙে গেল।'

মাস্টার মশাই বললেন, 'তাতে কী হয়েছে। নতুন আর একখানা কিনে দেব।'

ভরসা পেয়ে আমি আবার তাঁর পিছনে পিছনে হাঁটতে শুরু করতাম। ডানদিকে রোদে ভরা আদিগন্ত মাঠ। বাঁয়ে চাষী মুসলমানদের বসতি। বাড়ির ভিতর থেকে লাল ঝুঁটিওয়ালা মোরগগুলি ছুটে ছুটে রাস্তায় চলে আসত।

স্কুলে গিয়ে প্রথমে একটু হতাশ হয়েছিলাম। আমি ভেবেছিলাম বাড়িতে যেমন পড়েছি স্কুলেও তেমনি অক্ষয় মাস্টার মশাইর ক্লাসেই আমি পড়ব। কিন্তু গিয়ে দেখলাম অন্য ব্যবস্থা। অক্ষয় মাস্টার ছাড়াও আর একজন মাস্টার মশাই আছেন স্কুলে। তাঁর বয়স অল্প। ছিমছাম চেহারা। মুখখানা বেশ হাসিখুশি। তাঁকে আমরা বলতাম ছোট মাস্টার। তিনি নিচের ক্লাসগুলিতে পড়াতেন। বড় মাস্টার আর এক ঘরে বড়দের ক্লাস নিতেন।

ছোট মাস্টারের ঘরে এসে আমি বললাম, 'আমি এ-ঘরে পড়ব কেন? আমি অক্ষয় মাস্টারের ছাত্র। আমি ওই ঘরে গিয়ে পড়ব।'

আমাদের ক্লাসের একটি ছেলের নাম দীনবন্ধু। বাজারের ওপারে তাদের বাসা। ভারি ডাকাবুকো ছেলে। সে আমার মুখের কাছে এসে মুখ ঢালিয়ে ঢালিয়ে বলল, 'তোর তো ভারি আস্পর্ধা। তুই কি ডবল প্রমোশন পেতে চাস? আগে এ ঘর থেকে পাশ কর, তারপর তো ও-ঘরে যাবি।'

ছোট মাস্টার মশাইও ভালোই পড়াতেন। তিনি সাহিত্য পড়াতেন অঙ্ক কষাতেন। আবার ড্রয়িং মাস্টারও তিনি ছিলেন। ব্ল্যাকবোর্ডে চক খড়ি দিয়ে চমৎকার চমৎকার ছবি পাখি আঁকতেন।

তাঁর নাম মনে করতে গিয়ে দেখি নাম তাঁর কোনদিন আমরা শুনিইনি। ছোট ছোট ছাত্রদের কাছে ছোট মাস্টারই ছিল তাঁর একমাত্র পরিচয়।

এতদিন বাদে তাঁর মুখের আদল, দেহের গড়ন আমার কাছে ঝাপসা হয়ে গেছে। তবে একটি দিনের কথা বেশ মনে আছে।

সেদিন যতদূর মনে পড়ে অক্ষয় মাস্টার মশাই স্কুলে আসেননি। তাঁর ঘরের ছেলেরা মহা আনন্দে হৈ চৈ করছে। সারাটা দিনই তাদের টিফিন। আমাদের টিফিন বড় অল্প সময়ের জন্যে।

ছোট মাস্টার মশাই সেই টিফিনের সময় আমাকে ডেকে বললেন, 'খোকা শোনো।'

একটু অবাক হলাম। এখন তো মাস্টার মশাই-এর কথা শোনবার কথা নয়। এতক্ষণ ধরেই তো শুনেছি।

বললাম, 'বলুন।'

তিনি বললেন, 'এখানে নয়, বাইরে চল।'

আমি ওঁর সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। স্কুলটি ফাঁকা জায়গায়। গ্রামের বাইরে। কিন্তু একেবারে মাঠের মধ্যে নয়। চারদিকে গাছগাছালি আছে। পিছনে ছোট একটি পুকুর। তার পাড়ে সবুজ ঘাসের গালিচা বিছানো। ছোট মাস্টার আমাকে সেখানে নিয়ে গেলেন। সামনে নিয়ে বসালেন। বাবার নাম করে বললেন, 'তুমি তাঁর ছেলে?'

বললাম, 'হ্যাঁ।'

'তিনি তো চমৎকার গাইতে পারেন।'

'আপনি জানলেন কী করে?'

'বা রে, সেদিন তাঁর গান শুনলাম। থিয়েটার দেখলাম কালীবাড়ির স্টেজে। চন্দ্রগুপ্ত। তিনি সেজেছিলেন অন্ধগায়ক। গাইলেন ঐ মহাসিন্ধুর ওপার হতে কী সংগীত ভেসে আসে। চমৎকার গলা।'

পিতৃপ্রশংসায় আমি স্মিত মুখে চুপ করে রইলাম।

হঠাৎ মাস্টার মশাই বললেন, 'তুমি একটা গান গাও।'

আমি বললাম, 'গান তো আমি জানি না।'

'তুমি জানো। আমি শুনেছি।'

'কার কাছে শুনেছেন?'

'শুনেছি। গাওনা, লজ্জা কি।'

বিব্রত হয়ে বললাম, 'সত্যিই আমি গান জানিনে স্যার।'

তিনি বললেন, 'মুখ উঁচু কর তো। ওই তো তোমার গলায় তিল আছে।'

'তাতে কি।'

তিনি বললেন, 'যার গলায় তিল থাকে সে গাইতে পারে।'

আরো একটু অনুরোধ উপরোধ চলল। কিন্তু কিছুতেই যখন আমি গাইলাম না, তিনি হতাশ হয়ে উঠে পড়লেন, বললেন, 'চল তাহলে স্কুলে ফেরা যাক।'

আমি সেদিন বিব্রত হয়েছিলাম ঠিকই। কিন্তু সেই সঙ্গে মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটু আনন্দও ছিল। গাইতে না পারলেও অন্তত একজন আমাকে গায়ক বলে জেনেছেন। আমি যে পারিনে বলে গাইনি এ কথা তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করেন নি।

বাড়িতে এসে মার কাছে সমস্ত ব্যাপারটা বলেছিলাম।

'আমার গলায় তিল আছে মা। আমি তাহলে সত্যিই একদিন গাইতে পারব। কী বলো?'

মা হেসে বলেছিলেন, 'পারাতো উচিত। পারবি।'

কিন্তু কারো প্রত্যাশা পূর্ণ হয়নি। সব তিলকণ্ঠই কি আর গীতকণ্ঠ হয়?

দু বছর পরেই অক্ষয় মাস্টারের স্কুল থেকে বাবা আমাকে ছাড়িয়ে আনলেন। ছোট মাস্টারের ঘর থেকে আর বড় মাস্টারের ঘরে যাওয়া হল না।

আমি এসে ভর্তি হলাম আমাদেরই গাঁয়ের এম ই স্কুলে। মিডল ইংলিশ স্কুল। সেখানে ওয়ান টু নেই। একেবারে থ্রি থেকে শুরু।

প্রাইমারী স্কুলে চার বছর থাকলে অনর্থক সময় নষ্ট।

অক্ষয় মাস্টার অপ্রসন্ন হয়ে বললেন, 'মহেন্দ্র, কাজটা ভালো করলে না ভাই। তোমার ছেলে কাঁচা রয়ে গেল। গোড়ায় যারা কাঁচা থাকে তারা কোনদিন আর পাকে না। আমার স্কুলে থাকলে আমি ওকে বৃত্তির পরীক্ষার জন্যে তৈরি করে দিতাম। জানো প্রতি বছর আমার স্কুল থেকে অন্তত একটি করে ছেলে বৃত্তি পায়। কোনবার দুটিও পায়। কোন বছরই বাদ যায় না'।

কিন্তু বাবার চিত্তবৃত্তি তখন অন্যরকম। তিনি বৃত্তির কথায় কান দিলেন না। বিদ্যাটা বয়সের অনুপাতে না হলে মানায়

না। বয়সের তুলনায় নিচু ক্লাসে পড়লে কি ছেলে কি বাপ মা কারোরই কি কোন মান থাকে?

পুরোন স্কুল ছেড়ে আসতে আমার মনে একটু কষ্ট হয়েছিল। দীনবন্ধু প্রথম প্রথম আমার পিছনে লাগলেও শেষদিকে তো বন্ধুই হয়ে উঠেছিল। আরো কত বন্ধু ছিল ক্লাসে। তাদের আজ নামও মনে নেই, মুখও ভুলে গেছি। নতুন স্কুলে ভর্তি হয়ে পুরোন স্কুল ছেড়ে আসার দুঃখ ভুলে গেলাম। এই ক্ষণভঙ্গুরতা শুধু বাল্য প্রণয়ের ধর্মই নয়, সব প্রণয়ের সঙ্গেই তা জড়িয়ে আছে।

এম ই স্কুলে শুধু দুজন মাস্টার নয় চারজন মাস্টার। কখনো বা পাঁচজনও থাকেন। ঘণ্টায় ঘণ্টায় বিষয় বদলায়, ঘণ্টায় ঘণ্টায় মাস্টার বদলায়। একজনই সব পড়ান না, সব পড়া নেন না। এ স্কুলের কৌলীন্য আলাদা।

নতুন বিধি ব্যবস্থায় নতুন বুকলিস্ট। নতুন নতুন বই। সব বই আমাদের গাঁয়ের বইয়ের দোকানে পাওয়া গেল না। কলকাতা থেকে ভি পি তে বই এল। প্যাকেটে আমার নাম লেখা। কেয়ার অফ অমুক বাবার। পোস্ট অফিসে গিয়ে টাকা দিয়ে ভি পি খালাস করে নিয়ে এলাম। বাবা কি কাকা সঙ্গে গিয়েছিলেন ঠিক মনে নেই। কিন্তু আমি যে বড় হয়েছি পাঠশালা থেকে ইংরেজী স্কুলে এসেছি, ছাত্র হিসেবে কত [illegible] বেড়ে গেছে—সে গৌরব কি ভোলবার?

স্কুল আমাদের বাড়ির কাছেই। শুকনোর সময় হেঁটে যেতে মাত্র পাঁচ সাত মিনিট লাগে। কিন্তু বর্ষার সময় অসুবিধে। তখন নৌকোয় যেতে হয়।

অবশ্য ঘাটে আমাদের নৌকো থাকে, চাকরও থাকে। তখন অনাথ ছিল কর্ণধার। সেই আমাদের স্কুলে দিয়ে আসত আবার ছুটি হলে নৌকোয় করে নিয়ে আসত। বর্ষার সময় এম ই স্কুলের ঘণ্টা আমাদের বাড়ির ঘাট থেকে শোনা যায়।

সেদিন এক কাণ্ড হল। আষাঢ় কি শ্রাবণ মাস ঠিক মনে নেই। খুব বৃষ্টি হচ্ছে। ঘাটে নৌকো আছে কিন্তু চাকর নেই। অনাথকে যেন কোন কাজে পাঠানো হয়েছে। এদিকে আমার স্কুলের সময় হয়ে যায়।

আমি মনে মনে বেশ খুশি। আজ আর স্কুলে যেতে হবে না। কামাই করবার বেশ একটা অজুহাত হল। বইপত্র রেখে দিয়ে জামা খুলে ফেলব, বাবা এসে বললেন 'ও কি জামা খুলেছিস যে।'

আমি বললাম, 'অনাথ যে নেই। স্কুলে নিয়ে আসবে কে?'

বাবা বললেন, 'সে ভাবনা তোকে ভাবতে হবে না। আমি তো আছি।'

কি উপলক্ষে যেন তাঁর সেদিন কাছারি ছুটি। কিন্তু আমি ছুটি পেলাম না।

বই খাতা নিয়ে বিরস মুখে নৌকোয় উঠে বসলাম। বাবা বসলেন গলুইতে বৈঠা হাতে নিয়ে।

পাড়া পড়শীদের মধ্যে কিষাণ মাল্লা অনেকেই ছিল। তাদের কাউকে ডাকলেই তারা আমাকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে আসত। কিন্তু বাবা কাউকে ডাকলেন না, ডাকতেও দিলেন না।

তিনি নিজেই নৌকো বেয়ে আমাকে স্কুলে পৌঁছে দিতে চললেন। [illegible] প্রভাব প্রতিপত্তি কম নয়। কিন্তু কে কি ভাবল না ভাবল তাঁর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

[illegible] কোমরে কাপড় বাঁধা। [illegible] মাঝিমাল্লাদের [illegible] বই খাতা নিয়ে [illegible] পাটাতনের ওপর বসেছি।

একটু আগের বিরসতা, স্কুলে যাবার অনিচ্ছা আমার কোথায় চলে গেল।

আমি বসে বসে বাবাকে দেখতে লাগলাম। তিনি অভ্যস্ত হাতে নৌকো বেয়ে চলেছেন।

আমি বাবু হয়ে বসে আছি।

আমাদের দুজনের মুখেই হাসি।

(চৌত্রিশ)

লক্ষ্মীপুজোর পরদিন তুলসী আর মৃদুলা চলে যাচ্ছে। সকাল থেকেই গোছগাছ করছিল মৃদুলা। মাঝে মাঝে গোছানো থামিয়ে জানালার কাছে এসে দাঁড়াচ্ছিল। বাইরে বহু দূরে পর্যন্ত কলকাতার হিজিবিজি দেখা যায়—একটা ফিকে ধোঁয়ায় আবৃত। কলকাতার বেশির ভাগই মৃদুলার অচেনা। সে কেবল অনেককাল ধরে চিনেছে তাদের বেহালা, তার স্কুল কলেজ, কয়েকজন আত্মীয়ের বাড়ি, দু-একবার গেছে বোটানিক্সে কি চিড়িয়াখানায়—বাদবাকী কলকাতা তার কাছে অচেনা, রহস্যময় এবং ভয়ানক। পিসিমার বাসার জানালা দিয়ে কলকাতার কিছুই দেখা যায় না। তবু মৃদুলা নিষ্পলক চেয়ে ছিল। কোথায় যেন নাড়ির যোগ ছিঁড়ে সে চলে যাচ্ছে। মৃদুলার চোখে জল এসে যাচ্ছিল। বিয়ের পর একবারও বাপের বাড়ি যাওয়া হয়নি। কবে যে যাওয়া হবে আর! কয়েকদিন আগে তার চিঠি পেয়ে বাবা এসেছিল টুপুকে নিয়ে। বাবার শরীরটা ভেঙে গেছে অনেক, শরীরের বাঁধন ঢিলে হয়ে গেছে। মুখে কেমন খড়ি-ওঠা শুকনো ভাব, মুখচোখের অবস্থা খুব বাথাতুর। টুপু তেমনি লাজুক, তবে আরো একটু রোগা হয়ে গেছে। তাকে নিয়ে ছাদে চলে গিয়েছিল মৃদুলা। কত কথা জিজ্ঞেস করেছিল। কয়েকদিনের অদেখাতেই দিদিকে লজ্জা পাচ্ছিল টুপু, মাথা নীচু করে, চোখে চোখ না রেখে মিহি গলায় কথা বলছিল। কিছুদিন আগেই যে জলখাবার কম হয়েছে বলে দিদিকে পাখার ডাঁটি দিয়ে মেরেছিল তা এখন তাকে দেখলে বিশ্বাসই হয় না। টুপুর কাছেই মৃদুলা শুনেছে বিভু এখন নাম-করা গুণ্ডা। তার দাপটে পাড়া অস্থির থাকে। কোমরে ছোরা আর পকেটে পাঞ্চ, ব্লেডের টুকরো, কখনো বা হাতে সাইকেলের চেন নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। রাত্রিবেলা মদ খেয়ে ট্যাক্সিতে ফিরে ট্যাক্সিওয়ালার ওপর হামলা করে। কখনো তাদের বাসার সামনে দাঁড়িয়ে পা ফাঁক করে সিগারেট ফোঁকে। সপ্তমী পুজোর দিন গলির মধ্যে সে টুপুকে মুখোমুখি পেয়ে রাস্তা আটকায়, জিজ্ঞেস করে—এই শালা, তোর দিদির ঠিকানা কী রে? টুপু ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়ে সত্যি কথা বলেছে যে, সে জানে না। বিভু হেসে বলেছে—ভাবিস না, তোর দিদির ঠিকানা ঠিক খুঁজে বের করব। ঢাকুরিয়ার দিকে থাকে আমি জানি। বিশে একদিন দেখেছে কালোমতো শুঁটকো একটা লোকের সঙ্গে যাচ্ছে। আমি ঠিক খুঁজে বের করব। তারপর দেখিস কী হয়। শুনে মৃদুলা ঠিক আগের মতোই ভয় পেয়েছিল, তবে কেন যেন বিভুর জন্যও এই প্রথম একটু কষ্ট হচ্ছিল তার। টুপুর কাছেই আরো শুনেছে, মার বুকে এখন কেমন একটা ব্যথা হয়। মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে যায়। ডাক্তার দেখে বলে যায় অসুখটা আসলে মনের। মৃদুলা সে কথা বিশ্বাস করে। প্রত্যেকটা পরিবারেরই একটা করে আলাদা ধাঁচ আছে। কোনো পরিবারে রাগ বেশী, যেমন তাদের রাঙা পিসীমার বাড়ির প্রায় সবাই রাগী। সেরকম, কোনো পরিবারে বেশী লোভ, কিংবা কম। ঠিক তেমনি তাদের পরিবারে সকলেরই একটু ভয়ের ধাঁচ আছে। অল্পেই ভয় পায় তারা। আত্মসমর্পণ করে দেয়। তাই ঐটুকুন ছেলেটা—ঐ বিভুর ভয়ে তাদের পরিবারটা তছনছ হয়ে গেল। নইলে তারা গুটিকয় নিরীহ মানুষ—মা বাবা টুপু আর সে মিলে কত শান্তিতে ছিল! রাতে তারা তাড়াতাড়ি খেয়ে নিত, তারপর মা বাবা আর দুই ভাইবোনের একটা ছোট্ট আসর বসত। কী যে সুন্দর ছিল সেই আসর; বাবা বলত কোর্ট-কাছারির অদ্ভুত সব গল্প, কতবার বাবার মক্কেল হরিদাসের অলৌকিক ক্ষমতার কথা শুনে তারা পরস্পরের গা ঘেঁষে বসেছে। হরিদাস ছিল গুরুতর লোক, গুরুর কথায় ওঠে বসে, সারা দিন দয়াল গুরুর মহিমার কথা লোককে বলে বেড়ায়। বর্ধমানের এক গাঁয়ে একটা লোক অল্পবয়সে সান্নিপাতিকে মারা যাচ্ছিল। তার কচি বউ আর মায়ের কান্না শুনে থাকতে না পেরে হরিদাস গিয়ে বসল তার বিছানায়, ডেকে বলল—গুরুর নামে বসলাম, আমি বলছি এ রুগী মরবে না এখন। হরিদাস বসেই রইল, রুগীও রইল ঘোর জ্বরবিকারের মধ্যে বেঁচে। হরিদাস নড়ে না, রুগীও মরে না। গাঁয়ের কবিরাজ এসে দেখে বলে—রুগী শেষ

হয়ে গিয়েছে, কিন্তু প্রকৃতির বিরুদ্ধে কী করে যেন বেঁচে আছে সে। সাতদিন নাওয়া খাওয়া ছেড়ে বসে রইল হরিদাস রুগীও রইল। তখন খবর গেল হরিদাসের গুরুর কাছে যে হরিদাস মুমূর্ষু রুগীকে বাঁচিয়ে রেখেছে, ক্রমে রুগীর চোখ গর্তে চলে যাচ্ছে, শরীর হয়ে যাচ্ছে কাঠের মতো শুকনো, তবু বেঁচে আছে। হরিদাস বিছানা ছাড়ছে না, পায়খানা পেচ্ছাবে যাওয়ার সময়ে গায়ের চাদরখানা খুলে রুগীর বিছানায় রেখে যায়। শুনে-টুনে হরিদাসের গুরুদেব তামাকের নল মুখ থেকে সরিয়ে বললেন—যখন চাদর রেখে যাবে তখন সেটা সরিয়ে নিন। প্রকৃতির বিরুদ্ধে যাওয়া ভাল না। তাই হয়েছিল। হরিদাসের চাদর সরিয়ে নিলে সঙ্গে সঙ্গে রুগীর মৃত্যু ঘটেছিল। আর একবার হরিদাস গুরুর নামে উৎসর্গ করা গাছপাকা একটা কাঁঠালকে একমাস ধরে রেখে দিয়েছিল। সে কেবল গাছ থেকে পাড়ার সময়ে একবার বলেছিল—তোকে গুরুর নামে উৎসর্গ করছি, যখন সময় হবে তখন পাকিস। তারপর এক মাস নানা দপ্তর ঘুরে বেরিয়েছে সে, এক মাস জগদ্দল

কাঁঠালটিও ছিল একই অবস্থায়। পাকেনি। এইরকম অবিচল ভক্তিও একদিন টলে গিয়েছিল হরিদাসের। তার ক্ষমতার কথা যখন চারধারে ছড়িয়ে পড়েছিল তখন নিজেকে সে মহাশক্তিমান ভাবতে শুরু করে। বসে বসে সে ভাবত—আমি কম কী? তারপর থেকেই আস্তে আস্তে তার ক্ষমতা নিবে যেতে লাগল। এতটাই নিবে গেল যে, শেষজীবনে সে গুরুর সঙ্গে মামলায় নামে—তার গুরুর নামে উৎসর্গ করা সম্পত্তি ফেরত চায়। অল্পেই ফুরিয়ে যাওয়া হরিদাস নিজের এই পাপের গল্প বলত বাবাকে, চটি খুলে মারত নিজের গালে। গুরু তার সম্পত্তি ফিরিয়ে দিলেন, আর ফিরিয়ে নিলেন তাকে দেওয়া সেই অপার্থিব শক্তি। হরিদাস বাবাকে দুঃখ করে বলত—সাধু মানে যাদুকর নয়, বরং ত্যাগী, প্রেমী। বড় দেরিতে সেটা বুঝলাম।

তাদের সেই পারিবারিক, ছোট্ট আসরটিতে আরো কত গল্প হত। তারা পরস্পরের গা ঘেঁষে, গা শুঁকে বসত। কলেজের বন্ধুদের গল্প করত মৃদুলা, কখনো বা গান শোনাতো, কখনো কারো অদ্ভুত কথা বা আচরণ নকল করে দেখিয়ে হাসাতো মা-বাবাকে। বেশ ছিল তারা—ভীরু, আদুরে, পরস্পরের মধ্যে গভীর সম্পর্ক। হঠাৎ বাজপাখির মতো ছোঁ মারল বিভু। নইলে আজো মৃদুলা বেলেঘাটার সেই বাসায় সকাল-বিকেল আলপনা নিয়ে বসত, গ্রীষ্মের বিকেলে গা ধুয়ে চলে যেত ছাদে—বাবার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে তারা আর চাঁদ আর কলকাতার আকাশরেখার রঙীন আলো দেখে কীরকম আনন্দ পেতো!

বিভু জানেও না সে মানুষের কত ক্ষতি করেছে। সে চারজন ভীতু মানুষকে করে দিয়েছে দুর্বল, অসুস্থ, তাদের আয়ু যাচ্ছে কমে। তাদের সংসারে এখন লক্ষ্মী ছেড়ে যাওয়া ছন্নছাড়া ভাব। বাড়িতে কখন বোমা পড়ে সেই চিন্তায় বাবা কোর্টে ভাল সওয়াল জবাব করতে পারছে না। আঁচরে তার পসার কমে যাবে।

জানালা দিয়ে বাইরে কলকাতার সামান্য টুকরোটুকু দেখে মৃদুলা আর ভাবে, এই শহর ছেড়ে সে যে চলে যাচ্ছে তার কারণও ঐ বিভু। সেদিন সিনেমা হলে অনেকটা বিভুর মতো দেখতে সেই লোকটা তাকে চিমটি কেটে পালিয়ে যাওয়ার পর থেকেই তুলসী কলকাতার ওপর ক্ষেপে গেল। ভাগ্যক্রমে মৃদুলার বিয়েও হয়েছে এক ভীতু মানুষের সঙ্গে, যে কেবল পালিয়ে যেতে শিখেছে, রুখে দাঁড়াতে জানেই না। ফলে এখন অনিশ্চয়তার মধ্যে পাড়ি দিচ্ছে তারা দুজন। কেমন হবে পলাশপুর জায়গাটা? আগে খুব পলাশপুরের নিন্দে করত তুলসী, আজকাল বলে—কলকাতায় থাকা মানে পৃথিবী এবং প্রকৃতির বিরুদ্ধে যাওয়া। এখানে পচে গেলাম। মৃদুলা জানে এসব মন-ভোলানো কথা। পলাশপুরে নিশ্চয়ই ভরসন্ধ্যায় শেয়াল চলে আসে উঠোনে, রাতদুপুরে কাঁদে কুকুর, ঘাসে গা মিলিয়ে চলে বেড়ায় সাপ, আর জোঁক লাকায়। গ্রামীণ মানুষগুলোর সঙ্গেও মিলমিশ হতে সময় লাগবে অনেক। তারা কলকাতার লোক, তারা এখন কলকাতার প্রকৃতির বিরুদ্ধে যাচ্ছে। কেমন লাগবে মৃদুলার?

দুপুরবেলা বাসনের বস্তার মুখ দড়ি দিয়ে বাঁধতে বাঁধতে তুলসী তার ঘেমো পরিশ্রান্ত মুখখানা মৃদুলার কানের কাছে এগিয়ে এনে বলল—মায়ের একটা সুন্দর সাপ্তা-হাতা ছিল। পানের মতো দেখতে। কাঁসার, আর খুব ভরী। বউ সেটা সরিয়ে রেখেছে কোথাও, খুঁজে বার করো দেখি।

উদাসীন গলায় মৃদুলা বলো—বাদ দাও। আমরা স্টেনলেস্ স্টীলের জিনিস কিনে নেবো।

তুলসী মুখ বিস্বাদ করে বলে—ইঃ! সেরকম জিনিস আর হয়! মা আমাকে একবার সেই হাতাটা দিয়ে পিটিয়েছিল। আমি ভীষণ কান্নাকাটি করায় মা বলেছিল, এটা তোর বউকে দেবো—কাঁদিস না। হাতাটার একটা সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু আছে।

ভাগ-বাঁটোয়ারায় অনেক কিছুই সরিয়ে রেখেছিল তুলসীর বউদি। কিন্তু মৃদুলা তেমন গা করলনা। যেমন মৃত্যুর আগে মানুষের মায়া কমে যায় তেমনি মায়া কমে যাচ্ছিল তার। সে আড়ালে আবডালে কাঁদছিল।

বাসনের বস্তা বেঁধে তুলসী যখন ছাদের সিঁড়ির চাতালে বসে সিগারেট ধরিয়েছে তখন মৃদুলা তার পিঠ খুঁটে দিতে দিতে বলল—আবার আমরা ফিরে আসবো। তুমি কলকাতায় চাকরি খুঁজো। ওখানে গিয়ে গা ছেড়ে দিওনা। গা ছড়ালে তুমি চাষাভুষা হয়ে যাবে।

কলকাতায় চাকরি! শুনে তুলসী একটু চমকে ওঠে। কয়েকদিন আগে ললিত তাকে বলেছিল—তুলসী, আমি সেক্রেটারী আর হেডমাস্টারকে বলে রাখব আমার চাকরিটা যাতে তোর হয়। সেই থেকে ভিতরে ভিতরে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও একটা লোভ কাজ করছে। মাঝে মাঝে হঠাৎ মনে হয়, কলকাতায় ললিতের চাকরিটা পেলে মন্দ হত না। পরমুহূর্তেই সচেতন হয়ে সে নিজেকে ধিক্কার দেয়। কিন্তু ভিতরে ভিতরে একটা টানাপোড়েন চলতে থাকে। কোথায় যেন ভিতরে ভিতরে ভাল-তুলসী আর মন্দ-তুলসীর একটা অবিরাম মল্লযুদ্ধ চলছে। কেউ কাউকে হারাতে পারছে না। তাই মৃদুলার কথা শুনে তুলসী একটু চমকে ওঠে। তারপর নিঃশব্দে সিগারেট টানতে থাকে। অনেকক্ষণ পর হঠাৎ খেয়াল করে বলে—আজ যাওয়ার সময়ে ললিতের দেওয়া শাড়িটা পরে নিও।

—কেন?

—এমনিই। শাড়িটা ও দিয়ে যাওয়ার পর একদিনও পরোনি।

—বাঃ। আমি যে নীল মুর্শিদাবাদীটা—

—না। তুলসী দৃঢ় ভাবে বলে—ললিতের দেওয়াটা।

একটু থমকে যায় মৃদুলা, বলে—আচ্ছা।

তারপর খানিকক্ষণ তুলসীর পিঠে হাত বুলিয়ে বলে—ললিতবাবু তো চাকরি ছেড়েই দেবেন! তখন তোমার ওখানে হয় না?

শুনে তুলসী চট করে দাঁড়িয়ে সিঁড়ি ভেঙে নামতে থাকে। মৃদুলা পিছু

পিছু নেমে আসে, বলে—কলকাতায় তো আমাদের ফিরে আসতেই হবে। আমি চিরকাল পলাশপুরে থাকতে পারবো না।

তুলসী ফিরে দাঁড়িয়ে হঠাৎ হেঁকে বলে ওঠে—আমি পলাশপুরের লোক। আজ থেকে আমি চিরকাল পলাশপুরের লোক। আই ডিজ্-ওন্ ক্যালকাটা।

পিতু মেয়েটাকে কোনোদিনই পছন্দ করত না মৃদুলা। পিতু আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বাপ-মার সামনেই হিন্দী গান গুনগুনে করে কোমর দোলায়। ছাদের আলসে থেকে ঝুঁকে রাস্তার ছেলেদের ইশারা করে। মৃদুলার সঙ্গে তার বনে না। কিন্তু আজ পিতু সারাদিন কাঁদছে। "বন্ধের পর পরীক্ষা না হলে ঠিক তোমার সঙ্গে চলে যেতাম কাকীমা, অনেক দিন থেকে আসতাম তোমাদের পলাশপুরে। সংসার গুছিয়ে দিয়ে আসতাম ঠিক শাশুড়ীদের মতো।" কান্নার ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে এরকম ঠাট্টাও করছে পিতু।

—ইস্! কত কাজের মেয়ে। জল গড়িয়ে খেতে পারেনা। পরীক্ষার পরে যেও, দেখব কেমন।

একটু হাসিঠাট্টা করেই পিতু "ইস, সত্যি চলে যাচ্ছো" বলে থমথমে মুখ করে থাকে, চোখে টসটস করে জল। সঙ্গে সঙ্গে মৃদুলাও কাঁদতে বসে।

স্টেশনে খুব বেশী লোক আসবে বলে আশা করেনি তুলসী। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে বিদায় জানাতে অনেক লোক এসে গেল। সময় মতো এল না কেবল সঞ্জয়। কথা ছিল, সে তার গাড়ি নিয়ে এসে তুলসীকে স্টেশনে পৌঁছে দেবে। সঞ্জয়ের কথার খেলাপ বড় একটা হয় না। এটা সেই অন্যতম সদ্গুণ যার ওপর সঞ্জয় বড় হয়েছে। বেলা তিনটে অবধি তার জন্য অপেক্ষা করে অবশেষে ট্যাক্সি ধরতে হল।

বালিগঞ্জ স্টেশনের ওভারব্রীজের তলায় দাঁড়িয়ে ছিল লম্বা রমেন, উজ্জ্বল কিংবা বেশ উজ্জ্বল চেহারার ললিত, তার বাঁ পাশে সার্জেন্টের পোশাক পরা, কোমরে পিস্তলওলা একজন লম্বা, চওড়া লোক। দূর থেকে দেখে মনে হয়েছিল, ললিত আর রমেনকে পুলিশে ধরেছে। কাছে এসে শম্ভুকে চিনতে পেরে খুব জোরে শ্বাস ছাড়ে তুলসী, বলল হ্যাঁ রে, আমি কলকাতায় থাকতে থাকতে তুই সার্জেন্ট হলিনা! তোর ভরসায় নিশ্চিন্তে রাস্তায় হাঁটতাম কয়েকদিন!

শম্ভু শুনে তৃপ্তির চওড়া বোকা-হাসি হাসল একখানা। তারপর জড়োসড়ো মৃদুলার পাশে শাড়ি-পরা কচি চেহারার পিতুকে আড়চোখে লক্ষ করে অকারণে পিস্তোলের খাপের ওপর হাতখানা রাখল সে।

দূর থেকেই বাবা আর টুপুকে প্ল্যাটফর্মে ভিড়ের মধ্যে লক্ষ করে হাত তুলল মৃদুলা। শরীর ভাল থাকলে [illegible] উঠত। টুপু তাকে দেখতে পেয়ে বাবাকে ডেকে আঙুল দিয়ে দিদিকে দেখিয়ে দিল। কী করুণ, কী স্নেহময় হাসি ফুটল মুখে! পিতুর হাত ছাড়িয়ে ছুটে লাইন পেরিয়ে প্ল্যাটফর্মে উঠে গেল মৃদুলা।

—মাকে আনলে না বাবা! একটু দেখতাম।

—তার শরীর ভাল না রে। তাছাড়া বাড়িটা ফাঁকা থাকবে।

—তোমরা কবে যাচ্ছো পলাশপুরে, বলো। আমার ওখানে একা একদম মন টিকবেনা। তোমরা গিয়ে এক দুই মাস থাকবে। বলতে বলতে মৃদুলা একটু কী ভাবে, তারপর বলে—চলোনা, কলকাতার বাসা উঠিয়ে সবাই পলাশপুরে যাই। ওখানে সবাই কাছাকাছি থাকবো।

পলাশপুর সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই মৃদুলার, কিন্তু সে মনশ্চক্ষে দেখতে পায় সে এক স্বপ্নের দেশ—যেখানে বাস্তবের কোনো রূঢ়তা নেই, যেখানে বাইরের দুর্দৈব এসে সংসার ভেঙে দেয় না, যেখানে সবাই চিরকাল সুখে থাকে। এইরকম এক পলাশপুরের চিন্তা করে সে বড় আশান্বিত হচ্ছিল।

বাবা তার মুখখানা খুঁটিয়ে দেখছিলেন, ধীর স্বরে বললেন—ভয়ে ভয়ে থেকেই আমরা শেষ হয়ে গেলাম। ছেলেটার বড্ড ঝাড় বেড়েছে। কেউ এমন নেই যে ওকে ঠান্ডা করতে পারে। কানাঘুষো শুনছি আজকাল খুন জখম শুরু করেছে।

মৃদুলার বুকের মধ্যে ধক্ করে ওঠে, ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞেস করে—তা হলে কী হবে! মা গো! তুমি শীগগীর একটা কিছু করো। পলাশপুর এমন কিছু দূর নয়, তুমি ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করতে পারবে।

বাবা ম্লান শুকনো মুখে হাসলেন—তাই কি হয়! পালিয়ে যাওয়াটা ভাল দেখাবে না। বরং সহ্য করে দেখি আরো কিছুদিন, তারপর না হয় অন্য পাড়ায় বাসা নেবো।

এক সময়ে ফাঁক বুঝে টুপু মৃদুলার কানে কানে বলল—দিদি, আমাকে পালাশপুরে নিয়ে যাবি? আমি জামাইবাবুর স্কুলে পড়ব।

মৃদুলা আকুল চোখে অসহায়ভাবে বারো বছরের টুপুর কচি, নরম আর ভীতু মুখখানা দেখে। কী যে বলবে ভেবে পায় না।

টুপু মৃদু স্বরে বলে—বেহালায় আমার একটুও ভাল লাগে না।

—কেন রে?

টুপু কী একটু ভেবে লজ্জায় লাল হয়। চোখ নামিয়ে নেয়। কী করে সে মৃদুলাকে বলবে যে, পাড়ার রাস্তা দিয়ে সে হাঁটতে পারে না। বিভুর দল এখনো তাকে দেখলেই দূর থেকে চেঁচিয়ে বলে—এই বিভুর শালা। সেই থেকে এখন টুপুর বন্ধুরাও মাঝে মাঝে তাকে 'বিভুর শালা' বলে ক্ষ্যাপায়। সে দুর্বল, ভীতু, মারপিট করতে পারে না, কাউকে ভয়ও দেখাতে পারে না। লজ্জায় সে কেবল মুখ লুকোয়। মাঝে মাঝে পড়ার টেবিলে বসে লজ্জায় আর অপমানে কাঁদে।

মৃদুলা বুঝতে পারে, টুপু পালাতে চায়। নিশ্চিন্ত, নিরাপদ এবং সম্মানজনক পরিবেশে চলে যেতে চায় সে।

টুপুর পিঠে হাত রাখে মৃদুলা। নরম গলায় বলে—যতদিন মা বাবা আছে এখানে ততদিন তাদের কাছেই থাক। তুই ছাড়া দুজনকে দেখবে কে? তুই কাছে না থাকলে মা বাবা আরো ভেঙে পড়বে। একটু চুপ করে থেকে মৃদুলা আবার বলল—মাঝে মাঝে যখনই ইচ্ছে হবে তখনই পলাশপুরে চলে যাবি।

কেমন একটু হতাশ আর স্তিমিত হয়ে যায় টুপু। এতদিন সে মনে মনে কল্পনা করেছে, কলকাতার বাইরে অনেক দূরে মেঠো সুন্দর গ্রামখানায় সে চলে যাবে, তারপর সেইখানেই থেকে যাবে সে। দিদিকে বললেই নিয়ে যাবে দিদি। বেহালার বাসায় আর ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না তার। বড় ভয় করে লজ্জা লাগে।

বাবা আর দিদি কথা বলছে, টুপু একটু দূরে সরে দাঁড়াল। প্ল্যাটফর্মের শানে একটু জুতো ঘষল। অন্যমনস্কভাবে সে ভাবছিল, খুব শীগগীরই সে একটা ব্যায়ামাগারে ভর্তি হবে। সারিবাদি সালসার বিজ্ঞাপনে যে বিপুল চেহারার লোকটাকে দেখা যায় দু হাতে প্রকাণ্ড একটা সাপকে ধরে পিষে ফেলছে, ঠিক ঐরকমই একটা শরীর বানাবে সে।

অন্যমনস্কভাবে চারদিকে চাইছিল টুপু। হঠাৎ একসময়ে চোখ তুলে কিছু দেখে সে খুব স্থির হয়ে গেল। ওভারব্রীজের ওপরে লোহার রেলিঙের ওপর ভর দিয়ে একটা বিমের ধার ঘেঁষে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। তার চাপা গাঢ় কালচে রঙের প্যান্ট আর ঘী-রঙের টেরিলিনের শার্ট স্পষ্ট চেনা যায়। চোখে গগ্‌লস, খুব নির্বিকারভাবে সিগারেট টানছে। বিকেলের আলো খুব নিস্তেজ, তবু লোকটাকে চিনতে ভুল হয় না। চোখে গগ্‌লস বলে বোঝা যায় না কোন দিকে চেয়ে আছে। তবু টুপু বোঝে যে, বিভু তাকে দেখছে না, প্ল্যাটফর্মের হাজারটা

লোকের কাউকেই না। তার চোখ এক নির্দিষ্ট জায়গায় স্থির।

ভয়ে টুপুরে মুখ সাদা হয়ে গেল। দিদি কিংবা বাবা কেউ লক্ষ করেনি বিভুকে। টুপু তাড়াতাড়ি চোখ সরিয়ে নিয়ে নিজের জুতোর ডগার দিকে চেয়ে রইল।

জিনিসপত্রগুলো যেখানে নামিয়ে স্তূপাকার করে রাখা হয়েছে সেখানে ছোটো ভাইটার হাত ধরে নিজের বাবা-মার সঙ্গে আলাদা দাঁড়িয়ে ছিল পিতু। প্রকাণ্ড চেহারার সার্জেণ্টটা তার দিকে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে। যত বড় চেহারা লোকটার ততখানি সাহসী নয়। বরং ভীতু। চোখে চোখ পড়লে তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিচ্ছে। অত ঘাবড়াচ্ছে কেন ছেলেটা? পিতু তো চোখ দিয়ে বলতেই চাইছে যে, তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে। সার্জেণ্টদের আমি সত্যিই পছন্দ করি।

ট্রাঙ্কের ওপর রাখা বেতের ঝুড়িটাকে একটু ঠেলে দিয়ে সেখানে বসল পিতু। ছোট্ট রুমালে নাকের নীচের সামান্য ঘাম চেপে নিল। তারপর হাতে থুতনি রেখে ঝুঁকে বসে চেয়ে রইল লোকটার দিকে। লোকটা কাকার চেনা, নাম শুনেছে শম্ভু। লোকটা যদি সাহসী হত তা হলে এই স্টেশনেই লোকটার সঙ্গে আলাপ হয়ে থাকত। কাল স্কুলের বন্ধুদের সে তার সার্জেণ্ট-ভক্তের কথা অহংকার করে বলতে পারত।

ওদিকে অল্প অল্প করে ঘেমে যাচ্ছিল শম্ভু। মেয়েটার চোখে চোখ রাখতে পারছিল না। কচি সতেজ শরীর, মোম-মাখানো মসৃণ চামড়া আর লম্বাটে ধাঁচের মুখওলা কিশোরীটি তাকে ওলটপালট করে দিচ্ছে। বেশ ভাইঝিটি তুলসীদার। যদি কোনো দিন সুযোগ হয় তবে সে তার লাল মোটরসাইকেলের পাশে ছোট্ট খোপ-গাড়িতে বসিয়ে নিয়ে মেয়েটিকে সারা কলকাতা দেখিয়ে বেড়াবে।

এতদিন মেয়েদের কথা ভাবতেই পারত না শম্ভু। জিমনাসিয়ামের ইনস্ট্রাকটর কড়া ব্রহ্মচর্য করে যেতে বলেছিল তাকে। স্বাস্থ্যকে বরাবর ভালবেসে এসেছে শম্ভু। তাই এতকাল মেয়েদের ভাল করে চেনেনি সে। গরুর মতো ছোলা মুগ খেয়েছে। কাঁচা ডিম গিলেছে। কিন্তু এবার এই প্রকাণ্ড শরীরটার একটা মূল্য পেতে ইচ্ছে করে। কেউ মুগ্ধ হোক, ভালবাসুক। পাখা ঝাপটাক বুকের মধ্যে। ছোট্ট পাখির মতো একটি মেয়ে, একটি কিশোরী।

শম্ভু প্রাণপণের চেষ্টায় চোখ রাখল মেয়েটির চোখে। মেয়েটি সামান্য হাসল। তারপর রুমালটা ফেলে দিল মাটিতে।

শম্ভু প্রাণপণে ভেবে বের করতে চেষ্টা করল, এটা কিসের ইঙ্গিত।

শুক্রবার দিন বিকেলে অফিসের পর নিজের গাড়িতে নাকি দীঘায় গেছে সঞ্জয়। বাড়িতে রিনিকে ফোনে জানিয়ে গেছে যে, সে দীঘায় যাচ্ছে। তারপর থেকে আর কয়েকদিন তার কোনো পাত্তা নেই। এদিকে ললিত আর রমেনকে অনেক আগেই বলে রেখেছিল সঞ্জয়—সামনের রবিবার তোরা আমার বাসায় খাবি। রমেনকে বলেছিল—তোর টাকাটা রবিবারে নিবি। সব দিয়ে-থুয়ে এবার আমি ঋণমুক্ত হবো। অথচ রবিবারে তার বাসায় গিয়ে সে নাই জেনে দুজনেই বেকুব। রিনি অবশ্য তাদের যথাসাধ্য আপ্যায়ন করেছে। কিন্তু খাওয়ার টেবিলে হঠাৎ রিনি ভেঙে পড়েছিল। খুব কান্নাকাটি করে বলল যে, প্রায়ই নাকি বাসায় ভুতুড়ে টেলিফোন আসে। একজন লোক টেলিফোনে বলে—মিস বাগচী নাকি

কে একজন মেয়ের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায় সঞ্জয়। ময়দানের অন্ধকারে গাড়ি থামিয়ে এ ওর গায়ে ঢলে পড়ে। দীঘাতেও সঞ্জয় গেছে সেই মেয়েটির সঙ্গেই।

শুনে তুলসীর মন খারাপ হয়ে গেল। সঞ্জয় তাকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আজ গাড়ি নিয়ে আসেনি। তার অর্থ—সে এখনো ফেরেনি কলকাতায়। সঞ্জয় কথার খেলাপ করেছে আজ। অথচ কোনো দিন করে না। কতগুলো সদ্গুণের ওপর দাঁড়িয়ে আছে সঞ্জয়। ধৈর্য, অধ্যবসায়, অবিচল পরিশ্রম আর নিষ্ঠা—যে গুণগুলো তাদের আর কারো নেই। যদি সঞ্জয়ের কখনো পতন হয় তবে তুলসীর কাছে অনেকগুলো সদ্গুণের অর্থ নষ্ট হয়ে যাবে।

চারদিকে হই-হট্টগোল শুনে বোঝা যাচ্ছিল যে, ট্রেন আসছে। উবু হয়ে বসে থাকা লোকজন মুখের বিড়ি ফেলে উঠে দাঁড়াচ্ছে।

তুলসী চেঁচিয়ে বলল—শম্ভু, তুই তো বড়বলী, আমার মালপত্রে একটু হাত লাগা।

শুনে শম্ভু গটগট করে হেঁটে গেল। পিতুর কাছে আসতেই উঠে দাঁড়াল পিতু। নিচু হয়ে ট্রাঙ্কটা হাতে ধরে আলগা করে ওজন দেখার সময়ে শম্ভু বড় মিষ্টি একটা গন্ধ পায়। না, এটা কোনো পাউডারের গন্ধ নয়। সে গন্ধ ছাপিয়ে কিশোরী-দেহের ঘামের বোঁটকা মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ পায় সে। চকিতে এক টানে ট্রাঙ্কটাকে মাটি থেকে আলগা করে ফেলে এক হাতে। কে জানে, এভাবে গায়ের জোরটা কাউকে দেখানো এক ধরনের কেরামতি। চারপাশের লোকজন তাকে হাঁ করে দেখছে। কিন্তু সে আর কী করতে পারে! শরীরের জোর ছাড়া তার আর কী আছে যা সে মেয়েটিকে দেখাতে পারে?

ট্রাঙ্কটা আবার নামিয়ে রেখে পিতুর দিকে চেয়ে হাসল শম্ভু, বলল—তেমন ভারী নয় তো!

—বাঃ! ভারী অবাক হয় পিতু, বলে—ওর মধ্যে একগাদা কাঁচের বাসন আর বই আছে। খুব ভারী হওয়ার কথা।

পরিতৃপ্তির বোকা-হাসি হাসল শম্ভু।

রমেন অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ করেছে, ওভারব্রীজের ওপর দাঁড়িয়ে কী যেন লক্ষ করছে দুর্গাপুরের সেই ছেলেটা। খুনী-চোখ পরকলায় ঢেকে রেখেছে। খুব অন্যমনস্ক। মাঝে মাঝে হাতের আঙুলের একটা আঙটির পাথর মনোযোগ দিয়ে দেখছে।

প্ল্যাটফর্মের মাঝামাঝি হেঁটে এসে ঘাড় ঘুরিয়ে ছেলেটিকে দেখল। বড় অসহায় ছেলেটির ভঙ্গী। পৃথিবীতে বড় অনিশ্চয় বোধ করছে ও।

তুলসীর শালা বাচ্চা ছেলেটি জুতোর ডগা শানে ঘষতে ঘষতে হঠাৎ মুখ তুলে ওভারব্রীজের ওপর দাঁড়ানো ছেলেটিকে দেখল। তার মুখ সাদাটে। তাতে লেখা আছে ভয়। রমেন বুঝতে পারছিল না, ওভারব্রীজের ওপর থেকে দুর্গাপুরের ছেলেটা কাকে দেখছে। সে খানিকটা আন্দাজে তুলসীর শালার পাশে দাঁড়াল। তার কাঁধে হাত রেখে বলল—কী হয়েছে?

ছেলেটা ভীষণ চমকে উঠে তার দিকে তাকাল। তারপর মাথা নেড়ে বলল—না, কিছু না।

কিন্তু স্বস্তি পেল না রমেন। তার মন একটা কোনো বিপদের গন্ধ পাচ্ছিল। সে দাঁড়িয়ে থাকল। দেখল ওভারব্রীজের ওপর থেকে দুর্গাপুরের ছেলেটা আস্তে আস্তে সরে আসছে সিঁড়ির দিকে। একটু পরেই ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল ছেলেটা। কালো চশমার ওপর তার কোঁচকানো ভ্রূ আর চোয়ালের দৃঢ়তা লক্ষ করে রমেন। খুব কাছ দিয়ে, বুক ঘেঁষে অন্যমনস্কের মতো হেঁটে গেল সে, কিন্তু রমেনকে লক্ষ করল না। তারপরই ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল ছেলেটা।

তুলসীর শালা গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে মৃদুলা স্থির চোখে ভিড়ের ভিতরে কী যেন দেখছে। ঠোঁট কাঁপছে তার। তুলসীর শ্বশুরের চোখ কেমন ঘোলাটে, চঞ্চল। দুহাতের আঙুল মটকাচ্ছেন তিনি। হাঁ করে শ্বাস টানছেন।

ঠিক এই সময়ে গাড়ির দূরাগত গম্ভীর শব্দ হচ্ছিল। তুলসী ডেকে বলল—রমেন, তোর তো কোনো পিছুটান নেই, আমার সঙ্গে পলাশপুরে যাবি? কয়েকদিন থেকে আসবি আমার সঙ্গে! একা এত মালপত্র নিয়ে সন্ধেবেলায় নামতে কেমন ভয় করছে।

রমেন একটুও চিন্তা না করে বলল—যাবো।

বিভু মন-স্থির করতে পারছিল না। সে খবর পেয়ে সঠিক পিছু নিয়ে এসেছে স্টেশনে। ওভারব্রীজ থেকে দেখেছে মৃদুলাকে এতক্ষণ। কিন্তু হায় ঈশ্বর এ কী চেহারা হয়েছে মৃদুলার? কী রোগা হতশ্রী, শুকনো চেহারা! চোখের নীচে কালি, হনুর হাড় উঁচু, ঠোঁট শুকিয়ে আছে পানের রস। কনুইয়ের চামড়ায় পড়েছে কড়া। গায়ের রঙ ফ্যাকাশে। হায় ঈশ্বর! এর কাছে আর কী চাওয়ার আছে বিভুর?

এতকাল বৃথাই সে সাক্ষীগুণ্ডাকে ভয় দেখিয়ে মা-বাবাকে লেখা মৃদুলার, চিঠিগুলো পড়েছে। লোক লাগিয়ে খুঁজে বের করেছে ঠিকানা। পিছু নিয়ে এসেছে এত দূরে। ভেবেছিল, পলাশপুর পর্যন্ত যাবে। তারপর একদিন ওর স্বামী স্কুলে গেলে নির্জন দুপুরে হানা দেবে মৃদুলার দরজায়। বলবে—ঐ শুটকো লোকটার চেয়ে কি আমি খারাপ ছিলাম? দেখ তোমার জন্যই আমি আজ ফেরারী, পুলিস কেস পিছনে নিয়ে ঘুরছি। এ বিষয়ে তোমার কী বলার আছে!

কিন্তু খুব কাছ থেকে মৃদুলাকে দেখার পর বিভু ভিড় ঠেলে অনেক দূরে এগিয়ে গেল। ফিরে এসে আর একবার মৃদুলাকে দেখতে ইচ্ছে করল না। প্লাটফর্মের শেষ প্রান্তটা নির্জন। সেখানে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাল সে। গাড়ি এসে গেলে সে উদাসীন চোখে লক্ষ করল, ঢেউয়ের মতো হাজার হাজার মানুষ আছড়ে পড়ছে গাড়িতে। তার উঠতে ইচ্ছে করল না।

গাড়ি ছেড়ে গেল। আস্তে আস্তে। ট্রেনের কোন একটা জানালায় কবেকার দেখা একটা আধচেনা মুখ লক্ষ করে হঠাৎ সে চমকে ওঠে। বড় সুন্দর মুখখানা। কবে, কোথায় যেন দেখেছে! ঠিক মনে পড়ল না। ভ্রূ কুঁচকে ভাবতে ভাবতে ফিরে যেতে লাগল বিভু।

(ক্রমশ)

সহযোগিতার জন্য আপনাকে

ধন্যবাদ

আপনি আমাদের দেশী ব্র্যাণ্ডের সিগারেট খান, ওটা ভাল বলেই এবং আপনার অন্তরেরও তাতে সায় রয়েছে। নানাভাবের সূক্ষ্ম চাপ ও নিরুৎসাহ করার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আপনি যেটা একবার বেছে নিয়েছেন সেইটেই ধরে রেখেছেন গর্বের সঙ্গে এবং আপনার বিচারবিবেচনার ফলে।

আপনি চতুর প্রচারের ঘটায় বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন নি এবং এটা নিঃসন্দেহে বুঝতে পেরে গেছেন যে, ভারতে প্রস্তুত সিগারেট অথচ যাকে ভুল করে বিদেশী সিগারেট বলেই মনে হয়--সেগুলির দাম বেশী বলেই সত্যি--সত্যি গুণেও সেরা হয়ে ওঠে না। আর, তাছাড়া একথাও আপনি নিঃসন্দিগ্ধভাবেই জানেন যে ভারতে সেরা সিগারেট তৈরী করবার মতন জনবল, অর্থ ও কাঁচামাল পর্য্যাপ্তই রয়েছে এবং সত্যিকারের দেশী সিগারেটই এখানে তৈরী হতে পারে যাতে ভারতের অতি প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রাও বহুপরিমাণে বাঁচান যেতে পারে।

আপনার এই আদর্শের ওপর এবং আপনার অনুকারী ক্রমবর্দ্ধমান বহুসংখ্যক ধূমপায়ী যাঁরা দেশী সিগারেটই খান, তাঁদেরই ওপর নির্ভর করে দেশের এই শিশু সিগারেট শিল্পের ভবিষ্যৎ।

আমাদের দিক থেকে আমরা আপনাদের সেবায় পূর্ণভাবে নিয়োজিত এবং দেশীয় শিল্পের উন্নতিই আমাদের স্থির লক্ষ্য।

গোল্ডেন টোব্যাকো কোং প্রাইভেট লিমিটেড
বোম্বাই-৫৬

ভারতের এই ধরণের বৃহত্তম জাতীয় উদ্যম

GT.61.BNG Greens' Advtg.

স্বপ্নসংকেত

আপনি কি প্রায়শই স্বপ্ন দেখে থাকেন? আমি ঠিক জেগে স্বপ্ন দেখার কথা বলছি না। কারণ, এ ধরনের কাজকে আমরা বলে থাকি স্বপ্নবিলাস। যার আর এক নাম কল্পনা। কল্পনায় আমরা মনের জালকে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত করে ছুঁড়ে দিই। বিস্তৃত করি সীমা থেকে অসীমতার উদ্দেশে। সেই সঙ্গে কখনও আমরা বনে যাই দেশনায়ক, কখনও বিজ্ঞানী, কবি, প্রেমিক, এমন হাজারো ব্যক্তিসত্তার অধিকারী। কল্পনায় আমরা অনুভব করতে থাকি একটি বিশেষ ব্যক্তি-চেতনার আস্বাদ। যদি সে আস্বাদ ভবিষ্যৎ জীবনে সত্যি সত্যিই বাস্তবে রূপায়িত হয়ে যায় তখন ঐ স্বপ্নের নাম হয় উচ্চাশা। আর তা যদি শুধু চিন্তার বুনোনি হয়েই থেকে যায়, আমরা তার নাম দিই দিবাস্বপ্ন।

না, আমি দিবাস্বপ্নের কথা বলছি না। বলছি সেই স্বপ্নের কথা, যা ঘুমের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মস্তিষ্কে এসে বাসা বেঁধে নেয়। মনোবিজ্ঞানীর ভাষায় যাদের বলা হয় মানুষের অবচেতন মনের প্রতিক্রিয়া, অবচেতন মনে ব্যক্তি-অভিজ্ঞতার প্রতিলিপি। আর শারীরবিজ্ঞানীদের মতে, স্বপ্ন শুধু কতকগুলি মানসিক ঘটনার বিশেষ ধরনের প্রকাশই নয়, স্বপ্নের সঙ্গে জড়িয়ে আছে মানুষের শারীরিক প্রশ্নও। এঁদের বক্তব্য, ঘুম ভাঙার পর স্বপ্নকে সব সময় যে আমরা মনে করতে পারি, সে কথা ঠিক নয়। অনেক স্বপ্নই আমরা ভুলে যাই। কিন্তু তারই মাঝে যেটুকু উদ্ধার করা সম্ভব, তাদের যদি যথাযথ আমরা উদ্ধার করতে পারি, তা হলে শরীর বিষয়ক বহু তথ্যই আগে থেকে জেনে নেওয়া সম্ভব হতে পারে। সে ক্ষেত্রে আপনার দেখা স্বপ্নকে বিশ্লেষণ করে বলে দেওয়া সম্ভব, আপনি কোন শারীরিক ব্যাধিতে ভুগছেন কিনা। যদি না ভুগে থাকেন তা হলেও বলা সম্ভব, অদূর ভবিষ্যতে কি ধরনের রোগে আপনি আক্রান্ত হতে পারেন এবং সেই রোগটি কখন আপনার দেহে দানা বেঁধে বসবে তার আনুমানিক সময়ও। অর্থাৎ এক কথায়, আপনার দেখা স্বপ্ন, আপনার ভবিষ্যৎ শারীরিক অবস্থার সংকেত।

সম্প্রতি সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন ধরনের শারীরিক ব্যাধি আগে থেকে জানার ব্যাপারে স্বপ্নের সাহায্য নিতে শুরু করেছেন। এঁদের বক্তব্য, দৈহিক গোলযোগের সঙ্গে মস্তিষ্কের সম্পর্ক অতি নিকটের। দেহে বিভিন্ন রোগ যে মুহূর্তে দানা বাঁধতে শুরু করে সেই মুহূর্তেই মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষে শুরু হয়ে যায় প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া। ঘুমের ঘোরে সেই প্রতিক্রিয়া তখন সৃষ্টি করে নানারকম ক্লান্তিকর স্বপ্নের জাল। একে একে বিচিত্র দৃশ্য মনের পর্দায় প্রতিফলিত হয়। সে স্বপ্ন কখনও বা ভয়াবহ কোন দৃশ্যের, কোন বিরক্তিকর পরিস্থিতির, অথবা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার। স্বপ্নের মাঝে মাঝে আমাদের ঘুম ভেঙে যায়। আমরা জেগে উঠি। আবার ঘুমই, আবার জাগি।

এঁরা লক্ষ করেছেন, কণ্ঠনালীর স্ফীতিজনক রোগ, ইনফ্লুয়েনজা, ব্রনকাইটিস, শ্লেষ্মা, অ্যাপেনডিসাইটিস, পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্রে বিষঘটিতরোগ প্রভৃতি যে দিনটিতে প্রকাশ পায়, ঠিক তার আগের রাত্রে আক্রান্ত ব্যক্তি নানারকম বিরক্তিজনক স্বপ্ন দেখে থাকেন। মুশকিল হল, এ ক্ষেত্রে স্বপ্ন দেখার সময় এবং রোগের প্রাদুর্ভাবকালের মধ্যে ব্যবধান এত কম থাকে যে, আগে থেকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রায় অসম্ভবই হয়ে পড়ে।

কিন্তু কোন কোন রোগের কথা দু তিন দিন আগে থেকেই স্বপ্নের সাহায্যে জেনে নেওয়া সম্ভব হয়েছে। এর একটি হিসেব দিয়েছেন ভাসিলাই কাজাতকিন নামে জনৈক প্রবন্ধকার। একটি সমীক্ষায় ইনি বলেছেন, ক্লান্তিকর আমাশয় রোগে আপনি
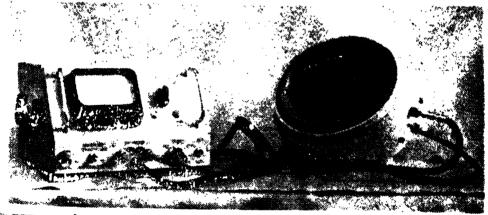
কঠিন আঘাতের ফলে মস্তিষ্কের স্নায়ু-কোষ স্বাভাবিক তাপমাত্রায় আর যথাযথভাবে অক্সিজেন কাজে লাগাতে পারে না। অক্সিজেনের ব্যয় তখন স্বাভাবিকের চেয়ে অর্ধেক কমে আসে। যার অনিবার্য ফল মৃত্যু। কিন্তু ঐ কোষের তাপমাত্রা যদি কমিয়ে প্রায় পাঁচ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে স্থির করে রাখা যায় তাহলে প্রচন্ড অক্সিজেন-ক্ষুধার হাত থেকে মস্তিষ্কের আঘাতজনিত স্নায়ু-কোষদের দীর্ঘকাল বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব। সম্প্রতি সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা মোটর সাইকেল আরোহীদের মাথার হেলমেটের মত একটি বৈদ্যুতিক টুপি পরিয়ে এই কাজটি সারছেন। টুপির মধ্যে আছে মাত্র আট গ্রাম ওজনের প্রায়-পরিবাহী পদার্থ। দুই থেকে তিন মিনিটের মধ্যে এই টুপি রোগীর আহত স্থানটির তাপমাত্রা পাঁচ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে নামিয়ে আনতে পারে আবার প্রয়োজনে যে কোন তাপমাত্রা সৃষ্টি করে কোষকে যথাযথভাবে সংরক্ষিত করতে সাহায্য করে। এই ব্যবস্থায় বিদ্যুৎ শক্তির ব্যয় অত্যন্ত কম। কাজ করা সহজ। যন্ত্রটি হাল্কা এবং প্রচলিত যন্ত্রগুলি থেকে অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য।

আক্রান্ত হতে চলেছেন কিনা, রোগ ধরা পড়ার দু' দিন আগে দেখা স্বপ্নকে বিশ্লেষণ করে সে কথা বিশেষজ্ঞরা বলে দিতে পারেন। টাইফয়েড, টাইফাস, সংক্রামিত রক্তপ্রবাহ রোগ সম্পর্কে আগাম সংবাদ দেওয়া সম্ভব এক সপ্তাহ আগেই। জটিল মানসিক রোগ বা সাইকোসিস-এর ক্ষেত্রে এই সময় তিন থেকে পাঁচ দিন। উন্মাদ রোগের ক্ষেত্রে পাঁচ থেকে দশ দিন এবং সাধারণ মনোবিকার বা অত্যধিক মানসিক উত্তেজনার ক্ষেত্রে দুই থেকে তিন মাস।

সীমায়িত গণ্ডীর মধ্যে সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে, কারুর কারুর স্বপ্ন বিশ্লেষণ করে দুই মাস আগে থেকেই বলে দেওয়া সম্ভব হয়েছে তার দেহে টি বি দেখা দিতে পারে কিনা অনেকের মস্তিষ্কের টিউমার হওয়ার কথা রোগ ধরা পড়ার এক বছরেরও আগে অনুমান করা সম্ভব হয়েছিল। যখনই এই সমস্ত রোগ শরীরের মধ্যে দানা বাঁধতে থাকে তখনই দেহের স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে শুরু হয়ে যায় তার প্রতিক্রিয়া। সেই প্রতি-ক্রিয়া অবশেষে রূপ পরিগ্রহ করে হাজারো দুঃস্বপ্নে। সেই সঙ্গে মানসিক উদ্বেগ।

কিন্তু কি করেই বা স্বপ্ন বিশ্লেষণ করে

রোগ সম্পর্কে পূর্বাভাষ যোগান সম্ভব?

ব্যাপারটা করা হয় এইভাবে।

ধরুন হঠাৎ গভীর রাতে স্বপ্ন দেখছেন, বাড়ি ছেড়ে আপনি যেন চলে যাচ্ছেন। হঠাৎ পায়ের নিচে সমুদ্র। হ্যাঁ, আপনি যেন ডুবে যাচ্ছেন সেই জলের মধ্যে। প্রাণপণ চেষ্টা করছেন নিজেকে রক্ষা করার জন্যে। চোখে মুখে জল ঢুকছে। এই বুঝি দম বেরিয়ে গেল। এই বুঝি মৃত্যু এসে গ্রাস করল।...অথবা, আপনি উঠে চলেছেন খাড়া একটি পাহাড় বেয়ে। উঠছেন, আপনি উঠেই চলেছেন। চূড়া যেন ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে। আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। পা দুটি অবশ হয়ে কাঁপছে। দম নেওয়ার ক্ষমতা আর আপনার নেই।...অথবা, আপনি ছুটে পালিয়ে যাচ্ছেন কোথায় যেন। হঠাৎ সামনে একটা বেড়া এসে দাঁড়াল। বেড়ার ফাঁকের মধ্যে মাথা গলিয়ে পার হওয়ার চেষ্টা করলেন। অমনি বেড়ার কাঠগুলি সরে এসে আপনাকে চেপে ধরল। প্রাণ বুঝি এবার বেরিয়ে যাবে।...অথবা, একটি আকস্মিক দুর্ঘটনায় আপনি মাটিচাপা পড়ে গেছেন। মাটির চাপে আর শ্বাস নিতে পারছেন না।

হয়ত বা স্বপ্নে দেখলেন, এক গাদা কাপড়ের আড়ালে আপনি যথেষ্ট অস্বস্তি বোধ করছেন। কাপড়গুলি আঁট হয়ে আপনাকে চেপে ধরেছে। দম ফেটে বেরিয়ে যাবেই। ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন আপনি।

যদি এ ধরনের স্বপ্ন কেউ দেখে থাকেন তা হলে এই রোগগুলি হওয়া তাঁর ক্ষেত্রে অসম্ভব নয় : নিউমোনিয়া, প্লুরিসি, ব্রনকাইটিস, এমন কি টিউবারকুলোসিসও। এখানে লক্ষ করা যেতে পারে, এই রোগগুলির কেন্দ্রস্থল ফুসফুস। ফুসফুস যখন আক্রান্ত হয় তখন শ্বাস-প্রশ্বাসে বাধা আসে। রোগীর স্বপ্নও তখন চলতে থাকে ঐ শ্বাস-প্রশ্বাসকে নিয়েই। যদি কারুর হাত, বাহু, পা বা দেহের পেশীতে কোন রোগ ধরা পড়ে বা পড়ার আশঙ্কা থাকে তখন তার স্বপ্নের দৃশ্যাবলীও পাল্টে যায়। স্বপ্নে তখন সে দেখে, এই বুঝি তার পা-টা মচকে গেল। অথবা দেহটি যেন হঠাৎ তুলতে পারছে না এমন সব ঘটনা। হৃদ্‌রোগীরা স্বপ্ন দেখেন, এই বুঝি তিনি বিরাট একটি গর্তে বা পাহাড়ের উঁচু চূড়া থেকে খাড়া নিচে পড়ে যাচ্ছেন। যাঁদের পাকস্থলী বা অন্ত্রাশয়ের রোগ, স্বপ্নে তাঁরা দেখতে পান সামনে প্রচুর খাবার। কিন্তু তার সবই কাঁচা। কাঁচা মাছ, কাঁচা সদ্য কাটা মাংস ইত্যাদি। কেউ হয়ত স্বপ্ন দেখলেন, গরম কর্দমাক্ত জলে তিনি স্নান করছেন। কেমন রিরি করে উঠছে শরীর। ব্যস! ঘুম ভাঙ্গা, দেখা গেল হয় তাঁর সর্দি, নয়তো তাঁর ফ্লু হয়ে গেছে। অতএব বিভিন্ন ধরনের স্বপ্ন বিশ্লেষণ করে কোন রোগের পূর্বাভাষ যোগান অসম্ভব নয়?

কিন্তু এ ধরনের যোগাযোগের কারণই বা কি? আপাততভাবে দেখা যায় যে, কোন রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাবার পূর্বেই প্রত্যেকেই রাতের দিকে বেশ খানিকটা ক্লান্ত বোধ করেন। সেই সঙ্গে তাঁর দেহের তাপমাত্রাও কিছুটা বেড়ে যায়। ঘুমের সঙ্গে সঙ্গে এর প্রতিক্রিয়া গিয়ে ঠেকে মস্তিষ্কে। তখন সে দুঃস্বপ্ন দেখে। বেশির ভাগ সময় যে-সমস্ত স্বপ্ন কোন রোগের লক্ষণ প্রকাশ করে, ঘন ঘন তখন তারা দেখা দিতে থাকে। এক একটি রোগের ক্ষেত্রে বেশির ভাগ একই স্বপ্ন বা সমঅর্থক স্বপ্ন দেখা যায়। স্বপ্নের পরেই যেন শরীরটা কেমন দুর্বল হয়ে গেল। ক্রমে অসুস্থভাব। আর সবচাইতে লক্ষণীয়, শরীরের ঠিক যে অংশটি কেন্দ্র করে রোগ হতে চলেছে স্বপ্নে বারবার যেন তারই ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাবার অনেক আগেই যে-কোন রোগীর স্বাভাবিক ঘুমে ব্যাঘাত দেখা যায়। তখন প্রায়ই সে স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। সেই স্বপ্নে কখনও সে দেখতে পায় কতকগুলি লেখা, অথবা দৃশ্যাবলী। সমস্তই যেন বিশেষ কোন শারীরিক অসুস্থতার সঙ্গে জড়িত। প্রথম দিকের স্বপ্নগুলি অস্পষ্ট, পরস্পরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন বলে মনে হয়। অবশেষে রোগের উপসর্গ যত বাড়তে থাকে, বাড়তে থাকে দেহের তাপমাত্রা, মানসিক উত্তেজনা, মেজাজের পরিবর্তন বা অন্য কিছু, তখন স্বপ্ন-সংকেত যথেষ্ট স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। আবার যে মুহূর্তে রোগের উপশম হয়ে শারীরিক অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে আসে, একে একে দুঃস্বপ্নগুলিও কোথায় যেন সরে পড়ে।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলে রাখা ভাল, বাজে স্বপ্ন যে সব সময়ই কোন শারীরিক অসুস্থতার পূর্বাভাষ, এটাও ঠিক নয়। পীড়িত না হয়েও কেউ কেউ দুঃস্বপ্ন দেখতে পারেন। যেমন ধরুন, স্বাভাবিক অবস্থাতেও দেখা গেছে, কোন ঘুমন্ত ব্যক্তির বুকের উপর তাঁর অজ্ঞাতে যদি আপনি একটি বই চাপিয়ে রাখেন তা হলে ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর হয়ত তিনি বলবেন, তিনি স্বপ্ন দেখেছেন, কোথায় যেন একটি বিরাট পাথর পাহাড়ের গা দিয়ে গড়িয়ে পড়েছে অথবা কোন ঘরবাড়ি তৈরির জায়গায় মস্ত বড় একটি দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। রেলে যেতে যেতে কেউ যদি ঘুমিয়ে পড়েন এবং ঘুমিয়ে পড়ার আগে তিনি দেখে থাকেন গাড়ির অপর যাত্রীরা ধূমপান করছেন তা হলে ঘুমের ঘোরে এমন স্বপ্নও দেখতে পারেন, দম বন্ধ হয়ে তিনি যেন মারা যাচ্ছেন অথবা কোথায় দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। অতএব স্বপ্ন বিচার করে কোন রোগের পূর্বাভাষ জানার আগে দেখে নেওয়া দরকার, ঠিক কোন পরিস্থিতির মধ্যে রোগ-সন্দেহ ব্যক্তি সেই স্বপ্ন দেখেছেন। নইলে ভুল থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

তবে এই সঙ্গে আরও একটি বিচার্য বিষয় এখনও রয়েছে। কোন ব্যক্তির অবস্থা, স্বকীয়তা ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের কথাও স্বপ্ন বিচারের আগে দেখে নেওয়া দরকার। তাঁর পেশা, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং কার্যাবলীর কথাও ভেবে দেখতে হবে। কারণ, এদের উপর স্বপ্নের বৈচিত্র্য নির্ভর করে। যেমন ধরুন, যদি কোন ডাক্তার কণ্ঠনালীর রোগে আক্রান্ত হতে যান, রোগ ধরা পড়ার ঠিক আগের রাত্রে তিনি হয়তো স্বপ্ন দেখবেন, তাঁর গলায় যেন এক পরত সাদা ডিপথেরিয়ার পর্দা জুড়ে রয়েছে। যাঁর কোন ডাক্তারি জ্ঞান নেই, তাঁর কাছে মনে হবে গলায় কোন একটা অসুখ হতে চলেছে। আর সামরিক ব্যক্তির কাছে হয়ত মনে হবে তাঁর গলায় কে যেন একটা ক্ষত সৃষ্টি করে দিয়েছে।

যদি কারুর এমন গভীর নিদ্রা হয় যে, ঘুম ভাঙ্গার পর কোন স্বপ্নই তিনি মনে করতে পারছেন না, সেটা তেমন কোন দুশ্চিন্তার কারণ নয়। অনেক সময় স্বপ্ন দেখার পর কয়েক মিনিট গভীর নিদ্রা হলে স্বপ্নকে আর সচেতন মনে ফিরিয়ে আনা যায় না। কিন্তু কেউ যদি বলেন, তিনি মোটেই কোন স্বপ্ন দেখেন না এবং সত্যিই দেখেন না তা হলে ব্যাপারটা রীতিমত বিপদেরও হতে পারে। এটা ঐ ব্যক্তির মাথার খুলির বিকৃতির দরুন হওয়া সম্ভব। স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে যাঁরা কম স্বপ্ন দেখেন তাঁদের ক্ষেত্রে বলা চলে, তাঁদের স্নায়বিক কাঠামো নিম্ন পর্যায়ের বা কম সংবেদনশীল। তাঁদের মানসিক গঠনও তেমন সতেজ নয়। অর্থাৎ, আসল কথা, স্বপ্ন মানুষকে দেখতেই হবে। যদি সে স্বপ্ন সুখের হয়, বুঝতে হবে শরীর ভাল যাচ্ছে। আর স্বপ্নের মধ্যে যদি থাকে আতঙ্ক এবং দুশ্চিন্তা, বুঝতে হবে এবার তিনি শারীরিক অসুস্থ হতে চলেছেন। কি সে অসুখ, কোন শারীর-স্বপ্নতত্ত্ববিদ হয়তো তা বলে দিতেও পারেন।

সমরজিৎ কর

খোঁড়া পথ কানা পথ
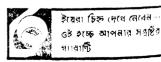
কলকাতার রাস্তাঘাটের কথা একটু বলতে চাই। আমাদের এই উন্নতিশীল মহানগরীতে কোনো কোনো রাস্তা অনাবশ্যকভাবে ভলো [বিজলি আছে, গর্ত নেই]। কোনো কোনো রাস্তা আবার আশাতিরিক্ত খারাপ [গর্তও আছে, বিজলিও নেই]। যথা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষদের কাছে আমার বিনম্র অনুরোধ : এক মধ্যপথ অবলম্বন করুন : যে-সব রাস্তা গর্তালংকৃত, আলোকিতও করা হোক; আর যে-সব রাস্তা বিজলি-বিহীন, তাদের করা হোক গর্তশূন্য। তা যদি হত, তবে কালকে রাত্তে কুঁদঘাটে যা ঘটল, তা ঘটত না—ছেঁড়া পাতার ডায়েরির লেখকের ঘ্রাণেন্দ্রিয় বেঁচে যেত।

এক সহানুভূতিশীল প্রতিবেশী উক্ত নাসিকা পরিদর্শন করতে এসে উপর্যুল্লিখিত পংক্তিগুলির উপর চোখ বুলিয়ে বলল, "আলোকিত গর্তশূন্য রাস্তা একটাও পেয়েছেন কোথাও?"

থতমত খেয়ে বললাম, "কলকাতার ম্যাপ নিয়ে এস।"

নিয়ে এল কোন এক হোসিয়ারি দোকানের সৌজন্যে সোনালী অক্ষরে মুদ্রিত, বিনা মূল্যে বিতরিত এক রঙিন মানচিত্র।

দেখতে লাগলাম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে; বউ-বাজার বাদ দিলাম, কলেজ স্ট্রীট বাদ দিলাম, বাদ দিলাম আপার ও লোয়ার সার্কুলার তথা চিৎপুর রোড...হঠাৎ বলে উঠলাম—পাঠশালার পাঠ্যপুস্তকে প্রশংসিত স্নানরত সেই গ্রীক বৈজ্ঞানিকের উল্লাসে : "পেয়েছি!"

সহানুভূতিশীল প্রতিবেশী সন্দিগ্ধ কৌতূহলে শুধু বললেন—জ্যৈষ্ঠ মাসে জলশূন্য কুয়োর প্রতিধ্বনির মতো : "পেয়েছেন?"

"হ্যাঁ, পেয়েছি...পার্ক স্ট্রীট...বড়দিনের রাত্রে...চৌরঙ্গি থেকে থানা পর্যন্ত... রাস্তাটার পশ্চিম অর্ধাংশ!"

প্রতিবেশী বলল, "আসছে বছর ক্রিসমাসে গিয়ে চেক করে আসব।"

নাসিকার বাহার

নাকের কথা বলছিলাম না? তবে শুনুন। রাঘবপুর বলে এক অজ পাড়া গাঁ থেকে স্কুটার চড়ে ফিরছিলাম, সগর্বে সদর্পে, অক্ষত নাক নিয়ে। মনে হচ্ছিল, রবিবারের ঐ ইতস্তত ভ্রাম্যমাণ জনতা এই অমাবস্যার অন্ধকারে শুধু আমার দিকেই তাকিয়ে আছে—পার্ক স্ট্রীটের সেই অর্ধাংশে দাঁড়িয়ে নববর্ষের বিলাসী ছোকড়ারা যেমন তাকায় পেট-কাটা-সাড়ি-পরা, আস্তিনছাড়া-ব্লাউজ-পরা, পাখির বাসার মতো খোঁপা-করা যুবতীদের দিকে। আমি মনে মনে শুনছিলাম, এই অনামী ভিড় উচ্ছ্বসিত প্রশংসার ঐকতানে যেন বলছে, "সাবাস, সাহেব, কি অপূর্ব আপনার স্কুটার চালাবার দক্ষতা, কেমন সুন্দরভাবে রাস্তার বাঁ দিকের, ডান দিকের, মাঝপথের ছোট গর্ত, মাঝারি গর্ত—মস্ত গর্ত এড়িয়ে যাচ্ছেন!"

আঁধার-সীমানা হল শেষ. ঐ অদূরে পোলের ওপারে টালিগঞ্জের আলো দেখা যায়—আমি মৃদু হাসছিলাম আপন মনে, মৃদু যেমন হাসে মাঝি সমুদ্রঝটিকাতাড়িত-বীচিবিক্ষুব্ধ নৌকোয়, বন্দরের কিনারে পৌঁছে। হঠাৎ তেতালা থেকে ফেলে-দেওয়া দেড়মণি গমের বস্তার মতো এক শব্দ...প্রপাতের মতো পতন, অহংকারের প্রবাদকথিত যা, সেই অনিবার্য অধঃপাত। স্কুটারের সামনের চাকাটা আটকে গিয়েছিল ঠিক তার ব্যাসের সমব্যাসী এক গর্তে।

অক্ষয়বাবু বলে এক ভদ্রলোক [ওঁর নাম অবশ্য পরেই জানলাম; আর সেই নাম আমার কৃতজ্ঞ স্মৃতিপটে সুবর্ণ অক্ষরে চিরকালই খোদিত থাকবে] আমাকে নিয়ে গেলেন অমায়িক এক প্রৌঢ় ডাক্তারের চেম্বারে। ইতিমধ্যে খবরটা পাড়াময় ছড়িয়ে পড়েছে দাবানলের বেগে। পাঁচ মিনিট যেতে না যেতে [নাকি যেতে যেতে?... এ জাতীয় বৈয়াকরণ সূক্ষ্মতা সাহেবদের সহজে আসে না] চেম্বার লোকে লোকারণ্য; সবাই দেখতে এসেছে সাদা বাঘটাকে, প্রবেশ-মূল্য দিতে হয় না। সাদা বাঘ এমনিতেই তো মজার দৃশ্য—তায় আবার নাক-কাটা সাদা বাঘ।

ন্যারুইন, তোমারে সেলাম

ডাক্তারবাবু যত্ন নিলেন খুব; লাল হলদে সাদা বড়ি দুটো দুটো করে খাওয়ালেন, ব্যাণ্ডেজ দিলেন, প্লাস্টার দিলেন। এক ছোকরাকে বললাম, "আয়না নিয়ে আসতে

সেদিন কথায় কথায় দিলীপ বলছিলো—
"আমি জেতাতে মার সেকি আনন্দ যদি দেখতেন!"
Cadbury's
Bournvita
the ideal food drink for strength and vigour
450g net

পরব?" পারল। নিজের মুখ দেখে বুঝলাম : চিড়িয়াখানার নয়, বিলকুল সার্কাসের পক্ষে লাগসই মুখ! স্থির করলাম, আজ থেকে আর আলখাল্লা পরব না, পরব বোরখা।

না, ডাক্তারবাবু পয়সা নিলেন না; উনি এক খাঁটি আর্টিস্ট, শুধু বললেন, "ওরকম এক নাক পাঞ্চল-এর টুকরোগুলোর মতো ঠিকঠাক জোড়া লাগিয়ে দেওয়ার আনন্দই আমার যথার্থ পারিতোষিক।"

বিদায়োপহার স্বরূপ তিনি এক চিরকুটে লিখে দিলেন প্রয়োজনীয় ওষুধের এক মস্ত ফিরিস্তি, নিজের চেম্বারের পরিচয়-তথা আর সাহেবসুবোদের এক হাসপাতালের ঠিকানা।

কাগজটা পড়ে বললাম, "একটা জিনিস লিখে দিতে ভুলে গিয়েছেন : সংবাদ-[illegible] ফোন নম্বরটা...কে জানে, বলা তো যায় না!"

এক বুড়ি বলল সান্ত্বনার সুরে, "বালাই ষাট, অমন কথা কি বলতে আছে? আপনি দীর্ঘজীবী হবেন।"

"দীর্ঘজীবী?...কত দীর্ঘজীবী? কুড়ি বছর?"

"কুড়ি না হোক, দশ-বারো তো হবে..."

[illegible]

ভূতের রাজা, দাও বর

[illegible]

একটা। তাই শিখেছি পাঠশালায়, শিখেছি বিদ্যালয়ে। আর আজও আমাদের স্কুল কলেজের করিডোরে পড়ে-থাকা কোনো কাগজ দেখলেই না তুলে পারি না। গুরু-জনকে তুলতে দেখলে ছাত্ররাও বোধ হয় তুলতে শিখবে; বাড়ির সামনের রাস্তায় গর্ত দেখলে ফুটপাতের আবর্জনার স্তূপে থেকে দুটো ইঁট উদ্ধার করে জোরে ঠেসে দেবে গর্তটিতে।

নাকি তা হবার নয়?...তবে কি নির্ভর করে থাকতে হবে দৈবেরই উপর? কবে আসবে ভূতের রাজা, গুপী-বাঘার মতো আমার দিকে তাকিয়ে বলবে : বল, কি বর চাও?

জবর জবর তিন বর চাইব না; বলব না, "যেখানে খুশি যাইতে পারি...এমন ব্যবস্থা করে দাও।" বেঁচে থাক, আমার স্কুটার, আমার বাইসাইকেল! আমি শুধু বলব, "যখন যে-পথে চলব, অন্ধকার যতই ঘুটঘুটে হোক, স্কুটারের সামনে যেন দু-কলা গর্ত-গুলো নিমেষে বুজে গিয়ে আমার যাত্রাপথ মসৃণ করে দেয়।"

...চোখ খুলে দেখি, ডাক্তার এসেছেন, আমার হাত ধরে নাড়ি দেখছেন। পাশের বাড়ির মাসিমা তাঁকে বোঝাচ্ছেন : "হ্যাঁ, ডাক্তারবাবু, ভুল বকছিলেন,.....কলকাতার রাস্তা-টাস্তা নিয়ে কি-সব বিড়বিড় করছিলেন..."

শীতের শুষ্কতায়ও....
নিভিয়া আপনার ত্বকে সৌন্দর্য্য ফোটায়

শীতকালে আপনার ত্বকের সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধনকারী সহজাত তৈল-ভাগের অভাব ঘটে। কিন্তু ত্বক আবার তার কমনীয়তা এবং সৌন্দর্য্য ফিরে পেতে চায়। নিভিয়ায় আশ্চর্য্য 'ইউসেরাইট' আছে· তাই নিভিয়া অনায়াসে সহজেই আপনার ত্বকের সহজাত তৈলভাব ফিরিয়ে আনে। আস্তে, আস্তে নিভিয়া মুখে লাগাবার সঙ্গে সঙ্গেই, 'ইউসেরাইটের' স্পর্শে আপনার মুখশ্রী আবার সঞ্জীবিত হয়ে উঠে এবং ত্বক মসৃণ, কোমল ও প্রস্ফুটিত হয়। একমাত্র নিভিয়ারই বৈশিষ্ট্য এটি:

নিভিয়া—প্রস্ফুটিত, ত্বকের রহস্য
স্মিথ ও নেভিয়ুব তৈরী

AIYARS U.M.I BAN

॥ ৫ ॥

ছোটবেলায় শান্তিনিকেতনে যাওয়ার যে স্মৃতি মনে পড়ছে এবারে সেইটে বলব।

ট্রেনে চড়ে অবধি সেখানে কখন পৌঁছব, সেখানে কি দেখব মনের মধ্যে অধীর কৌতূহলের অন্ত ছিল না। সন্ধ্যার একটু আগে আমাদের গন্তব্যস্থলে এসে পৌঁছলুম। আমাদের জন্যে স্টেশনের বাইরে একটি প্রকাণ্ড আয়তনের বাস অপেক্ষা করছিল। সেটাকে ঠিক বাস বলা চলে না, আবার ঘরের গাড়ি বললেও ভুল বলা হবে। গাড়িটি বাসের আকার, দু ধারে ছোট্ট চৌকো করে জানালা, ভিতরে বেশ অনেকে বসা যায় এমন জায়গা। এ রকম গাড়ি আমি আগে কখনো দেখিনি এবং কেউ বোধ হয় কখনো দেখেনি। কোথায় যে এই অপরূপ যানটি তৈরি করা হয়েছিল তা জানিনে, বোধ হয় আগাগোড়া লোহার তৈরি ছিল, গাড়িটা টানতে চারটি হৃষ্টপুষ্ট বলদ হাঁপিয়ে পড়ত। সন্ধ্যার আবছায়া অন্ধকারে ধীর মন্থর গতিতে চলেছি। বাসের মধ্যে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। গাড়ি থামতে জেগে উঠে দেখি একটি দোতালা বাড়ির সামনে এসে আমাদের বাস থামল। সবাই তখন ব্যস্ত হয়ে জিনিসপত্তর নামাচ্ছে। দোতলার একটি ঘরে আমাদের জন্য বিছানা প্রস্তুত ছিল। ঘরের অনেকখানি জুড়ে মস্ত বড় একটি খাট। তাছাড়া দু একটা নেয়ারের ছোট খাটও ছিল। তারি এক একটা খাটে আমরা শুয়ে পড়লুম। শমী রইল মায়ের বিছানায়। দোতলার প্রথমেই যে ঘরটি সেটি অপেক্ষাকৃত ছোট, তারপরে একটি বড় হলঘর তারি পাশে আমাদের শোবার ঘর। পূবে পশ্চিমে দুটি ঘরের পাশে স্নানের ঘর। ঘরের দু পাশে দুটি বারান্দা দক্ষিণ দিকে বারান্দায় সংলগ্ন একটি খোলা গাড়ি-বারান্দা, একতলাতে ও বারান্দা ও ঘরের প্ল্যান দোতলার অনুরূপ। এখন অবশ্য একতলার বারান্দা বন্ধ করে দিয়ে বাড়িটার শ্রী নষ্ট হয়ে গেছে।

সকালে উঠে চারিদিকটা একবার ঘুরে দেখে এলুম। প্রথমেই চোখে পড়ল স্টেশন থেকে যে বাসটি আমাদের নিয়ে এসেছিল অদূরে সেটি বকুল গাছতলায় রয়েছে। দুটি বড় বড় বকুল গাছ অনেকখানি জুড়ে ছায়া বিস্তার করেছিল। সেইখানে বাসটি থাকত, তারি মধ্যে আমাদের খেলার জায়গা করে নিয়েছিলুম। এদিকটা বাড়ির সামনের দিক। পিছন দিকে একটি গেট ছিল, সেই গেট পর্যন্ত কাঁকরের লাল রাস্তা—দু ধারের শিউলি গাছ থেকে অজস্র শিউলি বিছিয়ে আছে। তখনও ফুলগুলি শিশির ভেজা। শান্তিনিকেতনের কথা মনে হলে সেই শিশিরে-ভেজা শিউলি ফুলের সুমিষ্ট গন্ধ ও সেই সঙ্গে তার কমনীয় রূপ মনের কোণে উঁকি দেয়। বকুল আর শিউলি ফুলের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের স্মৃতি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে। বকুল গাছের ছায়ায় বসে কত যে মালা গেঁথেছি তার ঠিক নেই।

বাবা যখন দেহলীতে ছিলেন তখনকার কথা বলছি। দেহলীর সিঁড়ি ভারী খারাপ ছিল। উঁচু উঁচু ধাপের সরু একটি সিঁড়ি তা দিয়ে উঠতে বেশ কষ্ট হতো। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে সরু একটি বারান্দা। সেখান দিয়ে দু এক ধাপ উঠে ঘরে যেতে হতো। বাবা কেন যে এত সিঁড়ি পছন্দ করতেন জানি না। তিনি যে বাড়িতেই

সরুলকুঠীতে রবীন্দ্রনাথ

গেছেন তার এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যেতে দু এক ধাপ সিঁড়ি থাকবেই। কোনার্কে বাড়ি-নি ছিলাম, এখন চোখে কম দেখি সেইজন্য ওখানে থাকতে ভয়ে ভয়ে থাকতুম যে সিঁড়ি উঠানামা করতে কখন না পড়ে যাই!

বলা সেই যে সকালবেলায় লিখতে বসতেন স্নানাহারের জন্য যেটুকু সময় দরকার কেবল সেই সময়টুকুর মতো তাঁর কলম বন্ধ থাকত। খেয়ে উঠে আবার লিখতে বসতেন। তখন বাইরে যেন কাঠ ফেটে যাচ্ছে ও লু-য়ের মত গরম হাওয়া বইছে। যতই গরম হোক না বাবা কখনো দরজা জানালা বন্ধ করতেন না। আমরা গরমের ভয়ে ঘর অন্ধকার করে রেখেছি দেখলে বিরক্ত হতেন। তার বলতেন "যত গরম গরম করবি তত বেশী গরম লাগবে।" বাবা জন্মেছেন বৈশাখের খর রৌদ্রে তাই বোধ হয় রোদকে ভয় করতেন না। রোদের সঙ্গে তাঁর মিতালি ছিল। তাঁর "রবি" নাম রাখা সার্থক হয়েছিল। বড় পিসিমার কাছে শুনেছি যে বাবার অন্য ভাইরা যে ঘরে জন্মেছেন বাবা সে ঘরে হননি। বাবা জন্মাবার কিছুদিন আগে থাকতে আমার ঠাকুরমার শরীর খারাপ হওয়াতে তাঁকে আঁতুর ঘরে না রেখে অপেক্ষাকৃত বাসযোগ্য বড় ঘরে রাখা হয়েছিল এবং বাবা সেই ঘরে জন্মেছেন। বাবা কোন ঘরে জন্মেছেন সেটা অনেকেই জানতে চান কিন্তু তার হদিস দেওয়া সম্ভব নয়।

বাবা কি আশ্চর্য রকম অন্তরের কথা বুঝতে পারতেন, সে কথা এখানে বলে দিই। আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি কখনো যদি মন খারাপ নিয়ে তাঁর কাছে গিয়েছি, কিছু বলতে হতো না শুধু মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারতেন কোথাও ব্যথা পেয়েছি তখন সস্নেহে কাছে টেনে নিতেন। বাবার কাছে এত স্নেহ পেয়েছি যে মাতৃ অভাব কোনোদিন বোধ করিনি।

বাবাকে যেমন ভালবাসতুম তেমনি ভয় করতুম। তিনি কখনও বকতেন না। তাঁর মুখের দিকে তাকালে বুঝতে পারতুম যে কাজটা ভাল করিনি। কোনো অন্যায় কাজ করে তাঁর মুখের দিকে তাকাতে সাহস হতো না। অবেলায় বৃষ্টিতে ভিজে এসে বাড়ি ফেরবার সময় ভাবনা হতো যদি বাবা দেখে ফেলেন। এরকম অনেকদিন হয়েছে শুধু একবার তাকিয়ে দেখে নিতেন কতটা ভিজেছি তারপর বলতেন কাপড় ছেড়ে এসে "আদার রস দিয়ে চা খেয়ে নাও তাহলে সর্দি হবে না।" সুধাকান্ত একবার আমাকে একটা চিঠিতে লিখেছিলেন বাবার বিরক্তি সম্বন্ধে। "তিনি অসন্তুষ্ট হলে গাম্ভীর্য অবলম্বন করে থাকতেন সেই গাম্ভীর্য এতই রাসভারী ছিল তখন তাঁর ঘরে ঢুকতে কেউ সহজে সাহস করতো না। অভিমানও ছিল তাঁর গাম্ভীর্যপূর্ণ, বহুবার বহু কারণে তাঁর এই দুই রকমের গাম্ভীর্য আমি স্বচক্ষে দেখেছি।"

বালিকা বয়সে রবীন্দ্রনাথকে লেখা মীরা দেবীর চিঠি

সুধাকান্তর চিঠি থেকে এই ক' লাইন উদ্ধৃত করার লোভ সম্বরণ করতে পারলুম না।
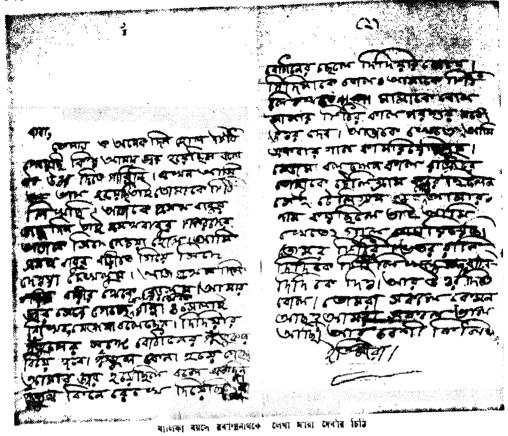
বাবা নিজের লেখাপড়ার কাজে ব্যস্ত থাকলেও তারি মধ্যে রোজ সকালে আমাকে নিয়ে পড়াতে বসতেন। বেশীর ভাগ সময় Golden Treasury থেকে বেছে বেছে কবিতা পড়াতেন। আমি ভাল মুখস্থ করতে পারতুম না কিন্তু বাবা এমন সুন্দর উপায়ে মুখস্থ করিয়ে দিতেন যে যেখানটা আমার মনে পড়ত না সে জায়গায় কবিতার ছবিটা মনে করিয়ে দিতেন, তখন আস্তে আস্তে সবটা মনে পড়ে যেত। যে কবিতাটা মুখস্থ করাতে চাইতেন সেটা বার কতক লিখতে বলতেন; লিখতে লিখতে আপনি মুখস্থ হয়ে যেত। চেঁচিয়ে পড়ে পড়ে মুখস্থ করার চেয়ে লিখতে লিখতে কত সহজে মুখস্থ হয়ে যায় স্কুলের ছেলেমেয়েরা যদি একবার জানত তাহলে নিশ্চয়ই আমার পন্থা ধরত। বয়সের তুলনায় বাবা একটু শক্ত বিষয় পড়াতে ভালবাসতেন। তিনি বলতেন, ছেলে-মানুষ বুঝতে পারবে না বলে যদি ছেড়ে দেওয়া হয় তা হলে কোনো কালে তারা ভাবতে শিখবে না। ক্রমে আমাকে টেনিসন ও ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতা সোরাব ও রোস্তামের কাহিনী তারপর এনক আর্ডেন ইত্যাদি ইংরেজী সাহিত্যের কতকগুলি শ্রেষ্ঠ কবিতার সঙ্গে পরিচয় করিতে দিলেন। একদিন যখন বায়রনের কবিতা ধরালেন কবিতাটির নাম বোধ হয় Lady of the Balcony তখন পড়লুম বিপদে। তারপরে কিন্তু বেশী দূর অগ্রসর হতে হল না। অজিত চক্রবর্তী তখন আশ্রমে এসেছেন, তাঁর কাছে আমাকে পড়তে দিলেন। অজিত-বাবুর কাছে Ancient Roman History পড়েছি। আমার কোনো কালে সাল বা তারিখ মনে থাকে না তবু ইতিহাসের দিকে আমার খুব ঝোঁক ছিল। তাদের বাড়ি ঘর দেশের অবস্থা কি রকম ছিল, চাল-চলন কেমন ছিল দেখতে কেমন ছিল এইসব জানতে ইচ্ছা করত। সেই বইটার চেহারা অবধি আজও মনে আছে। হঠাৎ একদিন সেই সময়কার আমার একটি রোমান ইতিহাসের নোট লেখা খাতা পুরোনো আবর্জনা থেকে বেরিয়ে পড়ল। দেখে নিজের এত আশ্চর্য লেগেছিল যে কি করে পাতার পর পাতা এতখানি নির্ভুল ইংরেজীতে লিখেছি। বলতে ভুলে গেছি দিদিকে পড়াবার জন্য লরেন্স সাহেব ও একজন সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন। আমিও লরেন্স সাহেবের কাছে পড়েছি; তাঁর একটা শখ ছিল গুটি

পোকা পোষা ও অনেক সময় তাঁর গায়েও দু'টি পোকা ঘুরে বেড়াত। অজিতবাবু বোধ হয় সতীশ রায়ের একটু আগে বা পরে এসে থাকবেন। দাদাদের মুখে সতীশবাবুর কথা খুব শুনেছি কিন্তু তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য আমার হয়নি। অজিতবাবুর কাছে ইংরেজী কবিতাও পড়েছি। তিনি বেশ আবৃত্তি করতে পারতেন, নিজেও কবিতা লিখতেন। অজিতবাবু যে শুধু ভাল পড়াতে পারতেন তা' নয় ভাল অভিনয়ও করতে পারতেন। তাঁর গানের গলাও ছিলো সুন্দর। মনে পড়ে দেহলীর একতলার ঘরে একটা দোয়ার্কিন-এর হারমোনিয়াম ছিল। হার্মোনিয়াম বাজিয়ে একটার পর একটা বর্ষার গান গেয়ে চলেছেন আর বাইরে ঝম্‌ঝম্‌ করে বৃষ্টি পড়ছে, আর সেই বৃষ্টির ধ্বনি ছাপিয়ে তাঁর গলা শোনা যেতো।

বাবা শুধু যে লেখাপড়া নিয়ে থাকতেন তা নয় তারি মধ্যে বিদ্যালয়ের কাজকর্ম ঠিকমত চলছে কিনা সে খোঁজও নিতেন। রাত্তিরে ছেলেরা শোবার পরে তাদের ঘর একবার ঘুরে দেখে আসতেন যে সবাই ঠিকমত মশারি গুঁজেছে কিনা। বরাবর দেখেছি কারোর অসুখ করলে বাবা স্থির হয়ে থাকতে পারতেন না। যখন নিজের হেঁটে যাবার মত ক্ষমতা ছিল তখন বিদ্যালয়ের ছেলেদের কারোর কিছু হলে নিজে গিয়ে ওষুধ খাইয়ে দিয়ে আসতেন। ইদানীং আর অতটা হাঁটতে পারতেন না তখন তাঁর হয়ে সুধাকান্ত রায় চৌধুরীকে তাদের খবর নিতে পাঠাতেন। আমার কিছু হলে সুধাকান্তকে 'মালঞ্চ'-এ গিয়ে আমাকে দেখে আসতে হতো। শুধু ওষুধ দিলে হতো না সুধাকান্তকে আবার গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসতে হতো ঔষুধ খেয়েছি কিনা। ঔষধ খাওয়ার বিষয় আমার বড় কুঁড়েমি ছিল। একবার অনেকদিন ধরে জ্বরে ভুগ-ছিলুম। বাবা বিছানায় এসে বসে কপালে [illegible] অনেক কমে গেছে আবার বাবা উঠে গেলেই ছটফট্‌ করতে শুরু করতুম। বাবা আমাদের মায়ের অভাব বোধ করতে কখনও দেননি আবার অতিরিক্ত আদর দিয়ে নষ্টও করেননি।

বাবা আমাদের নিয়ে নানারকম indoor games খেলতেন। একটা ছিল একটা কোনো লাইন লিখে তার শেষের কথাটা বলে দিতেন তারপর সেটা দিয়ে আমাদের আবার একটা লাইন লিখতে হতো। এমনি করে অনেক সময় বেশ একটা গল্প তৈরি হয়ে যেত।

বাবার সম্বন্ধে আর একটা কথা বলি। বাবা মাথা থেকে নানারকম রান্না বের করতে ভালবাসতেন এবং মাকে দিয়ে সেগুলো রাঁধাতেন। আগেই বলেছি, একবার মনে হলো [illegible] বদলে আটা মাখবার সময় ক্যাস্টর অয়েল দিয়ে মাখলে কেমন হয়।

প্রথমটা শুনে আমাদের মনে হলো বিশ্রী গন্ধ হবে। কিন্তু আশ্চর্য যে রুটিতে একটুও গন্ধ হয়নি। আমরা যখন শান্তিনিকেতন guest House-এ ছিলুম তখন রায়পুরের রবি সিংহ মাঝে মাঝে ওখানকার একটা ঘরে এসে থাকতেন। অনেক চাষীরা দেখা করতে আসত। ওখানে ও'দের অনেক জমিজমা ছিল কাজেই ওসব সংক্রান্ত ব্যাপারে তারা আসত। রবি সিংহ ঘোর শাক্ত ছিলেন। মস্ত বড় কপালে প্রকাণ্ড বড় সিঁদুরের ফোঁটা,

বাবরি চুল, বড় বড় রক্তবর্ণ চোখ দেখলে আমার ভয় করত। তিনি অনেক সময় আমাদের সাঁওতাল পাড়ায় বেড়াতে নিয়ে যেতেন। এমন কিছু দূর নয়, তখন বাড়ি থেকে একটুখানি দূরে গেলেই মনে হতো অনেক দূরে গেছি। সাঁওতালদের চালে লাউ কুমড়ো কিছু দেখতে পেলে তুলে দিতে বলতেন। তারা—বেচারারা ভয়ে ভয়ে তাই দিত, তার জন্য তাদের কখনো পয়সা দিতেন না। ফেরবার পথে অন্ধকার হয়ে যাবে বলে তাদের কাছ থেকে মশাল জ্বালাবেন বলে তাদের উঠোন থেকে খানিক খড় টেনে নিতেন। তারপর মশাল জ্বালিয়ে সেই আলোতে আমরা বাড়ি ফিরতুম। এখন মনে করতে কি রকম মজা লাগে মশাল জ্বালিয়ে বাড়ি ফিরছি। সিংহি মশায়ের রায়পুরের বাড়িতে গিয়েছি গরুর গাড়ি করে, যেতে অনেকক্ষণ লাগত। ও'দের বাড়ির সঙ্গে অনেকখানি জমি ছিলো তাকে বাগান বলা চলে না বন বললেই হয়। সেখানে প্রথম দেখলুম গাছে রুদ্রাক্ষ ঝুলেছে। রবি সিংহ হাতেও গলার মালায় রুদ্রাক্ষের মালা পরতেন। তাঁর স্ত্রীকে দেখলুম—আকৃতি বা প্রকৃতি দুয়ের কোনোটাতে স্বামীর সঙ্গে
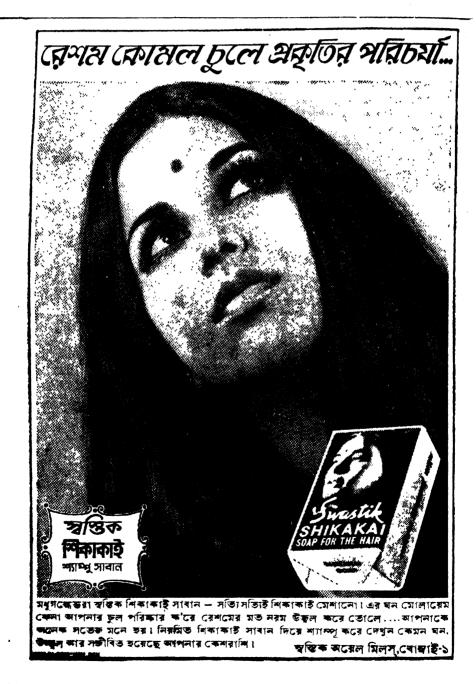
তার মিল নেই। সাধারণ নরম সরম বাঙালী মেয়ে যেমন হয়ে থাকে তিনি ছিলেন সেই রকম। একলা থাকেন, আমাদের পেয়ে খুব খুশী হতেন। সেখানে সারাদিন কাটিয়ে সন্ধ্যার আগে গরুর গাড়ি করে ফিরে এলুম। হুস্ করে মোটরে করে যাওয়ার চাইতে তখনকার দিনে গরুর গাড়ি বা পুস্পুসে করে যাওয়ার মধ্যে অনেকটা adventure ছিল। দু মাইল ধরে ইলাম বাজারের বন দিনের আলো থাকতে পার হতে হবে। ওখানে হেঁড়েল বলে এক রকমের জানোয়ার ছিল, নেকড়ে বাঘের ছোট ভাই বলা যেতে পারে। মাঝে মাঝে লোকালয়ের ছাগল চরছে দেখলে ধরে নিয়ে যেত। একবার শান্তিনিকেতনের গেটের বাইরে একটা ছাগল ধরে নিয়ে গিয়েছিল। ঘর থেকে খুব একটা চেঁচামেচি শুনলুম বটে কিন্তু উঠে গিয়ে দেখিনি। তাই হেঁড়েল যে কত বড় বা কি রকম দেখতে তা বলতে পারছিনে।

মহর্ষিদেবের ব্যবস্থা অনুসারে প্রতিদিন সকালে শান্তিনিকেতন মন্দিরে উপাসনা হতো এবং উপাসনা করবার জন্য একজন পশ্চিমী পণ্ডিত ও দুজন গাইয়ে ছিলেন। গাইয়েরা ঐখানকার স্থানীয় লোক। তার মধ্যে যিনি ছিলেন ঘোর কৃষ্ণবর্ণ তাঁর নাম ছিল গোরা। অপরটির নাম শ্যাম ভট্টাচার্য। সেটি উজ্জ্বল, শ্যামবর্ণ ও সুশ্রী দেখতে। গোরার চেয়ে তিনি বেশ ভাল গাইতে পারতেন। তাঁর কীর্তনের গলা ছিল। শ্যামা-বিষয়ক গান খুব সুন্দর গাইতেন। আমরা তাঁকে ধরে তাঁর গান শুনতুম। তাঁর কীর্তনের কথা ও সুর এখনকার আধুনিক কীর্তনের মত নয়। কেউ যদি গ্রামে গিয়ে সেই সব পুরোনো কীর্তনগুলি উদ্ধার করতে পারেন তাহলে খুব ভাল করেন। শান্তিনিকেতনে তখন যাঁরা যাঁরা ছিলেন তাঁদের সকলের কথাই বোধ হয় বলেছি। শুধু সর্দারের কথাটা বলা

বালিকা বয়সে মীরাদেবী

হয়নি। সে এক সময় ডাকাতের সর্দার ছিল, তাই সবাই তাকে সর্দার বলত। লম্বা চওড়া ছিপছিপে চেহারা তাকে দেখে কিন্তু ভয় করতো না যেমন রবি সিংহকে দেখলে ভয় করতো।

আমরা মাঝে মাঝে সুরুলে বেড়াতে যেতুম। সর্দার তার লম্বা একটা লাঠি নিয়ে আমাদের গরুর গাড়ির পাশে পাশে হাঁটত আর সেই সময় কত রকম যে ডাকাতের গল্প করত। রণপায়ে চড়ে সে কত তাড়াতাড়ি ক্রোশের পর ক্রোশ দূরের গ্রামে গিয়ে ডাকাতি করে আবার নিজের ঘরে এসে দিব্যি শুয়ে পড়ত যাতে ধরা না পড়ে—এসব গল্প শোনাতো। গল্প শেষ করে সব সময় অভয় দিত যে সে যতদিন বেঁচে আছে আমাদের কোনো অনিষ্ট হবে না। বোধ হয় মহর্ষিদেব এসে ওখানে বাস করাতে তাঁর প্রভাবে ওদের মতিগতির পরিবর্তন হলো। ওদের মধ্যে অনেকে জমিজমা নিয়ে চাষ বাস করতে আরম্ভ করল। কেউ কেউ আমাদের ঘরের কাজে লেগে গেল। তার মধ্যে কেউ কেউ বেশ রাঁধতে শিখে গেল। তখন ওরাই আমাদের সব কাজকর্ম করত। এখনও সর্দারের দু' একজন বংশধর বেঁচে আছে।

ভুবনডাঙ্গা ছাড়িয়ে অদূরে একটি দোতলা বাড়ি দেখা যায় সেটি হচ্ছে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের, যিনি 'রবীন্দ্র জীবনী'-রচয়িতা বলে সুপরিচিত। বিদ্যালয়ের লাইব্রেরী প্রথম অবস্থা থেকে প্রভাতবাবু বহুকাল ওখানকার লাইব্রেরিয়ান রূপে ছিলেন। বোলপুরের মেয়েদের প্রাইমারী স্কুলটি প্রভাতবাবুর স্ত্রী সুধা দেবীর যত্ন ও পরিশ্রমের ফলে আজ Higher Secondary School-এ পরিণত হয়েছে। সুধা দেবী স্বল্পভাষিণী শান্তস্বভাবের মহিলা। হঠাৎ দেখলে বোঝা যায় না যে তাঁর মধ্যে গড়ে তোলবার একটা ক্ষমতা আছে।

(ক্রমশ)

সোলিং এজেন্টস : মেসার্স রাধেশ্যাম কৃষ্ণকুমার অ্যাণ্ড কোং
১৯৬, যমুনালাল বাজাজ স্ট্রীট
(বিলাস রায় কাটরা), কলিকাতা-৭

খোরে কি মুশকিল! পায়ে ধরলে কি কজ পাওয়া যায় নাকি?'

'আপনি যেতিন' দয়া করো'—বলে রহমান।

'কাল এস রহমান, চেষ্টা করব।'

সবাই দেখেছে বাবু রহমানকে কথা দিয়েছে। তাই তারাও হাতে পায়ে ধরবার জন্যে খানিকটা ঘুরতে থাকে পায়ে পায়ে।

লোকগুলো যেন হন্যে কুকুর—এক টুকরো বাসি রুটির লোভে যেমন ঘুরে বেড়ায়! এই তো সেদিন ধর্মঘট গেল। ম্যানেজার সাহেব ওদের বুঝিয়ে কুমড়ো ঘণ্ট আর খান চারেক রুটি খাওয়াবার লোভ দেখিয়ে তিন শো জনকে আটকে রাখলে ক্যান্টিনে ধর্মঘটের দিনে কাজ করলে চাকরি পেয়ে যাবে। কিন্তুন হপ্তার টাকা থেকে ক্যান্টিনে খাওয়ার দাম কাটা গেল! লালঝান্ডার আপিসে গিয়ে গলা ফাটিয়ে অভিযোগ করলে। বললে, 'আমরা খাবার লোভে থাকিনি। ছিলুম শুধু চাকরি পাবার আশায়। জানের মায়া ছেড়ে। কিন্তুন ম্যানেজার সায়েব তার বাত ঠিক রাখেনি। যার বাত নড়ে তার বাপ নড়ে।'...

সাত হাজার শ্রমিকের মধ্যে মাত্র তিনশো-জনকে দিয়ে মিল চালিয়ে কোনো ফায়দা হয়নি। ভেবে দেখেছে ম্যানেজার। বলছে, 'তোমরা মীরজাফর!'

কিন্তু রহমান যায় নি ওদের দলে। সে জানত, মীরজাফরের পোষ্যপুত্র ওই ভাঁওতা-বাজ কোম্পানীর দালাল বাবু-সাহেবগুলো, ওদের বিশ্বাস নেই।

এগারটার ভোঁ হল। চালু হয়ে গেল নাইটসিফ্‌ট। ভিড়ভিড় করে খেতে বেরুচ্ছে কোঁদোমাথা হাজার হাজার মানুষ। কংকাল কাফেলা। তাঁর মধ্যে রহমান। খুঁজে নিয়েছে তাকে কানাই। পাশাপাশি চলেছে দু-জনে। মুখপোড়া হনুমানের মতো মুখ। খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ। নাভিশ্বাস বইছে হাঁ করা গালের ফাঁক দিয়ে। ট্যাঁকে একটা আধপোড়া বিড়িও নেই যে দু-টান মারবে। ঘুচিয়ে দেবে বুকের ভেতরের জমে-ওঠা যত গ্লানি, অভিমান, দুঃখ, হতাশা, শ্রান্তি আর ক্রোধ। ফিরতি পথে হেথা হোথাকার চা-দোকানের গায়ে মারা রঙিন কালির পোস্টারগুলোর চোখ পড়ে রোজ। বানান করে করে পড়ে কানাই :

"যুক্তফ্রন্ট যুক্ত নয়, গোদীর লোভে যুক্ত হয়।"

"ভোটের দ্বারা শাসক পালটায়, শোষক পালটায় না।"

"ভারতে ৫০ কোটি লোকের ৩৫ কোটি মূর্খ—বিশ বছরে কংগ্রেসের এটি বিশাল কীর্তি!"

"লক্ষ লক্ষ বেকারকে খুন-জখম-লুট-পাটের ছাড়পত্র দিতে হবে। 'বিপ্লবের' তারাই আসল দাবিদার।"

"শিবের চেলা ১৪ দল, ১৪ দলের ভাঙ কে বল্‌?"

বেড়ে লেখে বটে লোকগুলো!

কানাই বলে, 'দুনিয়ার হালচাল পালটাচ্ছে ভাই রহমান।'

'বয়ে গেল!...মোদের 'কুনো' উবগার হবে না কস্মিনকালেও। মোরা গরিব। খোদাও মোদের বাচ্চাদের 'কেসমতে'—রুজি-রোজগারে বেজার দাদা। খোদাও বেজার। দশ বচ্ছর বাঁচো তো 'তহোন' এসে 'মুয়ে' দু-ঘা জুতো মেরে বোলো যেতিন কুনো উবগার উন্নতি হয় গরিবের। গরিব ই-একটা জাত! ই-জাতের হাতে যেতিন রাজত্ব আসে—ই-শালাও বড়লোক হয়ে যাবে। গরিবদের ভোটটা লিয়ে কুনো রকমে একবার গদিতে বসতে পারলে হয়—গরিবকে ত্যাখন 'কেলা' দ্যাখনে! যারা গদিতে বসে তারা সবাই বড়লোক—নামে মোদের বন্ধু! দু-বচ্ছর 'মন্ত্রী' থাকলে টাকার পাহাড় জমাবে আর মোদের বংশধররা পিঁপড়ের সারির মতন খাবি খাবে বেকার হয়ে। মাঝে মাঝে দাংগা বাধিয়ে দিলে যদি এরা কিছু কমে তো কমবে। ভারতের হেঁদু-মোছলমান লড়ালড়ি শিখবে; শিবের গাজন শালা গরিবরাই ধ্বংস হবে। গরিব হল শালা ভগমানের চোখের জল! গরিব ই-একটা জাত—শালা কুকুরের ল্যাজ—যতই ঘি দিয়ে টানো সিধে করা যাবে না।'...

ক্ষোভে দুঃখে নিজের গায়েই যেন ছুরি-ছোরা মারে রহমান।

কানাইয়ের মতন রাজনীতিকও বুঝতে পারে না রহমানের চালটা। শুধোয়, 'বলি, তুমি কুন্‌ দলের হে?'

'কুনো শালার দলের লয়! আমি একটা গাধা, গরু—বুনো শুয়োর! তুই যা শালা! খচাস্‌নি এ্যাহোন আমার সঙ্গে। মাথা খারাপ!'...

ঘাবড়ে যায় কানাই। অকারণে হঠাৎ রেগে উঠতে খারাপ একটা কথা বলে সে মনে মনে।

কানাইকে এখনো যেতে হবে। পথ শেষ হয়েছে রহমানের। । সালাম জানালে কানাইকে।

বাড়িতে এসে হুমড়ি-খাওয়া ছাউনিওলা দাওয়ার চালখানাকে বেঁকে দুমড়ে পড়ে চাগিয়ে-রাখা খুঁটিটাতে হেলান দিয়ে হাঁটুতে হাত বেঁধে মাথা গুঁজে বসে রইল খানিকটা।

কাজলের কোলে ছেলেটা হ্যা-হ্যাঁ করে কাঁদছে। বিরক্তিতে ফেটে পড়ে রহমান : 'দেনা শালাটাকে এক কাছাড়। সাবাড় করে ফ্যাল!'

সজল করুণ চোখ তুলে তাকায় শুধু কাজল-বউ। ঢলঢলে মিষ্টি মুখখানা তার শুকনো তুলসীপাতা। কোনো প্রতিবাদ করে না কাজল। কিন্তু সেইটাই তো আরো

বিরক্তিকর রহমানের কাছে। আগুনভরা গোল গোল চোখে খানিকটা তাকিয়ে থাকে কাজলের মুখের দিকে। মরা হাসি চিকচিক করে শুকনো কালো বাঁকা দুটো ঠোঁটে। কাজল! গেরামের মধ্যে যে ছিল একদিন সেরা সুন্দরী! পাঁচ ছেলের মা হয়েও—দুঃখের সংসারে দু-বেলা দু মুঠো খেতে না পেয়েও যার রূপের জৌলুস এখনো ধাঁধা লাগায় রহমানের চোখে। এক দৃষ্টে কতক্ষণ তাকিয়ে থাকে। কাজল বোঝে বইকি রহমানের এই দৃষ্টির অর্থ। তাই অন্যমনস্কভাবে বলে, 'গা ধোবে তো! বসে রইলে কেন?'

'খাবার আছে কিছু?'

'না।'

মা—ছোট্ট একটা শব্দ! আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ! হাতের কাছে কিছু একটা পেয়ে গেলে ছুঁড়ে মেরে দিত কাজলকে। কেন—মিথ্যে কথা একটা বানিয়ে বলতে পারে না সে? কি দরকার তার ওই মানুষ পয়দা হওয়ার গাছটাকে? আশা-আকাঙ্ক্ষায় গড়ে রাখা আগামী বছরটাকে আরো ভীষণতর করে উপস্থিত করে ওই মেয়েমানুষটা!

মাথাটা ঝিমঝিম করে রহমানের। পেটের বত্রিশ হাত নাড়ীতে ছত্রিশ হাজার পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে। ছ-সাতটা প্রাণী। ঘরে একমুঠোও দানাপানি নেই।

খাবার যখন নেই—'গোসল' (স্নান) করে কি লাভ?

রেশন কার্ডখানা হাতে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল রহমান। রিলিফের টিকিট দিচ্ছে নাকি অঞ্চলের 'পেরধান'বাবু। কাজল ছেলে বগলে করে গিয়েছিল একবার। দেয়নি। বলেছে, 'তোমার সোয়ামী তো মিলে কাজ করে।' এত করে বললে, 'বদলি-কাজ—মাসের মধ্যে দুটো দিনও হয়নে—তবু দিলে নে।'

যাচ্ছে—বলে দেখবে একবার রহমান।

প্রধানবাবু বসে আছে। চারপাশে আধমরা ছোঁড়া ন্যাকড়াপরা নরনারীর ভিড়। রহমান এগিয়ে যায় বাবুর কাছে।

'কি রহমান যে, কি তোমার?'

'আজ্ঞে বাবু'...

'না বাপু, মাফ করো। এ কি আমার বাবার ঘরের মাল যে, যাকে ইচ্ছে বললেই দিয়ে দেব? পাঁচশো থেকে দু-হাজার করেছি—আরো কত চাও তোমরা?'

'সে তো ঠিক কথা। হুজুর হল আমাদের মা-বাপ।'

শত কণ্ঠের গুঞ্জন ওঠে বাবুর চারপাশে।

'তা হলে একটাও হবেনে হাঁ-বাবু?' হাতজোড় করে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে শুধোয় রহমান। থরথর করে কাঁপতে থাকে তার শুকনো ঠোঁট দুটো। বাবু লিখতে লিখতে মাথা না তুলেই বলে, 'আচ্ছা, সামনের কোটায় দ্যাখা যাবে। এখন যাও বিরক্ত করো না। ভাল এক ঝঞ্ঝাটে পড়া গেছে বাবা!'

দাঁড়িয়ে থেকে থেকে বসল রহমান। বসে থেকে থেকে আবার দাঁড়াল। বেলা তখন গড়িয়ে পড়েছে পশ্চিম আকাশে।

'হাঁ বাব., খেতিন একখানাও'...

'আরে, কি মুশকিল। চৌকিদার, এই বেচু সরদার। শুয়োর কাঁহে-কা—এই লোকটাকে বার করে দে এখান থেকে। পাগলা বুঝি; কথা বোঝে না। বেটোরা রিলিফের মাল খাবার বেলা হাত-জোড়—আর ভোট দেবার বেলা হাত্তুড়—যতসব!' তীব্র বিরক্তিতে কলমটা বন্ধ করে পকেটে গুঁজলেন প্রধানবাবু। নরম নারী-সুলভ মুখে কতকগুলো ভাঁজ পড়ে গেল তার।

'এই হাটো হাটো সব। বাবুকে হাওয়া লাগতে দাও।' বেচু সরদারের গায়ে তেজ আছে। ধাক্কা মেরে লোকগুলোকে হটিয়ে দিলে।

ঘোলা চোখ দুটোর দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায় রহমানের। আগুন জ্বলে ওঠে একবার তার বুকের ভেতরে দপ করে।

চৌকিদারের ধাক্কা খেয়ে মাথা নিচু করে বাইরে বেরিয়ে এল সে। মুখে বললে, 'শালা!'

পথে আসতে আসতে হঠাৎ একটু আশাতে মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার। কাজলের হাতে এখনো চারগাছা করে 'দায়মলকাটা' বাতানা (চুড়ি) আছে রুপোর। কাঁচের রেশমি চুড়ি একটু আঘাতেই ভেঙে যায় বলে হাঁস-মুরগীর ডিম বেচে বেচে বছর তিনেক আগে বাতানা ক-গাছা গড়িয়ে-ছিল কাজল। ডিম খেতে দেয়নি বলে তখন কত ঝগড়া করেছে—গালাগালি দিয়েছে কাজলকে। মারতেও কসুর করেনি।

আটগাছা বাতানা দু-টাকার এক সপ্তার করারে বন্ধক রেখে এক কেজি চাল একপো-খেসারী ডাল আর দু-আনার বারোটা পয়সা ফিরিয়ে আনলে রহমান সাহাদের দোকান থেকে।

রান্না করতে বসল কাজল। খালি হাতে থাকতে নেই বলে বুড়ী জরিমা বাদি কাপড়ের পাড় থেকে রাঙন সুতো তুলে 'নয়ে বেঁধে দিয়েছে বউমার দু-খানা হাতে।

বড় মেয়ে বাসিরন তার কাঁচ ভাইকে নিয়ে কান্না থামানোয় ব্যস্ত। ডাগর মেয়ে। দেহ ভরে গেছে যৌবনে।

ছোট তিনটি ভীড় জমিয়েছে মায়ের কাছে। গরম 'আসাম' (ফেন) খাবে তারা চায়ের মতন সুরুৎ সুরুৎ করে।

মুখ-আঁধারী সন্ধ্যার আকাশে ফুটে উঠেছে কয়েকটি নক্ষত্র। নিমগাছটাতে জোনাকীরা আলোর মালা গাঁথছে। হাতে পয়সা রয়েছে কটা। মনটা চনমন করতে লাগল রহমানের। ডাক দিলে মেয়েকে 'ও-মা বাসি, চার পয়সার বিড়ি লেয় না মা।'

কথাটা কানে গেল কাজলের। রাগে গজ

হয়ে রইল। কোনো প্রতিবাদ করলে না।

ডাগর মেয়ে। সাঁঝরাতে বাইরে যাবার দরকার নেই। হিন্দী-সিনেমা-দ্যাখা পাড়ার 'লোটো' ছোঁড়াগুলোর চালচলন দেখলে ঝাঁটা মারতে ইচ্ছে যায়। বাসিরনও 'নাই' বার করে কাপড় পরতে ধরেছে।

এক কেজি চালের ভাত ভাগ করে দিলে কাজল সবাইকে। নিজে কতকটা রাখলে নিজের জন্যে তা সেই জানে কিন্তু পেট ভরল রহমানের। খাটুনেতে মানুষ। সে তো একটু বেশি খাবেই।

ছোট বড় চারটে ছেলেমেয়েকে নিয়ে শুয়ে পড়ল রহমানের মা। তাদের নিয়েই বুড়ীর আশা-ভরসার পৃথিবী।

অনেকটা রাত হয়েছে। কাজলের চোখে তখনো ঘুম নেই। আস্তে আস্তে স্বামীর গায়ে হাত দিয়ে একটু নাড়া দিলে।

'শুনছ?'

'কি!' সাড়া দেয় রহমান। জেগেই ছিল সে।

কি বলবে হঠাৎ ভেবে পেলে না কাজল। অথচ কত কথাই না ভেবে গেল এতক্ষণ। লোকটা কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। কথা বলে না। গুম হয়ে থাকে। কত কি যেন ভাবে শুধু। অভাবে দুঃখে গলে যাচ্ছে। একদিন কি চেহারা ছিল আর আজ কি হয়েছে।

'কাপড়ের জন্যে যে বাইরে বেরোনো দায় হল।'

'কাল আনব তোর কাপড়।'

'ঠাট্টা করছ।'

'না। তোর। মায়ের। বাসির। আমার।'

'কাবুলীর দেনায় এমনি তো একগলা। আকবর কাবলী সেদিন 'বাকুলে' কেউ নেই, এসে একেবারে ঘরে ঢুকে পড়ে আমাকে বেইজ্জত করতে গেল—বঁটি লয়ে তাড়া করতে তবে পালায়। কাপড় আনবে, টাকা পাবে কোথা '

'বলব। পরে।'

স্তব্ধতাকে আরো গভীর খাদে বাইরে

চলে একটা কি যেন পোকা। কাঁচোর শব্দে বাসা তৈরি করছে আড়কাঠার বাঁশে। হাড়ের মজ্জা কুরেকুরে খাচ্ছে যেন। গভীর অন্ধকার। ক্রমে ঘুম নেমে এল দু-জোড়া চোখে।

হঠাৎ মাঝরাতে খিদেয় ককিয়ে ককিয়ে কাঁদতে লাগল কোলের বাচ্চাটা। স্তনের বোঁটা দাঁত দিয়ে কেটে ফেললেও দুধ পড়ে না এক ফোঁটা। রাগে ঘা কতক কীল-চড় দেয় কাজল তার বাচ্চাকে। ছেলেটা আরো জোরে চেল্লাতে থাকে। রেগে যায় রহমান। উঠে চুলের মুঠি ধরে বেশ করে ঘা-কতক লাগায় কাজলাকে। মেয়েমানুষের একটু সহ্যসবুরি নেই!

গাছপালার ভেতর দিয়ে এক চাই পোড়া মাটির চাঁদটা ডুবে যাচ্ছে পশ্চিম আকাশে। শীতের চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে পৃথিবী। তিনটের ভোঁ হচ্ছে কেঁপে কেঁপে। উঠে বসল রহমান। কান-খড়াক বুড়ী জরিনার ঘুম ঠিক ভেঙে গেছে। ডাকছে সে ছেলের নাম ধরে।

বুকে হাত বেঁধে পথে নামল রহমান।

হাজিরি হল। কাজ হল না রহমানের। বাইরে এসে বসে রইল। ভাবতে লাগল। রাতকাজটা হয় কি না দেখে যাবে। উঠে পড়ল। আনমনে চলতে চলতে পাট-তোলার ক্রেন-পাটাতনের জেটিতে এসে দাঁড়ালে রহমান। জেটিঘাটে ভিড়ানো বোটের খোল থেকে কাঠের সরু সিঁড়ি বেয়ে মাথায় কয়লার ঝুড়ি নিয়ে উঠছে নামছে একদল আঁধার-কালো মানুষ। আর ছোট ছোট কয়েকটি মানুষের বাচ্চা। তাদের মধ্যে থেকে নিজের পেটের ছেলেকেও চিনে বার করা মুশকিল!

ঘড় ঘড় করে ক্রেন ঘুরছে। ঝড় ঝড় করে কয়লা ভর্তি গাড়ি চলেছে রেলের ওপর দিয়ে। মাস কয়েক আগে গাড়িগুলো ঠেলত মানুষে। তামা-চটা পিচগলা রোদ্দুরে পায়ে চট জড়িয়ে। এখন তাদের ছাঁটাই করে আমদানি হয়েছে ইনজিন। একাই—এক শো মানুষের কাজ করে।

ঘোলাজলে পাক মেরে বয়ে চলেছে হুগলী নদী মন্থরে। কলকাতাগামী জাহাজের ঢেউয়ে দুলছে জেলেদের নৌকোগুলো। সাড়ে দশটার ভোঁ হল।

হাজিরি দিতে এল রহমান। কাজ হল। বাইশ নম্বরে। ঝড়ের বেগে ঘুরছে স্পিনিংয়ের ডাণ্ডিগুলো। বনবন করে বোঝাই হচ্ছে ফাঁকোনলী। ঝিঁঝিঁ করে একটা গম্ভীর শব্দ। রহমান ছুটে চলেছে লাইনের পাশের ঝোড়া থেকে নলী আনতে। নলীর ওপরে নলী সাজিয়ে নিয়ে ছুটে যায় অন্য লাইনে। পায়ের চাপে স্প্যাণ্ডেলখানা দাবিয়ে রেখে বাঁ হাতের তালুতে চেপে ধরে টেকোটা। পাক মেরে খুলে ফেলে একখানা ডাণ্ডি। সেই ডাণ্ডির ঘা মেরে অন্য ডাণ্ডিগুলোর প্যাঁচ আধখোলা করে নেয়। তারপর অতি দ্রুতবেগে এক-একটা বনবন করে ঘুরিয়ে খুলে খুলে রেখে দেয় নলীর কোলে কোলে। দড়ি ভর্তি নলীগুলো টেনে বার করে টপাটপ ছুঁড়ে দেয় স্পিনিং লাইনের মাথার ওপরে। সেখান থেকে চলন্ত ফিতের ওপর দিয়ে গড়িয়ে পড়ে গিয়ে বাক্সে। পরিয়ে দেয় খালি নলীগুলো। তারপর পাক দিয়ে দিয়ে ডাণ্ডি পরানো। মাথার ওপরের বোপিনের নলী থেকে আধ-পাকানো দড়ির খিগুলো টেনে এনে ডাণ্ডির একটা হাতলে পাকিয়ে দেওয়া। তারপর মেশিন চালু করে দাও। বনবন করে ঘুরতে থাকবে পাক-খেতে-খেতে বোঝাই হতে থাকা নলীগুলো। পরপর দশখানা নলী। আঠারোটা লাইন। আগে ছিল আটখানা নলী। তেরোখানা লাইন। প্রত্যেক লাইনে এক মিনিট করে সময়। নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নেই। হাড়ভাঙা খাটুনি। আট ঘণ্টার পারিশ্রমিক মাত্র তিন টাকা তেরো আনা। সপ্তায় আঠারো টাকা থেকে কুড়ি টাকা মাত্র। সে যাদের রোজ কাজ —পারমেণ্টওয়ালা —বদলিওয়ালাদের মাত্র দু' দিন কাজ হয়—ছ' টাকার বেশি হলে সরদার বাবুদের 'চেকারা' দিতে হয়।

বনবন করে ঘুরে ঘুরে পাক-খাওয়া দড়িগুলো বোঝাই হতে লাগল নলীতে। রহমানরা ছুটে গেছে অন্য লাইনে। দেখলে মনে হয় একদল মানুষ লড়াই করছে সমুদ্দানবের সঙ্গে। বাঁচবার কথা মরবার কথাও ভুলে যেতে হয়। পিছন থেকে তাড়া লাগায় সরদার। ঘুরে ঘুরে দেখছে একটার পর একটা লাইন। যেটার 'খি' ছিঁড়ে যাচ্ছে সন্ধ করে পরিয়ে দিচ্ছে। বাবুরা তালায় এসে চারদিকে চেয়ে চেয়ে ভারী মেজাজে জুতো মসমসিয়ে চলে যাচ্ছেন। পদমর্যাদার রঙিন চাহনি তাদের লাল চোখে।

দেড়টার ভোঁ হল। দিন টাইমের লোক এসে হাজির হচ্ছে একে একে। দুটোর সময় ঝপ করে আলো নিবে গেল। লোক বদল হল। গায়ের ফেঁসো ঝাড়তে ঝাড়তে খৈনী-গালে-পোরা মানুষের দঙ্গল বেরুতে শুরু হল বাঁধভাঙা স্রোতের মতো। বাইরে কত বড় সীমাহারা দুস্তর আকাশ। লাল চোখ দুটো জ্বালা করে ওঠে সূর্যের ঝলকানি লেগে। মিনিট পনেরো কানে শুনতে পাওয়া যায় না কিছু। তালা ধরে থাকে। ঝনঝন করে শুধু চটকলের হাজার রকমের শব্দ।

কানাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল রহমানের।

'কি ভাই, আজ কাজ হয়েছে?' শুধোল কানাই।

কলার ছড়ার মতন হলদে দাঁত বার করে ফ্যা-ফ্যা করে হাসে রহমান। হাঁ, কাম হয়েছে আজ তার।

'আমার ভাই, পাশ বইটাই সব কেড়ে নিয়েছে বড়সায়েব। আর ইউনিয়নে ঢুকতে মানা। জবাব। বদলি কাজ—তার আবার জবাব!'—ধারালো হাসিতে একটু পৌরুষের হাসি আছে কানাইয়ের।

'কি ব্যাপার রে ভাই?'

'বাবুকে বলেছিনু, যাদের কাজ দাও তারা তোমার বাবা হয় না বোনাই হয় যে তাদের ফি-হাপ্তায় কাজ দাও? শালা রেগে মেগে ঘাড় ধাক্কা মেরে মেরে নিয়ে যাচ্ছিল বড় সায়েবের কাছে। পথে—সেই লেবর অ্যাপিসের পাশে দিছিচ শালার নাকে এক ঘুঁষি। তারপর দরোয়ান এসে ধরে নিয়ে গেল। বড়সায়েব পাছায় দু' ঘা লাথি মেরে খিস্তিখাস্তা দিয়ে পাশবই কেড়ে নিয়ে বললে, জবাব! তবেই শালা, বয়ে গেল! ইউনিয়ানে যেয়ে বলতে তারা গা করলে না—আমি চাঁদা দিতে পারিনি। ঠিক আছে, চাবে জল খেটে খাব—বাজ পড়ুক শালার চটকলে!' খিঁক খিঁক করে হাসতে হাসতে পায়ের টায়ার কাটা স্যাণ্ডেল জোড়া টানতে টানতে কানাই চলে গেল ইটখোলার রাস্তাটা ধরে বাড়ির দিকে।

পদধ্বনি প্রায়ই শুনতে পাই। মাঝে মাঝে—এদানির ক্রমেই টেম্পো বেড়ে যাচ্ছে—প্রাচীরের উপর সাহেবী কায়দায় নক্‌ও করে। এহেন অবস্থায় সিরিয়াল অসম্পূর্ণ রেখে উল্টো রথহীন রথযাত্রায় বেরুতে চাইনে—মমেকসদয় সম্পাদকমণ্ডলীকে ক্ষিপ্ত পাঠক সম্প্রদায়ের অভিসম্পাতকুণ্ডে নিমজ্জিত করে। কাজেই সম্ভাব্য ক্ষিপ্ত পাঠকমণ্ডলীর জন্য সংক্ষিপ্ত পাঠ দিচ্ছি—সাতিশয় সংক্ষিপ্ত।২

দুই কারণে সোভিয়েত দেশ জরগের কাছে চিরঋণী। অবশ্য রুশের আরো বহু সেবা তিনি করেছেন।

প্রথম : হিটলার রুশদেশ আক্রমণ করার বেশ কয়েক মাস অর্থাৎ পর্যাপ্তকাল পূর্বে জরগে জাপান থেকে গোপন বেতারযোগে (বেতার যন্ত্রটি চালাতেন তাঁর এক সহ-স্পাই) স্তালিনকে খবর পাঠান, হিটলার চুক্তিভঙ্গ করে রুশ আক্রমণ করবে। শুধু তাই নয়, কোন্ মাসে, কোন্ সপ্তাহে সে খবরও পাকাপাকিভাবে জানান। আশ্চর্য, যখন খোদ জরমনির মাত্র গুটিকয়েক ডাঙর ডাঙর জাঁদরেল জানতেন যে হিটলার রুশ আক্রমণ করার জন্য সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করছেন, এবং তাঁরাও জানতেন না, কবে কোন্ মাসে হিটলার সে হামলা শুরু করবেন, তখন জরমনি থেকে হাজার হাজার মাইল দূরের জাপানে বসে জরগে এই পাকা খবরটি পেলেন কি করে? মনে রাখা উচিত, ১৯৩৯-এ যুদ্ধারম্ভের পর থেকে জাপান এবং জরমনির মধ্যে কোনো যাতায়াত পথ ছিল না। (সুভাষচন্দ্র যে কতখানি বিপদের ঝুঁকি মাথায় তুলে জরমনি থেকে জাপান পাড়ি দিয়েছিলেন সে-কথা সবাই জানেন।) সুইজারল্যাণ্ড থেকে গোপন বেতারেও—যেমন মনে করুন—খবরটা প্রথম জরমনি থেকে নিরপেক্ষ সুইজারল্যাণ্ডে গুপ্তচর মারফৎ গেল—সেটা পাঠানো প্রায় অসম্ভব ছিল। ওরকম বেআইনী জোরদার বেতার ট্রানসমিটার সুইস সরকার ধরে ফেলতই ফেলত। এস্থলে আরো বলি, হিটলার তাঁর যুদ্ধের প্ল্যান তাঁর দূরে-মিত্র জাপানকে তো বলতেনই না, তাঁর অতিশয় নিকট-মিত্র—ভৌগোলিক ও হার্দিক উভয়ার্থে—মুসসোলীনিকেও আগেভাগে জানাতেন না। এবং জাপানে অবস্থিত জরমন রাজ দূতাবাস আর-পঞ্চাশটা দেশে অবস্থিত জরমন রাজদূতাবাসের মত ও যে এ ব্যাপারের কিছুই জানতো না সে তো বহুবার বহু ক্ষেত্রে সপ্রমাণ হয়ে গেছে। হিটলার যে তাঁর ফরেন আপিস এবং তাঁর রাজদূতদের অবিশ্বাস করতেন তাই নয়, এদের রীতিমত ঘৃণা করতেন। এবং এ তত্ত্বটি হিটলার কোনোদিন গোপন রাখার কণামাত্র প্রয়োজনও বোধ করেননি। তিনি বিশ্বাস করতেন একমাত্র তাঁর আ প ন খাস প্যারা ফরেন মিনিস্টার রিবেনট্রপকে। ইনি জাতে শুঁড়ি। কূটনীতিতে তাঁর কোনো শিক্ষা-দীক্ষা বা অভিজ্ঞতা ছিল না। তৎসত্ত্বেও হিটলার গদীনশীন হওয়ার সামান্য কয়েক বৎসর পর তাঁর পার্টি, ফরেন আপিস, এমন কি তাঁর দক্ষিণ হস্ত গ্যোরিঙ, বাম হস্ত গ্যোবেলস সকলের তীব্র প্রতিবাদ উপেক্ষা করে রিবেনট্রপকে দুম্ করে বসিয়ে দিলেন ফরেন আপিসের মাথার উপর মহামান্য পররাষ্ট্র সচীবরূপে।

জরগের দ্বিতীয় অবদান : যে-রাত্রে জাপানী মন্ত্রিসভা এক অতিশয় গোপন বৈঠকে স্থির করলেন—হিটলার রুশ আক্রমণ করার পর জাপানকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালে, তারা যেন রুশের পূর্ব সীমান্ত আক্রমণ করে—যে তাঁরা কোনো অবস্থাতেই রুশ দেশ আক্রমণ করবেন না, তারপরদিন ভোরবেলা জরগে সেই সাতিশয় গুরুত্বপূর্ণ গোপনতম সিদ্ধান্তটির খবর পেয়ে যান এবং সঙ্গে সঙ্গে স্তালিনকে পূর্ব পদ্ধতিতে সংবাদটি জানান। স্তালিনের বুকের উপর থেকে জগদ্দল "জগারনট" নেবে গেল। জাপানী আক্রমণের ভয়ে পূর্ব সীমান্তে তাঁর যে-সেনাবাহিনী মোতায়েন ছিল সেটাকে তদণ্ডেই পশ্চিম সীমান্তে এনে হানলেন হিটলারের উপর মোক্ষম হামলা। দুই সীমান্তে একই সঙ্গে কে লড়তে চায়? ঐ করে সর্বনাশ হল কাইজারের। হিটলারেরও আখেরে সেই গতিই হয়েছিল। রুশ বেঁচে গেল।

*

পত্রান্তরে বেরিয়েছে : গত ৬ই নভেম্বর পূর্ব জর্মনির পূর্ব বার্লিনের একটি রাস্তার উপর প্রাক্তন রুশ স্পাইদের একটি সম্মিলিত অনুষ্ঠান হয়—প্রকাশ্যে। রয়টার বিস্ময় প্রকাশ করেছেন : স্পাইদের সম্মেলন—তাও প্রকাশ্যে!

এঁরা সমবেত হয়েছিলেন তাঁদের গুরুর গুরু জরগের স্মরণে।

পঁচিশ বৎসর পূর্বে বিশ্ব কম্যুনিজমের জন্য টোকিয়োতে প্রাণ দেন।

যে রাস্তাতে তাঁরা সমবেত হন সেখানে সেনাবাহিনীর ব্রাস্‌ব্যাণ্ডের সঙ্গীত সহ রাস্তাটির নূতন নামকরণ হয়

"রিখার্ট জরগে স্ট্রাসে"॥

---

২ শ্রদ্ধেয় সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী লেখকের উপকারার্থে মশলা নিবেদন। একখানা বৃহৎ ব্যাকরণ রচনা করার কয়েক বৎসর পর তিনি তারই একখানি 'সংক্ষিপ্ত' সংস্করণ প্রকাশ করেন। আমার সঙ্গে দেখা হলে পর দুষ্টু হাসি হেসে বললেন, "এটা হল 'সংক্ষিপ্ত' ব্যাকরণ; আগেরটা ছিল 'ক্ষিপ্ত' ব্যাকরণ।"

অবসর সময়ে এই ক্রিয়া অভ্যাস করতে হবে—যাতে এটা ফুটবলারের স্বভাবের ভিতর ঢুকে যায়। এ ব্যাপারে ব্যতিক্রম শুধু তীব্রগতিতে ছোটবার সময় এবং যখন আমরা শক্তি প্রয়োগের শেষ সীমায় উপনীত হচ্ছি, তখনই শুধু শ্বাসপ্রশ্বাস পুরোপুরি বন্ধ করা যেতে পারে। এবং এর ঠিক পরেই শরীরের অতিরিক্ত দরকারী অক্সিজেন যোগাতে ফুটবলার মুখ দিয়ে হাওয়া নিতে এবং ছাড়তে পারে। তবে ছুটন্ত অবস্থায় মুখ দিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া পেটে বায়ু বৃদ্ধি করে। এ ছাড়া সব সময় নাক দিয়েই শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়া অভ্যাস করা দরকার। কেননা ফুসফুসে ঢোকবার আগে, বাতাসকে অনেকটা রাস্তা পার হতে হয়। আমাদের নাকের ভেতরের লোমগুলো এবং হাড়ের ঝংকা ছাকনির কাজ করে বাতাসের সঙ্গে আনা ধুলোবালি সাফ করে দেয় এবং ভেতরের উত্তাপের সঙ্গে সমতা রাখতে, বাইরের ঠাণ্ডা বাতাসকে দরকারী উত্তাপও যোগায়।

যখন খেলা অথবা অনুশীলন থাকে না, তখনও ফুটবলারের উচিত ভোরবেলা নদীর ধারে অথবা মুক্ত হাওয়ায় পাঁচ থেকে দশ

মিনিট শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যায়াম করা। এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে মনে রাখতে হবে, যেখানে কয়লা অথবা কলকারখানার ধোঁয়ায় বাতাস দূষিত অর্থাৎ বাতাসে 'কার্বন মনোক্সাইড' প্রধান উপাদান হিসেবে অবস্থান করছে, সেখানে খেলা অথবা অনুশীলন শরীরের কোন উপকার না করে, যথেষ্ট অপকারই করবে।

দৌড়ন :—

বসা, হাঁটা এবং কথা বলার মতই দৌড়নও মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। এ মানুষ নিজে শেখে। কারও কাছে শিখতে হয় না। তাই অলিম্পিকের প্রথম আসরে দৌড়নই ছিল একমাত্র প্রতিযোগিতা।

কথা বলা সহজাত প্রবৃত্তি হলেও সব মানুষ যেমন সুবক্তা হয় না, তেমনি দৌড়ন মানুষের সহজাত হলেও, সব মানুষই দৌড়বীর হয় না, যদি না দৌড়নর পদ্ধতি সম্পর্কে তার পুরো জ্ঞান থাকে এবং নিয়মিত অনুশীলন না করে। আবার দৌড়নর ভিতরেও আছে বৈচিত্র্য। ১০০ মিটার দৌড় থেকে ২৬ মাইল পর্যন্ত নানা দূরত্বের দৌড় রয়েছে। এবং কায়দাতেও একটার সাথে আর একটার অনেক ফারাক।

আগেই বলেছি ফুটবল প্রচণ্ড গতিশীল খেলা। খেলার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, ফুটবলারকে পায়ের পাতার ওপর ভর দিয়ে ছোটবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। অ্যাথলীটকে ছুটতে হয় শুধুই সামনের দিকে। কিন্তু ফুটবলারকে সিধে, পিছনে, বাঁয়ে এবং ডাইনে। কখনও বল নিয়ে—কখনও বল ছাড়া। অ্যাথলীটকে মাঝপথে নিজেকে থামানর প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু ফুটবলারকে তীব্রগতিতে ছুটতে ছুটতে হঠাৎ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে যেতে হয়। আবার ঐ স্থির অবস্থা থেকেই তীব্র গতিতে ছুটতে হয়। সেই সঙ্গে ছুটন্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে গিয়ে, তাড়াতাড়ি উঠে পড়া এবং শূন্যে লাফানও রয়েছে।

উল্লেখযোগ্য অধিকাংশ ফুটবলারই ছোটার সময় দোষ-মুক্ত নয়। বিশেষ করে তীব্র-গতিতে ছোটবার সময়। অধিকাংশেরই শ্বাসপ্রশ্বাস ঠিকমত হয় না। কারও গোড়ালি ও পাতা একসঙ্গে পড়ে, কারও পায়ের পাতা বিশেষ একদিকে বেঁকে যায়। বেশীর ভাগেরই ঘাড় একদিকে বেঁকে শক্ত অবস্থায় থাকে এবং একটি হাত নড়ে ত অন্য হাত নড়ে না। ইংল্যান্ডের অ্যাথলেটীকস চীফ কোচ মিঃ ডাইসন তার 'দি মেকানিকস অব অ্যাথলেটীকস' বইতে এই প্রসঙ্গে লিখছেন, "গুড রানিং কলস ফর এ কো-অর্ডিনেটেড অ্যাকসন অব দি এণ্টায়ার বডি।" অর্থাৎ ভালভাবে ছুটতে গেলে, সমগ্র শরীরের সামঞ্জস্যপূর্ণ ক্রিয়া প্রয়োজন।

সামঞ্জস্যের অভাবের জন্য গতির তীব্রতা যথেষ্ট তো কমেই, উপরন্তু ঐ অবস্থায় মাটিতে পড়লে চোট লাগবারও যথেষ্ট সম্ভাবনা। তবে শারীরিক গঠন ও সৌষ্ঠবে, এজিলিটি ও শক্তিতে এবং অঙ্গন্যাসে মানুষের সঙ্গে মানুষের তফাৎ থাকায় একজনের সঙ্গে অন্যের দৌড়ের মিল খুঁজে পাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। দৌড়নকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ধীর, মধ্যম এবং তীব্র। ধীর গতিতে ছোটবার সময় পায়ের পাতা ও গোড়ালি প্রায় সমান্তরাল ভাবেই মাটিতে পড়বে। ১ নম্বরের (ক) ছবির মত। অনুশীলনের কিংবা খেলার শুরুতে শরীরের বিভিন্ন পেশীকে গরম করবার জন্য এবং দূর পাল্লার দৌড়ে এই রকম পদক্ষেপে দৌড়ন হয়। এ সময়ে হাঁটু, উরুর পেশীগুলো, হাত, হাত ও হাতের সন্ধিস্থল শিথিল রাখতে হবে।

মধ্যম গতিতে ছোটবার সময় ১-এর (খ)-এর মত গোড়ালি একটু উপরে থাকবে। পদক্ষেপ বড় হয়ে গিয়ে গতির সঙ্গে সঙ্গে হাতের দোলনও একটু বাড়বে। মোটর গাড়িকে ফার্স্ট গিয়ার থেকে ঝপ করে ফোর্থ গিয়ারে নিয়ে গেলে এনজিনের যেমন ক্ষতি হয়, ঠিক তেমনি স্থির অবস্থা থেকে হঠাৎ তীব্রতিতে ছুটতে গেলে, পেশী সংকোচনের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা শরীরকেও সব সময় ছন্দ মেনে চলতে হয়। মধ্যম গতি আসলে, ধীর গতি থেকে তীব্র গতিতে পৌঁছবার প্রস্তুতি।

তীব্র গতিতে ছোটবার সময় পায়ের অবস্থান কি রকম হবে তা দেখানো হয়েছে ১ নম্বরের (গ) ছবিতে। এ সময়ে শরীরের ভার পুরোপুরি পায়ে পাতা ও গুলির ওপর এসে পড়বে। হাতের দোলনের তীব্রতা সঙ্গে সঙ্গে বাড়লেও এ খুব সহজ-ভাবে আসা চাই। কনুই সরলরেখা থেকে ৪৫ ডিগ্রী ও ৬০ ডিগ্রীর ভিতর থাকবে। এবং গোড়ালি পাছার লাইনে যাবে। হাঁটু ও হাতের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া বারণ।

ফুটবল তীব্র গতির খেলা বলে, সব ফুটবলারেরই তীব্রগতিসম্পন্ন হবার আকাঙ্ক্ষা খুবই স্বাভাবিক। তাই সেহ বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে কি বলেন তাই দেখা যাক। কোটি কোটি কোষের সমন্বয়ে মানুষের এই শরীরে প্রতিনিয়ত অজস্র কোষের জন্ম-মৃত্যুর পালা চলেছে। এই পালার ভিতর দিয়েই ২৪ বছর বয়স পর্যন্ত কোষগুলো বৃদ্ধির দিকে থাকে। তারপর এই বৃদ্ধির পালাটা আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যায়। তাই এই বয়সের পর আর গতিকে বাড়ান সম্ভব নয়। তবে দৌড়নর সংখ্যা বাড়ান সম্ভব। যেমন ১০০ গজ তীব্রগতিতে ছুটতে, যে ফুটবলার ঘণ্টায় ৪।৫ বারেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে, অনুশীলনে একই সময়ে সে বিনা ক্লান্তিতে ১২।১৩ বার ছুটতে পারবে।

৩৫ বছরের পর এটাও সম্ভব হবে না। অর্থাৎ আস্তে আস্তে গতি কমে আসবে।

অনেক ফুটবলারকেই দেখা যায় ছোট বেলা থেকেই ধীরগতিসম্পন্ন। ১০০ মিটার দৌড়তে তার সময় লাগছে ১৩ কিংবা ১৪ সেঃ। এখন কেউ যদি প্রশ্ন তোলে "এরা কি অনুশীলনের দ্বারা স্প্রিণ্টার হতে পারবে? অর্থাৎ ১০০ মিটার ১১ অথবা ১১·৫ সেঃ আসতে পারবে?" আমার উত্তর—"আসলে
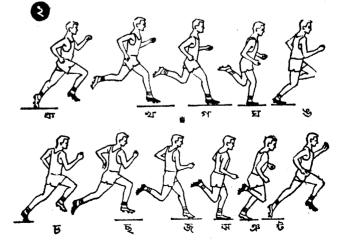
প্রকৃতি বিরোধী বলেই এটা সম্ভব হবে না।"

দেহের সমস্ত কর্ম ক্ষমতার মূলে রয়েছে যে এনার্জি, তার শতকরা আশী ভাগই হারিয়ে যায় পেশীতন্তুর বাধা অতিক্রম করতে। ফুটবলার বা শারীরিক কর্মক্ষম লোকেদের বেলায় এই হারানোর ভাগ হয় শতকরা ৭০ ভাগ।

পৃথিবীতে কিছু সংখ্যক অতি ভাগ্যবান আছে যাদের শরীরের এই পেশীতন্তুর প্রতিবন্ধকতা খুব কম। তারাই 'স্প্রিন্টার' হয়। তাই বলা হয় স্প্রিন্টার জন্মায়, তৈরি করা যায় না। কাজেই ধীরগতি সম্পন্ন ফুটবলারের উচিত, এ ব্যাপারে অযথা আক্ষেপ না করে, এমন জায়গায় খেলা, যেখানে তীব্রগতির বিশেষ দরকার নেই। যেমন উইং হাফ, স্টপার, ইন-সাইড ফরোয়ার্ড এবং গোলকীপার।

জোরে ছোটবার সময় সারা শরীরের ক্রিয়া কেমন হবে, তা ২ নম্বর ছবিতে দেখানো হয়েছে। অনুশীলনের সময় হুইসেলের সঙ্গে সঙ্গে স্টার্ট নেওয়া ও হুইসেলের সঙ্গে সঙ্গে থামার অভ্যাস রপ্ত করলে গতির তীব্রতা বাড়বে।

সহন ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য ফুটবলারকে সপ্তাহে দুদিন দূর পাল্লার দৌড় অভ্যাস করতে হয়। পাহাড় অথবা সমুদ্রের ধারে বালির ওপর হলে বিশেষ ভাল হয়। কিন্তু বাংলার মত সমতল দেশে পিচের রাস্তাই সম্বল। আরম্ভে দু মাইল থেকে শুরু করতে হয়। এবং শেষ পর্যন্ত একে বাড়িয়ে ৬ মাইল পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারলে ভাল হয়। অবশ্য এতে তীব্রগতিতে দৌড়বার দরকার নেই। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একই ছন্দ এবং গতি মেনে চলতে হবে। তবে দৌড়ের মাঝে মাঝে শরীরের সহনক্ষমতা বুঝে খানিকটা হাঁটাও চলতে পারে।

শুরুতেই হারিয়ে গেল বলে, বুদো যেন মাঠে আর খেলতে পারল না। ছোট থেকেই সে সীরিয়াস। ভবানীপুর মাঠে একদিন সবে খেলা শুরু হয়েছে। বুদো রেফারীকে কি বলতেই খেলা থেমে গেল। সবাই ওর দিকে তাকিয়ে। বুদো ততক্ষণে পকেট থেকে দুটো কাঁচা মুরগীর ডিম গোলপোস্টে ফাটিয়ে মুখে ফেলে দিয়ে, রেফারীর কাছে ফিরে এসেছে। বিরক্তিতে প্রশ্ন করলুম "এটা কি হল রে?" নির্বিকার মুখে ও বলল "একজন বলেছে এতে দম বাড়ে।"।

এই বুদোকেই সেবার দেখতে গেলাম হাসপাতালে। দুটো পায়েরই কাফ মাসল ছিঁড়ে দলা পাকিয়ে গেছে। অপারেশন করতে হবে। জিজ্ঞাসা করলাম "কি করে হলরে?" এবারও নির্বিকার মুখে ও বলল "একজনের পরামর্শে শ্যামবাজার থেকে ভিক্টোরিয়া রোড খালি পায়ে ছুটতে গিয়েই এ কাণ্ডটা ঘটল।"

একজন ফুটবলারকে খেলায় কতটা দৌড়তে হয় এ নিয়ে কোন পরীক্ষা এখনও পর্যন্ত আমাদের দেশে হয়নি। অবশ্য যে মাঠের সঙ্গে অপর মাঠের মিল খুঁজে পাওয়া যায় না বলে, এ ধরনের পরীক্ষা খুব সহজও নয়। তবু বিদেশে এর ওপর কিছু কিছু কাজ হয়েছে। ইংল্যাণ্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়ার ফুটবল বিশেষজ্ঞরা এ ব্যাপারে যে পরিসংখ্যান দিয়েছেন, তা অনেকটা সমর্থনযোগ্য বলেই এখানে উল্লেখ করছি। তবে মনে রাখতে হবে এই ভাগ পেশাদার ফুটবলারদের যা 'চরম খাটুনি' বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

সবসুদ্ধ দূরত্ব থাকছে...
১৭৫০—৬০০০ গজের ভিতর।
তীব্রবেগে দৌড়ন থাকছে...
২৫০—২০০০ " "
হাঁটা অথবা জগিং থাকছে...
১৫০০—৪০০০ " "

* দি এফ এ গাইড টু ট্রেনিং অ্যাণ্ড কোচিং—অ্যালেন ওয়েড।

॥ ১৭ ॥

বেলা প্রায় এগারোটা বাজে, বাসের দরজায় এখনও ঝুলছে অফিস যাত্রীরা। মণীন্দ্র কলেজের সামনে ছেলেমেয়েদের খুব ভিড়, আজও বোধ হয় স্ট্রাইকের উদ্যোগ পর্ব চলছে। দীপুর কলেজ জীবন শেষ হয়েছে বছর চারেক আগে, তবু সে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ শ্লোগান শুনলো, দেয়ালের গরম পোস্টারগুলো পড়লো মন দিয়ে। দীপু নিজে যখন ছাত্র ছিল, তখনও সে স্ট্রাইকের সময় এইরকম একটু দূরেই দাঁড়িয়ে থাকতো, বাড়ি চলে যেত না—আবার নেতৃত্ব নেবার জন্য এগিয়েও যেত না। মিছিলেও যোগ দিয়েছে অনেকবার, কিন্তু শ্লোগান দেবার সময় তেমন জোরে চেঁচাতে পারেনি, ওসব তার ধাতে নেই। বেশী লোকজনের সামনে সে একটু লাজুক হয়ে পড়ে, অতগুলো ছেলেমেয়ের সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেবার কথা সে ভাবতেই পারে না। অথচ ঐ তো, লাল-সাদা ডোরা কাটা জামা পরা একটি ছেলে কি তেজী ভাষায় বক্তৃতায় আগুন ছোটাচ্ছে! শ্লোগানের সময় মেয়েদের গলাও বেশ জোরালো এখন।

টুলটুল ছটফট করছে। কলেজের সামনে অত ভিড় ও চেঁচামেচি দেখে সে কিন্তু একটুও ভয় পায়নি বা বিচলিত হয়নি। ঐটুকু বয়েসেই সে জানে, এরকম প্রায়ই হয়ে থাকে, এর মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। সে দীপুর হাত ধরে টানাটানি করে বলতে লাগলো, দীপু মামা, চলো না, দাঁড়ালে কেন!

দীপু বললো, দাঁড়া না, একটু বাদে যাচ্ছি। ঐ দ্যাখ, এবার একটা মেয়ে বক্তৃতা দেবে। মেয়েটা কি ফর্সা দেখেছিস, তোর থেকেও ফর্সা।

—অনেকটা বড় মামীমা'র মতন দেখতে, না?

—যাঃ! বউদির মুখটা মোটেই ওরকম গোল ধরনের নয়!

বছর চারেক কলেজ ছাড়লেও দীপু এখনও ছাত্রদের ধরন-ধারন মোটামুটি জানে। সে জানে, এক্ষুণি এখানে বোমা-টোমা পড়ার সম্ভাবনা নেই, তা হলে অবশ্য টুলটুলকে নিয়ে ঝুঁকি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো না।

শান্তাদের বাড়িতে যাবার খুবই ইচ্ছে, অথচ দীপু ইচ্ছে করেই একটু দেরী করছে। এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে, যেন কোনো তাড়াই নেই।

এরকম প্রায়ই ওর হয়। হয়তো কোনো লোকের সঙ্গে দেখা করার কথা আছে, দরকারটা দীপুর নিজেরই, অথচ সেই লোকের বাড়ির দরজার কাছে গিয়ে মনে হয় আজ উনি বাড়িতে না থাকলেই ভালো হয়, তা হলে আর ভেতরে ঢুকতে হবে না কথা বলতে হবে না। সেই লোকটিই দরজা খুললে দীপু রীতিমতন নিরাশ হয় যদিও সে নিজে থেকেই দেখা করতে এসেছে। অনেক সময় মানুষের মনটা দুভাগে ভাগ হয়ে যায়—দুটি ভাগের ইচ্ছে থাকে ঠিক বিপরীত।

শান্তাদের বাড়িতে এক সময় যখন তখন যেতে পারতো দীপু, কারুকে না ডেকে ওপরে উঠে যেতে পারতো, কিন্তু আজকাল কি রকম যেন অস্বস্তি লাগে। এই অস্বস্তির কোনো কারণ খুঁজে পায় না অবশ্য। দীপু অন্যদের মুখের দিকে তাকিয়ে তাদের মনের কথা অনেক সময় সঠিকভাবে বুঝতে পারে, কিন্তু নিজের মনের হদিস অনেক সময়ই পায় না। সে যে সত্যি কি চায় তা সে নিজেই জানে না।

টুলটুলের হাত ধরে দীপু রাস্তা পার হয়ে এলো। বড় রাস্তা থেকে একটু গলির মধ্যে ঢুকে শান্তাদের বাড়ি। দরজার সামনে দাঁড়ানো মাত্রই তার মনে হলো, শান্তা এখন বাড়িতে নেই। কেন তার এরকম মনে হয় সে জানে না। কিন্তু এই মুহূর্তেই এ কথাটা তার কাছে ধ্রুব সত্য। দরজাটা

পুলকিত জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ
সুষমা ফুটিয়ে তুলবে
লেকমে সাটিন গ্লো
উজ্জ্বল দীপ্তির তরল মেক-আপ। এনে দেবে
চন্দ্রালোকের মধুর আভা
Lakmé
SATIN GLOW
লেকমে সাটিন গ্লো
তরল ফাউণ্ডেশন

[illegible] একটি খোলা, [illegible] ফাঁকা, টিকির [illegible] ওপরে তুলে রাখা হয়েছে, এক ঝাঁক পিঁপড়ে [illegible] নিয়ে যাচ্ছে একটা [illegible]—সাধারণ অতি [illegible] দৃশ্য, কিন্তু এর মধ্যেই দীপু [illegible] পেলো। [illegible] বাড়ি নেই। [illegible] এখান থেকে [illegible] ফিরে যাওয়া যায় [illegible]। [illegible] বিষণ্ণভাবে সে টুলটুলকে বললো, চলো, [illegible] একটা মাসীর বাড়ি। [illegible] খুব ভালো লাগবে, দেখিস!

দোতলায় উঠেই রিনির সঙ্গে দেখা। রিনি শান্তার ছোট বোন, ওদের দেখেই হই চই করে উঠলো! ওমা, দীপুদা! এ কে? আপনার দাদার মেয়ে বুঝি? না, দীপুদা এনেছে!

—দাদার মেয়ে না, আমার দিদির মেয়ে। এর নাম টুলটুল।

—কি মিষ্টি দেখতে, না? তুমি কোন ক্লাসে পড়ো!

—রিনি, তোমার আজ স্কুল নেই?

—না, আজ আমাদের ছুটি। আজ আমাদের স্কুলের ফেট হবে, দুপুরবেলা [illegible]। দীপুদা, আপনাকে কিন্তু আমাদের বিল্ডিং ফাণ্ডের জন্য চাঁদা দিতে হবে। বেশী না, এক টাকা। দেবেন তো?

টুলটুল চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলো, ফেট কি?

রিনি বললো, তোমাদের স্কুলে ফেট হয় না? তুমি কোন্ ইস্কুলে পড়ো?

—ও বাংলা স্কুলে পড়ে, তোমাদের মতন [illegible] নয়। ফেত-টেত জানে না। তুমি [illegible] ওকে!

রিনির বয়েস তের-চোদ্দ, কিন্তু টুল-টুলকে সে এত ছোট মনে করছে যেন, সে ঐ বয়েসে ছিল দু'তিন যুগ আগে। 'মিষ্টি' কথাটা তার মুখে সব সময় লেগে আছে। কেমন, দীপুদা, ওর চুলগুলো কি মিষ্টি! হাতের আঙুলগুলো কিরকম ছোট্ট ছোট্ট, মিষ্টি, না?

ভিতরতলার সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো শান্তার দিদি সুরভি। বিয়ে হবার তিন চার বছরের মধ্যেই চেহারাটা বেশ ভারী হয়ে এসেছে, তাই মুখের ভাব সব সময়ই বেশ তৃপ্ত দেখায়, হাসিটিও বেশ পরিপূর্ণ, যেন পৃথিবী থেকে তার যেটুকু প্রাপ্য ছিল সব পাওয়া হয়ে গেছে। একগাল হেসে বললো, দীপু কেমন আছো। অনেকদিন দেখিনি তোমাকে! এই বুঝি রণেনদার মেয়ে? এর মধ্যে এতবড় হয়ে গেছে!

শান্তার বাবা মারা যাওয়ার পর তার দিদি আর জামাইবাবু যে এ বাড়িতে এসে আছেন, সে কথা দীপু জানে, কিন্তু মনে থাকে না। প্রত্যেকবারই সুরভিদিকে দেখে সে অবাক হয়। দীপু এ বাড়িতে এসেছিল ঠিক একমাস সতেরো দিন আগে, তখনও সুরভিদিকে দেখেছিল।

টুলটুলকে নিয়েই সবাই কথা আরম্ভ করছে, তাই দীপুর অস্বস্তি একটু কম লাগছে। তবু, কৈফিয়ৎ দেবার জন্য বললো, টুলটুলকে নিয়ে ও বাড়িতে গিয়েছিলাম রণেনদার মায়ের সঙ্গে দেখা করাবার জন্য...

সুরভি জিজ্ঞেস করলো, রণেনদা আর চিঠিপত্র কিছু দেয় না?

—না।

—আর দেবেও না! ওর আশা ছেড়ে দাও! আমরাও যা খবর পেয়েছি...

শান্তার মা ইতিমধ্যে এসেছেন, তিনি চোখের ইশারা করে বললেন, সুরভি থাক ওসব কথা—! অর্থাৎ টুলটুলির সামনে তার বাবাকে নিয়ে আলোচনা না করাই ভালো। কিংবা রণেনের প্রসঙ্গ তিনি এখানে তুলতে চান না। রণেনদের সঙ্গে এ বাড়ির খুব একটা ক্ষীণ আত্মীয়তা আছে, এক সময় খুব যাতায়াত ছিল, কয়েক বছর ধরে কিন্তু একটা কারণে আর কোনো সম্পর্ক নেই।

সুরভিদি নেমে এসে টুলটুলকে আদর করে জড়িয়ে ধরে বললেন, আহা, এমন সুন্দর মেয়ে! কি নাম তোমার?

শান্তার মা নিপাট ভালো মানুষ। কারুর প্রতি কখনো রাগ দেখাননি, কোনো মানুষকে অবিশ্বাস করেন না। এই ভালো মানুষীর জন্যই তাঁর মধ্যে একটা অসহায় অসহায় ভাব আছে। বিধবা হবার পর সেটা আরও

বেড়েছে। রাস্তায় কিছু একটা হুড়োহুড়ি বা গোলমাল হলেই তিনি ভয়চকিত গলায় বলে ওঠেন, ওমা, এ কি কাণ্ড শুরু হলো? এখন কি হবে?

শান্তার মা জিজ্ঞেস করলেন, দীপু, তুমি চা খাবে?

—না, থাক, এত বেলায় আর—

—খাও না, এই সময় আমরাও আর একবার চা খাই। সুরভি, গোবিন্দকে বল চায়ের জল চাপাতে। আর এ কি খাবে? তুমি কি খাবে টুলটুল?

দীপু বললো, ওকেও চা খাইয়ে দিন। টুলটুল চা খেতে বেশ ভালোবাসে।

শান্তার মা ধমক দিয়ে বললেন, ধ্যাৎ! এইটুকু মেয়ে চা খাবে কি। তুমি বুঝি ওকে চা খাওয়াতে শিখিয়েছো? ওকে বরং চান করিয়ে দুটি ঝোল-ভাত খাইয়ে দি।

দীপু ব্যস্ত হয়ে বললো, না, না, আমি বেশীক্ষণ থাকবো না। এমনিই একটু এলাম। মেজদি অপেক্ষা করে বসে থাকবে।

—কতক্ষণ আর লাগবে! সুরভি তুই ওকে চান করিয়ে দিতে পারবি না।

—হ্যাঁ। কেন পারবো না। এসো...

দীপু বললো, সত্যি আজ থাক সুরভিদি! তা ছাড়া টুলটুল ও বাড়ি থেকে পায়েস টায়েস খেয়ে এসেছে, ওর খিদে নেই—

টুলটুল সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে বললো, আমার খিদে নেই—

বোঝাই যাচ্ছে, শান্তা নেই বাড়িতে। আজ অন্তত দীপুর ধারণাটা ভুল হতে পারতো না? সে কি সত্যিই মনে মনে চেয়েছিল শান্তা বাড়িতে না থাক। সে যাই হোক, দীপু মুখ ফুটে কিছুতেই শান্তার কথা জিজ্ঞেস করতে পারবে না।

চায়ের কাপ নিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে দীপু আলগাভাবে জিজ্ঞেস করলো, গৌতম কোথায়?

রিনি উত্তর দিল, দাদাতো বর্ধমান গেছে।

—বর্ধমান? কোনো কাজে?

সুরভি ঠোঁট উল্টে বললো, পার্টি। বর্ধমানে ওদের পার্টির প্লেনারি সেসান চলছে, কাগজে পড়োনি?

গৌতম কলেজে এক সঙ্গে পড়তো দীপুর সঙ্গে। এখন সে কম্যুনিসট পার্টির কাজে খুব মেতে উঠেছে। গৌতমের সঙ্গে আজকাল দেখা হয় খুবই কম, তবু যখন দেখা হয়—গৌতমকে দীপুর খুব ভালো লাগে। শান্তার বাবা মারা যাবার পর সেই অফিসে গৌতম একটা চাকরির অফার পেয়েছিল, নেয়নি। প্রায়ই সে কলকাতার বাইরে ঘুরে বেড়ায়—একবার জেল খেটেছেও তিন সপ্তাহের জন্য। গৌতম এমনই বেপরোয়া ধরনের ছেলে যে—তার এইসব কাজের জন্য বাড়ি থেকে আপত্তি করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। বাড়ির ব্যাপার নিয়ে সে মাথাই ঘামায় না। বরং গৌতম যখন বাইরে টাইরে যায়—তখন তার মা-ই তার সুটকেস গুছিয়ে দেন।

সুরভির স্বামীও একটু উদাসীন ধরনের মানুষ। গান বাজনায় দারুণ শখ, গলা তেমন ভালো না যদিও, কিন্তু উৎসাহ অপরিসীম। প্রত্যেকদিন ভোরবেলা উঠে গলা সাধেন, আবার সন্ধেবেলা অফিস থেকে ফিরেই হাত পা ধুয়ে তানপুরা নিয়ে বসে যান। তবলচি আসেন, গানের মাস্টার মশাই আসেন, আরও দু'চারজন গায়ক বন্ধু। উনি ঐ নিয়েই মেতে আছেন, সাংসারিক প্র্যাকটিক্যাল কোনো কাজ হীতেনকে দিয়ে হয় না।

কিন্তু প্রত্যেক সংসারেই অন্তত একজন দায়িত্ববান পুরুষের প্রয়োজন। এ সংসারে সেই দায়িত্ব নিয়েছে রমেন। রমেনের সঙ্গে এ বাড়ির যে কোনো আত্মীয়তার বন্ধন নেই, সে কথা এখন আর কারুর মনেও পড়ে না। এক সময় রমেন এ বাড়িতে এসেছিল শান্তার জামাইবাবুর বন্ধু হিসেবে, শান্তার বাবাও রমেনের বাবাকে চিনতেন—কিন্তু এখন রমেন একেবারে বাড়ির ছেলের মতন। এমন অনেকদিন হয়, রমেন এসে হীতেনের সঙ্গে দেখা করে না, বাড়ির অন্যদের সঙ্গেই তার যা কিছু কথা থাকে। আর রমেনকেও বাড়ির সবারই প্রয়োজন হয়—রমেনদা পারে না এমন কোনো কাজ নেই।

রমেনদার মতন মানুষ সহজেই অন্যদের প্রিয় হয়ে যায়। দীপুরও ভালো লাগে রমেনদাকে। রমেনদা বেশী বকবক করেন না, অন্যের নামে নিন্দে করেন না। মহাকাশ বিজ্ঞান, ক্রিকেট কিংবা সাহিত্য সব কিছু সম্পর্কেই মোটামুটি জ্ঞান আছে। বাড়ির ট্যাক্স নিয়ে গণ্ডগোল হলে করপোরেশনের অ্যাসেসমেন্ট ডিপার্টমেন্টে ঠিক রমেনদার একজন চেনা লোক বেরিয়ে যায়। লাকসেশান সার্টিফিকেট কি করে নিতে হয়, তা রমেনদার নখদর্পণে। ক্রিকেট ম্যাচের টিকিট যোগাড় করতেও রমেনদার কোনো অসুবিধে হয় না। আর সবচেয়ে বড় কথা, এসবের জন্য কোনো বাহাদুরি নেবার চেষ্টা নেই রমেনদার। অসহায় ভালো মানুষ ধরনের শান্তার মায়ের পক্ষে রমেন খুব বড় ভরসা।

বাড়ির অন্যান্য পুরুষেরা তো কেউ কাজের না, দীপু এ পর্যন্ত রমেনদার কোনো খুঁত পায়নি, শুধু সেই একদিন ছাড়া।

দীপু বললো, টুলটুলি, চলো, এবার বাড়ি যাবো—

রিনি বললো, বসুন না! ছোড়দি পোস্ট অফিসে গেছে, এক্ষুণি এসে পড়বে।

ও ব্যাপারে যেন দীপুর কোনো উৎসাহই নেই, সে দেয়ালের ক্যালেণ্ডারের ছবিতে সুদূরে সুদৃশ্য বিদেশ দেখতে লাগলো। পাহাড়ের চূড়ায় কি গাঢ় নীল আকাশ। দীপুর চড়াক করে মনে পড়ে গেল, ঠিক এই রকমই গভীর নীল রং সে দেখেছিল— রেঙ্গোরাড়া বলে একটা জায়গায়, মধ্যরাত্রে। দীপু তখন নদী পার হচ্ছিল। নদীটার নাম নর্মদা না? নাকি গোদাবরী? অমন গভীর নীল রং থাকলে আকাশকে তখন অনেক নিচু মনে হয়। আবার বাইরে কোথাও গেলে হয় না?

—নাঃ উঠি এবার।

—বসুন না বাবা আর একটু! ছোড়দি এক্ষুণি আসবে।

রিনি তাকে লজ্জায় ফেলার চেষ্টা করছে। দীপু উঠে দাঁড়িয়ে বললো, টুলটুলকে নিয়ে এসেছি তো, মেজদি ভাববে। সুরাজদি আপনি একদিন আসুন না আমাদের বাড়িতে? মেজদি একা একা থাকে। রিনি তুমিও এসো।

সুরাজ বললো, তুমি তো আর নিয়ে গেলে না! কেমন আছে অপর্ণা?

—ভালো। কবে যাবেন বলুন!

সিঁড়িতে খুব দ্রুত পায়ের শব্দ করে রমেন উঠে এলো ওপরে। বললো, অফিসের একটা কাজে ব্যারাকপুর যাচ্ছি, ফেরার সময় আপনাদের নামিয়ে দেবো রিনির স্কুলে' তৈরি হয়ে থাকবেন, আড়াইটের মধ্যে—

দীপুকে দেখে রমেন উৎফুল্ল ভাবে বললো, এই যে দীপুবাবু অনেকদিন পাত্তা নেই! কি খবর?

দীপু লাজুক ভাবে বললো, এই—

—চলো, তুমিও যাবে নাকি ওদের সঙ্গে?

—কোথায়?

—রিনিদের স্কুলে কি একটা মেলা হচ্ছে আজ। ওদের নিজেদের তৈরি করা জিনিস-পত্র কিনতে হবে দারুণ দামে! চলো না, বেশ ভালোই লাগে বাচ্চা বাচ্চা মেয়েদের দোকান-দারি—

—না, আপনারা যান।

—চলোই না। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে এখানে চলে এসো। শান্তাও যাবে।

দীপু তীক্ষ্ণ চোখে রমেনদার দিকে তাকালো। রমেনদার এই ব্যাপারটা সে ঠিক বুঝতে পারে না। বিশেষ করে শান্তার নাম করে তাকে লোভ দেখাবার মানে কি? রমেনদা নিজেই তো শান্তার জন্য...অথচ দীপুকেও ...দীপু রমেনের অন্তঃস্তল পর্যন্ত দেখার চেষ্টা করলো, পারলো না, এখানে সে ব্যর্থ।

দীপু দৃঢ় ভাবে বললো, না. আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব হবে না। চলো টুলটুলি!

রমেন বললো, এক গেলাস জল খাওয়াও তো রিনি! শান্তা কোথায়? শান্তাকে দেখছি না!

রমেনদা কি অনায়াসে শান্তার কথা জিজ্ঞেস করতে পারেন। কিন্তু দীপু পারে না। রমেনদার মতন অনেক কিছুই পারে না সে।

টুলটুল বসেই আছে. উঠতে চায় না, মুখখানা তার কাঁদো কাঁদো। দীপু অবাক হয়ে বললো, ওঠ, যাবি না? টুলটুল মুখখানা আরও করুণ করে বললো, দীপু মামা, শোনো—

—কি?

—শোনো না।

সবাই অবাক হয়ে চেয়ে আছে, দীপু টুলটুলির মুখের কাছে নিচু হয়ে এলো। কানে কানে ফিসফিস করে কি যেন বললো টুলটুল। দীপু রীতিমতন রেগে উঠলো। রমেনদা এসে গেছে, এখন আর এখানে থাকতে তার একটুও ইচ্ছে করছে না, অথচ কি ঝঞ্ঝাট! রীতিমতন ঝাঁঝালো ভাবে বললো, এই জন্যই তোকে নিয়ে বেরুতে চাই না! অতখানি পায়েস খেতে গেলি কেন?

—সুরাজদি ওকে একটু বাথরুমে নিয়ে যাবেন? ওর বুঝি ইয়ে পেয়ে গেছে, মানে বড় বাথরুম।

—ওমা, সেই জন্য বকছো ওকে? ওরকম তো সবারই এক এক সময় হয়! ওলো বাচ্চা! এসো টুলটুল, চলে এসো—

রিনির তখন কি হাসি! হেসে গড়িয়ে পড়তে পড়তে বললো, দীপুদা, কি হতো? যদি আপনি আগেই ওকে নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন? যদি রাস্তায়.....

রমেন, শান্তার মা সবাই হাসতে লাগলেন। শান্তার মা হাসতে হাসতেই বললেন, তুই থাম রিনি, তুই আর বলিস না! গত বছর সারকাস দেখতে গিয়ে তুই কি করেছিলি?

রমেন বললো, এই তো শান্তা এসে গেছে! শান্তা, তুমি কোথায় গিয়েছিলে?

—পোস্ট অফিসে।

—দীপু, তুমি তো চলে যাচ্ছিলে! ভাগ্যিস টুলটুলের ওরকম হয়েছিল, তাই শান্তার সঙ্গে তোমার দেখা হলো! শান্তা, দীপুকে বলো না, দুপুরে আমাদের সঙ্গে রিনির স্কুলে যেতে!

রমেনদার এই ধরনের কথায় দীপু ক্রমশ

আড়ষ্ট হয়ে পড়ছিল। অন্য কেউ কিছু মনে করছে না অবশ্য। কিন্তু—

শান্তা এক গোছা খাম—পোস্টকার্ড-ইনল্যান্ড রাখলো। টেবিলের ওপর। রোদ্দুরে হেঁটে এসেছে, মুখখানা তার লালচে, আঁচল দিয়ে ঘাম মুছলো। শান্তার ব্যবহারে কোনো আড়ষ্টতা নেই। রমেনের দিকে সে ভ্রূক্ষেপও করলো না, দীপুর দিকে তাকিয়ে বললো, দীপুদা, কখন এসেছেন?

—এই খানিকক্ষণ আগে।

—এক্ষুণি চলে যাবেন?

—হ্যাঁ।

—চলুন, আমি আপনার সঙ্গে যাই। আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।

এসব ব্যাপারে শান্তার মা কোনো কথা বলেন না। ছেলেমেয়েদের কোনো রকম শাসন করা তার ধাতেই নেই। শান্তা বাড়ি ফিরেই আবার বেরুতে চাইছে যখন, তখন সে বেরুবেই, এ যেন জানা কথা। এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই। দীপু বুঝতে পারলো, রমেনদাকে শোনাবার জন্যই শান্তা এ কথা বলছে। এ বাড়িতে একমাত্র শান্তাই গ্রাহ্য করে না রমেনদাকে। রমেনদাও কিন্তু শান্তার ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামালেন না। রিনির সঙ্গে হেসে হেসে গল্প করতে লাগলেন।

সরভি টুলটুলকে নিয়ে ফিরে আসার পর শান্তা বললো, দিদি, বাথরুমে আমার একটা শাড়ি ভেজানো আছে। তুমি যদি আগে চান করতে যাও, তাহলে শাড়িটা একটু কেচে দিও। আমি একটু ঘুরে আসছি।

—এখন আবার কোথায় যাবি?

—দীপুদাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসবো। চলুন, দীপুদা—

শান্তার কোনো দ্বিধা নেই, কিন্তু দীপুরে একটু একটু লজ্জা করছে। যথাসম্ভব সপ্রতিভ হওয়ার চেষ্টা করে দীপু একে একে সবাইকে বললো, চলি তা হলে—।

শান্তার মা বললেন, টুলটুলকে আবার নিয়ে এসো একদিন। আমাদের এখানে সারাদিন থাকবে। ভারী ভালো মেয়ে! রমেনদা বললেন, দীপু, আবার কবে আসছো? অনেকদিন তোমার সঙ্গে ক্যারাম খেলা হয়নি।

ঠিক এই সময় দীপু লক্ষ করলো, রমেনদা সুরভিদির সঙ্গে কথা বলেন না। আগে বলতেন, কিন্তু এখন কোনো কারণে দুজনে কথা বলা এড়িয়ে যাচ্ছেন। এতক্ষণের মধ্যে দুজনের কথা বলার কোনো প্রসঙ্গ আসেনি, এখন এইটুকু সময়ের জন্য কথা না বলা এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়, তবু বোঝা যায়। দীপু এ সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত।

বাইরে বেরিয়ে শান্তা দীপুর সঙ্গে আর কথা বলেই না। টুলটুলের সঙ্গে অনবরত গল্প করে যাচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে এসে পৌঁছুলো শ্যামবাজারের মোড়ে, রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে, তবুও রাস্তায় ভিড় কম নয় অবশ্য।

দীপু বললো, শান্তা, তুমি আর বাড়ি ফিরে কি করবে আমাদের সঙ্গে চলো না!

—কোথায়?

—যে-কোনো জায়গায়!

রাস্তার লোকদের অগ্রাহ্য করে শান্তা ঝরঝর করে হাসলো! বললো, জানো টুলটুল তোমার মামার সঙ্গে যখনই দেখা হয়, বলে, চলো, আমার সঙ্গে। যদি জিজ্ঞেস করি কোথায়, অমনি বলবেন, যে-কোনো জায়গায়! কেন, একটা জায়গা ঠিক করে বলতে পারেন না?

—যে-কোনো একটা জায়গায় গেলেই তো হলো? যাওয়াটাই তো আসল কথা!

—ইস্, আমার এখন খিদে পেয়েছে! টুলটুল, তোমার খিদে পায়নি?

—না।

—চলো, আমরা বাইরে কোথাও খেয়ে নিই! তারপর ট্রেনে চেপে ডায়মন্ডহারবার কিংবা ক্যানিং ঘুরে আসি।

—আর টুলটুল?

—টুলটুলও আমাদের সঙ্গে যাবে।

—আর বাড়িতে?

—মেজদি না হয় টুলটুলের জন্য একটু ভাববে। ভাবুক না। সন্ধ্যের মধ্যেই তো ফিরে আসবো। কি টুলটুলি, থাকতে পারবি না?

শান্তা বললো, থাক্, তোমার মেজদি'র এমনিতেই অনেক ভাবনা আছে, আর নতুন করে ভাবাতে হবে না! আপনি হঠাৎ সকালবেলা আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন কেন?

দীপু সে-রকম ছেলেই নয় যে বলবে, তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছিল। এসব কথা ওর মুখেই আসে না। আলগা ভাবে বললো, এমনিই, ওপাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, ইচ্ছে হলো, একটু কফি খেয়ে যাই। তোমার মা খুব ভালো কফি বানান—

—খেয়েছেন?

—হ্যাঁ।

—মিথ্যে কথা। আজ সকালবেলাই আমাদের বাড়িতে কফি ফুরিয়ে গেছে।

—কফি না হয়, চা খেয়েছি। তাতে কি হয়েছে? তুমি ওরকম করছো কেন?

—আপনি আমাদের বাড়িতে আর আসবেন না।

—কেন?

—আমি বলছি আসবেন না!

—কেন, কি হয়েছে কি?

—আমাদের বাড়িতে রমেনদা সব সময় আসেন—রমেনদার সঙ্গে আপনার দেখা হয়—আমি তা চাই না। রমেনদার পাশাপাশি আপনাকে দেখলেই আমার মাথায় রক্ত চড়ে যায়। আমি সহ্য করতে পারি না। রমেনদা আপনাকে কি রকম অপছন্দ করে আপনি বুঝতে পারেন না?

—কই? রমেনদা তো আমার সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করেন!

—আপনি কিছু বোঝেন না। আপনি রমেনদার সঙ্গে খবর্দার আর কখনো কথা বলবেন না বলে দিচ্ছি।

—কেন, রমেনদা আবার কি করেছে?

—কিছু করেনি।

—তা হলে?

—এবার থেকে আমিই আপনার সঙ্গে দেখা করবো। [ক্রমশ]

নিখিল ভারত হস্তশিল্প সংস্থার (All India Handicrafts Board) কলিকাতাস্থ ডিজাইন কেন্দ্র অ্যাকাডেমি ভবনে এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। দেশের বিভিন্ন স্থানের অবলুপ্তপ্রায় কুটীরশিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে হস্তশিল্প সংস্থা আঞ্চলিক ভিত্তিতে দিল্লী, কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই শহরে ডিজাইন কেন্দ্র স্থাপন করেন। দেশের একদা-প্রচলিত বিভিন্ন শিল্প যাতে সমসাময়িক যুগের চাহিদামত প্রসারলাভ করতে পারে, সেজন্য প্রত্যেক ডিজাইন কেন্দ্র স্থানীয় গ্রামীণ শিল্পীদের উৎসাহ ও সাহায্যদান করে থাকেন ও সেই সঙ্গে কেন্দ্রের অভিজ্ঞ শিল্পিগণ গ্রামের শিল্পীদের যুগোপযোগী নানা ডিজাইন তৈরি করার জন্য শিক্ষা ও নির্দেশ দেন। ফলে, বিশেষ করে গত কয়েক বছর যাবৎ ভারতের নানা লুপ্তপ্রায় বিভিন্ন শিল্প আজ পুনঃ প্রসারলাভ করেছে ও সেই সঙ্গে যুগের চাহিদামত নতুন নতুন ডিজাইন বা প্যাটার্নের জন্য কিছু জনপ্রিয়তাও লাভ করেছে।

কলকাতা ডিজাইন কেন্দ্র অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে বাংলা দেশ, উড়িষ্যা ও আসামের নিজস্ব শিল্পের নানা নিদর্শন দেখা যায়। গত কয়েক বছর যাবৎ যে যে শিল্প ডিজাইন কেন্দ্রের নির্দেশ ও সাহায্যে পুনর্জীবন লাভ করেছে বা যুগের চাহিদা অনুযায়ী নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে, তাদের প্রায় ৫,০০০ নিদর্শন প্রদর্শনীতে দেখা যায়। এদের মধ্যে পাড়ের, আঁচলের ও জমির নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী নানা রেশমের শাড়ী, স্কার্ফ, স্টোল, ব্লাউসের কাপড়, নিত্য ব্যবহার্য পাটের কার্পেট, নতুন গ্রাম (বর্ধমান জেলা)র শিল্পীদের কাঠে খোদাই করা শ্রীদুর্গা, রাবণের মূর্তি, পেঁচা, বাংলা দেশ ও উড়িষ্যার শোলার কাজ, উড়িষ্যার সুন্দর সুন্দর নানা কাঠের পুতুল, ইলামবাজার (বীরভূম জেলা)র নানা উল্লেখযোগ্য গালার কাজ, সামুদ্রিক ঝিনুকের (Sea Shell) চামচ, কানের দুল ও নেকলেস, তিব্বতীয় উদ্বাস্তুদের হাতে বোনা কার্পেট, টেবল ম্যাট ও ঢোকরার নানা দেবদেবীর মূর্তি বিশেষভাবে চোখে পড়ে। যাঁরা যত্ন ও আগ্রহ সহকারে প্রদর্শনীটি দেখেছেন, তাঁরা একই স্থানে বাংলা দেশ, উড়িষ্যা ও আসামের কয়েকটি নিত্য ব্যবহার্য বস্তু দেখে থাকবেন। বিশেষ করে তাজমহলের ভিতরের দেওয়ালের সূক্ষ্ম কারুকার্য অবলম্বনে রচিত একটি রেশমের শাড়ীর আঁচলের পরিকল্পনা দেখে অনেকেই মুগ্ধ হন। পাটের কার্পেটের নানা রঙ ও প্যাটার্নের মধ্য দিয়ে আধুনিক রুচিই প্রতিফলিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে সামুদ্রিক ঝিনুকের চামচ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাস্তবিকই এটি এত সুন্দর ও স্বচ্ছ যে, খাবার টেবিলে বা চায়ের সঙ্গে এই চামচ দেখে প্রত্যেকেই গৃহস্বামীনীর রুচির প্রশংসা করবেন। বিভিন্ন নিদর্শন দেখে বোঝা যায় যে, কলকাতা ডিজাইন কেন্দ্রের অধিকর্তা প্রভাস সেন ও তাঁর সহকর্মীরা নানা শিল্পের পুনরুজ্জীবন ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী।

জগন্নাথ (ঢোকরা কাজের নিদর্শন)—বর্ধমান জেলার দরিয়াপুর গ্রামের ঢোকরা শিল্পীদের তৈরী

দুঃখের বিষয়, প্রদর্শনীভুক্ত অধিকাংশ বস্তুই ঠিক সহজলভ্য নয়—তার কারণ ডিজাইন কেন্দ্রের বিক্রী করার কোনও সুবিধা বা অধিকার নেই। চাহিদামত তাঁরা সরকার বা বিভিন্ন সংস্থাকে এ জাতীয় জিনিস সরবরাহ করে থাকেন— ফলে, ছোটখাট দু' একটি জিনিস কেনার ইচ্ছা থাকলেও অনেকে কিনতে পারেন না। যেমন, ঝিনুকের কাজ—এটি অন্য কোথাও আমার চোখে পড়েনি। বিক্রয় প্রণালীটি সহজতর করলে জিনিসগুলির চাহিদা যে শত গুণে বেড়ে যাবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। নিখিল ভারত হস্তশিল্প সংস্থা বিক্রয়ের সহজতর পন্থা অবলম্বন করলে গ্রামীণ শিল্পীদের হাতে তৈরি এ জাতীয় নানা জিনিসই অবিলম্বে আরও জনপ্রিয়তা লাভ করবে। আশা করি, কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে সচেতন হবেন।

*

শিল্পী অশোক সেন ও তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী মল্লিকা সেন অ্যাকাডেমি গ্যালারিতে

সিটি অ্যান্ড সোল-২ —অশোক সেন

তাঁদের এক যৌথ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। অশোক সেন আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও স্কুল বা কলেজে অঙ্কন বিদ্যা শেখেননি—তবে কাজ দেখে মনে হয়, আঁকার

রাজা-বদল

॥ ১ ॥

১৩৭৬ সালের শারদীয়া 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীবিমল মিত্রের "রাজাবদল" উপন্যাসটির জন্যে কাকে যে অভিনন্দিত করব ভেবে পাচ্ছি না। কারণ এমন একটি লেখা উপস্থাপন করাও কম কৃতিত্বের কথা নয়। আচ্ছা, আপনারা দুজনেই আমার আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

এই প্রসঙ্গে পশ্চিম বাংলার উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির প্রতিটি শিক্ষক মহাশয়কে ও পরিচালকবৃন্দকে অনুরোধ করব তাঁরা যেন এটি পড়ে দেখেন, উপন্যাসটি আয়নার কাজ করবে, তাঁরা নিজেদের পরিবেশ সম্পর্কে চিন্তার খোরাক পাবেন।

আর একটি কথা, যাঁরা 'দেশ' পত্রিকাকে অশ্লীলতার ধ্বজাধারী বলে মনে করেন তাঁরা দয়া করে লক্ষ্য করবেন এ উপন্যাসে তথাকথিত অশ্লীলতা দূরের কথা প্রেমের চিত্রও নেই। প্রেম কাহিনী ছাড়াই যে ভালো উপন্যাস হয় সমরেশ বসু ও বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা দুটি তার সাক্ষ্য দেবে।

নির্মলেন্দু মান্না
সেক্রেটারী, গড়বালিয়া আর. সি.
মান্না 'ইনস্টিটিউশন', হাওড়া

॥ ২ ॥

এবারের শারদীয়া দেশ (১৩৭৬) পড়েছি। এই পত্রিকার প্রতি আমার বহুকালের শ্রদ্ধা-সম্পর্ক জড়িত। কিন্তু এবারের পত্রিকায় শ্রীবিমল মিত্র-মহাশয়ের সম্পূর্ণ উপন্যাস 'রাজা বদল'-এর কয়েকটি উক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করিতে বাধ্য হইলাম।

প্রথমে দেশ (শারদীয়া) ১১০ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় কলমে ২৮ পংক্তির পর আছে—গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে যুধিষ্ঠির বলছেন, —নাহং কর্মফলান্বেষী......ইত্যাদি।

আবার ১৭২ পৃষ্ঠায় তৃতীয় কলমে ১১ পংক্তি থেকে আবার আছে শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের কথাটা মনে পড়ল—নাহং কর্ম......ইত্যাদি।

প্রশ্ন—শ্রীমদ্ভাগবত গীতায় কোনো অধ্যায়েই এরূপ উক্তি নেই। এবং যুধিষ্ঠির কোথায় একথা বলেছেন?—শ্রীমদ্ভাগবত গীতায় শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের উক্তি ও প্রত্যুক্তি রয়েছে। মিত্র মহাশয় কোন্ গীতার কথা বলেছেন?

দ্বিতীয়—১৩২ পৃষ্ঠায় গৌর পণ্ডিতের উক্তি—ক্লাসে ছেলেরা "কাত্রা" শব্দের ধাতুরূপ লিখতে পারেনা। ইত্যাদি—আমার প্রশ্ন লেখক মহাশয় কি ক্তান্তশব্দের ধাতুরূপ হতে পারে না, একথা জানেন না?

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে একজন জনপ্রিয় এবং দেশের সম্মানসূচক রবীন্দ্র পুরস্কার-প্রাপ্ত লেখক সম্পর্কে এই প্রশ্ন করিতে হইল।

আশা করি, সাধারণের জ্ঞাতার্থে আপনাদের দেশ কাগজে এর যথাযথ উত্তর কিংবা ভুল সংশোধন করিলে সাধারণ পাঠকেরা উপকৃত হইবেন।

শ্রীদ্বারেশচন্দ্র শর্মাচার্য, এম এ
কলিকাতা-৩

॥ ৩ ॥

লেখকের বক্তব্য

পুজোর সময় মাসখানেক কলকাতার বাইরে ছিলাম। এসে আপনার পাঠানো এক গাদা চিঠি পেলাম। গান্ধী-জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর জীবনী অবলম্বনে একটা প্রতীকী উপন্যাস লিখেছিলাম। নাম দিয়েছিলাম—'রাজা বদল'। ইস্কুলটা হলো ভারতবর্ষ, আর গৌর পণ্ডিত হলেন গান্ধীজী। কিন্তু তা নিয়ে এত যে বাদানুবাদ হবে তা ভাবিনি।

চিঠিগুলো পড়তে পড়তে আমার একটা পুরোন স্মৃতি-কথা মনে পড়লো। বহু বছর আগে তখন সবে লেখার চর্চা শুরু করেছি, একজন বিখ্যাত কবি-সাহিত্যিকের সঙ্গে রাস্তায় দেখা। তিনি জিজ্ঞেস করলেন—তুমি তো লিখছো বিমল, কিন্তু পাঠকরা কী বলছে?

বললাম—পাঠকদের কথা আমি কী করে জানবো?

কবি বললেন—দেখ আমাদের দেশে সাহিত্যিকরা সবই পড়ে, কিন্তু লুকিয়ে লুকিয়ে। কেউ প্রকাশ্যে বলবে না যে তারা পড়েছে। এ জানবার একটা উপায় আছে—

বললাম—কী উপায়?

তিনি বললেন—তোমার লেখার একটা জায়গায় ইচ্ছে করে একটু খুঁত রেখে দেবে। তাহলে দেখবে সবাই ভালো দিকটার কথা কিছু বলবেনা, শুধু ওই খুঁতটার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে। তাতেই তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হবে।

শরৎচন্দ্র এই কায়দাটা জানতেন কিনা জানি না। কিন্তু একবার তিনি এটা প্রয়োগ করেছিলেন। শোনা যায় তাঁর কোন্ একটা গল্পে তিনি নাকি বোম্বাই মেল ট্রেনকে চন্দননগর স্টেশনে থামিয়ে

দিয়েছিলেন। হইহই কাণ্ড ঘটলো সঙ্গে সঙ্গে। যাঁরা তাঁর গল্প কখনও পড়েছেন বলে স্বীকার করেন নি, তাঁরা পর্যন্ত ধাওয়া করলেন। বললেন—এ আপনি কী করলেন শরৎবাবু, বোম্বাই মেল কখনও চন্দননগর স্টেশনে থামে?

তাঁরা টাইম-টেবল খুলে তাঁদের কথার সত্যতা প্রমাণ করলেন।

শরৎচন্দ্র সব শুনে গম্ভীর ভাবে বললেন —দেখুন, টাইম-টেবলে যা-ই লেখা থাক, আমি বোম্বাই মেলকে চন্দননগরে থামিয়ে দিলুম, এবার থেকে ও-ট্রেন ওখানে থামবে—

মাইকেল মধুসূদনের কথাই ধরা যাক। ভদ্রলোক "মেঘনাদ-বধ" কাব্য লিখে ভেবেছিলেন কিছু স্থায়ী কাজ করা হলো। কিন্তু বাদ সাধলেন বিদ্যাসাগর মশাই। বললেন—ব্যাকরণে ভুল আছে। ওগুলো সংশোধন করতে হবে। মাইকেল বড় মর্মাহত হলেন। এত পরিশ্রম করে লিখে শেষকালে কিনা ব্যাকরণ অশুদ্ধ হয়ে গেল!

তারপর একদিন রাস্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে চলেছেন। হঠাৎ ঝম্-ঝম্ করে বৃষ্টি এল। তিনি একটা মুদিখানার ঝাঁপের তলায় আশ্রয় নিলেন। খানিকক্ষণ দাঁড়াবার পর হঠাৎ কানে এল পেছনে কে একজন সুর করে 'মেঘনাদ বধ কাব্য' পড়ছে। পেছন ফিরে দেখলেন—পাঠক একজন আর শ্রোতা প্রায় জনা চারেক। মাইকেল আর থাকতে পারলেন না, জিজ্ঞেস করলেন—বইটা কেমন লাগছে পড়তে মশাইদের?

মশাইরা বললেন—আজ্ঞে খুব ভালো। কোনও ব্যাকরণ ভুল-টুল পাচ্ছেন?

—আজ্ঞে ওসব নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না, ও-সব বুঝিও না।

মাইকেল মহা উল্লসিত। আনন্দের আতিশয্যে সেই বৃষ্টির মধ্যেই রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন। হোক ব্যাকরণ ভুল, সাধারণ মানুষ 'মেঘনাদ বধ' গ্রহণ করেছে, এইটেই যথেষ্ট। বিদ্যাসাগর তাঁর ব্যাকরণ নিয়ে থাকুন আমি যেমন লিখেছি তেমনিই থাকবে, একবর্ণও ওর বদলাবো না—

ডিকেন্স, ওয়াল্টার স্কট্ প্রভৃতির কথা থাক, সেক্সপীয়রের কথায় আসি। তাঁর ইচ্ছাকৃত ভুলের তালিকা অনন্ত। রাজা জন্-এর আমলে তিনি কামান দাগার কথা লিখেছেন। আসলে সে-আমলের দেড়শো বছর পরে কামান প্রথম আবিষ্কৃত হয়। এমনি ভাবে দ্বিতীয় হেনরির আমলে ছাপাখানার উল্লেখ, জুলিয়াস সিজারের আমলে ঘড়ির উল্লেখ। ক্লিওপেট্রার প্রাসাদে বিলিয়ার্ড-টেবলের উল্লেখ খুঁত-সন্ধানী চোখে মারাত্মক ভুল হলেও রসিকের চোখে তা নয়। হেক্টরের মুখে অ্যারিস্টটলের কোটেশন, ক্যারিওলেনাসের মুখে আলেক-জাণ্ডারের উল্লেখ শুধু ভুলই নয়, অমার্জনীয় অপরাধের উদাহরণ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। ঘটনাক্রমে বাঙলা দেশে জন্মে যদি তিনি এই সব ভুল করতেন তো পণ্ডিতরা তাঁকে জাতিচ্যুত করবার ব্যবস্থা করতেন নিশ্চয়ই, এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর মহা সৌভাগ্য তিনি এমন এক দেশে জন্মেছিলেন যেখানে রসিক লোকের সংখ্যা বাঙলা দেশের চেয়ে বেশি।

'মাল্‌জ-বদল' উপন্যাসে এই ধরনের এক কাণ্ড ঘটেছে। সৌভাগ্যক্রমে আমি পণ্ডিত নই, তবে রসিক বটে। পাণ্ডিত্য আমার দুচোখের বিষ। কিন্তু উপন্যাসের প্রধান পাত্র দুর্ভাগ্যক্রমে এক পণ্ডিত মশাই। তিনি যে সত্যিই পণ্ডিত তার উদাহরণ হিসেবে তাঁর মুখ দিয়ে মাঝে মাঝে আমাকে কিছু সংস্কৃত শ্লোক বলাবার প্রয়োজন হয়েছিল। আমার হাতের কাছে ছিল গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষের শ্রীমদ্ভাগবতগীতা, (৯ম সংস্করণ) বইটি। তারই ১১১ পৃষ্ঠায় তৃতীয় অধ্যায়ে ১৪ থেকে ১৬ নম্বর শ্লোকের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মহাভারতের বনপর্ব থেকে গ্রন্থকার উক্ত শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন। আমি তাড়াতাড়িতে মহাভারতের বনপর্ব কথাটা উল্লেখ করিনি। তার জায়গায় গীতা লিখেছি। কিন্তু আমি বলি মহাভারত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবতগীতা কি আলাদা জিনিস? গীতা কি মহাভারতের অংশ নয়?

ভাগ্যিস ভুলটি করেছিলাম তাই তো জানতে পারলাম তাবড়-তাবড় পণ্ডিতও আমার মত সামান্য লেখকের উপন্যাস

রুশ লেখক দণ্ডিত

আপনাদের ঘড়িগুলোর ওপর থেকে ধুলো মুছে ফেলুন! ওগুলো কয়েক শতাব্দী পেছিয়ে আছে। আপনাদের এত প্রিয় ঐ ভারী ভারী পর্দাগুলো সরিয়ে ফেলুন। আপনারা ঘুণাক্ষরে সন্দেহও পর্যন্ত করতে পারছেন না যে বাইরে ভোর হয়ে গেছে...ধুলো, এমন কি নর্দমার নির্জীব আবহাওয়ায় আপনারা এখন রয়েছেন। এর ফলে মনুষ্য সমাজের যে একত্ব বোধ তা লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে এবং তার ফলে শুধু মনুষ্যত্বের মৃত্যুই ত্বরান্বিত হবে। একথা এখন বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে, আমরা প্রথমত, সমগ্র মানব সমাজেরই অংশ। পশু জগৎ থেকে মানুষ তার চিন্তা ও মুখের ভাষার জন্যই আলাদা এবং চিন্তা ও মুখের ভাষা স্বভাবগতভাবেই স্বাধীন। এগুলো দমন করলে আমরা আবার পশুতে পরিণত হবো। প্রত্যেক সমাজের, আমাদেরও, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বাক স্বাধীনতার প্রয়োজন। আমরা যারা নিজের দেশের জন্য বাক স্বাধীনতা চাই না, তারা তাহলে আমাদের দেশের অসুখগুলোই সারাতে চাই না।"

রুশ লেখক সংঘের কাছে আলেকজান্ডার সোলঝেনিৎসিন যে চিঠি দিয়েছেন, তারই অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা হলো। সোলঝেনিৎসিনকে লেখক সংঘ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। [illegible] একটা আভাস পাওয়া যাচ্ছিল, কিন্তু সেই পশ্চিমী প্রেসের [illegible] হতে পারে এরকম [illegible] ছিল, কিন্তু সত্যিই তা ঘটলো।

সোলঝেনিৎসিন সম্পর্কে [illegible]

মস্কো থেকে ১১৫ মাইল দূরে রিয়াজান শহরে লেখক ইউনিয়নের স্থানীয় শাখা সোলঝেনিৎসিনের নামে অভিযোগ আনেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ঃ

— কমিটির মতে সোভিয়েট সমাজের কদর্য চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন।

— বিদেশে তাঁর উপন্যাস 'ক্যানসার ওয়ার্ড' এবং "দি ফার্স্ট সার্কল" প্রকাশের ব্যাপারে তিনি প্রতিবাদ জানাননি।

— তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের মতে তিনি সমাজবিরোধী ক্রিয়াকলাপ চালাচ্ছেন।

— তরুণ লেখকদের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দেননি।

— লেখক ইউনিয়নের সিদ্ধান্তের বিরোধী ভূমিকা নিয়েছেন।

সোলঝেনিৎসিন দেশ বিদেশে সুখ্যাত লেখক, কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়নে তাঁর দুর্ভোগ দেখা দিয়েছে গোড়া থেকেই। তাঁর প্রথম উপন্যাসটি বহুদিন অপ্রকাশিত হয়ে পড়েছিল, শেষ পর্যন্ত স্বয়ং ক্রুশ্চেভের হস্তক্ষেপের ফলে সেটি মুদ্রিত হয়—এবং অসাধারণ জনপ্রিয়তা পায়। স্টালিনের আমলে একটি কনসেনট্রেশান ক্যাম্পের অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা এই উপন্যাস—বাংলায় অনুবাদ করেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

ক্রুশ্চেভ আমলের পর স্টালিন-চেতনার পুনরুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে সোলঝেনিৎসিনের অবস্থা আবার শোচনীয় হয়ে পড়ে। এই তো মুশকিল, একটা দেশের রাজনৈতিক হাওয়া বদলের সঙ্গে সঙ্গে লেখককেও বদলাতে হবে নাকি? এটা কোন্ ধরনের সাহিত্য বিচার! এই দশকের গোড়া থেকে সোলঝেনিৎসিনের আর প্রায় কোনো লেখাই রাশিয়ায় ছাপা হয়নি, কিন্তু দুটি উপন্যাস [illegible] বাইরে বেরিয়ে এসে ইংরাজি [illegible] ছাপা হয়। রুশ লেখকদের [illegible] প্রকাশিত হওয়া [illegible] সোলঝেনিৎসিন ইতিপূর্বেই [illegible]। পরে অবশ্য তিনি বলেছিলেন, রুশ লেখক হওয়া মানেই সমগ্র মানব সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া নয়!

লেখক ইউনিয়নের সোলঝেনিৎসিনকে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য মাত্র দশ মিনিট সময় দেওয়া হয়েছিল। সেখানে তিনি দৃপ্ত ভাষায় সেন্সর প্রথার অবসানের জন্য এবং সাহিত্যের ওপর রাজনীতির হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে বলেন। একজন অভিযোগকারী তাঁকে প্রশ্ন করেন, পশ্চিমের দেশগুলি আপনার বই এত আগ্রহ করে ছাপাতে চায়—এর আপনি কি ব্যাখ্যা দেবেন? সোলঝেনিৎসিন পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন, আপনিই বা কি করে ব্যাখ্যা করবেন, আমার নিজের দেশে আমার বই ছাপাতে দেওয়া হয় না?

কমিটির সকলেই ভোট তাঁর বিপক্ষে যায়। সোলঝেনিৎসিন বলে ওঠেন, ভোট। [illegible]ন আপনারা ভোট! আপনারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু একথা মনে রাখবেন, আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে আজকের এই সভা সম্পর্কে নিশ্চয়ই কিছু বক্তব্য থাকবে।

সোলঝেনিৎসিনের বয়স এখন ৫১. লেখক সমাজ থেকে বিতাড়িত হওয়ার মানে হলো, রুশ দেশে বুদ্ধিজীবী হিসেবে বেঁচে থাকা তাঁর পক্ষে এখন অসম্ভব। লেখা বন্ধ, বাঁচার জন্য তাঁকে অন্য কোনো কাজ করতে হবে। কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বেশী কিছু বলাবলি করলে হয়তো তাঁকে ডানিয়েল ও সিনিয়াভস্কির মতন জেলে পুরে দেওয়া হতে পারে।

সোলঝেনিৎসিন কোনো মতলববাজ চতুর লেখক নন, তাঁর লেখা পড়লেই তা বোঝা যায়। সূক্ষ্ম, সংবেদনশীল মানুষ—রুশ দেশের অপবাদ ছড়াবার চেষ্টা তাঁর কোনো গ্রন্থে নেই, যে মানুষ নিজের দেশকে ভালোবাসে, সেই নিজের দেশের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে উল্লেখ করতেও দ্বিধা করে না। 'ক্যানসার ওয়ার্ড' বইখানি পড়ে রুশ দেশের কোনো ভয়াবহ চিত্র আমার কাছে তো অন্তত উদ্ভাসিত হয়নি। গল্পের অন্তর্নিহিত দ্বিতীয় অর্থটি ধরলে, রুশ জনমানসে একটা চাপা অস্বস্তির কথা বোঝা যায়—কিন্তু তার আবেদন নিতান্তই সাহিত্যিক—সেই প্রসঙ্গ তুলে কেই বা রুশ দেশের সমালোচনা করতে যাবে, করলেই বা অতবড় দেশের কি ক্ষতি হবে? সোভিয়েত ইউনিয়ন যে নানাদিকে বিরাট উন্নতি করেছে অন্ধ ছাড়া সে কথা কেউ অস্বীকার করবে না—কিন্তু সে দেশের মানুষের বাক-স্বাধীনতা চেপে রাখার এই অদ্ভুত প্রচেষ্টা চলছে কেন, কে জানে? কোনো লোকই তার নিজের দেশের ছোটখাট ভুল ত্রুটির সমালোচনা করতে পারবে না? ত্রুটিহীন, নিখুঁত আদর্শ সমাজ আবার হয় নাকি।

একটি খবর

'টাইম' ম্যাগাজিনে এই খবরটি বেরিয়েছে। সানফ্রান্সিসকো শহরে 'ডক অব দি বে' নামে একটি গোপন পত্রিকার জন্য টাকা তোলার প্রচেষ্টা হিসেবে কুৎসিত যৌন উত্তেজনামূলক ছবি ও লেখা দিয়ে একটা নাইট 'এ কুইক পর্নো' নামে বের করার চেষ্টা হয়। সেটা বেরুবার ঠিক আগেই উদ্যোক্তা মশাইকে একদল রাগী মেয়ে জোর করে গাড়িতে তুলে লোপাট করে নিয়ে যায়। সেখানে ১২ ঘন্টা ধরে জ্ঞান দেবার ফলে লোকটি তার পরিকল্পনা বাতিল করতে রাজী হয়। মেয়েদের সামনেই লোকটি সমস্ত অশ্লীল ছবি ও পাণ্ডুলিপি আগুনে পুড়িয়ে দেয়।

সনাতন পাঠক

খেটে খেটে সারা!
সংসারের যাবতীয় কাজে গৃহিণীর শরীরের
গ্লুকোজ প্রতিমুহূর্তে ক্ষয় হচ্ছে
ক্লান্তির মানে হ'ল, শরীরে
গ্লুকোজের প্রয়োজন। আর
গ্ল্যাক্সোজ-ডি হল এমন বিশুদ্ধ
গ্লুকোজ পাউডার, যা খেলে
দেহের শক্তি ফিরে আসে।
আপনার শরীরের গ্লুকোজ অনবরত ক্ষয় হ'য়ে যাচ্ছে। আর সেই গ্লুকোজ
যখন একেবারে কমে যায় তখন আপনার ক্লান্তি আসে। সেই সময়ে আপনার
একটু গ্লুকোজ খাওয়া বিশেষ দরকার। মনে রাখবেন যাঁরা গ্লুকোজ ব্যবহার
করেন তাঁদের প্রায় সবারই পছন্দ মিষ্টি স্বাদের গ্ল্যাক্সোজ-ডি। এতে মুহূর্তে
আপনার শরীরে শক্তি ফিরে আসে। আপনি একে জলে, দুধে, ফলের
রসে কিম্বা সোজাসুজি প্যাকেট থেকে খেতে পারেন।
নিমেষে শক্তি অথচ কত কম দাম।
গ্ল্যাক্সোজ-ডি
গ্ল্যাক্সোর তৈরী গ্লুকোজ পাউডার
GLAXOSE-D
GCA-GL 48 ৮৪৪

সমাজতত্ত্ব

ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয়। ননীমাধব চৌধুরী। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, কলকাতা-৬। পাঁচ টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানিতে মূলতঃ ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের জাতিগত পরিচয় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এবং এই আলোচনা শুধুমাত্র ভারতীয়দের মধ্যে প্রাপ্তিসূত্র অনুসন্ধানে সীমাবদ্ধ না রেখে আলোচনাকে পূর্ণাঙ্গ করে তুলবার জন্য সমগ্র মানবসমাজের নরগোষ্ঠীর ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে [illegible] করেছেন। মোট ছয়টি অধ্যায়ে গ্রন্থের বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে মানব সমাজের ঐতিহাসিক পরিচয় [illegible] করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের [illegible] বিষয় ভারতবর্ষের অধিবাসীদের [illegible]। তৃতীয় অধ্যায়ে ভারতবর্ষের অধিবাসীদের সঙ্গে প্রতিবেশী [illegible] সংস্কৃতিগত এবং জাতিগত মিল সম্পর্কে লেখক আলোকপাত করেছেন। চতুর্থ অধ্যায়ের বিষয়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে পারস্পরিক [illegible] সম্পর্ক অনুসন্ধান। পঞ্চম অধ্যায়ে, [illegible] বহির্ভারতে ভারতীয় [illegible] সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে [illegible] এবং [illegible] এদেশে আগত বিদেশীদের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় অধিবাসী-পরিচয়ের [illegible] ছয়-অধ্যায়ে বিন্যস্ত গ্রন্থের [illegible] আলোচনা লেখকের পরিকল্পনার [illegible] পরিচায়ক। প্রত্যেকটি আলোচনাই [illegible] এবং যুক্তিবাহিত। উপরন্তু, লেখকের পাণ্ডিত্য ও নিষ্ঠার ফল। জাতিতত্ত্বের আলোচনায় তিনি এমন কিছু তথ্যের [illegible] করেছেন যা জিজ্ঞাসু [illegible] কৌতূহল বৃদ্ধি করবে। বিভিন্ন [illegible] সম্পর্কে তিনি নৃতত্ত্ব বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদের মতামত পাশাপাশি উল্লেখ করেছেন। এবং তুলনামূলক আলোচনা করে একটা সিদ্ধান্তে আসতে চেয়েছেন। বিচারের ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্তগুলোই লেখকের মৌলিক চিন্তা এবং মনীষার পরিচয় বহন করে। জাতিতত্ত্ব এবং প্রাগৈতিহাসিক নির্ণয় বিষয়ে গ্রন্থকর্তা রিজলে, রমাপ্রসাদ চন্দ, [illegible], [illegible] প্রমুখ নৃতাত্ত্বিকের মতামত প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করেছেন, কিন্তু নির্বিচারে সমর্থন করেন নি। নিজ বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে তার তুলনামূলক আলোচনা ও মূল্যায়ন করেছেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের জাতি-পরিচয়ে লেখক ইতিহাসকে [illegible] ধারাবাহিক সূত্র হিসেবে আলোচনাকে সমাধান করেছেন, তা তাঁর সুগভীর ইতিহাস-জ্ঞানের সাক্ষ্য দেয়। লেখকের রচনারীতি ঈষৎ জটিল, প্রসঙ্গ এবং ব্যাখ্যা কোন কোন ক্ষেত্রে নাতিবিস্তৃত হওয়ায় রচনা সর্বত্র আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে নি। এই জটিলতা এবং নীরসতা সম্ভবত বিষয়ের জটিলতা হেতু দেখা দিয়েছে। এতদ্ সত্ত্বেও, স্বদেশ এবং স্বজাতি পরিচয়ে আলোচ্য গ্রন্থখানি সাম্প্রতিককালের বাংলার জ্ঞান ভাণ্ডারে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন সন্দেহ নেই।

৩৪৫।৬৯

জীবনী

মহাজীবন (দ্বিতীয় খণ্ড)। শ্রীপরেশচন্দ্র ভোরা। প্রকাশক : শ্রীপরেশচন্দ্র ভোরা, সৎসঙ্গ, দেওঘর, এস-পি। মূল্য ছয় টাকা।

"আর্যদের যে কী জিনিস ছিল তা কল্পনাতেই আনা যায় না। ক্যাবিনেট হত বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যদের প্রধানদের নিয়ে। প্রধানদের প্রধান, তাদের প্রধান এইরকম ভাবে একটা সুন্দর গ্রেডেশন ছিল। যারা যত বেশী কে পূরণ করত তারা তত বড়

গত ২৬ ও ২৭ নভেম্বর কলকাতার সাউথ ক্লাবের হারডকোরটে ভারত ও স্পেনের বেসরকারী টেনিস টেস্ট উপলক্ষে মনোরম আসর বসেছিল। তিন বছর আগে ভারত ও ব্রাজিলের ডেভিস কাপের আন্তঃআঞ্চলিক ফাইনালের পর কলকাতার টেনিস রস পিপাসুরা বিশ্ব টেনিসের সেরা খেলোয়াড়দের কলা-কৌশল দেখা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। দু'দিনব্যাপী আসরের প্রধান আকর্ষণ ছিলেন ম্যানুয়েল সান্তানা। সাউথ ক্লাবের সাজানো টেনিস আসরটি কানায় কানায় পূর্ণ ছিল। ১৯৬৬ সালের উইম্বলডন বিজয়ী এবং বর্তমান আমেচার টেনিসের অন্যতম পুরোধা ম্যানুয়েল সান্তানা দর্শকদের প্রত্যাশিত আশা পরিতৃপ্ত করে গিয়েছেন। টেনিসের সব রকমের মার এবং সূক্ষ্ম কলাকৌশল যে সান্তানার অধিগত তার স্বাক্ষর মিলেছে তাঁর সাবলীল ও অনবদ্য খেলায়।

ভারতের পরাজয়

স্পেন বেসরকারী টেনিস টেস্টে ৫টি খেলায় ৩-২ খেলায় ভারতকে পরাজিত করেছে। প্রথম দিনের দুটি সিঙ্গলসের মধ্যে সান্তানা ১০-৮ ও ৬-২ গেমে জয়দীপ মুখার্জিকে পরাজিত করেন। দ্বিতীয় সিঙ্গলসে প্রেমজিতলাল ৬-৩ ও ৬-২ গেমে লুই আরিলার বিরুদ্ধে বিজয়ী হন।

সান্তানা ও জয়দীপের খেলাটি ছিল প্রথম দিনের বড় আকর্ষণ। জয়দীপ প্রথম সেটে সান্তানার সঙ্গে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালিয়ে দ্বিতীয় সেটে ক্লান্ত হয়ে সহজেই পরাজয় স্বীকার করেন। প্রেমজিত ও আরিলার খেলাটিতে প্রেমজিতের আধিপত্য শুরু থেকে শেষ অবধি বজায় ছিল।

দ্বিতীয় দিনের দুটি সিঙ্গলসের মধ্যে প্রথমটিতে জয়দীপ মুখার্জি ৬-২ ও ৭-৫ গেমে লুই আরিলার বিরুদ্ধে বিজয়ী হলেও সান্তানা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে প্রেমজিতকে সহজেই ৬-২ ও ৬-২ গেমে হার স্বীকার করতে বাধ্য করেন।

জয়দীপ ও আরিলার খেলায় জয়দীপ প্রথম সেটটি বিশেষ দাপটের সঙ্গে খেলার পর দ্বিতীয় খেলাটিতে কিছুটা হাল্কাভাবে নেওয়ায় আরিলার পক্ষে অনেকটা এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। ৫-২ গেমে আরিলা অগ্রগামী হবার পর জয়দীপ পুনরায় নিজের উন্নত ক্রীড়ায় পরপর ৫টি গেম দখল করে ৭-৫ গেমে জয়-পরাজয়ের মীমাংসা করে নেন।

সাউথ ক্লাবে ম্যানুয়েল সান্তানা ও জয়দীপ মুখার্জীর খেলার দৃশ্য

সান্তানা ও প্রেমজিতের খেলাটি একচেটিয়া সান্তানার আধিপত্যের মধ্যেই যবনিকা পড়ে। তাঁর সার্ভিস, দর্শনীয় প্লেসিং, ফোরহ্যাণ্ডের শানিত অস্ত্র নিক্ষেপ করে প্রাণোচ্ছল সান্তানা প্রেমজিতকে নিষ্প্রভ করে রাখেন। কঠিন বলকে সহজ এবং সাবলীলভাবে গ্রহণ করে সেই বল থেকে কিভাবে আবার দুর্বার আক্রমণ রচনা করা যায় তার অপূর্ব নিদর্শন দেন স্পেনের এই কুশলী টেনিস শিল্পী।

লুই আরিলা সান্তানা থেকে অনেক ম্লান হলেও ডাবলসের খেলায় সান্তানার যোগ্য সহচর হিসাবে প্রমাণ রাখেন। ফলে সান্তানা-আরিলার সুন্দর বোঝাপড়ার মিলিত শক্তির কাছে প্রেমজিত-জয়দীপ জুটি সহজেই ৬-২ ও ৬-৩ গেমে পরাজিত হন ডাবলসের খেলায়।

স্পেনের টেনিস খেলোয়াড়দের এই সফরটি বেসরকারী হলেও এটা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে, আন্তর্জাতিক টেনিস মান থেকে ভারত অনেক পিছিয়ে পড়েছে। রামনাথন কৃষ্ণানের প্রতিভাদীপ্ত খেলার পর আজ ভারতে এমন কোন খেলোয়াড় নেই যিনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোন প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড়ের সঙ্গে সমান তালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালাতে পারেন।

মনোরম আসর প্রতিকূল পরিবেশ

সাউথ ক্লাবের টেনিস কোরটটি মনোরম পরিবেশে অবস্থিত। ছায়াঘেরা পরিচ্ছন্ন সবুজের মধ্যে মাঠে ঢুকলেই কেমন যেন একটা টেনিসের শিহরণ জাগে।

ভূমিকালিপিতে আছেন অনেক চেনা মুখ। অনিল চ্যাটার্জী, কাবেরী বসু, রাধামোহন ভট্টাচার্য, ছায়া দেবী, দিলীপ রায়, মৃণাল মুখার্জি, অরুণ মুখার্জি ও জহর ব্যানার্জি। সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন শৈলেন রায়। ছবির কয়েকটি গান ইতিমধ্যেই রেকর্ড করা হয়ে গিয়েছে। গেয়েছেন মান্না দে, শ্যামল মিত্র, আরতি মুখার্জি ও মৃণাল মুখার্জি। ডিসেম্বরের ষোল তারিখ থেকে শুটিং শুরু হওয়ার কথা, জানালেন প্রযোজক। শ্রী দত্তর ইচ্ছে, ছবির "টাইটেল কার্ডে" ছেলের নামটা তিনি প্রযোজক হিসাবে ব্যবহার করেন। কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি একটু মুশকিলে পড়েছেন। ছেলের নাম অসীম দত্ত। এবং এই নামে বাংলা ফিল্মে আরেকজন

প্রযোজনা করতে চান যা দর্শককে, তাঁদের মতে, আসল রাজনীতিক ও সামাজিক লক্ষ্যের সন্ধান দেবে। লিটল থিয়েটার গ্রুপের এই দৃষ্টিভঙ্গির পূর্ণ পরিচয় "লেনিনের ডাক" নাটকে, এখন মিনার্ভায় মঞ্চস্থ।

নাটকের নাম "লেনিনের ডাক" কেন হল তারও বোধ হয় একটা কারণ আছে। লেনিনের ডাকে রাশিয়ার জাগরণ দেখানো নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই, সেই সঙ্গে এই ডাকে এ-দেশের লোকও যাতে সাড়া দেয় সেদিকেও নাট্যকারের নজর ছিল মনে হয়। অন্তত কিছু বক্তব্য ও শ্লোগান যেন নাট্যকারের দেশবাসীর উদ্দেশেই।

নাটকের ঘটনা ও বিস্তার দুই ভাগে বিভক্ত। নাটকের দুই পটভূমি—এক—মস্কোয় লেনিনের দপ্তর; দুই—চিরস্কায়া গ্রাম। লেনিনের দপ্তরে নাটকটি বেশী ভাল লেগেছে। একটি কারণ, লেনিনের ভূমিকায় সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের অতি চমৎকার অভিনয়। লেনিনের কর্মময় জীবনের রূপ শিল্পী খুবই বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন। তাঁকে মানিয়েছেও বেশ। কাহিনীকাল সীমিত—১৯১৮ সনের জুন মাস থেকে সেপ্টেম্বর। তখনও রাশিয়ায় 'প্রতিবিপ্লবীদের ষড়যন্ত্র চলছে, বিপ্লবীদের—লালফৌজের—প্রতিরোধের পালা তখনও শেষ হয়নি; লেনিনের পাশে দেখানো হয়েছে জোসেফ স্তালিন, নিকোলাই বুখারিন, লিদিয়া আলেকজান্দ্রোভনা ফাতিয়েভা এবং ফেলিকস জেরজিনস্কিকে। চিরস্কায়া গ্রামের পটভূমিতে গ্রামবাসীদের অন্ধ কুসংস্কার, ধর্মযাজকের ভণ্ডামি, কর্নেল বুলবার অত্যাচার, তরুণী মারিয়ার প্রেম ও প্রেমিকের মৃত্যুতে শোক, জনজাগরণের জন্য আকুলিনার উদ্যম ইত্যাদি ঘটনা মেলোড্রামার শর্তে অধিক নিয়ন্ত্রিত। যদিও এই সব ঘটনা বক্তব্য উপস্থাপনের জন্যই সাজানো। এবং যেহেতু বলবার বিষয়ের উপর গুরুত্ব বেশি, তাই নাটক জমেনি। নাট্যগুণের দিক থেকে উৎপল দত্তের অন্যান্য নাটকের তুলনায় "লেনিনের ডাক" নীরস।

গ্রামের পরিবেশ চমৎকার ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এই অবাক করার মত পরিবেশীয় গুণের জন্য সুরেশ দত্ত ভূয়সী প্রশংসা পাবেন। মঞ্চসজ্জার কৃতিত্ব তাঁরই। পরিচালকের বাহাদুরি, রুশ বিপ্লবের গান ও লোকসংগীত ব্যবহার করে তিনি রাশিয়ার পরিবেশ রচনায় অদ্ভুতভাবে সাহায্য করেছেন। ধ্বনি ও মঞ্চরূপের মধ্যে এবং গ্রামবাসীদের বেশভূষায় রাশিয়ার ব্যাকড্রপ সহজগ্রাহ্য হয়ে উঠেছে। এই পরিবেশে—হয়ত বা পুরো নাটকেই বেমানান মারিয়া (অপর্ণা সেন)। মারিয়ার কথা বলার ধরন ও উচ্চারণ আধুনিকা। [illegible] চিরস্কায়ার মেয়ে তাকে মনে হয় না। পরে তার হাতে রাইফেল তুলে দিয়ে পরিচালক সুবুদ্ধির পরিচয় দেননি। মারিয়ার মুখে, অর্থাৎ শিল্পীর অভিনয়ে সেই তেজস্বিতা কোথায়? জনতার আদালতে (আবার বলি, দৃশ্যসজ্জা অদ্ভুত) রায় ও দণ্ডদানের দায়িত্ব, অন্তত ওই মুহূর্তের দণ্ড উচ্চারণ অন্যের কণ্ঠে থাকলে ভাল হত। সুন্দর হত যদি এই দায়িত্ব আকুলিনাকে দেওয়া হত। এই চরিত্রে খুবই উচ্চাঙ্গের অভিনয় শোভা সেনের, বৃদ্ধার চরিত্রটি যেন প্রতি মুহূর্তে ক্রোধে ও তেজে জ্বলছে। উৎপল দত্তের (ধর্মযাজক আফানাসি) অভিনয়েরও অকুণ্ঠ প্রশংসা করতে হয়।

এল-টি-জি'র টিম-ওয়ার্ক বরাবরই দর্শকদের প্রশংসা পেয়েছে। প্রায় সব শিল্পীর অভিনয়ই বিশেষ উল্লেখের যোগ্য। রুমা গুহ (ফাতিয়েভা), অসিত বসু (ফেলিকস), মাধব দাঁ (ইগর), [illegible] (বুখারিন), শঙ্কর ভট্টাচার্য (বুলবা) প্রভৃতি শিল্পীরা জানেন, মঞ্চ-অভিনয় কাকে বলে।

লিটল থিয়েটার গ্রুপের নাটকের 'প্রোডাকশান ভ্যালু' বা আঙ্গিকগত মূল্য এই নাটকেও যথেষ্ট। প্রত্যেকটি দৃশ্য, বিশেষ করে বেশী চরিত্রের দৃশ্যে, পরিচালকের পরিকল্পনা দেখবার মত। কখন কে বা কারা কোথায় দাঁড়াবেন তাও সুপরিকল্পিত এবং তাতে নাটকীয় ও পরিবেশগত ডাইমেনশন-এর সৃষ্টি। মঞ্চের [illegible] কতখানি তা যেমন দেখিয়েছেন তাপস সেন তাঁর আলোকসম্পাতের ভিতর দিয়ে [illegible] দৃশ্যে ট্রেন চলার দৃশ্যটি স্মরণীয়। [illegible] পরিচালক দেখিয়েছেন শুধু ধ্বনির মাধ্যমে—যথা লেনিনের বক্তৃতা দেওয়ার দৃশ্যে জনতার করতালি ও আওয়াজে একটি সমগ্র অস্তিত্ব মুহূর্তে দর্শকের কাছে বাস্তব হয়ে ওঠে। এক কথায়, "লেনিনের ডাক" লিটল থিয়েটার গ্রুপের আর একটি বিশিষ্ট উল্লেখযোগ্য নাট্যপ্রযোজনা।

"অপরিচিত" এ-সপ্তাহে

আর ডি প্রোডাকসন্সের "অপরিচিত" এ সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে। ছবিটি প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য চিহ্নিত। সমরেশ বসুর কাহিনী। পরিচালনা করেছেন সলিল দত্ত। প্রধান চরিত্রগুলিতে অভিনয় করেছেন উত্তমকুমার, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায় ও অপর্ণা সেন। সংগীত পরিচালনা করেছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়।

আবিরে রাঙানো

অমল দত্ত পরিচালিত "আবিরে রাঙানো" ছবির প্রথম পর্যায়ের গান রেকর্ডিং হয়েছে সম্প্রতি। এ ছবির সংগীত পরিচালক সত্যদেব চাটার্জি। [illegible] চরিত্রে [illegible] রূপ দিচ্ছেন তাঁদের অধিকাংশই নতুন।

অরণ্যদেব

লী ফক

'ক্যাপটেন কিট তাঁর ছেলের কাছে নতুন পৃথিবীর গল্প বলতেন।'
সেখানকার মানুষ-দের কেমন দেখতে, বাবা?
ক্যারিবেদের মতন!

আচ্ছা, সেই জঙ্গলের গল্পটা আর একবার বলো না, বাবা!

'কিটের ছেলে বড় হয়ে উঠছে'
মস্ত বড় একটা নদী, তার কাছে মস্ত সেই টিপি।
বড় হয়ে আমি সেখানে যাব, বাবা!

'ক্যাপটেন কিটের ছেলে এখন যুবাপুরুষ।'
এই আমার শেষ সমুদ্রযাত্রা। এর পর তুই ক্যাপটেন হবি।

ক্যাপটেন কিটের সেই শেষ সমুদ্রযাত্রায় আফ্রিকার উপকূলে তাঁর জাহাজে হঠাৎ একদিন জলদস্যুদের দল আক্রমণ করল—

'জাহাজ থেকে সমুদ্রে পড়ে যেতে-যেতে ছেলে দেখলেন, জলদস্যুরা তাঁর বাবার বুকে ছুরি বসিয়ে দিচ্ছে...'

'সমুদ্রের তরঙ্গে ভাসতে ভাসতে ছেলে এসে আফরিকার তটভূমিতে পৌঁছলেন। তাঁর তখন জীবন্মৃত অবস্থা।'

'বামন-উপজাতির লোকেরা তাঁকে দেখতে পেয়ে শুশ্রূষা করে বাঁচিয়ে তুলল।'
4/13

'তারপর একদিন সমুদ্রতীরে ঘুরতে-ঘুরতে ছেলে দেখলেন, একজন মৃত জলদস্যু বালুর উপরে পড়ে আছে। পরনে তার ক্যাপটেন কিটের লাল পোশাক।'
এই লোকটাই আমার বাবাকে হত্যা করেছিল।

পশ্চিমবঙ্গ এবং মহীশূরে অ্যাড-হক কংগ্রেস কমিটি নিয়োগ বর্তমান সপ্তাহের বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ২৫ নবেম্বর ক্ষমতাসীন কংগ্রেস সভাপতি শ্রী সি সুব্রহ্মণ্যম পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতিকে সাসপেনড করে একটি অ্যাড-হক কমিটি গঠন করেছেন। এই কমিটির আহ্বায়ক শ্রীকৃষ্ণকুমার শুক্ল। "অবিলম্বে কংগ্রেসের সমস্ত সম্পত্তি, দফতরসমূহ, ব্যাংক অ্যাকাউনট, বই ও দলিলপত্র—সব কিছু অ্যাড-হক কমিটিকে সমর্পণ করার জন্য" শ্রীসুব্রহ্মণ্যম পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ও কার্যনির্বাহক সমিতিকে নির্দেশ দিয়েছেন। এ আই সি সি-র জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীসাদিক আলী পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের সভাপতি ডঃ চন্দ্রকে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীসুব্রহ্মণ্যমের আদেশ গ্রাহ্য না করার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। শ্রীকামরাজ যখন কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন তখন শ্রীমতী গান্ধী পশ্চিমবঙ্গে অ্যাড-হক কংগ্রেস গঠনের চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সফল হন নি। ২৭ নবেম্বর কংগ্রেস সভাপতি শ্রীসুব্রহ্মণ্যম বর্তমান মহীশূর প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কর্মকর্তাদের সাসপেনড করে সে জায়গায় ১১ জন সদস্যের একটি অ্যাড-হক কমিটি নিয়োগ করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গ, মহীশূর, গুজরাট ও তামিলনাড়ু নিজলিঙ্গাপ্পার নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের শক্ত ঘাটি। বর্তমানে দুটি কংগ্রেস রয়েছে। এই দুই কংগ্রেসের দুই প্রকাশ্য অধিবেশনে (বোমবাই ও আমেদাবাদ) শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত রূপ স্থির হয়ে যাবে বলে আশা করা যায়।

দেশী সংবাদ

২৪ **নবেম্বর**—খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম জড়িত এমন কতকগুলি প্রতিষ্ঠানের তিন বছরের আয় ও আয়কর সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ না করায় আজ লোকসভায় অ-কমিউনিসট বিরোধী সদস্যগণ সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেন। পি টি আই-র সংবাদে প্রকাশ, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কোম্পানী প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সহকর্মীদের টাকা-পয়সা দিয়েছেন বলে রাজ্যসভায় অভিযোগ উঠলে প্রতিদ্বন্দ্বী দুই কংগ্রেস দলের মধ্যে সংঘাত বাধে।

২৫ **নবেম্বর**—ক্ষমতাসীন কংগ্রেসের সভাপতি শ্রী সি সুব্রহ্মণ্যম আজ পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতিকে সাসপেনড করে একটি অ্যাড-হক কমিটি গঠন করেছেন। অ্যাড-হক কমিটির আহ্বায়ক শ্রীকৃষ্ণকুমার শুক্ল। "অবিলম্বে সমস্ত সম্পত্তি, দফতরসমূহ, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, বই ও দলিলপত্র—বস্তুত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সব কিছু অ্যাড-হক কমিটিকে সমর্পণ করার জন্য" শ্রীসুব্রহ্মণ্যম পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ও কার্যনির্বাহক সমিতিকে নির্দেশ দিয়েছেন।

২৬ **নবেম্বর**—মূল্যায়ন কমিটি টালার বিপর্যয় সম্পর্কে তদন্ত শেষে যে চূড়ান্ত রিপোর্ট দেন তাতে যে-সব কেলেঙ্কারী বিপর্যয়কে ঘনিয়ে তোলে সেগুলি একে একে উল্লেখ করে মন্তব্য করেন:—সামান্য কারিগরি জ্ঞান থাকলেও টালার বিপর্যয় এড়ানো যেতো; কিন্তু সেখানে যাদের পরে দায়িত্ব ন্যস্ত তাঁদের কোন বিশেষ অবস্থার মোকাবিলা করা তো দূরের কথা, সাধারণ কাজ চালানোর যোগ্যতাও নেই। রিপোরটে টালার যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণের চরম অবহেলার কথাও বলা হয়েছে।

আজ পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে শ্রীকৃষ্ণকুমার শুক্লকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র নির্দেশ দিয়েছেন এবং অ্যাড-হক কমিটি নিয়োগ করে সুব্রহ্মণ্যম যে চিঠি দিয়েছেন তাও ওয়েস্ট-পেপার বাসকেটে ফেলে দেবার নির্দেশ দিয়েছেন।

২৭ **নবেম্বর**—ভারতের কেন্দ্রীয় খাদ্য মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী এ পি সিনধে আজ লোকসভায় একটি প্রশ্নের উত্তরে জানান যে, ১৯৭০-৭১ সালের পর পি এল ৪৮০-র চুক্তি অনুসারে

আমেরিকা থেকে খাদ্য আমদানী করতে হবে না।

শাসক কংগ্রেস দলের অস্থায়ী সভাপতি শ্রী সি সুব্রহ্মণ্যম মহীশূর প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কার্যনির্বাহক কমিটি ও কর্মকর্তাদের আজ সাসপেনড করেছেন এবং তার জায়গায় ১১ জন সদস্যের একটি অ্যাড-হক কমিটি নিয়োগ করেছেন। গুজরাট ও তামিলনাড়ু সম্পর্কে শীঘ্রই এই ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে প্রকাশ।

২৮ **নবেম্বর**—সুব্রহ্মণ্যমের ওয়ার্কিং কমিটি গঠন নিয়ে তরুণ কংগ্রেসের মধ্যে এক সংঘাতের সৃষ্টি হয়েছে। শ্রীমতী নন্দিনী সৎপথী, শ্রীচন্দ্রজিৎ যাদব ও কে আর গণেশ ওয়ার্কিং কমিটি থেকে পদত্যাগ করায় এক নাটকীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে।

পশ্চিম বাংলা, কেরল, মাদরাজ ও রাজস্থান এই চারটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও প্রতিনিধিরা আজ বলেন ভূমি সংস্কার ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি রূপায়িত করতে হলে কেন্দ্রীয় সরকারকে সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী ও কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম ভূমিসংস্কার ব্যবস্থা দ্রুত রূপায়ণের উপর জোর দেন।

২৯ **নবেম্বর**—আজ নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির অফিসে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পার দলের সমর্থক কর্মচারীদের সঙ্গে কংগ্রেসের অন্যতম সভাপতি শ্রীসুব্রহ্মণ্যমের দলের সমর্থক কর্মচারীদের ধস্তাধস্তির ফলে প্রবল উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কর্তৃপক্ষ পুলিশ ডাকেন। সাতজন গ্রেফতার হন। আটজনকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়। কড়া পুলিশ পাহারায় ওই ভবনেই আজ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসে।

ভূমি সংস্কার সম্পর্কে দুদিনব্যাপী মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে যে সব উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তার একটি হলো: ১৯৭০ সালের মধ্যেই জমিতে মধ্যস্বত্ব ব্যবস্থার বিলোপসাধন করা হবে এবং বর্তমান আইনের সমস্ত দুর্বলতা দূর করে প্রকৃত কৃষক ও ভাগচাষীদের পূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে।

৩০ **নবেম্বর**—কংগ্রেসের অন্তর্বর্তীকালীন সভাপতি শ্রীসুব্রহ্মণ্যম আজ বলেন, তাঁর নেতৃত্বে গঠিত কংগ্রেসকে বেশীরভাগ কংগ্রেসী সমর্থন করলেও কোন্ কংগ্রেস আসল তা পরিষ্কার হয়ে যাবে আমেদাবাদ ও বোমবাইয়ের প্রকাশ্য অধিবেশনের পরই।

বিদেশী সংবাদ

২৪ **নবেম্বর**—গত রাত্রিতে এক অদ্ভুত সাংবাদিক বৈঠক হয়ে গেল। এর একদিকে বসেছেন 'অ্যাপোলো অভিযান' কেন্দ্র করে হিউসটনে সমবেত সাংবাদিক দল, অন্যদিকে বসেছেন লক্ষাধিক মাইল দূরে মহাকাশে তিন অ্যাপোলো-অভিযাত্রী। মহাকাশ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে টেলিভিশনে উভয়ের মধ্যে বার্তালাপ চলে।

২৫ **নবেম্বর**—আমেরিকান সেনারা মাই লাই হ্যামলেটের কাছে একের পর এক ভিয়েতকং (দক্ষিণ ভিয়েতনাম) গ্রামে আগুন লাগিয়ে জঘন্য ধ্বংসলীলায় মাতে। একজন স্টেটন নেতা বলেন, অকটোবরের শেষে এক সপ্তাহের মধ্যে আমরা তেরটি গ্রাম ধ্বংস করি।

২৬ **নবেম্বর**—জাপানের প্রধানমন্ত্রী শ্রীঅইসাকু সাতো এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে জানান যে, ১৯৭২ সালে ওকিনাওয়া জাপানকে ফেরত দেওয়া হবে। প্রেসিডেনট নিকসন এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ওকিনাওয়া জাপানকে হস্তান্তরের আগে ওই দ্বীপ থেকে সব পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র সরিয়ে নেওয়া হবে।

২৭ **নবেম্বর**—আজ পাকিস্তান বেতারে বলা হয়েছে যে, প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া খান আগামী বছর বসন্তকালে সোভিয়েট ইউনিয়ন সফরে যাবেন। সফরের তারিখ পরে স্থির করা হবে বলে বেতারে ঘোষণা করা হয়েছে।

২৮ **নবেম্বর**—পাকিস্তানের প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া খাঁ আজ ঘোষণা করেন, আগামী বছর ৭ অকটোবর তারিখে একজনের এক ভোট, এই ভিত্তিতে পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এটি হবে পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন। জেনারেল খান বলেন, নির্বাচনের ফলে যে জাতীয় পরিষদ গঠিত হবে, পাকিস্তানের নতুন সংবিধান রচনার জন্য তার সদস্যদের চার মাস সময় দেওয়া হবে।

২৯ **নবেম্বর**—সম্প্রতি জনৈক পাকিস্তানী নাগরিক শ্রীসুশীলকুমার বোস ওরফে শ্রীসুশীলকুমার বোসকে ঢাকার বিশেষ সামরিক আদালতে ১৯৪৭ সালের বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে ২ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০ লক্ষ টাকা জরিমানা করেছেন। অভিযোগে প্রকাশ ১৯৬৩ সালের ১৯শে জুলাই ও ২রা সেপটেম্বর ঢাকার হাটখোলা রোডের আসামী উপরোক্ত বোস স্টেট ব্যাঙ্ক অব পাকিস্তানের অনুমতি ছাড়া কলকাতার কোন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে প্রায় তিন লক্ষ টাকা ঋণ দিয়েছিলেন।

৩০ **নবেম্বর**—জনৈক সামরিক মুখপাত্র আজ বলেন, মিশরী সৈন্যরা গত রাতে সুয়েজ পেরিয়ে এসে পূর্ব তীরের একটি ইজরায়েলী ঘাটি আক্রমণের চেষ্টা করে। ঘাটিটি তৌফিক বন্দরের দু' মাইল উত্তরে। ইজরায়েলী সেনা সে আক্রমণ প্রতিহত করে।

মহাত্মা গান্ধীর

শতবার্ষিকী শ্রদ্ধাঞ্জলি

গান্ধী পরিক্রমা

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্
রাজাগোপালাচারী
কাকা কালেলকর
কৃপালনী
প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ
জয়প্রকাশ নারায়ণ
অন্নদাশঙ্কর রায়
অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়
নারায়ণ দেশাই
বিজয়কুমার ভট্টাচার্য
দিবাকর
নির্মলকুমার বসু
হরিদাস মিত্র
নলিনীকিশোর গুহ
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়
অরুণচন্দ্র গুহ
ডাঃ জাকির হোসেন
বিনোবা ভাবে
শঙ্কররাও দেও
দাদা ধর্মাধিকারী
ইউ এন ঢেবর
হুমায়ুন কবির
সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত
প্রমথনাথ বিশী
রতনমণি চট্টোপাধ্যায়
সুবোধ ঘোষ
রেজাউল করীম
গজেন্দ্রকুমার মিত্র
ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত
মন্মথ দত্ত
ক্ষিতীশ রায়
দক্ষিণারঞ্জন বসু
সাধনা ঘোষ
শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রমুখ ৫০ জন শ্রেষ্ঠ লেখকের রচনা-সমৃদ্ধ

॥ পনেরো টাকা ॥

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের মুক্তাক্ষর বিরল

গান্ধী জীবনী ১॥

মহাত্মা গান্ধীর

সত্যাগ্রহ ৭॥

আমার ধ্যানের ভারত ৪॥

ছাত্রদের প্রতি ৫॥

আমার ধর্ম ৫,

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের

গান্ধীজীর গঠন কর্ম ৪॥

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

দৃষ্টি প্রদীপ

নূতন মুদ্রণ — সাত টাকা

যতীন্দ্রমোহন বাগচীর
শ্রেষ্ঠ কবিতা সংকলন

কাব্য-মালঞ্চ ৬,

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

যাত্রাগানে রামায়ণ ৯৲

নীরদচন্দ্র চৌধুরীর

বাঙালী জীবনে রমণী ১০৲

নলিনীকান্ত সরকারের

দাদাঠাকুর ৫॥

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

গৌরাঙ্গ পরিজন

১০·০০

॥ নূতন বই ॥
সন্তোষকুমার ঘোষের উপন্যাস

ত্রিনয়ন ৪৲

বমল করের উপন্যাস

সঙ্গিনী ৪৲

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস

মুক্তাসম্ভবা ৫৲

নীহাররঞ্জন গুপ্তের উপন্যাস

কন্যাকুমারী ৬৲

লীলা মজুমদারের

সুকুমার রায় ৪॥

আর কোনখানে ৫৲

নির্মলকুমারী মহলানবিশের
॥ রবীন্দ্র জীবনের এক নূতন অধ্যায় ॥

কবির সঙ্গে য়ুরোপে ১০৲

বাসুদেব বসুর ভ্রমণোপন্যাস

নেফা, সুন্দরী নেফা ৪॥

॥ ছোটদের নূতন বই ॥
লীলা মজুমদারের
একশো মজার বই

নেপোর বই ৩॥

বেড়ে পেড়াল নেপোর বই সহ অন্তর্ধানের পরবর্তী লোমহর্ষণ রহস্যের ব্যাপার আর চন্দ্রযাত্রী ছোট মামা, নেতাম অভিজ্ঞ বড় মাস্টার, সন্দেহজনক ছোট মাস্টার দপুরে টিকটিকি নিতাই সামন্তর নানা রকম কীর্তিকলাপ

সুখলতা রাওর
সর্বশেষ বই

নূতনতর গল্প ২৲

সুখলতা রাওয়ের লেখা যারা ভালবাসে তারা নিশ্চয়ই এই বইখানি পড়বে।

সুমথনাথ ঘোষের

কিশোর গ্রন্থাবলী ৪॥

এর মধ্যে লেখকের আশ্চর্য বই 'বাংলার টার্জন' আর 'প্রথম হিমালয় অভিযান' আরও অনেক গল্প

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

কিশোর গ্রন্থাবলী ৪॥

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

নগরপারে রূপনগর ১৮৲

তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হল

মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২ ফোন : ৩৪-৩৪৯২/৩৪-৮৭৯১

সূচিপত্র

মা বলছিলেন,
আমায় নাকি
দিন-দিনই
কচি দেখাচ্ছে ...
মা তো ছেলের দিক
টেনে কথা কইবেনই!
আসলে কিন্তু নির্মল
আর আমার তারিফ করা
উচিত। তিনি তো জানেন না
ওঁর আদরের ছেলেটিকে
আমিই নির্মল বার সাবানে
কাচা ধবধবে পোশাক
পরিয়ে অমন খোকাটি
করে রেখেছি।
নির্মল
Nirmal
BAR
SOAP
পূর্ব ভারতে বার সাবান
হিসেবে কাটতিতে
সবার উপরে
—সবার সেরা
বলেই।
কুসুম
প্রোডাক্টস লিমিটেড,
কলিকাতা-১
KPN 4623

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ : শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশিত হল

দাম ৩০·০০

দেশের অতীত ইতিহাস ও মহৎ মানুষের জীবনের কথা সম্যকভাবে না জানলে জাতির ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধ হতে পারে না। শুধু বাংলা দেশ নয়, গোটা ভারতবর্ষের নবজাগরণের সন্ধিক্ষণে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কত বড় মহীরুহসদৃশ পুরুষ সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। ইতিহাসের এই ভূমিকা ছাড়াও, বিদ্যাসাগরের মনুষ্যত্ব ও চরিত্রদৃঢ়তা বহু মানুষকে প্রেরণা দেয়।

একই সঙ্গে ইতিহাসের ব্যাখ্যা ও পরিপ্রেক্ষিত এবং একজন যুগপ্রতিভূ মানুষের রক্তমাংসের জীবন ফুটিয়ে তোলার মতন দুঃসাধ্য কাজ করেছেন ইন্দ্রমিত্র।

ইন্দ্রমিত্রের

বিদ্যাসাগর-চরিতকথা

করুণাসাগর বিদ্যাসাগর

বস্তুত, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণিত তাঁর জীবনের ইতিহাসই সমগ্র দেশ-কাল ও মানসিকতাকে স্ফটিকের মতন স্বচ্ছ করে তুলেছে। তথ্য ও তত্ত্ব মিশে গিয়ে সৃষ্ট হয়েছে সেই রস, যা সব কালের সাহিত্যের সামগ্রী। এর আগে বিদ্যাসাগরের অনেক জীবনী প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু এমন রসসমৃদ্ধভাবে সমগ্র জীবনের কথা বলা হয়নি, সেদিক থেকে ইন্দ্রমিত্রের গ্রন্থখানি একটি অতুলনীয় কীর্তি। বহু দুষ্প্রাপ্য চিত্র ও দলিলপত্রাদির প্রতিলিপি সংবলিত।

বিমল মিত্রের

প্রেম পরিণয় ইত্যাদি

বড় গল্প ॥ সম্প্রতি প্রকাশিত ॥ দাম ৭·০০

কালকূট-এর

কোথায় পাবো তারে

ভ্রমণ-উপন্যাস ॥ সম্প্রতি প্রকাশিত ॥ দাম ২০·০০

মনোজ বসুর

সেতুবন্ধ

উপন্যাস ॥ দাম ১২·০০

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর

প্রেমের চেয়ে বড়

উপন্যাস ॥ দ্বিতীয় মুদ্রণ ॥ দাম ১২·০০

গৌরকিশোর ঘোষের

লোকটা

উপন্যাস ॥ দ্বিতীয় মুদ্রণ ॥ দাম ৩·০০

বিমল মিত্রের

বেগম মেরী বিশ্বাস

ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস ॥ তৃতীয় মুদ্রণ ॥ দাম ২৫·০০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

তুঙ্গভদ্রার তীরে

রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত উপন্যাস ॥ নবম মুদ্রণ ॥ দাম ৬·০০

সৈয়দ মুজতবা আলীর

প্রেম

অনুবাদ-উপন্যাস ॥ চতুর্থ মুদ্রণ ॥ দাম ৪·০০

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের

সূর্যসাক্ষী

উপন্যাস ॥ দ্বিতীয় মুদ্রণ ॥ দাম ১৪·০০

রমাপদ চৌধুরীর

বনপলাশির পদাবলী

উপন্যাস ॥ চতুর্থ মুদ্রণ ॥ দাম ৮·৫০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড

অফিস: ৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলিঃ ৯ ॥ ফোন ৩৪-৮২৪৭
বিক্রয়-কেন্দ্র : ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলিকাতা ৯

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৭ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৭
শনিবার ২৭ অগ্রহায়ণ ১৩৭৬

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহযোগী সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীশীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮৩ ২৩-৮৫৪১

চাঁদার হার

কলিকাতায়

বার্ষিক	২৫.০০
ষাণ্মাসিক	১২.৫০
ত্রৈমাসিক	৬.২৫

ভারতে

বার্ষিক সডাক	৩০.০০
ষাণ্মাসিক "	১৫.০০
ত্রৈমাসিক "	৮.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	৩০.০০
ষাণ্মাসিক "	১৫.০০
ত্রৈমাসিক "	৮.০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ ডাকে)

বার্ষিক সডাক	৫২.০০
ষাণ্মাসিক "	২৬.০০
ত্রৈমাসিক "	১৩.০০

আসাম অঞ্চলে
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	৩১.০০
ষাণ্মাসিক	১৯.৫০
ত্রৈমাসিক	১০.০০

দাম ৫০ পয়সা
উত্তরবঙ্গ ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাসুল ৭ পয়সা

DESH

Saturday 13 Dec. 1969

কলকাতায় ক্রিকেট টেস্ট

কলকাতার ইডেন গার্ডেনস ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম পীঠস্থান। এই মাঠের সঙ্গে এ-দেশের ক্রিকেট খেলার অনেক ইতিহাস এবং কিংবদন্তী যেমন জড়িয়ে আছে, সেই রকম কিছু কিছু দুঃখের স্মৃতিও। এই রকম একটি বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটেছিল বছর দুয়েক আগে, ওয়েস্ট ইন্ডিজ যখন এই মাঠে ভারতের সঙ্গে টেস্ট খেলতে নেমেছিল। ইডেনের ইতিহাসে সেটাই বোধ হয় সবচেয়ে কলঙ্কজনক ঘটনা। তারপর গত দু বছর এই মাঠ ছিল নির্জীব; আঞ্চলিক খেলা ছাড়া এখানে খেলার কোনো বড় আসর জমে নি। অবশ্য ভারতের মাটিতে টেস্ট খেলাও আর হয় নি ইতিমধ্যে। বর্তমান বছরে আবার সরকারীভাবে টেস্ট খেলা শুরু হয়েছে নিউজিল্যাণ্ড টেস্ট টীম ভারতে খেলতে আসার পর থেকে। ইডেন অবশ্য নিউজিল্যাণ্ডকে অভ্যর্থনা করতে পারে নি। সম্প্রতি এই মাঠে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দলের সঙ্গে ভারতের টেস্ট খেলা শুরু হয়েছে। আমরা আশা করব, ইডেনের মাঠে ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া দলের যে খেলার লড়াই শুরু হয়েছে তার তাপ উত্তাপ খেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে, দর্শকের অন্য প্রকার উত্তেজনা বৃদ্ধির কারণ হবে না।

এ-দেশে ক্রিকেট খেলার জনপ্রিয়তা অন্যান্য দেশের—যেখানে ক্রিকেট খেলা হয়—তুলনায় কিছু কম নয়। এবং অনেকে মনে করেন একদা রাজার খেলা হলেও এই প্রজার দেশেও ক্রিকেটের রীতিমত একটি বনেদীয়ানা ক্রমশ গড়ে উঠেছিল। এদেশের মাটিতেও এমন কয়েকজন ক্রিকেট খেলোয়াড় তৈরী হয়েছিলেন যাঁদের আন্তর্জাতিক খ্যাতি জুটেছিল। তবু, একথা স্বীকার করা ভাল, সমষ্টিগত একটি টীম হিসেবে ভারত কখনোই শীর্ষস্থানে পৌঁছুতে পারে নি। এর নানা কারণ অবশ্যই আছে, কিন্তু অন্যতম একটি প্রধান কারণ হল : মনোবল। মুশকিল এই যে, আমাদের জাতীয় চরিত্রের মধ্যেই এই জিনিসটির অভাব এত বেশী যে, কিছুটা বিরূপ অবস্থার মধ্যে এসে দাঁড়ালেই সহজে আমাদের যোঝার ক্ষমতা ভেঙে পড়ে, নিরাশ্য বোধ করি; মনোবলও নষ্ট হয়। ঠিক এই কারণেই একাধিকবার দলগতভাবে ভারতের ক্রিকেট টীম নিতান্ত দুর্বল না হয়েও খেলায় পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছে।

সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়া দল সরকারীভাবে ভারত সফর করতে এসে যে কটি টেস্ট খেলেছেন তার মধ্যে প্রথমটিতে আমাদের পরাজয় ঘটেছে। এই পরাজয় বেশ বড় রকমের হয়েছিল। দ্বিতীয় খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি ঘটে নি এবং ভারত কিছুটা মনোবল ফিরে পায়। তৃতীয় খেলায় ভারত বিজয়ী হয়েছে। শক্তিশালী এবং এখন বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম দল হিসেবে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দলের যে সুনাম তার খানিকটা যে দিল্লির মাটিতে নষ্ট হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। অপর পক্ষে বিজয়ী হয়ে ভারত শুধু মনোবল ফিরে পায় নি, তার কিছু গৌরবও জুটেছে। ভারতের পক্ষে এখন এই গৌরব বজায় রাখার জন্যে চেষ্টা করতে হবে। বলা বাহুল্য, অস্ট্রেলিয়া দলের সঙ্গে আমাদের খেলার পালায় এটা প্রথম জয় নয়, এর আগে একবার কানপুরে এবং পরে আরও একবার বোম্বাইয়ে ভারত বিজয়ী হয়েছে। এবারের জয় এইমাত্র প্রমাণ করে যে, বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে নি, ভাল খেলা খেলেই জয়টি হস্তগত করতে হয়েছে।

ভারতের ক্রিকেট দলে নতুনের হাওয়া লেগেছে—আর এই হাওয়াই যে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব বাড়িয়েছে তাতে সন্দেহ কী। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, সাম্প্রতিক খেলায় ভারতের বড় ভরসা হয়েছে নতুন খেলোয়াড়রা। অশোক মানকড়, বিশ্বনাথ, সোলকার—এই সব তরুণরাই খেলার মাঠকে সজীব করে রেখেছিলেন। পতৌদি, ওয়াড়েকার, প্রসন্ন, ভেঙ্কট এবং বেদীর মতন অভিজ্ঞ খেলোয়াড়ের সহযোগিতায় তরুণ ও নতুন খেলোয়াড়রা যদি দেশের সম্মান ও মর্যাদার জন্যে যুঝতে পারেন—তবে মনে হয় আমাদের ক্রিকেট দল ক্রমেই একটি মর্যাদাপূর্ণ আসন লাভ করতে পারবে।

প্রসঙ্গত আমাদের বাংলা দেশের তরুণ খেলোয়াড়দের কথাও কিছু বলা দরকার। বেশ কিছুদিন পর আমরা ভারতীয় টেস্ট দলে দুই তরুণ বাঙালী খেলোয়াড়কে দেখছি : বোলার হিসেবে গুহ আর ব্যাটসম্যান হিসেবে অম্বর। এখন পর্যন্ত এঁদের কৃতিত্বে আমাদের গৌরব বোধ করার তেমন কারণ ঘটে নি। তবে এঁদের ভাগ্য কিঞ্চিৎ সদয় হলে হয়ত দুজনেই নিজেদের কৃতিত্ব প্রকাশ করতে পারবেন।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় 'হিংসা ও শারিরিক সংঘর্ষ প্রতিরোধে' যখন কারজন পার্ককে প্যানডেল বেঁধে তিন দিবসব্যাপী অনশন সত্যাগ্রহ পালন করছিলেন, সেই সময় সাংবাদিকদের পালা করে ওই জায়গায় পাহারা দিতে হয়েছিল। বিশেষ করে রাতের দিকেই 'পাছে কিছু ঘটে যায়'—এই কারণে সাংবাদিকদের কাগজ ছাপার আগের মুহূর্তে পর্যন্ত কারজন পার্ককে অনুষ্ঠিত সত্যাগ্রহ মেলার (মেলা কথাটার ইদানীং কিঞ্চিৎ চল হওয়াতে ওই শব্দটাই ব্যবহার করতে হল) উপর নজর রাখতে হয়েছে। একদিন জনৈক টহলরত সাংবাদিক গভীর রাতে হঠাৎ সুরেন বাড়ুজ্জের স্ট্যাচুর সঙ্গে এক বিশেষ সাক্ষাৎকার নিয়ে ফেললেন। কিন্তু অফিসে ফিরে সেই সাক্ষাৎকারের বিবরণ লিখতে লিখতে কাগজ ছাপা শুরু হয়ে যায় এবং প্রতি এডিশনে সেই বিবরণ একটু একটু করে ছাপা হতে হতে একেবারে শেষ সংস্করণে পুরো বিবরণটা প্রকাশিত হয়। এই ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কয়েকটি এডিশনে যেভাবে বেরিয়েছিল, তা অবিকল এখানে প্রকাশ করা হল।

[১নং মফস্বল সংস্করণ, রাত তিনটেয় ছাপা]

অজয় মুখারজির অনশন সম্পর্কে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ

রাষ্ট্রগুরুর স্ট্যাচুর সহিত আমাদের **প্রতিনিধির এক বিশেষ** সাক্ষাৎকারকালে বাংলা দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী (বর্তমান সংবিধান অনুসারে মুখ্যমন্ত্রী) রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'অজয়বাবুর (পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী) অনশন সম্পর্কে আমার কিছু বলা সাজে না, এই কারণে [আর নেই]

[২নং মফঃ সংস্করণ, রাত তিনটে পনেরোয়]

অজয় মুখারজির অনশন সম্পর্কে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ

রাষ্ট্রগুরুর স্ট্যাচুর সহিত আমাদের প্রতিনিধির এক বিশেষ সাক্ষাৎকারকালে বাংলা দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী (বর্তমান সংবিধান অনুসারে মুখ্যমন্ত্রী) রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'অজয়বাবুর (পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী) অনশন সম্পর্কে আমার কিছু বলা সাজেনা, সেই কারণেই আমি আর কোনও বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করি না।'

আমাদের প্রতিনিধি : কেন স্যার? অজয়দা যে পদ থেকে নিজের অ্যাডমিনিসট্রেশনের বিরুদ্ধে অনশন করলেন, আপনিও ওই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অতএব আপনার এ বিষয়ে কিছু বলা অবশ্যই সাজে।

রাষ্ট্রগুরু : আসলে আমি ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারিনি। আজকাল আর ঘাড় ঘোরাতে পারি না, জানো তো, তাই সর্বদা ময়দানের দিকেই চেয়ে থাকি। ও'রা আমার পিছনে ছিলেন তো, তাই দেখতে কিছুই পাইনি। কদিন ধরে খুব আওয়াজই শুনলাম। একদল বলছে, অজয় মুখারজি জিন্দাবাদ। আচ্ছা, জিন্দাবাদ কী?

আমাদের প্রতিনিধি : ওর মানে দীর্ঘজীবী হোন।

রাষ্ট্রগুরু : মানে আমাদের আমলে যাকে লঙ লিভ বলা হত। আর মুর্দাবাদ মানে নিপাত যাক মানে ডাউন ডাউন। তাই না?

আঃ প্রঃ : আজ্ঞে হ্যাঁ।

রাষ্ট্রগুরু : তবেই দ্যাখ, ভাষারই যখন এতো পরিবর্তন হয়েছে, তখন পদ্ধতি প্রকরণ বদলে যাবে, এ আর বেশি কথা কি? আমার আমলে বিরোধীপক্ষ আমার বিরুদ্ধে, আমার অ্যাডমিনিসট্রেশনের বিরুদ্ধে বহুবার নো কনফিডেনস জানিয়েছে, কিন্তু আমি স্বয়ং আমার বিরুদ্ধেই নো কনফিডেনস জানাচ্ছি, এ আমি ভাবতেই পারি না।

[শেষ শহর সংস্করণ, ভোর সাড়ে চারটে]

২নং মফঃস্বল সংস্করণে যেটুকু বেরিয়েছিল, শেষ শহর সংস্করণে তার সঙ্গে নিচের বিবরণটুকুও যুক্ত হল।

আঃ প্রঃ : নিজের প্রতি অজয়দার, স্যার, দারুণ কনফিডেনস। উনি নিজে যেটা ঠিক বোঝেন, তার থেকে তাঁকে সরায় এমন ক্ষমতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরেরও নেই। উনি স্যার কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে যাওয়া যখন ঠিক মনে করলেন, তখন বেরিয়ে গেলেন। কমিউনিসটদের সঙ্গে আঁতাত করে মুখ্যমন্ত্রী হওয়া যখন ঠিক মনে করলেন, তখন যুক্ত ফ্রনটের মুখ্যমন্ত্রী হলেন। রাইটারস বিলডিংসের কমিউনিসট চাকুরেরা যখন মুখ্যমন্ত্রীকে লাঞ্ছিত করল এবং মুখ্যমন্ত্রী সেটা চেপে যাওয়া ঠিক মনে করলেন, উনি, স্যার, সেটা চেপে গেলেন। এক মন্ত্রীর অবর্তমানে তাঁর পোরটফোলিও তিনি যখন অন্য মন্ত্রীর কাছে মুখ্যমন্ত্রীকে না জানিয়েই গচ্ছিত রেখে গেলেন এবং মুখ্যমন্ত্রী এ বিষয়ে উচ্চবাচ্য করা ঠিক হবে না বলে ঠিক করলেন, তখন তিনি উচ্চবাচ্য করলেন না। যখন ঠিক করলেন মারকসবাদীরা ধোয়া তুলসীর পাতা তখন তারা ভাই ভাই।

রাষ্ট্রগুরু : দাঁড়াও, দাঁড়াও। একটু বুঝে নিই। তবে এই সত্যাগ্রহ কার বিরুদ্ধে?

আঃ প্রঃ : অজয়দা, স্যার, পই পই করে বলেছেন, এ সত্যাগ্রহ কারও বিরুদ্ধেই নয়।

রাষ্ট্রগুরু : তবে এই সত্যাগ্রহ কেন?

আঃ প্রঃ : সেটাও স্যার, অজয়দা বলে দিয়েছেন। যুক্তফ্রনট সরকার অরাজকতা, নারী নিগ্রহ ইত্যাদি দমন করতে পারছে না। দেশ জাহান্নামে যাচ্ছে। যে সি পি এম রক্ষক, সেই ভক্ষক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই সেই যুক্ত ফ্রনটকে ভেঙে দেবার জন্য জনতার সুপ্রিম কোরটে অজয়দা অনশনের মাধ্যমে মামলা দায়ের করেছেন। এখন তারা যুক্ত ফ্রনট ভাঙুক।

রাষ্ট্রগুরু : কিন্তু জনতা যুক্ত ফ্রনট ভাঙবে কি করে? তারা ভোট দিয়ে যাদের পাঠিয়েছে সরকারে, এ কাজ তো তাদেরই করবার কথা। মুখ্যমন্ত্রীর নিজের হাতেই তো সে ক্ষমতা আছে। তিনি পদত্যাগ করলেই তো সত্যের প্রতি বেশি আগ্রহ দেখান যায়।

আঃ প্রঃ আপনি বলছেন স্যার, যে জনতার সরকার ভাঙার ক্ষমতা নেই।

রাষ্ট্রগুরু : না, জনগণ শুধু গড়বারই কারিগর। সরকার ভেঙে গেলে তারা আবার ভোট দিতে পারে, যদি নির্বাচন হয়। নির্বাচিত প্রতিনিধির ভোটেই তো সরকার গড়ে, সরকার ভাঙে জানি। এখন কি কোনও নতুন বিধান হয়েছে নাকি?

আঃ প্রঃ তবে যে অজয়দা এসব কথা বলে যাচ্ছেন?

রাষ্ট্রগুরু : রাষ্ট্রনীতিতে আমার মাথা কিঞ্চিৎ খেলত বলে তোমরা আমাকে রাষ্ট্রগুরু বানিয়েছ, কিন্তু এখন দেখছি তোমাদের অজয়দা গুরুরও গুরু। দেখ বাপু, একটু বাঁচিয়ে লিখো। দিনকাল সুবিধের নয়।

তিন দিনের অনশন সত্যাগ্রহে যে তিনি এতটা সাফল্য অর্জন করবেন শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় নিজেও বোধ হয় কোনও দিন তা কল্পনা করতে পারেন নি।

বাংলা কংগ্রেসের নেতারা অনেকেই ভেবেছিলেন সত্যাগ্রহ হলে ও স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী অনশন করলে খবরের কাগজে কিছুটা হই-চই চলবে, দলের কর্মীরা উৎসাহ পাবেন এবং "অত্যাচারিত" মানুষ অনেকটা আশ্বস্ত হবেন। এর বেশি কেউই কিছু আশা করেন নি। এই অনশন সত্যাগ্রহ যে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি ও প্রশাসনে অনেকটা পরিবর্তন এনে দিতে পারে বুঝতে সেটা তাঁরা একবারও ভাবতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না।

কেউ কেউ আবার ভেবেছিলেন, গ্রামের মানুষ জিনিসটাকে খারাপ চোখে না দেখলেও শহরের মানুষ "বুজরুকি" বলেই ধরে নেবেন। একজন বাংলা কংগ্রেস নেতা (ভদ্রলোক কখনও-ই এই অনশন সত্যাগ্রহের ব্যাপারে তেমন উৎসাহী নন) আমাকে বলেছিলেন : সুশীল ধাড়া আবার অনশন কেন্দ্রটাকে নিয়ে যাচ্ছে কারজন পার্কে। অফিসের বাবুরা কি এখন আর এসব অনশন টনশন নিয়ে মাথা ঘামায়। অজয়বাবুকে অত্যন্ত ভক্তি শ্রদ্ধা করেন এইরূপ একজন উচ্চপদস্থ সরকারী অফিসার মন্তব্য করেছিলেন : হ্যাঁ, গ্রামে কিছুটা আলোচনা হলে হবে কলকাতার তো আর তেমন কিছু হতে পারে না। চিফ মিনিস্টার নিজেও বোধহয় মেদিনীপুরেই অনশন করলে ভাল করতেন।

স্বীকার করতে কুণ্ঠা নেই, আমি নিজেও অনুমান করতে পারি নি যে এই অনশন সত্যাগ্রহে বাংলা কংগ্রেস এতটা সফল হতে পারেন। ভেবেছিলাম, যে কাজকে যুক্তি দিয়ে সমর্থন করা প্রায় অসম্ভব সেই কাজ কিছুতেই তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। কিছু গান্ধীবাদী, কিছু ভাবপ্রবণ মানুষ হই-চই করতে পারেন এই যা।

যুক্তি দিয়ে এই অনশন সত্যাগ্রহকে আমি অবশ্য এখনও সমর্থন করতে পারছি না। যদি ধরেই নেওয়া হয় যে পশ্চিম বাঙলায় আইন ও শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে, সি পি এম শুধু পারটি স্বার্থে প্রশাসন ও পুলিশকে চালিয়ে এবং অন্যান্য দলের উপর হামলা হুজ্জুতি করে রাজ্যে এক অরাজক অবস্থার সৃষ্টি করে তুলেছেন তাহলেও স্বীকার করা যায় না যে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রতিকারের একমাত্র পথ অনশন সত্যাগ্রহ। তিনি কঠোর হাতে হাল ধরতে পারেন, তিনি সি পি এম মন্ত্রীদের সতর্ক করে দিতে পারেন, তাঁরা সতর্ক না হলে তাঁদের হাত থেকে দফতর কেড়ে নিতে

পারেন, এমনকি তাতেও কিছু না হলে নিজে পদত্যাগ করতে পারেন। এজন্য অনশন সত্যাগ্রহ কেন? এখানে অনশন সত্যাগ্রহের স্থান কোথায়? অজয়বাবু এবং তাঁর দলের কর্মীদের অনশনে কি জ্যোতিবাবু হরেকৃষ্ণবাবু, প্রমোদবাবুদের মন পাল্টাবে? কোথাও কখনও কেউ শোনেনি নি যে মুখ্যমন্ত্রী নিজ রাজ্যে "প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রায় ভেঙে পড়ছে" অভিযোগে অনশন সত্যাগ্রহ করেছেন!

তাই অজয়বাবু এবং বাংলা কংগ্রেসের অনশন সত্যাগ্রহকে আমার এক বিচিত্র বস্তু বলে মনে হয়েছিল। এবং এখনও তাই মনে হয়।

*

অন্যান্য কেন্দ্রে কি হয়েছে জানি না, কিন্তু কারজন পার্কে গিয়ে দেখেছি পশ্চিম বাঙলার বহু মানুষ এ বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত নন। তাঁরা হাজারে হাজারে গিয়েছেন ওই অনশন কেন্দ্রে। লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে ভক্তিপ্রণতচিত্তে অজয়বাবুকে প্রণাম করে এসেছেন। তাঁর পায়ের ধুলোর জন্য কাড়াকাড়ি করেছেন। বলে এসেছেন, "আপনি আমাদের নেতা, আপনি আমাদের মা বাপ; আমরা আপনার পিছনে আছি।" অনশন সত্যাগ্রহকে বুজরুকি মনে করলে নিশ্চয়ই এত মানুষ ওভাবে কারজন পার্কে যেতেন না।

আমি তিন দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা কারজন পার্কে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখেছি। না দেখলে বিশ্বাসই করতাম না এখানে এমন জিনিস ঘটেছে। যাঁরা অজয়বাবুকে প্রণাম জানাতে এসেছিলেন তাঁরা ধরে আনা মানুষ নন, তাঁরা হাজারে হাজারে স্বেচ্ছায় এসেছিলেন। তাঁরা জোতদার, মহাজন বা কালোবাজারীও নন। তাঁরা এই বৃহত্তর কলকাতার মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং গরীব মানুষ। এরাই তিন দিনে হাজারে হাজারে কারজন পার্কে এসে মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়ে গিয়েছেন : আপনি আমাদের নেতা, আপনি আমাদের মা-বাপ; আমরা আপনার পিছনে আছি।

যাঁরা ওই কারজন পার্কে হল্লা করতে গিয়েছিলেন, যাঁরা ওখানে দাঁড়িয়ে অজয়বাবুর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন, যাঁরা তাঁকে উদ্দেশ্য করে গালিগালাজ করেছেন আমার মনে হয় তাঁরাই অজয়বাবু এবং বাংলা কংগ্রেসকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছেন। এইসব বিক্ষোভকারীদের আচরণ যাঁরা স্বচক্ষে দেখেছেন তাঁরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছেন। যাঁরা মুখে বলেন "যুক্ত ফ্রন্ট জিন্দাবাদ", "জ্যোতি বসু জিন্দাবাদ" তাঁরা আর কারু উদ্দেশ্যে ওইভাবে ইতর

গালিগালাজ কি করে দিতে পারেন আমি বুঝেই পাই না। এদের আচরণের কিছুটা কিছুটা বিবরণ সংবাদপত্রে পড়ে অজয়বাবু সম্পর্কে সাধারণ মানুষের সহানুভূতি আরও বেড়ে গিয়েছে।

এ জিনিসটাও পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে এই অনশন-সত্যাগ্রহের মধ্য দিয়ে যে, বহু শহুরে মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত ও গরীব মানুষ এখনও অজয়বাবুকে শ্রদ্ধা করেন। তাঁকে নেতা বলে মানেন এবং সি পি এম-এর আচরণের প্রতিবাদে তাঁরা তাঁর সঙ্গে একমত। সাধারণ মানুষের অনেকের মনেই এই অনশন সত্যাগ্রহ একটা অদ্ভুত সাড়া জাগিয়েছে। তাঁরা যে এই সঙ্গে সঙ্গে বাংলা কংগ্রেসে এসে যোগ দিয়েছেন তেমন নয়; কিন্তু তাঁরা যে এই আন্দোলনে বাংলা কংগ্রেসের সমর্থক সেটা তো প্রমাণিত হয়েছে। সি পি এম নেতাদের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও, কিছু হামলাকারীর বিক্ষোভে ভয় না পেয়েও যে হাজার হাজার মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত এবং গরীব মানুষ এই কলকাতা শহরে এখনও এইভাবে এগিয়ে আসতে পারেন এই জিনিসটা অনেকেরই অজানা ছিল।

একজন সি পি এম সমর্থক সাংবাদিক বন্ধু সেদিন আমাকে বলছিলেন : অজয়বাবুর প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছে। আমার মনে হয়, কারজন পার্কের জনসমাবেশ দেখে আমার বন্ধু ও তাঁর সমমতাবলম্বীরা তাঁদের ভুল বুঝতে পারবেন। এখনও কংগ্রেস বিরোধী জনগণকে সমবেত করতে হলে যে অজয়বাবুকে খুব বেশি প্রয়োজন আছে কারজন পার্কের দৃশ্য দেখেও কি সকল বামপন্থী দল তা বোঝেন নি? নিঃসন্দেহে বলতে পারি, যিনি এখনও বোঝেন নি, তিনি মারাত্মক ভুল করছেন।

কংগ্রেস যে পশ্চিমবঙ্গে এখনও ভেসে যায় নি টালিগঞ্জ এবং রায়নার নির্বাচন নিশ্চয়ই তা প্রমাণ করেছে। টালিগঞ্জে কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রচার বলতে কিছুই ছিল না। এমনকি নির্বাচনের দিনেও কংগ্রেসের ভলাণ্টিয়ারদের তেমন পাত্তাই পাওয়া যায় নি। তবু ওই নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রমিক কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রায় ১৩ হাজার ভোট পেয়েছে। রায়নায় গত প্রায় দশ মাসের মধ্যেই কংগ্রেসের মোট ভোট বেড়েছে। তাই স্পষ্ট, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বামপন্থীদের এখনও অনেক লড়াই লড়তে হবে। এখনই কি অজয়বাবুকে সেই লড়াই থেকে বাদ দেওয়া যাবে?

বাংলা কংগ্রেসের অনশন সত্যাগ্রহে গোটা রাজ্যের সাধারণ মানুষের মধ্যে কোনও নতুন মনোবল সৃষ্টি হয়েছে কি না জানি না। তবে তিন দিনে কারজন পার্কে দেখেছি, মানুষ আস্তে আস্তে প্রতিবাদ করার সাহস খুঁজে পাচ্ছে। প্রথম দিন যখন বিক্ষোভকারীরা বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন, গালিগালাজ করছিলেন তখন সাধারণ মানুষের ভেতর থেকে কেউই প্রতিবাদ করার সাহস খুঁজে পান নি। দ্বিতীয় দিন তাঁদের মধ্যে শুধু প্রতিবাদের গুঞ্জন শোনা গিয়েছে। তৃতীয় দিন কিন্তু তাঁরা অনেকেই সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। বলেছেন, "ওঁরা ওঁদের মত করছেন করুন আপনারাও মিটিং ডেকে আপনাদের বক্তব্য জানান; এখানে হামলা কেন?" ওইদিন দেখেছি প্রতিবাদকারীরাই সোচ্চার, বিক্ষোভকারীরাই বরং আস্তে আস্তে রণে ভঙ্গ দিচ্ছেন।

আমার অবশ্য মনে হয় না যে, অনশন সত্যাগ্রহের ফলে রাজ্যের সর্বত্রই মানুষ এইভাবে প্রতিবাদ করার সাহস খুঁজে পেয়েছেন। তবে, এর ফলে যে বিভিন্ন অঞ্চলে কিছু কিছু মানুষ নতুন মনোবল পেয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই।

নতুন মনোবল বেশ কিছুটা পেয়েছেন **সরকারী অফিসাররা। অনেক অফিসার** তো প্রায় আত্মসমর্পণ করেই বসেছিলেন। যাঁরা একটু বেশি কর্মিৎকর্মা তাঁরা এগিয়ে গিয়ে নানা শ্রীচরণে প্রণাম জানাচ্ছিলেন; আর যাঁরা একটু মুখচোরা বা আত্মমর্যাদা-সম্পন্ন তাঁরা চুপচাপ থেকে শুধু হুকুম তামিল করে যাচ্ছিলেন। দেশে আইন বলতে যে একটা বস্তু আছে, কতকগুলি নিয়ম-কানুন মানার যে প্রয়োজন আছে এটা বহু প্রশাসনিক এবং পুলিশ অফিসার প্রায় ভুলে যেতে বসেছিলেন। বিশেষ কর রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পর ভয়ে ও শংকায় তাঁরা অনেকেই একেবারে পারটিতন্ত্রের কাছ আত্মসমর্পণ করে বসেছিলেন। আমাদের আমলাকুল সাধারণভাবে বহুদিন থেকে বহু ব্যাপারেই তাঁদের মেরুদণ্ডহীনতার প্রমাণ দিয়ে আসছিলেন। এই রাজত্বে তাঁরা সেই জিনিসটার একেবারে চূড়ান্ত দেখাচ্ছিলেন।

অজয়বাবুর অনশন এবং অনশনের সময় তাঁর কতকগুলি বক্তৃতা অফিসারদের অনেকেরই ভয় কিছুটা কাটিয়ে দিয়েছে। এবার তাঁরা বুঝতে পেরেছেন, একেবারে অসহায় নন। শ্রীসুবোধ দত্তের ডিসমিসাল বহু অফিসারের হাড়ে যে কাঁপুনি ধরিয়ে দিয়েছিল অজয়বাবু সেই কাঁপুনি থামিয়ে দিয়েছেন। অফিসাররা সিংহমূর্তি ধারণ করুন এটা কেউই চাইবেন না; কিন্তু প্রশাসন নিরপেক্ষভাবে ও আইনমত চলুক এটা নিশ্চয়ই সবাই চাইবেন। অজয়বাবুর অনশন যদি সেই কাজটা করে থাকতে পারে তাহলে সেই বিচারে পশ্চিম বাংলার বেশ কিছুটা উপকারই হয়েছে।

সি পি এম মন্ত্রীরা অবশ্য আশংকা করছেন, অজয়বাবু যেসব কথা বলেছেন তাতে আর প্রশাসন চালানো সম্ভব হবে না—অফিসাররা কেউই আর কথা শুনবে না। তাঁরা বলছেন, আমলাকুল আবার পুরোদস্তুর কায়েমী স্বার্থের পক্ষ নেবে।

মুখ্যমন্ত্রী যেসব কথা বলেছেন সেগুলি যে বিচিত্র তাতে সন্দেহ নেই। একজন মুখ্যমন্ত্রীর মুখে এসব কথা মানায় না। অফিসাররা ভয়ে নিরপেক্ষভাবে ও আইন মাফিক কাজ করতে পারছেন না, একথা কি কোনও মুখ্যমন্ত্রী বলতে পারেন? ও কথা বলার আগেই মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত নয় কি?

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও সত্য নয় কি যে অফিসাররা নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে ভয় পাচ্ছিলেন? বহু ক্ষেত্রে তাঁরা মন্ত্রীদের কথা আঞ্চলিক নেতাদের মুখের দিকে তাকিয়েও কাজ করছিলেন?

অজয়বাবুর অনশন এবং বিভিন্ন বক্তৃতা শোনার পর তাঁরা সকলেই আর তা করবেন বলে মনে হয় না। অন্তত, সেইরকম কথাই তো মুখে বলছেন।

৮-১২-৬৯

নবারুণ গুপ্ত

দেবরাজ

সং মাই একটি গ্রাম

এই সেদিন পর্যন্ত সং মাই বলে দক্ষিণ ভিয়েতনামে কোনও যে গ্রাম আছে তা ও দেশেও বেশী লোক জানতো কি না সন্দেহ, ওর বাইরে ভিন্ন দেশে কেউ তার নাম কস্মিন কালেও শোনে নি। আজ হেন সভ্য দেশ নেই যেখানকার লোক ওই ভিয়েতনামী গাঁয়ের নাম না শুনেছে। লড়াইয়ের সময় অবশ্য অমনিই হয়। যে সব গাঁ কী ক্ষুদে শহরের নাম ভূগোলের পাতা হাতড়ে খুঁজে পাওয়া যায় না তা রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে ওঠে, ইতিহাসের পাকা খাতায় তাদের নাম উঠে যায়। সাধারণত তার কারণ হচ্ছে সেখানে একটা জবর কোনও লড়াই হয় যার ফলে যুদ্ধের তো বটেই ইতিহাসেরও মোড় ঘুরে যায়। থার্মোপিলি কী হলদিঘাট, ওয়াটার্লু কী পানিপত, স্টালিনগ্রাদ কী ডিয়েনবিয়েন ফুর নাম আজ লোকের মুখে মুখে ফিরছে এই জন্যে যে ওই সব নাম-না-জানা জায়গায় এমন লড়াই হয়েছে যা ভোলবার নয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সে সব যুদ্ধের কাহিনী বীরত্ব, শৌর্য, সাহসের কাহিনী, অসাধারণ বীরত্বের বিচিত্র বৃত্তান্ত।

সব যুদ্ধ কিন্তু ধর্মযুদ্ধ নয়, যুদ্ধে যারা যোগ দেয় তারা সবাই সব সময় নীতি-নিয়ম মেনেও চলে না। যুদ্ধের সময় তাই এক একটা গাঁ কী ক্ষুদে শহর যেমন অতুলনীয় বীরত্বের স্বাক্ষর বুকে নিয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকে তেমনই অন্যায় এক-একটা গাঁ কী ছোট শহর কলঙ্কের পশরা মাথায় নিয়েও ইতিহাসের পাতায় চিরকালের জন্য ঠাঁই করে নেয়। তেমনই একটা নাম হচ্ছে পলাশী যেখানে বাঙালীর খুনে লাল হয়েছিল ক্লাইভের খঞ্জর। গেল মহাযুদ্ধের ওই রকম একটা নাম যা শুনলে আজও ঘোরা লাগে তা হচ্ছে চেকোস্লোভাকিয়ার লিডিস। কেন না ওই গ্রামটিতে হানা দিয়ে নাৎসি বর্বরেরা তাকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলতে চেয়েছিল। পুরুষদের তারা এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে গুলি করে মেরেছিল। মেয়েদের পাঠিয়ে দিয়েছিল তিলে তিলে মরবার জন্যে বন্দীশিবিরে। তারপর গাঁয়ের সব কটা বাড়ি বোমা মেরে উড়িয়ে দিয়ে সেখানে বুলডোজার দিয়ে সমান করে দিয়েছিল। সেখানকার কবরখানা খুঁড়ে ফেলে তছনছ করতেও তাদের বাধে নি।

নাৎসিরা খুব আটঘাট বেঁধে কাজ করেছিল। লিডিসের কোনও চিহ্ন যেন তারা রাখে নি, এমন কী তার গা দিয়ে যে ছোট্ট নদীটি বয়ে যাচ্ছিল তার গতিও তারা ঘুরিয়ে দিয়েছিল যাতে কোনও নিশানাই গাঁটির না থাকে। পাপের বিষ যেমন লুকোনো যায় না, তেমনই যুদ্ধের অপকর্মও। লিডিসে নাৎসিদের কুকীর্তি আজ আর চাপা নেই, দুনিয়ার সবাই তা জানে। নতুন একটা গাঁও গড়ে উঠেছে পুরোনো লিডিসের শ্মশান-ভূমির ওপর। তেমনই হয়তো হবে সং মাইয়ের। মার্কিন ফৌজের নথিতে মাই লাই ৪ বলে যে গ্রামটি ছিল—যাকে তারা নিশ্চিহ্ন করেছিল চরম নিষ্ঠুরভাবে গত বছরে মার্চ মাসে তা হয়তো আবার গড়ে উঠবে, প্রাণের সাড়া আবার দেখা দেবে আজ যা বিজন প্রেতপুরী সেখানে। কিন্তু কলঙ্কের যে কালি সং মাই সুসভ্য মার্কিন দেশের মুখে মাখিয়ে দিয়েছে তা কী কখনও মুছে যাবে? দক্ষিণ ভিয়েতনামের ঘা শুকিয়ে যাবে, ভিয়েতনামীদের অন্তরের জ্বালাও একদিন নিভে যাবে, কিন্তু যে অপযশ মার্কিনীদের হয়েছে তা কী আর কোনও দিন ঘুচবে?

ঘটনাটা ঘটেছিল ১৯৬৮ সনের মার্চের মাঝামাঝি। হঠাৎ একদিন সং মাইতে হানা দিয়েছিল মার্কিন ফৌজ। মর্টার আর গোলার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে গাঁয়ের লোকেরা লুকিয়ে পড়লো যে যেখানে পারে। তখন হঠাৎ সেখানে নামলো হেলিকপ্টার থেকে তিন দল মার্কিন ফৌজ। দু' দল ঘিরে রইলো গ্রামটা যাতে টিকটিকিও পালাতে না পারে। আর একদল ঢুকে পড়লো ভেতরে। আগুন জ্বালিয়ে, ডিনামাইট ফাটিয়ে তারা খাণ্ডবদাহন শুরু করলো সং মাইতে। যারা পুড়ে না মরলো কিংবা বোমার মার থেকে বেঁচে গেল তাদের নির্মমভাবে গুলি করে মারলো মার্কিন সেনারা। মেয়ে-পুরুষ, ছেলেবুড়ো কেউ বাদ গেল না। কত লোক সেদিন সেখানে মারা গিয়েছিল তার সঠিক হিসেব কেউ রাখে নি। ১০৯ থেকে ৫৬৭ অনেক সংখ্যাই এ প্রসঙ্গে শোনা গেছে। তবে এদের কেউ যে সেনা ছিল না তাতে ভুল নেই। এরা মার্কিন ফৌজদের বিরুদ্ধে ছিল ও কথা হয়তো ঠিক। কিন্তু তাই বলে নিরস্ত্র অসামরিক লোকদের নির্মমভাবে হত্যা করার কোনও কৈফিয়তই মার্কিন সেনাবাহিনীর নেই।

ঘটনাটা ঘটবার কিছু দিন পরেই এ কাহিনী প্রকাশ করেছিল ভিয়েতকং আর উত্তর ভিয়েতনাম রেডিও। কিন্তু ব্যাপারটা এতই বীভৎস যে, অন্য দেশে লোকে তা বিশ্বাস করতে চায় নি। ভেবেছিল এও বুঝি কথার লড়াই। মার্কিন ফৌজের তরফ থেকেও এ সম্পর্কে কিছুই বলা হয় নি, হয়তো বলা হতোও না, যদি হাটে হাঁড়ি ভেঙে না দিতেন ভিয়েতনাম ফেরত, মার্কিন ফৌজের একজন প্রাক্তন সৈন্য। নাম তাঁর রোনাল্ড লী রাইডেনহুর। তিনি সং মাইতে ছিলেন না, ঘটনাটা দেখেনও নি, কিন্তু তাঁর বন্ধুদের মুখে শুনেছিলেন তার বর্ণিত বিবরণ। যা তিনি শুনেছিলেন দেশে ফিরে সেনাবাহিনী থেকে মুক্তি পেয়ে সব লিখে পাঠালেন প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে সরকারের গণ্যমান্য সবায়ের কাছে। ব্যাপারটা তখন আর চেপে রাখা গেল না। বিস্তর লোকের খোঁজ পাওয়া গেল যারা নিজের চোখে ওই বীভৎস হত্যাকাণ্ড শুধু দেখে নি নিজেরা হাতে গুলিও করেছে। সে কুকীর্তির রঙীন ছবিও পাওয়া গেল যা হাজির সং মাইতে মার্কিনী ফৌজদের পাশবিকতা অভ্রান্ত প্রমাণ।

সারা আমেরিকাতে আজ সং মাই নিয়ে হুলুস্থূল পড়ে গেছে। প্রেসিডেন্ট নিক্সন থেকে সকলেই চমকে গেছেন। সাফাই গাইবার চেষ্টা করছেন সরকারী বড়কর্তারা এই বলে যে তাঁরা এর বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানতেন না, জানলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিতেন। সে ব্যবস্থা যে কী তা অবশ্য কেউ খুলে বলেন নি। তবে দেখা যাচ্ছে সং মাইয়ের ঘটনা নিয়ে জোর তদন্ত চলছে দফায় দফায়। কাণ্ডটা যে সেনা দল করেছে তার অধ্যক্ষ ছিলেন ফার্স্ট লেফটেনান্ট উইলিয়াম লস ক্যালি। তাঁর বিচার হবে, হয়তো শাস্তিও হবে। কিন্তু যারা প্রাণ হারিয়েছে মার্কিন সেনাদের হাতে দক্ষিণ ভিয়েতনামের ওই গ্রামে তাদের কেউ তো আর বেঁচে ফিরে আসবে না। তবে নিজেদের জীবন বলি দিয়ে একটা কাজ তারা হয়তো এগিয়ে দিয়েছে। ভিয়েতনামের যুদ্ধ থামাবার জন্যে যে আন্দোলন আমেরিকায় চলেছে এর পর তা আরও জোরদার হয়ে উঠবে। তার ফলে ভিয়েতনামে যুদ্ধ চালানো মার্কিন সরকারের পক্ষে আরও কঠিন হয়ে উঠবে।

'ফচক্কে জজ্জকফ'

ঘাবড়াবেন না, আমি কোনো মন্ত্রতন্ত্র উচ্চারণ করছি না। 'ফচক্কে জজ্জকফ'—এই দুটি শব্দ পড়ে আপনারা যা বুঝতে পারছেন, আমিও যে তার বেশি বুঝেছি তা নয়।

তাই বলে শব্দ দুটো আপনাদের যে সম্পূর্ণ অপরিচিত, তাও মনে করবেন না।

রাজনৈতিক ভূত
(রাজনৈতিক খুন হলে সেটা নরহত্যা নয়)

ঠিক 'ফচক্কে' নাই হোক—এই জাতের কোনো আকস্মিক শব্দ—কোনো 'ফক্কুচচ' ধমেকা—সম্পূর্ণ অকারণেই কি আপনাকে চমকে দেয়নি?

বাংলা খবরের কাগজ পড়েন? যেমন: সংবাদে প্রকাশ, গত ১লা ডিসেম্বর সোমবার বসিরহাট মহকুমার ফচক্কে জজ্জকফ—'

এইবারে বুঝেছেন আশা করি। কাগজ ছাপা হওয়ার সময় দুটো শব্দ লাইন থেকে খসে পড়েছে। কিন্তু ঝড়ের বেগে মেশিনের যখন ছুটবার পালা, কাঁপি মিলিয়ে ও দুটো ঠিক করবার সময় কোথায়? অতএব হাতের কাছে যা পাওয়া যায়—

'ফচক্কে জজ্জ—'

আপাতত বিশুদ্ধ ননসেন্স। কিন্তু একটু গভীরভাবে তলিয়ে দেখুন। যা নিতান্তই বসিরহাট মহকুমার একটা স্থূল সংবাদে পরিণত হতে যাচ্ছিল, ওই দুটি শব্দের সহযোগে তা কী বিপুল ব্যঞ্জনা লাভ করল। একটু কাব্য করে বলা যায়—সীমা থেকে একেবারে অসীমের দিকে লাফিয়ে উঠল।

আপনি যদি নাছোড়বান্দা হন, ক্রসওয়ার্ড-কুইজ-ধাঁধা সম্পর্কে আপনার যদি খুব দারুণ রকমের জেদ থাকে,

তাহলে আপনি ভাবতে বসে যাবেন—৬২ শব্দদুটো কী ছিল, কী হতে পারে, কী হলে বসিরহাট মহকুমা-সংক্রান্ত ব্যাপারটার সম্পূর্ণ রহস্য আপনার বোধগম্য হবে; আপনি যদি লঘুচেতা পাঠক হন, তাহলে 'মরুক গে' বলে কাগজ ফেলে বাজারে দৌড়াবেন—কারণ সাড়ে দশটায় অফিস আছে আপনার; আর আপনি যদি তত্ত্বজিজ্ঞাসু হন—তাহলে হয়তো আপনার মনে হবে: আমাদের জীবনই তো এই রকম—খুব সহজ আর স্বাভাবিকভাবে চলতে চলতে হঠাৎ এক দুর্বোধ্য অপরিচয়ের ঝলক—এক রহস্যের আবির্ভাব—এক অলৌকিক বীজমন্ত্রের শিহরণ!

'প্রিন্টার্স ডেভিল' বলে ইংরিজিতে একটি নিন্দাত্মক উক্তি রয়েছে—বাংলা মতে যাকে বলে, 'ছাপাখানার ভূত।' কিন্তু এ-সব ক্ষেত্রে 'ডেভিল' অথবা 'ভূত'কে সাবিয়সলি নেবার রেওয়াজ নেই। আপনি যদি তত্ত্বপিপাসু হন, তাহলে আপনার মনে হতে পারে: 'জজ্জকফ' কি হাতের কাছে যা অক্ষর পাওয়া গেল, কেবল তাই-ই? শব্দটা কি প্রেসের লোকদের স্বাধীন ইচ্ছা থেকেই এসেছে? অথবা সেই মুহূর্তে কোনো অলৌকিক শক্তি ভর করেছিল—যে ওই 'ফচক্কে জজ্জকফ'-এর ভেতরে নিহিত রেখে গেল কোনো অতীন্দ্রিয় ইশারা—কোনো

ছাপাখানার ভূত

অবোধ্য-সংকেত—সীমা থেকে কোনো অসীমের আভাস? কারণ ছাড়া কার্য ঘটতে পারে না—'ফচক্কে'ও অবশ্যই কারণ সঞ্জাত—কিন্তু সে কারণ স্থূল অথবা লৌকিক নয়—কোনো এক অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে—

এই পর্যন্ত লিখে সন্দেহ হল, আপনারা আমাকে পাগল ভাবছেন নাকি? কিন্তু

শিক্ষাজগতের ভূত
সিলেবাসের বাইরে থেকে প্রশ্ন আসে
মডারেটর ধাক্কা সত্ত্বেও

'ফচক্কে' কোথায় নেই? চারপাশেও কি দেখতে পাচ্ছেন না?

কাগজে পড়লাম, দোরগোড়ায় দাঁড়ানো একটি কিশোরের গলায় আচমকা একটি কাচের বোমার টুকরো এসে বিঁধল। শুরু হল রক্তপাত—তৎক্ষণাৎ নিয়ে যাওয়া হল হাসপাতালে। সুদীর্ঘ সময় তাকে অ্যাটেন্ড করা হল না—হাজার অনুনয়েও কোনো ডাক্তার তাকে দেখলেন না, তারপর জানানো হল, যে-হেতু এই হাসপাতালে কোনো এমার্জেন্সী ওয়ার্ড নেই, সুতরাং এখানে এর চিকিৎসা হবে না।

ব্যাপার আরো কিছু আছে। কিন্তু নীট রেজাল্ট হল এই যে ছেলেটি মারা গেল। অথচ সময় মতো একটুখানি চিকিৎসা হলেই বারো বছরের ছেলেটির বেঁচে যাওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব ছিল না।

'ফচক্কে' ছাড়া কী বলব একে? হাসপাতালে যদি এমার্জেন্সিই নেই, তাহলে কেন ভর্তি করা হল ছেলেটিকে? আর

কোন এক প্রিয়ংবদাকে

সাধনা মুখোপাধ্যায়

তোমার আলাপে আমি যে প্রিয়ংবদা,
    শুনি তটিনীর কাঁকনের ধ্বনি কোন;
তোমার ভাষায় আমি যে মুগ্ধ সদা,
    তোমার কণ্ঠ যেন মধু গাঢ় ঘন।

সুর মানে হার কখনও স্বরের কাছে,
    এ তথ্যটুকু আগে তো ছিল না জানা,
মঞ্জুভাষিণী তোমার উক্তিগুলো,
    বহুবিহগীর উড্ডীয়মান ডানা।

তোমার দু' চোখ যেন রহস্য-দীঘি,
    ব্যাকুল মুখেরা চেয়ে দেখে বারবার,
কোন্ সে পুরুষ সে লীলা-সলিলে পেল,
    মীন হয়ে দিন কাটাবার অধিকার।

তোমার হাসিতে ফুলের হাসিও ম্লান,
    কোন চুম্বক আছে যে উৎসমুখে,
ঢেউগুলো তার টান দেয় দুর্বার,
    আশেপাশে-ঘোরা স্তাবকজনের বুকে।

নদী ও দীঘির সব লালিত্য নিয়ে,
    হে চারুবর্ণা তোমার ও রূপকথা
রচিত রয়েছে, নিয়তচপলা তুমি,
    অথচ হৃদয়ে তড়াগের অতলতা।

হে প্রাগৈতিহাসিক নারী

প্রতিমা সেনগুপ্ত

সান্ধ্যেচিত কোন রং-এর আড়ালে তুমি যাওনি,
তোমার ইভনিং ইন প্যারিসের চোখ যখন
শিশির দিয়ে ধোয়া ছিল।

শুকতারার মত দেখছিলে সেই পৃথিবীকে,
যখন দুটি নর-নারী
শুধু খেলত স্বর্গসুখের খেলা; সেই তেমন সময়ে
তোমার নিরাবরণ দেহে
অ্যাডমের চিন্তারাশি অনিত্য সুন্দরের প্রত্যয়ে স্থির।
ছিল সে কেমন অদ্ভুত সকাল।

তারপরে ?
এতদিনে সেই পুরাতন অনুভূতি, চলমান জীবনের চাকায় আটকে
এগিয়ে চলেছে।

গা থেকে ছিটকে পড়ছে যার লোভ, ক্ষোভ, ঘৃণা প্রতিহিংসা।
তবে ?
আবরণে যদি হীনতা—
নিরাবরণ হতে দোষ কি ?
কিন্তু শাপভ্রষ্টা—
তুমি তা হতে দিলে না, তোমার ভুলের মাসুল দিতে
দেখা হ'ল না সেই পুরাতন পুতুল খেলা—
অ্যাডম ইভের পৃথিবীকে,
যেখানে—
আজকের শিশুর পদক্ষেপে ফুটত না কাঁটার জ্বালা
আর মানুষ কোন দিন কাঁদত না ভালবাসার জন্যে।

ফাল্গুন রয়েছে ঝুঁকে

শান্তিকুমার ঘোষ

ফাল্গুন রয়েছে ঝুঁকে ব্রিজের মাথায়—
তার খচিত খিলানে, থামে—পাপড়ি পাতায়।
রূপালী রেলিঙে রেখে ভর
গানে-গানে সাড়া দেয় কারা পরস্পর।
নৌকা বেয়ে সুধীজন উঠে আসে তীরে
পিছু নাহি ফিরে;
ফেরিঘাট ভরে গেল পাহাড়ের গল্প আর
                                        সমুদ্র-গাথায়।

খ'সে পড়া ফুলদল স্রোত নিয়ে যাবে।
আজকের এরা নয় লোক সেই পুরানো কালের
        যদিও রেলিঙে হেলে আছে এক-ই ভাবে।
এ বছরও ঢালু জুড়ে ফেলেছে আঙুর
বিশ-বাঁও-জলে ছায়া অতুল ভুরুর:
রাঙা অস্তে নেশা করে ভামিনী সিঁদুর প'রে
                                        অনন্ত সিঁথায়।

ইতিহাস চিন্তা

অম্লান দত্ত

মানুষকে জীবনে মুখোমুখি দাঁড়াতে হয় জড় প্রকৃতির সঙ্গে, অপর মানুষের সঙ্গে, এবং আপন সত্তার সঙ্গে। এর ভিতর দিয়ে নানা সমস্যার উদ্ভব; এদের কেন্দ্র ক'রে নানা কার্যকলাপ: এই নিয়ে জীবন। এই সব বিভিন্ন কক্ষে মানুষের জীবন পরস্পর সম্পর্কহীন গতি নিয়ে চলে না। বরং এদের পারস্পরিক সম্পর্ক এমনই নিবিড় যে এই সামগ্রিকতাকে উপেক্ষা ক'রে ইতিহাসের ব্যাখ্যা অসম্ভব।

(১)

প্রগতি নিয়ে একটা পুরনো তর্ক আছে। মানুষ কি সত্যি এগিয়ে চলেছে? না কি সত্যযুগ থেকে কলিযুগ পর্যন্ত মানুষের ইতিহাস এক দীর্ঘ অধোগতির কাহিনী? আজকের মানুষ কি অতীতের মানুষের চেয়ে সুখী অথবা সত্যবাদী? প্রশ্নটা এইভাবে রাখলে তার কোনো সদর্থক উত্তর দেওয়া কঠিন। কিন্তু জড় প্রকৃতির উপর মানুষের কর্তৃত্বকে যদি প্রগতির মাপকাঠি বলে একবার মেনে নেওয়া যায় তা হলে বিশ শতকের মানুষ-যে উনিশ শতক থেকে এগিয়ে আছে এবং নানা উত্থান পতনের ভিতর দিয়ে ইতিহাসে যে লক্ষণীয় অগ্রগতি ঘটেছে, এ বিষয়ে তর্কের অবকাশ থাকে না।

ইতিহাস জুড়ে মানুষের সঙ্গে জড় প্রকৃতির একটা সংগ্রাম চলছে। এই সংগ্রামে মানুষের সবচেয়ে বড় সহায় বিজ্ঞান। এরই বলে মানুষ নব নব জয়ের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে। পৃথিবীর সর্বত্র এই অগ্রগতি সমানভাবে ঘটে নি। পিছিয়ে পড়া সমাজের সঙ্গে শিল্পোন্নত দেশের তুলনা ক'রে বিজ্ঞানের এই অগ্রগতি সম্বন্ধে একটা ধারণা করা সহজ। এই জাগতিক উন্নতিকে যদি কেউ প্রগতি বলে স্বীকার করতে না চান তবে তাঁকে একটি কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন: শিল্প ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে-দেশ পিছিয়ে থাকবে তার পক্ষে স্বাধীন দেশ হিসাবে টিকে থাকাই কঠিন। শিল্প ও বিজ্ঞানের বলে যে-দেশ বলীয়ান সে-ই আজ ইতিহাসের পথ প্রদর্শক। প্রগতির সংজ্ঞা নির্ধারণে এটাই শেষ কথা না-হতে পারে; কিন্তু সত্যের এই অংশটিকে উপেক্ষা করা ভুল।

যে-সমাজই বিজ্ঞানকে ঐহিক উন্নতির জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছে সেখানেই সকল শ্রেণীর লোকের জীবনযাত্রার মানের উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেছে। এ ব্যাপারে ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ভিতর মৌলিক পার্থক্যের চেয়ে তুল্যতাই বেশী। শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার সুযোগ ব্যাপকতা লাভ করে এবং শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পায়। সেই সঙ্গে জনসাধারণের খাদ্যে, বেশ-ভূষায়, চিকিৎসার ব্যবস্থায় ও অন্যান্য নানা দিকে উন্নতি লক্ষ করা যায়। ইংল্যান্ডের আর্থিক উন্নতির ইতিহাসে এই সব তথ্য গবেষকেরা মনোযোগের সঙ্গে লিপিবদ্ধ করেছেন। জীবনযাত্রার উন্নতি শিল্পোন্নয়নের গোড়ার দিকে তেমন স্পষ্ট না হলেও সব দেশেই অবশেষে অনিবার্য হয়ে ওঠে। সাধারণভাবে জীবনধারণের মানের উন্নতিই যদি আমাদের লক্ষ্য হয় তবে বিজ্ঞান ও শিল্পের উন্নয়নই তার প্রশস্ত পথ! সমাজের সকল স্তরে অবশ্য সমভাবে উন্নতি দেখা যায় না। অতএব স্বার্থের দ্বন্দ্ব থেকেই যায়—ধনতন্ত্রে তো বটেই, সমাজতান্ত্রিক দেশেও। শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের আয় যতটা বেড়েছে চাষীর আয় ততটা বাড়ে নি, এ ব্যাপার ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দেশ উভয় স্থলেই দেখা গেছে। কিন্তু এই সব বৈষম্য সত্ত্বেও যে-কথাটা আরও বড় তা হল এই যে, শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে সকল শ্রেণী ও স্তরের মানুষেরই জীবনযাত্রার মানের ক্রমশ উন্নতি ঘটে।

কথাটা তবু বড় বেশী সরল ক'রে বলা হল। শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রার একটা গুণগত পরিবর্তন ঘটে। জড় প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক বদলালে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধেও পরিবর্তন দেখা দেয়। শুধু মাথাপিছু আয়ের হিসাবে এই পরিবর্তন ব্যক্ত করা যায় না। যাত্রা ও থিয়েটারের ভিতর যেমন একটা চারিত্রিক পার্থক্য আছে গ্রামীণ ও নাগরিক সমাজের ভিতরও তেমনই। জীবন-যাত্রায় যদি গুণগত পরিবর্তন দেখা দেয় তবে দুয়ের ভিতর উচ্চনীচ বিচার কি করে সম্ভব? ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এই প্রশ্নের একটি সহজ উত্তর আছে। দুই ভিন্ন জীবন-

যাত্রা যখন মুখোমুখি দাঁড়ায় তখন সেই সংঘর্ষে যেটি শেষ পর্যন্ত জেতে সেটিই ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে "উন্নত"। আমেরিকার ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের সমাজ বিজয়ী অতএব "উন্নত", প্রাচীন অধিবাসীদের জীবনযাত্রা "অনুন্নত", কারণ সে পরাভূত।

(২)

মানুষের সঙ্গে মানুষের তিন প্রকার সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। প্রথমটির নাম দেওয়া যেতে পারে আত্মীয় সম্পর্ক; দ্বিতীয়, ব্যবহারিক বা ব্যবসায়িক সম্পর্ক; তৃতীয়, আগ্রাসী সম্পর্ক। প্রথমটির সহজ উদাহরণ, পিতামাতার সঙ্গে সন্তান-সন্ততির সম্পর্ক। কিন্তু এটিকে রক্তের সম্পর্কের চেয়ে আরও ব্যাপক ও বৃহৎ অর্থে ধরা সম্ভব। যেখানেই আমরা অপরকে একটি সম্প্রসারিত "অহং"-এর অন্তর্ভুক্ত করি সেখানেই তার সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপিত হয়। আত্মীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমরা অপরের স্বার্থকে নিজের স্বার্থের অংশ হিসাবে গণ্য করি; অতএব অপরের আনন্দে আনন্দ ও অপরের দুঃখে দুঃখ অনুভব করি, অপরের গর্বে গর্বিত ও অপরের অপমানে অপমানিত বোধ করি। ব্যবসায়িক সম্পর্কের ক্ষেত্রে দুই পক্ষ নিজ নিজ স্বার্থ স্বতন্ত্রভাবে গণনা করে। নিজের স্বার্থেই কেউ ক্রয় করে ও নিজেরই বিক্রয় করে; নিজের ও অপরের স্বার্থের যোগফলে কোনো পক্ষেরই মাথা ব্যথা নেই। একপক্ষ যখন মনে করে যে এই সম্পর্কে তার কোনো স্বার্থ নেই তখন ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিন্ন হয়। আগ্রাসী প্রচেষ্টার বৈশিষ্ট্য এই যে, দুই পক্ষ এখানে স্বেচ্ছায় পারস্পরিক সম্বন্ধে আবদ্ধ নয় বরং একপক্ষ উপস্থিত অন্য পক্ষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। উদাহরণত ডাকাত ও গৃহস্থের ভিতর সম্পর্কটা ব্যবসায়িক নয়; বরং আগ্রাসী নামেই একে চিহ্নিত করা চলে। বাস্তবজীবনে এই তিন সম্পর্কের নানাপ্রকার সংমিশ্রণ দেখা যায়, কিন্তু বিশ্লেষণের সুবিধার জন্য এই পৃথকীকরণ প্রয়োজনীয়।

ইতিহাসের একটি পর্যায় ছিল যখন যুদ্ধে পটু যাযাবর গোষ্ঠীর আক্রমণে প্রাচীন সমাজ ও সভ্যতা বারবার পর্যুদস্ত হয়েছে। চীনে এই আক্রমণকারীরা এসেছে সাধারণত উত্তর দিক থেকে; ভারতে এদের আবির্ভাব হয়েছে উত্তর পশ্চিমের গিরিপথ ভেদ করে; পশ্চিমী দেশগুলিতে আক্রমণ ঘটেছে উত্তর অথবা পূবের কোণ থেকে। আক্রান্ত সমাজ অনেক সময়েই সভ্যতার মাপে খাটো ছিল না। কিন্তু সেই সমাজের অভ্যন্তরে ঐক্য ছিল দুর্বল, ভেদাভেদ প্রবল; আর অভিজাতবংশীয় নেতারা ছিলেন বিলাসে ও পারস্পরিক অসূয়ায় শক্তিহীন। আক্রমণকারীদের সাহস ও নিষ্ঠুরতার কাহিনী ইতিহাসে সুবিদিত; কিন্তু যে-বৈশিষ্ট্যটি আরও মৌল তা হল দল ও দলপতির ভিতর একটা প্রবল পারস্পরিক আনুগত্য বা আত্মীয়তাবোধের বন্ধন।

বাবরের আত্মজীবনী থেকে একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে তিনি একবার দলবল সহ পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন। ঘুরতে ঘুরতে সবাই অবশেষে একটি গুহার মুখে এসে পৌঁছলেন। তখন ভয়ানক বরফ পড়ছিল। এর পরের ঘটনা বাবরের নিজের ভাষাতেই ইংরেজী অনুবাদে তুলে দিচ্ছি:

Some urged me to go into the cavern, but I thought that I ought not to be in shelter and lie down at ease while my men were in misery shivering in the drift .... There is a Persian proverb, "Death in the company of friends is a feast." (The Life of Baber, by R. M. Caldecott, 1844, p. 117).

এই-যে নিজের স্বাচ্ছন্দ্যের চেয়েও অনুগামীদের সঙ্গে মৃত্যুবরণকেই রমণীয় বোধ করা এটাই উদ্ধৃত বাক্যে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এটিকে একটি অসাধারণ ব্যক্তি-মাত্র মনে করলে ভুল হবে। ইবন খালদুন তাঁর বৃহৎ ঐতিহাসিক গ্রন্থের ভূমিকায় আক্রমণকারী উপজাতীয় গোষ্ঠীদের ভিতর সুদৃঢ় সংহতিবোধ ও আনুগত্যের ভাবটি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। আধুনিক যুগের ইতিহাসেও এর নজির দুর্লভ নয়।

রাষ্ট্রের সঙ্গে কৃষক ও শিল্পজীবীদের পারস্পরিক সম্পর্ক [illegible]। বিভিন্ন পর্যায়ে এই সম্পর্কের প্রকারভেদও লক্ষণীয়। ভারতের সঙ্গে বাবরের সম্পর্ক ছিল আগ্রাসী। কিন্তু রাজ্য স্থাপনের পর আগ্রাসী সম্পর্কও ধীরে ধীরে আইনকানুন ও প্রতিষ্ঠানের ভিতর রূপ নিতে [illegible]। ক্ষমতা [illegible] নিরবচ্ছিন্ন অধিকারে। এখানেই অবশ্য ক্ষমতার [illegible] অবসান নয়। [illegible] ব্যবসায়িক [illegible] দেখা [illegible] সেই সঙ্গে আবার স্বীকৃত নিয়ম ও আচারের প্রতিষ্ঠা হয়। যেমন ধরা যাক সম্রাটের সঙ্গে সুবেদারের সম্পর্ক; সম্রাট যখন ক্ষমতাবান, সুবেদারও অনুগত [illegible]। অথচ কেন্দ্রীয় শাসন [illegible] দুর্বল হলেই সুবেদারের আনুগত্য অনিশ্চিত। রাজার প্রতাপ অবশ্য এরই সঙ্গে জড়িয়ে আছে, যদিও সেটা অনেক সময় তুলনায় গৌণ। আবার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও বহিঃশত্রুর আক্রমণে [illegible] নিরাপত্তা যখন গুরুতরভাবে বিপন্ন [illegible] তখন ব্যক্তিজীবনের পক্ষে [illegible] সেই সঙ্গে বড় রকমের পরিবর্ত

চেষ্টাও অবিরত চলেছে; এবং এই তিনের অসামঞ্জস্যে উদ্ভূত শক্তি ইতিহাসের একটি প্রধান নিয়ন্তা।

বাণিজ্যের পরিধির সঙ্গে আগ্রাসী উপায়ে রাজদণ্ডকে মিলাতে গিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পত্তন। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সকল অংশকে ধর্ম অথবা সংস্কৃতির একসূত্রে বাঁধা সম্ভব ছিল না। অথচ জাতীয় ঐক্যবোধের স্বাভাবিক গণ্ডিকে অতিক্রম করে সাম্রাজ্যকে দীর্ঘ দিন বাঁচিয়ে রাখা কঠিন। আবার রাষ্ট্রের সীমানা যদি আত্মীয়তাবোধকে খণ্ডিত করে তবে সেই সীমানাও শেষ অবধি মুছে যাবার সম্ভাবনা। পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানির ভিতর আত্মীয়তার একটা স্বাভাবিক বন্ধন আছে। রাজনীতি যদি একদিন জর্মানিকে বিভক্ত করে থাকে তো জাতীয়তাবোধ সম্ভবত তাকে পুনর্মিলিত করবে। এ বিষয়ে প্রাচীন ইতিহাসের সাক্ষ্য স্বভাবতই অস্পষ্ট তবু অর্থব্যঞ্জক। বাণিজ্যের রেখা ধরে অগ্রসর হয়ে লুণ্ঠন ও রাজ্যজয়ের আঘাতে দিগ্বিজয়ী বীরেরা কখনও কখনও বাণিজ্যকে সংহার করেছেন বটে। কিন্তু সাম্রাজ্যই আবার শান্তির রক্ষক হিসাবে বাণিজ্যকে উজ্জীবিত করেছে। সেই সঙ্গে বিশাল সাম্রাজ্যকে একই ধর্মের বন্ধনে আবদ্ধ করবার চেষ্টাও বারবারই দেখা গেছে। এমনি করে আত্মীয়শক্তি, আগ্রাসী শক্তি এবং ব্যবসায়িক সম্পর্কের ঘাত-প্রতিঘাতে ইতিহাসের পথ রচিত হয়েছে।

ভারতবর্ষের ইতিহাসকেও এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা সম্ভব। দিল্লী থেকে রাজ্যের সীমা বারবার ছড়িয়ে পড়েছে গুজরাত ও বাংলার উপকূল পর্যন্ত; আর বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পর্কস্থাপনে সাম্রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে অনিবার্যভাবে এক নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। বাবরের কথা আগেই বলেছি। তিনি যখন উত্তর ভারতে রাজ্যস্থাপন করেন তখন এ দেশের প্রতি তাঁর কোনো আত্মীয়তাবোধ ছিল না। এ দেশের জলস্থল ও মানুষ তাকে মুগ্ধ করেনি। এ দেশের ধর্মকে তিনি বিধর্ম বলে জানতেন; রাণা সংগের বিরুদ্ধে যুদ্ধকালে তিনি অনুগামীদের উদ্দেশ্যে যে ভাষণ দেন তাতে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। এসব কথা তাঁর স্মৃতিচারণে লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু সে সংকীর্ণ আত্মীয়তাবোধ বাবরকে যুদ্ধে জয়ী হতে সাহায্য করেছে সাম্রাজ্যকে স্থায়ী করবার পক্ষে সেটা যথেষ্ট ছিল না। আকবর বুঝেছিলেন যে, রাজশক্তিকে একটি বৃহত্তর জাতীয় ঐক্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। জিজিয়া করের বিলোপের ভিতর দিয়ে তিনি বিজয়ী ও বিজেতাদের ভিতর অপমানের ব্যবধান দূর করতে চেয়েছিলেন। রাজস্বকে আইনের শাসনের উপর প্রতিষ্ঠিত করবার গুরুত্বও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু এও যথেষ্ট নয়। আকবর একথা জানতেন যে, বৃহত্তর ঐক্যবোধের জন্য আরও গভীর কিছু চাই। একটি সম্প্রসারিত ও সমন্বয়াকাঙ্ক্ষী ধর্মবোধের ভিত্তিতে তিনি ভারতের ঐক্যকে স্থাপন করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তাঁর স্বপ্নসন্তানরূপে জন্ম নিয়েছিল একটি উপাসনাগৃহ, যেখানে সকল ধর্মমতের মানুষ হৃদ্যতাপূর্ণ আলোচনার জন্য স্বচ্ছন্দে সম্মিলিত হতে পারতেন।

আকবরের সেই উদারনীতি সফল হয়নি। শাহজাহানের সময় থেকেই স্রোত অন্য পথে বইতে লাগল। ধর্মসমন্বয়ের ভিত্তিতে ভারতে মহাজাতি গঠিত হল না। এর পরিণাম ভারতবর্ষের পরবর্তী ইতিহাসে সুস্পষ্ট। কিন্তু পরিণাম স্পষ্ট হলেও এই ব্যর্থতার কারণ আমরা নির্মোহ মনে অনুসন্ধান করিনি।

আত্মীয়তাবোধের বিস্তারের পথে যেসব বাধা দেখা দেয় তাদের মূলে অনেক সময়ে সুদূর অতীতে নিহিত থাকে। ব্যবসায়িক বুদ্ধির ঘোরফের বর্তমানকে নিয়ে; অতএব
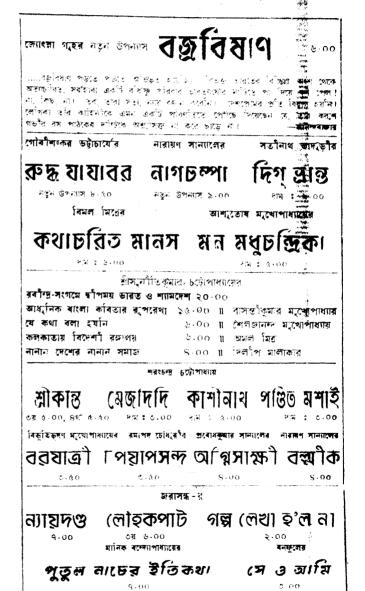
শুধু আর্থিক কারণ দিয়ে সাম্প্রদায়িকতার ব্যাখ্যা হয় না। ইতিহাসে সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এই কথাটা মনে রাখা ভালো। ধর্ম একদিন বাণীরূপে আমাদের ক্ষুদ্রতা থেকে উদ্ধার করে; ধর্মই আবার আচাররূপে আমাদের ক্ষুদ্রতায় আবদ্ধ করে।

পৌত্তলিকতায় অভ্যস্ত আরবের বিভিন্ন উপজাতিকে মহম্মদের বাণী একদিন বৃহত্তর ভ্রাতৃত্বে উন্নীত করেছিল। ইসলামের অনমনীয় পৌত্তলিকতাবিরোধী চিন্তাই আবার হিন্দু ধর্মের সঙ্গে সমন্বয়সাধনের পথে অন্তরায় হয়েছে। অথচ সাম্প্রদায়িক আনুগত্যকে সম্প্রীতির ওপরে স্থান দিলে সম্প্রদায়কেই ভগবানের ঊর্ধ্বে স্থাপন করা হয়; এবং এটাও গভীরার্থে পৌত্তলিকতারই ভিন্নরূপ। হিন্দুদের বিশুদ্ধ ধর্মচিন্তা উদার; কিন্তু আচারের ক্ষেত্রে কয়েকটি মারাত্মক বৈশিষ্ট্য আছে। দৈহিক পবিত্রতা সম্বন্ধে একটি বিশেষ ধারণা হিন্দু সংস্কৃতির অচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। এরই প্রভাবে অস্পৃশ্যতাবোধ হিন্দু মনের গভীরতম স্তরে পর্যন্ত প্রবেশ করেছে। মুসলমানকে হিন্দু দৈহিক অর্থে অপবিত্র জ্ঞান করে। হিন্দু ও মুসলমানের ভিতর প্রকৃত আত্মীয়তাবোধের পথে এটা সাংঘাতিক বাধা। এ বিষয়ে হিন্দুরা এমনই নির্বিকার যে, এই অমানুষিক অবস্থাটাকে তারা অমানুষিক বলে চিনতেও প্রস্তুত নয়। যে জড় অপবিত্রতাবোধ আমাদের মানবিক ভ্রাতৃভাবকে আচ্ছন্ন ও খণ্ডিত করেছে তাকে আমরা নির্মম ও প্রশ্নাতীত প্রত্যয়ের সঙ্গে ধর্মের অঙ্গ বলে মেনে নিয়েছি।

সাম্প্রদায়িকতাকে আমরা যদি কায়েমী স্বার্থের প্রতিবিম্বমাত্র মনে করি তবে এর স্বরূপ বোঝা যাবে না; এর সমালোচনাও ব্যাপ্তি এবং গভীরতায় অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। হিন্দু ও মুসলমানের ভিতর অস্পৃশ্যতার ব্যবধান যদি শুধু ব্যবসায়িক বুদ্ধির সৃষ্টি হত তবে একে দূর করাও অপেক্ষাকৃত সহজ হত। এটা মনের আরও গভীরে প্রোথিত বলেই একে উন্মূল করা এত কঠিন। এ কথা শুধু হিন্দু মুসলমানের বিরোধ সম্পর্কেই সত্য নয়। শিল্পোন্নয়ন সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃষ্ণাঙ্গবিদ্বেষ অব্যাহত। পূর্ব ইয়োরোপের কম্যুনিস্ট দেশগুলিতেও সমাপ্ত হয় নি ইহুদীবিদ্বেষ। জাতি ও ধর্মকে কেন্দ্র করে মানুষে মানুষে পারস্পরিক আকর্ষণ ও বিকর্ষণ বারবারই এমন আকার ও তীব্রতা লাভ করেছে, ব্যবহারিক যুক্তি দিয়ে যার অর্থ উদ্ধার হয় না। সংকীর্ণ আত্মীয়তাবোধ ও মানুষের বাস্তব প্রয়োজনের মধ্যে যে অমিল তাকে অতিক্রম করবার জন্য প্রয়োজন চিন্তায় যে-বিপ্লব, সেটা কোনো আর্থিক পরিবর্তনের ফলমাত্র নয়।

(৩)

মানুষের দুটি পরিচয়। একদিকে সে সামাজিক সম্পর্কে আবদ্ধ এবং এই সব সম্পর্ক দ্বারা তার সত্তা নির্ধারিত। তার একটি দ্বিতীয় পরিচয় আছে যা তাৎক্ষণিক সামাজিক সম্পর্ককে অতিক্রম করে যায়। কোনো কোনো সমাজবিজ্ঞানী ইতিহাসের ব্যাখ্যায় মানুষের এই দ্বিতীয় পরিচয়কে উপেক্ষা করেছেন। কিন্তু এটা ভুল। মানুষের গভীরতর আকাঙ্ক্ষা—আশা ও হতাশা—সামাজিক সম্পর্কের ভিতর সংক্রামিত, অথচ এই সব সম্পর্কদ্বারা সীমায়িত নয়।

মানুষের যে সত্তা সংগঠনের অতীত তাই আবার নিগূঢ়ভাবে সমাজে ও আত্মীয়তাবোধে প্রবিষ্ট। আত্মীয়তাবোধের দুটি বিপরীত মেরু আছে : জীবধর্ম ও আত্মজ্ঞান। জীবধর্মের স্বাভাবিক প্রকাশ পারিবারিক বন্ধনে। আত্মজ্ঞান বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার ক্ষেত্র এটা নয়। এ প্রসঙ্গে একটিমাত্র সূত্রই এখানে আলোচ্য। বৃহৎ সমাজ ও সংগঠনে ব্যক্তিকে বিভিন্ন কর্ম ও পদে চিহ্নিত করা আবশ্যক হয়। বৃত্তি ও পদের দ্বারা সমাজে ব্যক্তির বিশেষ পরিচয়। এই সব বিশেষ চিহ্ন থেকে বিচ্ছিন্ন করলে ব্যক্তির একটি সামান্য পরিচয় অবশিষ্ট থাকে। আমি অমুক অফিসের কেরানী, প্রহরী অথবা পরিচালক, এই বিশেষ পরিচয় আমার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া যায়। কিন্তু আমি বাঙালী, ভারতীয় অথবা মানুষ এই পরিচয় আমার একান্ত অন্তরঙ্গ, এমন কি অবিচ্ছেদ্য। এই সামান্য পরিচয়েই গোষ্ঠীর সঙ্গে ব্যক্তি বৃহৎ আত্মীয়তার সূত্রে বা আত্মার বন্ধনে আবদ্ধ।

আত্মপরিচয়ের বিভিন্ন স্তর আছে; আত্মীয়তাবোধেরও তেমনই ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বহু বৃত্ত আছে। শুদ্ধ জ্ঞানের দৃষ্টিতে আত্মীয়তাবোধের কোনো সীমা নেই। কিন্তু এই নিরাকার সাম্যবোধ সাধারণ ব্যবহারের সামগ্রী নয়। কর্মে ও অনুভূতিতে সত্য করে তুলতে হলে একে একটি আধারে স্থাপন করতে হয়, অতএক সীমায় বাঁধতে হয়। ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতির উপাদানে এই আধার রচিত হয়। ঐতিহাসিক আত্মীয়তাবোধ একদিকে স্থানে কালে সীমায়িত ও সংস্কারবিদ্ধ, অন্য দিকে মানবিক ভ্রাতৃত্ববোধের অস্পষ্ট কল্পনায় অনুরঞ্জিত। সাধারণ অবস্থায় এই আত্মীয়তাবোধ সমাজের সংহতি রক্ষায় সহায়ক। কিন্তু এই আধারেই আবার সেই আদর্শেরও উদ্ভব যুগপরিবর্তনের সময় যাকে প্রাচীন সমাজের নিয়মবন্ধন ও পদবৈষম্যের বিরুদ্ধে অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হতে দেখি।

সমাজে নানা কারণেই সংঘর্ষ ঘটা সম্ভব। অধিকাংশই ক্ষেত্রেই এর কিছু আর্থিক কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু অসন্তোষ যখন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ব্যক্তিগত কলহের সীমা ছাড়িয়ে নতুন সমাজ গঠনের আন্দোলনে পরিণত হয় তখন সামাজিক দ্বন্দ্ব ধর্ম ও মানবতাবোধের বিভিন্ন বয়ানের ভিতর সংঘাতের রূপ ধারণ করে। এটাকে নিছক ভণ্ডামি বিবেচনা করা ভুল। গৃহযুদ্ধে ব্যক্তির শুধু বিশেষ পরিচয়ই নয়, তার সামান্য পরিচয়ও বিপন্ন হয়—যেমন বিপন্ন হয় ভ্রাতৃহন্তার ভ্রাতৃপরিচয়। তখন আত্মপরিচয় রক্ষার জন্য ব্যক্তিকে ধর্ম অথবা আদর্শের পতাকা নতুন করে তুলে ধরতে হয়, নয় তো সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার আশ্রয় নিতে হয়। যুগ পরিবর্তনের মুখে শাসকগোষ্ঠীও দ্বিধা (অথবা বহুধা) বিভক্ত হয়। সামাজিক বিপ্লব একটি বিরাট পারিবারিক সংঘর্ষের আকারে দেখা দেয়। বিপ্লবের পর ব্যক্তিকে আবারও তার সামান্য পরিচয়ের সূত্রে একটি বৃহৎ সংহতিতে স্থাপন করতে হয়।

আর্থিক কারণে কখনও কখনও সামাজিক সংহতির পুরনো সীমারেখা অতিক্রম করা বাঞ্ছনীয় হয়ে ওঠে। যেমন হয়েছিল আরব দেশে মহম্মদের তৎকালীন সমাজে। কিন্তু শুধু স্বার্থবুদ্ধি দিয়ে বৃহত্তর ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করা যায় না। ব্যবসায়িক বুদ্ধির দ্বারা আরবের উপজাতিগণ ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ হয়নি; মহম্মদের ধর্মের আহ্বানেই সেটা সম্ভব হয়েছিল। উদাহরণ ছেড়ে এবার তত্ত্ব হিসাবে কথাটা বলা যাক। আত্মীয়তাবোধের সংকীর্ণ বৃত্ত থেকে কোনো সরল রেখা ধরে বৃহত্তর বৃত্তে প্রবেশ করা যায় না। সেজন্য প্রয়োজন প্রথমে স্বীকৃত সংস্কার থেকে ব্যক্তির পরিচয়কে মুক্ত করে শূন্যতায় আরোহণ, তারপর সেই শূন্যতা থেকে নতুন বিশ্বাসের রেখা ধরে সংসারে অবরোহণ। আমরা যখন শুধুই সংস্কারে আস্থা হারিয়েছি, নতুন কিছু লাভ করিনি, তখনকার সেই শূন্যতা কি ভয়ঙ্কর, কত সহজে তা হতাশায় অথবা হিংসায় ভরে ওঠে, সেটা উপলব্ধি করা আজ কঠিন নয়। কিন্তু এর অতিরিক্ত প্রীতি ও বিশ্বাস সাধারণ অর্থে যুক্তি অথবা ব্যবসায়িক বুদ্ধি থেকে লাভ করা যায় না।

এ যুগে শিল্প, বাণিজ্য ও যানবাহনের উন্নতির ফলে যে-অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তাতে সারা পৃথিবী জুড়ে এক যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পক্ষে যুক্তি আজ প্রবল। অথচ জাতীয় সংহতির পুরনো সীমারেখা অতিক্রম করা যে কত কঠিন তাও এই মুহূর্তে আমাদের কাছে বেদনাদায়কভাবে স্পষ্ট। ধনতন্ত্রই জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষের মূল কারণ এই অলীক ধারণা আজ ধূলিসাৎ। আণবিক বোমায় সর্বাত্মক ধ্বংসের ভয়কে সত্য জেনেও আমরা জাতীয় বিদ্বেষ অতিক্রম করে বৃহত্তর মানবতাবোধকে আত্মরক্ষার পথ বলে গ্রহণ করতে পারছি না। পৃথিবীর রাজনীতিতে মানুষের ধর্ম এখনও স্বীকৃত হয়নি। কখনও স্বীকৃত হবে কিনা আমরা জানি না।

ইতিমধ্যে ইতিহাস থেমে নেই, থেমে থাকবে না। আগেই উল্লেখ করেছি যে, শিল্প ও বাণিজ্য পৃথিবীকে এক সূত্রে গেঁথেছে। একথা আজ নয়, গত শতাব্দীর প্রথম ভাগেই মার্ক্স লক্ষ করেছিলেন তাঁর তরুণ বয়সের "জর্মান আইডিওলজি" গ্রন্থে। এরই সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সারা পৃথিবীতে এক সরকার গঠনের স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করবার চেষ্টাও শুরু হয়েছে বহুদিন থেকে। সাম্রাজ্যবাদকে কেউ কেউ বিশ্বরাষ্ট্র গঠনের দিকে পদক্ষেপ বলেছেন। কিন্তু কার্যত সাম্রাজ্যবাদ জাতীয়তাবাদকেই শক্তিশালী করেছে। গত অর্ধ শতাব্দীর অভিজ্ঞতার ফলে বিশ্বরাষ্ট্র গঠনের কয়েকটি শর্ত আজ আমরা আগের চেয়ে খানিকটা স্পষ্টভাবে জানি। দুর্বল জাতিসংঘ যুদ্ধ থামাতে পারেনি। যতদিন না মানুষের আগ্রাসী অর্থাৎ সামরিক শক্তি আরও বেশী পরিমাণে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের হাতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে, ততদিন পৃথিবীতে যুদ্ধের অবসান আশা করা যায় না। অপর পক্ষে সারা বিশ্বে এক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলেও মানুষের ছোট ছোট আত্মীয়তাবোধের বৃত্তগুলি মুছে ফেলা যাবে না: সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বহুত্ব ও বিকেন্দ্রিকতা রক্ষা করতে হবে। এবিষয়ে ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করবার আছে। যুক্তি যদি-বা নিরাকার ব্রহ্মের ইঙ্গিত বহন করে, সংস্কৃতি মাত্রই "পৌত্তলিক"। মানবতাবোধ এক হলেও তার প্রকাশ অনিবার্যভাবে বহুত্বে চিহ্নিত। অর্থনীতির স্থান এ দুয়ের মাঝামাঝি। এক জাতীয় উদ্যোগ আছে যার পরিধি প্রধানত স্থানীয়, সেখানে নিয়ন্ত্রণও স্থানীয় হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আবার এমন উদ্যোগও আছে, যার পরিধি বিশ্ব-ব্যাপী। অতএব আর্থিক ক্রিয়াকাণ্ডে সামরিক সংগঠনের তুল্য কেন্দ্রীকরণ সমর্থনযোগ্য নয়: আবার সম্পূর্ণ বিকেন্দ্রী-করণও সম্ভব নয়। তবে বিকেন্দ্রীকরণের দিকে ঝোঁক রেখেই পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে যাওয়া প্রয়োজন।

এই বাস্তব বিন্যাসের ভিতরই আশা করা যায়, মানুষ তার স্থানীয় পরিচয়ের সঙ্গে বিশ্বপরিচয়ের অবশেষে একটা সমন্বয় বিধান করতে পারবে। তা যদি না হয় তো আমাদের এই সর্বাধুনিক সভ্যতা বিগত সমস্ত সভ্যতাকে পরাভূত করবার পর আত্মঘাতে বিনষ্ট হবে। পৃথিবীর পক্ষে যা সত্য এদেশের পক্ষেও তাই। যেটা সারা পৃথিবীর বাঁচবার পথ সেটাই আজ ভারতেরও বাঁচবার পথ। সেজন্য চাই বিজ্ঞানের সাধনা এবং ক্ষুদ্র জাতিভেদ ও সাম্প্রদায়িকবুদ্ধির ঊর্ধ্বে বৃহত্তর মানবতার প্রতিষ্ঠা।

রম্ভা

সুশীল রায়

সমুখে ভীষণ আর ভয়ংকর এক বিরাট অন্ধকার অজস্র আলোর ফুলঝুরি নিয়ে আস্ফালন করে চলেছে। বিশাল এলাকা জুড়ে তার এই ভীষণ সমারোহ।

সমুদ্র দেখতে এসেছে তারা দল বেঁধে। প্রথমে তারা প্ল্যান করেছিল অন্য রকম। তারা রম্ভায় বেড়াতে যাবে ভেবেছিল। সেখানে ঘাঁটি করে তারা চিল্কা হ্রদে নৌ-বিহার করবে—এই ছিল তাদের ইচ্ছে।

কিন্তু চিল্কা এলাকায় যখন ট্রেন পৌঁছল রাত তখন গভীর। এই অন্ধকার রাত্রে অজানা জায়গায় নেমে পড়া বিশেষ বুদ্ধিমানের কাজ হবে না বলে হঠাৎ মন্তব্য করে বসল মনোজ।

মনোজ কথা কম বলে, তাই তার কথার ওজন থাকে। তার মন্তব্য শোনা মাত্র দলের সকলের যেন হঠাৎ চৈতন্য হল। তারা তখনই বুঝে ফেলল কথাটা ঠিক।

সুতরাং ট্রেন থেকে নামার দরকার নেই। অতিরিক্ত ভাড়া যা লাগবে তা তারা দিয়ে দেবে। কিন্তু কোথায় নামবে তা ঠিক হলে তবেই ঐ অতিরিক্তের প্রশ্ন।

তারা বেহরামপুরে নেমে পড়েছিল। সেখান থেকে চলে এসেছে এই গোপালপুরে।

আসলে, কোনো বিশেষ জায়গাকে কেন্দ্র করে তারা কিছু ভাবেনি। পাঁচ বন্ধুর এই পঞ্চপাণ্ডব বের হয়েছে কেবল মাত্র ভ্রমণের অভিযানে।

গোপালপুরে এসে সমুখে অমন একটা সমুদ্র পেয়ে তারা যেন ধন্য হয়ে গেল।

সমুদ্র তারা আগেও দেখেছে, এটা নতুন কিছু না। পুরীতে দেখেছে, দীঘায় দেখেছে। কিন্তু এখানকার সমুদ্র যেন একেবারে আলাদা জিনিস।

মনোজ একটু শান্তশিষ্ট প্রকৃতির মানুষ। সব ব্যাপারের মধ্যে আছে, কিন্তু কোনো-কিছুতেই যেন জড়িয়ে নেই।

সে বলল, "দ্যাখ বিল্টু। এ সমুদ্র যেন একটু আন্‌সফেস্টিকেটেড। গ্রাম্য বলব না, কিন্তু একটু একটু যেন গ্রামীণ গ্রামীণ ভাব এর সর্বাঙ্গে।"

একটু থেমে বলল, "হরেকৃষ্ণবাবু একদিন বলছিলেন, চণ্ডীদাসের রাধা শহুরে রাধা, কিন্তু বিদ্যাপতির রাধা গ্রামের মেয়ে।"

বিষ্ণুপদ যেন ঠিক বুঝে ফেলল। অনাদি, দীরেশ, আর মতিলাল একটু তফাতে ছিল, তাদের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, "এই—এই, মনোজ তো একেবারে মোহিত। প্রেমে পড়ে গিয়েছে।"

"কার, কার?"

"গ্রামের রাধার।"

"সে আবার কে?" ওরা এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। জালিয়া যুবতীর দল চলেছে বালুতে পা ডুবিয়ে-ডুবিয়ে সমুদ্রের কিনার-বরাবর, তাদের দিকে তাকাতে লাগল তারা।

বিষ্ণুপদ বলল, "ওদের মধ্যের কেউনা। এই সমুদ্র।"

মনোজ একটু বেরসিক টাইপের মানুষ। তার জীবনে প্রেম নামক কোনো বস্তু যে থাকতে পারে, এ কথা বিশ্বাস করাই কঠিন। সমুদ্রের হোক বা যারই হোক—সে যে প্রেমে পড়েছে, এইটেই যেন তাদের কাছে বেশ উৎসাহের ও আশ্বাসের ব্যাপার। ওরা বেশ হাসাহাসি করতে লাগল।

কিন্তু সমুদ্রের কিনারে এইভাবে দাঁড়িয়ে কবিত্ব করলে তো আর চলবে না। থাকার একটা জায়গা যোগাড় করাই হচ্ছে সর্বপ্রথম দরকার।

এসব ব্যাপারে কর্মিৎকর্মা হচ্ছে বীরেশ আর মতিলাল। ওরা এদের তিনজনকে অপেক্ষা করতে বলে সমুদ্রকে পিছনে রেখে উঠে গেল ডাঙার দিকে।

তার গেল তো গেলই। ওদের আর ফেরার মতলবই যেন নেই—এই রকম মনে হল এদের। এরা রোদ মাথায় করে সমুদ্রের আস্ফালন দেখতে লাগল। মাথায় তেকোণা টুপি পরে ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই করছে এক পাল মানুষ। সমুদ্রের সঙ্গে ওদের বোধ হয় আত্মীয়তা হয়ে গিয়েছে।

অনেকক্ষণ বাদে আবির্ভাব ঘটল ঐ যুগলের—বীরেশের আর মতিলালের। উঁচু পাড়ে দাঁড়িয়ে ওরা ইশারা করে এদের ডাকতে লাগল।

মনোজকে ব্যঙ্গ করে কবিত্ব করার মতন করে বীরেশ বলল, "মহাসমুদ্রে ভেসে বেড়াচ্ছিলাম, এবার বুঝি জীবনে তরে কোন্ঠের করা গেল।" বলে সে হাসতে লাগল।

অর্থাৎ, ডেরা তারা পেয়েছে। অদ্ভুত সুন্দর একটা বাসা। তার নাম নাকি আংকর।

নামটা সার্থকই বটে। একেবারে সমুদ্রের ঢেউয়ের লাগোয়া ছোট্ট বাড়িটা। সমুদ্রের এত ঘনিষ্ঠ-কাছে দ্বিতীয় আর কোনো বাড়ি নেই। এ-তল্লাটে।

ওরা সকলে মিলে বাড়িটা যখন দেখল তখন একেবারে যেন অবাকই হল তারা।

বাসাটা বড় না। তিনখানা ঘর পাশাপাশি। সমুদ্রের দিকে প্রাচীর। প্রাচীরের নীচেই বালুর স্তূপ জমা হয়ে আছে। ঠিক বালিয়াড়ি বলা না গেলেও অনেকটা তারই মতন। ঐ বালুর স্তূপ পর্যন্ত ঢেউয়ের জল চলে আসে গড়িয়ে। অর্থাৎ, বিরাট ঢেউ যখন আছড়ে খেয়ে এসে পড়ে সমুদ্রের কিনারে, তখন তার ফেনা চলে আসে এই প্রাচীর পর্যন্ত। ও ধাক্কাতেই বোধ হয় প্রাচীরের কিছুটা অংশ ভেঙে নেমে গিয়েছে।

এই বাড়ির নাম আংকর।

নামটা মন্দ হয় নি। একেবারে নোঙরই বটে। সমুদ্রকিনারে ঠিক নোঙরেরই মতন বাঁধা আছে।

মনোজ তো মোহিত।

কিন্তু মোহিত হয়ে বসে থাকলেই তো চলবে না। সমুদ্রের দৃশ্য দেখে আর সমুদ্রের হাওয়া খেয়ে তো জীবন বাঁচবে না। সুতরাং বাঁচার ব্যবস্থা কিছু করা দরকার।

কিন্তু যে দলে বীরেশ আছে আর মতিলাল আছে, তাদের আর ভাবনা থাকার কথা না।

মনোজ ঘুরে-ঘুরে বাড়িটা দেখতেই ব্যস্ত হয়ে গেল। কিন্তু ঘরে ঘরে নিজেদের টুকিটাকি জিনিসপত্র রেখে জীবনধারণের ব্যবস্থা করার জন্যে বের হয়ে পড়ল ওরা দুজন।

এরকম অনেকবার অনেক জায়গায় উদ্দেশ্যহীন ভাবে তারা এই পঞ্চপাণ্ডবের দল বেরিয়ে পড়েছে, যা-কিছু ব্যবস্থা করার দরকার তার সবই করেছে ওরা দুজনে, সুতরাং ওদের উপর আস্থা এদের সকলেরই আছে। এই জন্যেই নিশ্চিন্ত হয়ে থাকা এদের পক্ষে সম্ভব। তারা তাই পা এলিয়ে দিয়ে ট্রেনের ধকল ভুলবার চেষ্টা করতে লাগল।

বেলা ক্রমেই বাড়ছে। পেটেও আগুন জ্বলছে।

বিষ্ণুপদ আর অনাদি ঘরের মধ্যে বসে আছে, কিন্তু মনোজ গিয়ে বসেছে অনুচ্চ ঐ প্রাচীরে। সেখানে বসে সে [illegible] দেখছে সমুদ্রের।

কিছুক্ষণ পরে বীরেশ আর মতিলালের দেখা পাওয়া গেল।

সব নিয়ে এসেছে ওরা। কেবল চাল-ডাল-তেল-নুনই নয়, একটি রাঁধুনিও।

মধ্যবয়সী এই রাঁধুনির নামটাও কিন্তু বেশ কাকা। তার ভাষা বোঝা কষ্ট। তার নাম সত্যিই কাকা কিনা, এ নিয়ে সন্দেহ [illegible] মনোজের। নামটা কাকাও কিন্তু হতে পারে। কিন্তু কাকাটাই তারা মেনে নিল। এমন পরিবেশে ঐরকম নামই মানায়।

[illegible] ভাষা তো একটুও বুঝবার মত নয়, কিন্তু বীরেশ আর মতিলাল তার সঙ্গে [illegible] বলে চলেছে কিন্তু অনর্গল। রাঁধার নানা রকম ইনস্ট্রাকশন দিয়ে চলেছে।

[illegible] দেশ কোথায় জিজ্ঞাসা করায় সে বলল, অন্ধ্র।

মনোজ যেন অন্ধকার দেখল।

কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই যেন অদ্ভুত আলো এসে পৌঁছল এই ডেরায়।

মাথায় মাটির কলসী নিয়ে হঠাৎ এ কার আবির্ভাব? চমকেই গেল মনোজ।

অনাদি আর বিষ্ণুপদ পরস্পরের মুখ-চাওয়াচাওয়ি করল। অল্প-একটু হাসকও [illegible] তারা।

কিন্তু বীরেশ আর মতিলালের কোনো ভাবান্তর নেই। তারা কাজ নিয়ে যেন ব্যস্ত। [illegible] নানারকম পরামর্শ দেওয়া নিয়েই [illegible] ওরা বিভোর।

অথচ তারা তাদের বন্ধুদের দেখাতে চায় যে তাদের কৃতিত্ব কতটা, এবং পৃথিবীর উপর কর্তৃত্বই বা তাদের কতটা। এটা তারা একটু উদাসীন ভাবে থেকেই দেখাতে চায়। এই জন্যে ভীষণ ব্যস্ততার ভঙ্গি নিয়ে তারা রান্নার আয়োজন করেই চলেছে।

সমুদ্রের সৌন্দর্য একটা আছে। গাঢ় নীলবর্ণের সৌন্দর্যই অবশ্য সেটা। কিন্তু গভীর কালোবর্ণের সৌন্দর্যও কতটা গভীর আর নিবিড় হতে পারে তার দৃষ্টান্ত হয়ে এসে দাঁড়িয়েছে মাটির কলসী মাথায় নিয়ে ঐ মেয়েটা।

কালো কষ্টিপাথরে খোদাই করা যেন ঐ শরীর। খুঁটিনাটি করে দেখলে অনেক খুঁত নিশ্চয় বের করা যাবে, কিন্তু সব-মিলিয়ে একাকার ক'রে দেখলে আশ্চর্য হবারই কথা।

অনাদি এগিয়ে এল মনোজের কাছে, বলল, "চলন্ত ট্রেনে অমন মন্তব্যটা করেছিলে তার জন্যে তোমাকে বিলম্বিত ধন্যবাদ জানাই। ঐ রাত্রে রম্ভায় যদি আমরা নেমে পড়তাম তা হলে মিলত কেবল অষ্টরম্ভা।"

বিষ্ণুপদ বলল, "আর, এখানে এসে সত্যিই পেয়ে গেলাম রম্ভা।"

"মেনকাও বলতে পারিস।" মন্তব্য করল অনাদি।

সতেরো-আঠারো বছরের বেশি নিশ্চয় হবে না ওর বয়স। কিন্তু অত বড় মাটির কলসীটা জলে ভরতি ক'রে মাথায় চাপিয়ে কেবল অনায়াসে হেঁটে চলে এল।

এ'কে নাকি যোগাড় ক'রে দিয়েছে কঙ্কা। সে রান্না নিয়ে উনুন নিয়ে ব্যস্ত। রান্নার জন্যে জল দরকার, খাবার জল দরকার—এসব কথা উঠলে কঙ্কা নাকি একটু হেসেছিল। এক-এক কলসী এক-এক টাকা—তাতেই রাজি হয়ে যায় ধীবরেরা। এবং তারই ফলে।

হাত মুছতে-মুছতে ঘরের মধ্যে এসে মতিলাল বলল, "কেমন দেখলে?"

হাত বাড়িয়ে দিয়ে অনাদি তার করমর্দন করল, বলল, "পায়ের ধুলো নেওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু উঠতে ইচ্ছে করছেনা।" বলে সে পাশ ফিরে শুলো।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলার ভঙ্গি করে বিষ্ণুপদ বলল, "ঠিক। একেই নিশ্চয় বলে গ্রামীণ সংস্কৃতি। অন্যভাবে একে বলা যেতে পারে বিদ্যাপতির রাধা। কি বল হে মনোজ?"

কিন্তু মনোজ কিছু বলল না, সে ধীরে ধীরে উঠে চলে গেল প্রাচীরের দিকে। এখান থেকে অসীম সমুদ্রের চেহারা দেখা যায়। কিন্তু এখন এখানে এসে সে দেখল প্রাচীরের উপর বসে আছে একটি লোক। মাথায় তার তে কোণা লাল টুপি।

লোকটা নুলিয়া। প্রাচীরের ভাঙা জায়গাটা দিয়ে নিশ্চয় সে উঠে এসেছে এখানে। জল ছেড়ে দিয়ে ডাঙায় এসে বসেছে সে, সামনের ঐ সমুদ্রের দিকে সে চেয়ে আছে।

মনোজ এসে পাশে দাঁড়াল। লোকটা ঘাড় ফিরিয়ে মনোজের দিকে একবার একটু তাকাল। মনোজও কিছু বলল না, লোকটাও কিছু বলল না।

দিনটা কেটে গেল হৈই-হট্টগোলে। তার পর ক্রমশ নেমে এল রাত্রি। দিনের আলোতে সমুদ্রের চেহারা যেন ঝাপসা হয়ে ছিল, রাত্রি নামার সঙ্গে সঙ্গে নিজের স্বরূপ নিয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল এই বঙ্গোপসাগর। তার গর্জনও গুরুগম্ভীর হয়ে উঠল। জ্বলে-জ্বলে উঠতে লাগল ফসফরাস।

ওরা চারজন ঘরের মধ্যে বসে অজস্র কথা ব'লে চলেছে এবং ততোধিক হাসা-হাসি করে চলেছে, আর এখানে মনোজ একা-একা অনেক রাত্রি পর্যন্ত বসে দেখছে—সম্মুখে ভীষণ আর ভয়ংকর এক বিরাট অন্ধকার অজস্র আলোর ফুলঝুরি নিয়ে আস্ফালন করে চলেছে। বিশাল এলাকা জুড়ে তার এই ভীষণ সমারোহ দেখছে মনোজ।

একা-একা বসে সে এই দৃশ্য দেখছে আর ভাবছে—ওদের বাইরে বেড়াতে না আসাই ভালো। বাইরে বেড়াতে এসেও ওরা যদি ঘরের মধ্যেই বসে থাকবে তাহলে এত-দূরে ওদের আসা কেন।

কেন যে ওদের আসা, তা ওরা নিজেরা নিশ্চয়ই জানে। মনোজও যে একেবারে একটুও জানে না তা নয়। ওরা যে কি নিয়ে মেতে আছে তা বুঝতে পারছে মনোজ।

ওই মেয়েটার নাম কি তা জানা হয়নি, ওর নাম জানার কৌতূহলও বুঝি কারও নেই। ওরা নিজেরাই ওর একটা নাম দিয়েছে। ওরা ওর নাম দিয়েছে গাগরি।

ঐ গাগরিকে নিয়েই ওরা মেতে আছে। মেয়েটা স্বয়ং অবশ্য উপস্থিত নেই এখন, কিন্তু তবু সেই হচ্ছে এখন ওদের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

এখানে ওদের দিন বেশ কেটে যাচ্ছে। কঙ্কা রান্না করে তাদের খাওয়াচ্ছে এবং তাদের পিপাসার জল দিয়ে যাচ্ছে ঐ মেয়েটা।

ঘুম থেকে উঠে ওরা দল বেঁধে দোকানে গিয়ে সকালের চা আর খাবার খেয়ে আসে। বেলা দশটা-এগারোটার সময় আসে কঙ্কা। তার একটু পরেই কলসী মাথায় নিয়ে চলে আসে ঐ মেয়েটি।

ওর আসা মাত্র বাড়ির চেহারাই যেন বদলে যায়, মেজাজই যেন অন্যরকম হয়ে যায়।

মনোজ এ-ঘর ও-ঘর একটু পায়চারি করতে করতে সমুদ্রের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ায়।

প্রাচীরের উপর সেই লোকটি বসে আছে দেখতে পায় সে। বেশ তাজা চেহারা এই নুলিয়াটার। জলের জীব সে, অথচ অযথা সে উঠে আসে এই ডাঙায়।

কোনো কথা নেই তার মুখে। গম্ভীর হয়ে বসে কী যেন সে ভাবে। সমুদ্রের সঙ্গে

এত মাথামাথি করা সত্ত্বেও অন্ত পর্যন্ত তাকে চেনা গেল না কেন, এটাও তার ভাববার বিষয় হতে পারে বলে মনে মনে [illegible] করে মনোজ।

মনোজ সরে আসে। অনেকক্ষণ বাদে ফিরে দেখে, কখন যেন প্রাচীরের ঐ ভাঙা পথ দিয়ে সে নেমে চলে গিয়েছে।

মেয়েটি নাকি কঙ্কার করতলগত। তার হুকুম হলে সবই নাকি করতে সে বাধ্য।

এখন গোপালপুরের নাকি আর সেদিন নেই। এখন এখানে লোকজনও নাকি বেশি আসে না। আগেকার কাল ছিল নাকি রাজার হাল। সমুদ্রের কিনারে লোকজন এখন কম। তাই, এদের রুজি-রোজগারেও কমে গিয়েছে নাকি। এদের এখন নাকি খুব অভাব।

কিন্তু সমুদ্রের নাম তো রত্নাকর। তার কিনারে যারা থাকে, এবং সমুদ্র মন্থনই যাদের জীবিকা তাদের তো অভাব হবার কথা না।

অথচ, এদের দেখেই বোঝা যায় এরা দরিদ্র।

দারিদ্র্যের সুযোগ নাকি বহু লোক নিয়েছে নিচ্ছে এবং নেবে। এটাই নাকি নিয়ম।

মতিলাল নাকি কঙ্কার কাছে শুনেছে [illegible] হয়তো শুনেছে। কঙ্কার সঙ্গে একঘরে বসে বহু গল্পই সে করে [illegible] তার শেষ নেই।

কিন্তু এসব কথা কী আর নতুন! [illegible] কে না জানে। এই সত্যবাক্য শোনার জন্যে কঙ্কার শরণাপন্ন হতে হবে—এমন কোনো কথা নেই।

ওর সঙ্গে [illegible] আরও কি-সব ফন্দি আঁটছিল তা ওরাই জানে। ওসব জানার কৌতূহল মনোজের নেই। সে দেখতে এসেছে নতুন জায়গা, তাই সে দেখছে। এতেই সে বেশ খুশি আছে।

খুশি আছে বটে, কিন্তু [illegible] ঐ মেয়েটি [illegible] দেখার আগ্রহ তার [illegible] সেটা বোধ হয় আর কোনো কারণে নয়, সেটা কেবলমাত্র সৌন্দর্য উপভোগের জন্যে। সে সৌন্দর্য উপভোগে [illegible] যখন যে অন্য-এক সৌন্দর্যের [illegible] এদিক চলে আসে তখন দেখে সেই [illegible] জল ছেড়ে উঠে এসেছে, বসে [illegible] প্রাচীরের উপরে।

ওরা কি ফন্দি আঁটছিল তা ওরাই জানে। কিন্তু ওদের মতলব একটু আঁচ করতে পারছিল মনোজকুমার।

রোজ রাত্রে নাকি জল কম পড়ে যায়। সমুদ্রের জলের ঐ বিশাল এলাকা, তবুও [illegible] জল নাকি তারা পায় না। এই ধরনের একটা ইংরেজী কবিতার লাইন আছে না? আছে বোধ হয়।

কঙ্কার সঙ্গে ওরা কথা বলেছে। কঙ্কা নাকি একটু হেসেছে। সে নাকি আশ্বাসও দিয়েছে।

মতিলাল বলল, "আমরা যদি পঞ্চ-পাণ্ডব। তবে ঐ গাগরি হচ্ছে আমাদের দ্রৌপদী।"

মনোজের দিকে সকলে তাকাল। মনোজ কি মন্তব্য করে তা শোনার জন্যে তারা উদ্‌গ্রীব হল। কিন্তু মনোজ কিছু বলল না দেখে তারা সবাই তাকে প্রশ্ন করে বসল, বলল, "কি হে যুধিষ্ঠির, এ বিষয়ে তুমি কি বল?"

মনোজ বলল, "আমি যুধিষ্ঠির কিনা জানিনে। কিন্তু ওদের মধ্যে আমি নেই।"

"সে কি হে?" মোহিত বলে উঠল, "এক যাত্রায় পৃথক ফল, এটা ভালো দেখায় না।"

মনোজ বলল, "খুব সুন্দর দেখাবে। দ্রৌপদী না বলে ওকে চৌপদী বললেই মিটে যাবে।"

চার বন্ধু হেসে উঠল এক সঙ্গে।

সেদিন রাত্রে—একটু বেশি রাত্রেই—গাগরি মাথায় করে জল নিয়ে এসে হাজির হল।

মনোজ চলে এল প্রাচীরের কাছে। উঃ, কী ভীষণ সমুদ্র! ফসফরাস আজ যেন ফুলঝুরি নিয়ে খেলা করছে না, মনে হচ্ছে যেন মশাল জেবলে মাতামাতি করছে মাতালের মত। ঢেউয়ের মাথায়-মাথায় আগুন জেবলে হিসহিস করে ছুটোছুটি করছে যেন সমস্ত পৃথিবীটা জুড়ে। যতদূর পর্যন্ত দৃষ্টি যায় ততদূর পর্যন্ত চলেছে এই কাণ্ড-কারখানা।

ওদিকে ওরা কিসব কাণ্ডকারখানা করছে তা ওরাই জানে।

সমুদ্রের হাওয়া এসে লাগছে মনোজের সর্বাঙ্গে। লবণাক্ত হাওয়া। বেশ লাগছে তার। ঢেউগুলো আছাড় খেয়ে এসে পড়ছে কিনারে, সেখান থেকে গড়িয়ে প্রাচীরের নীচে পর্যন্ত এসে তবে তারা থামছে।

এ-যেন এক দীপান্বিতার রাত্রি। সমুদ্রের সর্বাঙ্গে আলোর মালা পরানো। সুবর্ণদীপমালিনী রাজেন্দ্রাণীর মতন তাকে দেখাচ্ছে হচ্ছে কখনো, কখনো আবার সেই রাজেন্দ্রাণীর প্রাসাদের আকার ধারণ করছে।

সারা রাত্রি বসে দেখলেও এ দেখার শেষ হবে না। মনোজ অভিভূত হয়ে গিয়েছে। মুগ্ধই হয়ে গিয়েছে সে। অনড় আর অটল হয়ে সে বসে আছে।

প্রাচীরের নীচে এসে যেভাবে আঘাত করছে এই ঢেউ তাতে তার মনে হচ্ছে এর পরে আবার যদি এখানে আসে মনোজ তখন আর এ প্রাচীর কিংবা এ বাড়ি আর দেখতে নিশ্চয় পাবে না। সমুদ্রের ধাক্কায় ভেঙে নেমে যাবে নিশ্চয়।

সমুদ্রের এই দীর্ঘনিশ্বাসের মতন শব্দের সঙ্গে ওটা কিসের শব্দ আসছে তার কানে? মনোজ মনোযোগ দিয়ে শোনবার চেষ্টা করল। হাঁ, অন্য একটা শব্দই তো! কান্নার শব্দ!

কে কাঁদে? কে কাঁদছে এখানে?

মনোজ উঠে ঘরের দিকে গেল ধীরে ধীরে পা ফেলে। দরজায় টোকা দিল।

কিছুক্ষণ পরে খুলল দরজাটা।

[illegible] দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে গাগরি।

তাকে কি বলবে মনোজ, কিছুই বুঝতে পারল না সে। একা এখানে এই মেয়েটা, ওরা চারজন পাশের ঘরে। ওরা কেউ হাঁপাচ্ছে, কেউ হাসছে।

হঠাৎ হাঁটুর মধ্যে থেকে মাথা তুলে মনোজের দিকে একবার তাকিয়েই মেয়েটা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। তার পর উঠে দাঁড়াল। খোলা দরজা দিয়ে প্রায় দৌড়নোর মতন বেগে সে বেরিয়ে গেল।

এগিয়ে গেল মনোজ। তার কিছু বুঝবার আগেই প্রাচীরের ঐ ভাঙা জায়গাটা দিয়ে সে নেমে গেল অন্ধকারের মধ্যে!

নীচেই ঢেউ ভাঙছে, ওই ঢেউয়ের মধ্যে পড়লে কিছুতে রক্ষে নেই।

প্রাচীরের উপর বুক রেখে ঝুঁকে পড়ল মনোজ, ডাকতে লাগল, "এই—এই—এই!"

কিন্তু কোনো সাড়া পেল না। দুই কানে সমুদ্রের হাওয়ার শব্দ বাজতে লাগল শন-শন করে। নীচেই বাজতে লাগল ঢেউয়ের আঘাত।

সমুদ্র নাকি সব ফিরিয়ে দিয়ে যায়? ঢেউয়ের টানে যা সে টেনে নিয়ে যায়, ফিরতি ঢেউয়ে তা নাকি আবার ফিরিয়ে দিয়ে যায় সমুদ্র! এটা মনোজের শোনা কথা। এটা ঠিক কথা কিনা তা সে জানে না।

আরও দিন-দুই তারা ছিল ঐ ডেরায়। কঙ্কা ঠিক এসেছে, কিন্তু জল মাথায় নিয়ে কেউ আর আসে নি!

কী হল তার? কঙ্কাও নাকি তা জানে না। সে যে জানে না, তার জন্যে তার এতটুকু আক্ষেপ নেই, এতটুকু উদ্বেগ নেই।

মানুষ নাকি চিরদিন থাকবার জন্য আসে না। তার জন্যে ভাববার কী আছে, ভাবনার কী আছে। এই-যে এরা এসে নোঙর করেছে এই ডেরায়, এখানেই কি এরা বরাবর থাকবে? থাকবে না। এতে ভাবনার কী আছে।

এইসব মহৎ কথা নাকি বলেছে কঙ্কা।

কিন্তু সুবিধে পেলেই মনোজ উঁকি দিয়ে দিয়ে দেখেছে—সমুদ্র যা টেনে নিয়ে গিয়েছে তা সে ফিরিয়ে দিয়ে গিয়েছে কিনা।

কিছুই চোখে পড়েনি তার। তাদের এই সফরের কথা চিরদিন মনে থাকবে মনোজের। দুটি নিষ্ঠুর জিনিস তার দেখা হয়ে গিয়েছে, তার বন্ধুদের কথা বাদ দিয়েই অবশ্য সে ভাবছে। প্রথম হচ্ছে ঐ সমুদ্র, আর দ্বিতীয় হচ্ছে ঐ কঙ্কা।

তার বন্ধুদের সে ছাড়েনি, কিন্তু তাদের দল ছেড়ে দিয়েছে মনোজ। তফাৎ সে বরাবরই ছিল, কিন্তু এখন আরও তফাৎ হয়ে গিয়েছে।

বীরেশের বিয়ে হয়ে গিয়েছে মাস-কয়েক হল। তার দেখাদেখি মতিলালও বিয়ে করে বসল। দলটায় ভাঙন ধরল এইভাবে।

মনোজ আর বাকি থাকে কেন। সেজ-খুড়িমা কিছুদিন থেকে চাপ দিচ্ছিলেন। এবার মনোজও রাজি হয়ে গেল।

বিয়ের পর হনিমুন করার একটা নিয়ম নাকি আছে। মনোজ সে নিয়ম পালন করতে অরাজি নয়। এই উপলক্ষে তবু একটু বেড়ানো হবে। বন্ধুদের দল ছাড়ার পর অনেকদিন বাইরে কোথাও যায়নি। সেও প্রায় বছর-দুই হতে চলল।

কোথায় যাবে ভাবছিল। হঠাৎ তার মনে হল রম্ভা। সেবার ঐখানে যাওয়ার জন্যে রওনা হয়েও শেষ পর্যন্ত যাওয়া হয়নি। সেখানে গিয়ে অন্তরম্ভা যদি জোটে তাতেও ক্ষতি নেই, যাওয়া তো যাক একবার।

মনোজ তার নবপরিণীতা বধূ মালতীকে নিয়ে চলে এসেছে সেই রম্ভায়।

জায়গাটা আহামরি ধরনের কিছু নয়। তবে, বেশ নিরিবিলি। মধুচন্দ্রিকা যাপনের পক্ষে উপাদেয় অবশ্যই।

তারা পরম আরামে আর পরম নিশ্চিন্তে বেশ দিন কাটাচ্ছে এখানে।

তারা চিল্কায় বেড়াচ্ছে নৌকো চেপে। এ হ্রদের জল তেমন গভীর না। তবু কেমন গা-ছমছম করে।

মালতী তাই নৌকো চাপতে চায় না।

"কেন, সাঁতার জান না?"

"উঁ হুঁ।"

তারা তাই বিকেলবেলা গিয়ে চিল্কার কিনারে বসে থাকে, আর একমনে গল্প করে যায়। কত-যে গল্প তার ঠিক নেই। পাহাড়ের গল্প, সমুদ্রের গল্প। [illegible] গল্প।

মনোজ বলল, 'সমুদ্রে যেন [illegible] লেগেছে, এই রকম মনে হয়। [illegible] অতটা না, দীঘাতে তো নয়ই।'

'তবে এটা কোথায়?' জিজ্ঞাসা করল মালতী। কিন্তু তার কথার উত্তর না দিয়ে মনোজ উঠে দাঁড়াল। ঐ-যে [illegible] নৌকোটা, ওতে দুটো প্রাণী [illegible] ধরতে ধরতে চলেছে। যেন চেনা [illegible] মনোজের, খুবই চেনা লাগল [illegible] যদি হাতের কাছে একটা নৌকো [illegible] তাহলে ওদের ধরতে পারত নিশ্চয়ই।

মালতীও উঠে দাঁড়াল, জিজ্ঞাসা করল, 'কি দেখছ?'

'ঐ-যে জেলে আর জেলেনি। [illegible] ভাঙা চেহারা দেখ জেলেটার, [illegible] জেলেনিটা—'

মালতী হাসতে লাগল, 'বিয়ে করার পর থেকে তোমার সবই যেন ভালো লাগছে।'

'লাগছেই তো!'

'ওরাও বুঝি হনিমুনে বেরিয়েছে?' মালতী একটু রসিকতা করার চেষ্টা করল।

কিন্তু মনোজ ভাবছে [illegible] কথা ভাবছে—কথাটা বোধ হয় ঠিক, সমুদ্র [illegible] ফিরিয়ে দেয় সবই।

মনোজ বলল, 'একবার বেড়াতে গিয়ে অবিকল ঐরকম দুজনকে দেখেছিলাম। কে জানে, ওরাই কি না!'

যাঁর "অনুমতানুসারে" গ্রন্থখানি রচিত। এদিকে অনেক রচনা অনামী : 'পথ্যপ্রদান' [দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৮২৩] "সম্যাগনুষ্ঠানাক্ষম তজ্জন্য মনস্তাপাবিশিষ্ট কর্তৃক সংকলিত"; 'মেঘদূতের' এক পদ্যানুবাদ [১৮৫৯] "কস্যাচিদ্বিদ্যানুরাগিণঃ" বিরচিত।

নামপত্রে শুধু পুস্তকের নাম নয়, তার অল্পবিস্তর ব্যাখ্যাও থাকতে পারে; যেমন 'কালিকৌতুহল' (১৮৫৩) "বর্তমান কলিযুগের প্রারম্ভাবধি অদ্য পর্যন্ত লোকসকলের যেরূপ আচার ব্যবহার হইয়াছে তাহা সংশোধনার্থ পরিহাসচ্ছলে রচিত"; কিংবা 'ললিতমাধবের' (১৮৫৫) প্রকাশ "শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃত শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রেম মাধুর্য রত্নাকর পীযুষ রসাস্বাদনার্থ রসিক ভক্তগণের চিত্তোল্লাসার্থ"; কিংবা 'মানবরঞ্জন' (১৮৬৪) "নব্য সভ্য ভব্য রসজ্ঞ গুণীগণের মনোরঞ্জনার্থে ফরাসডাঙ্গা নিবাসি শ্রীযুক্ত রামরত্ন দাস সরকার কর্তৃক পয়ারাদি ছন্দে নানাবিধ গ্রন্থের সারসংগ্রহ গ্রহণে সুললিত সাধুভাষায় আদিরস ও ভক্তিরস ঘটিত সংগৃহীত।"

কোনো কোনো গ্রন্থের নামপত্রে

হইবেক তখন তাঁহারা এতৎ প্রস্তাব পাঠে সন্তুষ্ট ও স্থির চিত্ত হইয়া পুনর্বার কার্যান্তরে ব্যাসক্ত হইতে পারিবেন; বিশেষত এই পুস্তক সুকুমারমতি কামিনী-গণের পক্ষে সাতিশয় মনোরঞ্জন ও গল্পচ্ছলে বিশেষ উপদেশক হইতে পারিবেক" [বিচিত্র উপাখ্যান, ১৮৬০]। ...

পাঠকের সহানুভূতিপ্রার্থী এক লেখক ঘোষণা করেন যে "কোন পুস্তকের সাহায্য না লইয়া" তিনি লিখেছেন। এদিকে একজন অনুবাদক প্রার্থনা করেন "পাঠকগণ যেন আবার অনুবাদে মূলের অপরূপর মাধুর্য সম্ভাবনা না করেন" [মালতী মাধব, ১৮৫৮]।

স্বীকার করতেই হয়, অনেক লেখকের ভূমিকা একান্ত মৌলিকতা-বিরহিত। তবে শুনুন 'কৌতুকলহরী' [১৮৬১] লেখক মাদারদ্রুম শর্মার গৌরচন্দ্রিকার কিছু অংশ: "আমি এই পুস্তক প্রকাশ করণের পূর্বে বিবেচনা করিলাম, যাঁহারা নিরন্ত পারস প্রভৃতি নানাবিধ মিষ্টান্নের আস্বাদ গ্রহণ করেন, তাঁহারাও তো সময়ানুসারে তিক্ত দ্রব্যের রস রসনাগ্রে স্বীকার করিয়া থাকেন। যাহারা অবিরত মধুর সুস্বাদু উৎকৃষ্ট দ্রব্য

[illegible] সঙ্গীতের সুমিষ্ট বাদ্য দ্বারা শ্রবণকে সুশীতল রাখেন তাঁহারা কি ঢাকঢোল ইত্যাদি সামান্য যন্ত্রের কর্কশ শব্দে কর্ণপাত করেন না? যাঁহারা ভারতাদি গ্রন্থের অতুল্য কবিতায় তুল্য রস, কর্ণেন্দ্রিয় দ্বারা পান করিয়া থাকেন, তাঁহারা কি প্রয়োজন মতে পাঁচালী গান শ্রবণে বিরত হন? এবং যাঁহারা সর্বদা সারঙ্গাদি পক্ষ্যাদির সুললিত সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া আনন্দচিত্তে সময় সম্বরণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা কি এক সময় অদ্ভুত ভূতের গান শুনিয়া উল্লসিত হন না?"

এই একটি লেখক সতর্ক হয়ে লিখেছেন: "পুস্তক বিশেষ ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া রচিত হয় নাই; কিন্তু ইহার স্থলবিশেষে অনেকেই কোন কোন ভাব কাহারো চরিত্র এবং স্বভাবের সহিত সংলগ্ন হইলেও হইতে পারে, তাহাতে তিনি কিংবা তাঁহারা আমার প্রতি রুষ্ট অথবা ক্ষুণ্ণচিত্ত না হইয়া বরং [illegible] মাত্র কল্পনার ন্যায় মনে মনে মনোদুঃখ নিবারণ করিবেন।"

[illegible] (১৮৫৯) অনামী অনুবাদক বিলাপ করেন: "হায়! আমাদিগের এ ভাগ্য দেশে কালিদাস যদ্যপি কুতূহলবশত একবার পুনরাগমন করেন তাহা হইলে চতুর্দিকে শ্মশান তুল্য দেখিয়া তাঁহার হৃদয় কি পর্যন্ত না ক্রন্দন করিয়া উঠে; তিনি যদি কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেন উজ্জয়িনী পুরী কোথায়? তাহার এইমাত্র প্রত্যুত্তর শ্রবণ করিবেন যে উজ্জয়িনীর নাম ত কস্মিনকালেও শুনি নাই। শোণিত [illegible] এই শেষোক্ত কথার আভাসে তাঁহার হৃদয় যে কিরূপ চমকিয়া উঠিবে ও তাঁহার মস্তকে যে কি নিদারুণ বজ্রাঘাত হইবে তাহা বর্ণনাতীত। উল্লিখিত প্রত্যুত্তর শ্রবণের পর তিনি কি ক্ষণকাল দণ্ডায়মান থাকিতে পারিবেন? দণ্ডায়মান থাকা দূরে থাকুক, দীর্ঘনিশ্বাসে মূর্চ্ছাতেই যে তিনি [illegible] করিবেন তাহাতে বিচিত্র কি?

[illegible]ভবনে প্রাপ্য

'[illegible]' কথাটা অব্যবহৃত হলেও লেখক ক্রেতার সুবিধার জন্য জানান: "গ্রাহক মহাশয়েরা কলিকাতায় ডিঙ্গাভাঙ্গার শাখারিটোলার গলিতে ৫৭নং বাটীতে অন্বেষণ করিলে এই পুস্তক পাইবেন" [প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক, ১৮৫২] কিংবা "এই পুস্তক যাহার প্রয়োজন হইবেক তিনি মোং কলিকাতার সিমুলিয়ার বাজারের পশ্চিমাংশে শ্রীযুৎবাবু গোবর্ধন ভড়জী মহাশয়ের ২২ নম্বর ভবনে তত্ত্ব করিলেই পাইবেন" [নববাবুবিলাস, ১৮৫৩]।

মূল্যভেদ নিরূপণের প্রথা প্রচলিত ছিল গ্রন্থের ক্রেতা বা গ্রাহকদের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ ক'রে: "স্বাক্ষরিক মূল্য ছয় আনা; অস্বাক্ষরিক মূল্য নয় আনা"; কিংবা "মূল্য স্বাক্ষরকারীর প্রতি ১ তঙ্কা, বিনা স্বাক্ষরকারীর প্রতি এক টাকা চারি আনা মাত্র"। 'রামোপাখ্যানের' (১৮৫৯) লেখক বিরাট ঝুঁকি নেবার সাহস দেখিয়ে সবিনয়ে নিবেদন করেছিলেন, "যে সকল মহাশয়েরা স্বাক্ষর পুস্তকে নামাঙ্কন করেন নাই অথচ বঙ্গভাষা সমালোচনে সমধিক সমুৎসুক তাঁহাদিগের নিকটেও ইহার এক এক খণ্ড প্রেরিত হইল। ভরসা করি পুস্তক গ্রহণ দ্বারা সাহায্যদানে কৃপণতা করিবেন না।"

বাংলা প্রাচীন গদ্যসাহিত্যের বহু রচনা অনুবাদমাত্র: "এই গ্রন্থ যে ইংরেজী পুস্তক হইতে অনুবাদিত তাহা বলা বাহুল্য" [পদার্থতত্ত্ব, ১৮৬২]; তবে মৌলিক রচনাও বিরল নয়। ঐ ধরনের কোনো গ্রন্থ 'বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের' দ্বারা প্রকাশিত হলে সেটা উক্ত সমাজেরই সম্পত্তি থাকে: "তাহাতে লেখকের কোন স্বত্ব থাকিবেক না।" লেখকের পারিতোষিক দুশো টাকা; তার উপর "পুস্তক প্রচারিত হওনাবধি এক বৎসরের মধ্যে দুই সহস্র পুস্তক যদি যথার্থতঃ বিক্রয় হয়, তবে সমাজের অধ্যক্ষেরা গ্রন্থকারকে পুনর্বার পুরস্কার প্রদান করিবেন; ঐ পুরস্কার ৫০ টাকার ন্যূন হইবেক না।"

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

Copyright Act [১৮৫৭] পাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাঙালী লেখকেরা ও'দের 'দাবি মানতে হবে' ব'লে ঘোষণা করতে শুরু করেন: "এই নাটক আমার সম্পত্তি বিশেষ, অতএব সাধারণ সমীপে নিবেদন, ইহা কেহ মুদ্রাঙ্কিত করিবেন না, করিলে রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হইবেন" [সপত্নী নাটক, ১৮৫৭]; কিংবা "সর্বসাধারণের বিদিতার্থে প্রকাশ করিতেছি যে, যিনি এই পুস্তক আমার অনুমতি ব্যতিরেকে পুনঃমুদ্রিত করিবেন, তাঁহাকে অত্র ব্যবহার নিবর্তক ব্যবস্থার অধীন হইতে হইবেক" [তুরকীয় ইতিহাস, ১৮৫৮]; কিংবা "সর্বসাধারণ ব্যক্তিবৃহকে বিদিত করা যাইতেছে, যিনি আমার বিনানুমতিতে এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কন করিবেন, তাঁহাকে ভারতবর্ষাধিপতি শ্রীমান ইংরাজ রাজার সুপ্রসিদ্ধ ব্যবস্থার মর্মাধীন হইতে হইবে" [পরিরঞ্জন, ১৮৬১]; কিংবা "আমি ব্যতীত অন্য কেহ মুদ্রিত করাইতে পারিবেন না; যদ্যপি অন্য কেহ মুদ্রিত করেন, তবে তিনি আমার দাবী অনুযায়ী সরকারে দণ্ডনীয় হইবেন" [প্রমথতরঙ্গিনী, ১৮৬৫]।

স্বত্ব রক্ষা করার উদ্দেশে বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করেন: "অপিচ সর্বসাধারণজনগণের বিদিতার্থে প্রকাশ করা যাইতেছে যে, ইংরেজী ও বাঙ্গালা অক্ষরে 'শ্রীকুঞ্জবিহারী সরকার' এই নামাঙ্কিত মদীয় মোহর ভিন্ন কেহ এই নাটক ক্রয় বিক্রয় করিবেন না" [কলঙ্ক ভঞ্জন, ১৮৬০]।

অনুবাদকের পর্যন্ত স্বত্ব সংরক্ষিত: "পাঠকগণ সমীপে আমার প্রার্থনা এই যে মৎকৃত ক্ষুদ্র পুস্তকখানি [যোগীনদরবেশ, পারসি থেকে তর্জমা] আমার অজ্ঞাতসারে কোন ব্যক্তি প্রকাশ করিলে নৃপতি সদনে শাসনীয় হইবেন।"

কোনো কোনো লেখক তাঁর স্বত্ব স্বায়ত্তে রাখেন না: 'মাধবমঙ্গলের' [১৮৬০] রচয়িতা উমাচরণ শর্মা পুস্তকটির স্বত্ব বিশ্বম্ভর লাহাকে প্রদান করেছেন। এভাবে যিনি স্বত্ব গ্রহণ করেন তিনিও তাঁর ন্যায্য দাবি ঘোষণা করতে ভোলেন না: 'সতীর্থচিত্র ভাগ্যকাব্যের' [১৮৬০] স্বত্ব, জানান নবস্বত্বাধিকারী, লেখক "আমাকে দিয়াছেন; ইহার স্বত্বাধিকারী আমি হইলাম অতএব কোন ব্যক্তি ইহা পুনর্মুদ্রিত করিলে সমুচিত মূল্য দাবি আইন মাফিক তাঁহাকে দিতে হইবেক।" পুস্তকাধিকার ক্রয়ও করতে দেখি: "আমি শ্রীযুক্ত বাবু দিননাথ বিশ্বাস মহাশয়কে এই পুস্তকের স্বত্ব বিক্রয় করিলাম। অতএব ইহাতে নামের সম্বন্ধ ব্যতীত আমার আর অন্য কোন সম্বন্ধ রহিল না" [কবিতাবলি, ১৮৬১]। ঐ ধরনের স্বত্বপ্রাপ্তেরা কি গ্রন্থপ্রকাশক? গ্রন্থপ্রকাশকের একমাত্র নাম পেয়েছি: হরিমোহন কর্মকারের পুস্তকসমূহ "রীতিমতো গবর্ণমেণ্টের হোম ডিপার্টমেণ্টে রেজেস্টরী করিয়া লইয়াছি। অতএব কোন ব্যক্তি ইহা পুনর্মুদ্রিত করিলে সমুচিত দণ্ড পাইবেন শ্রীকাজী সফীউদ্দীন, গ্রন্থপ্রকাশক।"

মহাজনের পদাঙ্ক অনুসরণে

এতে বিনয়, ইষ্টদেবে এমন নিষ্ঠা, আপন অধিকার রক্ষায় এতখানি আগ্রহ—পাঠক হয়তো বাঁকা হাসির সঙ্গে ভাববে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া। আধুনিক লেখকেরা তো এসব আবেদন-শরণং-করণং-এর ধার ধারেন না!

আমার কিন্তু ভালো লাগে ঐ প্রাচীন রীতি। মৎপ্রণীত মুদ্রিত বইটি ৩৪-এ, তেলিপাড়া লেন [কলিকাতা ৪]-এ মদীয় 'শান্তি সদনে'ই প্রাপনীয় হবে—কমিশন আমি নিজেই নেব! আর নামপত্রে লিখব: শ্রীশ্রী...না, কোনো দেবদেবী নয়, লেখকের যিনি একমাত্র ও চরম গতি, সেই পার্থিব চঞ্চলমতি অভীষ্ট গরিষ্ঠ নরদেবেরই উদ্দেশে সরাসরি লিখব: শ্রীশ্রীপদ্মশরণ্য সুধী পাঠক সহায়।

ডায়ওন

সম্প্রতি নোবেল বিজ্ঞানী জুলিয়ান সইংগার এক ধরনের নতুন ভৌত-কণিকার কথা উল্লেখ করেছেন। এই কণিকায় নাকি বিদ্যুৎ এবং চৌম্বক আধান যুগপৎ অবস্থান করে। এর অস্তিত্ব এখনও আঙ্কিক সূত্রের মধ্যে নিবন্ধ থাকলেও বিজ্ঞানীদের ধারণা কণা-পদার্থ-বিদ্যা বা পারটিকেল ফিজিকস-এর অনেক জটিল রহস্যই এই কণিকার দ্বারা সমাধান করা সম্ভব হতে পারে। ডঃ সইংগার কণিকাটির নাম রেখেছেন ডায়ওন।

বস্তুর পদার্থের মৌল উপাদান এবং তাদের যথাযথ চরিত্র সম্পর্কে আজ যত কথাই বলা হোক না কেন, যত পরিকল্পনার জল্পনা সূত্রই তৈরি হোক, তবু তার গঠন সম্পর্কীয় মূল জিজ্ঞাসা দিন দিন যেন জটিলতর হয়ে চলেছে। তেজষ্ক্রিয় বিকিরণের ফলে একই পদার্থ যে ভিন্নতর পদার্থে রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে সে সূত্রের আবিষ্কার বলতে গেলে বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার কাহিনী। তারও আগে পর্যন্ত সাংখ্যবিদদের মত ধরে নেওয়া হয়েছিল পরমাণুই সমস্ত পদার্থের একম-অদ্বিতীয় এবং অভিন্ন অবস্থা। পরমাণুকে কখনও ভাঙা যায় না।

কিন্তু না। এ তথ্যকে ভুল প্রতিপন্ন করলেন উত্তরকালের পদার্থবিজ্ঞানীরা। প্রমাণিত হল পরমাণু পদার্থের অবিভাজ্য অংশ নয়। আরও ক্ষুদ্র কণিকা দিয়ে পরমাণু তৈরি। এই কণিকারা হল ইলেক-ট্রন, প্রোটোন এবং নিউট্রোন। ইলেকট্রোন ঋণাত্মক বিদ্যুৎবাহী কণিকা। এর নিজস্ব ভর আছে, নির্দিষ্ট বিদ্যুৎ আধান আছে। ইচ্ছে করলে একটি ইলেকট্রোন কণাকে কোন পদার্থ থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন করে দেখাতে পারি. এই যে কণা এর নাম ইলেকট্রোন। এর মধ্যে এক একক ঋণাত্মক বিদ্যুৎশক্তি বাস করে। প্রোটোনের মধ্যে থাকে এক একক ধনাত্মক বিদ্যুৎ। এই কণাটিকেও পৃথক করে দেখান সম্ভব। বৈদ্যুতিক দশার পরিপ্রেক্ষিতে নিউট্রোন তড়িৎ-নিরপেক্ষ কণিকা। অর্থাৎ এই কণিকায় ঋণাত্মক বা ধনাত্মক কোন প্রকার তড়িৎ প্রভাবই বাহ্যিক দিক দিয়ে পরিলক্ষিত
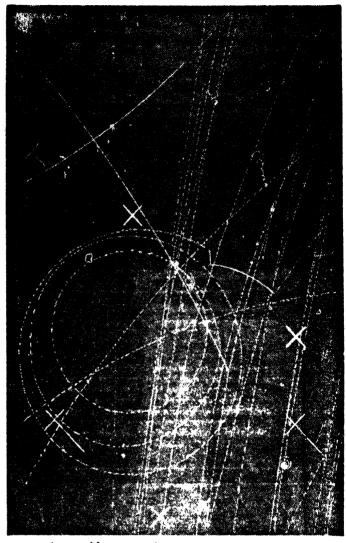
রাদারফোর্ড ল্যাবোরেটারিতে তোলা এই ছবিতে তরল পদার্থের মধ্যে সঞ্চরণরত পারমাণবিক কণার গমন পথগুলি দেখা যাচ্ছে

হয় না। দীর্ঘকাল পদার্থবিজ্ঞানীদের কাছে নিউট্রোন মস্ত একটি সমস্যার মত রয়ে গেলেও অবশেষে তারও প্রকৃতি সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য আবিষ্কার করা শক্ত হয়নি।

তবু তারই পর এল আর একটি বিরাট জিজ্ঞাসা। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পদার্থ বিজ্ঞানে রীতিমত আলোড়ন সৃষ্টি করলেন প্রখ্যাত বিটিশ বিজ্ঞানী জেমস ক্লার্ক ম্যাকসওয়েল। প্রকাশিত হল তাঁর যুগান্ত-কারী তড়িৎ-চৌম্বক সমীকরণ। ম্যাকস-ওয়েল আঁক কষে প্রমাণ করলেন বিদ্যুৎ এবং চুম্বকের অন্তর্নিহিত সম্পর্কটি যেন সমসূত্রে গাঁথা। যেখানেই বিদ্যুৎ কণা সেখানেই চুম্বকের অস্তিত্ব। যেখানেই চুম্বক, সেখানেই বিদ্যুৎ। কিন্তু মুশকিল হল না? বিদ্যুৎশক্তি যেমন দু' প্রকার, কণিকাদের যেমন পৃথক করে পাওয়া সম্ভব হয়েছে, চুম্বকের ক্ষেত্রে সেটা তো সম্ভব হল না? বিদ্যুৎশক্তি যেমন দু' প্রকার ঋণাত্মক এবং ধনাত্মক। চুম্বককেও তেমনি দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে—ঋণাত্মক এবং ধনাত্মক। দক্ষিণ এবং উত্তর মেরু। যখনই কোন চুম্বকের কথা আমাদের মনে পড়ে যায় তখনই আমরা ধরে নিই ঐ চুম্বকের দুটি মেরু আছে। উত্তর এবং দক্ষিণ। তারা ক্ষমতায় এক। ধর্মে বিপরীত। ধরা যাক, এমন ক্ষুদ্র একটি চুম্বক কণিকা নেওয়া

গেল যার উত্তর চুম্বক মেরুর ক্ষমতা 'একক'। তাহলে ঐ বস্তু কণায় নিশ্চয় আরও একটি চুম্বক মেরু থাকবে, যার ক্ষমতা 'একক' কিন্তু ধর্মে প্রথমটির বিপরীত?

ইতিমধ্যে আবির্ভূত হল হ্রস্বতম-অখণ্ড বলবিদ্যা বা কোয়ানটাম মেকানিকস। বলা হল, ঠিকই। পরমাণু-কেন্দ্রের চার পাশে, সূর্যকে কেন্দ্র করে যেমন গ্রহগুলি পরিক্রমণ করে চলেছে, ঠিক তেমনি ইলেকট্রোন কণারাও আবর্তন করে। কিন্তু কি ভাবে আবর্তন করে সেটা দেখে নিন? যে কোন একটি ইলেকট্রোনের কথাই ধরুন। ইলেকট্রোনটি অণুকেন্দ্রের চার পাশে পরিক্রমন করে চলেছে। যেমন পৃথিবী পরিক্রমণ করে সূর্যের চারপাশ। পরিক্রমণ করার সময় পৃথিবী যেমন তার নিজস্ব অক্ষের চার পাশে অবিরাম পাক খায়, ইলেকট্রোনও অণুকেন্দ্রের চার পাশে অমনি ভাবে পাক খেতে খেতে ঘুরে চলে। আবার এই পাক-খাওয়ার সময় তার মধ্যে আসে আর একটি গতি। লাটিম যখন পাক খায়, তখন তার অক্ষটি যেমন চারপাশে হেলে একটি বৃত্তীয় গতির সৃষ্টি করে, ইলেকট্রোনও নিজের অক্ষের চারপাশে ঘোরার সময় তার অক্ষের

যথাক্রমে $2/3$,—$1/3$,—$1/3$। দেখা গেছে তিনটি ডায়ওন এবং তাদের প্রতিকণার সাহায্যে প্রোটোন, ইলেকট্রোন, আলফা, বিটা, গামা, পজিট্রোন প্রভৃতি সমস্ত মৌল কণিকা এবং তাদের স্বকীয় ধর্মাবলী প্রকাশ করা সম্ভব। সইংগার উদ্ভাবিত এই কণিকা মৌল-কণা বিষয়ক পদার্থ বিজ্ঞানের বহু জটিল প্রশ্নের সমাধান জোগাতে সমর্থ হয়েছে। বর্তমানে গাণিতিক ছকের মধ্যে সীমাবদ্ধ এই কণিকার মধ্যে যেন দেখা যায় বস্তু জগতের উৎপত্তির মূল সূত্র। একদিন পরমাণুই ছিল পদার্থের আদিতম অবস্থা। অবশেষে সেই পরমাণুর মধ্যেই আবিষ্কৃত হল ইলেকট্রোন, প্রোটোন, নিউট্রোন এই তিনটি মৌল কণা। পরমাণু বিজ্ঞানের অগ্রগতি বস্তুর সৃষ্টি তত্ত্বের আরও মৌলিক অবস্থাকে নির্দেশ করল। আবিষ্কৃত হল মেসোন। সেই মেসোনেরই আবার কত রকম—পাই-মেসোন, মিউ-মেসোন, কাপ্পা-মেসোন। চলতে লাগল। এমনি করেই বিজ্ঞানীদের কল্পলোকে উদ্ভাবিত হতে লাগল কত রকমের কণিকা, যাদের বলা হয় মৌল-কণিকা। মানুষের মনের আদিমতম প্রশ্ন : পদার্থ সৃষ্টির মূল কোথায়? তার উত্তরও মিলেছে হাজারো? কিন্তু প্রতিটি উত্তরের মধ্যেই সব সময় থেকে গেছে একটি চিরন্তন জিজ্ঞাসা : এই কি সেই 'কণা' যা থেকে সৃষ্ট হয়েছে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ভৌত জগৎ? সঙ্গে সঙ্গে দ্বিধা। সঠিক উত্তর মেলেনি। সইংগারের কল্প-লোকের এই কণিকাও সঠিক উত্তরটি জোগাতে সমর্থ হবে কিনা সেটা নির্ভর করছে আরও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং সেই সঙ্গে গবেষণাগারের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল কি দাঁড়ায়, তার ওপর।

*

মৌল-কণার উপর গবেষণার সবচাইতে বড় অন্তরায় হল, এ ধরনের কোন কণিকাকে আমরা কখনই চোখে দেখতে পাই না। এদের উপর গবেষণা চালানোর জন্যে কোন পারমাণবিক কণিকা, যেমন প্রোটন বা ইলেকট্রোনকে প্রথমে বৃত্তাকার পথে বার কয়েক ঘুরিয়ে প্রচণ্ড গতি সম্পন্ন করে নেওয়া হয়। তারপর সেই কণা গিয়ে আঘাত করে স্থির ভাবে রেখে দেওয়া কোন বস্তুর পরমাণুকে। এই আঘাতের ফলে পরমাণুটি বিচূর্ণ হয়ে যায় এবং ক্ষুদ্র মৌল কণিকা রূপে প্রচণ্ড বেগে ছড়িয়ে পড়ে। তখন এদের সঞ্চারিত করা হয় কোন পাত্রে সংরক্ষিত তরল পদার্থের মধ্যে দিয়ে। সাধারণতঃ তরল হাইড্রোজেনকে এ কাজে লাগান হয়ে থাকে। মৌল কণিকারা ঐ তরল হাইড্রোজেনের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সময় অতিক্ষুদ্র বুদ-বুদ বা রেখার আকারে যে সঞ্চারণ পথগুলি এঁকে দিয়ে যায় ফটোগ্রাফিক প্লেটের উপর তাদের ছবি তুলে নেওয়া হয়। সেই ছবির আঁকগুলি বিশ্লেষণ করে গবেষকরা জানতে পারেন সঞ্চারিত মৌল-কণার স্বরূপ এবং বৈশিষ্ট্য। সম্প্রতি বৃটেনের ক্যাভেন্ডিস ল্যাবোরেটারির অধ্যাপক অটো ফ্রিসথ এবং তাঁর সহকারীরা নতুন একটি যন্ত্র তৈরি করছেন যার দ্বারা এই কাজগুলি আরও সহজে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। এবং অনেক কম খরচে। যন্ত্রটির নাম রাখা হয়েছে 'সুইপিস্ক'। লেজার রশ্মির সাহায্যে এই যন্ত্রে সঞ্চারিত কণিকার গমন পথের ছবিকে সরাসরি যন্ত্রগণকে পাঠিয়ে মৌল-কণিকা সম্পর্কে নানা রকম তথ্য সংগ্রহ করা হয়ে থাকে।

সমরজিৎ কর

তেজাল

তেজাল বা oven-এর ব্যবহার আমাদের [illegible] বোধায় নেই। তন্দুরে তৈরি [illegible] রুটি, পরোটা ও পশ্চিমের পরি-[illegible] oven বলতে যা বোঝায় তন্দুর [illegible] নয়। উপরে-নীচে আগুনে [illegible] তাপে কেক, বিস্কুট ইত্যাদি [illegible] oven-এর কাজ। [illegible] ইংরেজ-[illegible] এসে বাবুর্চি-খানসামারা oven-[illegible] করলেন তেজাল। উপরে জ্বলে, [illegible] থাকে যে আঁচ তা পরোক্ষ [illegible] এবং সেই তৃতীয় [illegible] হলো [illegible] baking-এর অর্থ [illegible] কথাটি আমরা [illegible] অর্থে ব্যবহার করি তাও baking [illegible] না।

[illegible] পশ্চিমের baking [illegible] কেক, নানা [illegible] বিস্কুট ইত্যাদি আমাদের প্রিয় [illegible] রয়েছে। [illegible] এবং [illegible] বিশেষ [illegible] এই [illegible] যাঁদের [illegible] নেই, যাঁরা [illegible] অধিকারী নন, তাঁদের [illegible] bake করার ব্যবস্থা [illegible] এবং আছে [illegible] ও [illegible] আঁচের অবস্থা। একটি কথা কিন্তু [illegible] যে, তেজালের আঁচ ঠিক [illegible] তা যা তৈরি করবেন তা [illegible] মাঝামাঝি আঁচের [illegible] ভালো। নতুন টিনে কেক [illegible] লেগে যেতে চায়। এখন বিদেশে non-stick বাসনপত্র খুব ব্যবহার হয়। [illegible] এক রাসায়নিক আস্তরণ লাগিয়ে [illegible] বেকিং থেকে নিয়ে ভাজাভুজি সব [illegible] ঘি তেল [illegible] দিব্যি ডিম ভাজা [illegible] পারেন। কেক এর টিনে কেক [illegible] লেগে যাবে না। এই non-stick [illegible] এক চিরাচরিত ব্যবস্থা অনেকে [illegible] ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারেন। [illegible] ভুসি ভরে বেকিং পাত্রটি গরম তেজালে রাখবেন। বেশ তেতে শুকিয়ে

উঠবে ভুসি, তখন নামিয়ে নেবেন ও বেশ করে মুছে পরিষ্কার করে রাখবেন। এই পাত্রের ব্যবহারে কখনও কেক ইত্যাদি লেগে যাবে না।

এবার সহজ এবং নিত্য কাজে লাগে এরকম দু'একটি জিনিসের প্রস্তুত-প্রণালী আলোচনা করতে চাই।

আদা দেওয়া বিস্কুট

উপকরণ :

৫০০ গ্রাম ময়দা। ৫০০ গ্রাম চিনি বা মিছরির গুঁড়ো। ১২৫ গ্রাম মাখন। শুকনো আদার গুঁড়ো রুচিমত।

প্রণালী :

১। সব মিলিয়ে ময়দা মেখে নিন।

২। বিস্কুটের আকারে কেটে মাঝামাঝি আঁচে বেক করুন।

আদা-বিস্কুট অন্যভাবেও বানানো যায়।

উপকরণ প্রায় একইরকম : এক কিলো চিনি, দুই পেয়ালা জল, মাখন ৬০০/৭০০ গ্রাম, ২ কিলো ময়দা, এক ছটাক আদার গুঁড়ো।

প্রণালী :

১। একটি পাত্রে ময়দা এবং আদার গুঁড়ো ছাড়া সব নিয়ে মৃদু আঁচে রাখুন।

২। এই মিশ্রণ ফুটে উঠলে নামিয়ে ঠাণ্ডা হতে দেবেন।

৩। এবার ময়দা এবং আদার গুঁড়ো মিলিয়ে তাল গড়ুন।

৪। বেলে নিয়ে গোল গোল করে কেটে মিনিট দশেক তেজালে বেক করলেই হবে।

ওটমিল বিস্কুট

যে জই দিয়ে প্রাতরাশের oatmeal হয় তার মিশ্রণে বেশ ভাল বিস্কুট হবে।

উপকরণ :

ভাল oatmeal প্রায় চারশ' গ্রাম নিয়ে কিছু কম নেবেন ময়দা, চিনি ২০০ থেকে ২৫০ গ্রাম আর মাখন বা অন্য কোন স্নেহ-পদার্থও ২৫০ গ্রাম। চায়ের চামচের চার চামচ বেকিং পাউডার এবং দু'টি ডিম।

প্রণালী :

১। সব একত্র করে গরম জল দিয়ে মেখে নিন।

২। বেলে নিয়ে বিস্কুটের আকারে কাটুন।

৩। বেশ গরম তেজালে অল্পক্ষণ রাখলে চলবে কিন্তু মনে রাখবেন, এ বিস্কুট সহজে জ্বলে যেতে পারে।

নিত্য পরিবেশনের মত সাধারণ কেক

উপকরণ :

এক পেয়ালা মিহি চিনি, দু'টি ডিম, বড় চামচের তিন চামচ মাখন, চার চামচ দুধ, দু' পেয়ালা ময়দা, এক চায়ের চামচ বেকিং পাউডার।

প্রণালী :

১। একটি পাত্রে চিনি রেখে তার উপর ডিম দু'টি ভাঙুন।

২। আধ ঘণ্টা ধরে ফেটান। চিনি ও ডিম মিশে ফেনার মত হয়ে যাবে।

৩। এবার মাখন দিন ও ফেটান।

৪। দুধ দিন আর ফেটান।

৫। সবার শেষে ময়দা দিন আর পছন্দমত কোন খাবার জিনিসে দেবার এসেন্স (যেমন ভ্যানিলা, লেমন) দু-চার ফোঁটা।

বেকিং করে নিন বেশ মাঝামাঝি গরম তেজালে। একটি চুলের কাঁটা কেকে ঢুকিয়ে বের করে আনলে যখন কাঁটার গায়ে একটা তেলতেলে ভাব ভিন্ন কিছু লাগবে না। তখন কেক তৈরি বুঝবেন।

কেক বা বিস্কুট বাদেও নানা রকম রান্না হয় তেজালে। হ্যামবার্গার এখন আমাদের দেশেও প্রিয় হয়ে উঠেছে। সেই হ্যামবার্গারের কাবাবের মত জিনিসটি তেজালে খুব ভাল হয়। কাবাব হিসাবে পরিবেশন করতে চান তাও করতে পারেন, আবার দু টুকরো মাখন মাখনো রুটির মধ্যে রেখে পকেটে পুরে ক্রিকেটের মাঠে নেওয়া চলে।

উপকরণ :

মাংসের কিমা ৫০০ গ্রাম, বেকিং পাউডার ৮ চায়ের চামচ, দুধ দুই চায়ের চামচ, ডিম একটি, এক পেয়ালা পেঁয়াজ কুচি, বড় চামচের এক চামচ মাখন, নুন, সামান্য টোম্যাটো সস ও গোলমরিচের গুঁড়ো।

প্রণালী :

১। দুধে বেকিং পাউডার গুলে নিন।
২। মাখনে পেঁয়াজ ভাজুন।
২। পাত্রে কিমা রেখে ওই বেকিং পাউডার ও পেঁয়াজ দিন।
৪। তারপর নুন, গোলমরিচ ও টোম্যাটো সস দিয়ে বেশ করে মাখুন।
৫। বেকিং করার প্লেটে ঘি বা ওই

জাতীয় কিছু মেখে গরম তেজালে রাখুন।

৬। কাবাবের আকারে কিমা তৈরি করে ওই প্লেটে সাজিয়ে দিন।

৭। একটু পোড়া পোড়া ভাব হলে উল্টে দেবেন, যখন হালকা, ঘিয়ের মত ঝোল একটু বের হবে তখন বুঝবেন রান্না তৈরি।

সহজ রুটি মাখনের পুডিং

সবচেয়ে সহজ আর হালকা পুডিং হিসাবে রুটি-মাখনের পুডিং সাধারণভাবে যখন-তখন তৈরি করা যায়।

উপকরণ :

৪ স্লাইস সাদা রুটি ও মাখন, কিছু কিসমিস, ২টি ডিম, আধসের দুধ, বড় চামচের ১½ চামচ চিনি আর সুগন্ধি কিছু (এসেন্স বা জায়ফল)।

প্রণালী :

১। মাখন মাখানো রুটি বেক করার ডিসের তলায় সাজিয়ে তার উপর অর্ধেক চিনি ও অর্ধেক কিসমিস দিন।

২। আবার বাকি রুটি সাজিয়ে ওইভাবেই তার উপর চিনি ও কিসমিস দিন।

৩। ডিম ফেটে, দুধ মিশিয়ে রুটির উপর দিন, একটু সুগন্ধি দিন ও

৪। মাঝামাঝি আঁচের তেজালে বেক করবেন।

কেক বা পুডিং কোন জিনিসের জন্য ফেটে বেশিক্ষণ ফেলে রাখবেন না। যথা সম্ভব তাজা ডিম যেন হয়। চিনি যেন শুকনো হয় ও কেকের চিনি মিহি হয়। কিসমিস, বাদাম ইত্যাদিও শুকনো হওয়া দরকার। ভিজে থাকলে শুকিয়ে নেবেন। মাখন যেন ভাল হয়। ময়দা শুকনো ঝরঝরে হয়। ময়দা ভিজে থাকলে গরম তেজালে রেখে শুকিয়ে নেবেন। কখনই ঠাণ্ডা তেজালে কিছু ঢোকাবেন না। গরম হলে তবে দেবেন।

টুকিটাকি

খাস্তা কচুরি অর্থাৎ ময়দার ভিতর ডাল ইত্যাদির পুর দেওয়া যে ভাজা খাবার, তার ময়দা মাখার সময় জল বর্জন করলে কচুরি মচমচে হবে ও দীর্ঘ সময় মচমচে থাকবে। জলের বদলে দেবেন দই। ঘিয়ের ময়ান এবং দই দিয়ে ময়দায় তাল তৈরি করবেন।

খাস্তা কচুরির পুরে নুন দেবেন না। বরং ময়দায় নুন দেবেন। কেবল কচুরি গড়বার সময় নুনে আঙুল ডুবিয়ে পুরে একটু সেই আঙুল টিপে দেবেন। এভাবে গড়লে পুরে জলকাটাভাব হবে না ও কচুরি মচমচে থাকবে।

নিমকির ময়দাও সম্ভব হলে দই দিয়ে মাখবেন। যে ছোট ছোট গোল মোটা ধরনের নিমকি অবাঙালী সমাজে খুব প্রিয় প্রাতরাশ, তাতে সাধারণত জল থাকে না। দই দিয়ে মাখা ময়দার নিমকি মাস খানেক রেখে খেলেও খারাপ হবে না।

ডিমের খোসা ফেলে দেবেন না। একটি পাত্রে জমা করে রাখবেন। ওই ডিমের খোসা-চূর্ণ খুল ভাল জমির সার। যাঁরা একটু শাকসবজি করবার সুযোগ পান তাঁদের ওই চূর্ণ করা ডিমের খোসা নানাভাবে কাজে লাগবে। টোম্যাটো গাছের জন্য ব্যবহার করে দেখুন, খুব ভাল ফসল হবে।

ডিমের খোসার মত চায়ের পাতা চমৎকার সার। চায়ের পাতা জমা করে সার হিসাবে কাজে লাগাবেন। গোলাপ গাছে চায়ের পাতার সার খুব উপকারী। লেবুর ফসলের জন্য লেবু গাছের গোড়ায় মাছের আঁশ বা ফেলে দেওয়া নাড়ীভুঁড়িসব ভাল করে পুঁতে দিলে ভাল হয়। বেশ ভাল গর্ত করে অনেকটা নীচে না দিলে বেড়াল ইত্যাদির উৎপাত হতে পারে।

মাছের আঁশ একটি হাঁড়িতে ভরে জল দিয়ে রেখে সেই জল যদি লেবুগাছের গোড়ায় মাঝে মাঝে দিতে পারেন তবে লেবু হবে বড় বড়, ফলবে অসংখ্য। এই জল দুর্গন্ধ হবে সত্য, কিন্তু বেশ করে চাপা-চুপি দিয়ে একটু দূরে এক কোণে রাখতে পারলে হয়তো দুর্গন্ধের হাত এড়ানো কষ্টকর হবে না।

শ্রীমতী

বাবা বড় কাছারী

সাংতাহিক লক্ষ্মীপুজোর শেষে চাল-কলা-সন্দেশ-বাতাসার ছাঁদা বেঁধে নিয়ে যাবার সময় বাড়ির বউ হরিমতী গড় করতে গেলে বাবা ঠাকুরও বলে গেলেনঃ 'আশীর্বাদ করি মা, তোমার কোলজোড়া সোনামানিক আসুক—শ্রীপতির বংশরক্ষে হোক—নিঃসন্তান হলে—আটকুড়ো হলে 'রৌরব' নরকে পুড়তে হবে।'

শ্রীপতি মাইতির মা বললে, 'রৌরব কি আর পাতালে আছে? ওটা মনে। তুষের আগুনের মতন জ্বলছে নিত্যিদিন। পাহাড়-পানা গতর আমার বউয়ের—পাঁচটা বছর কেটে গেল—এখনো বাচ্চাকাচ্চা হবার নাম নেই। হাজার জাড়বাটি তুকতাক করছি, সব গয়ায় যাচ্ছে। তা নয় বাবাঠাকুর, কোনো গোপন পাপে শনির নজর পড়েছে বউয়ের ওপর।'

বাবাঠাকুর শনিগ্রহের শান্তির জন্য পুজো দিতে বা কোনো পাথর ধারণ করতে উপদেশ দিয়ে চলে গেলেন।

শ্রীপতির সংসারে অভাব নেই। চাল ধান, ডাল-কলাই নারকোল-পাট-বাঁশ-অনাজ, দুধ ডিম গুড়—সবই নিজের চাষ-আবাদ থেকেই হয়। শ্রীপতি খাটতে পারে, সারাদিন সে লোকজন নিয়ে মাঠে মাঠে ক্ষেতখামারে থাকে, চাষবাস করে। সন্ধ্যায় ফিরে যখন হাতে পায়ে সরষের তেল ঘষে পাথরবাটি ভরা গরম ঘন দুধে হামাই ধানের বড় বড় মোটা মোটা ফুলকো মুড়ি অথবা বাসকামিনীর সুগন্ধি চিড়ে ফেলে নিয়ে খেতে বসে তার স্ত্রী হরিমতী লালপাড় তাঁতের শাড়ি পরে মাথায় আড়-ঘোমটা টেনে গম্ভীর মেজাজে ঘরের দোরের বাজু ধরে দাঁড়িয়ে থাকে তুলসীতলায় সন্ধ্যা দিয়ে শাঁখ বাজিয়ে গড় করে এসে। তার আসবার আগেই ছেলেকে খাবার দিয়ে দেয় বুড়ী। আর তার পাশেই মাটিতে হাত পেতে বসে আদিখ্যেতা জোড়ে।

'বাবাঠাকুর বলছিল বাচ্চাকাচ্চা না হলে নাকি রৌরব নরকে পুড়তে হবে। বলি কি বাবা, তুই না হয় আর একটা বিয়ে কর।'

মায়ের মন রেখে শ্রীপতি বলে, 'দেখো তবে আর একটা মেয়ে।'

বউয়ের এমন গতর, এমন সুন্দর দেখতে—তা একেবারে পান গাছ—ফল নেই ফুল নেই পাতায় ভরা।'

শাশুড়ির কথাবার্তা সময় সময় এত নিচুতে নামে যে হরিমতীর সহ্যের সীমা অতিক্রম করতে চায়। ইচ্ছে করে মাগীকে ঝাঁটার বাড়ি কষিয়ে খিরশের বিষ ঝরিয়ে দেয়। ছেলে তার এদিকে নিমুরোদে কিনা সে পরীক্ষা ডাক্তার দিয়ে করে দেখেছে কি?

তাই হরিমতীর মনে অন্য একটা প্রবৃত্তি মাঝে মাঝে খেলা করে। তার মাসতুতো দেওর কমল রায় যখন আসে আর রঙ্গ-তামাসা করে তখন তার কথার সোনালী রুপোলী চারা চারা মাছগুলো মনের অতল জলে খেলা করে। হরিমতী সন্তানের জননী না হলে এ সংসারে তার ভাগ

দেখি, তোমার হাতে বাচ্চাকাচ্চার চিহ্ন আছে কিনা

বসাবার জন্যে আর একজন সতীনের আবির্ভাব হতে পারে—একথা অনেক দিন থেকেই সে শুনে আসছে। কিন্তু হরিমতী জানিয়েছে শ্রীপতিকে, 'আমার কোনো অসুখবিসুখ নেই, হয়তো তোমারই। যদি আবার বিয়ে করো আর তারও বাচ্চাকাচ্চা না হয় তখন তোমারই অপমান হবে। তার চাইতে বাবা বড় কাছারীর কাছে মানত করো। দরখাস্ত লিখে লাল ঘুনসিতে গেঁথে বাবার থানে যে অশথ গাছ আছে তাতে টাঙিয়ে দিয়ে এসো। বাবা বড়-কাছারীর দৃষ্টি পড়লে নাকি বাঁজা মেয়েরও ছেলে হয়।'

তাই করবে শ্রীপতি। অনেকবার কথা দিয়েছে। কিন্তু সে প্রতিদিন ভোর না হতেই সংসারের কাজে বেরিয়ে যায় আর যাবার সময় হয়ে ওঠে না। আবার চেপে ধরলে বলে, বেশ তো আছি, ছেলে হলে তোমার এই যৌবনের বারোটা বেজে যাবে। ফুল ফুটে আছে, বেশ তো—ফলের জন্যে অত্তো তাড়া লাগালে যে গাছ শুকিয়ে যাবে।'

হরিমতী বলে, 'তুমি কি ছেলে চাও না?'

কোনো উত্তর দেয় না শ্রীপতি।

'তোমার মা তো এ সংসারে আমার আর মুখ দেখানো দায় করে তুললে। বাড়িতে যে আসবে তাকেই ধরে ধরে বলবে, ঐ গতর আছে মাগীর, ফল নেই, ফুল নেই, পাতায় ভরা!—এক দিন দেখো আমি গলায় দড়ি দেবো কিংবা পুকুরে ডুবে মরব। শুনেছ—ঐ দ্যাখো—'

শ্রীপতির তখন নাক ডাকতে শুরু করে।

অথচ কমলের কি গভীর আর তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাকে পাবার। বিকালে যখন কেউ বাড়ি থাকে না, কমল এসে চুপি চুপি ঘরে ঢোকে। ওর পায়ের তলায় বিড়ালের মতো নরম মাংস পেশী আছে নাকি কে জানে! কোনো শব্দ নেই—সাড়া নেই। এসে পিছন থেকে চোখ টিপে ধরে।

'ছাড়ো। ঠাকুরপো। কলেজে যাওনি যে আজ?'

'আজ ছুটি। জানো বউদি, দুর্দান্ত খবর, মাসী মামাদের বাড়ি গেছে। গুণধর মামার মেয়েকে দেখতে। তার সঙ্গে নাকি দাদার আবার বিয়ে দেবে। পথে দেখা হল, আমাকে বললে।'

কাঁথা সেলাই করছিল হরিমতী। নানা রঙের সুতো দিয়ে সে একটা ফুল তুলছিল। কোনো উত্তর দিচ্ছে না দেখে তার হাতের সেলাই গোলমাল করে দিলে কমল। হাতটা চেপে ধরলে। বললে, 'দেখি, তোমার হাতে বাচ্চাকাচ্চার চিহ্ন আছে কিনা!'

তাড় কিনে নিয়ে। বাড়ির সবাইকে খাইয়ে দাও—সর্বরোগের শান্তি হবে—মানত মনস্কাম পূর্ণ হবে।

শ্রীপতি একটা দরখাস্ত লিখে টাঙিয়ে দিলে। 'তার স্ত্রী হরিমতী দাসীর গর্ভে কেন একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দেন যেন বাবা বড় কাছারী। মানত দেবে নাম-সংকীর্তন আর জোড়া পাঁটা!' বাবা বড় কাছারীর কাছে জাত সম্প্রদায়ের, বামুন শূদ্রের বাছ-বিচার নেই। সবাই পুজো দিতে পারে।

মানত দিয়ে আসার পর শ্রীপতি দেখলে, হরিমতী কি খুশী। মাও সে কথা শুনলে। সে চুপ হয়ে গেল, আর বিয়ের কথা তুললে না। ছেলে তাহলে বিয়ে করতে চায় না, মিথ্যে তার মন ভোলানো কথা বলত। তবে সে মান্নাদের মেয়ে দেখে অতো দূরে এগুতে গেল কেন? তলে তলে তাকে অপদস্থ করা নয় কি।

তব, ভাল, যদি একটা নাতি হয় তা হলে মন্দ কি!

সন্ধ্যার পর রোজই সাজগোজ করে হরিমতী। সিঁথিতে ভক্তিভরে সিঁদুর দেয় ফোঁটা দেয় কপালে। খোঁপায় স্বর্ণচাঁপা

॥ ১৮ ॥

নীলাঞ্জন এমনিতেই সাড়ে নটা দশটার আগে বাড়িতে ফেরে না রাত্রে, সেদিন এগারোটার মধ্যেও ফিরলো না। পৌনে দশটা থেকে মাধুরী সিঁড়িতে নীলাঞ্জনের পায়ের আওয়াজের প্রতীক্ষা করে, সাড়ে দশটার মধ্যে ঠিক ফিরে আসে। রতন আর নীলাঞ্জনের পায়ের আওয়াজ দুরকম, দরজা ধাক্কা দেবার ধরনও আলাদা। রতন ওঠে নামে ধপ্ ধপ্ শব্দ করে, দ্রুত, যেন খুব ব্যস্ত, যদিও রতন আলসে, আয়েসী ধরনের মানুষ। নীলাঞ্জনের প্রত্যেকটি পদক্ষেপ মাপা, দরজায় একবারের বেশী আওয়াজ করে না, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। নীলাঞ্জন ফেরার আগে এ পর্যন্ত মাধুরী কোনোদিন ঘুমিয়ে পড়েনি।

সেদিন পড়েছিল। বিছানায় শুয়ে শুয়ে মাধুরী একটা মাসিক পত্রিকা ওল্টাচ্ছিল, কখন চোখ বুজে এসেছে, ধড়ফড় করে উঠে দেখলো নীলাঞ্জন তখনও ফেরেনি, এগারোটা বেজে পাঁচ। অনেক সময় বাড়ি ফেরার পথে প্রণবের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, ট্রাম ডিপোর কাছে নেমে দুজনে হাঁটতে হাঁটতে এইটুকু পথ আসে, নীলাঞ্জনের বাড়িই আগে, সেখানে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে নীলাঞ্জন প্রণবের সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করে। মাধুরী উঠে গিয়ে বারান্দা দিয়ে ঝুঁকে দেখলো। নিচে কেউ নেই, রাস্তা জনশূন্য, ফাঁকা-ফাঁকা বাসগুলো ছুটে যাচ্ছে ডিপোর দিকে। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে মাধুরী অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলো।

রতনও ফেরে দশটার মধ্যেই। কোনো কোনোদিন আগে ফিরে এলে আবার তাশ খেলতে বেরোয়, তবে এগারোটার মধ্যে তার শুয়ে পড়া চাই-ই। ভোরবেলা উঠে তার মর্নিং ওয়াক সেরে বাজার করে আনতে হয় তো। বাজারে অন্তত একটি ঘণ্টা সময় লাগে রতনের, যেসব জিনিস কিনবে , না তারও দাম জিজ্ঞেস করে, নেড়ে চেড়ে ভালোমন্দ যাচাই করে. মাছের বাজারের গন্ধটাই সে খুব উপভোগ করে মনে হয়।

মাধুরী তাকিয়ে দেখলো, শত্রুদের ঘর অন্ধকার, ঘুমোয়নি অবশ্য—দু'একটা কথা শোনা যাচ্ছে। মাধুরী একটু দূরে সরে দাঁড়ালো। এত দেরী করার জন্য নীলাঞ্জনের ওপর রাগ হচ্ছে না তার. নীলাঞ্জন অকারণে এমন দেরী করে, না কখনো, ঠিক দুশ্চিন্তাও হচ্ছে না—নীলাঞ্জনের কোনো বিপদের কথা সে মনে স্থান দিতেও চায় না, তবু কিরকম যেন একটা কান্না-কান্না পাচ্ছে তার।

আসলে এরকম অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকতে তার একটু ভয় ভয় করে। জ্যোৎস্না ওঠেনি, অবশ্য অন্ধকারে একটা রহস্যময় আকাশ, বিরাট চৌকো মিশমিশে কালো চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে টালার ট্যাংক, পার্কের পুকুরে থমথমে জল—দিনেরবেলা এ সবই দেখতে ভালো লাগে, এখনো পাশে যদি নীলাঞ্জন দাঁড়িয়ে থাকতো, কিন্তু একা—। মাঝে মাঝে দু'একটা ট্যাক্সি দুর্দান্ত গতিতে ছুটে যাচ্ছে, সেই কর্কশ আওয়াজে চমকে চমকে উঠছে মাধুরী।

একা একা এরকম দাঁড়িয়ে থাকলে মনে হয় চোখের সামনে দিয়ে হুড়মুড় করে ছুটে যাচ্ছে মুহূর্ত-মিনিট-ঘণ্টা, সময় তখন তার স্বরূপ দেখায়। মাধুরীর মনে হলো, এখানে সে বহুকাল দাঁড়িয়ে আছে, রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখ ব্যথা হয়ে এসেছে। তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে এসে ঘড়ি দেখলো। না, বেশী সময় কাটেনি, এগারোটা কুড়ি।

কি করে যেন একটা বেড়াল ঢুকে পড়েছে, খাবারের ঢাকনাটা উল্টে ফেলে ছিল আর কি। তক্ষুনি বেড়ালটাকে তাড়াবার কোনো উপায় মাধুরী জানে না। মুখ দিয়ে কোনো শব্দ করলো না, মাধুরী সেটার চোখে চোখে তাকিয়ে রইলো। তবু তো একটা জীবিত প্রাণী, এখন মাধুরীর ওকে তেমন খারাপ লাগছে না। বেড়ালটাও জ্বলজ্বলে চোখে মাধুরীকে দেখছে আর আস্তে আস্তে ল্যাজ দোলাচ্ছে।

একবার মিয়াও করে ডাকলো, বুঝলো খুব একটা বিপদের সম্ভাবনা নেই; আবার খাবারের দিকে মুখ বাড়ালো। মাধুরী এবার দূর থেকেই বললো, এই, হুস! হুস! কি ভাগ্যিস বেড়ালটা জানে না যে ওর খুব বাড়ে এগুবার সাহস মাধুরীর নেই। বরং বেড়ালটা যদি দু'চার পা মাধুরীর দিকে এগোয় যায়—তাহলে মাধুরীই ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে মেচিয়ে উঠবে। মাধুরীর হাতের কাছে আত্মরক্ষার কোনো অস্ত্রও নেই। এসব খবর জানে না বলেই কত বেড়ালকে মেয়েদের দেখে মুখের গ্রাস ফেলে চলে যেতে হয়।

বেড়ালটা অনিচ্ছা সত্ত্বে গা মোচড়ামচড়ি দিয়ে গুটি গুটি পিছিয়ে জানলার ওপর উঠলো এক লাফে। সেখান থেকে মাধুরীর দিকে আর একবার তাকিয়ে বাইরে নেমে গেল। মাধুরী খাবারের ঢাকনাটা ঠিক করে বসিয়ে জানলার কাছে এসে বেড়ালটাকে খুঁজতে লাগলো। একা একা তার ভালো লাগছে না। বেড়ালটা জানলার ঠিক নিচেই কার্নিসে বসে আছে। বেড়াল দু'চক্ষে দেখতে পারে না মাধুরী, তবু, আজ ডাকলো, আয় চু চু চু—। মাধুরীর মনে হলো, তার নিচু গলার আওয়াজটা যেন এখন বহুদূরে পর্যন্ত শোনা যাবে। বেড়ালটা অতি বদ, গাছতলোর সঙ্গে মাধুরীকে একবার দেখে ল্যাজটা একদম খাড়া করে বিশ্রীভাবে হেঁটে চলে গেল।

রাস্তায় কার পায়ের আওয়াজ না? মাধুরী আবার তাড়াতাড়ি চলে এলো বারান্দায়। জুতোর তলায় লোহার শব্দ করতে করতে আসছে একটা লোক, গুনগুন করে গানও গাইছে আবার, নীলাঞ্জন হতেই পারে না। তবু মাধুরী ব্যগ্রভাবে তাকিয়ে রইলো। বেশ বয়স্ক সবল চেহারা একজন অবাঙালী, নাল বসানো জুতোর জন্য গয়লা বলে মনে হয়, বেশ মনের আনন্দে দুলে দুলে হাঁটছে, যেন এত রাত্তিরেও তার বাড়ি ফেরার কোনো তাড়া নেই, মাধুরীর বারান্দার তলা পেরিয়ে চলে গেল। যতদূর দেখা যায়, মাধুরী দেখলো ওকে।

...বিয়ের আগে কখনো এতরাত পর্যন্ত জাগতে পারেনি মাধুরী। নাইট শোতে সিনেমা দেখতে চাইতো না। যতদিন জব্বলপুরে ছিল, রাত দশটার সময় তো সারা শহর ঘুমন্ত। জব্বলপুরে কোনোদিন মধ্যরাত্রির আকাশ দেখেনি, তখন খুব ভোরে ওঠা স্বভাব ছিল। ভোরবেলা উঠে হৈমন্তী-দের বাড়িতে ফুল তুলতে যেত—সে অনেক ছেলেবেলার কথা। কলকাতায় এসে হস্টেলে থাকার সময় অন্য মেয়েরা খুব রাগাতো তার ঘুম কাতুরেপনা নিয়ে। তার রুমমেট পারমিতা কি অসভ্য, একবার ঘুমের মধ্যে তাকে—। তবে যেদিন মাধুরী প্রথম নীলাঞ্জনের চিঠি পায়—দারুণ লাজুক ছিল নীলাঞ্জন, কলেজের পর প্রায় রোজই দেখা হতো—কিন্তু কিছুই প্রায় বলতো না, শুধু গম্ভীর গম্ভীর কথা—কি একটা কাজে বহরমপুরে বেড়াতে গিয়ে সেখান থেকে নীলাঞ্জন একটা চিঠি লিখেছিল, সেই প্রথম সে মাধুরীকে...সেই চিঠি পেয়ে মাধুরী সারারাত ঘুমোতে পারেনি। ছোট্ট চিঠি, কোনোরকম ন্যাকামি নেই, কিন্তু কি আন্তরিক—মনে হয়েছিল মানুষটা খুব দুঃখী। চিঠিটা পেয়ে ভালো লাগায়, রোমাঞ্চে শিহরণ জেগেছিল মাধুরীর, চোখে দু'এক ফোঁটা জলও এসেছিল, ঘুম আসেনি।...

একি, এগারোটা চল্লিশ! মাধুরীর বুকের মধ্যে ধক করে উঠলো, মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল, এক সঙ্গে দুশ্চিন্তা আর ভয়ে একেবারে হঠাৎ মুচড়ে পড়লো মাধুরী, দু'তিনবার উদ্‌ভ্রান্তের মতন ঘর আর বারান্দা করলো শুধু।

—শুভ্রা, এই শুভ্রা ঘুমিয়েছিস?

শুভ্রাদের ঘর এখন স্তব্ধ, আর কথা শোনা যাচ্ছে না। উত্তর আসার আগে খুট করে ছোট আলো জ্বলে উঠলো। শুভ্রাদের বেড সুইচ আছে।

—কে? মাধুরী নাকি? কি হয়েছে?

—একটু শোন না। রতনদা ঘুমিয়ে পড়েছেন?

—কেন কি হয়েছে? নীলাঞ্জনদা ফেরেননি এখনো?

—না!

রতনের বেরোতে একটু সময় লাগলো। ঘুমিয়েই পড়েছিল, কিন্তু হঠাৎ ঘুম ভাঙার জন্য তার মুখে কোনো দুশ্চিন্তার ছাপ নেই। শান্তভাবে বললো, কি হয়েছে কি? নীলাঞ্জন আসেনি এখনো? কিছু বলে টলে যায়নি?

—না। কিছু বলেনি!

—কোনো বন্ধুটন্ধুর বাড়িতে থেকে গেছে হয়তো। আসবে কাল সকালে।

—ওমা, বন্ধুর বাড়িতে থাকবে কেন? কিছু না বলে-টলে এরকমভাবে তো কখনো থাকেনি।

—তা হলে দ্যাখো ফিরতেও পারে। এখনো ফেরার সময় যায়নি।

—এরপর আর ফিরবে কি করে? বারোটা প্রায় বাজে।

—শ্যামবাজার অব্দি তো বারোটা পর্যন্ত বাস চলে। তা ছাড়া ট্যাক্সি আছে—

—কিন্তু এত রাত তো আগে কখনো হয়নি।

রতন একগাল হাসলো। বেশ জাঁকিয়ে বসলো মাধুরীর খাটে। ভদ্রলোক বললো, ও ঘর থেকে সিগারেট আর দেশলাইটা নিয়ে এসো তো! তারপর মাধুরীর দিকে চেয়ে আবার হেসে জিজ্ঞেস করলো, ক'বছর হলো?

ঠাট্টা ইয়ার্কি বোঝার মতন মনের অবস্থা এখন নেই মাধুরীর। তার মনটা এমনিতে ভারী স্বচ্ছ, সহজে কোনো ঘটনার গুরুত্ব বুঝতে পারে না—যখন তখন উদ্বিগ্ন হয় না, কিন্তু একবার ব্যাকুল হয়ে পড়লে আর নিজেকে সামলাতে পারে না। বিহ্বল মুখে জিজ্ঞেস করলো, কি ক'বছর হলো?

—বিয়ে। তিন বছর তো হয়ে গেছে?

—হাঁ।

—তবে?

রতন এমন মুখ করে আছে, যেন একটা খুব সহজ ধাঁধার উত্তর জিজ্ঞেস করছে। এই কি মাধুরীর পক্ষে ধাঁধার উত্তর দেবার সময়? এই রাত বারোটায়, নীলাঞ্জন এখনো বাড়ি ফেরেনি! মাধুরীর গলায় আওয়াজ প্রায় শোনাই যায় না, সে জিজ্ঞেস করলো, আপনি কি বলছেন, রতনদা?

রতনদা আবার নিজের রসিকতা উপভোগ করে হাসলো। হাসতে হাসতেই সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ার ফলে একটু কাশি এলো, সেই অবস্থায় বললো, তা হলে বলো, বিয়ে করার পর প্রথম প্রথম লোকে যা করে, তিন বছর বাদেও কি তা করবে? বুঝলে মাধুরী, প্রেম-ট্রেম করার সময় মানুষ একটু বদলে যায়, তখন অনেক কিছু লুকোয়—আমি খারাপভাবে বলছি না—

—ও আমার কাছে কিছুই লুকোয়নি—

—আহা, বললাম তো, আমি খারাপভাবে বলছি না। তখন লোকে ভাবে এই মেয়েটির

সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ছাড়া আমার জীবনের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। কিন্তু তিন বছর কেটে গেলে...বিশেষত নীলাঞ্জনের মতন মানুষ—ওতো আর শুধু আমাদের মতন নেহাৎ ছা-পোষা গেরস্থ নয়—

মাধুরী জানেনা এখন কি বলবে। রতনদার কথা সে বিশেষ কিছুই বুঝতে পারছে না। শুভ্রা তার সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলো। শুভ্রা ঝংকার দিয়ে বললো, তোমাকে আর বকবক করতে হবে না। একটু বেরিয়ে দেখো তো বরং—

রতন ভুরু তুলে জিজ্ঞেস করলো, বেরিয়ে কি দেখবো?

—নীলাঞ্জনদা আসছে কিনা—

—নীলাঞ্জন আসছে কিনা সেটা বেরিয়ে দেখবার দরকার কি? এলে তো এমনিই জানবে—

শুভ্রাকে কথা বলার জন্য বেশী ভাবতে হয় না। সঙ্গে সঙ্গে বললো, তা বলে তুমি একটু বেরুতে পারছো না? অচ্ছা কুঁড়ে মানুষ! ও বাড়িতে একটু খোঁজ নিলেও পারতে তো!

—ও বাড়ি মানে?

—আমহার্স্ট স্ট্রীট—। মাধুরী তোর মাওয়েকে ফোন করে জিজ্ঞেস করা যায় না নিচতলা থেকে ফোন করা যায়—

রতন একেবারে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। আমহার্স্ট স্ট্রীট মানে? নীলাঞ্জনদের নিজের বাড়ি? এখানে কোনো খবর না দিয়ে নীলাঞ্জন ওখানে খবর দেবে? কিংবা তোমরা ভাবছো, নীলাঞ্জন হঠাৎ বাপের সুপুত্তুর হয়ে বউকে ত্যাগ করে বাপের কাছে ফিরে যাবে? নীলাঞ্জনের কথা তো ছেড়েই দাও, আমি হলেও জীবনে আর কোনোদিন ওরকম বাবার মুখও দেখতুম না।

মাধুরীর মনের গতিই আলাদা। একটু আগেও সে রতনদার সামনে নীলাঞ্জনের সমর্থনে বলবে ভাবছিল, এখন ইচ্ছে হলো—শ্বশুরের পক্ষ সমর্থন করে কথা বলবে—যদিও তার শ্বশুর একটি দিনের জন্যও তার সঙ্গে ভালো করে কথা বলেননি। কিন্তু মাধুরীকে কিছু বলতে হলো না, শুভ্রাই রীতিমতন রাগের সঙ্গে বললো, তুমি হাসছো, তোমার লজ্জা করে না? নীলাঞ্জনদা এখনো ফেরেনি—তুমি যদি না যেতে চাও, আমিই নিচতলায় গিয়ে ফোন করছি। আমহার্স্ট স্ট্রীটে খবর না পাই, থানা কিংবা হাসপাতালে—

রতন এই প্রথম অবাক হয়ে তাকালো। তার মুখ আহত মানুষের মুখ। এই নারী দুজনকে নয়, কারণে খুশী করার জন্য তার যে এখন নিরর্থক ব্যস্তবাগীশের ভাণ দেখিয়ে রাস্তার মোড়ে গিয়ে দাঁড়ানো উচিত, একথা তার মাথাতেই ঢোকে না। নীলাঞ্জনকে সে ভালোভাবেই চেনে, হঠাৎ কোনো দুর্ঘটনা ঘটিয়ে থানা কিংবা হাসপাতালের আওতায় চলে যাওয়া—তার স্বভাবেই নেই। কাল সকালেই সে সুস্থ শরীরে ফিরে আসবে—এবং তাদের এই ধরনের ব্যস্ততা দেখে সে ঠাট্টা করবে—পুরুষ মানুষের স্বভাবই এইরকম।

রতন একটু গম্ভীর হয়ে বললো, তুমি দেখছি মাধুরীকে একটু শান্ত করার বদলে আরও বেশী ভয় দেখাচ্ছো! থানা-হাসপাতালে কি আর আমি খোঁজ নিতে পারি না। কিন্তু কাল নীলাঞ্জন এসব শুনলে আমার ওপরেই রাগারাগি করবে। বলবে, তুইও মেয়েদের কথা শুনে—

রতনের গম্ভীর ভাবে শুভ্রা একটুও দমলো না। বললো, বাঃ, তা বলে এত রাত পর্যন্ত মানুষটা বাড়ি ফিরলো না—মাধুরী এখন কি করবে?

রতন বুঝলো, এদের সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। পুরুষ মানুষের ব্যাপার মেয়েরা সত্যিই কোনোদিন বোঝে না। হঠাৎ সংযত হয়ে বললো, ঠিক আছে, আরও খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে দেখো না, তারপর না হয়—

ওরা তিনজনেই বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। রতনের পাশে শুভ্রা, তার ওপাশে মাধুরী। শুভ্রা অবশ্য রতনের হাতের এলাকার মধ্যে নেই। রাস্তায় এখন আগের তুলনায় অনেক লোক। অনেক নারীও রয়েছে ভিড়ের মধ্যে। প্রথমে ওরা বিচলিত থাকার জন্যই মধ্য রাত্রে এত জনসমাগমের কারণ বুঝতে পারেনি। আসলে বিজলী সিনেমা হলের নাইট শো ভেঙেছে, অনেকে হেঁটে বাড়ি ফিরছে।

হঠাৎ এত রাতে এত লোকজন দেখে ওদের দুশ্চিন্তা খানিকটা হাল্কা হয়ে গেল। একটুক্ষণের জন্য নীলাঞ্জনের কথা ভুলে ওরা অন্য বিষয়ে ঠাট্টা ইয়ার্কিও করতে লাগলো। এমন কি রতন যখন বললো, নীলাঞ্জনের যা ভুলো মন, হাতেও ঘড়ি পরে না—হয়তো কোথাও বসে বসে গল্প করতে করতে ভাবছে, এখন পৌনে নটা বাজে—তখন মাধুরী হেসে ফেললো পর্যন্ত।

ভিড় তখনো পুরো কমে নি, সাইকেলে ক্রিং ক্রিং করতে করতে একটি ছেলে এসে মাধুরীদের বারান্দার তলাতেই এসে থামলো। সাইকেল থেকে নামলো না, এক পা মাটিতে ছুঁইয়ে ওপরের দিকে মুখ করে ছেলেটি মাধুরীর দিকে তাকিয়ে বললো, বৌদি—

মাধুরী ছেলেটিকে চেনে না, কোনোদিন দেখেনি, তবু উৎসুকভাবে উত্তর দিল, কি? কি?

ছেলেটি আবেগহীন গলায় বললো, নীলাঞ্জনদা আজ রাত্তিরে বাড়ি ফিরবেন না। এসপ্লানেডে পিকেটিং করতে গিয়ে আজ অ্যারেস্ট হয়েছেন। বেল নিতে রাজী হননি। ভয়ের কিছু নেই—

ছেলেটি তখন আবার সাইকেল নিয়ে ছুটতে শুরু করেছে। মাধুরী জিজ্ঞেস করলো, শুনুন, শুনুন, একটু দাঁড়ান—

ছেলেটি হাওয়ায় উত্তর ছুঁড়ে দিল, কাল সকালে কাগজে দেখতে পাবেন, চিন্তার কিছু নেই—

রতনই আবহাওয়া হাল্কা করে দেবার চেষ্টা করে একটু হেসে বললো, ঐ তো বলা গেল, চিন্তার কিছু নেই। থানায় আছে যখন, খেতে পাবে নিশ্চয়ই। [ক্রমশ]

ছাত্রীর পরম শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন তিনি। নিজের অনেক রচনা তিনি লিখে রেখেছেন। পণ্ডিত রত্নজনকার নাকি ভরসা দিয়েছেন সেগুলি প্রকাশের ব্যবস্থা করবেন। তাঁর একটা কথা শুনে বড়ই কষ্ট হল। বয়স হয়েছে। দিল্লীর প্রচণ্ড শীত গ্রীষ্মে যাওয়া আসা করতে তিনি আর যেন পেরে উঠছেন না। বললেন—"পারেন কলকাতায় আমাকে নিয়ে যেতে? একটা সামান্য কাজ হলেই আমার চলবে।" এখানকার সংগীত প্রতিষ্ঠানদের প্রতি আমাদের আবেদন যদি তাঁরা এই প্রবীণ গুণী ব্যক্তিকে নিয়োগ করতে পারেন তাহলে তাঁরাও যেমন লাভবান হবেন তেমনি সহায়তালাভ করবেন এই অবসরকামী ব্যক্তিটি। সে যুগের বহু বস্তু এ'র জানা আছে আর আছে প্রচুর অভিজ্ঞতা। এই রকম ব্যক্তিদের দেশে ফিরে আসবার জন্য সহায়তা করাটা তো আমাদেরই কর্তব্য।

প্রতিবারই দিল্লীতে এসে পরলোকগত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত চন্দ্রশেখর পান্থের কথা মনে করে দুঃখ বোধ করি। অল্পকালের হলেও তাঁর সঙ্গে লেখকের একটি অসামান্য প্রীতির বন্ধন স্থাপিত হয়েছিল।

(পঁয়ত্রিশ)

সেই রাত্রে আর রমেনের ফেরা হল না। বালীগঞ্জ স্টেশন থেকে যখন ট্রেনটা ছাড়ছিল তখন হতভম্ব ললিত চেঁচিয়ে তাকে বলেছিল—তুই সত্যিই চললি নাকি?

রমেন মৃদু হেসে ঘাড় নাড়তে ললিত আবার চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল—কবে ফিরবি?

রমেন তার উত্তর দিতে পারেনি। আসলে সে তো কোথাও ফেরে না। যেখানেই সে যায় সেখানেই তার ফিরে যাওয়া। অন্তত ঐরকম ভাবেই ভাবতে চেষ্টা করে রমেন। আশ্চর্য এই, যে ভাবতে আজকাল আর অসুবিধে হয় না। তবু ললিতের জন্য কষ্ট হচ্ছিল। রমেনকে ছাড়া আজকাল বোধ হয় ললিতের একটু একা-একা লাগে।

পলাশপুরের নতুন বাসায় পা দিতে না দিতে মৃদুলার মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সন্ধের মুখে পেঁৗছে তারা খানিক দূর ইলেকট্রিকের আলো আর পিচের রাস্তা পেল। তারপর অন্ধকার কাঁচা রাস্তায় একটুখানি গিয়ে ফাঁকায়, প্রায় মাঠের মধ্যে অন্ধকার বাসা। তুলসীর ছাত্ররা আর কয়েকজন মাস্টার, বাড়িওয়ালা নিজে—সবাই মিলে করেক পলকে পুরুষালী রীতিতে যেমন-তেমন ভাবে ঘর দুখানা সাজিয়ে ফেলতে সাহায্য করল। কিন্তু হ্যারিকেনের আলোয় যে ধোঁয়াটে অন্ধকার সৃষ্টি হয়ে থাকে তাতে অভ্যাস ছিল না বলে মৃদুলার কেবল মনে হচ্ছিল সে এক চির অন্ধকারের নির্বাসনে এসেছে। আর কোনদিন কলকাতা আর বেহালার মুখ দেখবে না। বাড়ির ভিতর দিককার দরজা খুলে ভিতর বারান্দায় দাঁড়াতেই প্রতিপদের চাঁদের আলোয় ভাসা উঠোন, তারপর আগাছার বেড়া, আর বহু দূর বিস্তৃত এক কুয়াশায় মোহাচ্ছন্ন আগাছা কণ্টকিত প্রান্তর দেখে তার মনে হল সে মৃত্যুর পরের জগতে চলে এসেছে। চার দিকের এ জগৎ বেঁচে থাকার জগৎ নয়।

চা খেয়ে সবাই বিদায় নিয়ে গেলে রইল কেবল তুলসীর লম্বা সন্ন্যাসী বন্ধুটি। এও হয়তো কাল কি পরশু চলে যাবে। ভেবে মৃদুলার কেমন কান্না পায়। এখন যে কোনো মানুষ কাছে থাকলেই ভাল লাগবে। যে কোনো মানুষ।

নতুন তোলা উনুনে চালে ডালে চাপিয়ে ভাজার বেগুন কুটতে বসেছিল সে, এমন সময়ে যেসব ভীরু মেয়েরা দরজার আড়াল থেকে তাদের মালপত্র নিয়ে আসতে দেখেছে তারা আসতে লাগল এক দুই করে। অসম্ভব তাদের কৌতূহল কলকাতার মেয়েদের প্রতি। তাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই মৃদুলা বুঝতে পারছিল যে গ্রাম সুখের জায়গা নয়।

তুলসী আড়াল আবডাল থেকে হ্যারিকেনের মাজা আলোয় যতটা সম্ভব মৃদুলার মুখের ভাব লক্ষ করে যায়। তারপর নানা কথা ভেবে কেমন একটু নার্ভাস বোধ করে। এতখানি করার পর যদি মৃদুলা সুখী না হয়ে থাকে তবে তার সুখ কোথায়!

নতুন চৌকির ওপর সদ্য পাতা বিছানায় রমেনের মুখোমুখি আঁট হয়ে বসে একটা সিগারেট ধরাল তুলসী। বলল—এ জায়গাটা খুব ডেভেলপ করবে, বুঝলি? ভাবছি কিছু জমিয়ে টমিয়ে এদিকেই জমি কিনবো।

কথাটা বলেই তার খেয়াল হয় যে, যাকে সে এই কথা বলল তার জমি-বাড়ি কিংবা পার্থিব সঞ্চয়ের প্রতি আগ্রহ না থাকারই

কথা। মনে মনে একটু লজ্জা পেল তুলসী। বরাবর রমেনের কাছে নিজেকে তুচ্ছ বলে মনে হয়েছে তার, আজও হল।

সকালবেলায় উঠেই রমেনের চলে যাওয়ার কথা। কিন্তু মৃদুলা একটু আপত্তি তুলল—কেন যাবেন এক্ষুনি? কোনো কাজ তো নেই! আজকের দিনটা থেকে যান না।

আসলে বালীগঞ্জ স্টেশনে বিভুকে দেখার পর থেকেই মৃদুলা ক্রমান্বয়ে অস্বস্তিতে আছে। কেবলই মনে হয় যে কোনো সময়ে যে কোনো দিন বিভুর আবির্ভাব ঘটবে এইখানে। তুলসীকে মৃদুলা চেনে। যদি কখনো বিভুর মুখোমুখি হয় তবে কোথায় উবে যাবে তুলসীর সাহস! বিভুর আক্রোশের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ানোর ক্ষমতাই তুলসীর নেই। তাই ... সাহসী রমেন কয়েকটা দিন ... থাক। দুটো ঘরের একটা ... দেওয়া হবে।

রমেন থাকল।

আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি ... দেশের প্রকৃতি সেজে উঠেছে। এই ... অনেক দূরে দেশের পাখি আর বাতাস ...

সুন্দর পালের নৌকোর মতো মেঘ আসে পলাশপুরে। গত বর্ষার স্মৃতি মানুষ ভুলে যায়। ঠিক ঐ পাখি বা মেঘের মতোই নূতন একটি জিনিস দেখতে পেল গাঁয়ের লোক। তারা দেখল গৌরবর্ণ দীর্ঘকায় রমেনকে—একা একা হাঁটছে রাস্তায় রাস্তায়। যেন কোন দিকে যাবে ঠিক করতে পারছে না। লোকটাকে দেখলেই এত ভাল লাগে কেন? মানুষের মাথার চারদিকে জ্যোতির্বলয় নেই, এ তো ঠিক কথা। কিন্তু কাউকে কাউকে দেখলে মনে হয়, এর মাথা মুখের চার ধারে ওরকম কিছু একটা থাকলে মানাত ভাল।

মানুষের চার ধারে জ্যোতির্বলয় নেই! জ্যোতি না থাক, তার অস্তিত্বের একটা বলয় যে তার চারধারে নিয়ে বেড়ায়। সেটা হয়তো তার গায়ের উত্তাপ, রক্তের স্পন্দন, গায়ের বিশেষ গন্ধ। দেহ সবসময়েই বিকিরণ করছে তার অস্তিত্বের সংবাদ। ঠিক সেই রকম একজন মানুষ তার সারাজীবনের যা কিছু কাজ, স্বভাব এবং চিন্তারও একটা বলয় তৈরী করে নিজের অজান্তে। একে অন্যের বলয়ের মধ্যে এসে কী একটা টের পায়। কিন্তু ঠিক বুঝতে পারে না। তার নিজের অস্তিত্ব তাকে ব্যতিব্যস্ত রাখে বলে সে অন্যকে সঠিক বুঝতে পারে না। কিন্তু রমেন পারে। সে স্পষ্টতই মানুষের চারধারে তার বিশেষ বলয়টিকে অনুভব করে। যত মানুষ তার কাছাকাছি আসে, রাস্তায় উল্টোদিকে হেঁটে যায়, কিংবা রেল গাড়িতে বসে থাকে মুখোমুখী—তাদের প্রত্যেককেই বুভুক্ষু ভালবাসায় লক্ষ্য করে রমেন। সবসময়েই সে মানুষের সেই বলয়টির নিকটবর্তী হওয়ার সুযোগ খোঁজে।

যথাযথ সেই বলয়টিকে অনুভব করতে না পারলে মানুষের উপকার করতে যাওয়া বৃথা। তাই সেটা অনুভব করার জন্যই রমেন নিজেকে সতর্ক রাখে। অবিরল বীজমন্ত্র জপ করে সে। শব্দজাত উত্তাপ তার ভিতরটাকে ধিকি ধিকি জাগিয়ে রাখে।

পলাশপুর আধা গঞ্জ আধা গ্রাম। এখান থেকে কলকাতায় তরকারি চালান যায়, আর ভেড়ীর মাছ। মাটি একটু নোনা। ফলে ফসল ভাল হয় না খুব। মানুষগুলি যতটা মামলাবাজ ততটা দাঙ্গাবাজ নয়। মাঝে মাঝে রাজনৈতিক দলগুলি মিটিঙ করে এখানকার মানুষদের স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন করে দিয়ে যায়। একটু শিক্ষাদীক্ষার প্রসার হওয়ার ফলে মানুষ ক্রমে সব কিছুকেই অশ্রদ্ধা এবং অবিশ্বাস করতে শিখছে। নীতিবোধ কিছু ঢিলা।

রমেন চলতে চলতে মাঝে মাঝে দাঁড়ায়। চারদিকের আবহাওয়ায় কিছু একটা অনুভব করতে চেষ্টা করে। প্রতি জনপদেরই একটা বিশিষ্টতা আছে। অনেক মানুষ এক জায়গায় বসবাস করতে করতে কিছুটা একে অন্যের মতো হয়ে যায়। তাদের বোধ চিন্তার বিকিরণ সেই জায়গায় আবহাওয়াকে সম্মোহিত করে রাখে। কখনো রমেন মফঃস্বলের কোনো ছোট্ট শহরে পা দিয়েছে, আর সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হয়েছে এই জায়গায় কামুক লোকদের বসবাস, কোনো জনপদে গিয়ে তার মনে হয়েছে এ জায়গা অর্থলিপ্সুদের অধিকারে। প্রায় সময়েই দেখা গেছে যে তার ভুল হয়নি।

রমেন পলাশপুরে চষে বেড়াতে থাকে। সে লোকের কাছাকাছি যায়, দাওয়ায় বসে, কিংবা বহু দূরে হেঁটে যায় একসঙ্গে। মানুষ সংগ্রহ করতে চেষ্টা করে সে।

ওদিকে দীর্ঘ রাস্তা মোটর চালিয়ে গভীর রাতে ফিরেছে সঞ্জয়। তারপর বেলা পর্যন্ত ঘুমোচ্ছে নিঃসাড়ে। কাত হয়ে শুয়ে আছে সে। তেল-না-দেওয়া রুক্ষ চুলে ধুলোটে লালচে রঙ। এখনো চুল বাড়েনি সঞ্জয়ের। মায়ের শ্রাদ্ধের সময়ে কামানো হয়েছিল মাথা। তেল তেল করছে মুখ, গালে দাড়ি বেড়ে কর্কশ দেখাচ্ছে মুখখানা। হয়তো স্বপ্ন দেখছিল সঞ্জয়। তার ঠোঁটে একটু হাসির আভাস। সারা মুখখানায় কোনো পাপের চিহ্ন নেই, কিন্তু তাকে নিদারুণ পরিশ্রান্ত দেখায়।

রিণি এই দৃশ্যটা দেখল বার বার। কাল রাতে ঘুম থেকে উঠে সে সঞ্জয়কে দরজা খুলে দিয়েছিল। দেখেছিল হাসিমুখ সঞ্জয় দাঁড়িয়ে আছে দরজায়, হাতে স্যুটকেস।

ঘরে ঢুকেই জিজ্ঞেস করল—পিকলু কই?

পিকলু! পিকলুকে কি সঞ্জয়ের মনে ছিল?

স্যুটকেস মেঝের রেখে মশারি তুলে আধখানা শরীর ভিতরে ঢুকিয়ে ঘুমন্ত পিকলুকে 'বাবা সোনা' এই সব বলে আদর করেছিল সঞ্জয়। ঠিক বাবাদের মতোই, আদেখলাপনায়।

সম্ভবত সেটা ছিল রিণির মুখোমুখী হওয়ার অস্বস্তি থেকে পলায়ন। নইলে পিকলুকে কখনো হাত মুখ না ধুয়ে আদর করে না সে।

কিন্তু রিণি জানে, এ অস্বস্তিটুকু চিরকাল থাকবে না সঞ্জয়ের। বিয়ের পর প্রথম প্রথম সঞ্জয় বাইরে মদ খেলে কড়া জর্দা দেওয়া পান খেয়ে আসত। তবু টের পেত রিণি। টের না পাওয়ার ভাণ করত। ক্রমে ক্রমে সাহসী হতে হতে সঞ্জয়ের হুইস্কির বোতল আজকাল খাওয়ার ঘরের ফ্রিজেই মজুত থাকে।

ঠিক সেই রকম দীপা মেত্তামোর ব্যাপারটাও একদিন সঞ্জয় প্রকাশ্যে বলবে। রিণির মুখোমুখী দাঁড়াবে নিঃসঙ্কোচে সরল গাছের মতো। সে দিনের কথা ভাবলে রিণির ভয় করে।

কাল রাতে যে সঞ্জয় আসবে তার খবর আগে দেয়নি। ফলে খাবার ছিল না।

খাকারসীর
এভারফ্রেশ
৬৭% 'টেরিন' ও ৩৩% কটন
মসৃণতা ও শীতলতার জন্য "এভারফ্রেশ" বিশেষভাবে মিশ্রিত। নানারঙের হালকা, সুন্দর, ফুলেভরা অভিনব ছাপাই ডিজাইনের শাড়ি ও পোশাকের জন্য হল "এভারফ্রেশ"।
"এভারফ্রেশ" — পুরুষদের জন্য সুটিং ও সার্টিং, তাছাড়া ১০০% কটনের টেরিলাইজড বস্ত্র, পরীক্ষিত ভাজ-নিরোধক — স্ক্রীন প্রিন্ট, ২×২ পপলিন, রঙিন ও ছাপাই কেমব্রিক, ভয়েল — ডবি ও জ্যাকার্ড ইত্যাদি।
আমাদের বস্ত্র সম্ভারে রয়েছে খাকারসীর
দি হিন্দুস্থান স্পিনিং ও উইভিং কোম্পানী লিমিটেড
দি ইণ্ডিয়ান ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী লিমিটেড
১০, এপোলো স্ট্রীট, বোম্বাই-১
পশ্চিম বঙ্গে 'এভারফ্রেশ' কাপড়ের এজেন্ট: মে: রামচন্দ্র

সঞ্জয় মুখে বলল—খেয়ে এসেছি।

কিন্তু বস্তুত আন্তরিক উন্মাদনায় তার খাওয়ার কথা মনেই ছিল না। তার মুখ চোখ সেই সাক্ষ্য দিচ্ছিল।

রিণি কথা না বলে রুটি টোস্ট করেছে, ডিম ভেজেছে, তৈরী করেছে কফি। সঞ্জয়ের খাওয়ার সময়ে মুখোমুখি বসে লক্ষ্য করেছে তার মুখ। সমুদ্রের আবহাওয়ায় থাকার ফলে মুখ একটু কালো দেখাচ্ছিল।

রিণি কেঁদেছিল সঞ্জয় ঘুমোনোর পর।

সকাল থেকে ঘুরে ফিরে রিণি আসছে শোওয়ার ঘরে। অকারণে সঞ্জয়ের মাথার নীচে বালিশ ঠিক করেছে। পিকলুকে বিছানা পেতে শুইয়েছে খাওয়ার ঘরে ডাইনিং টেবিলের ওপর। পাছে তার দাপাদাপিতে সঞ্জয়ের ঘুম ভেঙে যায়।

পিকলু এখন হামা টানে। টলমলে পায়ে কখনো দাঁড়ায়। তারপর ঝুপ করে বসে পড়ে। পাছে সে পড়ে যায় সেই ভয়ে শোওয়ার ঘর থেকে বারবার খাওয়ার ঘরে যাচ্ছিল রিণি।

এইভাবে সারা সকাল সে হাঁটছে। খাওয়ার ঘর থেকে শোওয়ার ঘর, আবার খাওয়ার ঘর। রিণি কোনো শারীরিক অনুভূতি টের পাচ্ছিল না। সকাল থেকে সে কিছুই খায়নি। কিন্তু তার খিদে পাচ্ছিল না, তেষ্টা পাচ্ছিল না। দুই ঘরে যাতায়াতে সে বোধ হয় মাইল খানেক হেঁটে ফেলল।

বেলা নটা নাগাদ টেলিফোন বেজে উঠতেই বুকের ভিতরে দুর দুর করে উঠল তার। দম বন্ধ হয়ে এল প্রায়। আজ সকালে সে প্রথম নিজের শরীর টের পেল।

—কে?

—আমি সেই লোক। সঞ্জয়বাবু ফিরেছেন?

লোকটা কোনো দিনই নিজের নাম বলে না। কিন্তু গলাটা এখন চেনা হয়ে গেছে রিণির।

—ফিরেছেন। রিণি কাঁপা গলায় বলে। প্রথম প্রথম টেলিফোন রেখে দিত রিণি। কিন্তু আজকাল রাখে না। লোকটা সঞ্জয়ের নানা খবর দেয় তাকে। এইরকম ভাবেই লোকটার সঙ্গে বোঝাপড়া এবং অদ্ভুত [illegible] তৈরী হয়েছে রিণির। সম্ভবত লোকটা সেই মেয়েটিকে ভালবাসে।

লোকটা কী যেন ভাবে। তারপর বলে—আপনি ওঁকে কিছু বলেননি?

—কী বলব।

—বলা উচিত। নইলে এরকম হতে থাকবে। আমাদের আর কিছুই করার থাকবে না।

রিণি চুপ করে থাকে।

লোকটা আত্মগতভাবে বলে—মেয়েটা এত সস্তা ছিল না বুঝলেন? কী করে যে ও একটা দোকানী করতে পারে! মানুষ কী রকম পালটায়!

রিণি চুপ।

লোকটা আস্তে করে বলল—আমি আজ সঞ্জয়বাবুর সঙ্গে তাঁর অফিসে দেখা করব। যদি উনি কথা শুনতে না চান তবে—

লোকটা এইটুকু বলে ইতস্তত করলে রিণি চমকে উঠে জিজ্ঞেস করে—তবে কী করবেন?

—কিছু একটা করব। সামথিং হার্শ। আমার অনেক বন্ধু আছে। মেয়েটিকে বাঁচানোর দরকার, আপনাকেও।

টেলিফোন রেখে দিয়ে রিণি আবার ঘুরতে থাকে। খাওয়ার ঘর থেকে শোওয়ার ঘর, আবার খাওয়ার ঘর।

সঞ্জয় চোখ মেলে তাকিয়ে সকালের ঝলসানো রোদ দেখে চোখ মিটমিট করে। অভ্যাসবশত ঘুম চোখে হাত বাড়ায় রিণির জন্য। পায় না। পাশে ফিরে শূন্য বিছানাটা দেখে। সাদা এবং প্রকাণ্ড বিছানা। রিণি কোথায়! কেটে পড়ল নাকি? সঞ্জয় চমকে ওঠে।

ধড়মড় করে উঠতে গিয়ে সে রিণিকে দেখে, এ ঘর থেকে শ্লথ পায়ে ও ঘরের পর্দার আড়ালে চলে গেল।

শুয়ে থেকেই একটা সিগারেট ধরায় সঞ্জয়। সকালের এত স্পষ্ট আলো তার সহ্য হয় না। এত স্পষ্টতা তার অসহ্য লাগে। তার মনে হয় এরপর থেকে সারা-জীবন দিনের চেয়ে রাতটাই তার বেশী ভাল লাগবে।

মানুষকে যেদিন বালীগঞ্জ স্টেশন থেকে চলে যেতে দেখল বিভু সেদিন ফেরার পথে ট্যাক্সিতে খুব অন্যমনস্কভাবে বসে ছিল সে। গড়িয়াহাট পেরিয়ে যাওয়ার পর লক্ষ্য করল সামনে আর একটা ট্যাক্সি। পিছনের কাচ দিয়ে দেখা যায় একটি মেয়ে আর একটি ছেলের ঘনিষ্ঠতা।

প্রথমটায় তেমন খেয়াল করেনি বিভু। কিন্তু ট্যাক্সিটা আগাগোড়া তার ট্যাক্সির আগে আগে চলছিল। এতেই সামান্য উষ্ণতা বোধ করেছিল সে। কেন ওই ট্যাক্সিটা আগে আগে যাবে! তারপর রাস্তার উজ্জ্বল আলোয় সে লক্ষ্য করে মেয়েটার মাথা ভেঙে ছেলেটার ঘাড়ে পড়ল, তারপর আবার সোজা হয়ে গেল। ওদের দুজনেরই অবস্থা একটু বেসামাল।

বিভু তখন হাত বাড়িয়ে ট্যাক্সিওয়ালার কাঁধ ছুঁয়ে বলল—ওই ট্যাক্সিটাকে ওভারটেক করো, সর্দারজী।

ট্যাক্সিওয়ালারা বিভুকে খানিকটা চেনে। যারা চেনে না তারাও চিনে নেয়। ফলে সর্দারজী নিঃশব্দে ঘাড় নেড়ে হর্ন দিল।

ত্রিকোণ পার্কের কাছে দুটো ট্যাক্সির জানালা সমান্তরাল হলে বিভু মুখ বাড়িয়ে দেখে মেয়েটার কোলে ছেলেটার হাত। বিভু চেঁচিয়ে বলল—এই শালা, সরে বোস।

ভীষণ চমকে হাত সরিয়ে নিল ছেলেটা। ট্যাক্সিওয়ালা ফিরে তাকাল। ওদের ট্যাক্সিটা সামান্য আঁকাবাঁকা হয়ে সোজা হল আবার।

ছাড়িয়ে এসে বিভু পিছন ফিরে দেখল ছেলেটা আর মেয়েটা অনেক দূরে সরে বসেছে। বিভু হাসল। পরিতৃপ্তির হাসি। শালা প্রেম করবে! দেশের এই অবস্থা, আর শালারা প্রেম করবে, আঁ!

মাঝে মাঝে আজকাল বিভুর অদ্ভুত সব

খেয়াল দেখা যায়। রাস্তা দিয়ে দুটি ছেলেমেয়ে জোড় বেঁধে যাচ্ছে, বিভু আসছে উল্টো দিক থেকে। এরকম অবস্থায় সে ঠিক দুজনের মাঝখান দিয়ে সোজা হেঁটে যায়, দুজনকে ছিন্ন করে, দূরে সরিয়ে। আনন্দ পায়।

রাসবিহারীর মোড়ের কাছে রসারোডে একদিন এই কাণ্ড করল বিভু। এবারের ছেলেটা হলুদ গেঞ্জী গায়ে, স্বাস্থ্যবান চেহারা। ফলে ঘুরে দাঁড়িয়ে ছেলেটা বিভুর কাঁধ চেপে ধরল।

বিভু ঘুরে দাঁড়িয়ে আপনমনে শান্তভাবে হাসল। আই! ছোকরার গায়ে জোর আছে। প্রেমিকাকে বীরত্ব দেখাতে চায়।

—কী হল এটা! ভদ্রভাবে হাঁটতে শেখোনি! ছেলেটা গরম খেয়ে বলে।

বিভু শুধু হাসে। গায়ে জোর থাকলে কী হয়। প্রেমিকরা তেমন নিষ্ঠুর হতে জানে না। তুমি কি পারো আমার মতো হৃদয়হীন হতে! পারলে তুমি হতে মাস্তান। কিন্তু তুমি তো তা নও।

বিভু কিছুমাত্র গায়ের জোর দেখাল না। কেবল অতিশয় হৃদয়হীনতায় ঠাণ্ডা মাথায় ডান হাতে দুটো আঙুলে শাঁড়াশীর মতো

তুলে লম্বা হাতে ছেলেটির চোখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল।

এই হল কায়দা, বুঝলে! শত রেগে গেলেও তুমি কখনো পারবে না কারো চোখে আঙুল ঢোকাতে। তোমার মায়া হবে।

ছেলেটা প্রথমে বুক ফাটা চীৎকার করে দু' চোখ চেপে ধরেছিল। চশমাপরা মেয়েটা প্রথমে বুঝতেই পারেনি কী হলো। তারপর বুঝতে পেরে সে তাড়া করল বিভুকে হাতের সাদা ভ্যানিটি ব্যাগটা অস্ত্রের মতো তুলে ধরে।

বিভু শান্তভাবে কয়েক পা দৌড়ে গেল। ভাগ্যক্রমে পেয়ে গেল ছুটন্ত বাস।

পা-দানিতে দাঁড়িয়ে দূরে থেকেই সে দেখল ছেলেটা ফুটপাথে গড়াগড়ি যাচ্ছে। বোধ হয় কাঁদছে। ভীড় জমে উঠছে আস্তে আস্তে।

প্রেম! শালা প্রেম! দেশের লোক বোমা বন্দুক খেয়ে মরে যাচ্ছে, ফসল ফলছে না জমিতে—তোমরা শালা প্রেম করবে! প্রেমের কি এই সময়। প্রেম দিয়ে কী হয় রে শালা জীবনে যে সর্বস্ব নিয়ে একটা মেয়ের পিছনে ল্যাং ল্যাং করে ঘুরবে একটা ছেলে!

বিভু এই রাস্তায় জোড়া ছেলেমেয়ে দেখলে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। কখনো দূরে থেকে চেঁচিয়ে আওয়াজ দেয়। মুখ খারাপ করে।

বিশু মাঝে মাঝে তাকে সাবধান করে দেয় —বড় বেশী উড়পাচ্ছিস। একদিন বেমক্কা মার খেয়ে যাবি তোর চেয়ে ঢের মাস্তান আছে।

কিন্তু বিভু বিড় বিড় করে। না তার চেয়ে বেশী কেউ নেই।

টুপু সেদিন মুদ্দালাকে তুলে দিয়ে এসেছিল তার পর দিনই ফুটপাথের দোকান থেকে স্কুল থেকে ফেরার পথে একটা দেশী লোহার লম্বা চকচকে ছুরি কিনেছিল। হাতলটা কাঠের। ছুরিটা এত লম্বা যে পকেটে আঁটে না।

পরদিন শানে ঘষে ছুরিটাকে আরো ছুঁচোলো করে তুলেছিল সে। বন্ধুরা দেখে বলল—বেশ ছুরি। কী করবি এটা দিয়ে।

—দেখিস।

টুপু ছেলেমানুষ। কিন্তু ঠিক ছেলেমানুষের মতো সে বলেনি কথাটা। স্টেশনে দিদির সামনে দিয়েই যখন বিভু হেঁটে গিয়েছিল তখন দিদির মুখের ভাব আর বাবার অসহায় শ্বাস টানা সে লক্ষ্য করেছিল। এর পর থেকেই তার নিজেকে বড় বেশী অসুখী মনে হয়েছিল। এত বিমর্ষ সে আর কখনো বোধ করেনি।

খোলা অবস্থায় ছুরিটা সে পকেটে রাখে। পকেটে হাত দিয়ে মাঝে মাঝে অনুভব করে হাতলটা। ছুরিটাকে নাড়ে, ঘোরায়। ফলে কয়েকবার তার হাত কাটল, ছুরির ডগায় ফুটো হয়ে গেল আঙুল।

রাতে মা বাবার চোখের আড়ালে দিদির শোওয়ার ঘরে একটা পুরোনো কোলবালিশ দেয়ালের সঙ্গে দাঁড় করিয়ে ছুরিটার প্রথম পাঠ নিল টুপু। আশ্চর্য কোলবালিশটা ঠিক ছুরি-খাওয়া মানুষের মতোই সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে গেল। পেটের ওপর হাতলটা রইল জেগে।

কেবল টুপু জানল, এ রকম হবে। আর কেউ জানল না।

টুপুর সিনেমায় যাওয়া বারণ। কিন্তু পোস্টার দেখে সে দুটো মার দাঙ্গার ছবি বেছে নিল। স্কুল পালিয়ে দেখে এল দুটো ছবি। তার চোখে মুখে এবং মনে যথেষ্ট হিংস্রতার সঞ্চার হয়ে গেল। ছবি দুটোর শেষে সত্য এবং অহিংসা এবং প্রেম ইত্যাদির কথা বলা হয়েছিল। টুপু সেগুলো মনে রাখল না।

আজকাল টুপু ডিটেকটিভ বইগুলো দু' বার করে পড়ছে।

বাইরে থেকে তাকে এখন বেশ ভাবুক আর গম্ভীর দেখায়। কেউ 'বিভুর শালা' বলে চীৎকার করে তাকে খ্যাপালে সে ফিরেও তাকায় না।

সে এই পারিবারিক দুর্দিনের শেষ দেখতে চায়।

কয়েক দিনই গা-ঘেঁষা দূরত্বে দেখা হল বিভুর সঙ্গে। আগের মতোই রাস্তা ছেড়ে পাশে সরে দাঁড়াল টুপু। ভয় পেল। চোখে চোখ রাখল না।

টুপু নানাজনের কাছে শুনে শুনে শিখেছে যে পেটটাই হল সবচেয়ে সুন্দর জায়গা। সেখানে হাড় নেই। ছুরিটা ঢুকিয়ে একটু আড়াআড়ি টেনে দিতে হয়। ছুরিতে খুব ধার থাকলে ব্যাপারটা মোটেই শক্ত না।

—

মাসখানেকের মধ্যেই আকাশের শেষ অংশটুকু ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল বিমানের মাথা থেকে। চিন্তাশক্তি ফিরে এল। এখন তাকে হাসপাতালের দালানের বাইরে যেতে দেওয়া হয়। সে মাঝে মাঝে বাগানে চলে আসে। চমৎকার বাগান। ভেজা মাটির গন্ধ। সে পপি আর চন্দ্রমল্লিকার সারির ভিতর দিয়ে ঘোরে। মালীদের সঙ্গে বন্ধুর মতো কথা বলে।

অপর্ণার প্রকাণ্ড গাড়িটা এসে প্রায় রোজই ফুলগাছগুলোর কাছ ঘেঁষে দাঁড়ায়।

প্রায় দিনই অপর্ণার সঙ্গে বাগানে দাঁড়িয়ে কথা বলে বিমান। কত কথা হয়।

আর কয়েক দিন পরেই বিমানের ছুটি হয়ে যাবে। তখন তারা দু'জনে এক অদ্ভুত স্বর্গ রচনা করবে—এই কথা ভাবে অপর্ণা। সে মাঝে মাঝে রমেন নামে সেই লোকটির প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করে। একদিন নিভৃতে মোটর গাড়িতে বসে সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল সেই মানুষের কথা যে মানুষ নিরন্তর সততায় তাকে রক্ষা করবে। আছে কি তেমন মানুষ। সাধু সন্ন্যাসীর মতো সেই লোকটা বলেছিল—আছে। বিমান। সেই যে চমকে গিয়েছিল অপর্ণা, তারপর আজও সে সেই সত্য কথাটা ভুলতে পারে না।

সত্য যে বিমান ছাড়া তার আর কেউ নেই।

যত দিন যায় ততই বিষণ্ণ হতে থাকে শাশ্বতী। ততই বিষণ্ণ হতে থাকে ললিত।

মাঝে মাঝে সে মায়ের দিকে চেয়ে থাকে। কাঠকুড়ুনীর মতো কোলকুঁজো মা ঘরের কাজ সারছে। খুট খুট করে ইঁদুরের মতো শব্দ করছে ঘরময়।

কেমন ছিল মায়ের সেই বয়সের চেহারা যখন ললিত ছিল তার কোলে?

কে জানে! ললিতের কেবল ইচ্ছে করে আর একবার শিশু হয়ে এই মায়ের কোলে ফিরে আসতে। মাকে আরো কত ভালবাসার ইচ্ছে ছিল তার, কিন্তু আচমকা ফুরিয়ে গেল বেলা।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

সাধারণ এসরাজের চেয়ে তার আওয়াজ অনেক বেশী। যে কোনো সভাসমিতি বা অভিনয়ে গানের দলে মাসোজীর চেহারাটি আগে চোখে পড়ত—তাঁর প্রকান্ড এসরাজ নিয়ে বাজাচ্ছেন। বাজনাতে চমৎকার হাত ছিল। তিনি চলে যাবার পর তাঁর এসরাজের গম্ভীর ধ্বনির অভাব খুবে বোধ করতাম। এইবার বলি ক্ষিতিমোহনবাবুর কথা।

তাঁর আর একটি নাম ছিল ঠাকুরদা। তিনি ছেলে বুড়ো সকলেরই ঠাকুরদা ছিলেন। কে যে ও'র এই নামকরণ করেছিল জানিয়ে। তবে খুবে রসিক ছিলেন বলে বোধ হয় ঠাকুরদা নামটি পেয়েছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্যের বা দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা যাঁরা বিদ্বান লোক তাঁরা করবেন। এখানে আমি শুধু তাঁকে আমাদের ঠাকুরদা হিসাবে যেমন দেখেছি তাই বলছি। তিনি অনেক সময় আমাদের রাত্তিরে খাওয়ার পরে বেড়াতে নিয়ে যেতেন। তার আগে রাত্তিরে বেড়াতে যাবার কল্পনা করতে পারিনি কোনোদিন। ঠাকুরদা নিয়ে যাচ্ছেন তাই হেমবালাদি বোর্ডিং-এর মেয়েদের মধ্যে যদি কেউ যেতে চাইত আপত্তি করতেন না। বেশীর ভাগ দিন গোয়ালপাড়া অবধি গিয়ে

ক্ষিতিমোহন সেন

[illegible] সেখানে গাছে গাছে অসংখ্য [illegible] করে থাকত, দেখে ভারি [illegible] তার আগে কখনো এরকম [illegible] দেখিনি। তার কারণ [illegible] তখনও বেশী [illegible] অনেক পরে আমার নিজের [illegible] দেখেছি কিন্তু [illegible] গাছে বসে তার [illegible] গাছটি নেড়া করে দিয়ে [illegible] জানলুম। [illegible] খারাপ হয়ে [illegible] করেছে দেখে। ঠাকুরদার [illegible] কবিতায় [illegible] যেতেন। আমাদের [illegible] ও সঙ্গে [illegible] বেড়াতে ভাল- [illegible] উঠে রোজ [illegible] তার কোনো [illegible]

যো নেই। ঠান্‌দিকেও তখন ডেকে নিয়ে যেতেন। ঠাকুরদার সঙ্গে অত তাড়াতাড়ি হাঁটতে ঠান্‌দি নিশ্চয়ই হাঁপিয়ে পড়তেন এটা অবিশ্যি আমার নিজের অনুমান। আমাদের ঠানদি হচ্ছেন পাতলা ছোটখাটো মানুষটি, ঠাকুরদার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবেন কেন?

নেপালবাবুর কথা বলতে ভুলে গেছি। গুরুপল্লীতে নেপালবাবু ও ক্ষিতিমোহনবাবু পাশাপাশি বাড়িতে থাকতেন ও দুই পরিবারের মধ্যে খুব হৃদ্যতা ছিল। নেপালবাবুর রংটি ছিল পাকা আমের মত, তার মনটি ছিলো শিশুর মত সরল। তিনি ভলো ছিলেন। কটা বাজল তাঁর খেয়াল থাকত না, ক্লাসের সময় ছেলেরা তাঁকে অনেক সময় খুঁজে বেড়াত। কাউকে খেতে বলে বাড়িতে বলতে ভুলে যেতেন। নেপালবাবু কখনো একবারে ট্রেন ধরতে পারতেন না এ নিয়ে সবাই তাঁকে ঠাট্টা করত। কেয়া ফুলের সময় রোজ কেয়া বনে ফুল তুলতে যাওয়া চাই। তখন খুব কেয়া হতো, এখন কেয়া ঝোপের অনেকখানি লেক কাটতে গিয়ে তার মধ্যে চলে গেছে। কেয়া বনে যাবার রাস্তাটা হচ্ছে আমার বাড়ির পাশ দিয়ে, তাই নেপালবাবু যখন যেতেন রোজ দেখতে পেতুম। তারপরে ফুল সংগ্রহ করে ফেরবার পথে কয়েকটা ফুল আমাকে দিয়ে যেতেন। নেপালবাবুর কেয়াফুলের খদ্দের অনেকেই ছিল। অমন সুন্দর গন্ধ, কার না লোভ হয়? এমনি করে পথে যেতে যেতে তাঁর ফুলের বোঝা অনেকখানি হাল্কা হয়ে যেত। কি করে যে নেপালবাবু একসঙ্গে অতগুলো কেয়া পেড়ে আনতেন—যে কাঁটা কেয়ার পাতায়। তিনি যে কি রকম শিশুর মত সরল ছিলেন তার একটা উদাহরণ দিই। আমার বাড়ির ছাত বড় নীচু হয়েছে বলে আমি খুঁতখুঁত করতুম, একদিন নেপালবাবু আমাকে পরামর্শ দিলেন—তাতে কি হয়েছে ছাতটা ভেঙে উঁচু করে দিতে বলুন।

জগদানন্দ রায় ছিলেন অঙ্কের শিক্ষক। বাইরেটা তাঁর ছিল রুক্ষ, আসলে কিন্তু তা নয়। তাঁর ক্লাসে ছেলেরা কোনোরকম দুষ্টুমী করতে সাহস করত না। প্রমথনাথের বইতে কোথায় যেন পড়েছি তিনি অঙ্কের খাতায় কি কবিতা লিখেছিলেন তাই দেখে জগদানন্দবাবু বুঝলেন যে এ ছেলের অঙ্ক হবে না। তারপর থেকে তাঁকে আর জ্যামিতি পড়তে হত না। আমার কিছু ভুলচুক হয়ে থাকলে প্রমথনাথ যেন মাপ করেন। বইটা হাতের কাছে নেই তা নইলে দেখে নিতুম। আগেই বলেছি তাঁকে দেখে মনে হত না যে, তাঁর মধ্যে কোনো কোমলতা থাকতে পারে। কিন্তু ছেলেরা জানত যে তাঁর কাছে বকুনি খেলেও তিনি একটু পরে তা ভুলে যাবেন এবং ওদের আবদার শুনবেন। বাবা যে কি

জগদানন্দ রায়

(অবনীন্দ্রনাথ কর্তৃক অঙ্কিত পোর্ট্রেট)

করে আবিষ্কার করলেন যে জগদানন্দবাবুর ভিতরে হাস্যরসের ফোয়ারা আছে সেটা খুব আশ্চর্য লাগে। comic part খুব ভাল করতে পারতেন। শারোদোৎসবে তাঁর লক্ষীশ্বরের অভিনয় অতুলনীয়। তিনি স্টেজে এসে দাঁড়ালেই তাঁর ভঙ্গি দেখে হাসি পেত।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]
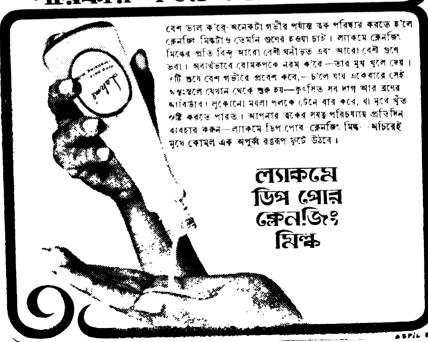
ভূমি সংস্কার নীতির মূল্যায়ন

সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে ভূমি সংস্কার সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। ভূমি সংস্কারের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন, ভূমির পুনর্বণ্টন করে ভূমিহীন কৃষকদের হাতে চাষের জন্য জমি তুলে দেওয়া ভূমি সংস্কারের অন্যতম উদ্দেশ্য হিসাবে অনুসৃত হবে। ভারত সরকারের ভূমিনীতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম এবং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী, উভয়েই বড় বড় জোতদারদের জমির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ভারত সরকারের ভূমি নীতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, (১) জমির মালিকগণ সর্বোচ্চ পরিমাণে কতটা জমি হাতে রাখতে পারবেন তার সীমা নির্ধারণ করা, (২) জমির সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেওয়ার পর উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া, (৩) পরিবারের ভিত্তিতে জমির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করা, (৪) মধ্যস্বত্বাধিকারের বিলোপ সাধন করা, (৫) সমবায় খামারের মাধ্যমে জমি চাষ করা এবং (৬) যে সমস্ত চাষী জোতদারের অধীনে কাজ করে তাঁরা যেন ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত না হন এবং ভাগ চাষীরা যেন নিজেদের অংশ ভোগ করতে পারেন তার ব্যবস্থা করা। ভারতের সবগুলি রাজ্যেই ভূমি সংস্কারের কাজ এগোচ্ছে। তবে বিভিন্ন রাজ্যে জোতদারের জমির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে বিভিন্নভাবে। খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী বলেছেন ভূমিনীতিকে ফলপ্রসূ করার জন্য রাজ্য সরকারগুলিই উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং এজন্য জোতদারের জমির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করার দায়িত্বও রাজ্য সরকারের।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমি-সংস্কারের অবদান অপরিসীম; বিশেষ করে কৃষি-প্রধান দেশে ঠিকভাবে ভূমি সংস্কার না হলে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাওয়া দুরূহ ব্যাপার। ভূমি স্বত্বের পরিবর্তনের ফলে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ বাড়তে পারে। কৃষকদের হাতে জমি এলে উৎপাদন বাড়াবার কাজে কৃষকদেরও উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণা বাড়ে। যাঁরা নতুন জমির মালিক হন, তাঁদের জমির উপর মালিকানা সম্পর্কে নিরাপত্তার অভাব যেন না থাকে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। যদি জমির নতুন মালিকরা জমির উপর মালিকানা সম্পর্কে নিশ্চিত হলে নতুন বিনিয়োগ করার কাজে এগিয়ে আসতে পারেন এবং তার ফলে একর প্রতি উৎপাদন বাড়তে পারে। সুষ্ঠু ভূমি সংস্কারের ফলে শুধু যে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন এবং বিনিয়োগ বেড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে তাই নয়, নতুন ভূমি ব্যবস্থায় কৃষকদের অবস্থা উন্নত হয় এবং তার ফলে গ্রামীণ সঞ্চয়ের পরিমাণও বেড়ে যায়। দেশের মূলধন সৃষ্টির হার বাড়াতে ভূমি সংস্কার এভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। যাঁরা জমির নতুন মালিক হন, তাঁরা যদি উন্নততর কলাকৌশলের মাধ্যমে এবং সমবায়ের ভিত্তিতে উৎপাদন বাড়াবার কাজে মনোনিবেশ করেন, তবে দেশের সামগ্রিক কৃষি-উৎপাদন বেড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। জমির পুনর্বণ্টন আমাদের ভূমিনীতির অন্যতম প্রধান অঙ্গ। সমাজতন্ত্রের আদর্শে যদি অর্থনৈতিক নীতি পরিচালিত হয়, তবে জমির পুনর্বণ্টন হওয়ার প্রয়োজন। কিন্তু দেখতে হবে যাঁদের হাতে নতুন জমি তুলে দেওয়া হচ্ছে, তাঁরা যেন তার উপযুক্ত হন।

ভাগচাষিগণ যাতে তাঁদের ন্যায্য অংশ জোতদারদের কাছ থেকে পান তার নিশ্চয়তা প্রদান করা উচিত। তা না হলেই ধান কাটার সময়ে গোলযোগের আশংকা থাকে। কিন্তু কৃষকগণ যদি জোর করে জোতদারের জমি কেড়ে নিতে আরম্ভ করেন, তাহলে যে শুধু বিশৃংখলা এবং গোলযোগই ডেকে আনা হবে তা নয়, সেক্ষেত্রে জমির বিখণ্ডন (fragmentation of lands) হবে ও উৎপাদন বৃদ্ধির হার কমে যাবার আশংকা থাকবে। অবশ্য সব ক্ষেত্রেই যে এজন্য জমির বিখণ্ডন হবে এবং উৎপাদন কমবে তা নয়। বহুদিন ধরে কৃষকগণ জমিদারদের দ্বারা শোষিত হয়েছেন একথা অস্বীকার করা যায় না। আজ জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ করে "লাঙ্গল যার, জমি তার" এই নীতি ভিত্তিতে ভূমি সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। ভূমি সংস্কারের মূল উদ্দেশ্যকে সফল করতে হলে বিশৃংখলার পথে পা বাড়ালে চলবে না—শান্তিপূর্ণ উপায়ে কৃষকদের হাতে জমি এবং উৎপাদনের অংশ তুলে দিতে হবে। দেশে "সবুজ বিপ্লব" আনতে হলে উৎপাদন বাড়াবার দিকে বেশি দৃষ্টি দিতে হবে। শুধু তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে এবং হিংসার পথ ধরে উৎপাদন বাড়ানো যায় না।

গ্রেট ব্রিটেন কি ইউরোপের সাধারণ বাজারে ঢুকতে পারবে?

ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে ঢোকার চেষ্টা গ্রেট ব্রিটেন বহুদিন ধরেই করছে। যতদিন ফ্রান্সের লৌহমানব দ্য গল ক্ষমতায় আসীন ছিলেন ততদিন ব্রিটেন বহু চেষ্টা করেও ইউরোপের সাধারণ বাজারে ঢুকতে পারেনি। এখন ফ্রান্সের যিনি প্রেসিডেন্ট তিনিও দ্য গলেরই অনুগামী। সম্প্রতি নেদারল্যাণ্ডের হেগে সাধারণ বাজারের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির শীর্ষ সম্মেলনে ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে গ্রেট ব্রিটেনের অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নটি আবার উত্থাপিত হয়েছিল। ফরাসী প্রতিনিধিবৃন্দ সম্মেলনে পৌঁছবার পর ব্রিটেনের তথাকথিত সমর্থকগণ প্রচার করতে শুরু করেন যে সাধারণ বাজারে ব্রিটেনের অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নে ফ্রান্স ভেটো প্রয়োগ করবে না; কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বিশেষ যোগাযোগ রাখার জন্য স্বাভাবিকভাবেই গ্রেট ব্রিটেন ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে প্রবেশ করার যোগ্যতা হারিয়েছে। ফ্রান্সের দিক থেকে বলা যায়, সাধারণ বাজারে ব্রিটেনের অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নটি বিবেচনা করার জন্য এখনও প্রেসিডেন্ট পম্পিদু প্রস্তুত হননি। ব্রিটেনের কপাল মন্দ বলতে হবে। একদা বিশ্বের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী দেশ ব্রিটেনের অঙ্গুলিহেলনে ইউরোপের অনেক দেশ পরিচালিত হত। অবশ্য ফ্রান্সের সঙ্গে ব্রিটেনের রেষারেষি বরাবরই ছিল; ফ্রান্স এখন তার বদলা নিচ্ছে। যখন সময় ছিল, তখন ব্রিটেন ইউরোপের সাধারণ বাজারে প্রবেশ করেনি; এখন পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলির কাছে মাথা খুঁড়েও ব্রিটেন সাধারণ বাজারে ঢুকতে পারছে না। অনেকেই পূর্বে আশংকা করতেন যে গ্রেট ব্রিটেন ইউরোপের সাধারণ বাজারে প্রবেশ করলে ভারতের উপর তার গুরুতর প্রতিক্রিয়া হবে। কয়েক বছর আগেও এই

ব্যাপ্তিটির যতটা সারবত্তা ছিল, এখন আর ততটা নেই। কয়েক বছর আগেও ব্রিটেন ভারতের বাহির্বাণিজ্যের যতটা অংশ জুড়ে ছিল, এখন আর ততটা জুড়ে নেই। বর্তমানে ভারত পূর্ব ইউরোপ, পশ্চিম আফ্রিকা এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক সম্প্রসারণ করছে। কিন্তু এখনও ব্রিটেনের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তাই ইউরোপের সাধারণ বাজারে ব্রিটেনের অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নটি ভারত একেবারে অবজ্ঞা করতে পারে না। শুধু ভারত নয়, কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য দেশের উপরেও ব্রিটেনের সাধারণ বাজারে অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নটি বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে। ব্রিটেন যে তা বুঝতে পারে না এমন নয়। কিন্তু হ্যারল্ড উইলসনের সরকারের ভবিষ্যৎ অনেকাংশে এ প্রশ্নটির সঙ্গে জড়িত। তাই কমনওয়েলথের দেশগুলির উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে এই আশংকা থাকা সত্ত্বেও ব্রিটেনের ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে প্রবেশের চেষ্টা চলছে।

—সুব্রত গুপ্ত

পেশোয়ার থেকে লাণ্ডিকোটালের ভেতর দিয়ে এ বাস জালালাবাদ হয়ে কাবুলে পৌঁছবে দুদিনে। বাসের বাইরে ভিতরে ধুলো, আর ধুলো। রোদে হুকোওঠা, নিষ্পত্র লালমাটির দিকে দুদণ্ড তাকানও অসম্ভব। এ পরিবেশে কারও পিছনে না লাগলে সময় কাটে কি করে!

কিটু আপ্পারাওকে প্রশ্ন করল "আচ্ছা সেনিয়র ১৯৪৮ সালের অলিম্পিক ট্রায়ালে তুমি বাতিল হয়ে গেছলে সেই তুমি এই '৫৫ সালের কাবুলে সফরে ইণ্ডিয়া টীমের ক্যাপ্টেন হও কি করে?" আপ্পারাও স্মিত হেসে এক মনে 'চোটা' টেনে যেতে লাগল। আমি ছিলাম ওর পাশের সীটেই। প্রশ্ন করলাম "মেডিক্যাল চেক আপে বাদ পড়েছিলে বুঝি?" ও ঘাড় নেড়ে বলল "উঁহু"।

"তবে?" চোটাটা বাইরে ছুঁড়ে আপ্পারাও উত্তর দিল "আমার কেসটা ভারি ইন্টারেস্টিং। সেবারের ক্যাম্প শিলংএ। অসুস্থতার জন্য ক্যাম্পে অ্যাটেণ্ড করতে কয়েকদিন দেরী হয়ে গেছল। ইয়া মোটাসোটা তাগড়াই এক মিলিটারীর ওপর ছিল আমাদের পিটি করাবার ভার। ওসবে ত অভ্যস্থ নই। ঘণ্টাখানেক পিটির পর যখন সারা শরীর কাঁপছে, তখন আমার দ্বিগুণ ওজনের সেই মিলিটারি ইনস্ট্রাক্টার আমার কাঁধে চেপে অর্ডার দিল—ওকে নিয়ে মাঠ পরিক্রমা করতে।"

এখানে থামতেই বাসসুদ্ধ হৈহৈ করে উঠল "তারপর?" নতুন এক চোটায় আগুন লাগাতে লাগাতে স্বভাবসিদ্ধ হাসির ভঙ্গীতে আপ্পারাও বলল, "আরে মাথায় নিয়ে ঘুরব কি, তাকে মাথায় তুলতে পারলে ত? ব্যাস। ফিজিক্যালি আনফিট হয়ে তিনদিনেই ক্যাম্প থেকে আউট।"

সবাই নীরব। শুধু স্তব্ধতা গুনগুনিয়ে উঠতে লাগল—সামান্য ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাক্টারের অজ্ঞতা, চিরকালের বরেণ্য এবং স্মরণীয় এক ফুটবলারকে তার সারাজীবনের স্বপ্নকে ছুঁতে দিল না বলে।

ফুটবলারকে তাই বিশেষ করে মনে রাখতে হবে যে ফুটবল খেলাই তার মুখ্য এবং প্রধান উদ্দেশ্য। আর ব্যায়াম, দীর্ঘপথ দৌড়ন, সাঁতার কাটা, বাস্কেট খেলা, জিমন্যাস্টিক বা কুস্তি এগুলো করার ফুটবলারের একমাত্র উদ্দেশ্য, এই বিষয়গুলিতে পারদর্শী হওয়া নয়—ফুটবলারের শরীরে কো-অর্ডিনেশন অর্থাৎ প্রত্যেক অঙ্গের সঙ্গে প্রত্যেক অঙ্গের সামঞ্জস্য বোধ আনা এবং বাড়ানর জন্য। এবং এ নিঃসন্দেহে দীর্ঘ সাধনা সাপেক্ষ।

দীর্ঘ সাধনায় একই জিনিস বারবার করলে একঘেয়েমি আসে বলে এত বৈচিত্র্যের প্রয়োজন।

খালি হাতে ব্যায়ামকে ফুটবলারের শরীরে ফিটনেস আনবার 'অ আ ক খ' বলা যেতে পারে। ইংরাজিতে একেই বলা হয় পি টি। এ ব্যায়ামে যেমন কোন যন্ত্রপাতি লাগে না, তেমনি যে কোন অল্প উন্মুক্ত জায়গায় সারা বছরই করা যায়। এবং এতে যেমন অতি সহজ ধরনের ব্যায়ামও আছে, যা ফুটবলারের শারীরিক ফিটনেস আনবার গোড়ার দিকে লাগে, অথবা অনুশীলন ও খেলার আগে পেশীকে গরম করতে এবং শরীরের বিভিন্ন গ্রন্থির সচলতা আনতে, তেমনি শক্ত পিটিও আছে যা চূড়ান্ত শারীরিক ফিটনেস ছাড়া সম্ভব নয়। তাই এর সংখ্যা এবং বৈচিত্র্য এত বেশী যে এই রচনার পরিসরে তার বিস্তারিত আলোচনা অসম্ভব। তবে ফুটবলারের এইটুকু মনে রাখলেই চলবে যে তার পা কোমর, ঘাড় এবং পেটের পেশীগুলির কর্মক্ষমতা প্রথম এবং প্রধানত তাকে ফুটবল খেলায় সাফল্য এনে দেবার জন্য বিশেষ করে দরকার।

এক ব্যায়াম থেকে অন্য ব্যায়ামে যাবার আগে শরীরকে ২০।২৫ সেকেণ্ড বিশ্রাম দিতে হবে। প্রথম সপ্তাহে প্রত্যেকটি ব্যায়াম তিন চারবার, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সপ্তাহে আস্তে আস্তে বাড়িয়ে প্রত্যেকটি ১৬ বার পর্যন্ত করতে পারলে মূল লক্ষে পৌঁছান যাবে।

এই ব্যায়ামটি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ছোটার ভঙ্গিতে করতে হবে। আরম্ভে আলগাভাবে হাত দুটো পাঁজরার দুপাশে রাখ (ক)। হাঁটু কোমরের ওপর (খ) এবং (গ)-এর মত তোলবার চেষ্টা কর। প্রথমে ধীরে এবং একের পরে এক। ক্রমশ গতি বৃদ্ধি করে, আধ মিনিট তীব্র গতিতে করবার পর, আবার ধীরে ধীরে গতি কমিয়ে আন। সমগ্র প্রক্রিয়াটি প্রতিবারে এক থেকে দেড় মিনিট স্থায়ী হবে

আরম্ভে পা জোড়া করে সিধে হয়ে দাঁড়াও (ক)। বাঁ পায়ের পাতার ওপর ভর দিয়ে হাত দুটো ছবির (খ)-এর মত ছাড়িয়ে দাও। এবার দু হাত দিয়ে বাঁ পায়ের উরু (গ)-এর মত ৫ সেকেন্ড জড়িয়ে ধর। (ঘ)-এর ভঙ্গিতে এবং তারপর আরম্ভের (ঙ) ভঙ্গিতে ফিরে এস। চ, ছ, জ, ঝ অবিকল খ, গ, ঘ এবং ঙ-র মতই হবে। তফাৎ খালি বাঁদিকের বদলে ডান দিক

আরম্ভে পা ফাঁক করে আঙুলের ভেতর আঙুল দিয়ে হাত দুটো মাথার পিছনে রেখে দাঁড়াও (ক)। হাঁটু না ভেঙে কোমর থেকে শরীরের উর্ধাংশকে ঝাঁকুনি দিয়ে হাঁটুর কাছে (খ)-এর মত নিয়ে যাও। এবার উর্ধাংশ ঝাঁকুনি দিয়ে নিয়ে যাবে বটে, সেই সঙ্গে সঙ্গে বাঁদিকে বেঁকবে (গ)-এর মত। ডান কনুই বাঁ হাঁটুর লাইনে যাবে। (ঘ) ভঙ্গিটি (গ)-এরই অনুরূপ হবে। শুধু এ সময়ে বাঁ কনুই ডান হাঁটুর লাইনে যাবে। (ঙ) আরম্ভের অবস্থায় ফিরে আসবে
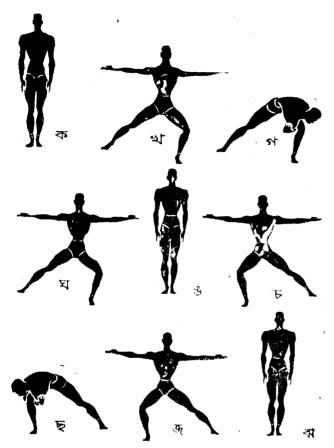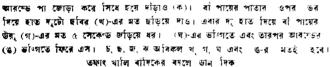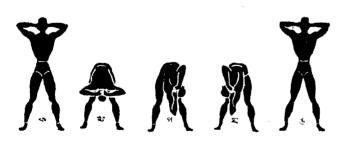
আরম্ভে আঙুলের ভেতর আঙুল দিয়ে মাথার পিছনে দু হাত দিয়ে দাঁড়াও (ক) দু পায়ের দূরত্ব থাকবে ১২ ইঞ্চি। কোমর থেকে শরীরের উর্ধাংশকে ধীরে ধীরে (খ)-এর মত পিছনে নিয়ে যাও। কনুই মাথার সমান্তরাল রেখায়, বুকের ছাতি ফোলান এবং দৃষ্টি আকাশের দিকে থাকবে। হাঁটু ভাঙবে না। আবার আগের অবস্থায় ফিরে এস (গ)

আরম্ভে হাঁটু অল্প ভেঙে দু হাত পিছনে রেখে দাঁড়াও (ক)। দু পায়ের দূরত্ব থাকবে ১২ ইঞ্চি। প্রথমে দু হাত সামনে এবং পরে আকাশের দিকে নিয়ে (খ)-এর শাদা অংশের মত জোরে শূন্যে লাফাও। মাটিতে নামবার পর শরীরের অবস্থান আরম্ভের অবস্থায় (গ) ফিরে আসবে

আরম্ভে পা ফাঁক করে দুহাতের পাতা জোড়া লাগিয়ে মাথার ওপর তুলে দাঁড়াও (ক) হাঁটু ভেঙে, বন্ধ হাতকে, দু পায়ের ফাঁক দিয়ে (খ)-এর মত যতটা পার পিছনে যাও। (গ) আরম্ভের অবস্থায় ফের

আরম্ভে কনুই না ভেঙে দু হাতের তালু মাটিতে রাখ। দুয়ের দু ফুট (ক)। মাথা থেকে গোড়ালি পর্যন্ত শরীর সিধে থাকবে এবং শরীরের পুরো ভারটা দু হাত এবং দু পায়ের পাতার ওপর পড়বে। দু কনুই ভেঙে (খ)-এর মত ধীরে ধীরে শরীর সিধে রেখে বুক মাটিতে ছোঁয়াও। এবং আস্তে আস্তে (গ) আরম্ভের অবস্থায় ফের
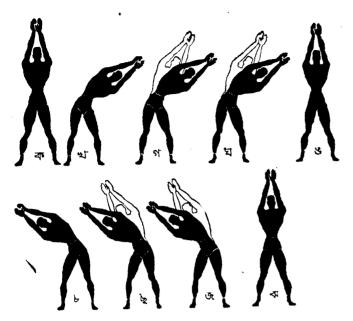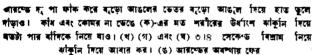
আরম্ভে পা ফাঁক করে দু হাত ছড়িয়ে দাঁড়াও। ঝাঁকুনি দিয়ে কোমরকে (ক)-এর মত বাঁদিকে নিয়ে যাও। (খ) (গ) (ঘ) ক-এরই অনুরূপ। শুধু প্রত্যেকবারের শেষে কোমরকে অল্প বিশ্রাম দিতে হবে। (ঙ) আরম্ভের অবস্থায় ফের। চ, ছ, জ এবং ঝ আগের মতই, বাঁদিকে না হয়ে ডান দিকে হবে

আরম্ভে চিৎ হয়ে শোও। দুই হাত দুই উরুর উপর রাখ (ক)। প্রথমে মাটি থেকে মাথা, তারপর কাঁধ (খ)-এর মত আস্তে আস্তে তোল। যতক্ষণ না পর্যন্ত বুকের শেষ পাঁজরা মাটি ছাড়ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সামনে যাও। এবং সেই সঙ্গে দুই হাত ও উরু ছোঁয়া অবস্থায় হাঁটুর দিকে যেতে থাকবে। ৫ সেকেণ্ড ঐ অবস্থায় থাকার পর আরম্ভে ফিরে এস

আরম্ভে দু পা ফাঁক করে বুড়ো আঙুলের ভেতর বুড়ো আঙুল দিয়ে হাত তুলে দাঁড়াও। কাঁধ এবং কোমর না ভেঙে (ক)-এর মত শরীরের ঊর্ধাংশ ঝাঁকুনি দিয়ে যতটা পার বাঁদিকে নিয়ে যাও। (খ) (গ) এবং (ঘ) ৩।৪ সেকেণ্ড বিশ্রাম নিয়ে ঝাঁকুনি দিয়ে আবার কর। (ঙ) আরম্ভের অবস্থায় ফের

চ, ছ, জ এবং ঝ আগের অনুরূপ। শুধু বাঁদিকের বদলে ডান দিকে হবে।
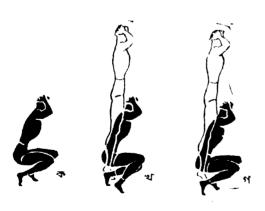
আরম্ভে পায়ের পাতার ওপর ভর দিয়ে হাঁটু গেড়ে বস (ক)। আঙুলের ভেতর আঙুল দিয়ে, দু' হাত মাথার ব্রহ্মতালুতে রাখ। দু' পায়ের দূরত্ব থাকবে ৮ ইঞ্চি। এবং বাঁ পা ডান পায়ের চেয়ে আট ইঞ্চি এগিয়ে থাকবে। এখন উপরে লাফাও এবং লাফান অবস্থায় (ক-এর সাদা অংশ) হাঁটু সিধে এবং দু' পা মাটি ছাড়বে। শূন্যে থাকাকালীন পা বদল হবে অর্থাৎ ডান পা আগে যাবে এবং বাঁ পা পেছিয়ে আসবে। খ-এর কালো অংশের মত পায়ের পাতার ওপর ভর দিয়ে মাটিতে ফিরে এস। এবং এবার লাফাবার আগে ডান পা থাকবে বাঁ পায়ের চেয়ে আট ইঞ্চি এগিয়ে।

(গ) আরম্ভের অবস্থারই অনুরূপ

এ ব্যায়ামে দুজনের দরকার আরম্ভে সামনের খেলোয়াড় হাঁটুতে হাত রেখে মাথা নীচু করে দাঁড়াবে (ক)। পিছনের খেলোয়াড় সামনের খেলোয়াড়ের পিঠে আলতো করে হাত রেখে (খ) এর মত দু'পা ফাঁক করে সামনে লাফিয়ে যাবে। লাফাবার সময় খেয়াল রাখতে হবে, পায়ের কোন অংশ সামনের জনের মাথায় না লাগে

আরম্ভে হাঁটা অবস্থায়, সামনের দিকে বাঁ পা আকাশের দিকে ছোঁড় (ক)। ডান হাঁটু অল্প ভাঙবে কিন্তু বাঁ হাঁটু যেন না ভাঙে। এই সময়ে সামনে ঝুঁকে ডান হাতের পাতা দিয়ে বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুল ছোঁও

(খ) আরম্ভেরই অনুরূপ। শুধু বাঁ পায়ের বদলে ডান পা হবে

আরম্ভে হাঁটু না ভেঙে, দু'পা তুলে সামনে লাফাও (ক)। লাফাবার শেষ মুহূর্তে (খ)-এর মত শূন্যে দু' হাত দিয়ে দু' পায়ের বুড়ো আঙুল ছোঁও

আরম্ভে দু পায়ের পাতার ভর দিয়ে হাঁটু ভেঙে বস (ক)। দু হাত কোমরে থাকবে সামনের দিকে ব্যাঙের মত লাফাও (খ) আরম্ভের অবস্থায় ফিরে এস (গ)
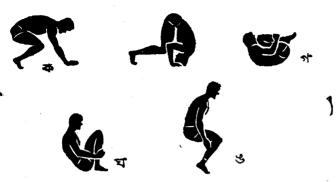
এ ব্যায়াম ম্যাট অথবা নরম ঘাসের ওপর ছাড়া করা উচিত নয়। আরম্ভে দু' হাত মাটিতে রেখে সামনের দিকে ঝুঁকে বস (ক)। সামনের দিকে (খ)এর মত গড়িয়ে যাও। মাথার ব্রহ্ম তালু যেন কিছুতেই মাটিতে না লাগে। শুধু ঘাড়ের পিছন এবং কাঁধ মাটি ছোঁবে। মাটিতে গড়াবার সময় (গ)-এর মত দু' হাত দিয়ে দু' পায়ের সিনবোন ধরতে হবে। এবং মাটি ছেড়ে উঠবার (ঘ) পূর্ব মুহূর্তেও হাত সিনবোনকে ধরে থাকবে। দাঁড়াবার সময় (ঙ) দু' হাত মুক্ত হয়ে যাবে
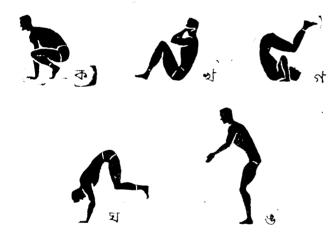
এ ব্যায়াম আগের ব্যায়ামের পাল্টি। আরম্ভে দু' হাতের পাতা মাটিতে রেখে হাঁটু পুরোপুরি ভেঙে বস (ক)। পিছনে গড়াও (খ)। মাটি ছাড়বার পূর্ব মুহূর্তে (গ)-এর মত দু' হাতের পাতা মাটি ছুঁয়ে থাকবে। চিবুক বুকের সঙ্গে লেগে থাকবে। (ঘ) এবং (ঙ) মাটিতে দাঁড়াবার অবস্থায় ফিরে আসার ছবি

আরম্ভে সামনে ছোট। প্রত্যেক পদক্ষেপে সামনের পা আকাশের দিকে ছোঁড়
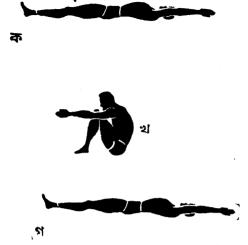
আরম্ভে চিৎ হয়ে শুয়ে মেঝের সঙ্গে সমান্তরাল করে হাত দু'টি ছড়িয়ে দাও (ক)। দু' হাত (খ)-এর মত সামনের দিকে বাড়িয়ে উঠে বস। দু' হাঁটু বুকে লেগে যাবে। (গ) আরম্ভে ফিরে যাও

ফাইনালের পর সভাপতি ফুলপ্যান্ট গুটিয়ে ফুটবলে শট মারছে, এ দৃশ্য অস্বাভাবিক হলেও বিরল নয়। একবার আমিই এইরকম এক গল্পের নায়ক হয়েছিলেম। বছর পাঁচ ছয় আগে বারুইপুরের ওদিকে ডিসেম্বরের কনকনে শীতে পিঠে রোদ লাগিয়ে বেশ খেলা দেখছি। খেলার শেষে ওখানকার কয়েকজন কর্মকর্তার উপরোধে ঢেঁকি গিলতে গিয়েই কাল হল। শুটিং-এর তীব্রতা বাড়াবার কায়দা দেখাতে গিয়ে তৃতীয় শুটিং এর পর চতুর্থ শুটিং এই চিরিং করে উঠল ডান পায়ের উরুর পেশী। তারপর চলল যথারীতি সভাপতিকে চ্যাংদোলা করে বাইরে নিয়ে যাওয়া, সারা সন্ধ্যা চোটে বরফ ঘষা এবং ওষুধ খাওয়া। সে এক এলাহি কাণ্ড। নিজেই আশ্চর্য হলাম এই ভেবে যে, যে আমি সকলকে ফুটবল খেলার উপদেশ দিয়ে বেড়াই—সে কি করে যথেষ্ট 'ওয়ার্মড আপ' না হয়ে জোরে জোরে শুট করতে গেল। এবং সেখানকার চোট আজও আমার সম্পূর্ণ সারেনি।

ফুটবলারকে কোন সময়েই ভুললে চলবে না যে কি দারুন গ্রীষ্মে, কিংবা প্রচণ্ড শীতে, শরীরের পেশী যথেষ্ট গরম না হলে শক্ত ব্যায়াম, তীব্র জোরে ছোটা অথবা খেলা কিছুতেই উচিত নয়। জুন, জুলাইতে আমাদের দেশে, দশ থেকে পনেরো মিনিট খালি হাতে উপরোক্ত সহজ পিটিগুলো করলেই যেখানে শরীরের পেশী যথেষ্ট গরম হবে, সেখানে ডিসেম্বর অথবা জানুয়ারিতে লাগবে ২০ থেকে ২৫ মিনিট। এবং তাও ফুটবলারের ট্রাক স্যুট কিংবা উলের ট্রাউজার এবং সোয়েটার পরে করা উচিত। শরীর যথেষ্ট গরম হলে অর্থাৎ বেশ ঘাম দেখা দিলে তবেই খেলায় যোগদান করা যেতে পারে। (ক্রমশ)

স্পাই (২)

রিষার্ট জরগে খাঁটি জরমন নাম। রিষার্টের পিতা ছিলেন খাঁটি জরমন, মা রুশ। জরগের জন্ম রুশ দেশে। জাপানে [illegible] জরগে সর্বজন সমক্ষে বলতে কসুর করতেন না যে রুশের প্রতি তাঁর অশেষ শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি আছে। তৎসত্ত্বেও কেউ কখনো সন্দেহ করেনি যে তিনি রুশের স্পাই, অতখানি কি করে হয়। ওদিকে তাঁর মূলে কর্ম ছিল জাপান সম্বন্ধে স্তালিনকে খবর দেওয়া এবং দ্বিতীয় সেই সুদূর জাপান থেকে জরমনির আভ্যন্তরীণ গুপ্ত খবরও সংগ্রহ করে তাঁকে জানানো—কি করে তিনি সংগ্রহ করতেন সেটা প্লানশেটে (প্লানচেটে) শার্লক হোমসকে আবাহন করলে হয়তো জানা যেতে পারে। জরগে ধরা পড়ার পর জাপানে প্রবাসী জরমন [illegible] সবাই এক বাক্যে বলেছেন, জরগে [illegible] তাদের কাছ থেকে জরমনি সম্বন্ধে কোনো খবর-খবর পাম্প তো করতেনই না, উল্টে নয়া নয়া খবর দিয়ে তাদের পিলে চমকে দিতেন; পরে সেগুলো কনফারমড হত।

জরগের চেহারাটি ছিল সুন্দর এবং পুরুষব্যঞ্জক। দীর্ঘ বলীয়ান দেহ। নাক চোখ ঠোঁট যেন পাথরে খোদাই অতি তীক্ষ্ণ। তাঁকে দেখে মনে হত যেন চ্যাম্পিয়ন [illegible] বিরাট কোনো মেলাতে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বেড়াচ্ছেন, কেউ তাঁর সঙ্গে লড়তে রাজী আছে কি না—

বলেছেন এরিষ করট্, জাপানে অবস্থিত জরমন রাজদূতাবাসের দুই নম্বরের কর্মচারী। অবশ্য টোকিয়োতে তিনি সবাইকে চ্যালেঞ্জ করতেন তর্কযুদ্ধে এবং জিততেন হামেশাই। কারণ তাঁর তূণীর ভর্তি থাকতো হরেক লেটেসট ইনটেলিজেনসের শরগুচ্ছে। অর্থাৎ নেকেড ফ্যাক্‌ট্‌স।

সেই যে গল্প আছে গ্রামাঞ্চলের দুই [illegible] জমিদার মোকদ্দমা লড়তে লড়তে আপিল করেছেন বাগদাদের শেষ আদালতে অর্থাৎ স্বয়ং খলীফা হারুন-উর-রশীদ এর শেষ ফাইনাল বিচার করবেন। এক জমিদার বাগদাদে এসে উঠলেন তাঁর সখা বাদশার প্রধানমন্ত্রীর প্রাসাদে। প্রতিবাদী উঠলেন তাঁর বাল্যের বান্ধবী বাদশার খাস প্যারা রক্ষিতার বাড়িতে। বাদী মোকদ্দমা হেরে গ্রামে ফিরলে পর সবাই বিস্ময় মেনে শুধোলে "প্রধানমন্ত্রীর বাড়িতে উঠেও আপনি মোকদ্দমার সুরাহা করতে পারলেন না?" বিজ্ঞজনোচিত কণ্ঠে বললেন, "তারা যে উঠেছিলেন রাজরক্ষিতার বাড়িতে। আমার কোন যুক্তি কোন নজীর দাঁড়াতে পারে "উলঙ্গ" যুক্তির বিরুদ্ধে, এগেনেসট নেকেড আরগুমেন্ট!"

জরগের বেশভূষা ছিল অপরিপাটি; তিনি বাস করতেন টোকিওর সবচেয়ে খাঁটির খাঁটি ঘিঞ্জি জাপানী মহল্লায়, এবং বাড়িটা চোখে পড়ার মত নোংরা। কিন্তু জাপানীদের আকর্ষণ করার মত কেমন যেন একটা চুম্বকের শক্তি তাঁর সর্বাঙ্গ থেকে বিচ্ছুরিত হত। তারা তাঁকে পুজো করতো বললে কমই বলা হয়। ওদিকে তাঁর চালচলন ছিল ভ্যাগাবন্‌ড, বেদে বা বোহেমিয়ান ধরনের। রমণীবাজী করতেন প্রচুর এবং মদ্যপান করতেন বেহদ্দ। তিনটে বোতল হুইস্কি ঘণ্টা কয়েকের ভিতর সাবড়ে দিতেন তিনি অক্লেশে—চোখের পাতাটি না কাঁপিয়ে এবং তাঁর চোখের সেই তীক্ষ্ণ জ্যোতিটির উপর সামান্যতম ঘোলাটে পোঁছ পড়তো না।

অর্থাভাব তার লেগেই থাকতো। ধরা পড়ার পর অনুসন্ধান করে জানা যায়, তাঁর আমদানি যে-কোনো মাঝারি রাজদূতাবাসের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের মত অতি সাধারণ। পরিষ্কার বোঝা যায়, তিনি কখনো তাঁর স্পাইবৃত্তি এক্‌সপ্লয়েট করেননি। তিনি স্পাই হয়েছিলেন কম্যুনিজমের প্রতি তাঁর আন্তরিক আদর্শবাদে প্রবুদ্ধ হয়ে।

জরগে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন রুশ এবং জরমনি উভয় দেশে। তাঁর স্বর্গত ঠাকুর্দা ছিলেন কারল্ মারকসের সেক্রেটারি। শিক্ষা সমাপনান্তে, প্রথম যৌবনে, এ শতকের দ্বিতীয় দশকে তিনি পশ্চিম জরমনিতে একটি কমুনিসট পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। অতঃপর তাঁকে তৃতীয় ইন্টারনেশনালের বৈদেশিক গুপ্তচর বিভাগে কর্ম দিয়ে স্কানডিনেভিয়া ও পরে তুর্কীতে গুপ্তচরবৃত্তি করতে পাঠানো হয়। তুর্কীরা এসব বাবদে অসাধারণ চালাক। গন্ধ পেয়ে যায় অচিরায়। জরগে কিয়তকাল জেল খাটলেন—তাঁর গুপ্তচরবৃত্তিতে এই একটি মাত্র কলঙ্ক; সর্বসাধারণ অবশ্য যুদ্ধ শেষের অনেক পরে এসব জানতে পায়। ১৯৩০ সালে রুশ সরকারের আদেশে তাঁকে পাঠানো হয় সাংহাইয়ে। এখান থেকেই আরম্ভ হয় তাঁর কৃতিত্বময় জীবন। ...জরগেকে যে জাপানী গোপন কোরট মারশালের সামনে দাঁড়াতে হয় সে মোকদ্দমার নথিপত্র মারকিনরা জাপান অধিকার করার পর হস্তগত করে। তার থেকে জানা যায়, জরগে

সাংহাইয়ে যেসব দেশী-বিদেশী কম্যুনিসটদের সংস্পর্শে আসেন তাঁদের অন্যতম হুজুমি ওসাকি নামের জনৈক জাপানী। এর পর এ'রা মস্কোর আদেশে টোকিও চলে আসেন।

প্রকাশ্যে তাঁর পেশা ছিল নাৎসি নির্দেশ চালিত (অবশ্য তখন তাবৎ জরমন প্রেসই গোয়েবেলসের কব্জাতে) ফ্রাঙ্কফুরটার আজগেমাইনে ৎসাইটুঙের সংবাদদাতারূপে। তবে তাঁর অনেক প্রবন্ধই ছাপবার মত সাহস সম্পাদকমণ্ডলীর ছিল না। তাঁরা সেগুলো না ছেপে চেপে যেতেন। সহকর্মীরূপে তাঁকে ক্লাউজেন নামক আরেক জরমন গুপ্তচর দেওয়া হয়েছিল। প্রকাশ্যে তাঁর ব্যবসা ছিল মোটর মেরামতী। ওদিকে ছিলেন সেরার সেরা রেডিয়োর ওস্তাদ। অবশ্য জাপান থেকে রুশের পূর্বতম সীমান্তে রেডিয়োবার্তা পাঠাতে জোরদার ট্রানসমিটারের দরকার হয় না—ধরা পড়ার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম। ক্লাউজেনও ধরা পড়েছিল কিন্তু তাঁকে জাপানীরা ফাঁসি দেয়নি; যুদ্ধশেষে রুশ দেশে ফিরে যাবার অনুমতি দেয়।

জরগে যখন ধরা পড়লেন এবং সামান্যমাত্র

অনুসন্ধানের ফল জানা গিয়েছে, তিনি নাম স্পষ্ট তখনই জাপানী মন্ত্রিমণ্ডলী [illegible] হতবাক। এ যে একেবারে অবিশ্বাস্য। এই মত যে জাপানী হজুমি ওসাকির নাম বললুম সেই লোকটি কি করে হয়ে গিয়েছিলেন প্রিন্স কনোয়ের সাতিশয় বিশ্বাসভাজন সহকর্মী। এই কনোয়েটি যে-সে ব্যক্তি নন। একে তো জাপানের তিন-চারটি খানদানীতম ঘরের একটির প্রিনস (ডিউক) তদুপরি তিনি তিন-তিনবার জাপানের প্রধানমন্ত্রীত্ব করেছেন—এঁর আদেশেই জাপান ত্রিশক্তি চুক্তিতে যোগ দেয়, হিটলার ও মুসোলিনীর সঙ্গে এবং এঁরই রাজত্বকালে পাকা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে—যদিও [illegible] করা হয় তাঁর পদত্যাগের পরে। এবারে পাঠক তারিখগুলো লক্ষ্য করবেন। ১৯৪০ জুলাই থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৪১ [illegible] ক্যাবিনেট পুনর্গঠনের জন্য মাত্র [illegible] দিন বাদ দিয়ে) কনোয়ে ছিলেন জাপানের সর্বময় কর্তা এবং হজুমি ওসাকি ছিলেন তাঁর পরম বিশ্বাসী অন্তরঙ্গজন। [illegible] গোপন মন্ত্রণাসভার আলোচনা-[illegible] ওসাকি কনোয়ের কাছে পেয়ে [illegible] জরগেকে গরমাগরম সরবরাহ [illegible] এবং এই চোদ্দ মাসেই জাপানের [illegible] ইতিহাসে সবচেয়ে মোক্ষম [illegible] মরণ-বাঁচন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় [illegible] সঙ্গে মৈত্রী, মার্কিনের সঙ্গে [illegible]। একেবারে গাঁজাখুরী অবিশ্বাস্য [illegible] হিটলার-সখা কনোয়ের পরম [illegible] ছিলেন হিটলার-বৈরী রুশের [illegible] এবং তিনি জাপানের গোপনতম [illegible] পাঠাচ্ছেন হিটলারের [illegible] এবং হিটলার বিনষ্ট [illegible] মাতৃভূমি জাপানেরও [illegible] সে তত্ত্বটি বোঝার মত [illegible] এই ঝানু গুপ্তচরের পেটে [illegible] গুপ্তচরবৃত্তিতে তালিম [illegible] কাছ থেকে। জরগে যে [illegible] সে কথা তো পূর্বেই [illegible]।

[illegible] অক্টোবর ১৯৪১-এ জরগে গ্রেফতার হন। ঠিক তার ৩২ দিন পূর্বে কনোয়ে মন্ত্রীত্ব পদ ইস্তিফা দেন। এ দুটোতে কোনো যোগসূত্র আছে কি না—আমার কাগজপত্র কেতাবাদি সে সম্বন্ধে নীরব। আমার মনে হয় পুলিশ কোনো গুপ্তচর সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া মাত্রই তাকে গ্রেপ্তার করে না। বেশ কিছু দিন তাকে অবাধে চলা ফেরা করতে দেয়। তার সহকর্মী চরদের চিনে নেয়। তার পর এক "শুভ প্রভাতে" বিরাট খেয়াজাল ফেলে সব কটা মাছ ধরে। ইতিমধ্যে কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধান কনোয়েকে অবশ্যই জানানো হয়েছে, যে তাঁর বিশ্বাসী ওসাকিই অশেষ পাপের পাপী, পঞ্চম পাতকী/তার চেয়ে বেশী পাপী বিশ্বাসঘাতকী।

এত বড় কেলেংকারির পর প্রধানমন্ত্রী থাকা যায় না। কনোয়ের রাজনৈতিক জীবন এইখানেই চিরতরে খতম। ১৯৪৫-এ তিনি আত্মহত্যা করেন। কনোয়ে ছাড়া আরও বেশ কয়েকটি খানদানী উচ্চকর্মচারীকে, জরগের নির্দেশে ওসাকি পারদর্শিতার সংগে দিনের পর দিন পাম্প করেছিলেন।

সামসনের মত জরগে পুরো এমারৎ ধূলিসাৎ না করতে পারলেও জাপান রাষ্ট্রের ভিতে যে ফাটল ফাটিয়ে যান সেটা কখনো মেরামত হয়নি।

চিত্রাঙ্কণ

গুড আর্ট। প্রকাশ কর্মকার। নীহারিকা প্রকাশন। ৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৯। প্রতি খণ্ড দু টাকা।

প্রকাশ কর্মকার প্রখ্যাত চিত্রকর। ভাল চিত্রকর। ভাল চিত্রকর হলেই যে ভাল আর্ট টীচার হওয়া যায়, সে কথা ঠিক নয়; আবার ভাল আর্ট টীচার হলেই যে, ভাল শিল্পী হওয়া যায় সে কথাও ঠিক নয়।

প্রকাশ কর্মকার কিন্তু ব্যতিক্রম। তিনি যেমন মস্তবড় শিল্পী তেমনই আবার ভাল শিক্ষক। তাঁর সদ্যপ্রকাশিত বই 'গুড আর্ট'-এ তিনি তা প্রমাণ করেছেন। গুড আর্ট তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। প্রথমটি সবে যারা ছবি আঁকা শিখবে তাদের জন্যে, প্রথম খণ্ড পাঠ করে যারা একটু পাকা হবে তাদের জন্যে দ্বিতীয় খণ্ড, এবং যাদের হাত আরও পাকা তাদের জন্যে তৃতীয় খণ্ড।

গোড়াতে লেখক বলেছেন ইতিহাসের কথা। কেমনভাবে আদি মানুষ জীবজন্তুর

ছবি এঁকেছে, কেমন ভাবে ছবি থেকে অক্ষরের সৃষ্টি হয়েছে ইত্যাদি। অক্ষর সাজিয়ে শব্দ লিখতে হয়। সেই ভাবে সরলরেখা, বক্ররেখায় সৃষ্টি হয় ছবি। নানান রকম রেখা সাজিয়ে গুছিয়ে কত সহজে ছবি আঁকা যায় তা শিখিয়েছেন এই লেখক-শিল্পী সুন্দর সরল ভাষায়। বাংলা দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে যেন একটা মস্তবড় অভাবের পূরণ ঘটলো। মনোরম মলাট, ঝকঝকে ছাপা।

প্রথমে শেখানো হয়েছে ছবিকে বর্গক্ষেত্রে ভাগ করে নিয়ে কপি করতে। পরে আবার বর্গক্ষেত্র ত্যাগ করে মধ্যম রেখার সাহায্য নিয়ে ছবি আঁকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কারণ বর্গক্ষেত্র করে নিয়ে ছবি আঁকা কতকটা মুখস্ত করার মত বিদ্যা। পাখি, ফল, ফুল, ঘটি, বাটি, কলম, দোয়াত এ সবের মধ্যে শেখার বিষয়বস্তু সীমাবদ্ধ নয় এ বইয়ে; কিভাবে রচনা (কম্পোজিশন) করতে হবে, নিসর্গ চিত্র কিভাবে আঁকতে হবে, প্রতিকৃতি কিভাবে আঁকতে হবে, প্যাটার্ন কিভাবে সৃষ্টি করতে হবে তাও পাওয়া যাবে এর মধ্যে। ছোটদের রচনার কিছু কিছু নমুনা যোগ করায় সিরিজটি আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। স্কুলের পাঠ্য হিসেবে তো বটেই, উপহার হিসেবেও 'গুড আর্ট' বাস্তবিকই চমৎকার সৃষ্টি। বড়দেরও এ বই কাজে লাগবে।

কিশোর সাহিত্য

বাদশাহী আংটি। সত্যজিৎ রায়। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-৯। চার টাকা।

দিগ্বিজয়ী চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায় এবার পুজোর পর আরও দুটি দিকে চমৎকার কীর্তি স্থাপন করলেন। একটি হলো, "দেশ"-এর পুজো সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর 'শব্দ ছক'—শুধু বাংলা ক্রশ ওয়ার্ড পাজলের অভিনবত্বের জন্যই নয়, খাঁটি বাংলা ছড়ার ধারায় তিনি সূত্র সন্ধানের জন্য লিখেছেন অপূর্ব ছড়া। আর দ্বিতীয়টি হলো, "বাদশাহী আংটি"র প্রকাশ। বাংলা

সাহিত্য ক্ষেত্রেও এই দীর্ঘ পুরুষটি মহীরুহ সদৃশ হয়ে উঠছে।

"বাদশাহী আংটি" কিশোরদের জন্য লেখা একটি গোয়েন্দা উপন্যাস। কিন্তু এই ধরনের বই বড়োরাও পড়লে কিছুক্ষণের জন্য অন্তত তাদের মনটা পরিষ্কার হয়ে যায়, এক ধরনের হাল্কা দুঃখ দুঃখ ভাব হয়। আমাদের মতন যারা দেড় যুগ দু'যুগ আগে কৈশোর ছেড়ে এসেছি, এই রকম বই পড়লে আবার খুব ফিরে যেতে ইচ্ছে করে সেই কৈশোরে।

তপেশ, যার ডাক নাম তপসে, তার বয়েস চোদ্দ। আর তার মাসতুতো দাদা ফেলুদার বয়েস সাতাশ। ফেলুদার গুণ অনেক, ভালো ক্রিকেট খেলে আর একশো রকম ইনডোর গেম জানে। মেমরি এত ভাল যে দু'বার রিডিং পড়েই 'দেবতার গ্রাস' মুখস্ত বলে দেয়। আর যেখানেই সে যায়, তাকে ঘিরে একটা রহস্য ঘনিয়ে ওঠে।

সুতরাং তপসে আর ফেলুদা যখন পুজোর ছুটিতে কাকার বাড়ি লক্ষ্ণৌ-এ বেড়াতে এলো, সেখানেও এক রহস্য। রীতিমতন রোমহর্ষক ব্যাপার। ওদের ধীরু কাকার বন্ধু ডাক্তার শ্রীবাস্তবের কাছে ছিল আওরঙ্গজেব বাদশার হীরের আংটি, সেটা চুরি হয়ে গেল। আর অমনি ফেলুদা উঠলো সজাগ হয়ে—নেমে পড়লো শখের গোয়েন্দাগিরিতে—তারপর নকল সন্ন্যাসী, কালো মোটর গাড়ি, অদৃশ্য আততায়ী, ভয় দেখানো চিঠি—হায়না, সাপ, কুমির—কত কি। সে এক সাংঘাতিক ব্যাপার। লক্ষ্ণৌ থেকে লছমনঝোলা পর্যন্ত নানান ঘটনা আর অ্যাডভেঞ্চার। আগাগোড়া রুদ্ধশ্বাসে পড়বার মতন, সব সময় কি হয় কি হয় আর হুডানিট—আর শেষ দৃশ্যে জঙ্গলের মধ্যে একটা কাঠের কুটীরেতে তপসে আর ফেলুদা বন্দী, মেঝেতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সাংঘাতিক কটকটে সাপ (র‍্যাটল স্নেক), কি হবে এবার! গল্পের শেষ বলে দিয়ে আমি পাঠকদের ক্ষতি করতে চাই না।

ফেলুদা ক্ষুদে শার্লক হোমস্, তপসে হলো ওয়াটসন। তপসে তার সাদামাটা বিচারবুদ্ধি দিয়ে পাঠকদের ভুল পথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে, আর ফেলুদা পাকা গোয়েন্দার মতন—সব সময় রহস্যময় কিছুতেই আগে থেকে কিছু ফাঁস করে না। ভালো জাতের গোয়েন্দা কাহিনীর মতন, এ বইয়ের শেষেও চমক আছে একটি নয়, দুটি।

ভারী নির্মল, সরস ভাষায় বইটি লেখা। বীভৎস কিংবা অরুচিকর ঘটনা একটিও

নেই। এ বইতে গোপন আততায়ী গুলি ছুঁড়ে চালাবার বদলে গুলতি দিয়ে মারার চেষ্টা করে। আর গোয়েন্দা ফেলুদাও ছোরা-বন্দুকের কারবার করে না, আত্মরক্ষার জন্য সব সময় তার সঙ্গে থাকে একটা ভয়ংকর অস্ত্র—এক কৌটো গোলমরিচের গুঁড়ো। বিপদের দৃশ্যেও প্রচ্ছন্ন কৌতুকের রস লেখক বজায় রেখেছেন।

ভালো গল্প দুর্লভ, কিন্তু শুধু ভালো গল্প লেখাই যথেষ্ট নয়—সত্যজিৎ রায়ের এই কাহিনীটি সাহিত্য গুণাশ্রিতও বটে। ১৪ বছর বয়স্ক তপেশের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কাহিনীটি বর্ণিত, ঐ বয়েসের ছেলের পক্ষে যেরকম ব্যবহার ও চিন্তা স্বাভাবিক তা খুবই ফুটে উঠেছে, ভাষায় ফুটে উঠেছে সূক্ষ্ম সৌকুমার্য। এক জায়গায় ফেলুদা'র গায়ে একটা চিঠি ছুঁড়ে দিয়ে গেল অপরাধীরা। ফেলুদা চিঠিখানা খুলে গম্ভীরভাবে বললো, হুঁ, উর্দুতে লেখা! পরে আমরা জানতে পারলুম, চিঠিটা বাংলা ভাষাতেই লেখা ছিল, দুটি মাত্র শব্দ, 'খুব হুঁশিয়ার' কিন্তু ফেলুদা মিথ্যে বলেনি, শব্দ দুটো এসেছে উর্দু থেকে। কাহিনীর বেশ সংকটজনক মুহূর্তেও অনায়াসে এসে পড়ে "Steal মানে হরণ, Horn মানে শিং, Sing মানে গান, Gun মানে কামান, Come on মানে আইস, I saw মানে আমি দেখিয়াছিলাম, এটা জানো?"

প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদের আগে একটি করে পূর্ণ পৃষ্ঠা বর্ণনা-চিত্র, সত্যজিৎ রায়েরই আঁকা। সে ছবিগুলো যে ভালো হবেই, সে তো বলার অপেক্ষা রাখে না। সত্যজিৎ রায়ের ছবির নতুন করে প্রশংসা করা মানে তো রসগোল্লাকে মিষ্টি বলা। কিন্তু একথা বলতে ইচ্ছে করে, চলচ্চিত্র জগত থেকে খানিকটা সময় বাঁচিয়ে সত্যজিৎ রায় যদি মাঝে মাঝে এরকম দু'একটি মধুর উপভোগ্য বই লেখেন, তা হলে বড্ড ভালো হয়। কিশোর পাঠ্য বই, যা বড়দেরও ভালো লাগে, সেরকম বই তো আজকাল আর লেখাই হচ্ছে না।

রংজগৎ

ক্যানাডার "প্রোলোগ"

ভারতের ফেস্টিভ্যাল

প্রতিযোগিতা-শাখায় যে ছবিগুলি দিল্লি ফেস্টিভ্যালে দেখানো হচ্ছে তার মধ্যে কোনটা কী-রকম এখানে বসে বলা কঠিন। জয়মাল্য এবার কোন দেশের ভাগ্যে জুটবে তাও বলা অসম্ভব। ফলাফল জানা যাবে দুরেকদিনের মধ্যেই।

আজকাল ইন্টারন্যাশনাল ফেস্টিভ্যালের উপর বড় বড় চিত্রপরিচালকরা আস্থা প্রায় হারিয়েই ফেলেছেন। শোনা যায়, প্রায় সব ঐতিহ্যমণ্ডিত ফেস্টিভ্যালেই নাকি এখন কোন না কোন অলিখিত নীতি অনুসৃত হয়ে থাকে। এই নীতি নাকি এবার রাজনীতি অথবা কূটনীতি-ঘেঁষা। অভিযোগ কতখানি সত্য জানি না, তবে ফেস্টিভ্যালের উপর আস্থা এখন অনেকেরই নেই।

আশা করা যায়, ভারতের ফেস্টিভ্যাল তথা উৎসবের পুরস্কার কোন অলিখিত নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। গত উৎসবে সর্বোচ্চ পুরস্কার পেয়েছিল সিংহলের "গ্যামপেরেলিয়া"। "পথের পাঁচালি"-অনুপ্রাণিত ওই ছবিকে পুরস্কার দিয়ে জুরী-বোর্ড দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। এবারেও সিংহলের লেস্টার জেমস পিয়েরিসের ছবি এসেছে।

ভারতের ছবি নাকি কিছুতেই জুটছিল না। শোনা গিয়েছিল, কোন ছবিই সিলেকশন কমিটির পছন্দ হয়নি। শেষ পর্যন্ত মৃণাল সেন রাজি হয়ে গেলেন "ভুবন সোম" দিতে। "ভুবন সোম" প্রতিযোগিতায় রয়েছে বলে আশার কথা। সত্যজিৎ রায় তাঁর কোন ছবি এই উৎসবে দিতে রাজি হননি।

আগেই বলেছি, এবারের কোন্ ছবি কোন্ স্তরের বলা সম্ভব নয়। নামকরা পরিচালকদের মধ্যে ভিসকন্তির "দি ড্যামড্" রয়েছে। আমেরিকার ছবি "স্টেয়ারকেস" নাকি দুই সমকামী পুরুষকে নিয়ে। চেকোস্লোভাকিয়ার "ফানি ম্যান", পোল্যাণ্ডের "রেড অ্যান্ড গোল্ড", সোভিয়েট রাশিয়ার "নো ওয়ান ওয়ান্টেড টু ডাই" প্রভৃতি ছবিগুলি সম্পর্কে লোকের প্রত্যাশা বেশী।

প্রতিযোগিতায় এবার ফ্রান্সের ছবি নেই। প্রতিযোগিতার বাইরে জ্যাক কার্ডিফের "দি গার্ল অন এ মোটরসাইকেল" রয়েছে। আন্দ্রে ওয়াইদার ছবি—"হান্টিং ফ্লাইজ"—অন্য একটি আকর্ষণ। এই ছবিটিও প্রতিযোগিতার জন্য নয়। ব্রিটেনের "ইসাডোরা", "থ্রি ইনটু টু ওনট গো" উল্লেখযোগ্য ছবি। ক্যানাডার "প্রোলোগ" ছবিটিরও সুনাম আছে।

তবু গত ফেস্টিভ্যালের ছবির তালিকা ফিল্ম-বোদ্ধাদের মনে যে প্রত্যাশা জাগিয়েছিল, এবারের তালিকা তা জাগাতে পারেনি। ভারতের ফেস্টিভ্যাল প্রথম শ্রেণীর ইন্টারন্যাশনাল ফেস্টিভ্যালের মর্যাদা এখনো পায়নি। এর কারণও আছে, এই ফেস্টিভ্যাল এখনও নাবালক। সম্ভবত এই ফেস্টিভ্যাল সম্পর্কে বিদেশের প্রথম সারির পরিচালকরা নিরুৎসাহ। তাঁদের উৎসাহ যাতে বাড়ে সে-ব্যাপারে কর্মকর্তাদের সচেতন হতে হবে। কী-ধরনের ছবি পুরস্কার পেল তার উপর ফেস্টিভ্যালের সম্মান অনেকখানি নির্ভর করে। প্রতিযোগিতার বাইরে এবার খুব ভাল ছবি আসেনি বলে দর্শকরাও নিরাশ। এ-বছর প্রতিযোগিতার ছবি দিল্লির বাইরে দেখানো হবে না। কিন্তু প্রতিযোগিতার বাইরের ছবিগুলির আসবার কথা। দর্শকের আশা কতখানি মিটবে কে জানে।

এ-আর-সি প্রোডাকশন্স-এর "রূপসী" চিত্রে (পরিচালনা : অজিত গাঙ্গুলি) সুলতা চৌধুরী, অনুভা ঘোষ ও সন্ধ্যা রায়

॥ চিত্র-সমালোচনা ॥

অপরিচিত

(আর ডি প্রোডাকশন্স)

এই ছবিটির বিজ্ঞাপনে আমাদের মানে দর্শকদের প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে—আমাদের মুখোস খোলা মুখের নির্লজ্জ চেহারা দেখতে। আমরা প্রস্তুতই ছিলাম, দেখলামও—কী আমরা দেখতে ভালবাসি। অতি পরিচিত চরিত্রদের সামনে রেখে "অপরিচিত" ছবিতে পরিচালক সলিল দত্ত একটির পর একটি অবাস্তব রীতি প্রয়োগ করে গেলেন, "কমার্শিয়াল" (বিশেষ অর্থে) ফিল্মে যা পেলে দর্শকরা খুশি হন।

অথচ ছবির শুরুতে কিন্তু প্রতিশ্রুতি ছিল অন্যরকম। ককটেল পার্টিতে নায়িকা সুনীতা (অপর্ণা সেন) বিলিতি নাচ নেচে চলেছে, এক ধারে দুই প্রৌঢ় (উৎপল দত্ত ও হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়) আলাপরত। তাদের কথা থেকে জানা গেল প্রিয়নাথ দাশের (উৎপল দত্ত) সঙ্গে সুনীতার কী যেন একরকম জটিল, অসুস্থ ও অসামাজিক সম্পর্ক; সুনীতা ওই ব্যক্তির অসৎ উদ্দেশ্য হাঁসিলের হাতিয়ার। বাইরের লোক জানে সুনীতা শিল্পপতি প্রিয়নাথের আশ্রিতা, কন্যাস্থানীয়া। সুনীতা কী জানে? সে কি এতদিন প্রিয়নাথের কাছ থেকে পিতৃ-স্নেহ পেয়ে আসছিল? এই প্রশ্ন দর্শকের মনে হয়ত জাগত না। জেগেছে যে তার কারণ আছে। বুদ্ধিমান প্রিয়নাথ নিজের সামাজিক মর্যাদা বাঁচাবার জন্য (তিনি আবার নির্বাচনপ্রার্থী) বন্ধু বীরেন্দ্রকিশোরের একান্ত সচিব শিবেনের (দিলীপ রায়) সঙ্গে সুনীতার বিয়ে দেবেন স্থির করলেন। শিবেন পঞ্চাশ হাজার টাকা পেয়েই খুশি

"মুক্তিস্নান" (পরিচালনা : অজিত গাঙ্গুলি) ছবিতে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও শ্যামল ঘোষাল

থাকবে, সুনীতাকে পাবে না। সুনীতা প্রিয়নাথেরই থাকবে—বিয়ের মুখোশ আর কি! সুনীতা এইসব ব্যাপারের পর বলেছে অর্থাৎ বুঝতে পেরেছে, ও আম তা হলে তার আশ্রিতা নই, রক্ষিতা। তবু ভাল, এত বুদ্ধিমতী (সোসায়েটির লোক-দের মাথা সে ঘুরিয়ে দিতে পারে) ও শিক্ষিতা মেয়ে শেষ পর্যন্ত এই কথাটা বুঝতে পেরেছে। প্রিয়নাথের পাপ কাজের সাগরেদ বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী—একটি বড় সংবাদপত্রের মালিক ও এডিটর (হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়)। সাগরেদ নির্বাচনে কী কল্পনা!

ছবির গোড়ায় তবু আভাস পেয়েছিলাম, বাস্তবের চেহারা দেখব, প্রিয়নাথ ও সুনীতার সম্পর্কের ভিতর দিয়ে অনেকের অপরিচিত একটি আত্মগোপনকারী সমাজের চিত্র হয়ত দেখা দেবে, সমরেশ বসুর কাহিনীও বোধহয় বাছা হয়েছিল সে-কারণে। কিন্তু গল্প চলল সেই পরিচিত ছকে। দস্তভয়েস্কির "ইডিয়ট"-এর মত (মূল বাংলা গল্পেও তার ছায়া) এল সুজিত (সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়), সুনীতার মানসিক রূপান্তর ঘটল। আমরা সুনীতার আসল চেহারা দেখতে পেলাম, অন্তরের অসহায়তার কথাও জানলাম সুজিতের দৌলতে। অর্থাৎ সুজিতই বুঝিয়ে দিয়েছে সুনীতাকে

আসলে সে কী। তাই তিন লাখ টাকার ডানাপটে রঞ্জন (উত্তমকুমার) যখন সুনীতাকে প্রিয়নাথের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল তখনও সুনীতা সুখী নয়। প্রিয়নাথ দেড় লাখ টাকায় সুনীতাকে নির্বাচিত পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে নিজের অধিকার বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। রঞ্জন একদা ঝড়ের মত এসে উপস্থিত হল সুনীতার জীবনে। জমিদার বংশের রঞ্জন, দুর্দমনীয় তার বাসনা, নিজের অধিকার জোর করে সে প্রতিষ্ঠা করে, নিজের প্রাপ্য সবলে ছিনিয়ে নেয়। রঞ্জন ভালবেসে ফেলেছে সুনীতাকে।

সুনীতা কিন্তু অতি সহজেই বেরিয়ে এল প্রিয়নাথের জাল থেকে। সত্যিই কি তাকে নিলামে চড়ানো হয়েছিল যে রঞ্জন তিন লাখ টাকায় তাকে কিনে নিয়ে আসবে? প্রিয়নাথের কোন চেষ্টাই দেখা গেল না সুনীতাকে নিজের দখলে রাখার ব্যাপারে। সুনীতা তবে অসহায় কী করে? সুনীতাই (যে সদা অসন্তুষ্ট) [illegible] আগে বেরিয়ে এল না কেন? ছবির শেষ অধ্যায়ে প্রিয়নাথকে আর দেখা যায় না। রঞ্জনের ঘরে এসেও সুনীতা চলে গেছে সুজিতের কাছে—যাকে সে ভাল না বেসে পারেনি। আবার ফিরে এসেছে রঞ্জনের কাছে। ওই ফিরে আসার মধ্যে আবার নাটকীয় স্বার্থ-ত্যাগ আছে—ফিল্মের মহৎ মেয়েরা যেমন প্রেমাস্পদকে ত্যাগ করে থাকে বিশ্বাসযোগ্য কারণ ব্যতিরেকেই। সুজিতকে ভালবাসে দোলা—বীরেন্দ্রকিশোরের কন্যা। সুনীতা চিঠিতে লিখে এসেছে সুজিত যেন দোলাকে বিয়ে করে। রঞ্জনের সঙ্গে সুনীতার বিয়ে ঠিক—বিয়ের পিঁড়ি থেকে সুনীতার অন্তর্ধান, চলে এসেছে সুজিতের কাছে। আবার রঞ্জন এসে তাকে নিয়ে গেছে। এবার আর বিয়ে নয়। রঞ্জন তখন ওথেলো—আর যাতে সুনীতা তাকে ছেড়ে যেতে না পারে সেজন্য গলা টিপে মেরে ফেলেছে মেয়েটিকে। ছবির শেষে রঞ্জন জেলে, সুজিতের স্নায়বিক ও মানসিক অসুস্থতা আবার বেড়েছে। সুজিত ছোটবেলা থেকেই স্নায়বিক বিকারে ভুগছিল। সহৃদয় ডাক্তার ডাঃ ঘোষ (তরুণকুমার) তাকে সারিয়ে তুলে কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন। পরিচালকের উদ্দেশ্য বোধহয় একটি অসুস্থ, অন্যায়ের জগতে একজন সুস্থ, ন্যায়নিষ্ঠ (আসলে অন্যরাই অসুস্থ, সুজিতই সুস্থ—এই বোধহয় বক্তব্য) লোক এসে কীভাবে মূল্যবোধ পালটে দেয় তা-ই দেখানো। সুজিত কিন্তু ছবিতে পুরোপুরি দস্তভয়েস্কির ইডিয়ট-এর মত নয়, বাংলা ফিল্মের চিরাচরিত হাবাগোবা চরিত্রের মত। এবং ওই জগতে তাকে উপলক্ষ করে যা ঘটেছে তা নিতান্ত ত্রিকোণ মেলোড্রামা। একটু অন্য ধরনের চরিত্র রঞ্জনের, সেও শেষে মেলো-

"সমান্তরাল" (পরিচালনা : গুরু বাগচী) ছবিতে ললিতা চ্যাটার্জি

ড্রামার শিকার। তাই প্রথম দিকে ওই চরিত্রে উত্তমকুমারের অভিনয়ও হয়েছে চমৎকার, খুবই শক্তিশালী অভিনেতা মনে হয়েছে তাঁকে; অতি নাটকীয়তার অংশে যদিও তাঁর অভিনয় অতিনাটকীয়। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের কথা বলার ধরন চরিত্রোপযোগী। সৎ, সরল ও বোকা একটি চরিত্র হিসাবে তাঁকে ভালই লেগেছে। অপর্ণা সেন সোসায়েটি গার্ল হিসাবে বেশ অভিনয় করেছেন, তাঁকে অস্বচ্ছন্দ মনে হয়েছে সীরিয়স মুহূর্তে। আর ওই চরিত্রের মুখে বড় বড়, পরিশীলিত কথা মানায় না। আরও বিশ্রী লেগেছে যখন টাঙ্গায় সুজিতের পাশে একটি মনস্তাত্ত্বিক মুহূর্তে আধুনিক গান (গানের সুর রবীন চট্টোপাধ্যায়ের) গেয়েছেন—অবশ্য এটা তাঁর দোষ নয়। সন্ধ্যা রায়ের (দোলা) বিশেষ কিছু করবারই ছিল না তবু সুজিতের প্রতি প্রেম তিনি দেখিয়েছেন। চরিত্রের অবিশ্বাস্যতা সত্ত্বেও নিপুণ অভিনয় করেন উৎপল দত্ত, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিকাশ রায়ের (শিবেনের বাবা)। দিলীপ রায় চরিত্র অনুযায়ী অভিনয় করেছেন। এবং বনানী চৌধুরী।

চিত্র পরিচালনায় যেটা টেকনিক্যাল দিক—দৃশ্যগ্রহণ, ছবির গতিরক্ষা ইত্যাদি—সে ক্ষেত্রে পরিচালক অবশ্যই কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এবং কৃতিত্ব দেখিয়েছেন নাটক-প্রিয় দর্শকদের তুষ্ট করার কাজে। ওই অর্থে ছবিটি "এন্টারটেনিং", মূল্য-বিচারের কষ্টিপাথরে নয়। তবে তিনি অপরিচিতের সঙ্গে দর্শকের সাক্ষাত পরিচয় কতখানি ঘনিষ্ঠ করে তুলছেন সে ভিন্ন কথা।

সত্যজিৎ রায়ের "অরণ্যের দিন-রাত্রি"-র মুক্তি নিয়ে গোলযোগ

সত্যজিৎ রায়ের নতুন ছবি, প্রিয়া ফিল্মসের "অরণ্যের দিনরাত্রি"-র মুক্তির

ব্যবস্থা হয়েছিল ১১ ডিসেম্বর। অগ্রিম টিকিট বিক্রির দিন ছিল ৭ ডিসেম্বর। ওই-দিন সংরক্ষণ সমিতি সেন্সর-ভিত্তিক চিত্র-মুক্তির দাবিতে নির্দিষ্ট হলের সামনে বিক্ষোভ জানাতে আসেন। একদল লোকের সঙ্গে তাঁদের সংঘর্ষ বাধে, ফলে তিনজন আহত হন। টিকিট বিক্রি বন্ধ থাকে।

ফিল্ম কনসালটেটিভ কমিটির সভাপতি শ্রী বি এন সরকার জানান, সেন্সারের তারিখ না মেনে চিত্রমুক্তির ব্যবস্থা হয়েছিল। তারই প্রতিবাদে এই বিক্ষোভ।

"অরণ্যের দিনরাত্রি"-র মুক্তি আসন্ন শোনা যাচ্ছিল কয়েকদিন থেকেই। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে তৈরি সত্যজিৎ রায়ের এ-ছবির প্রধান চরিত্রে শর্মিলা ঠাকুর, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, সমিত ভঞ্জ, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় এবং বোম্বাইয়ের সিমি অভিনয় করেছেন। সংগীত-পরিচালনা সত্যজিৎ রায়ের।

টলি-টিপ্পনী

নিশ্চিত কেন বাধ্যতে। তারারাও না। নইলে পাত্র ঠিক, বিয়ের তারিখও প্রায় ঠিক-ঠাক, নেমন্তন্ন চিঠিও নাকি ছাপা হয়ে গিয়েছিল, শেষ মুহূর্তে শোনা গেল আপাতত বিয়ে হচ্ছে না। তনুজার কথা বলছি। তনুজা শীঘ্রই জায়া হচ্ছেন, এ-সংবাদ চিত্রামোদীদের অজানা ছিল না। যত দূর মনে পড়ে, আমিও ইতিপূর্বে এই পত্রিকার কোন এক সংখ্যায় জানিয়েছিলাম, বিয়ের জন্যে তনুজা অনেক ছবির "ডেট" ক্যানসেল করেছেন। নভেম্বরে বিয়ে, সুতরাং সত্তর সালের এপ্রিল মাসের আগে কোন ছবির শুটিং করতে পারবেন না বলে

উনি নিজেই পত্রযোগে বাংলা দেশের একাধিক প্রযোজককে জানিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে অনেকেই একটু প্রমাদ গুনেছিলেন মনে মনে। "প্রথম কদম ফুল" ও "চৈতালী"-র শুটিং বন্ধ হয়ে গিয়েছিল অনির্দিষ্টকালের জন্যে। তনুজাকে নিয়ে যাঁরা নতুন ছবির পরিকল্পনা করেছিলেন তাঁরাও রীতিমত সমস্যায় পড়ে গিয়েছিলেন এই আকস্মিক সংবাদে। সম্প্রতি জানা গেল, তনুজা আবার সবাইকে "ডেট্" দিয়েছেন। পুরনো ছবির তো বটেই, নতুন ছবিরও। গত সপ্তাহে টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে তনুজার সঙ্গে দেখা। উনি জানালেন, আপাতত বিয়ে হচ্ছে না। তাই বলে বিয়ে নাকি একেবারে বন্ধ হয়ে যায় নি। আপাতত উনি নিয়তির হাতের খেলনা হয়ে বিয়ের "ডেট্" পিছিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন।

তনুজার নতুন ছবি সলিল সেনের "রাজকুমারী"। ৩ জানুয়ারী থেকে শুটিং শুরু হচ্ছে। নায়ক উত্তমকুমার। এ-ছবির সংগীত-পরিচালক হয়েছেন রাহুলদেব বর্মণ। বাংলাদেশে রাহুলের এটাই প্রথম ছবি। গানের টেকিং অবশ্য বাংলাদেশে হয় নি, বম্বে ফিল্ম সেন্টারে ছবির গানগুলি রেকর্ড হয়। গেয়েছেন কিশোরকুমার, আশা ভোঁসলে ও লতা মঙ্গেশকার। উত্তম-তনুজা ছাড়া এ-ছবির অপরাপর শিল্পী তালিকায় আছেন অসিতবরণ, ছায়া দেবী, দীলিপ রায় ও আরো অনেক। একটি নতুন নামও সংযুক্ত হবে সেই সঙ্গে। রমেন চ্যাটার্জী।

✻

গত সপ্তাহে একই দিনে দু-দুটি দুঃসংবাদ বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির অনেককেই মর্মাহত করেছে। সুচিত্রা সেনের স্বামী দিবানাথ সেনের মৃত্যু সংবাদের সঙ্গে সঙ্গেই আরো একটি দুঃসংবাদ শোনা গেল। লব্ধপ্রতিষ্ঠ চলচ্চিত্র ব্যবসায়ী শ্রীসত্যনারায়ণ খাঁ সম্ভবত আর ইহজগতে নেই। সেদিন নিউ থিয়েটার্স এক নম্বর স্টুডিওতে "মেঘ-কালো"র শুটিং ছিল। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য, শ্রীমতী সেন এ-ছবির নায়িকা, এবং সত্যনারায়ণ খাঁ ছবির পরিবেশক। সেদিন শুটিং বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। চণ্ডীমাতা ফিল্মসও ছুটি। সুচিত্রা সেনের টেলিফোন নম্বরে বার বার ফোন করেও লাইন পাওয়া যাচ্ছিল না। সমব্যথী হয়ে অনেকেই বোধ করি টেলিফোনে শ্রীমতী সেনকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন। বিকেলের দিকে আমি যখন টেলিফোনে জিজ্ঞাসা করলাম, দুঃসংবাদটি সত্য? অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে শ্রীমতী সেন জবাব দিলেন, "হ্যাঁ।" মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে তারযোগে ৩০ নভেম্বরই ওঁর কাছে খবর এসেছে হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ২৯ নভেম্বর শ্রীসেন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

—বিচক্র

আর্ট মুভজ্-এর "প্রতিবাদ" (পরিচালনা : তপেশ্বর প্রসাদ) ছবিতে মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় ও বিশ্বজিৎ

নান্দীকারের নতুন নাটক

নান্দীকারের নতুন প্রযোজনা বহু প্রতীক্ষিত 'তিন পয়সার পালা'র প্রথম অভিনয় ১৪ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে দশটায় নিউ এম্পায়ার মঞ্চে। ব্রেখটের 'দ্য থ্রি পেনি অপেরা' অনুসরণে নাটকটির রূপান্তর করেছেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্দেশনার দায়িত্ব তাঁরই। নান্দীকারের প্রতিটি শিল্পী এই নাটকটিতে অভিনয় করছেন।

আর্ট-ইস্ট'এর দুটি নাটক

পশ্চিমবঙ্গের কয়েক হাজার নাট্য-সংস্থার তালিকায় আর একটি নতুন নাম যুক্ত হল। আর্ট-ইস্ট সেই নতুন নাট্যদলের নাম। 'মানুষকে দেশাত্মক প্রাণশক্তিতে বলীয়ান করে তুলতে সংস্কৃতির দান অনস্বীকার্য'— এই বাক্যে বিশ্বাস করেন আর্ট-ইস্ট'এর সদস্যরা। তার প্রমাণ তাঁদের প্রথম অভিনীত নাটক নির্বাচনে পাওয়া যায়। গত ৩ ডিসেম্বর রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চে তাঁরা উৎপল দত্তের 'এক দেহে লীন' এবং অমর গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দ্বান্দ্বিক' নাটক দুটি অভিনয় করলেন। দুটি নাটকই আকারে ছোট।

'এক দেহে লীন' নাটকের পটভূমি ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের একটি পার্বত্য অঞ্চল। সীমান্তরক্ষাকল্পে এ গ্রামের সাধারণ মানুষকে গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করবার প্রচেষ্টাকে নাট্যকার ব্যক্ত করেছেন। ভারতীয় জওয়ানদের আচার-আচরণ সম্পর্কেও কটাক্ষ করা হয়েছে। যার ফলে নাট্যকার যে 'খোশখেয়ালে' এ নাটক রচনা করেননি, বিশেষ একটি উদ্দেশ্য সেখানে ক্রিয়াশীল, তা দর্শকদের কাছে জলের মত স্পষ্ট। এ নাটকের বিষয়বস্তু সকলের কাছে সর্বাংশে গ্রহণীয় হবে কিনা বলা কঠিন। সমবেত অভিনয়ের গুণে এই নাটকটিই কিন্তু সকল শ্রেণীর দর্শক উপভোগ করেছেন। প্রয়োগের রূপটিও অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন।

'দ্বান্দ্বিক' নাটকটিতে শ্রমিক সংগ্রামের একটি খণ্ডরূপ উপস্থিত করা হয়েছে। আবেগের উপকরণ এ নাটকে কিছু বেশি। কোথাও কোথাও তা অতি-নাটকীয়তার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। কিন্তু প্রয়োগের আশ্চর্য নৈপুণ্যে এ নাটক দর্শকচিত্তকে মথিত করেছে। পকেটমারের ভূমিকায় নাট্য-পরিচালক শ্রদ্ধানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয়। অন্যান্যদের অভিনয়ও নিন্দনীয় নয়, তবু, তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে কমল ভট্টাচার্য ও দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম।

দুটি নাটকই পরিচালনা করেছেন শ্রদ্ধানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। চমকপ্রদ আঙ্গিকের কোন সাহায্য ছাড়াই যে তিনি নাটক দুটিকে উপভোগ্য করে তুলতে পেরেছেন তার জন্য সাধুবাদ তাঁর প্রাপ্য। আশা করব পরবর্তী পর্যায়ে আরও আধুনিক এবং নিরীক্ষামূলক নাট্য প্রযোজনায় অগ্রণী হবেন তাঁরা। সে ক্ষমতা তাঁদের লক্ষ্য করেছি বলেই এই আশা।

রাশিয়ান ব্যালের মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান

চাইকভ্স্কির 'সোয়ান লেক' একটি নিরবচ্ছিন্ন ব্যালে। কিছুকাল আগে এই শহরের চিত্রগৃহে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে এর

উপস্থাপনা দেখবার সুযোগ হয়েছিল। কিন্তু মঞ্চে, ব্যালে নর্তকীদের প্রত্যক্ষ উপস্থিতির ফলে সোয়ান লেকের দৃশ্য যে কত সজীব আর সুন্দর হয়ে উঠতে পারে সেটা উপলব্ধি করবার অবকাশ হল সেদিন। ১লা ডিসেম্বর, সন্ধ্যায়, রবীন্দ্রসদনে। প্রখ্যাত ব্যালেগোষ্ঠী, লেনিনগ্রাদ্ ম্যালি আকাদমির বত্রিশজন শিল্পীর সমাবেশে সেদিনকার ব্যালে-নৃত্যের অনুষ্ঠান আমাদের কাছে এক বিরল অভিজ্ঞতা। অবশ্য চারটি অঙ্ক-সম্বলিত 'সোয়ান লেক'-এর সমগ্র রচনাটি তাঁরা উপস্থিত করেন নি। কেবল দ্বিতীয় অঙ্কটির অভিনয়ের আয়োজন করে বস্তুত তাঁরা সুবিবেচনারই পরিচয় দিয়েছেন। তার কারণ, প্রথমত যে-অর্কেস্ট্রার সুর 'সোয়ান লেক'-এর প্রায় অবিচ্ছেদ্য সম্পদ, তাকে প্রকাশ করা হয়েছে কেবল পিয়ানো, আর অংশবিশেষে বেহালার মাধ্যমে। যদিও এই দুটি যন্ত্রবাদনে যথাক্রমে পদ্‌গোরেলায়া ওল্‌গা পেট্রোভ্‌না এবং গেলার আইজাক গ্রিগোরিভিচের দক্ষতার অভাব ছিল না, তাহলেও সোয়ান লেকের আবহ-সংগীতের অপরূপ ধ্বনিব্যঞ্জনা যে তাতে পরিপূর্ণ ফুটে উঠতে পারে না, তা বলাই বাহুল্য। দ্বিতীয়ত, উপযুক্ত মঞ্চসজ্জা আর আলোক-প্রক্ষেপণের ব্যবস্থা না থাকায় সমগ্র রচনাটিকে মনোজ্ঞ করে তোলা সম্ভব হত না। কিন্তু যে অংশটি আলোচ্য অনুষ্ঠানের উপজীব্য ছিল, সেই দ্বিতীয় অঙ্কে মধ্যরাত্রে সরোবর-প্রান্তে বিষণ্ণ রাজকুমার সিগফ্রিদের সঙ্গে নায়িকা ওডেটের প্রথম সাক্ষাতের একটি রোমান্টিক মুহূর্তে অপরূপ ব্যঞ্জনা নিয়ে ফুটে উঠেছে। এই মুহূর্তটি রচনায় অন্যান্য ব্যালেরিনা-সহ গ্যালিনা পলাখ, আর নিকিতা ডলগুশিনের নৃত্যভঙ্গিমা যেমন স্বচ্ছন্দ, তেমনই সুন্দর অভিব্যক্তির গুণে সার্থক।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয়ার্ধ ছিল মিশ্র-ধরণের। কিছু লোক-নৃত্য, কিছু আধুনিক ব্যালের অংশ-বিশেষ আর পূর্বোক্ত বেহালা-শিল্পীর একটি মনোজ্ঞ বেহালার অনুষ্ঠান এই অংশে পরিবেশিত। লোক-নৃত্যগুলির মধ্যে কৌতুকের মিশ্রণে কয়েকটি বেশ সুন্দর উপভোগ্য মুহূর্ত সৃষ্টি হয়েছিল। বিশেষত লায়াডভের 'ডলস'—যেখানে খাঁটি বিলিতি স্প্রিঙের পুতুলের ভঙ্গিতে দুজনে আশ্চর্য সাবলীলভাবে নেচে মাতিয়ে দিয়ে গেল তা দর্শকদের অনেকদিন মনে থাকবে। এর পাশে, আডান-রচিত ব্যালের 'পা দ্য দু'র (দ্বৈত-নৃত্য) অংশে রোমান্টিক আবেগ-রচনায় ভ্যালেন্তিনা মুখানোভা-সহ নিকিতা ডলগুশিনের কৃতিত্বও প্রশংসনীয়।

মিনকাসের 'বায়াডেরকা'র একটি দৃশ্যের অভিনয় দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি। সমগ্র-ভাবে এই অনুষ্ঠানটি নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ ও মনোজ্ঞ। কিন্তু অর্কেস্ট্রা মঞ্চ-সজ্জা আর আলোক-নিয়ন্ত্রণ ছাড়া ব্যালের পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য তো প্রত্যাশিত নয়। আর তাছাড়া, অনুষ্ঠানপত্রে ব্যালের কাহিনীগুলি দেওয়া থাকলে দর্শকদের অনুষ্ঠানগুলি অনুসরণে সুবিধা হত।

—আনন্দ বর্ধন

মুক্তি পথে "মুক্তিস্নান"

রাধারাণী পিকচার্সের চতুর্থ ছবি "মুক্তি-স্নান"-এর মুক্তি আসন্ন। কাহিনী রচনা করেছেন শক্তিপদ রাজগুরু। চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : অজিত গাঙ্গুলী। সুর : রাজেন সরকার। প্রধান চরিত্রগুলিতে রূপ দিয়েছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, কমল মিত্র, পাহাড়ী সান্যাল, কালী ব্যানার্জী, শ্যামল ঘোষাল, জহর রায়, হরিধন, অজয় গাঙ্গুলী, গঙ্গাপদ বসু, গীতা দে, ছায়া দেবী, সমর চ্যাটার্জী, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, ললিতা চ্যাটার্জী প্রভৃতি।

পরলোকে শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙালীর প্রথম চিত্রগৃহ [illegible] কলকাতার পূর্ণ থিয়েটারের (পূর্বে [illegible] রসা থিয়েটার) স্বত্বাধিকারী শ্রীশশাঙ্ক-শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় (তুলসীবাবু নামে বেশী পরিচিত) গত ৮ ডিসেম্বর (সোমবার) তাঁর কলকাতাস্থ বাসভবনে পরলোক গমন করেছেন। চন্দননগরের কাছে তেলেনীপাড়ার জমিদার বংশে তাঁর জন্ম। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯। [illegible] চার পুত্র ও স্ত্রী রেখে গিয়েছেন।

বিশিষ্ট চিত্রপ্রদর্শক হিসাবেই তিনি পরিচিত ছিলেন না, বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের একজন একনিষ্ঠ সেবক রূপেও তিনি সকলের শ্রদ্ধাভাজন হয়েছিলেন। [illegible] দশকের প্রথম ভাগে বাংলা দেশের এক [illegible] থেকে অপর প্রান্তে ট্যুরিং সিনেমা প্রদর্শনের ব্যাপারে তিনি অগ্রণী ছিলেন। তিনি প্রথম জীবনে তাঁর পিতা মনোময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে চিত্রপ্রযোজনার ক্ষেত্রে যুক্ত ছিলেন। তখন তিনি বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র। তাঁরা "গ্রাফিক আর্টস" নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে "বঙ্গবালা", [illegible] "অভিষেক" প্রভৃতি ছবি পরিবেশনের ভার নিয়েছিলেন।

চলচ্চিত্রের নানা সমস্যার সমাধানে কাজে তিনি এগিয়ে এসেছেন। [illegible] কিছুকাল আগেও চলচ্চিত্রশিল্পের [illegible] তাঁকে সক্রিয় দেখা গেছে। চিত্রপ্রদর্শক হিসাবে তিনি বাংলা ছবির স্বার্থরক্ষার কথা আগে ভাবতেন। গত দুই মাস যাবত তিনি রোগশয্যায় ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে [illegible] চলচ্চিত্রশিল্প একজন অভিভাবক হারালেন।

অরণ্যদেব

লী ফক

আফ্রিকার উপকূল ··
১৫৩৬ খ্রীষ্টাব্দ ··
এই জলদস্যুরাই হত্যা করেছে আমার বাবাকে। নিজের চোখে সেই হত্যাকাণ্ড আমি দেখেছি।
হত্যা করে আমার বাবার পোশাকটাও ও কেড়ে নিয়েছিল।

ডায়ানা, আমার গল্প প্রায় শেষ হয়ে এল।

প্রতিজ্ঞা করছি, জলদস্যুদের উচ্ছেদ করব।
পুরুষানুক্রমে অন্যায় ও অবিচারকে·

4/20

পৃথিবীর আর-এক প্রান্তে।

বাবা যা বলে- ছিলেন, ঠিক তাই!

যখনই সুযোগ পাই, এই ঢিপিটা দেখে যাই!
মনে হয় যেন পিতৃপুরুষের ভিটে দেখতে এসেছি।

আমার গল্প ফুরিয়েছে, ডায়ানা। কিছু বলবে?
গল্পটা আবার শুনতে ইচ্ছে করছে।
আগামী সপ্তাহে : নতুন কাহিনী (১৬)
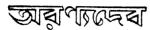
সারা রাজ্যব্যাপী বাংলা কংগ্রেসের গণ-অনশন এই সপ্তাহের বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ‘হিংসা ও শরিকী সংঘর্ষ’ প্রতিরোধে বাংলা কংগ্রেস ১ ডিসেম্বর সোমবার থেকে সারা বাংলায় অনির্দিষ্টকালের জন্য সত্যাগ্রহ শুরু করেছেন। সারা রাজ্যে ১১৩টি অনশন কেন্দ্র এবং সত্যাগ্রহীর সংখ্যা ১৫০০। দলের সভাপতি ও পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় এদিন সকাল ৮টা থেকে আরও ৩১ জন সহকর্মীর সঙ্গে কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ পারকে (কার্জন পারক) ৭২ ঘন্টার জন্য অনশন আরম্ভ করেন। নিজ-রাজ্যে অরাজকতার বিরুদ্ধে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর অনশনের ঘটনা ভারতে অভূতপূর্ব। সকাল থেকে অধিক রাত্রি পর্যন্ত হাজার হাজার মানুষ অনশনব্রতী মুখ্যমন্ত্রীকে দেখতে যান, তাঁকে শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জানিয়ে আসেন। অন্যদিকে এই অনশনের জন্য কিছু লোক সুরেন্দ্রনাথ পারকে মুখ্যমন্ত্রী এবং বাংলা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ করে। বিক্ষোভকারীরা মুখ্যমন্ত্রীকে লক্ষ্য করে চটিজুতো দেখায়, তাঁর গায়ে শালপাতা ও কাগজের ঠোঙা, ফলের কুচি ছুঁড়ে মারে। বাংলা কংগ্রেসের এই সত্যাগ্রহের তৃতীয় দিন সুরেন্দ্রনাথ পারকে এক বিরাট জনসমাবেশে অনশনরত মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন:—আইন-শৃঙ্খলার যদি উন্নতি না হয় তবে দরকার হলে ছেঁড়া-জুতোর মত মন্ত্রিত্ব ছেড়ে চলে যাব। মরব তবু আদর্শভ্রষ্ট হবো না। বাংলাদেশের সর্বনাশ হতে দেব না।

দেশী সংবাদ

১ **ডিসেম্বর**—নব কংগ্রেসের সভাপতি পদের জন্য মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ সময় ছিল আজ বিকাল ৫টা। ওই সময়ের মধ্যে আর কেউ মনোনয়নপত্র দাখিল না করায় শ্রীজগজ্জীবন রামই একমাত্র প্রার্থী। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ৯ ডিসেম্বর। ওই দিনই তাঁকে নির্বাচিত বলে ঘোষণা করা হবে।

শিল্পপতি শ্রীশান্তিপ্রসাদ জৈন ও সরকারের একজন প্রতিনিধির মধ্যে যে চুক্তি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে—তার প্রতিলিপি রাজ্যসভায় পেশ করার দাবিতে কংগ্রেস সদস্যরা বিরোধী-সদস্যদের সঙ্গে একযোগে সভায় হই-হট্টগোল শুরু করে দেন।

২ **ডিসেম্বর**—গৌহাটিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু বলেন যে, যদি যুক্তফ্রন্ট ভেঙে যায় তাহলে তাঁদের দল (মারকসবাদী কমিউনিসট পার্টি) যে কোন পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত। তিনি বলেন যে, তাঁর দফতর কেড়ে নেওয়া চলবে না। তিনি আরও বলেন যে, উপর থেকে ফ্রন্ট ভাঙা যাবে, কিন্তু জনতার ঐক্য কিছুতেই ভাঙা যাবে না।

৩ **ডিসেম্বর**—বাংলা কংগ্রেস ও মুখ্যমন্ত্রীর অনশন সত্যাগ্রহের ফলে যে রাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য আজ যুক্তফ্রন্টের পাঁচটি দল বাংলা কংগ্রেস, সি পি আই, ফরওয়ার্ড ব্লক, এস ইউ সি এবং ফ্রন্টপন্থী প্রজাসমাজতন্ত্রী দলের প্রতিনিধিরা আলাদাভাবে বৈঠকে মিলিত হন। বিভিন্ন কারণে সি পি এম-এর আচরণে বিক্ষুব্ধ দলের প্রতিনিধিরা এই প্রথম একটা আলোচনায় বসলেন।

খাঁ আবদুল গফফর খাঁ আজ পাটনায় এক বিরাট জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন যে ভারতীয় জনগণের বড়লোকদের হাতের পুতুল হওয়া উচিত নয়। এই বড়লোকেরাই তাদের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করছেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও বড়লোকদের কারসাজি। ওই সব দাঙ্গায় গরিবরাই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৪ **ডিসেম্বর**—আজ বড়বাজারে প্রচণ্ড হাঙ্গামা ঘটে। পুলিস কাঁদানে গ্যাস ছাড়ে, লাঠি চালায়, অবশেষে চার রাউণ্ড গুলি ছোড়ে।

তিনজন নিহত হয়। পুলিস জনতায় মিলিয়ে আহতের সংখ্যা ৫০ জন। ৩০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই গোলমাল চলে। দোকানপাট, যানবাহন সব বন্ধ থাকে।

গুজরাটের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীফতে সিংরাও গায়কোয়াড় আজ অতর্কিতে প্রধানমন্ত্রীর দিকে তাঁর সমর্থন তুলে নিয়েছেন এবং স্থির করেছেন যে, গুজরাট প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি ও রাজ্য সরকারের সঙ্গে তিনি সন্তোষজনকভাবে সহযোগিতা করবেন। অর্থাৎ তিনি আদি কংগ্রেসে ফিরে গেলেন।

৫ **ডিসেম্বর**—সর্বশ্রী বিভূতি দাশগুপ্ত, মাখন পাল, অশোক ঘোষ, নির্মল বসু যুক্তফ্রন্টের বর্তমান সংকট মিটমাটের জন্য চেষ্টা করছেন বটে, তবে সি পি এম নেতা শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত জানান যে, যুক্ত ফ্রন্টের এই সংকট দূর করতে হলে সব-কিছুর আগে বাংলা কংগ্রেসকে অনশন সত্যাগ্রহ বন্ধ করতে হবে এবং যুক্ত ফ্রন্ট ও সি পি এম বিরোধী কুৎসা থামাতে হবে। তারপর সকলের সব অভিযোগ নিয়ে যুক্ত ফ্রন্টের ভিতরে আলোচনা শুরু হতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী আজ সংসদীয় দলের কর্মসমিতির সভায় বলেন, সংসদ ভেঙে দেওয়ার কোন উদ্দেশ্য তাঁর নেই। প্রধানমন্ত্রী সংসদ ভেঙে দেওয়ার কথা ভাবছেন এই ধরনের সংবাদের প্রতি দলের সম্পাদক শ্রী বি শঙ্করানন্দ তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বলেন, অন্তর্বর্তী নির্বাচনের কোন কথাই ওঠে না।

৬ **ডিসেম্বর**—মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ও উৎসব-মুখর পরিবেশের মধ্যে ভারতের দশম তৈল শোধনাগারের শিলান্যাস করে আজ হলদিয়াতে কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও রসায়ন দফতরের মন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেন বলেন, ‘এই শোধনাগারের ভিত্তি স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে হলদিয়াতে এক বিরাট শিল্প সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠল।’

আজ তমলুকে এক বিপুল জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জি আবেগরুদ্ধকণ্ঠে বলেন, এই তমলুকেই জীবন শুরু করেছিলাম; জীবন সায়াহ্নে আবার এখানেই প্রতিজ্ঞা নিচ্ছি রাজনীতির নামে যারা অরাজকতা চালিয়ে যাচ্ছে তাদের আমি স্তব্ধ করব, করব, করব।”

৭ **ডিসেম্বর**—বিশদিন পর আজ বিকালে কলকাতা বন্দরে ডককর্মী ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হয়েছে। ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে মীমাংসার পর ধর্মঘট প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বড়বাজারে [illegible] বিরোধ চলছিল, আজ উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর [illegible] ব্যবসায়ী ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের বৈঠকে [illegible] মীমাংসা হয়ে গিয়েছে।

বিদেশী সংবাদ

১ **ডিসেম্বর**—[illegible] নির্ভরযোগ্যসূত্রে পাওয়া এক খবরে বলা হয়েছে, আওয়ামী লীগ নেতা শ্রীমুজিবর রহমান [illegible] সামরিক আইন অমান্য করে [illegible] ডিসেম্বর আইন অমান্য আন্দোলন [illegible] করবেন।

২ **ডিসেম্বর**—দক্ষিণ-পশ্চিম [illegible] দক্ষিণ আফ্রিকার দখল থেকে উদ্ধারের [illegible] যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে [illegible] সাধারণ পরিষদ আজ নিরাপত্তা পরিষদের কাছে সুপারিশ করেন।

৩ **ডিসেম্বর**—প্রাক্তন সোভিয়েট প্রেসিডেন্ট মারশাল ভরশিলভ আজ মারা গিয়েছেন। টাস একটি সংক্ষিপ্ত ঘোষণায় তাঁকে অসাধারণ সোভিয়েট রাষ্ট্র নেতা ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মারশাল হিসাবে উল্লেখ করেছে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বৎসর।

৫ **ডিসেম্বর**—গতকাল রাতে [illegible] (ভেনিজুয়েলা) মাইকুয়েটিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর থেকে যাত্রা শুরু করার কিছুক্ষণ পরেই এয়ার ফ্রান্সের একখানি বোয়িং ৭০৭ [illegible] বিমান সমুদ্রের মধ্যে ভেঙে পড়ায় বিমানের [illegible] জন যাত্রী এবং ৮ জন চালক নিহত হন।

৫ **ডিসেম্বর**—টোকিওর দৈনিক পত্রিকা মাইনিচি সিমবুনে প্রকাশিত এক সংবাদে প্রকাশ, তিনজন জাপানী ডাক্তার এমন একটি [illegible] বীজাণুনাশক ঔষধ আবিষ্কার করেছেন যার সাহায্যে সম্ভবত ক্যানসার রোগ নিরাময় করা সম্ভব হতে পারে।

৬ **ডিসেম্বর**—নেপালের প্রধানমন্ত্রী কীর্তিনিধি বিস্তা আজ বলেন যে, আর অনাবশ্যক দেরি না করে নেপালী চেক পোস্ট ও নেপালে অবস্থিত ভারতীয় সংযোগরক্ষী দল থেকে ভারতীয় কর্মচারীদের ফেরত পাঠানো হবে।

৭ **ডিসেম্বর**—লনডন-সিডনি বিমান দৌড় ১৬ ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে। এই ১২ হাজার মাইল দৌড়ে যে সব বিমান যোগ দিবে তাদের ওড়ার সময় চেক করার ভার ভারতে একমাত্র দমদম বিমানঘাটির ওপর দেওয়া হয়েছে। ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের রয়েল এয়ারো ক্লাব এবং অসট্রেলিয়ার রয়েল ফেডারেশন অব এয়ারো ক্লাব এই দৌড়ের উদ্যোক্তা।

FDSB-SI-2PB

সূচিপত্র

সূচীপত্র

সূচিপত্র

বাংলা ভাষার সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৭ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৮
শনিবার, ৫ পৌষ, ১৩৭৬

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সংযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীশীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮৩ ২৩-৮৫৪১

চাঁদার হার

কলিকাতায়

বার্ষিক ...	২৫.০০
ষান্মাসিক ...	১২.৫০
ত্রৈমাসিক ...	৬.২৫

ভারতে

বার্ষিক সডাক ...	৩০.০০
ষান্মাসিক " ...	১৫.৫০
ত্রৈমাসিক " ...	৮.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক ...	৩০.০০
ষান্মাসিক " ...	১৫.৫০
ত্রৈমাসিক " ...	৮.০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ ডাকে)

বার্ষিক সডাক ...	৫২.০০
ষান্মাসিক " ...	২৬.০০
ত্রৈমাসিক " ...	১৩.০০

আসাম অঞ্চলে
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক ...	৩৯.০০
ষান্মাসিক ...	১৯.৫০
ত্রৈমাসিক ...	১০.০০

দাম ৫০ পয়সা
উত্তরবঙ্গ ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাসুল ৭ পয়সা

DESH

Saturday 20 Dec., 1969

কলকাতায় সীমান্ত গান্ধী

দীর্ঘ দুই যুগ পরে সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গফফর খান বাংলা দেশে পদার্পণ করে আমাদের ধন্য করেছেন। বাংলা দেশের মানুষ, বিশেষ করে সেই সব বয়স্ক ও প্রবীণ ব্যক্তি যাঁরা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের হয় অংশীদার না হয় প্রত্যক্ষদর্শী তাঁরা হয়ত আশাও করেননি যে আর কোনোদিন এই মানুষটিকে তাঁরা চোখে দেখতে পাবেন। নিকটতম আত্মীয়ের প্রবাস-জীবন যাপনের মতনই হয়ে এসেছিল ব্যাপারটা, মনে হত সীমান্ত পারের আফগানিস্থান থেকে তিনি কী আর আসবেন? কেনই বা আসবেন? আমাদের তিনি যা দিয়েছেন আমরা কি তার বিন্দুমাত্র দিতে পেরেছি তাঁকে প্রতিদান হিসেবে! কিন্তু তিনি এসেছেন। ভারত তাঁকে কিছু না দিলেও তিনি তাঁর ভালবাসার দেশকে ভোলেন নি, বা অভিমানবশে মুখ ফিরিয়ে থাকেন নি। গান্ধী জন্মশতবার্ষিকীতে আমরা তাঁকে আমন্ত্রণ করেছিলাম, সে-আমন্ত্রণ তিনি রক্ষা করতে এদেশে এসেছেন। কারণ তিনি মহাত্মাজীর একান্ত অনুগত শিষ্যই শুধু নয় তিনি অহিংসার আদর্শকেই সার সত্য মনে করেন। তবে শুধুই আমন্ত্রণ রক্ষা নয়, সেই সঙ্গে দেখতে এসেছেন সেই ভারতকে যা তাঁর কর্মের দেশ ছিল : যেখানে ছিল অহিংসার আদর্শ।

এদেশে এসে সীমান্ত গান্ধী তৃপ্ত হয়েছেন এমন কথা কেউ বলবে না। খান আবদুল গফফর খানও তা বলেন নি। বরং বর্তমান ভারতকে দেখে তিনি বেদনা বোধ করেছেন, আশাহত হয়েছেন; বলেছেন : ভারতে আসার আগে তাঁর দুটি উদ্দেশ্য ছিল—গান্ধীজীর জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া আর ভারতবাসীকে দেখা। আজ বড় দুঃখ হচ্ছে সেই ভারতকে দেখে। কেন এই দুঃখ? দুঃখ এই জন্যে যে, ভারত গান্ধীজীকে ভুলে গেছে। অর্থাৎ গান্ধীজীর সমস্ত শিক্ষাই আমরা বিস্মৃত হয়েছি; সে-শিক্ষার কোনো মূল্য দেবার চেষ্টাও আর নেই।

আজকের ভারতকে দেখে যদি সীমান্ত গান্ধীর হতাশা গভীর হয়ে থাকে তবে মনে করতে হবে আমাদের মধ্যে আজ বিশ বাইশ বছর ধরে এমন কিছু গলদ ঢুকে গেছে যার গলিত চেহারা আজ খুবই পীড়াদায়ক। সেটা কী? বোধ হয়, বাদশা খাঁ যা বলতে চান, তা হল, আমাদের মানবতাবোধ ক্রমশই নীচুতে নেমে গিয়েছে। তিনি স্পষ্টই বলেছেন, গান্ধীজীর আদর্শ, প্রেম, সত্য ন্যায় বিচারের প্রতি আমাদের আজ আর অনুরাগ নেই। তার বদলে সারা দেশময় হিংসা, হানাহানি, দাঙ্গাহাঙ্গামা।

কলকাতায় ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডের বিরাট জনসভায় সীমান্ত গান্ধী যে ভাষণ দেন সেটি নানা দিক দিয়েই তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেন, ভারত স্বাধীনতা পাবার পর আশা করা গিয়েছিল দেশের দারিদ্র্য দূর হবে, দুঃখ-কষ্ট, ঘৃণা-বিদ্বেষ নষ্ট হবে। হিন্দু-মুসলমান সমস্যা—অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক সমস্যাও ঘুচবে। এইসব সমস্যার কতটা মিটেছে? কতটা যে মিটেছে তা বলার অপেক্ষা থাকে না। বাদশা খান না বললেও আমরা জানি দারিদ্র্য কী দুঃসহ, দুঃখকষ্ট কী পরিমাণ মাত্রাহীন হয়ে উঠেছে। আর সাম্প্রদায়িক সমস্যা? তারই বা সমাধান কোথায়?

এই সভায় সীমান্ত গান্ধী সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্পর্কেও একটি সঙ্গত কথা বলেছেন। বলেছেন যে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হানাহানিতে বড় লোকরা মরে না, মরে গরীবরাই। বড় লোকরাই হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতিকে ভয় করে। এই ধরনের সমস্যাও এই পুঁজিবাদীদের সৃষ্টি। বাদশা খানের এই অভিমত পুরোপুরি অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই। কেন না বরাবরই দেখা গেছে, স্বার্থান্বেষীরাই এই ধরনের দাঙ্গা বাধাবার কারণ হয়ে থাকে। অথচ, মজা এমনই যে—আমরা এই স্বার্থান্বেষীদেরই হাতের পুতুল হয়ে পড়ি।

যাই হোক, বাংলা দেশ সম্পর্কে সীমান্ত গান্ধী কিছুটা প্রীত হয়েছেন। কারণ তাঁর মনে হয়েছে এখানে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির ভাব আছে। আর খুবই আশার কথা যে এর জন্যে তিনি বর্তমান সরকারের প্রশংসাই করেছেন। বাংলা দেশ সম্পর্কে তাঁর আশা-ভরসাও আমরা লক্ষ করেছি। তাঁর আশা, এই বাংলা দেশ যেমন এক সময়ে সারা ভারতকে পথ দেখিয়েছে সেই রকম এই রাজ্য থেকেই সারা ভারত কোনো সঠিক পথের নিশানা পাবে।

খেতাবের
লড়াই
জগজীবন কংগ্রেস
নিজলিঙ্গাপ্পা কংগ্রেস

পশ্চিমবঙ্গে বাংলা কংগ্রেস এবং সি পি এম-এর মধ্যে যে টেসট ম্যাচ খেলা শুরু হয়েছে তার ফলাফল জানবার জন্য সকলেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। বাংলা কংগ্রেস [illegible] কারজন পারকে প্যানডেল [illegible] সত্যাগ্রহের উদ্বোধন করার পর থেকে এ পর্যন্ত খেলার অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে ক্রিকেট ভাষ্যকারদের ধারা-বিবরণীর [illegible] তা এইরূপ শোনাবে :

বাংলা কংগ্রেসের দুজন ওপেনিং ব্যাটস-ম্যান অজয় মুখার্জি এবং সুশীল ধাড়া সি পি এম বোলারদের সর্বপ্রকার আক্রমণের [illegible] এখন অনেকটা নির্ভয়ে খেলে যাচ্ছেন। সি পি এম দল প্রধানত [illegible] এক দিক থেকে স্পিড এবং অন্য দিক থেকে স্পিন আক্রমণের এই সাঁড়াশি কৌশল প্রয়োগ করেছেন। প্রমোদ দাশগুপ্ত তাঁর [illegible] পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। [illegible] স্পিন, [illegible] আক্রমণের ভার। [illegible] হিসাবে হরেকৃষ্ণ [illegible] হচ্ছে। [illegible] প্রমোদ দাশগুপ্ত এক প্রান্ত থেকে [illegible] করে যাচ্ছেন। [illegible] বাংলা কংগ্রেসের অধিনায়ক এবং [illegible] অজয় মুখার্জি [illegible] খেলে যাচ্ছেন। [illegible] অজয় মুখার্জির [illegible] কিন্তু অজয় [illegible] ব্যাট ও প্যাডে [illegible] নিয়ে খেলে যাচ্ছেন। [illegible] নানা ব্যাটসম্যানের [illegible] বাম্পার ছুঁড়ছেন। [illegible] চার পাশে [illegible] টিটকিরি দিচ্ছে, জুতো দেখাচ্ছে এবং [illegible] নানা প্রকার কটাক্ষ করে [illegible] ব্যাটসম্যানদের [illegible] করে যাচ্ছেন না।

প্রথম ভাষ্যকার : আচ্ছা কমলদা, এই সব [illegible] কি মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে [illegible]

দ্বিতীয় ভাষ্যকার : আমি চিরকাল [illegible] প্রচার করেছি, খেলার [illegible] কিছুটা জানি। কিন্তু এই [illegible] খেলার নিয়ম তো জানিনে, তাই [illegible] শোভন কোনটা অশোভন ঠিক করে [illegible] পারব না। কিন্তু একটা ব্যাপার লক্ষ্য [illegible] খেলার সূচনায় সি পি এম-এর প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে যেমন মনে [illegible] বাংলা কংগ্রেস বুঝি উড়ে বেরিয়ে যাবে এখন আর তেমন মনে হচ্ছে না।

প্রথম ভাষ্যকার : ঠিক বলেছেন কমলদা। বাংলা কংগ্রেস এখন বেশ সামলে নিয়েছে। প্রমোদ দাশগুপ্ত এবং জ্যোতিবাবুর বলে বেশ বিচক্ষণতার সংগে খেলে যাচ্ছেন ওপেনিং জুটি। এখন এ'দের এই প্রতিষ্ঠা পাবার মূলে আমার তো মনে হয় এ'দের পিটিয়ে খেলার সিদ্ধান্ত......

দ্বিতীয় ভাষ্যকার : ঠিক বলেছ ভায়া! এরা পিটিয়ে খেলছেন বলেই উইকেটে টিঁকে

আছেন। অজয় মুখার্জি জ্যোতিবাবুর বলগুলো কেমন হিসেব করে খেলছেন দেখছ তো। লাভলি।

প্রথম ভাষ্যকার : বাংলা কংগ্রেস জোতদারদের পার্টি এবং অজয়বাবু জোতদারদের দালাল প্রমোদবাবুর এই ইন-সুইংগার বলটি অজয়বাবু যেভাবে ফরওয়ারড খেলে একস্ট্রা কভার দিয়ে অনায়াসে বাউনডারিতে ঠেলে দিলেন, তাতে কি মনে হয় না, কমলদা, যে যুক্ত ফ্রনটের উইকেটের অবস্থা অজয় মুখার্জির একেবারে নখদর্পণে।

দ্বিতীয় ভাষ্যকার : ওটা লাভলি শট। ধন্যবাদ অজয় যে তুমি ওটা মনে করিয়ে দিলে। তবে এটাও লক্ষ্য করেছ তো, সুশীল ধাড়াও ব্যাক ফুটে চমৎকার খেলে যাচ্ছে। বিশেষ করে প্রমোদবাবুর বলে পিছিয়ে এসে সুশীল ধাড়ার কভার ড্রাইভগুলো অতুলনীয়। দেখে মনে হচ্ছে ইনি যদি বুনো ওল, উনি তবে বাঘা তেঁতুল। তবে ভাই এটা বুঝতে পারলাম না যে জ্যোতিবাবুর মত ঝানু স্পিন বোলার কেন বারবার অজয়বাবুকে 'জোতদার জোতদার' বলে ফ্লাইটেড লেগ ব্রেক দিয়ে যাচ্ছেন। ওতে কি অজয়বাবুর মত বিচক্ষণ ওপেনারকে ঘায়েল করা যায়? তুমি কি বল অজয়?

প্রথম ভাষ্যকার : এ প্রশ্ন আমার মনেও দেখা দিয়েছে কমলদা। ধন্যবাদ, কথাটা তোলবার জন্য। কিন্তু আমিও সদুত্তর খুঁজে পাইনি। হয়ত ওটা জ্যোতিবাবুর ক্যালকুলেটেড রিসক্।

দ্বিতীয় ভাষ্যকার : কিন্তু খুবই কস্টলি রিসক্। নয় কি অজয়?

প্রথম ভাষ্যকার : অবশ্যই। দেখছেন তো ওই ফ্লাইটেড লেগ ব্রেক বলগুলোকে অজয়বাবুর ব্যাট "যার এই দুনিয়ায় এক ছটাক জমি বা একটা কুঁড়ে ঘরও নেই সেই আমি হলাম জোতদার আর যিনি এই কলকাতার বুকে বাড়িভাড়া খাটিয়ে ইনকাম করছেন তিনিই সর্বহারা" বলে কেমন উইকেটের চার ধারে পিটিয়ে ছক্কা তুলছে।

দ্বিতীয় ভাষ্যকার : আসলে কি জান ভায়া, দেখে শুনে মনে হচ্ছে, এবার অজয়বাবুর ছক্কার হাত খুলে গেছে। দেখলে তো হরেকৃষ্ণর সেই মারাত্মক অফ ব্রেক—"কালনার সেই মাথা মুড়ান মহিলার নির্যাতনের সংগে সি পি এম কর্মীদের কোনও যোগ সাজস নেই, ওটা শাশুড়ী-উয়ের ঝগড়া"—অজয়বাবু কত আত্ম-নির্ভরতার সংগে খেললেন। প্রথমে মনে হয়েছিল, হরেকৃষ্ণর এই অফ ব্রেকেই বোধ হয় অজয়বাবুর উইকেট গেল। কিন্তু কি মার্ভেলাস ফুটওয়ারক লোকটার! এমনটি তুমি আর দেখেছ অজয়?

প্রথম ভাষ্যকার : না দাদা! ওয়ানডার-ফুল! যেমন পায়ের কাজ তেমনি কব্জির জোর। ওই বল ঘুরিয়ে গালি আর পয়েনটের মধ্য দিয়ে গলিয়ে "শ্রীকোঙারও বলেছিলেন কালনার ওই নির্যাতিত বধূটির ব্যাপার শাশুড়ী-বউ-এর ঝগড়ার পরিণতি, কিন্তু আমি জেলা শাসকের কাছ থেকে রিপোরট পেয়েছি ইচ্ছে করেই শ্রীকোঙারের দল মহিলাটিকে হয়রানি করেছেন" এই বলে অজয়বাবু যে ছক্কাটি মেরেছেন এর আর তুলনা নেই।

বাংলা কংগ্রেস বনাম সি পি এম-এর টেসট ম্যাচ আপাতত যেখানে এসে পৌঁচেছে তাতে দেখা যাচ্ছে অজয়বাবু একমাত্র অস্বস্তি বোধ করছেন জ্যোতি-বাবুর—"উনি যদি ওঁ'রই কথায় অসভ্য সরকারের মুখ্যমন্ত্রী তা হলে সেই অসভ্য সরকারের মুখ্যমন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করছেন না কেন?"—এই গুগলি বলগুলো খেলতে। অনেক সময়ই ব্যাটে বলে সংযোগ হচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে এইখানেই অজয়-বাবুর যা কিছু দুর্বলতা।

[বিঃ দ্রঃ এই ভাষ্যে উল্লিখিত ভাষ্যকার-দের চরিত্রগুলি সম্পূর্ণরূপে অলীক। জাত, অজাত বা মৃত কোনও লোকের সংগেই এদের সম্পর্ক নেই।—রূপদর্শী]

পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস

পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস এবার আস্তে আস্তে তিনভাগ হচ্ছে। একভাগ আদি কংগ্রেস আর একভাগ নব কংগ্রেস এবং তৃতীয়ভাগ মধ্য কংগ্রেস। আদি কংগ্রেসের তিন নেতা—সর্বশ্রী প্রফুল্ল সেন, অতুল্য ঘোষ এবং প্রতাপ চন্দ্র। নব কংগ্রেসের দুই নেতা—সর্বশ্রী বিজয় সিং নাহার ও সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। এবং মধ্য কংগ্রেসের এক নেতা—শ্রীনেপালচন্দ্র রায়।

কেন্দ্রীয় কংগ্রেসের ভাগাভাগিতেও যেমন কংগ্রেসের দাদারা ও ভাইরা আদর্শের কথা মুখে বলে প্রধানত ব্যক্তিগত লাভ লোকসানের হিসাবেই দল বেছেছেন, পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসেও তেমনি এই ভাগাভাগিতে ব্যক্তিগত প্রশ্নই প্রধান। আদর্শের কথা অবশ্য মুখে সকলেই বলছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে ওসব স্রেফ কথার কথা।

আদি কংগ্রেসের নেতা ও ভাইদের সকলেই জানেন। প্রফুল্ল সেন বা অতুল্য ঘোষকে চেনেন না, মানেন না এমন বাঙ্গালী কম আছেন। গত বিশ বাইশ বছর ধরে মানুষ এদের দেখছে। এরা আগে যা ছিলেন এখনও তাই আছেন—নতুন কোনও দাবিদাওয়াও করেন নি।

প্রতাপবাবু কিন্তু বেশ কিছুটা ব্যতিক্রম। প্রতাপবাবু কংগ্রেস রাজনীতিতে এই দুই নেতার সঙ্গে কোনও দিনই ছিলেন না। বরং এদের বিরুদ্ধেই ছিলেন। তিনি এখানে কংগ্রেস সোসালিস্ট ফোরাম করেছেন,

অতুল্যবাবুদের বিরুদ্ধে দিল্লিতে ডেপুটেশন নিয়ে গিয়েছেন এবং ফলে ডঃ রায় একবার মন্ত্রী করবেন বলে প্রায় পাকা করেও তাঁকে শেষ পর্যন্ত মন্ত্রিসভায় নিতে পারেন নি।

এই প্রতাপবাবুই কিন্তু এবার পশ্চিম বাংলায় প্রফুল্লবাবু এবং অতুল্যবাবুর ভাইদের অনেকটা বাঁচিয়েছেন। প্রতাপবাবুকে যে কোনও মূল্যে দলে টানতে হবে, এরকম একটা নির্দেশ দিল্লি থেকে এসেছিল। চেষ্টাও হয়েছিল। কিন্তু কাজ হয়নি। প্রতাপবাবু যদি নব কংগ্রেসে যেতেন তাহলে আদি কংগ্রেস বেশ অসুবিধায় পড়ত। কারণ তিনি প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি। কংগ্রেস গঠনতন্ত্রে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি এবং বিধানসভায় কংগ্রেস দলের নেতা দুজনই যদি সদলবলে শ্রীমতী ইন্দিরার দিকে চলে যেতেন তাহলে দিল্লির সাহায্যে তাঁরা এখানে বেশ একটা বড় রকমের লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে তুলতে পারতেন।

ডঃ প্রতাপ চন্দ্র এখনও আধুনিক অর্থে ঠিক রাজনৈতিক নেতা হয়ে উঠতে পারেন নি বলেই বোধ হয় নতুন দলে যেতে পারছেন না। প্রফুল্লবাবু অতুল্যবাবুদের বিরুদ্ধে বদলা নেওয়ার একটা বিরাট সুযোগ এসে গিয়েছিল তাঁর সামনে। কিন্তু তিনি স সুযোগ নেননি। কারণ তিনি [illegible] দের চেয়েও শ্রীমতী গান্ধীর উপর বেশি চটে। প্রতাপবাবু মনে করেন, শ্রীমতী গান্ধী আসলে এক ক্ষমতালোভী নেত্রী। আদর্শ তাঁর কাছে কোনও কিছুই বড় [illegible] না, এখনও নয়। তাছাড়া রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকাকে [illegible] করেন। তাঁর মতে শ্রীমতী গান্ধী [illegible] করেছেন তা শুধু অন্যায় নয়, [illegible] ডঃ চন্দ্রের তাই বক্তব্য : আমি বরং [illegible] ছেড়ে দেব, তবু শ্রীমতী গান্ধীকে সহ্য করব না।

প্রতাপবাবুর ইন্দিরা বিরোধিতার [illegible] একটা বড় কারণ আছে। তিনি [illegible] শ্রীমতী গান্ধীর উপর দুর্নীতি [illegible] বিরাট প্রভাব-প্রধানমন্ত্রী [illegible] হাত মিলিয়েছেন। প্রচণ্ড [illegible] বিরোধী ডঃ চন্দ্র এই কারণেও [illegible] বিরুদ্ধে।

✲

প্রতাপবাবু যেমন প্রধানমন্ত্রীকে [illegible] করতে পারছেন না, সিদ্ধার্থবাবু [illegible] প্রধানমন্ত্রীকে খুব বেশি [illegible] প্রধানমন্ত্রীও মনে করেন, সিদ্ধার্থ [illegible] বাংলা দেশের নেতা হিসাবে [illegible] মানে। এই ধারণাটা তিনি [illegible] পোষণ করেন। সিদ্ধার্থবাবু [illegible] রাজনীতিতে অতুল্যবাবু, প্রফুল্ল [illegible] একান্ত অনুগত ভ্রাতা, [illegible] তিনি [illegible] "প্রফুল্লদা অতুল্যদা" [illegible] তখনও কিন্তু তিনি নিয়মিত শ্রীমতী [illegible] সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন। এক সময় চেষ্টা ছিল শ্রীমতী গান্ধী এবং শ্রী [illegible] ঘোষের মধ্যে একটা মিটমাট করিয়ে [illegible] একবার তাই সিদ্ধার্থবাবু প্রধানমন্ত্রী [illegible] অতুল্যবাবুর দিল্লির বাড়িতে [illegible] একটা বড় বৈঠকেরও আয়োজন [illegible] ছিলেন।

কিন্তু সিদ্ধার্থবাবু যখন দেখলেন [illegible] গান্ধী ও অতুল্যবাবু দুই দিকে [illegible] গান্ধীই প্রধানমন্ত্রী, তখন তিনি সহজেই ইন্দিরাপন্থী হয়ে [illegible] পশ্চিমবঙ্গে তাঁর দলের প্রধান নেতা [illegible] প্রধানমন্ত্রী শ্রীরায়কেই বেছে নিলেন। [illegible] গান্ধী নাকি মনে করেন, সিদ্ধার্থ [illegible] বাংলার নেতা হওয়ার সর্বপ্রকারের [illegible] আছে—তাঁর বংশ মর্যাদা আছে, তিনি

…কে পরিচিত নন এবং ধনীদরিদ্র সকলের সঙ্গেই তাঁর ভাল যোগাযোগ।

কোন্ যোগ্যতা সিদ্ধার্থবাবুর কতটা আছে সে বিতর্কে গিয়েও লাভ নেই। সিদ্ধান্তটা প্রধানমন্ত্রীর। বিচার-বিশ্লেষণও তিনিই করেছেন। ভালমন্দের ফলও তাঁকেই ভুগতে হবে। কিন্তু এটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে ইন্দিরা-পন্থীদের মধ্যে এই নিয়ে বেশ কিছুটা মন কষাকষি শুরু হয়ে গিয়েছে। বিজয়বাবুকে না নিয়ে সিদ্ধার্থবাবুকে নব কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটিতে নেওয়ায় অনেকে ক্ষুব্ধ। সিদ্ধার্থবাবুকে প্রধানমন্ত্রী বেশি প্রাধান্য দেন, এটাও পশ্চিমবঙ্গের বহু ইন্দিরাপন্থী পছন্দ করেন না। যেভাবে তিনজনকে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের আডহক কমিটি গঠিত হয়েছে তাতেও অনেকেই চটে গিয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গে ইন্দিরাপন্থীদের সবচেয়ে বড় অসুবিধাটা হল তাঁদের ঐক্য নেতিবাচক—কোনও আদর্শভিত্তিক নয়। নানা কারণে নানাভাবে অতুল্যবাবু প্রফুল্লবাবুর বিরোধীরা একত্রে মিলিত হয়েছেন। এদের সঙ্গে আবার কেউ কেউ এসে সমবেত হয়েছেন অন্যান্য কয়েকটি বিচারে। মূল কোনও ইতিবাচক ঐক্য সূত্র নেই এদের। তাই আনুষ্ঠানিকভাবে দল গঠিত হবার আগেই পশ্চিমবঙ্গের ইন্দিরাপন্থীদের মধ্যে মনোমালিন্য শুরু হয়ে গিয়েছে। এদের মুশকিল, প্রায় প্রত্যেকেই নেতৃত্ব চান।

তৃতীয় গোষ্ঠীটা সবচেয়ে বেশি সুযোগ সন্ধানী। এরা পাকাপাকি কিছু করার আগে আরও দেখে নিতে চান। বুঝতে চান আরও স্পষ্ট করে, কোন্ পক্ষ জিতবে। তাই তারা এখন তৃতীয় গোষ্ঠী গড়ে রেখেছেন, তৃতীয় গোষ্ঠী অবশ্য মুখে বলছেন, তাঁরা ঐক্য চান, তাই এখনই কোনও দলে যোগ দিতে চান না। কংগ্রেস ঐক্য যে হবার নয়, এটা যেন তাঁরা এখনও বোঝেননি!

*

এই আদর্শহীন বিরোধেরও অবশ্য একটা বড় ফল হয়েছে—কংগ্রেস দলগত বিচারে

একেবারে পঙ্গু হয়ে পড়েছে এবং ছাত্র পরিষদ নামক যে শক্তিশালী সংগঠনটি গড়ে উঠেছিল তারও প্রচণ্ড ক্ষতি হয়েছে।

অথচ আজই কংগ্রেসের সামনে সবচেয়ে বড় সুযোগ এসেছিল। জেলায় জেলায়

বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে যে যুক্তফ্রন্ট বিরোধী মনোভাব প্রবল হয়ে উঠছে কংগ্রেস তাকে সংগঠিত করতে পারত। কংগ্রেস কর্মীরা দেখাতে পারতেন, নির্বাচনের মুখে তাঁরা ফ্রন্টের ঐক্য সম্পর্কে যে সব কথা বলেছিলেন সেগুলি সত্য কিনা। যুক্তফ্রন্ট বিভিন্ন নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি রক্ষা করছেন কিনা সেটাও তাঁরা সাধারণ মানুষকে জিজ্ঞাসা করতে পারতেন।

১৯৬৯ সনের নির্বাচনের পরে ছাত্র পরিষদ প্রচণ্ডভাবে এগোচ্ছিল। জেলায় জেলায় তাদের শক্তি বাড়ছিল। বর্ধমান, ময়মনসিংহের মত এলাকায়ও ছাত্র পরিষদ ধর্মঘটের ডাক দিতে পেরেছিল। দাদাদের ঝগড়ায় পড়ে ভাইরাও আজ বিহ্বল। নেতৃস্থানীয় ছাত্র কর্মীরা পক্ষ নিচ্ছেন। কিন্তু সাধারণ ছাত্র পরিষদ কর্মীরা অনেকটা বুঝে উঠতে পারছেন না কি করা।

বিরোধ যদি আদর্শগত হত তা হলে অবস্থাটা এতটা শোচনীয় হত না। ছাত্র কর্মীরা যে যার মতানুযায়ী পথ বেছে নিতে পারতেন। আদর্শের ভিত্তিতে দল ভাগ হলে পরিস্থিতিটা বরাবরই পরিষ্কার হয়। এখানে তা হয়নি বলেই পরিস্থিতি ঘোলাটে। দলের এবং ছাত্র পরিষদের সামনে তাই এত সব জটিল প্রশ্ন।

নবারুণ গুপ্ত

নতুন হাওয়া

দেবরাজ

কেনিয়া স্বাধীন হয়েছে বছর ছয়েক হলো। তার পরের বছরই বিলেতের রাজা-রাণীর সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে দেশটা হয়েছে রিপাবলিক অর্থাৎ প্রজাতন্ত্র তবে কমনওয়েলথের গাঁটছড়ায় ভারতবর্ষের মতই কেনিয়া আজও বাঁধা। কিন্তু নামে প্রজাতন্ত্র হলে কী হয় কেনিয়ার চালচলন কেমন যেন অন্য ধরনের। সংসদীয় গণতন্ত্র বলতে যা বোঝায় তা সে দেশে নেই। শাসন যন্ত্র চালান প্রেসিডেণ্ট জোমো কেনিয়াট্টা। তিনি সম্প্রতি দ্বিতীয়বারের জন্য অবশ্য নির্বাচিত হয়েছেন। কিন্তু সে নির্বাচন নেহাত একটা বাইরের ঠাট। কেনিয়াতে কার ঘাড়ে দুটো মাথা আছে যে নির্বাচনী পাঞ্জা কসতে সাহস পাবে তাঁর সঙ্গে এমনই তাঁর দোর্দাণ্ড প্রতাপ। ক্যাবিনেট অর্থাৎ মন্ত্রিসভা তাঁর একটা আছে বটে। কিন্তু সেও তো তাঁর একান্ত অনুগতদের নিয়ে তিনিই তৈরি করেছেন। মন্ত্রীদের রাখার মালিকও তিনি আবার দরকার হলে বরখাস্ত করারও। তৃতীয় পক্ষের সে ব্যাপারে কিছু বলার বা করার নেই।"

অন্তত ডিসেম্বরের ছ তারিখ পর্যন্ত ছিল না। ওদিন কেনিয়াতে হয়ে গেছে ভোটযুদ্ধ যাকে বলে সাধারণ নির্বাচন। সে নির্বাচনে দেখা যাচ্ছে বিস্তর উঁচু মাথা হেঁট হয়েছে, অনেক মন্ত্রীরই মুণ্ডু কাটা গেছে। প্রেসিডেণ্ট কেনিয়াট্টার যাঁরা প্রিয়পাত্র তাঁদের অনেকেই প্রতিপক্ষের ঘায়ে ধরাশায়ী হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে আছেন জন আঠার ছোট বড় মন্ত্রী। প্রেসিডেণ্ট কেনিয়াট্টা নির্বাচনের ফলাফল দেখে মোটেই খুশি হননি। তার প্রধান কারণ তাঁর বশংবদ ভক্তদের মধ্যে অনেকেরই হার হয়েছে কেবল নয়, ধরতে গেলে তাঁর সরকারেরই হার হয়েছে। আর সে সরকার তো একেবারেই অদ্বৈতবাদী—তার প্রাণপুরুষ তো তিনিই। কাজেই নির্বাচনে সরকারের হার হলে তো সে হার কোনও দল কিংবা অন্য কোনও লোকের তো নয়—সে হার তাঁর নিজেরই। ভোটারদের রায় যদি কারুর বিপক্ষে গিয়ে থাকে তো তা গিয়েছে তাঁরই বিরুদ্ধে। ভোটারদের এ হেন মতিগতিতে জোমো কেনিয়াট্টার উদ্বিগ্ন হবার তো কথাই।

তাঁর সে উদ্বেগ আরও বাড়িয়ে তুলেছে কেনিয়া নির্বাচনের ধাঁচ। আর পাঁচটা গণতন্ত্রী দেশের নির্বাচনী ব্যবস্থার সঙ্গে তার কোনও মিল নেই। নির্বাচন বলতে তারা যা বোঝে কেনিয়ার নির্বাচন মোটেই তা নয়। বিলেতে আমেরিকায় কী ভারতবর্ষে সিংহলে নির্বাচনী লড়াইয়ে নামে দুটো দল তো বটেই, সাধারণত আরও অনেক বেশী দল। তাদের সঙ্গে পাল্লা দেন অনেক নির্দল প্রার্থীও। সে লড়াইয়ে কস্মিনকালেও একটিমাত্র দলের লোকেরা জেতেন না। যেখানে একটা দল বাজীমাত করে অন্যদের নাহারান হারিয়ে দিয়ে সেখানেও যেসব দল হেরেছে তাদের কেউ কেউ জেতেন, জেতেন কোনও কোনও নির্দল প্রার্থীও। কিন্তু কেনিয়াতে রাজনীতি অন্য গণতন্ত্রী দেশ-গুলোর মত বহুদলধারিণী নয়, কম্যুনিস্ট দেশগুলোর মত রাজনীতি সেখানে একেশ্বরী। একটিমাত্র দলই কেনিয়াতে ৬ ডিসেম্বর নির্বাচনে লড়েছে। তার নাম হচ্ছে সংক্ষেপে কানু অর্থাৎ কিনা কেনিয়া আফ্রিকান ন্যাশনাল ইউনিয়ন। সে দল জোমো কেনিয়াট্টারই গড়া। তিনিই তার হর্তা কর্তা বিধাতা নামে না হলেও কাজে।

বিরোধী দল বলতে কেনিয়াতে কিছু নেই। কানুর প্রতিদ্বন্দ্বী কাডু (কেনিয়া আফ্রিকান ডেমোক্র্যাটিক ইউনিয়ন) ভেঙে দেওয়া হয় ১৯৬৪ সালে। কেনিয়াতে দেখা দিল একটিমাত্র দলের আধিপত্য। তারপর কিন্তু তৈরি হলো আর একটি বিরোধী দল কাপু অর্থাৎ কেনিয়া পিপলস্ ইউনিয়ন। সে দলকে বেআইনী বলে ঘোষণা করা হলো নির্বাচনের ঠিক আগেই। ভোট-যুদ্ধে নামবার অধিকার তার আর রইলো না—এমন কী সে দলের সঙ্গে যোগ ছিল এমন কোনও প্রার্থীরও সে অধিকার রইল না যদি না তাঁকে নির্বাচনে নামার ছাড়পত্র সরকার থেকে দেওয়া হয়, তবে শর্ত হলো সে সব প্রার্থীদেরও ছাপ নিতে হবে কেনিয়াট্টার দল কানুর। তেমন ছাড়পত্র কারুর কারুর মিলেও ছিল আবার তাদের মধ্যে কেউ কেউ জিতেওছেন। তাঁদের মধ্যে আছেন শ্রীমতী গ্রেস ওনিয়াঙ্গো। নিষিদ্ধ কাপু দলের তিনি ছিলেন একজন চাঁই। তাঁর জিত মানে আসলে ওই বেআইনী কাপু দলেরই জিত। তবে যাঁরা ভোল পালটে কাপু ছেড়ে দিয়ে কানু দলে ঢুকেছিলেন তাঁদের অনেকেই কিন্তু নাজেহাল হয়েছেন। এতেই বোঝা যায় কাপু দল লুপ্ত হয়ে যায়নি।

এক দলের লড়াই হলে কী হয় কেনিয়াতে নির্বাচন প্রার্থী হয়ে এক-একটা কেন্দ্রে মাত্র একজন করে দলের সদস্য দাঁড়াননি। প্রত্যেক কেন্দ্রেই ছিলেন একের বেশী প্রার্থী যদিও একের বেশী দলের প্রার্থী নয়। যাঁরা আসরে নেমেছিলেন তাঁদের সকলেরই ছিল একটিমাত্র দলের ছাপ অর্থাৎ সকলেই কানু দলের প্রার্থী। ব্যাপারটা যেন ঘরোয়া লড়াই। সে লড়াইয়ে নীতি নিয়ে কোনও দ্বন্দ্ব ছিল না—তা হতে পারে না—দ্বন্দ্ব ছিল ব্যক্তি নিয়ে। প্রার্থীদের মধ্যে ব্যক্তিগত গুণাগুণের বিচার হয়েছে নির্বাচনে। যাঁকে লোকে উপযুক্ত মনে করেছে তিনিই জিতেছেন, হেরেছেন যাঁকে লোকে যোগ্য বলে মনে করেনি। এক হিসেবে ও নির্বাচন দেশের সাধারণ নির্বাচন ছিল না—ছিল দলীয় নির্বাচন। এ নির্বাচনে জয় হয়েছে তরুণদের, পরাজয় ঘটেছে যাঁরা প্রৌঢ় কিংবা বৃদ্ধ তাঁদের। আর যাঁদের সরকারের সঙ্গে যোগটা ঘনিষ্ঠ তাঁরাও বিশেষ সুবিধে করতে পারেননি। কেনিয়ার পার্লামেণ্ট বা জাতীয় সংসদের ১৫৮ জন সদস্যের মধ্যে ১০০ জনই এবারে নতুন—পুরোনোদের প্রায় বাতিল করে দিয়েছে ভোটাররা।

স্বাধীন হবার পর কেনিয়াতে এই প্রথম নির্বাচন। এক দলীয় এই নির্বাচনে লোকের যে মনের ভাব প্রকাশ পেয়েছে তাতে বোঝা যাচ্ছে সরকারের ওপর তারা প্রসন্ন নয়। তার মানে অবশ্য এ নয় যে তারা সরকারী রীতি নীতি সব কিছুই অপছন্দ করছে। তবে এটাও স্পষ্ট সরকারের নীতির অনেক রদবদল তারা চায়। তার মধ্যে বিরোধী দল গড়ে তোলার অধিকারও আছে। কাপুকে বেআইনী করাতে যারা গণতন্ত্রের ভক্ত তারা মোটে খুশি হয়নি। তার ওপর নির্বাচনটা অনেক কেন্দ্রে ছিল উপজাতীয় রেষারেষি। কেনিয়াট্টা জাতে কিকুয়ু। অন্য জাত বিশেষ করে লুয়োরা মনে করে তিনি তাদের বিরোধী। উপজাতীয় ভেদবুদ্ধি তো মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে কেনিয়াতে টম এমবোয়াকে হত্যা করার পর থেকে। অনেকের ধারণা কেনিয়াট্টা তা দূর করার চেষ্টা তো করছেনই না বরঞ্চ তাকে প্রশ্রয়ই দিচ্ছেন তাঁর নিজের জাত কিকুয়ুর স্বার্থে। লুয়ো অঞ্চলে তাঁর দল তাই সুবিধে করে উঠতে পারেনি। পার্লামেণ্টে কানু ছাড়া গতি না থাকলে কী হয় কেনিয়াট্টাকে নতুন সংসদ বেশ বেগ দেবে। তাঁর সব হুকুম তারা চোখ কান বুজে তামিল করতে আর রাজী হবে না বলেই মনে হচ্ছে।

'আমার আত্মত্যাগ'

অনেকদিন থেকে আমার মনে এই রকম একটা [illegible] সন্দেহ জেগেছে যে আমি কখনো হুট করে একটা লটারীর টাকা পেয়ে যাব।

টিকিটের প্রেরণা

[illegible] দেশে, মহলে, অন্দরে, অলিগলিতে [illegible] লেখা দেখে আমার চিৎকার [illegible] লাখ তিন লাখ পাঁচ লাখের [illegible] শুনতে শুনতে কেমন ঝিম ধরে, রোজ যাওয়া-আসার পথে গড়িয়াহাট রোডের এক প্রাচীরে শালু টাঙিয়ে বসে যে লোক হাঁকছে, তার সিংহনাদে থমকে দাঁড়িয়ে অচমকা ভাবি: **পাঁচ লাখ টাকা**, না পাঁচ মিলিয়ন? তারপরে মনে হয়, পাঁচ লাখ টাকা কী-রকম দেখতে? আমি যদি হঠাৎ এই টাকাটা পেয়ে যাই—তা হলে কী করব? যেমন শোনা যায়, সেইভাবে হার্ট ফেল করব কি? কিংবা আনন্দে-বিস্ময়ে-বিমূঢ়তায় তিনদিন স্তব্ধ হয়ে বসে থাকব? রাস্তায় রাস্তায় দাপিয়ে বেড়াব নাতো? অথবা স্রেফ পাগল হয়ে গিয়ে ফস করে কাউকে কামড়ে-টামড়ে দেব?

এই রকম একটা **অপঘাতের আশঙ্কাতেই** আমি কখনো লটারীর টিকিট কিনি না। তবু আমার সন্দেহ হচ্ছে আমি কখনো লটারীর টাকা পেয়ে যাব। পাঁচ লাখ—চার লাখ—দু লাখ নয়—চোট সামলাতে পারব না। এক লাখের কথা ভাবতেও রোমাঞ্চ হয়। দশ-পনেরো-বিশ-ত্রিশ হাজার পর্যন্ত আমার নার্ভ সইতে পারবে আশা করি।

টিকিট না কিনেও এ টাকাটা আমি পেতে পারি কি? কেন পারি না? আমার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন—সবাই তো প্রাণপণে টিকিট কিনছেন। তাঁদের কেউ লাখ পাঁচেক পেয়ে গেলে— এমন তো হতে পারে—একটা ভীষণ ঔদার্যে ব্যাকুল হয়ে উঠবেন তিনি। তাঁর মনে হবে, কী হবে এত বেশি দিয়ে—'কিমহং তেন কুর্যাম?' কিছু, কিছু আরো দশজনকে ভাগ করে দেওয়াই যাক না। এবং সেই দশজনের ভেতরে আমার নামটাও যে তাঁর মনে পড়বে না, একথা জোর করে বলতে পারেন কেউ?

টিকিটের প্রেরণা

জানি, আপনারা নাক কুঁচকে বলবেন, **ওই আনন্দেই থাকো। টাকার জন্যে লোকে বাপ-ভাইকে পর্যন্ত খুন করে বসে—আর তোমাকে একজন অকারণে খয়রাত করতে যাবে বিশ-ত্রিশ হাজার টাকা! একেই বলে** বকাণ্ডপ্রত্যাশা ন্যায়—তুমি তো দেখছি আল্‌-নশ্‌করকেও ছাড়িয়ে গেলে হে!

কিন্তু 'বকাণ্ডপ্রত্যাশা' আমি জানি, আল্‌-

টিকিটের প্রেরণা

নশ্‌করও হতে চাই না। তবু বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, রিপ্‌লির মতো মনে হোক আর না-ই হোক, আমি—এই কমনম্যান স্বনন্দও—প্রায় অযাচিতভাবে

ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার চতুর্থ টেস্টের একখানা টিকেট পেতে যাচ্ছিলুম। যে টিকেটের জন্য আকুল আর্তনাদে লটারী-ভেন্ডারদের মাইক-চোঙা-বিঘোষিত আহ্বান প্রাবৃটের মেঘারাবে দর্দুরধ্বনিবৎ (দেখেছেন, মনে তেজ এলে কিরকম সাধুভাষার আবির্ভাব হয়!) অবলীন, যে টিকেটের জন্য মুখ্যমন্ত্রী থেকে প্রধানমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী থেকে রাষ্ট্রপতি এবং রাষ্ট্রপতি থেকে 'বিশ্বপতি'-(অন্য সময় যিনি অনাবশ্যক হলেও আপৎকালে অবশ্য স্মর্তব্য) পর্যন্ত আলোড়িত—সেই টিকেট—সেই 'জীবন-বল্লভ সাধন-দুর্লভ'—আমার 'মর্মের কথা কিছুই' বলবার আগে অযাচিতভাবে আমার দ্বারে এসে গিয়েছিল।

এর পরেও বলবেন, টিকেট না কিনেও আমি লটারীর টাকা পেতে পারি না? এর পরেও বলতে চান—প্রত্যেক মানুষই নির্লজ্জভাবে স্বার্থপর? এরপরেও কি লটারীতে লাখ তিনেক প্রাপ্ত কোনো বন্ধু আমাকে হাজার বিশেক টাকা দান করবেন না? আপনারা অবিশ্বাসের কালো চশমা চোখে এঁটে জগৎটাকে অন্ধকার দেখছেন। কিন্তু আমি এখন 'রোজি ভিউ'—অর্থাৎ কিনা বিশ্ব-সংসারকে একটি প্রস্ফুটিত গোলাপ ফুলের মতো দেখতে পাচ্ছি। এমন কি সেই দুর্জন অধ্যাপক—যে প্রত্যেক চিঠিতে আমাকে জার্নালী ননসেনস্ বন্ধ করবার জন্য কঠিন উপদেশ দিয়ে থাকে—সামনে পেলে তাকেও এখন আমি কফি আর চুরুট খাওয়াতুম, আমার সেই দুর্মূল্য বইটি—বহু যত্নে আহরিত রাসিনের সেই চমৎকার কমপ্লীট ওয়ার্কসটা তাকে উপহার দিতুম।

ঔদার্যই তো উদারতার সিংহদ্বার খোলে। সুতরাং এর পরবর্তী সারপ্রাইজ যা দেব—বিশ্ববিখ্যাত রিপ্লিরও তা অনুমানের বাইরে। সে টিকেট আমি নিইনি। যে টিকেট পেলে লোকে পাঁচদিনের জন্য রা[জ্য] দান করতে পারে, আপনারা বিশ্বাস করব[েন] না—সে টিকেট আমি সত্যিই নিই[নি।] টিকেটদাতার সেই ঔদার্যে আমার হৃদয়ে ত্যাগ আর প্রেমের লহর বয়ে গেছে।

আমার এই সুমহান আত্মবিসর্জন কা[র] জন্য?

পাড়ার একটি তরুণ হন্যে হয়ে ঘুরছে—শুনেছি ছেলেটি উঠতি খেলোয়াড়—ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। না—তাকে দিইনি। কারণ [...] আপনি উজ্জ্বলিত হবে—খেলা দেখে [...] লাভ কী? কলেজ-টীমের এক ক্রিকেট ক্যাপ্টেনকে দেওয়া যেত—কিন্তু নিজে টীমকেই সে খেলায় না—পারে[...] খেলা [...] কী করবে? খেলা বোঝেন এমন [...] অভিজ্ঞ অধ্যাপক আমার কাছে হানা দিয়ে ছিলেন, তাঁকে বললুম—'যান [...] লেখাপড়া করুন গে, খেলা-টেলা আপনার কী?' স্কুলের একটি স্পোর্টসম্যান ছেলে—তাকেও তাড়িয়েছি: 'পড়াশুনোর সময় [...] খেলাধুলোর মন কেন?

তা হলে আমার এই ত্যাগ স্বীকার কা[র] উদ্দেশ্যে?

ধরুন, পাড়ার চার তলা বাড়ির সেই [...] মহিলা—যিনি খেয়ে, ঘুমিয়ে, সিনেমা দেখে, গল্প করে, মাথায় আড়াই সেরী [...] বাঁধিয়ে হয়রাণ হয়ে পড়েছেন [...] একটু রিক্রিয়েশান দরকার। খেলা[র] মাঠের ফ্রেশ এয়ার তাঁর কাজ দেবে। [...] লেডীজ ক্লাব নিয়ে রংঙীন [...] পার্টি-টার্টি আছে—যে-জন্যে [...] কার্ডিগান তিনমাস ধরে বুনে উঠতে পারে[ন] না—এই টিকেটটা পেলে তাঁর [...] পাঁচদিনে কমপ্লীট হতে পারে। [...] একজিকুটিভ একটু আউটিং বা পিকনিক[ের] অবসর পাচ্ছেন না—তিনি জীবনে [...] কিংবা বল স্পর্শ না করলেও—মাঠে [...] ইন্ দি একস্প্যানস অব সাদি গ্রীন—এক[টু] লাঞ্চ কিংবা চা খাবেন—সেজন্যও তো [...] টিকেট দরকার। খেলার মাঠের [...] সংশ্লিষ্ট যে কর্তাব্যক্তির, শ্যালীপতি[কে] একটা টিকেট দিতে না পারলে শ্যালী[র] কাছে মান থাকছে না (যদিচ শ্যালীপতি আধঘণ্টা রোদে বসলেই মাথা ধরবে)—[...] প্রেসটিজের দিকটা তো আমাকে দেখতে হবে। যে বিজনেস-ম্যাগনেট মাঠে একবার [...] বসতে পারলেই দশ লাখ টাকার একটা ট্র্যানজ্যাকশান করতে পারবেন, তাঁর কথা কি আমি ভাবব না?

যিনি আমাকে টিকেট যোগাড় ক[রে] দিয়েছেন, তাঁর মহত্ত্বটা ভাবুন। আর অনুমান করুন—দেশবাসীর হিতায় সু[খায়] চ আমার এই আত্মত্যাগ। এরপরেও [কি] বলবেন, লটারীর টিকেট না কিনেও আমি লটারীর টাকা পেতে পারি না?

বুকের ভিতর থেকে

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

চিরদিন ওইখানে ছিল না,
জানালা-কপাট-ঘর-বারান্দাসমেত এই বুকের ভিতরে ছিল—
অট্টালিকা।
তাকে আমি বাহিরে এনেছি,
প্রতিষ্ঠা দিয়েছি ওই মাঠের উপরে।

সমুদ্র তোলপাড় ক'রে
অন্য পৃথিবীর দিকে ছুটে যায় বিশাল জাহাজ।
সেও
চিরদিন ওইখানে ছিল না,
আডেক্-মাস্তুল এই বুকের ভিতরে ছিল।
তাকে আমি ভুবন দেখাব ব'লে
বাহিরে এনেছি,
মুক্তিপত্র লিখে দিয়ে অর্পণ করেছি ওই জলে।

শুধু স্থির হর্ম্য কিংবা চলিষ্ণু জাহাজ নয়।
বিশ্বময়
যা-কিছু দাঁড়িয়ে আছে, অথবা চলেছে অন্য দিকে—
সব এই বুকের ভিতরে ছিল।

এখনো অনেক সঙ্ঘ-সমিতি ও উত্থান-পতন,
অভিষেক, নির্বাসন,
চুম্বন, গোলাপ, সন্ধি, আন্দোলন, রক্তপাত
বুকের ভিতরে অন্ধকারে
সারি বেঁধে প্রতীক্ষানিরত। আমি
একে-একে তাদের সবাইকে সেই অন্ধকার থেকে
বাহিরে আলোর মধ্যে
মুক্তি দেব।
যেখানে মানায় যাকে, সেইখানে
প্রতিষ্ঠা দেবার জন্য।
প্রণয়, সংগ্রাম, হিংসা—সমস্ত কিছুকে
ঘটনায় ঘটিয়ে দেবার জন্য।

দ্রুতগতি যানের আচমকা গতিরুদ্ধ হবার মতন একটা অস্বস্তিকর অবস্থা। সে গতি স্নায়ু, শিরায় সঞ্চারিত হয়ে সমস্ত সত্তাকে উত্তপ্ত, উদ্দীপিত রেখেছিল তার ইতি। তাও একেবারে আকস্মিক।

গ্রিল দেওয়া জানলার ওপারে রাধাচূড়া গাছের যে আংশিক অবয়বটুকুর সঙ্গে আমার এতদিনের পরিচয়, সে গাছের অংশটুকু যদি শাখাপ্রশাখা পাতার রাশ নিয়ে সরে যায়, কেউ সরিয়ে নেয়, তাহলে জানলার দিকে দৃষ্টিপাত করে সে শূন্যতা-বোধ চোখকে, মনকে পীড়িত করবে, এও যেন অনেকটা সেই রকম।

কতটুকু ব্যবধান। আড়াই ফুট, তিন ফুটের বেশী নয়, কিন্তু অন্যদিক দিয়ে ব্যবধান দুস্তর।

আমি জীবন্ত, আর খাটের ওপর নিমীলিত চক্ষু, নিস্তেজ, অবসন্ন দেহটি নিষ্প্রাণ।

মৃত্যু নিঃশব্দ পদসঞ্চারে এসে কখন ওকে কুক্ষিগত করেছে, আমি জানতে পারি নি, জানবার কোন অবকাশ পাই নি।

কোন আর্তনাদ নয়, যন্ত্রণার বহিঃপ্রকাশ চোখমুখে রেখায়িত হয়ে ওঠেনি। মানুষটা ঘুমোচ্ছে। সুপ্ত। কিন্তু এটা যে অনন্ত সুষুপ্তি ডাক্তার চৌধুরির পরীক্ষার আগে জানতেই পারিনি।

গতকালের কথা স্মরণ করার চেষ্টা করলাম। মানুষটা যখন ছিল, তার কামনা, বাসনা, ভোগের দাবি নিয়ে। প্রাণচঞ্চল হয়তো নয়, কিন্তু মুখর। স্পন্দনশীল।

রোজকার মত বেড়িয়ে ফেরার পর রেখা কফির কাপ সামনে ধরেছিল।

বলেছিল, এই এক কাপ। চাইলেও আর পাবে না।

কেন?

কেন জানো না? কাল সারাটা রাত ঘুমাও নি। বিছানায় এপাশ ওপাশ করেছ।

আমি আর রেখা এক খাটের অংশীদার নই। এক কামরাতেও শুই না। পাশাপাশি দুটো কামরা, মাঝখানে পাতলা পর্দার প্রাচীর। এপাশে আমি, ওপাশে রেখা।

তাও রেখা লক্ষ্য করেছে, আমি ঘুমাতে পারিনি। বারবার বিছানায় উঠে বসেছি। অন্যমনস্ক হবার জন্য সিগারেট ধরাবার চেষ্টা করেছি, দেশলাইয়ের বুকে কাঠির ঘষড়ানির শব্দ হয়তো রেখার কানে গেছে, চোখে পড়েছে অগ্নির স্ফুলিঙ্গ।

আমি বলতে পারতাম, এ অনিদ্রা কফিপানের জন্য নয়, এর কারণ অন্য।

কিন্তু এসব কথা রেখাকে, বলা যায় না। চিরদিনই আমি মিতবাক, বিশেষ করে নিজের সম্বন্ধে। তাছাড়া আমার জীবনের কোন ঘটনাই তো রেখার অজানা নেই।

আশ্চর্য, আমার এক রাতের ঘুম না হওয়ার অস্বস্তিটুকু রেখার নজরে এসেছে, সে ঠিক বুঝতে পেরেছে আমি ছটফট করেছি সারারাত, কিন্তু রেখার চিরদিনের মতন ঘুমিয়ে পড়াটা আমি টেরও পাইনি।

অথচ রাতে আমি দুবার উঠেছি। বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে বাইরের নিকষ কালো অন্ধকারের দিকে চেয়ে অনেক মুহূর্ত খরচ করেছি। সিগারেট ধরাবার চেষ্টা করি নি, কারণ ভাল লাগে নি।

বাড়তি কফির কাপ না পেয়েও কোন অসুবিধা হয়নি। আমি ঠিক কোন নেশার বশীভূত নই। শুধু সময় কাটাবার জন্য কফি পান, সিগারেট ঠোঁটে ঠেকানো।

এই সন্ধ্যাটুকু বড় নিঃসঙ্গ মনে হয়।

চোখের ছানি কাটাবার পর থেকে বই-পত্র বেশী নাড়াচাড়া করতে পারি না, অসুবিধা হয়। বই একেবারে চোখের সান্নিধ্যে নিয়ে এসে পড়ার অসুবিধা অনেক।

এই সময়টা রেখা ঠাকুরঘরে থাকে। প্রায় ঘণ্টা দুয়েক।

আমি আমার ঘরে বসেও তার ঘণ্টা নাড়ার শব্দ শুনতে পাই, আত্মনিবেদনের অস্ফুট ছন্দ।

আমি পারি না। নিজেকে নিয়ে নিজের মন নিয়ে ছলনা করতে ঘৃণা হয়। জীবনের

সব পাপ, সব অন্যায় দ্রবীভূত হবে পট বা পাথরের নুড়ির সামনে ঘণ্টা কয়েকের কসরত্তে তা আমি বিশ্বাস করি না।

নিজে বিশ্বাস করি না বলে অন্যের বিশ্বাসে আঘাত দেওয়াও আমি অপছন্দ করি।

টের পেলাম সকালে উঠে।

মুখ হাত ধুয়ে রেখার-ঘরে ঢুকেই চমকে উঠলাম।

রেখা শুয়ে রয়েছে।

অথচ রাধাচূড়ার ডালপালার ফাঁক দিয়ে, রোদ এসে পড়েছে মেঝের ওপর। জালিকাটা গরাদের ফাঁক দিয়ে এসেছে বলে রোদের বুকে নকশার ছাপ।

রেখা ভোরে ওঠে। সকালেও কিছুক্ষণ ঠাকুরঘরে কাটায়। তারপর তরকারির ঝুড়ি নিয়ে বসে।

কিই বা কাজ। দুটি মোটে লোক। একটি ছোকরা চাকর। সেই সময় মোড়া পেতে আমি রেখার কাছে বসি। হাতে খবরের কাগজ থাকে বটে, কিন্তু কাগজের পাতায় চোখ রাখার বিশেষ সুযোগ হয় না। রেখার কথার উত্তর দিতে হয়।

রেখা, রেখা।

নিজের কণ্ঠস্বর নিজের কাছেই কেমন অস্বাভাবিক মনে হল।

কাঁপছে কণ্ঠস্বর। বয়সের ভার যেন স্বরের ওপরও নেমেছে।

কোন উত্তর-নেই।

অস্বাভাবিক কিছু মনে হয়নি।

এমনিতে রেখার ঘুম খুব গাঢ়। গায়ে হাত দিয়ে ঠেলাঠেলি করে তবে ওঠাতে হয়।

আরো কাছে এগিয়ে এসেছিলাম। একটা হাত তার কপালে রাখতেই সন্দেহ হয়েছিল।

বয়স বাষট্টি, কিন্তু এ পর্যন্ত মৃত্যুর মুখোমুখি পরিচয় হবার সুযোগ হয়নি। দূর থেকে মৃত্যুকে দেখেছি, কিন্তু তার স্বরূপ, তার প্রতিক্রিয়া জানি।

বাবুয়া, বাবুয়া।

ছোকরা চাকরকে ডেকেছি উচ্চকণ্ঠে।

বাবুয়ার বয়স বছর পনেরোর বেশী নয়। এ বিষয়ে তার কোন অভিজ্ঞতা থাকার কথা নয়। তা জেনেও তাকে ডেকেছিলাম।

সেই মুহূর্তে শুধু মনে হয়েছিল এই হিমশীতল দেহের সামনে দাঁড়িয়ে শরীরের কোষে কোষে যে আতঙ্কের শিহরণ অনুভব করছি, আর এক সজীব সত্তার উপস্থিতিতে সে আতঙ্ক হয়তো কিছুটা স্তিমিত হবে।

বাবুয়া চৌকাঠের ওপর এসে দাঁড়াতে বলেছিলাম,
ডাকতো মাইজীকে।
বাবুয়া ডেকেছিল, তারপর কি ভেবে রেখার গায়ে হাত দিয়ে নির্মম সত্যটা উচ্চারণ করেছিল।
মা মারা গেছে বাবু।
তুই একবার দৌড়ে ডাক্তার চৌধুরিকে ডেকে নিয়ে আয় বাবুয়া। আমার নাম করে বলবি।

ডাক্তার চৌধুরি এসেছিলেন দশ মিনিটের মধ্যে।
নিশ্চিতকে সুনিশ্চিত করার জন্যই ডাক্তার অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করেছিলেন। চোখের পাতা টেনে, বুকে পিঠে স্টেথস্কোপ বসিয়ে তারপর বিচারকের রায় দেবার ভঙ্গীতে বলেছিলেন, সি ইজ নো মোর।
আমি কাছে ছিলাম। বললাম,
কি হয়েছিল ডাক্তার চৌধুরি?
হার্ট-অ্যাটাক বলেই মনে হচ্ছে।
কিন্তু আমি তো কিছুই বুঝতে পারি নি।
ডাক্তার চৌধুরি বিজ্ঞের হাসি হাসলেন।
এসব কেসে বোঝাও যায় না।
তারপর খবরটা ছড়িয়ে পড়ল। সারা গলিতে।
মেয়ের দল এসে দাঁড়াল বাইরের দরজার ওপারে।
খুব ঘন কুয়াশা একটু একটু স্বচ্ছ হয়ে গেলে যেমন পিছনের দৃশ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তেমনি এই শহরতলির রূপটা ফুটে উঠল চোখের সামনে।
আঁকাবাঁকা একজোড়া রেলের লাইন, তার পাশে পাশে ছেলেদের বস্তি। আগে, অনেক আগে, এ এলাকায় প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে আঁশটে গন্ধ পাওয়া যেত। বাতাসে ভাসত গন্ধ। জেলেদের বাইরে শুকোতে দেওয়া জাল থেকে।
তারপর এই ক' বছরে সবকিছু বদলে গেছে।
নতুন তুলির আঁচড়ে পুরোনো রং, পুরোনো ছবি একেবারে বরবাদ। তার জায়গায় নতুন এক শহরতলির চেহারা ফুটে উঠেছে। নিজের পিতৃপুরুষের ভিটে থেকে ধর্ম, অর্থ, ইজ্জত খুইয়ে আসা মানুষের দল।
নতুন করে বাঁচবার আশায় আবার তারা ঘর বাঁধল, ভাঙা মেরুদণ্ডে আঁপ্প লাগিয়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল।
তারাই আজ আমার দরজায় ভিড় করেছে।
হঠাৎ খেয়াল হ'ল, কে যেন সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। আমার সামনে।
কাকাবাবু, কাকিমা পরম ভাগ্যবতী। আপনার মতন বুড়ো স্বামী রেখে সিঁথের সিঁদুর নিয়ে যেতে পারা কম ভাগ্যের কথা!
চমকে মুখ তুললাম।
মেয়েটিকে কোনদিন দেখেছি বলে মনে করতে পারলাম না। দেখে থাকলেও মনে নেই। অস্বচ্ছ দৃষ্টির সামনে সব অস্পষ্ট।
এটুকু বুঝতে পারলাম, এ পাড়ারই কেউ।
বসে বসে দেখলাম। আরো অনেকে এল। সিঁদুর, আলতা, ফুল নিয়ে।
রেখার তুহিনশীতল দুটি পায়ে আলতা মাখাল, সিঁথের এত বেশী সিঁদুর দিল যে চোখের ওপর এসে পড়ল সিঁদুরের গুঁড়ো।
একবার বলতে গেলাম, ও কি করছ তোমরা, চোখে সিঁদুরের গুঁড়ো পড়বে যে! তারপরই নির্মম, কঠিন সত্যের স্বরূপ মনের সামনে ভেসে উঠতেই থেমে গেলাম। চোখে পড়লেও রেখার কোন ক্ষতি হবে না।
কেউ ফুলের মালা আনল, কেউ তোড়া।
খাটের পাশে রাখল, রেখার মাথার দুপাশে।
কয়েকজন পুরুষও এসে পাশে বসল।
গীতার আশ্বাসবাণী শোনাল, শোকে মুহ্যমান হয়ে না পড়ার অনুরোধ।
আপনার এবার বড় কষ্ট হবে।
হয়তো হবে, এখন ঠিক বুঝতে পারছি না। যতক্ষণ রেখার মরদেহ এই বাড়িতে থাকবে ততক্ষণ বুঝতেও পারব না। রেখার অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে মুছে গেলে তখন সচেতন হব। নিজের ভয়াবহ অসহায়তা সম্বন্ধে।
আপনাদের একজনকে ছাড়া আর একজনকে কল্পনাও করতে পারি না। এখানে এসে পর্যন্ত দেখেছি আপনাদের।
তা সত্যি। আমরা এ এলাকার আদি বাসিন্দা। আমরা আসবার অনেক পরে আর সকলে এসেছে। আগে আমরা দুজনে, আমি আর রেখা বেড়াতে বের হতাম। লাল মাটির রাস্তা ধরে রেললাইনের পাশ দিয়ে, অনেকটা পথ।
তারপর পীচের রাস্তা হ'ল, আমাদের সামর্থ্য কমল। বিশেষ করে আমার। সামনের বাগানটুকুতে বেড়াতেই হাঁপিয়ে পড়তাম। রেখা একটা চেয়ারে বসে থাকত।
আবার চোখ কাটানোর পর লাঠি হাতে একটু একটু করে রাস্তায় বের হতাম। রেখাই তাড়া দিত।
বাড়ির মধ্যে চুপ করে বসে থাকলে শরীর খারাপ হবে। একটু বেরিয়ে এস।
আমি বরং বলছি।
তুমি? তোমারও তো একটু বেড়ানো দরকার। তোমারও তো মানুষের শরীর।
রেখা হেসেছে।
আমার কোনদিন শরীর খারাপ হতে

দেখেছ? আমি সংসারের যা কাজ করি, তাতেই আমার যথেষ্ট পরিশ্রম হয়।

সত্যিই রেখার কোনদিন শরীর খারাপ হয় নি। মধ্যে মাঝে সামান্য মাথাব্যথা, কিংবা অল্প জ্বর, এছাড়া আর কিছু দেখিনি।

এত সহজে বিনা কষ্টে চলে যাবে বলেই বোধ হয় রেখা কোনদিন শয্যা আঁকড়ে থাকে নি।

পাড়ার ভদ্রমহিলারা ছাড়াও দরজার কাছে বস্তিবাসিনীদের ভিড় হয়েছে। তারা হয়তো ভিতরে আসতে সাহস করছে না। চৌকাঠের ওপারে জড় হয়েছে। সকলের কপালেই অর্ধাঙ্গুলি পরিমাণ সিঁদুরের টিপ। সিঁথিতে সিঁদুরের প্রলেপ।

তারা সধবা এমন একটা ভাব প্রকট করার দুরূহ চেষ্টায় তারা যেন পরস্পরের সাথে প্রতিযোগিতা শুরু করেছে।

সস্তা ফুলও তারা এনেছে। গাঁদা ফুল বেশী। সম্ভবত কেনেনি। আসতে আসতে কারো বাগান থেকে আহরণ করেছে।

একবার ইচ্ছা হয় তাদের ভিতরে আসতে বলি। তারাও আসুক, অন্য ভদ্র মহিলাদের মতন নীচু হয়ে সিঁদুর ছোঁক

দিক রেখার কপালে। তার দু' পায়ের ওপর ফুল ঢেলে দিক।

উঠতে গিয়েও উঠতে পারলাম না। ওঠবার দরকার হল না। ভিড়ের চাপে তারাই একসময়ে ছিটকে ঘরের মধ্যে এল।

খাটের কাছে বসল। মাথা ঠেকাল রেখার পায়ের কাছে।

ফুলগুলো ছড়িয়ে দিল।

এই বুঝি তাদের মনের কামনা। রেখার মতন শাঁখা সিঁদুর নিয়ে যেন যেতে পারে।

এটা আর কিছু না, একটা উন্মাদনা, অন্ধ আবেগ। কারণ জানি, এদের মধ্যে কারো সামান্য অসুখ হলেই প্রাণ বাঁচাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়বে। শাঁখা সিঁদুর নিয়ে চোখ বোজার কামনা মুলতুবি রেখে চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের হাতে পায়ে ধরবে।

এবার পাড়ার ছেলেরা এসে দাঁড়াল। কিছু বলল না। বলতে পারল না। শুধু সামনে এসে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে আমাকে নিরীক্ষণ করল।

বলতে পারলাম, লোকে অভিভূত এই সত্যকে [illegible] কথাটা বলতে তারা [illegible] করছে।

আমি উঠলাম। আলমারির চাবি খুলতে গিয়েই মনে হল, চাবিটা রেখার আঁচলে বাঁধা।

এ সংসারের সব কিছুই যেন বাঁধা তার আঁচলে। কোন কিছুর প্রয়োজন হলেই তার কাছে হাত পাততে হয়।

রেখার দিকে চোখ ফেরালাম।

সে একভাবে ঘুমাচ্ছে। তার মুখটা দেখা যাচ্ছে না। কে একজন জামা পরাতে গিয়ে মাথাটা মুখের ওপর রেখেছে। নাক আর ঠোঁটের ওপর।

চাবিটা।

গলার স্বর আটকে গিয়েছে। উচ্চারণ পরিষ্কার নয়।

কে একটি মহিলা রেখার মাথার বালিশের তলায় হাত ঢুকিয়ে চাবির গোছা বের করল। ওরা জানে, শোবার সময়ে মেয়েদের চাবি শিয়রের বালিশের তলায় থাকে।

চাবি দিয়ে আলমারি খুললাম।

একটা টিনের বাক্সের মধ্যে টাকা থাকে। বাক্সটা সামনেই ছিল। কিন্তু তবু টাকা বের করতে দেরি হল। বেশ একটু দেরি।

কারণ টিনের বাক্সটা দেখার আগেই শাড়িগুলোর ওপর তার চোখ পড়েছিল। শাড়ির থাকে কয়েকটা রঙীনও আছে।

ইদানীং রেখা সাদা শাড়ি পরত। সাদা শাড়ি, লাল কিংবা সবুজ পাড়। অনেকবার বলেছি, রঙীন শাড়িগুলো কাউকে দিয়ে দেবে। বিয়ের মেয়ে কিংবা আশপাশের কাউকে।

কিন্তু দেয়নি। হয়তো ভুলে গিয়েছিল, কিংবা মন চায়নি দিতে।

কে একজন কাশির শব্দ করল। কৃত্রিম কাশি।

বোধ হয় আমার মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করল। বোঝাতে চাইল তারা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে।

বাক্স খুলে এক মুঠো নোট বের করে তাদের হাতে দিলাম।

যা করার তারা করুক। যেমন ব্যবস্থা করা উচিত।

আবার ফিরে এসে চেয়ারে বসলাম।

ছোকরার দল বেরিয়ে গেল।

মেয়েদের ভীড় বাড়ছে।

আশ্চর্য লাগল। এ তল্লাটে এর আগে সধবা বুঝি আর দেহত্যাগ করেনি। রেখার মৃত্যুকে ঘিরে এত হৈ চৈ, এত সমারোহ।

তারপরই কথাটা মনে পড়ল।

এ সমারোহের উৎস আমি। আমার মতন বৃদ্ধকে বহাল তবিয়তে রেখে রেখা যে পাড়া কাটিয়ে আগে যেতে পেরেছে, তাই এত উৎসব।

একটু বোধ হয় ঝিমুনি এসেছিল।

মেয়েরা আর বিশেষ কাঁদছে না। খাটের চারপাশ ঘিরে নিজেদের মধ্যে গল্প করছে। কে কত অলৌকিক কাহিনী দেখেছে তার ফিরিস্তি।

কোথায় কোন গ্রামে কবিরাজ স্বামীকে চরক বাক্য বলে দেবার পাঁচ মিনিটের মধ্যে স্ত্রীর দেহত্যাগ। কোথায় সধবা অবস্থায় বিদায় নেবার জন্য স্ত্রীর উদ্বন্ধনে আত্মনাশ।

হঠাৎ চমকে উঠলাম।

বাইরে খোল করতালের সম্মিলিত ধ্বনি।

সংকীর্তনের দল এসেছে।

হাতে পায়ে খবর পেয়ে এসেছে। এমন সুযোগ বৃথা যেতে দেয়নি।

কিংবা ছোকরারাই ভাড়া করে এনেছে।

মনে পড়ল, এভাবে চীৎকার করে ঈশ্বরকে ডাকার পদ্ধতির প্রতি রেখার বিশেষ অনুরাগ ছিল না।

সে বলত, এত গোলমাল মানুষই পালায়, কি করে ভগবান আসবে।

ঈশ্বর আসবার অনুকূল অবস্থা কি আমার জানা নেই। তবে এটুকু বুঝতে পারি শান্ত পরিবেশ সাধকের মানসিক স্থৈর্য থাকে। যে উপাসনা করে, অনুকূল আবহাওয়াই তার কাম্য।

আপনি একটু ওপরে যান।

প্রতিবেশী মহিলা একজন কাছে এসে বলল।

শুধু বলল নয়, হাত ধরে ওঠাবার চেষ্টা করল।

আমি? কেন?

আমার এই অর্বাচীনতার উত্তরে সে বলল।

ও'কে সাজাতে হবে।

হাত দিয়ে বরথাকে দেখিয়েও দিল।

উঠে দাঁড়ালাম।

এরা কেউ কিন্তু একবার জিজ্ঞাসাও করল, আমাদের আত্মীয়স্বজন কাউকে খবর দিতে হবে কিনা।

আমার কিংবা রেখার পরিচিত জনকে।

সম্ভবত এরা দেখেছে কোনদিন আমাদের বাড়ীতে বাইরে থেকে কেউ আসেনি। আমরাও কোথাও যাইনি।

যদি ভালভাবে লক্ষ্য করে থাকে, তাহলে এও দেখে থাকবে পোস্টম্যান কোন চিঠিও এ বাড়ীতে দেয় না।

আমরা শুধু দুজন। আমি আর রেখা। একজন অন্যের পরিপূরক। আর আমাদের কোথাও কেউ নেই।

কিংবা এরা হয়তো এও ভেবে থাকতে পারে।

কাউকে খবর দেবার প্রয়োজন হলে

আনিয়ে ওদের ডেকে বলতাম।

শ্যামবাজারের রামতনু সেন লেন-এ অন্তর জ্ঞাতিরা রয়েছে, অথবা উত্তরপাড়ার বসুপাড়ায় রেখার কোন কুটুম্ব।

আমি এ ঘরে চলে এলাম। আমার শোবার ঘরে।

বিছানাটা একভাবে রয়েছে। ওঠবার সময় বালিশে হাত লেগে বালিশটা কাত হয়ে গিয়েছিল। সেইভাবেই রয়েছে।

অন্যদিন রেখা বিছানা ঝেড়ে বেড-কভার পেতে দিয়ে যায়।

আজ পারেনি। কোনদিন পারবে না।

মাঝখানের দরজাটা ওরা বন্ধ করে দিয়েছে।

রেখাকে বোধ হয় সাজাচ্ছে।

আলমারিতে চাবিটা লাগানোই আছে। ওরা ইচ্ছা করলে পছন্দমত শাড়ি বের করে নিতে পারে। দরকার হলে টাকাও।

বাইরের রাস্তার ওপর মোটর থামার শব্দ হল।

উঠে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। ধূসর রংয়ের গাড়ি। এ পাড়ায় বহুবার দেখেছি।

ভাবতে ভাবতেই মনে পড়ে গেল। মোড়ে লাল রংয়ের তিনতলা বাড়ি, রমাসৌধ, সেই বাড়ির মোটর।

মালিক হরনাথ মল্লিক। লোহার কারবারি। লোহার কড়ি বরগা প্রতি মুহূর্তে সোনার তালে রূপান্তরিত হচ্ছে।

জনশ্রুতি, সব সময়ে যে সোজাপথে তাও নয়।

রমাসৌধের রমাই হয়তো।

পিছনে চাকরের হাতে একটা থালায় শাড়ি আর ফুলের মালা।

একটু পরেই দরজার ফাঁক দিয়ে চন্দনের ধূপের গন্ধ এল।

কারা ধূপকাঠি জ্বালিয়েছে।

রেখাকে তৃপ্তি দেবার জন্য নয়, রেখা স্পর্শ, গন্ধ সব চেতনা অনুভূতির বাইরে।

সংকীর্তনের দল উদ্দাম হয়ে উঠেছে। বোধ হয় রমাসৌধের রমাকে দেখে। নামকীর্তনে খুশী হয়ে ধনাঢ্য-গৃহিণী যদি নজরানা দেয়, কিংবা অন্য কোথাও বায়না।

এত লোকের মধ্যে বাবুয়াকে দেখতে পাচ্ছি না। বাইরের মানুষ যেন বাড়ি অধিকার করেছে। কাছের মানুষকে সরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য এই অনাত্মীয়-সমাগম।

একবার ভাবলাম তাকে চীৎকার করে ডাকি, কিন্তু মনে হল, গলা দিয়ে স্বর বের হবে না। আমার কথা বলার শক্তিও যেন রেখা হরণ করে নিয়ে গেছে।

কিন্তু বাবুয়াকে একবার দরকার ছিল। জল খাব এক গ্লাস।

উঠতে যেতেই মাঝখানের দরজা খুলে গেল।

একটি মেয়ে এসে দাঁড়াল চৌকাঠের ওপর।

একটু আসুন এ ঘরে।

ঠিক যেন ঠাঁই করা হয়েছে, খাবেন আসুন, এমনই কণ্ঠস্বর।

খুব আস্তে উঠলাম। খাট ধরে।

কি দৃশ্য দেখতে হবে জানতাম। লোভনীয় দৃশ্য নয়, তবু দেখার আকর্ষণ দুর্বার।

রেখাকে গরদের শাড়ি পরিয়েছে। গলায় মালার পর মালা। সারা মুখে চন্দনের বিন্দু। মাথার দুপাশে রজনীগন্ধার স্তবক।

যাত্রার সাজ। মহাযাত্রার।

এত সাজিয়ে চিত্তহারিণী করে আগুনের মধ্যে সঁপে দেবার কোন মানে হয়!

এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি, এবার দেখলাম, দেখতে পেলাম, নতুন একটা খাটে রেখাকে শোয়ানো হয়েছে।

পুরানো খাটটা ঘরের মধ্যে কোথাও দেখতে পেলাম না।

আপনি এগিয়ে আসুন। আরো কাছে। আর তো দেখতে পাবেন না।

না, আর দেখতে পাব না। আমার সর্বস্বের বিনিময়েও নয়। আমার এ জীবনের অর্জিত সব পুণ্যফল দিয়েও না।

ছেলের দল একটু চঞ্চল হয়ে উঠল। বোধ হয় দেরি হয়ে গেছে। কাজটা তাড়াতাড়ি চুকিয়ে দিতে পারলেই তারা পরিত্রাণ পায়।

কে একজন আমার কাঁধের ওপর হাত রাখল।

অনুমতি দিন দাদা। এ মাটির খোলসটাকে আটকে রেখে আর লাভ কি!

চেয়ে দেখলাম।

এক প্রৌঢ়। এ দেশের হাজার মধ্যবিত্ত প্রৌঢ়ের প্রতীক। একটু ঝুঁকে পড়া দেহ, চোখে নিকেলের চশমা, অসংস্কৃত বেশবাস। মুখে দর্শনের বুলি।

রেখার পায়ের কাছে তখনও অনেক মহিলার দল মাথা ঠেকিয়ে রয়েছে। তার সীমন্তে সিঁদুর ছুঁইয়ে সেই সিঁদুর নিজেদের সিঁথেয় মাখাচ্ছে।

বোধ হয় আমার মৌনভাবকেই সম্মতির লক্ষণ মনে করে থাকবে।

বারান্দায় দাঁড়ানো ছোকরার দল ভিতরে এসে দাঁড়াল।

খাটশুদ্ধ রেখাকে তুলে ধরল।

এতক্ষণ রেখা নিষ্প্রাণ, নিষ্কম্প ছিল। অসাড়, চেতনাহীন।

খাটটা তোলার সঙ্গে সঙ্গে তার দেহ নড়ে উঠল।

ভাবটা যেন উঠে বসবে। দুটো চোখ কচলে বলবে, এত বেলা হয়ে গেছে। এত বেলা!

ছেলেদের পিছন পিছন আমিও বাইরে এসে দাঁড়ালাম।

তখনই দেখতে পেলাম বাবুয়াকে।

বারান্দায় রেলিং-এ হেলান দিয়ে চুপচাপ বসে আছে। তার শোক অন্য সকলের মতন এত সোচ্চার, এত উচ্ছ্বাসপূর্ণ নয়। শোকের সাগরে সে যেন ডুবে গেছে। কিংবা তলিয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে।

বাবুয়া।

আমার ডাক হরিধ্বনিতে হারিয়ে গেল। বাবুয়া শুনতে পেল না।

তখন নীচু হয়ে তার শরীরে হাত ঠেকালাম।

বাবু।

বাবুয়া সোজা হয়ে দাঁড়াল।

তুই থাক বাড়িতে, আমি ঘুরে আসি।

শেষদিকে আমার কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ হয়ে গেল।

যে পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, জলভরা দৃষ্টির মাধ্যমে তাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম না। সে বলল।

এতটা পথ আপনি পারবেন যেতে?

রেখার যেতে কষ্ট হবে না। সে লোকের কাঁধে চলেছে। পুষ্প আর ধূপবৃষ্টির মধ্য দিয়ে। আবহসংগীত হিসাবে রয়েছে কীর্তনের সুর।

কিন্তু আমাকে পায়ে হেঁটে যেতে হবে। সেটাই রেওয়াজ।

কোন উত্তর দিলাম না। এগিয়ে গেলাম।

এগিয়ে গেলাম, সেটাই আমার উত্তর।

রমাসৌধের রমা তার মোটরে বসেছিল।

মোটরের দরজা খুলে নেমে দাঁড়াল।

নিন, উঠে পড়ুন। এতটা পথ হাঁটতে আপনার কষ্ট হবে।

আশপাশের কয়েকটি মহিলাও যেন রমার কথায় সায় দিল।

অবাক লাগল। আগে আমার দুঃখ কষ্ট, ব্যথা বেদনার ওপর চোখ রাখত শুধু একটি মানুষ। সে রেখা।

রেখা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমার বেদনার অংশীদারের সংখ্যা বেড়ে গেল।

এদিকের শ্মশানটা কোথায় ঠিক জানি না। জানার এতদিন প্রয়োজন হয়নি।

এদের কথাবার্তায় মনে হচ্ছে, সম্ভবত শ্মশানটা বেশ দূর। পথও সুগম নয়।

নিজে কতটা আয়েসী হয়ে পড়েছি সেটা বুঝতে পারলাম, মোটরের গদীতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে।

গোটা ছড়াল। ভিতরে রমা ছাড়াও আরো দুটি মহিলা রয়েছে। বোধ হয় এরা সবাই শ্মশান পর্যন্ত যাবে। অপেক্ষা করবে সেখানে মরদেহ ভস্মীভূত হওয়া পর্যন্ত।

রেখা এগিয়ে চলেছে। পিছনে রাস্তার ওপর ভীড় করে দাঁড়ানো মেয়েরা দুটো হাত কপালে ঠেকিয়ে শেষ প্রণতি জানাচ্ছে। পুরুষেরা জয়ধ্বনি দিচ্ছে।

এই মুহূর্তে সহজ সত্যটা উচ্চারণ করতে দ্বিধা হ'ল।

এতগুলো মানুষের ভক্তি ও শ্রদ্ধার অর্ঘ নিয়ে পুষ্পমাল্য বিভূষিত হয়ে যে মহিলা শেষ-যাত্রা করছে, সে যে কুখ্যাত এলাকার যশোদাবাঈয়ের মেয়ে, এ কথা এত অবিশ্বাস্য যে এমন কিছু একটা বললেও, লোকে আমার মানসিক ভারসাম্যহীনতার দোষ দেবে।

বাঈজির এই ভ্রষ্ট চরিত্র মেয়েটির জনাই যে আমি আমার সাজানো সোনার সংসারে নিজের হাতে আগুন জ্বালিয়ে বের হয়ে এসেছি, এমন কথাও কেউ শুনতে চাইবে না।

ফুল, সিঁদুর, যুক্তিহীন ভক্তির চাপে যমুনাবাঈয়ের সব কলঙ্ক চাপা পড়ে গেছে।

এক রাশান নাস্তিকের প্রতিকৃতি, যে-নাস্তিকের বিখ্যাত উক্তি হচ্ছে "ধর্ম হল জনসাধারণের আফিং"; সেই প্রাকাম থেকেই বাসা পাওয়া এখানে রীতিমতো মুশকিল ছিল। আমি ভারি ভাবনায় পড়লাম।

সিতে উনিভের্সিতের (ইউনিভার্সিটি সিটি) নামে ছাত্র-ছাত্রীদের যে কলোনি সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন ফরাসী সরকার, সেখানের মনোরম পরিবেশে সম্প্রতি 'ভারত-ভবন'ও খোলা হয়েছে; আদি অকৃত্রিম নির্ভেজাল বাঙালী মতে আড্ডা দেবার জন্য প্রাণ-বাবাজী বায়না ধরলে ওখানে বন্ধুদের কাছে 'ফ্রেণ্ড ইন্ নীড' উক্তির সার্থকতা যাচাই করতে যাওয়া চলে। তাছাড়া ওখানেই তো ল্য কর্বুসিয়ে নির্মাণ করেন 'সুইস ভবন' (১৯৩৩ সালে) এবং তাঁর পরিচালনাধীনে নির্মিত হয় ওখানে 'ব্রেজিল ভবন'। ১৯৩৬ সালে জন্ ডি রকফেলার (জুনিয়র) অর্থ সাহায্য করেন ওখানে 'আন্তর্জাতিক ভবন' নির্মাণার্থে : ১,২০০ আসন সম্বলিত থিয়েটার, ডাইনিং হল্, সুইমিং পুল, বিভিন্ন ক্লাব—এই ভবনে বাসা পাওয়া রীতিমতো দুরূহ ব্যাপার। তাছাড়া, বড় বড় সব দেশেরই ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এই কলোনিতে ছাত্রাবাস রয়েছে।

আমাদের হোস্টেলের ডাইরেক্টর গেরো সাহেবের সামরিক বন্ধুত্ব আমায় বরাবর মুগ্ধ করেছে। তাঁর কাছে পরামর্শ চাইতেই বলে উঠলেন, "ব্যুলিয়ে অর্থাৎ জাঁ সারাই ছাত্রাবাসে যাবে?" "তার পর?" "দেখি কোন করে।" এবং ওঁর ব্যবস্থায় অবশেষে আমি নতুন ঘরে এসে নিশ্বাস ফেলে বাঁচলাম।

এই ছাত্রাবাসটির বহু বৈশিষ্ট্য। হোস্টেল থেকে বেরিয়ে যদি উত্তরমুখে বা ডানদিকে চলতে থাকেন বুলেভার সাঁ-মিশেল ধরে, লুক্সেমবুর্গ বাগান পেরিয়ে আপনি পৌঁছে যাবেন সরবন্—পাড়ায়, তার ওপারে স্যাঁ-জ্যারমাঁ, এবং সেইন্ নদী পার হলেই নতরদাম গীর্জা, ফরাসী রাজাদের প্রাসাদ ও চ্যাপেল, সেই 'গুহা' যেখানে অভিজাত বন্দীদের আটকে রাখা হত গিলোটিনে নিয়ে যাবার আগে (আনাতোল ফ্রাঁসের Les dieux ont soif বা 'তৃষিত দেবতা' উপন্যাসের কথা মনে পড়ে এখানে)। আর হোস্টেলের গা ঘেঁষে যে রাস্তাটা পশ্চিম দিকে চ'লে গিয়েছে তার নাম মঁপার্নাস—শিল্পী সাহিত্যিক অভিনেতাদের স্বর্গ এখানে : পাশেই রাসপাই বুলেভারে থাকেন জাঁ-পল সার্ত্র—সন্ধ্যে নাগাদ গুটি গুটি উনি যখন ওঁর প্রিয় কাফে-তে গিয়ে বসেন, সংগে থাকেন কোনদিন কোনও নামী কেউ, কোনদিন-বা একা; যাঁরা ওঁকে চেনে না, তাদের চোখে কিম্ভূত ওই বেঁটে মানুষটার সংগে দেড়-হাজার জাঁ পলের পার্থক্য বিশেষ নেই।

আর, ছাত্রাবাসের সামনেই যে অ্যামেরিকান বাড়ীটি, তার ভিতর ঢুকলে আপনাকে ওরা দেখিয়ে দেবে পুরোনো আমলের closerie des Lilas কাফে'র কোন বেঞ্চিতে বসতেন লেনিন, কোন বেঞ্চিতে গত শতাব্দীর কোন কোন বিখ্যাত কবি। ওর বাইরে মারেশাল নেয়'র প্রতিমূর্তিটি ফরাসী ভাস্কর রোদ্যাঁ-র মতে পারী-র অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং শিল্পকীর্তি। এবং বাঁ দিকে, দক্ষিণ অভিমুখে চলতে থাকেন, যদি Port-Royal'-এর কথা যদি আপনার জানা থাকে, তা হলে শাতোব্রিয়াঁ যে বাড়িটায় বাস করতেন তা যেমন আপনার নজর এড়াবে না আভ্যনু দাঁকের-রোশরো দিয়ে যেতে যেতে তেমনি সতেরো শতকের স্মৃতি-বিজড়িত অন্যান্য খ্যাতনামা ব্যক্তিদের পদধূলি-ধন্য আরো অনেক ছোট-বড় বাড়িও দেখতে পাবেন।

হোস্টেলের ঘর থেকে দেখছি, আমার পূবের আকাশ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে ভাল্ দ্য গ্রাস গীর্জার চূড়া। ওর পাশেই নয় নম্বর বাড়িতে বাস করতেন একটি ফরাসী মেয়ে : প্রচুর অর্থ, ঈশ্বরদত্ত রূপ-গুণ, বংশ-গৌরব—কোন কিছু মেয়েটিকে বাঁধতে পারল না; ওই বাড়ির বাগানে বসে মেয়েটি লিখতেন তাঁর খাতা ভরে প্রার্থনা আর ধ্যানের অনুলিপি, প্রথম মহাযুদ্ধের আগে: স্বামী ছিলেন দার্শনিক—দুজনে ভারতবর্ষে যান ১৯১৪ সালে এবং সে দেশের বিপ্লবী নেতা শ্রীঅরবিন্দকে মহাযোগীর ধ্যানে আসীন দেখে মেয়েটি জীবনের সর্বস্ব তাঁর শ্রীচরণে অর্পণ ক'রে ভারতবর্ষকেই নিজের মাতৃভূমি বলে বরণ ক'রে নেন। চুয়াল্ল বছর আগে সেই যে মেয়েটি পণ্ডিচেরী যান, আজও তিনি ভারতের মাটিতে স্বীয় মহিমায় ভাস্বর হয়ে অধিষ্ঠান করছেন—'শ্রীমা' নামে আজ বহু দশক যাবৎ দেশে দেশে পরিচিতা তিনি।

আর এক বিদেশী মহিলার কথা মনে পড়ে : পোল্যান্ড থেকে এসে তিনি ফ্রান্সকে আপন ক'রে নিয়েছিলেন কর্ম-সাধনার সূত্রে। মাদাম মারী ক্যুরী ও পিয়ের ক্যুরীর নাম কারো অজানা নয়। এঁদের সাধন-পীঠও এই হোস্টেল থেকে দূরে নয়, মাত্র কয়েক মিনিটের পথ। লুই পাস্তার, ভিক্তর য়্যুগো থেকে শুরু ক'রে আরো কতজনের স্মৃতি বিজড়িত এই অঞ্চলে ব'সে রোমাণ্টিক মন আমার নিজের অগোচরে অহর্নিশ পুলকিত হচ্ছে।

*

গত রাষ্ট্রবিপ্লবের জের টেনে এ অবধি অন্ততঃ দশ-বারোটি উল্লেখযোগ্য বই এখানের বাজারে বের হয়েছে। লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে উচ্চাভিলাষীর নাম আমার মতে জাঁ-জাক সেরভাঁ-শ্রেব্যার। কিছুদিন আগেই ইনি "ল্য দেফি আমেরিক্যাঁ" (মার্কিনী চ্যালেঞ্জ) নামে একটি বই লিখে প্রচুর সুনাম, দুর্নাম এবং প্রকাশক দনোয়েল'এর ইনাম অর্জন করেছেন। পিয়ের মেঁদেস-ফ্রাঁস'এর সহকারীর ভূমিকায় পলিটেকনিকের এই কৃতী সন্তান ধীরে ধীরে খ্যাতির ও প্রতিপত্তির চূড়ার দিকে এগিয়ে চলেছেন। মিউনিকে, মাদ্রিদে সর্বত্রই ওঁর মার্কিনী চ্যালেঞ্জের অনুবাদ বিক্রী হতে দেখেছি। এর কারণ ইনি হঠাৎ ক'রে মার্কিনী অর্থনৈতিক সাফল্যের প্রতি এবং ইউরোপে তার ফলস্বরূপ ইওরোপীয় দেশগুলির অর্থনৈতিক ও অন্যান্য দৈন্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়েছেন জনপ্রিয় হবার উপযুক্ত কৌশল প্রয়োগ ক'রে। অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও অপরাপর দৃষ্টিবিন্দু থেকে নতুন এক পশ্চিম-ইওরোপীয় জোট বাঁধবার স্বপক্ষে লেখক প্রথমে তুলে ধরেছেন বর্তমান সঙ্কটের চিত্র, এবং দিয়েছেন কিছু সমাধানের সম্ভাবনা। সমাধানগুলির যৌক্তিকতা নিয়ে সংশয় রয়েছে যথেষ্ট। কিন্তু এর কিছু অংশও যদি বাস্তবে গৃহীত হয় সজ্ঞানে বা দৈবাৎ, সেরভ্যাঁ-শ্রেব্যার তা হলে হয়তো বড় বা মাঝারি রকমের প্রফেট রূপে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। কুয়ান ৎসার উদ্ধৃতি, "কাউকে তুমি যদি একটা মাছ দাও, একবার তা দিয়ে সে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে পারবে; তাকে তুমি যদি মাছ ধরতে শিখিয়ে দাও, সারাজীবন তা দিয়ে সে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে পারবে"—দিয়ে শুরু হয়েছে উক্ত গ্রন্থটি। এডোয়ার্ড কেনেডির নামে ফরাসী ভাষায় যে বইটা বাজারে চলছে (বব-এর মৃত্যুর পরদিন থেকে), তার ভূমিকাও আবার লিখেছেন সেরভাঁ-শ্রেব্যার। পাণ্ডিচেরী নারায়ণের কাছে ফিরে যাবার হ্রস্বতম পথ—শত্রুরূপে তিনজন্ম—বেছে নিয়েছেন বোধ হয় এই লেখক।

'মার্কিনী চ্যালেঞ্জ' গ্রন্থের মূল সংস্করণের ২৯২ পৃষ্ঠা থেকে ছোট দুটি পারা তুলে দিই : "মার্কিন সৈন্যবাহিনী ভিয়েৎনাম ছাড়বে; সেখানে তাদের অন্য কোন লক্ষ্যের আর সম্ভাবনা নেই, সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা সম্যক। কিন্তু মার্কিন শিল্পবিদ্যা ইওরোপের মাটি ছাড়বে না; সেখানে তার বিজয় ব্যাপকতর হয়ে চলেছে, বেড়ে চলেছে তার ক্ষমতা। এ ভাগ্যাস আদৌ অস্তিত্ব পেত না যদি আমরা খুঁজে পেতাম নিজেদের মধ্যে এক 'শিল্পবিদ্যোত্তর সমাজ' (une societe post-industrielle) গড়ে তোলবার শক্তি এবং তাকে চালাই ক'রে নেবার রুচি। কারিগরী বিদ্যার দক্ষ সংগঠনের পরাক্রম, ভাল লাগে বই-কি, কিন্তু উচ্চতর এক সভ্যতার পরিপ্রেক্ষিতের তুলনায় তা আমরা অনেক কম চিত্তাকর্ষক গণ্য করি। এভাবে দেখা যায় মার্কিনী স্পর্ধা যেন সেই আভ্যন্তরীণ ত্যাগেরই সমর্থকে জুগিয়ে চলেছে এক বাহ্যিক চাপ।

"এই অ-পূর্ব স্পর্ধার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমরা, নিঃসঙ্গ, বিলম্বে জাগ্রত, কিন্তু অসম্বল হব না। যে যুগে সমস্ত জনসংখ্যাই ছিল ক্ষমতার পরিচায়ক, অক্ষৌহিণীই ছিল বলে ইওরোপ সেদিন পুরোভাগে ছিল। শিল্পবিদ্যার যান্ত্রিক বল যেদিন দেখা দিল, কাঁচা-মাল রূপান্তরের প্রশ্ন উঠল, ইওরোপ নেতৃত্ব ছাড়ল না। ১৯৪০ সালেও একত্রিত করা যদি যেত, জার্মানী, গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্সের কোয়ালিশন ভাঙত, সাধ্য কার? এমন কি হিটলারের খ্যাপামির পরেও শোচনীয়তম গৃহযুদ্ধের পরে দেহে রক্ত-মোক্ষণ ও অন্তরে দিগভ্রান্তির শেষে ১৯৫০ সালের পর এমন প্রচণ্ড প্রাণ-শক্তি নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল ইওরোপ যে তখনও সে শ্রেষ্ঠ আসনের দাবীদার হতে পারত। কিন্তু আমাদের নেতাদের মধ্যে যে বস্তুটির ঘাটতি দেখা গিয়েছে পরবর্তী এই ক'টি বছরে তা' হল যুক্তিযুক্ত এক উচ্চাকাঙ্ক্ষা, যা সাধ্য।"

আশা করব, লেখকের এই উচ্চাকাঙ্ক্ষার অভাব হবে না। বহু-পঠিত সাপ্তাহিক 'এক্সপ্রেস' প্রতি-সংখ্যায় তার সম্পাদক সেরভাঁ-শ্রেবের'এর কলম-নিঃসৃত একটি ফিচার নিয়মিত ছেপে চলেছেন। ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে থাকা হয়ত-বা নৈরাশ্যজনক পরিগণিত হবে না। ঐক্যের স্বপ্ন, যে পথ দিয়েই হোক, যত সংকীর্ণ হোক না কেন তার পরিধি—আমাদের ঈপ্সিততম স্বপ্নের রাজ্য। বিশেষত সে স্বপ্ন যদি হয় গঠন-মূলক।

কিন্তু আমি বিপ্লবের আগুনে পিঠ তাতিয়ে ব'সে আছি, ভুলিনি। রাষ্ট্র-বিপ্লবের পথ বেয়ে আর যেসব বই এখানে প্রকাশিত হয়েছে, তাদের ধর্ম—বর্তমান আন্দোলনকারী 'ছাত্রবল'-এর স্বধর্ম যা, তা হল নৈরাজ্যবাদ। ভালদাদু জানতে চেয়েছেন, "সার্ত্র সাহেবের অস্তিত্ববাদের প্রভাব কতটা এদের মধ্যে?" কিন্তু যুদ্ধোত্তর এজন্মে "সার্ত্র বা কামু যে তাৎপর্য বহন করতেন, বিবর্তনের পাথেয় রূপে আজ তা কানা-কড়িতে পর্যবসিত।

আজকের প্রবল নেতিবাদে, আজকের এই সংরক্ষণশীলতা-বিধ্বংসী এবং জ্যেঠা-মশাইকে বক-দেখানোর প্রবৃত্তিতে ইন্ধন জুগিয়েছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যে দার্শনিকের চিন্তাধারা, নাম তাঁর হের্বার্ট মারকিউস। কার্ল মার্ক্সের ১৫০তম জন্ম-বার্ষিকী উপলক্ষে ইউনেস্কোর আমন্ত্রণে তিনি মাস কয়েক আগে নতুন ক'রে পারী ঘুরে গেলেন। আমাদের শতাব্দীর চেয়ে দু-বছর বেশি এঁর বয়স। বহু ভাষার সঙ্গে ইনি পরিচিত : মাতৃভাষা জার্মান, ১৯৩৭ সাল থেকে মার্কিন নাগরিক ব'লে ইংরেজিকে স্বকীয় করেছেন, ফরাসী ও রুশে সহজ দখল, ইতালীয় ও স্পেনিশ বেশ বোঝেন। বার্লিনে ওঁর জন্ম হলেও দক্ষিণ জার্মানীর ফ্রিবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরি-বিলি পরিবেশে মারকিউস তাঁর ডক্টরেট করেন হেগেলের উপর—মার্টিন হাইডেগারের পরিচালনায়। সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বগ্রাসী শিল্পবিদ্যা নামধারী যন্ত্রটির কুক্ষিতে নিজের চিন্তা-স্বাধীনতা বলি দিতে অনিচ্ছুক, তিনি জার্মান ও রাশ্যান বিপ্লবের আগুনকে আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে জিইয়ে রাখতে তৎপর ছিলেন।

এই সময়ে ফ্রয়েডের কিছু কিছু শিষ্য সচেষ্ট ছিলেন বিপ্লববাদী মার্ক্সিজম্ আর মনঃ-সমীক্ষণ-লব্ধ কামশক্তির মধ্যে সংযোগ স্থাপনে। 'ল্য নুভেল অব্‌সের্ভাত্যর'-এর স্যার্জ মালে'র মতে ফ্রয়েডের "মানুষের ইতিহাস হল তার অবদমনের ইতিহাস" উক্তিটির পিঠাপিঠ মারকিউস পরবর্তী কালে লেখেন, "যা অবদমিত, তার প্রত্যাবর্তন দিয়েই রচিত হয়েছে সভ্যতার নিষেধাজ্ঞা-গুলো আর ভূতলগামী ইতিহাস, এবং এই ইতিহাসকে আলোয় টেনে আনলে শুধুমাত্র ব্যক্তিরই নয়, সভ্যতার গোপন কথাও জানা যাবে।" শাস্তির ভয়ে, সমাজের ভয়ে মানুষ ধার ক'রে ঘি খেয়ে সুখে জীবন কাটিয়ে যাবার মতো বিভিন্ন প্রবৃত্তিকে চাপা দিতে গিয়ে সৃষ্টি করে মুখোসের। এবং এই মুখোস অন্তরায় হয়ে ওঠে মানব-জীবনের বৃহত্তর রূপান্তরের পথে।*

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল গবেষণার পরে তাঁর বেস্ট-সেলার বই "সোভিয়েত মার্ক্সবাদ", ছাপতে দেন মারকিউস। হেগেল-বিশেষজ্ঞ মারকিউস তাঁর নিজের বিশিষ্ট চিন্তাধারা যে-দুটি বইয়ে প্রকাশ করেন তা অবিলম্বে যথাক্রমে জর্মান, ইতালীয় ও ফরাসী ছাত্রদের বাইবেলে পরিণত হয় : ১৯৫৫ সালে বস্টনে ছাপা 'এরস অ্যান্ড সিভিলাইজেশন' (ফ্রান্সে এর অনুবাদ বেরিয়েছে ১৯৬৩ সালে), এবং 'ওয়ান ডাইমেনশনাল ম্যান' (বস্টন, ১৯৬৪): প্রথমটির নতুন এক ফরাসী সংস্করণ এবং দ্বিতীয়টির প্রথম ফরাসী অনুবাদ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে ফ্রান্সে।

মারকিউস নিজে গত ত্রিশ বছর যাবৎ আদর্শ অধ্যাপকরূপে দাম্পত্য জীবন যাপন করছেন ক্যালিফর্নিয়ায় এবং মার্কিন সমাজের মগডালে বসেই নির্মমভাবে কুড়ুল মারছেন সেই ডালের গোড়ায় : সেই কুড়ুলের দৃষ্টান্ত ক্রমে ক্রমে সংক্রামিত ক'রে চলেছে তরুণদের মন, বিশেষত বিভিন্ন ইওরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে।

* নিম্ন প্রকৃতিকে, প্রবৃত্তিকে বশ ক'রে কীভাবে ভারতীয় যোগ সাধনা ঊর্ধ্বমুখী হবার শিক্ষা দিয়েছে, মারকিউস তা যদি জানতেন!

'অতীন বসু তাঁর 'নৈরাজ্যবাদ' পরিক্রমায় মারকিউসকে স্থান দিয়ে গিয়েছেন কিনা স্মরণে নেই। তবে বিপ্লবী বাংলা তথা ভারতের চেতনায় আজ আপাতদৃষ্টে যে নৈরাশ্য পরিস্ফুট, তার আলোকে রুশ বিপ্লবে আস্থাসম্পন্ন মারকিউসের আশা ভঙ্গের ফলস্বরূপ রচনাগুলি নিশ্চয় নতুন কিছু চিন্তার খোরাক দেবে। নাৎসীবাদ নামক যে দুই চোরাবালিতে রুশ বিপ্লবের স্রোতস্বিনীকে হারিয়ে যেতে দেখেছেন মারকিউস, আমাদের দেশের সমস্যাবহুল পটভূমিকায় আমাদের ভূদেব মুখোপাধ্যায় বা বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু ক'রে স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দের গ্রন্থাবলী সামনে রেখে যদি মারকিউস পড়ি—হয়তো-বা উত্তর পাব আমরা, "আমাদের বিপ্লবের আগুন কোথায় গেল? কেন আমরা জগৎ-সভায় আজও খুঁজে নিতে পারছি না প্রতিশ্রুত আমাদের শ্রেষ্ঠ আসন?" স্বভাবতই, মারকিউস কেন, কোন বিদেশী মতবাদ বা চিন্তাধারাই আমরা আর মূল সমেত উপড়ে নিয়ে কলম বানাতে যাব না ভারতের মাটিতে; বিশেষত পাশ্চাত্ত্য দর্শনের নিরন্ধ্র হতাশার অন্ধকার আমাদের উদার রোদে পুষ্ট সভ্যতার পক্ষে উপাদেয় যখন নয়, তখন রুশ, চীন বা মার্কিনী কোন বিষবৃক্ষেরই প্রয়োজন নেই আমাদের দেশে। তাই ব'লে কি ঠেকে শেখার পরিবর্তে দেখে শেখার সুযোগ হারানো উচিত?

*

টোগো বলল, "সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী এসেছে নাচ-গানের অনুষ্ঠানসূচীতে আমন্ত্রিত হয়ে। শুনেছিস কখনো, কেমন হয় ওদের অনুষ্ঠান?"

এর আগে যতবারই ওরা এসেছে, যথেষ্ট সাফল্য ও জনপ্রিয়তা অর্জন ক'রে ওরা দেশে ফিরেছে। গত বছরে যতদূর মনে পড়ে ভার্সাই দরওয়াজার ক্রীড়া-প্রাসাদে (Palais de sports) ওদের নাচ-গানের ব্যবস্থা হয়েছিল এবং দিনের পর দিন দলে দলে দর্শকেরা গিয়ে চমৎকৃত হয়ে এসেছে; আমার ইচ্ছা সত্ত্বেও কখন যাওয়া হয়নি। শুনে তো টোগো তখুনি যায় আর-কি টিকিট কাটতে। গেলও অবশেষে।

প্রসিদ্ধ প্রেক্ষাগৃহ সাল প্লেইয়েল (যেখানে সব বড় বড় কনসার্টের আয়োজন হয়ে থাকে) গমগম ক'রে উঠল উদ্বোধনী সঙ্গীত—ফ্রান্সের জাতীয় সঙ্গীত, 'লা মার্সেইয়েজ'-এর উন্মাদনা-দীপ্ত সুরে! প্রচলিত সুরটির স্থানে স্থানে হার্মনির খাতিরে যে ব্যতিক্রম কানে এল, তা আমায় স্মৃতির উজান ব'য়ে আজ থেকে আঠারো বছর আগে নিয়ে গেল। শ্রীঅরবিন্দ

আন্তর্জাতিক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের জন্য আহূত কনভেনশন উপলক্ষে সঙ্গীত-পরিচালনা করছিলেন শ্রীদিলীপকুমার রায়। মূলে 'লা মার্সাইয়েজ', তার সঙ্গে কবি নর্ম্যান ডাউসেটের ইংরেজি বাণী, তার সঙ্গে ভোগে দিলীপকুমারের সংস্কৃত 'ভারতনিশান্তে-মিহাগতম্' ও বাংলায় 'ভারত-রাষ্ট্র প্রজাহিল, যন্ত্রী!'—প্রভৃতি ছিল আমাদের কোরাসের অঙ্গ। উদাত্ত মধুর কণ্ঠ দিলীপকুমারের; ফরাসী ভাষায় জ্ঞান তাঁর সর্ববিদিত যেমন, তেমনি অধিকার তাঁর পশ্চাত্য সঙ্গীতের ওপর। একদিন রিহার্সাল চলছে; রিফ্রেনের "মারশ'... মারশ'..." (marchoous...marchous...) অংশে অনিলদা, সুনীলদা, নর্ম্যানদা প্রভৃতির ভরাট গলায় বুকের তলা অবধি আমাদের কেঁপে উঠছে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন দিলীপদা, "দাঁড়াও, তোমাদের একটা ভাল কিছু শোনাই।" ফিরে এলেন হাতে একটা পুরনো রেকর্ড। বললেন, "রাশ্যান গাইয়ে ফেওডোর শালিয়াপিন 'লা মার্সাইয়েজ' গাইতেন কিভাবে, শোন।" প্রাণমাতানো সেই বিপ্লবের আহ্বান শুনতে পেলাম এতদিন বাদে—ফরাসী

আসুন না, দাদা, আমাদের ওখানে খাবেন।"

এ যেন মরুভূমিতে ধাঁ ক'রে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল। কারণ জয়ার হাতের রান্না খেয়ে ভুলে যেতে হয়, দেশ থেকে আট হাজার কিলোমিটার দূরে বাস করছি। মশুর ডাল, বেগুনের কোপতা, রসম-সম্বর, ঘি-ভাত, মুর্গির মাংস, এমন পরিপাটি ক'রে রাঁধে যে কে বলবে জয়া ভারতীয় নয়? এর ওপরে দুজনেই শিল্পী। প্যাট চমৎকার শিস দেয়, যে-কোনও সুর দু-একবার শুনলেই তুলে নেয়। রিপণের কাছে 'এ মণিহার আমার নাহি সাজে' বা 'এই দুনিয়াটা লাট্টু' না কি সব গান শুনেছিল, খাসা বাজায়। আর জয়া গায় বিশুদ্ধ শাস্ত্রীয় মতে তামিল ভাষায় কর্ণাটি গান। গ্রহস্পর্শ ঘটে, এর সঙ্গে যখন ইউনুস ছাড়ে তার হিন্দী ছবির গানের স্টক; কী স্মৃতিশক্তি ছেলেটার!

জয়া আর প্যাটের ইচ্ছে, ওদের ছিপছিপে হালকা শ্যামলা মেয়েকে ভারতে পাঠায় ভরতনাট্যম শিখতে।

আমি বললাম, "রম্বু নাল্লো, পা!" (উত্তম কথা, হে!)

পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ছত্রিশ

বিমান তার পুরোনো বাসায় আর ফিরল না। একদিন এক শীতের বিকেলে অপর্ণা তার প্রকাণ্ড গাড়িখানা নিয়ে হাসপাতাল থেকে তুলে নিল বিমানকে। বলল—আমরা কিন্তু নতুন জায়গায় যাচ্ছি। তুমি আপত্তি করতে পারবে না।

না, বিমান আপত্তি করল না। ছেলেবেলা থেকে সে কখনো সুখের মুখ দেখেনি। সুখকে গ্রাহ্যও করেনি। কিন্তু এখন সে টাকার শক্তিকে অগ্রাহ্য করতে ভয় পায়। তার পুরোনো ব্যাধি সেরে গেছে। যেদিন সে নতুন ছিনতাইবাজের হাত থেকে নিজের ঘড়ি আর মানিব্যাগ ছিনিয়ে নিয়েছিল, সেদিন থেকেই বস্তুত তার ঐ ব্যাধির সূত্রপাত হয়েছিল। এখন সেই সব পাগলামি ইচ্ছে তার আর হয় না। অপর্ণার পাঠানো নানা মহার্ঘ ফল ও খাবার, দামী ওষুধ এসবের ফলে ব্যাধি সেরে তার শরীর এখন মোটাসোটা, উজ্জ্বল গায়ের রঙ, মাথার চুল সুবিন্যস্ত, গায়ে ভাল জাতের জামা প্যান্ট। তবে, তাকে কেমন একটু ভীতু, সুখী আর লাজুক দেখায়। তার মাঝে মাঝে মনে হয় সে বোধহয় আর ইচ্ছে করলেও মাথার ভিতরে আকাশটাকে টের পাবে না। আকাশ চিরকালের জন্য মাথার ওপরে—অনেক ওপরে সরে গেছে।

মোটরগাড়ির এক কোণে গভীর গদির মধ্যে ডুবে থেকে সে বিকেলের স্নিগ্ধ, নীল সুন্দর আকাশের দিকে নিস্পৃহভাবে একটু চেয়ে দেখল।

চোখ ফিরিয়ে দেখল আকাশী নীল শাড়ি পরেছে অপর্ণা। সামনের দিকে ঝুঁকে ড্রাইভারকে পথের নির্দেশ দিচ্ছে। বারকয়েকই জিজ্ঞেস করেছে বিমান—কোথায় নিয়ে যাবে আমাকে? অপর্ণা তার উত্তর দেয়নি। কেবল রহস্যময়ভাবে হেসেছে।

এখন আর জিজ্ঞেস করছিল না বিমান। যেখানেই হোক, খুব সুন্দর ভাল জায়গাতেই তাকে নিয়ে যাবে অপর্ণা, একথা বিমান জানে। তারপর সেখানেই সে আর অপর্ণা থাকবে সুখে, চিরকাল, যতদিন না অমোঘ বিচ্ছেদগুলি আসে। কিন্তু এখন বিমান কেবল এটুকুই দেখতে পায় যে অপর্ণার শাড়িখানার আকাশী নীল রঙটা বড় সুন্দর। এ রঙ অপর্ণাকে মানায়।

আশ্চর্য এই যে, ডাক্তারেরা কত যাদু জানে। কত ভোজবিদ্যা লুকোনো আছে ভাল ওষুধ আর পুষ্টিকর খাবারে। এখন আর কিছুতেই একটা অন্ধকার পৃথিবীর কথা ভাবা যায় না, যে পৃথিবীতে জন্মান্ধ মানুষেরা হাতড়ে হাতড়ে পথ খুঁজছে।

অপর্ণা তার দিকে মুখ ফিরিয়ে হাসল। আস্তে করে বলল—তোমার মাথার আসলে কোনো গোলমাল ছিলই না, ডাক্তার বলেছে।

—কী বলেছে?

—বলেছে, অপুষ্টি এবং বেশী চিন্তা ভাবনা থেকে তোমার ওরকম হয়েছিল। ওটা কিছু না। তুমি একদম সেরে গেছ।

বিমান সেটা টের পায়। কতক জিনিস আছে যা টের পেতে ভুল হয় না।

অপর্ণা বলল—বাবা রাজী হয়েছেন।

—কিসে?

লাজুক হেসে মুখ নামাল অপর্ণা, বলল—তুমি একটুও আমার কথা ভাবো না। ভাবলে বুঝতে পারতে।

বিমান বুঝতে পেরে যায়। সামান্য একটু সুখ এবং দুঃখ সে যুগপৎ বোধ করে। হ্যাঁ, বোধ হয় এখন সে অপর্ণাকে ভালবাসে। এতকাল সেই ভালবাসা সে বুঝতে পারত না।

বুঝতে পেরে নিজেও লাজুক হাসল বিমান, বলল—রাজী হলেন? কী করে!

—বাঃ! আমি বাবার এক মেয়ে না! একটাই তো সন্তান আমি! আমার ইচ্ছে না রেখে কি বাবা পারে!

বিমান চুপ করে থাকে।

একটু ইতস্তত করে অপর্ণা বলে—কিন্তু এরপর থেকে তোমাকে ঐ বিদঘুটে চাকরি ছেড়ে আমাদের কারখানা টারখানার ভার নিতে হবে। তুমি আর আমি দুজনে মিলে চালিয়ে নেবো—কী বলো?

বিমান ঘাড় নাড়ে। এখন আর কোনো কাজই তার শক্ত বলে মনে হয় না।

হিন্দুস্থান পার্কে অপর্ণাদের বাড়ির অদূরে একটা সাদা সুন্দর ছোট বাড়ির সামনে গাড়ি এসে দাঁড়ায়। নতুন রং করা বাড়ি, এখনো এধারে ওধারে কাজ চলছে। অপর্ণা বলল—এটা আমাদেরই একটা বাড়ি। এতদিন ভাড়াটে ছিল।

আপনার সৌন্দর্যকে
ধ'রে রাখা
কি কষ্টকর?
Basant Malati

—তারা গেল কোথায়?

—তাদের তুলে দেওয়া হল। পাকোমো ভাড়াটে, কম টাকা দিত। তা ছাড়া ওদের ভাড়াও পড়ে গিয়েছিল।

—কী করে তুললে—মামলা করে?

অপর্ণা মাথা নাড়ল—না। তাতে অনেক সময় লাগত। আমরা ওদের কিছু নগদ টাকা দিয়েছি। ব্যস।

বলে মাথা নিচু করল অপর্ণা। বিমানের সামনে হয়তো এটুকু ওর অপরাধবোধ।

কিন্তু তার দরকার ছিল না। কবিতার আর গল্পের বই কেনার জন্য বিমানও তুলে নিত ভাড়াটেদের কাছ থেকে। মাথা পিছু দশ পয়সা।

মিস্ত্রীদের কাজের তদারক করতে করতে ধুলোবালি আর চুনের গুঁড়ো লাগা চেহারার উঁচু করে-পরা ধুতি আর পাঞ্জাবি পরা অপর্ণার বাবা সদরের সামনে এসে গম্ভীর মুখে ওদের সামনে দাঁড়ালেন।

বিনা দ্বিধায় বিমান এগিয়ে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করল।

সহজে গম্ভীর দেখাচ্ছিল তাঁকে, তিনি আসলে হয়তো গম্ভীর ছিলেন না। তিনি বিমানের মুখে কী একটা খুঁজে দেখলেন। তার চোখে কিছু একটা খুঁজে পেলেন। অবশ্যেই বিমানের কাঁধে এক-হাত রেখে বললেন—এই বাড়ি দেখলে।

তারপর একটু থেমে বললেন—শুধু এই বাড়ি কেন, ক্রমে ক্রমে আমার যা আছে সবই তোমার হবে। সব দেখেশুনে নিও।

ওঁর কথা শুনে একটু কুঁকড়ে গেল বিমান। কেন কুঁকড়ে গেল তা সে বুঝতে পারল না তক্ষুনি। কিন্তু অস্পষ্ট ভাবে তা হল, কোনোদিনই আর তার দ্বারা কোনো মহান মানুষের জন্ম হবে না।

গত কালীপুজোর রাতে খুব অদ্ভুত-ভাবে মারা গেছে বিশু। পাড়ার পুজো। বিকেলে প্রতিমা আনার সময়ে তাদের লরীর ধাক্কায় বোসপাড়ার মণ্ডপের একটা টিক-লাইট ভেঙেছিল। সেইজন্য বোসপাড়ার ছেলেরা আটকে রেখেছিল প্রতিমাশুদ্ধ তাদের লরী। লাইটের দাম না দিলে তারা প্রতিমা ছাড়বে না।

কয়েকটা ছেলে দৌড়ে এসে এ খবর পাড়ায় রটিয়ে দেয়। শুনে ভীষণ ক্ষেপে গিয়েছিল বিশু। বিশু মাস্তান। সশস্ত্র শক্তি বা সৈন্য কোনোটাই হওয়া লাগেনি তার। তার ফৌজ নানাদিকে ছুটে বেরিয়েছিল। তাই সকলের আগে দৌড়ে গিয়েছিল সে। বোসপাড়ায় যাওয়ার সংক্ষেপ একটা আছে। সে রাস্তায় বিশু যায়নি। সে গিয়েছিল [illegible] দিকে। মহীনের খাটাল পার হয়ে, বস্তি, নালা, মাঠ পেরিয়ে। বোমাবাজি আর ছোরার ঝিলিকে বোসপাড়া শ্মশান হয়ে গিয়েছিল। খাঁ খাঁ করছিল ওদের মণ্ডপ। আলোজ্বলা শূন্য মণ্ডপে ওদের অসহায় কালী, ঢুকে বিশুর মাস্তানি দেখেছিল। চল্লিশ পঞ্চাশ মিনিট তারা দখল করে রইল মণ্ডপ। বোসপাড়ার ছেলেরা ছাদ কিংবা আঁকগাছ থেকে কয়েকটা ইঁট পাটকেল ছুঁড়েছে মাত্র। ওদের দু জনকে মাটি নেওয়াল বিশু আর তার দল। বাদবাকিরা পালাল।

ফেরার পথে বিশু রাস্তার আলোর বাল্ব ভাঙতে ভাঙতে এল। তার কাছ শাকরেদরা এ ব্যাপারে নিখুঁত পরিপাটি হাতের কাজ দেখাচ্ছিল। গোটা পাড়া অন্ধ-কার করে দিয়ে ফাঁকা নিরাপদ কয়েকটা পটকা ফাটিয়েছিল তারা।

অন্ধকারেই ঘটল ঘটনাটা। নিজেদের পাড়ার সীমানায়। অনেক রাতে। মণ্ডপের পিছনেই সেই রাতে ভোগ রান্না হচ্ছিল। মাংস আর ভাত। বাড়ি ভর্তি ছিল বাংলা মদের বোতল। বিশু রাত বারোটার পর খিদে বাড়াতে দুটো বোতল তুলে নিয়ে চলে গিয়েছিল মণ্ডপ ছাড়িয়ে মহীনের খাটালের পাশে বস্তীতে ঢুকবার কাঁচা রাস্তার ধারে—যেখানে একটা নতুন বাড়ি উঠছে। বাঁশের ভারার শেষ ধাপটাতে বসে শান্তভাবে বিশু খাচ্ছিল। অনেক হয়েছিল খাবে। দাঁড়িয়ে উঠে সে একটা হাঁক ছেড়েছিল। রক্তজমা হাঁক।

ভয়ে কেঁপে কুঁকড়ে আরো ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল পাড়া।

তারপর সামান্য টলোমলো পায়ে মণ্ডপের দিকে ফিরছিল বিশু।

সামনে রহস্যময় একটা আলো-আঁধারি, দূরে ধুধু করে জ্বলছে মণ্ডপের আলো। মাইক্রোফোনে বাজছে হিন্দী গান।

ঠিক এ সময়েই অন্ধকার থেকে একটা বাচ্চা ছেলেকে কাঁপিয়ে এগিয়ে আসতে দেখেছিল বিশু। সে সতর্ক হয়নি। হওয়ার কারণও ছিল না। আজ অন্য ছোটো রাত জাগছে।

ছেলেটা মুখোমুখি ঠিক ছায়ার মতো এগিয়ে এল। তার ডান হাত পকেটে। তারপরই পকেট থেকে হাতটা বেরিয়ে এল। বিভু কেবল দেখতে পেয়েছিল হাতখানা একটু পিছিয়ে নিয়ে তারপর সামনের দিকে জোর চালাল ছেলেটা। খুব নিখুঁত ভাবে নয় অবশ্য। কচি হাতে তেমন জোরও ছিল না।

তবু তখনই বিভু টের পেয়েছিল তার পেটের ভিতর পর্যন্ত ঠাণ্ডা অবশ করা কঠিন অনুভূতি। প্রথমে ব্যথা লাগেনা। ছেলেটা কুঁজো হয়ে তার পেটের এ প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত ছোরাটা টানার চেষ্টা করল। কিন্তু টেরিলিনের শার্টটা আর ভিতরের গেঞ্জীতে আটকে ছিল বলে ছোরাটা খুব বেশীদূর গেল না। ছেলেটা ছোরার হাতলে জড়ানো রুমালটা দ্রুত খুলে নিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

তখন বিভু অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল তার পেটের ওপর আলো-আঁধারিতে একটা ছোরার হাতল। খুবই আনাড়ি হাতের কাজ। তবু এও যথেষ্ট।

'আঁঃক' করে একটা শব্দ তুলেছিল বিভু। হাঁটু ভেঙে সামনে পড়তে পড়তে

সামনে নিয়েছিল। তারপর মুহূর্তে নিজের সর্বনাশ বুঝতে পেরে কয়েক পা প্রাণপণে দৌড়ে গিয়ে সে চীৎকার করেছিল—বি......শু......

যখন তার শরীর নিয়ে হৈ চৈ করছে ছেলেরা, অ্যাম্বুলেন্স ডাক্তার ডাকতে ছুটেছে তখন বিন্তু চোখ বুজে এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখতে পেয়েছিল। বেলা শেষের পড়ন্ত আলোর চষা ক্ষেতের ওপারে লম্বা একটা লাঠি উঁচু করে ধরে একজন মুসলমান লোক তাকে চেঁচিয়ে বলছে—ভাই রে...এ..., তুই এঁকে বেঁকে ছোট, এঁকে বেঁকে ছোট......

অদ্ভুত মৃত্যুর সময়টা বেশ উপভোগই করেছিল বিন্তু। শেষ পর্যন্ত তার কোনো দুঃখ ছিল না। যতক্ষণ তার জ্ঞান ছিল ততক্ষণ সে জিজ্ঞেসও করেনি, কে তাকে মেরেছে।

পাড়ার ছেলেদের সাক্ষ্য প্রমাণ নিয়ে পুলিস গিয়ে রাত্রে বোসপাড়ার কয়েকটা ছেলেকে ধরে নিয়ে যায়। কিন্তু এখন পর্যন্ত বিন্তু-হত্যা-মামলায় কোনো কিনারা হয়নি।

টুপু তেরোয় পা দিয়েছে। কালীপুজোর মাত্র কয়েক দিন আগে। কালীপুজোর দিন রাত্রে সে যা করেছিল তার জন্য কয়েক দিন সে খুবই অস্বস্তি বোধ করেছে। খাওয়া হয়নি, ঘুম হয়নি, রাস্তায় বা বাড়িতে কেউ তার দিকে তাকালে চমকে উঠেছে সে। স্কুলে যেতে বেরিয়ে সে কতদিন ঘুরেছে রাস্তায়।

আর কেউ না, কিন্তু কেবল মাঝে মাঝে মা তার শরীরে হাত রেখে জিজ্ঞেস করেছে—কী হয়েছে তোর? ঘুমের মধ্যে কেঁপে উঠছিলি কেন। দেখি গা—

গা দেখে বোঝা যায় না কিছু, টুপু জানে। তবু তার অস্বস্তি হত, মা গায়ে হাত দিলে আরো কেঁপে উঠত সে।

মাঝখানে দিন কতক সে বেড়িয়ে এল মামাদের কাছ থেকে। সেই বেড়ানোটা ভালই লেগেছিল তার। এ বছর পরীক্ষা হয়ে গেলে সামনের বছর থেকে তাকে পলাশপুরেই ভর্তি করা হবে হয়তো। তাই বেন হয়। বেহালায় সম্ভবত আর থাকতে পারবে না টুপু।

কিন্তু আবার আস্তে আস্তে তার মন অন্য দিকে ফিরছে এখন। সে বুঝে গেছে বিন্তুর মৃত্যুর জন্য বোসপাড়ার ছেলেদেরই সন্দেহ করছে পুলিস। এরকমভাবেই ভুল পথে তারা ঘুরবে। বিন্তুর দলবলের সঙ্গে আজকাল বোসপাড়ার মারপিট লেগেই আছে। ভদ্রলোকেরা মিলে নাগরিক কমিটি তৈরি করে শান্তিরক্ষার কথা-ভেবে আরো বুড়ো আর অথর্ব হয়ে যাচ্ছে।

বাবাকে আজকাল একটু সজীব দেখায়। এখন বাবা খোলা রাস্তায় দাঁড়িয়ে সকাল সন্ধ্যার রোদে পাড়ার ভদ্রলোকদের সঙ্গে কথা বলে। নিশ্চিন্ত মনে হাঁটাচলা করে রাস্তায়। বাবাকে আজকাল আর তেমন বুড়ো দেখায় না।

মাঝে মাঝে আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখে টুপু। দেখে অবাক হয়। তার মুখের মেয়েলী ধাঁচ ভাবটা সে আর খুঁজে পায় না।

বড় হয়ে সে কী হবে, এ কথা ভাবতে গেলে আজকাল সে বিন্তুর কথাই ভাবে। তবে সে হয়তো বিন্তুর মতো অসতর্ক আর বোকা হবে না। সে যদি হয় তবে হবে আরো বুদ্ধিমান এক মাস্তান।

আজকাল সে স্কুল পালিয়ে মারদাঙ্গার ছবি দেখছে খুব।

—

পিন্টুর মর্নিং স্কুল শেষ হয় প্রায় এগারোটায়। সে সময়ে পিন্টুর সঙ্গিনীরা প্রায়ই দেখতে পায় স্কুলের সামনেই বড় রাস্তায় একটা সাইড-কার সমেত লাল মোটর সাইকেল থেমে আছে। কালো কিন্তু স্বাস্থ্যবান চেহারার সার্জেন্ট লোকটা চোখে গগ্‌ল্‌স্ এঁটে বসে থাকে। মেয়েরা হাসে। পিন্টুকে ঠাট্টা করে বলে—চিনা চিনা চিন?

পিন্টু একটু রাঙা হয়। কিন্তু গর্বে অহংকারে ময়ূরের মতো পেখম ধরে সে। মনে মনে।

শম্ভু আজকাল আর ব্যায়াম করে না। এবার "দক্ষিণ কলকাতাশ্রী" কম্পিটিশনেও সে নাম দেয়নি। আসলে পিন্টুরই ব্যাপারটা পছন্দ না। সে কয়েকবারই বলেছে—শরীরে সাপের মতো মাংস কিলবিল করে—মাগো! ঘেন্না করে আমার। সেই থেকে শম্ভুরও বীতরাগ এসেছে ব্যায়ামে।

প্রথম চাকরি। তাই ভয় করে। নইলে পিন্টুকে সে মোটরসাইকেলে বাসা পর্যন্ত এগিয়ে দিত। এখন শুধু গলিতে দাঁড়িয়ে একটু আধটু চলতে দেয়। এগিয়ে দেয় বাস স্টপ পর্যন্ত। তারপর ফিরে চলে কোনো এক রাস্তার মোড়ে একা একঘেয়ে গাড়ি-ঘোড়া সামলানোর কাজ করতে।

কিন্তু পিন্টুর সঙ্গে প্রায়ই তার দেখা হতে থাকে।

দীঘা থেকে ফেরার পরদিন সঞ্জয় গাড়িটা গ্যারেজে পাঠিয়েছিল ঝোলঝোলা আর মেরামতের জন্য। বিকেলের দিকে অফিস থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি না পেয়ে হেঁটেছিল অনেক দূর। টের পায়নি যে তাকে অনুসরণ করছে কয়েকজন লোক—যাদের চেহারা কালো, রোগা, কিন্তু মজবুত, যাদের দেখলেই পেশাদার গুণ্ডা বলে চেনা যায়।

একটু অন্যমনস্ক ছিল সঞ্জয়। অণিমা বাগচীর ভক্তদের মধ্যে সবচেয়ে উৎসাহী যে ছেলেটি সেই শুভময় ঘোষাল তার অফিসে এসেছিল সেদিন। ছেলেটি মোটাসোটা গোলগাল, সঞ্জয় শুনেছে ছেলেটা খাসা ভাল রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়। ছেলেটি সঞ্জয়ের মুখোমুখি হয়ে একটুও না থেমে বলল—আপনি দুটি মেয়ের সর্বনাশ করছেন। এক নম্বর, অণিমা, আর দু নম্বর রিনি—আপনার স্ত্রী।

এসব শান্তভাবে শুনল সঞ্জয়। বেয়ারাকে ডেকে দু কাপ কফি আনতে বলল। বাড়িয়ে ধরল সিগারেটের প্যাকেট। ছেলেটাও শান্তভাবে সিগারেট নিল, কফি খেল। কিন্তু সোজা চোখে চোখ রেখে যা বলার তা বলতে ছাড়ল না। পুরোনো ধরনের নীতি কথাই বলল বেশী। চরিত্র, সতীত্ব,

সন্ধার—এই সব নিয়ে যতদূর বলা যায়। ছেলেটি অণিমাকে ভালবাসে। গোলগোল নাদুসনুদুস চেহারার কোনো ছেলেকে এরকম শীতল এবং শান্তভাবে রেগে যেতে কখনো দেখেনি সঞ্জয়।

শুভময়ের সঙ্গে একটু কথার খেলা খেলতে ইচ্ছে হয়েছিল তার। তাই সে কথার এক ফাঁকে হঠাৎ বলেছিল—অণিমার জন্য আমার কাছে আরো কয়েকজন এসেছিল। ভিজায়ারেবল ক্যান্ডিডেটস্।

—তাহা মিথ্যে। কিন্তু ছেলেটি এই প্রথম সামান্য লাল হয়ে গেল।
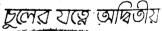
সঞ্জয় হঠাৎ টেবিলের ওপর ঝুঁকে বলল—অণিমা কি রকম মেয়ে তা তো আপনি জানেন বোধ হয়। আপনি শান্তশিষ্ট ভদ্র ছেলে, ওকে নিয়ে সামলে রাখতে পারবেন না। চান্স পেলেই ও দড়ি ছিঁড়বে, খোঁটা ওপড়াবে। আমি পাকা লোক, তবু আমিই সামলাতে পারছি না।

সঞ্জয় ছেলেটির গোল মুখে কোনো ভাবপরিবর্তন টের পেল না। কিন্তু ওর মুখে রক্তিমাভাটা লেগেই ছিল।

সঞ্জয় হঠাৎ যেন বে-খেয়ালে তার চেক-বইটা বের করে ফয়েলগুলো শুভময়কে দেখিয়ে বলল—চারদিনে আমরা খরচ করেছি হাজার দেড়েক টাকা। এই দেখুন।

শুভময় ইঞ্জিনীয়ার। সদ্য চাকরিতে ঢুকেছে। সম্ভবত সে বড়লোকের ছেলে নয় এবং তার বাড়িতে পুষ্যিও অনেক। সম্ভবত শ' চারেকের বেশী মাইনে সে এখনো পায় না। তাই চারদিনে দেড় হাজার টাকা খরচের কথায় সে একটু ভ্রূ তুলল।

তারপর আস্তে করে বলল—বাঙালী মেয়েরা আজকাল কতদূর অধঃপতনে গেছে!

বলে সে উঠে দাঁড়াল। দরজার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে একটু ইতস্তত করে বলল—আপনার স্ত্রীকে আমিই বেনামে ফোন করতাম। আজ সকালেও করেছি।

খুশী হল সঞ্জয়। বলল—আবার করবেন। যখন খুশী। ও খুব একা একা বোধ করে। ফোন করলে খুশী হবে।

এটাও কথার খেলা। ছেলেটার নীতিবোধ বড় প্রবল। সেইখানেই বোধ হয় আঘাতটা লাগল। শীতল চোখে নীরবতায় সঞ্জয়কে একটু দেখে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

অফিসে যতক্ষণ ছিল সঞ্জয় তারপর, ততক্ষণ সে মৃদু একটা অস্বস্তি বোধ করেছে। কোন কারণ নেই তবু কেবলই সে একটা বিপদের গন্ধ পাচ্ছিল।

অন্যমনস্ক সঞ্জয় 'বার'-এ একটু সময় কাটিয়েছিল বিকেলে। তারপর এস-প্ল্যানেডের ভিড় ঠেলে মেট্রোর সামনে দাঁড়াল ট্যাক্সির জন্য। কী ভেবে রাস্তা পার হয়ে গেল গোলঘরের পেচ্ছাপখানার দিকে। আবার বেরিয়ে এসে প্যান্টের বোতাম এঁটে গাছের তলায় ঝুপসি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে যখন সিগারেট ধরাচ্ছিল তখন গোটা চারেক লোক নিঃশব্দে ঘিরে দাঁড়াল তাকে। চারজন পেশাদার লোক।

কাজটা অবশ্য তাদের পক্ষে সহজ হয়নি। সঞ্জয় প্রথম চোটে দুজনকে নিয়ে নিয়েছিল। একজনের তলপেটে একটা লাথিও জমিয়ে দিয়েছিল সে। এরা কারা, এবং কেন তাকে মারছে তা ভাববার চেষ্টাও করেনি সে। কেবল লাথিটা মেরে সে আদিতার লাথিটার শোধ নেওয়ার এক অদ্ভুত আনন্দ বোধ করেছিল।

কিন্তু লোকগুলো ছিল পেশাদার। মার খাওয়া তাদের কাছে তুচ্ছ ব্যাপার। কাজেই সঞ্জয়ের ঘুঁষি লাথি তারা তুচ্ছজ্ঞান করে খুব চটপট সেই প্রয়োজ্য জায়গায় তাদের কাজ সারল। চার পাশ থেকে ঘিরে, অত্যন্ত সুন্দর হাতে।

পেটে সামান্য মদ ছিল সঞ্জয়ের। ফলে সে ওদের হাত আর পায়ের কাজ বুঝতেই পারল না। ঢলে পড়ল লোহার রেলিঙের তলায়, সিমেন্টের বাঁধানো গোড়ায় মাথা রেখে শুয়ে বমি করতে লাগল।

এক সময় এ সব ঘটনা ছিল তার গায়ের ধুলো। চট করে ঝেড়ে ফেলতে পারত। কিন্তু এবার তা হল না। কয়েক দিন ঘরে শুয়ে বসে থাকতে হল তাকে। ডাক্তার দেখাতে হল। অষুধ খেতে হল। ডাক্তার দেখেশুনে বললেন—ব্লাডপ্রেশার খুব হাই।

ইয়াঃ। সঞ্জয় শুয়ে থেকে সারা দিন আপনমনে হাসে। মনে মনে রিণিকে সম্বোধন করে কথা বলে—এই সবই বয়সের ব্যাপার, বুঝলে রিণি। বয়স হয়ে যাওয়ার চেয়ে বড় ট্র্যাজেডি মানুষের জীবনে আর নেই। কে আমাকে মেরেছে আমি তার কী জানি। কেন মেরেছে তাই বা কে জানে। কিন্তু এ কথা ঠিক, বয়সের শেষ চলে মানুষের প্রায়শ্চিত্ত শুরু হয়। খুব শান্তভাবেই মানুষের তা গ্রহণ করার কথা। আমি তো আর খুব সুন্দর জীবন যাপন করিনি!

আমি এখনো সন্ন্যাসী হওয়ার কথা ভুলি নি। বাইরে এই যে আমাকে দেখছ—সবগুণে ঝরে-যাওয়া লোক—চুরি করছে, টাকা জমাচ্ছে, করছে অবৈধ প্রেম, মদ খাচ্ছে—এ সব কিছু আমার অন্তরের সেই বৈরাগ্যকে স্পর্শও করছে না। একদিন না একদিন সেই বৈরাগী সব ফেলে রেখে চলে যাবে।

কিন্তু যাওয়া হয় না।

মাঝে মাঝে আজকাল রাতে তার ঘুম আসে না। অনেকটা হুইস্কি খাওয়ার পরেও না।

কখনো নানা কাজে ব্যস্ত সঞ্জয় হঠাৎ গলার কাছে হাত তুলে একটা মাংসের ডেলাকে অনুভব করে। লাম্প্। চমকে উঠে ভাবে—ক্যান্সার ক্যান্সার হয়ে যা তো! কখনো বা শোওয়ার দোষে ঘুমের মধ্যে তার শ্বাসকষ্ট হয়। অমনি তড়বড় করে উঠে বসে, ভাবে—শরীরের মধ্যে কোথাও রক্ত জমাট বাঁধছে না তো! যদি থ্রম্বসিস হয়!

কখনো বা সে ঘুমচোখে অকারণে রিণিকে ডাকে।

—রিণি!

—উঁ! রিণি ঘুমগলায় উত্তর দেয়।

—রিণি। আবার ডাকে।

—উঁ!

—রিণি।

—উঁ!

তখন পাশ ফিরে রিণির কানে কানে বলে—আমি তোমাকে ভীষণ ভালবাসি।

পিকলুকেও। ঘর সংসার টাকা সব কিছুকেই। তবে আর কবে আমি সন্ন্যাসী হবো!

রিণি এসব কথা বিশ্বাস করে না। চুপ করে থাকে। আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

সঞ্জয়েরও কেমন যেন ফাঁকা লাগে বুকে। আড়াল থেকে কে যেন তাকে এই সব মিথ্যে রঙীন কথা বলায়। অকারণে।

আদিত্য এখন খুব ব্যস্ত। মাঘ মাসে তার বিয়ে। পাত্রী ঠিক করেছেন বাবা। সে পাত্রীকে চোখেও দেখেনি সে। জানে, সেই পাত্রী টাকার কাঁড়ি আর জিনিসপত্রের জঞ্জাল নিয়ে আসছে। বনেদী ঘরের মেয়ে, যার গায়ে রোদ লাগেনি। কিন্তু সেজন্য আর দুঃখ নেই আদিত্যর। তার ধারণা, বিয়ে হলেই সে অতীতকে সম্পূর্ণ ভুলে যাবে।

আদিত্য অস্থিরভাবে মাঘ মাসের প্রতীক্ষা করে। আর, অফিসে বসে নিমন্ত্রিতের তালিকায় রোজই একটি দুটি নাম যোগ করতে থাকে সে। তালিকা বড় হতে থাকে।

সুবলের মধ্যে পাগলামীর লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। লক্ষ্য করছে পাড়ার সবাই। তাকে ছেঁড়া পাজামা আর রঙীন ময়লা শার্ট পরে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরতে দেখা যায়। আ-ছাঁটা চুল বাবরি হয়ে নামছে ঘাড়ে।

সারাটা দিনই প্রায় তার কাটে হিন্দুস্থান পার্কের রাস্তায় ঘুরে ঘুরে। দূর থেকে সে অপর্ণাদের বাড়িটাকে দেখে। দেখতে পায়, বাড়িতে রঙ করা হচ্ছে। বাঁশের ভারায় উঠে কাজ করছে মিস্ত্রীরা। ওরা অপর্ণার কত কাছে আছে—এই ভেবে সে হিংসা বোধ করে। একা একা বিড় বিড় করে কথা বলে সে। মাঝে মাঝে তার মাথার মধ্যে দুর্বোধ্য যন্ত্রণা হয়।

অপর্ণাদের প্রকাণ্ড গাড়িটা তার গা ঘেঁষে রাজহাঁসের মতো মাঝে মাঝে চলে যায়। সুবল দেখে অপর্ণাদের বাড়িতে অনেক জিনিসপত্র কেনা হচ্ছে। আনাগোনা করছে লোকজন।

কী হবে এ বাড়িতে? কোন উৎসব?

এ কথার কোনো উত্তর মনের মধ্যে খুঁজতে তার ভয় করে।

পলাশপুরে দিন দুয়েক থেকে তারপর আবার কোথায় চলে গেছে রমেন। কারা যেন তাকে ডেকে নিয়ে গেছে। এ কথা তুলসী একদিন এসে বলে গেল।

শুনে কেমন হঠাৎ বিষণ্ণ হয়ে গেল ললিত। মনে মনে সে কেবলই রমেনের প্রতীক্ষা করছে। কিন্তু রমেন আসছে না। তার ছোট্ট বিছানা আর টিনের স্যুটকেস পড়ে আছে। পৃথিবীর বেশীরভাগ মানুষই জিনিস-পত্র রেখে গেলে ফিরে আসার সম্ভাবনাও রেখে যায়। কিন্তু রমেনের বেলায় এ নিয়ম খাটবে কি? ও দুটো তুচ্ছ জিনিস রমেনকে ফিরিয়ে আনবে এ কথা ললিতের ভাবতে ভরসা হয় না।

এদিকে পৃথিবীতে কতরকমের ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। একদিন অপর্ণা আর তার সঙ্গে ফরাসটে এবং মোটামুটি ভাল চেহারার একজন লোক এসে হাজির, সকালবেলায়। অপর্ণা লাজুক মুখে একটু হাসল। সঙ্গের লোকটিও। তারপর লোকটি বলল—আমাদের বিয়ে, নেমন্তন্ন করতে এলাম। যেও।

ভীষণ অবাক হয়েছিল ললিত, রেগেও গিয়েছিল, লোকটি তাকে 'তুমি' করে বলায়।

ভুল ভাঙল অনেক পরে। লোকটি বিমান—এ কথা কে বিশ্বাস করবে? তার ইচ্ছে হয়েছিল বিমানের কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দেয়, চোখের তারার গভীরে অনুসন্ধান করে দেখে এই সেই পুরোনো বিমান কিনা।

বিমানকে দেখে ডাক্তার আর হাসপাতালের ওপর ভক্তি বেড়ে গেল ললিতের। ভক্তি বাড়ল ওষুধের ওপর। আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতি সে কৃতজ্ঞতা বোধ করতে লাগল। মানুষের অসাধ্য কিছু নেই। হে ভগবান, মানুষকে আর একটু শক্তি দাও। আমি মরার আগেই সে আবিষ্কার করুক ক্যান্সারের ওষুধ।

বিয়ের নেমন্তন্ন করে গেল আদিত্যও।

যাস কিন্তু।

—যাবো। নিশ্চয়ই যাবো।

—লোকটা, পুরোনো কিছু মনে রাখিল না।

—বাধব না। তুই আমার কতকালের বন্ধু।

যাবে। দুজনের বিয়েতেই যাবে ললিত। সুন্দর উপহার দিয়ে আসবে। সত্যিকারের শুভকামনা জানিয়ে আসবে।

ঘরে ফিরে শাশ্বতীর সঙ্গে দেখা হয়। রোজই। কিন্তু এখন তারা পরস্পর কম কথা বলে। পৃথিবীতে আর কেউ তেমন করে টের পায় কিনা কে জানে, তবে তারা যখন পরস্পরের কাছাকাছি থাকে, তখন স্পষ্টই টের পায়, সময় বয়ে যাচ্ছে। সময় বয়ে যাওয়ার কোনো শব্দ নেই, তবু তারা একরকমের অদ্ভুত শব্দও বোধ হয়। সেই টিপ্ টিপ্ টিপ্ শব্দ তাদের নিস্তব্ধতাকে ভয়াবহ করে তোলে।

মাঝে মাঝে শাশ্বতী রমেনের কথা জিজ্ঞেস করে—উনি কোথায় গেলেন! ফিরবেন না?

কে জানে! ঠোঁট ওল্টায় ললিত।

রমেন বলেছিল, ক্যান্সারের অষুধ জানে। সে কথা বিশ্বাস হয় শাশ্বতীর। ক্যান্সারের অষুধ এখনো বাজারে বেরোয়নি। তা বলে কি নেই? কেউ না কেউ ঠিক জানে। লুকিয়ে রেখেছে, বলছে না। শাশ্বতী এও জানে যে, রমেনই সেই লোক। ঈশ্বরপ্রেরিতের মতো সে এসেছে। সময় মতো ঠিক মুহূর্তে সে এসে দেখা দেবে আবার। ভোজবিদ্যার মতো আরোগ্য দান করবে ললিতকে। একথা মুখে বলে না শাশ্বতী। কিন্তু অন্তরের গভীরে সে বিশ্বাস করে। ভীষণ বিশ্বাস করে।

সেই তুলনায় ললিত অনেক বাস্তববাদী। সেও রমেনের অপেক্ষা করে। কিন্তু তার কারণ ভিন্ন। রমেন যতদিন তার কাছে ছিল, তারা পাশাপাশি শুতো, তখন প্রায়ই ললিত টের পেত সারারাত জেগে আছে রমেন। ঘুম চোখে মাঝে মাঝে অসহায় ললিত মাঝ-রাতে কি ভোর-রাতে মৃদু গলায় ডাকত—রমেন। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর পেত, বল। জেগে আছি। রমেনের এই নিরন্তর জেগে থাকা দেখে ললিত বড় অবাক হয়েছে প্রতি রাত্রে। ললিত ডাকবে, ডেকে পাছে সাড়া না পায় সেই জন্যই জেগে থাকত রমেন? তার আরো মনে পড়ে, অপর্ণার মোটরগাড়িটা এক বিকেলে তার হাতে ছেড়ে দিয়েছিল রমেন, যারা ঘুরপাক খেয়েছিল ময়দানের নির্জন রাস্তায়। বহুকাল বাদে সেই দিন নিজের ওপর বিশ্বাস, অনেকটা ফিরে পেয়েছিল ললিত। কিংবা মনে পড়ে শ্মশানের সেই ঘটনার কথা, কীর্তনের মধ্যে রমেন তাকে টেনে নিয়েছিল—সেই কথা। এ সব ঘটনার ভিতর দিয়ে রমেনের একটা অতিলৌকিক চেহারা তার কাছে ধরা পড়ে।

এখনো মাঝে মাঝে রাতে ঘুম ভেঙে গেলে অদূরে রমেনের জেগে থাকা অনুভব করতে তার ইচ্ছে করে।

রমেনের সঙ্গে আর দেখা হবে কি তার? সময় মতো রমেন যদি না ফেরে? মরার সময়ে রমেন যদি কাছে থাকে তবে বোধ হয় ললিতের তেমন কোনো কষ্ট হবে না।

সে রমেনের জন্য ক্রমে ক্রমে অধীর হয়ে পড়ে। আকুল হয়। অলক্ষ্যে সেই প্রতীক্ষায় তার আয়ু বেড়ে যায়। সে টের পায় না।

পুজোর বন্ধের পর আবার স্কুলে যাচ্ছে ললিত। আজকাল খুবই ব্যস্ত থাকে সে। সরস্বতী পুজোর নাটক নিয়ে রিহার্সাল দেওয়ায় ছেলেদের। একটা ডিবেটিং ক্লাব খোলার কথা ভাবে। ম্যাগাজিনটার ভারও সে নিচ্ছে এবার।

মৃত্যুর কথা ভাবলেই পৃথিবীর প্রতি মায়া-দয়া বেড়ে যায়। অন্তরে অন্তরে সে মানুষের প্রতি, জীবজগৎ ও গাছপালার প্রতি এক দুর্বোধ্য ভালবাসাকে অনুভব করে। তার মরে যেতে ইচ্ছে হয় না। সে ভাবে, এ পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য সে একটা কিছু করবে। খুব শীগ্গীরই। মরে যাওয়ার আগেই।

একদিন রাতে মৃদুলার চীৎকারে ঘুম ভাঙল তুলসীর। ভয় পেয়ে উঠে বসল।

হ্যারিকেনের মৃদু আলোয় দেখা গেল মৃদুলা চোখ বড় করে তাকিয়ে ঘন শ্বাস টানছে।

—কী হয়েছে, মৃদুলা?

—দেখ, আমার পেটের মধ্যে কী যেন নড়ছে।

নড়ছে! ভারি অবাক হয় তুলসী। কী নড়ছে।

—ভীষণ ভয় করছে আমার। একটু তন্দ্রার মতো লেগে এসেছিল, অমনি হঠাৎ নড়ে উঠল। মৃদুলা ভীত গলায় বলে।

তুলসীও ভয় পায় প্রথমে। তারপর মৃদুলার পেটের ওপর সে হাত রাখে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে। তারপর টের পায়, হঠাৎ টোকা দেওয়ার সেই নড়া, নড়ে ওঠা।

—ঐ দেখ। মৃদুলা চমকে বলে।

—বোধ হয় বাচ্চাটা।

—নড়ছে! বাচ্চাটা নড়ছে! ইস্, কীরকম যে লাগছে আমার!

তুলসী পেটের ওপর কান পাতল। অপেক্ষা করল অনেকক্ষণ। আবার সেই নড়ে-ওঠা টের পেল। তার শরীরে কাঁটা দিল রোমাঞ্চে। কীরকম পোকার মতো নড়ছে। শব্দটা কিসের? ওটা কি ওর হৃৎপিণ্ড, না কি হাত! কিংবা পা? কে জানে! সে জানান দিচ্ছে যে সে আছে, সে আসছে।

দুঃখময় পৃথিবীতে মানুষ কত পুরোনো হয়ে গেল! তবু মানুষের জন্ম এখনো কী রোমাঞ্চকর!

সমাপ্ত
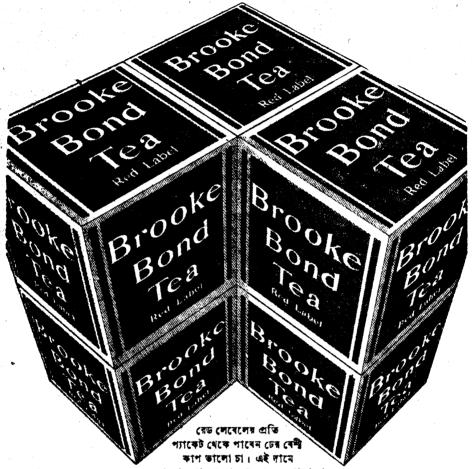
ভালো চা
কম খরচা
Brooke Bond Tea
Red Label
রেড লেবেলের প্রতি
প্যাকেট থেকে পাবেন ঢের বেশী
কাপ ভালো চা। এই দামে
এমন চা আর পাবেন না। ব্রুক বণ্ডের পাকা হাতের
ব্লেণ্ড—খেয়ে পরিতৃপ্তি, আর পয়সাও বাঁচে।
ভারতে যেসব পাতা চা বিক্রী হয় তার মধ্যে রেড লেবেলের
বিক্রীই তাই কত সবচেয়ে বেশী।
ব্রুক বণ্ড রেড লেবেল—প্রতি প্যাকেট থেকে পাবেন
আরও বেশী কাপ আর সত্যিই ভালো চা

বিশ্ব বিজ্ঞান

চন্দ্র প্রাপ্তি

হিউসটনের মহাকাশ কেন্দ্র সম্প্রতি একটি চমকপ্রদ সংবাদ পরিবেশন করেছেন। সেখানকার বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, চাঁদের বুকে এই প্রথম তাঁরা একটি স্থায়ী চৌম্বক-ক্ষেত্র আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছেন। পৃথিবীর পরিমণ্ডলে যেমন একটি চৌম্বক-ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়ে রয়েছে, ঠিক তেমনভাবেই চাঁদের ভূ-পরিবেশের উপরও বিস্তৃত হয়ে আছে একটি নির্দিষ্ট চৌম্বক-ক্ষেত্রের আবরণী। এই সঙ্গে এটাও আবিষ্কৃত হয়েছে, পৃথিবীর নিরক্ষীয় অঞ্চলের মত চাঁদের নিরক্ষীয় প্রদেশে একটি বৈদ্যুতিক পরিবেশ বর্তমান। এই বিদ্যুৎক্ষেত্র তুলনায় পৃথিবীর চেয়ে অবশ্য অনেক দুর্বল। তবে এর আগে যতটা দুর্বল মনে হয়েছিল, [illegible] গত নভেম্বরের ১৯ তারিখে নভোচর চার্লস কনরাড এবং অ্যালান বীন চাঁদের ঝড়সাগরে যে চৌম্বক ক্ষেত্র পরিমাপক যন্ত্র বসিয়ে আসেন এই তথ্যগুলি জুগিয়েছে সেই যন্ত্র। ক্যালিফোর্নিয়ার [illegible] গবেষণা কেন্দ্রের ডঃ পামার ডায়াল সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, চাঁদের বুকে অবস্থান করে ঐ চৌম্বক-ক্ষেত্র পরিমাপক যন্ত্র বা ম্যাগনেটোমিটার পৃথিবীতে যে সংকেতবার্তা পাঠিয়েছে তা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে সেখানকার চৌম্বক-ক্ষেত্রের প্রাবল্য তিরিশ থেকে চল্লিশ গামার মত। ওজন মাপার একক যেমন গ্রাম বা পাউন্ড, চৌম্বক-প্রাবল্য পরিমাপের একক তেমনি গামা। পৃথিবীর নিরক্ষীয় অঞ্চলে চৌম্বক-ক্ষেত্রের প্রাবল্য প্রায় তিন হাজার গামা। মহাশূন্যে বিভিন্ন গ্রহের মধ্যে যে বিস্তৃত অঞ্চল রয়েছে সেখানকার চৌম্বক-ক্ষেত্রের প্রাবল্য ধরা পড়েছে পাঁচ থেকে দশ গামার মত। ডঃ ডায়ালের অভিমত চাঁদের বুকে যে ধরনের চৌম্বক পরিবেশের চিহ্ন দেখা গেছে তা থেকে মনে হয় সেখানে অবশ্যই অত্যন্ত শক্তিশালী কোন চৌম্বক-উৎস অবস্থান করছে। সে উৎস চাঁদের পৃষ্ঠতলে অথবা অভ্যন্তরেও থাকতে পারে। তবে ঠিক কোথায় আছে এই মুহূর্তে তার সঠিক সন্ধান করা সম্ভব নয়। আগামী বছর যে কয়টি অ্যাপলো যান চাঁদের দেশে গিয়ে হাজির হবে তারা আরও

পৃথিবী থেকে পাঠান সংকেতের সাহায্যে এপ্রিল ২১, ১৯৬৭ সার্ভেয়ার-৩-এর হাতলকে দিয়ে চাঁদের বুকে গর্ত করার কাজ চালান হচ্ছে

কয়েকটি চৌম্বক-প্রাবল্য পরিমাপ যন্ত্র বিভিন্ন অঞ্চলে বসিয়ে আসবে। এইভাবে অন্ততঃ চারটি যন্ত্র চন্দ্র-ভূমির বিভিন্ন দেশ থেকে যে সংকেতবার্তা পাঠাবে তাদের বিশ্লেষণ করে সেখানকার মূল চৌম্বক ক্ষেত্রের হয়ত পুরো রহস্যটাই জেনে নেওয়া সম্ভব হবে। জানা যাবে সেখানকার চুম্বক-ক্ষেত্রের মূল রহস্য। তার সঠিক উৎপত্তি স্থল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস পৃথিবীর চুম্বক-ক্ষেত্রের মূল উৎপত্তিস্থল পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ গলিত পদার্থের সঞ্চারণ। পৃথিবীর বুকের নীচে অক্রম গলিত পদার্থের আনাগোনা সমানে চলেছে। পৃথিবীর নিয়ত আবর্তন এবং সেই গলিত পদার্থের দ্রুত সঞ্চারণের ফলে তার গর্ভে

সার্ভেয়ার-৩ কিভাবে ঠিকরে গিয়ে চাঁদের সেই গহ্বরে গিয়ে পড়েছিল

প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত হয়ে চলেছে ইলেকট্রোন কণিকার নিরন্ত প্রবাহ। সম্ভবত এই কারণেই পৃথিবীর পরিমণ্ডলে সৃষ্টি হয়েছে শক্তিশালী চুম্বক-ক্ষেত্র। সেই ক্ষেত্রের একপ্রান্তে আছে পৃথিবীর উত্তর-চুম্বক মেরু, আর একদিকে দক্ষিণ চুম্বক মেরু। ভবিষ্যতের অ্যাপলো-নভোচরেরা হয়ত চাঁদেরও উত্তর এবং দক্ষিণ চুম্বক মেরু খুঁজে বের করতে সমর্থ হবেন। আর তার ফলে এটাই প্রমাণিত হবে, চাঁদ একটি নিথর শিলাপিণ্ড নয়। এর হৃৎপিণ্ডের মধ্যে আজও গলন্ত প্রবাহ ভাঙাগড়ার খেলা সমানে চালিয়ে যাচ্ছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের মৌল গবেষণায় এ ধরনের তথ্য গ্রহ এবং নক্ষত্রের জন্ম রহস্য সম্পর্কে অনেক নতুন সংবাদ জোগাতে সমর্থ হবে।

ইতিমধ্যে অ্যাপলো-১১-র নভোচরদের নিয়ে আসা চাঁদের মাটি এবং পাথরের উপাদান সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য পরিবেশন করেছেন কয়েকজন জাপানী বিশেষজ্ঞ। চাঁদের মাটির মধ্যে এঁরা আবিষ্কার করেছেন অ্যাপেটাইট এবং ট্রোইলাইট নামে দু ধরনের দুষ্প্রাপ্য খনিজ পদার্থ। আন্তর্জাতিক সহ-যোগিতা প্রকল্পের মাধ্যমে 'নাসা' এঁদের

কিছুটা চাঁদের পাথর এবং মাটি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের জন্যে উপহার দিয়েছিলেন। দুটি জাপানী বিশেষজ্ঞ দলের পরিচালক হচ্ছেন টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূ-তত্ত্ববিদ ডঃ ইকুয়ো কুশিরো এবং ভূ-পদার্থবিদ ডঃ তাকেশি নাগাতা। এ'রা বলেছেন, চাঁদের পাথরের কুচি দেখতে কতকটা পৃথিবীর বেসল্ট পাথরের মত। তবে এর উপাদান বা গঠন প্রণালী স্বতন্ত্র। সম্ভবত সেখানকার অভিকর্ষ বলের ভিন্নতার জন্যে এটা হতে পারে। এই পাথর-কুচির ভেতর এ'রা চুম্বক-কণিকা আবিষ্কার করেছেন। ডঃ কুশিরো বলেছেন, এর আগে চাঁদের পাথরের উপর বিশ্লেষণ চালিয়ে যে সমস্ত তথ্য পরিবেশন করা হয়েছিল তাদের মধ্যে অ্যাপেটাইট এবং ট্রোইলাইটের কথা বলা হয় নি। এ'র বক্তব্য, বিশুদ্ধ ট্রোইলাইট আসলে লোহা এবং গন্ধক ঘটিত এক ধরনের যৌগিক পদার্থ। রসায়নিক নাম ফেরাস সালফাইড। আর এই পদার্থটি একমাত্র মহাকাশ থেকে আগত উল্কা পিণ্ডের মধ্যেই পাওয়া যায়, স্বাভাবিক অবস্থায় পৃথিবীর কোথাও এর সন্ধান মেলে নি। ডঃ নাগাতা চাঁদের পাথরের মধ্যে চুম্বক-কণিকা দেখে রীতিমত বিস্মিত হয়েছেন।

এপ্রিল ২০, ১৯৬৭ ঝঞ্ঝা সাগরের একটি অগভীর গহ্বরের মধ্যে যেন কতকটা আকস্মিক ভাবেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মার্কিন দেশের ঐতিহাসিক স্বনিয়ন্ত্রিত মহাকাশযান সার্ভেয়ার-৩। রেঞ্জার প্রকল্প শেষ করার পর ও'রা শুরু করেছিলেন সার্ভেয়ার প্রকল্পের কাজ। উদ্দেশ্য, চাঁদের বুকে ধীর গতিতে মহাকাশযান অবতরণ করানর অনুশীলন এবং সেই সঙ্গে মানুষের অবতরণ করার পক্ষে তার জমি যথেষ্ট কঠিন কিনা তা দেখে নেওয়া। আকস্মিকভাবে গহ্বরের মধ্যে পড়েছিল বলছি এই কারণে যে, ঠিক যেখানটায় এই যানটিকে অবতরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়ে সেখানে পৌছনর কয়েক মুহূর্ত আগে উর্ধমুখে ঘাত সৃষ্টিকারী রকেট ইঞ্জিনটি হঠাৎ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বন্ধ হয়েছিল ঠিক সেই সময়ে যখন যানটির দূরত্ব মাটি থেকে ছিল মাত্র চোদ্দ ফুট। ফলে সার্ভেয়ার-৩ চাঁদের বুকে কিছুটা জোরে নেমে এসে আঘাত করে এবং সেখানকার ভূ-পৃষ্ঠের প্রতিঘাতে লাফিয়ে প্রায় পঁয়ত্রিশ ফুট উপরে উঠে যায়। তারপর চাঁদের মাধ্যাকর্ষণেই আবার নেমে এসে ঠিকরে পড়ে। দ্বিতীয় বারের এই আঘাতের ফলে উঠে যায় প্রায় এগার ফুট। এমনি করে লাফ-ঝাঁপ দিয়ে সার্ভেয়ার-৩ অবশেষে তার মূল অবতরণ স্থল থেকে প্রায় তেত্রিশ ফুট দূরে সরে গিয়ে ঐ গহ্বরের মধ্যে এসে পড়ে। সৌভাগ্যবশতঃ এই কসরতে সেদিন যানটির কোন ক্ষতি হয় নি। এপ্রিল ২১, ২২ এবং
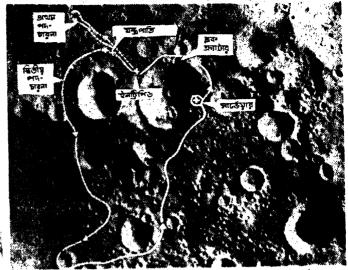
অ্যাপোলো-১২ নভোচররা এবার যে পথে চাঁদের বুকে হেঁটে বেড়িয়েছিলেন। সার্ভেয়ার-৩-এর থেকে ইনট্রিপিডের অবতরণস্থলের দূরত্ব প্রায় ২০০ মিটার। দুই কিস্তিতে অর্থাৎ মাঝে একবার বিশ্রাম নিয়ে দুইবার চাঁদের বুকে নেমে ও'রা প্রায় তিন কিলোমিটার পথ ঘুরে বেড়ান

২৩ এই তিনদিনে ১৬০০টি দুর্লভ ছবি তুলে পাঠিয়েছিল মানব-আরোহীহীন এই মহাকাশযান শুধু মাত্র তার যন্ত্র-মগজের সাহায্যে কাজ চালিয়ে। আর সেই মগজকে নিয়মিত নির্দেশ দিয়ে গেছেন ক্যালি-ফোর্নিয়ার জেট প্রোপালশন ল্যাবোরেটারির বিশেষজ্ঞরা।

অবতরণ করার পর সেদিন সার্ভেয়ারের সমস্ত যন্ত্রপাতি একান্ত অনুগতের মত যে সমস্ত কাজ সম্পন্ন করেছিল চন্দ্রাভিযানের ইতিহাসে তখনও পর্যন্ত তার কোন দ্বিতীয় নজির সৃষ্টি হয় নি। পৃথিবী থেকে নির্দেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যানটির যান্ত্রিক হাত চাঁদের মাটিতে আঁচড় কাটতে শুরু করে, কখনও বা খোঁড়ার কাজ চালায় অথবা ভূমিতে আঘাত মারার কাজ। কয়েকবার মাটি গুড়ো করার কাজও করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সেই সঙ্গে খানিকটা চাঁদের ধুলো সরিয়ে সরু খাল কাটার। এক একটি কাজ সারার পর হাতটিকে এক পাশে সরিয়ে দেওয়া হয়। সেই ফাঁকে যানটির সঙ্গে লাগান টেলিভিশন ক্যামেরা সেই সমস্ত কাজ কর্মের ছবি তুলে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেয়। সার্ভেয়ার-৩-এর ঐ ক্যামেরাটি ঐ বছর এপ্রিল ২৪ তারিখে যখন চন্দ্রগ্রহণ হয়েছিল তখন পৃথিবী এবং শুক্র গ্রহের কয়েকটি চমৎকার ছবি তুলেছিল।

ইতিমধ্যে শুরু হয় চান্দ্র-ভূমির দীর্ঘ-সময়কালীন দিবা ভাগ। এই সময়ে দুপুরের দিকে সেখানকার তাপমাত্রা দাঁড়ায় প্রায় ২০০

ভবিষ্যতে মানুষ যখন চাঁদের জগতে দীর্ঘকাল ধরে বাস করতে যাবে তখন কি ধরনের সাবধানতা নিয়ে তার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তৈরি করলে সহজে কাজ করা সুবিধে হতে পারে।

আরও একটি যুগান্তকারী পরীক্ষা সম্পন্ন করে এসেছেন অ্যাপোলো-১২-র নভোচররা। ইনট্রিপেড নামে যে চাঁদের-ভেলাটিতে চড়ে দুই নভোচর চাঁদের বুক থেকে মূল মহাকাশ জাহাজ ইয়াংকি-ক্লিপারে এসে উপস্থিত হন, নিজেরা নিরাপদ হওয়ার পর প্রায় সত্তর মাইল উর্ধাকাশ থেকে সেটিকে সবেগে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছিল চাঁদের বুক লক্ষ করে। ফলে ইনট্রিপেড প্রচন্ড বেগে নেমে গিয়ে চাঁদের কঠিন ভূমিতে গিয়ে আঘাত করে। এই আঘাতের ফলে যে ধাক্কার সৃষ্টি হয়েছিল তার পরিমাণ প্রায় ষোল পাউন্ড অতি বিস্ফোরক পদার্থ টি এন টি-র বিস্ফোরণ-জনিত ঘাতের সমান। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে গিয়ে ভেলাটি ঠিকরে পড়ে তার চারপাশে নাগাড়ে অনেকক্ষণ ধরে ভূ-কম্পন হতে থাকে। কনরাড এবং বীন এবার নতুন ধরনের যে ভূ-কম্পন মাপক যন্ত্রটি সেখানে বসিয়ে এসেছেন সেই যন্ত্র নিয়মিত সেই ভূ-কম্পনের প্রাবল্য পৃথিবীর গবেষণাগারে পাঠাতে সমর্থ হয়। এই কম্পন বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা জানতে পারবেন চাঁদের ভূ-ত্বক ঠিক কি ধরনের শিলা দিয়ে গঠিত এবং সেই শিলাস্তর সেখানে কিভাবে সজ্জিত হয়ে রয়েছে।

এক কথায় বলা চলে, অ্যাপোলো-১২ পরবর্তী চন্দ্র-অভিযানের ক্ষেত্রে এক বলিষ্ঠ সোপান। অ্যাপোলো-১১-র মধ্যে ছিল প্রথম সাফল্যের অসম্ভব-ভাবনার শ্বাস-রুদ্ধকারী উত্তেজনা। অ্যাপোলো-১১ প্রমাণ করেছিল মানুষ চাঁদে অবতরণ করতে পারে এবং নিরাপদেই পারে। নীল আর্মস্ট্রং এবং অলড্রিন সেখানে ঝটিতি নেমেছিলেন, ঝটিতি কাজ কর্ম সেরে ফিরে এসেছিলেন। অ্যাপোলো-১২-র নভচর কনরাড এবং বীন তা করেন নি। তাঁরা যে সমস্ত পাথর বা ধুলো সঙ্গে করে এনেছেন সেগুলি সংগ্রহ করার আগে খুঁটিয়ে দেখেছেন সত্যিই সেগুলি নতুন কোন তথ্য জোগাতে পারবে কিনা। তাঁরা পরি-কল্পনা মত দীর্ঘকাল এবং দীর্ঘ দূরত্ব পথে বিচরণ করেছেন। উদ্দেশ্য, আরও সহজতর কোন পথ বের করা যাতে ভবিষ্যৎ চন্দ্রচারীরা আরও সহজে, অনাবিল ভাবে সেখানে গিয়ে কাজ কর্ম চালাতে পারেন। এঁরা বলেছেন, শ্বাসকার্যের জন্যে যথেষ্ট কম অক্সিজেন হলেই সেখানে চলে। শরীরের বাইরের তাপমাত্রা স্বাভাবিক রাখার জন্য যে ঠান্ডা জলের প্রবাহের ব্যাপারটার ওপর এর আগে জোর দেওয়া হয়েছিল অতটা জোর না দিলেও চলে। এমন কি পোশাকের ভারও কমিয়ে নেওয়া যেতে পারে। কিভাবে বিমান চালকের মত নভোচরও ইচ্ছে মত চন্দ্রযানকে চালনা করতে পারে সে অভিজ্ঞতাও তাঁরা বেশ কিছুটা রপ্ত করে নিয়েছেন। সেই সঙ্গে চাঁদের দেশে সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে গেলে কিভাবে দৈহিক এবং মানসিক সামর্থ্যকে স্বাভাবিক রাখা যায় অ্যাপলো-১২-র নভোচররা সে ব্যাপারেও অনেক কথা বলতে পারবেন। উল্লেখ্য, 'নাসা' এরই মধ্যে অ্যাপলো-২০ পর্যন্ত সমস্ত পরিকল্পনা মোটামুটি শেষ করে এনেছেন। চন্দ্র-যানের প্রযুক্তিগত জটিলতাকে আরও সহজতর করা এবং সেই সঙ্গে চন্দ্রযাত্রাকে যথেষ্ট সুগম করাই হবে অ্যাপোলো প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

সংবাদঃ দু এক বছরের মধ্যে ভারতের বেসামরিক বিমান সংস্থা বোয়িং-৪৪৭ নামে যে অতিকায় জেট বিমান যাত্রী চলাচলের জন্যে কাজে লাগাতে চলেছেন তার আয়তন বর্তমানের বোয়িং-৭০৭-এর চেয়ে অনেক বড়। ৪৫০ জনের বেশী যাত্রী বহন করবে এই প্লেন। গতিবেগ ঘন্টায় ৫৬০ মাইলের বেশী। দ্বিতল। এই প্লেনের পরিচালনার ব্যাপারে এমন কিছু কিছু যন্ত্র কাজে লাগান হবে যা এ পর্যন্ত শুধু মহাকাশযান পরিচালনাতেই ব্যবহার করা হয়েছিল। অ্যাপলো-১১ যে ধরনের যন্ত্রগণক বা যন্ত্রের সাহায্যে চাঁদের বুকে অবতরণ করে একেবারে প্রায় ঐ একই ধরনের যন্ত্র কাজে লাগান হবে অব্যর্থ এবং নিখুঁত নিরাপদে নতুন এই প্লেনকে আকাশে তুলতে বা বিমান বন্দরে অবতরণ করাতে।

এছাড়াও কনরাড লক্ষ্য করেছেন চাঁদের বুকে হেঁটে বেড়ানর সময় নভোচরকে সব-সময় সামনের দিকে ঝুঁকে চলতে হয়। এপাশ ওপাশ দুললেই পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই মূল্যবান অভিজ্ঞতা ভবিষ্যৎ নভোচরদের চলাফেরার কাজে যথেষ্ট সহায়ক হবে।

সমরজিৎ কর

কুমোর বাড়ি : কলসী হাঁড়ি

বিরলাপুরে চটকলের ভোর তিনটের ভোঁ হতেই ঘুম ভেঙে যায় পাল পাড়ার মানুষদের। তেল-ময়লা-জমা মোটা আর ভারী কাঁথার ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ে গায়ে মাত্র ধুতির খুঁট বা শাড়ির আঁচল জড়িয়ে এসে বসতে হয় 'কাজঘরে'। দরজা, বৈঠকখানা, চালাঘর, দাওয়া, উঠোন, বার-খামার সর্বত্র হাঁড়ি, কলসী, তিজেল গড়ার কাঁচা কাজের মালে 'লেতুড়ে'।

মোরগ-ডাকা সেই ভোরে শীতে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বাঁ হাতে চাকে-তৈরি-করে-রাখা ভাঁড়ের 'মুখপাত' আর পাথরের 'বোলে' ধরে ডান হাতে কাঠের 'পিটুনী' দিয়ে গতকালের গড়ে-রাখা 'চাপড়া'—পাতি ভাঁড়ের তলা—জুড়বার জন্যে পটাপট পটাপট শব্দ ওঠে সারা পাল পাড়া জুড়ে।

আর ধানভানা ঢেঁকির শব্দ উঠছে—দুমাদুম দুমদুম...!

নারকেলপাতা পুড়িয়ে আগুনে তৈরি করে এক পো সময় ধরে হুঁকোয় ভুড়ুক ভুড়ুক করে তামাক টেনেও গা গরম হয়নি, তাই তাড়ু কাটার ছলো গলা ছেড়ে কীর্তন জুড়েছে হেম পাল।

> শুন এক কাজ তোমায় কি কহব সই।
> দেহ সেই যদি তেজই না যাই॥
> ...উঠল হাম কালিন্দী-তীর।
> অংগহি লাগল পাঙ্কজ চীর॥
> ...দেখত ভেল সকল শরীর।
> ...উপনীত সমুখে যদুবীর॥

হেম পাল রোজই ভোরবেলা আর সন্ধ্যায় কীর্তন গায়। ভাইপো গোবিন্দ এসে করতাল বাজিয়ে ঠেকা দেয়। খোল বাজায় তার সনাতন খুড়ো। তামাক টেনে নিয়ে তারা গান জোড়ে আবার গান শেষ করে তামাক খায় এক ছিলিম। তারপর ওরা চলে যায় যে যার কাজঘরে। হেম পালের কীর্তনের গলাটা ভাল। ভাল লাগে সকলের। সনাতন খুড়োর গোটা 'গীতগোবিন্দ' মুখস্থ! শুনে শুনে হেমেরও কিছু কিছু আয়ত্ত হয়েছে। সে কাজ করতে করতে গুন-গুন করে :

'ধীর সমীরে যমুনা তীরে বসতি বনে বনমালী,
পীন পয়োধর পরিসর মর্দন চঞ্চল করযুগশালী।'

হেম পাল এসব মহাজনের বাণীর গূঢ় অর্থ হয়তো তেমন বোঝে না কিন্তু অপূর্ব ভক্তিরসে তার মন ভিজে যায়। অপরিচিত শব্দের মোহ, দেবদেবীর হৃদয়, মনের দেওয়া-নেওয়ার স্বর্গীয় মাধুরী তাকে মুগ্ধ করে।

বৈঠকখানার পেছনে ঠিক চাকের পাশেই চড়া জমি চটিয়ে তুলে এনে জমিয়ে রাখা এঁটেল মাটি 'আতালি'-র জল নিয়ে মেখে 'বোলে' দিয়ে ঠুকে ঠুকে 'চাপড়া' গড়তে

গড়তে মেয়েরা হেম পালের সেই গান শোনে আর ভক্তিরসে মন তাদেরও সিক্ত হয়।

সকাল হলে সকলে একবার ওঠে। হাত-পায়ে-ঝিনঝিনি-ধরে-যাওয়া - অবশ - হওয়া শরীর নাড়েচাড়ে। মুখ হাত ধুয়ে মুড়ি কিংবা রুটি দিয়ে এক ঘটি করে গরম চা খেয়ে নেয়। আবার এসে কাজে বসে। পঞ্চাশ হাত লম্বা পাঁচিলের গায়ে যে চালাঘর সেখানে সাজানো এক শো-টা করে কলসী অথবা হাঁড়ি। পর পর পাঁচ থাক। কোমরে আঁচল জড়িয়ে বছর সাতাশের সুন্দরী বউ, কপালে বড় একটা ফোঁটা, 'চন্দ্রকোণা' রঙ সালতিতে করে নিয়ে পাঁচ রোদে শুকোনো কলসী-হাঁড়ি তিজেলের গায়ে ন্যাতা বুলিয়ে বুলিয়ে মাখিয়ে দিচ্ছে। ঘাটালের 'চন্দ্রকোণা' মাটির রঙ দেওয়া হয়ে গেলে তার ওপর কলসী হাঁড়ির কানায় গলায় দিতে হয় 'উপরি-বনক' রঙ। কাঁচা গোলা রঙের রূপটা কালো। কিন্তু 'পনে' পোড়ালে হবে টকটকে লাল। এ রঙের দর বড্ড বেশি। আধকিলো টাকায়। কুমোরটুলীর জি সি পালের নাতনী হল হেমচন্দ্র পালের বউমা—পাকা হাত—কাজ করতে করতে আড়চোখে এক একবার দেখে পাল মশায় আর খুশী হয়।

শুধোয় 'হাঁ বউমা, প্রবোধ কি এখনো ওঠেনি? সারারাত জেগে মহাবীর ভীম সেজে যাত্রা করে এসে বেটা আমার এখনো বিছানায় চিৎপাত হয়ে পড়ে আছে! দু-এক গেলাস টেনে এসেছে কিনা দেখ, ওসব না গিললে তো আবার লম্ফঝম্প করা যায় না—তাতে আবার ভীমের পার্ট!'

বউমা মৃদু মৃদু হাসে। বলে, 'এই তুলে দিতে বাগানের দিকে গেল। চোখ দুটো কুঁচের মতো হয়ে আছে। মদ ও কোনদিন খায় না বাবা!'

সংসপ্তে পড়লে সবাই খায়। কথায় বলে, 'ছেলেকে দেবে না যাত্রা দলে, গরুকে দেবে না আখ-শালে!'—তা কচি বাছুরটা ভ্যাবাচ্ছে, দুধটা দুইবে কখন? আজ ধান উঠবে তো, খামারটা নিকিয়ে দিতে বলো বুড়ীকে।'

ভারী পাওয়ারের মোটা কাচের চশমাপরা হেমচন্দ্রের বুড়ী মা 'আতালি' থেকে জল নিয়ে হাঁড়ির মুখপাত আর চাপড়া-জোড়া জোড়েন মুখে বুলিয়ে দিয়ে পিটুনী চালিয়ে চলেছে। ছেলে প্রবোধ পাল মস্ত ডাকাতের মতো চেহারা—মাথায় চুলের স্তবক—তিনটে গাই গরু, দুটো বাছুর আর হেলে জোড়াকে গলায় 'গলাম' লাগিয়ে পঞ্চানন্দ তলার বিশাল তেঁতুল গাছটার নিচে রোদে বেঁধে দেয়। হেঁড়ে গলায় হঠাৎ তাকে বলতে শোনা যায় :

'জনেরা কেউ কাজে আসবে না বাবা। তাদের নাকি চার টাকা করে জনের দাম দিতে হবে। দু টাকা রোজ দেওয়া হচ্ছিল, আমি আড়াই টাকা দোব বলিচি। ওরা নাকি লালঝান্ডাওয়ালাদের পার্টি থেকে হুকুম পেয়েছে, 'চার টাকা রোজ না দিলে কেউ কাজ করবে না।' শ্লোগান দিয়ে গত সন্ধ্যায় নাকি পার্টির লোকেরাও হেঁকে গেছে পাড়ায় পাড়ায়? শেষ পর্যন্ত বলে এলুম তিন টাকা দোব। আর মুড়ি বিড়ি। না পারিস দরকার নেই, আমরা নিজেরাই ধান কাটব, 'গলটাব', মাথায় করে বয়ে এনে খামারে গাদা দোব। ঝাড়ব মাড়ব সব করব। কেন, আমরা কাজ জানি না নাকি? শালা, আমি কাজ করলে তিনটে জনে পারে না আমার সনে। ওরা বললে, তা হতে দুবোনিকো দাদা! তোমার জমি হলেও তুমি কাজ করতে পারবে না আমাদের কাজ না করিয়ে। তাহলে কাস্তে দিয়ে ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দোব! বলিচি, মাইরি নাকি! নেবে দেখ না জমিতে! ভাদ্দর মাসে জল হতে রোয়া হল, বিঘেয় ছ-সাত মণ ধানের জায়গায় এ বছর তিন চার মণ হবে মাত্র—ওদের আবদার চার টাকা করে জনের দাম দাও! এটা তো ঘাটতি এলাকা, হুঁশ আছে? ছোট ছোট চাষী সবাই, ক্ষেত মজুর বরং সংখ্যায় কম, তারাই এর পাঁচদিন ওর সাতদিন কাজ করে চাষ তুলে দেয়। ধানটা উঠে গেলে কে চার টাকা রোজ দেবে? তোদের কতখানি অভাব আমরা চাষীরা ছাড়া কি বাইরের বাবুরা জানে? এখন পাঁচ সিকে নতুন চালের কেজি, এখন রোজ বাড়াবার কথা তুলছে আর যখন বর্ষাকালে চাল দু-টাকার উপরে ছিল বাছাধনরা কোথায় ছিল? তার মানে খাবও না, খেতেও দেবে না। চলে আসছি, কানাই মোড়ল ডেকে বললে, তিন টাকা দিও, পার্টিকে বলব চার টাকা দিচ্ছ।'

হেমচন্দ্র যেন এসব কথার ফাঁক তেমন বুঝতে পারে না। মাঠে কি তাহলে ধান

পড়ে থাকবে নাকি? খুন খারাবি রক্তপাত হবে?

প্রবোধ বলে, 'ক্ষেত মজুররা কিছু বলছে না, পার্টি বলাচ্ছে, তাদের উপকারী সেজে ভোট নেবে একদিন। এর নাম আন্দোলন, সংগঠন। তিন টাকা নেবার কথা দিয়ে পাঁচজন কাজে গেছে। দেখ, কি হয়, মাঠ থেকে তাদের তেড়ে দেয় কিনা।'

হেমচন্দ্র বলে, 'ওদের ভাতভিত যাবে। দুদিন কাজ বন্ধ গেলে খাবে কি? গরিব ভিখিরির দশা ওদের। ওদের নিয়ে আবার রাজনীতি শুরু হল। বেকারদের যে পুঁটিমাছের প্রাণ, আড়াই ঘণ্টা টেঁকে না। আমরা 'চাষীরা যদি পাঁচদিন কাজ বন্ধ দিই ওদের পার্টি কি খোরাকী দিয়ে সাহায্য করবে?'

বউমা বলে, 'কেন, ওরা তোমাদেরই জমির ধান তুলে নিয়ে যাবে।'

হেমচন্দ্র বলে, 'আমাদের তিরিশ বিঘে সম্পত্তি, বছরের খোরাকী হয় মাত্তোর—তা আমরা কি ওদের হাতে লুঠ খুন জখম হ'য়ে মরব?'

প্রবোধ বলে, 'যার পাঁচ কাঠা জায়গা আছে সেই জোতদার।'

বাংলাদেশে মৃৎশিল্পী মাত্রেই হিন্দু। পাল বংশ জগৎ সৃষ্টির পর মানুষ যখন সমাজ গড়ে তোলে তখন থেকেই সনাতন এবং ত্রিকালজয়ী। এদের কাজ কেউ নিতে পারেনি। সৃষ্টির আদি কাজ মৃত্তিকা-শিল্প। লক্ষ লক্ষ বছর আগের ধ্বংসস্তূপে খুঁড়ে প্রত্নতাত্ত্বিকরা ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মিশর, ফ্রান্স, রাশিয়া সর্বত্র পোড়া মাটির পুতুল, পাত্র, হাঁড়ি-কলসী পেয়েছেন। হাঁড়ি-কলসী মানুষের প্রায় প্রথম সৃষ্টি। সেই সৃষ্টি আজও জাত-ব্যবসায়রূপে পালেদের মধ্যে অকৃত্রিমভাবেই রয়েছে। সভ্য জগতে শহর নগর গড়ে উঠতে যখন সেখানের পায়ের তলা থেকে নরম মাটি সরে গেল, এল সিমেন্ট আর কংক্রীট-কাঠিন্য, মাটির পাত্রের ব্যবহার কমে গিয়ে সে সব জায়গায় এল এলুমিনিয়াম, জার্মান-সিলভারের পাত্র, লোহা, পিতলের দ্রব্যাদি কিন্তু তাতে কি মৃৎপাত্রের রেওয়াজ কিছুমাত্র কমেছে?

হেম পাল বলে, না কমেনি। আমাদের কাজের টানে আদৌ ভাঁটা পড়েনি। জাত-ব্যবসা ছেড়ে যারা কেরানী, অফিসার, প্রফেসার হয়ে যাচ্ছে তাদের চাপটা এসে পড়ছে আমরা যারা টিকে রয়েছি তাদের ঘাড়ে। দিন দিন কাজের টান বাড়ছে বরং। শহরে ফুলের টব, কলসী, কুঁজোর টান বেশি। গ্রামে হাঁড়ি, মালসা, সরা, ভাঁড়, কলসী, চাটু, তিজেল, ম্যাচলা, খুলী (গুড় জ্বাল দেওয়া) জালা, মেটে, গামলী, ধুনুচী, দেবীঘট, ছোবাভাঁড়, পাতিভাঁড়, রসের ভাঁড়, চাল উঁচোনো খুলী এসব চিরকাল নিত্যদিন কাজে লাগে। এত পাতিভাঁড় গড়ছি, এসব যাবে শহরে। পুজোর ঘটরূপে ব্যবহার হয়, মেছুনীরা, কাঁচা আনাজ ব্যাপারীরা, ফুল ব্যাপারীরা জল তোলার ভাঁড় হিসেবে এসব ব্যবহার করে। একটা ভাঁড়ের দাম ১২ পয়সা। পাইকারী দশ পয়সা। ভাতের হাঁড়ি একটা আট আনা, যাতে আড়াই কেজি চাল ফুটবে। মোটা চাল তিন কেজি, সরু চাল আড়াই কেজি। তিজেল মানে 'বেনে' হাঁড়ি বা তরকারীর হাঁড়ি ১৯ পয়সা। একটা জালা ছ-টাকা। ম্যাচলা একটা যাতে এক বস্তা মানে দেড় মণ ধান ধরে, তিন টাকা। গাঁজার কোল্‌কে ১২ পয়সা। এ বাবা অমানুষিক খাটুনি। চল্লিশ বচ্ছর এক নাগাড়ে ভোর তিনটে থেকে রাত দশটা অব্দি কাজ কচ্ছি। কুমোরের কাজ মেয়েদের হাতেই বেশি বলে আগে পরের মেয়ে ঘরে আনতে অনেক টাকা পণ লাগত। এখন আর সে সব নেই। পালপাড়ার ছাপান্ন ঘর লোকের মধ্যে অনেকেই যাকে বলে 'শিল্পকাজ' তা জানে না। শিক্ষিহীন লোকের কাজ এসব। হাত বশ হতে বহুদিন লাগে। কাজেই কল-কারখানা হতে অনেকেই এখন জাত ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে শ্রমিক হয়ে যাচ্ছে। তারা এখন দুর্দিনে পড়ে জাত-ব্যবসা, জমিজিরেত সব খুইয়ে, কাবুলীর কাছে দেনা করে ফতুর হয়ে গিয়ে চা দোকানে আড্ডা দেয় আর রাজনীতি করে। এ পাড়ার মোটে ২৩টা ভোট কংগ্রেসের। আমাদের বাড়ি আর সারদা পালের বাড়ি। সারদা পাল ইউনিয়ন বোর্ডের 'পেসডাণ্ড' বাবু ছিল। তাতেই সব খুইয়েছে সমাজবাদী হয়ে কাজ করতে গিয়ে, উল্টে বদনাম। তবে সেই এই গ্রামে দুই ইস্‌কুল, মেয়েদের ইস্‌কুল পোস্ট অফিস, লাইব্রেরী এইসব করেছে। আমাদের প্রবোধবাবু এখন গাঁয়ের মোড়ল-মহাশয় ব্যক্তি! একটু চড়া মেজাজের লোক। যুক্ত ফ্রন্টের ৫০/৬০ জন লোক এল গত বছরের আগের বছর আমাদের ঘর থেকে ধান বার করতে। প্রবোধ বললে, গেট আউট! আমার বাড়িতে তোমাদের প্রতিনিধি আসুক—সব লোক এলে থালা-ঘটি-বাটি, জিনিসপত্র চারদিকে ছড়ানো আছে, চুরি গেলে তোমরা সব দায়ে পড়বে। লোকগুলো যেন বর্গীর দল। বাড়ি লুঠ করতে এসেছে! আসলে রাজনীতি নিয়ে 'আক্‌ষা আক্‌ষি'। প্রবোধের মূর্তি দেখে সবাই বাইরে দাঁড়াল। প্রবোধ তখন দু-ধামা মুড়ি, এক কলসী ভাল বালিগুড় আর পঁচিশ তিরিশটা নারকেল দিয়ে গেল তাদের। খুশী হয়ে তারা সবাই খেলে। ধান না পেয়ে চলে গেল। পাবে কোথা? আমার তিরিশ বিঘে সম্পত্তি কিন্তু পাত পড়ে এগারোটা! এ'টেল মাটি তুলে তুলে জমিও আমার অনেক ডহর হয়ে গেছে। গঙ্গার মাটিতে হাঁড়ির তলা তৈরি হয়। রায়পুর, বেড়াল, রায়গঞ্জ, স্যাকরাইল থেকে নৌকোয় করে গঙ্গার মাটি আনতে হয়। উত্তর মগরা, পাণ্ডুয়ার বালি আনতে হয়। ধুলোবালিতেও পেতেনের কাঁচা কাজ হয়।

প্রবোধ একটা ধানের বোঝা মাথায়

স্বাভাবিক লাবণ্যের আভা আনবে...
Pond's Angel Face
পণ্ডস এঞ্জেল ফেস
তরল মেক-আপ
Angel Face
LIQUID MAKE UP
NATURAL ANGEL
MADE IN INDIA
— আপনাকে পরীর মত অপরূপ ক'রে তুলবে

নিয়ে এসে খামারে ফেলে দিয়ে বললে, জনেদের ওই পারটির লোকেরা কাজ করতে দেয়নি। কেড়ে নিয়েছে। তারা তিন টাকা রোজে কাজ করতে চায় কিন্তু ছোকরারা বলছে চার টাকা রোজ না দিলে কেউ চাষীর ক্ষেতে নামতে পারবে না। ছোকরাগুলোর এখন ভাল করে গোঁফ গজায়নি। ঠিক আছে, আমারই লাভ, বিনা পয়সায় দু ঘণ্টা করে পাঁচ জন ধান গোছুটে দিয়ে গেল। দেড় রোজের কাজ হয়ে গেল এমনি এমনি। এই ছেলেরা চল সব, ধান বইবি। থাক পাঁচ দিন ওদের কাজ বন্ধ থাক।'

হেম পাল বলে, 'তা কি হয়। ওরা গরিব মানুষ, খাবে কি?'

মুড়ি নিয়ে যেতে বলেছি, তাও নিতে দেয় কি দেখ।'

হেম পাল উঠে এসে এক আঁটি ধান তুলে হাতে নিয়ে দেখে বললে, 'এই তোর ১২৮১ ধান 'চারেন' হয়ে ফলেছে। এক আঁটিতে দুশো গ্রামের বেশি ধান হবে না। তুই বললি ৫০০ গ্রাম হবে! 'মরিচ-শাল' ধানের মতোই দেখতে—ফুদে ফুদে। কিন্তু এর গাঁথুনি যে পাতলা।'

প্রবোধ বলে, 'তাইনান, তাইচুঙ, আর-আই-এইট, বারো শো একাশী—এসব ধান প্রফুল্ল সেন জাপান থেকে এনেছিলেন বলেই এখন এরা ডুগডুগি বাজাচ্ছে।'

হঠাৎ জনেরা ফিরে এসে বললে, 'আমরা কাজ করব। পার্টির লোকদের রাজি করিয়েছি।'

তারা মুড়ি নিয়ে ক্ষেতে চলে গেল।

স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেললে যেন হেমপাল।

বিকালে সারা পাল পাড়া ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার। 'পনে' আগুন দিয়েছে।

চৌচালা ছাউনী, ছ-টা মাঝখানে, দুটো ধারে মাটির থাম আর দেওয়াল; নিচে 'পনে'র গহ্বর। আকার ত্রিভুজের মতো। পেছন দিকটা দু-কোণ এবং উঁচু। মুখের কোণের দিকে ইঁট আর মাটির তিন থাক পৈঠা। মাঝে মাঝে ফাঁক। তার মধ্যে দিয়ে আগুনের হল্‌কা আসে 'পনে'র মধ্যে। 'পনে'র নিচে পুরনো কলসী উপুড় করে সাজিয়ে দিয়ে তার ওপরে দিতে হয় কাঁচা কাঁটাপালা, তার ওপর শুকনো নারকেল পাতা। এবার দিতে হবে রোদে শুকনো কাঁচা হাঁড়ি কলসী ইত্যাদি। তার ওপরে আবার কাঁচা ডালপালা, নারকেল পাতা আবার হাঁড়ি-কলসী আবার ডালপাতা কলসী দাও। এমনি করে পাঁচ থাক দিয়ে তার ওপর আঁটির বাঁধন খুলে খড় বিছিয়ে দিয়ে আবার কাদার লেপন দিতে হবে। এবার দক্ষিণ মুখো 'পনে'র মুখের নিচে লোহার শিকের ওপরে কাঁচা কয়লা তুলে দিয়ে দাও। কয়লা পোড়ার লেলিহান শিখা ভেতরে ঢুকতে থাকলে কাঁচা ডালপাতা পুড়তে থাকবে আর 'পনে'র পেছনের গহ্বর দিয়ে থল্‌থল করে ধোঁয়া বেরুবে। সেই ধোঁয়ায় সারা পালপাড়া অন্ধকার হয়ে যাবে। সারারাত ধরে এই 'পন' জ্বলবে। সকালে পন পোড়ানো শেষ হবে।

পন পোড়াতে লাগে :

৮ মণ কাঁচা কয়লা	দাম	২৪·০০
৪০ খানা নারকেল পাতা	„	৪·০০
কাঁচা ডালপালা	„	১·০০
খড়	„	৮·০০
মজুরী	„	২০·০০
		৫৭·০০

একবার পন পোড়ানো হলে তা থেকে যে মাল খালাস হয় তার মোট মূল্য একশো টাকা। সপ্তার দু-বার পন পোড়ে। এখন শীতকালে মাটির কাজ ভাল হয়। বর্ষায় বড় কষ্ট। বৃষ্টি বাদলায় সব মাল তুলতে না পারলে অনেক নষ্ট হয়।'

মুসলমান ছেলেমেয়েরা ভাঁড় ভর্তি করে কাঁকড়া ধরে এনে তার বিনিময়ে হাঁড়ি পাতিল নিয়ে যায়। মুসলমান বুড়ী-দের হাতে পাড়ায় মাল বিক্রি হয়ে যে দু-চার আনা আসে সে সব পয়সা নেয় প্রবোধের মা। তাদের সঙ্গে সুখ দুঃখের আর কি রকম ঝগড়া হয় শাউড়ি-বউয়ে, সেই সব কাহিনী।

হেম পাল বলে, 'তখনকার সমাজ-কর্তারা আমাদের সমাজের রক্ষণাবেক্ষণের কথা ভাবত। এই যে 'অরন্ধন' পুজো, এ আমাদের কথা ভেবেই। সারা বছর যদি মানুষ হাঁড়ি-পাতিল না ফেলে তাহলে আমাদের চলে কেমন করে সে কথা ভেবে নিয়ম করে দিয়েছিল ভাদ্র মাসের সংক্রান্তির দিনে সব পুরনো হাঁড়ি ফেলে দিয়ে কুমোর বাড়ি থেকে নতুন হাঁড়ি মালসা সরা কিনে আনতে হবে। এখনকার সমাজকর্তারা কি সে কথা ভাবে? তারা সবকিছু নষ্ট করতে পারে সে দিকে বুদ্ধি-বাগীশ! সকাল সন্ধ্যা রেডিও খুলে বসি, অনেক কথা শুনি কিন্তু পৃথিবীর সব চাইতে আদি মৃৎশিল্পী এই কুমোর জাতের কথা কেউ কই কোনোদিন কিছু বলে কি?

প্রবোধ বলে, 'বৈজ্ঞানিক সভ্যতা বাড়লে আমাদের মাটির হাঁড়ি স্বর্গে চলে যাবে। তখন আর হয়তো খেতেই হবে না মানুষকে, হয়তো দূরের কথা।'

হেম পাল বলে, 'তাহলে আমরা কি তখন শুধু ঠাকুর গড়ব?'

প্রবোধ বললে, ঠাকুর গড়তেও হবে না। আজকাল লোকে ঐ মিথ্যা ঠাকুর-দেবতা মানে না। সভ্যজগৎ লোহা-লক্কড় চায়, মাটিকে চায় না। মাটি তাদের পায়ের তলা থেকে আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে।'

সন্ধ্যায় প্রবোধের স্ত্রী শাঁখে ফুঁ দিয়ে তুলসী তলায় আলো দেখিয়ে গড় করে এসে ঘাটের জলে কলার ভেলায় কয়েকটা ছোট ছোট মাটির প্রদীপ জেলে দিয়ে উঠে আসবার সময় প্রবোধ কয়েকজন বাবুকে নিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকল গিয়ে।

সনাতন খুড়ো আর ভাইপো গোবিন্দ এসে তামুক টেনে নিয়ে খোল করতাল বাজাতে বসলে হেম পাল গলা ছেড়ে কীর্তন গাইতে শুরু করলে :

> 'বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে।
> দেখা না হইত পরাণ গেলে॥
> এতেক সহিল অবলা ব'লে।
> ফাটিয়া যাইত পাষাণ হ'লে॥'

কীর্তন শুনতে শুনতে হেম পালের বুড়ো মায়ের ভারী পাওয়ারের কাঁচের চশমা চোখের জলে ভিজে যায়।

বাবুরা বিদায় নিলে বউমাও এসে গলবস্ত্র হয়ে বসে ভক্তিপ্লুত মনে কীর্তন শোনে। হাতের কাজ কিন্তু তাদের বন্ধ হয় না। বোলের ওপরে পিটুনী চলে হাতের পটাপট পটাপট শব্দে। আর চাক ঘুরতে থাকে বন বন করে প্রবোধের হাতে। সে এখন স্রষ্টার ভূমিকায় সেজেছে মৃত্তিকা-ঈশ্বর॥

আবদুল জব্বার

"চমৎকার খেতে হয়েছে—
যেমন স্বাদ তেমনি গন্ধ,
রহস্যটা কী!"

ভারতের অর্থনীতি
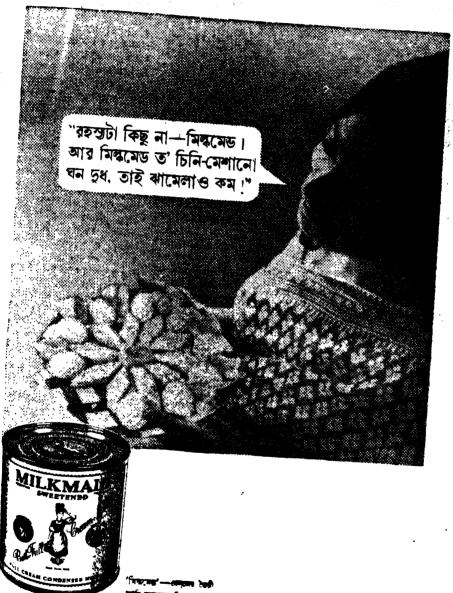
মুদ্রাস্ফীতি ছাড়াই বৈষয়িক উন্নয়ন

সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার গভর্নর একটি ভাষণে বলেছেন যে, মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি না করেও ভারতে উচ্চহারে উৎপাদন সম্ভব। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার শুরু থেকেই ভারতে ব্যাপক হারে ঘাটতি অর্থসংস্থানের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় যেখানে ৫৫০ কোটি টাকার ঘাটতি অর্থসংস্থানের কথা ছিল, সে ক্ষেত্রে তার পরিমাণ প্রকৃতপক্ষে দাঁড়িয়েছিল প্রায় ১১৫০ কোটি টাকা। তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার পর থেকেও প্রতি বছর ২০০ কোটি টাকার উপর ঘাটতি অর্থসংস্থান (Deficit Financing) করা হচ্ছে। ১৯৬৯-৭০ সালের জন্য ঘাটতি ধরা হয়েছে ২৬০ কোটি টাকা। এই বিপুল পরিমাণ ঘাটতি অর্থ-সংস্থানের পরিণতি হয়েছে মুদ্রাস্ফীতি। জিনিসপত্রের দাম ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে, হয়তো মুদ্রাস্ফীতির কারণ শুধু ঘাটতি অর্থ-সংস্থানই নয়। কিন্তু নতুন মুদ্রা ছাপার ফলে যে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর শ্রী এল কে ঝা বলেছেন, যদি ভারত সরকার একটি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার বাড়াবার জন্য চেষ্টা চালান এবং কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়াবার জন্য যতটা নজর দেওয়া হয়েছে, মূলধনী-পণ্য ও ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন বাড়াবার জন্যও ততটা নজর দেওয়া হয়, তা হলে অদূর-ভবিষ্যতে মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি না করেও ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার দ্রুত বাড়ানো সম্ভব হবে। এমন কি বাজেটে উদ্বৃত্ত হওয়াও অসম্ভব নয়। ভারতে খাদ্য-শস্যের উৎপাদন যে ১০০ মিলিয়ন টন অতিক্রম করতে চলেছে এটা নিঃসন্দেহে একটি শুভ লক্ষণ। কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়লে শুধু যে খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রেই স্বয়ম্ভরতা অর্জন করা সম্ভব হবে তা নয়, শিল্পক্ষেত্রেও কাঁচামালের যোগান বাড়বে। এর সঙ্গে সরকারকে মূল্যমান স্থিতিশীল করতে হবে এবং বৈদেশিক মুদ্রার এক মজুত ভাণ্ডার গড়ে তুলতে হবে। শ্রী ঝা মনে করেন, মুদ্রাস্ফীতি রুখতে হলে বৈষয়িক উন্নয়নের জন্য সঞ্চয়ের পরিমাণ অপেক্ষা বেশি টাকা বিনিয়োগ করা উচিত নয়। তা ছাড়া, প্রধান প্রধান ভোগ্যপণ্যের ঘাটতি দূর করতে হবে। যতক্ষণ ভোগ্য-পণ্যের ঘাটতি থাকবে ততক্ষণ সেগুলির দাম ঊর্ধ্বমুখী থাকবে। উৎপাদন বাড়িয়ে এবং সুষ্ঠুভাবে উৎপাদিত সামগ্রীর বণ্টন সুনিশ্চিত করে বণ্টনকারী এবং ক্রেতাদের ক্ষেত্রে ভোগ্যপণ্যের দাম স্থিতিশীল রাখা দরকার। আমাদের দেশের বাজেটে ঘাটতি দূর করার জন্য নতুন টাকা ছাপানো এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না বলেই মনে হয়। কিন্তু, শ্রী ঝা মনে করেন, এভাবে ঘাটতি পূরণের সীমা কড়াকড়িভাবে নির্দিষ্ট করতে হবে। বিদেশ থেকে অত্যাবশ্যক জিনিস-গুলির আমদানির জন্য বৈদেশিক মুদ্রার এক মজুত ভাণ্ডার গড়ে তুলতে হবে এবং রপ্তানি বাড়াবার ক্ষেত্রে যে সব শিল্প সাহায্য করে সেইগুলির উপর জোর দিতে হবে।

শ্রী এল কে ঝা স্বীকার করেছেন যে, আমাদের অর্থনীতিতে অপেক্ষাকৃত অল্প অর্থ বিনিয়োগ এবং শিল্প ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পরিমাণ উৎপাদন না হওয়ায় অর্থনীতি ক্ষেত্রে একটা অস্বস্তিকর ভাবও লক্ষ করা যাচ্ছে। কিন্তু বর্তমানের সাময়িক রাজনৈতিক অস্থিরতা বৈষয়িক উন্নতির পক্ষে পরিপন্থী হবে বলে মনে করা উচিত হবে না। অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার আরও দ্রুত বাড়াবার জন্য এবং সেই সঙ্গে মুদ্রাস্ফীতির তীব্রতা কমাবার জন্য শ্রী এল কে ঝা বলেন, খাদ্য ও কৃষিজাত কাঁচামালের উৎপাদন বাড়াতে হবে। উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি রেখে দেশের সর্বত্র বেতন কাঠামোর পুনর্বিন্যাস করতে হবে; বিভিন্ন শিল্পকে শিল্প পরিচালনায় আধুনিক পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে এবং লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে উদার নীতি গ্রহণ করতে হবে।

আমাদের চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনারও প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে স্থিতিশীলতা বজায় রেখে উন্নয়ন হার দ্রুত বৃদ্ধি করা (growth with stability)। যেভাবেই হোক জিনিসপত্রের দামের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতেই হবে। তা না হলে উন্নয়ন হার দ্রুত বাড়ানো সম্ভব হবে না; সেজন্য প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত, আরও উৎপাদন বাড়ানো এবং উৎপাদিত সামগ্রীর যাতে সুষ্ঠু বণ্টন হয়, তার ব্যবস্থা করা।

শিল্পপতির তিন দফা পরিকল্পনা

বিশিষ্ট শিল্পপতি শ্রী জে আর ডি টাটা তিন দফা পরিকল্পনার ভিত্তিতে বৈষয়িক উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাবার জন্য বিশেষ জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে, ১৯৮০-৮১ সালের মধ্যে জাতীয় আয় শতকরা ৮৮ ভাগ বাড়িয়ে ৫৮,০০০ কোটি টাকায় নিয়ে যেতে হবে, শিল্পকে ব্যাপকভাবে কৃষির সহায়তায় এগিয়ে চলতে হবে, এবং কর্মসংস্থানের নতুন নতুন পথ খুলে দেবার জন্য সর্ব-ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। শ্রী টাটার মতে এই তিনটি লক্ষ্যে উপনীত হওয়া অসম্ভব নয়। এক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তাকে বাস্তবে রূপায়িত করা, কলকারখানায় শৃঙ্খলা বজায় রাখা, সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগ কর্মসূচীর মধ্যে সংহতি বজায় রাখা এবং বেকার সমস্যার মোকাবিলা করা। শ্রী টাটা মনে করেন, বর্তমানে যেখানে বেসরকারী মূলধন নিয়োগের পরিমাণ হচ্ছে ১২২ কোটি টাকা—আগামী দশ বছর ধরে তার পরিমাণ বছর পিছু ৪৮০ কোটি টাকায় তুলতে হবে। বেকার সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য শ্রী টাটার পরি-কল্পনা হচ্ছে : পল্লী অঞ্চলে সড়ক নির্মাণের এক সর্বব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণের জন্য প্রতি বছর ২৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করলে দশ লক্ষ নরনারী সরাসরি কাজ পাবে এবং আরও বিশ লক্ষ নরনারী আনুষঙ্গিক কাজ পাবে। তা ছাড়া সড়ক নির্মাণের এই কর্মসূচী অনুসৃত হলে শহর ও গ্রামীণ অর্থনীতির মধ্যে যোগসূত্র আরও নিবিড় হবে।

শ্রী টাটা যে পরিকল্পনার কথা বলেছেন, তাতে নতুন কিছু বলা হয়নি। বেসরকারী ক্ষেত্রে মূলধন নিয়োগ বাড়াবার জন্য সাহায্য করতে সরকার সর্বদাই প্রস্তুত। কিন্তু শিল্পপতিদের নিজেদেরই বিনিয়োগ বাড়াবার কাজে এগিয়ে আসতে হবে। কলকারখানাগুলিতে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষেত্রে শ্রমিকদের ভূমিকা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, সন্দেহ নেই, কিন্তু সেক্ষেত্রে মালিকদের দায়িত্বও কম নয়। অনেকক্ষেত্রে কারখানা-মালিকদের সহানুভূতি এবং উদার নীতির ফলে শিল্প-শান্তি বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে—এ রকম নজির বহু আছে। সড়ক নির্মাণের প্রকল্পও চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। তবে সমস্যাগুলি সম্পর্কে শিল্পপতিগণ যে সজাগ আছেন এবং সমস্যাগুলির সমাধানকল্পে শ্রী জে আর ডি টাটা যে একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার পথে এগিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য।

—[illegible]

বাচ্চুর অভিযোগ

"একটি কথা বলব, কিছু মনে করবেন না?" বাচ্চু, দরজা ঠেলে ঢুকে, মুখটা ফুলিয়ে রেখে, চেয়ার টেনে বসে পড়ে বলে উঠল।

'কিছু মনে করার না থাকলে মনে করব না, নইলে অবশ্যই করব।'

'আপনার লেখা আর একটুও ভালো লাগছে না...। জানেন? আমার বাবা দেশের গ্রাহক ছিলেন না, শুধু আপনার লেখা পড়বেন বলেই কিনতে শুরু করেছিলেন। আমি কিন্তু আর পড়ি না, আমার বোনটিও না—আপনি আজকাল না সব বড় বড় কথা লিখছেন.....। আমাদের জ্ঞান দিতে লেগেছেন বুঝি?'

জোর করে বলতে যাচ্ছিলাম, পাঠককে শিক্ষা নয়, আনন্দ দিতেই সাহিত্যক্ষেত্রে আমার অনিবার্য পদক্ষেপ, তবে আনন্দের সঙ্গে যদি শিক্ষাও...

বলার সুযোগ আর পেলাম না, বাচ্চু হঠাৎ বলে উঠল, 'আপনার দিদিমা ছিল না, না?'

'ছিল, কিন্তু...'

'দিদিমা আপনাদের গল্প বলত না, না?'

'বলত, কিন্তু...'

'বাঁচা গেল! আপনার বইটই পেনটেন রেখে আপনার সেই দিদিমার একটা গল্প বলুন; দেখি পারেন কি না!'

কাজ ছিল এক গাদা, বইটই পেনটেন রাখার ইচ্ছা মোটেই ছিল না, কিন্তু সেই 'দেখি পারেন কি না'-র চ্যালেঞ্জ আমার অহংবোধকে তিক্ত শূলে বিঁধছিল।

দিদিমা পরীর গল্প, ভূতের গল্প বলতেন কম, প্রায়ই বলতেন সেন্টদের পৌরাণিক কাহিনী। বাচ্চুর তিনটি অনুরোধে দিদিমার কথা ভাবতে গিয়ে মনে এল সেন্ট নিক্লাসের গল্প। গল্পটির নাম : কন্যাদায় মোচন।

তিন মেয়ের বাপ

চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মিরনগরে বাস করতেন নিক্লাস নামে একজন বিশপ।

আপনার দিদিমা ছিল না, না?

নিক্লাস ছিলেন দয়ার সাগর আর মায়ার জলধি; হাসপাতালের রোগীদের নিজ হাতে সেবা শুশ্রূষা করতেন, বাচ্চা কাচ্চাদের সঙ্গে অমায়িকভাবে মিশতেন, দীন দরিদ্রদের সাহায্য করতেন অকৃপণ হস্তে। তবে তাঁর উদারতা ও সাধুতার এক বৈশিষ্ট্য ছিল বটে—তিনি কাউকে প্রকাশ করতে দিতেন না তাঁর সৎকার্যের কথা। উপকৃত লোকটিকে তিনি বলতেন, 'এই উপকারের কথা আমাদের স্বর্গস্থ পরম-পিতাই জানুন; আর জানুক ভগবানের কাছে কৃতজ্ঞ তোমার চিত্ত; তাতেই আমার যথেষ্ট।'

তখনকার দিনে মিরনগরের পূর্বপল্লীতে বাসা বাঁধতে এসেছিলেন বাতপঙ্গু ও কন্যাদায়গ্রস্ত একজন অবসরপ্রাপ্ত রাজকর্মচারী। নাম... না, তাঁর নাম—ঐতিহাসিকদের অমার্জনীয় অবহেলাবশত—আমাদের জানা নেই। তাঁকে নাম দিয়েছি আমি কাপ্রিকোর্ন... না, এমনি, বিনা কারণে, নামটা কি জানি কেন, আমার বড়ই পছন্দ।

কাপ্রিকোর্নের দুঃখের কাহিনীর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ শুনেছিলেন নিক্লাস তাঁর বাবুর্চির আশ্রিত এক দূর সম্পর্কীয় মামার মুখে। ভূতপূর্ব রাজকর্মচারীটির আইবুড়ো মেয়ে তিনটি লেখাপড়া তেমন করেনি, গান শেখে নি, নাচ জানে না, রং ময়লা...। তার উপর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে—আর যৌতুকের অভাবে—ওদের পক্ষে শুভ লগ্নে সদ্বংশীয় পাণিগ্রহণের সম্ভাবনা দিনদিন ক্ষীণতর হয়ে যায়.....

এত বড় সমস্যার সমাধানের দুরাশায় অন্তত কন্যাত্রয়ের গর্ভধারিণী কাটিয়ে-ছিলেন অনেক নিদ্রাহীন রাত—[illegible] বিলাপে। অবশেষে ধৈর্য হারালেন তিনি, দেহরক্ষা করলেন, উত্তরাধিকারিণীদের আশীর্বাদ করে। বিপত্নীক কাপ্রিকোর্ন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে লাগলেন; আর তাঁর পায়ের কাছে স্বর্গপ্রাপ্ত মায়ের চৌকির উপর বসে ছোট মেয়েটি তাঁর সর্বাঙ্গ মালিশ করে টিপে দিতে লাগল।

এদিকে নিক্লাস কোলে কনুই রেখে আর হাতে মুখ গুঁজে ভাবতে বসেছেন। মেয়েদের বয়স তো কমানো যায় না [অর্থাৎ তখনকার অবৈজ্ঞানিক যুগে যেত না], ওদের গান ও নাচ শেখাবার সামর্থ্যও নিক্লাসের ছিল না, আর পূর্বাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ওদের শ্যামবর্ণের পরিবর্তনও তাঁর ক্ষমতার বাইরে। তবে?

তবে সেদিন, অমানিশার অন্ধকারে, মিরনগরের পূর্বপল্লীর অভিমুখে অগ্রসর হলেন নিক্লাস। তাঁর সঙ্গে কেউ নেই। কাউকে না জানিয়ে বাড়ি থেকে এক রকম পালিয়েছেন আর কি। ওভারকোটের অন্তরালে লুকিয়ে রেখেছেন এক থলি স্বর্ণমুদ্রা।

কাপ্রিকোলের বাড়ির সামনে এসে টর্চলাইট জ্বালিয়ে [বরং চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম পাদে এশিয়া মাইনরে যে বাতিটা টর্চলাইটের কাজ করত, সেটাকে জ্বালিয়ে] নিক্লাস পড়তে লাগলেন দরজার ডানদিকে ঝোলানো এক বিজ্ঞাপন 'কাপ্রিকোল বাহাদুর, অবসরপ্রাপ্ত রাজকর্মচারী'।

থলিটা দরজার চৌকাঠে রাখতে যাচ্ছিলেন; হঠাৎ দোতলার জানলাটা খোলা দেখতে পেয়ে সেদিকেই টিপ্ করে ছুঁড়ে দিলেন—কলকাতার ভোরবেলার কাগজওয়ালা-সুলভ নিপুণ ভঙ্গিতে। তার পর কাঁপতে কাঁপতে [মিরনগরের পৌষ মাসের অভিজ্ঞতা যাদের আছে, তারাই বুঝবে] বিশপ নিক্লাস চুপি চুপি বাড়ি ফিরে গেলেন।

পরের দিন প্রত্যূষে কাপ্রিকোল যখন প্রাতঃকৃত্য সেরে থলিটা দেখতে পেলেন, কেঁদে ফেললেন। তাঁর সহধর্মিণীর শ্রাদ্ধদিনের পর তাঁর প্রথম এই অশ্রুপাত—আনন্দের অশ্রু কিন্তু, অজানা উপকারকের উদ্দেশে কৃতজ্ঞতার অশ্রু। বৃদ্ধ পিতা তাহলে বড় মেয়েটির বিয়ে দিতে পারবেন শেষ পর্যন্ত। কিন্তু... আর দুটি বোন?

এক সপ্তাহের পরে আর এক থলি সোনা নিয়ে নিক্লাস কাপ্রিকোলের বাড়িতে তাঁর পরোপকার পুনরাবৃত্তি করতে গেলেন। দ্বিতীয় মেয়েটিও লাল শাড়ির কথা ভাবতে লাগল, বলতে লাগল শ্বশুরবাড়ির কথা......

কাপ্রিকোল কিন্তু বড় চিন্তিত হয়ে পড়ছেন—চিন্তিত ও দ্বিধাগ্রস্ত। মনে মনে ভাবছেন, 'উপকারকটি কে? তাঁকে ধন্যবাদ না জানিয়ে আমি যে থাকতে পারব না...।'

এই রাতে মেয়েদের কিছু না বলে, কাপ্রিকোল তাঁর বাতপীড়িত পা একটা মোড়ার উপর রেখে জানালার পাশে আরামকেদারায় বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন। রাস্তা নীরব, রাত অন্ধকার...। ডুবে গেল চাঁদ, শীতের বাতাস বইতে লাগল, আর কাপ্রিকোল কাঁপতে কাঁপতে শুয়ে পড়লেন। ঘুম এল না তাঁর, শুধু ভাবছিলেন, 'উনি নিশ্চয়ই আবার আসবেন... আমার ছোট মেয়েটির কথা ভেবে।'

রাতের পর রাত জেগে রইলেন কাপ্রিকোল উৎসাহপূর্ণ প্রতীক্ষায়। চতুর্থ রাত্রিতে নিরাশ হয়ে পড়ে যখন শুতে যাচ্ছিলেন, শুনতে পেলেন রাস্তায় প্রতিধ্বনিত কার পদক্ষেপ...। তাঁর হৃদপিণ্ড দ্রুততর দুর দুর করতে লাগল। হঠাৎ জানলায় একটা হাত... বাতপঙ্গু কাপ্রিকোল একলাফে ছোঁ মেরে আগন্তুকের হাতটিকে জড়িয়ে ধরলেন। থলিটা নিক্লাসের মুঠো থেকে খসে পড়ল; কাপ্রিকোল তবু ছাড়লেন না, বললেন, 'যাবেন না... দয়া করে পায়ের ধুলো দিয়ে এই বুড়োকে খুশী করে যান।' নিক্লাস মৃদু হাসি হেসে বললেন, 'দরজা খুলুন, ভিতরে গিয়ে বসব কিছুক্ষণ...... কিন্তু ধন্যবাদের কথা একবারও যেন তুলবেন না।'

এইভাবে তাঁর পরম উপকারকের নাম জানতে পারলেন কাপ্রিকোল। নিক্লাস তাঁকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন সোনার কথা কাউকে না বলতে। কাপ্রিকোল কিন্তু কৃতজ্ঞতা ও আনন্দে মেতে উঠে প্রতিজ্ঞাটা রাখতেই পারলেন না।

নিক্লাসের বদান্যতার কথা পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছিল; প্রতি বছর ৬ই ডিসেম্বর তাঁর পর্বদিনটিতেই য়ুরোপীয় ছেলেমেয়েদের উৎসব—ভারতবর্ষে যেমন চাচা নেহরুর জন্মদিন......

'এই তোমার গল্প... ডায়েরিতে দিলে হয় না?'

বাচ্চু গম্ভীরভাবে প্রস্তাবটা বিবেচনা করে দেখল: 'হবে না কেন, তবে ভাষাটা একটু শুধরে টুধরে নিতে হবে আর কি......'

তাড়াতাড়ি নির্ঝঞ্ঝাটে রান্না করতে হলে

-ক্লীয়ারটোন হট্‌প্লেট কিনুন

আপনার রান্নাঘরে, ক্লীয়ারটোনের 'হট্‌প্লেট' না থাকলে চলবে কেন? আধুনিক যুগে তাড়াতাড়ি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে রান্নার সুবিধার জন্যই এটি তৈরী-যেমন মজবুত, তেমন টেকসই। মনের আনন্দে রাঁধবার জন্যই ক্লীয়ারটোন হটপ্লেট আধুনিক ডিজাইনে তৈরী এবং বহুদিন ব্যবহার করা যায়। ক্লীয়ারটোনের হটপ্লেট ২ রকম—১ টী প্লেট লাগানো, বা ২ টি প্লেট লাগানো—যা তেতে উঠলে রান্না করা যায়। হটপ্লেটের এলিমেন্ট ঢাকা থাকে—কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি গরম হয়ে ওঠে, আর জলীয় পদার্থ কিছু উপচে পড়ে ক্ষতি না করার জন্য তার ওপর আলাদা "ড্রিপ ট্রে" আছে। উষ্ণতা-রোধক এনামেল দিয়ে তৈরী বলে সহজে নষ্ট হয় না। অনেক দিন একেবারে নতুনের মত থাকে।

সংসারের কাজে ব্যবহৃত ক্লীয়ারটোনের তৈরী যাবতীয় ইলেকট্রিক সামগ্রী যেমন—ইস্ত্রি, হটপ্লেট, টোস্টার, আভেন (তন্দুর) কুকিং রেঞ্জ, ওয়াটার হিটার, এবং অন্যান্য সকল দ্রব্যই অতি নির্ভরযোগ্য এবং সুপরিচিত। প্রত্যেকটি জিনিষই এত কাজের যে দাম উশুল হয়ে আসে।

ভারতের সর্বত্র ক্লীয়ারটোনের ১৫০০ ডীলার ছড়ানো আছে—যারজন্য বিক্রয়পরবর্ত্তী সার্ভিসের সুযোগ অবিলম্বে পাওয়া যায়।

ক্লীয়ারটোনের সামগ্রী সর্বদাই নির্ভরযোগ্য

ন্যাশনাল রেডিও অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিকস্‌ কোঃ লিঃ (জেনারেল রেডিও অ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েন্সেস এর বিভাগ)

শিল্পী ইশা মহম্মদ অ্যালায়াজ ফ্রান্সে গ্যালারীতে সম্প্রতি তাঁর এক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। ইশা মহম্মদ ১৯৫৮ সালে কলকাতার সরকারী আর্ট কলেজে শিক্ষা সমাপ্ত করেন ও পরে নানা স্থানে বহু প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করেন। বর্তমান তিনি তাঁর শিক্ষায়তনেই অধ্যাপক হিসাবে কাজ করছেন। প্রদর্শনীতে তেলরঙে আঁকা ১১টি কমপোজিশন দেখা যায়।

ইশা মহম্মদের অঙ্কনরীতি বিমূর্ত ও সমবিমূর্ত। দু'এক স্থলে সোচ্চার বা তীব্র রঙের স্পর্শ দেখা গেলেও মনে হয় তিনি চাপা রঙ ব্যবহারের পক্ষপাতী। তাঁর রচনা দেখে মনে হয় রঙ অপেক্ষা তিনি মূর্তি তথা আকারের বিভিন্ন রূপের সমন্বয়ের ওপর অধিক গুরুত্বদান করেন। তাঁর ছবির দুটি বৈশিষ্ট্য প্রথমেই চোখে পড়ে—পরিচ্ছন্নতা ও রচনাক্ষেত্রের কারুকার্য। শিল্পী প্রগতিবাদী ও সমকালীন যুগের নিরাশা, অস্থিরতা-অনিশ্চয়তা ও বর্বরতা বিষয়ে সচেতন। তাই বর্তমান যুগ ও সমাজের অবহেলিত বা নিপীড়িত সম্প্রদায়ের কয়েকটি নগ্ন ও বীভৎস রূপ তাঁর রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে টর্চার ও ডিজায়ার-এর উল্লেখ করা চলে। নরদেহধারী পশু নারীকে পীড়ন করার চেষ্টা করছে, নীরবে সকলে সে দৃশ্য দেখছে—প্রথমটিতে এই বিষয়বস্তুটিই শিল্পী ব্রুশের নানা টানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন এবং ইচ্ছাকৃত-ভাবে কয়েকস্থানে তীব্র লালরঙ ব্যবহার করে রচনাটির তাৎপর্য পরিস্ফুট করেছেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেক সময়ে নারীকে (বা স্ত্রীকে) কিভাবে পুরুষের (বা স্বামীর) কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়, সম্ভবত তারই অতি বাস্তব চিত্রটিই যেন দ্বিতীয়টিতে প্রতিফলিত হয়েছে। দুটি ছবিই সমবিমূর্ত জাতীয়, তবে ঠিক দুর্বোধ্য নয়। তবে শিল্পী ঠিক নিরাশাবাদী নন—তাঁরও বিশ্বাস এ যুগের অসভ্যতা একদিন শেষ হবে, এবং মানুষ আবার সভ্য সমাজে ফিরে আসবে—যেমন ইমার্জেন্স। অন্ধকার গুহার অভ্যন্তর থেকে নরনারী যেন নতুন আশা ও

স্ট্রাগল্ —ইশা মহম্মদ

আলোকের সন্ধানে বেরিয়ে আসছেন। বিষয়-বস্তু হিসাবে পীড়াদায়ক হলেও রচনা হিসাবে প্রথম দুটি ও শেষোক্তটি অনেকের ভাল লাগে। তবে শিল্পীর শূন্যস্থান সংস্থাপনা সবক্ষেত্রে সমীচীন হয়নি। কয়েক স্থানে ক্যানভাসের বিশেষ কোনও দিকে অযথা অধিক শূন্যস্থান খালি রেখে অন্য দিকে অল্প বা পরিমিত স্থানের মধ্যে তিনি বিষয়-বস্তু প্রকাশ করতে চেয়েছেন—ফলে শূন্যস্থান ও বিষয়বস্তুর মধ্যে যেন সব সময়ে ঠিক সমতাটুকু রক্ষিত হয়নি। তাহলেও শিল্পীর হাত পাকা, রঙ ও ব্রুশ চালনায় নিষ্ঠা ও নিয়মানুবর্তিতার পরিচয় পাওয়া যায়—অযথা তিনি কোনও পরীক্ষামূলক কাজ করেন নি। অন্যান্য রচনার মধ্যে মিউজিক অব এ ক্রুয়েল ডেথ ও বিশেষ করে দি মাদার উল্লেখযোগ্য।

*

একই গ্যালারীতে ইতিপূর্বে দু'জন শিল্পীর অনেক প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়েছে। কিন্তু সম্প্রতি আকাডেমির একটি গ্যালারীতে অনুষ্ঠিত শিল্পী মরিস শোলিম ও শ্রীমতী বাসন্তী সেনের প্রদর্শনীতে চিন্তাধারা ও শিল্পগত যে পার্থক্য দেখা গেল তা সহজে চোখে পড়ে না। মরিস শোলিম পেশায় ডাক্তার। বিদেশের বিভিন্ন স্থানে তিনি ঘুরেছেন ও সেখানকার নানা দৃশ্য তিনি তাঁর ক্যানভাসে রূপায়িত করেছেন। সুতরাং আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি চিত্রকলা-বিদ্যা শেখেন নি। বাসন্তী সেন শিল্পী জগদীশ রায়ের ছাত্রী ও ইতিপূর্বে কয়েকটি প্রদর্শনীরও আয়োজন করেছেন। বহির্জগতের বিভিন্ন বস্তু তথা দৃশ্য তিনি নিজ অনুভূতিমত প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। বলা বাহুল্য দুজনের অঙ্কনরীতি সম্পূর্ণ পৃথক।

ডাঃ মরিস শোলিমের ছবিগুলি প্রধানত দৃশ্যমূলক। দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্র ও উপকূলবর্তী শহর বা গ্রামের বিভিন্ন রূপ দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন ও তাদের অবিকল রূপই তিনি এঁকে গেছেন। অঙ্কনরীতির সরলতা ও পরিচ্ছন্নতা তাঁর ছবির প্রধান গুণ। বিষয়বস্তু অনুযায়ী তাঁর রঙের পাত সীমাবদ্ধ এবং যে রঙই তিনি ব্যবহার করেছেন তা অতি সহজভাবেই করেছেন, অর্থাৎ যত্নসহকারে যেন রঙের পরিষ্কার একটি প্রলেপ দিয়ে গেছেন। ছবিতে তাই কোথাও রঙের কোনও স্তরভেদ দেখা যায় না—বাস্তবতার প্রতিলিপি হিসাবে ছবিগুলি কয়েকজনের ভাল লাগে। শেলটজাতীয় নীলরঙ ব্যবহার করে শিল্পী অধিকাংশ স্থলে সমুদ্রের রূপ বর্ণনা করেছেন এবং সেই সঙ্গে শিল্পীর পরিপ্রেক্ষিতবোধ প্রায় প্রত্যেক ছবিতেই আশানুরূপ আবেষ্টনীর সৃষ্টি করেছে। এই প্রসঙ্গে দি ব্রাউন সেল ও অমরেলোনী উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে প্রথমটির ক্রমঅপসৃয়মান ইমারত শ্রেণীর পরিপ্রেক্ষিতে বিস্তীর্ণ নীল সমুদ্রের বুকে ভাসমান একটি নৌকা সকলের চোখে পড়ে যায়। আরও একটি ছবির নাম করা যায়—আওয়ার ভিলেজ। অপরাপর ছবির মধ্যে দি আর্চ অনেকের ভাল লাগে।

শ্রীমতী বাসন্তী সেনের রচনায় প্রথমেই চোখে পড়ে তাঁর রঙ নির্বাচন ও রঙ ব্যবহার রীতি। তাঁর রঙের পাত উজ্জ্বল, বিশেষ করে লাল রঙ সুকৌশলে ব্যবহার করে তিনি

NIVEA
creme

স্মল টাউন সেল —ডাঃ মরিস শোলম

সফললাভ করেছেন। কয়েকটি রঙভরা রেখার অবলীলাক্রমে ব্যবহার করে তিনি সুন্দর পরিবেশের সৃষ্টি করেছেন—যেমন আর্ট সানসেট। সূর্যাস্তের শেষ রশ্মিজাল যেন লতায় ও পাতায়, গাছে ও ফুলে, স্থলে ও জলে আবীরের রক্তরাগ ছড়িয়ে দিয়েছে। বস্তুত যেন সুখ্যাত নিসর্গ শিল্পী—আধুনিক রীতিতে আঁকা এ জাতীয় কয়েকটি ছবি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই প্রসঙ্গে এনচ্যানটেড ফরেস্ট-এর নাম করা চলে। এখানে শিল্পী প্রধানত নীল, সবুজ ও হলুদ রঙ ব্যবহার করে অরণ্যের স্নিগ্ধ রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। দু-একটি স্টিল লাইফ ছাড়া অন্যগুলি ইমপ্রেশনিস্ট প্রথায় আঁকা, যেমন বোকে অব ফ্লাওয়ারস ও সং ইন গ্রীন। শিল্পীর মহৎপ্রচেষ্টাগুলি সকলের মনে রেখাপাত করতে পারেনি। এগুলির পরিকল্পনা আশানুরূপ নয়, অঙ্কনরীতিও দুর্বল, ফলে এ শ্রেণীর ছবির অপূর্ণতার সহজেই ধরা পড়ে।

⁂

শ্রীমতী মৈত্রেয়ী চ্যাটার্জী অ্যাকেডেমি গ্যালারীতে তাঁর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। শিল্পী আনুষ্ঠানিকভাবে শিল্পবিদ্যা শেখেন নি, তবে শিল্পের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল তাই তিনি পরে শিল্পী বিবেক সাহার কাছে শিক্ষালাভ করেন। শিল্পী সঙ্গীত-চর্চাও করে থাকেন। সাধারণ বাঙালী গৃহবধূ হয়ে সংসারের দৈনন্দিন যাবতীয় কাজ করার পরেও যে তিনি এক সঙ্গে নিয়মিতভাবে চিত্র ও সঙ্গীতকলার চর্চা করেন তা থেকে তাঁর শিল্পপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রদর্শনীতে কালি ও কালি-কলমে আঁকা ২৫টি স্কেচ দেখা যায়। শিল্পীর বিভিন্ন স্কেচ দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তিনি প্রাথমিক অঙ্কনবিদ্যাটুকু ভালভাবে আয়ত্ত করেছেন। তাঁর ড্রয়িং অধিকাংশস্থলেই যথাযথরূপে রেখা দৃঢ় ও বলিষ্ঠ। সবচেয়ে বড় কথা তিনি অল্প রেখার মধ্য দিয়ে বক্তব্যটুকু প্রকাশ করতে পারেন। বস্তুত কয়েকটি স্কেচ দেখে মনে হয় না যে তিনি শখের শিল্পী। তাঁর এক-একটি রেখার টান যেন এক-একটি সংকেত, এবং মাত্র কয়েকটি সংকেতের মধ্য দিয়েই তিনি তাঁর বক্তব্য ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন ইন এ প্যাডি ফিল্ড, তবলা লহরা, সিকিং এ মেলোডি ও বিশেষ করে মাদার উইথ চাইল্ড। স্কেচগুলির মধ্যে যেন সাবলীল একটি ছন্দের সুর বেজে ওঠে—যাঁরা স্কেচটি দেখেছেন তাঁদের কানে এ সুর বেজে উঠেছে সন্দেহ নেই। তবে শিল্পীর দু একটি স্কেচে ত্রুটিও দেখা যায়—যেমন টেস্ট অব ওয়াটার। কলসটি অপেক্ষাকৃত বড় করে আঁকার জন্য স্কেচটি দুর্বল হয়ে গেছে। কালিকলমের স্কেচের মধ্যে বেসিক প্রবলেম মন্দ লাগে না।

প্রয়াস হিসাবে উল্লেখ্য হলেও গান্ধীজী ও কস্তুরবার ছবির মধ্যে শিল্পী আকৃতিগত সাদৃশ্য ঠিক মত ফোটাতে পারেন নি। অপরাপর স্কেচের মধ্যে এ ফেস ও মাই ফাদার-এর নাম করা যায়।

⁂

অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে সম্প্রতি শিল্পী অরুণ দত্ত ও শ্রীমতী শানু লাহিড়ী তাঁদের প্রদর্শনীর আয়োজন করেন।

অরুণ দত্ত কলকাতা সরকারী আর্ট কলেজে শিক্ষা শেষ করেন ও ইতিপূর্বে কলকাতা ও অন্যান্য স্থানে কয়েকটি প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করেন। অভাব ও অভিযোগ, অনিশ্চয়তা ও অসন্তোষ, দুর্নীতি, অত্যাচার ও সংগ্রাম—সমকালীন সমাজদেহে বুঝি আজ এই জাতীয় বিস্ফোরকগুলি নানাভাবে এক ঘৃণ্য পরিবেশের সৃষ্টি করেছে এবং শিল্পীও যেন রঙ ও তুলির মধ্য দিয়ে বর্তমান সমাজের এই কদর্য, বাস্তব রূপ প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। অরুণ দত্তের প্রদর্শনী দেখে সকলেই সেই ধারণা পোষণ করবেন। স্কেচ জাতীয় রচনাগুলি দেখে মনে হয় শিল্পী যেন সমগ্র মানবজাতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন ও সভ্য ও সামাজিক মানুষকে আদিম গুহাবাসী বা ক্রুর ও লোভী জন্তুবিশেষে পরিণত করেছেন। যেমন, এ ম্যান অব দি কামিং সেঞ্চুরি। জটিল, রেখাজাল মুখের স্কেচটি দেখে মনে হয় আধুনিক যুগের মানুষ বুঝি আবার তার পুরোনো গুহার অন্ধকারে ফিরে যেতে চায়। একটি ভল্লুক তার শিকারের আশায় লুব্ধদৃষ্টিতে চেয়ে আছে—নাম এগজিস্টিং সোসাইটি। আধুনিক সমাজে নানা গলদ আছে সন্দেহ নেই, তবে সে জন্য সারা সমাজকে ক্রুর ও নিষ্ঠুর জন্তুর পর্যায়ে ফেলা সমীচীন কিনা তা বিচার্য। তাছাড়া আধুনিক সমাজের পঙ্কিল রূপকে কোন

ইন এ প্যাডি ফিল্ড —মৈত্রেয়ী চ্যাটার্জী

অমল দত্ত

১৯৫৩ সালে রেঙ্গুনে দেখেছিলাম—ছোট্ট সাজানো শহরটার সারা মুখ জাপানী বোমার ঘায়ে দগদগে। সেই সঙ্গে সারা বর্মাবাসীর মন জুড়ে জাপানীদের সম্পর্কে কি সুতীব্র ঘৃণা! এর আঁচ আমার মনেও সেদিন লেগেছিল। পরের বছর ম্যানিলায়, এশিয়ান গেমসেও (১৯৫৪) দেখেছি, আমাদের ক্যাম্প থেকে মাইল তিনেক দূরে, ধূ ধূ মাঠের মাঝখানে, ৩০০ জন জাপানী অ্যাথলীটকে কড়া মিলিটারি পাহারায় নিঃসঙ্গ এক বাড়ীতে থাকতে। পাছে রাস্তায় কেউ আক্রমণ করে, তাই সব সময় তাদের বাসের সঙ্গে ছিল মিলিটারী পাহারা। এহেন সর্বজনধিকৃত জাপানীরা একটার পর একটা ইভেন্ট জিতে, সোনার মেডেল গলায় দুলিয়ে, কখন যে আমার মত অনেকেরই মন জয় করে নিয়েছে, তা টের পাইনি। টের পেলাম, সশ্রদ্ধ কণ্ঠে এক জাপানী ম্যানেজারকে যখন দুম করে প্রশ্ন করে বসলাম 'এত বড় যুদ্ধের ধাক্কা শুকোতে না শুকোতে, আপনারা স্পোর্টসে এত উন্নতি করলেন কি করে?'

জাপানী ভদ্রলোক খুব আস্তে আস্তে বললেন, 'যুদ্ধে বহু লোকক্ষয়ের ফলে যোগ্য স্পোর্টসম্যানের অভাব অন্যান্য যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত দেশগুলোর মত আমাদের দেশেও দেখা দিয়েছিল। আমরা নজর দিলাম স্কুলের দিকে। যেখান থেকে ভাবীকালের সুযোগ্য স্পোর্টসম্যান বেরিয়ে আসবে। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত খেলায় বা অ্যাথলেটিকসে কোন রকম উৎসাহ না দিয়ে, স্কুলে জিমন্যাস্টিকস্ বাধ্যতামূলক করা হল। ভবিষ্যতের বড় স্পোর্টসম্যান হবার জন্য যে উপযুক্ত শারীরিক প্রস্তুতির দরকার তার এই গোড়াটুকু চালু গেলে, আর ফিরে আসে না বলেই, ম্যাট্রিকেও এতে পাশ করতে হবে বলে আমরা নিয়ম করলাম। ১৫।১৬ বছর বয়স হলে, যার যেদিকে প্রতিভা বা ইচ্ছা তাকে স্পোর্টসের সেইদিকে শিক্ষার সুযোগ দেওয়া হল। আজকের সাফল্য এরই পরিণতি। আশা রাখি আমরা আরও উন্নতি করব।'

১৯৬০, '৬৪, '৬৮-এর অলিম্পিকে জিমন্যাস্টিকসে পুরুষদের দলগত চ্যাম্পিয়ান হিসেবেই শুধু নয়, গত বছর পশ্চিম জার্মানীর ডার্টমুন্ডে বিশ্ব জিমন্যাস্টিকসে সোভিয়েট রাশিয়াকে হারিয়ে জাপান যখন পুরুষদের একক এবং দলগত চ্যাম্পিয়ান হল, তখন আমার সেই জাপানী ম্যানেজারের মুখটাই বারে বারে মনে পড়ে। কিন্তু এর চেয়েও আমার কাছে দুটো বড় খবর (১) ১৯৫৪-য় ম্যানিলায় ভারত ৩-০ গোলে ফুটবলে জাপানকে হারিয়েছে। (২) এত বড় জন-অধ্যুষিত দেশ হয়েও, ভারত যেখানে ১৯৬৮ প্রি-অলিম্পিকে ফুটবলে টিম তৈরী করতে পারেনি, জাপান সেখানে মেক্সিকো অলিম্পিকে ফুটবলে তৃতীয় স্থান অধিকার করে এশিয়ার প্রথম দেশ-রূপে অলিম্পিক ফুটবলে পদক আনল।

জিমন্যাস্টিকসের জন্ম প্রাচীন গ্রীসে। গ্রীক শব্দ 'Gymnazein' বাঙলায় যার মানে 'উলঙ্গ হয়ে ব্যায়াম করা' থেকেই 'জিমন্যাস্টিকস' কথাটির উৎপত্তি। সেদিন প্রাচীন গ্রীসের সর্বত্র জিমন্যাসিয়ামের যেমন ছিল ছড়াছড়ি, তেমনি ছাত্রাবস্থায় গ্রীসবাসীর কাছে এ শেখা ছিল পবিত্র এবং অবশ্য কর্তব্য। তারপর পৃথিবীর অনেক সভ্যতা পেরিয়ে, জিমন্যাস্টিকস সেদিনের তুলনায় আলাদা একটা রূপ নিয়েছে। কিন্তু বাঙলা দেশে সম্পূর্ণ জিমন্যাসিয়াম না থাকায়, জিমন্যাস্টিক একদিকে যেমন জনপ্রিয় হতে পারেনি, তেমনি অন্যদিকে এ সম্পর্কে লোকের ধারণাও খুবই অস্পষ্ট। পাড়ায় পাড়ায় গজিয়ে ওঠা 'বডি বিল্ডিং' ক্লাবের সদস্যদের 'মাসলস পোজিং' অথবা সার্কাস পার্টির নানান খেলা দেখেও, অনেকে আবার এ বিষয়ে ভুল ধারণা পোষণ করেন।

বস্তুতঃ ছ'টি বাধ্যতামূলক ব্যায়াম নিয়ে আজকের জিমন্যাস্টিকস তৈরী হয়েছে। এই ছটি হল:—ফ্লোর এক্সারসাইজ, পমেল বা সাইড হর্স, লঙ হর্স, প্যারালাল বার, রোমান রিং, এবং হরাইজেন্টল বার। এবং এই ছ'টি ছাড়া অতিরিক্ত হিসেবে আছে 'অল অ্যারাউন্ড' এবং প্রদর্শনী ব্যায়াম হিসেবে ট্রামপলিনের ব্যবহার করতে দেওয়া হয়।

এ বিষয়ে ফুটবলারের বিশেষ নজর

মনে রাখা দরকার যে উপযুক্ত শিক্ষকের অধীনে অনুশীলন না করলে, এতে যেমন দারুণ শারীরিক আঘাতের সম্ভাবনা রয়েছে, যা জীবনভোর ফুটবলারকে আকেজো করে দিতে পারে তেমনি বেশ ধরে দীর্ঘদিন সাধনা না করলে এই ছ'টি বিষয়ে পাকা পোক্ত হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। এ একদিকে যেমন ফুটবলারের শরীরে শক্তি এবং চটপটে ভাবকে অনেকটা

জন্মের সময় শারার ওজন
ছিল খুবই কম।
অন্য এক বেবি-ফুড
ছাড়িয়ে ওকে আমূলস্প্রে
খাওয়ানো শুরু হয়।

এখন ওকে দেখুন !

"আমূলস্প্রে খাওয়াবার পর থেকেই ওর ওজন বাড়ছে।
শরীরেরও উন্নতি হচ্ছে চমৎকার"—
আনন্দে বলেন শ্রী লাইরাস গাজদার, ১ মাস বয়স্ক শারার বাবা।

আপনার বাচ্চা প্রথম বছরেই সবচেয়ে তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে। এই সময়ের মধ্যে ওর জন্মের ওজনটা তিনগুণ বেড়ে যাওয়া উচিত। আমূলস্প্রে'তে যে বাড়তি প্রোটিন আছে তা' আপনার বাচ্চার শরীর দ্রুত পুষ্ট করে তুলবে। আমূলস্প্রে তৈরী হচ্ছে উন্নতধরণের স্প্রে-ড্রাইং পদ্ধতিতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমস্ত বেবি-ফুড তৈরীতে এখন এই পদ্ধতিই ব্যবহার করা হচ্ছে। স্প্রে-ড্রাইং পদ্ধতিতে অপেক্ষাকৃত অল্প তাপে দুধটা শুখিয়ে নেওয়া হবে। তারফলে এর প্রোটিনেরগুণ সংরক্ষিত থাকবে আরও ভালভাবে। আমূলস্প্রে খুব ভাল এক সুষম খাবার। এতে আছে ভিটামিন, কার্বোহাইড্রেট, খনিজপদার্থ,—এক কথায় দ্রুত সুস্থ সবল হয়ে বেড়ে উঠতে আপনার বাচ্চার যা-যা দরকার সবই আছে আমূলস্প্রে'তে। হাজার হাজার মায়েরা তাঁদের বাচ্চাদের জন্মের একেবারে প্রথম সপ্তাহ থেকেই বুকের-দুধের বিকল্প হিসাবে বা এক পরিপূরক খাবার হিসাবে আমূলস্প্রে খাওয়াচ্ছেন। আর তাই বাজারে বেরুবার মাত্র দু বছরের মধ্যেই ভারতের বেবি-ফুডগুলোর মধ্যে আমূলস্প্রে-ই বিক্রী হচ্ছে সবচেয়ে বেশি।

আমূলস্প্রে

মায়ের দুধের এক চমৎকার বিকল্প

বাড়ায় তেমনি সেই সঙ্গে তৈরী করে সারা শরীরের ভেতর এক অপূর্ব 'সামঞ্জস্য বোধ' বা 'বডি ব্যালান্স' যা তীব্র গতির এবং দৈহিক সংঘর্ষের এই ফুটবল খেলায় ফুটবলারের প্রতি মুহূর্তেই দরকার।

ফ্লোর এক্সারসাইজ :—

এই ব্যায়ামের আগে ফুটবলারকে দুটো বিষয়ে বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হবে। (১) অনুশীলনের সময়ে এ ব্যায়ামে সুদক্ষ না হওয়া পর্যন্ত সর্বদা ম্যাটের বা গদির ওপর অনুশীলন। ম্যাট বা গদির মাপ কমপক্ষে ৫ ফুট × ৫ ফুট হওয়া দরকার। নারকেলের ছোবড়া, খড় অথবা কাঠের ভুষি দিয়ে গদি তৈরী অল্প পয়সাতেই সম্ভব। কমপক্ষে ৫ ইঞ্চি পুরু হলেই চলবে। এর অভাবে ঝুরো মিহি বালি অথবা পুকুরে কিংবা নদীর জলেও অভ্যাস করা চলে।

(১) পিকক :—দু হাতের তালু ম্যাটের ওপর সমানভাবে থাকবে। দু হাতের দূরত্ব এক হাত। কনুই ভাঙবে না। প্রথম প্রথম দুটো পা এক নম্বর ছবির মত দেওয়ালে ভর দিয়ে রাখতে হয়। তারপর আস্তে আস্তে পা দেওয়াল থেকে সরিয়ে নেওয়া অভ্যাস করতে হবে। স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারবার পর হাত দিয়ে হাঁটার অভ্যাস করা যেতে পারে।
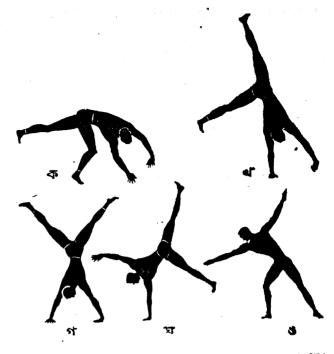
(২) কার্ট হুইল :—২ নম্বর ছবির ফিগারগুলো করবার সময় চাকার কথা মনে পড়ে। তাই একে বাংলায় চাকাচলা বলা হয়।

(৩) রাউন্ড অফ :—৩ নম্বর ফিগার করবার আগে একটু ছুটে আসতে হবে। তারপর ক, খ, গ, ঘ, ঙ এবং চ'এর মত পরপর করবার চেষ্টা কর।

(৪) ফরোয়ার্ড হ্যাণ্ড স্প্রিং :—চার নম্বর ফিগার করবার আগে একটু ছুটে আসতে হবে, এবং সেই সঙ্গে দু হাত কনুই না ভেঙে আকাশে উঠবে এবং সামনের পা (ক) এর মত বুকের দিকে উঠবে। (খ) এবং (গ) এর সময় কনুই অল্প ভাঙবে এবং শরীরকে সম্পূর্ণ উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দেবার জন্য (ঘ, ঙ, চ) ঊর্দ্ধাংশের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করতে হবে।
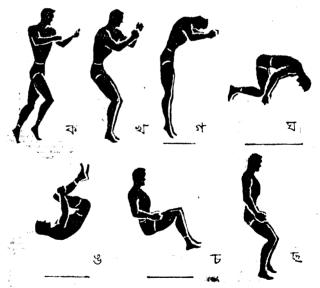
(৭) ফ্রণ্ট সামারসল্ট :—এ ফিগার করবার আগে, লাফানো অবস্থায় দু হাঁটু ভেঙে বুকের দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা কর। যতক্ষণ না পর্যন্ত নিজের কাঁধের সমান উচ্চতায় ঐ অবস্থায় না উঠতে পারছ, কিছুতেই এ ফিগার করার চেষ্টা করবে না। (ক) এর আগে তীব্র গতিতে কিছুটা ছুটে এস। (খ) এবং (গ) দু পায়ের ওপর সমান জোর দিয়ে (ঘ), (ঙ) এবং (চ) এর মত হয়ে শূন্যে ঘুরে যাও। শরীরের ঊর্দ্ধাংশকে ঘোরাবার জন্য দু হাতের কনুই ভেঙে কাঁধ থেকে একটু অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। এবং শূন্যে ঘোরবার সময় (ঘ) এর মত দু হাঁটু বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরতে হবে।
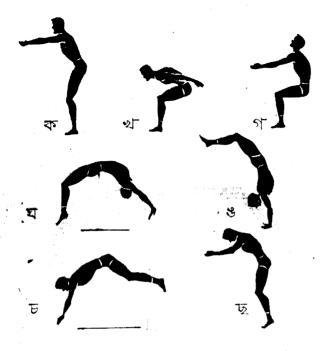
(৬) ব্যাক হ্যাণ্ড স্প্রিং:—এ ফিগার চার নম্বর ফিগারেরই পাল্টা। আরম্ভে (ক) অল্প পা ফাঁক করে, হাত দুটো বুকের সিধেসিধি তুলে, হাঁটু অল্প ভেঙে দাঁড়াও। (খ) এবং (গ) তে শরীরকে পিছনে ঘোরাবার আগে সমস্ত শক্তিকে পায়ের দিকে কেন্দ্রীভূত করতে দেখা যাচ্ছে। ঘ, ঙ, চ এবং শূন্যে ঘুরে আবার মাটিতে ফিরে আসবার ছবিটাই দেখানো হচ্ছে।

(৮) ব্যাক সমারসল্ট:—এ ফিগার ৭ নম্বরের পাল্টা। এতেও যতক্ষণ না পর্যন্ত কাঁধের সমান উচ্চতায় হাঁটু বুকের দিকে নিয়ে লাফান না যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এ ফিগার চেষ্টা করাটাও মারাত্মক বিপদের।

(৫) স্ন্যাপ-আপ:—এ ফিগারের শুরুতে (ক) দু হাত মাথার পিছনে এবং দু পা পিছনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। খ, গ, ঘ, ঙ এবং চ-তে দেখানো হচ্ছে (ক) এর অবস্থা থেকে স্রেফ কাঁধ এবং কোমরের ওপর ঝাঁকুনি দিয়ে মাটিতে দাঁড়ানো হচ্ছে।

॥ ৭ ॥

সেই আমলে আর একজন অধ্যাপক ছিলেন ভূপেন সান্যাল। খুব নিষ্ঠাবান সাত্ত্বিক পুরুষ। তাঁর মতের সঙ্গে অনৈক্য থাকলেও কি করে যে তিনি আশ্রমের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন তা বলতে পারিনে। স্বপাকে খেতেন। একটি ডাল রাঁধতেন, তার মধ্যে সবরকম তরকারী ও একটু গাওয়া ঘি দিয়ে বসিয়ে দিতেন। এই ছিল তাঁর প্রতিদিনের আহার্য। তাঁর সেই ডালটি যে কি সুস্বাদু হোত, আমি তাঁরই ডাল খেতে খুব ভালবাসতুম। ছোটখাটো পাতলা মানুষটি একজোড়া খড়ম পায়ে দিয়ে একটা ঘটি হাতে নিয়ে শালবীথি পার হয়ে আমাদের বাড়ির দিকে আসছেন এখনও চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। প্রমথনাথের মত আমি অঙ্ককে বড় ভয় পেতাম। ভূপেনবাবুর কাছে কিছুদিন শিখে টাকা আনা পাইয়ের হিসাব একটু মাথায় ঢুকল। আমি কোনো বিদ্যালয়ে পড়তে যাব না তা জানতেন তাই ঘরকন্না করতে গেলে যতটুকু ভাগ বিয়োগ ও টাকা-পয়সার হিসাব জানা দরকার সেইটুকু যাতে শিখতে পারি তার চেষ্টা করতেন। ভূপেনবাবুর চেষ্টায় যেটুকু শিখেছি একরকম করে কাজ চলে যায়, তবে এখনও চাকরদের কাছ থেকে হিসাব না নিতে পারলে খুশী হই।

সন্তোষদার বাবাকে আমরা জ্যাঠামশায় বলতুম। জ্যাঠামশায় মারা যেতে বাবা জ্যাঠাইমাদের শান্তিনিকেতনে নিজের কাছে নিয়ে এলেন। সন্তোষদা ছাড়া এখন ছেলে-মেয়েরা সবাই ছোট। বাবা যদি না নিয়ে আসতেন জ্যাঠাইমা খুবই আতান্তরে পড়তেন। প্রথমটা ওঁরা এসে অনেক দিন পর্যন্ত দেহলীর বাড়িতে ছিলেন তারপরে নিজেদের বাড়ি হতে সেখানে উঠে গেলেন। ওঁরা শেষ অবধি শান্তিনিকেতনে রয়ে গেলেন। জ্যাঠাইমা ঐখানেই মারা যান। বেচারি অনেক দুঃখকষ্ট ভোগ করে গেছেন। তাঁর জীবিতকালে তিন ছেলে ও তিন মেয়েকে হারান। তাদের কথা পরে বলছি। সন্তোষদার রমা নামে যে বোন (নুটু বলে বেশী পরিচিত) তার ভাল গানের গলা ছিল। দিনুর কাছে তার গানের শিক্ষা। অভিনয়ের দলের সঙ্গে অনেক জায়গায় সে গেছে, সে ছিল প্রধান গায়িকা ও দিনুর প্রিয় ছাত্রী।

সন্তোষদা দাদার সঙ্গে আমেরিকায় গিয়েছিলেন সে কথা আগে বলেছি। তিনি গোষ্ঠবিদ্যা (Dairy) শিখে এসে শান্তি-নিকেতনে কয়েকটি গরু কিনে ছোটখাটো dairy-র কাজ আরম্ভ করে দিলেন। তখন ওখানে দুধের বড় কষ্ট ছিল, সেই জন্য বাবা সন্তোষদাকে dairy-র কাজ শিখতে পাঠিয়ে-ছিলেন যাতে ছাত্ররা খাঁটি দুধ খেতে পায়। কিন্তু শান্তিনিকেতনের অনুর্বর মাঠে ঘাস বেশী হয় না তাই dairy-র পক্ষে ওটা উপযুক্ত স্থান নয়। ওখানে এলে গরুর দুধ অনেক কমে যেত। তবু সন্তোষদা অনেক-দিন অবধি dairy চালিয়ে ছিলেন। তাঁর অবর্তমানে তাঁর যে হিন্দুস্থানী গয়লা ছিল সে কিনে নিয়ে কিছুদিন চালিয়েছিল তারপরে সব বেচে দিয়ে দেশে চলে গেল।

সন্তোষদার উপর ভার ছিল নূতন কোনো অতিথি এলে তাদের সব ঘুরে দেখানো ও তাঁদের থাকার ব্যবস্থাদি করা। তখন সন্তোষদার জন্য আশ্রমের আতিথ্যের খুব সুনাম ছিল। কেউ অসময়ে এসে পড়লে নিজের বাড়িতে রেখে দিতেন। সন্তোষদা বাড়ির কাছাকাছি কিছু জমি কিনেছিলেন, তাতে চিনে বাদাম, ছোলা ও কিছু কিছু তরিতরকারি হোত। বেশীর ভাগ ছিল ডাঙ্গা জমি কিছু ধানের জমি

বাঁধের কাছে ছিল। উঠোনে ধানের গোলা ছিল, বাড়ির বাইরে খড়ের স্তূপ জমা হয়ে যেত। সাঁওতাল মাঝিরা খড়ের গোছা ধরে আছড়াচ্ছে এই সবের জন্যে সন্তোষদার বাড়িতে গেলে পল্লীগ্রামের একটি গৃহস্থের বাড়ি বলে মনে হোত। তাঁর বাড়িতে ছিল আমার সবচেয়ে যাওয়া আসা। সন্তোষদার তিন বোন অবিবাহিতা ছিল তারা ছিল আমার সঙ্গিনী। বাড়ির সামনে বড় একটি জাম গাছ ছিল, তাতে সন্তোষদা একটি দোলনা খাটিয়ে দিয়েছিলেন। সন্তোষদার যে বোনের বিয়ে হয়েছিল তারা যখন আসত তাদের ছেলেমেয়েতে বাড়ি ভরে যেত। তারা এলে আমাদের দলটি আরো ভারী হোত। সন্তোষদার মা জ্যাঠাইমার ছিল অতি অনাবিল শান্ত স্বভাব। আমরা ছোটরা তাঁকে ভালবাসতুম তাঁর কাছে গল্প শোনবার জন্য। জ্যাঠামশায় ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, তাঁর সঙ্গে জ্যাঠাইমা নানা জায়গায় ঘুরেছেন। বেশীর ভাগ সেই সব জায়গার গল্প করতেন। কত শাল মহুয়ার বনের মধ্য দিয়ে চলেছেন, সন্ধ্যে হয় হয়, পাল্কীর মধ্যে বসে গা ছম্‌ছম্‌ করছে। সন্ধ্যের আগে পৌঁছোতে হবে। হাজারীবাগ কোডারমার ঐ দিকে, তখন বাঘের ভয় ছিল। সন্তোষদাদের পরিবারের সঙ্গে এত বেশী ঘনিষ্ঠতা ছিল যে তাঁদের কথা বিশেষভাবে না লিখে থাকতে পারলুম না। আর কারো জন্য লাগবে বলে নয় নিজের তৃপ্তিসাধনের জন্য তাঁদের চিত্র যতটুকু পেরেছি এঁকেছি। শ্রীনিকেতনে যখন "শিক্ষাসত্র" হোল সন্তোষদা তার ভার নিলেন। সেই সময়ে আমাদের প্রাক্তন ছাত্র গৌরগোপাল ঘোষ শ্রীনিকেতনের কর্তা ছিলেন। সন্তোষ মিত্র dairy তৈরিকে বইলেন। এবার dairy-তে প্রচুর দুধ হতে লাগল এবং সেই দুধ শান্তি-নিকেতনে ছাত্রদের জন্য পাঠানো হোত। এখনও সেই নিয়ম আছে। তবে তাতে ছাত্রদের চাহিদা মেটে না বাইরের থেকেও দুধ নিতে হয়।

কালীমোহন ঘোষের কথা বলা হয়নি। তিনি শ্রীনিকেতনের সরুল গ্রামের আশে-পাশে পল্লী সংস্কারের কাজে লেগে গেলেন। গ্রামের অল্প বয়সের যুবকদের দিয়ে রাস্তাঘাট তৈরী ও পুষ্করিণী উদ্ধার ইত্যাদি কাজে লাগিয়ে দিলেন। ক্রমশ পল্লী উন্নয়নের কাজে গ্রামের লোকদের উৎসাহ দেখা গেল এবং কালীমোহনবাবুর নেতৃত্বে গ্রামের শ্রী ফিরে গেল। ছেলেদের পড়াশুনোর জন্যে দু'একটা প্রাইমারী স্কুল খুললেন, ছেলেদের যাতে শরীরের উন্নতি হয় তার জন্যে খেলাধুলোরও প্রবর্তন করা হোল। কয়েক বছর পরে গ্রামের ছেলেদের দিয়ে ব্রতীবালকের দল গঠন হল।

গ্রামের মেয়েদের সেলাই শেখাতেন নন্দীবালা রায়। তিনি শ্রীনিকেতনে তাঁর কন্যা লতিকাকে নিয়ে বাস করতেন। লতিকা শান্তিনিকেতনে শ্রীভবনে থেকে পড়েছেন। শান্তিনিকেতনে থেকে বি-এ পাশ করে এখন বোলপুরে মেয়েদের হাইস্কুলে শিক্ষকতা করছেন। তার ছেলেমেয়ে সবাই আশ্রমে থেকে পড়াশুনো করেছে।

তখন গ্রামে প্রায় আগুন লাগত গ্রাম-বাসীদের অসাবধানতায়। সন্তোষদা তক্ষুনি ছেলের দল নিয়ে ছুটতেন আগুন নিবোতে। দূরের গ্রামে লাগলেও আগুনের হল্কা দেখে সেখানে চলে যেতেন এবং যাতে সমস্ত গ্রাম না পুড়ে যায় আশেপাশের খোড়ো চাল টেনে ফেলে দিতেন। কিন্তু গ্রামের লোকেদের অজ্ঞতার জন্য আগুন নিবোবার কাজে তাদের কাছ থেকে সাহায্য চেয়ে বাধা পেয়েছেন

বোলী। তারা শুধু এক জায়গায় জমা হয়ে "হায় হায়" করতেই ব্যস্ত। আগেকার মত এখন সেরকম আগুনে লাগতে দেখিনে। বিদ্যালয়ের সামনে এক সার লাল রং-এর বালতি সর্বদা টাঙ্গানো থাকত, আগুন নিবোতে যাবার সময় তারি এক-একটা হাতে নিয়ে ছেলেরা ছুটত, এসব ব্যবস্থা সন্তোষদা করেছিলেন। সন্তোষদা এক সময় ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন। কিন্তু একবার হাঁটু ভেঙ্গে যাওয়াতে ইদানীং আর খেলতে পারতেন না। ছেলেরা যাতে ভাল খেলোয়াড় তৈরী হয়ে ওঠে তার প্রতি তাঁর খুব মনোযোগ ছিল। তখন আমাদের ছাত্রদের মধ্যে কয়েকজন খুব ভাল খেলতেন এবং তাঁদের জন্যে আশ্রম থেকে যখনি কোথাও খেলতে গেছে সর্বদা জিতে এসেছে। তখনকার খেলোয়াড়দের মধ্যে বীরেন সেন, গৌর-গোপাল ঘোষ, ওসরোজ রায়চৌধুরী, এঁরা ছিলেন সেরা খেলোয়াড়। প্রত্যেক বুধবারে সন্তোষদা ছেলেদের বাঁধে স্নান করাতে নিয়ে যেতেন। সেখানে তারা খুব আনন্দ করে স্নান কোরত এবং সন্তোষদার কাছে সাঁতার শিখত।

সন্তোষদার আর দুটি ভাই ছিল ভোলা

সপরিবারে রবীন্দ্রনাথ
বাঁ দিক থেকে : মীরা দেবী, রথীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী, বেলা দেবী

আর সাব। তারা দুজনেই অল্পবয়সে মারা যায়। সবির মৃত্যুটা বড় দুঃখের। বেনারসে পড়তে গিয়েছিল। সেখান থেকে অসুস্থ শরীরে এল আসছিল। মাথার যন্ত্রণায় ছটফট করেছে, খুব সম্ভব ব্রেনে কিছু হয়েছিল। বাড়ির লোকে হাওড়াতে যখন আনতে গেলেন তখন দেখেন বেঞ্চির ওপর তার মৃতদেহ। সবির মৃত্যুটা তাই সকলের মনে খুব লেগেছিল। তার কয়েক বছর পরে ভোলা চলে গেল। জ্যাঠাইমা পর পর এই দুটি পুত্রশোক পেলেন। ভোলা যাবার পর ভয়ে ভয়ে জ্যাঠাইমার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি যে কি করে তাঁর সামনে দাঁড়াব কি বলব। গিয়ে দেখি তিনি পাথরের মূর্তির মত বসে আছেন। আমাকে কিছু বলতে হল না। তিনিই বললেন, "বোস, কেমন আছ?" তারপরে তো জ্যাঠাইমা আরো নিদারুণ শোক পেয়ে গেছেন সন্তোষদা ও তাঁর বোন নুটুর মৃত্যুতে। নুটুর আসল নাম রমা কিন্তু তার চেয়ে নুটু বললেই সবাই বেশী চিনত। সুরেন কর মশায়ের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। দুটি শিশুপুত্র জন্ম দিয়ে সে অকালে মারা যায়। নুটু দিনেন্দ্রনাথের ছাত্রী—ভাল গাইতে পারত। যখন যেখানে অভিনয় হয়েছে গানের দলে নুটু ছিল প্রধান গায়িকা।

সন্তোষদার সম্পর্কে কাকা হতেন শ্রীসুবোধ মজুমদার। তিনি আমার গৃহশিক্ষকরূপে আমাদের বাড়িতে থাকতেন। কিছুদিন পরে সুবোধবাবুর স্ত্রী তাঁর একটি ছোট মেয়েকে নিয়ে এলেন। আমার পড়বার ঘরে তাঁদের থাকতে দেওয়া হল। সন্তোষদার সম্পর্কে কাকীমা হতেন বলে আমিও তাঁকে কাকীমা বলে ডাকতুম। কাকীমার সঙ্গে অল্পদিনের মধ্যেই আলাপ জমে গেল। বেশীর ভাগ সময় ঐ ঘরে কাটাতুম। কাকীমার বাবা দিল্লীতে থাকতেন, তিনি সেখান থেকে কাকীমাদের জন্য ওখানকার সরু সরু ডালমুট ভাজা মস্ত বড় টিন ভর্তি করে পাঠাতেন। সেই প্রথম দিল্লীর ডালমুট ভাজা খেয়ে যে কিরকম ভাল লেগেছিল। যখন তখন মুঠো মুঠো খেতুম। আমার আজও কাকীমাদের কথা মনে হলে সেই ডালমুট খাওয়ার কথা মনে হয়। ছোটবেলার কত তুচ্ছ জিনিস মনে থেকে যায় অথচ তারপরের কত কি বিচিত্র ঘটনার কথা ভুলে গেছি।

একবার কিছুদিনের জন্য শান্তিনিকেতন থেকে বিদ্যালয় বন্ধ করে শিলাইদার কুঠিবাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। আমরা তখন পদ্মার উপর আমাদের "পদ্মা" বোটে বাস করছি। সেই সময় একটি দুর্ঘটনা ঘটে। বোটে সকলের জায়গা হবে না বলে সুবোধবাবু সস্ত্রীক কুঠিবাড়িতে ছিলেন, সেখান থেকে বোটে এসে আমাকে পড়িয়ে যেতেন। সুবোধবাবুর মেয়ে লতু বন্দুক দেখলে বড় ভয় পেত। তারপর শেষ দিনের যে ঘটনার কথা বলছিলুম বলি, লতু যে ঘরে বসেছিল একজন কর্মচারী বসে বন্দুক পরিষ্কার করছিলেন, কিন্তু তার মধ্যে একটা বন্দুক যে গুলিভরা ছিল তাঁর সে খেয়াল ছিল না। লতুকে ভয় দেখাবার জন্য যেই ট্রিগার টেনে দিয়েছেন, অমনি বেচারীর রক্তাক্ত দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। লতুর রক্তমাখা জামা-কাপড় কাকীমার হাতে দেখে শিউরে উঠেছি। লতু যাবার পর কাকীমাকে আমাদের বোটে নিয়ে আসা হল।

শান্তিনিকেতনে ঢোকবার প্রথম গেটের মাথার উপর মহর্ষির আমল থেকে স্বর্ণাক্ষরে লেখা তিনটি কথা "সত্যম্, শিবম্ অদ্বৈতম্

জঙ্গলজঙ্গল কোরত (বিশ্বভারতী যখন ভারত সরকারের কর্তৃত্বাধীনে এল) ত খন হঠাৎ দেখলাম তার মাঝখানে "শিবম্" কথাটা উড়ে গেছে। দেখে প্রথমটা আশ্চর্য লেগেছিল। তারপর মনে হোল কেউ বোধ হয় 'শিবম্' দেখে জটাধারী শিবের সংগে ভুল করে থাকবেন তাই ওটা ছেঁটে দিয়েছেন। বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ যখন এতে আপত্তি করেননি তখন নিশ্চয়ই এর একটা গূঢ় কারণ আছে। তারপর অনেক কিছুরই পরিবর্তন দেখলাম। প্রথম যখন ছাতিম-তলার পরিবর্তন দেখি তখন খুব খারাপ লেগেছিল। এখনকার ছাত্রছাত্রীরা সাজে পোশাকে কত বদলে গেছে। আগেকার ছাত্রছাত্রীদের দেখলে বোঝা যেত এরা শান্তিনিকেতনের ছেলেমেয়ে, তাদের সাজ পোশাকের মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। কোথায় সে শান্তিনিকেতনের খোলা মাঠ, খোলা প্রান্তর। এখন চারদিকে কেবল প্রকান্ড প্রকান্ড বাড়ি চোখকে পীড়া দেয়। বিশ্বভারতীর আজ টাকার অভাব নেই কিন্তু যখন বিশ্বভারতীর টাকা ছিল না তখন তার আদর্শ ছিল। আজ রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বভারতীকে' খুঁজে পাওয়া মুশকিল হয়ে পড়েছে।

যখন আইন পাশ করে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়রূপে স্বীকৃতি পেল তখন দাদা রথীন্দ্রনাথ হলেন তার প্রথম উপাচার্য। তাঁর সূক্ষ্ম কাজে হাত ছিল নিপুণ। তিনি শ্রীনিকেতনের অনেক উন্নতি সাধন করে-

ছিলেন। চামড়ার উপর বাটিকের কাজ তিনি প্রথম সৃষ্টি করেন। ফুলের ছবি এঁকে তাতে এত সুন্দর রং দিতেন যে দেখে মনে হোত যেন সত্যিকারের ফুল ফুটে আছে। শ্রীনিকেতনে নানারকম সুন্দর গড়নের ও রঙের চায়ের বাসন ও অন্যান্য জিনিস সন্তোষ ভঞ্জ মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে উৎপাদন হতে লাগল। শ্রীনিকেতন কুটির শিল্প শেখবার কেন্দ্র হয়ে উঠল। দূর থেকে গ্রামের মেয়েরাও শেখবার জন্য আসতে লাগল।

আমার স্মৃতিকথা শেষ করে বৌঠানের (প্রতিমা দেবী) হাতে দেব বলে আশা করেছিলুম। কিন্তু তিনি তার আগেই চলে গেলেন। আমার দুর্ভাগ্য আমার লেখা তাঁর হাতে পৌঁছে দিতে পারি নি। আমি যখনকার কথা লিখেছি কজন আর এখন আছেন যাঁদের সেই সময়ের কথা আমার লেখা পড়ে মনে পড়বে। বৌঠান আর আমি ছিলুম প্রায় সমবয়সী। আমরা একসঙ্গে শান্তিনিকেতনে ও শিলাইদায় বাস করেছি। তখনকার কথা পড়লে তিনি খুশী হতেন। বৌঠানের বিয়ের আগে ছবি গায়ে-হলুদের দিন তাঁকে দেখি গগনদাদের ছাতে দাঁড়িয়েছিলেন। নূতন শাড়ি গয়না পরে। কি সুন্দর যে দেখিয়েছিল তাঁকে, সেই ছবিটি কখনও ভুলব না। বৌঠান যখন আমাদের সংসারে নূতন বৌ হয়ে এলেন বাবা তাঁর হাতে এক গোছা চাবি দিয়ে বললেন, "তোমার হাতে এই চাবি রইল এখন থেকে তুমি এই সংসারের কর্ত্রী হয়ে চালাবে।" বাবা তাঁকে সেই যে কল্যাণী বধূ রূপে গ্রহণ করেছিলেন শেষ দিন অবধি তাঁকে সেই চোখে দেখেছেন। বৌঠানও তাঁকে আপন বাপের মত ভক্তি করতেন।

প্রতিমা দেবী।

বৌঠান যেদিন প্রথম শান্তিনিকেতনে এলেন ছেলেদের সেদিন বোধ হয় ফুটবল ম্যাচ খেলা ছিল। বৌঠান তাদের প্রত্যেকের হাতে একটি করে কমলালেবু দিলেন। তখনকার ছাত্রদের মধ্যে কেউ যদি এখনও থাকেন তাহলে তাঁরা নিশ্চয় নূতন বৌ-এর হাত থেকে কমলালেবু পাওয়ার কথা মনে রেখেছেন।

সমাপ্ত

[এই প্রবন্ধে প্রকাশিত অধিকাংশ ছবি, বিশেষত দুষ্প্রাপ্য পুরাতন প্রতিকৃতি শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদন থেকে প্রাপ্ত। শ্রীঅজয় দত্ত যত্নপূর্বক এগুলির প্রতিলিপি তুলে দিয়েছেন।]

সাম্য আর স্বাধীনতা

উথাল পাথালের যুগে। দু'দণ্ড কেউ কোথাও চুপ করতে চায় না অথবা চুপ করতে পারে না। গতিবেগে উদ্দাম মানবসমাজ ছুটে চলেছে। লক্ষ্য নিয়ে লক্ষ আলোচনা হয়, নিশানা নিয়ে শতসহস্র কথা, তবু অগ্রগতি বলতে আমরা যা বুঝি তার ফলাফল যেন সমাজকে আরও নানা প্যাঁচে পাকিয়ে তোলে। ধরুন মহিলা সমাজ সেই যে ইংলণ্ডের রাণী ভিক্টোরিয়ার যুগ থেকে হইহল্লা করে পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমেছে তার অনুবৃত্তি আজও থামে নি। সে খেলার গতিবেগ বা momentum সারা দুনিয়ার মেয়েদের গণ্ডীবদ্ধ জীবনকে মুক্তি দিয়েছিল। তার জের যেন আজ তালগোল পাকিয়ে তুলছে। তা থেকে প্রগতির প্রকৃত পরিচয় বেছে নেওয়া কষ্টকর। বন্ধনমুক্তির এই বেপরোয়া যাত্রায় ভারতীয় অবস্থা কিছু ভাল। কিন্তু পশ্চিমের সমাজ প্রায় পাগল হয়ে উঠেছে। শুনেছি সেখানে মনস্তত্ত্ববিদদের পসার বেড়েছে প্রায় মেয়ে মক্কেলের ঠেলায়। মুক্ত মেয়ে আর রান্নাঘরকে ঘিরে জীবন কাটাতে চায় না। এমন কি ছেলে মানুষ করার দায়িত্বকে পুরুষের সঙ্গে সাম্যের অন্তরায় মনে করে। একদিকে পাশ্চাত্য পুরুষ মনে করেন মেয়েদের দাবি করার আর কিছু নেই। সাধারণভাবে সমাজ ও শাসন থেকে প্রাপ্য যা কিছু ছিল তা তারা পেয়েছে। এখন তাদের নিজেদের সমান সুযোগের যোগ্য করে তোলা বই আর কিছুই চাইবার নেই।

ভোট দেবার অধিকার প্রায় সব দেশের মেয়েদের আছে। মেয়েরা কর্মক্ষেত্রে সমান সুযোগ পান। অন্ততঃ তাই পাবার বিধান, প্রয়োগ ক্ষেত্রে সব সময় সব সমান হয় না; যেমন সমান হয় না সব পুরুষের ক্ষেত্রেও। সমান পারিশ্রমিক দাবিও বহুদেশে প্রায় মেনে নেওয়া হয়েছে। মেয়ে জজ আছেন, পুলিস-এর নানা বিভাগে, আইন ব্যবসায়, কূটনীতি কোথায়ই বা মেয়ে নেই? আমাদের দেশে এ বিষয়ে আমরা টেক্কা দিয়েছি। আমাদের প্রধানমন্ত্রী মহিলা এবং মন্ত্রী পর্যায়, কূটনীতিতে, রাজ্যপাল পদে সর্বত্র বিশিষ্ট মহিলা বিরাজ করেছেন এবং করছেন।

পশ্চিমে নাকি গোল বেধেছে জীবনের মৌলিক ভিত্ত নিয়ে। রান্না না হয় গ্যাজেট সামলানো, পকেটে পয়সা থাকলে কেনাকাটায় সে সব দেশে অসুবিধা কম। কিন্তু ছেলে মানুষ করা? শিশুদের কোথাও পাঠিয়ে, অথবা ছোটদের জন্য গণ্ডা গণ্ডা স্কুল বানিয়ে স্বামী মাকে কিছু সুবিধা দিতে পারেন। সবটা তো সম্ভব নয়। মাকে সম্পূর্ণ দায়িত্ব থেকে মুক্ত করার ক্ষমতা স্বয়ং বিধাতারও নেই। আমাদের দেশে আর্থিক কারণে সন্তান জন্মের সম্বন্ধে সতর্ক হবার প্রচার চলেছে আর পশ্চিমের সম্পন্ন সংসারের শিক্ষিত মেয়ে সন্তান চায় না আর এক কারণে। কে নেবে জননীর কর্তব্যভার। পুরুষের সঙ্গে সাম্যের দায়ে সে ধরা পড়েছে অফিসের জালে!

হল্যাণ্ডে নাকি কিছুদিন আগে এক মহিলা প্রতিষ্ঠান ছিল যার নাম women 2000 অর্থাৎ তাঁরা অগ্রগামী মেয়ের দল। সম্প্রতি নাম পাল্টে তাঁরা হয়েছেন Action group man/woman অর্থাৎ লড়াই হবে সাম্যের পুরুষ বনাম নারী। আমস্টারডামের এই উৎসাহী সংগ্রামশীলারা বলছেন চিরাচরিত শ্রমবিভাগ, পুরুষ উপার্জন করবে আর নারী মহিমান্বিতা দাসী বই নয়, এ যুগে অচল। কিছু পুরুষ তাতে সহজেই সায় দিয়েছেন। তাঁরা ঘরের কাজ অনেকটা সামলে দিতে রাজী। কারণ একূল ওকূল দুকূল হারিয়ে তাঁরাই বা কোন কিনারায় ঠাঁই পাবেন? পারিবারিক জীবনের মাধুর্য, সন্তান পুরুষও চান। যে কোন শর্তে তাই তাঁরা রাজী।

Action group man/woman যখন এক সাংবাদিক সভা ডাকলেন তখন হলো বিপদ। প্রায় সব দেশের মতই সাংবাদিক সমাজ পুরুষ শাসিত। একটি মাত্র মহিলা সম্পাদিকা আছেন। তাঁর কাগজের নাম De Vrouw en haar Huis। অনুবাদ করলে পত্রিকার নামের মানে হয় নারী ও গৃহ, কিন্তু নারী বা গৃহের কিছুই সে কাগজে থাকে না। অন্যান্য কাগজে, এমন কি মহিলা পত্রিকায় মেয়েরা সাংবাদিকদের কাজ করেন বটে, কিন্তু সম্পাদনার ভার পুরুষের। দৈনিক সংবাদপত্রে ফ্যাসান বা মহিলাদের বিশেষ বিভাগে মেয়েরা কাজ করেন অন্যত্র তাঁদের সংখ্যা খুব কম। কাজেই action group নিয়ে তীব্র ও কঠিন সমালোচনা হয়েছিল। কেউ কেউ তো উপহাসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন, বলেছিলেন এ এক উদ্ভট খামখেয়ালীপনা মাত্র।

যাঁরা উপহাস করেননি তাঁদেরও সমর্থন ছিল না একেবারেই। ঘরের কাজ স্বামী কতটা করবেন আর স্ত্রী কতটা করবেন তা নিয়ে আবার আন্দোলন সভা-সমিতি করবার কি আছে? প্রত্যেক বিবাহিত পুরুষ বা নারীর সংসার বা পরিস্থিতি এক নয়। নিজের সুবিধা আর সুযোগ বুঝে চালাবার ব্যবস্থা [illegible] আছে?

অগ্রগামী গোষ্ঠী আবার স্কুল ইত্যাদিকে শাসিয়েছেন। বোর্ডিং স্কুলে ছেলে পাঠালেও তো ছেলেরা ছুটিতে বাড়ি আসবে। কর্মী-মা তখন বিপদে পড়েন। এমনভাবে স্কুলের সময় ঠিক করা হবে যাতে মায়ের উপর দায়িত্বের বোঝা কমে। দুপুরে খাবার ঘণ্টায় বাড়ি আসার ব্যবস্থা থাকবে না। হয় ছেলেমেয়ে স্কুলে খাবে অথবা সকালে তৈরী টিফিন বা জলখাবার যা কিছু থাকবে তা

বসে খাবার ব্যবস্থা থাকবে স্কুলেরই এক পাশে।

পশ্চিম দেশে বিবাহবিচ্ছেদের সংখ্যা এত বেশী যে তাঁদেরও এক গোষ্ঠী গড়া হয়েছে হল্যান্ডে। ৬৫,০০০ divorcee মহিলারা অনেকে মিলে এই সংসদ, নাম divortium! নিজেদের নানা সুবিধার ব্যবস্থা করাই উদ্দেশ্য। এখানে কিন্তু সাম্য নেই। প্রাক্তন স্বামীকে শাসন করার আয়োজন। খোরপোষ যা আদালত দেয় তা যথেষ্ট নয়। স্বতন্ত্রভাবে বাস করার জন্য এ ভাতা আরও বেশী হওয়া দরকার। আদালতই প্রাক্তন স্বামীর আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করেন বড্ড বেশী। স্বামীরা আবার পাষণ্ড। তাদের দুরাচারের সীমা নেই। বিচ্ছেদের পর কোথায় বেশ মোটারকম খোরপোষ দিয়ে এতদিন যার সঙ্গে ঘর করলেন তার সুখস্বাচ্ছন্দ্য দেখবে না দুদিন যেতেই সংসার পাতার শখ। জজসাহেব তখন নূতন সংসারের খরচ ইত্যাদি সব বিচার করতে বসেন। বিবাহ বিচ্ছেদী মেয়েদের এ সবে ঘোরতর আপত্তি। সাম্যের উপরন্তু সামান্য বাড়তিটুকুর দাবীতে তাঁরা মুখর। আচ্ছা, যদি কোন উপার্জনশীলার কাছে প্রাক্তন স্বামী খোরপোষ চাইতেন তবে কি তাকেও আমরা সাম্য আখ্যা দিতাম? [illegible] নয়।

এদিকে আবার ভাতার উপর আয়কর আছে। মেয়েরা তা দিতে নারাজ। এ আবার [illegible] এ তো প্রাক্তন ভালবাসার আর [illegible] সামান্য স্মৃতিমাত্র। এতেও [illegible] নয়। প্রাক্তন স্বামী ঠিক মত দেনা-পাওনা না দিলে আইন-আদালত আছে। [illegible] সে সব ঝামেলা করতে কামিনীরা [illegible]। তাঁরা বলেন বিচ্ছেদের পর স্বামী-দের নামে ধরে ভাতা আদায় করবে সরকার—inland revenue department! রাজ্যের [illegible] যেমন আসবে, স্বামীদের কাছ [illegible] খোরপোষের সংগ্রহ সে ভাবেই হবে। [illegible] পাবেন ঘরে বসে তাঁদের প্রাপ্য [illegible]। আরও বলছেন তাঁরা যে সন্তান [illegible] বিধবা হলে যদি সরকার পেনসন দেন, [illegible] বিচ্ছেদের পর অবলা মহিলাকেই বা [illegible] না কেন?

পরিশেষই যে এই সব দাবীর বিপক্ষে তা [illegible] মহিলাও অনেকে মনে করেন আধুনিক নারীসমাজ অযথা দাবির পর দাবি চালিয়ে চলেছে। অনেকে তো মনে করেন নানা অধিকার দাবি করে যে সব মহিলা সংগঠন আন্দোলন করে যাচ্ছে, এখন সে সব সংগঠন তুলে দেওয়া দরকার। নারী সংগঠনের কাজ এখন সমগ্রভাবে সমাজের উন্নতি। নারী হিসাবে আলাদা করে দাবি করবার এখন আর কিছু নেই। নারী হিসাবে দাবি না করে সমাজের অংশ হিসাবে সম্পূর্ণ সমাজের দায়িত্ব গ্রহণ করা দরকার। ট্রেড ইউনিয়নে মেয়েরা খুব কম আগ্রহশীল। পাশ্চাত্য দেশেও খুব কম মেয়ে ট্রেড ইউনিয়নের জন্য কিছু করেন। অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী মেয়েরা অনেক সময় বৃত্তি বা পেশাকে অল্প-দিনের ব্যবস্থা মনে করেন। বিবাহ ও গৃহস্থালির আগে দিনকতকের আয়োজন মাত্র।

ভিন্নমুখী চিন্তাধারার অস্তিত্ব সত্ত্বেও মহিলা সংগঠন-এর প্রয়োজন সম্বন্ধে সন্দেহ আমরা করি না। পশ্চিম দেশেও সংগঠন চলবে বহুকাল। তাঁরা একটু লক্ষ সম্বন্ধে নাম পাল্টেছেন বটে। emancipation বা মুক্তি নিয়ে প্রগতিপ্রাপ্ত মহিল মাথা ঘামান না। এখন প্রশ্ন integration বা সম্পূর্ণ হওয়া। এদেশেও আমরা দাবির ভাণ্ডার প্রায় সামলে এনেছি, এখন দাবী বা অধিকারের পর সার্থক হওয়ার পর্যায়। বিচ্ছেদের পর স্বামীর দেওয়া খোরপোষ কিভাবে আসবে তার অভাবনীয় সব পথ বের করা অথবা শিশুকে ঘরের বাইরে রেখে মায়ের মুক্ত জীবনের মহড়া আমাদের পথ নয়। বরং যে সুযোগ এসেছে তার সম্পূর্ণ ব্যবহার করার যোগ্যতা অর্জন করা আগে বেশী দরকার।

রাজনৈতিক স্বাধীনতার উত্তরপর্ব যেমন সংগঠন, নারীর প্রগতির বেলায়ও তাই। রেষারেষির প্রশ্ন পিছনে রয়েছে। সামনে সমন্বয় সাধনার ভবিষ্যৎ। জীবনের যা মৌলিক ব্যবস্থা তা নিয়ে আপত্তি পেশ করে সমন্বয় হয় না। বিক্ষোভ সৃষ্টি হতে পারে। শ্রম বিভাগের বিপর্যয় ঘটতে পারে। সমাজের সুবিধা হবে না। সে বিপর্যয়ে মহিলারা ঐ মনস্তত্ত্ববিদের ঘরেই যাবেন কারণ যা স্বাভাবিক তা অস্বীকার করার প্রতিক্রিয়া আছে তো!

টুকিটাকি

লেবু জাতীয় ফল অল্প ভিজে কাপড়ে জড়িয়ে রাখলে রস শুকিয়ে যায় না সহজে।

পাকা কলা অত্যন্ত তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। যেসব সেলোফিন কাগজের থলিতে নানা জিনিস পাওয়া যায় সে থলি ফেলে দেবেন না। থলিতে কলা ভরে বেশ করে মুখ বন্ধ করে দিলে কলা দু'চারদিন ভাল অবস্থায় থাকবে।

পেঁয়াজ রাখবেন হাওয়া লাগতে পারে এমন ব্যাগ-এ। গরম ভাপসা জায়গায় পেঁয়াজ রাখলে গাছ গজিয়ে উঠতে চায় বা পচে যায়। যে ব্যাগে রাখবেন তা জালি-বোনা হলে আরও ভাল হয়।

বেশী করে আলু রাখতে ঠাণ্ডা, শুকনো এবং কম আলো লাগে এমন জায়গা ভাল। অবশ্য হাওয়া চলাচল দরকার। বেশী রোদ বা আলো লাগলে আলুতে সবুজে ভাব আসতে পারে।

রেফ্রিজারেটরে আলু রাখার দরকার হয় না। রেফ্রিজারেটরে আলু রাখলে দেখবেন আলুতে কেমন একটা মিষ্টি মিষ্টি স্বাদ হয়। ঠাণ্ডায় আলুর শর্করা চিনি হয়ে যেতে চায়। এ মিষ্টি মিষ্টি ভাব আলু খেতে ভাল লাগে না। যদি রেফ্রিজারেটরে রাখা আলু ঐরকম হয় তবে দিন সাত আট বাইরে রেখে তবে ব্যবহার করবেন।

চালের মধ্যে 'পারদ' ট্যাবলেট রেখে চালকে পোকা থেকে বাঁচানো যায়। তবে ব্যবহারের আগে ঐ ট্যাবলেট বেছে ফেলে দেওয়া দরকার।

শক্ত পনীর বা চীজ রেফ্রিজারেটরে রাখবার আগে ভাল করে মুড়ে রাখবেন। চীজ বহুদিন ভাল থাকবে।

চীজের উপর সামান্য ছাতা ধরলে ছাতা চেঁছে ফেলে দেবেন।

রেফ্রিজারেটর ভিন্ন চীজ ভাল রাখতে হলে ভিনিগার বা সির্কায় কাপড় ভিজিয়ে বেশ করে নিংড়ে নেবেন তারপর ঐ কাপড়ে চীজ মুড়ে রাখবেন। শুকিয়ে গেলে আবার ঐভাবে সির্কায় নিংড়ে নেবেন।

শ্রীমতী

"ওগো বধূ সুন্দরী, তুমি মধু মঞ্জরী"

কিন্তু ঠিক এইরকমটি ছিলনা। কিছুদিন আগেও আজকের এই সুন্দরী বধূ সুচেতার মুখশ্রী অবাঞ্ছিত ব্রণতে ভরা ছিল।

সুচেতা জানতো প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই তার সেই কিশোরী বয়সে মুখে ব্রণ উঠবেই। সেই সঙ্গে এও জানতো সুচেতা নিয়মিতভাবে ক্লিয়ারাসিল্ ব্যবহার করলে ব্রণ নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু থাকবে না। তাই প্রতিদিন সকালে ও রাত্রে সাবান ও অল্প গরম জলে মুখটি পরিষ্কার করে সুচেতা ক্লিয়ারাসিল্ লাগাতো ব্রণর মুখ গুলিতে ও তার আশেপাশে। তারপর সময় মতো মিলিয়ে যেতো মুখের ব্রণ কিম্বা তার কোনো চিহ্ন। কেরাটোলিটিক্ ওষুধের গুণে ক্লিয়ারাসিল্ ব্রণর মুখ গুলোকে ফাটিয়ে দিয়ে ত্বকের ভেতরে অনুপ্রবেশ করে বলেই এতো তাড়াতাড়ি কাজ হয় এতে। আজকের সুন্দরী বধূ সুচেতার নিত্য প্রসাধনীর অন্যতম ছিল ক্লিয়ারাসিল্। সময় মতো যত্ন নিয়েছিল সুচেতা—ক্লিয়ারাসিল্ লাগিয়েছিল ঠিকমতো—তাই বিয়ের দিনে তার সুন্দর মুখশ্রী নববধূর বেশে আরো সুন্দর হয়ে উঠেছিল।

ক্লিয়ারাসিল এইভাবে কাজ করে:

১। ব্রণগুলিকে কাটিয়ে দেয়

২। ব্যাক্টেরিয়া রোধ করে

৩। ব্রণগুলিকে পরিষ্কার করে

লঘু-গুরু লেখক সংবাদ
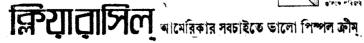
জেমস থারবারের 'সাহিত্যিক তীর্থযাত্রা সহায়িকা' নামের লেখাটি নিশ্চয়ই পড়েছেন। কয়েকদিন আগে ট্রামে চেপে আসছিলুম, সামনের বেঞ্চে দু'জন তরুণ নিজেদের মধ্যে একমনে আলাপ করছেন, টুকরো টুকরো কথা কানে এলো। বুঝতে পারলুম, তরুণ দু'জনই, এমন কিছু অপ্রত্যাশিত নয়, নবীন লেখক। তাঁদের আলোচ্য বিষয়, তাঁরা এক অতি বিখ্যাত শ্রদ্ধেয় প্রৌঢ় সাহিত্যিকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন, এবং নিরাশ হয়েছেন। প্রৌঢ় লেখকটি তরুণ দু'জনের সঙ্গে শুধু, দু'একটা বলে বাক্যালাপ সেরেছেন, তরুণ দু'জনের কবিতা শুনতে চাননি—এতে দেখা সংগঠনোদ্দিষ্ট ক্ষুব্ধ। মনে হলো, ঐ দুই তরুণ থারবারের লেখাটি পড়েন নি। না-পড়া কিছু দোষের নয়, তবে পড়া থাকলে তাঁদের আশাভঙ্গের কারণ ঘটতো না। অন্তত আমার হয়নি।

জেমস থারবারের লেখাটির নাম 'এ গাইড টু লিটারারি পিলগ্রিমেজ'। আরম্ভ হয়েছে এই ভাবে; একদিন থারবার একটা রেস্টুরেন্টে একা দাঁড়িয়ে বিয়ার খাচ্ছেন—ঐ রেস্টুরেন্টে লেখক-শিল্পীদের যাতায়াতই বেশী—একটা টেকো মাথা বেঁটে মতন লোক থারবারকে একটা ছোটখাটো ল্যাং মারবার জন্য ভুরু তুলে জিজ্ঞেস করলো, আপনি হঠাৎ এ লাইনে যে? লোকটি ভেবেছিল, থারবার বুঝি তো-তো করবেন, লাজুক ভাবে বোকা হাসি হাসবেন। মোটেও না। থারবার সপ্রতিভ বললেন, 'আমিই একমাত্র জীবিত লেখক, যে-কখনো বার্নার্ড শ'এর সঙ্গে দেখা করেনি, দেখা করবার ইচ্ছেও নেই।' লেখক হিসেবে একরকম সাংঘাতিক বিশেষত্বের কথা বেঁটে লোকটি ভাবতেও পারেনি। সে নিজেই মিনমিন করে সরে পড়লো।

বলাই বাহুল্য, থারবার পরবর্তী অনুচ্ছেদেই দ্রুত বলে গিয়েছেন যে বার্নার্ড'শ সম্পর্কে তাঁর কোনোই বিরূপ মনোভাব নেই এবং তিনি বার্নার্ড শ'এর প্রতিভার ভক্ত। শুধু বার্নার্ড 'শ নয়—যে-কোনো বিখ্যাত লেখকের সঙ্গে দেখা করার ব্যাপারেই তাঁর এই অনাসক্তি। বিখ্যাত ব্যক্তিদের বসবার ঘরে তিনি নির্বোধের মতন আড়ষ্ট ভাবে বসে আছেন—এই দৃশ্যটিই তাঁকে শিহরিত করে।

যাই হোক, থারবার নিজে কোনো বিখ্যাত লেখকের সঙ্গে দেখা করতে চান না। কিন্তু যারা চায়, তাদের জন্য তিনি কয়েকটি অবশ্যমান্য নিয়মের কথা বলেছেন। শুধু এই কটিই পর্যাপ্ত নয়, আরও আছে, সেগুলো অবস্থা বুঝে।

থারবারের বিখ্যাত নিয়মগুলি এই ঃ

(১) সব সময় মনে রাখবে, তুমি একজন লঘু লেখক, যাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছো, তিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ লেখক। না হলে, তুমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছো কেন, তিনিই তো তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। তিনি তোমার সম্পর্কে কোনো স্মৃতিকথাও লিখবেন না সুতরাং তোমার সাহিত্যিক পরিচিতি ইত্যাদি প্রথমেই তাঁকে শোনাবার কোনো মানে হয় না। সুতরাং, ঢোকামাত্রই জোর-গলায় 'আমার নাম হারাধন চক্রবর্তী'—এই ধরনের বলা বেশ অশোভন। আবার বিড়-বিড় করে জড়িয়ে নাম বলার বিপদ এই, তাহলে তিনি সর্বক্ষণ তোমাকে হরিচরণ কিংবা হরিধন বলে ভুল করবেন।

অনেকে কায়দা করে আরও তিনরকম ভাবে নিজের পরিচয় জানায় (ক) আমি বাঁশবেড়ে থেকে আসছি, আমি একজন নাট্যকার। (খ) আমি একজন ভ্যাগাবন্ড, এমনিই আপনার কাছে এলাম। (গ) আমি স্যার একটি ঝাঁঝালো ছেলে, ঝাঁঝা থেকে আসছি, আমি আর বছর পাঁচেক বাঁচবো—। এই ধরনের কোনো প্রস্তাবনার পরই আলোচনা আর জমে না। বাংলা দেশে প্রথাটি এই রকম ঃ এক গাল হেসে বলা, আপনাকে একটু বিরক্ত করতে এলাম। কিংবা, আপনার সময় নষ্ট করতে এলাম। এর উত্তরে লেখক মশাই অতিশয় বিরক্ত মুখেই বলেন, না, না, বিরক্ত হবো কেন!

থারবারের মতে, আগে থেকে চিঠি লিখে দেখা করার সময় ঠিক করে যাওয়া ভালো। গিয়ে বিনীত হাসি মুখে বলা, ভালো আছেন!

(২) বিখ্যাত ব্যক্তিটিকে মুগ্ধ করার জন্য চালাক চালাক কথা বলার দরকার নেই। যেমন, অমুক বইটা দেখেছেন? একেবারে কাঁঠালের আমসত্ত্ব! কিংবা, যাই বলুন, এখনও পাঠকদের যা অবস্থা, শরৎচন্দ্রের বই পড়লে চোখের জল নর্দমা দিয়ে গড়িয়ে যায়।

(৩) এরকম কথা কক্ষনো বলার দরকার নেই (যে দেখা করতে গেছে, সে যদি মেয়ে এবং লেখিকা হয়—তার প্রতি বেশী করে প্রযোজ্য), আপনি যা লিখেছেন এ পর্যন্ত আমি তার সব পড়েছি! আপনার প্রত্যেকটা লাইন আমার এত ভালো লাগে! একথা বলার মিনিট পাঁচেক বাদে বিখ্যাত লোকটি অনায়াসেই ধারণা করে নিতে পারে যে, তুমি আসলে একটি গাধা! তোমার কোনো বিচারবুদ্ধি নেই—যার প্রত্যেকটা লাইন ভালো লাগে, সব লেখা ভালো লাগে—তার ভালো লাগা না-লাগা সমান! (বেশী স্মার্টনেস দেখাবার জন্য অনেকে আবার বলে, আপনার এখনকার লেখা কিন্তু আমার আর ভালো লাগে না! একথা শুনেই লেখক ভাববেন, ভালো লাগে না তো আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছো কেন? যার লেখা ভালো লাগে, তার কাছে গেলেই পারতে! কিংবা আপনার অন্য লেখা ভালো লাগে, কিন্তু আপনার 'জলের মধ্যে আগুন' বইটা কিন্তু একদম ভালো লাগলো না!—একথাও অবান্তর। সে বইটার যদি কিছু মাত্র গুণ থাকে, তাহলে সংক্ষেপে তার উল্লেখ করে, খুবই দুঃখিত ভাবে ভালো-না-লাগা অংশটুকুর প্রসঙ্গ উত্থাপন করা উচিত।)

(৪) যে-কোনো সমালোচকের নামের উল্লেখ সযত্নে পরিহার করা উচিত।

(৫) লেখকের কোনো লেখার উল্লেখ করতে গিয়ে অন্য কোনো লেখকের লেখার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা মারাত্মক ভুল হবে। 'আপনার একটা লেখা আমার খুব ভালো লেগেছিল, কি যেন নামটা, এক অধ্যাপকের সঙ্গে তার ছাত্রীর দিদির—...... নায়কের ভাই সাঁতার কাটতে গিয়ে ডুবে গেল......।' অনেক গবেষণার পর যদি দেখা যায় সেটা অন্য কারুর গল্প, তাহলে সেখানেই সব কিছুর শেষ!

(৬) ঈশ্বরের দোহাই, ওঁর সামনে কিছু আবৃত্তি করে শোনাবেন না। বিশেষত নিজের লেখা কবিতা বা গল্পের অংশ।

(৭) অন্য কারুর কাছ থেকে পরিচয়-পত্র আনার দরকার নেই। 'আপনি অমুককে চেনেন? আপনার সঙ্গে একবার লছমন-ঝোলায় যাবার পথে আলাপ হয়েছিল.....' এঁকেছে আলপনা দিয়ে"।

(৮) সঙ্গে কোনো উপহার নিয়ে যাবেন না। বিশেষত এই ধরনের উপহার "আমার সাত বছরের ভাগ্নী আপনার একটা ছবি এঁকেছে আলপন দিয়ে"।

(৯) সঙ্গে আর কোনো বন্ধুবান্ধব,

অনিবার্য কারণবশত এই সপ্তাহে জীবন-যেরকম প্রকাশিত হ'ল না। আগামী ৩রা জানুয়ারী সংখ্যা থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হবে।

কিংবা প্রতিবেশীকে না নিয়ে যাওয়াই ভালো। আপনার পিসতুতো ভাই কিংবা মাসতুতো বোন ঐ দিকেই কোথাও যাবে বলে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। পিসতুতো ভাই কিংবা মাসতুতো বোনের যদি কোনোরকম সাহিত্যজ্ঞান না থাকে, লেখক সম্পর্কে কিছুই জানে না— সে আগাগোড়া চুপ করে বসে থাকবে। সেটা একপক্ষে ভালো হলেও অস্বস্তিকর— চোখের সামনে সর্বক্ষণ একজনের চুপ করে থাকা। আর তার যদি বেশী কথা বলা স্বভাব থাকে, তাহলে তো সাংঘাতিক। সে তখন অনবরত মনে করার চেষ্টা করবে, অন্য কোন্ কোন্ লেখককে সে চেনে। এই ধরনের সংলাপ একেবারেই অরুচিকর: 'আচ্ছা, অমুক ম্যাগাজিনে একটা গল্প পড়েছিলাম, কি যেন রাইটারের নাম?' কিংবা 'আপনি হরিশ্চন্দ্র চাকলাদারকে চেনেন, আমার ছোড়দার বন্ধু, চেনেন না? সেও রাইটার—অনেক লিখেছে, ছোড়দার অফিসের হাউস ম্যাগাজিনেই তার একটা ভ্রমণ কাহিনী......, কিংবা আমার বড়দির মেয়েও (বয়েস সাত) বেশ পদ্য লেখে কিন্তু, লাল নীল পেন্সিল দিয়ে সুন্দর সুন্দর ছবি এঁকে তার তলায় পদ্য লিখে দেয়। শুনবেন একটা?'

(১০) মান্য লেখকটির বাড়ির দরজা খুলে দেয় যদি পরিবারের অন্য কোনো লোক, এবং বলে, উনি তো এখন বাড়ি নেই, কিংবা এখন ঘুমুচ্ছেন, কিংবা উনি বলেছেন, আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কারুর সঙ্গে দেখা করবেন না—তাহলে এ কথার সত্যতা পরীক্ষার জন্য বাড়ির আশেপাশে ঘুরঘুর করা উচিত নয়। চলে যাওয়া উচিত।

(১১) এই রকম অবস্থায়, 'একটা কাগজ পেন্সিল দিন তো, চিঠি লিখে রেখে যাবো'—বলাও সঙ্গত নয়। হাজার-শব্দ সম্বলিত অস্পষ্ট হস্তাক্ষরের চিঠি রেখে আসার কোনো অর্থ নেই, বিশেষত সে চিঠির আরম্ভ যদি এই রকম হয়— 'আপনার হয়তো মনে নেই, আজ থেকে সাড়ে তিন বছর আগে রাণাঘাট রেল স্টেশনে আপনার সঙ্গে দু' মিনিটের জন্য আলাপ হয়েছিল......' (মনে রাখা উচিত, আপনিই একমাত্র ভক্ত নন সেই লেখকের, আপনিই একমাত্র দর্শনার্থী নন। সাক্ষাৎকারের সময় বা কারণ লেখকের পক্ষে যদি আকর্ষণীয় না হয়, তাহলে শুধু আপনি অনেক দূরে থেকে এসেছেন—এটাই বড় যুক্তি নয়। শুধু চিঠি নয়, নিজের কবিতার খাতা কিংবা উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি রেখে আসা একেবারেই অনুচিত।)

(১২) এবং, ঐ রকম কথা শুনলে, আর ফিরে আসবেন না।

মনে হয়, জেমস 'থারবারের সবকটি নিয়ম মানতে গেলে গুরু লেখকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে লঘু লেখক বিশেষ কোনো কথাই বলতে পারবেন না, আগাগোড়াই চুপ করে বসে থাকবেন। অবশ্য, তাই-ই হয় বেশীর ভাগ।

সনাতন পাঠক

কবিতা সংকলন

একালের প্রেমের কবিতা। দীপ্তি ত্রিপাঠী সম্পাদিত। বিশাখা, ২৮।১এ, গড়িয়াহাট রোড, কলকাতা-১৯। ৪·০০ টাকা।

নাম যদিও 'একালের প্রেমের কবিতা' তবু মুখ্যত যাঁরা 'পঞ্চাশের কবি' নামে খ্যাত, তাঁদের প্রেমের কবিতার রূপচিত্রটি ফুটিয়ে তোলাই নাকি উদ্দেশ্য ছিল, ভূমিকায় সম্পাদিকা জানিয়েছেন। প্রথমেই বলা ভাল যে, 'পঞ্চাশের কবি' এবং '১৯২৬-৩৬'-এর মধ্যে জন্মেছেন এমন কবি অভিন্ন বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। ফলে আগে পরে যাঁদের জন্ম, পঞ্চাশের কবি হিসেবে খ্যাত হলেও তাঁরা এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হননি। বরং এক-আধজন যাটের কবিও (প্রচলিত অর্থে) অন্তর্গত হয়েছেন। মনে হয়, শ্রীমতী ত্রিপাঠী পঞ্চাশের কবিদের সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত ছিলেন না। কারণ '২৬ থেকে '৩৬-এর মধ্যে যাঁদের জন্ম তাঁদের মধ্যে দীপংকর দাশগুপ্ত, দেবদাস পাঠক, দিলীপকুমার সেন, সুনীলকুমার নন্দী, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, ফণিভূষণ আচার্য, পূর্ণেন্দু পত্রী, বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত, তুষার চট্টোপাধ্যায়, মণিভূষণ ভট্টাচার্য, কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত প্রমুখ কবিরা বাদ পড়লেন কী বিচারে জানা গেল না। ভূমিকায় এক জায়গায় সম্পাদিকা অবশ্য লিখেছেন: "সমকালীন কবিদের সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা প্রায় লজ্জার বস্তু হয়ে পড়েছে।" কিন্তু এই স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও তাঁর কিছু মন্তব্যে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। যেমন তিনি লিখছেন, "তিরিশের কবিদের পর প্রেমের জোয়ার আবার এসেছিল পঞ্চাশের কবিদের রচনায়। চল্লিশের মুখ্য কবিদের রচনা প্রধানত রাজনৈতিক।" জানতে ইচ্ছে হয়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অরুণকুমার সরকার কিংবা নরেশ গুহর রচনার কথা শ্রীমতী ত্রিপাঠীর স্মরণে ছিল কিনা। নাকি তিনি এঁদের চল্লিশের মুখ্য কবি মনে করেন না। কিংবা এঁদের বিখ্যাত প্রেমের কবিতাগুলিকে তাঁর মনে হয় 'রাজনৈতিক'!

সুখের কথা, সংকলনে অন্তর্ভুক্ত কবিদের সম্বন্ধে শ্রীমতী ত্রিপাঠী এতখানি নির্বিচার হননি। বরং পঞ্চাশের প্রেমের কবিতার লক্ষণ, রূপবৈচিত্র্য, মাধুর্য ও বৈশিষ্ট্য আবিষ্কারে তাঁর যত্ন ও উৎসাহের পরিচয় সুস্পষ্ট। পঞ্চাশের কবিদের প্রেমের কবিতায় তিনি লক্ষ্য করেছেন: "এঁদের প্রেমে কখনো আশা, প্রীতি, বিশ্বাস, স্বপ্ন— কখনো পাপবোধ, কাম, হতাশা, অসহায়তা। বহিরঙ্গে অনুকূল অন্তরঙ্গে প্রতিকূল এক যুগ বিশেষের রচনা বলে এঁদের রচনায় মুগ্ধবোধের স্থান কম। অনেক সময় নায়িকা নারী নয়, কবিতা বা সময়। এই প্রেমবোধ থেকে যেসব তরঙ্গ ওঠে, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা সমর্পণ, সেই চেতন-অবচেতন-অতিচেতনের ইন্দ্রধনু, এখানেও উপস্থিত।" সংকলিত কবিতা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা নিরর্থক। কারণ কবিতাগুলি প্রত্যেকটিই প্রায় সুপরিচিত। পঞ্চাশের প্রেমের কবিতার মোটামুটি পরিচয় এ গ্রন্থে পরিস্ফুট একথা বলা যায়।

২১৮/৬৯

ভ্রমণ

চেনাশোনার বাইরে। অমিতা রায়। জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড, ১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৩। পাঁচ টাকা।

রুমানিয়া ভ্রমণ লেখিকার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। কোন এক কার্যকারণের যোগে তাঁকে যেতে হয়েছিল অজানা অচেনা দেশ রুমানিয়ায়। কিন্তু সেখানে দেখেছিলেন এক আশ্চর্য সমাজ, মানুষ এবং তাদের নতুন স্বপ্নের জীবনকে। যা গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল তাঁর মনকে। সেই অভিজ্ঞতার কাহিনী নিয়েই লেখা 'চেনাশোনার বাইরে'।

আলোচ্য বইখানিতে লেখিকা রুমানিয়ার ইতিহাস, রাষ্ট্রীয় জীবন, সমাজ এবং

পারিবারিক জীবন থেকে শুরু করে এখানকার উৎসব, প্রাকৃতিক বর্ণনা, ঋতু, বিচিত্র মানুষ তাদের অকৃত্রিম আন্তরিকতা— কোন কথাই তিনি বাদ দেননি। সুনিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। চিত্তাকর্ষক তাঁর বিবরণগুলি, লেখার ভঙ্গি অত্যন্ত গরম, ঝরঝরে তাঁর ভাষা।

রুমানিয়া ছোট্ট দেশ হলেও এখানে আছে বিচিত্র মানুষের সমাবেশ। এখানকার ছোট বড় সব মানুষের কাছেই তিনি পেয়েছিলেন সহানুভূতি। তিনি দেখেছিলেন ভারতবর্ষ সম্পর্কে এদের কি অপরিসীম কৌতূহল। এরা আমাদের দেশের অনেক খবরও রাখে। অথচ আমরা এদের এদের সম্পর্কে কতটুকু জানি! ও দেশের বইতে দাক্ষিণাত্যের মন্দির, কুতুবমিনার, তাজমহল প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যের কথা যেমন আছে, তেমনি আছে আধুনিক ভারতের চিত্রও। বর্তমান বৈজ্ঞানিকদের প্রশংসা। আবার কলকাতার রাস্তায় জল জমে, ভিখারীরা ফুটপাথে ভিড় করে, সারা ভারতের গ্রামাঞ্চলে বাজার-হাটে কাক-শকুন-কুকুরেরাই যে জমাদারের কাজ করে এ খবরও তাদের অজানা নয়।

নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে লেখিকা বলেছেন ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাদের শ্রদ্ধা এবং কৌতূহলের কথা। তার দু একটি উল্লেখ করি। যেমন, ওদেশের জনৈক তরুণ অধ্যাপকের উপনিষদ অনুবাদের আগ্রহ, ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে মন্তব্য—এত গভীর চিন্তা, এমন অধ্যাত্মবাদ পৃথিবীর আর কোন দেশেই নাকি নেই।

দানিয়েলের আত্মভোলা শিল্পী ভাই ইয়নের ঘরে রাজপুত আর্ট, মোগল আর্ট থেকে শুরু করে তিব্বতী, নেপালী প্রভৃতি প্রাচীন শিল্পের সংগ্রহও আমাদের কাছে তেমনি বিস্ময়কর।

রুমানিয়ার ঋতু, প্রাকৃতিক বর্ণনা অনবদ্য, বুখারেস্ট ইউনিভার্সিটির ছবিটি সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখিকা। প্রফেসর ঝিরবুরে ভাষা শিক্ষার প্রণালীটি প্রশংসনীয়। আমাদের জানবার বহু বিষয় এতে আছে।

তবে লেখিকার মন আবেগপ্রবণ। ওদেশের প্রশংসায় তাঁর কলম অধিকতর উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু সামান্য দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও পুস্তকখানি সুখপাঠ্য।

উপন্যাস

অন্নাই। শৈলেন রায়। বাক্-সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৩, কলেজ রো কলকাতা-৯, দশ টাকা।

কলকাতার একটা ইতিহাস আছে। গোড়াপত্তনের ইতিহাস।

সেই সময় থেকে সদ্য-স্বাধীন ভারত— এই দীর্ঘকালকে কখনো ঘটনা ঘটিয়ে, কখনো বিবরণ দিয়ে লেখক পটভূমি তৈরি করেছেন। সেই পটভূমির সামনে আছে নটবর চৌধুরী। তার পিতৃকুলে সুতানুটির জমিদার, মাতৃকুলে কলকাতার ভদ্রভদ্রাটির সঙ্গে সঙ্গে বর্ধনী হয়ে উঠেছে। সেখানে নটবরকে সবাই নাটু বলে। এই নাটু খুব চিন্তাশীল। তাকে সবাই ভালবাসে—বিশেষ করে টোপা, মোহর, আর যূথিকা। এই মেয়ে তিনটির বয়স বেশী না। একজনের বিয়ে হয়ে গেল। অনাঙ্কন হল ঠৈরবণী— অব যূথিকা ঘরণী। তবু, নাটু টোপাকে ভুলতে পারে না। তাকে দেবী কল্পনায় ভাবে। সাড়ে তিনশো পাতার নভেল চোদ্দ বছরের নাটু তার বয়সের তুলনায় অনেক বেশি বেশি ভেবেছে, টোপা-মোহর-যূথিকার মাঝখানে আগাগোড়াই ব্যাডমিন্টনের ফেদার হয়ে নেটের এধার-ওধারে নাটু ওড়াউড়ি করেছে। সেসব জায়গায় কান ঘেঁষে অনেক ডায়লগ চলে গেছে। নাটু যখনই মাটিতে পড়েছে—তখনই সে স্বাভাবিক। তার বাবা, মা, মাতুলগোষ্ঠী এবং যুদ্ধের আগের কলকাতার বর্ণনা আন্তরিক। বিশেষ করে

আভিভূত হতে হয়, টোপার বিয়ের পরে নাটুর মনের অবস্থার বর্ণনায়।

উপন্যাসটি একটানা পড়ে শেষ না করে পারিনি। জায়গায় জায়গায় উজ্জ্বল মৃদু রসিকতা এই দীর্ঘ গদ্য রচনার সম্পদ। লেখক কাউকেই আগাগোড়া ভিলেন বা সাধু বানান নি। এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে মনে পড়ে জিতেনমামাকে। এখানেই লেখক লেখক। সমালোচনায় মুশকিল—নিন্দা করার ভাষা অনেক, কিন্তু প্রশংসার ভাষা যে কত কম।

সংগীত

শ্রীহট্টের লোকসংগীত। গুরুসদয় দত্ত ও নির্মলেন্দু ভৌমিক সম্পাদিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পনের টাকা।

বাংলার লোকসংগীতের ইতিহাসে শ্রীহট্টের লোকসংগীতের একটি নির্দিষ্ট স্থান রয়েছে। বিষয়-প্রকরণ-বৈচিত্র্য—সব দিক থেকেই শ্রীহট্টের লোকসংগীত সুসমৃদ্ধ। আজ থেকে তিরিশ বছর আগে স্বর্গীয় গুরুসদয় দত্ত মহাশয় অশেষ পরিশ্রম করে ৪২৩টি শ্রীহট্টের লোকসংগীতের এক সুবিশাল পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দেন। উদ্দেশ্য ছিল, ভূমিকা, শব্দটীকা ইত্যাদির সাহায্যে সংকলনখানি সুসম্পূর্ণ করে গ্রন্থের আকারে প্রকাশ করবেন। সংগ্রহের ব্যাপারে শ্রদ্ধেয় দত্ত মহাশয়ের নিষ্ঠা এবং সতর্কতা অতুলনীয়। অত্যন্ত শ্রমসহকারে তিনি আঞ্চলিক শব্দব্যবহার অবিকৃত রেখে পাণ্ডুলিপি রচনা করেন। দীর্ঘকাল বাদে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক স্বর্গীয় শশিভূষণ দাশগুপ্তের পৃষ্ঠপোষকতা এবং আনুকূল্যে দত্ত মহাশয়ের অসম্পূর্ণ কাজ, গ্রন্থের বিস্তৃত ভূমিকা এবং প্রয়োজনীয় শব্দ-টীকা যোজনা করে শ্রীহট্টের লোকসংগীতের পূর্ণাঙ্গ সম্পাদনা করেন অধ্যাপক নির্মলেন্দু ভৌমিক।

'শ্রীহট্টের লোকসংগীত', — সুবিশাল গ্রন্থখানি বিষয়ের দিক থেকে মুখ্যত তিনটি অংশে বিভক্ত—ভূমিকা, সংগ্রহ এবং পরিশিষ্ট-অংশ। সংগ্রহ-অংশে অধ্যাপক ভৌমিক শ্রদ্ধেয় দত্তমহাশয়ের সংকলন থেকে ৪৩টি গান বাদ দেন। অবশিষ্ট ৩৮০টি গান সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করেন। যে কোন কারণেই, অনাবশ্যক বিধায়, শ্রীভৌমিক প্রাগুক্ত গানগুলিকে সংগ্রহভুক্ত করেন নি। সংকলনের পরিমার্জনার ক্ষেত্রে এই রকম যোগবিয়োগের স্বাধীনতা শ্রীভৌমিকের অধিকারভুক্ত হলেও এক্ষেত্রে অতিরিক্ত ৪৩টি গান গ্রন্থভুক্ত হলে তেমন ইতরবিশেষ পার্থক্য হয়ত হত না। বরং, সন্ধিৎসু পাঠক, পুনরুক্তি হলেও আরো কিছু অজানিত গানের সঙ্গে পরিচিত হতে পারত। গ্রন্থের নামকরণের ব্যাপারেও এরকম একটা ছোট ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। শ্রদ্ধেয় দত্ত মহাশয় বইটির নাম দিতে চেয়েছিলেন, 'শ্রীহট্টের গণগীত'। বর্তমানে 'শ্রীহট্টের লোকসংগীত' নামে গ্রন্থখানি আত্মপ্রকাশ লাভ করেছে। শ্রদ্ধেয় দত্ত মহাশয় পরিকল্পিত নামকরণটি গ্রাহ্য না করারও তেমন কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে, সঙ্গীত সংগ্রন্থনার ব্যাপারে শ্রীভৌমিকের কৃতিত্বের কথাও এক্ষেত্রে অবশ্য উল্লেখণীয়। মূল সংগ্রহে গানগুলি বিষয় এবং ভাবের দিক থেকে ক্রমবাহিক বা সুবিন্যস্ত ছিল না। শ্রীভৌমিক সুবিপুল সংগীতমালাকে বিষয়ের দিক থেকে ধারাবাহিকভাবে সাজিয়েছেন। ফলত, ভাবের দিক থেকেও একটা চমৎকার ক্রমপরিণতি লক্ষ্য করা যায়। বিশেষত, বিষয়সমূহকে গুচ্ছে-গুচ্ছে উপবিভক্ত করে এবং তাদের শীর্ষনাম যোজনা করে গানগুলিকে যেভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে তা শ্রীভৌমিকের শ্রম, নিষ্ঠা এবং সতর্কতার পরিচায়ক।

ভূমিকাংশ গ্রন্থের অন্যতম সম্পদ। দীর্ঘবিস্তৃত এই অংশে শ্রীভৌমিক শ্রীহট্টের ইতিহাস, লোকসংগীতের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। প্রত্যেক আলোচনাই সুব্যাখ্যাত, তথ্যসহ এবং প্রাসঙ্গিক। শ্রীহট্টের বিচিত্র-বিপুল লোকসঙ্গীতের অবধারণে প্রেক্ষাপট হিসাবে ভূমিকাংশের এই আলোচনাসম্ভার যথেষ্ট কার্যকরী হয়েছে। শ্রীহট্টের ইতিহাস, লোকবসতির পরিচয়, ধর্মপরিচয়, বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার, 'সিলেট নাগরী' হরফ সম্পর্কিত মূল্যবান আলোচনা, শ্রীহট্টে ইসলাম—বিশেষত সুফী ধর্মের ব্যাপক প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ক আলোচনা শ্রীহট্টের লোকসংগীতের পাঠের প্রস্তাবনা হিসাবে সুপ্রযুক্ত হয়েছে। লোকসঙ্গীতের কবি ও ভণিতা সম্পর্কিত অধ্যায়টি অত্যন্ত সতর্কতা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে ভূমিকাংশে সংলগ্ন হয়েছে। শ্রীহট্টের বিবিধ ভক্তিগীতি, বৈষ্ণব গীতাবলী, বাউলগান, ভাটিয়াল-গীতি, রাগ-গীতি, ধামাইল গান, সারিগান, বিবাহগীতি—প্রভৃতি বিষয়ক আলোচনা প্রচুর বিশ্লেষণ-ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গ চিত্তাকর্ষক। শ্রীভৌমিকের শ্রম, অনুসন্ধিৎসা এবং মনস্বিতার পরিচয় বহন করে এসব আলোচনা। শ্রীহট্টের লোকসংগীতের রচনাভঙ্গী, ভাষা-পরিচয়, ধ্বনিতত্ত্ব, রূপ-তত্ত্ব—ইত্যাদি দুরূহজটিল কাব্যপ্রয়ত্নের রস-রূপের আলোচনায় আলোচকের পাণ্ডিত্যের প্রমাণ রয়েছে। ভূমিকাংশের আলোচনায় আরো একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এই যে, প্রত্যেকটি আলোচনাই তিনি তথ্যসহ ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। এবং এব্যাপারে তিনি বিভিন্ন পত্রপত্রিকা এবং পূর্বসূরীদের আলোচনা থেকে প্রতুল দৃষ্টান্ত গ্রহণ করেছেন।

গ্রন্থের 'পরিশিষ্ট' অংশও যথেষ্ট মূল্যবান। এই অংশে কিছু অতিরিক্ত গান সংযোজিত হয়েছে। ৩০৫।৬৯

মের পঃ জার্মানীতে পলায়নকে কেন্দ্র করে দুই জার্মানীর মধ্যে যে রাজনৈতিক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল তারই রূপ পরিগ্রহ করলো এথেন্সে। বিগত মেক্সিকো অলিম্পিকে পূর্ব জার্মানীর আবেদনে আই এ এ এফ ইয়রগেন মেকে পঃ জার্মানীর প্রতিনিধিত্ব করার অনুমতি দেয়নি। আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আইনের ১২ ধারা অনুসারে কোন খেলোয়াড় অন্তত তিন বছরের মধ্যে অন্য কোনও দেশ অথবা সংস্থার প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন না। মের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল—"আমি জার্মান নাগরিক ছিলাম এবং বর্তমানেও জার্মান নাগরিকই রয়েছি।" তা সত্ত্বেও আই এ এ এফ স্ব-সিদ্ধান্তে অবিচল ছিল। ইউরোপের একাধিক প্রখ্যাত ক্রীড়া সমালোচক সেদিন নির্দ্বিধায় আই এ এ এফকে সমালোচনা করে দেখিয়েছিলেন পনের বছর আগে রচিত আইন আজকের দিনে সম্পূর্ণ অচল। এ আইনের বিপাকে পড়ে একাধিক খেলোয়াড় বিশ্বের ক্রীড়া প্রাঙ্গণ থেকে মুছে গিয়েছেন। লঘু অপরাধে গুরু দণ্ডের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে ক্রীড়া প্রতিভার অপমৃত্যু না ঘটাবার আবেদন করেছিলেন। এ কথা যে কতদূর সত্যি তার অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। ১৯৫৬ সালে হাঙ্গেরির বিদ্রোহের পর দূর পাল্লার দৌড়বিদ রোসনোই ও টাবোরি যথাক্রমে অস্ট্রিয়া ও আমেরিকাতে রাজনৈতিক আশ্রয় লাভ করেছিলেন। আন্তর্জাতিক সংস্থা উভয়কে তিন বছরের জন্য আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ নিষিদ্ধ করেছিলেন। তারপরে আর দুই উদীয়মান ক্রীড়াবিদের নাম শোনা যায়নি।

বিগত জুলাই মাসে স্টুটগার্টে অনুষ্ঠিত আমেরিকা বনাম ইউরোপের অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতায় ইয়রগেন মেকে পাঁচ হাজার মিটার দৌড়ে ইউরোপ দলের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ দিয়ে আই এ এ এফ এ ধারণারই সৃষ্টি করেছিল যে এথেন্সে পঃ জার্মানীর হয়ে অংশ গ্রহণ করার পেছনে আর কোন বাধা নেই। কিন্তু নবম ইউরোপীয়ান গেমসের শুরুর মাত্র আধঘণ্টা আগে আই এ এ এফ পূর্ব জার্মানীর আবেদনে ঘোষণা করলো, পঃ জার্মান দলের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার মের নেই। কারণ তিন বছরের মেয়াদ এখনো শেষ হয়নি। কিন্তু প্রশ্ন হলো যদি আমেরিকার বিপক্ষে ইউরোপের হয়ে মে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে পারে, তাহলে ইউরোপীয়ান গেমসে পঃ জার্মানীর প্রতিনিধিত্ব করার পেছনে বাধা কোথায়, এ প্রশ্নের জবাব আই এ এ এফ দিতে পারেনি। তাহলে কি শুধু পূঃ জার্মানীকে খুশি করার জন্যই এই ব্যবস্থা? তার জবাব দিয়েছে হল্যান্ড ও বেলজিয়ামের ক্রীড়া দৈনিক—"ইয়রগেন

ইডেনের টেস্ট ক্রিকেট আসরে কুকুর

মেকে পঃ জার্মানীর প্রতিনিধিত্ব করার অনুমতি দিলে পূর্ব জার্মানী আই এ এ এফ-এর সভাপদ ত্যাগ করে ওয়ারস-চুক্তির অন্তর্ভুক্ত দেশগুলিকে নিয়ে নতুন ক্রীড়া-সংস্থা গড়ে তোলার হুমকির কাছে আই এ এ এফ-এর নতি স্বীকার"। ক্রীড়াক্ষেত্রে রাজনীতির প্রভাবে এ অভিযোগ আজ নতুন নয়। তারই প্রমাণ নতুন করে পাওয়া গেল এথেন্সে। "আই এ এ এফ যে একাধিকবার আইনের বহির্ভূত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তার জ্বলন্ত প্রমাণ রয়েছে ইংল্যান্ডের ব্যাপারে। জিম হোগেন ১৯৬৪ সালে টোকিও অলিম্পিকে আয়ারল্যান্ডের প্রতিনিধিত্ব করেন। কিন্তু মাত্র দুই বছরের ব্যবধানে হোগেন ইংল্যান্ডের হয়ে ইউরোপ অ্যাথলেটিকসে ম্যারাথন দৌড়ে অংশ গ্রহণ করেন। তাহলে মের প্রতি এই বৈমাত্র সুলভ মনোভাব কেন?" প্রশ্ন করেছেন পঃ জার্মানীর প্রখ্যাত "ফ্রাঙ্কফুর্টার আলগেমাইন"-এর ক্রীড়া সমালোচক।

মের প্রতি সমবেদনা স্বরূপ মূল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে পঃ জার্মানীর প্রতিযোগীরা যে দৃঢ়তা দেখিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। একাধিক প্রতিযোগী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা বর্জন করে ইউরোপীয়ান গেমসের জন্য যে প্রস্তুতি করেছিল তার এই পরিণতি অনেককেই আহত করেছে। সমাপ্তি দিবসে কুচকাওয়াজরত পঃ জার্মানীর ক্রীড়াবিদদের অসংখ্য করতালির মধ্যে সমবেদনা জানিয়েছে লক্ষাধিক দর্শক।

যাইহোক, পঃ জার্মানী বিহীন ইউরোপ অ্যাথলেটিকস্-এর আকর্ষণ যে অনেকাংশে কমে গিয়েছিল তা অনস্বীকার্য।

তাহলেও বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অভাব পরিলক্ষিত হয়নি। বিশেষ করে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন মহিলা বিভাগ। যে পাঁচটি নতুন বিশ্ব রেকর্ড স্থাপিত হয়েছে তার চারটিরই অধিকারী মহিলারা। ইউরোপীয়ান গেমসের প্রথম স্বর্ণপদক অর্জন করে রাশিয়ার মহিলা প্রতিযোগিনী নাদিসেভা চিসোভা। চিসোভা ২০·৪৩ মীটার দূরে গোলা নিক্ষেপ করে নতুন বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেন। মহিলাদের ৪০০ মিটার দৌড়ে উত্তর কোরিয়ার সিন কিম-এর প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব রেকর্ড ভঙ্গ করেন ফ্রান্সের দুই প্রতিযোগিনী। নিকলে ডুকলোস ও কোলেট্টে বেসন ৫১·৯ সেঃ নতুন বিশ্ব রেকর্ড করেন। আকর্ষণীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় মহিলাদের ১৫০০ মিটার দৌড়ে। যদিও সম্ভাব্য বিজয়িনীর তালিকায় ইটালীর পিগনী ও হল্যান্ডের মারিয়া গোমেরস-এর নাম সর্বাগ্রে ছিল, তাহলেও অভাবনীয়ভাবে চেকোশ্লোভাকিয়ার জেলিকোভা ৪ : ১০·৭ মিনিটে নতুন বিশ্বরেকর্ড করে সবাইকে হতবাক করে দেন। ৪×৪০০ মিটার রিলেতে পঃ জার্মানীর মহিলা দল "হিটে"তে ফ্রান্সের ৩:৩৪·২ মিঃ গঠিত বিশ্ব রেকর্ড ভঙ্গ করেন ৩:৩৩·৯ মিনিটে। উল্লেখযোগ্য পঃ জার্মানীর পুরুষ ও মহিলা দল শুধুমাত্র রিলে রেসে অংশ নেন।

পুরুষ বিভাগে একমাত্র বিশ্বরেকর্ডের অধিকারী হলেন রাশিয়ার আনাটোলি বোনডারসোক। ৭৪·৬৮ মিটার দূরে হাতুড়ী নিক্ষেপ করে আনাটোলি নতুন বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করেন। পুরুষ বিভাগে নতুন কয়েকটি ইউরোপীয়ান রেকর্ড সৃষ্টি হলেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা মুষ্টিমেয় দু'-একটি দেশের মধ্যেই যেন সীমাবদ্ধ ছিল। এগারটি স্বর্ণপদক অর্জন করে পূর্ব জার্মানী শীর্ষস্থান লাভ করেছে। তারপর স্থান লাভ করেছে যথাক্রমে রাশিয়া ও ফ্রান্স।

এথেন্সে ভিন্ন পতাকার পাদদেশে এবারই প্রথম দুই জার্মানীর আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ। "মিউনিক অলিম্পিকে আমাদের গণতান্ত্রিক জার্মানীর পতাকা জাতীয় সংগীতের সুরে আরও উঁচুতে স্থান পাবে এটাই কামনা করি"—সমাপ্তি দিবসে সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন পূর্ব জার্মানীর ক্রীড়া মন্ত্রী।

ব্যাডমিণ্টনের আইন-কানুন

গত ৬ সংখ্যায় ব্যাডমিণ্টনের আইন-কানুন সম্পর্কীয় যে ২২টি প্রশ্ন প্রকাশিত হয়েছিল, এ সপ্তাহে সেই প্রশ্নের উত্তরের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাডমিণ্টনের আইনকানুন পর্যায়ের লেখা শেষ হয়ে যাচ্ছে। এর পর অন্য প্রসঙ্গ।

উত্তর

(১) না। যদিও যে লাইন দিয়ে কোর্ট চিহ্নিত হয় সেই লাইন কোর্টের অন্তর্ভুক্ত তবুও সার্ভিস করা বা সার্ভিস রিসিভ করার সময় ওই লাইনের উপর পা রাখা যায় না। লাইনের উপর পা থাকলে তো বটেই, এমন কি সার্ভিস করার বা সার্ভিস রিসিভ করার সময় পা দিয়ে লাইন স্পর্শ করলেও ফল্ট হবে। অবশ্যই রিসিভ করার ক্ষেত্রে সার্ভিস না হওয়া পর্যন্তই রিসিভারের পা লাইনের উপর থাকলে ফল্ট হবে (আইন ১৬)।

(২) না। এক্ষেত্রে খেলোয়াড় কোর্টের বাইরে হাত অথবা র‍্যাকেট চালনা করতে পারেন (**আইন** ১৪সি)।

(৩) না। সার্ভারের সহ খেলোয়াড় অর্থাৎ পার্টনার যেখানে খুশি দাঁড়াতে পারেন। তবে প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়ের বাধা সৃষ্টি না করে। রিসিভারের পরিস্কারভাবে সাটল দেখার অধিকার আছে (আইন ১৬)।

(৪) সার্ভিসের পর সাটল কোর্টের বাইরে গেলেও ফ্লোর স্পর্শ না করা পর্যন্ত ফল্ট হয় না। সুতরাং এ ক্ষেত্রে সার্ভার পয়েন্ট পাবে (আইন ১৭)।
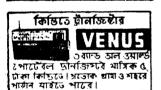
(৫) দুজনের মধ্যে যে কেউ সার্ভিস করতে পারে। তবে অবশ্যই ডান দিকের কোর্ট থেকে সার্ভিস আরম্ভ করতে হবে (আইন ১১)।

(৬) না, ফল্ট নয়। আবার সার্ভিস করতে হবে (আইন ১৮)।

(৭) সার্ভার সাটল না মারা পর্যন্ত রিসিভারের দুই পা ফ্লোরের সঙ্গে অনড় অবস্থায় মিশে থাকবে। সার্ভিস হবার পর রিসিভার সাটল মারার জন্য তার অর্ধ-কোর্টের বাইরেও যেতে পারেন (আইন ১৬)।

(৮) সার্ভারের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করলে রিসিভারের সহ খেলোয়াড়ের অবস্থানের কোনই বাধ্যবাধকতা নেই (আইন ১৬)।

(৯) একমাত্র বাধ্যবাধকতা তাদের র‍্যাকেট বা শরীরের কোন অংশ প্রতিপক্ষের কোর্টের মধ্যে অনুপ্রবেশ করবে না (৩ নম্বর ভাষ্য)।

(১০) না। যদি কোর্ট বদলের ভুল সঙ্গে সঙ্গে ধরা না পড়ে তবে গেম শেষ না হওয়া পর্যন্ত ভুল থেকেই যাবে। অর্থাৎ ভুলভাবে যে খেলোয়াড় যে কোর্টে গিয়েছে সেখানে থেকেই খেলা চালাবেন। অবশ্যই পর্যায়ক্রমে কোর্ট বদল করে সার্ভিস করতে হবে (আইন ১২)।

(১১) না 'লেট'-এর দাবী করা যাবে না। সাটল রিটার্ণ করার কোন চেষ্টা করা হলে খেলোয়াড় প্রস্তুত ছিলেন বলে ধরে নেওয়া হবে। যদি খেলোয়াড় প্রস্তুত না থাকেন তবে সাটল মারার কোনরকম চেষ্টা করা উচিত নয় (আইন ১৫)।

(১২) খেলার সময় সাটল হলের ছাদ স্পর্শ করলে সাটলকে আউট অফ কোর্ট বলে ধরতে হবে (আইন ১৪ সি)। ছাদে সাটল লাগলে যদি 'লেট' ডাকা হয় তবে খেলোয়াড় যখনই বিপদে পড়বে তখন ইচ্ছে করে ছাদে সাটল মেরে 'লেট'-এর দাবী জানাবে।

(১৩) সাধারণত এসব ক্ষেত্রে 'লেট' ডাকা হয়। তবে এ সম্পর্কে খেলার আগে জেনে নেওয়া দরকার তারে বা অন্য কিছুতে সাটল লাগলে কি হবে। ৪ নম্বর ভাষ্য অনুযায়ী যে সংস্থার উপর খেলা পরিচালনার দায়িত্ব সেই অ্যাসোসিয়েশন এ সম্পর্কে উপধারা প্রস্তুতের অধিকারী।

(১৪) লেট-এর সিদ্ধান্ত দিতে হবে (আইন ১৭)।

(১৫) হ্যাঁ, এ ধরনের শট এখন ফেয়ার শট হিসাবে পরিগণিত (আইন ১৪ (এইচ)।

(১৬) না। সেটা হবে প্রতিপক্ষের কোর্টে অনুপ্রবেশ। নেটের উপর দিয়ে নিজের কোর্টে সাটল না আসা পর্যন্ত অবশ্যই অপেক্ষা করতে হবে। তারপর সাটল মেরে র‍্যাকেট নেটের ওপাশে চালনা করা যেতে পারে। সাটল-এর সঙ্গে র‍্যাকেটের সংঘাতের সময় সাটল নেট পার হয়ে নিজের কোর্টে এলেই হল।

(১৭) হ্যাঁ, এটা ফেয়ার শট।

(১৮) ১৩—১৩ পয়েন্টে যদি গেম সেট করা না হয় তবে ১৪—১৪ পয়েন্টেও গেম সেট করা যায়। সেট করার সুযোগ একবার প্রত্যাখ্যান করলে দ্বিতীয়বারের সুযোগ নষ্ট হয় না।

(১৯) নিজের ফাউল শট খেলোয়াড়ের নিজেরই ডাকা উচিত এবং সেটা ডাকা উচিত ফাউল শটের সঙ্গে সঙ্গে। যেখানে আম্পায়ার আছেন সেখানে অবশ্য আম্পায়ারই সিদ্ধান্ত জানাবেন।

(২০) অবশ্যই। কারণ দুজনকে নিয়েই ডাবলসের দল। তাদের একজন আর একজনকে অবশ্যই এ ভাবে সাহায্য করতে পারেন।

(২১) র‍্যালিতে পয়েন্ট পাবে প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়। সাটল হলের ছাদে, দেওয়ালে বা কোর্টের বাইরে হলের পাটাতনে না পড়া পর্যন্ত সাটল আউট বলে গণ্য হয় না।

(২২) তার কোন মানে নেই। প্রতিপক্ষ টসে জিতে কোর্টের একদিক বেছে নিয়েছে। এবার কে প্রথম সার্ভিস করে খেলা আরম্ভ করবে সেটা নির্ভর করবে অপর খেলোয়াড়ের ইচ্ছার উপর। সে ইচ্ছে করলে প্রথমে সার্ভিস করতে পারে, আবার ইচ্ছে করলে যে টসে জিতেছে তাকে সার্ভিসের সুযোগ দিয়ে নিজে প্রথমে রিসিভও করতে পারে।

মুকুল

লী ফক

সেকালের সেই রাজারা আজও আছে? এখনও তাদের সেই আগের মতই দাপট?
হ্যাঁ, ডায়ানা। আপন-আপন রাজ্যে তারাই আজও সর্বেসর্বা।

অর্থাৎ সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তারা চলতে পারেনি। বাইরের পৃথিবীতে, এই বিংশ শতকের পরিবেশে মাঝে-মাঝে তারা আসে বটে, কিন্তু…
আপন রাজ্যে ফিরেই আবার মধ্যযুগের অন্ধকারে ডুব দেয়?

অন্তত একজন রাজা আমাকে দেখাতে পারো?
তা দেখা হয়ে যাওয়া এমন আর বিচিত্র কী?

বাইরের সভ্যতা একটু-একটু করে অরণ্যের মধ্যেও এগোচ্ছে-----

পর্ণ-কুটিরের পাশাপাশি গড়ে উঠছে আধুনিক ঘরবাড়ি-

গভীর অরণ্যে কিন্তু এখনও দাঁত আর নখের সেই আদিম রাজত্ব চলেছে-----
4/27

সেই গভীর অরণ্যের মধ্যেই লুকিয়ে আছে অরণ্যদেবের গুহা-----

পাহাড়ের ওদিকে রাজাদের এলাকা। এখনও তাঁরা মধ্যযুগীয় কায়দায় রাজ্যপাট চালান।

তাঁদের মধ্যে প্রিন্স চার্লই সবচাইতে ধনী, লোকে তাঁকে আড়ালে বলে 'পাজী রাজা'।
আমার হারেমে এইটিই সবচাইতে সুন্দরী। সিগারেটটা ধরিয়ে দাও তো।
এই যে-
সেজন্যে আমি বলেই এত টাকা মাইনে দিয়ে তোমাকে পাইলটের চাকরি দিয়েছি। এত টাকা তোমাকে আর কে দিত?

রঙ্গজগৎ

কলিকাতায় ফেস্টিভ্যালের ছবি

দিল্লি ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের প্রসাদ কলকাতায় এসে পৌঁছেছে সামান্যই। গত উৎসবগুলির সময় এখানকার দর্শকরা অনেক ভাল ভাল ছবি কলকাতায় দেখতে পেয়েছিলেন। এবার নিয়মের বাইরে কিছুই হবার নয়। প্রতিযোগিতা-শাখার কোন ছবিই উৎসবের বাইরে দেখানো চলবে না। তা-ছাড়া, মনে তো হয় না- উৎসবে খুব ভাল ছবি এসেছে। প্রতিযোগিতা-শাখার বাইরের ছবিগুলির মধ্যেও নামকরা পরিচালকদের ছবি বিশেষ নেই। তার মধ্যে কলকাতার জন্য মাত্র দশটি ছবি। সামান্য দরাদর, পাঁচটি সিনেমা হলে এক সপ্তাহ ধরে দেখানো হয়েছে। ছবিগুলি হল: ডেজ অব ম্যাথ, (পোলাণ্ড), ডোণ্ট লেট দি এঞ্জেলস ফল (কানাডা), লাভ ইন কার্নাক (ইউ এ আর), টু গ্রাব দি রিং (নেদারল্যাণ্ডস), নিউ অ্যাডভেঞ্চার অব দি ইলিউসিভস (সোভিয়েট রাশিয়া), ক্লোজলি ওয়াচড ট্রেনস (চেকোশ্লোভাকিয়া), কলাম (রুমানিয়া), হাণ্টিং ফ্লাইজ (পোলাণ্ড), এ ফানি ওল্ড ম্যান (চেকোশ্লোভাকিয়া) এবং মাটাঙ্গা (পশ্চিম জার্মানি)। আঁদ্রে ওয়াইদার ছবি "হাণ্টিং ফ্লাইজ"। ফ্রান্স ও ব্রিটেনের কোন ছবি কলকাতায় আসছে না। আমেরিকারও নয়। চেক ও পোলিশ ছবির একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। এই দুই দেশের ছবিই কলকাতার চলচ্চিত্র সপ্তাহকে কিছুটা মূল্যবান করে তুলেছে। ক্যানাডার "প্রোলোগ"-ও আসেনি। লিণ্ডসে অ্যাণ্ডারসনের "ইফ"ও নয়। ভিসকণ্টির "ড্যামড"-এর তো কোন আশাই ছিল না। অতএব কলকাতার ফিল্ম-বোদ্ধাদের এবার অল্পেতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে।

রূপশ্রী ইন্টারন্যাশনাল রবীন্দ্রনাথের "চতুরঙ্গ" কাহিনীর নায়িকা সুচিত্রা সেন

রূপশ্রী ইন্টারন্যাশনালের প্রথম ছবি "সাগিনা মাহাতো"-র কাজ প্রায় শেষ। গত ২রা ডিসেম্বর দিলীপকুমার ও সায়রা বানুকে নিয়ে ছবিটির শেষ পর্যায়ের দশদিনব্যাপী শুটিং সমাপ্ত। তপন সিংহ ছবির পরিচালক, চিত্রনাট্যকার ও সংগীত পরিচালক।

"সাগিনা মাহাতো"-র পর রূপশ্রী ইন্টারন্যাশনালের হিন্দী আপন জন-এর শুটিং আরম্ভ হচ্ছে জানুয়ারিতে। কে এল কাপুর প্রোডাকশন্স-এর সঙ্গে যুগ্মভাবে রূপশ্রী ইন্টারন্যাশনাল ছবিটি প্রযোজনা করছেন। তপন সিংহের এটাই হবে প্রথম হিন্দী চিত্র। ওয়াহীদা রেহমান, সঞ্জীবকুমার, কিশোরকুমার, জালাল আগা ও নাকি জাহা ছবির কয়েকটি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করবেন। সংগীতপরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন এস ডি বর্মণ।

রবীন্দ্রনাথের "চতুরঙ্গ"-র চিত্ররূপ দিচ্ছেন রূপশ্রী ইন্টারন্যাশনাল। এ-ছবির প্রধান স্ত্রী-চরিত্রে অভিনয় করবেন সুচিত্রা সেন।

তারপর "সাগিনা মাহাতো"-র হিন্দী-রূপ তৈরি হবে। তাতেও দিলীপকুমার ও সায়রা বানু অভিনয় করবেন। ছবিটি হবে কালারে। রূপশ্রী ইন্টারন্যাশনালের অন্যতম কর্ণধার চিত্রপ্রযোজক শ্রীহেমেন গাঙ্গুলী।

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত "অরণ্যের দিন রাত্রি" ছবিতে শর্মিলা ঠাকুর ও কাবেরী বসু।

ফটো—দেশ

"প্রতিবাদ"-এর শুটিং চলছে

আর্ট মুভীজ-এর প্রথম ছবি "প্রতিবাদ"-এর প্রথম পর্যায়ের শুটিং আরম্ভ হয়েছে। বিশ্বজিৎ, মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়, রুমা বন্দ্যোপাধ্যায়, অজয় গাঙ্গুলি, পদ্মা দেবী ও গৌর শী ছিলেন শুটিংয়ের শিল্পী। সুলতা চৌধুরী, কালীপদ চক্রবর্তী, চিন্ময় রায়, জহর রায়, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় ছবির অন্যান্য শিল্পী। অজিত গাঙ্গুলির কাহিনী অবলম্বনে চিত্রপরিচালনা করছেন তপেশ্বরপ্রসাদ।

সংগীতপরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন অসীমা ভট্টাচার্য। শ্রীমতী ভট্টাচার্য ইতিপূর্বে "চৌরঙ্গী"-র সংগীত-পরিচালিকা হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছেন।

জেমিনীর "পৈসা ইয়া প্যার" ছবিতে শারদকুমার ও তনুজা।

টলি-টিপ্পনী

টালিগঞ্জে এখন অশান্তির দিন রাত্রি। শিল্পী ও কলাকুশলীদের মধ্যে কোথাও উত্তেজনা, কোথাও অস্বস্তি। "অরণ্যের দিন-রাত্রি"র মুক্তি নিয়ে যে বিক্ষোভের সূত্রপাত, তার মর্মান্তিক পরিণতি কারো অজানা নয়। এই লেখা শুরু করার সময় পর্যন্ত স্টুডিওগুলিতে ধর্মঘট চলছে, সংরক্ষণ সমিতির অধিকাংশ সদস্যই এখন উল্লিখিত ছবিটির প্রদর্শন গৃহের সামনে "পিকেটিং" নিয়ে ব্যস্ত। সমিতির জনৈক মুখপাত্র বললেন, সরকার নিযুক্ত কনসালটেটিভ কমিটির সিদ্ধান্ত মত "অরণ্যের দিনরাত্রি" যদি সেনসার ওরাইজ হাউসে আসত, তাহলে নাকি এই অশান্তির সূত্রপাত হত না। আজ শুক্রবার, কলকাতার তিনটি চিত্রগৃহে—দর্পণা, প্রাচী ও ইন্দিরায় "অরণ্যের দিনরাত্রি"র সমস্ত শো বন্ধ রাখা হয়। এদিনও যথারীতি ওই তিনটি হলের সামনে সংরক্ষণ সমিতির পক্ষ থেকে সত্যাগ্রহ চলে। অবস্থা শীঘ্রই স্বাভাবিক হয়ে আসবে বলে সংশ্লিষ্ট সকলেই আশা প্রকাশ করেন।

*

নিউ থিয়েটার্স দু নম্বর স্টুডিওতে কিন্তু কোন ধর্মঘট হচ্ছে না। এখানে শুটিং চলছে তপন সিংহের "সাগিনা মাহাতো"র। দিলীপকুমার ও সায়রা বানু কলকাতায় এসেছেন গত সপ্তাহে তপনবাবুর "সাগিনা"-র শেষ পর্যায়ের শুটিংয়ে অংশ গ্রহণ করতে। সেদিন দু' নম্বরে ওঁদের শুটিং দেখলাম। বাংলা মদের সরাইখানায় সায়রা বানু নাচছেন, তালে তালে দুলে দুলে গান গাইছেন দিলীপকুমার।

"ভালোবেসে ভালোবেসে

বাসরে ভালো,
নইলে বেসো না।"

তপনবাবুর নিজের লেখা গান। কোরাস। নেপথ্যে গেয়েছেন মৃণাল চক্রবর্তী ও আরো অনেকে। সেটে সেদিন দিলীপকুমারের সাগরেদ দলে অভিনয় করলেন কল্যাণ চ্যাটার্জি, সন্তু মজুমদার ও চিন্ময় রায়। রূপশ্রী ইণ্টারন্যাশনালের "সাগিনা মাহাতো"র শুটিং অবশেষে শেষ হল, জানালেন প্রযোজক হেমেন গাঙ্গুলি। দিলীপকুমার বললেন, তপনবাবুর ইউনিটকে তাঁর মনে থাকবে অনেক দিন। "সাগিনা"-র কাজ করে নাকি তিনি প্রভূত আনন্দ পেয়েছেন। "ভবিষ্যতে আর বাংলা ছবি করার ইচ্ছে আছে কি?"—এ প্রশ্নের উত্তরে দিলীপকুমার মৃদু হেসে জবাব দেন, "ভবিষ্যৎ আমাদের সকলেরই অজানা।"

১২ ডিসেম্বরের কথা বলছি আমি। শিল্পী ও কলাকুশলীদের অনেকেরই মন সেদিন ইডেনমুখী। দিলীপকুমারও ক্রিকেটের ভক্ত, জানালেন সে কথা। সময় থাকলে ইডেনের চতুর্থ টেস্ট উনি দেখে যেতেন, কিন্তু পরের দিনই তাঁকে আবার মাদ্রাজ চলে যেতে হবে বলে সেটা আর সম্ভব হল না। "সাগিনা"-র অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে সেটে সেদিন স্বরূপ দত্তও ছিলেন। স্বরূপের খুব মন খারাপ দেখলাম। টিকিট পেয়েও নাকি শুটিংয়ের জন্যে উনি খেলা দেখতে যেতে পারলেন না, আক্ষেপের সুরে বললেন স্বরূপ।

—বিচক্র

অবশেষে "আরোগ্য নিকেতন"

আরোরা ফিল্ম করপোরেশনের "আরোগ্য নিকেতন" (পরিচালনা : বিজয় বসু) ছবির মুক্তি নিয়ে ইতিপূর্বে আড় বেধে গেছে। ছবিটি শেষ পর্যন্ত ২৬ ডিসেম্বর মুক্তি পাচ্ছে বলে বিজ্ঞাপিত। ছবির প্রধান চরিত্র-গুলিতে অভিনয় করেছেন বিকাশ রায়, সন্ধ্যা রায়, রুমা গুহঠাকুরতা, ছায়া দেবী, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, রবি ঘোষ ও সন্তোষ জহর গাঙ্গুলি। সংগীত পরিচালনা করেছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়।

নাট্য-সমালোচনা

বাসু মেননের "ওয়ারিশ" হিন্দী চিত্রে জিতেন্দ্র ও হেমা মালিনী।

জন্মভূমি

(থিয়েটার ইউনিট)

সাধারণত বক্তব্যপ্রধান নাটক 'এন্টারটেনিং' হয় না। শুধু কথায় চিঁড়ে না ভেজার মতন। থিয়েটার ইউনিটের 'জন্মভূমি' কিন্তু সে-রকম নয়। উদ্দেশ্যপূর্ণ নাটকের যেটা বড় দোষ তা 'জন্মভূমি'তে নিশ্চয়ই আছে। একটি গ্রামের দুই শ্রেণীকে মুখোমুখি দেখানো হয়েছে নাটকে, শোষক মহাজন, জোতদার ইত্যাদি এবং শোষিত কৃষক। যারা মন্দ তারা অতিশয় মন্দ, যারা সৎ তারা অতিশয় সৎ—এমন ভাল মানুষ যে একেবারে বোকা। অবোধকে শোষণ করার সুবিধা বেশি। হয়ত কুচক্রী মহাজনদের শয়তানি ফলাও করে দেখাবার জন্যই বক্তব্যবাহী নাটকের এই রীতি। 'জন্মভূমি' সেদিক থেকে প্রথাসিদ্ধ। তিন মূর্তিমান শয়তান হাজি সাহেব, শেঠ মণ্টার ও রূপচাঁদ সর্দার দল অবাধে নিরীহ কৃষকদের উপর অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে—সভ্যজগতের কাছে যা অকল্পনীয়। নাট্যকার পরিচালক শেখর চট্টোপাধ্যায় চরিত্রগুলি এঁকেছেন ভাল। তবে এক পক্ষকে অতিমাত্রায় সবল করেছেন, অপরপক্ষকে করে রেখেছেন একেবারে অসহায়। এতে প্রবলের শাসন ও শোষণ তিনি নিখুঁতভাবে দেখাতে পেরেছেন, সবলের প্রতিকারহীন অপরাধ দেখাতে গিয়ে শোষকদের দুষ্প্রবৃত্তি তুলে দিয়েছেন চরমে। তাতে তিনি তাঁর উদ্দেশ্যই সিদ্ধ করতে চেয়েছেন, কিন্তু সামান্যতম প্রতিরোধ থাকলেও যে দ্বন্দ্ব জমে ভাল—অন্তত নাট্যদ্বন্দ্ব তো বটেই—এবং অত্যাচারের মাত্রাও যে আরও বিশ্বাসযোগ্য হয় সে খেয়াল বোধহয় ছিল না নাট্যকার-পরিচালকের। প্রতিরোধের প্রস্তুতি যখন, নাটক তখন শেষ।

অবশ্য এই ধরনের নাটক দর্শকমনে যে ক্লান্তি ও বিরক্তি আনে 'জন্মভূমি' দেখে সে সংশয় পাবার কোন অবকাশ নেই। এইখানেই শেখর চট্টোপাধ্যায়ের রসবোধ এবং বাহাদুরি। তিনি একটি গ্রামের পটভূমিতে কৃষককুলের দৈন্যদুর্দশা দেখাবার বিষয়টি বড় করে ভাবলেও গ্রামীন সংস্কৃতির কথা ভুলে যাননি। গ্রামে যে-ধরনের নাচ-গান তা নাটকে দেখানো হয়েছে। আমোদের উপকরণ বলতে যা বোঝায় তাও নাটকে যথেষ্ট। অর্থাৎ মূল নাট্যবস্তুর আশেপাশে ছোট ছোট নাট্য ঘটনা এবং কৌতুকের উপাদানও রয়েছে। বিধবা গঙ্গা, বারবণিতা বাতাসী, মুসলমান কৃষকের মেয়ে বেগম ও স্বাধীনচেতা বাদশা—এদের নিয়ে কয়েকটি নাটকীয় পরিস্থিতি রচনার কাজ সুন্দর।

একটি গ্রামে এত বেশি মানুষ শুধুই অনাচার ও অত্যাচার চলছে—কারো কিছু বলবার নেই—এটা ভাবতেই অস্বাভাবিক লাগে। তার মধ্যে বি-ডি-ও (শেখর চট্টোপাধ্যায়) অত্যাচারিতের পক্ষ নিয়ে রুখে দাঁড়ালেন, তখন দর্শক অদ্ভুত স্বস্তি বোধ করেন। ওই চরিত্রের মানবত্ব-বোধ চমৎকারভাবে দেখানো হয়েছে। কিন্তু কিছুই করতে পারেননি তিনি, কিছুই যেন করবার নেই—উঁচু মহলের সঙ্গে শয়তানদের অশুভ আঁতাতের ফলে তাঁকে চাকুরি ছাড়তে হয়েছে। চাকুরি ছাড়তে পারাই যেন কিছু করা, অন্তত নিজের বিবেককে ঠকানো নয়—এই নৈতিক আত্মপ্রসাদ বি-ডি-ও'র কাছ থেকে কেউ কেড়ে নিতে পারল না। কৃষকদের সঙ্গে লড়ে গেছেন গ্রামের স্কুলের মাস্টার—শেষ পর্যন্ত বিপ্লবী হিসাবে তিনি পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন। এতে অনুমান করা যেতে পারে কাহিনী কোন অমঙ্গলের, তবে সূর্যোদয়ের লাল আভা ছড়িয়ে পড়তে বিলম্ব হয়নি। এক্ষেত্রে তাপস সেনের আলোকসম্পাতের সুযোগ যথাযথ নিয়েছেন পরিচালক।

গোড়াতে যা বলেছি সেই সূত্রে আবার বলা, সোচ্চার বক্তব্য সত্ত্বেও "জন্মভূমি" আসল নাটক, নাটকের গুণ এতে যথেষ্ট এবং এক কথায়, খুব উপভোগ্য।

উপভোগ্যতা আরও বেড়েছে টিম-ওয়ার্কের গুণে। অভিনয় প্রত্যেকেরই উঁচুদরের। শেখর চট্টোপাধ্যায় ও সাবনা রায়চৌধুরীর মঞ্চাভিনয় বরাবরই দর্শকের অকুণ্ঠ প্রশংসা পেয়েছে—এ-নাটকে আরও বেশি পাবে। শেখর চট্টোপাধ্যায় অভিনীত চরিত্রে মানুষের প্রতি দরদ, আবার তাঁর অভিনয়ে কখনও কমেডির ঢঙ অপূর্ব।

উত্তীয় দেব হয়েছেন হাজি সাহেব। টাইপ চরিত্র সৃষ্টিতে তিনি অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়েছেন। দীপিকা ভট্টাচার্যের বাতাসী আর একটি চমৎকার চরিত্রচিত্রণ। বাদলা

"পরিচয়" (কাহিনী : বিমল কর) ছবির কাজ শুরু হয়েছে গান রেকর্ডিংয়ের মধ্য দিয়ে; সংগীত পরিচালক শৈলেশ রায় (বাঁয়ে) এবং দুই কণ্ঠশিল্পী মৃণাল মুখার্জি ও মৃণাল চক্রবর্তী—নির্মল মিত্র ছবিটির পরিচালক। ফটো: দেশ

চরিত্রে সমর বন্দ্যোপাধ্যায়ও কম যান না। প্যানা চরিত্রে মণ্টু ঘোষের অভিনয়ও প্রশংসনীয়। আরও বেশি ভাল লাগে তাঁর গান। স্টেজে ভাল গায়কের অভাব, সে ক্ষেত্রে মণ্টু ঘোষকে দর্শকরা স্বাগত জানাবেন। অভিনয় আরও অনেকেরই খুব ভাল। এঁরা হলেন সুজিত সরকার, কানাই বন্দ্যোপাধ্যায়, আলোক রায়চৌধুরী, নন্দিতা চৌধুরী, নবেন্দু গুপ্ত, অরবিন্দ ভট্টাচার্য প্রমুখ। খালেদ চৌধুরীর মঞ্চসজ্জা ও সংগীত বিশেষ প্রশংসার যোগ্য।

দি নাইট অফ দি ইগুয়ানা

(দি অ্যামেচারস)

আজকাল শোনা যায় এমন কয়েকটি মাত্র সংস্থাই কলকাতায় আছে, যারা নিয়মিত বিদেশী নাটক অভিনয় করে থাকে। 'দি অ্যামেচারস' তাদেরই অন্যতম। ১৯৬০ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত এঁরা তিরিশটিরও বেশি বিদেশী নাটক অভিনয় করেছেন। গত ৯ ডিসেম্বর টেনেসি উইলিয়ামসের বিখ্যাত নাটক "দি নাইট অফ দি ইগুয়ানা"র এক বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন এঁরা কলামন্দির প্রেক্ষাগৃহে। পরে ১০ থেকে ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত আরও পাঁচটি অভিনয় এঁরা করেছেন ওয়াই ডবলিউ সি এ-র সাহায্যের জন্য।

টেনেসি উইলিয়ামসের আলোচ্য নাটকটি আদি-মধ্য-অন্ত বিশিষ্ট কোন সাদামাটা ঘটনাবহুল কাহিনীপ্রধান নাটক নয়। এ নাটকে মানব-মনের জটিল কিছু রহস্য নিয়ে কারবার করেছেন নাট্যকার। সে ক্ষেত্রে এ নাটকটির মঞ্চাভিনয় নিঃসন্দেহে কঠিন। সুখের বিষয়, দি অ্যামেচারসের শিল্পী-গোষ্ঠী সে পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ।

এ নাটকের প্রধান পুরুষ রেভারেন্ড স্যানন এক বিচিত্র চরিত্র। সুস্থ সহজ জীবনে নিরাসক্ত এই মানুষটি জৈবিক ক্ষুধার দাসত্বে শৃংখলিত। ঈশ্বর-উপাসকের মহান দায়িত্ব থেকে বিতাড়িত এই মানুষটি এখন টুরে কনডাক্ট করে বেড়ায়। দশের অল্পবয়স্ক বালিকাদের প্রতি তার আসক্তি কোন বৈধ-সীমানায় আবদ্ধ থাকে না। মেক্সিকোর এক জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ী অঞ্চলে ভ্রমণযাত্রীদের গাড়ি খারাপ হলে রেভারেন্ড যে হোটেলে আশ্রয় নেয়, সে হোটেলের মালিক বিধবা ম্যাক্সিন স্যাননের পূর্ব পরিচিতা। ম্যাক্সিন স্যাননের দেহ-মুগ্ধ। তাকে আটকে রাখতে চায় এখানে চিরকালের মত। আসন্ন দুর্যোগ মাথায় নিয়ে ওই হোটেলে এসে উপস্থিত হয় তরুণী হান্না তার সাতানব্বই বছরের বৃদ্ধ মাতামহকে নিয়ে। প্রথম দর্শনেই হান্নার প্রতি আকৃষ্ট হয় স্যানন। ম্যাক্সিন সেটা বুঝতে পেরে ওদের আশ্রয় দিতে রাজি হয় না। স্যাননের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত মত পাল্টাতে বাধ্য হয় সে। সেই রাত্রেই একটি ইগুয়ানা ধরা পড়ে। ইগুয়ানা অতি নিরীহ জীব। তার মাংস অতি সুস্বাদু। ম্যাক্সিন ওটিকে বেঁধে রাখে হোটেলে।

সেই রাত্রেই স্যানন এবং হান্নার মধ্যে পরিচয় গাঢ় হয়। দুজনে দুজনের মনের কাছাকাছি আসে। স্যাননের অসহায়তা হান্না বুঝতে পারে। তার সরলতা, উদারতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও শুভময়তা স্যাননের চিত্তকে শুদ্ধ করে, পবিত্র করে।

সেই রাত্রেই হান্নার মাতামহ মারা যান। সেই রাত্রেই বন্দী ইগুয়ানাটিকে নিজের হাতে মুক্তি দেয় রেভারেন্ড স্যানন। সেই ক্ষণে আকাশ মেঘমুক্ত। সব দুর্যোগ কেটে গেছে।

প্রয়োগ-কর্মের আশ্চর্য নৈপুণ্য এই নাটকে। শ্রীমতী নীতা পিল্লাইকে একান্ত অকুণ্ঠ সাধুবাদ জানাতে হয়। সমগ্র নাটকটিকে তিনি হৃদয়গ্রাহ্যে পরিণত করেছেন। খণ্ড খণ্ড বিক্ষিপ্তভাবে এখানে-ওখানে এক একজনের হৃদয়ের দ্বার উন্মোচিত হচ্ছে। কখনো কথায়, কখনো বাতায়, কখনো

শব্দে, কখনো বা নৈঃশব্দ্যে নাটক এগিয়েছে শেষ পর্যন্ত দর্শকদের পৌঁছে দিয়েছে সুন্দর ও মহান এক অনুভূতির জগতে। শ্রীমতী পিল্লেকে আরও একবার ধন্যবাদ জানাই।

অভিনয় প্রায় প্রত্যেকেরই ভাল। সেরা অভিনয় রেভারেনড স্যাননের চরিত্রে বিমল ভগত-এর। ওই চরিত্রের দেহ-লোলুপতা, অসহায়তা, নীচতা এবং মহত্ব শিল্পীর অভিনয়ে আশ্চর্য প্রাণবন্ত। এর পরেই নাম করতে হয় হান্নার চরিত্রে পামেলা পারকস এবং ম্যাকসিনের ভূমিকায় জুনি বোসের। প্রথম জন সরলতা ও কোমলতার প্রতি-মূর্তি, দ্বিতীয় জন অবৈধ জীবন যাপনে অভিলাষী। প্রকৃতিতে দুজনে দুই মেরুর। দুজনের অভিনয়েই সেটা আশ্চর্য দক্ষতায় প্রকাশিত। অন্যান্য ভূমিকায় বিজয় কৃষ্ণা, প্যাট শ্যানড, রীতু কুমার, সমর চৌধুরী ও ভিকটর ব্যানার্জি চরিত্রানুগ। একমাত্র নাইক্রম বৃদ্ধের চরিত্রে কমল ভগত। তাঁর অভিনয়ে বার্ধক্য সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

সংগীত ও সাউন্ড এফেক্ট (আর এস পিল্লে) এবং আলোর কাজ (কণিষ্ক সেন) এ নাটকের ভাব প্রকাশে প্রভূত সহায়তা করেছে। মঞ্চের পরিকল্পনাটিও বড়ই সুন্দর।

-দিবাকর বর্মা

শীশমহলে চতুর্মুখ

বিশিষ্ট নাট্য সংস্থা চতুর্মুখ ১৮ ডিসেম্বর থেকে প্রত্যেক বৃহস্পতি, শনি, রবি ও ছুটির দিনগুলিতে হাওড়ার একমাত্র স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ শীশমহল থিয়েটারে নিয়মিত ভাবে নাটক অভিনয় করছেন।

"প্রতিদান" (পরিচালনা : অজিত গাঙ্গুলী) ছবিতে অনিল চ্যাটার্জি ও কাজল গুপ্তা

প্রথম এঁরা মঞ্চস্থ করছেন তাঁদের বিখ্যাত নাটক "জনৈকের মৃত্যু"। নাটক ও নির্দেশনার দায়িত্বে রয়েছেন অসীম চক্রবর্তী। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করবেন : চিত্রিতা মণ্ডল, রাধা ভট্টাচার্য, রেণু ঘোষ, সুনন্দা সান্যাল, নীহার তালুকদার, প্রশান্ত মুখার্জি, অনিল ব্যানার্জি, প্রদীপ মুখার্জি, তপন বিশ্বাস, স্বপন বিশ্বাস, দিলীপ মুখার্জি, সুখেন্দু সাহা, প্রণবজ্যোতি গোস্বামী, সমীর দাস, বিমল চক্রবর্তী, ধীরাজ ব্যানার্জি, নরেন্দ্র সিংহ, রতন বাগ, রঘু চক্রবর্তী, সাগর চৌধুরী, অমিয় সান্যাল ও অসীম চক্রবর্তী।

রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'র নাট্যরূপ

বাংলা সাহিত্যের যে-কয়েকটি উপন্যাসের নাট্যরূপ মঞ্চে অসামান্য সার্থকতা অর্জন করেছে, সেগুলির মধ্যে "গোরা"র স্থানটি বিশেষভাবে চিহ্নিত হবার যোগ্য। বিশেষত আধুনিক নাট্যআন্দোলনের নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার পাশে এ ধরনের পরিচিত এবং পরীক্ষিত আঙ্গিকের নাটকগুলির একটা স্বতন্ত্র আবেদন আছে। এই আবেদনটিই সেদিন অনুভব করেছি ২৯শে নভেম্বর, রবীন্দ্র-সরোবর-সংলগ্ন প্রেক্ষাগৃহে 'মুক্তমঞ্চ' প্রযোজিত 'গোরা' নাটক দেখতে গিয়ে। নাটকের বিষয়বস্তুতে যেমন, উপস্থাপনার মধ্যেও তেমনই অতিক্রান্ত যুগের একটি পরিবেশ চমৎকার ফুটে উঠেছিল।

'মুক্তমঞ্চে'র নাট্যানুষ্ঠানের সর্বপ্রধান আকর্ষণ ছিল সুন্দর অভিনয়। দর্শকদের সহজে আকৃষ্ট করবার মতন প্রচুর উপাদান 'গোরা' নাটকের একাধিক চরিত্রে উপস্থিত। 'মুক্তমঞ্চে'র অভিনেতা-অভিনেত্রীরা তার সদ্ব্যবহারও করেছেন সার্থকভাবে। এঁদের মধ্যে আনন্দময়ীর চরিত্রে মায়া সেনগুপ্তকে সবচেয়ে আগে মনে পড়বে। পরেশবাবুর ব্যক্তিত্বের পরিস্ফুটনে হীরেন চট্টোপাধ্যায়ের কৃতিত্বও উল্লেখযোগ্য। সুনীতি বোসের সুদীর্ঘ দেহ আর সুগম্ভীর কণ্ঠস্বর নাম-ভূমিকায় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বিশেষ অনুকূলে ছিল। তাঁর অভিনয়ও ভাল হয়েছে। বিশেষতঃ শেষ দৃশ্যের আবেগের অভিব্যক্তিটুকু মনকে নাড়া দেবার মতন।

সংগীতের অংশটি অবশ্য একটু দুর্বল ছিল। মঞ্চ-সজ্জার দিকেও আর একটু যত্নবান হবার প্রয়োজন আছে।

নির্মল মিত্র পরিচালিত "প্রথম বসন্ত" ছবিতে অনিল চট্টোপাধ্যায়, ইলা চ্যাটার্জী ও মাধবী মুখোপাধ্যায়।

সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গফফর খানের (বাদশা খানের) কলকাতায় আগমন এই সপ্তাহের মুখ্য আলোচনার বিষয়। ১০ ডিসেমবর বাদশা খান কলকাতায় পদার্পণ **করেন।** দমদম বিমান ঘাটিতে ও শহরের পথে কিছু-সংখ্যক পাঠান সহ হাজার হাজার লোক স্বাধীনতা সংগ্রামের এই বীর অহিংস যোদ্ধাকে স্বাগত জানিয়েছেন। কলকাতায় **আগমনের পরে** সীমান্ত গান্ধী রাজভবনে তাঁর প্রথম ভাষণে **বলেন** যে, গান্ধীকে ভুলে গিয়ে হিন্দুস্থানের **ক্ষতি** হয়েছে। ১১ ডিসেমবর সকালে কলকাতার শহীদ মিনার ময়দানে লক্ষাধিক **মানুষের সমাবেশে** খান আবদুল গফফর খান ঈদ মুবারক **জানা**-লেন। "সারা ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র বাংলা দেশেই আমি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মিল দেখেছি" একথা বলে ১১ ডিসেমবর **অপরাহ্নে** ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউনডে **বাদশা খান** বাংলা দেশকে অভি-বাদন জানান। সঙ্গে সঙ্গে বাংলার মানুষকে তিনি হুশিয়ার করে দিয়ে **বলেন ঃ**—বড় লোকেরা দাঙ্গা চায়। তারা চায় মুসলমানেরা **মার খাক। ১২ ডিসেমবর** সীমান্ত গান্ধী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছাত্র-শিক্ষক, কর্মচারী, অভিভাবকদের এক সভায় জাতি গঠনে ছাত্রদের আত্মনিয়োগ করার **আহবান** জানান। এদিন বেলেঘাটায় গনি মিঞার বাগানে হায়দরী ম্যানসনে গান্ধীজীর প্রতিকৃতিতে তিনি মাল্যদান করেন। **১৪ ডিসেমবর** অপরাহ্নে কেন্দ্রীয় পৌরভবনে পৌর-সভার পক্ষ থেকে প্রদত্ত এক সম্বর্ধনা সভায় বাদশা খান জাতীয়তার ভিত্তিতে দেশ গড়ে তোলার আহবান জানান। এদিন তিনি নেতাজী ভবনেও পদার্পণ করেন।

দেশী সংবাদ

৮ ডিসেমবর—আসন্ন ক্রিকেট টেস্টে হাঙ্গামা আশঙ্কায় রাজ্য সরকার সামরিক বাহিনীকে সতর্ক করে রেখেছেন। আজই রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে পূর্বাঞ্চলের সামরিক কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ক্রিকেট খেলার সময় কোন হাঙ্গামা দেখা দিলেই তা মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনে সামরিক কর্তৃপক্ষের সাহায্য নেওয়া হতে পারে।

আজ বিকালে এক ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানে কলকাতা মহানগরীর প্রাণকেন্দ্র ডালহৌসী স্কোয়ারের নাম বদল করে 'বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ' রাখা হয়। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় আনুষ্ঠানিকভাবে মহাকরণের সামনে, লালদীঘির উত্তর-পশ্চিম কোণে ওই তিন মৃত্যুঞ্জয়ী বীরের নামাঙ্কিত স্মৃতিফলকের উন্মোচন করেন।

৯ ডিসেমবর—লোকসভায় আজ সর্বসম্মতি-ক্রমে সংবিধান সংশোধন (২৩তম) বিল গৃহীত হয়েছে। এই বিলে ১৯৭০ সালের ২৬ জানুয়ারির পর আরও ১০ বছর লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভাগুলিতে তপশিলী সম্প্রদায় ও তপশিলী খন্ডজাতীয়দের আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় আজ সাংবাদিকদের বলেন,—রাজ্যে হানাহানি কিছু কমেছে। কমেছে শরিকী ঝগড়াও। ভূমি ও ভূমিরাজস্বমন্ত্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙারও এদিন মহাকরণে বলেন, ধানকাটা নিয়ে সংঘর্ষ সরকারের কাছে আর তেমন সমস্যাই নয়।

১০ ডিসেমবর—সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গফফর খান আজ কলকাতায় এই বলে খেদ প্রকাশ করেন যে, ভারতবাসী যে আজ শুধু [illegible] নয়, নিজের দেশ [illegible] তিনি বলেন ভারত [illegible]।

১১ ডিসেমবর—আইন ও শৃঙ্খলার অবনতি ঘটেছে এই মিথ্যা অজুহাতে কেন্দ্রীয় সরকার যদি পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন চাপিয়ে দেন তাহলে সারা রাজ্যে আগুন জ্বলবে—গতকাল শ্যামবাজারে উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু একথা বলেন।

খেলার মাঠে শান্তি রক্ষার জন্য মিলিটারী প্রস্তুত। প্রয়োজনে মুহূর্তের মধ্যে তারা ছুটে আসবেন। এ ছাড়া বৃহস্পতিবার রাত থেকেই ইডেনে ইসটারন ফ্রনটিয়ার-এর একটি বাহিনী মোতায়েন করার কথা। রাজ্য সরকার যে-কোনভাবে খেলার মাঠে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর।

১২ ডিসেমবর—আজ সকাল দশটায় রাসেল স্ট্রীটের স্টেট ব্যাঙ্কে একদল সশস্ত্র ডাকাত ৪ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা ও আরও চার লক্ষ টাকার শেয়ার ও সরকারী সিকিউরিটি পেপার লুঠ করে নিয়ে উধাও হয়ে যায়। প্রায় দুমাসের মাথায় কলকাতায় এটি আর একটি দুঃসাহসিক ব্যাঙ্ক ডাকাতি।

ধান-কাটা নিয়ে কান্দী থানার হাটপাড়া গ্রামের অধিবাসীদের সঙ্গে পাশের জিয়াদারা ও অন্যান্য গ্রামের বাসিন্দাদের দাঙ্গাহাঙ্গামার ফলে জিয়াদারা দলের চারজন খুন হয়েছে এবং বেশ কিছু লোক জখম হয়েছে। গত ১ ডিসেমবর গোটা হাটপাড়া গ্রামটি এক বিক্ষুব্ধ জনতা আগুনে লাগিয়ে পুড়িয়ে দেয়।

১৩ ডিসেমবর—কলকাতার স্টেট ব্যাঙ্ক ডাকাতির পর ২৪ ঘন্টা না যেতেই আবার আসানসোলের কাছে আজ সকাল সাড়ে ৯টায় এক দুঃসাহসিক ডাকাতি হয়ে গেছে। রিভলভার ও স্টেনগান সজ্জিত ডাকাত দলের সঙ্গে তীর-ধনুক, লাঠি-বল্লমধারী খনি শ্রমিকদের সশস্ত্র লড়াইয়ে ডাকাত দলের ৪ জন, ডাকাতের গুলিতে কয়লা খনির একজন ক্যাশিয়ার এবং একজন শ্রমিক নিহত হন। ডাকাত দলের কাছ থেকে ১ লক্ষ ১২ হাজার ৯০০ টাকা এবং একটি স্টেনগান উদ্ধার করা হয়েছে। প্রকাশ ঃ খনিশ্রমিকদের বেতন দেওয়ার জন্য ৪ লাখ টাকা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। খনি শ্রমিকরা ২ জন আহত ডাকাতকে আটক করে পুলিসের হাতে অর্পণ করে। পুলিসের অনুমান দুর্বৃত্তরা আন্তঃরাজ্য এক ডাকাত দলের সঙ্গে জড়িত।

১৪ ডিসেমবর—পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস পরিষদীয় দল (ইন্দিরাপন্থী) আজ এক বৈঠকে দলের চীফ হুইপের পদ থেকে শ্রীহেমবন্ত [illegible] এবং সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে শ্রী[illegible] মাইতিকে অপসারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

আজ বেলগাছিয়ায় একটি ছেলের ট্রামে চাপা পড়ার ঘটনা নিয়ে দুদল মারমুখী জনতার মধ্যে প্রচন্ড সংঘর্ষ হয়। আধ ঘন্টা ধরে বোমা, পটকা, সোডার বোতল, ইট, পাথর নিক্ষিপ্ত হয়। ট্রামের চালক প্রহৃত হয়। একটি ট্রাম ও দুটি লরি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। সংঘর্ষের মধ্যে দমকলের তিনজন কর্মী এবং দুজন পুলিস আহত হন। এ সংঘর্ষে আহতের সংখ্যা ২০।

বিদেশী সংবাদ

৮ ডিসেমবর—পশ্চিম জারমানী এবং সোভিয়েট রাশিয়া অনাক্রমণ চুক্তি প্রসঙ্গে আজ মসকোতে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় বসেছে। ১৫ নবেমবর বন সরকার আলোচনার স্থান ও তারিখ ঠিক করার জন্য যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন রুশ সরকার তা মেনে নিয়েছেন এবং সেই ভিত্তিতেই আলোচনা শুরু হয়েছে।

৯ ডিসেমবর—একটি গ্রীক যাত্রিবাহী বিমান আজ এথেনসের কাছে এক পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ভেঙে পড়ে। ফলে বিমান আরোহী মোট ৯০ জনই মারা গিয়েছে। এর মধ্যে ৮৫ জন ছিলেন যাত্রী এবং ৫ জন বিমানকর্মী।

১০ ডিসেমবর—[illegible] ন্যাশনাল [illegible] ইনস্টিটিউটের গবেষণার পরে কার্নেগি [illegible] জন বিজ্ঞানী মানবদেহে [illegible] বীজাণু, আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন। এই গবেষণার নেতৃত্ব করেন ডঃ জুলিও ওসাপিনা এবং এনরাইম [illegible]।

১১ ডিসেমবর—কাল স্টকহলমের কনসার্ট হলে নোবেল পুরস্কার বিতরণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। সাতজন পুরস্কার বিজয়ী—এর মধ্যে চারজন আমেরিকান এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। দুজন আইরিশ নাট্যকার নিজেরা না গিয়ে প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন।

১২ ডিসেমবর—পূর্ব পাকিস্তানে যে-সব উর্দু ভাষাভাষী উদ্বাস্তু আছে সেখানে তারা তাদের জন্য একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠনের দাবি করেছে। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলের নেতারা এবং সংবাদপত্রগুলি তাদের এই দাবির বিরোধিতা করেছেন।

১৩ ডিসেমবর—ইউ-এন আই-এর এক খবরে প্রকাশ, সোভিয়েট ইউনিয়নে মানুষের আয়ু দ্বিগুণ হয়েছে। টাস-এর এক রিপোর্টে জানা গেল শতকরা ৭৫ ভাগ মৃত্যুর হার কমেছে। শুধু তাই নয় শিশু মৃত্যুর হার পূর্বের তুলনায় ২০ ভাগের ১ ভাগে দাঁড়িয়েছে।

১৪ ডিসেমবর—হল্যানডের ১০৪৮০০ টনের অতিকায় তৈলবাহী জাহাজ মারপেসা মেনেগালের কাছে আটলান্টিক মহাসাগরের জলে ডুবে গিয়েছে। জাহাজখানি ছিল একেবারে আনকোরা নতুন এবং এই প্রথম সমুদ্র যাত্রা শুরু করেছিল। এ পর্যন্ত যত বড় বড় জাহাজ ডুবে গিয়েছে সম্ভবত এইখানাই তাদের মধ্যে বৃহত্তম। শেল অয়েল কোমপানির জন্য এই জাহাজখানি জাপানে নির্মিত হয়েছিল।

বিষয় লেখক		পৃষ্ঠা

এখন আপনি কাশি ও গলাব্যথার জীবাণু দ্রুত বিনাশ করতে পারেন

দু'ভাবে কার্যকর

ডেকোয়াডিন

দ্রুত ও নিশ্চিত আরাম দেয়।

গলাব্যথা ও কাশির লক্ষণ দেখা দিলেই একটি ডেকোয়াডিন অ্যান্টিসেপটিক লজেন্স মুখে ফেলে দিন। সাথে সাথে এর ঔষধের কাজ শুরু হয়ে যাবে।

একমাত্র ডেকোয়াডিনেতেই রয়েছে দ্বিক্রিয়াকারের ফলপ্রদ ডেকোয়ালীনিয়াম ক্লোরাইড—যা দু'ভাবে কাজ ক'রে থাকে:

- প্রথমতঃ, কয়েক সেকেণ্ডেই গলাব্যথায় আরাম দেয়।
- তারপরে এর অ্যান্টিসেপটিক গলাব্যথা ও কাশি সৃষ্টিকারী জীবাণু নাশ করে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত আরাম দেয়।

ডেকোয়ালীনিয়াম ক্লোরাইড যুক্ত হওয়ায় ডেকোয়াডিন কাশি ও গলাব্যথা সারাবার জন্যে এক নিশ্চিত ও দ্রুত আরামদায়ক ওষুধ।

ডেকোয়াডিন স্ট্রিপ-প্যাকে পাওয়া যায়।

কাশি ও গলাব্যথা থেকে নিশ্চিত ও দ্রুত আরাম দেয়

ডেকোয়াডিন অ্যান্টিসেপটিক লজেন্স

তৈরী করেছেন

গ্ল্যাক্সো

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ : শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

অবোধ শিশু

কিন্তু আপনি না!
আপনি তো জানেন,
সর্দি বসে গেলে
বাড়াবাড়ি হতে পারে!

সর্দির শুরুতেই ভিক্স ভেপোরাব লাগান। সর্দির সবরকম ভোগান্তি আপনি এড়াতে পারবেন। বুকে সর্দি বসার ভয় থাকবে না।

ধরুন, বাচ্চার সবে সর্দি লেগেছে;—নাক দিয়ে জল পড়া শুরু হয়েছে—গলা খুস্ খুস্ করছে। তক্ষুনি যদি এর একটা ব্যবস্থা না করেন তাহলে এই সর্দি বুকে বসে গিয়ে শুরু হতে পারে নানান্ ভোগান্তি—নাক বন্ধ হয়ে নিশ্বাসের কষ্ট, গ ব্যথা, কাশি-কিছু আর বাকি থাকবে না-অযথা কষ্ট ভোগ করবে বেচারা।

সর্দির লক্ষণ দেখা দিলেই যদি ভিক্স ভেপোরাব লাগানো যায়, কোনো কষ্ট পেতে হয় না— বুকে সর্দি বসার ভয় থাকে না।

আর একটা কথা! ভিক্স ভেপোরাব লাগাতে হবে সেই সব জায়গায়-যেখানে ঠাণ্ডা বেশী লাগে,-যেমন নাকে, গলায়, বুকে, পিঠে।

খুবই সহজ কাজ! তেতো বড়ি বা, বিচ্ছিরি মিক্সচার খাওয়াতে হবে না।

ভিক্স ভেপোরাব কাজ করে সঙ্গে সঙ্গে,— সর্দির কষ্ট থেকে আরাম দেয় দু'ভাবে —

১)
বাইরে থেকে গায়ে

২)
ভেতর থেকে নিশ্বাসের সঙ্গে

১) বুকে পিঠে লাগালে গায়ের বেদনা দূর করে-
২) গায়ে লাগাতেই ভিক্স গলে যে ভাপ বেরোয় তাতে ভিক্সের যাবতীয় ওষুধের গুণ বজায় থাকে। এই ভাপ নিশ্বাসের সঙ্গে ভেতরে গিয়ে, গলা আর বুকের সর্দি গলিয়ে দিয়ে আপনাকে সুস্থ ক'রে তোলে।

সর্দির শুরুতেই ভিক্স ভেপোরাব— নাকে, গলায়, বুকে, পিঠে ভাল ক'রে মালিশ করুন। যতক্ষণ না আরাম পাচ্ছেন, এই চিকিৎসা চালিয়ে যান।

সর্দি বসতে দেবেন না! সর্দি শুরু হলেই ভিক্স ভেপোরাব!

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৭ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১০
শনিবার ১৯ পৌষ ১৩৭৬

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার

সংযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীশীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮৩ ২৩-৮৫৪১

চাঁদার হার

কলিকাতায়

বার্ষিক	২৫.০০
ষান্মাসিক	১২.৫০
ত্রৈমাসিক	৬.২৫

ভারতে

বার্ষিক সডাক	৩০.০০
ষান্মাসিক "	১৫.৫০
ত্রৈমাসিক "	৮.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	৩০.০০
ষান্মাসিক "	১৫.৫০
ত্রৈমাসিক "	৮.০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ ডাকে)

বার্ষিক সডাক	৫২.০০
ষান্মাসিক "	২৬.০০
ত্রৈমাসিক "	১৩.০০

আসাম অঞ্চলে
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	৩৯.০০
ষান্মাসিক	১৯.৫০
ত্রৈমাসিক	১০.০০

দাম ৫০ পয়সা
উত্তরবঙ্গ ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাসুল ৫ পয়সা

DESH

Saturday, January 3, 1970

আদি ও নব কংগ্রেসের অধিবেশন

আদি ও নব উভয় কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হয়েছে। এই অধিবেশনের একটা বাইরের চেহারা ছিল, যার উদ্দেশ্য মূলত প্রদর্শনী ধরনের—অর্থাৎ অধিবেশনের জাঁকজমক, লোকসমাগম ইত্যাদি দেখানো। আদি চেয়েছিলেন, নবরা দেখুক তাঁদের পেছনে কী পরিমাণ সমর্থন ও উদ্দীপনা রয়েছে সদস্যদের ও মানুষের। নবরা নিশ্চয় এটা লক্ষ্য করেছেন এবং পাল্টা তাঁরাও জমক, কিংবা লোকসমাগম দেখিয়ে তাঁদের ক্ষমতাও বোঝাতে চেয়েছেন। শোনা যায়, আদি কংগ্রেসের অধিবেশনের সাফল্য নাকি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পার হতাশ মনে আশার সঞ্চার করেছে; আর নবরাও কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হয়েছেন। অন্য দিকে নব কংগ্রেসের অধিবেশনও এমন শীতের দিনে জমে উঠেছিল।

এই দুই অধিবেশনে যে পরোক্ষে একের সঙ্গে অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা তা পূর্বেই জানা গিয়েছিল। দেখা যাচ্ছে, সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রকাশ্যেও। প্রতিদ্বন্দ্বিতা কেন?—এ প্রশ্নের জবাব আজ আর কেউ চাইবে না। রাজনৈতিক প্রভুত্ব রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কার করায়ত্ত হবে, কিংবা কে সেই ক্ষমতা অধিকার করে রাখতে পারবে—দ্বন্দ্ব সেখানেই। আর আজকের দিনে এটা খুবই স্পষ্ট যে, জনগণের মতিগতি ভাল নয়, এদের হাতে রাখতে হলে কিছু কিছু সুবিধাদি দিতে হবে। ফলে আদি এবং নব উভয় কংগ্রেসই যতটা সম্ভব প্রতিশ্রুতি দিতে চান। আদির অসুবিধে এই যে, গত বিশ বাইশ বছরের কংগ্রেসী শাসন ও অক্ষমতার দায়ভার তার ঘাড়ে চাপানো রয়েছে। নব কংগ্রেস সেদিক থেকে আচমকা নিজেদের পুরোনো দায় থেকে খালাস করে নিয়ে প্রগতিবাদী হবার খানিকটা সুবিধে সৃষ্টি করে নিতে পারছে। শুকনো কথায় চিড়ে ভেজে না—এই অতি পুরাতন ও সদা সত্য প্রবাদের মতন তাই দুই কংগ্রেসই আপাতত চিড়ে ভেজাবার জন্যে তৎপর।

চিড়ে ভেজাবার উপাদান হিসেবে অবশ্য এখানে পাচ্ছি প্রোগ্রাম, অর্থাৎ কাজ। অর্থনীতি তার গোড়ার কথা। কোন্ কংগ্রেস কী ধরনের অর্থনৈতিক বিপ্লব ঘটাচ্ছে তার ওপরই এখন মানুষের চোখ বুঝি। অন্তত উভয় কংগ্রেসের নেতাদের মুখে অর্থনৈতিক বুলি শোনা যাচ্ছে। আর এখানেও সমান প্রতিযোগিতা, কে কতটা বৈপ্লবিক সাজতে পারেন। স্লোগানের লড়াই যদি হয় তবে বলব এখন পর্যন্ত দুই পাল্লাই সমান। এক পক্ষ যদি বলেন, আমাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আসে নি, সঙ্গে সঙ্গে অন্য পক্ষ বলবেন, এতদিন যাবৎ সরকার আর্থিক স্বাধীনতার জন্যে কিছু করেন নি।

ইন্দিরাজীর নব কংগ্রেস সাহসে ভরপুর। ইন্দিরাজী নিজেও অসম সাহসে ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়িয়েছেন। এই সাহসের সাম্প্রতিক উদাহরণ নবকংগ্রেসের আশু কর্মসূচী। কর্মসূচীগুলি এই রকম : সাধারণ বীমার জাতীয়করণ, রাজন্য ভাতা এবং সুযোগ সুবিধের অবলুপ্তি, আমদানি বাণিজ্যের রাষ্ট্রীয়করণ ইত্যাদি ইত্যাদি। এর সঙ্গে অবশ্য নাটকীয়ভাবে রয়েছে একটি অদ্ভুত প্রস্তাব—উত্তর প্রদেশের চিনিকল রাষ্ট্রীকরণ।

সাধারণ বীমা জাতীয়করণ কিংবা রাজন্যবর্গের ভাতা লোপ সমর্থনযোগ্য নিশ্চয় কিন্তু প্রশ্ন অন্যত্র। প্রশ্ন এই যে, জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির সহায়ক যা কিছু তা আয়ত্তে এলেই কাজের ষোলো আনা পূর্ণ হয় না, প্রয়োজন সদ্ব্যয়ের। জীবনবীমার অর্থ কতটা সদ্ব্যয় হচ্ছে? সহজ কথাটা এই যে, অর্থনৈতিক সম্পদ সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করতে পারলেই সাধারণের মঙ্গল, নচেৎ নয়।

উত্তর প্রদেশের চিনিকল রাষ্ট্রীকরণের ব্যাপারটা অদ্ভুত। যদি চিনিকল রাষ্ট্রীকরণের প্রয়োজন দেখা দিয়েই থাকে তবে শুধু উত্তর প্রদেশ কেন? বলা হয়েছে যে, উত্তর প্রদেশের চিনিকল রাষ্ট্রীকরণে সেখানকার কৃষক ও সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের প্রভূত উপকার হবে? হয়ত হবে। কিন্তু বিহারের চিনিকল রাষ্ট্রীকরণেও কি তা হবে না?

আমরা মনে করি—আদি বা নব কোনো কংগ্রেসই কথার আড়ালে বেশিদিন আত্মরক্ষা করতে পারবে না। কাজই প্রমাণ করবে কোন্ কংগ্রেস কত শক্তি ধরে।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় লোকটা যে যাচ্ছেতাই রকমের বেয়াড়া, সি পি এম-এর এই সুচিন্তিত মতের সঙ্গে এই রাজ্যের জনগণতান্ত্রিক জনগণ যে একমত হবেন সে বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই। যে দলে ব্রহ্মা ওরফে সর্বব্যাপ্ত কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্ত, বিষ্ণু ওরফে হিন্দুস্থান পারক নিবাসী বিলাত ফেরত কমরেড জ্যোতি বসু এবং সাক্ষাৎ রুদ্র ওরফে খাঁটি রাঢ়ী কমরেড হরেকৃষ্ণ কোঙার, এই ত্রিমূর্তি নেতৃরূপে বিরাজিত, জনগণ এই সেদিনও যে দলের প্রার্থী দিব্যি মোটা সোটা এক শিক্ষামন্ত্রীকে মদত দিয়ে টালিগঞ্জ থেকে উপনির্বাচনী পোল ভলটে অনায়াসে তরিয়ে এনেছে এবং যে-দলের গলায় লাল রুমাল বাঁধা বিস্তর নারায়ণী সেনা দুষ্টের অর্থাৎ সি পি এম বিরোধীদের দমন এবং শিষ্টের অর্থাৎ সি পি এম-এর শরণাগতদের পালনের নিমিত্ত ঝাণ্ডা ডাণ্ডা খড়্গ ভল্ল ইত্যাদি নানা প্রহরণে সজ্জিত হয়ে স্বেচ্ছায় জনগণের জানপ্রাণের জিম্মা নিয়ে ফেলেছে, সেই দলের বিরুদ্ধে কোনও ভদ্রলোকের কিছু বলার থাকে? বলুন। অথচ সেই দলের বিরুদ্ধেই মুখ্যমন্ত্রী কিনা এই অবেলায় কত সব খারাপ খারাপ কথা বলে চলেছেন! সে আবার এমন সব কথা যা কিনা কানে শোনাও পাপ।

জানেন, মুখ্যমন্ত্রী কী সব বলছেন? শুধু এই ২৪ ডিসেম্বরে দেশবন্ধু পারকের জনসভায় তিনি যা বলেছেন, তারই গোটা-কতক কথা বলি?

'সি পি এম দলের লোক ও সমর্থকদের দ্বারা গুণ্ডামী, লুঠপাট, খুন, নারী লাঞ্ছনা ইত্যাদি কয়েকটা ঘটনার উল্লেখ করে শ্রীমুখারজি বলেন যে, পারটির যদি এসবে সায় না থাকবে, তাহলে পারটি ঐ সব অপরাধীদের প্রকাশ্যে লাথি মেরে বের করে দেয় না কেন? তাহলে বুঝতাম পারটি ভাল, ঐ লোকগুলোই খারাপ। কিন্তু তা হয়নি। দেখা যায় যে, সেইসব অপরাধীরা গলায় লাল রুমাল বেঁধে নাচানাচি করছে, নেতাদের গলায় মালা দিচ্ছে। তাই বোঝা যায়, তারা প্রশ্রয় পাচ্ছে পারটি নেতাদের কাছ থেকেই।'—যুগান্তর, ২৫ ডিসেম্বর, ৬৯।

শুনলেন? এবার আপনারাই বিচার করে বলুন, কথাগুলো কি মুখ্যমন্ত্রীর মর্যাদার উপযুক্ত হল? আপনি মুখ্যমন্ত্রী আছেন, মুখ্যমন্ত্রীই থাকুন। আমরা তো আপনাকে কিছু বলছি নে। তবে আপনি কেন অন্যের পারটির ভিতরে নাক গলাচ্ছেন? তাহলে তো কেন্দ্রও পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপারে নাক গলাতে চাইতে পারে, নয় কি? বলুন। দেখছেন তো আমাদের কমরেড এম-পিরা

কত লড়াই করে পশ্চিমবঙ্গের সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য ইত্যাদি ইত্যাদি বজায় রেখে চলেছেন। এতদিন কংগ্রেসীদের ঔপনিবেশিক মানসিকতার দরুন এমন একটা ধারণা বদ্ধমূল প্রায় হয়ে এসেছিল যে পশ্চিমবঙ্গ বুঝি কংগ্রেসী কেন্দ্রের অধীন

একটা কলোনি। এইমাত্র ক'মাসের বিরামহীন সংগ্রামের ফলে আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামী বীর কমরেড এম-পিগণ পশ্চিমবঙ্গের স্বাধীনতা আবার ফিরিয়ে এনেছেন। এমন সময় মুখ্যমন্ত্রী কিনা তাঁর আবোল-তাবোল ক্রিয়া ও বাক্যের দ্বারা সে-সব ভেঙেতে দেবার চেষ্টা করছেন। ছিঃ!

এবং এর ফলে জনসাধারণ যদি ভেবে বসে মুখ্যমন্ত্রীর এইসব ক্রিয়াকলাপের পিছনে কেন্দ্রের ষড়যন্ত্র আছে তবে তা কি সি পি এম-এর দোষ? বলুন। অবিশ্যি সি পি এম অ্যাজ সি পি এম এ কথা এখনই বলছে না, কারণ সি পি এম খুবই শৃঙ্খলা-পরায়ণ পারটি, পলিত-ব্যুরোর কথাই তার সরকারি কথা, কিন্তু তা বলে সে তো লোকের মুখ বন্ধ করাতে পারে না। পারা যায় কি? বলুন।

সি পি এম কাকে পারটিতে রাখবে, কাকেই বা পারটি থেকে প্রকাশ্যে লাথি মেরে বের করে দেবে, সেটা তো নিছক সি পি এম-এর ঘরোয়া ব্যাপার। সি পি এম যদি অপরাধীদের পারটিতে রাখে এবং সেই অপরাধীরা যদি গলায় লাল রুমাল বেঁধে সি পি এম নেতাদের গলায় মালা দেয়, তার কি একটাই মানে যে সি পি এম খারাপ?

তাহলে জগাই মাধাই-এর মত ঘোর পাপী নিতাইচাঁদের মত মহাত্মার মাথায় যখন কলসীর কানা মেরে রক্ত বের করে দিল এবং তারপরও প্রেমদাতা নিত্যানন্দ সেই পাষণ্ডদের 'মেরেছিস কলসীর কানা, তাই বলে কি প্রেম দিব না' বলে কোল দিলেন, তার মানেও তো এই দাঁড়াবে যে নিতাই-চাঁদও পাষণ্ডের স্পর্শে পাষণ্ডই বনে গেলেন। নয় কি? বলুন। তাহলে আমাদের গৌরচাঁদও যখন হরিদাসকে কোল দিয়ে রিপিট যবন হরিদাসকে কোল দিয়ে যবন হয়ে গেলেন। তাহলে শ্রীরাম-চন্দ্রও পাষাণী অহল্যাকে স্পর্শ করে নিজেই পাষাণ রিপিট পাষাণ হয়ে পড়ে রইলেন। হাঃ হাঃ। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়, আপনি নিজের ঐতিহ্য সম্পর্কে এত অজ্ঞ বলেই এসব কথা এমন অনায়াসে বলতে পারছেন।

তবে শুনুন, আপনার জ্ঞাতার্থে এটা জানাচ্ছি, জোতদার, ক্যাপিটালিসট ব সমাজবিরোধী অপরাধীরা কংগ্রেস, পি এ পি. এস এস পি, ফরওয়ারড ব্লক, এস ইউ সি, সি পি আই বা এমন কি আপনার নিজ দল বাংলা কংগ্রেসে যোগ দিলে তার জোতদার, ক্যাপিটালিসট বা সমাজবিরোধ অপরাধীই থাকে কারণ তাদের গুণগত পরি বর্তন হয় না, কিন্তু যে মুহূর্তে জোতদার ক্যাপিটালিসট বা সমাজবিরোধী অপরাধীর সি পি এম-এ যোগ দেয় অমনি তাদে গুণগত পরিবর্তন হয়, তারা তখন জনগণ তান্ত্রিক (নকশালি ব্র্যানড নয়) জনগণে একটি বিশুদ্ধ যৌগে পরিণত হয়। ব্রাহ্ম অথবা চণ্ডাল, কণ্ঠি ধারণ করলেই যেম বৈষ্ণব তেমনি জোতদার, ক্যাপিটালিসট অথ সমাজবিরোধী অপরাধী লাল রুমাল গল ধারণ করলেই সি পি এম। এ এক দার আলকেমি।

মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় আপনি সি পি এম-এ এই আলকেমি বোঝেন না, সি পি এম মানে না। সি পি এম-এর ধারণা এবং তাদের সে ধারণা দৃঢ় থেকে থেকে দৃঢ় হয়ে দুশ্চিন্তার কারণ ঘটাচ্ছে যে, আপ সবই বোঝেন। আপনাকে যতটা স সরল ভালো মানুষ ভালো মানুষ দূর স্পষ্ট বলাই ভালো, বোকাসোকা বলে সি এম মনে করেছিল এবং আপ সত্যাগ্রহকে যতটা নিরামিষ নিরামিষ হা হাসির ব্যাপার বলে ধরে নেওয়া হয়ে এখন আর ঠিক তেমনটি মনে হচ্ছে আপনি মুখ্যমন্ত্রী, যে কোনও সম যুক্তফ্রনট সরকার ভেঙে দিতে পারেন, কোনও সময় পদত্যাগ করলেই যায় বা যে-কোনও দফতর নিয়ে পারেন, কিন্তু তা চান না, যুক্তফ বাঁচাতে চান বলেই সি পি এম-এর দৌ বন্ধ করার জন্যই জনগণকে এগিয়ে চান, লোকে এটা বেশ বুঝছে। এটা ভালো হচ্ছে না।

দুই কংগ্রেসের অধিবেশন

দুটো কংগ্রেসের অধিবেশনই দেখে এলাম। একটা আমেদাবাদে, আর একটা বোমবাইয়ে। আমেদাবাদে যাঁরা সমবেত হয়েছিলেন আমাদের খবরের-কাগজের ভাষায় তাঁরা আদি কংগ্রেস, আর বোমবাইয়ের কংগ্রেস হল নব কংগ্রেস। আমরা সাধারণভাবে নিজলিঙ্গাপ্পার সমর্থকদের বলি 'আদি', ইন্দিরাপন্থীদের বলি 'নব'।

পর পর দুই কংগ্রেসের অধিবেশন দেখে আমার কিন্তু মনে হয়েছে বোমবাই কংগ্রেসই আদি কংগ্রেস, আমেদাবাদ কংগ্রেস নব কংগ্রেস। সাধারণত আমরা কংগ্রেস অধিবেশনে যেসব জিনিস দেখতে অভ্যস্ত, বোমবাই কংগ্রেসে তার প্রায় সবই দেখেছি। সেই বিরাট সমারোহ, সেই ভি আই পিদের ছড়াছড়ি, সেই পুলিশ সিকিউরিটির কঠোর ব্যবস্থা, সেই শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের টাউটদের ঘোরাঘুরি, সেই নেতা ও কর্মীদের বিরাট ব্যবধান, সেই হাল্কা মেজাজে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সব সংক্ষিপ্ত আলোচনা, সেই কর্মীদের মনে সন্দেহ যে নেতারা তাঁদের কতকগুলি স্তোকবাক্য শুনিয়ে যাচ্ছেন, ইত্যাদি, ইত্যাদি। বোমবাই কংগ্রেস সব মিলিয়ে আর দশটা কংগ্রেস অধিবেশনকেই অনুকরণ করেছে।

বোমবাই কংগ্রেসে নেতারা বার বার ঘোষণা করেছেন : আমরা এবার কতকগুলি সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচী কার্যকরী করবই, আমরা যা প্রস্তাব নেব কাজেও তা দেখাবই এবং আমরা রাষ্ট্রে ধনীদরিদ্রের ক্রমবর্ধমান ব্যবধান ঘোচাবই। ভাল কথা। কিন্তু বোমবাই কংগ্রেসেই দেখা গিয়েছে নেতা ও কর্মীদের জন্য থাকা খাওয়ার কী বিরাট ব্যবধান। হাজার হাজার কর্মীর জন্য মাথা গোঁজার কোনও ঠাঁই মেলে নি। কিন্তু ছোট বড় মাঝারি সব নেতার জন্য গাড়ি বাড়ি ও ভূরিভোজনের অঢেল ব্যবস্থা হয়েছে। নব কংগ্রেসের ওয়ারকিং কমিটির বিশেষ আমন্ত্রিত কয়েকজন সদস্যকে তাজমহল হোটেলের বিলাস কক্ষগুলিতে রাখা হয়েছিল। দেখলাম, হোটেলের আর্দালী চাপরাসী ছাড়াও দুয়ারে দুয়ারে খিদমত খাটার জন্য ডজন করে বিশেষ কর্মী নিযুক্ত। প্যাণ্ডেলের পাশে ক্যানটিন খোলা হয়েছিল। শুধু এ আই সি সির সদস্য এবং দৈনিক সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের প্রবেশাধিকার ছিল সেই ক্যানটিনে। সকাল সাড়ে নটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত চালুও ব্যবস্থা : তিন রকমের ঠাণ্ডা পানীয়, চা বা কফি, সিঙ্গারা, সন্দেশ, বিস্কুট, চানাচুর এবং কাপে ভরা প্লেটে সাজান সুমধুর আইসক্রিম।

লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে বোমবাই অধিবেশনে। কত লক্ষ, সঠিক কেউই জানেন না। কিন্তু এই টাকাটার প্রায় সবটাই যে যুগিয়েছেন বড়লোকেরা সেটা সবাই জানেন। একজন বহুবিতর্কিত শিল্পপতি তাঁর অফিসবাড়িতে হাজার দুয়েক কর্মীর থাকা এবং খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। ভদ্রলোক অবশ্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের "সেবাতেও" অনেক কিছু করেছিলেন।

অথচ বোমবাই কংগ্রেস অধিবেশনে কিন্তু প্রধানত এঁদের বিরুদ্ধেই জেহাদ ঘোষণা করা হয়েছে!

আমেদাবাদ কংগ্রেসেও প্রচুর পয়সা খরচ হয়েছে। কত লক্ষ—এ ক্ষেত্রেও অজানা। এবং এই পয়সাটাও যুগিয়েছেন নিঃসন্দেহে ব্যবসায়ীরাই। কিন্তু আমেদাবাদে কর্মী ও নেতাদের মধ্যে বিরাট ব্যবধান ছিল না। শুধু ওয়ারকিং কমিটির সদস্যদের জন্য থাকাখাওয়ার আলাদা ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তাও রাজসিক নয়। আর সকলের জন্য সমান বন্দোবস্ত। কয়েকজন ওয়ারকিং কমিটি সদস্যও কমন ক্যানটিনে খেয়েছেন। হাজার তিনেক লোকের একসঙ্গে বসে খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। আমেদাবাদেও এ আই সি সি সদস্য এবং রিপোর্টারদের জন্য চায়ের ক্যানটিন হয়েছিল। সেখানে ব্যবস্থা ছিল : ঠাণ্ডা পানীয়, চা বা কফি, সিঙ্গারা ও লাড্ডু এবং পেয়ারা। আমেদাবাদে "এখনই দেশের অর্থনৈতিক বৈষম্য" কমাবার দৃঢ় সংকল্প ঘোষিত হয় নি; তবে সেখানে নেতা এবং কর্মীদের জন্য একেবারে আকাশপাতাল ফারাক ব্যবস্থাও ছিল না।

একটা ব্যাপারে কিন্তু দুই কংগ্রেসই তাঁদের চিরাচরিত প্রথা বজায় রেখেছেন—কেউই স্পষ্ট করে মূল কথাটা অনুগামীদের জানান নি। বোমবাই কংগ্রেসের নেতারা কর্মীদের স্পষ্ট করে বলেন নি, কিভাবে তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারকে বাঁচিয়ে রাখবেন। আমেদাবাদ কংগ্রেসের নেতারাও দলের প্রতিনিধিদের জানান নি, কংগ্রেস দু' টুকরো হওয়ার ফলে দ্রুত দেশব্যাপী যে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এসেছে কিভাবে সেই সমস্যার মোকাবিলা করতে চান। অথচ, এই প্রশ্নটাই দেশের সামনে সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক প্রশ্ন। দেশের বৃহত্তম দুই রাজনৈতিক দলই এই অতি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রশ্ন এড়িয়ে গেলেন।

*

বোমবাই কংগ্রেসে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি অবিলম্বে চালু করার উপর খুব বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। নেতারা বলেছেন, প্রতিশ্রুতিমত কাজ তাঁরা করবেনই। তাঁরা বার বার শপথ নিয়েছেন, একচেটিয়া পুঁজিবাদের উত্থানকে খর্ব করবেনই, ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক বৈষম্য কমাবেনই। যে দলের উপর একচেটিয়া পুঁজিপতিদের এত প্রভাব, যে দলে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের ঘরের মানুষরা সবাই সমবেত, যে দলের সম্মেলনের জন্য একচেটিয়া পুঁজিপতিরা দরাজ হস্তে অর্থসাহায্য করেন সেই দলের পক্ষে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থে আঘাত হানা সম্ভব কিনা সে প্রশ্নে আপাতত না হয় নাই গেলাম। কিন্তু এ মূল প্রশ্নে তো যেতেই হবে যে, এই দল এইসব প্রস্তাব কার্যকরী করার জন্য সরকারে থাকতে পারবেন কিনা।

নব কংগ্রেসের এখন লোকসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই। তাঁদের সরকার বেঁচে আছে পরের দয়ায়—ডি এম কে, দুই কমিউনিস্ট পার্টি, আকালি দল, মুসলীম লীগ, কিছু নির্দলীয় তাঁদের বাঁচিয়ে রেখেছেন। এখন যেটা সবচেয়ে বড় প্রশ্ন সেটা হল, সংসদের বাজেট অধিবেশনে এঁরা কি করবেন? এঁরা কি তখনও ইন্দিরা-সরকারকে নিঃশর্ত সমর্থন জানিয়ে যাবেন? যদি তাঁরা তা না করেন তা হলে সরকারের পতন অবশ্যম্ভাবী। এবং, এই সরকারের পতন মানেই কেন্দ্রেও অনিশ্চিত অবস্থার সূত্রপাত, কেন্দ্রেও এক দলের শাসনের অবসান। যদি সরকার নাই বাঁচে তাহলে ওই সব অর্থনৈতিক প্রতিশ্রুতি কার্যকরী করার প্রশ্নই ওঠে না। তাই সব চেয়ে বড় প্রশ্ন আজ, কেন্দ্রীয় সরকার বাঁচবে কিনা? কেন্দ্রে কি হবে? কোয়ালিশন, না নির্বাচন?

বোমবাই নব কংগ্রেসের নেতারা এই মূল প্রশ্নটিকে একেবারে এড়িয়ে গিয়েছেন। কর্মীরা শুধু দেখেছেন, দলের নেতৃত্ব দুই

কমিউনিস্ট পার্টি, মুসলীম লীগ ও আকালি দল এবং ডি এম কের বিরুদ্ধে কোনও কথা বলতে চান না। কর্মীরা এও দেখেছেন যে, পরিবর্তে নেতারা আক্রমণটা আদি কংগ্রেস, জনসংঘ এবং স্বতন্ত্র দলের বিরুদ্ধে চালিয়েছেন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও দলের নেতারা স্পষ্ট করে জানান নি তাঁরা কার কার সঙ্গে ঐক্য গড়তে চান—তাঁরা কিভাবে সরকার বাঁচাতে সচেষ্ট। এখনই আবার নির্বাচনের সম্ভাবনা আছে কিনা এবং নির্বাচন হলেই বা সে যুদ্ধ একা লড়া হবে, না কারো সহযোগিতায় চালান হবে—এ প্রশ্নেও বোম্বাইয়ে কোনও আলোচনা হয় নি।

ঠিক এমনিই আদি কংগ্রেসের নেতারাও মূল প্রশ্নটি এড়িয়ে গিয়েছেন। তাঁরা বার বার নব কংগ্রেসের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেছেন : ওদের সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই, ওরা কমিউনিস্টদের সাহায্যে বেঁচে আছে এবং ওদের সরকারের পতন ঘটবেই। কিন্তু একবারও বলেন নি, ওই সরকারের পতন ঘটলে বিকল্প কি। বলেন নি, এর পর কোয়ালিশন, না অন্তর্বর্তী নির্বাচন? ওঁরা ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি আক্রমণ করেছেন, ওঁরা কমিউনিস্ট পার্টিদ্বয়, ডি এম কে, আকালি দল প্রভৃতির বিরুদ্ধে বিষোদগার করেছেন। কিন্তু জনসংঘ, স্বতন্ত্র পার্টির বিরুদ্ধে স্পষ্ট করে কিছু বলেন নি। আবার এ কথাও খোলাখুলি বলেন নি যে, ওঁরা ওই দুই দলের সঙ্গে মিতালি করতে চান।

আসলে দেশব্যাপী যে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এসেছে, যে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ভারতকে যে-কোনও বিপদের মুখে ঠেলে নিয়ে যেতে পারে সেই সমস্যার মোকাবিলা দুই কংগ্রেস কিভাবে করতে চান বোম্বাই বা আমেদাবাদে তার কোনও স্পষ্ট জবাব পাওয়া যায় নি। আদি বা নব, কেউ তা দেওয়ার চেষ্টাও করেন নি।

*

সমাজতন্ত্রের কথাও খুবই বলা হয়েছে দুই কংগ্রেসে। এটাও চিরাচরিত কংগ্রেসী প্রথা। ১৯৫৫ সনে আবাদিতে বলা হয়েছিল সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা। ১৯৬৪ সনে বিস্তারিত পরিকল্পনা সহ বলা হল একেবারে নির্ভেজাল সমাজতন্ত্রের কথা। ১৯৬৭ সনে দিল্লিতে নেওয়া হল দশ দফা কর্মসূচী। কংগ্রেসী নেতারাই বলছেন, এর কিছুই কার্যকরী হয় নি। উল্টে দেশে একচেটিয়া পুঁজিবাদ বেড়েছে, ধনী ও দরিদ্রের বৈষম্যও ক্রমবর্ধমান।

বোম্বাইয়ে শুরু থেকেই নব কংগ্রেসের নেতারা বললেন, তাঁরা এবার কম বলবেন, কিন্তু যা বলবেন তা করবেনই। কম বলবেন কম বলবেন করেও তাঁরা এবার যেসব কথা বলেছেন তাই অনেক। বলতে গেলে ঝুড়ি ঝুড়ি প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। বোম্বাইয়ে পশ্চিমবঙ্গের একজন কংগ্রেসী এম এল এ আমাকে বলছিলেন : আমাদের এই কম প্রতিশ্রুতির অর্থনৈতিক প্রস্তাব ভাল করে পড়লে দেখবেন যুক্ত ফ্রন্টের ৩২ দফা কর্মসূচীর চেয়েও ওটা উচ্চাকাঙ্ক্ষী।

কথাটা সত্যিই। দিল্লিতে যে দশ দফা কর্মসূচী নেওয়া হয়েছিল বহু বিচারে বোম্বাইয়ে গৃহীত কর্মসূচী তার চেয়ে পিছিয়ে। কিন্তু এই পিছিয়ে থাকা প্রস্তাবেও এমন সব প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যেগুলি কার্যকরী করা অত্যন্ত কঠিন। মূল প্রস্তাবে এবং ভাষণে সকলের মূল বক্তব্য ছিল: একচেটিয়া পুঁজিবাদের প্রভাব ভয়ঙ্করভাবে বেড়ে যাচ্ছে; তাকে খর্ব করতেই হবে। ধনী ও দরিদ্রের বৈষম্য ক্রমবর্ধমান; এই বৈষম্য কমাতেই হবে। দুটোই ঠিক কথা এবং এই দুটো কাজ যদি নব কংগ্রেসের নেতারা করতে পারেন তাহলে তাঁরা অনেকটা এগিয়ে যাবেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সকলেই এ জিনিসও জানেন যে, এই কাজ দুটো করা অত্যন্ত কঠিন—বর্তমান নব কংগ্রেস নেতৃত্বের পক্ষে প্রায় অসম্ভব।

কংগ্রেস নেতৃত্বকে নিয়ে কি কেবলই এইখানে মুশকিল। তাঁরা সব বুঝেসুঝেও কতগুলি ফাঁকা প্রতিশ্রুতি দেন। যেমন ধরুন, ১৯৬৪ সনে ভুবনেশ্বরে তাঁরা সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, সব ধানকল রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে এনে ফেলবেন। এই প্রতিশ্রুতি কোনও দিনও কংগ্রেস কার্যকরী করতে পারবেন বলে মনে হয় না। যা করতে পারবেন তার চেয়ে অনেক বেশী বেশী বলে কংগ্রেস নেতারা মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষাকে বাড়িয়ে তুলেছেন। যা তাঁরা করেছেন সেটাও যে কম নয় তা একবারও মানুষকে বোঝাতে চেষ্টা করেন নি।

এই দিক দিয়ে আদি কংগ্রেসও কোনও নতুন রাস্তা ধরেন নি। তাঁরাও আমেদাবাদে পুনরায় ঘোষণা করেছেন : আমরা দশ দফা কর্মসূচী রূপায়িত করবই। দশ দফা রূপায়িত করা যে তাঁদের পক্ষে অসম্ভব, সে কথা কিন্তু বুঝেসুঝেও বলতে সাহস পান নি। ভয়, লোকে তা হলে প্রতিক্রিয়াশীল বলবে। তবে, তাঁদের একটা সুবিধা আছে, তাঁরা এখন সরকারে নেই। সুতরাং, কাজে করার দায়িত্ব তাঁদের নেই।

প্রগতিবাদী সাজার অদম্য বাসনায় কংগ্রেস চিরকালই লাফাতে লাফাতে এগিয়ে গিয়েছে। কিন্তু এই প্রগতিবাদ শুধু মুখে। তাঁদের দলের ভেতরে থেকে গিয়েছে সেই রক্ষণশীলদেরই প্রাধান্য—এখনও যাঁরা দুই কংগ্রেসের ভেতরেই শক্তিশালী। রক্ষণশীলদের আওতাধীন দলের পক্ষে বৈপ্লবিক কিছু করা যে সম্ভব নয় কংগ্রেস নেতৃত্ব বুঝেও তা বুঝতে চান না। তাঁরা চিরকাল ভেবে এসেছেন, এখনও ভাবেন, মুখে প্রগতিশীলতার কথা বললেই মানুষ খুশী হয়। সেই বিচারে বোম্বাই বা আমেদাবাদ কোনও ব্যতিক্রম নয়।

*

সব কিছুর মধ্যেও আমেদাবাদে একটা জিনিস ছিল—সেটা হল কর্মীদের, সাধারণ প্রতিনিধিদের নিষ্ঠা। তাঁরা গোটা অধিবেশনটাকে নিষ্ঠা সহকারে গ্রহণ করেছেন। অভাব অভিযোগ নিয়ে ঘ্যান ঘ্যান করেন নি। দুঃখ কষ্টকে হাসিমুখে গ্রহণ করেছেন। আমেদাবাদে পৌঁছে যখন আদি কংগ্রেসের কর্মীরা দেখেছেন তাঁদের পাশে অনেক লোক তখন তাঁরা মনে আরও বল পেয়েছেন, আরও উৎসাহিত হয়েছেন।

তাঁরা যে বাঁচবার কঠিন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত, আমেদাবাদে সমবেত আদি কংগ্রেসের কর্মীরা তাঁদের আচার আচরণে তা প্রমাণ করেছেন। তাঁরা নেতৃত্বের সঙ্গে ঝগড়া করেন নি। পদ নিয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি করেন নি—যদিও তাঁদের মধ্যে পদলোভী লোকের অভাব নেই। এই বিচারে আমেদাবাদ কংগ্রেস নতুন দল।

নয়া কংগ্রেস কিন্তু এ বিচারে সেই পুরাতন কংগ্রেসই থেকে গিয়েছে। সেই ঢিলেঢালা আলোচনা। সেই পদের জন্য মারামারি। সেই নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ, কৃপা প্রার্থনার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা। স্বাধীনতার পর চিরকাল কংগ্রেস অধিবেশনে যা দেখা গিয়েছে বোম্বাইতেও তার কোনও ব্যতিক্রম ঘটে নি। দলের সামনে, জাতির সামনে যে এত বড় সংকট, বোম্বাই অধিবেশনের আলাপ আলোচনায় তা একবারও বোঝা যায় নি।

নবারুণ গুপ্ত

দেবরাজ
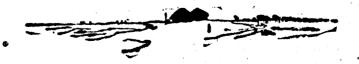
ঘরে বাইরে

দেখতে দেখতে আমেরিকাতে নিক্সন আমলের এক বছর শেষ হয়ে এলো। ভিয়েতনামের লড়াই শেষ হবার লক্ষণ কিন্তু এখনও দেখা যাচ্ছে না। গোড়ায় যে মনে হয়েছিল ফ্রান্সের দ্য গল যেভাবে ঝপ করে আলজিরিয়ান লড়াই থামিয়ে দিয়েছিলেন কারুর কথা না শুনে প্রেসিডেন্ট নিক্সনও তাই করবেন ভিয়েতনামের লড়াইয়ের ব্যাপারে তা কিন্তু সত্যি হয়নি। একতরফা যুদ্ধ বন্ধ করার কোনও ইচ্ছে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের নেই। লড়াই তিনি দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছেন আর তাঁর মনের মত নিষ্পত্তি না হলে যদ্দিন তিনি প্রেসিডেন্টের গদিতে থাকবেন তদ্দিন চালিয়েও যাবেন বলেই মনে হচ্ছে। দক্ষিণ ভিয়েতনামে অস্থায়ী সরকার ভিয়েতকঙ তৈরি করেছে বলে তিনি ঘাবড়েও যাননি, তাকে বাধাও দেন নি। প্যারিসে যে ভিয়েতনাম সমস্যা নিয়ে চার দলের বৈঠক চলছে তাতে কথাবার্তা না এগুলেও তিনি বিশেষ চিন্তিত নন। দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রজাতন্ত্রী সরকারের প্রেসিডেন্ট থিউয়ের সঙ্গে মাস ছয়েক আগে মিডওয়ে দ্বীপে তাঁর যে বৈঠক হয়েছিল তাতে তিনি থিউকে ভরসা তো দিয়েছিলেনই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যাতে দক্ষিণ ভিয়েতনাম নিজের জোরে জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারে তার ব্যবস্থা করবার। এসব আর যাই হোক ঝামেলা মিটিয়ে ফেলবার ইঙ্গিত নয়।

রণে ক্ষান্ত দেবার বাসনা নিক্সনের যে মোটেই নেই তার প্রমাণ পদে পদে মিলছে। ভিয়েতনামের লড়াই তিনি চালাচ্ছেন ঘরে-বাইরে। বাইরে লড়াই চলছে ভিয়েতনামে তো বটেই, লাওস আর কাম্বোডিয়াতেও। ওই দু দেশেই আছে ভিয়েতকঙ গেরিলাদের ঘাঁটি, যে পথ দিয়ে তাদের অস্ত্রশস্ত্র, রসদ, সাজসরঞ্জাম, লোকলস্কর আসছে তাও গেছে ও দেশ দুটোর মধ্যে দিয়ে। মার্কিন সেনাসামন্তরা গেরিলাদের শায়েস্তা করার অজুহাতে দুটো দেশেই হানা দিয়েছিল। তবে মার্কিনী পলটন লাওস কী কাম্বোডিয়াতে আর নেই। মাস পাঁচেক হলো তাদের ফিরিয়ে আনা হয়েছে। তবে গোপন ঘাঁটি কিছু আছে কী নেই তা বলা শক্ত। মার্কিন কংগ্রেসও চায় না তাদের সেনা খাস ভিয়েতনামের বাইরে কোথাও লড়ে কী লড়াইয়ের জন্যে ঘাঁটি পাতে। এমন কী যে দেশের সঙ্গে আমেরিকার খুব দহরম মহরম সেখানেও সেনাসামন্ত পাঠাতে তাদের ঘোর অনিচ্ছে।

তবে যুদ্ধটা এক্ষুনি বন্ধ করা হোক বলে কোনও প্রস্তাব যে কংগ্রেস পাস করবে তার কোনও সম্ভাবনা নেই। কেননা নিক্সন ঠিক পথেই চলেছেন বলে তার সদস্যদের ধারণা। তাদের মধ্যে নিক্সনের নিজের দলের লোক তো আছেনই আছেন ভিন্ন দলের লোকও। রিপাবলিকান আর ডেমোক্র্যাটিক দু দলের সদস্যরা মিলে গেল মাসে হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভসে (যা হচ্ছে মার্কিনী লোকসভা) একটা প্রস্তাব বিস্তর ভোটে পাস করিয়ে নিয়েছেন যাতে নিক্সনের ন্যায়সঙ্গত শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টাকে সমর্থন জানানো হয়েছে। প্রস্তাবটা অবশ্য সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয়নি। তবু দ্বিপাক্ষিক ও প্রস্তাবের গুরুত্ব যে খুবই বেশী তাতে ভুল নেই। অমনি ধরনের একটা প্রস্তাব কংগ্রেসে পাস হয়েছিল ১৯৬৪ সনে। তারই জোরে প্রেসিডেন্ট জনসন ভিয়েতনামে লড়াই জোরদার করে তার পরিধি অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিলেন যদিও কংগ্রেস ঠিক তা চায়নি।

শুধু কংগ্রেসে কেন কংগ্রেসের বাইরেও যে ভিয়েতনামের লড়াই নিক্সন জিতেছেন তা বোঝা যাচ্ছে গণমতের গতি দেখে। তার রায় তাঁর বিরুদ্ধেই যাচ্ছিল এতদিন। ভিয়েতনাম তিনি ঠিক পথে চলছেন কিনা এ নিয়ে ভোট নেওয়া হলে এই সেদিন পর্যন্ত বেশীর ভাগ ভোটই পড়তো তাঁর বিপক্ষে। ইদানীং হাওয়া পালটেছে। নিক্সন যে দাবি করেছিলেন মূক জনতা আছে তাঁর পেছনে তা যে একেবারে ভুয়ো নয় তার নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে জনমতের ভোটে। বয়স্কদের মধ্যে ষাট শতক লোক তাঁর ভিয়েতনাম নীতিকে সমর্থন জানিয়েছে, ছাত্রদের মধ্যেও শতকরা পঞ্চাশ জন। এরপর পুরোনো নীতি বদলাবার আর কোনও কারণ নিক্সনের নেই। সে নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল সারা মার্কিন মুল্লুক অক্টোবর আর নভেম্বর মাসে। হাজার হাজার ছেলেমেয়ে শহরে শহরে মিছিল বার করে যুদ্ধবিরোধী ধ্বনি দিয়েছিল, ধিক্কার দিয়েছিল নিক্সনকে। প্রেসিডেন্ট আর তাঁর দলবল হয়ত খানিকটা বিচলিত যে হননি তা নয়। কিন্তু আবার সামলে নিয়েছেন প্রেসিডেন্ট নিক্সন। চাকা ঘুরেছে তারপর তাঁরই দিকে। শান্তি আন্দোলন থেমে না গেলেও কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। আগের জোর তার আর নেই।

যে চালে নিক্সন কিস্তিমাত করেছেন তা হচ্ছে আস্তে আস্তে ভিয়েতনাম থেকে মার্কিন সেনাসামন্তদের দেশে ফিরিয়ে আনবার পরিকল্পনা। সে পরিকল্পনা তো নতুন কিছু নয়। মাস ছয়েক হতে চললো প্রথম দফায় পঁচিশ হাজার মার্কিন সেনাসামন্তকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে ভিয়েতনাম থেকে। তখন কিন্তু লোকে নিক্সনকে ঠাট্টাই করেছিল, বলেছিল এক আঁজলা জল তুলে তো আর সমুদ্দুরের জল কমানো যায় না। নিক্সন সে সব হাসি তামাসায় কান না দিয়ে নিজের গোঁ বজায় রেখে চলেছেন, দুবারে ফিরিয়ে এনেছেন ষাট হাজার সেনাকে, তৃতীয় দফায় আরও পঞ্চাশ হাজার সেনাকে ঘরে ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত তিনি দেশকে জানিয়ে দিয়েছেন। এতেও শেষ নয়। আসছে এপ্রিলের পনেরো তারিখের মধ্যে এক লাখ দশ হাজার মার্কিন সেনা ভিয়েতনাম ছেড়ে চলে যাবে যদি অঘটন কিছু না ঘটে। ওই এক লাখ দশ হাজার সেনাসামন্ত ফিদের নিলেও বাকী যারা থাকবে তাদের সংখ্যাও কিছু কম নয়—সেও হবে সওয়া চার লাখের ওপর, সাড়ে চার লাখের কাছাকাছি। ওদিকে মার্কিনী হিসেবে দক্ষিণ ভিয়েতনামে ভিয়েতকঙের বাহিনী আড়াই লাখও হবে না। কাজেই সৈন্য সরিয়ে তেমন একটা বড় ঝুঁকি কিন্তু নিক্সন নিচ্ছেন না।

তবে ঘরের ছেলেরা যে আস্তে আস্তে ঘরে ফিরে আসছে এতেই মার্কিন মুল্লুকে অনেকে খুশী। তাই তারা চেয়েছিল। ছোট্ট একরত্তি একটা দেশের ওপর বিরাট মার্কিন বাহিনী যে হামলা করছে তাতে তারা তেমন বিরক্ত কিংবা বিব্রত হয়নি, হয়েছে তাদের দেশের তাজা প্রাণগুলো ভিন্ন দেশে নষ্ট হচ্ছে বলে, নতুন করে মার্কিন তরুণদের সে যুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য করা হচ্ছে বলে। নিক্সন বলেছেন নতুন করে সেনাবাহিনীদের যাদের যোগ দিতে বলা হবে তাদের সংখ্যা ক্রমশই কমবে, এ বছর তাদের সংখ্যা কমবে শতকরা দশ ভাগ অর্থাৎ প্রায় পঁচিশ হাজার লোক। কাজেই যাঁরা নিক্সনের নিন্দে করছিলেন গরম গরম বুলি ঝেড়ে তাঁদের সুর হয়ে এসেছে অনেকটা নরম। তার ওপর নিক্সন দেশের লোককে বোঝাচ্ছেন যুদ্ধের গতি এখন তাঁদের অনুকূলে। দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রজাতন্ত্রী সরকারের সেনারাও এখন পাকা হয়ে উঠেছে, সাজ-সরঞ্জাম পেলে আর পেছনে আমেরিকা থাকলে তারা নাকি ভিয়েতকঙদের সামাল দিতে পারবে। নিক্সনের এ হিসেবে কতটা ফাঁকি আছে তা বোঝা যাবে ভিয়েতনামের নতুন বছরে যখন ভিয়েতকঙের নতুন অভিযান শুরু হবার কথা।

উলঙ্গ রাজা

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

সবাই দেখছে যে, রাজা উলঙ্গ, তবুও
সবাই হাততালি দিচ্ছে।
সবাই চেঁচিয়ে বলছে ঃ সাবাশ, সাবাশ!
কারও মনে সংস্কার, কারও ভয়;
কেউ-বা নিজের বুদ্ধি অন্য মানুষের কাছে বন্ধক দিয়েছে;
কেউ-বা পরান্নভোজী, কেউ
কৃপাপ্রার্থী উমেদার, প্রবঞ্চক;
কেউ ভাবছে, রাজবস্ত্র সত্যিই অতীব সূক্ষ্ম, চোখে
পড়ছে না যদিও, তবু আছে,
অন্তত থাকাটা কিছু অসম্ভব নয়।

গল্পটা সবাই জানে।
কিন্তু সেই গল্পের ভিতরে
শুধুই প্রশস্তিবাক্য-উচ্চারক কিছু
আপাদমস্তক ভিতু, ফন্দিবাজ অথবা নির্বোধ
স্তাবক ছিল না।
একটি শিশুও ছিল।
সত্যবাদী, সরল, সাহসী একটি শিশু।

নেমেছে গল্পের রাজা বাস্তবের প্রকাশ্য রাস্তায়।
আবার হাততালি উঠছে মুহুর্মুহু:
জমে উঠছে
স্তাবকবৃন্দের ভিড়।
কিন্তু সেই শিশুটিকে আমি
ভিড়ের ভিতরে আজ কোথাও দেখছি না।

শিশুটি কোথায় গেল? কেউ কি কোথাও তাকে কোনো
পাহাড়ের গোপন গুহায়
লুকিয়ে রেখেছে?
নাকি সে পাথর-ঘাস-মাটি নিয়ে খেলতে খেলতে
ঘুমিয়ে পড়েছে
কোনো দূর
নির্জন নদীর ধারে কিংবা কোনো প্রান্তরের গাছের ছায়ায়?
যাও, তাকে যেমন করেই হোক
খুঁজে আনো।
সে এসে একবার এই উলঙ্গ রাজার সামনে
নির্ভয়ে দাঁড়াক।
সে এসে একবার এই হাততালির ঊর্ধ্বে গলা তুলে
জিজ্ঞাসা করুক ঃ
রাজা, তোর কাপড় কোথায়?
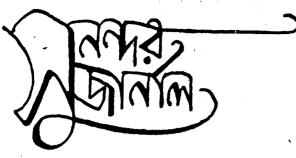
'আতিথেয়তা'

ইডেন গার্ডেন্সের অত্যাশ্চর্য চতুর্থ ক্রিকেট টেস্ট সম্বন্ধে বাক্যব্যয় করব না ঠিক করেছিলুম কিন্তু নিন্দুকের জ্বালায় চুপ করে থাকা গেল না। ভারতীয় দল দুটো ইনিংস মিলিয়ে সর্ব-সাকুল্যে পনেরো রান করলেই বা কার কী বলবার ছিল? অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট টীম আমাদের অতিথি। কে কবে শুনেছে যে অতিথিকে না খাইয়ে গৃহকর্তা ভূরি-ভোজন করে থাকেন? কানপুরে—দৈবক্রমে (আমাদের সজ্ঞান কৃতিত্বে নিশ্চয় নয়—অত অভদ্র আমরা হতেই পারি না) যে অঘটন ঘটে গিয়েছিল, কলকাতায় আমরা তার প্রায়শ্চিত্ত করে ভারতীয় আতিথ্যের মুখোজ্জ্বল করেছি। আমরা আশা করব, এ থেকে অন্যান্য দেশও শিক্ষালাভ করবেন—আমরা যখন তাঁদের ওখানে ক্রিকেট খেলতে যাব, তখন তাঁরাও এই রকম ব্যাট বগলে ঢুকবেন আর বেরোবেন—"শুধু যাওয়া, শুধু আসা।" আর ভবিষ্যৎ টেস্ট সিরিজে দুটি খেলোয়াড়কে আমরা সযত্নে বর্জন করব: একজন বেদী আর একজন বিশ্বনাথ। এই দুজন রাগী ছোকরা ভারতের আতিথেয়তাকে ম্লান করে দিয়েছে।

আর বাংলা দেশ। সে তো ভারতের 'মধ্যমণি'—একদা বাঙালী কবিরা এই মর্মে কবিতা আর গান-টান বাঁধতেন। মহামতি গোখলে তো তাঁর মোক্ষম বাণীটি শুনিয়েই রেখেছেন—"বাঙালী আজ যা ভাবে" এট্‌সেট্‌রা এট্‌সেট্‌রা। কিছুকাল যাবৎ কোনো-কোনো দুর্জন এই সব 'সুভাষিত' সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে আসছিলেন। কিন্তু নিন্দুকের প্রচারে কি আর কোনো গরিমাময় জাতির আত্মিক পরিচয় চাপা থাকতে পারে? আতিথেয়তার জন্যে যে আমরা কী পরিমাণে আত্মদান করতে পারি—চতুর্থ টেস্টের চতুর্থ দিনে—ইডেনের ভেতরে বাইরে, তা আবার প্রমাণ হয়ে গেল।

মনে পড়ে, কলেজে পড়ার সময় একবার পুজোর ছুটিতে দেশের বাড়িতে গেছি। এর আগে আমার বরাবর বাইরে কেটেছে, দেশের সঙ্গে পরিচয়ই ছিল না। বিকেলে একদিন চণ্ডীমণ্ডপে একা বসে ছিলুম—বড়োরা কেউ হাজির ছিলেন না। মণ্ডপে প্রতিমা প্রায় শেষ হয়ে এল, তাই দেখছি, হঠাৎ কানে এল: 'অতিথ্ আইলাম।'

চেয়ে দেখি, শীর্ণ, কালো, খর্বকায় এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। হাতে ছাতা আর পুঁটলি, খালি গা খালি পা। কাঁধে একটি মলিন চাদর—গলায় মোটা পৈতে। আমি আশ্চর্য হয়ে তাকাতে বিরস গলায় বললেন, 'হাঁ করিয়া দ্যাহো কী? কইলাম না, অতিথ আইছি?'

মেজাজ দেখে তটস্থ হয়ে বললুম, 'বসুন, ভেতরে খবর দিই।'

'খুব যে কইলকাত্তাইয়া কথা কও! কার পোলা তুমি?'

সত্বরে পিতৃ-পরিচয়—আত্ম-পরিচয় দিতে হল, একটা প্রণামও করে ফেললুম। একটু প্রসন্ন হয়ে বললেন 'বাড়ির চাকর-বাকর

সস্তার বাজার

অগ্নি পরীক্ষা

কই? ওক্কা (মানে হুঁকো) আনও!'

বললুম, 'হুঁকো কোথায় পাব? কেউ তো তামাক খায় না।'

'ওক্কা নাই!'—একটা হাতল-ভাঙা চেয়ারে
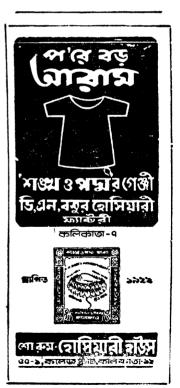
বসে পড়েছিলেন, তড়াক করে উঠে সগর্জনে বললেন, 'বামুন-বাড়িতে হুক্কা নাই অতিথের লাইগ্যা! গোল্লায় গ্যাছস্—এ্যামোন বাড়ির নাম কাম ব্যারাক ডুবা ইছস্ তরা! থাকুম না এই বাড়িতে—জলস্পর্শ করমু না।' ছাতা-পুঁটলি কুড়িয়ে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বেগে অন্তর্ধান! আমি যতটা বিস্মিত হলুম, পরে বড়োদের কাছে বকুনি খেলুম তার চেয়ে বেশি। অতিথি ফিরে গেলেন। কেন, পাশের ভটচায বাড়ি থেকে হুঁকো আনিয়ে দিলেই হত!

অস্ট্রেলিয়ানরা স্বীকার করবেন—আমরা হুঁকো-তামাকে কোনো ত্রুটি তো করিই নি—বরং পাঁচ দিনের খেলা চারদিনে শেষ হল বলে, তাঁদের ব্যাট্‌সম্যানদের পেটানোর অতৃপ্ত সুখকে পরিতৃপ্ত করবার জন্যে 'ব্লাডি ইণ্ডিয়ান' ('ব্লাডি' কথাটা ভদ্র ইংরিজিতে অকথ্য বলে একটা ভ্রান্ত ধারণা ছিল!) প্রেস-ফোটোগ্রাফারদের 'পাঁঠা' সিক্সারের উদ্দেশ্যে এগিয়ে দিয়েছি। কিন্তু এগুলো সবই তুচ্ছ। অতিথি পরিচর্যার মহাযজ্ঞে আমরা ছ' জনকে বলি দিয়েছি, হাসপাতালগুলিতে আরো দু একজনও হয়তো যাবেন!

ছটা মরগুণী মরেছে। ফেলে দাও

এই তো ভারতের ধারা আর ট্র্যাডিশন। ছেলেবেলা থেকেই আমরা রাজা উশীনর, দাতা কর্ণ—এইসব মহাপ্রাণদের জীবনী পড়ি। না হলে—বীভৎস একটা স্ট্যাম্পিডে ছ'জনের প্রাণ গেল, অসংখ্য আহত হল, অথচ নেতার জবানীতে আমরা অম্লান মুখে বলতে পারলুম : 'ও কিছু না—দুর্ঘটনা অমন হতেই পারে।'

নিশ্চয় পারে। যাঁরা এই ব্যাপার নিয়ে ক্ষোভ এবং ক্রোধের কলরব তুলেছেন, খেলা কেন বন্ধ করে দেওয়া হয় নি বলে অকারণ প্রশ্ন করছেন, তাঁদের পালটা জিজ্ঞাসা : খেলা কেন বন্ধ হবে মশাই? আমেরিকার হ্যাপী ক্রিসমাসের আনন্দে বছরে কতজনের প্রাণ যায়? ক্রিসমাসের উৎসব বন্ধ থাকে নাকি? গোটা আমেরিকা বসে থাকে নাকি কালো কাপড় মুড়ে?

প্রদীপ ঘোষের সংসার পথে বসল? ছাঁটাই নিয়েছেন তিনি, হয় আহার, নয় অনাহার একটা কিছু দেবেনই। মহেশ নন্দীর হেড-মাস্টার বাপ একমাত্র ছেলের আশা ভরসা হারালেন? স্কুল-মাস্টারদের আবার আশা ভরসা কী—সম্পূর্ণ নিরাকাঙ্ক্ষ হয়েই তো মাস্টারিতে নামতে হয়। অনিল দে গান না কাঁদছেন—পিনাকী চাটুজ্যের পরিবার কান্নার রোল তুলছেন? কাঁদুক নিঃ—অ্যাকসিডেন্ট ইজ অ্যাকসিডেন্ট। অরুণ চক্রবর্তী আর ক্রিকেটার হবে না? না হোক না, কী যায় আসে—আমরা যে এখনো বাঙালী ক্রিকেটার পেয়েছি—চতুর্থ টেস্টে তাদের খেলা দেখেন নি?

এরই পরিবারের কথা যে এইসব উল্লেখিত বাঙালীর চৈতন্যের সমান থাকে না। শ্রীবাস অঙ্গনে মহাপ্রভুর সংকীর্তন চলছে—সেই সময়ে শ্রীবাস সন্তান হারালেন। কিন্তু পাছে নাম কীর্তনে বাধা হয় শ্রীবাস সেই মৃত্যুসংবাদ চেপে গেলেন। মাঠে নিয়ে আমরা যখন অসীম যাচ্ছি, প্রভুত আনন্দ নিচ্ছি অস্ট্রেলীয়দের সেই আশ্চর্য খেলা দেখে, যখন কোনো মাননীয় অফিসার পাস নিয়ে সপরিবারে সুখে লাঞ্চ খাচ্ছেন—তখন আমরা তাদের বিন্দুমাত্র বেদনা দিইনি। বরং সবিনয়ে বলেছি : "থাকো স্বর্গে হাস্যমুখে, করো সুধা পান"—

অস্ট্রেলীয়ানদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি—আমরা কোনোদিন স্টেডিয়াম করব না—কখনোই না যদি এবার কাউকে পাসেরোটি কার্ড দিয়ে থাকি, আসছে বারে পঁয়ত্রিশ খানা দেব, যাতে তাঁদের বাবুর্চিরও মনোকষ্ট না হয়। এবারে ছ' জন দিয়েছি, আসছে বারে ছশো প্রদীপ ঘোষ অরুণ চক্রবর্তীদের আহুতি দেব।

এরই নাম ভারতবর্ষ।

অথবা বাংলা দেশ। কারণ, "বাঙালী আজ যাহা চিন্তা করে—" এট্‌সেট্‌রা এট্‌সেট্‌রা।

কী আশায়?

বিমল কর

সকালে ঘুম ভেঙে গেলে বিষ্ণু কয়েক মুহূর্ত কিছু অনুভব করল না; তারপর সে তার মাথা, চোখমুখ, হাত-পায়ের সাড় পেল। করকরে মোটা কম্বলের তলায় শরীর বেশ গরম মনে হলেও মাথার অবস্থা থেকে তার ধারণা হল, জ্বরটর হয়েছে। মাথা খুব ভার লাগছিল, যেন কাল সারা রাত ইটের ওপর মাথা রেখে শুয়ে ছিল, আজ আর মাথা নাড়াবার সামর্থ্য নেই। বিষ্ণু চোখের পাতাও খুলল না। বাঁ চোখটা তেমন যন্ত্রণা দিচ্ছে না, কিন্তু ডান চোখের ভুরুর ওপর ফুলে আছে, হয়ত কালশিরে পড়ে গেছে। চোয়ালে দাঁতে-টাঁতেও ব্যথা আছে। বাঁ হাতের কনুই, ঘাড় পিঠ এবং পায়েও ব্যথা-যন্ত্রণা; আপাতত এই সব ব্যথা জায়গায় জায়গায় জমে রয়েছে যেন, বিছানা ছেড়ে উঠতে গেলেই ছড়িয়ে পড়বে।

বিষ্ণু শুয়েই থাকল। শুয়ে শুয়েই সে এক থেকে দশের মধ্যে তিনটে সংখ্যা চট করে মনে করল: তিন, পাঁচ, নয়। সতেরো কিংবা তিনশো উনোষাট—কোনোটাই বিষ্ণুর মনোমত হল না। তার কপাল খারাপ বলছে। এখনও যদি এই চলে—একই রকম তা হলে মুশকিল।

এবার বাঁ চোখের পাতা খুলল বিষ্ণু, তারপর আস্তে আস্তে ডান চোখের পাতা। ডান চোখের পাতা ভাল করে খোলা গেল না। ভুরুর ওপর টনটন করছে। বিমর্ষভাবে বিষ্ণু নিজের মুখে একবার সন্তর্পণে হাত বুলিয়ে নিল। না, অক্ষত নেই; দু'এক জায়গায় কেটেকুটে আছে, একটু আধটু ফোলাও হাতে ঠেকছে; আয়োডিনের গন্ধও তার নাকে লাগছে এখন। বিষ্ণু অসহায়-

ভাবে নিজের মাথার চুলেও অল্প হাত বোলাল। তার কি বেশ জ্বর হয়েছে? না, অল্পস্বল্প? ব্যথার জন্যে বিষ্ণু কাল সন্ধ্যের পর থেকে দু' দুবার আর্ণিকা মাদার খেয়েছে, কুসুমবাবু দিয়েছিলেন। তেমন একটা উপকার হয়েছে বলে বিষ্ণুর মনে হল না।

আরও একটু বিছানায় শুয়ে থেকে বিষ্ণু উঠল। শুয়ে থেকে লাভ নেই। শুয়ে থাকলে তার শরীর বা মনের কষ্ট যাবে না। হাত-মুখ ধুয়ে বিষ্ণুকে দেখতে হবে তার শরীরের অবস্থাটা ঠিক কতটা কাহিল হয়েছে। আর, এটা কোনো রকমে সামলে নেবার চেষ্টা করতে হবে। কেন না সে এখনও এই অবস্থাতেও সরে আসতে রাজী নয়।

খদ্দরের মোটা চাদরটা গায়ে জড়িয়ে স্যাণ্ডেলে পা ঢোকাতে গিয়ে দেখল ওপারের স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে গিয়েছে। এটা কালই হয়েছে। ছেঁড়া চটিটা পায়ে গলিয়ে বিষ্ণু কিভাবে বাসায় ফিরেছিল তা আর মনে পড়ল না। হয়ত সে বুঝতেই পারে নি তার চটির এই হাল। ঘুঁষি চড় লাথির চোটে তার শরীরের এমনই অবস্থা এবং অবস্থা যে— যে নিজেকে মৃতপ্রায় লাগছিল; স্বাভাবিক হুঁশটাও তার ছিল না। এই অবস্থায় সে ফিরেছে। ফেরার পর কুসুমবাবুর মুখোমুখি হতেই হৈচৈ করে উঠলেন ভদ্রলোক। কুসুমবাবুর স্ত্রী—দিদি—জল গরম করে দিলেন। কোনো রকমে মুখটা পরিষ্কার হলে গাঁইতা কাটাছেঁড়া জায়গায় আয়োডিন লাগিয়ে দিলে কুসুমবাবু, তাঁর হোমিওপ্যাথির বাক্স থেকে দু' ডোজ আর্ণিকা মাদার দিলেন। বিষ্ণু সঙ্গে সঙ্গে এক পুরিয়া মুখে দিয়ে নিজের ঘরে চলে এল। এসেই বিছানা। কিন্তু সে ঘুমোয় নি। কাচ্ছুরের মতন পড়ে ছিল। সামান্য রাতে কুসুমবাবুর স্ত্রী কিছুটা দুধ এনে দিলেন। বিষ্ণু দুধটা খেল, জল খেল, আর্ণিকার পুরিয়া খেল। তারপর লণ্ঠন নিবিয়ে শুয়ে পড়ে মাথায় খানিকটা কাতরালো চাপা গলায়। শেষে কখন ঘুমিয়ে পড়ল।

স্ট্র্যাপ ছেঁড়া চটি কোনো রকমে ঘষড়াতে ঘষড়াতে বিষ্ণু বাইরে এসে দেখল রোদ ডালিমতলার এপারে চলে এসেছে, তার মানে বেশ বেলা হয়েছে। সামনের জমিটুকু শীতের রোদে ভরা। একপাশে কাঠের তক্তার ওপর পুকুরের জল বয়ে এনে বাউরী ঝি বাসন-মাজা শেষ করে ফেলেছে। কুসুমবাবুর স্ত্রী সকালের বাসি কাপড়-চোপড় ছেড়ে কেচে-কুচে শুকোতে দিয়েছেন শাড়িটাড়ি বাগানে ওপাশে। কাঠকুটো, কাঁটা তার দিয়ে বাঁধা বেড়ার গায়ে বুনো লতাপাতা, কয়েকটা কলাফুলের ঝোপ। কিছু শীত ফুটেছে এক কোণে, সন্ধ্যামণির ঝোপ হয়েছে। আর এই শীতে শিউলি গাছটা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বিষ্ণু কয়েক পলক তাকিয়ে এই সব দেখল। ডান চোখটা সে পুরোপুরি খুলতে পারছে না, মাথাও বেশ ভার, হাত-পায়ে জড়তা—তবু, বিষ্ণু চোখের সামনে নিত্যকার জিনিসগুলো দেখে যেন কিছুটা সান্ত্বনা পেল। না, তার মাথার গোলমাল, জ্বর-বিকার কিংবা দৃষ্টিভ্রান্তি নষ্ট হয় নি। সে এখনও স্বাভাবিক। তার সঙ্গে যে লড়াই চলছে—সেই লড়াই তাকে এখন পর্যন্ত মেরে ফেলেনি। বিষ্ণু আরও কয়েক দফা লড়তে পারবে।

মুখ ধোওয়ার জলটুকু আলাদা করে তোলা ছিল—কুয়ার জল; বিষ্ণু মুখ ধুতে নীচে নেমে গেল।

রোদের মধ্যে দড়ির ছোট ছোট চৌকি পেতে দিয়ে কুসুমবাবুর স্ত্রী চা দিলেন। কুসুমবাবুর স্ত্রীর নাম প্রভা, প্রভাসুন্দরী না প্রভাবতী বিষ্ণু জানে না। সে দিদি বলে। দিদি বলতে তার ভাল লাগে। কুসুমবাবু বলেন, আমি আজ বারো বছর শালা-শালী শ্বশুর-শাশুড়ির কোনো ঝামেলা না রেখে জীবন কাটাচ্ছি, তুমি বিষ্টুচন্দর এই বয়েসে আবার কেন মায়া বাড়াতে আসছ! তবে হ্যাঁ, তুমি বন্ধু, শালা নাও, স্বয়ং বিষ্ণু, তাড়াতে পারছি না। কুসুমবাবু অবশ্য কখনোই একথা বলেন না যে তাঁরা নিঃসন্তান আত্মীয়স্বজনহীন—কাজে এক অপরজনকে আত্মীয়রূপে গ্রহণ করতে তাঁদের ঔৎসুক্য কম নয়।

বিষ্ণু দড়ির ছোট চৌকিতে বসে চা খাচ্ছিল রোদের দিকে পিঠ; প্রায় মুখোমুখি কুসুমবাবু বসে।

কুসুম বললেন, "বিষ্টুচন্দ্র তোমার সঙ্গে আমার একটা বোঝাপড়া হয়ে যাক। কাল আমি তোমায় দিদিকে বলেছি—এভাবে আর চলতে দেওয়া যায় না।"

বিষ্ণু চায়ের গরম ভাপ চোখের ফোলার ওপর দেবার চেষ্টা করতে করতে বাঁ চোখ দিয়ে কুসুমকে দেখল।

"তুমি একদিন নির্ঘাত মরে যাবে আসবে" কুসুম বললেন, "জোর মার ধোর খাচ্ছ, আজ হাঁটু, কাল কবজি পরশু মাথা—একটা না একটা জখমই হচ্ছে, তবু তোমার চেতনা হচ্ছে না। এরপর তো গলা টিপে শেষ করে দেবে। কী ছেলেমানুষী করছ তুমি!"

বিষ্ণু কোনো জবাব দিল না, চুপচাপ। রোদের তাতে তার শরীরের জ্বর-ভাব বাড়ছিল না কমছিল সে বুঝতে পারছিল না। তার আরাম লাগছিল যদিও তবু ভেতরে কীরকম চাপা কাঁপুনি লাগছিল।

কুসুম কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে থাকলেন, যেন বিষ্ণুর কাছ থেকে কী জবাব পান দেখতে চাইছিলেন। বিষ্ণু কোনো জবাব দিচ্ছে না দেখে বললেন "কি হে চুপ করে আছ কেন?"

বিষ্ণুর গলা এখনও পরিষ্কার নয়, সর্দি জড়িয়ে আছে। গলা পরিষ্কার করে বিষ্ণু একটা শব্দ করল। শব্দটা যেন সার, কোনো জবাব নেই।

কুসুম অপেক্ষা করে থাকলেন।

শেষে বিষ্ণু বলল "আমি পারছি না। ওর জোর বেশি।" বলে একটু থামল, আরও চাপা গলায় বলল, "ওর দলের ছেলে-গুলোও কাছে থাকে।"

"সবই যদি বুঝছ তবে যাচ্ছ কেন?" কুসুম যেন খানিকটা অপ্রসন্ন।

বিষ্ণু প্রায় এক চোখেই কুসুমকে দেখছিল। এবার ডান চোখটাও বড় করার চেষ্টায় তার চোখের পাতা কাঁপতে লাগল। বলল, "বাঃ! যাব না?" বলে একটু থামল, আবার বলল, "না গেলে আমি হেরে যাব।"

এই বোকা, অদ্ভুত অবাধ্য ছোকরাটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কুসুমের মনে হল, জেদের বশে ছোকরাটা কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে পড়েছে, নিজের ভাল মন্দ বোঝার ক্ষমতাও আর নেই। পাগল একেবারে।

কাছাকাছি কোথাও প্রভা এদিকে কোনো কাজে। কুসুম ডাকলেন। "ঘর থেকে একটা আয়না এনে তোমার ভাইকে দেখাও। শালা আমার বরাট ব্রুস...।"

বিষ্ণুর চা খাওয়া শেষ হয়েছিল। কুসুমের প্রতি এখন তার তেমন মনোযোগ নেই। বিষ্ণু ভাবছিল—এই জ্বরো ভাব, গায়ে হাতের ব্যথা কমাবার জন্যে তাকে কিছু করতে হবে। সে একবার রমেনবাবুর ডাক্তারখানায় যাবে। সামন্ত কম্পাউণ্ডারের সঙ্গে তার বেশ ভাবসাব হয়েছে। রমেনবাবু তার এইরকম মূর্তি দেখলে নানান কথা জানতে চাইবেন। সামন্ত চাইবে না। সামন্ত কিছু কিছু জানে। সামন্তই তাকে দু' চারটে কড়া ট্যাবলেট দিতে পারবে, এই ফোলাটোলা কাটাকুটি খানিকটা ব্যবস্থা করে দিতেও পারবে হয়ত। বিষ্ণুর পক্ষে আজই সব সামলে নেওয়া সম্ভব নয়; কালকের চোট-জখম খানিকটা বেশি। কাল পরশুর মধ্যে অবশ্য বিষ্ণু আবার সামলে উঠে ওদের মুখোমুখি হতে চায়।

ততক্ষণে প্রভা একটা আয়না নিয়ে এসেছে।

কুসুম বললেন, "তোমার ভাইয়ের হাতে দাও, মুখটা দেখুক।"

প্রভা আয়না বাড়িয়ে দিল।

বিষ্ণু প্রথমে আয়না নিল না। তার অস্বস্তি হচ্ছিল। প্রভার চোখে চোখ পড়াতে বিষ্ণুর মনে হল, এ-সব ব্যাপারে দিদিও যেন ক্ষুণ্ণ, বেশ উদ্বিগ্ন। দিদিকে গম্ভীর দেখাচ্ছিল।

কী মনে করে বিষ্ণু হাত বাড়িয়ে আয়নাটা নিল। নিয়ে নিজের মুখ দেখল। প্রথমেই ডান চোখের ওপর নজর পড়ল। বিষ্ণু যা ভেবেছিল তার চেয়ে বেশি, ভুরুর ওপর অনেকটা ফুলে গেছে, জামফলের মতন রঙ হয়েছে, সেই ফোলা যেন চোখের পাতায় ছড়িয়ে এসেছে। চোখের সাদা জমি—যেটুকু দেখা যাচ্ছে—কালচে মতন। চোখের তলাতেও সামান্য কালচে ভাব। গাল, থুতনি, কপালেও নানারকম কাটাছেঁড়া; আয়োডিনের দাগ খয়েরী হয়ে এসেছে। ঠোঁট ফুলে আছে একপাশে। নিজের মুখের এই অবস্থা দেখতে দেখতে বিষ্ণুর রাগ আক্রোশ হচ্ছিল, উত্তেজনায় তার জ্বরোভাব যেন আচমকা বেড়ে গিয়ে এক দমক কাঁপুনি এল।

প্রভা বলল, "কতটুকু ক্ষমতা তোমার! পাজী হতচ্ছাড়াগুলোর সঙ্গে হাতাহাতি করতে যাও?"

বিষ্ণু আয়নাটা রেখে দিল। দিদি আজ রেগে রয়েছে। কাল কুসুমবাবুর সঙ্গে দিদির যে বেশ কথা কাটাকাটি হয়েছে, বিষ্ণুকে নিয়ে, আলোচনাও হয়েছে, বিষ্ণু তা বুঝতেই পারছে। নয়ত দিদি এত রেগে থাকত না। বিষ্ণুর জন্যে দিদিকে কী কী শুনতে হয়েছে কে জানে! কুসুমবাবু বরাবরই এই ব্যাপারটা তেমন পছন্দ করছেন না।

কিছুই যেন বলার নেই, বিষ্ণু বাঁ হাতে একটু মাথা চুলকে কৈফিয়তের মতন করে বলল, "পান্নার আঙুলে লোহার ভারী আঙটি মতন ছিল, তাতেই লেগেছে।" বিষ্ণু এমনভাবে বলল কথাটা যেন, এই সব জখম বা এত বড় বড় চোট হবার কারণ পান্নার লোহার আঙটি। ওটা না থাকলে বিষ্ণু কিছুতেই এ রকম জখম হত না, আর ছোট-খাটো চোট হলে নিশ্চয় বলারও কিছু থাকত না।

বিষ্ণুর কথা বলার ধরনে প্রভা চটে গেল। বলল, "তুমি সাত ন্যাকার এক ন্যাকা। বেশ তো, এর পর পান্নার হাতে লোহার কাটারি থাকবে, তোমার মাথা দুখানা করে ছেড়ে দেবে, আর তুমি এসে বলবে—পান্নার হাতে কাটারি ছিল।...কী বাকমারি! স্কুলে কত বচ্ছর পড়ালে গাধা হয় শুনেছি, তুমি দেখছি তিন মাস না যেতে যেতেই গাধা হয়ে গিয়েছ।"

বিষ্ণু মুখ ফিরিয়ে গাঁদা গাছের দিকে তাকিয়ে থাকল। তার খারাপ লাগছিল। কুসুমবাবুকে বিষ্ণু তেমন কিছু বলতে বা বোঝাতে চায় নি কোনোদিন, কিন্তু দিদিকে ব্যাপারটা সে যথাসাধ্য বোঝাবার চেষ্টা করেছে। বিষ্ণু জানত, এই সব ঝগড়া-ঝামেলা, মারামারি দিদির পছন্দ না হলেও অন্তত বিষ্ণুর বেলায়—বিষ্ণু যে কেন এইভাবে বার বার লড়তে যাচ্ছে—দিদি ব্যাপারটা বুঝতে পারছে। আর পারছে বলেই উদ্বেগ ও বিরক্তি সত্ত্বেও দিদি বিষ্ণুর বিপক্ষে নয়। আজ দিদিকে অন্য রকম মনে হচ্ছে। বিষ্ণুর মন খারাপ হয়ে যাচ্ছিল।

প্রভা আর দাঁড়াল না, চলে গেল। আয়নাটা পড়েই থাকল।

কুসুম বিষ্ণুর বিমর্ষ ক্ষুব্ধ অবস্থাটা দেখতে দেখতে এবার কৌতুক করে বললেন, "তোমার খুঁটিও নড়বড়ে হয়ে গেছে বিষ্টুচন্দ্র, এটা বিপদসংকেত। আমি বলি কী, মাথাটাথা ফাটিয়ে ফিরে আসার আগে মাথা ঠাণ্ডা করে ভাব খানিক। তুমি হলে শান্তশিষ্ট নরম ধাতের মানুষ, বাংলার মাস্টার, মাইকেল টাইকেল পড়াও বটে কিন্তু মেঘনাদ নও। তুমি এ সব গণ্ডগোলে থাকবে কেন? বদমাশ, ভ্যাগাবাণ্ডা, লোফার কটা ছোঁড়ার সঙ্গে তোমার লড়ালড়ি ভাল নয়, উচিতও নয়। স্কুলের মাস্টার তুমি—তোমার এ রকম হাল দেখলে সবাই বলবে কী। এরই মধ্যে তো নানা রকম গুজব শুরু হয়ে গেছে। কার মুখ তুমি চাপা দেবে! মাথা ঠাণ্ডা করে ভাব খানিক, অকারণে ঝঞ্ঝাট-ঝামেলার মধ্যে জড়িয়ো না।"

এর পর কুসুম উঠে গেলেন। ঘরে কিছু কাগজপত্র পড়ে আছে। স্কুলের কাজ। কুসুম অঙ্কের মাস্টার, তা ছাড়া স্কুলের সিনিয়ার টিচার বলে কিছু অফিসের কাজকর্মও করার থাকে।

বিষ্ণু আরও কিছুক্ষণ বসে থাকল। তার মাথা এত ভার, চোখের যন্ত্রণা এমনই যে কুসুমবাবুর কথাবার্তা সে যদিও শুনল তবু এ সব নিয়ে কিছু ভাবতে পারল না। শীতে কাঠ হয়ে থাকা শিউলিগাছটা বাতাসে নড়তে শুরু করল। বিষ্ণুরও চোখ যদিও অন্য-মনস্ক তবু শিউলি গাছের চাঞ্চল্য দেখে সে আচমকা নিজের চাঞ্চল্য অনুভব করল। করে উঠে পড়ল।

সেদিন রবিবার। ছুটি। পরের দিন ক্লাস প্রমোসান। তারপর দিন পাঁচেক বড়দিনের ছুটি। বিষ্ণুর করার কিছু ছিল না। বাড়ি থেকে বেরিয়ে বিষ্ণু প্রথমে কাছাকাছি ডুমুরতলার মোড় থেকে পায়ের চটিটা সারিয়ে নিল। তারপর হাতের ময়লা রুমালে ডান চোখটা মাঝে মাঝে চেপে ধরে সোজা রসোবাবুর ডাক্তারখানায় চলে গেল। এ সময় রসোবাবু থাকেন না। সেদিন সামনেই বসে ছিলেন। বিষ্ণুর ইচ্ছে নয় রসোবাবুর মুখের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। ভদ্রলোক যে কোনো ব্যাপারেই পঞ্চাশ রকম প্রশ্ন করেন। বিষ্ণু এ সবের জবাব দিতে চায় না। অগত্যা বিষ্ণুকে কাছাকাছি জায়গায় ঘুরঘুর করে সময় কাটাতে হল, রসোবাবু না-ওঠা পর্যন্ত। এরই মধ্যে বিষ্ণু দেখল রাস্তায় তাকে অনেকেই লক্ষ করছে, মুখচেনারা কাছে এসে প্রশ্নটশ্নও করল; বিষ্ণু এড়িয়ে যেতে লাগল : 'না, কিছু না—এমনি; পড়ে যাই নি ঠিক, ওই রকমই হয়েছিল; অন্ধকারে কী রকম একটা...' এই সব এলোমেলো কথা বলে বলে যখন আর পারছে না—তখন রসোবাবু ডাক্তারখানা ছেড়ে উঠে পড়লেন দেখে বিষ্ণু সেদিকে এগিয়ে গেল। রসোবাবু এবার চললেন 'কল'-এ। বিষ্ণু ঠিক এই সময়ে তার দুজন ছাত্রকে দেখতে পেল। এই ভয় সে বরাবরই করছিল। ছাত্র দেখামাত্র বিষ্ণু খুব ঘাবড়ে গিয়ে রাস্তার কুকুরের ওপর দিয়ে লাফ মারল, মেরে সোজা রসোবাবুর ডাক্তারখানার পাশের দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল।

কম্পাউণ্ডার সামন্ত বোধ হয় কল্পনাও করে নি বিষ্ণুর এই রকম মূর্তি দেখতে হবে। সে ইদানীং বিষ্ণুকে মাঝেসাঝে তুলোটুলো ছুঁইয়ে দিচ্ছিল, দু'একটা বড়ি ফড়িও দিচ্ছিল। কিন্তু এবারে বেশ খানিকটা বাড়াবাড়ি। সামন্ত বলল, "অ্যাঃ

হে; মুখটা যে থেঁতো করে দিয়েছে মাস্টারমশাই। বড্ড মেরেছে।"

বিষ্ণুর আর সহ্য হচ্ছিল না। কোনো রকমে সে বাড়ি ফিরতে পারলে বাঁচে। কালকের ঘটনা সম্পর্কে দু'চার কথা বলল বিষ্ণু। সামন্ত ততক্ষণে পরিষ্কার তুলো বের করে তার কাজ শুরু করেছে। রেকটিফায়েড স্পিরিট দিয়ে কাটাকাটিগুলো মুছিয়ে পাতলা করে মারকিওরেক্রম বুলিয়ে দিল। বলল, চোখের ফোলাটা যেতে সময় লাগবে, সেঁক দেবেন আস্তে আস্তে। গায়ে একটু জ্বর এসেছে, দাঁড়ান ক'টা বড়ি দিচ্ছি।

"ওই পান্না শালারা শয়তান", সামন্ত বলল, "বুঝলেন মাস্টারমশাই, হাড় হারামী। ওদের জব্দ করতে হলে শুধু হাতে লড়লে চলবে না। ছোরাছুরি চাই।" বলতে বলতে ক্রোধেরবশে সামন্ত মলম-তৈরি-করা ছুরিটা হাতে তুলে বিষ্ণুর দিকে বাড়িয়ে ধরল। "একটা ছুরিটুরি সঙ্গে নেবেন। দেবেন শালার......"

"ছুরি?" বিষ্ণু অবাক হয়ে বলল। "ছুরি কেন?"

"না থাকলে একদিন আপনিই মরবেন।"

"না—" বিষ্ণু মাথা নাড়ল। "ছোরাছুরি নেবার কথা তো নেই। পান্নার কাছেও ছোরা থাকে না।"

সামন্ত সামান্য থতমত খেয়ে গেল। তার পর বলল, "থাকে না আপনি জানলেন কি করে? দরকারের সময় ঠিক বের করবে।"

বিষ্ণু মাথা নাড়ল। না, সে ছুরিটুরি নেবে না।

সামন্তর কাছ থেকে বিষ্ণু সোজাসুজি বাড়ি ফিরল। বাড়ি ফিরে গোটা দুই বড়ি খেয়ে শুয়ে থাকল খানিক। তার বেশ শীত করছিল, মাথাও অবশ লাগছিল। শীতের বেলা বাড়তে বাড়তে প্রায় দুপুরের কাছাকাছি হয়ে এল যখন তখন বিষ্ণু ঘুমোচ্ছে। প্রভার ডাকাডাকিতে উঠল, স্নানটান করার কথাই ওঠে না, কিছু খেয়ে আবার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। শুয়ে শুয়ে সিগারেট খেল একটা। তারপর কী মনে করে তার ঘরের পেছন দিকে রোদে গিয়ে বসে থাকল। পৌষের রোদ এবার ভাটার দিকে, মাঠের ধুলো বাতাসে উড়ছে, খেজুর গাছের মাথা টপকে বালিয়াড়ির মতন উঁচু ঢিবিটা দেখা যাচ্ছিল তার কাছাকাছি হাট বসেছে, হাটের কিছু কোলাহল ভেসে আসছে। দড়ির ছোট খাটিয়ায় শুয়ে থাকতে থাকতে বিষ্ণু আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

এইভাবেই দুপুর কাটল, বিকেল এল আর গেল। সন্ধ্যাবেলায় বিষ্ণু নিজের ঘরে। জামকাঠের ছোট মতন টেবিলটার ওপর লণ্ঠন জ্বলছে, পাশে একটা টিনের চেয়ার। সামান্য আগে প্রভা এসেছিল, কড়াইশুঁটি আর আলু সেদ্ধ করে গোলমরিচ দিয়ে সামান্য ভেজে এনেছিল, চা এনেছিল। বিষ্ণু খেয়েছে। প্রভা কিছুক্ষণ ঘরে বসে ছিল। সামান্য কথাবার্তাও হয়েছে। বিষ্ণুর মনে হয়েছে: দিদি সকালের মতন অতটা আর রেগে নেই, এখন যেন খানিকটা নরম হয়ে এসেছে। কুসুমবাবু বিকেলের আগেই বাইরে বেরিয়েছেন, এখনও ফেরেন নি, ফিরতে রাত হবে।

সামন্তর ওষুধের গুণ বলতে হবে, সারা দিন পরে বিষ্ণুর এখন কিছুটা ভাল লাগছিল। বোধ হয় দুপুরে তার জ্বর এসেছিল, জ্বরের ঘোরও ছিল তার, শারীরিক বেদনা ও কষ্ট ছাড়া সে আর কিছু অনুভব করতে পারে নি। প্রায় আচ্ছন্নের মতনই তার সারা বেলা কাটল। এবার, এই সন্ধ্যার দিকে যেন সেই বেহুঁশ ভাবটা কেটে গেছে অনেক। জ্বর আছে বলে মনে হচ্ছে না। গলার কাছে সামান্য ঘাম ফুটেছে, মাথার যন্ত্রণা অনেকটা কম।

বিষ্ণু খানিকটা আগেই আরও দুটো বড়ি খেয়েছে ওষুধের। এবার একটা সিগারেট ধরিয়ে কম্বলের তলায় শুয়ে থাকল।

শুয়ে থাকতে থাকতে বিষ্ণু সমস্ত ব্যাপারটা আবার ভাবল, আগাগোড়া সব কিছুই, সে এখানে আসার পর যা যা ঘটেছে।

পুজোর আগে আগেই বিষ্ণু এখানে এসেছে। তারাপদ দত্ত—এখানকার স্কুলের বাংলার এক মাস্টারমশাই হুট করে চলে যাবার পর সেই চাকরিটা বিষ্ণু পেয়ে যায়। তারাপদ ছিল বিষ্ণুর বন্ধু, বছর খানেকের সিনিয়ার। তারাপদদা চিঠি দিয়েছিল: আমি কলেজে একটা কাজ পেয়েছি। তুমি যদি এখানে আসতে চাও আমার জায়গার ঝটপট একটা অ্যাপ্লিকেশান পাঠাবে, আমি সাধ্যমত বলেকয়ে যাব; তারপর তোমার ভাগ্য।

বিষ্ণুর ভাগ্য ভাল; চাকরিটা তার হয়ে যায়। কুসুমবাবু কেন যেন তার হয়ে দু কথা বলেও ছিলেন। এ ব্যাপারে তারাপদদার হাত থাকতে পারে, কিংবা বিষ্ণুকে দেখে কুসুমবাবুর হয়ত পছন্দও হয়েছিল। বিষ্ণু সঠিক কিছু জানে না। চাকরি জুটলেও থাকার জায়গা নিয়ে অসুবিধে ছিল। কুসুমবাবু নিজের বাড়িতে বিষ্ণুকে জায়গা দিলেন।

দু এক মাস করে এদিক ওদিক মাস্টারী করলেও বিষ্ণু পুরোপুরি বা পাকাপাকি-ভাবে কোথাও চাকরি করতে পারে নি, পায় নি। এখানের চাকরিটা সেদিক থেকে স্থায়ী, বিষ্ণু কারও বদলি খাটতে আসে নি। চাকরিটা ভালই লেগেছিল বিষ্ণুর। এটা কোনো শহুরে স্কুল নয়, জায়গাটাও ঠিক শহর নয়। এক সময় জায়গাটা নিশ্চয় পুরোপুরি গ্রাম ছিল—বড় গ্রাম; ক্রমে আর গ্রাম থাকে নি, যদিও গ্রামের পুরোনো গন্ধটা রয়ে গেছে। কাছাকাছি কয়েকটা কয়লাকুঠি চালু ছিল অনেক দিন ধরে, ইদানীং আরও ছড়িয়েছে, মস্ত দুটো ফায়ার ক্লে কারখানা হয়েছে, আর একেবারে হালে গড়ে উঠছে কাচ কারখানা। এর কোনোটাই এই জায়গার মাঝমধ্যে বসে নেই, কিন্তু গায়ে গায়ে লেগে রয়েছে। ফলে এখন এই জায়গাটা গ্রাম নয়, শহরও নয়, দুয়ের মেশামিশিতে এক আধা-শহর।

বিষ্ণু জায়গাটা পছন্দ করে ফেলেছিল। স্কুলও তার ভাল লেগেছিল। তার বয়েস অল্প, অভিজ্ঞতাও প্রায় কিছুই নেই। বিষ্ণুর প্রথম প্রথম ভয় হয়েছিল সে হয়ত পড়াতে পারবে না। মাস খানেকের মধ্যে বিষ্ণুর সে ভয় কেটে গেল। পড়াতে তার আর কোনো অসুবিধেই হচ্ছিল না। বরং সে যত্ন করে মন দিয়ে পড়াতে পারছে বুঝে নিজেই বেশ খুশী হয়ে উঠছিল।

গণ্ডগোলটার সূত্রপাত তার পর থেকেই। বিষ্ণু যখন নিজেকে প্রায় সব দিক দিয়েই মানিয়ে নিয়েছে, সে খুশী হয়ে উঠেছে, মনে হচ্ছিল—এবার আর তার দুশ্চিন্তার উদ্বেগের কিছু নেই—তখনই এই ঝঞ্ঝাটটা শুরু হল, পান্নাদের সঙ্গে গণ্ডগোল।

বিষ্ণু এমন মানুষ নয় যে সে নিজে এরকম বিশ্রী একটা ঝঞ্ঝাটের মধ্যে জড়াতে চাইবে। তার সেরকম চরিত্রও নয়। বরং বিষ্ণু এমন ধাতের ছেলে—যে, কোনোরকম হাঙ্গামা হুজ্জুত পছন্দ করে না। তার স্বভাব নরম, প্রকৃতি শান্তশিষ্ট। লোকে তাকে নিরীহ, লাজুক, নম্র বলেই বরাবর জেনে এসেছে। চেহারাও বিষ্ণুর এমন নয় যাতে তাকে তেমন সবল পুরুষ বলে মনে হতে পারে। তার গড়ন বরাবরই রোগা-ধরনের, খানিকটা ছিপছিপে। মাথায় সে মোটামুটি লম্বা। তার স্বাস্থ্য না চোখে-মুখে না হাতে পায়ে বুকে টগবগ করে ফুটছে বলে মনে হবে। তার গায়ের রঙ মামুলি, না কালো না বা ফরসা, ওই মাঝামাঝি। মুখ লম্বা ধরনের। নাকও বেশ লম্বা, যদিও তার কপাল তেমন ছড়ানো নয়। হাত পা দেখে কোনোদিন কেউ সন্দেহমাত্র করবে না যে, বিষ্ণু হাতাহাতি লাঠালাঠি করার যোগ্য। বরং বিষ্ণুর চোখ, বিষ্ণুর পাতলা ঠোঁট, সরু সরু আঙুল সামান্য ঝুঁকে-পড়া পিঠ দেখে তাকে ভীরু, দুর্বল, অসহায় বলেই মনে হবে। ছেলেবেলায় ছোটরা যেরকম দৌরাত্ম্য সাধারণত করে থাকে—বিষ্ণু হয়ত ততটা করেছে, তার বেশি নয়। বড় হয়ে সে সাইকেল চড়া এবং ব্যাডমিণ্টন খেলা ছাড়া আর কিছু শেখে নি। সে ফুটবল খেলা দেখেছে, নিজে বড় হবার পর খেলে নি কোনোদিন। কলেজে পড়ার সময় একবার বন্ধুরা তাকে হকি খেলতে নামিয়ে ছিল,

বিষ্ণু যতবার স্টিক তুলে বল মারতে গেছে ততবার তার মনে হয়েছে সে বুঝি কোনো বন্ধুর মাথা, নাক কিংবা হাতে মেরে বসবে; ফলে বিষ্ণু স্টিক তুলতে সাহস পায় নি।

যদি বলতেই হয় তবে বলা ভাল, বেচারী বিষ্ণু এ-যাবৎ একেবারে গোবেচারার মতন জীবন কাটিয়েছে। বন্ধুরা তার স্বভাব দেখে ঠাট্টা করে বলত, তুই শালা মেয়েছেলে হয়ে জন্মালি কেন? সোজা কথা, যেসব পৌরুষে দেখে লোকে বাহবা দেয় সে-রকম পৌরুষ তার কোথাও ছিল না। সে কোনোদিন জ্বলজ্বলে করেনি লোকের মধ্যে, বরং মিটমিট করেছে। সে শখের গান গাইত, কবিতাটবিতা পড়ত, গল্প-উপন্যাস থেকে শুরু করে এলেরী কুইন-টুইন যা হাতে পেত পড়ে ফেলত। এক সময় তার প্লুরিসির মতন হয়েছিল সেই ভয়ে সে ঠান্ডায় ভয় পেত, জ্বরটর হলে মনমরা হয়ে পড়ত।

এই যে বিষ্ণু—নিরীহ, নরম, শান্তশিষ্ট, নির্ঝঞ্ঝাট, লাজুক এবং যে কোনো রকম উগ্রতাই যার অপছন্দ—সেই বিষ্ণু এখানে পান্নাদের মতন ছেলেদের সঙ্গে বাজে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ল।

সিগারেটটা ফুরিয়ে যাওয়ায় বিষ্ণু জানলার দিকে মাটির পিকদানে—যেটা তার ছাইদান—নিবিয়ে ফেলে দিল। দিয়ে কম্বলের তলায় হাত ঢুকিয়ে নিল। নিয়ে চোখ বুজে শুয়ে থাকল কিছুক্ষণ, আবার চোখের পাতা খুলল, লণ্ঠনের আলো দেখতে দেখতে পান্নাদের সঙ্গে তার গোলমালের ব্যাপারটা মনে করতে লাগল।

এখানে আসার মাস দুই পরে, বিষ্ণু যখন নিজেকে সব দিক দিয়ে মানিয়ে টানিয়ে নিতে পেরে খুশী হয়ে রয়েছে ঠিক তখনই ঘটনাটা ঘটল। একদিন সন্ধ্যের পর—সামান্য রাত করেই সে কেদারবাবুর বাড়ি থেকে ফিরছিল সাইকেলে চড়ে। সাইকেলটা তার নয়, কুসুমবাবুর। কুসুমবাবু ইদানীং আর সাইকেল চড়তেন না, হাঁপানির জন্যে ছেড়েই দিয়েছিলেন। সাইকেলটা পড়েই ছিল; বিষ্ণু সারিয়ে-সুরিয়ে নিয়ে চড়াছিল। পাড়াপড়শি লক্ষ করেও সে চড়ছিল না। কেদারবাবুর বাড়িতে যাওয়ার জন্যেই সাইকেলটা তার দরকার হত। কেদারবাবুর বাড়ি খানিকটা দূরেই, বরাকর নদীর কাছাকাছি। প্রিমিয়ার কয়ার ক্লে-র বড়বাবু তিনি, টালি-বাংলোয় থাকেন। বিষ্ণু সেই কেদারবাবুর শালীর মেয়েকে পড়াতে। মেয়েটির নাম শচী। মা-বাবা নেই, মাসির কাছেই প্রতিপালিত হচ্ছে। শচীর বয়েস কমই, বছর আঠারো হবে হয়ত। শচীর চোখ-মুখ যেন পটে আঁকা, সুন্দর, লাবণ্য-ভরা; অথচ ভগবানের এমনই মার যে শচীর ডান পা অপুষ্ট। ছেলেবেলায় কী এক অসুখের পর থেকে এইরকম হয়ে গেছে।

শচী তাই বরাবরই বাড়িতে পড়াশোনা করে। বিষ্ণুর প্রথম থেকেই শচীর ওপর মমতা পড়ে যায়। যথাসাধ্য যত্ন করেই বিষ্ণু তাকে পড়াচ্ছে।

সেদিন বিষ্ণু সাইকেলে করে ফিরছে, শীত পড়েছে প্রথম, চাঁদের আলোতে হিম জড়ানো; সামান্য উঁচু গলায় গান গাইতে গাইতে বিষ্ণু প্রায়-ফাঁকা রাস্তা ধরে আসছিল। এ-রকম গান—শখের গান বিষ্ণু গায়। সেদিন গানের কীরকম মনও পেয়ে গিয়েছিল বিষ্ণু। গোটা দুয়েক গান শেষ করে সে যখন 'পূর্ণ চাঁদের মায়ায়...' গাইতে গাইতে আসছে তখনও সে তার গায়ে ঘন করে জড়ানো শচীর দেওয়া মেয়েলী পাতলা চাদরটার জন্যে মাঝে মাঝে হঠাৎ চুপ করে যাচ্ছিল। এই চাদর শচী তাকে জোর করে দিয়েছে, বিষ্ণু নিতে রাজী হয় নি। বিষ্ণুর গায়ে নামমাত্র সোয়েটার, নতুন ঠান্ডা পড়ে গেছে ফাঁকায় ফিরতে হবে বলে শচী জবরদস্তি করেই দিয়ে দিয়েছিল।

ঈশ্বরীতলা ছাড়িয়ে চৌমুখো বাজারটার কাছে এসে বিষ্ণু ভেবেছিল, নুটুর চায়ের দোকানের পাশ দিয়ে ডান হাতের পথটা ধরবে। তাতে সুবিধে হবে সামান্য। জায়গা মতন মোড় নেবার সময় বিষ্ণু দেখল, ওই ছোট্ট রাস্তায় জনা চার-পাঁচ জটলা করছে। বিষ্ণু চিনতে পারল—এখানকার কয়েকটা বকাটে, বাজে ধরনের ছেলে, পান্নার দলবল। বিষ্ণু ততক্ষণে গান থামিয়ে দিয়েছে, এবং কিছুটা বিরক্ত হয়েই ওদের গায়ের পাশ দিয়ে সাইকেলটাকে কাটিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে টাল খেয়ে পড়তে পড়তে পা বাড়িয়ে সামলে নিল। বিষ্ণু বলতে যাচ্ছিল, রাস্তা আটকে গল্প কেন, একটু সরে দাঁড়ালে কী হয়!—কিন্তু তার আগেই একজন বিষ্ণুর সাইকেলের হ্যান্ডেল ধরে ফেলল খপ্ করে।

বিষ্ণু রীতিমত অবাক হয়ে গেল। এমন নয় যে তার সাইকেল ওদের কারও গায়ে লেগেছে। বিষ্ণু মাথের দিকে তাকাল ছেলেটার। "সাইকেল ধরছ যে?"

ছেলেটা কোনো জবাবই দিল না, বরং এমন করে সাইকেলটা বিষ্ণুর দিকে জোরের সঙ্গে ঠেলে দিল যে বিষ্ণুর হাঁটুতে সাইকেলের চাকাটা লাগল। বিষ্ণু 'উঃ' করে উঠল।

পান্না পাশের ছেলেটাকে সরিয়ে বিষ্ণুর মুখোমুখি দাঁড়াল। বিচিত্র মুখ করে দেখল, তারপর মুখ একটু নামিয়ে ঘাড় কাত করে এক চোখ প্রায় বুজে অন্য চোখ ট্যারা করে বলল, "আলো কই?"

বিষ্ণুর সাইকেলে অবশ্য আলো ছিল না। এখানে সাইকেলে আলোটালো কেউ রাখে না। নিতান্ত দায়ে পড়লে পকেট টর্চ জ্বালায়। বিষ্ণু বলল, "আলো নেই।"

"ঘন্টিও নেই নাকি—?"

ঘন্টি আছে, বিষ্ণু অবশ্য ঘন্টি মারেনি, কেননা সে একটু তাড়াতাড়ি মোড় ঘুরেছিল এবং পান্নারা তাকে দেখছে দেখে অযথা আর ঘন্টি দেয় নি। বোধ হয় বিষ্ণু খানিকটা অন্যমনস্কও ছিল।

বিষ্ণু বলল, "ঘন্টি মেরে কী হবে। সামনাসামনি দেখা যাচ্ছে..."

"দেখা যাচ্ছে—! তুমি শালা মটরের হেড-লাইট নাকি?" পান্না বিশ্রী মুখ করে খিঁচিয়ে উঠল।

বিষ্ণু 'তুমি' এবং 'শালা' দুটো শব্দই স্পষ্ট শুনতে পেল। সে বুঝতে পারল, পান্না ইচ্ছে করেই শব্দ দুটো বলেছে। বোধ হয় বিষ্ণু প্রথমে তার সাকরেদকে 'তুমি' বলেছিল বলেই। বা পান্নার এটা ধরনও হতে পারে। বিষ্ণুর রাগ হল। সে স্কুলের মাস্টার, আর ওরা এখনকার হতচ্ছাড়া বকাটে বদ ছেলে।

বিষ্ণু বলল, "কথাবার্তাগুলো ভদ্রলোকের মতন বলাই ভাল।"

সঙ্গে সঙ্গে পান্না একটা পা বিষ্ণুর দিকে বাড়িয়ে তার পা মাড়িয়ে দিল। "মাস্টারী মারছ? তোমার স্কুলে আমরা পড়ি শালা?"

বিষ্ণুর পায়ে লেগেছিল, রাগও হচ্ছিল। কান গরম হয়ে উঠল। সাইকেলটা টেনে নেবার চেষ্টা করল হঠাৎ ঝটকা মেরে। এর ফলে সাইকেলের হ্যান্ডেলের একটা হাতল পান্নার গায়ে লাগল।

পান্না বিনা বাক্যব্যয়ে বিষ্ণুর হাত চেপে ধরে টান মারল, তারপর মুচড়ে ধরল। বিষ্ণু যন্ত্রণায় কাতরে উঠল, সাইকেলটা ততক্ষণে সে ছেড়ে দিয়েছে। পড়ে যাচ্ছিল সাইকেলটা, কে যেন—পান্নার দলের কেউ পড়ন্ত সাইকেল ধরে ফেলল।

একজন বলল, "মাস্টারকে দশবার নামতা পড়িয়ে দে পান্না... ও নামতা ভুলে গেছে...।"

আর একজন বলল, "শালার প্রাণে খুব ফুর্তি, গান গাইতে গাইতে আসছিল—ওর ফুর্তি ঠিক করে দে।"

বিষ্ণু পান্নার হাত থেকে ছাড়া পাবার চেষ্টা করতে করতে বলল, "রাস্তার মধ্যে গুণ্ডামি হচ্ছে? হাত ছাড়ো।"

পান্না হাতের মোচড় আলগা করলেও হাত ছাড়ল না। বলল, "বদনচাঁদ! শালার শরীর তো মুরগীর মতন, তাতে আবার তড়পানি। মারব পাছায় লাথ, মুখ থুবড়ে পড়বে...।"

বিষ্ণু তার সমস্ত শক্তি দিয়ে পান্নাকে ঠেলা মারল। তাতে তার হাত আলগা হয়ে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই বিষ্ণু দেখল পান্না বিষ্ণুর পায়ের পাশে পা রেখে ঠেলে দিয়েছে। বিষ্ণু রাস্তায় উল্টে পড়ল।

ধুলোর ওপর কয়েক মুহূর্ত পড়ে থাকতে থাকতে বিষ্ণু শুনল তার দলবলের

সবাই হাসছে। অট্টহাস্য। কে একজন ব্যাঙ ডাকার আওয়াজ করল। চোখ মুখে হলকা বেরোচ্ছিল বিষ্ণুর। সে উঠে দাঁড়াল।

বিষ্ণু উঠে দাঁড়াবার সময় তার গায়ের চাদরটা মাটিতে লুটোচ্ছিল। বিষ্ণু তুলে নেবার আগেই পান্নার দলের একজন সেটা কুড়িয়ে নিল। নিয়ে বিষ্ণুর নাকের ওপর ধুলো ঝাড়তে লাগল।

বিষ্ণু বলল, "আমার চাদর, সাইকেল দাও—"

"না", পান্না মাথা নাড়ল।

"কেন ?"

"খুশি।"

"আমার জিনিস আমায় দেবে না ?" বিষ্ণু প্রায় চেঁচিয়ে বলল।

"না, না—" পান্না যেন একই কথা বার বার বলতে হচ্ছে বলে বিরক্ত হয়ে শেষের 'না'-টা গলা ফাটিয়ে বিষ্ণুর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল, বলে মুখটা বিদ্রূপবশে হাঁ করে থাকল একটু। তারপর বলল, "নটবর নিমাই শালা। তুমি কিছু পাবে না।"

রাস্তায় পড়ে গিয়ে বিষ্ণুর লেগেছিল, রাগে তার সর্বাঙ্গ কাঁপছে। বিষ্ণুর চিৎকার করে বলল, "গায়ের জোর ?"

"হ্যাঁ, জোর—। মুরোদ থাকে নিজের জিনিস নিয়ে যাও।"

বিষ্ণু নতুন করে চারপাশ দেখল না। তাকে চারপাশে ঘিরে চার পাঁচজন দাঁড়িয়ে আছে। পান্নার চেহারাটা প্রায় জন্তুর মতন না হলেও তাকে ওই রকম দেখাচ্ছে। মাথায় মাঝারী, চৌকস গড়ন, হাত পা মুখ শক্ত, পরনে প্যান্ট, গায়ে পুরো হাতা লাল পুলওভার। মাথার চুলগুলো খোঁচা খোঁচা। বিষ্ণু বেশ বুঝতে পারল এই দলের হাত থেকে কিছু কেড়ে নেওয়া তার সাধ্য নয়। নিজের অক্ষমতা এবং অসহায়তা তাকে ধিক্কার দিচ্ছিল যেন। ছি ছি, ছি ছি। চোখ দুটো সামান্য ঝাপসা হয়ে এল। বিষ্ণু এবার মাস্টারনীর ঢঙে বলল, "তোমরা দল বেঁধে একজনের ওপর হামলা করে বীরত্ব ফলাচ্ছ ? কাওয়ার্ড কোথাকার—!"

পান্না যেন কথাটা শুনল একটু। তারপর হোহো করে হেসে উঠল। ঘাড় ঘুরিয়ে একজনকে বলল, "লে রে ফেলু, মাস্টার জ্ঞান দিচ্ছে—" বলে ফেলুর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বিষ্ণুর দিকে মজার মুখ করে তাকাল। তারপরে আরও বিশ্রী ঢঙ করে বিষ্ণুর থুতনি ধরে নেড়ে এক বিঘত দূরে থেকে একটা চুমু খাবার শব্দ করল। "আয় হায় মাস্টার, তোমায় শালা কী বলব, জ্ঞানচাঁদ না জ্ঞানচৈতন্য।...শোনো হে বদনচাঁদ, আমার দল তোমায় কিছু করেনি—করলে দাঁড়িয়ে বুলি মারতে হত না। বেশ, এরা কেউ কিছু করবে না—তুমি সাইকেল আর চাদর নিয়ে যাও যদি মুরোদ থাকে। আমি একলা থাকব, লড়ো শালা—কাম অন্..."

বিষ্ণু পান্নাকে দেখতে লাগল।

পান্না দু পা ফাঁক করে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল। তার চোখ মুখে শয়তানীর হাসি। ভঙ্গিটা হিংস্র।

বিষ্ণু দাঁড়িয়ে থাকল।

পান্না বলল, "আ যাও পিয়ারী..., আ যাও...। মরদ কা বাত হাতি কো দাঁত। তোমায় কেউ কিছু বলবে না, তুমি আর আমি ফাইট করব। জিতলে তুমি শালা তোমার জিনিস নিয়ে যাবে। মা কালীর দিব্যি।"

বিষ্ণু বুঝতে পারল, পান্না তাকে চ্যালেঞ্জ করছে। সে পারবে না। কিন্তু...? বিষ্ণু পা দাঁড়িয়ে বলল, "সাইকেল আমার নয়, চাদরটাও পরের—। অন্যের জিনিস আমায় ফেরত দিতে হবে।"

পান্না এবার একটা খারাপ গালাগাল দিল।

বিষ্ণু যেন ছুটেই যাচ্ছিল, তার আগেই পাশে সরে গিয়ে বিষ্ণুর পায়ে ল্যাঙ মারল পান্না, বিষ্ণু মুখ থুবড়ে গিয়ে পড়ল। উঠে দাঁড়াতেই পেছনে একটা লাথি মারল পান্না।

আর সম্ভব নয়। বিষ্ণু কোনো রকমে উঠে দাঁড়াল। ক্ষোভে, আক্রোশে, যন্ত্রণায় তার কান্না আসছিল। "তোমরা আমার জিনিস আমায় দেবে না ?"

"না, ক্ষমতা থাকে লড়ে নিয়ে যাও।"

বিষ্ণু নীরব।

পান্না কী ভেবে বলল, "এগুলো আমাদের জিম্মায় থাকল। আমাদের ক্লাব ঘরে থাকবে। ওই বাড়িটায়—" বলে পান্না আঙুল দিয়ে সামান্য তফাতে একটা চালা মতন ঘর দেখাল। "ইয়ং বেঙ্গল ক্লাব। বুঝলে হে বদনচাঁদ !"

বিষ্ণু বুঝল কী না কে জানে—সে এবার পা বাড়াল, পরাজিতের মতন।

পান্না বলল, "তুমি লোকজন ডেকে সাইকেল চাদর নিয়ে যেতে এলে তোমায় আর এখানে ঘাড়ে মাথা নিয়ে থাকতে হবে না মাস্টার, হুঁশিয়ার থেকো। শালা ভদ্রলোকের কথা। মরদ কা বাত। একলা আসবে, লড়ে যাবে, ক্ষমতা থাকে তো নিয়ে যাবে..... ."

বিষ্ণু চলেই যাচ্ছিল। তবু দাঁড়াল। বলল, "বেশ...কিন্তু অন্যের জিনিস আমার বলার মুখ থাকল না।"

"তা হলে শালা প্রথমেই রোয়াব করতে এলে কেন ? হাত জোড় করে মাফি চাইলেই পারতে, মাপ করে দিতাম।...রোয়াব যখন মেরেছ—তখন তুমি ভুগবে শালা, আমাদের কী !"

বিষ্ণু আর দাঁড়াল না। চলে এল।

এই ঘটনা বিষ্ণুকে তারপর থেকে কেমন উদ্‌ভ্রান্ত করে দিয়েছে। সাইকেলটা কুসুম-বাবুর, চাদরটা শচীর। সাইকেলের ব্যাপারে কুসুমবাবুকে বিষ্ণু কিছুই বলেনি, তিনি জানতেও চাননি। কথাটা অবশ্য দিদি—অর্থাৎ প্রভাকে বিষ্ণু বলেছে। সাইকেলের জন্যে প্রভার তেমন দুশ্চিন্তা নেই, চিন্তা বিষ্ণুর জন্যে। বিষ্ণু জানে না, দিদি কুসুমবাবুকে আড়ালে সাইকেলের ব্যাপার বলেছে কিনা ! কুসুম-বাবু তো ও বিষয়ে চুপচাপ। শচীর চাদর নিয়েও বিষ্ণু খুব বিব্রত ও লজ্জিত। শচী প্রথম দিকে একবার অস্পষ্টভাবে জিজ্ঞেসও করেছিল; বিষ্ণু কী বলবে বুঝতে না পেরে মিথ্যে কথা বলেছিল : 'পাছে গোলমাল হয়ে যায়—হারিয়ে টারিয়ে যায় ভেবে সুটকেসে রেখে দিয়েছিলাম সেদিনই। এমনই মুশকিল, সুটকেসের চাবিটা খুঁজে পাচ্ছি না। নিয়ে আসব একদিন।' শচী জবাব শুনে মুখ নীচু করে ফেলেছিল, আর ও প্রসঙ্গ তোলেনি।

আজ প্রায় একমাস হতে চলল ব্যাপারটা ঘটেছে। এর মধ্যে আরও ঝঞ্ঝাট গেছে। স্কুলের পরীক্ষা, খাতা দেখা। বিষ্ণুর মন যদিও ওই পান্নাদের দিকে পড়ে তবু তাকে কাজকর্ম করতে হয়েছে। কেদারবাবুর বাড়িতে আটদশ দিন যেতেও পারেনি—পরীক্ষার কৈফিয়ত দিয়ে কাটিয়েছে। এখন তার স্কুল, পরীক্ষা, খাতা দেখা কিছুই নেই। সে এখন ওই একটা ব্যাপার নিয়েই উদ্‌ভ্রান্ত।

পান্নাদের কাছে বিষ্ণু আরও বার পাঁচ ছয় গিয়েছে। পান্না ভদ্রবাড়ির ছেলে, কিছুটা লেখাপড়াও শিখেছিল, একেবারে ছেলেমানুষ নয়—বিষ্ণুর প্রায় সমবয়সী। বিষ্ণু ভাবত, পান্না হয়ত শেষ পর্যন্ত তার অন্যায় বুঝতে পেরে—বিষ্ণুর জিনিস

বিষ্ণুকে ফেরত দিয়ে দেবে। অথচ পান্নার হাবভাবে বিন্দুমাত্র সে-রকম নয়। যতবারই বিষ্ণু পান্নার কাছে গিয়েছে ততবারই সেই একই রকম—নোংরা কথাবার্তা, তামাশা, বিদ্রূপ, মারধোর। বিষ্ণু প্রতিবারই মার খেয়েছে : পান্না তাকে নির্দয়ভাবে চড় ঘুঁষি, লাথি মেরেছে, হাত মচকে দিয়েছে, কশিতে জখম করেছে, পায়ে চোট দিয়েছে। পরাজিত, বিক্ষত, ক্লান্ত, অসহায় চেহারা নিয়ে প্রতিবারই ফিরে এসেছে বিষ্ণু। সে তার জিনিস উদ্ধার করতে পারেনি।

প্রথম থেকেই বিষ্ণুর কী মনে হয়েছিল কে জানে সে পান্নাকে তার প্রতিপক্ষ বলে ধরে নিয়েছিল। এরকম প্রতিপক্ষের মুখোমুখি বিষ্ণু আগে কখনো হয়নি। বিষ্ণুর জেদ ধরে গিয়েছিল। আর ক্রমশই বিষ্ণু এক ধরনের হঠকারিতা বা পাগলামির দিকে ঝুঁকে পড়ছিল। অবশ্য বিষ্ণু একে পাগলামী বলত না, দিদি বলত, কুসুমবাবু বলতেন।

কিন্তু তা নয়। এটা পাগলামী নয়। ওই যে পান্নারা—দলবল নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, পাজী হতচ্ছাড়া বদমাশ ছেলের দল, ওরা সত্যি সত্যি কী? এরা আর যাই হোক, বিষ্ণু বুঝতে পেরেছে, তার প্রতিপক্ষ। গায়ের জোর ছাড়া অন্য কিছু এরা বোঝে না। শরীরের ক্ষমতাটাই এদের অহংকার। এই অহংকারকে তারা মান্য করে না, অকারণ মানুষকে পীড়ন করা অন্যায়। নিজের, নিজের ইতর হতে কিংবা পীড়ন, অপমান, অসম্মান করতে এদের বাধে না; বরং এসব করতে পারলে তারা উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। বিষ্ণুর সঙ্গে ওরা প্রথম থেকেই এরকম ব্যবহার করছে। আজকাল আরও বাড়াবাড়ি শুরু করেছে—পথেঘাটে তারা বিষ্ণুকে টিটকিরি মারে, রগড় করে কথা বলে, খুঁচিয়ে অপমান করার চেষ্টা করে। বিষ্ণুর সাইকেলটা যে তাদের এক্তিয়ারেই রয়ে গেছে এখনও এটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার জন্য মাঝে মাঝে পান্নাদের ইয়ং বেঙ্গল ক্লাবের চালাঘরের কাছে বারান্দায় সাইকেলটা বের করে রেখে দেয়। রাস্তাও কিম্ভূতভাবে চাকা দুটো আকাশের দিকে তুলে, উল্টে, এঁকিয়ে বেঁকিয়ে। সেই সঙ্গে শচীর চাদরটাকে পতাকার মতন করে একটা চাকার সঙ্গে বেঁধে দেয়। বিষ্ণুর চোখে পড়ার জন্যেই এই সমস্ত করে। দেখলে মনে হয় বিষ্ণুকেই যেন ওরা চিৎপাত করে মাটিতে ফেলে দিয়েছে : ঠ্যাং তুলে, কোমর ভেঙে, হাত-পা দুমড়ে বিষ্ণু পড়ে আছে। সেই সঙ্গে শচীর চাদর তার গলায় লটকে রয়েছে।

এই নোংরামি, ইতরতা দেখলে বিষ্ণুর অসহ্য রাগ হয়, আক্রোশ হয়, অপমানে চোখ-মুখ লাল হয়ে ওঠে। কিন্তু সে কিছুই করতে পারে না। পান্নারা যখন তাদের ক্লাবের বারান্দায় বসে শিস মারে, কিংবা জঘন্য ভাবে সকলে মিলে হাসি ঠোকে, অশ্রাব্য কথাবার্তা ছুঁড়ে মারে—তখন বিষ্ণু মুখ নীচু করে চলে আসে। করার মতন তার কিছুই থাকে না।

যতই পান্নারা বাড়াবাড়ি শুরু করল ততই বিষ্ণুরও কেমন একরোখা ভাব বাড়তে লাগল। এখন সে ধরে নিয়েছে—পান্নার সঙ্গে তার লড়াইটা সম্মানের। পান্না জানে না, কিন্তু বিষ্ণু অনুভব করছে, বিষ্ণু যদি নিজের জিনিস ফিরিয়ে আনতে না পারে তবে বিষ্ণু বড় রকম মার খেয়ে যাবে। এ মার তার মনের : বিষ্ণু নিজের মর্যাদা, আত্মসম্মান, অধিকারবোধ হারিয়ে ফেলবে। বিষ্ণু এত সহজে হার স্বীকার করতে চায় না। সে যতবার তার জিনিস ফিরিয়ে আনতে যাচ্ছে ততবারই মার খাচ্ছে। তবু বিষ্ণু এখনও তেমন মার খায়নি যাতে সে বাস্তবিকই পান্নার কাছে হার স্বীকার করে নেবে। বিষ্ণু লড়বে, যতদিন পারে, যতটা পারে—! তারপর দেখা যাক শেষে কী দাঁড়ায়!

কম্বলের তলায় বিষ্ণু আরও খানিকটা উসখুস করল। সামন্তর ওষুধ বোধ হয় খুব কড়া, শরীরটা আনচান করছে, জল তেষ্টা পাচ্ছে বিষ্ণুর। বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছিল না, অথচ গলা শুকিয়ে এসেছে।

শেষ পর্যন্ত বিষ্ণু উঠল। জলটল খেয়ে সামান্য পরে ফিরে এসে আবার বিছানায় শুয়ে পড়তে পড়তে বিষ্ণু নিজের মনেই মাথা নেড়ে বার কয়েক 'না—না' বলল। না, দিদি যা বলে তা সে হতে দিতে পারে না। কুসুমবাবুকে বলে বা পাড়ার এবং স্কুলের লোকদের বলে সে পান্নার কাছ থেকে তার জিনিস উদ্ধার করে আনতে চায় না। অন্যের সাহায্যে বিষ্ণু নিশ্চয় তার সাইকেল বা চাদর নিয়ে আসতে পারে, কিন্তু তাতে বিষ্ণুর কোনো গৌরব নেই। তা ছাড়া পান্নার সঙ্গে তার লড়াই তাদের দুজনের, অন্যের নয়; বিষ্ণু একাই লড়তে চায়। পান্নাও এখন পর্যন্ত কথার খেলাপ করেনি। একাই লড়ছে। বিষ্ণুও করবে না।

দিন চারেকের মধ্যেই একরকম সুস্থ হয়ে উঠল বিষ্ণু। এই ক'দিন তার মাথায় পান্না ভর করে থাকল সর্বক্ষণ। সে ক্রমাগত মার খেয়ে যেতে পারে না, তাকে যে কোনো রকমে একবার অন্তত জিততে হবে। বিষ্ণু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভাবল, পান্না তাকে কীভাবে, কখন, কোন সুযোগে প্রথম চোট মারে। কীভাবেই বা সে অত তাড়াতাড়ি বিষ্ণুকে জখম করে দেয়। পান্নার জোর বেশি। অনেক বেশি। তার হাত পা লোহার মতন শক্ত। সে নানারকম কৌশল জানে; মানুষ মারায় সে অভ্যস্ত। বিষ্ণু কোনো কিছুই জানে না। এমন কি বিষ্ণু তেমনভাবে একটা ঘুঁষি ছুঁড়তেও পারে না।

...তবু বিষ্ণু মনে মনে নানারকম ভেবে নিল। স্থির করল, এবার সে যতক্ষণ না অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে, কিংবা তার মুখ দিয়ে রক্ত উঠে সে মরমর হচ্ছে ততক্ষণ সে পান্নার সঙ্গে লড়বে।

সেদিন সন্ধ্যার মুখে বিষ্ণু বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। প্রভা দেখতে পেয়েছিল। শুধলো, 'কোথায় যাচ্ছ?' বিষ্ণু বলল, 'আসছি ঘুরে।' বলে সে আর অপেক্ষা করল না, উঠোন দিয়ে নেমে গেল।

বাজারের দিকে সরাসরি বিষ্ণু গেল না, ফাঁকা দিয়ে যেতে লাগল। সে প্রথম থেকেই উত্তেজিত হতে চাইছিল না, বরং মাথা ঠাণ্ডা করে হাঁটবার চেষ্টা করছিল; যেন প্রথম থেকে উত্তেজিত হবার অর্থ তার সামান্য যা শক্তি তা ফুরিয়ে ফেলা, নষ্ট করা। বিষ্ণু তার যতটুকু শক্তি ততটুকু অটুট রাখতে চায়। রাস্তায় যেতে যেতে বিষ্ণু বরং নিজেকে জাগাবার চেষ্টা করতে লাগল, মনে মনে বলছিল : হাজার হোক, বিষ্ণু তুমি তোমার মর্যাদার জন্যে লড়তে যাচ্ছ, তোমার জিনিস ফেরত আনতে—এবারও যদি না পার, আবার যাবে, আবার, যতদিন না হাত পা ভেঙে ঠুঁটো হচ্ছ...। কথাগুলো বিষ্ণুকে কীরকম যেন উত্তেজিত করছিল, ভরসা দিচ্ছিল।

পান্নাদের ক্লাবের কাছে গিয়ে বিষ্ণু দেখল, চালাঘরের মধ্যে লণ্ঠন জ্বালিয়ে পান্নারা হুল্লোড় করে তাস খেলছে, বিড়ি সিগারেট ফুঁকছে। বিষ্ণু সরাসরি বারান্দায় উঠে গেল। উঠে ছোট দরজাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

পান্নারা প্রথমে খেয়াল করে নি। পরে চোখ পড়াতে কে যেন অবাক হয়ে বলল, "আরে, বিষ্টু মাস্টার...!"

পান্নারা মুখ তুলে তাকাল। হাতের তাস হাতে। ঘরের একপাশে বিষ্ণুর সাইকেল দাঁড় করানো আছে, শচীর চাদরটা পান্না মাফলারের মতন করে গলায় জড়িয়ে নিয়েছে।

পান্না বিস্মিত হয়ে বলল, "তুমি শালা আবার এসেছ! মা মাইরি, লজ্জাশরম নেই তোমার। কুত্তার মতন। ঝাড় ফুঁক গায়ে লাগছে না তোমার।"

বিষ্ণু কোনো কথা বলল না।

একজন তার হাতের সিগারেটটা পান্নাকে দিল। পান্না সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে ছাইটা আঙুলে করে পরিষ্কার করে নিয়ে বোকা চোখে বিষ্ণুকে দেখল। "আমরা তাস খেলছি, ভেগে পড়ো।"

বিষ্ণু বলল "আমার সাইকেল, চাদর—"

"নেহি মিলেগা।"

"আমার জিনিস আমি নেব।"

"না—" পান্না মাথা নাড়ল। তারপর কী মনে করে বিদ্রূপের সঙ্গে বলল, "তোমার শালা মুরোদ নেই। তুমি পারবে না। তোমার কলজেয় হবে না। এ জন্মে নয়। তার চেয়ে তুমি আমাদের..." বলে পান্না একটা অশ্লীল কথা বলল।

বিষ্ণুর মাথা গরম হয়ে উঠল। "জানোয়ার কোথাকার! লোচ্চা...!"

পান্না আর বসে থাকল না, লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। সে উঠে দাঁড়াবার সময় তার পা লেগে হ্যারিকেনটা উলটে পড়ে গিয়ে দপদপ করছিল।

পান্না দাঁত পিষে বলল, "বাইরে চলো শালা, আজ তোমার জিব ছিঁড়ে নেব।"

বিষ্ণু চৌকাট থেকে সরে এসেছিল। বারান্দার একেবারে ধারে সে। পাশে মস্ত এক জবা গাছের ঝোপ।। বারান্দার সামনে খানিকটা মেঠো জমি, ওপাশে বকুল গাছ।

পান্না খেপা মোষের মতন বারান্দা থেকে লাফ মেরে মাঠে নামল। তার মুখে অশ্রাব্য গালাগাল। পান্না হাত উঁচিয়ে বিশ্রীভাবে চিৎকার করে ডাকল, "চলে আয় শালা, বাপের বেটা হোস তো চলে আয়। আজ তোর টুঁটি ছিঁড়ে ফেলব তবে শালা আমার নাম।" বলতে বলতে গলায় জড়ানো শস্তার চাদর সে টান মেরে ছুঁড়ে মাটিতে ফেলে দিল।

বিষ্ণু বারান্দায় পান্নার সাকরেদদের পায়ের শব্দ ও কথা শুনতে পেল। মাঠে নেমে পড়ল বিষ্ণু। উত্তেজনায় তার পা কাঁপছে, চোখ মাথা গরম—আগুনের তাপ ছুটছে। তার প্রায় সামনাসামনি পান্না, দু হাত তুলে মত্তের মতন দাঁড়িয়ে, চাঁদের আলোয় তাকে প্রবল, ভয়ংকর ও ভীষণ হিংস্র দেখাচ্ছিল। পান্না যে কী বলছে বিষ্ণু কিছুই শুনতে পাচ্ছিল না, তার দু চোখ শুধু পান্নার দিকে। বিষ্ণু চোয়াল শক্ত করে আবার বলল, "জানোয়ার..."

পান্না মাথার ওপর থেকে হাত নামিয়ে বোধ হয় ঘুঁষি পাকিয়ে ছুটে আসছিল, বিষ্ণু তাড়াতাড়ি সরে যাবার চেষ্টা করেও পারল না, পান্নার ঘুঁষি তার ঘাড়ের পাশ দিয়ে বাতাসে পড়ল। আর ঠিক তখনই, কোনো উপায় না পেয়ে বা আচমকা কী মনে হওয়ায় বিষ্ণু তার পুরো মাথাটা প্রাণপণে পান্নার মুখের তলায় মারল। একেবারে গুঁতো মারার মতন। পান্নার লাগল। কোথায় লাগল কে জানে—পান্না কাতরে উঠল। তারপরই সে সামলে নিয়ে বিষ্ণুর গলার কাছটা ধরে ফেলল। বিষ্ণু কিছু না বুঝেই পান্নার কুঁচকিতে জোরে একটা লাথি মারল। বিষ্ণুর গলা ছেড়ে দিয়ে পান্না পড়তে পড়তে সামলে নিয়ে টলতে লাগল।

তারপর বিষ্ণুর আর কিছুমাত্র খেয়াল নেই। পান্না পাগলের মতন লাথি চড় ঘুঁষি চালাচ্ছে—অথচ সেগুলো যেন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে, তেমন জোরও নেই। প্রথম চোট জখম হয়ে গিয়ে হয়ত পান্নার হাত পা তেমন কাজ করছে না। বিষ্ণু তার মাথা দিয়ে আরও দুবার পান্নার বুকে মারল। শেষে জাপটাজাপটি করে এলোপাথাড়ি মার চলছে। চলতে চলতে বিষ্ণু জানে না, কখন সে হঠাৎ নীচু হয়ে গিয়ে পান্নার পেটে মেরেছে। মারটা বেকায়দা হয়েছিল। পান্না পেটে হাত দিয়ে টলতে টলতে মাটিতে বসে পড়ল। পান্নার দলবল চেঁচাচ্ছে। পান্না নিজেও গালাগাল দিতে দিতে আবার উঠে দাঁড়াল। সোজা হয়ে দাঁড়াবার পুরো ক্ষমতাও তার নেই। আর বিষ্ণুও এই সময় তার এত-দিনের পুঞ্জীভূত আক্রোশ, তিক্ততা যেন চরিতার্থ করার জন্যে উন্মাদ হয়ে গেল। হিংস্রের মতন, কাণ্ডজ্ঞানহীনের মতন বিষ্ণু এবার সটান একটা লাথি মারল পান্নার মুখে। আর্তনাদ করে পান্না আবার মাটিতে বসে পড়ল। বিষ্ণু ছাড়ল না, ছুটে এসে আবার মারল। পান্না মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

এই সময় কে যেন কী ছুঁড়ে দিল পান্নার দিকে। পান্নার কাছ থেকে খানিকটা তফাতে এসে পড়ল জিনিসটা। বিষ্ণু দেখল, ছোরা। ছোরাটা ঘাসের ওপর পড়ে আছে, একেবারে শস্তার চাদরের পাশে। পান্না হাত বাড়িয়ে নেবার অনেক আগেই বিষ্ণু ওটা নিয়ে নিতে পারে। বিষ্ণু কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াল।

পান্নার দলের ছেলেগুলো একেবারে চুপ। খানিকটা আগেও চেঁচাচ্ছিল, এবার থেমে গেছে। হঠাতই। বিষ্ণু ছোরাটার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই সব চুপ।

পান্না আর উঠছে না। আশে পাশে লোকজনের গলাও পাওয়া গেল।

লুটিয়ে পড়া পান্নার সামনে বিজয়ীর মতন দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছিল বিষ্ণু। এবার আশ্চর্য এক আনন্দ পেল সে। এতদিন সে শুধু মার খেয়েছে, পীড়ন সয়েছে, অপমানিত হয়েছে, আত্মসম্মান নষ্ট করে গেছে। আজ বিষ্ণু জিতেছে। এখন সে তার জিনিস ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে। যেন পান্নার কাছে তার মর্যাদা এতকাল বাঁধা পড়েছিল—এইমাত্র বিষ্ণু তা ছাড়িয়ে নিতে পারল। বিষ্ণুর গলার কাছে কোনো আবেগ, উচ্ছ্বাস আটকে ব্যথা ব্যথা করল।

'আমি জিতেছি—তোমরা দেখো; দেখে যাও—!' বিষ্ণু যেন এই কথাটা চেঁচিয়ে বলতে গিয়ে সামনে তাকাল। তারপর আশে পাশে। পান্নার বন্ধুরা আস্তে আস্তে মাঠ ছেড়ে চলে যাচ্ছে, পালাচ্ছে। এই তোমরা কোথায় যাচ্ছ? দাঁড়াও, কাছে এসো, দেখে যাও—তোমাদের পান্না মাটিতে পড়ে লুটোচ্ছে, সে হেরেছে—আমি শেষ পর্যন্ত জিতেছি।

আশ্চর্য, মাঠ ফাঁকা; কেউ নেই; বিষ্ণুর জিত দেখার জন্যে কেউ দাঁড়িয়ে নেই। খারাপ লাগল বিষ্ণুর, হতাশা বোধ করছিল।

শেষে বিষ্ণুর ভয় হল—পান্না কী মরে গেল নাকি? কোনো সাড় নেই। উঠছে না, কাতরাচ্ছে না।

বিষ্ণু ধীরে ধীরে পান্নার মাথার কাছে বসল। ইস, পান্নার নাকের তলায় রক্ত, গালে রক্ত, চোখ বোজা, চিবুক ফুলে গেছে, ধুলো লেগেছে তার কপালে, কানে। হাত ছড়িয়ে পান্না পড়ে আছে। না সে মরে নি, তার নিশ্বাস রয়েছে।

পান্নার লুটোনো, অচেতন, বিধ্বস্ত চেহারা দেখতে দেখতে একেবারে আচমকাই বিষ্ণুর কেমন মায়া হল। ও আর উঠতে পারছে না, ওর কোনো সাড় নেই। পান্না পরাজয় স্বীকার করে নিয়ে যেন মাটিতেই পড়ে গেছে বরাবরের মতন।

আর এই সময় সহসা, বিষ্ণুর চোখে জল এল। পান্নাকে সে যেন বলতে চাইল : তুমি ধুলো ঝেড়ে উঠে পড়। লড়ো। লড়ে যাও। আমি শালা বিষ্ণু—বার বার তোমার লাথি খেয়েছি, কিল চড়, ঘুঁসি—কী না, কিন্তু লুটিয়ে পড়ি নি, আবার এসেছি আমার জিনিস ফেরত নিতে। কিন্তু তুমি যখনই পড়লে আর উঠতে পারছ না। তোমার সে ক্ষমতা নেই কেন? কেন?

বিষ্ণু হাত বাড়িয়ে পান্নাকে নাড়া দিয়ে জাগাবার চেষ্টা করল। তার কেন যেন চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। সে বুঝতেই পারছিল না কী আশায় সে এতদিন ধরে লড়ছিল, আর কেনই বা আজ জিতেও তার এই অদ্ভুত বেদনা জাগল।

॥ ১ ॥

পঞ্চানন হঠাৎ এমন চিঠি লিখতে গেল কেন, তা-ও আবার পুলিস হাজত থেকে, কিছুই বুঝতে পারছি না। পুলিসে কেন তাকে ধরবে; চুরি ডাকাতি তার পক্ষে সম্ভব নয়, সে ধনী; সরকার বিরোধিতাও অসম্ভব, সে ভালোমানুষ। তবে আর কি হতে পারে। অনেকক্ষণ চিন্তার পরেও যখন হদিশ পেলাম না, ভাবলাম অনির্বাণের কাছে যাওয়া যাক, পঞ্চানন আমাদের দুজনেরই বন্ধু, স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা পর্যন্ত এক সঙ্গে আমরা পড়েছি। উঠব, উঠব ভাবছি, এমন সময়ে হঠাৎ দরজা খুলে গেল আর প্রবেশ করলো অনির্বাণ রায় স্বয়ং।

এসো, এসো, তোমার কথাই ভাবছিলাম; এসেছ ভালোই হয়েছে, নতুবা আমাকেই যেতে হতো।

তবেই দেখো প্রবাদগুলো একেবারে মিথ্যা নয়, ইংরাজিতে বলে শয়তানের কথা ভাবলেই এসে উপস্থিত হয় সে।

শয়তান না হোক অন্তর্যামী দেবতাকে এখন বিশেষ প্রয়োজন।

আরে শয়তানই কি কিছু কম অন্তর্যামী? কি হয়েছে বলো।

পঞ্চানন পুলিস হাজত থেকে চিঠি লিখে অবিলম্বে দেখা করতে বলেছে, তোমাকেও স্মরণ করেছে। দেখো।

তার চেয়ে তুমি পড়ো, আমি শুনি। পাঠকের চেয়ে শ্রোতা হিসাবে আমি বেশি নির্ভরযোগ্য।

এই বলে সে গরম চাদরখানা টেনে নিয়ে বেশ জমিয়ে বসলো, এমন সময় গুপী দু পেয়ালা গরম চা নিয়ে ঢুকলো। গুপী অনেকদিন আছে আমার কাছে, কখন চা যোগাতে হবে জানে।

নাও পড়ো।

"ভাই জগবন্ধু, পুলিস হাজত থেকে

'শাহী শিরোপা' প্রখ্যাত কথাশিল্পী শ্রীপ্রমথনাথ বিশী রচিত একটি নতুন ধরনের দীর্ঘ রহস্য কাহিনী। কাহিনীটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে তিন সংখ্যায় শেষ হবে।

আমার এ চিঠি পেয়ে নিশ্চয় অবাক হয়ে যাবে। কাল যখন আমাকে গ্রেফতার করলো, আমিও কম অবাক হইনি। [illegible] আজ আমি চুরির অপরাধে [illegible] সব কথা লিখবার সময় নাই। এর মধ্যে কোথাও একটা মস্ত ভ্রান্তি বা রহস্য আছে বলে আশঙ্কা। তুমি উকিল, সহজেই জামিন হতে পারবে, অন্য পরামর্শেরও দরকার। যদি হাতের কাছে পাও অনির্বাণকে এনো, পরের দায় বহন করাই তার পেশা, এ ক্ষেত্রে দায়টা গুরুতর। ইতি

পঞ্চানন ঘোষ"

চা শেষ হয়ে গিয়েছে, চুরুট ধরিয়েছে অনির্বাণ, জ্বলন্ত চুরুট প্রায় তার [illegible]-লক্ষণ, বন্ধুরা ঠাট্টা করে বলে সার্থকনামা।

[illegible]

বুঝবার মত কিছুই তো নেই চিঠিতে, তবে এ কথা নিশ্চয় পঞ্চাননের পক্ষে চুরি ডাকাতি করা আর দিনের বেলায় অমাবস্যার চাঁদ দেখা সমান সম্ভব। খুব সম্ভব ওর লেখাই ঠিক, কোথাও একটা মস্ত ভ্রান্তি বা রহস্য আছে নিশ্চয়।

এখন কি করবে?

যাবো—এই বলে সে উঠে দাঁড়ালো। গুপীকে ট্যাক্সি ডাকতে বলে দুজনে নীচে এসে দাঁড়ালাম।

অল্প আয়াসেই পঞ্চাননের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। আমি উকিল, পুলিসে উকিলে একটা অলিখিত সন্ধি আছে। অনির্বাণকে নিয়ে হাজতে ঢুকে দেখলাম যে একখানা-বেঞ্চির একান্তে পঞ্চানন উপবিষ্ট, চোখমুখ ম্লান, গায়ের কাপড় এক রাত্রি হাজত-বাসেই মলিন। বেশ বুঝতে পারা গেল সারারাত ঐভাবে বসে কাটিয়েছে।

আমাদের দেখে তার মুখে চোখে ভরসার ভাব ফুটে উঠল। বলল, আমি জানতাম নিশ্চয় তোমরা আসবে।

আমি বললাম, আসবনা এমন সম্ভাবনাও কি ছিল?

তিনজনে গিয়ে জানলার কাছে দাঁড়ালাম, কারণ লক-আপে আরও দু-তিনজন লোক ছিল, একটু নির্জনতা আবশ্যক।

চুপ করে থাকলেই অস্বস্তির ভাব প্রবল হয়ে উঠবে তাই ভূমিকা না করে একেবারেই ঘটনা বিবরণের মধ্যে গিয়ে পড়লাম।

কি ব্যাপার বলো তো।

লক-আপে ধূমপানের নিয়ম না থাকায় অনির্বাণ এখন নিতান্ত নির্বাণ, নীরব শ্রোতামাত্র।

পঞ্চানন আরম্ভ করলো, ব্যাপার কিছুই জানিনে। হঠাৎ পরশুদিন বাসায় পুলিস গিয়ে উপস্থিত, বলে, রংপুর থেকে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা এসেছে।

আমি শুধোলাম, কি চার্জ?

দারোগা বললে, জানিনে।

আমি জামিনে খালাস চাইলাম, দারোগা বলল, নন্-বেলেবল ওয়ারেন্ট, জামিন চলবে না। তখন একটুখানি সময় চেয়ে নিয়ে তোমাকে চিঠি লিখে ডাকে দিলাম। তারপর থেকে যেমন দেখছ সেইভাবে বসে আছি।

অনির্বাণ বলল, তুমি থাকো তো রংপুরে।

রংপুর জেলার [illegible], সংশোধন করে দিল পঞ্চানন।

কলকাতায় কদিন এসেছ?

পাঁচ ছয় দিন, বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে ওয়ারেন্ট আমার পিছু পিছু রওনা হয়েছে।

ওখানে থাকতে কিছু বুঝতে পারনি?

কিছুমাত্র না।

পঞ্চানন ও অনির্বাণের মধ্যে সংবাদ চলছিল আমি শুনছিলাম।

কিছুমাত্র নয়?

এবারে তাকে গম্ভীর ও চিন্তান্বিত দেখা গেল, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, দেখো, সত্য কথা বলতে কি কিছুকাল থেকে একটা কেমন যেন রহস্যের মতো অনুভব করছিলাম।

কি রকম খুলে বলো,

খুলেই যদি বলতে পারবো তবে আর রহস্য বলতে যাবো কেন?

তবু—

তবে আমার পারিবারিক বিবরণের একটা খসড়া দেওয়া আবশ্যক।

এবারে আমি বললাম, আমি মোটামুটি জানি, অনির্বাণ অল্পই জানে, তাকে বলো; আমার অজানা কিছু থাকলে ওর কাছে শুনে নেবো।

কিন্তু তুমি চললে কোথায়?

তোমার জন্যে কিছু সন্দেশ নিয়ে আসি, কাল থেকে খাওয়া হয়নি বুঝতে পারছি।

সেই সঙ্গে গোটা দুই ডাব এনো, একটা এখন খাবো, একটা থাকবে; এখানকার জল অপেয়।

পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেওয়া আবশ্যক যে, এ ঘটনা সন্দেশ নিয়ন্ত্রণের অনেক আগের, ইংরাজ আমলের।

পঞ্চাননকে খাইয়ে জামিনের দরখাস্ত করতে গিয়ে শুনলাম যে এখানে জামিন পাওয়া যাবে না, রংপুরের পুলিসের পরওয়ানাবলে গ্রেপ্তার হয়েছে আসামী, কলকাতার পুলিস তাকে পাঠিয়ে দেবে রংপুরে, সেখানকার ম্যাজিস্ট্রেট ইচ্ছা করলে জামিন দিতে পারে। আরও জানতে পেলাম যে পঞ্চাননের বিরুদ্ধে চার্জ গুরুতর। চুরির চার্জ। তাহেরগঞ্জের রাজাবাহাদুরের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত, "হয়ারলুম", মোতির হার চুরির অভিযোগ। পঞ্চাননকে গ্রেপ্তার করতে যখন পরওয়ানা নিয়ে গিয়েছিল তখনই তার এ খবর জানবার কথা। হয় জেনেছিল কিন্তু লজ্জায় আমাদের বলতে পারেনি, নয় গ্রেপ্তারী পরওয়ানা দেখে এমনি হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল যে চার্জ জিজ্ঞাসা করবার কথা মনে ছিল না কিম্বা এমন হওয়াও অসম্ভব নয় যে অকস্মাৎ অবস্থা বিভ্রাটের মধ্যে পড়ে সব ভুলে গিয়েছে। যাই হোক, এখানে আর করণীয় কিছু ছিল না। পঞ্চাননকে খবর পাঠিয়ে দিলাম যে এখানে জামিন পাওয়া যাবে না, তাকে রংপুর যেতে হবে। আমরাও রংপুর বলে রওনা হলাম, হয় তো এক গাড়িতেই যাবো। আরও জানালাম যে, আমরা গিয়ে একেবারে তাহেরগঞ্জের রাজবাড়িতে উঠবো, যা করবার সেখান থেকেই করতে হবে। তাহেরগঞ্জের রাজবাড়িতে আমরা একেবারে অপরিচিত নই, আগে বার দুই পঞ্চাননের সঙ্গেই গিয়েছি।

বাসায় ফিরতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল অনির্বাণকে বললাম, এখন বাসায় যেয়ো না, এখানেই খেয়ে নাও, আজ রাতেই নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেসে রওনা হতে হবে। গাড়িতে নিরিবিলি বসে শুনবো পঞ্চাননের সঙ্গে কি কথা হয়েছিল তোমার। যথাসময়ে শেয়ালদ স্টেশনে এসে সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় দুজনে উঠলাম। ভাগ্যক্রমে গাড়িখানা ফাঁকা ছিল পঞ্চাননকে নিয়ে এলো কি না বুঝতে পারলাম না। গাড়ি ছেড়ে দিলে অনির্বাণকে বললাম, এবারে বলো কী কথা হলো তোমার সঙ্গে।

অনির্বাণ বললো, তুমি বোধ হয় লক্ষ করেছ যে আমি এতক্ষণ বেশি কথা বলিনি।

তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু কেন?

তুমি অবশ্য কম কথার মানুষ, কিন্তু এত বেশি নীরবতা তোমার স্বভাবসিদ্ধ নয়।

নিতান্ত মিথ্যা বলোনি, জগবন্ধু। পঞ্চানন সমস্ত ঘটনা বিবৃত করে মন্তব্য করেছিল যে মস্ত একটা রহস্যের জালে সে ধরা পড়েছে, এ গ্রেপ্তারী পরওয়ানা তারই একটা মোটা সুতো।

আমি বললাম, রহস্য কথাটা আমি থাকতেই একবার বলেছিল, তোমার কাছে বিস্তারিত আর কি বললো?

অনির্বাণ গুছিয়ে বসে নিয়ে বলল, তবে শোনো। তুমি তো জানো যে পঞ্চানন রাজাবাহাদুরের উত্তরাধিকারী দত্তকপুত্র।

ভাই অনির্বাণ, আমি এ সমস্তই জানি, নূতন কিছু থাকে তো বলো।

নেহাত মন্দ বলোনি। যাই হোক যদি জানো তবু আর একবার শুনতে বাধা নাই, বার বার শুনতে শুনতে রহস্য কিছু ফিকে হয়ে আসতে পারে।

বরঞ্চ আমিই বলি, ওর পারিবারিক অবস্থা তোমার চেয়ে আমি ভালো জানি, তুমি দেখো পঞ্চানন যা বলেছে তার সঙ্গে কোথাও গরমিল হয় কি না।

বেশ, তাই হোক, তুমি বলো আমি চেক করি।

আমি আরম্ভ করলাম।

তাহেরগঞ্জের রাজাবাহাদুর কৃষ্ণবিলাস অপুত্রক, মৃতদার ও বৃদ্ধ। বৃহৎ ভূসম্পত্তির উত্তরাধিকারী না থাকায় দরিদ্র এক বাল্যবন্ধুর পুত্র পঞ্চাননকে পোষ্যপুত্র রূপে গ্রহণ করেন। আইনত সে-ই উত্তরাধিকারী বটে। আর কেবল আইনত উত্তরাধিকারী বলে নয় রাজাবাহাদুরের সমস্ত পুত্রস্নেহেরও সে অধিকারী। রাজবাড়িতে তার সুখ ও সম্মানের অন্ত নাই। সুখ রাজাবাহাদুরের কাছে, সম্মান আত্মীয়স্বজন কর্মচারীদের কাছে। সবাই জানে পঞ্চানন হচ্ছে ভাবী মালিক ও রাজাবাহাদুর, ঐ পদবীটা ওদের উত্তরাধিকারী সূত্রে চলে। কেমন ঠিক হচ্ছে কিনা।

চুরুটের আগুনে দীপ্ত মুখমণ্ডল অনির্বাণ উত্তর করলো, বলে যাও।

সবাই প্রসন্ন মনে পঞ্চাননকে গ্রহণ করেছে। কেন না করবে? চেহারায় ও স্বভাবে সে রাজসম্মানের যোগ্য। এদিকে রাজা বাহাদুরও ক্রমে ক্রমে স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি তাকে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। পুরুষানুক্রমে ওদের সঞ্চিত সোনারুপোর অলঙ্কার ও তৈজস, হীরে জহরত প্রচুর। আকবরি মোহর থেকে কুইন ভিকটোরিয়ার মোহর, তার সংখ্যাও বড় কম নয়। রাজা বাহাদুরের ব্যাঙ্কের উপরে আদৌ বিশ্বাস নেই, সমস্তই থাকে রাজবাড়ির চোরা কুঠুরিতে। কেমন অবিকল হচ্ছে তো?

হচ্ছে, তবে এখনো আসল দুটি প্রসঙ্গই বাকি।

দুটি কোথায়, একটি। জাহাঙ্গীরের দত্ত সেই মোতির মালা। সেটাও দেখেছে পঞ্চানন। সেটা দেখিয়ে রাজাবাহাদুর বললেন, বাবা পঞ্চানন, এই শিরোপাই তাহেরগঞ্জের রাজ পরিবারের বুনিয়াদ। কতদিন আমি স্বপ্ন দেখেছি, মহাপুরুষ বলেছেন, যতদিন এটা পুরুষানুক্রমে চলবে, হস্তান্তর না হবে ততদিন এই পরিবারের মান সম্মান ঐশ্বর্য অক্ষুণ্ণ থাকবে, অন্য কারো হাতে গেলেই ধ্বংস শুরু হবে তাহেরগঞ্জ রাজপরিবারের। অনির্বাণ, এ সব কথা তুমিও শুনেছ, আমিও শুনেছি পঞ্চাননের মুখে, তোমার চেয়ে আমাকেই বেশি বার শুনতে হয়েছে, আমার পাশেই তার তক্তপোশ ছিল।

পর পর চুরুটে অনেকগুলি টান দিয়ে সে বলল, আর একটি প্রসঙ্গ যে বাদ দিলে দেওয়ানজীর কথা।

ঠিক মনে করিয়ে দিয়েছ। বুড়ো দেওয়ানজী। হাঁ, সেই বুড়ো দেওয়ানজী পঞ্চাননের উপর আদৌ সন্তুষ্ট নয়। পঞ্চানন বলে গোড়া থেকেই অসন্তুষ্ট ছিল, এখন রীতিমতো প্রতিকূল হয়ে উঠেছে।

কেন, কিছু অনুমান করতে পারো কি?

পঞ্চানন কিছু অনুমান করতে পারে নি?

দেখো পঞ্চানন খুব সরল মানুষ, ওর মনে কিছুই আসে নি। তবে ওর দিকেও তো দু-চার জন আছে, তারা ওকে দেওয়ানজীর অসন্তোষের কারণ ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছে। দেওয়ানজী হচ্ছে রাজাবাহাদুরের পিসতুতো ভাই, নিকট সম্বন্ধ, বয়সে কিছু বড়। রাজাবাহাদুর অপুত্রক, গত হলে তারই সম্পত্তি পাওয়ার কথা। হঠাৎ দত্তকপুত্ররূপে

পঞ্চানন এসে পড়ায় সেই আশায় ছাই পড়েছে। সে নাকি দত্তক গ্রহণের বিরুদ্ধে অনেকদিন বুঝিয়েছে রাজাবাহাদুরকে। ওদিকে আবার জ্ঞাতিদের মধ্যে যাদের আক্রোশ দেওয়ানজীর উপরে তারা রাজাবাহাদুরকে দত্তক নিতে উৎসাহ দিয়েছে। অনেক কাল কি করি কি করি চিন্তা করতে করতে অবশেষে দত্তক গ্রহণ করলেন তিনি।

তাই বলো, এত কথা জানতাম না। এমন ক্ষেত্রে রাগ হতেই তো পারে দেওয়ানজীর। তাহলে এই হল গিয়ে রহস্য।

অনির্বাণ একটি নতুন চুরুট ধরাতে ধরাতে বলল, যাই হোক, এর মধ্যে আর রহস্য কি আছে? এ তো মানব স্বভাবের নিত্যধর্ম। মুখের গ্রাস ছুটে গেলে কার না রাগ হয়।

কিছুক্ষণ কোন কথা না বলে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলো অনির্বাণ। বাইরে অন্ধকারে রেল পথের দুধারে অস্পষ্ট জঙ্গলের মধ্যে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ জোনাকি জ্বলছে আর নিবুছে, রীতিমতো অগ্নিস্ফুলিঙ্গের হরির লুঠ আর সেই সঙ্গে ভেসে আসছে পাট পচানো স্নিগ্ধ গন্ধ। দুজনেই নীরবে বসে আছি।

হঠাৎ অনির্বাণ বলে উঠল, কি ভাবছ বলবো?

বলো দেখি।

সেবার পঞ্চাননের সঙ্গে এই রাত্রের গাড়িতেই তাহেরগঞ্জে গিয়েছিলাম সেই কথা।

ঠিক ধরেছ, বুঝলে কি করে?

অতি সহজ। Association of Ideas! সে রাত্রেও এমনি জোনাকির চমক ও পাট-পচা গন্ধ ছিল। আজকার অভিজ্ঞতায় সে দিনের স্মৃতি মনে পড়ে গিয়েছে।

বোধ হয় তাই। কিন্তু এখন মনস্তত্ত্ব থাক, পঞ্চাননের রহস্যের কথা বলো।

আরে সেটাও যে একটা মনস্তত্ত্বের ব্যাপার।

কি রকম?

পঞ্চাননের ধারণা হয়েছে, কিছুদিন থেকে—তা বছরখানেক হবে, ও যেন একটা রহস্যের মধ্যে বাস করছে। রাজবাড়িতে অসংখ্য ঘর, অধিকাংশই খালি পড়ে থাকে।

রাজবাড়ি আমার দেখা আছে বিশদ বর্ণনার প্রয়োজন নেই।

আছে, নতুবা বাজে কথা বলতাম না। ও যে মহলে শোয় সেখানে ওর পুরাতন খানসামা হারান ছাড়া আর কেউ থাকে না।

সে ঘরটা আমার বেশ মনে আছে, সেবারে পাশের ঘরে আমাদের শুতে দিয়েছিল।

সে ঘরটা যখন মনে আছে তখন নিশ্চয় মনে আছে যে তার তিন দিকে টানা বারান্দা।

ও বর্ণনাটাও বাদ দাও। সেখানে চেয়ার পেতে তিনজনে অনেক রাত পর্যন্ত বসে থাকতাম; তুমি চুরুট টানতে আর রাজবাড়ির

পারতাও জীর্ণ মহলগুলোর দিকে তাকিয়ে উদ্ভট কল্পনার জাল বুনতে।

আশঙ্কা হচ্ছে পঞ্চাননের বিবরণটাও তোমার কাছে উদ্ভট মনে হবে।

উদ্ভট হলে অবশ্যই সে রকম মনে হবে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার কি আগে শুনি।

পঞ্চানন বলে মাঝে রাতে ঘুম ভেঙে গিয়ে অনেকদিন দেখেছে একটা ছায়ামূর্তি ঘুরে বেড়াচ্ছে ঐ বারান্দায়।

এবারে ভুতুড়ে গল্প আরম্ভ করলে।

ভুলে যাচ্ছ কেন, এ আমার বানানো নয়, শুধু কথিত বিবরণ।

পঞ্চাননের কি ধারণা ছায়াটা ভৌতিক।

ভৌতিক কি আধিভৌতিক কিছুই জানে না, যা দেখেছে তাই বলেছে।

কি দেখেছে শুনি?

একটা ছায়ামূর্তি প্রায় নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সেই বারান্দায় ঘুরে বেড়ায়। দু-তিন পাক দিয়ে চলে যায়।

এমন হতে পারে যে রাজবাড়ির রাত-পাহারা।

আমারও সে সন্দেহ হয়েছিল। পঞ্চানন বললো, রাতে পাহারা আছে বটে তবে তাদের এ মহলে আসবার হুকুম নেই।

ভূত যদি না হয়, মানুষ। কটাই বা মানুষ রাজবাড়িতে? চিনতে পারে কি না জিজ্ঞাসা করেছিলে?

করেছিলাম, সে বলে জ্যোৎস্না রাতে দেখি নি, দেখেছি অন্ধকার রাতে, তখন চিনতে পারিনি।

তবু তো একটা আন্দাজ করতে পারে? লম্বা কি রকম?

সে বলে দেওয়ানজীর মতো লম্বা।

রাজাবাহাদুরের মতোই বা নয় কেন? দুজনেই তো মাথায় সমান সমান।

পাগল হলে জগবন্ধু, রাজাবাহাদুর আসতে যাবে কেন?

তবে দেওয়ানজীই বা আসতে যাবে কেন?

সে তো দেওয়ানজী বলেনি, বলেছে তার মতো লম্বা।

আর কি বলেছে শুনি।

একদিন সেই মূর্তি তার ঘরে ঢুকেছিল।

দরজা খোলা ছিল?

সামনের দিকের দরজাটা বন্ধ করবার ভার হারানের উপর। দরজা বন্ধ করে দিয়ে হারান পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায় আর একটা ঘরে যেখানে হারান শোয়।

হারানকে ডাকলে শুনতে পায়?

শুনতে পায়, দরকার হলে কখনো কখনো ডাকে। তবে ছায়ামূর্তির প্রবেশে সে এমন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল যে হারানকে ডাকবার কথা মনে হয়নি। তাছাড়া মূর্তি প্রবেশ করেই বেরিয়ে যায়।

তুমি বলতে চাও যে ঘরে একটা লোক ঢুকলো আর চিনতে পারলে না।

যদি অচেনা লোক হয়?

রাজবাড়িতে গভীর রাতে অচেনা লোক আসবে কোথা থেকে? আর চেনা লোককেই কি সব সময়ে অন্ধকারে চিনতে পারা যায়। জগবন্ধু তুমি বাবলা গাছ ও আম গাছ দুই-ই চেনো। বলো দেখি বাইরে ওগুলো কি গাছ?

এই কি তাহলে রহস্য?

প্রায়।

তার মানে আরও আছে।

আছে তবে এখন আর নয়। ঘুমের ঝোঁকে বলতে গেলে সব গুলিয়ে যাবে। অনেক রাত হয়েছে। শুয়ে পড়ো।

আমারও ঘুম পাচ্ছিল, শোবার উদ্যোগ করছি এমন সময়ে ঝম ঝম রবে ঝঙ্কার তুলে গাড়ি পদ্মার পুলের উপরে উঠল

ভোর বেলা ঘুম ভাঙতে দেখি গাড়ি পার্বতীপুর স্টেশনে থেমেছে। গাড়ি বদলে ব্রাঞ্চ লাইনের গাড়িতে উঠতে হবে। তাড়াতাড়ি দুজনে নেমে পড়লাম। নামতেই দেখি পাশের এক ইণ্টার ক্লাস থেকে পঞ্চানন নামছে, সঙ্গে একজন পুলিস ইন্সপেকটার আর দুজন কনস্টেবল। তারাও গাড়ি বদলাবে—রংপুরের লাইনে। শেয়ালদায় পঞ্চাননকে চোখে পড়েনি। পঞ্চাননের কাছে গেলাম। ব্রাঞ্চ লাইনে গাড়ি ছাড়তে দেরি আছে। চা খেয়ে নেওয়া যেতে পারে। ইন্সপেকটার পঞ্চাননের মর্যাদা জানে, কাজেই যখন বললাম ইন্সপেকটার, পঞ্চানন আর আমরা চা খাই কি বলো, আপত্তি আছে। সে বলল, বেশ তো, খান না; আমরাও এই অবসরে চা খেয়ে নিই। তারা তিনজনে চায়ের দোকানে গেল। আমরা তিনজনের চা আনিয়ে নিয়ে নিরিবিলি একখানা বেঞ্চির উপরে বসলাম।

আমি বললাম, কেমন রাতে ঘুম হয়েছিল?

পঞ্চানন বলল, বর্তমান অবস্থায় যতটা সম্ভব তার বেশি নয়।

তারপরে একটু থেমে বলল, তোমরা যে সঙ্গে আসছ এ একটা মস্ত ভরসা।

জ্বলন্ত চুরুট মুখ থেকে নামিয়ে অনির্বাণ বলল, কালকেই তো কথা হয়েছিল, আমরা আসবো আর তাহেরগঞ্জ যাবো। দেখা যাক রাজাবাহাদুরের মন নরম হয় কিনা।

পঞ্চানন বলল, রাজাবাহাদুর সহজেই রাজি হবেন, ভয় দেওয়ানজীকে।

তুমি কি মনে করো তোমার গ্রেপ্তারের পিছনে দেওয়ানজীর হাত আছে?

ষোল আনা।

কিন্তু রাজাবাহাদুরের অমতে নিশ্চয় হয়নি।

তিনি এখন দেওয়ানজীর হাতের পুতুল।

এমন কি ভাবী উত্তরাধিকারী সম্বন্ধেও।

ভাবী উত্তরাধিকারী সম্বন্ধেও।

তাঁর কি স্বার্থ?

তিনিই জানেন। তোমরা যদি আশা করে থাকো তাঁর মন গলাতে পারবে তবে ভুল ভাঙতে দেরি হবে না।

অনির্বাণ বলল, আগে যাই তো, তার পরে দেখা যাবে।

এই বলে চুরুটে আচ্ছা করে গোটা দুই টান দিল।

আমি শুধোলাম আচ্ছা, ওখানে কারো কাছে সাহায্য পেতে পারি?

দেখো, এক সময়ে অনেকেই আমার পক্ষে ছিল, এখন বোধকরি কেউ নেই। তবে গুপীবাবুকে বিশ্বাস করতে পারো, তিনি আমাকে কখনো ত্যাগ করবেন না।

গুপীবাবুটি কে?

গুপীবাবু আমার গাঁয়ের লোক, আমার সঙ্গেই রাজবাড়িতে এসে কাজ নিয়েছেন, আমাকে বাল্যকাল থেকে জানেন।

তাঁর পুরো নামটা কি?

পুরো নাম বললে কেউ চিনবে না, গুপীবাবু বললেই সকলে জানে। কিন্তু তোমরা কি করবে ভাবছ?

প্রথমে গিয়ে জামিনের চেষ্টা করবো।

জামিন কে হবে?

ধরো রাজাবাহাদুর।

তিনিই যদি হবেন তবে গ্রেপ্তার হলাম কেন?

ধরো গুপীবাবু।

তাঁর এমন কিছু মর্যাদা নেই যে জামিন হতে পারেন, তাছাড়া তিনি রাজ সরকারের কর্মচারী, রাজার বিরুদ্ধে যাবেন কেন?

আচ্ছা, আমরা দুজনে যদি জামিন দাঁড়াই।

তোমাদের সেখানে চেনে কে?

তবে?

তবে আর কি হাজতবাস।

তার পরে বলল, ওসব চেষ্টা করে লাভ নেই। তোমরা প্রথমে গিয়ে আমার বিরুদ্ধে চার্জটা কি জানতে চেষ্টা করবে। তারপরে কাজটা যে আমার পক্ষে অসম্ভব রাজাবাহাদুরকে বোঝাতে চেষ্টা করো, তবে দেওয়ানজীর সম্মুখে হলে পেরে উঠবে না।

রাজাবাহাদুরকে একলা পাবো তো?

খুব আশা নেই, দেওয়ানজী বা তাঁর লোক সর্বদা ঘিরে থাকবে রাজাবাহাদুরকে। তার পরে থেমে বলল, যাচ্ছো তো, কি রকম অভ্যর্থনা পাবে জানি না।

সেবার তো ভালই পেয়েছিলাম।

সেবারে যে উত্তরাধিকারীর বন্ধুরূপে, এবারে বন্ধু আসামীর, অনেক প্রভেদ।

ইন্সপেক্টার কাছে এসে দাঁড়ালো, এবারে গাড়ি ছাড়বে।

পঞ্চানন ও আমরা দুই আলাদা গাড়িতে চাপলাম। গাড়ি ছেড়ে দিল। কিছুক্ষণ পরে তারা রংপুর স্টেশনে নেমে গেল। তার কিছুক্ষণ পরে আমরাও স্টেশনে নামলাম। এখান থেকে তাহেরগঞ্জ যেতে হয়, পাকা সড়ক আছে, ঘোড়ার গাড়ি পাওয়া যায়।

তাহেরগঞ্জের রাজবাড়ি একটা মস্ত ব্যাপার। বাড়ি ঘিরে গড়খাই, গড়খাই বরাবর ঘুরে এলে মাইল দেড়েক হবে। গড়খাই এখন শুকনো, বর্ষায় অবশ্য জলে ভরে যায়। গড়খাইয়ের পরে প্রাচীরের ঘের, প্রাচীর অনেক জায়গায় ভগ্ন। চারদিকে চারটা দেউড়ি ছিল, এখন কেবল পুব দিকের দেউড়িটাই ব্যবহার হয়, বাকিগুলো ইঁট গেথে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এখানে দেউড়ির সামনে গড়খাইয়ের উপরে ইঁটের পুল, গাড়ি, পাল্কি যেতে বাধা নেই। রাজবাড়ির চারদিকে খোলা মাঠ, উত্তর দিকে কিছু দূরে একটা গ্রাম, এই গ্রামটাই তাহেরগঞ্জের। রাজবাড়ির তিন তলার ছাদে উঠে তাকালে উত্তর দিকে অনেকটা দূরে রেল লাইনের খানিকটা অংশ দেখা যায়। আমরাও দেখেছি। ঐটুকু চোখে না পড়লে রাজবাড়িকে বিংশ শতকের না ভেবে সপ্তদশ বা অষ্টাদশ শতকের বলে মনে করতে কোন বাধা নেই। বর্তমান কালকে ডান হাত দিয়ে প্রাণপণ চেষ্টায় ঠেকিয়ে রেখেছে রাজবাড়িটা, যদিচ বাম হাতের অভ্যর্থনার চিহ্নও অপরিস্ফুট নয়। বাড়িটা যেমন বিপুল তেমনি নানা যুগের চিহ্নবাহী। ইতিহাসের পরিভাষায় প্রাচীনযুগ, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সাক্ষী। প্রাচীনতম অংশ এখন অব্যবহার্য, মধ্যযুগীয় অংশ প্রায় তথৈবচ, তবে প্রয়োজন হলে ব্যবহার করা যায়; আধুনিক অংশটাতেই এখন সকলে বাস করে; বাকি দুটো অংশ তাহেরগঞ্জ রাজবাড়ির প্রাচীন ঐতিহ্য ঘোষণার নকিব। এ সব আমাদের কাছে নূতন নয়, পঞ্চাননের কাছে আগে যখন এসেছি দেখে নিয়েছি; দেখার সঙ্গে শোনাও যুক্ত হয়েছে, কেননা, সেই ঘোর বর্ষাকালে সাহস করে প্রাচীনতম অংশে ঢুকতে পারিনি।

আমাদের গাড়ি রাজবাড়িতে এসে পৌঁছতেই দুজন কর্মচারী এসে আমাদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে বৈঠকখানায় বসালো, চাকরেরা মালপত্তর নামালো, মালপত্তর সামান্যই ছিল। রাজবাড়িতে অতিথি কেন এসেছে জিজ্ঞাসা বেদস্তুর, এসেছে এই যথেষ্ট। কার কাছে এসেছে, কেন এসেছে অতিথি নিজে থেকে না বললে জিজ্ঞাসা করবার নিয়ম নেই। আগের বারে নবাবী কায়দার বিড়ম্বনা পোয়াতে হয় নি, পঞ্চাননের সঙ্গে এসেছিলাম।

একজন কর্মচারী বিনীতভাবে নিবেদন করলো, আপনারা হাত মুখ ধুয়ে নিন, জলযোগ প্রস্তুত।

আমরা উত্তরে জানালাম, আমরা পঞ্চাননবাবুর বন্ধু, কলকাতা থেকে আসছি, রাজাবাহাদুরের সঙ্গে দেখা করবো।

আমাদের পরিচয় ও উদ্দেশ্য অবগত হয়ে অধিকতর বিনীতভাবে বলল, আজ্ঞে, আগে জলযোগ—

কাজেই জলযোগের জন্য উঠতে হল। বুঝলাম আগে জলযোগ পরে রাজদর্শন, দস্তুর ভেঙে কোন কাজ এখানে চলবে না।

কে একজন লেখক নাকি বলেছেন যে, মানুষ বুড়ো হলে সুন্দর হয়। সেই সঙ্গে তিনি বলতে পারতেন যে, সে সৌন্দর্য মানুষের মনে সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা জাগায়। রাজাবাহাদুরের সঙ্গে যখন আলাপ হচ্ছিল তখন এমন বিপুল সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা অনুভব করছিলাম, যে ভালো করে কথা বলতে পারছিলাম না, আমি বেশি কথা বলতে পারিনি, নিতান্ত অভিভূতভাবে বসেছিলাম, কথাবার্তা চালাচ্ছিল অনির্বাণ।

রাজাবাহাদুর বলছিলেন, বাবা, এ কেমন করে হল জানি না, আমি মনে মনে নিশ্চয় জানি, এ কাজ কখনো পঞ্চাননের দ্বারা সম্ভব নয়।

অনির্বাণ বলেছিল, তবে আপনি থাকতে অর্থাৎ আপনার এ বিশ্বাস থাকতে পুলিসে কি করে তাকে গ্রেপ্তার করে চালান দিল।

এখানে থাকলে কখনো সম্ভব হতো না। কলকাতায় গেলে তাকে গ্রেপ্তার করলো। রামসুন্দর (দেওয়ানজী) একদিন এসে জানালো যে পঞ্চানন গ্রেপ্তার হয়েছে।

আপনাকে কিছু না বলেই।

বাবা, আগের সেদিন তো আর নেই, যখন আমার জমিদারিতে আমিই জজ ম্যাজিস্ট্রেট।

কিন্তু সম্ভব অসম্ভব তো দেখতে হবে।

সে-সবের বিচার পুলিস আর রামসুন্দরের মধ্যে হয়েছে।

আর আপনি কিছুই জানতেন না।

আমি শুধু জানতাম যে জাহাঙ্গীর দত্তা মোতির মালা চুরি হয়েছে। আমিই সে কথা রামসুন্দরকে জানিয়েছিলাম।

সে মালার কথা কে জানতো?

সবাই জানতো। এ রাজ্যের সবাই জানে যে তাহেরগঞ্জের রাজবাড়িতে জাহাঙ্গীরের দত্তা মোতির মালা আছে যার দাম আজকের বাজারে কয়েক লক্ষ টাকা।

অনির্বাণ বলে, রাজাবাহাদুর, সে তো জনশ্রুতি। কলকাতায় বসে আমরাও জানতাম।

জানবে বই কি বাবা, শুনেছি ছাপা বইয়ে আছে।

তাইতো বলছি জনশ্রুতি। কিন্তু এ মালা আপনার বাড়িতে যে আছে সবাই জানলেও দেখেছে কয়জন?

দেখবে আর কে? আমার স্ত্রী দেখেছেন, তিনি আজ কয়েক বছর গত হয়েছেন। আর দেখেছে রামসুন্দর, আমিও অবশ্য দেখেছি।

পঞ্চানন?

হ্যাঁ, সে-ও দেখেছে। দত্তক হয়ে এ বাড়িতে আসবার পরে ক্রমে ক্রমে তাকে আমি সব দেখিয়ে শুনিয়ে দিচ্ছিলাম। পঞ্চানন খুব বুদ্ধিমান বাবা, অল্প দিনেই জমিদারির কোথায় কি আছে সমস্ত বুঝে নিল। তারপরে তিনশ বছরের সঞ্চিত হীরে জহরত মণিমুক্তো, সেই সঙ্গে সেই মোতির মালা দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলাম।

ও সব বাড়িতে রাখতেন কেন? ব্যাঙ্কে জমা দিলেই তো সব চুকে যেতো।

ব্যাঙ্কের উপরে আমার বিশ্বাস নেই। আমার জিনিস যদি আমি সামলাতে না পারি তবে ব্যাঙ্ক সামলাবে। ওসব হাল ফ্যাশানের মধ্যে আমি নেই। যাক্‌ গে সে কথা। অন্যান্য সমস্ত জিনিস দেখানো হয়ে গেলে সব শেষে দেখালাম জাহাঙ্গীরের নিজে হাতে দেওয়া সেই মোতির মালা।

এখানে আমি এক চরম নির্বুদ্ধিতার কাজ করে ফেললাম, শুধালাম, কেন বাদশা এই মালা দিয়েছিলেন খুলে বলবেন, অবশ্য যদি আপনার কষ্ট না হয়।

কষ্ট! বিলক্ষণ। ও গল্প হাজার বার বলেছি, আরও হাজার বার বলতে পারি, অদৌ কষ্ট হয় না। আনন্দ, আনন্দ, বাবা আনন্দ। কিন্তু সে এক দীর্ঘ ইতিহাস, শেষ করতে কিছু সময় লাগবে। এখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, আজ আর নয়। আগামী কালকে হবে। তোমরা বিশ্রাম করো। বলে তিনি উঠে পড়লেন। দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, পঞ্চানন থাকলে কোন কথা ছিল না, তোমাদের দেখা শোনার ভার সেই গ্রহণ করতো। আপাতত গুপী সে কাজ করবে। লোকটি বড় ভালো, পঞ্চাননদের গাঁয়ের লোক। গুপী—

আজ্ঞে,-বলে গুপীবাবু সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন।

এঁদের ভার তোমার উপরে রইলো, কোন ত্রুটি না হয় দেখো, এঁরা পঞ্চাননের ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

রাজা বাহাদুর ধীরে ধীরে অন্তঃপুরের দিকে চলে গেলেন। আমরাও গুপীবাবুর অনুসরণ করে আমাদের জন্য নির্দিষ্ট রুমের দিকে চললাম।

সন্ধ্যার পরে গুপীবাবু এসে আমাদের কাছে বসলেন। আমাদের বসবার ও শোবার জন্যে দুখানি ঘর নির্দিষ্ট হয়েছিল দোতালার উপরে। আরও অনেক কয়খানি ঘর ছিল, সব খালি, বেবাক দোতালাটাই খালি। আমাদের ঘরের সম্মুখে টানা বারান্দা, সেখানে বসলে সামনে অনেকগুলো আঙিনা দেখা যায়। চক মিলানো অট্টালিকা চলেছে আঙিনার পরে আঙিনা, সবগুলোই অন্ধকার তাই জনশূন্য মনে হচ্ছে। এ সব রাজবাড়ির মধ্যযুগের অন্তর্গত, বোধ করি তার পিছনে প্রাচীন যুগ, ভাঙা অট্টালিকার উপরে অশত্থ গাছের ডগাগুলো এই আলো-আঁধারির মধ্যেও চোখে পড়ে। বেশ বুঝতে পারা যায় এ সব এক সময় রাজবংশের গৌরবের সময়ে নরনারী দাসদাসীতে পূর্ণ থাকতো। আজ গৌরবে ভাটা পড়েছে, জন সমাগমেও। ফাঁকা মাঠ বা ঘন অরণ্য অনেক সময়ে মনে ভয় জাগায়, কিন্তু এই জনশূন্য ভগ্ন বাড়ির তুলনায় কিছুই নয়। মৃতদেহ ও পরিত্যক্ত সৌধ ভৌতিকর, ওর আশেপাশে অতীতের প্রেত ঘুরে বেড়ায়।

গুপীবাবু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, কি দেখছেন?

এসব আনুষ্ঠানিক প্রশ্নের কোন উত্তর না দিলেও চলে, কিন্তু হঠাৎ ঠোঁটের উপরে উত্তর এসে পড়লো, বললাম, ভাবছি ঐ ভাঙা বাড়িগুলোর মধ্যে ভূত আছে কিনা।

সে চমকে ওঠে শুধালো হঠাৎ ভূতের কথা মনে পড়লো কেন?

তার চমকটা আমার চোখ এড়িয়ে গেলেও অনির্বাণের চোখ এড়ায় নি। এক মনে বসে চুরুট টানলেও তার চোখ-কান প্রভৃতি সজাগ থাকে। তার যে চোখ এড়ায় নি তা পরে জানতে পেরেছি।

বললাম, এইরকম সব ভাঙা বাড়ি ভূতের স্বাস্থ্যনিবাস বলে শুনেছি তাই কি না।

না, কই ভূতটুত আছে বলে তো শুনিনি।...আচ্ছা, আজ রাত হয়েছে, আপনারা বিশ্রাম করুন।

গুপীবাবু চলে গেলে অনির্বাণ মন্তব্য করেছিল ভূতের কথাটা যেন চাপা দিয়ে গেলেন।

ও গল্প হাজারবার বলেছি, আরও হাজারবার বলতে পারি

তুমি কি ভূতে বিশ্বাস করো নাকি?

মানুষে যখন বিশ্বাস করি ভূতেও বিশ্বাস করতে হয় বই কি।

কেন মানুষ মরলে ভূত হয় বলে?

না, মানুষে ভূতের কল্পনা করেছে বলে। ওর মধ্যেও মানুষের প্রক্ষেপ আছে।

কিন্তু এখানে তার কি সম্বন্ধ?

কে বলতে পারে। পঞ্চাননের কথাটা ভুলো না, একটা রহস্য আছে বলেছিল।

তুমি কি বলতে চাও মোতির মালা ভূতে চুরি করেছে?

মানুষে না করলে অবশ্যই ভূতে করেছে।

অর্থাৎ চুরির ব্যাপারটা রহস্যময়। সে কোন উত্তর না দিয়ে চুরুট টানতে লাগলো।

গুপীবাবুকে বলেছিলাম পঞ্চাননের সঙ্গে শেষ দেখা, পার্বতীপুর স্টেশনে, অবশ্য তার আগে কলকাতায় দেখা হয়েছিল।

আমার কথা কিছু বলেছিলেন কি?

বিশেষ করে বলেছিল, বলেছিল যে আপনি তার হিতাকাঙ্ক্ষী, আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করেছিল।

সে যোগাযোগ যে আপনাদের অনুরোধে না হয়ে রাজাবাহাদুরের আদেশে হয়েছে সে ভালই।

কেন বলুন তো।

এ বাড়িতে সবাই আমার উপরে খুশি নয়। সবাইর মধ্যে তো দেখলাম রাজা বাহাদুর আর দেওয়ানজী।

ওরাই সব। অবশ্য অন্যলোকের অভাব নেই তবে তারা সবের মধ্যে নয়।

রাজাবাহাদুর তো আপনার উপরে খুশি মনে হল।

রাজার চেয়ে মন্ত্রীর প্রতাপ বেশি।

বোধ করি এতটা বলে ফেলা উচিত হয়নি মনে করে কথার মোড় ঘুরিয়ে নিল, রাজাবাহাদুর আমাকে বিশেষ অনুগ্রহ করেন। তাঁরই আদেশে পঞ্চাননবাবুর সঙ্গে এখানে এসেছি।

ওদের গাঁয়েই তো আপনার বাড়ি।

আজ্ঞে, হাঁ, একেবারে পাশের বাড়ি বললেই চলে। ছেলেবেলা থেকে ওকে

হানি, কোলেপিঠে করেছি, তখন ভাবতাম পদ্মা নেবে।

অনির্বাণ কৌতূহলের সুরে বলল, এখনও পঞ্চাননবাবু। তবে অন্যদের দেখাদেখি শুনেছি রাজাবাহাদুর বললে বড় রাগ করেন।

শুনেছিলাম, আমরা তো শুনেছিলাম রাজাবাহাদুর পোষ্যপুত্র গ্রহণ করবেন না। জ্ঞাতিদের মধ্যে থেকেই কাউকে উত্তরাধিকারী করবেন?

আমারও শোনা কথা, যেমন শুনেছি বলতে পারি। মুশকিল হল কাকে নেবেন। এক জ্ঞাতিপক্ষের কথা ভাবলে আর একজন আপত্তি করে, আর একজনের কথা ভাবলে অন্যপক্ষ থেকে আপত্তি ওঠে। এদিকে দেওয়ানজী একজন দাবিদার দাঁড়ালেন। তিনি রাজাবাহাদুরের আপন পিসতুতো ভাই। রাজাবাহাদুর অপুত্রক গত হলে তিনিই নিকটতম উত্তরাধিকারী। তিনি বোঝাতে লাগলেন জ্ঞাতিদের মধ্যে থেকে দত্তক নিয়ে অন্য সকলে জোট পাকিয়ে রাজবংশের ক্ষতি করতে চেষ্টা করবে। আর অনাত্মীয় কারো পুত্রকে নিলে সেই জমিদারির মালা তাহেরগঞ্জ রাজবংশের বাইরের রক্তে চলে যাবে, তাতে বংশ ও সম্পত্তিনাশ।

সে জবাব কিরকম গুপীবাবু, শুধালাম আমি।

কেন এ প্রবাদটার কথা পঞ্চানন কিছু বলে নি আপনাদের।

কই মনে তো পড়ে না। আপনি বলুন না কেন?

দরকার হবে না, রাজাবাহাদুর নিজেই বলবেন মতিমালার ইতিহাসের সঙ্গে।

আচ্ছা তাঁর কাছেই না হয় শুনবো, এখন যা বলছিলেন বলুন।

আমাদের গাঁয়ের নাম তালপুকুর। পঞ্চাননের পিতা কাশীনাথবাবু গাঁয়ের মধ্যে সম্পন্ন লোক। রাজাবাহাদুর আর কাশীনাথ বাল্যবন্ধু। কাশীনাথবাবু ধার্মিক ও সৎশীল তাই রাজাবাহাদুর তাঁকে বড় ভাল বাসতেন। কাশীনাথবাবুর দ্বিতীয় পুত্র পঞ্চাননকে দেখে রাজাবাহাদুর স্থির করে ফেললেন, এই ধার্মিক বাল্যবন্ধুর পুত্রকেই দত্তক নেবেন।

অনির্বাণ বলল, কিন্তু সম্পত্তি যে অন্য বংশের রক্তে চলে যাবে।

সে কথা অনেকেই বোঝালো। কাশীনাথবাবুও বোঝালেন, তাঁর বড় ইচ্ছা ছিল না। ওদিকে জ্ঞাতিরা দেওয়ানজীর পথ বন্ধ করবার আশায় পণ্ডিতদের দিয়ে বোঝালো যে, শাস্ত্র মতে দত্তক গ্রহণ করলেই দুই রক্ত এক হয়ে যায়। অতএব দোষ নেই। যাই হোক রাজাবাহাদুর পঞ্চাননকে দত্তক নিয়ে ফেললেন, বোধ করি জ্ঞাতিদেরও দেওয়ানজীর ঝামেলা থেকে বাঁচবার আশাতেই। পঞ্চাননের সঙ্গে রাজাবাহাদুর নিয়ে এলেন আমাকে আর হারাণকে।

হারাণ কে?

পঞ্চাননের প্রজা ছিল, এখন রাজবাড়িতে পঞ্চাননের খাস খানসামা। দুজনেই আমরা দেওয়ানজীর বিষ নজরে।

কেন?

কেন আর কি। আমরা যে পঞ্চাননের পক্ষের লোক।

তারপরে?

এমন সময় দেউড়িতে দশটার ঘড়ি বাজলো। গুপীবাবু বললো, এবারে আপনাদের কষ্ট করে উঠতে হবে আহারের সময় এসেছে।

রাজার ঘরে মানুষ ঘড়ির ক্রীতদাস।

আহারান্তে দুজনে বারান্দায় বসে আছি, অনির্বাণের মুখে অনির্বাণ চুরুট, আমি চির নির্বাপিত। সম্মুখে রাজবাড়ির পরিত্যক্ত প্রাচীন অট্টালিকাগুলো আলো আঁধারিতে ষড়যন্ত্রণায় নিযুক্ত, অশ্বত্থ গাছের পাতায় বাতাস লেগে কানাকানি করছে, চাঁদ যতই দিগন্তের দিকে হেলে পড়ছে অন্ধকার ততই এগোচ্ছে পায়ে পায়ে, কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত অধিকার করে নেবে। কাছেই কোথাও পাখীর বাসায় ধড়ফড় করে আওয়াজ হল। একটা বাদুড় জাতীয় নৈশপাখী সম্মুখ দিয়ে হুস করে উড়ে গেল, দূরে কুকুরের ডাক উঠল। এমনি সমস্ত অসংলগ্ন এলোমেলো ঘটনাস্রোত আমার ইন্দ্রিয়গুলোর উপর দিয়ে আনাগোনা প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে। দু-একবার প্রশ্ন করে উত্তর না পেয়ে অনির্বাণের সঙ্গে কথা বলবার আশা ছেড়ে দিয়েছি। ও কি ভাবছে জানি না, রহস্যের খেই খুঁজছে না আর কিছু, ও যখন নীরবতা অবলম্বন করে পাথরের মূর্তি হয়ে যাচ্ছে। অবশেষে আর বসে থাকতে না পেরে ঘুমোতে যাচ্ছি বলে ঘরের মধ্যে চলে এলাম। সে শুধু বলল আচ্ছা।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না, হঠাৎ ঠেলা খেয়ে জেগে উঠলাম, শুনছ?

করুণ বুক ভাঙা আর্তনাদ, যেন কার সুচির সঞ্চিত আশাআকাঙ্ক্ষা মাটিতে পড়ে খান খান হয়ে যাচ্ছে।

উঠে বসলাম, কি ব্যাপার?

অনির্বাণ বলল, তা জানি না।

কোথা থেকে আসছে?

রাজবাড়ির ভাঙা অংশের দিক থেকে বুঝতে পারছ না।

তা-ই হবে।

কান্না বলে মনে হয়।

অসম্ভব নয়।

কে কাঁদে এত রাত্রে এখানে?

কেমন করে জানবো?

ভূত নাকি?

ভূত না হোক ভৌতিক।

এই কি পঞ্চাননের রহস্য।

তা জানি না। আচ্ছা লক্ষ্য করেছিলে রহস্যের কথা উঠতেই গুপীবাবু চমকে উঠেছিল, শুধালো অনির্বাণ।

কথাটা চাপা দিয়ে গিয়েছিল মনে পড়ছে।

তবে এই সেই রহস্য।

অসম্ভব নয়। তবে এ এক প্রকার নিশ্চিত যে এ বাড়ির অনেকেই ব্যাপারটা অবগত আছে।

ব্যাপার বলতে কি বোঝায়? ঐ শব্দ?

আপাতত তাই বটে।

কান্না অনেকক্ষণ থেমে গিয়েছে তারপরে চলছিল আমাদের সংলাপ। কথা বলতে বলতে দুজনে ঘর থেকে বের হয়ে বারান্দার রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম।

গায়ে ঠেলা দিয়ে অনির্বাণ ফিসফিস করে বলল, কিছু দেখলে?

কই, না।

না দেখেছ ভালই। জগবন্ধু সংসার চোখ-কান খোলা রেখে চলতে হয়।

যেটুকু স্বভাবতই খোলা তার চেয়ে বেশি রাখবার প্রয়োজন মনে করিনে।

প্রয়োজন মতো খোলাতে কাজ চলে, তার অতিরিক্ত না হলে রহস্যোদ্ধার চলে না, মনে রেখো।

অত ভণিতায় কাজ কি, কি দেখলে বলেই ফেলো না।

অনির্বাণ কিছু বলতে যাচ্ছিল এমন সময়ে হারাণ এসে দেখা দিল। কাল রাতেও সে এসেছিল, রাতের বেলায় আমাদের পাশের ঘরে ঘুমোবো হুকুম, তবে রাত বেশি হওয়ায় আর আলাপ করতে পারিনি তার সঙ্গে। অথচ পঞ্চানন পরামর্শ দিয়েছিল তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে।

বাবু, এখনো আপনারা ঘুমোতে যান নি, রাত যে অনেক হল।

অনির্বাণ বলল, হারাণ, তোমার জন্যেই জেগে আছি। কালকে তো কথাবার্তা হতে পারেনি।

হারাণের গম্ভীর মুখে হাসি ফুটল, বলল, বাবু, আমি কি আপনাদের আলাপের যুগ্যি লোক।

কিন্তু পঞ্চানন যে বিশেষ করে বলে দিয়েছিল তোমার সঙ্গে আলাপ করতে।

খোকাবাবু আমাকে খুব ভালোবাসে।

তুমিও তো তাকে খুব ভালোবাসো।

তা আর বাসবো না বাবু, সে যে মায়ের কোল থেকে আমার কোলে এসেছিল।

ভূমিকা অংশ বাদ দিয়ে অনির্বাণ শুধালো, হারান একটা কান্নার শব্দ শুনেলাম। বোধ হয় আশেপাশে কোন মেয়ে ছেলে কাঁদছে।

হারানও ভূমিকা অংশ বাদ দিয়ে বলল, মেয়ে ছেলের গলা নয় বাবু, বুড়ো মানুষের গলা।

তবে তুমি শুনেছ?

না শুনে উপায় কি? রাজবাড়ির সবাই শুনেছে।

কে কাঁদে বলতে পারো।

কেমন ক'রে বলবো, বাপু, সংসারে বুড়ো মানুষ তো দু'চার জন নয়।

কেন কাঁদে বলতে পারো।

তাই বা কেমন ক'রে বলবো, সংসারে দুঃখ তো অল্প নয়।

তোমরা কখনো খোঁজ করোনি।

কি দরকার বাবু।

মনে হ'ল হারাণ কিছু চাপা দিতে চায়। কাজেই অনির্বাণ বলল, তা বটে। তারপরে সে বলল, তোমাদের দেওয়ানজীকে তো এ পর্যন্ত দেখলাম না, ব্যাপার কি!

দেওয়ানজী ব্রহ্মপুত্রে স্নান করতে গিয়েছেন।

কেন এখনকার নদীতে কি জল নেই?

বড়লোকের বেশি জল দরকার হয়, এখানকার নদী হাঁটু জল।

ব্রহ্মপুত্র তো কাছে নয়। প্রত্যহ যাতায়াত করলে ওতেই তো দিন কেটে যাবে।

প্রত্যহ যাবেন কেন, যোগপ্রযোগে যান, কালকে ভোরেই আসবেন।

এলে দেখা হবে নিশ্চয়।

হবে না আবার! আপনারা যুবরাজ বাহাদুরের বন্ধু, ভালো করেই দেখা হবে।

তার কথায় না হোক কথার সুরে মনে হল যে দেওয়ানজী আমাদের দেখে খুব খুশী হবে না। শুধালাম, কেন হারাণ, দেওয়ানজী যুবরাজ বাহাদুরের উপর খুশি নয়।

খুশি হলে আর সম্পত্তির মালিককে জেলে দেয়।

জেল তো এখনো হয়নি।

হবে দেখে নেবেন।

রাজাবাহাদুরের মত না থাকলে দেওয়ানজীর সাধ্য কি?

দেওয়ানজীর অসাধ্য কিছু নেই বাবু।

তোমার উপরে কেমন ভাব?

রাধুনির যেমন লকড়ির উপরে ভাব সেই রকম। উনুনের মধ্যে ঠেলে দেয়।

প্রসঙ্গান্তর ক'রে অনির্বাণ শুধালো, হারান, মোতির মালা কে চুরি করলো? পঞ্চানন নিশ্চয় করেনি। তোমার কি মনে হয়?

দারোগা পুলিসে মীমাংসা করতে পারলো না, আমি কি ক'রে জানবো, বাবু।

তা বটে, তবে তুমি বাড়িতে আছ কিনা তাই শুধালাম।

না বাবু কিছু জানিনে।

এতক্ষণ সে বেশ কথা বলছিল, এবারে মুখ বন্ধ করলো।

আমি তো উকিল, তবু আমার সমস্ত সতর্ক জেরা ব্যর্থ হল, হারাণ কিছু বলতে রাজি নয়। কাজেই বললাম, হারাণ রাত হ'ল, এবারে আমরা শুতে যাই।

ঘরে এসে অনির্বাণ বলল, জগবন্ধু, তোমার আইনের ডিপ্লোমা ফেরত দাওগে।

কেন?

কেন কি! কিছু বার করতে পারলে?

কিছু জানলে তো বার করবো?

ও অনেকখানি জানে, অন্তত কিছু একটা সন্দেহ আর অনুমান করেছে নিশ্চয়।

সে মীমাংসা না হয় কালকে ক'রো, এখন ঘুমোনো যাক।

অনেক রাতে জল তৃষ্ণা পাওয়ায় ঘুম ভেঙে গেল। টর্চের আলোয় দেখলাম দুটো বাজে। টেবিলে জলের গেলাস থাকবার কথা, নেই। ভাবলাম হারাণের ঘরে দেখা যাক। পাশাপাশি তিনটা ঘর, দুটোয় আমরা দুজন, তৃতীয়টায় হারান, তিনটারই দরজা খোলা থাকে। অনির্বাণের ঘরে সে অঘোরে ঘুমোচ্ছে, কিন্তু হারাণের ঘরে গিয়ে দেখি তার বিছানা খালি। তাই তো এত রাতে গেল কোথায়? কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম, হারাণ ফিরলো না। তখন সন্দেহ হ'ল কাছাকাছি নিশ্চয় কোথাও হারাণের অনুগৃহীতা কেউ আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় হারাণই তার অনুগৃহীত, সেখানেই তবে গিয়েছে। অগত্যা তৃষ্ণা নিবারণের আশা পরিত্যাগ করে ঘরে ফিরছি, সহজ স্বাভাবিক স্বরে অনির্বাণ বলে উঠল, কি জগবন্ধু, না পেলে জল, না পেলে হারাণকে।

জেগে আছ নাকি?

আমার নামই তো অনির্বাণ, আমার চুরুট ও চক্ষুর কোনটাই কখনো নির্বাপিত হয় না।

কিন্তু জল ও হারাণকে না পাওয়া জানলে কি করে?

নিতান্তই মামুলী, জগবন্ধু, নিতান্তই মামুলী।

কেমন!

ঘণ্টাখানেক আগে জেগে আমি জলের সন্ধান করেছিলাম, তখনই দেখেছিলাম হারাণের বিছানা খালি, গত রাত্রেও তার বিছানা খালি দেখেছি।

সন্দেহ হচ্ছে ও কোন মেয়ের অনুগৃহীত।

অনুগৃহীত কি নিগৃহীত সে মীমাংসা না হয় পরে ক'রো, এখন রাত দুটো।

(ক্রমশ)

খুকুর হাতে-খড়ি

আজ মাসকাবার, আয়ব্যয়ের হিসেবের দিন। আয়ের স্তম্ভে 'দেশের' ছেঁড়া পাতা, কৃতজ্ঞ ছাত্রের পাঠানো যৎকিঞ্চিৎ প্রণামী...আর ব্যয়ের স্তম্ভে : মুচি, ধোপা, এ পি সি ট্যারেট—আর খুকু। খুকুর পাঁচ নয়া, অর্থাৎ মুড়ি ["আমার যা খিদে লেগেছে না..."] খুকুর দশ নয়া, অর্থাৎ চানাচুর ["বিশ্বাস করুন, আজকে কিছুই খাইনি...পেট যা গুলোচ্ছে!"] খুকুর বারো আনা [দুর্গাপুজোর উপহার : চুলের ক্লিপ] খুকুর দেড় টাকা : হাতে-খড়ির পড়ার বই আর খাতা।

বই দেখাতে এসেছিল খুকু : বর্ণপরিচয়, প্রথম ভাগ। ধন্য খুকু! বাবা মামা কাকা প্রভৃতি অবান্তর ও আভিধানিক শব্দ না শিখে সোজাসুজি শিখতে পারবে "অজ, ঈশ, বলী, করী, বৈধ, হৈম তোল ধৌত" প্রভৃতি আটপৌরে অতিসহজবোধ্য শব্দাবলী। আর শুধু তা-ই নয় : "তৈজস, বৈভব, অধঃপাত, শিরঃপীড়া, আরূঢ়, অপহৃত"-ও বটে!

'শিশুশিক্ষে শিশু সুশিক্ষা'

তখনকার দিনে দেখি, বিদ্যালয়ের পাঠ্য-পুস্তকের এমনিধারা সব নাম : 'বর্ণবোধ', 'গুণমালা' [পদার্থ বিষয়ক উপদেশ], 'শিশুদর্পণ', 'বালকরঞ্জন', 'বালিকাবান্ধব' [না, বালিকার ঐ বান্ধব পুংলিঙ্গ নন; নাম "বর্ণমালা"], 'শিশুপদেশ' [নামকরণ কি শিশুপযোগী খুব?], 'শিশুসেবক' ["হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষ মহাশয়দিগের আদেশে পাঠশালার ব্যবহারার্থ সংগৃহীত"]। আর দুরুচ্চার্য সেই 'শিশুসুশিক্ষাবলী' যার প্রকাশিত উদ্দেশ্য : "বালকবালিকারা যদ্দ্বারা সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ বর্ণ-পরিচয় অবধি প্রথম আবশ্যকীয় অঙ্কের হরণ পূরণ পর্যন্ত ও কিছু কিছু সদৃষ্টান্ত প্রাণীবিষয়ক উপদেশ, এবং যথা কথঞ্চিৎ জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করার রীতি প্রভৃতি অনায়াসে পরিজ্ঞাত হইতে পারে।" এমন পুস্তকও পাওয়া যায় যেগুলো স্কুলে পাঠ্য নয়, কিন্তু "অপ্রাপ্তব্যবহারা-শ্রমস্থ ছাত্রদিগের শিক্ষার্থ" ['বস্তুপরিচয়' অর্থাৎ ভূতপদার্থের আকৃতি-নাম-ধর্মাদির উপদেশগর্ভ পাঠমালা, ১৮৫৯]।

'সংখ্যাসার' [১৮৬১] ইংরেজী

বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য রচিত: "ইহা কি সামান্য দুঃখের ও বিস্ময়ের বিষয় যে, ইংরাজী বিদ্যালয়ের কৃতবিদ্য ছাত্রগণের মধ্যে অনেকেই পঞ্চভূত কাহাকে বলে তাহা অবগত নহেন। তাঁহারা পঞ্চভূতকে পাঁচটি প্রেত বলিয়া জানেন।" পুস্তক পাঠে ওরা শিখবে কাকে বলে ঋণত্রয় [পিতৃ, ঋষি, দেব], ত্রিদোষ [বাত, পিত্ত, কফ], ষড় রস [স্বাদু, অম্বল, লবণ, কটু, তিক্ত, কষায়] ইত্যাদি "আবশ্যকীয় সংখ্যার পর্যায়"।

'মনোরম্য পাঠের' [১৮৫৭] সংকলয়িতার মতে "অনেকে বিদ্যালয় মধ্যে অবাস্তবিক অদ্ভুত গল্প পাঠনাই মনোনীত করিয়া থাকেন।" এদিকে 'নীতিদর্পণের' [১৮৫৭] লেখকের অভিযোগ : "হা! কি দুঃখের বিষয় কোন কোন প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ে অত্যুৎকৃষ্ট সাধু ভাষায় শিক্ষা প্রদান করণাভিপ্রায়ে আদিরস ঘটিত পুস্তক সমস্ত প্রচলিত হইয়া কোমলবুদ্ধি বালকদিগকে উক্ত রসে রসিক করিতেছে।" এর বহু আগে 'নীতিপ্রভার' [১৮৫০] রচয়িতাও লিখে-ছিলেন: "এক্ষণে অনিষ্টজনক ইন্দ্রিয়-উদ্দীপক ও রিপুল্লাসক নাটক এবং অলীক গল্পের পুস্তকাদি যেরূপ বাহুল্যরূপে প্রকাশ হইতেছে সুনীতিপূর্ণ শুভদায়ক সৎ পুস্তক তাদৃশ নহে।"

শিশু পাঠোপযোগী অনেক গ্রন্থ ক্যালকাটা স্কুলবুক সোসাইটির উদ্যোগেই প্রকাশিত—যেমন ডবলু এচ পীয়ার্স-এর 'পত্রাবলী' [১৮২৮] : সিংহ, শৃগাল, ভালুক, হস্তী, গণ্ডার এবং হিপুপটমস অর্থাৎ "নদাশ্বের" বিবরণ। গদ্যে লিখিত এই পুস্তকে দুয়েকটি পয়ারও মেলে। সাহেবের পদ্য রচনার নমুনা হিসেবে উল্লেখ করি: "সিংহের বৃত্তান্ত কথা শুন দিয়া মন। যাহার প্রতিমা এই উপরে লিখন/ সকল পশুর মধ্যে সে বলশালী/সেই হেতু ইহাকে পশুর রাজা বলি।"

'বঙ্গ ভাষানুবাদক সমাজের' বিজ্ঞাপনে ভাবী লেখকদের জানানো হয়েছে যে, 'গার্হস্থ্য বাঙ্গালী পুস্তক সংগ্রহের' প্রযত্নে প্রকাশিত উক্ত সমাজের যাবতীয় পুস্তক "সুনীতিসম্পন্ন বা চরিত্রশোধক হইবেক"; এছাড়া "বঙ্গভাষার যথার্থ রীত্যনুসারে অথচ সরল ভাষায় গ্রন্থের রচনা হইবেক; বিশেষত ঐ রচনা ও উহার ভাব এরূপ হওয়া আবশ্যক, যে এতদ্দেশীয় লোকের অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।" অনু-বাদক সমাজের সহকারী সম্পাদক মধুসূদন মুখোপাধ্যায় লং সাহেবের সংকলিত 'জীবরহস্য' [১৮৫৯] গ্রন্থকে অনুবাদ করে বইটির আশ্চর্য জনপ্রিয়তার উল্লেখ করেছেন: "কি বালক, কি বালিকা, কি যুবক, যুবতী সকলেই ঐ পুস্তক পাঠ ও পুস্তক-বৃত্তান্ত শ্রবণে সমধিক অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন। এক বৎসরের মধ্যে প্রায় তিন সহস্র পুস্তক বিক্রীত হইয়াছে।" এই গার্হস্থ্য সংগ্রহের মধ্যে স্থান পেয়েছে রাম-মোহন রায়ের ব্যাকরণ, মে সাহেবের অঙ্ক পুস্তক, টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলাল', এমন কি 'শিল্পিক-দর্শন' [১৮৬০] : কাগজ, লবণ, অহিফেন প্রস্তুতি

প্রয়োজনীয় পদার্থকীর্তিপত্রের প্রস্তুতকরণের বিবরণ গ্রন্থ।"

উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে

'পাঠমালা' [১৮৫৯] নামক গ্রন্থ "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রবেশার্থি বিদ্যার্থিগণের ব্যবহারার্থ সংকলিত।" ছাত্রদের অবশ্যপাঠ্য ছিল : বিদ্যাসাগরের জামিরোডুবালে, গোপাল, সর উইলিয়ম জামিরোডুবালে, গোপাল, সর উইলিয়ম হ্যামিল] 'শকুন্তলার' চতুর্থ থেকে সপ্তম অঙ্ক এবং 'মহাভারতের' দ্রৌপদী স্বয়ংবর। এ ছাড়া 'টেলিমেকাসের' প্রথম তিনটি সর্গ!

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়েছিল বাংলা দেশের প্রথম বই : 'টেলিমেকাস্' এবং পাঠমালার শব্দার্থ। নোট বইয়ের সেই আবিষ্কর্তার নাম ভুবনচন্দ্র বসাক। অধ্যাপক সমাজের বিরুদ্ধে তিনি ছাত্রদের চিরন্তন দাবি সমর্থন করেছেন : "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশার্থি ছাত্রদিগের পরীক্ষার্থ যে সমস্ত বাংগালা গ্রন্থ নির্ধার্য হইয়াছে, তৎসমুদয়ের শব্দার্থ অতিশয় কঠিন। বিদ্যার্থিদিগের প্রতি অতিশয় কাঠিন্য প্রকাশ প্রদান করা বিধেয় নহে।" ভদ্রলোক যে-দুটি

"অসহজ শব্দের" উল্লেখ করেছেন, তারা হল 'সুপ্রসিদ্ধ' ও 'পরম' এবং তাদের "সাতিশয় সুলভ" প্রতিশব্দ: 'সুবিখ্যাত' ও 'উৎকৃষ্ট'।

দু বছর পরে প্রকাশিত 'ছাত্রবোধ' নামক গ্রন্থে দেখি, ছাত্রদের পঠনীয় রচনাগুলি অনেক বেশি বিচিত্র—আর সহজও বটে। পদ্যাংশে আছে: 'বিদ্যার মাহাত্ম্য' [মাতার প্রতি কোনো বিদ্যার্থিনী কন্যার উক্তি]: "অগো মা জননি, আমি শুনি সখীমুখে/কত বালা পড়িতে যায় গো মনোসুখে..."। কিংবা 'দর্শনশক্তি' [মাতার প্রতি জন্মান্ধ কন্যার করুণোক্তি]: "ওগো মা জননি, দিবস রজনি আমার সমান জ্ঞান/নয়ন বিহনে এ তিন ভুবনে বিফল আমার প্রাণ।" গদ্যাংশে পড়ি 'চীন দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের বিবরণ': "চীন দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের শরীর স্থূলোকার। বিশেষত সকল অঙ্গের অপেক্ষা উদর অতিশয় বড়...।"

'রচনা-রত্নাবলী'

'রচনা-রত্নাবলী' মাসিক পত্রিকা বাংলা দেশের ইতিহাসে কি প্রথম স্কুল-ম্যাগাজিন? "কলিকাতাস্থ গবর্ণমেণ্ট হিন্দু বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের দ্বারা প্রকাশিত।" প্রথম গোটা দুই সংখ্যা বেরোয় ১৮৫৮ সালে: তার গদ্যাংশে ছিল "কাপ্তেন কুকের জীবনচরিত" এবং বঙ্গদেশীয় ভণ্ড ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের ব্যবহার"; পদ্যাংশে কালীবন্দনা: "জয়, কালি, কপালিনি, ত্রিলোকতারিণী/দুর্গতিনাশিনি, মহেশ্বরী গো... লম্বোদরি গো...ভয়ংকরি গো "।

দু বছর পর পত্রিকাটির পুনরাবির্ভাব: "কিয়ন্মাসপূর্বে হিন্দু বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ কএকজন ছাত্র মিলিত হইয়া 'রচনা-রত্নাবলী' নাম্নী একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ পত্রিকার সমস্ত কার্যভার পঠদ্দশা বিশিষ্ট একজন বালকের [প্রাণনাথ দত্ত, যার গৃহেই ছিল পত্রিকার প্রাপ্তিস্থান] হস্তে পড়িয়াছিল, আর কেহই সাহায্য করেন নাই, সুতরাং ঐ পত্রিকা কেবল চকিতের ন্যায় সাধারণের নয়ন পথারূঢ় হইয়া অনতিবিলম্বেই অদৃশ্য হয়।" পুনরুজ্জীবিত 'রচনা-রত্নাবলীর' সম্পাদকমণ্ডলীর নাম তালিকায় [পাঁচজন "প্রেসিডেন্সী কলেজীয়"] দেখি পুরাতন দলের তিনজনকে। কাগজের উদ্দেশ্য: "ইংরেজী বিদ্যালয় মাত্রেই বঙ্গ ভাষায় অনাদর ও ইংরেজী ভাষার অধিক আদর হয়, সুতরাং তথাকার বালক সকল বঙ্গভাষা অত্যল্পই জানেন, তদর্থে আমাদিগের এপ্রকার মাতৃভাষার মুখোজ্জ্বলকরণ চেষ্টা সন্দর্শনে বিদ্যালয়স্থ আর আর বালকবৃন্দ মাতৃভাষা বঙ্গভাষার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন।" সম্পাদকমণ্ডলী সম্পূর্ণ ব্যয় বহন করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কিন্তু পত্রিকাটি "পূর্বে বিনা মূল্যে প্রদত্ত হওয়াতে অনেকানেক ভদ্রবংশীয়েরা গ্রহণ করেন নাই, তজ্জন্য আমরা ইহার প্রত্যেকখানির মূল্য অর্ধ আনা নিরূপিত করিলাম।" এই লব্ধ অর্থের কি সদগতি হবে? "এক বৎসর বিক্রয় করিয়া যে কিঞ্চিৎ সংগৃহীত হইবে, তদ্দ্বারা একখান বাৎসরিক পুস্তক প্রকাশ করিব।"

বলা বাহুল্য 'রচনা-রত্নাবলী' ছাত্র সমাজের প্রথম মুদ্রিত প্রয়াস নয়: ১৮৫৪ সালে মিল্টনের 'আদিনরের ভৌমস্বর্গ ভ্রষ্টতোপাখ্যান' গ্রন্থটি প্রকাশ করেন "শ্রীরামপুর কলেজের ছাত্র শ্রীবেচারাম রায় তথা শ্রীবিশ্বম্ভর দত্ত"। অর আছে অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের সেই 'ললিতা তথা মানস' [১৮৫৬] নামে দুটি কবিতা। "তিন বৎসর পূর্বে এই গ্রন্থ রচনা কালে গ্রন্থকার [যাঁর বয়স ছিল তখন মাত্র পনেরো বছর] জানিতে পারেন নাই যে, তিনি নূতন পদ্ধতির পরীক্ষা পদবীরূঢ় হইয়াছেন।"। কতদূর সুতীর্ণ হইয়াছেন" ভেবে না পেয়ে বঙ্কিম ঘোষণা করেন, তিনি "স্বকর্মার্জিত ফলভোগে অস্বীকার নহেন, কিন্তু অপেক্ষাকৃত নবীন বয়সের অজ্ঞতা ও অবিবেচনাজনিত তাবৎ লিপিদোষের এক্ষণে দণ্ড লইতে প্রস্তুন নহেন।"

কাব্যাম্বরের অভিনবত্ব কোথায়? "মৃত প্রিয়জনের উল্লেখে" রচিত 'মানস' কাব্যের মিলবিন্যাসেই কি? ক্লাসিকাল ককখখ বিন্যাসের মাঝখানে কোথাও কোথাও কখকখ অন্ত্যানুপ্রাস-ও চোখে পড়ে "একমাত্র সুখ মম ছিল যে সংসারে/আঁধার জীবনাকাশে একাকিনী তারা/একবার জ্বালিয়ে সে মিশেছে আঁধারে/সংসার জন্মের মত হইয়াছে সারা।" আর 'ললিতা'? মন্মথকে সে বলে: "রহিব দুজনে, গোপনে কাননে, দেখিব না কোনজনা (...) পিতার সাম্রাজ্য নাহি তাহে কার্য, লউক না সে যে কেহ/খেয়ে বনফল, খেয়ে নদীজল, পালন করিব দেহ।"

'ভেক মূষিকের যুদ্ধ'

সত্যি কথা বলতে কি, 'ললিতার' ছ' শো'টি পদের চেয়ে 'ভেক মূষিকের যুদ্ধের' ছ' শো-টি পদ অনেক বেশি সুখপাঠ্য। কাব্যটি—এক গ্রীক কাব্যের মর্মানুবাদ—এডুকেশান গেজেটে কিস্তিমাফিক প্রকাশিত হওয়ার পরে ১৮৫৮ সালে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়। অনামী লেখক [লেখকগণ?... রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গণেশচন্দ্র?] বহু বচনে রচিত এক ভূমিকায় প্রশ্ন তুলেছেন: ইউরোপীয় কবিত্ব ভারতীয় ভাষায় সংগ্রহ করা সম্ভব কি না? রচয়িতার মতে "মনুষ্যের মানসিক ভাবনিচয় সর্বদেশে একই প্রকার, তবে দেশ কাল পাত্র ভেদে তাহার কথঞ্চিৎ বিপর্যয় হইবার সম্ভাবনা। (...) লালিত্যানিলর নীললোচন দৃষ্টে সকল দেশীয় কবির মনে একই প্রকার ভাবোদয় হয় সন্দেহ নেই, তবে উপমিতি প্রভৃতি অলংকার প্রয়োজক পদার্থ সর্বদেশে একই প্রকার জন্মে না, এই নিমিত্ত কিঞ্চিন্মাত্র বিভেদ সম্ভূত হয়। (...) অতএব একদেশের কবির ভাব যে অপর দেশের ভাষায় আকর্ষিত হইবার যোগ্য নহে, এ কথায় আমরা কখনই সম্মত নহি। এতদ্দেশীয় লোকেরা অধুনা ইউরোপীয় ফল, মূল, শাক, শস্যাদি স্বদেশীয় রুচি অনুসারে স্বদেশীয় নিয়মে পাক করিয়া গ্রহণ করিতেছেন, ইউরোপীয় উপাদেয় মানসিক ভোজ্য কবিতা প্রভৃতি কি এতদ্দেশীয় জনগণের রুচি

অনুসারে এতদ্দেশীয় নিয়মে প্রস্তুত করা যাইতে পারে না?"

কাব্যের কুশীলবের নাম বড় উপভোগ্য: ফুল্লগণ্ড, বারিবিলাস, মৃণালিনী, নিনাদক, প্লুত-গতি, মেঘ-বল্লভ প্রভৃতি ব্যাঙ, শস্যাহারী, সূচী-মুখ, পিষ্টকাশী, মোদক-চোর, রম্ভা-ভোগী, ভাণ্ড-বিহারী প্রভৃতি ইঁদুর। গ্রীক মূলকাব্যেও ঐ ধরনের নাম মেলে—যেমন Psicarpax গুঁড়ো-চোর, Meridarpax টুকরো-চোর...। এই নাম দুটো ফরাসি কবি লা ফোঁতেন-এর 'ইঁদুর ও বেজির লড়াই' নামক উপকথাতেও ব্যবহৃত।

কবি বীররসে বর্ণনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন "কিরূপে মূষিকগণ মাতি রণ-রঙ্গে/করল ভয়াল যুদ্ধ ভেক-জাতি সঙ্গে ...যাবৎ গগনে রবি হইবে উদিত/তাবৎ সে কীর্তি রবে জগতে বিদিত।"

গল্পটা কি? এক সরসীর তীরে মূষিক-যুবরাজ শস্যাহারী গোঁফ ডুবিয়ে জলপানে প্রবৃত্ত। এই সময় মণ্ডূকরাজ ফুল্লগণ্ডের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ। শস্যাহারী নিজের পরিচয় দেয়: "মনুষ্যের দিব্য খাদ্যে পুষ্ট মম অঙ্গ/কত যত্নে রুটি পিঠা প্রস্তুত করিয়া/লুকাইয়া রাখে নর হাঁড়িতে ভরিয়া ...সন্দেশ মিঠাই নানা মোরব্বা আচার... কত কষ্টে গুপ্ত করে ভয়েতে আমার!" প্রতারক ফুল্লগণ্ড যুবরাজকে প্রলোভন দেখায়: "প্রবেশি আমার পুরী আতিথ্য লইয়া/বিদায় হইবে পরে সানন্দ হইয়া।"

শস্যাহারী রাজি হয়। "এত বলি পৃষ্ঠ পাতি দিল ভেক পাড়ে / লাফ দিয়ে উন্দুর উঠিল ঘাড়ে / দুই বাহু পসারিয়া জড়াইয়া ধরে / চলিল মূষিকরাজ সুখ-সরোবরে।" হাবুডুবু খেয়ে যুবরাজ—অনেক দেরীতে হায়! —তার ভুল বুঝতে পারে: "শুনিয়াছি এইরূপে ভুলায়ে সীতারে / লয়ে গেল দশানন জলধির পারে!"......"

দ্বিতীয় সর্গ: শস্যাহারীর মৃত্যু সংবাদে মর্মাহত মূষিকরাজ পিষ্টকাশী রাজসভা-সদগণের সামনে বিলাপ করছে: "বীরবর তিন পুত্র জন্মেছিল মম / একে একে মম অগ্রে গ্রাসিলেক যম।" বড় ছেলেকে বেড়ালে খেয়ে ফেলেছে; মেজো ছেলে মানুষের ইঁদুর-ধরা কলে প্রাণ দিয়েছে, "অবশেষে ছিল মাত্র কনিষ্ঠ নন্দন / আমার অন্ধের নড়ি, দরিদ্রের ধন...ফুল্লগণ্ড ভেক তারে ডুবাইল জলে/মারিল আমার যাদু, সে বেটার ছলে / সাজ, সাজ, সাজ সবে, দেহ প্রতিফল / মারহ মণ্ডূকরাজে, মার ভেকদল।"

পিষ্ঠকাশীর রাজদূত মণ্ডূকরাজ্যে গিয়ে দৃপ্ত কণ্ঠে যুদ্ধ ঘোষণা করে। "শুনিয়া ভেকের দল ক্রোধে কম্পমান / গর্বে ফুলে, কিন্তু সবে চিন্তিত অন্তর / রাজার অধিক নিন্দা করে পরস্পর।" ফুল্ল গণ্ড কিন্তু তাদের নিরস্ত করে: "আমি কেন সে মূষিকে করিব নিধন?......আপনার দোষে সেই হইল নিহত...আপনি আইল জলে পাড়িতে সাঁতার...অকারণে রাগ করে উন্দুরের দল/অনর্থ আমারে চাহে দিতে প্রতিফল।"

তারপর? তারপর বাঁধল যুদ্ধ মালঝাঁপ ছন্দে: "দুই দল মহাবল ধরাতল কাঁপে/থর থর থরতর যুড়ি শর চাপে..."

যাদু সমাধান

আমাদের বাড়িতে ইয়া ইয়া মস্ত দুটো ধেড়ে ইঁদুরের উপদ্রব হয়েছে। ভারি চালাক, কলে পড়ে না, টুগন খেয়ে হজম করে ফেলে, বেড়ালবাবাজী নিজেই ওদের দেখে পিঠটান দেন। আমি দুটোর নাম দিয়েছি: মার্জারজিৎ আর সর্বগ্রাসী [খাবারের টুকরো, গায়ে-মাখা সাবান, আলখাল্লার পকেট, মায় আমার লেখার পাণ্ডুলিপি—সব খায়]।

এতদিন উপায় পেয়েছি। কলেজের বায়োলজি ডিপার্টমেন্টের বেয়ারাকে ধরে দুটো জ্যান্ত তাগড়াই ব্যাঙ এনে ছেড়ে দেব বাড়িতে, নাম রাখব—আরো ভীষণ দুই নাম: দর্দুর ভৈরব আর বজ্রদংষ্ট্র।

হানাহানি ক'রে মরুক দুপক্ষ। না মরুক, মারামারি ক'রে চলবে। আমি তো শান্তি পাব।

—আমতুল জামিল

আমতুল জামিল। ও'র নাম আমতুল জামিলই ছিল। জামিল মানে সুন্দর, ঈশ্বর সবচেয়ে সুন্দর। সেই সুন্দর খোদার তিনি সেবিকা। আমতুল অর্থাৎ ছোট মেয়ে। খোদার সেবিকা কন্যা তিনি। শেষ সেই নাম কেটেকুটে হ'লো জামিলা খোয়াজা। বেগম সাহেবা চিরকুমারী। খোয়াজা তাঁর পিতার নাম।

জামিলা বেগম নাম বলতে আপত্তি করেননি, এমন কি ছবি তুলতেও মানা করলেন না। কেবলমাত্র ঠিকানাটা আপনাদের বাতলাতে বিষম মানা আছে তাঁর বড় শহরের ছোট গলি। এমন কতশত গলি আছে। সেই গলির খোঁজ না পেলে মাত্র আমতুলের চেহারা দেখে বা নাম শুনে কিছুতেই তাকে পাবেন না। এসব গলিতে সবাই যায় না অথবা বলতে পারেন আমাদের আমতুলের মত মেয়ে হয়তো অন্যান্য গলিতেও দু'একটি মিলবে। যদি মেলে জানবেন জামিলা তাদেরই একজন।

জামিলা বেগমের জন্ম বিহারের শাসারাম শহরে। সেই শাসারাম স্টেশন যার সামনে দিয়ে রেলগাড়ি যখন যায়, দূর থেকে দেখা যায় শেরশাহের সমাধি। একটি পুকুরের মাঝখানে শেষ শয়নে সম্রাট শের শাহ। হুমায়ুনকে পরাজিত করে তিনি সাম্রাজ্য শাসন করেছিলেন কিছুদিন। হয়তো বা শাসারাম শহরও সেদিন ছিল জমকালো এক জায়গা। আজ ছোট্ট শাসারামের সমাধি সম্বন্ধে সামান্য সংবাদও অল্প লোকেই রাখে।

তাই বলছিলাম জামিলার জন্মস্থানের সঙ্গে তার জীবনের কত মিল। জামিলা যখন জন্মায় ১৯১২ সালে তখন তাঁর বাবা ছিলেন সরকারী কর্মচারী। সম্পত্তিপন্ন সংসার। আপজন সবাই বেশ পয়সা প্রতিপত্তিওয়ালা লোক। ঝট্ করে যখন আমতুল জামিলের জনক ননকোঅপারেশন আন্দোলনের কালে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে ব্যবসায়ে নামলেন সবাই অবাক হলেন। কোথায় সেকালের রাজকর্মচারীর দারুণ দাপট আর কোথায় বা শিশুরে দোলন, মশারি এইসবের ছোটখাটো কারবার। ত হ'ক, বললেন জামিলার বাবা। বিদেশী সরকারের নোকরি করবো না। সেই আবহাওয়ায় মানুষ জামিলা। লেখাপড়া ভালভাবে শিখেছিলেন। মেডিক্যাল কলেজে পড়তে পড়তে অসুস্থ হ'য়ে পড়া ছাড়লেন। কিন্তু কাজ করেছিলেন বহুদিন সে

স্মৃতিভারে আনমনা আমতুল

ডাক্তারী বিদ্যাটুকু সম্বল করে। সেদি যক্ষ্মা ছিল মহাভয়ানক ভয়। নূতন সব ওষুধপত্র বের হয়নি। যক্ষ্মা রোগীদের মাঝে কাজ করতেন জামিলা। নিজে হাতে মোটর চালিয়ে যক্ষ্মা রোগীদের তত্ত্ব নিতে ঘরে ঘরে ঘুরে।

জামিলা বলছিলেন যক্ষ্মা রোগীদের মাঝে ঘুরে তাঁর এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হ'য়েছিল। খাদ্যাভাব কি সাংঘাতিকভাবে ব্যাপক! খাদ্য বলে যা গলাধঃকরণ করা হয়, সব সময় তা' খাদ্য নয়, তাতে খাদ্যের সম্যক পুষ্টি থাকে না। পেটের জ্বালা নিবারণ হয় মাত্র। মাঝে মধ্যে হাতে পয়সা থাকলে জামিলা বেগম রোগীদের জন্য সামান্য খাবার হাতে করে আসতেন। কতই বা আনা যায়? যক্ষ্মা রোগী তো একটি দুটি নয়। ডিম সেকালে তেমন মহার্ঘ মনে হতো না। টুকরিতে ডিম কয়েকটি রেখে এ বাড়ি ও বাড়ি যেতেন। কোথাও একটি, কোথাও দুটি এমনি করে ডিম বিলিয়ে ফিরতেন। ভাবতেন ওরা যদি ডিম খাবার একটা সহজ উপায় করে নিতে পারতো কত উপকারই না হ'তো।

আজ জীবনের আর এক অধ্যায়। মুরগী পালন করেন জামিলা খোয়াজা। তা থেকে আয় হয় যা তা' দিয়ে নিত্যকার খরচা চলে যায়। দেশ বিভাগের উন্মত্ত দিনগুলিতে আপজন ছিটকে গেছে কে কোথায় ঠিক নেই। পরিবারের কেউ পাকিস্থানে, কেউ আরও অনেক দূরে; লণ্ডনে বা আমেরিকায়। সবাই সচ্ছল। সবাই ডেকেছিল জামিলাকে। বলেছিল কেন পড়ে আছ এমন বেসাহারা জীবনে, কেন কাটাচ্ছ নিঃসঙ্গ দিন। জামিলা কি বলেছে জানেন? এই তো আমার দেশ। যাবো কোথা আমি? এ জমি এ ঘর জামিলা পেয়েছিল তার মায়ের কাছ থেকে। মা পেয়েছিলেন করে তাঁর বাপদাদার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে। এই বড় শহরের ছোট গলির চার দেওয়ালের চারখানা ঘরের ইতিহাস কত বিচিত্র, কত মধুর তা লণ্ডন আমেরিকায় বসে লোক বুঝবে কি করে। পারবেন খোরশা সুরীর মকবরা তুলে নিয়ে যেতে?

যাক, যেসব কথা জামিলা খোয়াজা মাটি আঁকড়ে রইলেন। একেবারে একা। সাহস আছে। দেশ বিভাগের আগে যে দুরন্ত তাণ্ডব গেছে তখনও প্রায় একাই ছিলেন। হামলা যে তাঁর ঘরে হয়নি তাও নয়। একবার নাকি দুর্বৃত্তের দল এসে প্রথমেই তাঁর বিজলী আলোর তার কাটতে গিয়েছিল। জামিলা এগিয়ে এসে বলেছিলেন যেন সুইচ খুঁজে পাচ্ছেন না, হ্যারিকেন ধরবো?" গুণ্ডারা যেন কেমন থতমত

খেয়ে গেল। সে যাত্রা তারা আর কিছু করতে পারেনি।

গলিটার যেখানে শুকনো গাছের ডালের মত আর একটি সরু গলি বের হয়েছে ঠিক সেই সংযোগস্থানে জামিলার ঘর কখানা। যে মাটি আঁকড়ে ঘিরে জামিলার জীবন সে মাটি সেখানে কাদায় জলে একাকার। রাস্তার কল থেকে বস্তিবাসীরা জল নিতে যেয়ে এমন একাকার করে রাখে। আমি তাদের ঐ একজনকে জিজ্ঞাসা করে জামিলার খোঁজ পেলাম। বেগম সাহেবাকে পাড়ার সবাই চেনে। ছোট ছেলেমেয়েরাও বলে 'যে বেগম সাহেবা ঘরে মুরগী পালেন তাঁকে খুঁজছেন?' সেই সেকেলে দরজা। মাথা নীচু করে ঢুকতে হয়। দরজার আগে দুপাশে দুই পানের দোকান। দোকানের চারদিকে ছেঁড়া চট ঝুলছে। শীতের সংক্ষিপ্ত প্রহরে সংকুচিত মানুষ ঐ চটের চেষ্টায় শীতের হাওয়া আটকে বসে কেনা-বেচা চালাচ্ছে। তারপরেই দুদিকের ঘরে থাকে ভাড়াটে। জামিলা বলেন ওরা ভাড়া দেয় না। কখনও ঘরদোর একটু সাফ করে দেয়, জামিলার জবর জবালায় জল গড়িয়ে দেয়, কখনও দুটো জিনিস কিনে এনে

জামিলা বেগম এই মই বেয়ে তরতর করে নামেন ওঠেন

খাওয়ায়। দরকার হলে ডেকে দুটো কথা বলা যায়। তারও দাম আছে। ভাড়াটেরা আরামে আছে। জামিলার ঘরের যাবতীয় জিনিস দরকার মত তারা চেয়ে নিয়ে যায়, মায় ঝাঁটাটি পর্যন্ত।

জামিলার একদিকের ছাদে তার দিয়ে ঘেরা বিরাট মুরগীর ঘর। অন্যদিকে দেওয়াল ঘেঁষে দোতলা ব্যবস্থায় নিব্য রোদ পোহায় মুরগা আর মুরগী। এখন মানুষের পেটটাই না ভেবে জামিলা বেগম মুরগীদের খাবার নিয়ে ব্যস্ত। নিজে কি খাবেন তার ভাবনা নেই, কোথায় মুরগীর দানা, কোথায় তাদের জন্য "মচ্ছলিকা তেল" এই সন্ধানে তাঁর সময় কাটে। সেই যে ডাঃ রায় এক সময় মুরগী পালনে গৃহস্থের আয় সম্বন্ধে সবাইকে সচেতন করতে চেয়েছিলেন তখন শুনেছিলাম ভালভাবে পাললে একটি মুরগী থেকে মাসে এক টাকা মুনাফা থাকে। এখন বেগম সাহেবা বললেন মুরগীর খাদ্য বড্ড দাম হয়েছে। সব সময় সমান লাভ থাকে না। তবে হ্যাঁ ঘরের আনাজের ছিলকা, বাসি আটার রুটির টুকরো ইত্যাদিকে তিনি যদি খরচা না ধরেন তবে মন্দ আয় নয়। আগে মুরগী কাটতে পারতেন না। এখন পারেন। নিজে হাতে ছুরি ধরে কতবার, কাটতে হয়েছে। না হলে তাঁর খদ্দের ফিরে যাবে। রোদ্দুর দিকে ছেঁড়া গদির আরাম চেয়ারে গা এলিয়ে জামিলা চোখ বুজলেন। মুরগী কাটার কথা বলতে ভাল লাগে না। কুকুরের বাচ্চার নাম রেখেছেন শের-ই। শেরই ঠিক সিংহ নয় তবে জামিলা তখন তর তর করে বাঁশের মই দিয়ে ছাদের মুরগীর ঘরে আনাগোনা করেন তখন শেরই মাথা উঁচু করে চেয়ে বসে থাকে। ভাবটাই এমন যে যদি জামিলার পা ফসকায় সে ধরে ফেলবে।

বেগম সাহেবা সেলাই করেন নিজের জামা, দরকার হলে আরও দু'দশ জনেরও করে দেন। এককালে মুর্শিদাবাদী রেশমী শাড়ি ভিন্ন পরতেন না। খাদি তে দরকার, কাজেই খাদি রেশম পড়তেন। এখন সস্তা শাড়ির রং ওঠা আধময়লা কাপড়েও ওঁকে কি সুন্দর দেখায়। সৌন্দর্য তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের। রূপোলি চুল, পান খাওয়ার ছোপ ঠোঁটে মুখে, ছিপ ছিপে গড়ন তাঁর বয়সকে যেন আর মর্যাদাময়ী রূপ দিয়েছে। আমি বসে থাকতে থাকতে অতিথি এলেন। মানোয়ার বেগম আশ্চর্য জামিলার বন্ধুবান্ধবও যেন তাঁর মত বৈশিষ্ট্যময়। মানোয়ার বেগম বিধবা এগারোটি সন্তানের জননী। বেশী দূর লেখাপড়া শেখেননি। ম্যাট্রিকও পাশ করা হয়নি তখন এক হিন্দু যুবকের প্রেমে পড়লেন। আপনজনে আপত্তি যে করেনি তাও নয়। তবে এই যুবকের ঘরে মানোয়ারের দুই ফুপীর বিয়ে হয়। সেই সূত্রেই পরিচয়। কাজেই দত্ত মশাইকে বেশী বেগ পেতে হয়নি। দত্ত মশাইরা স্বামী বিবেকানন্দের আত্মীয় স্বজনের মধ্যে। বলতে বলতে মানোয়ারের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। কোনদিন মানোয়ার বেগমের আর দত্ত মশায়ের এতটুকু কথা কাটাকাটিও হয়নি। এমন মোহব্বৎ ছিল। সেই মোহব্বৎ-এর সাক্ষী তাঁর সুষমা, নীলিমা, অশোক সবাই এগারোজন সন্তান। সন্তানরা বলে তারা বাঙ্গালী। ইদের উৎসবে মায়ের বাড়িতে পোলাওবিরিয়ানী আর দুর্গাপূজোয় নূতন কাপড় প'রে পূজোবাড়ি দুইই তাদের সমান ভাল লাগে।

কিছুদিন আগে দত্তমশাই দেহ রেখেছেন। মানোয়ার বেগমের সিঁথিতে তাই সিঁদুর নেই। না হলে দত্ত মশাই তাঁর আঁচড়ানো চুলের মধ্য রেখা সিঁদুর শূন্য দেখতে পারতেন না। 'বেগম, এ যে সোহাগিনী নারীর সোহাগচিহ্ন। তোমার আমার মিলিত জীবনের বিজয়লক্ষণ।' পতি বিয়োগে আর্থিক বিপর্যয় হয়েছে বলে বেগম মানোয়ার সাধারণ একটি ছোট্ট স্কুলে কাজ নিয়েছেন। তাতে কি আর চলে? দত্ত মশায়ের আত্মীয় স্বজন যথাসাধ্য সাহায্য করেন। বড় ছেলেও সামান্য উপার্জন শুরু করেছে। চলে যায় দিন। মানোয়ার বেগম নিজে কিন্তু পশ্চিমের মানুষ। দত্ত পরিবারের সঙ্গে পরিচয়ও বাংলার বাইরেই হয়েছিল। দত্তদের কোন পূর্ব পুরুষ 'গদর' বা সিপাহী বিদ্রোহের সময় বাংলার বাইরে চলে গিয়েছিলেন। তারপর আবার এখন বাংলাদেশের সঙ্গে নূতন করে যোগ হয়েছে।

মুরগীদের দোতলা বাড়ি

গল্প করতে করতে জামিলা বেগম সাহেবা বললেন তাঁর বড় সাধ গৃহস্থ সংসারে মুরগী পোষার চলন হোক। এখন তো সব কত নূতন কায়দা হয়েছে। অল্প জায়গায় খাঁচায় মুরগী রেখে ডিম পাওয়া যায়। বাজারে নাই বা বেচতে পারলেন, ঘরে ছেলেমেয়েদের খাওয়ালে যা উপকার হবে তার মূল্য কম নয়। বেগম সাহেবার ডাক্তারী বিদ্যায় তো মনে হয় ডিম অত্যন্ত সহজপ্রাপ্য আমিষ। এখন ডিম নিয়ে সব তথ্য প্রকাশিত হচ্ছে। ডিম নাকি হৃৎপিণ্ডের ক্ষতিকারক, কোলেস্টেরল তাতে বড্ড বেশী থাকে। ছোট শিশু বা বাড়ন্ত ছেলেমেয়ে খেলে ক্ষতি কি? বয়স গড়িয়ে গেলে না হয় ডিমটা কমই হলো। ভেজালবিহীন প্রায় পূর্ণ খাদ্য ডিমের বিরুদ্ধে সব প্রচার তাঁর একেবারেই ভাল লাগে না। তাঁর পঁচাত্তরটি মুরগী থেকে দিনে প্রায় পঞ্চান্ন ছাপ্পান্নটি ডিম পান। ছয়টি আটটি হলেই ছোট এক সংসারের কাজ চলে যেতে পারে। মুরগীর বাচ্চা যদি না তোলেন তবে মুরগা রাখার দরকার নেই। মেজেতে কাঠের গুঁড়ো, ভুসি দিয়ে রাখতে হয়। রোজ রোজ পরিষ্কার করবার প্রশ্ন পর্যন্ত থাকে না। বেগম সাহেবাকে বলেছি একদিন ভাল করে মুরগী পালন-এর নিয়ম কানুন জেনে নেবো ওঁর কাছ থেকে। যদি সুবিধা মত ওঁর কাছ থেকে জেনে আসতে পারি, আপনাদেরও জানাবো। কত লোকের কত কিছু থাকে সমাজকে দেবার জানাবার, বেগম আমতুলের ঈশ্বর কর্তৃক নির্দিষ্ট কাজও কম জনহিতকর নয়। সেজন্যই হয়তো তাঁর নাম হয়েছে আমতুল জামিল।

শ্রীমতী

॥ ১৯ ॥

রতনের ঘুমকাতুরেপনা আজ কোথায় উবে গেছে। মাধুরীর পিঠে হাত দিয়ে বললো, এসো আজ সারারাত জেগে গল্প করা যাক্। কাগজ তো আসবে অন্তত সাড়ে ছ'টায়!

মাধুরী রক্তহীন ফ্যাকাসে মুখে অনেকক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো রতনের দিকে। তারপর আচ্ছন্নের মতন বললো, ওর আর কিছু হয়নি তো? গুলি টুলি—

রতন বললো, ধ্যাৎ ধ্যাৎ! তা হলে তো ঐ ছেলেটা বলতোই! শুভ্রা, আজ রেডিও'র লোক্যাল নিউজ শুনেছিলে?

—না, শুনিনি।

আমিও তো দশটার সময় ক্লাব থেকে ফিরলাম, আজ কোনো গণ্ডগোলের কথা শুনিনি তো! আজ গুলি ফুলি কিছু চলেনি!

শুভ্রা বললো, তুমি একবার তিনতলায় যাও। থানায় একবার ফোন করে দ্যাখো। লালবাজারেই তো নিয়ে যায়, না?

রতন বিরত হয়ে উঠলো। এখন তো বারোটা বাজে, তিনতলার ওরা সব ঘুমুচ্ছে।

—বাঃ, তা হলে একদিন ডাকলে উঠবে না? বিপদের সময়—

—বিপদটা কি হয়েছে আবার?

শুভ্রা স্বামীকে এক ধমক দিল, তুমি উঠবে? না আমিই যাবো?

রতন শুভ্রাকে সঙ্গে নিয়ে গেল তিনতলায়। কি ভেবে, আবার ফিরে এসে মাধুরীকেও ডাকলো। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে মাধুরীকে বললো, তুমি নিজের কানে শুনবে এসো। নইলে হয়তো আমার কথা বিশ্বাস করবে না। মাধুরী কোনো উত্তর দিল না, সিঁড়ি দিয়ে উঠার সময় সে একটু এঁকেবেঁকে উঠছে। তার পদক্ষেপ ঠিক থাকছে না। একবার তার পা পিছলে যেতেই রতন তার হাতটা চেপে ধরলো। মাধুরী হাত ছাড়িয়ে নিয়ে মৃদু গলায় বললো ঠিক আছে।

লালবাজারে তিন জায়গায় কানেকশন নিয়েও সঠিক কোনো খবর পাওয়া গেল না। হ্যাঁ, কিছু লোক ধরা পড়েছে বটে, রোজই তো পড়ে, কিন্তু ডিটেলস্ বলা এখন সম্ভব নয়। পলিটিক্যাল এজিটেশান? হয়েছে বটে আজ দু' জায়গায়—তবে, নীলাঞ্জন রায়চৌধুরী, নামটা বড় চেনা চেনা, আচ্ছা ইনি কি করপোরেশনের মেয়রের ভাই? রতন জানালো, না। হোম সেক্রেটারির এক শালার নাম নীলাঞ্জন—ইনি তিনিও নন্? তাহলে আর কি করা—এখন আর বিশেষ কিছু বলা যাচ্ছে না।

লালবাজারে নিরাশ হয়ে রতন ফোন করলো একটা ইংরিজী কাগজের অফিসে। তার এক কলিগের দাদা ঐ কাগজের রিপোর্টার। তিনি অফিসে নেই, তাঁর আজ নাইট ডিউটি নয়, তবে অন্য একজন লোক রতনকে সাহায্য করার অনেক চেষ্টা করলো। তার কাছেও গ্রেপ্তার হওয়া লোকদের নামের তালিকা নেই বটে, কপি প্রেসে চলে গেছে, তবে এ কথা একেবারে ঠিক, কলকাতায় কোথাও আজ গুলি কিংবা লাঠিচার্জ হয়নি। কলেজ স্ট্রিটে দু' দল ছাত্রে মারামারি হয়েছে বটে, তবে কেউ হতাহত নয়। এমনকি, ট্রাম-বাস-মোটর দুর্ঘটনাতেও কলকাতায় আজ কোনো বয়স্ক লোক মারা যায় নি। আশ্চর্য ব্যাপার, তাই না? হাঃ-হাঃ-হা

নিচে এসে রতন বললো, আগে, বার যখন নীলাঞ্জন আর আমি এক সঙ্গে জেলে গিয়েছিলাম—

শুভ্রা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, তুমি জেলে গিয়েছিলে? কবে?

রতন নির্লিপ্তভাবে বললো, গিয়েছিলাম এক সময়

—আগে কখনো বলোনি তো!

—বলিনি, তার কারণ বলার মতন কারণ ঘটেনি। এমনি এমনি কেউ আবার জেলের গল্প করে নাকি! শোনো মাধুরী, সেবারও দেখেছিলাম—আমি খানিকটা ভয় পেয়ে গেলেও নীলাঞ্জনের কিন্তু দারুণ স্পিরিট। কালো ভ্যানে করে যাবার সময়ও আর দু' তিনজনের সঙ্গে কোরাস গাইছিল।

শুভ্রা বললো, তোমার ওসব মিথ্যে মিথ্যে গল্প থামাও তো! মাধুরী কি ছেলেমানুষ নাকি? তুমি কখনো জেলে গেছ কিনা জানি না, তবে নীলাঞ্জনদা যে আগে কখনো জেলে যায় নি, তা আমি ভালো করেই জানি।

—তাই নাকি? কি করে জানলে?

—নীলাঞ্জনদাই আমাকে বলেছে। কিরে মাধুরী, তাই না?

রতন হো হো করে হেসে বললো, ঠিক, ঠিক। নীলাঞ্জন আবার দারুণ সত্যবাদী তো! সেবার আমাদের এক রাত্তির হাজতে আটকেই ছেড়ে দিয়েছিল। সেটাকে ঠিক জেল বলা যায় না। সিকস্টি ফোরের ফুড মুভমেন্টের সময়—। যাক, মাধুরী একটু চা বানাও

শুভ্রা বললো, এত রাত্তিরে চা?

—বাঃ, সারা রাত জাগবো কি করে?

মাধুরী অনেকক্ষণ চুপ করে আছে। এর মধ্যে সে সামলে নিয়েছে অনেকটা। এবার আস্তে আস্তে বললো, না, না, আপনারা সারারাত জাগবেন কেন? এবার শুতে যান!

রতন বললো, বাঃ, তুমি একা থাকবে কি করে? একা থাকলেই তো শুয়ে শুয়ে কাঁদবে।

—না, কাঁদবো কেন?

—স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, চোখ দুটোর তলায় জল জমে আছে।

যাঃ, মোটেই না।

শুভ্রা রতনকে বললো, তুমি গিয়ে বরং শুয়ে পড়ো। আমি মাধুরীর সঙ্গে থাকছি।

মাধুরী এতেও আপত্তি জানালো যদিও, কিন্তু সেটা টিকলো না। শুভ্রা সত্যিই খুব আন্তরিক, কোনো ওজর-আপত্তিই সে তুললো না কানে। রতন জানালো, আর একটা অন্তত সিগারেট না শেষ করে সে শুতে যাবে না। সিগারেটটা ধরিয়ে সে

খুব আস্তে আস্তে বললো, জানো মাধুরী নীলাঞ্জনের জন্য আমার কষ্ট হয়। ও বড্ড ভালোমানুষ। এ পৃথিবীতে এখন ভালো-মানুষ হলে টিকে থাকা বড় শক্ত।

মাধুরী কোনো মন্তব্য করলো না। শুভ্রা বললো, পাজী বদমাশ হয়ে বড় হওয়ার চেয়ে ভালোমানুষ হয়ে কষ্ট পাওয়াও ভালো।

এ কথা শুনেও রতন যে কি করে কিছু না-কিছু রসিকতা করার লোভ সামলালো, তা সে-ই জানে। একটু বেশী রাত হলে মানুষ বোধ হয় তখন একটু ভারি কথা বলতে ভালোবাসে, গলার আওয়াজটাও তখন যেমন ভারী হয়ে আসে।

রতন আবার আপন মনেই বললো, নীলাঞ্জনের মতন ছেলের পক্ষে রাজনীতি করতে যাওয়া উচিত হয় নি। রাজনীতি করা যে খারাপ তা আমি বলছি না। কিন্তু নীলাঞ্জন একটাও মিথ্যে কথা বলে না—মিথ্যে কথাকে ও মনে প্রাণে ঘৃণা করে। অথচ, ও লাইনে মিথ্যে কথা বলে না—এমন লোক একটাও দেখলুম না। বড় বড় সব শ্রদ্ধেয় নেতারা দিন দুপুরে যে-রকম মিথ্যে কথা বলে! এমন কি গান্ধীজীও—...। ঐ জন্যই তো, পলিটিকস ইজ দি লাস্ট রিসর্ট অফ দি স্কাউন্ড্রেলস্—এ কথা মেঘনাদ সাহা না বার্নার্ড সাহা কে যেন বলেছিল না।

শুভ্রা জিজ্ঞেস করলো, গান্ধীজী মিথ্যে কথা বলেছিলেন?

—আরে, গান্ধীজী যদি অন্য যুগে জন্মাতেন, তা হলে রাজনীতি না করে মুনি-ঋষি হতেন। সেইটাই হতো ওঁর খাঁটি নিজের ব্যাপার।

সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে রতন উঠে দাঁড়ালো। দরজার কাছে যখন পৌঁছেচে তখন মাধুরী ডাকলো, রতনদা, শুনুন।

এ গলার আওয়াজ একেবারে অন্যরকম রতন সচকিত হয়ে মুখ ফেরালো। সাদা দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাধুরী, ক্রিম মাখা ফর্সা উজ্জ্বল মুখখানা এখন নরম, ভারী নরম। নীল রঙের শাড়িখানা এলোমেলো ভাবে পরা, হাত দুটিতে একটা নিঃসঙ্গ ভঙ্গি। মাধুরীর চোখে জল। এক মুহূর্তের জন্য রতনের মনে হলো, এ রকম একটা সুন্দর ছবি সে বহুদিন দেখে নি।

পর মুহূর্তেই রতন ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, কি হয়েছে মাধুরী? ওরকম করছো কেন?

—আপনি বলুন, ওর সত্যি অন্য কিছু হয়নি তো?

—আরে, এই তো শুনলে, টেলিফোনে কি বললে। তুমি এরকম করলে—

শুভ্রা মাধুরীকে জড়িয়ে ধরে বললো, এই তুই এমন—আয় শুয়ে পড়।

রতন কাছে এসে বললো, তুমি কাঁদছো? আমি বলছি, কিছু হয়নি নীলাঞ্জনের। সত্যি কথা বলতে কি, নীলাঞ্জনের জন্য তোমার গর্ব হওয়া উচিত। আমরা তো শুধু খাচ্ছি-দাচ্ছি-ঘুমোচ্ছি—আর নীলাঞ্জন তো তবু একটা কিছু কাজ করার চেষ্টা করছে। নিজের জন্য নয়, অন্য মানুষের জন্য—।

পরদিন সকালে খবরের কাগজে নীলাঞ্জনের কোনো খবরই পাওয়া গেল না। রাজভবনের সামনে একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভঙ্গ করার অপরাধে সতেরোজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বটে, কিন্তু তাদের মধ্যে তিনজনের মেটে নাম বেরিয়েছে। নীলাঞ্জনের খাবার এখনও ঢাকা রয়েছে। বাথরুমে রাখা আছে তার গেঞ্জি ও পাজামা।

মাধুরীর কোনো আত্মীয়স্বজন নেই কলকাতায়। শুভ্রাই বললো, আমহার্স্ট স্ট্রীটে একবার দীপুদের খবর দিতে। মাধুরী আপত্তি জানালো। ও বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার পর নীলাঞ্জন প্রতিজ্ঞা করেছিল, সে ও বাড়ির আর কোনো কিছুই গ্রহণ করবে না, কোনো সাহায্যও না।

মাধুরী ভাঙতে চায় না সে প্রতিজ্ঞা। শুভ্রা বললো, তোর শ্বশুরকে না হয় নাই জানালি, তোর দ্যাওরকেও তো একটা খবর দিতে পারিস! সে তো কোনো দোষ করেনি। মাধুরী তাতেও রাজী নয়। অনেক দিন আগে নীলাঞ্জন তাকে একবার বলেছিল, কোনোক্রমে সে যদি কখনো আটকে পড়ে, যদি তার কোনো বিপদ হয়—মাধুরীকে তখন উতলা হলে চলবে না, তাকে মন শক্ত করতে হবে। মাধুরীর আজ সেই পরীক্ষা।

সকাল থেকে মাধুরী সত্যিই অনেকটা স্বাভাবিক ও সংযত হয়ে উঠলো। একবার এ কথাও বললো, সতেরোজন ধরা দিয়েছে, তাদেরও অনেকেরই নিশ্চয়ই বাড়িতে বউ কিংবা মা আছে, তারাও ভাবছে। আমি তো আর একা নই? শুভ্রা ঠোঁট টিপে হেসে বললো, ইস্, তুই দেখছি বীরের সহধর্মিণী হয়ে উঠলি একেবারে!

বিকেলের মধ্যে রতন অনেক ঠিকঠাক খবর নিয়ে এলো। এমন কি ব্যাঙ্কশাল কোর্টে দূর থেকে সে নিজের চোখে নীলাঞ্জনকে দেখেও এসেছে। ওরা বেল নিতে রাজী হয়নি, আদালতের মধ্যে দাঁড়িয়ে স্লোগান দিয়েছে তাই ওদের আরও আট দিন আটকে রাখার হুকুম হয়েছে। রতন বললো, নীলাঞ্জন নাকি দূর থেকে ওকে ইশারায় জানিয়েছে, মাধুরীকে বলিস, আমার জন্য যেন একটুও না ভাবে। বেশ ভালো আছি।

রাত্তিরের রেডিওতে অবশ্য আবার অন্য রকম খবর পাওয়া গেল। ওদের রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদা দেওয়া হয়নি বলে ওরা জেলের মধ্যে সন্ধ্যে থেকে অনশন শুরু করেছে। সে খবরেও অবশ্য নীলাঞ্জনের নামের উল্লেখ নেই। শুভ্রা বললো, এটা কিন্তু বাপু বাড়াবাড়ি! জেলে তো আর চিরকাল থাকতে যায়নি। সেখানে রাজনৈতিক বন্দী করলো না কি করলো--

রতন কাল রাত্তির থেকেই নীলাঞ্জনের সমর্থনে সব সময় তৈরি। সে বললো, মোটেই বাড়াবাড়ি নয়। বোঝো না সোঝো না—সব ব্যাপারেই একটা কথা বলা চাই। এটা হচ্ছে একটা কায়দা, জেলের মধ্যে গিয়েও রাজনৈতিক আন্দোলনটা টিঁকিয়ে রাখা। শুধু শুধু জেল খেটে আসার কি আর মানে হয়! পদে পদে সরকারকে অপদস্থ করতে না পারলে—

—তা বলে ইচ্ছে করে না খেয়ে থাকবে? চাট্টিখানি কথা?

—সবাই মিলে দল বেঁধে থাকলে কিছু বোঝাই যায় না। কোনো কষ্টই হয় না।

—তুমি থাকো না একদিন! রাত্তিরে এক আধ দিন রুটিও খেতে পারো না--রোজ দু বেলা ভাত চাই—

মাধুরীকে রান্না করতে দেয় নি শুভ্রা। এক সংগেই রান্না হচ্ছে। রতন খেয়ে ওঠার পর শুভ্রা আর মাধুরী একসঙ্গে খেতে বসলো। মাধুরী ভাত নিয়ে নাড়াচাড়া করছে শুধু। শুভ্রা জোর করে খাওয়াচ্ছে তাকে, বললো, ডাল তরকারি খেতে ইচ্ছে না করে —শুধু মাছের ঝোল দিয়ে খা, তুই তো পার্শে মাছ ভালোবাসিস্! কেমন হয়েছে রে ঝোলটা? টপ করে শুভ্রা নিজের মাছটা তুলে দিল মাধুরীকে। মাধুরী নেবে কেন, সে আবার সেটা ফেরৎ দিল শুভ্রার পাতে। শুভ্রা আবার সেটা ছোঁ মেরে তুলে মাধুরীর থালায় রেখে বললো, আমার পেট ভরে গেছে, এটা তোকে খেতেই হবে। শুভ্রারই জোর বেশী, তার কথাই খাটলো। শুভ্রার কথা বেশীক্ষণ উপেক্ষা করতে সাহস পায় না মাধুরী। মাঝে মাঝে শুভ্রা হঠাৎ ছোটখাটো কারণে এমন অভিমান করে যে তিন চারদিন কথাই বলে না।

আঁচাতে আঁচাতে শুভ্রা বললো, জেলের মধ্যে যা বিচ্ছিরি খাবার দেয়, ও খাওয়ার চেয়ে না খাওয়াই ভালো!

মাধুরী মুখ ফিরিয়ে কিছু বলতে গেল, কিন্তু বলতে পারলো না, এমনভাবে বমি করে দিল যে আর একটু হলে শুভ্রার গায়েই পড়েছিল। তারপর বমি আর থামে না, সমস্ত শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে, শুভ্রা হাত বুলোচ্ছে তার পিঠে। এই তো এতটুকু মোটে ভাত খেল, তবু এত বমি আসে কোথা থেকে কে জানে।

বমি করে করে অবসন্ন হয়ে পড়েছে মাধুরী, শুভ্রাই ওর মুখ ধুইয়ে দিল, জলের ছিটে দিল চোখে। তারপর অপরাধীর মতন বললো, আমি জেলের খাবারের কথা বললুম বলেই—নীলাঞ্জনদা খায় নি—

মাধুরী মাথা নেড়ে জানালো, না না, সে জন্য নয়। আমার কদিন ধরেই এরকম বমি হচ্ছে।

—বমি হচ্ছে? আমাকে আগে বলিস নি কেন?

—বলিনি, ভেবেছিলুম সেরে যাবে।

—সেরে যাবে কি! ক' মাস?

—ক' মাস মানে? না, না, ওসব কিছু নয়।

—পরীক্ষা করিয়েছিস? দেখি, সিধে হয়ে দাঁড়া তো। তোর বন্ধ এখন?

মাধুরী দুর্বলভাবে কলের মাথাটা ধরে দাঁড়িয়েছে। শুভ্রা তার আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে বললো, হ্যাঁ, নির্ঘাৎ! তোর কত আগে আমার বিয়ে হয়েছে, আমার হলো না—আর তোর—

—না রে শুভ্রা, বোধ হয় তা নয়। তুই কি করে বুঝলি?

—আমি ঠিকই বুঝেছি। নীলাঞ্জনদাকে বলেছিস?

—না। কি বলবো?

—ধ্যাৎ! এ সময় নীলাঞ্জনদার জেলে যাওয়ার কোনো মানে হয়। এ খবর তো ওকেই প্রথম বলার কথা। কত আনন্দ হতো। তোর কি ইচ্ছে রে? মেয়ে না ছেলে?

—শুভ্রা, আমার ভয় করছে।

—ভয় কি? চল্, কাল ডাক্তারের কাছে যাবো। অবশ্য এ সময় কোনো নিজের লোক কাছে থাকলে ভালো লাগে।

—সে জন্য নয়। তুই-ই তো আছিস। কিন্তু আমার এমনিই ভয় করছে।

—ভয়ের কিছু নেই। দেখবি এ ক'টা মাস দেখতে দেখতে কেটে যাবে। তোর শ্বশুর-বাড়িতে একটা খবর দিবি না?

—না।

—তোর দ্যাওরটাই বা কি? এমনিতে কত হুটহাট করে আসে, আর এখন ক'দিন কোনো পাত্তা নেই। আবার টাকার দরকার হলে আসবে!

—দীপু এসেই বা কি করবে?

—তবু কাছাকাছি একজন কেউ থাকলে কথা বলতেও ভালো লাগে। ইস্ নীলাঞ্জনদা যখন প্রথম খবরটা শুনবে, তখন মুখের অবস্থাটা কি রকম হবে—দেখতে এমন ইচ্ছে করছে না!

—তুই এমন করছিস! আগে ডাক্তার দেখানো হোক।

—ও আমি ঠিক বুঝে গেছি! নে, এখন শুয়ে পড়। প্রথম কয়েকটা মাসই একটু যা সাবধানে থাকতে হবে, এই সময়ই বমি হবে, উইন্ড হবে। পাঁচ ছ' মাস হয়ে গেলে আর এসব কিছু না।

—তুই এসব জানলি কি করে রে?

—বাঃ, আমার দুই দিদিকে দেখিনি? কি মনে হচ্ছে, এখনো উইন্ড আছে পেটে? একটু টাকাজাইম খেয়ে নে, আমার কাছে আছে।

পরের সকালে রতন বেরিয়ে যাবার একটু পরেই শুভ্রাও বেরিয়ে পড়লো। ডিপো থেকে ট্রামে উঠে নামলো গিয়ে ঠনঠনের সামনে। আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগলো আমহার্স্ট স্ট্রীটের দিকে। দীপুদের বাড়িতে সে ছ' সাত বছর আগে একবারমাত্র এসেছিল। আজ কেন যেন সে বেশ খানিকটা জড়তা বোধ করছে। হয়তো দীপু তাকে দেখলে খুশী হবে না। আজকাল দীপু যে রকম বিশ্রীভাবে কথা বলে, যদি মুখের ওপরেই—অথচ এক সময়—। মধুপুরে সেই এক মাস, দীপু ছিল তার ছায়ার মতন। শুভ্রা চকিতে একবার পেছনে ফিরে নিজের ছায়াটা দেখে নিল, একটা মাঝারি দীর্ঘশ্বাস ফেললো। বিয়ের আগে সব জিনিসই কি রকম ঝকঝকে তকতকে সুন্দর ছিল, কি রকম হুড়মুড় করে চলে যেত সময়, কখনো কারুর সামান্য একটু ছোঁয়ায় ঝনঝন শব্দ হতো রক্তে। এখন দিনগুলো দারুণ লম্বা, শরীরটাও এক এক সময় মনে হয় বোঝার মতন।

[ক্রমশ]

ঊনসত্তরের প্রদোষ ক্ষণে

যে বছর শেষ হল ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে তার গুরুত্ব মোটেই কম নয়। গত এক বছরে ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অনেক রূপান্তর হয়েছে। ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ব্যাংকিং সংশোধনী আইন ১৯৬৮ কার্যকর হয় এবং ব্যাংকের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পুরোপুরি বিধিবদ্ধ হয়। কিন্তু কয়েক মাস না যেতেই জুলাই মাসের ১৮ তারিখে ভারতের ১৪টি প্রথম শ্রেণীর বাণিজ্য-মূলক ব্যাংককে (যাদের মোট আমানত ৫০ কোটি টাকার উপর) জাতীয়করণ করা হয়। ভারতের আর্থিক বুনিয়াদ সুদৃঢ় করার পথে এই ব্যবস্থার গুরুত্ব অসামান্য। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় ব্যাংকিং ব্যবসায়ের দুটি জিনিসের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল,—একটি হচ্ছে ব্যাংকগুলির পরিচালনা-ব্যবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ এবং সরকারের অনুমোদনক্রমে পরিচালকমণ্ডলীর পুনর্গঠন, আর অপরটি হচ্ছে কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প, রপ্তানি প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যাংকের ঋণ যাতে সহজলভ্য হয় তার ব্যবস্থা করা। এছাড়া ব্যাংকিং ব্যবসায়ে যাতে একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ না থাকে তার ব্যবস্থা করাও ব্যাংকের সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অন্যতম লক্ষ্য হিসাবে ধরা হয়েছিল। কিন্তু কেন এত তাড়াতাড়ি ব্যাংকের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ আরও দৃঢ়ভাবে কার্যকর না করে চৌদ্দটি ব্যাংককে জাতীয়করণ করা হল। প্রধানমন্ত্রীর মতে ব্যাংকের সামাজিক নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে সফল হয়নি। সত্যিই কি তাই! তাছাড়া প্রধান-মন্ত্রী মনে করেন, সুদূর গ্রামাঞ্চলে সাধারণ মানুষের দরজায় ব্যাংক-ব্যবস্থার সুফল পৌঁছে দেবার জন্য ব্যাংকগুলিকে জাতীয়করণ করা দরকার। ব্যাংক ব্যবস্থার উপর থেকে একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণের শেষ রেশটুকু মুছে দেবার জন্য এবং কৃষি, শিল্প ও রপ্তানি বাণিজ্যের পক্ষে ব্যাংক-প্রদত্ত ঋণ সহজলভ্য করার জন্য ব্যাংক জাতীয়করণ আরও বেশি কার্যকর হবে বলেই সামাজিক নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে এসেছে জাতীয়করণ। ব্যাংক জাতীয়করণের পর পাঁচ মাসে ব্যাংক আমানত কিছু বেড়েছে এবং কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে ব্যাংকের ঋণ দেওয়ার শর্ত আরও উদার করা হয়েছে সন্দেহ নেই।

১৯৬৯ সালের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, অনেক টালবাহানার পর চতুর্থ পাঁচ-সালা পরিকল্পনার শুভারম্ভ। তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার পর তিনটি বছর পার হয়ে যাবার পর চতুর্থ পরিকল্পনা শুরু হয়েছে। শুধু তাই নয়, চতুর্থ পাঁচ-সালা পরিকল্পনার শুরুতেই কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে কিভাবে রাজস্ব বণ্টন করা হবে সে সম্পর্কে পঞ্চম ফিনান্স কমিশনের প্রতিবেদনও প্রকাশিত হয়েছে।

শিল্প ক্ষেত্রে পুনরুজ্জীবনের সূচনা এ বছরের পক্ষে শুভকারক। কিন্তু পাট, চা, সুতাকল প্রভৃতি শিল্পে দীর্ঘকালীন ধর্ম-ঘট চলায় শিল্প-উৎপাদনের ক্ষতিও হয়েছে যথেষ্ট। এ বছরেই ভারতের প্রথম জাতীয় শ্রম কমিশনের রিপোর্ট বেরিয়েছে। কমিশন শ্রমিক জীবনের বহু দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন—যেমন, শ্রমিক ধর্মঘট, ট্রেড ইউ-নিয়ন আন্দোলন, শিল্প-বিরোধের নিষ্পত্তি, মজুরি নিয়ন্ত্রণ, সামাজিক নিরাপত্তা প্রভৃতি। যদিও এই কমিশনের সুপারিশ-গুলির সবই সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হয়নি, তবুও ভারতের শ্রম-আন্দোলনের ইতিহাসে এই কমিশনের গুরুত্ব অপরিসীম।

গত এক বছরে খাদ্য-শস্যের উৎপাদন যেমন আশানুরূপ হয়েছে, রপ্তানি বাণিজ্যের অবস্থা তেমনি অপেক্ষাকৃত নৈরাশ্যের সৃষ্টি করেছে। খাদ্যশস্যের উৎপাদনে মোটামুটিভাবে স্থিতিশীলতা এসেছে এবং "সবুজ বিপ্লবের" সুফল দেশবাসী পেতে শুরু করেছে। যদি সত্তর সালেও খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির হার অব্যাহত থাকে, তবে অদূর ভবিষ্যতে খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জন করা অসম্ভব হবে না। বিগত বছরের শেষার্ধে রপ্তানি বাণিজ্যের অবস্থা ভাল যায়নি। আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যের হার শতকরা সাত ভাগ করে বাড়াতে হলে যে পরিমাণ রপ্তানি হওয়া উচিত ছিল তার অর্ধেকও গত ছয় মাসে হয়নি। খাদ্যশস্যের দামে স্থিতিশীলতা সবক্ষেত্রে আসেনি। সাধারণ ভোগ-সামগ্রীর দাম তো বেড়েই চলেছে; তবে চাল ও গমের দামের মধ্যে খানিকটা স্থিতিশীলতার ইঙ্গিত পাওয়া গেছে।

১৯৬৯ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস দ্বিধা বিভক্ত হয়েছে এবং দুই উপদলের মধ্যে যে ঠাণ্ডা লড়াই চলছে তার একটি দিক হচ্ছে, কোন দল কত বড় সমাজতন্ত্রী তা জাহির করা। আশা ছিল, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস কোনও মৌলিক অর্থ-নৈতিক নীতির কর্মসূচী ঘোষণা করবে কিন্তু তা ঘোষিত হয়নি। হয়তো সত্তর সালের জন্য তা তোলা আছে। তবে যতদূর মনে হচ্ছে, শহরাঞ্চলে আয়ের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ এবং রাজন্যভাতা বিলোপের ব্যবস্থা অনতিবিলম্বেই প্রবর্তিত হবে। ১৯৬৯ সালের একটি লাভ দেশের সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক সচেতনতা অনেক বেড়ে গেছে; দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে এই সচেতনতার গুরুত্বও কম নয়।

রপ্তানি বাড়াবার জন্য শত দিবসের পরিকল্পনা

আগামী ১০০ দিনের মধ্যে ৬০ কোটি টাকা থেকে ৭০ কোটি টাকার পরিমাণ অতিরিক্ত রপ্তানি বাড়িয়ে গত চার মাসের ঘাটতি দূর করার একটি জরুরী পরিকল্পনা ভারত সরকার গ্রহণ করেছেন। গত চার মাসে ভারতের রপ্তানি-আয় কিছু পরিমাণে কমে গেছে; এই ঘাটতি দূর করার জন্যই ভারত সরকারের বাণিজ্য পরিষদ নতুন পরিকল্পনার কর্মসূচী তৈরি করেছেন। রপ্তানির পরিমাণ বাড়াবার জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে বস্ত্রশিল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প তৈরী পোশাক, চটজাত জিনিস, মেসিন এবং কৃত্রিম কার্পাস-আঁশ প্রভৃতি। এই প্রচেষ্টা সফল হলে ভারত সরকারের পক্ষে শতকরা সাত ভাগ রপ্তানি-আয় বাড়াবার লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব হবে।

ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের রপ্তানি-শাখা-গুলির জন্য যতটা ইস্পাত আমদানি করা দরকার, তা দ্রুত আমদানি করার সিদ্ধান্ত ভারত সরকার গ্রহণ করেছেন। ক্ষুদ্র শিল্পগুলির জন্য নীতিও ভারত সরকার আমদানি করার নীতিও ভারত সরকার গ্রহণ করেছেন। কয়েকটি শিল্পের উৎপাদন-ক্ষমতার পথে যে বাধা আছে তার গুরুত্ব সম্পর্কে যে সরকার অবহিত আছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আশা করা যায়, শত দিবসের প্রচেষ্টা সফল হলে ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ আরও আশাপ্রদ হবে। দত্ত কমিটিও আমাদের শিল্প-কাঠামোর অব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেছিলেন। ভারত সরকারের রপ্তানি সম্প্রসারণ নীতি সেই অব্যবস্থা দূরীকরণের জন্য আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা অবলম্বন করবে।
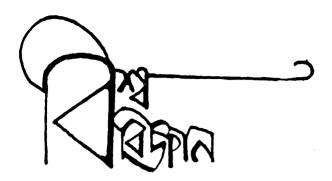
সুব্রত গুপ্ত

গেঁটে বাত ও আপনি

বাত রোগটি যে যথেষ্ট ঝঞ্ঝাটে সে কথা আমরা কেউ কেউ শুনে এসেছি। আর এই রোগটি দেহে বহন করে যাঁরা দিন কাটাচ্ছেন তাঁরা হাড়ে হাড়ে বুঝছেন এর ধকলটা কি সাংঘাতিক। দেখুন একজন গেঁটোবেতো রোগীর প্রতি সাধারণের যথেষ্ট সহানুভূতি থাকলেও তাঁদের নিয়ে তাঁরা কৌতুক বোধ করতেও ছাড়েন না। সম্প্রতি এই গেঁটো রোগীদের নিয়েই কিন্তু রীতিমত গবেষণা শুরু হয়ে গেছে। গবেষকদের মধ্যে আছেন কিছু সমাজ বিজ্ঞানী, কিছু সংখ্যক জৈব-রসায়নবিদ এবং অন্যান্য। এঁরা লক্ষ্য করেছেন, সমাজে যে সমস্ত ব্যক্তি এই বিশেষ রোগটিকে শরীরে বহন করে দিনগত পাপ-ক্ষয়ের মত জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত গুণে চলেছেন আসলে ব্যক্তিগত জীবনে তাঁদের বেশীর ভাগই নাকি 'সাকসেসফুল পারসোনালিটি'। যাকে বলে সফল ব্যক্তিত্ব। তাঁদের অনেকেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন।

প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী হ্যাভলক এলিসও তাঁর 'স্টাডি অব বৃটিশ জিনিয়াস' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, জীবনে যাঁরা সাফল্যমণ্ডিত তাঁদের মধ্যেই এই পাজি ব্যারাম গেঁটে বাত দানা বেঁধে বাস করে গেছে। উদাহরণ, বেকন, মিলটন, নিউটন, হার্ডে, হান্টার, বড় এবং ছোট পিট, ওলাস প্রভৃতি। আর যে মুহূর্তে আবিষ্কৃত হল রক্তে বেশি পরিমাণ ইউরিক অ্যাসিডের অবস্থিতিই 'গেঁটে-বাত' উৎপত্তির কারণ, সঙ্গে সঙ্গে বিশেষজ্ঞরা যাঁরা জীবনে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি তাঁদের দেহে ইউরিক অ্যাসিডের পরিমাণ কত তা মাপার কাজ শুরু করে দিলেন। এ ধরনের পরীক্ষায় কিন্তু একটি অভাবিত মিল ধরা পড়ল। পরীক্ষা চালান হল বড় বড় অফিসের উচ্চপদস্থ প্রশাসক এবং তাঁদের অধস্তন কর্মচারীদের উপর, বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরা অধ্যাপক এবং সাধারণ কর্মীদের উপর, বড় ব্যবসায়ী এবং মজুরের উপর। দেখা গেল প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই পদস্থ কর্মচারী, অধ্যাপক বা ব্যবসায়ীদের রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা প্রচণ্ড পরিমাণ বেশী। সাধারণের রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা কম। তার মানে, প্রথমোক্ত ব্যক্তিরা গেঁটে-বাতে ভুগছেন। দ্বিতীয় দল বহাল তবিয়তে রয়েছেন।

ডঃ আমেক্কি আনুমনিয়ে এবং তাঁর সতীর্থ কয়েকজন বিশেষজ্ঞ এডিনবারার একজন ব্যবসায়ীর উপরও পরীক্ষা চালান। এঁদের মধ্যে যাঁরা বড় বড় প্রশাসকের পদে রয়েছেন তাদের বেশীর ভাগ রক্তের প্রতি-একশ মিলিলিটারে প্রায় ছয় মিলিগ্রামের মত ইউরিক অ্যাসিড ধরা পড়েছে। এটাও লক্ষ করা গেছে, প্রশাসকের পদ যাঁর যত বেশি দড়, তাঁর রক্তে এই অ্যাসিডটির মাত্রাও বেশী।

ব্যাপারটা নিয়ে মনোবিজ্ঞানীরাও মাথা ঘামাচ্ছেন। এঁদের একটি দল জনকয়েক নামকরা প্রশাসন অফিসারের সাতটি ব্যক্তিগত দিকের অবস্থা বা দশা জানার জন্যে কয়েকটি সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেন। সাতটি দিক হল : ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা, সাফল্য, নেতৃত্ব, ব্যক্তিগত উৎসাহ, কার্যসীমা, বিরূপতার প্রতি সহনশীলতা এবং ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা অর্জনের প্রতি ঝোঁক। কোন মানুষের মধ্যে এর প্রত্যেকটির স্ফুরণ এবং সেই অনুযায়ী কাজ করার চেষ্টা এবং সাফল্যই ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠার প্রধানতম অঙ্গ। নামকরা প্রশাসক, ববসায়ী, কোন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক প্রভৃতির মধ্যে এদের প্রাধান্য অত্যন্ত বেশী। বুদ্ধির বিকাশের মূলেও এরা অপ্রতিহতভাবে কাজ করে। আর এঁদের প্রায় সকলের দেহ-রক্তেই ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা স্বাভাবিক চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে ধরা পড়েছে। চিকিৎসকের ভাষায় এঁরা নিশ্চয় প্রত্যেকে এক একজন গেঁটে-বাত-এর রোগী বা রোগী হতে চলেছেন।

ফলে বুদ্ধিমত্তা, মানসিক আবেগ প্রভৃতি যে সমস্ত গুণাবলী মানুষের ব্যক্তিত্ব নির্ধারণের মাপকাঠি তাদের যথাযথ পরিমাপ করার ব্যাপারে মনোবিজ্ঞানীরা এবার অন্যভাবে ভাবতে শুরু করে দিয়েছেন। এতদিন এই পরিমাপ চালান হচ্ছিল লিখিত পরীক্ষা, সাক্ষাৎকার বা বিভিন্ন ধরনের জটিল কাজ করার পদ্ধতি প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। এতে ভুল থাকার সম্ভাবনাও থাকে খুব। তাই প্রচলিত পদ্ধতিতে পাওয়া মনসমীক্ষার সব সময়েই কিছু না কিছু ত্রুটি থেকেই যায়। কিন্তু সত্যিই যদি শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হয়ে যায়, রক্তের
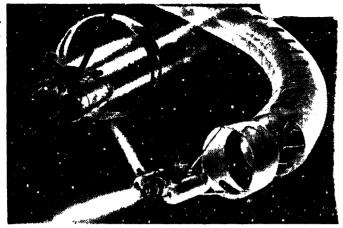
কি ভাবে কৃত্রিম মহাকাশ স্টেশন তৈরি করা হবে তার এই ছকটি এঁকেছেন নভোচর আলেক্সি লিওনভ এবং শিল্পী আন্দ্রে সোকোলভ। বিজ্ঞানীরা এঁদের উদ্ভাবিত পরিকল্পনা তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করেন। এই আন্তগ্রহ মহাকাশ স্টেশনটিতে কৃত্রিম উপায়ে অভিকর্ষবল সৃষ্টি করে নভোচরদের ভারহীনতা-জনিত অসুস্থতা থেকে রক্ষা পেতে সাহায্য করবে

মধ্যেকার ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রার উপর মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সম্পর্ক রয়েছে, তাহলে কোন রকম ঝুঁকি না নিয়ে শুধু রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের পরিমাণ মেপে নিলেই তো কাজ হয়ে যায়? সে ক্ষেত্রে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে কম। এর অর্থ শেষ পর্যন্ত এই দাঁড়াচ্ছে, যদি আপনি সত্যিই সেরা বুদ্ধিমান, উৎসাহী, সহনশীল প্রভৃতি বলে বিবেচিত হন, তাহলে আপনার রক্তে অতিমাত্রায় ইউরিক অ্যাসিড হয়ত ধরা পড়বে। তার মানেই হল, আপনার সামনে জীবন-সাফল্যের দ্বার খোলা। যেটুকু অসুবিধে, তা হল, আপনার দেহ-অস্থির গাঁটে গাঁটে কিছুটা তিক্ত-কষায় বাতের প্রাবল্যজনিত ব্যথা। ব্যাপারটা অপরের কাছে কৌতুকেরও যেমন, ঈর্ষারও বড় কম নয়।

মহাকাশ স্টেশন

আধুনিক মহাকাশ বিজ্ঞানের অন্যতম রূপকার কনস্তানতিন জিওলকভস্কি চাঁদ অথবা সুদূরতম গ্রহ-উপগ্রহে পারাপারের ব্যাপারে সর্বপ্রথম বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তিতর্ক দিয়ে মহাকাশ স্টেশনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। পৃথিবীর মাটি থেকে সরাসরি দূরাকাশে যাত্রার যে সমস্ত প্রযুক্তিগত অসুবিধে রয়েছে তাদের কথা ভেবেই এ-ধরনের একটি পরিকল্পনার কথা সেদিন চিন্তা করেছিলেন জিও-লকভস্কি। কিছুদিন আগে সাতজন সোভিয়েত নভোচর পর পর তিনটি 'সোয়ুজ'কে নিয়ে সে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে এলেন তার মূল লক্ষ্য ছিল জিওলকভস্কিরই সেই পরিকল্পনার একটি সুষ্ঠু রূপ দেওয়া। অতি নিকট ভবিষ্যতে মোটামুটি বড় ধরনের একটি মহাকাশ স্টেশন তাঁরা পৃথিবীর চারপাশের একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে স্থাপন করতে চান। এমন একটি স্টেশন যা দীর্ঘকাল ধরে পৃথিবীর চারপাশে পরিক্রমণ করবে। আর পৃথিবীর মানুষ একের পর এক সেখানে নিয়মিত যাতায়াত করে নানারকমের মৌলিক গবেষণা অথবা পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ চালিয়ে যাবেন। তাঁদের লক্ষ্য হবে দুটি। এক, এই স্টেশন থেকে তাঁরা দূরবর্তী কোন মহাকাশ অঞ্চলে পাড়ি দেবার সহজতর পদ্ধতি আবিষ্কার করবেন। দুই, এখানে বসে পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা এমন ধরনের কাজকর্ম করে যাবেন যাতে করে মানব কল্যাণে মহাকাশ বিজ্ঞানকে কাজে লাগান যায়। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, মহাকাশ বিজ্ঞানের সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ফল ইতিমধ্যে যাঁরা ভোগ করতে শুরু করেছেন তাঁরা হলেন হাসপাতালের মানুষেরা। মানে রোগীরা। সম্প্রতি রক্তচাপ বিষয়ক রোগ, হরমোন চিকিৎসা, হৃদরোগ প্রভৃতির ক্ষেত্রে পৃথিবীর বেশ কিছু হাসপাতালে সেই সমস্ত পদ্ধতি কাজে লাগাচ্ছেন, একদিন যাদের রূপ দেওয়া হয়েছিল শুধুমাত্র নভোচরদের শারীরিক অবস্থাকে স্বাভাবিক রাখতে। এরই মধ্যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শারীরতত্ত্ববিদরা লক্ষ করেছেন, অনেক দৈহিক-ব্যাধির মূলে কারণ একমাত্র শূন্যে মাধ্যাকর্ষণ-পরিবেশের মধ্যেই অনুসন্ধান করা সহজ হয়। কিছু কিছু জটিল অস্ত্রোপচার ঐ পরিবেশের মধ্যে যত সহজে সম্পন্ন করা সম্ভব, সাধারণ অবস্থায় ততটা নয়। ভবিষ্যতে হয়ত এমন দিনও আসতে পারে দৈহিক অথবা মানবিক রোগ নিরাময়ের জন্য যখন মানুষকে সুদূরে কোন মহাকাশ স্টেশনের স্যানিটোরিয়ামে গিয়ে থাকতে হতে হতে পারে।

অতএব জিওলকভস্কি যা ভেবেছিলেন আজকের রূপকাররা তারও উপর অতিরিক্ত কিছু ভাবছেন। তাঁরা মহাকাশে বাসস্থান তৈরি করতে চান। তৈরি করতে চান বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার। অথবা উৎপাদন ক্ষেত্র। হয়ত হাসপাতাল। কিংবা রসায়নাগার, যেখানে তৈরি করা হবে দুরারোগ্য ব্যাধি উপশমের কোন ওষুধ, প্রযুক্তি-ক্ষেত্রে কাজে আসতে পারে এমন কোন সামগ্রী প্রভৃতি।

সম্প্রতি সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন ধরনের মহাকাশ স্টেশনের ছক তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছেন। আর এ ব্যাপারে সব চাইতে বড় যে সমস্যাটির তাঁরা সম্মুখীন হয়েছেন সেটা হল 'ভারহীনতা'। একটি চিরন্তন ভারহীন পরিবেশ সৃষ্টি করা একমাত্র মহাকাশেই সম্ভব। পৃথিবীর বীক্ষণাগারে কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টি করলেও সেই পরিবেশে দীর্ঘকাল ধরে কোন বস্তু বা প্রাণীকে ভারহীন অবস্থায় রাখা সম্ভব নয়। বিশেষ ধরনের প্লেনের মধ্যে ভারহীন পরিবেশ সৃষ্টি করে নভোচরদের অবশ্য প্রশিক্ষণ চালান হয়ে থাকে। কিন্তু সে পরিবেশেরও স্থায়িত্ব কয়েক সেকেন্ড মাত্র। কৃত্রিম জলাশয়ে দীর্ঘ সময়ের জন্যে 'ভার-হীনতা' সৃষ্টি করা সম্ভব। কিন্তু প্রাণী দেহে তার প্রতিক্রিয়া মকাকাশে সৃষ্ট 'ভারহীনতার অনুরূপ নয়।

এই ভারহীনতার প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন নভোচরের উপর ভিন্নতররূপে দেখা গেছে। কেউ কেউ অমন পরিবেশটিকে দারুণ পছন্দ করছেন। কারুর কাছে ব্যাপারটা যেন খুবই বিরক্তিকর। তাঁদের মনে হয়েছে যেন ভীষণ গভীর একটা খাদের মধ্যে ক্রমান্বয়ে তাঁরা সবেগে পড়ে যাচ্ছেন। কেউ কেউ মানসিক বা দৈহিক অস্বস্তি বোধ করেছেন।

কিন্তু এতো গেল ব্যক্তিগত ব্যাপার। চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা লক্ষ করেছেন 'ভার-হীনতা' মানুষের দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর বিশেষ ধরনের প্রভাব বিস্তার করে। শূন্য-মাধ্যাকর্ষণ অবস্থায় হৃদপিন্ড আরও সহজে কাজ করতে পারে। দেহের পেশীর উপর টান পড়ে কম। ফলে নভোচরের দেহের যন্ত্রপাতি নিয়মিতভাবে কাজকর্ম চালাতে অক্ষম হয়। একথা ঠিক, মানব-দেহের সহনশীলতাও বড় কম নয়। তাই দু সপ্তাহ ধরে মহাকাশে বিচরণ করে এবং 'ভারহীনতা'র মধ্যে থেকেও আজ পর্যন্ত কোন নভোচরের দেহে বা মনে দারুণ কিছু ব্যতিক্রম চোখে পড়েনি। কিন্তু এতো গেল সীমিত সময়ের ব্যাপার। মহাকাশ

এই সেই প্রতিকেন্দ্রিক বল সৃষ্টিকারী যন্ত্র যার সাহায্যে বারিওসের মস্তিষ্কের বুলেটের টুকরোকে নিরাপদে স্থানে নিয়ে আসা হয়

ডিগ্রি কোণ সৃষ্টি করে অবস্থান করে। প্রযুক্তির দিক দিয়ে এ ধরনের ধাপ তৈরি করাটা কিন্তু খুব যে সহজ কাজ হবে তা বলা যায় না।

আর এক ধরনের স্টেশনের কথাও চিন্তা করছেন বিশেষজ্ঞরা। এই স্টেশনটিও তৈরি করা হবে অর্ধবৃত্তাকার বিরাট একটি চোঙ দিয়ে। এই চোঙের বৃত্তীয় কেন্দ্রে থাকবে বড় এবং যথেষ্ট ভারী আর একটি কক্ষ। চোঙের সঙ্গে কক্ষটি শক্ত নল দিয়ে জোড়া থাকবে। কক্ষপথে চোঙটি ঐ কেন্দ্রীয়-কক্ষের চারপাশে আবর্তন করবে, কিন্তু কক্ষটিতে কোন আবর্তন বেগ থাকবে না। তবে তৃতীয় একটি পরিকল্পনা নিয়ে বেশী মাথা ঘামাচ্ছেন প্রযুক্তিবিদরা। এই ধরনের স্টেশন আয়তনে হবে অনেক বড়। কৃত্রিম অভিকর্ষ বল সৃষ্টির জন্যে এটিকে আবর্তন করান হবে না। এই স্টেশনে একটি বিশেষ কক্ষ থাকবে। ভারহীন অবস্থায় দীর্ঘকাল কাজ করার পর কোন নভোচর যখন অসুস্থ হয়ে পড়বেন তখন তাঁকে এই কক্ষের মধ্যে নিয়ে আসা হবে। এই কক্ষের মধ্যে থাকবে কৃত্রিম অভিকর্ষ বল সৃষ্টি করার ব্যবস্থা। ব্যবস্থা বলতে একটি বিশেষ ধরনের আসন। আসনের উপর বসার পর আসন সমেত নভোচরকে পাক খাওয়ান হবে একটি কেন্দ্রের চারপাশে। কতকটা কলু-বাড়ির ঘানির চারপাশে বলদ যেমন ঘোরে, তেমনি ভাবে। তবে বলদ সেখানে হেঁটে চলে। এখানে নভোচর কাজটা সারবে চেয়ারে বসে। এর ফলে সৃষ্টি হবে কৃত্রিম অভিকর্ষ বল। কিছুক্ষণ এই বল তাঁর দেহের উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তাঁকে আবার সুস্থ করে দেবে।

বস্তুত, কৃত্রিম অভিকর্ষ বল সৃষ্টি করাটা আজকের দিনে বড় সমস্যা নয়। সমস্যা যা, তা হলো কিভাবে সেই বল সৃষ্টি করে কোন পদ্ধতিতে কাজ করতে পারলে মহাকাশে কাজ করার পক্ষে সুবিধে হবে সেটাই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে দেখা। এবং প্রযুক্তিগতভাবে নতুন উদ্ভাবনাকে কতটা সহজসাধ্য করা যায় এই সঙ্গে সেটাও দেখে নিতে হবে।

জীবনঘূর্ণী

ব্যাপারটা ঠিক এইভাবে করা হয়েছিল। জোসেফ বারিওস নামে সেই ভয়ংকর লোকটিকে প্রথমে বসান হয় একটি চেয়ারে। পরে শক্ত ফিতে দিয়ে তার দেহটিকে বেঁধে দেওয়া হয় চেয়ারটির সঙ্গে। তারপরই বৈদ্যুতিক সুইচ টেপা। প্রচণ্ড বেগে চেয়ারটি সেই লোকটিকে নিয়ে দারুণ বেগে ঘুরতে শুরু করল। এবং বলা যেতে পারে, পাক খেতে লাগল। লোকটির উপর তখন কাজ শুরু করে দিয়েছে একটি প্রতি-কেন্দ্রিক বল। ফলে ক্রমেই তার দেহ চেয়ারের সঙ্গে

বুলেটের টুকরো কিভাবে ঢুকলো, কি ভাবে সরে গেল

সেঁটে ধরতে লাগল প্রচণ্ড বলে। কে যেন তাকে চেপে ধরছে চেয়ারের পিঠের সঙ্গে। সেই বলের ধাক্কা ক্রমে চার থেকে পাঁচে, শেষে পৃথিবীর অভিকর্ষ বলের প্রায় ছয়গুণ বেশীতে গিয়ে দাঁড়াল। মাত্র কিছুক্ষণ। তারপরই থামিয়ে দেওয়া হল চেয়ারটি। এবার ডাক্তাররা হুমড়ি খেয়ে পড়ল বারিওসের উপর।

চমকে যাওয়ার কোন কারণ নেই। যে বর্ণনাটি দিলাম সেটা পৃথিবীর কোন জঘন্যতম শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা নয়। বরং বলা চলে একটি মানুষকে রক্ষা করলেন অব্যর্থ মৃত্যুর হাত থেকে। রক্ষা করলেন ডাক্তাররা। আর যে পদ্ধতির সাহায্যে তাঁরা কাজটি সারলেন তা মহাকাশ গবেষণারই উত্তর ফল।

আসলে ব্যাপারটা ঘটেছিল এই রকম: ক্যালিফোর্নিয়ার ম্যারগ্যান হিলের একটি ডাকাতিতে বারিওস ভীষণভাবে আহত হন। শল্য চিকিৎসকেরা তাঁর পাকস্থলী থেকে একটি বুলেট উদ্ধার করেন। কিন্তু পরে এক্স-রে ছবিতে আরও একটি বুলেটের টুকরো ধরা পড়ল। পেন্সিলের ডগার সিসের মত ছোট্ট এই টুকরোটি তাঁর মস্তিষ্কের নিচে একটি রস-ভর্তি গহ্বরের মধ্যে ভেসে রয়েছে। অস্ত্রোপচার করে এই টুকরোটি বের করতে গিয়ে চিকিৎসকরা দেখলেন এটি এমন একটি জায়গায় আটকে রয়েছে যেখান থেকে বের করতে গেলে হয়ত বারিওস মারা যাবে। তাঁরা চেষ্টা করলেন টুকরোটিকে আরও একটু নিরাপদ স্থানে সরিয়ে আনতে। এর জন্যে প্রথমে তাঁরা বিশেষ ধরনের একটি চেয়ার ব্যবহার করেন। এই চেয়ারের সাহায্যে বারিওসের মাথাটি এমনভাবে উল্টে দেওয়া হয় যাতে করে বুলেটের টুকরোটি নিরাপদ স্থানে সরে যায়। গেলও তাই। কিন্তু মাথাটি সোজা করার সঙ্গে সঙ্গে আবার ফিরে এসে দাঁড়িয়ে রইল যথাস্থানে। ফলে অবস্থা যা ছিল তাই রইল।

কিন্তু এরই মধ্যে একটা আংশিক সাফল্যের ইঙ্গিত খুঁজে পেলেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে বারিওসকে নিয়ে এসে বসালেন প্রতি-কেন্দ্রিক বল সৃষ্টিকারী একটি যন্ত্রের চেয়ারে। যন্ত্রটি সাধারণত অতি-মাধ্যাকর্ষণ বলে নভোচরদের সহনশীল করার জন্যেই এ পর্যন্ত ব্যবহার করা হয়েছিল। এই প্রথম তাতে চেপে বসলেন একজন হাসপাতালের রোগী। কাজও হল। কৃত্রিম বলের চাপে বুলেটের টুকরোটি একটি নিরাপদ স্থানে ঐ যে এসে ঠাঁই হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, বলটিকে তুলে নেওয়ার পরও সেখান থেকে আর সরল না। এবার নিরাপদে অস্ত্রোপচারের কাজটি সেরে ফেললেন চিকিৎসকরা।

সমরজিৎ কর

মা মনসা/বাবা শা-ফরিদ

মেয়েরা 'বার' করে চলেছে! 'বার' মানে ব্রত। লাল নীল সবুজ শাড়িপরা 'এয়োস্তি' মেয়েরা। কপালে দগদগে সিঁদুর। প্লাসটিকের বালতি-ব্যাগের মধ্যে একখানা শাড়ি, মুড়ি, চালভাজা, খেসারী কলাই ভাজার পুঁটুলি। সঙ্গে চাষাভূষো স্বামী, পা ফাটা, রুখু চুল, গায়ে ময়লা সার্ট চাদর, পরনে আটহাতি ধুতি। আর পেট ডাবা ছেলে বা মেয়ে। হীরেপুরে মা মনসা আর বাবা শা-ফরিদের থানে মানত দিতে যাচ্ছে। হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া থানায় এই হীরাপুর গ্রাম। হুগলী নদীর চরে—আড়বাঁধের একেবারে ওপরেই। পুবপারের ২৪ পরগণা থেকেই যাত্রীরা আসছে বেশি। উলুবেড়ে, বাউড়ে, কালসাপা, আছিপুর, বিরলাপুর, রায়পুর, গদাখালি, নলদাঁড়ি, কাঁটাখালি, বুড়ুল, বাগান্ডা কত শত জায়গা থেকে ফেরি নৌকো বোঝাই হয়ে ঢোল কাঁসি শানাই বাজিয়ে আসছে যাত্রীরা। কারো ছেলের পেটের ব্যামো ভাল হয়ে গেছে—তাই বাবা মায়ের থানে চলেছে মানসিক করা হাঁস বা পাঁটা নিয়ে বলি দিতে। কেউ চলেছে পেটজোড়া লিভার পিলেতে 'গাম্বিস' হয়ে ওঠা হাত পা নলা হাড়গিলে ছেলেকে নিয়ে মানসিক করে, ওষুধ ধারণ করে আসতে। শতকরা আশীজন মেয়ে। তাদের সঙ্গে চলেছে আরো বাড়তি দু-চারজন করে—হয়তো বা শাশুড়ী, নয় শ্বশুর কিংবা কুমারী বোন, বিধবা পিসি মাসি। সকলেই স্নান করে পবিত্র হয়ে ভিজে চুল পিঠে এলিয়ে হাতে মিষ্টির হাঁড়ি নিয়ে এসে উঠছে নৌকোয়।

অধিকাংশ ফেরি নৌকোর মাঝি মুসলমান। কারো লম্বা দাড়ি, কারো বা চেঁচে কামানো। ইসমাইল মাঝি তরুণ ছোকরা। যে নন্দ মাঝি ঘাট জমা নিয়েছে তার নিজস্ব নৌকোর দাঁড়ি সে। কাজেই মাঝি গফুর মিয়া তার আপন চাচা হলে কি হবে, তা বলে কি ঘাটের ফেরিকে টপকে ভাড়া নিয়ে চলে যাবে?

ইসমাইল বলে, 'দেখ চাচা, ভাল হবে না, চারটে লোক নিয়ে তুমি চলে যাবে—আচ্ছা যাও, দু-আনা ঘাট জমা দিয়ে যাও। আর লোকগুলো চার আনা তোমাকে দেয় দিক।'

নন্দ মাঝি পাড় থেকে হেঁকে বলে, 'হ্যাঁ, ঘাট জমা দিয়ে যাও।'

গফুর মিয়া গর্জে ওঠে, 'চারটে লোক নৌকোয় তুলেছি তো অমনি ঘাট জমা? চললুম এদের নিয়ে, দেখি কি করিস মোর!'

সত্যিই গফুর মিয়া তার পানশি নিয়ে হালের ঝিঁকি মারতে মারতে চলে গেল মাঝ দরিয়ার দিকে ছোট ছোট আট দশ বছরের দুটি ছেলেকে দাঁড় বইয়ে। যুগোশ্লাভিয়ার একটি জাহাজ চলে গেল কলকাতার দিকে প্রপেলারের ভীষণ গর্জন তুলে। তার পিছনে পিছনে জলের উচ্ছ্বাসের মধ্যে ছিটকে-ওঠা-মাছ খাবার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে উড়ে চলেছে একদল পানপায়রা আর গাঙচিল। বিরাট বিরাট ঢেউ উঠলে গফুর মিয়ার নৌকোটা মোচার খোলার মতন নাচতে থাকে। দূর থেকে মনে হয় এই বুঝি তলিয়ে গেল! আবার টুক্ করে ভেসে উঠছে ঢেউয়ের মাথায়। আবার নেমে গেল। আরো দুঃসাহসিক কান্ড, কচি কচি মাত্র দুটি ছেলে ছোট্ট একটি পানশি নিয়ে জাহাজের একেবারে সামনে দিয়ে চকিতে পার হয়ে এসে ঢেউয়ের ওপর নাচতে লাগল। তাদের একজন জাহাজের উদ্দেশে চিৎকার করছে, 'হেই বাবা সাহেবেরা, শুনছ, হেই শালারা, কিছু দিয়ে যাও...'

জাহাজ থেকে তিন চারটে খালি টিন, বা ক্যানাস্তারা পড়ে গেল। ছেলে দুটো অসীম বিক্রমে ঢেউয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে ছুটল যেন নৌকো নিয়ে, টিন তোলবার জন্যে। ধরল তারা সব কটি। তীরে এনে বেচবে টিনগুলো একটা দেড় টাকায়।

ফেরি নৌকোয় বসে ছিলুম ইসমাইলের। আটটার সময় উঠে বসেছি। নৌকো ছাড়বার নাম নেই। আরো জন চারেক লোক মানসিক শুধতে যাচ্ছে, ঝোলার মধ্যে তাদের একটা হাঁস। নৌকোর পাড়নের সঙ্গে বেঁধে ঝুলিয়ে রেখেছে। মাঝে মাঝে ফ্যাস ফ্যাস করে ডাকছে। হাঁসা। পুরুষ হাঁস। আর একজন লোক এল, বুড়ো মতন। কখন নৌকো ছাড়বে তারই অস্থিরতা। নন্দ মাঝির বাড়ির মেয়েরাও নাকি যাবে এই নৌকোয়। বুড়ো লোকটি রাজনীতি সমাজ-নীতির গল্প বলে যাচ্ছিল। আর একদল মেয়ে পুরুষ এল। বড় নৌকো। ইসমাইল বললে, 'আশীজন লোক তোলা যাবে, ভয় কি!'

জলে নেমে খানিকটা এসে নৌকোয় উঠতে হবে। মেয়েরা হাঁটুর ওপরে কাপড় তুলে তুলে এগিয়ে আসছে। একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক, দিব্যি আদ্দির পাঞ্জাবি গায়ে, গলায় মাফলার, কাঁধে পাটকরা শাল, মিহি ধুতি কিন্তু খালি পা। তার সঙ্গের বছর সাতেকের ছেলেটার কাঁধে ঝোলানো একটা ছোট্ট রেডিও সেট। ভদ্রলোকের শালীটি আধুনিকা, স্ত্রী ছাপোষা। তার চোখে লজ্জা! ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীকে হাত ধরে নৌকোয় তুলে নিলেন। এবার যুবতী শালীকে তুলে নিতে গেলে সে আপত্তি করলে। নিজেই উঠতে গেল। যথেষ্ট উঁচুতে একটা পা তুলতে হল তাকে। সে দৃশ্য নির্লজ্জ চোখ দুটো যাদের তারা দেখল।

তবু এই বাহা! মা মনসার থানে পবিত্র মনে চলেছে সকলে। এখন সর্ব পাপ, সর্ব কুদৃশ্য উপভোগ এবং দর্শন নিন্দনীয়।

মাঝির দাঁত-বড়-বড় ঠোঁট-ঝোলো বউটি চার পাঁচটি ডিবের ডাবরা ছেলে-মেয়ে নিয়ে এসে উঠল। সঙ্গে একটা পাঁঠা এনেছে। মিষ্টির হাঁড়িগুলো নৌকোর গলুয়ের দিকে ভাল করে বসিয়ে রাখলে।

একটি ফ্যাকাশে মেয়ে আর একটি পাঁটাকে তোলা হল। দুর্গন্ধে অস্থির।

ভদ্রলোক আমার পাশে বসে আলাপ জমাতে চাইলেন। ছেলেটি রেডিও চালাচ্ছে। শালীটি আর বউটি আমার দিকে কেন জানি না বার বার তাকাচ্ছিল। কি যেন বলাবলি করছিল তারা। ভদ্রলোক বললেন, 'আপনি কি হীরাপুর যাবেন? মানসিক নাকি?'

বললাম, 'হ্যাঁ।'

'কিসের মানসিক?'

'আমার এক অনূঢ়া শালী আছে, তার খরিশ কেউটের মতন রাগ, দিনে কিম্বা লোকের সামনে তো দূরের কথা, রাত্রে এবং একাকী তার গায়ে হাত দেবার উপায় নেই। তাই মা মনসার কাছে মানত করতে চলেছি, শ্যালিকার খরিশ কেউটের বিষ অথবা ক্রোধ যেন তিনি হরণ করেন!'

ভদ্রলোকের শালী এবার খিলখিল করে হাসতে লাগল। বউটিও অপাঙ্গে একবার তীর হেনে ঘোমটার আড়ে মিটিমিটি হাসতে লাগল। ভদ্রলোক উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়লেন। সিগারেট দিলেন। হঠাৎ বললেন, 'আমি কিন্তু আপনাকে চিনি।'

বললাম, 'মরেছে!'

তিনি বললেন, 'কি কুসংস্কার দেখুন না ভাই, এই ছেলেটার পেটের ব্যাধি। বায়োকেমিক, কোবরেজি, হোমিওপ্যাথি, অ্যালোপ্যাথি করে করে সব প্যাথির ওপরে সিমপ্যাথি হারিয়ে এখন শ্রীমতীর আবদারে চলেছি মা মনসার থানে। আমি আবার খানিকটা কমিউনিস্ট! জানেন তো আমরা মাঠে জনতার সামনে বক্তৃতা দিই, আমরা দেবতা ভগবান মানি না, কিন্তু ঘরে স্ত্রী লক্ষ্মী পুজো মনসা পুজো করে—তাতে বাধা দিতে পারি না। এখানে আমরা হিন্দু কমিউনিস্ট। তাই আমাদের কমিউনিজমের রূপ একান্ত ভারতীয়—নানান জোড়াতালি তাতে।'

নৌকোকে উজান ঠেলে মাইল খানেক দক্ষিণে নিয়ে চলল ইসমাইল। তারপর ছেড়ে দিলে। মাঝখানে এসে, পড়ল জাহাজের ঢেউয়ের সামনে। ভীষণ নাচতে লাগল নৌকোটা। ভদ্রলোকের স্ত্রী শালী ভয় পেয়ে তাঁর কাছ ঘেঁষে এসে বসে তাঁকে প্রায় জড়িয়ে ধরলে। ছেলেটা তার কোলে মুখ লুকোল।

নন্দ মাঝির ছোট ছোট ছেলেগুলোর কী উল্লাস! তারা নৌকোর দাঁড় ধরে ঝুলে ঝুলে ঢেউ দেখছে।

আমি নির্বিকার। ভদ্রলোকটির নাম নাকি শ্রীপতি চক্রবর্তী। তাঁর শালীর নাম রাধা। বউটির নাম কৃষ্ণা। তার হাতের

শ্যালিকার খরিশ কেউটের বিষ অথবা ক্রোধ যেন তিনি হরণ করেন!

আংটিতে নামটি লেখা রয়েছে দেখলাম। রাধার চাইতে বড় বোন অনেক ফরসা এবং দেখতে ভাল। বউটির চোখ দুটো যেন দুটি প্রদীপ। উজ্জ্বল-হাস্যময়। নৌকো অসম্ভব দোল খাচ্ছে। রাধার চেহারা একটু গোলগাল। তার পা দুটো হঠাৎ একবার আমার পায়ে ঠেকে যেতেই সে পায়ে হাত দিয়ে গড় করলে।

ভদ্রলোক বললেন, 'ও কলেজে পড়ছে।'

রাধা বললে, 'আমাদের লোক-সাহিত্যের ক্লাসে প্রফেসার সুধীন বন্দ্যোপাধ্যায় আপনার খুব প্রশংসা করছিলেন, আমি ঠাকুরপুকুর বিবেকানন্দ কলেজে পড়ি।'

'সুধীনবাবুকে আমার নমস্কার জানিও।'

তারপর রাধা আমার কাছে সরে এল। প্রগল্‌ভার মতো নানান কিছু বকতে লাগল। বললে, 'জামাইবাবু আসলে কমিউনিস্ট নন, সুবিধাবাদী। আজকাল কমিউনিস্টরা রাজত্ব করছে, তারা জাতে উঠেছে দেখে অনেক ভদ্রলোকও এখন নিজেকে কমিউনিস্ট বলে পরিচয় দিয়ে 'প্রগতিশীল' বলে চলাতে চান। অমন ভদ্রলোকদের মুখে ছাই! বলুন তো, কোনো কমিউনিস্ট ধান চালের কারবার করেন?'

বললাম, 'দেশের কল্যাণে আত্মপর রেহাই নেই, দাও আলিপুরে গিয়ে ও'র নামে একটা কেস ঠুকে। ভদ্রলোক জব্দ হয়ে যাক।'

শ্রীরাধা গাল ফুলিয়ে ক্ষুণ্ণ মনে বললে, 'তা দিতে পারি, কিন্তু সাক্ষী হবে কে? দিদি? হরিবোল হরি! ও'র সঙ্গে যে হরিহর আত্মা!'

শ্রীপতিবাবু হাসতে লাগলেন।

হীরাপুরে গ্রামটা চোখের সামনে ভাসছে। বনানীর গাছগুলোর মধ্যে যেগুলো ঘন কালো রঙের সেগুলো তেঁতুল কিংবা শিরিশ হবে মনে হল। ২৪ পরগণার তীরে অর্থনীতির আখড়া বেশি। বেশি কারখানা, খটি, জেটি, বাজার, গঞ্জ, ইঁটখোলা, পাটকল, তেলকল। বেশি নারকেল গাছ, খেজুর গাছ, তালগাছ।

বয়ার কাছে এল নৌকোটা। বয়ার মধ্যে বেশ বড় মতো একটা ঘর যেন। তার মধ্যে কয়েক জোড়া পায়রা বাসা বেঁধেছে। জেলেদের ছেলেরা মাঝে মাঝে ওখানে নৌকা ধরে তাদের বাচ্চা নিয়ে আসে। হঠাৎ ফাঁস করে শব্দ তুলে নিঃশ্বাস ছেড়ে কালো একটা শুশুক ডিগবাজি খেলে নৌকোর কাছেই। আবার উঠল কিছুক্ষণ পরেই। তার পাখা আছে। মুখটা ইউ অক্ষরের নিচের দিকের মতো গোলাকার। ইসমাইল বললে, 'ঠিক শুয়োরের মতন দেখতে। ভীষণ তেল হয় ওর। আশী টাকা কেজি। বাতের উপশম হয়।'

হীরেপুরের চড়ায় নৌকো বাঁধল। এদিকে একেবারে চড়া। অনেক দূরে নামতে হবে। চারদিক থেকে নৌকো এসে জড়ো হচ্ছে। সবাই ঝপাঝপ নেমে যাচ্ছে।

রাধা বললে, 'এখানে তো অনেক জল, এখানে নামতে পারব না আমরা।'

কিন্তু ইসমাইল নামতেই দেখলে মাত্র এক হাঁটু জল সেখানে। কয়েকটি মেয়ে ফেটি জাল ফেলে মাছ ধরছে। যাত্রীরা নামতে লাগল। পা ফাটো অসুস্থ মেয়েটিকে তার স্বামী নামিয়ে কোলে করে তুলে নিয়ে গেল চরের ওপরে। পাঁঠা দুটোকে নামালে ইসমাইল। জলে ফেলে দিলে। চান করাতে হবে তো! তার চেষ্টাতে থাকল। একটি রোগা দিয়ে তাকে ঠাং তুলে সোজা হয়ে দাঁড়ায় ইসমাইলের পাছায় দিলে এক গুঁতো মেরে। সে দিলে এক লাথি। বললে, 'মরবার আগে শালা ইতরেছ বোধহয়!'

আমি নামলাম। কেবল আমার হাতেই জুতো। বউটি নামল শ্রীপতিবাবুর হাত ধরে। রাধা আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বললে, 'ধরুন তো একটু, প্লিজ!'

রাধা আমার হাত ধরে ধরে কাপড় তুলে তুলে জল ভেঙে ভেঙে এসে চরের ওপরে উঠল।

ছেলেটি রেডিও চালিয়ে দিতেই গান শুরু হল—'নাগিনওয়ালা আগেয়া...'

আড়বাঁধির চরের, হীরাপুরের মেলায় আসা গেল। চরের ঢালুতে আমন ধান পেকেছে। খালের মধ্যে জোয়ারের স্রোত চলেছে রুপোলী ফিতের আকারে কুল কুল করে বয়ে। খালধারে বনঝাউ আর হরকোচের বন। চারদিকে শুধু পাঁটার গায়ের গন্ধ। সানের ঘাটে সকলে পা ধুয়ে নিলে। হাঁসগুলোকে চুবিয়ে নিলে। মেলায় দোকানপাট বসেছে। মাত্র রবিবার, একদিনের মেলা সপ্তাহে। তেলেভাজা মুড়ির

দোকান কয়েকটি। প্লাস্টিকের খেলনার দোকান। সবেদা, পাকা কলা, লেবু, আম ইত্যাদি ফল বিক্রি হচ্ছে। আমাদের গ্রামের সেই বহুরূপীসাজা বেচা ঘোষ এসেছে আইসক্রীম বেচতে। সে চিৎকার করছে, 'অজয়-ইন্দিরা আইসক্রীম, একান্ত গোপন ঘরে তৈরি, খেলেই মুক্তি, হাঁফকাশি, ওলাউঠো সাফ, যে না খাবে তার শ্বশুর হব, যে খাবে তার হব শালা।'

সারি সারি বারকোসে সাজানো বাতাসা বরফি বিক্রি করছে জন পঞ্চাশেক মিঠাইওলা। পিতাম্বর বাগের বাড়ির সদোরের দরজায়ও উঠে বসেছে তারা। মেলার মাঝখানে একখানা আটচালা। তার মধ্যে পুজো দেওয়া মেয়েরা এসে হাত পা মেলে বসে এক গামছা মুড়ি আর তেলেভাজা পেতে সবাই মিলে গাল চালিয়ে যাচ্ছে। আর লাল সালুর ফতুয়া গায়ে গলায় বত্রিশটা মেডেল ঝুলিয়ে, চিক দানা গলায় দিয়ে হাতে চামর দুলিয়ে দুলিয়ে কথকতা গাইছেন শ্রীসাধনচন্দ্র মাইতি মা মনসার। অবিকল যাত্রাদলের বিবেকের গলা তাঁর। লখিন্দর বেহুলার পালা গাইছেন তিনি। সবাই শুনছে ভক্তিভরে। মেলার দক্ষিণ দিকে দুটি পাকা বাড়ি বাগেদের। শুরুতেই একটি তেলেভাজা আর চায়ের বাঁধা দোকান মুসলমানদের। তারপরেই বাবা শাহ্ ফরিদউদ্দিন পীরের মাজার। চার হাত বাই তিন হাত চুড়োহীন খিলেন করা পাকা মাজার। ভেতরে বাবার থান। কাজী গিয়াসউদ্দিন সেবক। সিন্নি গ্রহণ করে কার কি অসুখ জিজ্ঞেস করছেন। তারপর থানের খানিক ধুলো নিয়ে দুটো বাতাসা তাতে গুঁড়ো করে কাগজে মুড়ে দু-হাতে সেটা কপালে ঠেকিয়ে কি সব মনে মনে বিড় বিড় করে বলে দিয়ে দিচ্ছেন। বলছেন, 'সাতদিন সকালে একটু করে খাওয়াবেন। পেট দেখি, পেটে পিলে হয়েছে, ঠিক আছে, বাবার থানের ধুলো মাখিয়ে দিচ্ছি, ভাল হয়ে যাবে। ভাল হলে মানত শুধে যেও। সিন্নির জন্যে আট পয়সা, পেটের জন্যে পাঁচ পয়সা দাও।'

কাজী সাহেবের দ্বারস্থ হলাম। সব ইতিহাস জানতে চাইতে বললেন, 'প্রায় একশো বছর এই বাবার মাজার চলছে। অসংখ্য যাত্রী হয়। আমার ঠাকুরদাদা মেহের আলী কাজী এর প্রতিষ্ঠাতা। বাবা শেরিয়াতুল্লাহ্ কাজীও এই মাজারের সেবক ছিলেন। আগে আমাদের ১৪০০ বিঘে সম্পত্তি ছিল নাখারাজ। হুগলীর খানাকুলে ছিল আমাদের আদি বাস। নবাব সিরাজোদ্দৌলার প্রিয়পাত্র ছিলেন আমাদের আদি পুরুষ রফিজুদ্দিন কাজী। তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে যতদূরে পেরেছিলেন জায়গা দখল করে নিয়ে ভোগ করেন। সে-সব এখন কিছু নেই। ভগ্ন বাড়ি পড়ে আছে আমাদের।'

'এ মাজার হয় কেমন করে?'

'পিতাম্বর বাগ নামে একটি লোক—এইটাই তার বাড়ি, খুব অসুখে ভোগে। একদিন নদীর চরে গরু বাঁধতে এসে গালে হাত দিয়ে বসে বসে ভাবছে হঠাৎ দেখে তার পেছনে একজন ফকির। গলায় তাঁর নানা রঙের পাথরের মালা। ফকির হেসে শুধোলেন, 'তুমি এখানে বিষণ্ণ মনে বসে কেন?'

'বাগ মশায় বললে, আমার কঠিন ব্যাধি ফকির বাবা।'

'ফকির সাহেব তাঁর সামনে থেকে একটা গাছ উপড়ে নিয়ে তার শিকড় গলায় বাঁধতে বলে চলে গেলেন। বাগ মশায় এসে

এদিকে আসুন, দেখবেন।

ঠিক এই মাজার যেখানে, এইখানে বসে ওষুধটা গলায় বাঁধে। আর তার অসুখ ভাল হয়ে যায়। তারপর সেই ঘটনা আমার দাদাও শোনেন। এবং ফকির সাহেবও কয়েকদিন দাদার অতিথি হয়েছিলেন। হঠাৎ তিনি একদিন উধাও হয়ে যান। তারপর বাগ মশায় তাঁকে স্বপ্ন দেখেন। তিনি নাকি পীর বাবা শা-ফরিদ। তিনি তাকে একটা মাজার করে দিতে বলেন। কিন্তু বাগ মশায় তা করছে না দেখে পীর বাবা আমার দাদাকে স্বপ্নাদেশ করেন। দাদা তখন এখানে একটি মাজার করেন। তারপর শত শত লোক এই মাজারে আসতে শুরু করে এবং তাদের রোগশোক ভাল হয়ে যায়। তখন বাগ মশায় করলে কি, তার বাড়ির মনসা ঠাকুরকে বাইরে এনে বামুন ডেকে প্রতিষ্ঠা করে সেখানে ওষুধ বাঁধতে শুরু করে দিলে। তাদের কুল-পুরোহিত পুজোয় বসতে লাগলেন। যাত্রীরা অনেকেই হিন্দু। তাই ওদেরই 'মানত, সিন্নি, দক্ষিণা ইত্যাদি পড়ে বেশি।'

শুধোলাম, 'শাহ্ ফরিদ পীরের ইতিহাস জানেন?'

গিয়াসউদ্দিন কাজী বললেন, 'তিনি জাগ্রত পীর। যৌবনে ছিলেন দুরন্ত ডাকাত। হেন অপরাধ নেই যা নাকি তিনি করেননি। বাদশাহ পর্যন্ত তাঁকে ডরাতেন। বড় বড় একশো অপরাধের পর তাঁর ভেতরে বিবেক জাগ্রত হয়। তিনি অনুশোচনায় পাগল হয়ে ওঠেন। বহু পীর দরবেশের কাছে যান, কেউ তাঁর মুক্তির পথ বলে দিতে পারেননি। তাঁর ইতিহাস কিছুক্ষণ শোনার পরই সকলে ধৈর্য হারিয়ে তাঁকে পাপিষ্ঠ দুরাচার বলে তাড়িয়ে দেন। তখন তিনি এক গোরস্থানের নিবিড় জঙ্গলে এসে, তলায় নিজের তরবারিটি রেখে দিয়ে গাছে উঠে দুটি পায়ে শিকল বেঁধে মাথাটা নিচের দিকে করে ঝুলতে থাকেন। এই কৃচ্ছ্রসাধনাতেই হবে তাঁর পাপের প্রায়শ্চিত্ত। অনাহারে আল্লাকে ডাকতে ডাকতে তাঁর পাপের মুক্তির জন্যে দীর্ঘ এক চল্লিশ দিন কাঁদার পর হঠাৎ একদিন তিনি দেখলেন সেই নিভৃত গোরস্থানে কাকে যেন বহু বনেদী আমীর ওমরাহ্ গোছের লোকেরা, কবর দিয়ে গেল। কবরটি হয়ে যাবার পর তার মাঝখানে একটা বর্তুল আকার চিহ্ন করে দেওয়াতে বোঝা গেল —সেটি কোনো মেয়ে মানুষের কবর। সবাই 'জিয়ারত' করে চলে গেলে কিছুক্ষণ পরে একটি যুবক এসে—শা-ফরিদকে মহা আশ্চর্য করে—কবরটা খুঁড়তে আরম্ভ করলে। তারপর যুবকটি কবরের লাসটা ওপরে তুলে এনে কাফন খুলে ফেলে সেই মৃত যুবতী নারীটির ওপর আঘাত শুরু করলে। শা-ফরিদের রক্তে তখন আগুন ধরে গেল। এত বড় অন্যায় কি মানুষ করতে পারে? এ কি হতাশ প্রেমিক ছিল মেয়েটির? মরার পর আজ প্রতিশোধ নিতে এসেছে! ঠিক আছে, একশো পাপ তিনি করেছেন, আর একটি করবেন ভেবে নিয়ে শিকল ধরে ডালে উঠে পায়ের বাঁধন মুক্ত করে শা-ফরিদ নেমে এলেন। তরবারিটি নিয়ে গিয়ে তিনি পাপিষ্ঠ যুবকটির দেহকে দ্বিখণ্ডিত করে দিলেন। এরপর তাঁর মুক্তি হল। বিষে বিষক্ষয় হল। সেই থেকে তিনি পীর। মানুষের পাপের, ব্যাধির, শোকের দুঃখের যে যুবক-দেহ পাপাচারে লিপ্ত হয় তাকে তিনি নাশ করেন।'

রাধা হঠাৎ আমার হাত ধরে টান দিয়ে বললে, 'এদিকে আসুন, দেখবেন।'

মা মনসার মন্দির। ওপরে একত্রে গাঁথা তিন মুখী তিনটে ত্রিশূল। নিচে লেখা ওঁ, শ্রীশ্রীমা মনসা। স্থাপিত সন ১৩৫৯ সাল। মন্দিরের গা থেকে খোলার চাল খানিকটা। তারপর টিন ছাওয়া। তার ওপরে লাউ গাছ। ভেতরে বাসন্তী রঙের মনসা দেবী দণ্ডায়মানা। হাতে সাপ। গলায় শোলার অসংখ্য চাঁদমালায় তিনি প্রায় চাপা পড়েছেন। ব্রাহ্মণ নামাবলী গায়ে দিয়ে বসে ভক্তদের মিষ্টান্ন ফল প্রসাদী নিয়ে নাম ঠিকানা লিখে দিচ্ছেন হাঁড়ির গায়ে। তারপর

একটি বছর চোদ্দ বয়েসের ফ্রক পরা মেয়ের হাতে হাঁড়িটি দিলে সে ঠাকুর ঘরে রেখে দিচ্ছে। ব্রাহ্মণের দুটি মেয়ে নাকি কলেজে পড়ে। উলুবেড়েয় তাঁর স্থায়ী বাস। নাম শ্রীকাশীনাথ ত্রিবেদী। তাঁর পিতৃদেব ক্ষুদিরাম ত্রিবেদীও মায়ের সেবা করে গেছেন। পিতাম্বর বাগের বংশধর গৌর-মঙ্গল-কানাই বাগ—এ'রাই এখন এই মন্দিরের লভ্যাংশের মালিক। তাঁরা ব্রাহ্মণ, কথক, কর্মকার, ঢুলী, সেবক সবাইকে একটা নির্ধারিত অংশ দেন।

মন্দিরের একদিকে দুটি লোক বসে বসে দক্ষিণা নিচ্ছেন। পেটে দরকার হলে ছেঁকা দিচ্ছেন। একটি লম্ফ জ্বলছে। যারা মন্দিরের পেছনের পুকুর থেকে স্নান করে চাল আর খেসারী কলাই ভাজা চিবুতে চিবুতে এসে দাঁড়াচ্ছে তাদের একটু ন্যাকড়া ছেঁড়াতে ওষুধ পাকিয়ে নিয়ে সুতো দিয়ে বেঁধে দিচ্ছেন গলায়। বলে দিচ্ছেন, 'একদিন পর রোগীকে পুঁটিমাছের অম্বল রান্না করে খাওয়াবে। একমাস পিঁয়াজ, মাংস, কাঁকড়া, ডিম খাবে না। ভাল হয়ে গেলে মানত দিয়ে যাবে।'

রাধা যে দৃশ্য দেখতে ডেকে এনেছিল সেটি বড় মর্মন্তুদ! তার দিদি এবং আরো কয়েকটি বউ ঘাট থেকে ডুব দিয়ে উঠে সাষ্টাঙ্গে মাটিতে শুয়ে পড়ে পড়ে মন্দিরের চারদিকে গণ্ডি দিতে শুরু করেছে। অনেক মেয়ের গায়ে ব্লাউজ নেই, পরনে সায়া নেই। ভিজে কাপড়চোপড় সরে যাচ্ছে, উঠে আবার টেনে টুনে নিচ্ছে। মন্দিরের দিক চোখ মুখ ফিরিয়ে মায়ের উদ্দেশে নাক মলা, কান মলা খেয়ে আবার মাটিতে লম্বা হয়ে শুয়ে দুহাতে প্রণিপাত করছে। মাটি স্যাঁৎসেতে কাদা হয়ে গেছে। পাথরকুঁচি খোলা ভাঙা চারদিকে ছড়িয়ে। যাদের গণ্ডি দেওয়া হয়ে গেছে তারা পুকুরে স্নান করে উঠলে তাদের সোয়ামীরা শাড়ির একপ্রান্তে ধরে আছে আর একপ্রান্ত পরে নিচ্ছে মেয়েরা।

কৃষ্ণা-দিদির কষ্টে রাধার চোখে জল এসে গেল! তার বোন-পোটা মরলেও বোধহয় এত কষ্ট পেত না সে। দিদি থরথর করে কাঁপছে। দাদাবাবু এদৃশ্য দেখতে না পেরে সরে গেছেন। দিদির সাত 'বড়' মানসিক! তিন চার দিন আর জ্বরে হুঁশ থাকবে না! এমন করে কি কেউ মানসিক দেয়? ছেলের জন্যে মা সব করতে পারে! অথচ বড় হয়ে এই মায়েদের কি মর্যাদাই না দিই আমরা!

রাধার দিদির দশা দেখছিলাম, তার লজ্জা হচ্ছে দেখে সরে এলাম।

সাড়ে বারোটার পর পুজো আরম্ভ হল। যার যার মিষ্টির হাঁড়ি আর প্রসাদী ফেরত পেলে। কৃষ্ণা-বউ স্নান করে এলে শ্রীপতিবাবুরা আটচালায় বসে মুড়ি খেতে খেতে সাধন মাইতির কথকতা শুনছেন। রাধা আমাকে তাদের খাদ্যের ভাগ বসাবার জন্যে ডাকলে। আমি মাফ চাইলুম। কারণ বউটি অর্থাৎ তার দিদিটি বড় লাজুক। যদিও ঘোমটার আড়ে তার মুখ চোখে তখন এক দিব্য প্রশান্তির হাসি!

সাধন মাইতি ঢোল কাঁসি আর লোক-জনের কলকোলাহলের মধ্যেই চিৎকার করে গাইছেন :

"লোহার বাসর বেঁধে এক থাকে লখিন্দর।
মা মনসা পাঠায় সেথা নাগিনী বিষধর॥
কালনাগিনী দংশাইল লখিন্দরের পায়ে।
বেহুলা সতী যাতি মারে
সেই নাগিনীর গায়ে॥
মৃত স্বামী ভেলায় নিয়ে ভাসে বেহুলা সতী।
তার স্বামীরে বাঁচায় পুনঃ মনসা দয়াবতী॥"

এরপর হাঁস বলি, পাঁটা বলি শুরু হল।

শম্ভু কর্মকার কাতন তুলে হাঁসের ধড়ের কোল থেকে এক কোপ মেরে কেটে নিচ্ছে। মুণ্ডুগুলো সবই তার। তিন আনা করে বিক্রি করবে সে। পাঁটা বলি দিচ্ছে 'জয় মা মনসা' ব'লে তার ভাই সতীশ কর্মকার। মুণ্ডুটা তার পাওনা। কাজেই যতখানি এগিয়ে নিতে পারবে তারই লাভ। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছিটকে পড়ে পড়ে জায়গাটা লাল হয়ে গেছে। অন্য জীবন্ত বলির পাঁটাগুলো ভয়ে ব্যা ব্যা করে ডাকছে।

গিয়াসউদ্দিন কাজীর কাছে চলে এলাম। তিনি রোজা করা সত্ত্বেও মতিহার তামাকের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি করা মিশি দিচ্ছেন ঠোঁটের কোণে! গ্রামের অনেক মুসলমান মেয়েরা অবশ্য তাই করে। এতে রোজা না হবারই কথা। কাজী সাহেবকে নিশ্চিত সহানুভূতির জন্যই বললাম, 'দিন তো দেখি আমার ছেলেটার জন্যে কিছু সিন্নি, তার টনসিল হয়েছে, ভাল হয় কিনা দেখব।' কাজীসাহেব থানের খানিক মাটি নিয়ে বাতাসা গুঁড়ো করে দিলেন। কুড়িটা পয়সা দিলাম। তিনি কতকগুলি বাতাসা আর শক্ত বরফি দিলেন শালপাতায় মুড়ে। যারা মনসার পুজো দিচ্ছে তারা শা-ফরিদেরও মানত দিয়ে যাচ্ছে। মুসলমান মেয়েরাও তাই। মুসলমান মেয়েরা মা মনসার মন্দিরের চারপাশে গণ্ডি দেয় কিনা শুধোতে কাজী সাহেব বললেন, না। তবে শা-ফরিদের এই মাজারের চারপাশে গণ্ডি দেয়।'

'আপনাদের হাঁস বা পাঁটা দিলে কি করেন?'

'আমরা বলি দিই না, ছেড়ে দিই এই মাঠে। পরে ধরে নিয়ে যাই। যারা বৈষ্ণব তারা বলি না দিয়ে মনসার পুকুরে হাঁস ছেড়ে দিয়ে যায়।'

শত শত যাত্রী। প্রাগৈতিহাসিক আচার অনুষ্ঠান। খাদ্যের বিধি নিয়ম পালনে কিছু ফল হলেও মানসিক ক্ষেত্রে তাদের ইষ্টসিদ্ধির হয়তো কিছুটা সহায় হয়, নইলে এত লোক আসবে কেন? আর বাঙালী মুসলমানদের যে অংশের হিন্দু থেকে উৎপত্তি প্রাথমিক জীবনের আত্মীয়তা আজো ভুলতে পারেনি বলেই শুধু এখানে কেন অনেক হিন্দু দেব-দেবীর থানে তাদের পুজো-আচ্চায় শরিক হতে দেখা যায়। দেশ যখন সাম্প্রদায়িকতার বিষে জর্জর তখন মা মনসা আর বাবা শা-ফরিদের এই সহঅবস্থান বেশ একটি তাৎপর্য-পূর্ণ ব্যাপার। এ এক চমকপ্রদ তীর্থ—যেখানে কোনো সাম্প্রদায়িক বৈষম্যের বালাই নেই।

কাজী সাহেব বললেন, 'যে এই মনসা শা-ফরিদকে অবজ্ঞা করবে তাকে কাল সাপে খাবে অথবা বাবার তরবারি পড়বে তার গর্দানে!'...

শ্রীপতিবাবুদের আসতে দেরি হবে, তাই নমস্কার জানিয়ে চলে আসছিলাম, রাধা সামনে এসে বললে, 'চলে যাচ্ছেন'—বলেই সে আমাকে গড় করলে।

আশীর্বাদ করে বললাম, 'বালিকা, তোমার দেবদ্বিজে অচলা ভক্তি হোক।'

সে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বললে, 'কলা!'

নৌকোয় এসে উঠলাম। যাত্রীরা ফেরত চলেছে ওপারে। অপরাহ্নের নদী রহস্যময় রূপ ধারণ করেছে। ভাটার টানে গলা রুপো কিম্বা পারার মতো যেন টগবগ করে ফুটছে তখন। ঝিলমিল ঝিলমিল করছে। ঠিক যেন রাধার দিদি কৃষ্ণার ছেলের অসুখ ভাল হবার পর কঠিন আয়াস-সাধ্য ব্রত সমাধার সিদ্ধির এক চরম প্রশান্তি! মায়ের মুখের পবিত্র স্বর্গীয় হাসি! বড় রহস্যময়!

—আবদুল জব্বার

বিমানবিহারী মজুমদার

(১৮৯৯, ২১ ডিসেম্বর—নভেম্বর ১৯৬৯)

ভবতোষ দত্ত

১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে বার্ষিক সমাবর্তন অনুষ্ঠান হয়, তাতে রবীন্দ্রনাথ ভাষণ দিয়েছিলেন বাংলায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এ ঘটনা অভূত পূর্ব। ভাষাজননীর যে মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য রবীন্দ্রনাথ আবাল্য আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে এসেছেন সে মর্যাদা প্রথম দিলেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বাংলা ভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষার বিষয় রূপে গ্রহণ করে, তারপরে দিলেন শ্যামাপ্রসাদ কবিকে বাংলা ভাষায় সমাবর্তন ভাষণ দিতে আমন্ত্রণ করে। অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ এই দুই ঘটনারই উল্লেখ করেছিলেন।

কিন্তু এই সমাবর্তন-অনুষ্ঠানটি আরও একটি কারণে স্মরণীয়। এই সমাবর্তনেই বাংলা ভাষায় লেখা গবেষণার জন্য একজন পরীক্ষার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ উপাধিতে ভূষিত করা হল। সেই গবেষণার পরীক্ষক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। গবেষক ছিলেন বিমানবিহারী মজুমদার। জ্ঞানের বিচিত্রমুখী সাধনার সিদ্ধ সাধক বিমানবিহারী আমাদের দেশের একটি স্মরণীয় ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থেকে ইতিহাসে অবিনশ্বর হয়ে রইলেন।

পিতা ছিলেন শাক্ত, মাতা ছিলেন বিখ্যাত বৈষ্ণব ভক্তের কন্যা। বিমানবিহারীর সারা জীবনের বিদ্যাচর্চায় বৈষ্ণব ধর্মালোচনা একটি মুখ্য স্থান অধিকার করে থাকলেও বিনয়ের সঙ্গে দৃঢ়তা, রসচর্চার সঙ্গে প্রবল যুক্তিবাদ, ভক্তির সঙ্গে বৈজ্ঞানিক চেতনার মিশ্রণ তাঁর পাণ্ডিত্যকে দিয়েছিল বিশিষ্টতা। বিদ্বান আছেন আমাদের দেশে, সৌভাগ্যক্রমে তাঁদের সংখ্যাও কম নয়, কিন্তু বহুমুখী বিদ্যাকে অবলীলায় বহন করেন অলংকারের মতো, এমন পণ্ডিতের সংখ্যা বেশি নয়। বিমানবিহারীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় নিতে গেলে বিভ্রান্ত হতে হয়—কোনটা তাঁর মূল সাধনা বোঝা শক্ত। বৈষ্ণব ধর্ম সংক্রান্ত বই যখন পড়ি, মনে হয় তাঁর মনীষা বুঝি এই বিষয়েই পূর্ণতাপ্রাপ্ত, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গবেষণাগ্রন্থ পড়লে মনে হয় এই বিষয়েই তাঁর পাণ্ডিত্যের অতুলনীয়ত আবার আধুনিক বাংলার সামাজিক ইতিহাস কিংবা তুলনামূলক ধর্মবিজ্ঞানে তাঁর তীক্ষ্ণ জ্ঞ [illegible] রবীন্দ্র সাহিত্যের নায়িকাদের আলোচনায় দেখি বিমানবিহারী খুলে দিলেন এক অভিনব সমালোচনার রাজপথ। বাংলার স্বাধীনতার ইতিহাসের চরমপন্থীদের ভূমিকা সম্বন্ধে তাঁর উৎস সন্ধানী আকরগ্রন্থ অপরিহরণীয় অবলম্বন হিসাবেই গণ্য।

পিতা শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ছিলেন নদীয়া জেলার কুমারখালি গ্রামের এক প্রাচীন সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। কিন্তু নানা মামলা মোকদ্দমায় তিনি সম্পত্তি হারান। বিমানবিহারীর জননী ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও কীর্তনসম্রাট অদ্বৈতদাস পণ্ডিত বাবাজীর একমাত্র সন্তান কৃষ্ণপ্রিয়া। বিমানবিহারী মাতামহের গৃহে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ২১এ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করলেন। মায়ের কোলে বসেই তিনি পদাবলী কীর্তন এবং বৈষ্ণব শাস্ত্রের আলোচনা শুনতেন, সেই প্রভাবই তাঁর মনে অক্ষয় হয়েছিল। পিতাও ছিলেন সাহিত্যিক। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসুর বিশ্বকোষ সম্পাদনায় সহকারিতা করেছিলেন; দুখানা উপন্যাসও তিনি লিখেছিলেন, 'অধদেবতা' এবং 'বিক্রয়িনী'। ডি এম লাইব্রেরি থেকে বই দুটি বেরিয়েছিল।

গ্রামের পাঠশালায় তাঁর পড়াশোনার আরম্ভ; নবদ্বীপ হিন্দু স্কুল থেকে ১৯১৭ সালে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করলেন। বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে ইতিহসে বি এ পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলেন। সে বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম হয়েছিলেন অধ্যাপক সুশোভন সরকার। কৃষ্ণনাথ কলেজ স্থাপনাবধি বিমানবিহারীই প্রথম ফার্স্ট ক্লাশ পেলেন। কলেজে পড়বার সময়ে অধ্যাপক নলিনীকান্ত নাগ বিমানবিহারীকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন। তিনিই তাঁকে কলকাতায় স্যার আশুতোষের জামাতা প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান পেয়ে এম-এ পাশ করলেন। এবারও প্রথম হয়েছিলেন সুশোভন সরকার।

বিমানবিহারী অর্থনীতিতেও এম-এ পরীক্ষা দিয়েছিলেন। দ্বিতীয়বার এম-এ পরীক্ষা দেওয়ারও ইতিহাস আছে। বিমানবিহারী তখন হেতমপুর কলেজের চাকরি ছেড়ে বিহারে অধ্যাপক 'বিখ্যাত অর্থনীতির অধ্যাপক ডি জি কালে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছয়টি বক্তৃতা দিলেন। সেই বক্তৃতা শুনে বিমানবিহারী এতই মুগ্ধ হলেন যে তিনি ঘরে বসেই অর্থনীতির বই পড়তে আরম্ভ করলেন। প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু ভাবলেন পরীক্ষাটা দিয়েই ফেলা যাক। ফলে ১৯২৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি গ্রুপে পরীক্ষা দেবার জন্য কলকাতায় এলেন।

তিনি যখন ইতিহাসে এম-এ পড়ছিলেন তখনই তাঁর বিবাহ হয়। এবার এম-এ পরীক্ষা দেবার আগে তিনি পরিবার পাঠিয়ে দিলেন শ্বশুর বাড়িতে। কিন্তু পরীক্ষার চোদ্দ দিন আগে তাঁর মনে হল হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁদের অবাক করে দেবেন। গেলেনও, কিন্তু প্রচণ্ড বৃষ্টিতে ভিজে দারুণ দুর্যোগের মধ্যে। তার যা ফল তাই হল। জ্বর নিয়ে সাতদিন পরীক্ষা দিলেন, শেষের দিন আর পারলেন না। কিন্তু ওই সাত পেপার পরীক্ষা দিয়েই দ্বিতীয় শ্রেণীতে তিনি চতুর্থ স্থান অধিকার করলেন।

অতঃপর পাটনায় বি-এন কলেজে ইতিহাস এবং অর্থনীতি দুই বিষয়েরই তিনি অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন। এখানে অধ্যাপনা করতে করতেই তিনি ১৯৩২-এ পি-আর-এস হলেন। তাঁর বই ছিল History of Political Thought from Rammohan to Dayananda, Vol. I, Bengal.

এই সঙ্গে তাঁর সহায়ক গ্রন্থ ছিল History of Religious Reformation in India in the Nineteenth Century.

কিন্তু এর আগে থেকেই বিমানবিহারী তাঁর আর-একটি বিখ্যাত বই 'চৈতন্যচরিতের উপাদান'-এর উপকরণ সংগ্রহে ব্যাপৃত ছিলেন। বাংলাতে এই গবেষণা গ্রন্থ লিখে তিনি ১৯৩৭-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি এইচ ডি উপাধি পেলেন। আজ এ বইখানি চৈতন্যসম্বন্ধীয় গবেষণার একটি আকরগ্রন্থের মর্যাদা পেয়েছে, যেমন পেয়েছে বাংলার আধুনিক কালের ইতিহাস লিখতে তাঁর ইংরেজী বইখানি। ইতিমধ্যে ১৯৩৩-এ তিনি 'সংস্কৃত সাহিত্যে চৈতন্য সম্বন্ধীয় উপকরণ'—এই নিবন্ধ লিখে পেলেন গ্রিফিথ মেমোরিয়াল প্রাইজ। সেবারই এই প্রাইজ পেয়েছিলেন নবগোপাল দাস আই-সি-এস।

বিমানবিহারীর পক্ষে বৈষ্ণব ধর্ম ও শাস্ত্র আলোচনাই ছিল পরাবিদ্যা চর্চা। ইতিহাস এবং অর্থনীতি ছিল অপরাবিদ্যা, যদিও এতেই তিনি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে পাণ্ডিত্য ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। সতেরো বৎসর বয়সেই জননীর আগ্রহে তিনি মাতামহ অদ্বৈতদাস বাবাজীর কাছে দীক্ষা নিয়েছি[illegible] [illegible]ত্রের যুক্তিবাদিতার প্রতি [illegible]ষ্ঠার নিষ্ঠা থেকে

কৃষ্ণপ্রিয়া তাঁকে ভক্তির পথে টানতে চাইলেন। চৈতন্যচরিতামৃতকার লিখেছেন,

অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান নিম্বফলে।
রসজ্ঞ কোকিল চুষে প্রেমাম্রমুকুলে॥

কিন্তু বিমানবিহারী জ্ঞানকে বর্জন করেননি, প্রেমের তত্ত্ব তিনি বিশ্লেষণ করেছেন যুক্তি দিয়ে। এইজন্যই আধুনিক বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে তাঁর স্থান নিঃসংশয়িত। জর্নাল অব আমেরিকান ওরিয়েন্টাল সোসাইটিতে (১৯৫৮) শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডিমক চৈতন্যচরিতের উপাদানে for a complete and excellent evaluation of the various sources of Chaitanya's life-এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। বিমানবিহারীর বৈষ্ণব গ্রন্থ আলোচনা সে সম্প্রদায়ের বাইরে পণ্ডিত সমাজে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ বলে স্বীকৃত, এ তারই প্রমাণ। আরও মূল্যবান বই তিনি এ বিষয়ে রচনা করেন, বিদ্যাপতি (খগেন্দ্রনাথ মিত্রসহযোগে), চণ্ডিদাসের পদাবলী (সাহিত্য পরিষৎ), ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ, ক্ষণদাগীতচিন্তামণি, শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্‌ পাঁচশত বৎসরের পদাবলী, জ্ঞানদাস ও তাঁহার

কৃষ্ণলীলা Krishna in history and Legend গৌরীশংকর (এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিতব্য)

বৈষ্ণব ধর্মে তাঁর অনুরোগ জননীর প্রভাবে স্বাভাবিকভাবেই একাগ্র ও গভীর হয়ে উঠেছে। তিনি যখন স্কুলে পড়েন তখন সুরেন্দ্রনাথ বিদ্যার নামে একজন পুণ্যচরিত্র সাধকের সংস্পর্শে আসেন। তাঁরই প্রভাবে চোদ্দ পনেরো বছর বয়সে বিমানবিহারী হরিনামে দীক্ষা নেন। তাঁর জীবনযাত্রাও বদলে যায়। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় বৈষ্ণব ধর্ম বিষয়ের রচনাও প্রকাশ করতে থাকেন। এ সময়ে তিনি আর একজন সাধকের সংস্পর্শে আসেন; তিনি প্রসিদ্ধ ভাগবত বক্তা কুলদাপ্রসাদ মল্লিক।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে বিমানবিহারী নবদ্বীপ সমাজ নামে এক সভা স্থাপন করলেন, তখন তাঁর বয়স ষোলো কিংবা সতেরো। উদ্দেশ্য ছিল চৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা। এর সভাপতি ছিলেন সংস্কৃত কলেজের অবসর-প্রাপ্ত অধ্যাপক শিবনারায়ণ শিরোমণি। বিমানবিহারী হলেন এর সম্পাদক এবং নবদ্বীপের পণ্ডিতেরা কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য। আট টাকা দক্ষিণায় এতে পরীক্ষা দেওয়া যেত। এর সার্টিফিকেটে বিমানবিহারীর স্বাক্ষরও থাকত। তা ছাড়া শুধু সভা স্থাপন করেই নয়, বিভিন্ন জায়গায় তিনি বক্তৃতাও দিতে লাগলেন—ম্যাট্রিক পাশ করবার আগেই। অনেকেই মনে করলেন এঁচড়ে পক্ব, আবার কেউ কেউ বললেন, প্রতিভাবান, কিন্তু বাল্যকাল থেকেই বৈষ্ণব ধর্মে তাঁর নিষ্ঠা। সে নিষ্ঠা কখনোই ম্লান হয়নি, বরং বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস পড়ে এই ধর্মকে অন্ধ ভক্তির উচ্ছ্বাস থেকে উদ্ধার করেছেন, ভক্তিকে ঐতিহাসিক শৃঙ্খলায় নিয়ে এসেছেন। এক সময়ে তিনি শ্রীখণ্ডের বড়ডাঙ্গার নির্জন মন্দিরে নিভৃত সাধনাতেও লিপ্ত হয়েছিলেন; শিখা ও তুলসীর মালাও ধারণ করেছিলেন। এ সময়ে প্রাচ্যবিদ্যার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁকে আহ্বান করে নিয়ে আসেন বিশ্বকোষের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে সহযোগিতা করার জন্য। কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী তাঁকে উড়িষ্যাতে পাঠিয়েছিলেন একটি গুরুত্বের কাজের ভার দিয়ে। ওড়িয়া বই থেকে চৈতন্য সম্বন্ধে উপকরণ সংগ্রহ করবার জন্য তিনি বিমানবিহারীকেই পাঠিয়েছিলেন। সেসব পুঁথির বিবরণ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

এম-এ পাশ করবার পরে তিনি হেতমপুর কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক রূপে যোগ দেন। সেখানে তিনি পরিচিত হলেন আর একজন বৈষ্ণব পণ্ডিতের সঙ্গে। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বিমানবিহারীকে গ্রহণ করে নিলেন সস্নেহ সহৃদয়তায়। অতঃপর তিনি যখন পাটনা বি এন কলেজে চাকরি নিয়ে চলে আসেন তখন মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখেছিলেন,

তুমি এসেছিলে, রসরহস্যে হাস্যে ও পরিহাসে।
লীলাকৌতুকী যে মুখর শুকে নির্জন
বনবাসে॥
তুমি এসেছিলে উড়াতে মোদের জঙ্গলে জড়তার
মূর্ত ঝটিকাবর্তের মত উৎসাহ-অবতার॥

কবিতাটি ছাপা হয়েছিল 'সচিত্র শিশির' পত্রিকায় (১৩৩২)।

বিমানবিহারী পাটনাতেই তাঁর সারা জীবন কাটান। ১৯৪৫ সালে তিনি আরায় হরপ্রসাদ জৈন কলেজে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর পরিচালনাধীনে ওই কলেজ কিছুকালের মধ্যেই একটি বড়ো কলেজে পরিণত হয়। পরে তিনি আবার ফিরে এসেছিলেন বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ে কলেজ পরিদর্শকের পদে। ১৯৫৯ সালে তিনি অবসর নিলেন।

জ্ঞান যাঁদের সাধনার বিষয়, তাঁদের অবসর কখনোই আসে না। চাকরি থেকে অবসর নিলেও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতার জন্য তাঁর প্রায়ই আমন্ত্রণ আসত। সে-সব তিনি প্রত্যাখ্যান করতে পারতেন না। বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থরচনার উৎসাহে ভাটা পড়ল না। বৈষ্ণব ধর্ম বিষয়ক ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ের গ্রন্থে কখনোই মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব হয়নি। বিবেকানন্দ ও নিবেদিতার রাষ্ট্রীয় সমাজ দর্শন যেমন, 'প্রেমধর্ম' সম্বন্ধে দিউফানোস নির্মলেন্দু ঘোষ বক্তৃতাতে তেমনি। ভারতীয় রাজনীতি সম্বন্ধেও তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ, উপকরণ ছিল সুপ্রচুর। তাঁর

Congress and Congressmen in the Pre-Gandhian age (1967) এবং Militant Nationalism (1966), problem of Public Administration in India (1953) এবং Indian Political Association and Reform of Legislature (1965).

প্রভৃতি বইগুলি ছাড়াও অসংখ্য প্রবন্ধ নানা গবেষণা-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে নানা বিষয়ের সূত্রে তাঁর যোগ ছিল। ইতিহাসে অর্থনীতিতে বাংলা সাহিত্যে সমাজতত্ত্বে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বিমানবিহারী কোথাও পরীক্ষক, কোথাও বক্তা।

বিমানবিহারীর বহু বাংলা প্রবন্ধ সাময়িক-পত্রে ছড়িয়ে আছে। উল্লেখযোগ্য, দেশ-পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যাতেই (৮ অগ্রহায়ণ, ১৩৪০) তাঁর প্রবন্ধ ছিল 'ভগ্নলোর রূপান্তর'। প্রাচীন ভারতবর্ষ নিয়ে বহু প্রবন্ধ তিনি লিখেছিলেন। এসব গুরু প্রবন্ধ ছাড়াও রসরচনাতেও তিনি ছিলেন অভ্যস্ত। তিনি পদরচনাও করেছেন।

একবার পদ রচনা করেই পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটে তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৩৫ সালে বি এন কলেজের অধ্যক্ষ ললিতকুমার ঘোষ বিমানবিহারীকে জোর করে প্রার্থী দাঁড় করিয়ে দিলেন। এসব নির্বাচনে সভ্যদের বাড়ি-বাড়ি না ঘুরলে ভোট পাওয়া যায় না। পড়াশোনা নিয়ে সর্বক্ষণ ব্যস্ত বিমানবিহারীর সময় কোথায়? তিনি একটি অভিনব উপায় বের করলেন। নরোত্তম ঠাকুরের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনি একটি পদ রচনা করে সব কলেজে বাঙালী অধ্যাপকদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।—

প্রিয়বরেষু,

সেনেটে যাইব বলি বড় সাধ মনে
অদ্যাবধি নাহি জানি যুদ্ধ কার সনে॥
ভোটের আয়ুধে বন্ধু সাজাও আমারে।
নিজের না থাকে যদি দাও ভিক্ষা করে॥
তুমি তো দয়ার সিন্ধু, অধমজনার বন্ধু,
মোরে প্রভু কর অবধান।
কৃপা না করিলে তবে বিমানের মান যাবে
ওহে নাথ কর পরিত্রাণ॥

সেবার এই কবিতার জন্যই পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক যদুনাপ্রসাদকে তিনি ভোটে হারিয়ে দেন।

বৈষ্ণব পদ আলোচনা করতে-করতে তিনি নিজেও কুরুক্ষেত্র-মিলন পর্যায়ে কয়েকটি পদ রচনা করে তাঁর ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্যের পরিশিষ্ট জুড়ে দিয়েছিলেন। বৈষ্ণব সমাজে বিমানবিহারী একজন শীর্ষস্থানীয় শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি।

বিমানবিহারীর কথা মনে পড়লে একজন বিদেশী পণ্ডিতের কথা মনে আসে। সংস্কৃত-সাহিত্যে বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত কীথ ছিলেন কনস্টিটিউশনাল ল'-র একজন বিশেষজ্ঞ। প্রাচ্যবিদ্যার চর্চা যে সব বিদেশী পণ্ডিত করেছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই গোড়াতে ছিলেন অন্য কোনো বিষয়ে পারঙ্গম। উইলসন গ্রীয়ারসন কীথ প্রভৃতি প্রাচ্যবিদ্যা-বিশারদরা সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা করেছেন বিশুদ্ধ জ্ঞানেরই পিপাসায়। আমাদের জীবিকা অর্জনের বাঙালীদের মধ্যে নিরাসক্ত বিদ্যোৎসাহী পণ্ডিত-সমাজে বিমানবিহারী তাঁর বিপুল সখ্যক গ্রন্থ ও অন্যান্য রচনার দ্বারা শ্রদ্ধার আসনেই প্রতিষ্ঠিত থাকবেন। বিদ্যা বিনয় দান করে, এ-উক্তি পুঁথির কথা নয়, জীবনেরই কথা। বিমানবিহারীর সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছেন তাঁরা তা জানেন। নিজের সাধনায় তিনি যেমন ছিলেন অটল, নবীন প্রতিভাকে বরণ করে নিতেও তাঁর ঔদার্য তেমনি ছিল অবারিত। তিনি লোকান্তর গমন করলেন নিঃশেষিত তৈল প্রদীপের মতো নয়, বিদ্যা ও জ্ঞানের সমৃদ্ধ উপকরণের মধ্যে তাঁর বহু পরিকল্পনাই অসমাপ্ত রেখে।

সহযোগিতার জন্য

আপনি আমাদের দেশী ব্র্যাণ্ডের সিগারেট খান, ওটা ভাল বলেই এবং আপনার অন্তরেরও তাতে সায় রয়েছে। নানাভাবের সূক্ষ্ম চাপ ও নিরুৎসাহ করবার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আপনি যেটা একবার বেছে নিয়েছেন সেইটেই ধরে রেখেছেন গর্বের সঙ্গে এবং আপনার বিচারবিবেচনার ফলে।

আপনি চতুর প্রচারের ঘটায় বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন নি এবং এটা নিঃসন্দেহে বুঝতে পেরে গেছেন যে, ভারতে প্রস্তুত সিগারেট অথচ যাকে ভুল করে বিদেশী সিগারেট বলেই মনে হয়--সেগুলির দাম বেশী বলেই সত্যি--সত্যি গুণেও সেরা হয়ে ওঠে না। আর, তাছাড়া একথাও আপনি নিঃসন্দিগ্ধভাবেই জানেন যে ভারতে সেরা সিগারেট তৈরী করবার মতন জনবল, অর্থ ও কাঁচামাল পর্য্যাপ্তই রয়েছে এবং সত্যিকারের দেশী সিগারেটই এখানে তৈরী হতে পারে যাতে ভারতের অতি প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রাও বহুপরিমাণে বাঁচান যেতে পারে।

আপনার এই আদর্শের ওপর এবং আপনার অনুকারী ক্রমবর্দ্ধমান বহুসংখ্যক ধূমপায়ী যাঁরা দেশী সিগারেটই খান, তাঁদেরই ওপর নির্ভর করে দেশের এই শিশু সিগারেট শিল্পের ভবিষ্যৎ।

আমাদের দিক থেকে আমরা আপনাদের সেবায় পূর্ণভাবে নিয়োজিত এবং দেশীয় শিল্পের উন্নতিই আমাদের স্থির লক্ষ্য।

গোল্ডেন টোব্যাকো কোং প্রাইভেট লিমিটেড
বোম্বাই-৫৬

ভারতের এই ধরণের বৃহত্তম জাতীয় উদ্যম

GT.61.BNG Greens' Advtg.

কাব্যে আহারের রসাস্বাদন

অলকা বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙালীরা চিরকাল ভোজনবিলাসী। ছোটবেলায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুদিত ভোজনবিলাসী ও শয্যাবিলাসীর গল্প পড়েছিলাম, ব্যবহারিক জীবনেও তার পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলাদেশ ছাড়া ভারতের অন্যান্য দেশ ও ভারতের বাইরে সব দেশেই আহারের ব্যাপারে সময়ের অপব্যবহার করতে চায় না, সেটা সংক্ষিপ্ত করে নিতে চায়। অন্যান্য দেশের মেয়েরা যখন পাঁচরকম সেদ্ধ, তেঁতুলের ঝোল বা লাউয়ের তরকারি, ডাল, টক চাটনি, এক তরকারীতে ভোজনপর্ব সমাধা করেন, সেখানে বাঙালী মহিলারা খুব ভাল করে তেল-মশলা দিয়ে উপাদেয়, সুস্পাচ্য আহারের ব্যবস্থা চিরকাল করে এসেছেন। বাঙালী শুধু নিজেই পঞ্চব্যঞ্জন খেতে ভালবাসে না, পাঁচজনকে খাইয়ে তারা আনন্দ পায়। তারা খেয়ে বা খাইয়ে আনন্দ পেত বলেই রান্নার পিছনে অনেক সময় দিয়ে, প্রাণ ঢেলে রান্নাকে সুস্বাদু করে তুলতো। আজকের দুর্মূল্যের দিনে লোকজনকে খাওয়াবার ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই।

কিন্তু প্রাচীনকালে অর্থনৈতিক অবস্থা এমন কঠিন ছিল না, সব কিছুর দাম ছিল কম, সমাজে সকল কিছুর সাচ্ছল্য ছিল। তাই প্রাচীনকালের কাব্য থেকে আমরা অন্যান্য তালিকার সঙ্গে রন্ধনের একটি লম্বা তালিকা পাই। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে মহাদেব পার্বতীকে বিশ্রামের দিনে ভাল করে বাঁধবার এক তালিকা দিয়েছেন—

"সুকুতা শীতের কালে বড়ই মধুর।
কুমড়া বার্তাকু দিয়া রান্ধিবে প্রচুর॥

✻

রান্ধিবে মসুরি ডাল দিবে টাবা জল।
খণ্ড মিশাইয়া রান্ধ করঞ্জার ফল॥
ঘৃতে ভাজি দুগ্ধেতে ফেলিবে ফুলবড়ি।
চড়চড়ি করিয়া রান্ধ পলতার কড়ি॥
রান্ধিবে ছোলার ডালি তাহে দিবে খণ্ড।

✻

মানের বেসারে দিবে কুমড়ার বড়ি।

✻

ঘৃত জিরা সন্তলনে রান্ধিবে পালঙ্গ॥"

এমন কি ব্যাধ কালকেতুও—"ছোট গ্রাস তোলে যেন তেআঁটিয়া তাল", সেও খাওয়ার শেষে এক হাঁড়ি দই খেয়ে উদ্গার তুলে তৃপ্ত হয়েছে।

তখনকার দিনে ইচ্ছামত তরিতরকারি নিজেদের বাড়ির সংলগ্ন জমিতেই উৎপন্ন করা যেত, এখন মানুষের সে ইচ্ছাও নেই, শক্তিও নেই, পরিশ্রম করতে চায় না, এত ভেজাল খাদ্য খেলে কি মানুষের শক্তি থাকে।

উনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশক (অর্থাৎ মধুসূদনের আবির্ভাব কাল) পর্যন্ত কবিরা চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় খাদ্যের আস্বাদনের লোভটুকু ধরে এবং কাব্যে ছাড়তে পারেন নি। ঐ সময়ের বিভিন্ন বৈষ্ণব কাব্যে মঙ্গলকাব্যে ও আখ্যানমূলক প্রেমকাব্যে কবিরা মুখরোচক খাদ্যের আস্বাদন রেখে গেছেন। সেসব খাদ্যের আস্বাদন কাব্যের মারফৎ করতে করতে জিহ্বা রসসিক্ত হয়ে ওঠার বদলে, না পাওয়ার বেদনায় চোখ দুটি অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। দ্বিজ বীরেশ্বরের "সরস্বতীমঙ্গলে" রাজা বিক্রমাদিত্যের কন্যা, মহাকবি কালিদাসের স্ত্রী, শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে পরম সমাদরে রান্না করে খাইয়েছেন—

"নিমে-শিমে বেগুনেতে করিলেন ঝোল।
সরিষা বাটনা দিয়া সিদ্ধ করি ওল॥
পাকা মর্তমান রম্ভা সহ ঘৃত দধি।
মুগের সুন্দর বড়া দুটি সিদ্ধ আদি॥
নারিকেল পাপড়ি লাড্ডু চিঁড়া চাঁপাকলা।
চাঁছি ছেনা চিনি পানা দেই নৃপবালা॥
নানা মত কাসন্দি দিলেন শাশুড়িরে।
পায়স পিষ্টক আদি দিলা তার পরে॥"

একজন নিরামিষভোজী বিধবা স্ত্রীলোকের পক্ষে ভাতের পাতে এতরকম ব্যঞ্জন ও শরীর রক্ষার উপযুক্ত খাদ্যের প্রাচুর্য একদিকে যেমন আর্থিক সচ্ছলতার কথা বলে অন্যদিকে বাজারের সস্তায় লভ্য জিনিসের প্রতি ইঙ্গিত করে। আজকের দিনে বাজারে গিয়ে আলু, শিম, বেগুন, নারিকেল, মর্তমান কলা দেখে দর করে বিরস মুখে ফিরে আসতে হয়, তরিতরকারি আর রন্ধনশালায় রান্না হয় না, সেগুলি বাজারের 'ঠাণ্ডাঘরে' বা জলছড়া পেয়ে ক্রমশ দর বৃদ্ধি করতে থাকে, তার ফলে ভিটামিনযুক্ত সজীব সব্জিগুলি নির্জীব হয়ে মানুষের শরীর নষ্ট করে। আর 'চিনির পানা' সে তো দুর্লভ বস্তু, কেননা বাজারে তো চিনির দর সাড়ে চার টাকা পর্যন্ত চলে যায়।

রাধামাধব ঘোষের লেখা "বৃহৎ সারাবলী"র 'গৌরাঙ্গলীলা' প্রসঙ্গে পাওয়া যায়, অদ্বৈত আচার্যের গৃহে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব খাবেন বলে তাঁর জন্য রান্না হয়েছে—

"সত পীত ঘৃতযুক্ত শালি অন্নস্তূপ।
চৌদিকে ব্যঞ্জন ডোঙ্গা আর মুদ্গ সূপ॥
সামুদ্রিক শাক আর বিবিধ প্রকার।
পটোল কুষ্মাণ্ড বড়ি মানকচু আর॥
রাই মরিচ শুক্ত দিয়া কন্দ মূল ফলে।
অমৃত নিন্দুক পঞ্চবিধ তিক্ত ঝোলে॥

✻

মুগবড়া মাস বড়া রম্ভা বড়া মিষ্ট।
ক্ষীর পুলি নারিকেল যত পুষ্প ইষ্ট॥"

এখন খাঁটি গাওয়া ঘি পাওয়া যায় না কি কোথায়ও? শালি অন্ন? এই সব রন্ধন তালিকা থেকে সুগৃহিণীরা যেমন ভাল রান্নার প্রক্রিয়া শিখে নেবেন, তেমন অন্যদিকে বাজার দরের দিকে তাকিয়ে হা-হুতাশ যাবে বেড়ে।

যশোদা ও রাধিকা, কৃষ্ণের জন্মদিনে যা রেঁধেছেন তাতে আমাদের রসনা সরস হয় এই পর্যন্ত তার বেশী কিছু করার উপায় নেই। এই সব মিষ্টির কিছু কিছু কেউ বা প্রস্তুত করতে পারেন, আবার কেউ বা নামই শোনেন নি। তাতে কারুর কিছু আক্ষেপের নেই, কারণ অধিকাংশ জিনিসের আগুন-ছোঁওয়া দর।

"শাকের পাকড়ি বিবিধ ভাজা।
শাক-চচ্চড়ি অম্বল তাজা॥

✻

সুক্তোতে মুলোতে রাঁধে অম্বল।
অলাবু বার্তাকু আলু পটোল॥
বেসম পোলাও মুগ কালিয়া।
নানাবিধ ডালি খাটাই দিয়া॥

✻

কিসমিস তপ্ত ক্ষীরে দিল ভিজাইয়া।
পোস্ত বীজ দুগ্ধ সহ দিল পাকাইয়া॥

✻

চন্দ্রকান্ত পিঠা রচে কোরা নারিকেলে।
মিঠা দুগ্ধ মধ্যে রাখে অতি কুতূহলে॥
ছানাবড়া পানিতাওয়া মাখন মিছরি।
দুগ্ধ পুরি ক্ষীর রুটি কটরাতে ভরি॥"

(করুণানিধান বিলাস—জয়নারায়ণ ঘোষাল)

আজকের দিনে শত শত মানুষ না খেয়ে শুকিয়ে মরছে, কিন্তু সীতাদেবী নিজে রন্ধন করে হনুমানকে খাইয়েছেন—

"তণ্ডুলের স্থানে গোধূমের সূত্র দিয়া।
অপর পায়স কৈলা যতন করিয়া॥

✻

নারিকেল চূর্ণ বার্তাকু অর্পিয়া
পালঙ্গ শাকের ঘণ্ট কৈলা হিঙ্গু দিয়া॥
এইরূপে কচুশাক তণ্ডুলীয় শাক।
অপূর্ব যতন করি করিলেন পাক॥
মুস্পবটী নারিকেল অলাবু মিশ্রিত।
সাক্তনীর শাকে গন্ধ দ্রব্যে আমোদিত॥"

(শ্রীশ্রীমদ্রামরসায়ন—উত্তর কাণ্ড, রঘুনন্দন গোস্বামী)

উৎসব ব্যসনে বিবাহাদি শুভদিনে অতিথি নিয়ন্ত্রণ আইনের জন্য আমরা বহুজনকে নিয়ে আনন্দ করতে ভুলে গেছি, তাই সীতার বিবাহের খাদ্যতালিকা হয়তো 'ঘ্রাণেন অর্ধ ভোজনম্'-এরই মতো 'পাঠেন অর্ধ ভোজনম্' করাতে পারে।

সোণার পরাতে লুচি কচুরি পুরিয়া।
লাখে লাখে পরিবেষ্টা চলিল লইয়া॥
প্রত্যেক সভার আগে রাখে স্বর্ণ থাল।
তারপরে পড়ে গেল অলাবুর ঝাল॥

শাক ছোলা আদি ভাজি দিছে জোগাইয়া।
সন্দেশের হাঁড়া আনে হাতে মাথে লয়্যা॥
ফোটা মোটা মণ্ডা মতিচুর মনোহরা।
খাঁড় মিঠা ক্ষীর পিঠা ছানা রসকরা॥
খাজা গজা জেলেপি নিকুতি খাসতকা।
গোলাবি বরফি দিছে দরে টাকা তোলা॥
(রামায়ণ—দ্বিজ রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়)

ঊনবিংশ শতাব্দীতে জয়গোবিন্দ দাস ও তাঁর 'ভাগবতামৃতে' কৃষ্ণের খাদ্যের তালিকা দিয়েছেন, তাও অত্যন্ত লোভনীয়।

শষ্কুলাপী ফেনিকা আর রোটিকা সহিত।
অন্য ঘৃত পক্ক নানাবিধ সুবিহিত॥
দধি দুগ্ধ বিকারেতে জাত নানামত।
শিখরিণী, অপর মিষ্টান্ন কব কত॥

*

মধুরোম্ল রস প্রায় পোরস সাধিত।
মরীচাদি চূর্ণ জিরা লবণ সহিত॥

আজকে যাঁরা কাশীতে যান, তাঁরা ইচ্ছে করেই মিলিয়ে নিতে পারেন ১৮০৮ সালে জয়নারায়ণ ঘোষাল তাঁর 'কাশী পরিক্রমায়' যে সব খাবার দেখেছিলেন, আজ আর তা পাওয়া যায় কি না বা তার মধ্যে কয়রকমের খবার দোকানের শোভা বর্ধন করে অথবা খাদ্যরসিকের রসনার তৃপ্তিসাধন করে?

পলোটি শাক সূপ ভৃষ্ট তরকারী॥
ক্ষিপ্তপুরি কচোরি ছোহেরি শিখরিণী।
পোস্তল পাকোড়ি কারি আচার চাটনি॥
দুগ্ধ-দধি ঘৃত আদি করিয়া ভোজন।

*

জিলেবি এলাচিদানা খিওর বাতাসা।
মতিচুর পাণিতুয়া খাজা আন্দরসা॥
মগদল বেসম লাড়ু সংগত পছন্দ।
পেঁড়া বরফি বুন্দিয়া মিছরি চিনিকন্দ॥
ক্ষোহেরি কচোরি পুরি সর্ব দ্রব্য ভাজা।
মোরব্বা আচার শাক তরকারি তাজা॥"

এখন আমাদের কাছে চাল, ডাল, তরি-তরকারি কিছুরই আর প্রাচুর্য নেই; চাল, চিনি, আটা, ময়দা সবই মাপা, অন্যের হাত তোলার উপর আমরা আছি। বাজারে তো সবই আগুন দর, এক টাকা কিলোর নিচে কোন তরকারী বাজারে বিক্রয় হয় না। বাড়ীতে গিন্নি বলেন, 'এতগুলো টাকা দিলুম, এই বাজার! এই জিনিসে আমি এতগুলির পেট ভরাই কি করে বলো তো?' কিন্তু গিন্নিদের চেয়েও যাঁরা বাজার করেন, তাঁদের বিপদ আরও বেশী, টানাটানি করে কোনদিকে কর্তারা সংকুলান করতে পারেন না। নিখুঁতভাবে রান্না করে পরিজনকে খাওয়াতে গিন্নিরা জানেন, সুগৃহিণীরা জানেন "মানের বেসারে কুমড়ো বড়ি" দিয়ে সুস্বাদু করে রাঁধতে, কিন্তু মান, কুমড়ো, ডাল সব যে আগুন দর, তাই তো মুখরোচক রান্নার আদেশ শিবের মতো বাড়ির কর্তারাও আর গিন্নিদের দিতে পারেন না; এখন আমাদের শুধু অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করতে হয় আর প্রাচীন কাব্য পাঠের মধ্যে দিয়ে রসনায় খাদ্যের আস্বাদ নিতে হয়।

আজ ভেজাল খাদ্য ঠাণ্ডা ঘরের সব্জি আর গুঁড়ো দুধের দেশে, সব কিছুই আমাদের কাছে স্বপ্ন, কাব্যকথা। আমার বাবা এই সব আলোচনার সময়ে অতীতের অনেক গল্প বলতেন, এই প্রসঙ্গে তাঁরই একটি গল্প মনে পড়ে গেল—অতীতের এক বিত্তবান বৃদ্ধ নিজের বাড়ীর গরুর খাঁটি দুধ জ্বাল দেওয়ার পর রূপোর বাটিতে করে ফুঁ দিতে দিতে, চুমুক দিয়ে দুধ খেতেন। শেষ বয়সে তিনি একেবারে নিঃস্ব হয়ে যান, তাই সেই বৃদ্ধ দুঃখের মধ্যেও রসিকতা করে বলতেন—'আগে যা ছিল, তার সব গেছে, সে রূপোর বাটিও নেই, গরুর খাঁটি জ্বাল দেওয়া দুধও নেই, এখন শুধু আছে আমার ফুঁ টুকু আর ইচ্ছাটুকু।' আমাদেরও আজ সেই কথাই বলতে হচ্ছে, রসনার স্বাদ-আস্বাদ আছে, খাবার ইচ্ছে আছে, কিন্তু বাজার আগুন, তার কাছে যায় কার সাধ্য! তাই তো পুরাতন কাব্যের নানা খাদ্যের তালিকার মধ্যে দিয়ে আমরা না পাওয়া জিনিসগুলির স্বাদ পেতে চাই।

প্যারিসের চিঠি

পারীর ক্লোশারদের কথা কে না জানে? সমাজের রীতি-নীতি-দুর্নীতিতে সীমাবদ্ধ শৃঙ্খলিত জীবনের নিরর্থক প্রবাহ থেকে মুক্তি চেয়ে সজ্ঞানে এদের অনেকে বেছে নিয়েছে মোহমুদ্গরের পন্থা: ছেঁড়া নোংরা পুতিগন্ধভরা পোশাক, বগলে বারো আনা নিঃশেষ হয়ে যাওয়া সস্তা মদের বোতল, হাতে এক টুকরো রুটি এবং ডাস্টবিন থেকে কুড়নো বাসি খবরের কাগজ, শয়ন নদীর পুলের তলায় অথবা পার্কের বেঞ্চে পায়রার দৌরাত্ম্য তুচ্ছ করে। এমন জীবন্মুক্ত পুরুষ (নারীও) পারীর পথে-ঘাটে হামেশা দেখা যায় এবং পারীসিয় নাগরিকের চোখে এরা ফেলনা নয়। 'নিরর্থক' (absurd) জীবন-দর্শনের ছবি আঁকতে আলবেয়ার কামু তাঁর 'পতন' উপন্যাসের নায়ককে আমস্টারডামে নিয়ে না গেলেও পারতেন নিশ্চয়, যেহেতু অমন দার্শনিক কামুর দুয়ার থেকে অদূরে উপস্থিত ছিল। মরিস শাভালিয়েরের Ma Pomme ছায়াচিত্রের নায়ক তাদেরই একজন। এবং পারীসিয়দের মনে ক্লোশার-সংক্রান্ত ধারণাটি প্রায়শ এইসব কোমল বা দর্শনীয় প্রক্ষেপে উজ্জ্বল। অতীতে যারা ক্লোশার হত, আজ তারা বীটনিক হয়, প্রোভো বা হিপি। অন্তরে এরা গন্ধর্ব-লোকের ছাড়পত্র নিয়ে জন্মায়।

১৯৩৭ সালের কোনও এক সন্ধ্যায় পারীর পথে এমনি এক ক্লোশার অতর্কিতে ছুরি চালিয়ে জখম করে পারী-প্রেমিক পারী-প্রবাসী (আত্মনির্বাসিত) এক আইরিশ যুবককে। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েই যুবকটি জেলখানায় গিয়ে সাক্ষাৎ করলেন আততায়ীর সঙ্গে। জানতে চাইলেন, কোন্ অভিযোগ নিয়ে ক্লোশারটি তাঁকে আক্রমণ করেছিল। "তা আমি জানিনে কর্তা," জবাব দিয়েছিল কয়েদী।

যাযাবরের জীবনে এই প্রথম 'জলকে চল' আহ্বান নয়। আইরিশ যুবকটি ডাবলিন থেকে ফরাসী ও ইতালীয় ভাষা-সাহিত্যে এম এ পাশ করে ১৯২৭ সালে পারী এসেছিলেন ইংরেজির লেকচারার হয়ে। স্বদেশে নিন্দিত পারী-প্রবাসী আইরিশ লেখক জেমস জয়েসের সঙ্গে তখন আলাপ, বন্ধুত্ব এবং জয়েসের প্রভাবে অনুপ্রেরিত হয়ে তাঁর সহযোগিতায় নামেন যুবকটি। Whoroscope নামে দীর্ঘ একটি কবিতা প্রকাশ করে দশ পাউণ্ডের একটি সাহিত্য পুরস্কার লাভ করে সেদিন যে স্যামুয়েল বেকেট সাহিত্য-জীবনের শুরু করেন, আজ নোবেল পুরস্কারের আন্তর্জাতিক সম্মানে তিনি ভূষিত। ১৯৩৩ সালে ডাবলিনের ট্রিনিটি কলেজের সহকারী অধ্যাপক-পদে ইস্তফা দিয়ে ভ্রাম্যমাণ হন বেকেট। পারীতে জুল রোমাঁর Unanimisme সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেও জার্মানী, ইতালি প্রভৃতি দেশে ঘুরে বেড়ালেন তিনি আরো

স্যামুয়েল বেকেট শিল্পী : দানিয়েল রোক

কিছুদিন। ১৯৩৭ সালে পারীতে মঁপার্নাসের কাছে পাকাপাকিভাবে আস্তানা গাড়বার অল্পদিনের মধ্যেই বেকেটের জীবনে আকস্মিক ওই দুর্ঘটনা এবং আততায়ীর সংক্ষিপ্ত জবাবের মধ্যে মানব অস্তিত্বের নিয়ন্ত্রণকারী এক ইঙ্গিত গভীরভাবে বিচলিত করল বেকেটকে।

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধল। বেকেট আয়ার্ল্যাণ্ডে গিয়েছিলেন গর্ভধারিণীর দর্শন পেতে। পারী ফিরে এসে ফরাসী বন্ধুদের সঙ্গে [illegible] ...ৎসী-বিরোধ গুপ্ত সমিতিতে [illegible] কালে গেস্তাপোর খপ্পর থেকে কোনক্রমে [illegible] পেয়ে আশ্রয় নিলেন তিনি দক্ষিণ ফ্রান্সের এক খামারে শ্রমিক সেজে। সে-জীবনের অভিজ্ঞতা ব্যঞ্জনা পেল ১৯৫৩ সালের জানুয়ারি মাসে বেকেটের প্রথম নাটকে এবং প্রথম মঞ্চ ফরাসীতে প্রকাশিত সাহিত্য-কীর্তি—'গোদোর প্রতীক্ষায়': গভীর নিরাশা, নাড়ি-ছেঁড়া যন্ত্রণা, শোক-তাপ-বিক্ষোভে ভারাক্রান্ত এই নাটকের পরিবেশে তিক্ত শ্লেষ, সুখের ব্যর্থ অন্বেষণে অনীহা, প্রত্যাশা-প্রতীক্ষার বিড়ম্বনা পরিস্ফুট হয়েছে দ্ব্যর্থহীন প্রাঞ্জলতার মাধ্যমে। ১৯৫৭ সালের মে মাসে তীব্রতর তীক্ষ্ণতর হয়েছে বেকেটের প্রকাশভঙ্গী 'শেষের কিস্তি' নাটকে, এখনো যা পারীর নাট্যশালাতে অভিনীত হচ্ছে সমান মর্যাদায়। এই নাটকটি ১৯৫৭ সালে মঞ্চস্থ হবার আগেই নাট্যকার ইওনেস্কো লিখলেন, "বেকেটের এই যে নাটকটির পাঠ 'শেষের কিস্তি' এখুনি সাঙ্গ করলাম, সম্ভবত 'গোদোর প্রতীক্ষায়' নাটকের চেয়ে উৎকৃষ্ট। এ এক অনবদ্য সাহিত্য কীর্তি এবং আমার ধারণা মঞ্চ পরিচালকদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যাওয়া উচিত এটি মঞ্চস্থ করবার অধিকার অর্জনে, যদিও আমি জানি যে পারীর চালকদের একই শ্রেণীর ভাবেই 'ক্লাউটধর্মী' নাটকের দিকে [illegible] থেকে বেকেট অবধি সবার নাটকেই আমি 'ক্লাউটধর্মী' মনে করি।"

রূপনারানের কূলে যে প্রশ্ন 'তুমি' প্রশ্ন উঠেছিল, সেই গভীর জিজ্ঞাসা বেকেটের সাহিত্যিক-জীবনের প্রাণ। কিন্তু প্রতীক তাঁর স্বতন্ত্র। পরিবেশ [illegible]-দুঃস্বপ্নকর। বেকেটের মতে আমাদের অস্তিত্ব হচ্ছে ইতিহাসের অনুকরণ মাত্র। সমাজের বাগ-চিত্র। প্রতিটি জাতকই এই জীবনে আসামীর ভূমিকায় দাঁড়াতে বাধ্য। দোষ? মানবজন্ম গ্রহণ। এখানে বেকেটের জীবন-দর্শনে আবাদ করে সোনা ফলাতে চাওয়া তো দূরের কথা, আবাদও দুষ্কর। এক হাঁটু কাদা ঠেলে আদিগন্ত এগিয়ে চলা, [illegible] দৃষ্টিতে বিরক্ত পথ, অকারণ এই নৈসর্গিক পারিপার্শ্বিককে একটু [illegible] ঠাঁই, মাতৃ জঠরের আরাম অন্বেষণ, প্রস্থানের পরিবর্তে প্রত্যেক মানুষের [illegible] অন্ধ-গহ্বরের পটভূমিকায় ফের জন্ম না [illegible] চাওয়া, ঈডিপাসের আত্মনিরীক্ষণ—বেকেটের কলমে ফুটে উঠেছে। গতির চেষ্টা নিরর্থক, বেকেট দেখা যায়, কারণ গতি হচ্ছে স্থিতি থেকে স্থিতিতে চলে বেড়ানো।

প্রচারভীরু মুখচোরা বেকেট তাঁর ফরাসী স্ত্রী সুজানের সঙ্গে মঁপার্নাসের ফ্ল্যাটে নয়তো শহরতলীতে তাঁর বাগান-বাড়ির নিভৃত আশ্রয়ে দিন কাটান। বাগানের একটা গাছের চারদিকে উঁচু পাঁচিল তুলে নিয়েছেন বেকেট, লেখবার সময় একাগ্রতা চান বলে। কিছুদিন আগেও তিনি বলে-ছিলেন, "আমার কোন বক্তব্য নেই। শুধু

একটা কথাই আমি বলতে পারি: আমি জানি আমার কোন বক্তব্য নেই কথাটা কত খাঁটি।"

বেকেটের 'গোদো' God-এর সামিল। প্রত্যাশা, প্রতীক্ষা, গতির চেষ্টা, সবই যেখানে নিরর্থক, তা হলে কেনই বা কলমবাজী করা? জীবনের এই উপলব্ধির সঙ্গে একমত হয়ে স্বল্পভাষী (লিখনে ও বচনে) বেকেট ক্রমে ক্রমে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করছিলেন, লক্ষ্যণীয়। প্রেরণার অনটন? নাকি আত্ম-সচেতন শিল্পীর বিশ্ববীক্ষায় অপূর্ব-শ্রুত ছন্দের নান্দীমুখ এই যতি?

প্রত্যাশা ও প্রতীক্ষা প্রসঙ্গে আমাদের সঙ্গে বেকেটের মতের মিল নেই। ভবিষ্যতের ধারা যে স্থিতি থেকে স্থিতিতে চ'লে বেড়ানো নয়, বিবর্তনবাদী মনে আমার সে-বিষয়ে তিলমাত্র সংশয় বা সন্দেহ নেই।

*

পারীতে ভারতীয়ের সংখ্যা বড়জোর শ'খানেক; পুরো ফ্রান্সে পাঁচশ' হবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু মাঝে-মধ্যে ভারতীয়দের যেসব আসর বসে, তার দু-চারটে অনুষ্ঠানে

আমি উপস্থিত থেকেছি। ওসব আড্ডায় নিয়মিত যেসব ফরাসী বন্ধুদের মুখ আমরা দেখতে অভ্যস্ত, তাদের মধ্যে মিরেই নালেরো একজন।

ও'র চেহারাতেই কেমন যেন উত্তর ভারতীয়তার ছাপ ; লাবণ্যের আনাটমি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হবার ধক রাখলেও ও বিষয়ে মিরেই-এর নারী-হৃদয়ে অযথা অহমিকা আছে বলা অন্যায় হবে।

অক্টোবরের শেষ নাগাদ মিরেই ফোন করল, "পুজোতে এবার লণ্ডনে গিয়েছিলাম। রবিশঙ্করের সঙ্গে দেখা। উনি তোমায় শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এবং বলতে বলেছেন যে ১১ই নবেম্বর পারীতে ও'র কনসার্ট উপলক্ষে আসছেন, তখন তোমায় দেখতে পেলে সুখী হবেন।" সত্যিই আশা করিনি যে স্বল্প পরিচয়ের জের এমন দীর্ঘস্থায়ী হবে বিশ্ব-পর্যটক রবিশঙ্করের স্মৃতির পটে। এই বিস্ময়ের পর্বে আরো খোরাক জুটল যখন, বাস্তবিকই রবিশঙ্করের ডাক এল ৯ই নবেম্বর সকালে : আমার সঙ্গে গল্প করবেন ব'লে স্নেহপ্রবণ রবিশঙ্কর তাঁর অমূল্য সময়ের অনেকখানি মজুত রেখেছিলেন এবং সেই আলোচনার শুরুতেই গত বছরের আলোচনার সূত্র ধরে নানা কথা যে পাড়লেন এমন নয়, আমার অনুজ শ্রীমান টোগোর খবরাখবর, আমার কাজকর্মের খবর ইত্যাদি বহু ছোটখাটো প্রসঙ্গ তুলে অভিভূত করলেন আমায়।

"আপনি আমায় গত বছর যে লিখেছিলেন ভারতীয় রাগের ভিত্তিতে সিমফনি বা কনচার্টো ধরনের পশ্চিমী কম্পোজিশন বিষয়ে, তা আমি ভুলিনি। এবং আপনি শুনে সুখী হবেন যে ১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাসে লণ্ডনে আমি পুরো অর্কেস্ট্রার সঙ্গে প্রায় চল্লিশ-পয়তাল্লিশ মিনিটের একটি অনুষ্ঠান করব : সকাল থেকে রাত অবধি রাগ-রাগিনীর যে পরম্পরা আছে, তারই মালা গেঁথে দেব এই সুর প্রচেষ্টায়।" রবিশঙ্কর বললেন।

"আপনার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক," অভিনন্দন জানানো চলে না। অথচ মন আমার দুর্দান্ত ফূর্তিতে খইয়ের মতো ছিটকে পড়াতে উদযোগ করল। দেড়যুগ ধরে লালিত এ আমার অত্যন্ত শ্লাঘনীয় এক স্বপ্ন। ভারতীয় সংগীতের কাঁচামাল নিয়ে পশ্চিমী হার্মনির প্রয়োগে নতুন এক সংগীত-রীতির সৃষ্টি করা যুক্তিযুক্ত এবং সম্ভব যে, তা প্রমাণ করতে আমি বেগ পাইনি। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজী, বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী থেকে শার্ঙ্গদেব পর্যন্ত ভারতীয় এবং খ্যাত-অখ্যাত পশ্চিমী বহু বিদগ্ধজন আমার এই ধারণাকে প্রণিধান-যোগ্য ব'লে মানেন। কিন্তু রবিশঙ্করের মতো প্রতিভা যে আন্তর্জাতিক রসিক-দরবারে তা পরিবেষণ করতে বদ্ধপরিকর এখন, স্বয়ং তাঁর মুখে এই সংবাদ পেয়ে আমার আনন্দ কম হল না।

গতবারে রবিশঙ্করের সঙ্গে যখন দেখা হয়, তিনি বলেছিলেন যে ও'র প্রথম বই My Music, My Life শীঘ্র প্রকাশিত হচ্ছে। ইতিমধ্যে বইটি সম্বন্ধে নানা আশাপ্রদ কথা কানে এলেও দেখবার সুযোগ আমার হয়নি। আলোচনা-প্রসঙ্গে রবিশঙ্করই বইটার কথা তুললেন এবং বললেন যে আমার জন্য উনি এককপি বই নিয়ে এসেছেন।

অ্যামেরিকার Simon and Schuster বইটি ছেপেছেন বহু যত্ন নিয়ে : প্রায়-অর্ধশতাব্দীর জীবনের বারো আনার উপর যিনি অতিবাহিত করেছেন নৃত্য ও সঙ্গীতের সাধনায় ধারণায় মননে, ভৌগোলিক রাজনৈতিক সমাজনৈতিক সমস্ত ব্যবধান তুচ্ছ ক'রে যিনি শাশ্বত ভারতবর্ষের আত্মার বাণী শুনিয়ে চলেছেন আজকের রণক্লান্ত শান্তিকামী, সদিচ্ছা-প্রণোদিত বিশ্ববাসীর উদ্দেশে নগরে নগরে, সেই 'যাজক' রবিশঙ্করের আত্মকথাতেও 'আত্ম'-অংশ ছাপিয়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে তাঁর সংগীত-চিন্তা, তাঁর গুরু প্রসঙ্গ, তাঁর ঐতিহ্য-গৌরব। সহজ খ্যাতি, সহজ প্রতিপত্তি, সহজ ঋদ্ধি রবিশঙ্করের নয়। "আমাদের যুব-চেতনায় রবিশঙ্কর যে প্রভাব বিস্তার করেছেন—তাঁর সান্নিধ্য এবং তাঁর সংগীত যে মন্ত্র-মোহ জাগায়, যুগপৎ তা মহান তাঁর শিল্পের সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি এবং মুমুক্ষু যুবশক্তি সহজাত বোধির পরিচায়ক," গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন য়েহুদী মেনুহিন। "রবিশঙ্করে তারা খুঁজে পেয়েছে প্রকাশ-ক্ষমতার সপ্রতিভ বিচ্ছুরণ, স্বতঃস্ফূর্তি, সত্য এবং নির্দিষ্ট মুহূর্তের উপযোগী অভ্রান্ত কর্মের পূর্ণতা—এ-সবকিছুরই সমন্বয়, যা কিনা একাধারে নিষ্পাপ শিশুর ও সুকৃত শিল্পীর ভূষণ, যার নাম সততা। রবিশঙ্কর তাদের কাছে —শুধুমাত্র শিল্পীর সত্তারই নয়, তাঁর পূর্বপুরুষদের অফুরন্ত অভিজ্ঞতা ও ধ্রুবনিষ্ঠ প্রচেষ্টা সম্ভূত এক সাধনায় আত্মনিবেদনের এবং সেই সাধনার পুরোহিতের মতো।...তরুণ যারা একাগ্র মনে একান্ত হৃদয়ে রবিশঙ্করের শিল্প-সাধনায় নেমেছেন, তাদের সামনে রবিশঙ্কর তুলে ধরেছেন এক তাৎপর্য, রসাতলের বিশৃঙ্খলার বদলে প্রতিষ্ঠা করেছেন সৃষ্টির শৃঙ্খলা, কাজে নিবেদিত অন্তরে ধর্ম-সাধনের, আত্ম-সংযমের বিশ্বাসের মূলগত চরম মূল্যবোধে ও মানব-জীবনের মূল্যবোধে তিনি সঞ্চার করেছেন সঞ্জীবনী শক্তি।"

দেশের দুর্দশা নিয়ে যারা ব্যবসা করেছে, দেশের নাম ভাঙিয়ে ইওরোপ অ্যামেরিকায় যারা 'কামযোগ' শেখাচ্ছে, ভারতীয় সংস্কৃতির নামে যারা কুৎসিত, বিকৃত রুচির আচরণ প্রচার করছে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগতভাবে রবিশঙ্করের অভিযোগ না থাকলেও তাঁর বিবেকে এই নিয়ে কম দ্বন্দ্ব জাগেনি। এইসবের পরিবর্তে অসুখী অশান্ত জিজ্ঞাসু পশ্চিমের যুব-মনের সামনে তিনি তুলে ধরেছেন সনাতন ভারতের সমৃদ্ধির বাণী তাঁর সংগীতের মাধ্যমে। শিল্পী রবিশঙ্কর বলেছেন এই গ্রন্থে, "কত সময়ে আমিও সমাচ্ছন্ন বোধ করেছি ঘৃণা, ঈর্ষা , মাৎসর্য, সংগ্রাম, অসুন্দরের সামনা-সামনি, অথচ এসব তো আমাদের পৃথিবীর অঙ্গ এখন। আমি চেষ্টা করি সুন্দরের ও মঙ্গলের আওতায় জীবনযাপন করতে; যা কিছুই অবাঞ্ছিত বোধ-তরঙ্গ সৃষ্টি করে, সঙ্গে সঙ্গে তা আমায় শতহাত দূরে ঠেলে দেয়। দীর্ঘ বছরের দুরূহ প্রয়াসে, গুরুর প্রসাদে আমি নিজের অন্তরে এক সৌন্দর্য ও আধ্যাত্মিক শক্তি গ'ড়ে তুলতে পেরেছি : যখনই ইহজগতের রূঢ়তা আমায় বিষণ্ণ করতে চায়, আমি ফিরে দাঁড়াই, অন্তর্মুখী। এত বছর ধ'রে এই যে আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য আমি সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেছি, আমার সংগীতের মাধ্যমে তাকেই চাই আমি প্রকাশ দিতে, আমার শ্রোতাদের মধ্যে তাকে বিলিয়ে দিতে।"

১১ই নবেম্বর পারীর বিপুল প্রেক্ষাগৃহে একটিও আসন ফাঁকা ছিল না রবিশঙ্করের বাজনার সময়ে। এবং রবিশঙ্করের উদ্ভাবিত রাগ (প্রভাতী) 'পরমেশ্বরী' শেষ হবার পরে যে নিথর নীরবতা বিরাজ করছিল করতালির সহর্ষ উৎসরণের আগের পঞ্চাশ সেকেণ্ড ধরে তা আমায় স্পষ্ট বলে দিল যে রবিশঙ্করের অন্তরের সেই সৌন্দর্য-জগতের অংশীদার হবার মতো শ্রোতা এতদিনের পরিশ্রমের শেষে স্বয়ং রবিশঙ্করই গ'ড়ে তুলেছেন।

রবিশঙ্করের প্রতিভা মাঝ-আকাশের অপ্রমেয় দ্যুতি অক্ষুণ্ণ রাখবে এখনো বহু বছর, কারণ, বিশ্ব-পর্যটক তিনি, আকাশের সূর্যের গতিপথ ধ'রে যান্ত্রিক কালের পরিক্রমায় ধনাত্মক বিজয় তাঁর অজ্ঞাত নয়।

*

মোরয়মের মার্কিন স্বামী স্কট ফুলম্যান শিল্পী। এখন পণ্ডিচেরীতে থাকে। নীস্ থেকে মেরিয়ম পারী এসেছিল। তার সঙ্গে সাক্ষাতের স্থান নির্দিষ্ট ছিল সরবোন্-এর কাছে, বুলভার সাঁ-মিশেলের একটি কাফে'য়। মেরিয়মের আসতে তখনো মিনিট দশেক দেরি। পিছন থেকে হঠাৎ পুলক-কণ্ঠ ডুকরে উঠল, "আরে Guhyapakva !" এমন নিভেজাল সংস্কৃত উচ্চারণ সারা ইওরোপে একমাত্র স্লাভ-ঘরোয়ানার জিভেই সম্ভব। এবং গোটা ইওরোপ চ'ষে ফেললেও এমন মধুর সম্ভাষণ ভ্লাদিমির ছাড়া কারো

কাছ থেকে পাব না জেনে পাভ্‌লভ সায়েবের সারমের বাঙ্ময় হয়ে উঠল আমার রসনায়, "দোপ্রদেলে, দোব্রী দেন্‌?"

গৃহাগতকের অনুরূপ চেক্‌ সম্ভাষণ এই দোপ্রদেলে। আমাদের বিশু খুড়োর থিওরি ছিল, নতুন ভাষা শিখতে গেলে আগে-ভাগে-কণ্ঠস্থ করতে হবে তার খিস্তিগুলো; খুড়ো তাই তামিল শেখে "মান্ডু-মাচ্যাঁ, কুপ্পুকেটে" দিয়ে। (অবশ্য শেষ পর্যন্ত কাম্বনের রামায়ণ অবধি খুড়ো পেৌঁছেছিল কিনা খবর রাখিনে।) ভ্ল্যাদিমিরেরও থিওরি তাই। অগত্যা আমাদের খিস্তি-বিনিময় শুরু হয়েছিল চেক ও সংস্কৃতে। এমন ডেঁপো ছেলে কম দেখেছি : একসঙ্গে একোল নর্মাল সুপেরিয়্যর এবং ডাক্তারি পড়ছিল সে পারীতে! দেশে স্থাপত্য-শিল্পের ডিপ্লোমা নিয়েছিল। পারী থেকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে যখন-তখন প্রাগ্‌-মুখো মোটরে চেপে বসত ভ্ল্যাদিমির পারীর পুবের অটোরুটের মুখে। মাস-দেড়েক আগে রাত একটায় ধূমকেতুর মতো আমার ঘরে ভ্ল্যাদিমিরের আবির্ভাব, "চললাম দেশে, আর ফেরা হবে না। আবার দেখা হবে, যদি তুমি প্রাগে আস।"

সেই ভ্ল্যাদিমিরকে সশরীরে বুলভার স্যাঁ-মিশেলে আবার এবং এত শীঘ্র দেখতে পাব ভাবিনি। তাই খুশী হলাম। ৩১শে অক্টোবর ওর পাসপোর্টের মেয়াদ ফুরিয়ে যাবে এবং আর পাসপোর্ট পাবে না ব'লে হুট ক'রে ও সাধের পারী দেখে যাচ্ছে জন্মের মতো।

"পরশু তিরিশে দুপুরে আমরা গাড়ি ক'রে প্রাগ যাচ্ছি। যাবে?"

"গাড়ি কার? ব্যানার্টারের?"

"দুটো গাড়ি। ব্যানার্টারের এবং আমার বান্ধবী দানিয়েল তাইয়াঁতে'র; জায়গা অনেক আছে। চাও কি সঙ্গে আরো আসতে পারে।"

অগ্রজ রথীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে এবং সম্প্রতি সে পারী এসেছে। মনে পড়ল তার কথা। এবং আমাদের বান্ধবী দানিয়েল রোক'এর কথা। লাফিয়ে উঠল ভ্ল্যাদিমির। "কুছ পরোয়া নেই। কাল সকালে তা' হলে কথা পাকা হবে চেকোস্লোভাকিয়ার কনসুলেটে। ইদে তো?"

জবাব দিলাম, "দোব্রে।" (এই ভাষায় আমার বিদ্যে ইয়েস-নো-ভেরি গুড্‌ এই সীমিত হলেও ডাঁট যাবে কোথায়?)

পরদিনের ব্যবস্থা অনুযায়ী, তিরিশে দুপুরে তাইয়াঁতে'র গাড়িতে রওনা হল ব্যানার্টার, ভ্ল্যাদিমির, ফ্রাঁসোয়াজ ও তাইয়াঁতে। এবং ব্যানার্টারের গাড়ি হাঁকিয়ে ৩১শে রওনা হলাম বড়দা, দানিয়েল রোক, আমি। আমাদের চেক্‌ বন্ধু কারেল এসেছিল দেখা করতে; ওর বাবা-মা-ভাইয়েদের জন্য কিছু 'সন্দেশ' দিয়ে গেল। ওর আসল নাম কারেল নয়; নানা কারণে এই নাম ব্যবহার করছি, বিশেষত সম্প্রতি ওর বাবাকে চেক কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব থেকে ইস্তাহার দিতে হয়েছে যখন।

আজকের চেক তারুণ্যের দুটি রূপ এই কারেল ও ভ্ল্যাদিমিরের মধ্যে দেখেছি। কারেলের কল্যাণেই আমার ভ্ল্যাদিমিরের সঙ্গে আলাপ। এবং কারেলের সঙ্গে আলাপ বিচিত্র এক পরিবেশে। কলকাতার কোলে যেমন যাদবপুর, তেমনি পারীর কোলে নাঁতের বিশ্ববিদ্যালয়—যার ছাত্ররা ছিল গত বছরের খন্ড-বিপ্লবের মূলে। ওই উগ্র বামপন্থী ছাত্রদের মধ্যেই আছে একদল ঈশ্বর-বিশ্বাসী ছাত্র-ছাত্রী, যারা নিয়মিত পুজো-আচ্চা বাইবেল পড়া ইত্যাদি চালু রেখেছে। যদিও ক্যাথলিক ধর্মমতেই ওদের ঈশ্বর-ধারণা সীমাবদ্ধ, তবু শুষ্ক নাস্তিক ও সংশয়বাদী অস্তিত্বের অন্ধকার পার হয়ে ওরা ফিরে পেয়েছে যে ভক্তির ও প্রেমের আস্থা, তা আমায় যেমন স্বস্তি দেয়, তেমনি ওদের অকুণ্ঠ সখ্য ও সমীহ আমি লাভ করেছি আমার আশৈশব অনুসৃত জীবন-দর্শনের খাতিরে।

নাঁতের দলের জেরার্‌ ও ক্রিস্তিয়ান পরস্পরকে ভালবেসে যখন বিয়ের সিদ্ধান্ত নিল, বরযাত্রী হয়ে আমরা গেলাম ব্রতাঁঞ সমুদ্রকূলে ক্রিস্তিয়ানদের গ্রামে। সেই যাবার দিন, গাড়ি ছাড়ব ছাড়ব, হঠাৎ স্পোর্ট-স্যুট পরা পুরু-চশমা আঁটা কারেল এসে উপস্থিত, "তোমরা ক্রিস্তিয়ানের বিয়েতে যাচ্ছ? জায়গা হবে?" দেড়শ' মাইলের উপর পথ অপরিচিত এক ছোকরার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যেতে হবে, ভেবে একটু বিরক্ত হয়েই আমরা জায়গা ক'রে দিলাম। খানিক বাদে কারেল কথা পাড়ল, ও চেক, ব্যানার্টারের সহপাঠী (গণিতের উপর-মহলে ওদের আনাগোনা)! শুনে আমি কেতার্থ বোধ করলাম। কারণ সাধারণত গণিত ও বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীর কলুর বলদ চেহারা আমায় বরাবর পীড়া দিয়েছে। এদেশে তার ব্যতিক্রম যদিও যথেষ্ট দেখেছি। ব্যানার্টার যেমন, এক নাগাড়ে এদেশী নিধুবাবু-হরু ঠাকুর-ভারতচন্দ্র থেকে শুরু ক'রে স্বদেশ-প্রেম, আধুনিক, ধ্রুপদী সবরকম গান তিন-চার ঘণ্টা অবলীলাক্রমে গাইতে পারে গীটারের সঙ্গতে। অত্যন্ত বিনীত সুরে কারেল জানতে চাইল, আমি ভারতীয় কিনা। শুনে খাড়া হয়ে বসল কারেল। চকচক করতে লাগল ওর চোখ। নিচু গলায় ইতস্তত ক'রে বলল, "নিজের চেষ্টায় কিছুদিন হল সংস্কৃত শিখছি। উচ্চারণ মক্‌শো করছি জার্মান বই থেকে। আপনার অসুবিধে না হলে পারী ফিরে গিয়ে মাঝে মাঝে আমায় যদি একটু তালিম দিতেন—"

"কই দেখি, কিছু মুখস্থ করেছেন?"

আমার চোখ গোল-গপ্‌পো বানিয়ে কারেল সপ্রতিভ অথচ রস-মুগ্ধ ছন্দে 'তস্মিন্নদ্রৌ কতিচিদ্‌ অবলাবিপ্রযুক্তঃ স কামী/নীত্বা মাসান কনকবলয়ভ্রংশরিক্ত প্রকোষ্ঠঃ' আবৃত্তি ক'রে একেবারে ভেনি-ভিদি-ভিকি স্কোর করল। এবং পারী ফিরে তারপরে এই অজ্ঞ ব্রাহ্মণ-কুলাঙ্গারের সঙ্গে সংস্কৃতই শুধু নয়, বাংলার চর্চাও কম করেনি কারেল। টেপ-রেকর্ডারের বাংলার পাঠ ওর জন্য যে রচনা ক'রে দিয়েছি ব্যালিংস কোম্পানি একদিন তা ভাঙিয়ে দু' পয়সা করে নিতে পারবে।

ব্যানার্টারের দোফিন গাড়ি পক্ষীরাজের জেঠাইমা : গতর দুলিয়ে পান চিবুতে চিবুতে বেতো প্রত্যঙ্গের বেদনা সামলাতে যায় তো চোখের ঠুলি তখন 'ওই গেল ওই ধরু' খিটকেল বাধায়। ওই বাহনে সওয়ার হয়ে পারী ছাড়তে ছাড়তে আমাদের বেলা তিনটে প্রায় বাজল। অবশেষে যখন ফরাসী-জার্মান সীমান্তে পেঁৗছলাম, সারব্রুকে রাত কাটাব ভেবে, এদেশী নিয়ম অনুযায়ী ভোর তখন পোনে একটা। ফরাসী শুল্ক-বিভাগে ছোকরা-পানা এক অফিসার রাত্রি-জাগরণের মতো বিরক্তিকর কর্তব্য পালন করছিল স্থানীয় একটি পত্রিকার সদ্য-প্রকাশিত সংস্করণ থেকে মুখরোচক অংশ-গুলি প'ড়ে। আমাদেরও সরিক মেজাজের নমুনা দেখে বেচারায় ফুর্তির প্রাণ গড়ের মাঠ দেখা গেল। চেকোস্লোভাকিয়া যাচ্ছি পয়লা নভেম্বরের (Toussaint) ছুটিতে, সোমবার ফিরে আসব শুনে রসিকতা করল। রথীন্দ্রনাথের ছোট-বাইরের প্রয়োজন শুনে বলল, "ফরাসী চৌহদ্দিতে করতে চান, নাকি জার্মান এলাকায়?" "যাবার আগে ফরাসী দেশের ঋণ এধারেই শোধ ক'রে রেখে যাই।" জবাব দিল রথীন্দ্রনাথ। "ঠিক আছে। তার আগে দাঁড়ান এক মিনিট, আমার জার্মান সাকরেদকে আপনাদের নামগুলো পাঠিয়ে দিই।"

টেলিফোন তুলে নিল, "কিরে, ঘুমুচ্ছিস নাকি? এই নে, তিনটে নাম।" পাশেই আন্তর্জাতিক সংকেতের তালিকা টাঙানো ছিল ভাগ্যিস, নইলে পরবর্তী শব্দগুলোর হাট্টিমাটিম্‌টিমে ঘেবড়েই যেতাম। বড়-হাতের অক্ষরগুলোর দিকে নজর রাখলেই এই হেঁয়ালি মালুম পড়বে : "প্রথম নাম : Romeo, Oscar, Charlie, Hotel! Romeo, Juliette, Echo, Echo; দ্বিতীয় নাম : Mike, Uniform, Kilo, Hotel, Echo,

তৃতীয় নাম—দ্বিতীয়ের মতো!"— প্রাণ-খোলা হাসির মধ্যে দিয়ে শুল্ক-বিভাগের বেড়া টপকে আমরা পেঁৗছে গেলাম ডয়েচ্‌ মার্কের দেশে।

১লা নভেম্বর সারব্রুকে প্রাতরাশ সেরে জার্মান অটোবান্‌ ধ'রে মানহাইম অভি-মুখে রওনা হলাম। জার্মানীতে এই প্রথম আসা নয়; কিন্তু জার্মান কুয়াশার সঙ্গে

এই প্রথম পরিচয় : এত ঘন কুয়াসা ফ্রান্সে দেখিনি। ঘণ্টা-দেড়েকের মধ্যে যখন সূর্য চু' মারল আমাদের তন্দ্রিল করতে, একটু চাঙ্গা হওয়া গেল। মানহাইম হয়ে হাইডেলবার্গের প্রসিদ্ধ শোভা দেখতে গিয়ে বেলা বেড়ে যাচ্ছে : ইচ্ছে ছিল হাইডেলবার্গে অধ্যাপক কৃষ্ণ রাজাজ মশাইকে হঠাৎ গিয়ে চমকে দেব, এবং তাঁর পরামর্শ নেব, আউটোবান ছেড়ে নুরেনবার্গ যাবার কোন শর্টকাট আছে কিনা। কৃষ্ণজীর বন্ধঘরের দরজায় "এসেছিলাম। চলে যাচ্ছি" লেখবার সময় ভাবলাম হয়তো বা উনিও এমন ছুটির দিনে প্যারীতে আমার ঘরের দরজায় চিরকুট রাখছেন। ফ্রাঙ্কফুর্টের দিকে গাড়ি ছুটিয়ে দেওয়া গেল আর বিলম্ব না করে।

ফ্রাঙ্কফুর্টের বেশ খানিক দক্ষিণে ডার্মস্টাট থেকে আসাফেনবুর্গ অবধি একটা গৌণ সড়কের সন্ধান মানচিত্রে পেয়ে নেমে পড়া গেল রাজপথ থেকে। হেমন্তের সোনা রোদে সোনালী ঝরাপাতার রাশি বনভূমিতে কী যে সুন্দরের সমারোহ রচনা করেছে, স্বচক্ষে না দেখলে অনুমান করা কঠিন। সোনায় সোনায় লক্ষ্মীমন্ত বনস্পতিদের নীরব আপরাহ্নিক বৈঠকে আমাদের মনে হল অনধিকার প্রবেশ ঘটেছে। পক্ষীরাজের ক্লোঠিমা পর্যন্ত তাঁর বপু নিয়ে বেশি হাঁসফাঁস করা বেমানান হবে, টের পেলেন বুঝি : প্যারীর উপকণ্ঠে ফঁতেনব্লোর বনভূমিতেও এই ধরনের সোনা-হেমন্ত চেহারা আমার আনন্দের কারণ হয়। কিন্তু জার্মান এই বনভূমিতে আরণ্যকতা যেন আরও আদিম, আরও ধ্যানগম্ভীর। আরো বেশি সুরস্রষ্টা-কবি শিল্পীর নিশ্বাসে সুরভিত মনে হল এই পথ।

নুরেনবার্গ পর্যন্ত আবার ফেমে বাঁধানো মসৃণ আউটোবান্। জার্মান সীমান্তে পৌঁছনোর আগে হ্যাসব্রুকে নেমে দশ মার্ক দিয়ে তিনজনে যে সান্ধ্যভোজ সম্পন্ন করলাম তা অকল্পনীয়। ফরাসী ফ্রাঁর মূল্য হ্রাস, জার্মান মার্কের পদোন্নতি ইত্যাদির ফলে শ' ফ্রাঁ দিয়ে মাত্র পাঁয়ষট্টি মার্ক পেয়েছিলাম আমরা; ভাগ্যক্রমে ফ্রান্সের চেয়ে পেট্রোল জার্মানীতে সস্তা এবং স্টেশন অনুযায়ী লিটারের মূল্য চুয়ান্ন থেকে উনষাট প্ফেনিষ্ (পেনী), তারতম্য হিসেব-নিকেষ করেও আমাদের পকেটে তখন মা ভবানী কম্পিত লড়ছেন। ভয়ে ভয়েই খেতে বসেছিলাম, কিন্তু সুস্বাদু, সবজীর স্যুপ, শাসলিক (নয়তো সাওয়ারক্রাউট বা ফরাসীতে যাকে বলে শুক্রুৎ : আলু-বাঁধাকপির সিদ্ধ তরকারিতে তৃতীয় অবতারের সসেজ) আর রুটি খেয়ে, গ্রাম্য ওই সরাই থেকে বার হয়ে পথে লোকজন নেই দেখে ঠাণ্ডায় ঠকঠক করে কাঁপছিলাম, অথচ ফ্রান্সে তখনো সন্ধ্যার হাওয়া উপভোগ্য, দেখে এসেছি। মহাসুখে দেড়বিঘৎ লম্বা উদ্গার তুলে নিজের কানকে নিজেই প্রবোধ দিলাম, "বেশ খেলাম!" কৌতূহলী ভোজনরসিকের জ্ঞাতার্থে শাসলিক বস্তুটির বর্ণনা দিই। যত দূর জানি রুমানিয়া যুগোস্লাভিয়ার দিকে এই ধরনের শিক-কাবাবের প্রচলন খুব বেশি : মাংসের টুকরোর ফাঁকে ফাঁকে পেঁয়াজ, আনারসের টুকরো প্রভৃতি দেওয়া এবং অম্ল-মধুর নানা ধরনের ঝালচাকজাতীয় প্রলেপ তার উপরে, মায় ভাজা-মসলার গুঁড়োর মতো কিছু একটাও স্থান-বিশেষে আবিষ্কার করা সম্ভব।

ভাইদহাউসে সীমান্ত পার হয়ে চেকোস্লোভাকিয়ার মাটিতে পা দিয়ে পক্ষীরাজের জ্যোঠিমা কঁকিয়ে উঠলেন। তাঁর পদসেবা করে "প্রাগ আর মাত্র কয়শ' কিলোমিটারের পথ গো" ইত্যাদি বুঝিয়ে সুঝিয়ে আবার রওনা হলাম। কিন্তু পথের দুর্দশা দেখে আমাদের দাঁত আর সাহস কুলাচ্ছিল না অত রাতে বার বার চোখ কচলে গাড়ীপথ হাৎড়ে প্রাগে হাজির হবার। প্রায় একনাগাড়ে হাজার মাইলের মতো পথ জ্যোঠিমার সঙ্গে একাহাতে লড়তে লড়তে বড়দার হাড়গোড়ের কি দশা হয়েছে আন্দাজ করতে পারছিলাম এবং দু'জনেই আমরা তাজ্জব হচ্ছিলাম ওর স্নায়ুবল দেখে।

অবশেষে ভোর চারটেয় যখন প্রাগ পৌঁছলাম, ঠাণ্ডায় ক্লান্তিতে দেহ-মন কেমন যেন কিম্ভূতকিমাকার হয়ে গিয়েছে বোধ হল। অত রাতে আর হোস্টেল ডরমিটরির তল্লাস না করে ভালয় ভালয় একটা হোটেলে ঢুকে পা তেলে ঘুমিয়ে পড়বার মতলবে কাঠখড় পোড়াতে গিয়ে দেখি, কোনও হোটেলে জায়গা নেই। দানিয়েল রুশ ভাষা-সাহিত্য নিয়ে পড়াশুনো করে বিশ্ববিদ্যালয়ে। চেকভাষী হোটেলওয়ালারা আমাদের ফরাসী ও ইংরেজি বুঝছে না ভেবে রুশ ভাষায় একটি হোটেলে দৈবাৎ ঘর চাইতেই হিতে হল বিপরীত। অসহায় তিনটি বিদেশী তরুণ ওই ভোররাতের হিমে কাঁপতে কাঁপতে প্রাগের পথে পথে হোটেলের ব্যর্থ অন্বেষণে যে কি বেগ পেতে পারে, ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ জানবে না। গাড়িতে তেল নেবার প্রয়োজন। কোন স্টেশান খোলা নেই। কোন মতে একটি স্টেশন খোলা পেয়ে তেল নিয়ে জিগ্যেস করলাম, কোন হোটেলের সন্ধান জানে কিনা; আমাদের পক্ষীরাজের জ্যাঠিমার প্রলেটারিয়েট চেহারা থেকে কি বুঝল বলা বাহুল্য, তবে অভদ্র অঙ্গভঙ্গীতে যা বোঝাল, তাতে সাধ্য থাকলে আমরা ওই রাতেই ফিরে আসতাম প্রাগকে ছেড়ে ঠুকে।

হোটেলের দরজায় দরজায় ঘুরতে ঘুরতে হোটেল এসপ্ল্যানেডে ঢুকলাম। "এক রাতের জন্য ঘর চাই—" "আসুন, আসুন!" বলে রিসেপশনিস্ট আপ্যায়ন করল। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি ভদ্রসন্তানও হোটেলের তরফ থেকে আমাদের তোয়াজ শুরু করলেন। যথেষ্ট নাটকীয় হাবভাবে ঘর পেয়েছে, অমুক অমুক নম্বর, এত ক্রাউন পড়বে, ইত্যাদি বুঝিয়ে দিল রিসেপশনিস্ট। মূল্য দেখে চক্ষুস্থির হবার উপক্রম আমাদের। ফোড়ে-মশাই ফোড়ন দিলেন, "এসব ভাল হোটেলে খরচ একটু বেশি হবেই। তবে একটা রফা করা যায়। ফ্রান্স থেকে আসছেন, সঙ্গে ফরাসী মুদ্রা নেই? দিন না একশ' ফ্রাঁর নোট। নগদ আপনাদের পাঁচশ কুরোন (ক্রাউন) দেব। এ থেকে হোটেলের খরচ, স্নান, প্রাতরাশ প্রভৃতি মিটিয়েও দেড়শ' ক্রাউনের মতো হাতে থাকবে।" সরকারী মুদ্রা বিনিময়ের হার অনুযায়ী একশ' ফ্রাঁতে প্রায় আড়াইশ' কুরোনু দেবার কথা। অর্থাৎ এটি কালো টাকার হাতছানি। আমরা তাড়াতাড়ি পাঁয়ষট্টি মার্ক দেখে ফোড়ে-সাহেব পিছু পিছু বাইরে এসে বললেন, "দরদামে আমি একশ' ফ্রাঁর জন্য আটশ' কুরোন পর্যন্ত দিয়ে থাকি। কিন্তু এখন মেরে-কেটে সাড়ে ছয়শ'র বেশি পারব না।" শরীর আর বইছে না, তবু পাড়ি দিতে হল।

ভোর পাঁচটার প্রাগ শহরের নগররূপ— পণ্যনারী, সমকামী, দালাল— রাতের প্রাগের লালায়িত চেহারা আমাদের চোখে বিভীষিকার মতো লেগে থাকলেও পরদিন দুপুর থেকে সঙ্গীদের সন্ধান পেয়ে অবধি দুটো দিন কাটল চেকোস্লোভাকিয়ার মানুষদের আন্তরিক চেহারার সান্নিধ্যে। ছাত্রমহল, শিল্পী, রাজনীতিবিদ, পথচারী অচেনা মানুষ সবার সঙ্গে আলাপ করেছি অবাধে। ফরাসী ইংরেজী, ভাঙা জার্মান, এমন কি দৈবক্রমে স্প্যানিশ পর্যন্ত। প্রথম দিন সন্ধ্যায় কারেলের বাবা-মা আমাদের অভ্যর্থনা করলেন ঘরে তৈরি নানা রকম মিষ্টি এবং আপেলের রস দিয়ে। তারপরে গেলাম আমরা দুর্গ দেখতে। চত্বরের মাঝামাঝি ফোয়ারা দেখে ফ্রাঁসোয়াজ একটু জিরিয়ে নেবে বলে বসল। এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক যেতে যেতে এক মুহূর্ত থেমে দাঁড়িয়ে কিছু মন্তব্য করলেন। জার্মানে বললাম, আমরা চেক বুঝি না। ম্লান হেসে জার্মানে উনি জবাব দিলেন, "বিদেশী? প্রাগ দেখতে এসেছ? দেখে যাও : সারা চেকোস্লোভাকিয়ার লোকে আজ হাসতে ভুলে গিয়েছে।..." হনহন করে ভদ্রলোক মিলিয়ে গেলেন রাতের অন্ধকারে। মনে হল, আমরা অল্পক্ষণের জন্য ফিরে গিয়েছি রাজ্যহান বিপ্লবের যুগে, অথবা ভিশীতন্ত্রের আমলে ফ্রান্সের হৃত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের প্রস্তুতি -লগ্নে।

সর্বত্রই অভিযোগের ছাই-চাপা আগুন, সর্বত্রই কেমন যেন এক সন্ত্রাসের ছায়া। পথে ঘাটে। সিনেমা হলে প্রচারধর্মী ছবির মধ্যে মারেশাল পেতাঁর চেক সংস্করণ

কোনও নেতার ছবি দেখলেই দর্শকদের প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের ধ্বনি মুখর হয়ে ওঠে। হেমন্তের বিষণ্ণ আত্মা প্রত্যক্ষ করলাম জল্‌ভাভা নদীর পুলের উপরে দাঁড়িয়ে। ওয়েস্টমিনস্টারের ব্রিজ থেকে আজও কষ্ট-সৃষ্টে ওয়ার্ডসোয়ার্থের 'Earth has not anything to show more fair' স্মরণ করা চললেও, প্রাগ আমায় কোন সান্ত্বনাই দিতে অপারগ মনে হল। ছাত্রদের মধ্যে অসন্তোষ : শোনা গেল নতুন বছরে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার আগে দস্তখত লিখে ঢুকতে হবে, "বর্তমান চেকোস্লোভাকিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতি দেশের ও জনগণের মঙ্গলের জন্য অপরিহার্য বলে আমি মানি!" এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করবার ক্ষমতা যে ছাত্রেরা রাখত, তাদের অনেকে বিচারাধীন বন্দী হয়ে আছে অনির্দিষ্ট কালের জন্য, নয়তো বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার নামে ঘানি ঘুরিয়ে কালঘাম ছুটোচ্ছে। আমি পুঁজিবাদকে যেমন অস্বাস্থ্যকর মনোবৃত্তির ফল বলে মানি, তেমনি আমার মন অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে যখন শক্তের অপরাধে কোথাও কোনখানে বিচারের বাণীকে চোখের জল ফেলতে দেখি। জনতন্ত্রের শাসন-পদ্ধতিতে ত্রুটির যেমন অভাব নেই আমি জানি, তেমনি সাম্যবাদের একাধিপত্য নিয়ে কোন রাষ্ট্র কোথাও মানুষের নিত্য অধিকারকে খর্ব করছে দেখলে বিপ্লবের সমার্থক বামপন্থী নীতির প্রতি আমার অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা কেমন যেন টলে ওঠে। প্রাগে প্রথম রাত্রিতে যে ঘৃণ্য মনোভাবের পরিচয় বারেবারে পেয়েছিলাম, তার হেতু পেলাম অন্য দুদিনের ঘনিষ্ঠ দৃষ্টি-নিক্ষেপে। মানুষের আত্ম-মর্যাদার বিলোপ হচ্ছে বাইরে থেকে আসা এই মমত্ববোধহীন চাপে। অন্যদিক থেকে নতুন প্রস্তুতির প্রতিশ্রুতিকে শিকের টাঙিয়ে রাখবার দিন শীঘ্র ফুরিয়ে যাবে আমার অনুমান। পূর্ব ইওরোপের সর্বত্র সাময়িক-ভাবে যেন প্রগতির যৌবনে ভাটা পড়েছে; মস্কোও যেন নতুন নীতির সন্ধান করছে। যে অত্যাচার যে-পীড়ন যে-শোষণের বিরুদ্ধে এই শতকের সূচনা থেকে মানবতার পুরোগামী নেতারা সংগ্রাম ঘোষণা করে-ছিলেন, তাঁদের পতাকা হাতে নিয়ে তাঁদের আদর্শ-বিরোধী কোনও হঠকারিতার পুনরাবৃত্তি আমাদের সমসাময়িক বা অনাগত কালেও কোনভাবে যেন না ঘটে, এই প্রার্থনা আমাদের নিশ্চয় উত্তীর্ণ করবে সভ্যতার নিত্য নূতন সংকটের মুহূর্তে। প্রাগ আমায় এ কথা শেখাল।

প্রাগ থেকে রওনা হবার আগের রাতে একটি সরাইখানায় দল বেঁধে হানা দিয়ে-ছিলাম। মনমতো দু-চারটি ইয়ার-বন্ধু নিয়ে এখানে আসেন তরুণ-তরুণী, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ-বৃদ্ধারাও। বাইরের আবহাওয়ার শৈত্য ও গ্লানি ভুলে যান এঁরা বিয়ারের ভৃঙ্গার হাতে নিয়ে। প্রত্যেকে আমরা পৃথক পৃথক পদ বেছে নিয়ে ভাগাভাগি করে খাচ্ছিলাম। কোপ্তা, কাবাব, বেগুনের ঘণ্ট, হ্যানা ত্যানা খেতে খেতে আমার মায়ের সামনে রান্নাঘরে পিঁড়ি পেতে বসে খাওয়া এটা-সেটার কথা মনে পড়ছিল। যে মাসীমাগোছের ভদ্রমহিলা পরিবেশন করছিলেন, তাঁকে বললাম, "তো মি পৃংস্রিপোমিনা মৌ জোমি" (আমার বড় মনে পড়ছে ঘরের কথা)! "বাছারে! তোমার দেশ কোথায়?" ভ্লাদিমির ভাগ্যিস সঙ্গে ছিল দোভাষণের ভূমিকায়। খাওয়া-শেষে মাসীমা আমায় ফাউ এনে দিলেন একটি মিষ্টি। ব্যান্ডের ততক্ষণে গান ধরেছে। ফ্রাঁসোয়াজ গাড়ি থেকে কখন গীটার এবং দানিয়েল আমার বাঁশি নিয়ে এসেছিল খেয়াল করিনি। 'ৎস্রিস্তা-ৎস্রিয়েৎ-ৎস্রি! (তিনশ-ত্রিশ-তিন : চেক উচ্চারণের এক দুরূহ নমুনা) হুংকারে আমরা আসর জমালাম। আমাদের দলের বাইরে যাঁরা, তাঁরাও গুটি গুটি সরে এলেন, যোগ দিলেন আমাদের গুলতুনি-কেন্দ্রে। ভ্লাদিমিরের বন্ধু একজন পেশাদার জ্যাজ-ট্রাম্পেটিস্ট দলে ছিলেন। তাঁর পরেই কোপ পড়ল আমার ঘাড়ে। মনে বড় দ্বিধা ছিল, আমার বাঁশের বাঁশি ওই উত্তেজিত সংগীত-আসরে যদি কোন প্রতিধ্বনি না তুলতে পারে। ছুটকো এক-একটা গৎ যেমন যেমন মনে আসছিল, খেয়াল-খুশিমত তান কর্তব মেরে তাল বদলে বাজাতে বাজাতে প্রশান্ত বিলম্বিত একটা কিছু রাগে পৌঁছে গিয়ে-ছিলাম। মন বলল, এবারে থামি!... সবারই মুখে তৃপ্তির ছাপ ও সমবেত করতালি আমায় আশ্বস্ত করল। পেশাদার শিল্পী ভাঙা ইংরেজীতে তারিফ করলেন, "Born Jazzman!" বড়দা টিপ্পনি দিল বাংলায় "বাহা রে আশুতোষ!"

*

বুদ্ধ বড়ুয়া (বাসবকুমার) যখন তাঁর নিপুণ সুমার্জিত হাত দুটি দিয়ে চাকের পাশে দাঁড়িয়ে চেপে ধরেন আকারবিহীন মাটির তাল, বনেদী বুদ্ধিদীপ্ত মুখমণ্ডলে ও'র যে তন্ময়তা ও সংকল্প জ্বলে ওঠে, তার উত্তাপ উপভোগ করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। ১৯৩৬ সালে কলকাতায় জন্মে অবধি গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কলকাতা, লণ্ডন, গোয়াট বাই টুন (সুইৎ-জারল্যাণ্ড), বরোদা, পারী—বহু জায়গায় তিনি মৃৎশিল্পে হাত পাকানোর ও অধ্যাপনার অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। যত দূর জানি, ও'র সহধর্মিণী নিকোল-এর সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয় বরোদাতে—নিকোল যখন ফরাসী পড়াতেন ওখানে। পারীর উপকণ্ঠে ছোট্ট শহর স্যাঁ-জ্যারম্যাঁ-আঁ-লেতে বড়ুয়ার স্টুডিও থেকে মৃৎশিল্পের যে নমুনা বার হয়, তা বহু আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে প্রশংসা অর্জন করেছে।

গত ১৮ই নভেম্বর আমাদের রাষ্ট্রদূত শ্রীদ্বারকানাথ চট্টোপাধ্যায় বুদ্ধ বড়ুয়ার একক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করলেন পারীর নৎরদাম অঞ্চলের Galerie Saint_Jacques-এ : সনাতন ভারতীয় রীতির প্রসন্ন পরিচ্ছন্ন মেজাজের সঙ্গে শিল্পীর উদ্ভাবনী শক্তি সুন্দরভাবে নিজেকে খাপ খাইয়ে নতুন যে আঙ্গিকের স্পর্ধা রাখতে পেরেছে, প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে তা নিজে চোখে দেখলাম এবং লক্ষ করলাম যে, এই আঙ্গিকের আবেদন পরিচিত অপরিচিত কারো কাছেই উপেক্ষণীয় নয়।

বুদ্ধ বড়ুয়া যদি গেঁয়ো যোগী হতেন, কী ভিক্ষে পেতেন জানি না। বিদেশে তাঁর সমাদর আমাদের গৌরবের কারণ। সুখী গৃহস্থ বড়ুয়ার বন্ধু-বান্ধব, শ্বশুরবাড়ির সকলেই ও'র চরিত্রগুণে মুগ্ধ ও ও'র শিল্প প্রতিভার সমঝদার। এমন কি উনি যখন স্টুডিওতে কাজ করেন, দুরন্ত শিশুপুত্র আঁতোয়ান তখন এয়ারগান নিয়ে যে বাইরে পাহারা দেয়, তা বোধ হয় বুদ্ধ বড়ুয়া জানেন না।
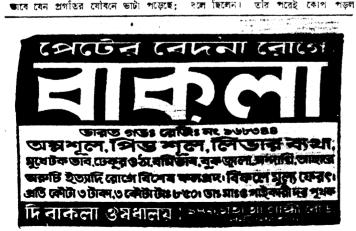
পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

এ কথার একজন শ্রদ্ধাভাজন সঙ্গীতজ্ঞ বলেছিলেন, কলকাতায় অবস্থিত সংগীত-বিদ্যালয়ের সংখ্যা এবং তাদের প্রচেষ্টা সম্বন্ধে লিখতে। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। সম্প্রতি আর একটি বিদগ্ধ সংস্থা কলকাতায় বহুবিধ সাঙ্গীতিক ঐতিহ্যের সহাবস্থান এবং বিভিন্ন সঙ্গীত-সম্প্রদায়ের অবস্থিতি সম্বন্ধে লেখকের চিন্তার উদ্রেক করেছেন। বিষয়টি চিত্তাকর্ষক সন্দেহ নেই এবং সমাজতত্ত্বের দিক দিয়েও এইরকম মূল্যায়নের একটি তাৎপর্য আছে। এতে জনচিত্তের একটা দিক বৈজ্ঞানিকভাবে নিরূপণ করা যায়, যেটি এ পর্যন্ত করা হয়েছে কিনা সন্দেহ।

অষ্টাদশ শতকের শেষ দিক থেকে কলকাতার একটা নিজস্ব রূপ গড়ে উঠেছে, আর তারই ওপর শহরবাসীদের বিচিত্র ভাবধারাও প্রতিফলিত হতে শুরু করেছে। এই সময় থেকেই বর্ধিষ্ণু গ্রামগুলি থেকে বিত্তশালী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিরা কলকাতায় একটি করে স্থায়ী নিবাস স্থাপন করতে থাকেন এবং সমাজে নানা স্তরের আন্দোলন জাগ্রত হতে থাকে। এই যে কলকাতার আকর্ষণ এ কিন্তু তখনও গ্রাম্য সমাজকে রিক্ত করেনি। গ্রামীণ সমাজের ভাবধারা এবং বোধগুলি শহরেও সমানভাবেই ছিল, তবে তাদের মধ্যে কিছুটা নূতনত্ব এসেছিল এই পর্যন্ত। দেখা যাচ্ছে এই নব্য শহর-বাসীদের পৃষ্ঠপোষকতার জন্যই তখন কবিওয়ালা, যাত্রাওয়ালা, পাঁচালীর দল, কথক সম্প্রদায়, টপ্পাওয়ালা প্রভৃতি সবই শহরে ভীড় জমিয়েছে। বড়বাবুদের বাড়িতে অথবা বারোয়ারী মজলিসে এদের অনুষ্ঠান হত সেই একই কায়দায়। শহরবাসীদের মনটা তখনও খুব একটা নতুন জিনিসের জন্য তৈরি হয়নি। আরও কিছুকাল পরে দেখা গেল একটা সংস্কারের মনোভাব দেখা দিয়েছে। যে সব সঙ্গীতসম্প্রদায় চিরাচরিত নিয়মে চলেছিল তাদের ধরণ-ধারণ পাল্টেছে। পুরাতন রীতি কিছুটা বর্জিত হয়েছে, আর নতুন রীতি অনেকটা সংস্কৃতির প্রলেপ লাগিয়েছে। কিন্তু এই সব সম্প্রদায়ের সহাবস্থানে কোনও বাধা ছিল না। তেমন কোনও দ্বন্দ্বেরও অবকাশ হয়নি। সঙ্গীতের দিক থেকে অষ্টাদশ শতকের কলকাতা একটি বৃহত্তর গ্রাম্য সমাজ ছাড়া আর কিছু ছিল না।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে দেখা গেল সঙ্গীতের যে সব বিভিন্ন সম্প্রদায় ছিল তাদের গোষ্ঠী হিসাবে ভাগ করা চলে। এই সব শ্রেণীর কোনটি নিবদ্ধ ছিল ধর্মসঙ্গীত এবং ভাবসঙ্গীতকে নিয়ে, কোনটি যাত্রা, পাঁচালী প্রভৃতি চিত্তাকর্ষক সঙ্গীতকে নিয়ে, কোনটি সদ্যরচিত কাব্যসঙ্গীত নিয়ে এবং কোনটি নিবিষ্ট ছিল হিন্দুস্তানী রাগ-সঙ্গীতের চর্চায়। এরই মধ্যে টপ্পার বিপুল সমাদর হয়েছে। আখড়াই থেকে হাফ আখড়াই তৈরি হয়েছে। ছোট ছোট গান বহুল পরিমাণে জনসমাজে প্রচলিত হয়েছে। লিরিক বা কাব্যসঙ্গীত সম্বন্ধে নতুন চেতনাটা এসেছে ঊনবিংশ শতাব্দীতে এবং এই রচনায় একটা শহরেরও বিশেষ ছাপ পড়েছে। এই সঙ্গে শহরের নিজস্ব যে সব সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে ছিল থিয়েটার, ধর্মসঙ্গীত ব্রহ্মসঙ্গীত নানারকম বাদ্য নিয়ে কনসার্ট, হিন্দুস্তানী ওস্তাদী সঙ্গীত—এই সব। কিন্তু, সব সত্ত্বেও সঙ্গীত সম্বন্ধে সকলেই একটা উদার মনোভাব পোষণ করতেন। যাঁরা ওস্তাদী গান শুনতেন তাঁরাও অবসর সময়ে যাত্রা, পাঁচালীর গান উপভোগ করতেন। সঙ্গীত সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ পছন্দ থাকলেও তেমন গোঁড়া গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়নি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বহু ক্ষেত্রে গ্রাম্য এবং শহরে প্রচলিত উভয়রীতির সংমিশ্রণ দেখা যায়। একটা যেন আপোস করা হয়েছে এইরকম ভাব। মোটামুটিভাবে এই যুগের সহাবস্থান ছিল সহনশীল যেমন ছিল এই শতাব্দীর জনগণের মনোভাব।

বিংশ শতাব্দী কিন্তু বেশ কিছু "সফিস্টিকেশন" নিয়েই দেখা দিল। পুরাতন ঐতিহ্যের বিলোপ ঘটতে লাগল ধীরে ধীরে। কবি, পাঁচালী তো বলতে গেলে উঠেই গেল; আর যা কিছু ছিল তাকে নতুন করে সাজানো হতে লাগল। এইবার আমরা দেখছি পুরোপুরি শহরের সাঙ্গীতিক সংস্কৃতি একটা সুসম্পন্ন চেহারা নিয়েছে। এরই সঙ্গে একটি নতুন চিন্তা সঙ্গীত জগতে এবং শ্রোতাদের মধ্যে দেখা দিল, সেটি হচ্ছে মূল্যায়ন। এ যুগে আমরা সচেতন হয়ে উঠেছি আমাদের সঙ্গীতগুলির গুণ এবং আবেদন সম্বন্ধে নানাবিধ বিচারে। প্রত্যেকটি সাঙ্গীতিক ঐতিহ্যকে তার অন্তর্নিহিত মূল্য নিয়ে বিচার করা হচ্ছে। শিক্ষার সাধারণ প্রচারের সঙ্গে এইরকম ঘটাই স্বাভাবিক এবং এরই সঙ্গে সঙ্গীতমহলেও বিভিন্ন গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছে যাঁরা তাঁদের মনোভাবের সঙ্গে মিলিয়ে এক এক শ্রেণীর সঙ্গীতকে অবলম্বন করে রয়েছেন। এর ভাল মন্দ বিচার করা যায়। কিন্তু সেটা এ ক্ষেত্রে করব না সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে কি ঘটেছে শুধুমাত্র সেইটুকু নির্ণয় করাই আমাদের উদ্দেশ্য। এই শতকের তিরিশ দশকে আমরা যে লোকসঙ্গীতের সমাদর দেখি তার কারণও এই বিশ্লেষণের মনোভাব। যাত্রা, পাঁচালী উঠে গেল, কিন্তু বাউল, ভাটিয়ালীর জনপ্রিয়তা বাড়ল কেন? এর কারণ লোকসঙ্গীতের যে একটা সর্বজনীন আবেদন আছে তার মূল্যকে স্বীকার করা হয়েছে। নজরুল যখন বাংলায় গজল রচনা করলেন তখনও তার বিপুল স্বীকৃতি হয়েছিল এইরকম চিন্তা থেকেই। জনসমাজ এই রচনার একটি সার্থকতা উপলব্ধি করেছিলেন। সাধারণ হিন্দুস্তানী গান বা টপ্পা তো কতই ছিল, কিন্তু জ্ঞান গোঁসাই আর ভীষ্মদেবের বাংলা রাগসঙ্গীতে লোকে কেন আকৃষ্ট হল? এরও কারণ এই নবতর মূল্যবোধ। প্রাচীন কীর্তনকে ছেড়ে লোকে কৃষ্ণচন্দ্র দের গাওয়া কীর্তনগুলির বিশেষ সমাদর করেছিল। কারণ এর মধ্যে তারা একটি নতুন আবেদন খুঁজে পেয়েছিল।

এর পরে যুদ্ধোত্তর যুগে দেখা দিয়েছে একটি বিশেষীকরণের মনোভাব। শিক্ষায় যেমন নানাবিধ বিষয়ে বিশেষীকরণের আয়োজন করা হয়েছে সঙ্গীতেও সেই চিন্তা প্রভাব বিস্তার করেছে। এর ফলে সঙ্গীত জগৎ বিভিন্ন গোষ্ঠীতে দানা বেধেছে প্রবল-ভাবে। এর একটি বিশেষত্ব হল এই যে এক গোষ্ঠী অপর এক গোষ্ঠীর প্রতি আগ্রহ-শীল নয়। প্রত্যেকেই যেন নিজের নিজের রুচির পরিপোষণ করতে ব্যস্ত। বর্তমান যুগে সঙ্গীত অবশ্যই বহুধা বিভক্ত, কিন্তু প্রত্যেকটি সম্প্রদায়ই যেন আত্মনিবিষ্ট। কারণ কোনও কোনও গোষ্ঠী একে অপরের প্রতি আদৌ শ্রদ্ধাশীল নয় এমন প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সব বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে রয়েছে —আধুনিক, রবীন্দ্রসঙ্গীত, লোকসঙ্গীত, রাগসঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত প্রভৃতি বহু বহু দল। এঁরা আলাদা আলাদাভাবে অনেক গবেষণামূলক কাজ করে চলেছেন, তাতে হয়তো সঙ্গীতের উন্নতিই হচ্ছে। কিন্তু এই অবস্থানকে ঠিক সুখকর সহাবস্থান বলা যাবে না। বহুতর বিদ্যালয় কলকাতায় স্থাপিত হয়েছে, যেখানে শিক্ষার্থীর মনের মত সঙ্গীতবিভাগ রয়েছে। সে সব প্রতিষ্ঠান থেকে এক একজন এক একটি বিষয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছে। এও সাধারণভাবে শহরবাসীদের মধ্যে যে আত্মকেন্দ্রিকতা দানা বেঁধেছে তারই প্রতিফলন। এই সব বিভিন্ন সঙ্গীতের রুচি থেকেও ললিতকলার দিক থেকে শহরবাসীর বিভিন্ন মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

অতি সাম্প্রতিক কালে দেখা যাচ্ছে ধনীর সমারোহে পূর্ণ এক ধরণের পাশ্চাত্তাসঙ্গীত এক সম্প্রদায়ের প্রিয় হয়ে উঠেছে। আগেকার

পণ্ডিত রবিশঙ্কর

রমণীয় শান্তরসের গানগুলি তাদের আর আকৃষ্ট করে না। এর জন্য তারা রেকর্ড কোম্পানী, সিনেমা ক্যাবারে প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের দিকে চেয়ে আছে। বলতে গেলে "ট্রেড" বা ব্যবসায়ীরাই বর্তমানে সঙ্গীতের চাহিদা পূরণ করছেন এবং তাঁরাই সঙ্গীতের নিয়ামক। এ'রা প্রতিনিয়তই জনচিত্তের স্তরগুলি পরীক্ষা করে সঙ্গীত উৎপাদন করে চলেছেন।

অবস্থাটা সামগ্রিকভাবে অনুশীলন করে আমরা দেখতে পাচ্ছি সঙ্গীতে সমাজেরই প্রতিফলন ঘটেছে। যাঁরা বিত্তশালী পরিতৃপ্ত তাঁরা শান্ত, সমাহিত, রঞ্জনধর্মী সঙ্গীতের অনুরাগী। অবশ্য এর মধ্যে রবীন্দ্রসঙ্গীত, কাব্যসঙ্গীত, রাগসঙ্গীত—এইভাবে ভেদ রয়েছে। যাঁরা মানবিক অনুভূতির প্রাধান্য দেন তাঁদের মধ্যে অনেকে লোক সঙ্গীতের অনুরাগী। বর্তমানে লোকসঙ্গীতকে অনেকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ করছেন। লোকসঙ্গীতের সমাদর এ যুগে ঠিক তিরিশ দশকের মত নয়। এ যুগে এর মূল্যায়ন যেন গভীরতর হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বর্তমান যাত্রার বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কথা মনে পড়ে। আগেকার যাত্রাগান যা লোক-সাহিত্যেরই একটি অংশ ছিল তা আজ বহুলভাবে সংস্কৃত হয়ে একটা নতুন পর্যায়ে উন্নীত হতে চাইছে। আর যে বৃহৎ জনসমাজ অপরিতৃপ্ত অবসন্ন, পারিবারিক বা সামাজিক বিরোধের সম্মুখীন হয়ে জীবন সংগ্রামে লিপ্ত তারা সংগীতেও আনতে চায় একটা বিপ্লব। নানা ধ্বনির জটিল সংমিশ্রণে এবং উচ্চকলরোলে তারা যেন একটা প্রেরণা পায়, —এগিয়ে যেতে চায়।

এই বিশ্লেষণটি অবশ্যই খুবই সংক্ষিপ্ত। মনস্তত্ত্ব এবং সমাজতত্ত্বের দিক থেকে এই বিষয়টিকে আরও অনেক ব্যাপক এবং বৈজ্ঞানিকভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। বস্তুত এটি একটি গবেষণারই বস্তু। হয়তো এ নিয়ে অনেক কাজও হচ্ছে যা আমাদের জানা নেই।

শার্ঙ্গদেব

নবরাগ 'পরমেশ্বরী' : রবিশঙ্করের অনিন্দ্য সৃষ্টি

মধ্যম কিংবা ষড়জের তন্ত্রীতে সুদক্ষ দক্ষিণ-তর্জনীর নিপুণ-নিভুল আঘাত অথবা বাম-করের স্বচ্ছন্দ ও নিখুঁত সঞ্চরণ-শীলতায় মীড়-গমক আর আশ্-জমজমায় সমৃদ্ধ সুরের বিচিত্র পক্ষবিস্তার এটুকু সার্থকতা রবিশঙ্করের মতন শিল্পীর বেলায় স্বতঃসিদ্ধ। তাই তাঁকে যখন তাঁর সেতারটি নিয়ে রসজ্ঞ শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে উপস্থিত হতে দেখি তখন মন যেন চায় আরও কিছু বেশি—যা অনিবার্য, যা সংজ্ঞাতীত। তাই এ'দের অনুষ্ঠানে অনেক সময় হতাশও হতে হয় এই বাড়তিটুকু না পাওয়ার জন্যই। কিন্তু বেশ কিছুদিন পরে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর 'কিংশুক'-এর প্রযোজনায় গত ৬ই ডিসেম্বর রাত্রে 'প্রিয়া' চিত্রগৃহে আর তার পরের দিন প্রভাতে নিউ এম্পায়ারে রবিশঙ্করের একক অনুষ্ঠানের যে আয়োজন করা হয়েছিল সেখানে অন্তত একটি রাগের পরিবেশনায় শিল্পী যে আমাদের এই প্রত্যাশাকে কানায় কানায় মিটিয়ে দিয়েছেন, তা অনায়াসে বলতে পারি। রাগের নাম 'পরমেশ্বরী'। তাঁর নিজেরই সাম্প্রতিক সৃষ্টি। বাজিয়েছিলেন নিউ এম্পায়ারে প্রভাতী অনুষ্ঠানের শুরুতে।

রাগটির মধ্যে কয়েকটি পরিচিত রাগের ছায়া খুঁজলে হয়তো পাওয়া যাবে। জ্ঞমধপস—এই স্বরবিন্যাসে বাগেশ্রীর ব্যঞ্জনা আছে কিংবা কোমল রেখাবের ছোঁয়ায় আহীর ভৈরোঁ। কোথাও কোথাও ভৈরবী আর বিলাস-খানি-তোড়ীর সংগতিও দুর্লক্ষ্য নয়। কিন্তু তাহলেও পঞ্চম বর্জিত এবং কোমল গান্ধার-নিষাদ সম্বলিত ষাড়ব-জাতীয় এই রাগটি এদের সব কিছুকেই ছাপিয়ে একটা অখণ্ড পরিপূর্ণতায় সমৃদ্ধ। সবচেয়ে বড় কথা, কী রাগ-নির্মাণে আর কী তার পরিবেশনায় এমন এক ধ্যানমগ্ন শিল্পীর সত্তা 'পরমেশ্বরী'র মধ্যে মিশে গেছে যা আমাদেরই দেশের ধ্রুপদী-সংগীতের বাইরে আর কোথাও দেখি না।

পরমেশ্বরীর ধ্যানটি সবচেয়ে বেশি ফুটেছিল মন্দ্র-সপ্তকের আলাপে। পরবর্তী অংশের ক্রমিক উন্মোচনের স্তরগুলিও লক্ষ্য করবার মতন। ফুলের পাঁপড়ি-মেলার মতন সংযম আছে, ধৈর্য আছে অথচ পুনরাবৃত্তি নেই। গতের অংশটি নিবদ্ধ ছিল এক দুরূহ তালে। চার-চার-দেড়-দেড় —এগারো-মাত্রার ছন্দটি এই বিশেষ গতি-ভঙ্গিমায় পরিস্ফুট। 'চার-সওয়ারীর তাল' নামে অভিহিত এই তালটির ছন্দ-নির্মাণে সংগতকারী আল্লারাখার কুশলতাও অনবদ্য। রবিশঙ্কর আগের দিন বাজিয়েছিলেন পঞ্চম-সওয়ারী। তার থেকেই যেন চার-মাত্রার একটি পর্বকে পরিহার করে গড়ে উঠেছে এই 'চার-সওয়ারীর তাল'। সেতারের ঝংকার আর বাঁয়া তবলার কথকতার সংযোগ স্বচ্ছন্দ গতিবেগে স্পন্দিত চকিত-চমকিত তান আর চিত্তবিমোহন তেহাই-এর অভিঘাত সেদিনের অনুষ্ঠানে এমন একটা মাত্রা যোগ করেছিল, যা এক রবিশঙ্করের মতন শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব। অন্ততঃ সেদিন নিউ এম্পায়ারে বসে এই কথাই মনে হয়েছে।

অতঃপর রবিশঙ্কর বাজিয়েছেন সিন্ধু-ভৈরবী। দাদরায় আর ত্রিতালে। এর আগে 'পরমেশ্বরী'র পরম মুহূর্তটুকু পেরিয়ে আসবার জন্যই কিনা জানি না, 'সিন্ধু-ভৈরবী'র পরিবেশনাটি খুব অসাধারণ বলে মনে হল না। একই কথা মনে হয়েছে আগের দিনের দরবারী কানাড়া আর তিলক-শ্যাম শুনে। তবে হাঁ, শিল্পী যে রবিশঙ্কর আর সঙ্গে ছিলেন আল্লারাখার মতন নিপুণ সংগতকারী সেটা চোখ বুজেও চিনে নিতে অসুবিধে হয়নি।

—আনন্দবর্ধন

পরধর্ম

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

শাস্ত্রে বলেছে পরধর্ম ভয়াবহ। শুধু এইটুকু বলেই ক্ষান্ত হয়নি, বলেছে স্বধর্মে নিধনও শ্রেয় তথাপি পরধর্ম কদাপি নয়। অর্থাৎ কিনা পরধর্মের পরিণাম নিধনের চাইতেও ভয়াবহ। বলে নেওয়া ভালো, প্রচলিত অর্থে যাকে ধর্ম বলে সে ধর্মে আমার মতি নেই এবং সেই ধর্ম এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়ও নয়। আমার এ আলোচনায় ধর্ম বলতে বিশেষ কোন ধর্ম-বিশ্বাস নয়, ব্যাপকতর অর্থে মনুষ্যের স্বভাব-ধর্ম। কাজেই পরধর্ম বলতে এখানে ধর্মান্তর গ্রহণ নয়। কোন ব্যক্তি যদি আপন লৌকিক ধর্ম ত্যাগ করে অপর কোন ধর্মমত গ্রহণ করেন, সেটা তাঁর পক্ষে পরধর্ম নাও হতে পারে যদি তিনি তাঁর নতুন ধর্ম বিশ্বাসকে মনে প্রাণে গ্রহণ করেন।

আসল কথা ধর্মত্যাগ আর স্বধর্ম ত্যাগ এক কথা নয়। স্বধর্ম ত্যাগেরই অপর নাম পরধর্ম কারণ পরধর্ম বলতে প্রকৃতপক্ষে বোঝায় আপন স্বভাবধর্মের বিরুদ্ধচরণ অর্থাৎ স্বভাব বিরুদ্ধ কাজ যা বলতে গেলে ইদানীং কালে আমাদের সকলেরই স্বভাব-গত হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে আমরা সকলেই স্বধর্মত্যাগী অথচ সে নিয়ে কারো তেমন চৈতন্য নেই। কোন ব্যক্তি যখন লৌকিক অর্থে নিজ ধর্ম ত্যাগ করে অপর কোন ধর্ম গ্রহণ করে, তখন চার-দিকে সোরগোল পড়ে যায়, কিন্তু লোকে যখন নিজ নিজ স্বভাব-বিরুদ্ধ কাজ করে অর্থাৎ স্বধর্ম ত্যাগ করে, তখন দেশসুদ্ধ সকল মানুষ নির্বিকার। অথচ এর চাইতে গুরুতর ব্যাপার আর কিছু হতে পারে না। কারণ নিজ স্বভাবের বিরুদ্ধাচরণ নিজের সঙ্গে সবচাইতে বড় শত্রুতা। একে বলে আত্মবঞ্চনা। সমাজের বেশির ভাগ মানুষ যখন আত্মবঞ্চনায় রত, তখন সমগ্র সমাজের ব্যবহারই অস্বভাবিক হয়ে ওঠে। সমাজ তখন আর প্রকৃতিস্থ থাকে না। আমাদের সমাজের এখন সেই অবস্থা।

সমগ্র সমাজই আজ স্বধর্মচ্যুত। খুব বড় এবং স্থূলে রকমের দৃষ্টান্ত দিতে গেলে রাজনীতির কথাই প্রথমে বলতে হয়। চৌদ্দটি দল মিলে আমাদের যুক্তফ্রন্ট সরকার। কোন দলের সঙ্গে কোন দলের মিল নেই অথচ সকলে এসে এক জায়গায় মিলেছেন। এ অসম্ভব কি করে সম্ভব হল? **সম্ভব হল এই কারণে যে, প্রত্যেকেই নিজ** নিজ মৌলিক বিশ্বাস কিছু পরিমাণে ছেড়ে দিয়েছেন। সোজা কথায় প্রত্যেকটি দলই এখন স্বধর্মচ্যুত, আংশিকভাবে হলেও প্রত্যেকেই পরধর্ম গ্রহণ করেছেন। ফলে প্রত্যেকেরই চরিত্রহানি ঘটেছে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী নিজেকে গান্ধীবাদী বলে পরিচয় দেন, কিন্তু হাত মিলিয়েছেন মার্কসবাদী-দের সঙ্গে। গান্ধীবাদ এবং মার্কসবাদের মধ্যে কোনটি ভাল কোনটি মন্দ—সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর। উভয় মতবাদের মধ্যেই অনেক ভাল জিনিস আছে, কোনটাই ফ্যালনা নয়। তবে এ কথা সকলেই স্বীকার করবেন যে, দুই পন্থায় প্রচণ্ড অমিল। তথাপি গান্ধী-বাদী এবং মার্কসবাদী—এমন দুই বিপরীত-মুখীর মিলন যে সম্ভব হল এর দ্বারা এটুকুই শুধু প্রমাণিত হয় যে, নিজ নিজ বিশ্বাসের প্রতি কারোই কোন নিষ্ঠা নেই। একে মিল বলে না, বলে গোঁজামিল। দু-এর মিলনে যে জিনিসের সৃষ্টি হয়েছে, সেটা কারোই স্বধর্ম নয়, উভয়ের পক্ষেই পর-ধর্ম। কেরালায় মুসলিম লীগ-এর সঙ্গেও কমিউনিস্টদের মিল হয়েছে। মুসলিম লীগ-এর মন রক্ষার জন্যে কমিউনিস্টরা একটি মুসলিম জেলা সংগঠনেও রাজি হয়েছেন। দেখা যাচ্ছে আমাদের কমিউনিজম এবং কমিউনেলিজম-এর মধ্যে এক পদক্ষেপের মাত্র ব্যবধান। পরধর্মাচরণ আর কাকে বলে? দুই বিপরীতের যোগাযোগে শুধু গোল-যোগেরই সৃষ্টি হয়। কেরালা মন্ত্রিসভার পতনেই তার প্রমাণ। সম্প্রতি বাংলা কংগ্রেস দেশের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে যে বিবৃতি প্রচার করেছেন, তাতেই পরধর্ম যে কী ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে, তার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। বলা বাহুল্য, যুক্ত-ফ্রন্টের কোন শরিকই আজ সুখে নেই। একে অন্যের উপর দোষারোপ করছেন, কিন্তু ভুলে যাচ্ছেন যে, প্রত্যেকে একই অপরাধে অপরাধী, প্রত্যেকেই স্বধর্মত্যাগী।

স্বভাবের বিরুদ্ধাচরণ করতে গেলে প্রকৃতির প্রতিশোধ অপরিহার্য। দলে দলে সংঘর্ষ ক্রমেই প্রচন্ডতর আকার ধারণ করছে। সংঘর্ষের কারণও বড় সুন্দর—আমি এখানটায় দিব্যি মার্কসিস্ট মতে লোকের সেবা করছিলাম, তুমি আবার কেন সি পি আই মতে এদের ভাল করতে এলে? এক-সঙ্গে না হয় মন্ত্রিত্ব করছি তাই বলে এক **সঙ্গে লোকের ভাল করব নাকি? কংগ্রেস কুড়ি বছর ধরে দেশ শাসনে এমন ব্যস্ত ছিল যে, দেশের কাজ করবার কোন সময়ই পায়নি আর যুক্তফ্রন্টের শাসন কর্তৃপক্ষ এমন জোর কদমে দেশের কাজ শুরু করেছেন যে, দেশের শাসনব্যবস্থাই ভেঙে পড়বার উপক্রম হয়েছে। দল যখন দেশের চাইতে বড় হয়ে ওঠে, তখন দেশে দলাদলি ছাড়া আর কিছু থাকে না।**

মজার কথা এই যে, প্রত্যেকটি দলই নিজেকে বিপ্লবী আখ্যা দিয়ে থাকে, কিন্তু কার্যত দেখা যাচ্ছে প্রত্যেকেরই দিব্যি খাঁজ-কাটা মন। সুযোগ বুঝে সম্পূর্ণ বিপরীত-ধর্মীর সঙ্গেও দিব্যি খাঁজে খাঁজে নিজেকে মিলিয়ে নিতে পারে। এটা বিপ্লবী মনের লক্ষণ নয়। স্বার্থের সংঘাত হলে খাঁজ থেকে বেরিয়ে আসে, কিন্তু খাঁজ ভাঙে না। সুযোগ মত আবার গোঁজামিল দিতে পারলেই খাঁজে বসে যায়। পরধর্মী মন পরভৃতের মন। সে-জন্যে আমাদের রাজনীতিতে কাকের বাসায় কোকিলের ছা কিছুই বিচিত্র নয়। পশ্চিম-বঙ্গ এবং কেরালার যুক্তফ্রন্টে, মধ্যপ্রদেশ এবং যুক্ত প্রদেশের সংযুক্ত বিধায়ক দলে আমরা এর দৃষ্টান্ত দেখেছি। কোন দলের সঙ্গে কোন দলের মিল নেই। রাজনীতির এমন জগাখিচুড়ি পৃথিবীর কোন দেশে কোন কালে দেখা যায়নি। একমাত্র আবোল-তাবোল এর ভাষাতেই এই তালগোল পাকানো রাজনীতির বর্ণনা সম্ভব—

> মাসি গো মাসি, পাচ্ছে হাসি
> নিম গাছেতে হচ্ছে শিম,
> হাতির মাথায় ব্যাঙের ছাতা
> কাগের বাসায় বগের ডিম।

রাজনৈতিক ইনটারলুডে হিসাবে ব্যাপারটা উপভোগ্য বলতে হবে, খানিকটা কৌতুকের সঞ্চার অবশ্যই হয়। কিন্তু সকলেই জানেন যে, ইনটারলুড জিনিসটা কৌতুকের উদ্দেশ্যে একটা স্বল্পকালীন অনুষ্ঠান, সে জিনিস দীর্ঘস্থায়ী হলে বিড়ম্বনার হেতু হয়।

দেশের সংকট মুহূর্তে ন্যাশনেল গবর্নমেন্ট স্থাপনের নজির আছে। মহা-যুদ্ধের সময় ইংলণ্ডের তিন রাজনৈতিক দল একত্র হয়ে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করে-ছিল। সংকটের মুখে নিজেদের মতপার্থক্য সম্পূর্ণরূপে ভুলে গিয়ে একমাত্র দেশরক্ষা এবং যুদ্ধজয়ের উদ্দেশ্যে সমস্ত শক্তিকে নিয়োজিত করেছিল। আমাদের মন্ত্রিসভা বত্রিশ দফা কর্মসূচীর কথা না ভেবে কেবল যদি দেশের খাদ্য সমস্যা এবং রিফিউজিদের বাসগৃহের কথা ভাবতেন, তাহলে এতদিনে দেশের অনেক কল্যাণ হত। সুভাষচন্দ্র সব সময়ে বলতেন, ফার্স্ট থিংস ফার্স্ট। কিন্তু **আমাদের এমনি স্বভাব, যা সর্বাগ্রে ভাবা**

উচিত তাই আমরা সর্বশেষে ভাবি। রাস্তা-ঘাট মেরামতের চাইতে রাস্তার নাম বদলানো আমাদের কাছে ঢের বেশি জরুরী। তাছাড়া আমাদের নেতারা অধিকাংশই এমন থিওরি-বাজ মানুষ, তাঁরা প্রমাণ করে দেবেন যে, দেশের সকল সমস্যা এমন অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত যে, আলাদা করে একটিরও সমাধান সম্ভব নয়। যুক্তফ্রণ্ট সরকার কোন কাজ করেননি এমন কথা কেউ বলবে না। অনেক ভাল কাজের সূচনা করেছেন, কিন্তু সুপরিকল্পিত সুচিন্তিত কাজের জন্য একটি অপরিহার্য শর্ত আছে—সেটি হল শান্ত পরিবেশ। ঐ পরিবেশের অভাবে কোন কাজই এগোয়নি। আইনশৃংখলার এমন হাল হয়েছে যে, সমস্ত বেসামাল হয়ে উঠেছে। সরকার কোন দিক ছেড়ে কোন দিক সামলাবে? বলা বাহুল্য, সরকার নিজেই এ অবস্থার সৃষ্টি করেছেন। সর্বনাশে সমুৎপন্নে পণ্ডিত ব্যক্তিরা অর্ধাংশ ত্যাগে প্রস্তুত থাকেন, কিন্তু আমাদের রাজনৈতিক পণ্ডিতেরা তেমন আপৎকালেও দলীয় স্বার্থ সূচাগ্র পরিমাণে ছাড়তে রাজি নন। জনসাধারণকে অতিমাত্রায় আস্কারা দিতে যাওয়া বিপজ্জনক। শাসন কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত জনকল্যাণ সাধন, কিন্তু বর্তমান শাসকবর্গের উদ্দেশ্য হয়েছে জন-প্রিয়তা অর্জন। ওখানেই তাঁরা মারাত্মক ভুল করেছেন। নেপোটিজম বা স্বজন তোষণকে সকলেই নিন্দনীয় বলে থাকেন। কিন্তু প্রত্যেকটি শরিক দল যখন স্বদল তোষণ করতে থাকেন, তখন সেটা যে কতখানি সমাজবিরোধী নিন্দনীয় ব্যাপার হয়ে ওঠে, সে বিষয়ে আমাদের নেতৃবৃন্দ অন্ধ। এই যা হচ্ছে—nepotism on such vast scale ইতিপূর্বে কেউ কখনো দেখেওনি শোনেওনি।

এই আস্কারা-দেওয়া রাজনীতির সংগে মিলিত হয়ে এক অভিনব শ্রমনীতির উদ্ভব হয়েছে। তাতে মজুরি বাড়াতে হলে কাজ কমাতে হবে। এখানেও সেই স্বধর্ম পরধর্মের কথা। শ্রমিককে শ্রম থেকে বিরত থাকতে বলা ধর্মত্যাগে প্ররোচনা দেওয়ার সমতুল্য। যে মানুষ শ্রমের দ্বারা জীবনধারণ করে তাকেই বলে শ্রমজীবী। সরলার্থে প্রত্যেকটি মানুষই শ্রমজীবী। জীবধর্ম পালন করতে হলে সকলকেই শ্রম স্বীকার করতে হয়। বিনাশ্রমে শুনেছি কারাদণ্ড ভোগ করা যায়, কিন্তু জীবন যৌবন ভোগ করা যায় না। সব ব্যাপারে লাভের অংশ শ্রমের দ্বারা লভ্য। এখন শুনছি লাভের ভাগ পেতে হলে কাজ বন্ধ করতে হয়। শ্রমিকরা তাঁদের ন্যায্য পাওনা থেকে অনেক সময়েই বঞ্চিত হন, একথা সকলেরই জানা আছে। এ জাতীয় প্রবঞ্চনা বন্ধ করাই প্রগতিশীল সরকারের প্রধান কাজ। চাষের ক্ষেত্রেও বেনামিতে বে-আইনি জমি যাঁরা ভোগ করছেন, তাঁদের হাত থেকে ছিনিয়ে এনে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে সে জমি ভাগ করে দেওয়া সরকারের কর্তব্য। আমাদের প্রগতিশীল সরকার নিজ কর্তব্য পালন না করে শ্রমিক এবং কৃষক উভয়কেই পরোক্ষ ইংগিত দিচ্ছেন, বাহুবলে ন্যায্য পাওনা আদায় করে নাও। অর্থাৎ কিনা তাঁরা নিজেরা অক্ষম। সরকার যেখানে অক্ষম প্রতিপন্ন হন আর জনগণ সক্ষম হয়ে ওঠে, সেখানে অরাজকতা অনিবার্য। আগে শুনেছিলাম লাঙ্গল যার জমি তার, এখন আর তা নয়। এখন কাস্তে যার জমি তার অর্থাৎ যে জোর করে ফসল কেটে নিতে পারে জমি তারই। এখন গীতার উক্তি স্মরণ রেখে চাষের কাজ করতে হবে কারণ চাষেই অধিকার আছে, মা ফলেষু কদাচন। বিনা শ্রমে শ্রমের মূল্য আদায় করা, বিনা চাষে ফসল সংগ্রহ করা একই ব্যাপার। এরূপ ব্যাপারে প্রশ্রয় দেওয়া কোন সরকারকেই মানায় না, প্রগতিশীল সরকারকে তো নয়ই। বিনা শ্রমে কোন প্রকার প্রগতিই সম্ভব নয়। অথচ পৃথিবীতে একমাত্র এ দেশেই দেখা গিয়েছে যেখানে সরকার নিজে থেকে সবাইকে ডেকে বলেছেন, কালকে সব কাজ বন্ধ, কেউ কোন কাজ কোরো না। নিরতিশয় দরিদ্র দেশ; যেখানে নিরলস কর্মযজ্ঞ প্রধানতম প্রয়োজন, সেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষকে কর্মবিরতির নির্দেশ দেওয়ার মত সমাজবিরোধী কাজ আর কি হতে পারে?

রাজনীতি-সর্বস্ব দেশ। অতিমাত্রায় রাজনীতিপরায়ণ হয়ে উঠলে সমাজের কোন শ্রেণীই—কৃষিজীবী, শ্রমজীবী, চাকুরিজীবী—কোন বৃত্তিজীবীই আর স্বধর্মপরায়ণ থাকতে পারেন না। সমাজ ঠিক প্রকৃতিস্থ অবস্থায় থাকে না। আমাদের সমাজব্যবস্থায় বহু ত্রুটিবিচ্যুতি আছে, সে কথা কেউ অস্বীকার করবে না। কিন্তু প্রত্যেকে যদি মনে করে এই মুহূর্তেই প্রতিকার আবশ্যক এবং প্রতিকার ব্যবস্থা প্রত্যেকের নিজের হাতেই তুলে নিতে হবে, তাহলে অরাজকতা দেখা দিতে বাধ্য। একটি সাধারণ দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটা স্পষ্ট হবে। রোগব্যাধি জর্জরিত এই দেশ, চিকিৎসা ব্যবস্থা সে তুলনায় নিতান্তই অপ্রচুর। যেটুকু আছে তার সদ্ব্যবহার সর্বপ্রকারে বাঞ্ছনীয় অর্থাৎ ডাক্তার, নার্স, রোগী এবং রোগীর আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে একান্ত সহযোগিতা প্রয়োজন। কিন্তু কোন কালে যা দেখিনি শুনিনি—রোগীকে উপলক্ষ করে হাসপাতালে হামলা, ডাক্তার নার্সের উপর আক্রমণ এখন হামেশাই ঘটছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের ব্যবহার ত্রুটিহীন এমন কথা অবশ্যই বলা চলে না। কিন্তু হামলার দ্বারা তার সুরাহা হবে এমন মনে করবারও কোন কারণ দেখি না। লাভের মধ্যে চিকিৎসা কার্যেই বিঘ্ন ঘটে। রোগীর সেবা বাকবিতণ্ডার ঊর্ধ্বে। আমাদের দেশেরই এক মহামান্য ব্যক্তি বলেছিলেন, রোগীর সেবাকে আর ভগবানের সাধকে সাদৃশ্য আছে। ডাক্তার নার্স রোগী আত্মীয়-স্বজন কেউ একথা স্মরণ রাখেন না। যেখানে স্থৈর্য ধৈর্যের সবচাইতে বেশি প্রয়োজন, সেখানে হুলস্থূল কাণ্ড বেধে যায়। অতিরিক্ত রাজনীতিগ্রস্ত হওয়ার দরুন আমরা সকল ব্যাপারেই রাজনৈতিক সমাধান

সৃষ্টি করি। এখন এটাই আমাদের সবচাইতে মারাত্মক ব্যাধি। এর চিকিৎসা সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

উন্নতিকামী দেশমাত্রেই রাজনীতির সঙ্গে যুবক সম্প্রদায়ের সম্পর্ক অতি অন্তরঙ্গ। দেশের যৌবন শক্তিই রাজনীতির প্রধান সম্বল, যুবক সম্প্রদায় নেতাদের প্রধান সহায়। যৌবনকে বলা হয় জীবনের শ্রেষ্ঠ কাল। তার কারণ যৌবন কালেই মানুষের সকল গুণের উজ্জ্বলতম প্রকাশ। সে গুণগুলো কি? শৌর্য বীর্য বিদ্যা বুদ্ধি তো বটেই, এছাড়াও সরলতা উদারতা নিঃস্বার্থতা। বলে নেওয়া ভালো যে, যৌবন স্বভাবধর্মেই একটু বেহিসাবী, বেপরোয়া। চিন্তায় কর্মে সর্ব বিষয়ে যুবক সম্প্রদায় স্থিতধী হবেন এমন আশা কেউ করে না। বরং তাঁরা যে সব সময়ে অগ্রপশ্চাত বিবেচনা করেন না, একটু যে বেপরোয়া সেটাই তাঁদের একটা আকর্ষণ, এটা যৌবনধর্মের অন্তর্গত। কিন্তু অজকে তাঁদের ভাবভঙ্গি দেখলে সেটাকে ঠিক বেপরোয়া ভাব বলে মনে হয় না, মনে হয় এঁরা একটু যেন অতিমাত্রায় সেয়ানা, যেন নিজেদের অত্যধিক বিজ্ঞ বলে মনে করেন। যৌবনের বেপরোয়া স্বভাবের মধ্যেও একটি বিনয়-নম্র ভাব থাকে তাতেই যৌবনের শ্রী সৌন্দর্য বজায় থাকে। অকাল-পক্কতা যৌবনের শ্রী বৃদ্ধি করে না, তার শোভনতা নষ্ট করে। বিজ্ঞজন মনোভাব যৌবনের স্বভাবধর্ম নয়। আজকের বিজ্ঞ ভাবাপন্ন যুবকদের দেখলে স্বভাবতই মনে হয় তাঁরা স্বধর্মচ্যুত এবং পরধর্মচর্চায় রত।

একটু তলিয়ে দেখলে আরো প্রমাণ পাওয়া যাবে। যৌবনে মানুষের ভালবাসার শক্তি থাকে অপরিসীম। ভালবেসেই তারা সকলের হৃদয় জয় করে, জয় দৌরাত্ম্যে নয়। যত সহজে প্রাণ দেয়, তত সহজে প্রাণ নেয় না। এখন যা দেখছি তা একেবারে উল্টো। এমন মারমুখী যৌবন আগে কখনো দেখিনি। আমার মতে যৌবন অজাতশত্রু। সকলকে ভালবাসে বলে তার কোন শত্রু নেই। ইয়ুরোপের যুদ্ধকালীন কাব্যে সাহিত্যে দেখা গিয়েছে বুদ্ধিজীবী যুবকরা বরবার এই কথাই বলেছেন, আমরা যাদের সঙ্গে লড়াই করছি, হত্যা করছি, তাঁরা আমাদের শত্রু নন আর তাঁরাও জানেন যে, আমরাও তাঁদের শত্রু নই। বিরোধটা বিভিন্ন দেশের শাসনবিধি এবং সমাজবিধিতে। শত্রুতা যদি থাকে তো শাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে তা আবদ্ধ, আমাদের সঙ্গে কারোর বিরোধ বা শত্রুতা নেই। শাসক সম্প্রদায়ের আজ্ঞাবহ হিসাবে আমরা নিরর্থক প্রাণ দিচ্ছি এবং প্রাণ নিচ্ছি। যুদ্ধ ব্যাপারটাকে তাঁরা utter stupidity হিসাবে দেখেছেন। আমাদের দেশে এখন যে দলগত সংঘর্ষ চলছে, সেটা আরো ভয়ংকর রকমের stupidity। বিরোধ দলনেতাদের মধ্যে। যুবক সম্প্রদায় যদি তাঁদের আজ্ঞাবহ না হয়ে নিজেরা ঐক্যবদ্ধ হতেন, তাহলে দলগত স্বার্থকে ভুলে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে নিজেদের ঐকান্তিকতাকে নিয়োজিত করতে পারতেন, তাতেই দেশের অশেষ কল্যাণ হত। যৌবন itself একটি আদর্শ, আমার মতে জীবনের মহত্তম আদর্শ। এজন্যে রাজনৈতিক সমাজনৈতিক সকল প্রকার মতবাদে যৌবনের জয়গান। বলা বাহুল্য, যৌবন শুধু বয়সের ধর্ম নয়, মনের ধর্ম। তার চর্চা করতে হয়। আমাদের যুবকরা যদি সর্বান্তঃকরণে যৌবনের আদর্শ পালন করতেন, তাহলে বিশেষ কোন মতবাদের তাঁবেদারি করে নিজেদের অযথা সংকুচিত করতে হত না। ফলে এখন আমাদের পলিটিক্সে যুবক আছে কিন্তু যৌবন নেই।

যুবক সমাজের মস্ত বড় একটা অংশ ছাত্র সম্প্রদায়। ছাত্র শব্দটা কোত্থেকে এসেছে আমি জানি না। যাঁদের আমরা ছাত্র বলি, তাঁরা আসলে শিক্ষার্থী। বিদ্যার্থী বললেও ঠিক হয় না কারণ বিদ্যার চাইতে শিক্ষা অনেক বড় কথা। অনেক বিদ্বান মানুষও আচারে ব্যবহারে অশিক্ষিতই থেকে যান। যাক এই যে শিক্ষার্থী সম্প্রদায় যাঁরা শিক্ষালাভের জন্য এসেছেন, দেখা যায়, সে উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে তাঁরাই এখন সকলকে শিক্ষা দিতে উদ্যত। শিক্ষা বা জ্ঞান লাভের জন্যে যে শ্রদ্ধা, যে বিনয়ের প্রয়োজন তাঁদের মধ্যে সেটির যথেষ্ট অভাব ঘটেছে। অধ্যয়নই ছাত্রদের একমাত্র তপস্যা এমন কথা আজকের দিনে কেউ বলবে না। তাঁদের তপস্যাকে বহুমুখী করতে হবে; কিন্তু কেবলমাত্র অধ্যয়নে নিযুক্ত না থেকে যদি দশকর্মে নিজেকে নিয়োজিত করেন, তাহলেও অধ্যয়ন এবং বিদ্যাচর্চাকে অন্যতম মুখ্য কর্তব্য বলে গণ্য করতে হবে। সকল কাজেই নিষ্ঠার প্রয়োজন আছে, বিশেষ করে শিক্ষার্থী এবং বিদ্যার্থীর পক্ষে এটি একটি অপরিহার্য গুণ। শিক্ষার্থীর মন হবে জিজ্ঞাসু মন। সব কিছু জানবার শিখবার প্রতি তার আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে তার একমাত্র নজর পরীক্ষা পাশের দিকে, শিখবার দিকে নয়। সকল ছাত্রই বিদ্যাচর্চায় বিমুখ এমন কথা কেউ বলবে না, কিন্তু ছাত্র সমাজের খুব বড় একটা অংশ যে শিক্ষার্থীর ধর্মপালনে বিরত, সে কথা সকলেই স্বীকার করবেন। আগেই বলেছি ছাত্র সমাজ যুবক সমাজেরই অংশ। সর্বপ্রকার কঠিন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হওয়া যৌবনের স্বভাবসুলভ প্রবণতা। আজকের ছাত্রসমাজ সেই প্রবণতাকে উপেক্ষা করে সর্বপ্রকার made-easy পন্থার অনুসারী হয়েছে। এটা বড় সুলক্ষণ নয়।

শিক্ষাক্ষেত্রে অদ্ভুত এক সহজিয়া রীতির প্রবর্তন হয়েছে। শিক্ষা ব্যাপারটাকে ছেঁটে কেটে পরীক্ষা পাশের ন্যূনতম ব্যবস্থায় পরিণত করা হয়েছে। এর ফলে শিক্ষার মান বিস্ময়কররূপে নেমে গিয়েছে। ব্যবসা ক্ষেত্রে পণ্যসামগ্রীতে যতখানি ভেজাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীতে ততখানি। ভেজাল খাদ্য খেয়ে সমস্ত জাতির যেমন স্বাস্থ্য-হানির আশংকা দেখা দিয়েছে, তেমনি ভেজাল ডিগ্রীধারীরা শিক্ষা এবং অপরাপর কার্যে লিপ্ত হয়ে জাতির ভবিষ্যৎকে বিপন্ন করছেন। এরূপ চলতে থাকলে ডিগ্রীর বাজারে অবিলম্বে 'আগ মার্কা'র প্রবর্তন করতে হবে। অল্পসংখ্যক ভাল ছাত্রকে হিসাব থেকে বাদ দিলে (ভালো ছাত্ররা নিজ গুণেই ভালো, ভালো ছাত্রের মান আগেও যেমন ছিল, এখনও তেমনি আছে) দেখা যাবে শিক্ষার মান গত কয়েক বৎসরে অবিশ্বাস্য-রূপে নেমে গিয়েছে। এই ব্যাপারে শিক্ষক সম্প্রদায়ের দায়িত্ব সর্বাধিক। পরীক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে নানা রকম কারচুপি চলছে। অল্পদিন পূর্বে খবরের কাগজে জনৈক কলেজ-অধ্যক্ষের যে কেলেংকারির বার্তা প্রকাশিত হয়েছে, সেটি এই ব্যাপারে চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত বলা যেতে পারে। এরূপ ঘটনা কোন বিশেষ বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদ্ধ নয়। এই ব্যাধি নানা আকারে বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে সংক্রমিত হয়েছে। ফলে শিক্ষার পবিত্র বৃত্তি অসহনীয়রূপে কলংকিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, যথার্থ শিক্ষাব্রতী এখনও আছেন, কিন্তু তাঁদের সংখ্যা দিনে দিনে কমে যাচ্ছে। অধিকাংশ শিক্ষকই স্বধর্মচ্যুত। শিক্ষকের অধঃপতন সমস্ত জাতির অধঃপতন সূচনা করে।

বিশিষ্ট নিমন্ত্রিত নাগরিকদের উপস্থিতিতে কলকাতার মেয়র শ্রীপ্রশান্ত সূর অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস-এর ৩৬তম বার্ষিক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। ভারতের শিল্পজগতে অ্যাকাডেমি আয়োজিত বার্ষিক প্রদর্শনীর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে, এবং দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে শিল্পীরা এই প্রদর্শনীতে তাঁদের রচনা-সম্ভার পাঠিয়ে থাকেন। এবারেও বিভিন্ন অঞ্চলের বহু শিল্পী প্রদর্শনীতে যোগদান করেছেন, সুতরাং সেদিক থেকে বিচার করলে প্রদর্শনীটি গুরুত্ব অর্জন করেছে সন্দেহ নেই। তবে কলকাতার একটি বিশিষ্ট তরুণ শিল্পী সম্প্রদায় এতে যোগদান করলে প্রদর্শনীটি বোধ হয় সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠত। অতএব প্রদর্শনীতে উচ্চাঙ্গের কয়েকটি আধুনিক রচনার অভাব অনেকেই বোধ করেছেন।

এবারের প্রদর্শনীতে ভাস্কর্য বাদে সবশুদ্ধ মোট ২৯২টি শিল্প নিদর্শন দেখা যায়। নির্বাচন প্রণালী, বলা বাহুল্য, আশানুরূপ মনে হল না, কারণ গতবারের মত এবারেও সংখ্যার ওপরে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, ফলে অবাঞ্ছিত কয়েকটি রচনা প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে, বিশেষ করে জলরঙ ও ভারতীয় বিভাগে। আর একটি কথা বলা উচিত মনে করি। ললিতকলা অ্যাকাডেমি তথা নিখিল ভারত চারু ও কারুকলা সমিতি (AIFACS) প্রত্যেক বার্ষিক প্রদর্শনীর সময়ে নতুন বিচারকমণ্ডলী নির্বাচন করেন। ফলে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী ও বিচার অনুযায়ী প্রতি বছরই প্রদর্শনীতে কিছু নতুনত্ব বা বৈশিষ্ট্যের আভাষ পাওয়া যায়। শ্রদ্ধেয় বিচারকমণ্ডলীর প্রতি কোনওরূপ কটাক্ষপাত করা আমার উদ্দেশ্য নয়, কারণ তাঁরা সকলেই সুপরিচিত শিল্পী। তাহলেও এ বিষয়ে মনোযোগী হয়ে যদি অ্যাকাডেমি কর্তৃপক্ষ প্রতি বছর নতুন বিচারকমণ্ডলী নির্বাচন করেন তাহলে এই জনপ্রিয় প্রদর্শনীটির রূপ অন্য ও আরও সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হতে পারে।

বাইরে বাংলার উল্লেখযোগ্য পরিচিত শিল্পীদের মধ্যে আমলেকার, চিঞ্চোলকার, এস এস জোশী, হরকিষণ লাল ও পানিকারের দর্শন মেলে। বাংলা দেশের প্রবীণ শিল্পীদের মধ্যে রথীন মৈত্র, গোপাল ঘোষ, ধীরেন দেববর্মণ, ইন্দ্র দুগার, সুনীলমাধব সেন ও সুবল পাল প্রদর্শনীতে যোগদান করেছেন। তাছাড়া উদীয়মান ও পরিচিত কয়েকজন তরুণ শিল্পীর সাক্ষাত পাওয়া যায়—যেমন সমর ভৌমিক, অমরেন্দ্র চৌধুরী, গণেশ হালুই, নির্মল দত্ত, মহিম রুদ্র, কুনাল কর, অনীতা রায় চৌধুরী, কার্তিক পাইন ও করুণা সাহা। প্রদর্শনীভুক্ত বিমূর্ত, সমবিমূর্ত, সমসাররিয়ালিস্টিক, কোলাজ ও আধুনিকতম উপাদানে রচিত নানা নিদর্শনের মধ্য দিয়ে সমকালীন চিত্রকলাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে ভাস্কর্য বিভাগ অপেক্ষাকৃত দুর্বল, আধুনিকতম কোন নিদর্শন চোখে পড়েনি। মনোরম হলেও প্রদর্শনীতে অসাধারণ কোনও নিদর্শন দেখা যায়নি তবে সাধারণভাবে বিচার করলে মান উন্নত বলা যায়। ভারতীয় বিভাগ গ্যালারী ছাড়া অন্য গ্যালারীগুলির সজ্জাবিন্যাস সুন্দর, সেজন্য কর্তৃপক্ষ প্রশংসা দাবী করতে পারেন।

উত্তর দিকের গ্যালারীতে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রচনা দেখা যায়। প্রথমেই চোখে পড়ে কার্তিক পাইনের ক্যাপটিভিটি। ছোট ছবিখানির রোমান্টিক পরিবেশ লক্ষণীয়। তারপরেই কুণাল করের কমপোজিশন অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রঙীন কাচ ও আলঙ্কারিক রীতির সমন্বয় করে শিল্পী প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। সমর ভৌমিকের প্রাচীন ঐতিহ্যপ্রধান রচনাটির মধ্যে তাঁর শিল্পীসত্তাটি যেন ঠিক ফুটে ওঠেনি। অমরেন্দ্র চৌধুরীর দুটি রচনাতেই যেন রঙীন কোলাজ বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে। নির্মল দত্তর দুটি রচনার মধ্যে মুনলাইট সন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পরিকল্পনা ও কাব্যপ্রধান রূপের দিক থেকে এটি অনেকের চোখে পড়ে যায়। গভীর নীল রঙ প্রধান কমপোজিশনে (২৩১) মহিম রুদ্রের শূন্য-স্থান সমাবেশ কৌশল দেখা যায়। ইমেজেস চেঞ্জ-এর মধ্যে রথীন মৈত্রের নতুন চিন্তাধারার সন্ধান মেলে।

প্রবীণ শিল্পী হিসাবে সুবল পাল ড্যান্সিং শ্যাডোজ-এ তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছেন। অন্যান্য ছবির মধ্যে বরেন বসুর ট্র্যাপ, বীণা ভার্গব-এর ফ্লিটিং ভিসান, অরুণ কুণ্ডু (১৩২) ও সমীর দেব প্যাশন-এর নাম করা যায়, যদিও শেষোক্তটিতে সেকুইরোসের প্রভাব দেখা যায়। আর একটি ছবিরও উল্লেখ করা চলে অমিতাভ ব্যানার্জির ফিগার ২।

পশ্চিমদিকের গ্যালারীতে প্রধানত জল-

ফোলিয়েজ —অমরেন্দ্র চৌধুরী
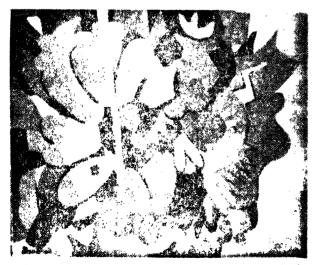
রঙে আঁকা নিসর্গদৃশ্য ও বিষয়বস্তুমূলক নানা ছবি রাখা আছে। বলা বাহুল্য সবগুলি সুনির্বাচিত নয়। পূর্ণ চক্রবর্তী সুপরিচিত প্রবীণ শিল্পী—৪১নং অপেক্ষা অবশ্যই শ্রেষ্ঠতর ছবি প্রদর্শনীতে রাখা উচিত ছিল। ৪২নং অনায়াসে বাদ দেওয়া যেত। এই গ্যালারীর শ্রেষ্ঠ শিল্পী হিসাবে দুজন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন —গণেশ হালুই (স্টোরড রেন ওয়াটার) ও সতীশ চন্দ্র (ওল্ড মার্কেট)। সূক্ষ্ম, স্বল্প ও রেখা প্রধান ক্যালিগ্রাফিক রীতিতে আঁকা প্রথমোক্ত ছোট্ট ছবিটির মধ্য দিয়ে শিল্পী বিষয়বস্তুটি ব্যাখ্যা করেছেন ও সুন্দর জলরঙ ব্যবহার প্রণালীর মধ্য দিয়ে দ্বিতীয়টিতে শিল্পী লক্ষ্ণৌ শহরের একটি পরিচিত দৃশ্য রূপায়িত করেছেন। গোপাল ঘোষ দুটি ছবিতেই তাঁর মৌলিক অংকন-রীতি বজায় রেখেছেন, যদিও রঙমাধুর্যে একটি চোখে পড়ে (১১০)। এম এস জোশীর নিসর্গ দৃশ্য (১০২) উপভোগ্য। এ গ্যালারীতে আরও একটি ছোট্ট ছবি চোখে পড়ে—বি আর পানেসারের টাইলাইট কেথিড্রাল। এই সঙ্গে বারিন গোস্বামীর কালো রঙ প্রধান ডন-এরও নাম করা যায়।

দক্ষিণ দিকের নতুন গ্যালারীতে প্রধানত ভারতের বিভিন্ন স্থান অর্থাৎ মাদ্রাজ, আহমেদাবাদ, বোম্বাই, লক্ষ্ণৌ ইন্দোর ও হায়দরাবাদের শিল্পীদের রচনা রাখা হয়েছে। একমাত্র পানিকার ছাড়া ঠিক প্রথম শ্রেণীর কোনও শিল্পীর কাজ চোখে পড়েনি। মাদ্রাজের শিল্পকাজে যেমন প্রতীক ও অলংকারগুণের প্রাধান্য দেখা যায় বোম্বাইয়ের কাজে চোখে পড়ে উচ্চস্বরের রচনাশৈলী। প্যানেলপ্রধান একটি ছবিতে (১১৪) পানিকার জন্তু ও নানা প্রতীকের সমন্বয় ঘটিয়েছেন। রঙ ও বৈচিত্র্য মোম ব্যবহার কৌশলের জন্য রমনের বাটিক জার্নি ভাল লাগে। শৈলজ মুখার্জীর প্রভাব দেখা গেলেও এস ডি বাসুদেবের ফ্যানটাসির মায়াজাল অনেককে মুগ্ধ করে। বিমূর্ত রচনা হিসাবে আশিন মোদির গেরুয়া রঙপ্রধান কমপোজিশন-এর নাম করা চলে। বোম্বাইয়ের নিদর্শনের মধ্যে হরকিষণলালের ভিলেজ সিন ও লক্ষ্মণ বিশ্বনাথ শেলাকরের হোলি ঘাটস বিশেষভাবে উল্লেখ্য। প্রথমটির ইমপ্যাস্টো প্রথা (যা দেখে অনেকের দশরথ প্যাটেলের রীতির কথা মনে পড়বে) ও দ্বিতীয়টির রঙ ব্যবহার কৌশল লক্ষণীয়। বস্তুত এ গ্যালারীতে এ দুটি ছবিই প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করে। লক্ষ্ণৌ শিল্পীদের কাজ অলঙ্কারমূলক—যেমন ১২৩। চিন্তোলকারের (ইন্দোর) প্লাইউডে রচিত মুনলাইট নাইট ও মহম্মদ আলি খাঁর (হায়দরাবাদ) বুলও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তবে সৈয়দ বিন মহম্মদের টেপেস্ট্রীভিত্তিক রচনা সিক্যোয়েন্স-এ নতুনত্বের স্বাদ মেলে।

মধ্যকার গ্যালারীতে কয়েকটি গ্রাফিক ও অন্যান্য নানাজাতীয় রচনার সমাবেশ দেখা যায়। এখানে প্রথমেই সরিৎ নন্দীর আধুনিকতম উপাদানে রচিত দি ল্যাব সকলের চোখে পড়ে যায়। পরিকল্পনা ও উপাদান (পেরেক, বোতাম, ছোট ছোট পয়সা, লোহার পাত ইত্যাদি) সংস্থাপনের মধ্য দিয়ে ল্যাবরেটরির প্রতীকমূলক রূপটি শিল্পী কৌশলে ফুটিয়ে তুলেছেন। করুণা সাহার আঁকা দুটি প্রতিকৃতি ছাড়া দি মুন (অজিত কেশরী রায়—উড়িষ্যা) ও ভিসান (প্রবীর চক্রবর্তী চণ্ডীগড়)-এর নাম করা যায়। গ্রাফিকের মধ্যে লাল রঙ প্রধান সূক্ষ্ম খোদাই কাজের জন্য ইনটালিও—১ (জয়কৃষ্ণ, লক্ষ্ণৌ ও বিশেষ করে ট্রাংকুইলিটি (জীবন সেন) উল্লেখযোগ্য। ব্রজগোপালের কালিকলমে আঁকা সুদীর্ঘ প্যানেল জাতীয় কাজটিও অনেকের প্রশংসা অর্জন করে।

দক্ষিণ দিকের গ্যালারীতে ভারতীয় রীতিতে আঁকা বহু ছবি দেখা যায়। কয়েকটি বাদ দিলে (বিশেষ করে ১০৮, ৭৮, ৫৬ ও ২৫নং) গ্যালারিটির গুরুত্ব বাড়ত সন্দেহ নেই। এখানে ইন্দ্র দুগারের দুটি রচনাই (রাজস্থানী বেল ও মাই হাউস অ্যাট জিয়াগঞ্জ) শ্রেষ্ঠ বলে মনে হয়। দুটিরই সরলতা ও পরিচ্ছন্নতা বিশেষভাবে দর্শককে আকৃষ্ট করে। আরও একটি ছবি অনেকের চোখে পড়ে যায়—প্রবীর সেনগুপ্তের রূপোর। কোলাজ নিদর্শন হিসাবে এটি প্রশংসা দাবী করে। অপরাপর ছবির মধ্যে ১৪৯, ২৮৩, ১২২ ও ১৭০ উল্লেখযোগ্য।

ভাস্কর্য বিভাগে কাঠ ও সিমেন্টে রচিত নিদর্শনের সংখ্যাই অধিক, যদিও ব্রঞ্জের কাজও ছিল। এ বিভাগে মীরা মুখার্জীর

রিক্লাইনিং ফিগার —সত্যেন মজুমদার

পরলোকে শিল্পী অশোক মুখোপাধ্যায়

শিল্পী অশোক মুখোপাধ্যায় গত ১২ নভেম্বর খড়দহে তাঁর নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করেন। আর্ট কলেজে শিক্ষা-শেষ করে নানাস্থানে প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করলেও তথাকথিত সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পী হিসাবে হয়ত তিনি পরিচিত হতে পারেননি। তবে যাঁরা তাঁকে জানতেন বা তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছেন তাঁরা জানেন যে তিনি ছিলেন যথার্থ শিল্পী। তাঁর সে পরিচয় পাওয়া যেত তাঁর আচার-ব্যবহারে, তাঁর জীবনযাত্রার প্রতিপদক্ষেপে ও তাঁর প্রাত্যহিক কর্মজীবন ধারায়। খ্যাতনামা শিল্পী সতীশ সিংহের তিনি ছিলেন প্রিয় ছাত্র। ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালীন তিনি অশোক মুখোপাধ্যায়কে স্কুলে অধ্যাপক হিসাবে গ্রহণ করেন। কিন্তু যিনি প্রকৃত শিল্পী বাঁধা ধরা

অশোক মুখোপাধ্যায়

গণ্ডি তাঁকে কতদিন ধরে রাখবে? তাই শেষে তিনি নিজের ছোট পরিধির মধ্যেই ফিরে যান। খড়দহে তিনি ছিলেন সকলের 'অশোকদা'। ঘোড়ায় চড়তে, শিকার করতে, বাঁশী বাজাতে, কবিতা লিখতে, অভিনয় করতে ও সংগঠন করতে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। শুধু তাই নয় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানে তিনি ছিলেন বিশেষ আগ্রহী—খড়দহের শ্রেষ্ঠ শিশু-ক্ষেত্রকেন্দ্র 'সন্দীপন' তার দৃষ্টান্ত। অবিশ্বাস্যই বটে। একাধারে এত গুণ সহজে চোখে পড়ে না। কিন্তু সত্যিই তিনি ছিলেন মনে প্রাণে শিল্পী—তথাকথিত সুনাম বা প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য তিনি কোনওদিন লালায়িত হননি।

হট স্ট্রীম অনেকের চোখে পড়ে যায়। মিশরীয় প্রভাব থাকলেও মূর্তিটির বসার ভঙ্গিমা ও মুখের ভাবটুকুর মধ্যে যেন গভীর রহস্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বলবীর সিং কাট-এর রামকিঙ্কর-এর মুখমণ্ডলও একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি—গঠন পারিপাট্য-গুণে রামকিঙ্করের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য এটির মধ্যে ফুটে উঠেছে। আকারের নতুনত্বের দিক থেকে আরও একটি কাজ চোখে পড়ে—সত্যেন মজুমদারের রিক্লাইনিং ফিগার। বিশেষ করে আকারের সৌন্দর্য ও পেলবতা ও আয়তনিক সমতার দিক থেকে এ মূর্তির পিছনের অংশটুকু ভাস্কর কৌশলে গঠন করেছেন। মাথার দিকের অংশটুকু অপেক্ষাকৃত ভারী হলে নিদর্শনটি সর্বাঙ্গসুন্দর হত। তা সত্ত্বেও এটি প্রশংসা দাবী করে। রঙীন কাচের অভ্যন্তরীণ অলঙ্কারমূলক নিদর্শন হিসাবে সুকুমার দাসের রিফ্লেকসন অল ওভার লোকবিশেষের ভাল লাগে। অন্যান্য নিদর্শনের মধ্যে ফুলচাঁদ পাইনের নাইট-ক্লটকার, তারকেশ্বর গড়াই-এর হান্টিং ইগ্রেট ও কে এস বিশ্বম্ভর-এর টুইস্টেড ফর্মের নাম করা চলে।

প্রদর্শনীটি ৮ই জানুয়ারী পর্যন্ত খোলা থাকবে।

*

গান্ধী শতবার্ষিকী উপলক্ষে কলকাতা আর্ট সোসাইটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও আমেরিকার হওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে যথাক্রমে একটি গান্ধী প্রতিকৃতি ও গান্ধী প্লাক প্রদান করেন। দুটি শিল্প কাজই করেন খ্যাতনামা ভাস্কর-শিল্পী শ্রীচিন্তামণি কর। কলকাতা রাজভবনে রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরির উপস্থিতি ও বাংলার রাজ্যপাল শ্রী এস এস ধাওয়ানের সভাপতিত্বে আহূত একটি সভায় উপাচার্য ডাঃ সত্যেন সেন ও আমেরিকার কনসাল জেনারেল মিঃ হার্বার্ট গর্ডন যথাক্রমে গান্ধী প্রতিকৃতি ও প্লাক আর্ট সোসাইটির কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে গ্রহণ করেন। প্রতিকৃতির মধ্যে চিন্তামণি কর খাদি পরিহিত দণ্ডায়মান গান্ধীজির একটি নতুন রূপ ও ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তোলেন। প্লাকের মধ্যে হাস্যমুখর গান্ধীজির আশাবাদের পরিচয় পাওয়া যায়।

চিত্রপ্রিয়

সুধাকান্ত সান্নিধ্যে

ডঃ অমিয়কুমার মজুমদার

রবীন্দ্রনাথের একান্ত-সচিব শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী গত ১২ নভেম্বর ৭৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। আশৈশব শান্তি-নিকেতনের ছাত্র ছিলেন, পরবর্তীকালে প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে নানাভাবে তিনি রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সৃষ্টি শ্রীনিকেতন ও শান্তিনিকেতনের সেবা করে এসেছেন। শ্রীচৌধুরীর কাছে দেশ পত্রিকা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। সাপ্তাহিক সংখ্যা ও শারদীয় সংখ্যা দেশ-এ তিনি রবীন্দ্র প্রসঙ্গে বহু প্রবন্ধ লিখেছেন যা তথ্য ও ইতিহাসের ক্ষেত্রে মূল্যবান সংযোজনরূপে বিবেচিত। মৃত্যুর অনতিপূর্বে শ্রীচৌধুরীর সঙ্গে আলোচ্য প্রবন্ধের লেখকের এই সাক্ষাৎকার দেশ পত্রিকায় প্রকাশের সঙ্গে তাঁর প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।
—সম্পাদক

এ বছরের গোড়ার দিকে শান্তিনিকেতন যেতেই বন্ধুবর সৌমেনবাবু বললেন, গুরুদেব সম্পর্কে আরো তথ্য চান তো সুধাকান্তদা'র সঙ্গে দেখা করুন। তাঁর কাছে অতীত ইতিহাসের পাণ্ডুলিপি আছে, অবশ্য স্মৃতিতে। সন্ধ্যায় সেবাপল্লীতে তাঁর বাড়িতে হাজির হ'লাম সৌমেনবাবুর সঙ্গে। পরিচয় দিতেই বন্ধুবরকে বললেন, এ'র সরকারী ডক্টোর চেয়ে বিজ্ঞানী পরিচয়টাই বড়ো। শুরু করলেন 'আপনি' দিয়ে, কখন খসে পড়লো তিনি টের পাননি। তৎক্ষণাৎ 'তুমি' পর্যায়ে এসে গেছি।

যে ঘরে তিনি ছিলেন তাকে সঙ্কীর্ণ না বলাই ভালো। উঁচু খাটের উপর তিনি তখন আধশোয়া অবস্থায় ছিলেন। বললেন দাড়িটা দেখে ভাল লাগছে না তো? গুরুদেবকে ব্যবহার করতে পারলে বেশ ভাল অবস্থা দেখাতে পেতে।' প্রসঙ্গান্তরে চলে গেলাম। বললাম, রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান-প্রীতি ও তাঁর কাব্যে-সাহিত্যে বিজ্ঞানের প্রভাবের কথা নিয়ে আজকাল কিছু আলোচনা হচ্ছে। সত্যিই কি বিজ্ঞান তাঁকে প্রভাবিত করেছিল? এ সম্বন্ধে আপনি কি বলেন?

সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিলেন : দ্যাখো, রবীন্দ্রনাথ পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক মেজাজের মানুষ ছিলেন। তাঁর কবিতার বহু জায়গাতে বিজ্ঞান নানা ভাবে ছড়িয়ে আছে। বিজ্ঞান তাঁকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছিল বটে তবে একথা মনে রাখতে হবে তিনি মূলত কবি ছিলেন।

প্রশ্ন করলাম : কবি কি জ্ঞাতসারে তাঁর কবিতায় বিজ্ঞানের প্রবেশাধিকার দিয়েছেন, না অজ্ঞাতসারে হয়েছে বলে আপনার মনে হয়।

বললেন, অজ্ঞাতসারে, তাঁর sub-conscious mind-এ সব সময়েতেই কিছু বিজ্ঞান চিন্তা থাকতো। তাই কোন কোন কবিতাতে তার প্রভাব পড়েছে। কবি নিজেও আমাকে তা বলেছেন।

: সাহিত্যের অনেক অধ্যাপক আছেন যাঁরা রবীন্দ্র কাব্যে বিজ্ঞানের প্রভাবকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। তাঁরা মনে করেন যেহেতু রবীন্দ্রনাথ কবি-দার্শনিক-ঔপন্যাসিক, অতএব বিজ্ঞান-বিরোধী না হলেও অনুরাগ ছিল একথা বলা চলে না।

আমার এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তিনি উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন : 'ওদের যা খুশি বলতে দাও; আমি নিজে ত দীর্ঘদিন তাঁকে দেখেছি। তাঁর ছাত্র ছিলুম, শান্তি-নিকেতনে মাস্টারীও করেছি। রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলুম। প্রতিমা দেবীর লেখা 'নির্বাণ' বইয়ে তো দেখেছ বোধহয় একটা ঘটনা বলি শোন, তাহলেই বুঝতে পারবে তাঁর scientific attitude-এর কথা। সেবার অসুস্থ অবস্থায় শান্তিনিকেতন থেকে তাঁর শেষ যাত্রা। আমরা ভেবেছি বিধান রায়, ললিত বাড়ুয্যের মত ডাক্তার যখন আশ্বাস দিচ্ছেন তখন গুরুদেব নিশ্চয় ভাল হয়ে ফিরে আসবেন। যাবার আগে আমাকে তিনি বললেন, 'তোরা ভাবছিস, আমি ভাল হয়ে আবার শান্তিনিকেতনে ফিরে আসবো। এটা তোদের অনুমান। আমি অনুভব করছি অপারেশনের ধাক্কা আমি সইতে পারবো না, আর এ-ই আমার শেষ যাত্রা। 'অনুমান' আর 'অনুভব'-এর মধ্যে 'আকাশ পাতাল প্রভেদ'। তখন আমি **বললুম, তাহলে যাচ্ছেন কেন আর অপারেশনে রাজী হলেনই বা কেন? তার** উত্তরে কবি বললেন, 'ডাক্তাররা যা বলছেন তা তো সায়েন্টিফিক, তাঁদের যুক্তিকে অস্বীকার করা মানে সায়েন্সকে অস্বীকার করা। আমি নিজে বিজ্ঞান পড়ে তাকে মানবো না কেন?'

তাহলেই বোঝ যেখানে বহু বিজ্ঞানী নিজের জীবনের সাধারণ বিষয়েই অবৈজ্ঞানিক, সেখানে রবীন্দ্রনাথ কবি হয়েও কতটা লজিক্যাল, কেমন সায়েন্টিফিক। মৃত্যুর নিশ্চিত আশঙ্কা করেও সায়েন্সের কাছে নিজেকে ছেড়ে দিলেন। যদিও তাঁর আশঙ্কাই সত্যি হলো।

আরো একটা ঘটনা বলি শোন। একবার কবি দার্জিলিং-এ বেড়াতে গেছেন। তাঁর বরাবরের অভ্যেস খাবার পরে কিছু ফল খাওয়া। দার্জিলিং-এর এক প্রবীণ বাঙ্গালী ডাক্তার ('স্যানাটোরিয়াম'-এর ডাঃ শিশির পাল) একদিন রবীন্দ্রনাথকে বললেন খাবার পরে ফল খাওয়া বিজ্ঞান-সম্মত নয়। কবি বললেন, 'তবে যে সাহেবরা খাবার শেষে ফল খায়।' ডাক্তার জবাব দিলেন, 'ওদের দেশে তা সম্ভব। প্রথমত শীতের দেশ। তাছাড়া ওদের খাবার পদ্ধতি আলাদা। ফল খাবার আগে ওরা নানারকম গরম স্যুপ খায় তাতে ফল হজম করবার সুবিধে। খাবার শেষে ফল খেলে stomach থেকে যে secretion হয় বা ফল থেকে যে অ্যাসিড বেরোয় তার vitilization হয় না, তাতে দেহের ক্ষতি হয়। ডাক্তারবাবু তো অনেকক্ষণ ধরে খাদ্য-তত্ত্ব বোঝালেন। শেষে বলে গেলেন প্রধান ভোজ্য খেতে আরম্ভ করার আগে ফল খেয়ে নিতে। তিনি চলে যাবার পর কবি বেশ খানিকক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইলেন। পরে বললেন, 'ডাক্তারবাবু মনে হচ্ছে ঠিক কথাই বলেছেন, ও'র যুক্তি অস্বীকার করতে পারিনে।' পরের দিন বলে দিলেন খাবার শেষে আর ফল নয়, আগে খাবেন। দীর্ঘ-দিনের অভ্যাস বলো, সংস্কার বলো রাতা-রাতি ছেড়ে দিলেন। খাঁটি scientific natnre-এর না হলে এমনটি কি সম্ভব?

: কবি নিজের হাতে বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন কি?

: ছেলেবেলাতে হয়তো করেছেন, জীবন-স্মৃতিতে তার উল্লেখ আছে, তবে কবির বৃদ্ধ বয়সের একটা ঘটনা বেশ দাগ কেটে আছে আমার মনে। একদিন আমাকে বললেন, 'যা-তো, বাজার থেকে ছাগলের লাংস, হার্ট, লিভার একসঙ্গে সমস্ত কিনে নিয়ে আয়।' আমি তো অবাক। এগুলি দিয়ে কি হবে? জিনিসগুলি as it is নিয়ে আমার পরে বললেন, 'দ্যাখ, **আমার মনে কেমন একটা খটকা লেগেছে,**

লাংসের খাঁজের মধ্যে হার্টের পজিশন নিয়ে, তাই মিলিয়ে দেখতে চাই।' এর পরেও যদি কেউ বলেন যে কবি বিজ্ঞান পছন্দ করতেন না বা তাঁর scientific mind ছিল না, তা হলে বলতে হয় তাঁরা কবি সম্বন্ধে খুঁটিয়ে বেশি কিছু জানেন না।

: কবির 'জীবনদেবতা' সম্বন্ধে *অজিতকুমার চক্রবর্তী বলেছেন, এটি সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক। আমি নিজেও তা বিশ্বাস করি। কিন্তু রবীন্দ্র-সাহিত্যের গবেষক বা অধ্যাপকেরা তা স্বীকার করেন না। তাঁদের ধারণা অজিতবাবুর তত্ত্ব সত্য নয়। অনেকের মতে 'এ এক আশ্চর্য কবি কল্পনা মাত্র।' এ সম্বন্ধে আপনি কি বলেন।

: জীবনদেবতা নিয়ে অজিতবাবু প্রথম কবির সঙ্গে আলোচনা করেন। এ নিয়ে কবির সঙ্গে তাঁর অনেক কথাবার্তা হয়েছে, কয়েকবার আমার উপস্থিতিতেও। লেখার পর কবি maunscript দেখেন, যদি তাঁর মতে না মিলতো বা তিনি পছন্দ না করতেন তবে কি ছাপতে দিতেন? যা তাঁর মতের সঙ্গে মিলতো না তিনি কখনো জ্ঞাতসারে প্রকাশ করতে দিতেন না। তাহলেই বুঝতে পারছো জীবনদেবতার scientific explanation কবি মেনে নিয়েছিলেন।

: শুনেছি এখানকার স্কুলে বিজ্ঞান শেখানোর পদ্ধতি ছিল স্বতন্ত্র। কেমন ছিল তা আপনার কাছে শুনতে ভাল লাগবে।

: কবির মনোযোগ এ বিষয়ে গোড়া থেকেই ছিল। জগদানন্দবাবু, তেজেশবাবু এঁরা তো বিজ্ঞান পড়াতেনই।

একদিন ক্লাসে ছোটদের পড়াচ্ছি, হঠাৎ পেছন ফিরে দেখি উনি দাঁড়িয়ে পড়ানো শুনেছেন। তখনই বুঝতে পারলুম সেদিন বিকেলে নিশ্চয় তাঁর ওখানে চায়ের নেমন্তন্ন হবে। চা খাওয়ানোটা ছুতো। পড়ানোর বিষয় নিয়ে নানা জিজ্ঞাসাবাদ করতেন, আর বুঝিয়ে দিতেন কেমন করে পড়াতে হবে। একদিন বললেন, 'বাতাসে যে জলকণা আছে তা ছেলেদের কেমন করে বোঝাবি বল দেখি?' উত্তর মনের মতো না হওয়াতে নিজেই তার ব্যাখ্যা আরম্ভ করলেন। এমনভাবে বুঝিয়ে দিলেন, যাতে ছোটদের তো বটেই, বড়োদেরও ভালো লাগবে। আর বলতেন, 'ছেলেদের কাছে বিজ্ঞানের প্রশ্ন তুলে ধরবি তাদের ভাবতে সময় দিবি, পরে আলোচনা করে ওদের কাছ থেকেই জবাব বের করতে চেষ্টা করবি। তাহলে ওদের খুব ভাল করে শেখাও হবে, আবার বিজ্ঞানের দিকে আকর্ষণও হবে।'

এ ছাড়া তিনি বিকেলে sense training বা science trainingএর ক্লাস করতেন। আমাদের জিজ্ঞাসা করতেন, 'আচ্ছা বল দেখি এই পাথরটার ওজন কতো, বা এখান থেকে ঐ অশ্বিদ কতটা দূরে, অথবা এটা কতটা লম্বা।' এমনি ধরনের নানা প্রশ্ন। না মেপে আমাদের বলতে হতো। কাছাকাছি ফুট-রুলে, দাঁড়িপাল্লা সবই থাকতো। পরে মেপে দেখতাম। এমনিভাবে করতে করতে শেষের দিকে প্রায় নির্ভুলভাবেই বলতে পারতুম। শিক্ষক হিসেবে একদিন পড়াচ্ছি ওঁরই কবিতা। আমি তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা শোনাচ্ছিলাম। দেখি কবি দাঁড়িয়ে শুনেছেন। সেদিনই তলব পড়লো। বেশ প্রশংসা করেছিলেন। বলেছিলেন, 'সবই যে ঐ ভাবে লিখেছি তা নয়, হয় তো sub conscious mind-এ ছিল। তবু তোর ব্যাখ্যা ভালই লাগল।'

: কবি বিজ্ঞানের কোন ধরনের বই পড়তে ভালবাসতেন, তাদের নাম বা লিস্ট কি আপনার মনে আছে?

: বিজ্ঞানের প্রায় সব দিকেই তাঁর দৃষ্টি ছিল। বিস্তর বই পড়তেন। নাম মনে নেই। ডাক্তারী বই অনেক পড়েছেন। জুলজির বই-ও পড়তেন। ফিজিক্স-কেমিস্ট্রি তো বটেই। আমাকেও পড়তে দিতেন। শুনলে অবাক হবে কাঁকড়া বিছের সম্বন্ধে একটা বই সযত্নে পড়ে আমাকে পড়ে দেখতে বললেন। ওঁর রিক্রিয়েশন ছিল বিজ্ঞানের বই পড়া। 'বিশ্ব-পরিচয়' লেখার কথা ধরো না। এক বাক্স ভর্তি বিজ্ঞানের বই নিয়ে চললেন আলমোড়াতে। নির্জনে রচনা করলেন বিশ্বপরিচয়।

: অনেকে বলেন, কবি বিশুদ্ধ বিজ্ঞানকেই পছন্দ করতেন, ফলিত বিজ্ঞানকে নয়।

: তা কেমন করে বলা যায়? তাহলে কবি নিজে ডাক্তারী পড়তেন-ই বা কেন আর ছোট কল-কারখানার কথাই বা ভাবতেন কেন? তিনি তো বলতেন, 'দ্যাখ, discovery না হলে invention-এর পথ খোলে না। আগে discovery পরে invention।' তিনি যে অ্যাপ্লায়েড সায়েন্স পছন্দ করতেন তার বড়ো প্রমাণ নিজের ছেলে রথীবাবুকে আমেরিকা পাঠালেন কৃষিবিদ্যা পড়তে। একই সঙ্গে সন্তোষ মজুমদারকেও পাঠিয়েছিলেন ঐ বিষয় পড়তে এই আশা করে যে, তাঁরা এখানকার কৃষি-বিভাগকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গড়ে তুলবেন।

: যন্ত্র সম্বন্ধে কবির কেমন ধারণা ছিল? অনেক সময় মনে হয়েছে যন্ত্রকে তিনি দানব বলেছেন। বলেছেন কল্যাণ প্রহরণের উৎস। তাহলে তিনি কি যন্ত্র বা কলকারখানা পছন্দ করতেন না?

: যন্ত্রকে তিনি খারাপ বলেননি, বলেছেন তার অপব্যবহারকে। মানুষ তাকে দানব করে তুলেছে এ কথাই তিনি বলতে চেয়েছেন। তিনি ট্রেনে, মোটরকারে, অ্যারোপ্লেনে সফর করতেন, ইলেকট্রিক ফ্যানও ব্যবহার করতেন।

: তাহলে 'মুক্তধারা' নাটকে তিনি যে সরাসরি যন্ত্রের 'পরে দোষ চাপিয়েছেন। তাছাড়া অনেক জায়গাতে তিনি যন্ত্রকেই আক্রমণ করেছেন, যন্ত্রীকে নয়। আবার অনেক চিঠিতে বলেছেন মানুষের সর্বগ্রাসী লোভ যন্ত্রের অপব্যবহার করছে। কোনটা তাঁর মতে সত্যি?

: ভুলে যেও না রবীন্দ্রনাথ সর্বোপরি কবি। কাজেই কবিসুলভ emotion তাঁর থাকবেই। একজন্যে যন্ত্রকে অনেক সময় বিশেষ moodএ দোষী করেছেন। আবার যখন তাঁর scientific mind সচেতন থাকতো, তখন যন্ত্রকে গ্রাহ্য করতেন।

কথায় কথায় অনেক রাত হয়ে গেল। নিবিষ্ট হয়ে শুনে যাচ্ছিলাম কঠিন মাটির বুকে সবুজের প্রসারের কথা। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন সত্তার বিচিত্র পরিচয় পেলাম তাঁর একান্ত সচিব ও সহচর সুধাকান্তবাবুর কাছে। সুধাকান্তবাবু রবীন্দ্র সান্নিধ্যে এসে দেখিয়েছেন সাধনায় ত্যাগের মহাত্ম্য। বললেন, দৃষ্টি অনেকটা ক্ষীণ হয়েছে, দেহও অপটু। আজকে যেমন দেখছো এমনি মোটেই ছিলুম না, এই বলে আগেকার এক ফোটোগ্রাফ দেখালেন। এরই মধ্যে বোধ হয় নাতনী এসে নৈশাহারের জন্যে তাগিদ দিয়ে গেলেন। প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালাম। উনি এগিয়ে এলেন গেট অবধি। বাইরে চাঁদের আলোয় গাছ, ফুল, মাটি ও আকাশের একাত্মতা অনুভব করলাম।

লেপের পর কম্বলের তলায় দিবানিদ্রা দিতে ঢুকেছি কি ল্যান্ডলর্ড হাজির। শেষে বুড়ির উপদেশের হাত থেকে বাঁচতে, ভর্তি হলাম সিটি গিল্ডসের মটর মেকানিক কোর্সে। মটর চড়তে আর সবায়ের মত আমারও ভাল লাগে। কিন্তু ওর নীরস কলকব্জা দুদিনে মাথা ধরাবার উপক্রম করতেই, ক্লাস পালিয়ে হাজির হলাম কলেজের জিমন্যাসিয়ামে। আর ওখানেই একটা নতুন জিনিস দেখলাম। ঠিক ইস্পাতের ডাবল বেডের খাটের মত। মাঝে শুধু সাদা নাইলনের একটা নেট। নাম শুনলাম—ট্র্যামপোলিন। এর ওপর ডবল সামারসল্ট, টু এন্ড হাফের মত শক্ত শক্ত ফিগারগুলোকে অনায়াস ভঙ্গীতে করতে দেখে, তাজ্জব বনে গেলাম। কোচকে জিজ্ঞাসা করাতে উনি বললেন, "সুদূর অতীতে ভাইকিংসরা যুদ্ধের অবসরে, আনন্দ আহরণের জন্য কিছু লোক একটা শক্ত তাঁবুর কাপড় হাত দিয়ে ধরে থাকত আর মাঝখানে একজনকে চড়তে বলত। তারপর মাঝখানের লোকটিকে শূন্যে ছুঁড়ে দেওয়া হলে, আকাশে নানান ধরনের ডিগবাজি খেয়ে লোকটি আবার কাপড়ের ওপর এসে পড়ত। এর পর একে দেখতে পাই সার্কাসে। ট্রাপিজ থেকে ঝুপঝাপ করে একের পর এক সার্কাস খেলোয়াড় নেটের ওপর কিছু রিবাউন্ডের খেলা দেখিয়ে সার্কাস শেষ করছে। ১৯৩০ সালে আমেরিকার জর্জ নিশেন আকারের রূপ দিয়ে একে বাজারে বিক্রি করতে শুরু করেন। ছোট্ট জায়গাতে এ ব্যায়াম করা সম্ভব, সেই সঙ্গে সৃষ্টিশীল, সহজ এবং আনন্দময় ব্যায়ামের যন্ত্র ও সব বয়সের পক্ষেই এ সম্ভব বলে পৃথিবীতে আজ এ অসাধারণ জনপ্রিয়। আমেরিকা, ইউরোপ, বা স্ক্যান্ডিনেভিয়ার প্রত্যেক

স্কুলের জিমন্যাসিয়ামেই এ যন্ত্রকে অতি অবশ্য দেখা যাবে।" আমি প্রশ্ন করলাম, "ফুটবলারদের এতে কোন সাহায্য হতে পারে কি?" উনি বললেন, "নিশ্চয়। ভলি, বাস্কেট, ব্যাডমিন্টন, বা ফুটবলের মত খেলাতে যেখানে এজিলিটি ও ফ্লেক্সিবিলিটির খুবই দরকার, তাতে খুবই সাহায্য করে এ ব্যায়াম।"

"১৯৬৪/৬৫ সালে কলকাতার কোনো এক বড় ক্লাবের কর্মকর্তাদের অনুরোধ করেছিলাম, "হাজার পাঁচেক টাকা খরচ করে ক্লাবে ছোট্ট একটা জিমন্যাসিয়াম করুন, ফুটবলার ছাড়াও আপনাদের ক্লাবের হকি, ক্রিকেট ও অ্যাথলেটিক্সরা উপকৃত হবে।" সেদিন এ অনুরোধের কোন সাড়া তো পাই নি। উপরন্তু একজন কর্মকর্তা যিনি নিজের জীবনে কোন দিন কোন খেলা-ধুলো করেননি, বললেন, "ভারতের নানান জায়গা থেকে গাদা গাদা টাকা খরচা করে

ট্র্যামপোলিনের ওপর ডাবল সামার সল্ট

আমরা প্লেয়ার নিয়ে আসি। তারা আমাদের ট্রফি পাইয়ে দেয়—তাতেই আমরা খুশী। তা ছাড়া এদের শেখাবারই বা কি আছে? কোচ রাখাটাই ক্লাবের একটা বাজে খরচ।"

এই দৃষ্টিভঙ্গী আজও গড়ের মাঠের প্রায় সব তাঁবুতেই বহাল তবিয়তে আছে বলেই জিমন্যাস্টিক্স এদেশে এখনও দুর-অস্ত।

লঙ হর্স বা ভল্টিং হর্সে ব্যায়ামের আগে, কমপক্ষে ১৫ থেকে ২০ গজ, অ্যাথলেটদের লঙ জাম্পের মত তীব্রবেগে ছুটে আসতে হবে। এবং ভল্টিং হর্সের তিন ফুট আগে যে স্প্রিং বোর্ড থাকে, তার ওপর লাফিয়ে, ভল্টিং হর্সের ওপর ফিগার করবার পর, শরীরের সমস্ত ভার পায়ের পাতার ওপর দিয়ে মাটিতে আলতোভাবে পড়বে। এ সময়ে পা জোড়া, কোমর সামনে অল্প ঝুঁকে এবং দু হাত শরীরের ভারসাম্য রাখতে দু পাশে ছড়ানো থাকবে

সাইড হর্স বা পমেল হর্সে ব্যায়ামের শুরুতেই স্মরণ করিয়ে দিই যে, এতে মানসিক একাগ্রতার সঙ্গে চূড়ান্ত শারীরিক সহনশীলতার প্রয়োজন। প্রথম প্রথম শরীরের নীচের অংশটুকুই নড়বে। কিন্তু কিছুদিন ধৈর্য সহকারে অনুশীলন করলে কাঁধ থেকে সমস্ত শরীরটাই এই ছবির ফিগারের মত নড়ানো সম্ভব হবে

রিং সিম্যান্সের কঠিন ব্যায়াম। এতে ফুটবলারের বিশেষ করে গোলকীপারের অতি প্রয়োজনীয় কাঁধের ও পেটের পেশীগুলোর কর্মক্ষমতা বাড়িয়ে দেবে। যদিও এ ব্যায়াম করবার আসল নিয়ম হল, দুটো রিং যেন কিছুতেই না নড়ে। তবু প্রথম শিক্ষার্থীদের কাছে কিছুতেই তা সম্ভব নয়। অর্থাৎ এ অল্প দুলবেই। তবে কিছু দিন পরে এ ঠিক হয়ে যাবে। দুটো রিং উঁচু নীচু থাকলে কিছুতেই এ ব্যায়াম করা উচিত নয়। কেননা, তাতে চোট লাগবার সম্ভাবনা আছে

প্যারালাল বারে ব্যায়ামের বৈচিত্র্য অনেক। কিন্তু জায়গার স্বল্পতায় মাত্র একটি ব্যায়ামই দেখানো হল

হরাইজেন্টাল বার নিঃসন্দেহে সবচেয়ে কঠিন এবং তীব্র উত্তেজনাপূর্ণ ব্যায়াম। ফুটবলারের দেহের শক্তির সঙ্গে তার ওজনের সাম্য আনতে এর মত আর দুটি নেই। তবে এ ব্যায়ামের সময় সর্বদাই একজন গার্ড যেন থাকে

কং/গ্রেস

এই সুচিন্তিত ও সুখপাঠ্য প্রবন্ধটির জন্য শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ এবং 'দেশ'কে ধন্যবাদ। দুই বন্ধুদের লড়াই আরম্ভ হবার পর থেকে ইন্দিরাপন্থী ও বাম-পন্থীরা হুমকি দিচ্ছেন যে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর আচরণের, নীতির যাঁরা বিরূপ সমালোচনা করেন তাঁরা দেশদ্রোহী। বামপন্থীরা শুনেছি নাকি 'মনোপলির' বিরুদ্ধে। সে ক্ষেত্রে দেশভক্তির 'মনোপলি'র দাবি তাঁরা কিরূপে করছেন তা চিন্তনীয়। গণতন্ত্রে বিরোধী পক্ষের মতামতের মূল্য প্রচণ্ড। কারণ আজ যিনি বিরোধী দলের নেতা কাল তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন। কম্যুনিসট দেশগুলি যতই গণ-তন্ত্রের দোহাই দিন, 'প্রতিক্রিয়াশীল' বা 'বিপ্লব-বিরোধী' বলে ছাপ মেরে বিরোধী পক্ষের অস্তিত্বের পথ বন্ধ করে রেখেছেন। সেখানে মুখ খোলা মানে চিরতরে কণ্ঠ-রোধের আমন্ত্রণ জানান। অবশ্য দলনেতার পক্ষে জয়ধ্বনি দেবার জন্য মুখ খুলতে বাধা নেই। ভারতে ইন্দিরাপন্থীরাও শুধু জী হুজুর'দেরই চান।

১৯৬৪ সনে শ্রীমোহনকুমার মঙ্গলম (বর্তমানে ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনসের চেয়ার-ম্যান) একটি পুস্তিকা লেখেন। (তখন তিনি কম্যুনিসট পার্টির মেম্বার ছিলেন।) তাতে কংগ্রেস সরকারকে জব্দ করবার প্রায় সম্পূর্ণ খসড়া ছিল। কংগ্রেসের বাম ঘেঁষা নীতিগুলিকে জাতীয় নীতি বলে জাহির করে সেগুলিকে অবিলম্বে আইনে পরিণত করবার দাবি তুলে জন-আন্দোলন আরম্ভ করা হল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অন্যতম অস্ত্র। অন্য অস্ত্র হল ছলে বলে কৌশলে প্রদেশে ও কেন্দ্রে কংগ্রেসকে সরিয়ে বা দুর্বল করে কোয়ালিশন বা সংযুক্ত ফ্রন্ট গড়া। তারপর গল্পের সেই উটের মত প্রথমে মাথাটি মাত্র গলিয়ে পরে ক্রমশ সমস্ত শরীরটিকেই তাঁবুতে প্রবেশ করিয়ে তাঁবুর মালিককে তাড়ান। এটি হল গুপ্তির মত সাধারণ ছড়ির মধ্যে লুকান অস্ত্র যার প্রকাশ্য উল্লেখ কম্যুনিসট নীতিশতকে পাওয়া যায় না।

"বিপক্ষ পার্টি তুমি বিভক্ত হও, আমরা তাতে প্রবেশ করি" এটি হল ঐ নীতি শতকের একটি মোটা হরফের নীতি। কং/গ্রেস হল সেই নীতির সফল প্রয়োগ ফল।

ভারত হল মূর্তি পুজো, নায়ক পুজো, পূর্ব পুরুষ পুজো, শক্তির পুজো ইত্যাদি, বার মাসে তের পার্বণের দেশ। তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীর সঙ্গে গান্ধী, নেহরু, লেনিন, মার্ক্স, মাও এবং ইন্দিরাকে জনতা যুক্ত করে দিয়েছে। ফলে এঁদের কারুর নিরপেক্ষ সমালোচনা করা নিরাপদ নয়। তারকেশ্বরী ও তুর্কেশ্বরীর তর্কযুদ্ধ কেবলমাত্র রসনায় আবদ্ধ থাকে না।

লাল আদর্শবাদ ও লাল গোলাপের প্রতি পণ্ডিত নেহরুর আসক্তি গোপন ছিল না। কিন্তু সমাজবাদ যে কম্যুনিসট পার্টির একচেটিয়া আদর্শ একথা তিনি মানতেন না। তিনি চেয়েছিলেন যে দেশের বৃহত্তম পার্টি কংগ্রেসই সমাজবাদের প্রতিভূ হবে, কিন্তু বিক্ষোভ, সন্ত্রাস, রক্তপাতের মাধ্যমে নয়। মিশ্রিত অর্থনীতির পথে। শিল্পোন্নত, সমৃদ্ধ দেশে ধনিক ও শ্রমিকের সহাবস্থান শান্তিপূর্ণ পথেই হতে পারে। কিন্তু তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় ট্রাজেডী এই যে দেশ-বিদেশে তাঁর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পঞ্চশীল সিদ্ধান্ত যত বাহবা পেল তত ফলপ্রসূ হল না। পুরাতন শক্তি মার্কিন ও রাশিয়া এবং নতুন শক্তি চীন ও পাকিস্তানের কূটনীতির বিপরীতে আমাদের আদর্শবাদ বাষ্প হয়ে গেল। রাশিয়া, চীন, আফ্রো-এশিয়ান দেশগুলি পঞ্চশীলের ঢালের আড়ালে শক্তি সঞ্চয় করে ভারতকে তাদের স্ফীত বন্ধাগুলি প্রদর্শন করতে দ্বিধা বোধ করল না। "আশায় ছলনে ভুলি" আমাদের একূল ওকূল দুকূলই গেল। তিব্বত থেকে রাবাত পর্যন্ত ভারতের বিদেশনীতি নিষ্করুণভাবে বিফল হয়েছে। এদিকে প্রশ্রয় পেয়ে সাদাটুপির অন্তরালে দুই

নেহর্, কালো বাজার ও লাল সৈনিক গোকুলে বেড়েছে।

নেহর্ ও লালবাহাদ্র আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের য্গের বীর। গদি বজায় রাখবার জন্য তাঁদের আঙিনায় দাঁড়িয়ে 'জনতা'র নিকটে অশ্রুভরা আবেদন জানাবার প্রয়োজন ছিল না। তবে তাঁরাও রক্ত-মাংসের মানুষ এবং ক্ষমতার মোহের ঊর্ধ্বে ছিলেন না। লালবাহাদ্র একবার সেকথা মুখেও বলেছেন. (বিট্ইন দি লাইনস. কুলদীপ নয়ার।) কিন্তু ১৯৭২ সনে (যদি তার আগেই না স্তো ছেঁড়ে) ইন্দিরাজীকে জনভোট নিতে হবে। স্বাধীনতার পর ততদিন পঁচিশ বছর কেটে গেছে। নতুন যুগের মতদাতারা গান্ধী, নেহর্, লাল-বাহাদ্রদের প্রত্যক্ষভাবে চেনে না। তারা স্বাধীন ভারতে জন্মেছে, তাই স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের চেয়ে অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয় নিয়ে ভালভাবে বেঁচে থাকাটাই তদের প্রধান সমস্যা ও উদ্দেশ্য। আবাদী কংগ্রেসে সমাজবাদী ধরনের নীতি ঘোষণা করে নেহর্ কম্যুনিস্টদের পাল ফ.টো করে দিয়েছিলেন। দ্বিধা বিভক্ত কম্যুনিস্ট পার্টিও কংগ্রেসকে টিঁকিয়ে রাখতে সাহায্য করে-ছিল। কিন্তু ১৯৬৭-র মত গণনায় দেখা গেল যে তারা তাদের ম্রুব্বীদের ঠেকায় আবার মাথা তুলছে। আর পাঁচ বছরে তাদের মাথা আকাশে ঠেকবে। বাঙগালোরে তাই নেহর্কন্যা তাঁর পিতার কালেরই প্নরাব্ত্তি করলেন। কিন্তু নেহর্র ব্যক্তিত্ব কংগ্রেসকে বিভক্ত হতে দেয়নি। ইন্দিরাজীর সেই ব্যক্তিত্ব এখনো হয়নি। তাই তাঁকে এগিয়ে যেতে হল দুই কম্যুনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য বামপন্থীদের উৎস্ক অবলম্বন গ্রহণ করতে।

কামরাজ আবিষ্কার করেছিলেন, 'কন-সেনসাস'। ইন্দিরাজী করলেন 'কনসেন্স'। ফারাক খ্ব নেই। শ্ধ্ কামরাজ প্রকাশ্যে ঘরের ময়লা কাপড় কাচাকে ঠেকিয়ে রেখে-ছিলেন এখন অর্বাচীন ও প্রাচীন দ্-দলই পরস্পরের নোংরা কাপড়ের ডাঁই গাধার পিঠে নিয়ে রাজপথে মিছিল বার করেছেন। পরিষ্কার করবার মত জলের অভাব সাবরমতী, গঙ্গা, যম্না সর্বত্রই। উপযুক্ত রজকেরও প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। শ্ধ্

UNESCOর সেন্সাস অনুসারে পৃথিবীতে গর্দভের সংখ্যা দেখেছে সবচেয়ে বেশী ভারতে। তাই আমাদের অসংখ্য পার্টির ময়লা কাপড় বইবার মত বাহনের অভাব নেই।

কংগ্রেস থেকে আনক্রেসফুলি বিতাড়িত বিক্ষুব্ধ অজয় মুখার্জি বাংলা থেকে কংগ্রেসের নামনিশানা মুছে দিতে যুক্ত ফ্রন্ট গড়লেন। বেরাদ্রিদের নেতা অজয় মুখার্জি ও সুশীল ধাড়ার দেশভক্তি সন্দেহের উর্ধ্বে। এঁকে অপসারণ করা কংগ্রেসের হিমালয়সম ভুল হয়েছিল। কিন্তু বাংলা কংগ্রেস যা চেয়েছিল তা কি পেয়েছে।

আগামী ইলেকসানে ইন্দিরাজী যদি তাঁর নতুন কংগ্রেসের পক্ষে যথেষ্ট মত না পান তাহলে কেন্দ্রেও যুক্ত ফ্রন্ট অবশ্যম্ভাবী। তখন আইন ও শৃংখলা রক্ষার জন্য ইন্দিরাজীকেও মার্কস্বিষ্ট পার্টির দুয়ারে ধর্না দিতে হবে। নিজের দলের মোরারজীকে কলমের এক আঁচড়ে অপসারণ করা সম্ভব। অন্যান্য অবাঞ্ছনীয় মন্ত্রীদেরও। কিন্তু যুক্ত ফ্রন্টে অন্য কারকী উপ-প্রধানমন্ত্রী বা অন্য মন্ত্রীর কি অত সহজে যাবেন? সহজ হলে অজয়বাবু কি সেটা পারতেন না?

কমলাক্ষ চট্টোপাধ্যায়
আমেদাবাদ ৯

ফিচার-লেখক বনাম সাহিত্যিক

সম্প্রতি আবদুল জব্বারের লেখা বাংলার চালচিত্রকে কেন্দ্র করে 'দেশের' পাতায় বেশ কিছু আলোচনা আমার নজরে পড়েছে। আমি জব্বার সাহেবের 'ধানের নাম লক্ষ্মী' (১৭ সংখ্যা দেশ) এবং সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের আলোচনাও (৪৮ সংখ্যা দেশ) পড়েছি আগ্রহের সাথেই। তাকে কেন্দ্র করে পাঠকদের লেখনী যুদ্ধে অবতরণ করার মত ব্যাপার কিছু চোখে পড়েনি। অথচ আসল ব্যাপারটা থেকে সরে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের মন্তব্যও চোখে পড়ল। সম্প্রতি (দেশ ৩৭ বর্ষ ৯ সংখ্যা) পরিমল লাহিড়ীর একটি আলোচনা পড়লাম এবং এ সম্পর্কে আমার বক্তব্য না জানিয়ে পারলাম না।

মতভেদ থাকতে পারে না যে ফিচার হিসাবে 'বাংলা চালচিত্র' আমার ভালো লেগেছে, তার জন্য লেখক ধন্যবাদার্হ। কিন্তু তাই বলে তিনি অপর একজন সাহিত্যিককে ব্যঙ্গ করবেন, এটা আমরা আশা করি না তাঁর কাছে। অথচ তিনি ঠিক তাই করেছেন বেশ কয়েকটি ফিচারে। যেমন করেছেন 'ধানের নাম লক্ষ্মী' ফিচারটিতে। লক্ষণ বাগের মুখ দিয়ে লেখক বলেছেন, "আরে বাবা, তোমাদের কে একজন লিখেছে 'হিজলের অবাধ তৃণভূমি'... তোমার ঐ আধ লাইন লেখায় বোঝা গেল তুমি আদৌ জানো না গ্রাম বাংলা কেমন"

আমি যতদূর জানি, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ বহুবার এই 'হিজলের অবাধ তৃণভূমি' কথাটি ব্যবহার করেছেন এবং যুক্তি সংগত ভাবেই। জব্বার সাহেব ভালোভাবে না জেনেই তাঁর লেখা সম্পর্কে এ রকম মন্তব্য করলেন কেন জানি না এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে মুস্তাফা সিরাজের প্রতিবাদও স্বাভাবিক। এর পরে জব্বার সাহেবের কাছ থেকে কোন সাড়া না পাওয়ায় আমরা এও ধরে নিতে পারি যে তিনি হিজল সম্পর্কে মুস্তাফা সিরাজের ব্যাখ্যাটিকেও মেনে নিয়েছেন। কিন্তু বিস্মিত হলাম দেশের ৩৭ বর্ষ ২ সংখ্যায় পরিমল লাহিড়ীর চিঠিটি পড়ে। শঙ্কিতও হলাম দেখে যে ব্যাপারটাকে ভ্রান্তভাবে তিনি কোথায় নিয়ে এলেন। তিনি মুস্তাফা সিরাজের চিঠিটাকে জব্বার সাহেবের প্রতি আক্রমণ হিসাবে ধরে নিলেন কেন? তাঁর চিঠিটা একটু সচেতন হয়ে পড়লেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে তিনি "অধৈর্য" হয়ে অপর একজন নবাগতকে 'পোস্টমর্টেম' করার মত অদম্য মেজাজ নিয়ে চালচিত্রের গায়ে কাদা ছিটাতে শুরু" করেন নি, বরং কিছু ভুল তথ্য পরিবেশন করে জব্বার সাহেব একজন সাহিত্যিককে যখন ব্যঙ্গ করেন, তখন তারই প্রতিবাদ করে তিনি সংশোধনের ইঙ্গিত দিয়েছেন মাত্র। পরিমলবাবু এটুকু ধরতে পারলেন না কেন জানি না। যদিও তিনি নিজেকে একজন সাহিত্যের অধ্যাপক বলে জাহির করেছেন কিন্তু এটুকু বুঝলেন না যে "কোন শ্রদ্ধেয় কথা সাহিত্যিককে বা তাঁর সাহিত্যকে কোথাও সামান্য মূল্যবোধে করে নিজের Originality প্রদর্শন" করা যায় না। মনে হয়, Originality কথাটির ব্যবহার সম্পর্কেই লেখক সচেতন নন। আর তাঁর জেনে রাখা প্রয়োজন যে সাহিত্য আজ "আধুনিকতার নাম নিয়ে বাজার মাত করার চেষ্টা করছে" না। আমরা সাহিত্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিরুদ্ধে নই। আর এটা কি শুধু বাংলা সাহিত্যেই হচ্ছে? পরিমলবাবু যখন নিজে একজন 'সাহিত্যের অধ্যাপক' তখন তিনি নিশ্চয় জানেন যে বিদেশী সাহিত্যেও বিভিন্ন সাহিত্যিক গোষ্ঠী বিভিন্ন সময়ে সাহিত্যকে নতুন চোখে দেখেছেন, নতুনভাবে প্রকৃতি আর জীবনকে বিচার করেছেন। আধুনিক বাংলার সাহিত্যিকরাও তার ব্যতিক্রম নন। বার্গসঁ-এর গতিবাদ যদি সত্য হয়, তবে সাহিত্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলবেই। এর অভাবে সাহিত্যের গতি থেমে যেতে বাধ্য। জলের নিম্নগামিতার মত সাহিত্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা স্বাভাবিক।

পরিমল লাহিড়ীর আর একটি মন্তব্য চালচিত্রের লেখক নাকি আমাদের 'কচু খাইয়ে রসনা পরিতৃপ্ত করার Credit' নিচ্ছেন। কথাটা হাস্যকর হলেও দুঃখবোধ করছি বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে সাহিত্যের অধ্যাপক পরিমলবাবুর অজ্ঞতা উপলব্ধি করে। তাঁর জানা প্রয়োজন বিশেষভাবে সমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্যে কোন ফিচার লেখক "কচু খাইয়ে" Credit পেতে পারেন না, কারণ বাংলা সাহিত্য কোন ফিচার-লেখকের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়নি—হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর ইত্যাদি সাহিত্যরথীদের দ্বারা। আর ফিচার লেখকদের জন্যে অন্যান্য সাহিত্যিকদের গাত্রদাহ হবারও কথা নয়। তাঁরা জানেন, সাহিত্যে ফিচার লেখকের জনপ্রিয়তা বিশেষ একটি সময়কে ঘিরে, আর ফিচার লিখে সাহিত্যের ইতিহাসেও স্থান পাওয়া যায় না, কারণ, ফিচার

সৃষ্টিশীল সাহিত্য নয়। যে কোন পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই একশ্রেণীর ফিচার লেখকের উদ্ভব হয়। তাদের লেখনী ক্ষমতাও প্রবল হতে বাধা নেই। সময় সময় দর্শকদের প্রশংসাও কুড়ান। এ ধরনের লেখক রবীন্দ্র-নাথের আমলেও ছিল, কল্লোল যুগের সাহিত্যিকদের পাশাপাশিও ছিল। বর্তমানে কজন আমরা তাদের নাম মনে রেখেছি? পত্র-পত্রিকার দিক থেকে হয়তো এদের প্রয়োজন রয়েছে, কেননা পাঠকের রুচি ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু চিরন্তন সাহিত্যের দিক থেকে তাদের লেখার মূল্য কতটুকু? বস্তুত ফিচারের সাথে সৃষ্টিশীল সাহিত্যের পার্থক্য এখানেই।

পুনরায় স্বীকার করতে বাধা নেই, জব্বার সাহেব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যে তথ্য-পূর্ণ লেখাগুলি আমাদের সামনে পরিবেশন করছেন, তা প্রশংসার দাবী রাখে—অবশ্য ফিচার হিসাবে। সবশেষে আবার বলছি, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ 'চালচিত্রে'র তথ্যগত ভুলগুলো ধরিয়ে দিয়ে ঠিকই করেছেন এবং দেশের নিয়মিত পাঠক হিসাবে সেটুকু আমাদের জানার প্রয়োজন ছিল।

কওসর জামাল
মুর্শিদাবাদ

সোনা তৈরীর কাহিনী

(১)

আমার গুরুদেব সদগুরু মন্মথনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের মুখে সোনা তৈরী করার গল্প একটি শুনেছিলাম। তাঁর সামনেই ঘটনাটা ঘটেছিল।

তিনি তখন প্রব্রজ্যা নিয়ে নানা দেশ ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বিষ্ণুপুরে কিছুদিন আছেন তখন। সন্ধ্যায় এক ভক্ত-গৃহে ধর্ম বিষয়ে নানা কথা হচ্ছে। এমন সময় জটাজুটধারী তিন চারজন সাধুর আবির্ভাব হলো। তাঁরা 'আসন' নিলেন। কথায় কথায় সোনা তৈরীর কথা উঠলো। তাঁদের মধ্যে একজন বললেন, কিছুটা খাঁটি তামা আনো ও অনেক কাঠ কয়লা।

ভক্তদের মধ্যে কজন উৎসাহিত হয়ে তখনই তা সংগ্রহ করে ফেললেন। সাধুদের মধ্যে একজন কাঁধ হতে ঝোলা নামালেন। কাঠ কয়লার আগুন করে ছোট্ট একটি লোহার বাটি বসিয়ে দিলেন ঐ আগুনে। কিছু শুকনো লতার শিকড় ছেঁচে যতটুকু রস হয় ঐ বাটিটিতে ঢেলে দিলেন। বললেন, এবারে তামাটি ওর মধ্যে ফেলে দেব। ঐ লতার রস তামা গলাতে সাহায্য করবে।

তামাটি গলে তরল হতেই আবার কিছু শুকনো লতার রস পূর্বের মত ছেঁচে বার করে ওর মধ্যে ফেলে দিলেন। খানিক পর দেখা গেল তামাটা সোনা হয়ে গেছে। লতা, বাটি ইত্যাদি সব ঐ ঝোলার মধ্যেই ছিল।

সংবাদটা খুব গোপনে রাখা হলো। সাধুদের সেবায় সন্তুষ্ট করে অনুরোধ জানালেন ভক্তটি, কিছু বেশী সোনা করে দিতে হবে। তাঁরা উপস্থিত মত রাজী হলেন। এদিকে তামা ও কাঠ কয়লা সংগ্রহ হতে লাগলো। ভোরের দিকে ঘুম ভাঙ্গাতে দেখা গেল, সাধুরা নেই, পালিয়ে গেছে। এটি প্রায় চল্লিশ বছর আগের কথা।

(২)

হিমালয় প্রদেশের অতি গভীর অরণ্যে একদল তপস্বীর আস্তানা আছে। এঁরা কেউ ভিক্ষা করেন না। সেখান থেকে প্রয়োজন মত সোনা তৈরী হয়ে শহরে আসে। বিক্রী করে ঐ পয়সায় আটা-ঘি ইত্যাদি কেনা হয়। চলে যায় ঐ তপস্বীদের আস্তানায়।

এটি আমার শোনা কথা। তবে বিশেষ একজন সাধুর মুখে শুনেছিলাম। এঁর কোনো আশ্রম বা স্থায়ী আস্তানা নেই। অতি উন্নত অবস্থার সাধু ইনি। এঁনার নিত্য চলার পথে, কোনো ভক্ত যথার্থ পরিচয় পেলো তো পেলো, নয়তো পেলো না।

আমার কিছু প্রশ্নের পর হাসতে হাসতে বলেছিলেন, রূপা করাটা শিখে নাও

হড়-হড়িয়া মুসা পানি
দুর্বাদিলে বান্ন,
রাঙকো কসুকে পানি কারো
চাঁদি হোগা খাসা।

হড়-হড়িয়া মুসাপানি লতাটি কিন্তু চিনিয়ে দেননি। বলেছিলেন এ অঞ্চলে হয় না। এ হচ্ছে বিহারের [illegible] অঞ্চলের কথা।

কালিকানন্দ ব্রহ্মচারী
বারাকপুর

ডায়েরির ছেঁড়া পাতা

ফাদার দ্যতিয়েনের "ডায়েরির ছেঁড়া-পাতা"য় পাণ্ডিত্যের ও সুক্ষ্মহাস্যরসের যে অপূর্ব সমন্বয় (ফরাসীদের ইহা বিশিষ্টতা) আমরা পাই তাহা প্রমথ চৌধুরী, নীরদচন্দ্র চৌধুরী ও প্রমথনাথ বিশীর রচনা ছাড়া বাংলা সাহিত্যে আর কোথাও দেখি নাই। ৮ই নভেম্বরের দেশ সংখ্যায় তাঁহার লেখা "প্রথম বাঙ্গলা লেখিকা—কৃষ্ণকামিনী মিত্রমুস্তাফী" সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে, আপনার পত্রিকায় যদি দয়া করিয়া ছাপান হয় তাহা হইলে বাধিত হইব।

আমিও মিত্রমুস্তাফী বাড়ির কুলবধূ। আমার নিকট "উলার মুস্তৌফী-বংশ" নামক (শ্রীসুজননাথ মিত্রমুস্তাফী লিখিত) একটি পুস্তক আছে। তাহাতে মুস্তৌফীদের তিন শাখার [উলার (আদিশাখা) সুখড়িয়া ও শ্রীপুর] বংশ পরিচয় বিশদভাবে দেওয়া আছে। এই পুস্তক হইতে আমরা জানিতে পারি শ্রীমতী কৃষ্ণকামিনী মিত্রমুস্তাফীর স্বামী শশীভূষণ বিশেষ শিক্ষিত ছিলেন। তিনি এলাহাবাদে সর্বপ্রথম "প্রয়াগদূত" নামক সংবাদপত্র প্রচার করিয়া বহুদিন উহার সম্পাদকতা করেন। শশীভূষণ কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন যথা "তত্ত্বচূড়ামণি", "সহজ সত্যতত্ত্বজ্ঞান", "ভবরোগের মহৌষধি" ও "বাক্যতত্ত্বাদুতরস" প্রভৃতি (উলার মুস্তৌফী বংশ—সুখড়িয়ার শাখা বংশ ১৪৬ ও ১৯২ পৃষ্ঠা)। ইহাতে কিন্তু শ্রীমতী কৃষ্ণকামিনী-দেবীরকোন উল্লেখ পাই না। তবে কয়েক পৃষ্ঠার পরেই ঐ বংশের বধূ নগেন্দ্রবালা সরস্বতী সম্বন্ধে লেখা আছে। তিনি ঐ বংশের বধূ হইয়া বংশের মুখোজ্জল করিয়াছেন। নগেন্দ্রবালা—"মর্মগাথা", "প্রেম-গাথা", "নারীধর্ম", "অমিয়গাথা" "ব্রজগাথা" ও "কুসুমগাথা" ইত্যাদি নামক কয়েকখানি কবিতা ও গদ্যপুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন (পৃষ্ঠা ১৯২)

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে যদি কৃষ্ণকামিনী দেবী বাঙ্গলার প্রথম লেখিকা হইতেন তাহা হইলে কি তাঁহার উল্লেখ ঐ পুস্তকে থাকিত না, "চিত্তবিলাসিনীর" প্রকৃত লেখক বা লেখিকা কি শশীভূষণ না তাঁহার স্ত্রী কৃষ্ণকামিনী দেবী? এই বিষয়ে ফাদার দ্যতিয়েন বা অন্য বিদগ্ধ পাঠক পাঠিকা-দিগের আলোকপাত করিতে অনুরোধ করিতেছি।

বাণী মুস্তাফী
[illegible]

ছোট গল্প প্রসঙ্গে

ছোট গল্পের সমাদর দিন দিন কমে যাচ্ছে, এই নিয়ে বিলাপ প্রায়ই নানা লেখকের নানা প্রবন্ধে ঘুরে ফিরে আসে। ব্যাপারটা এখন খানিকটা একঘেয়ে হয়ে গেছে বলা যায়। এখন মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই যে নানা পত্র-পত্রিকায় মাঝে মাঝে দু' একটা ছোট গল্প ছাপা হলেও এই জিনিসটির প্রতি সাধারণ পাঠকের প্রীতি অনেকটা কমে গেছে। অর্থাৎ, তিরিশ পাতার একটি রচনাকে উপন্যাস বলে চালালে পাঠকের আপত্তির বদলে আগ্রহ বাড়বে, কিন্তু পনেরো-কুড়ি পাতার একটি রচনাকে গল্প বললে পাঠক আকৃষ্ট হবে না। এ এক ধাঁধা কিংবা মজা, কিন্তু এই রকমই চলছে।

বই কেনার সময়—অবশ্য কজনই বা আজকাল বই কেনে, বই উপহার দেওয়ার দিন তো আর নেই-ই বলতে গেলে। কিংবা লাইব্রেরী থেকে বই আনার সময় পাঁচ ছটি বিভিন্ন ছোট গল্প সম্বলিত একটি বই আনতে পাঠক অরাজী। কিন্তু একটি ছোট গল্পকেই ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে উপন্যাস হিসেবে বই করিয়ে দিলে পাঠকের আর আপত্তি নেই। ফলে, ব্যাপারটা দুষ্টচক্রে পরিণত হয়েছে। পাঠকের আগ্রহ নেই বলে প্রকাশকরা ছোট গল্পের বই ছাপতে চান না, বই ছাপা হয় না বলে লেখকদের এ সম্পর্কে আগ্রহ কমে আসছে, ফলে বাংলা সাহিত্যের এই শাখাটি দিন দিন হতমান।

সারা বিশ্বেই ছোট গল্পের এই দশা, এ কথায় খুব একটি সান্ত্বনা পাওয়া যায় না। কারণ বাংলা সাহিত্যের এই শাখাটি ছিল বিশেষ উন্নত, অনেকটা গর্ব করার মতো। পুরো ইতিহাস পুনরুক্তির দরকার নেই, যেসব লেখকের বয়েস এখন পঞ্চাশের এপারে ওপারে, তাঁদের অনেকেই অনেকগুলি অত্যুজ্জ্বল গল্প লিখেছেন। বাংলা ছোট গল্পের শেষ গৌরবময় যুগে বিরাজ করেছেন এঁরা। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, নরেন্দ্র মিত্র, সন্তোষকুমার ঘোষ, রমাপদ চৌধুরী, বিমল কর, সমরেশ বসু প্রভৃতির বেশ কয়েকটি ছোট গল্প বহুদিন নিবিষ্ট পাঠকের মনে থাকবে। এঁদের সবারই চার পাঁচটি করে গল্প গ্রন্থ আছে। এঁদের পর যাঁরা লিখতে এলেন, তাঁদের মধ্যে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, মতি নন্দী, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, দীপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, কবিতা সিংহ, দিব্যেন্দু পালিত, শংকর চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকেই মনোযোগ দিয়ে চমৎকার গল্প লিখছিলেন, কিন্তু এঁরা এসেছেন ছোট গল্পের অবনতির যুগে। প্রকাশকরা এঁদের প্রতি বিমুখ। এঁদের কারুর কারুর দু'একখানা উপন্যাস বেরিয়েছে, কিন্তু ছোট গল্পের বইয়ের সংখ্যাই ওঠে না। ব্যতিক্রম শুধু দীপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়—এঁদের একটি করে গল্প গ্রন্থ বেরিয়েছিল।

যাই হোক, ছোট গল্পের ক্ষেত্রে একটু সুখবর আছে। তরুণ লেখকদের দুটি নতুন ছোট গল্পের বই বেরিয়েছে। দুটি কিংবা সওয়া দুটি।

এতকাল পরে দেবেশ রায়ের প্রথম ছোট গল্পের বই বেরুলো, নাম **"দেবেশ রায়ের গল্প।"**। এই শক্তিমান লেখকের গল্পের ধারা পাঁচ ছ' বছর আগে অন্য একদিকে মোড় নেয়। তাঁর দ্বিতীয় ধারার গল্প এই গ্রন্থে স্থান পায়নি—এতে আছে তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত গল্প, যার কয়েকটি বেরিয়েছিল দেশ পত্রিকায়। বইটি বাংলা ভাষায় একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গল্পের বই হিসেবে গণ্য হবার যোগ্য।

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের দু'খানি বই বেরিয়েছে চিত্তাকর্ষক আকারে। **"সমবেত প্রতিদ্বন্দ্বী"** একটি সুদৃশ্য পকেট বই, এতে নাম গল্পটি ছাড়া আরও অনেকগুলি রচনা আছে—যাদের হয়তো ঠিক গল্প বলা

যায় না, কিন্তু গল্পের উপাদান সমন্বিত এবং নিশ্চিত আকর্ষণীয় পাঠ্য।

মিনি বুক নামে একটি অভিনব গ্রন্থমালা প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়েছে একটি গোষ্ঠী। মিনি বুকের প্রথম খন্ড বেরিয়েছে, **"বিপ্লব ও রামমোহন"**—সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের একটি মাত্র গল্প নিয়ে। গল্প ছাড়াও এতে আছে বিচিত্র সব ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন।

অনুবাদে মায়াকভস্কির লেনিন

সিদ্ধেশ্বর সেন একজন খ্যাতনামা কবি। এ পর্যন্ত তাঁর নিজস্ব কোনো কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি যদিও, কিন্তু মায়াকভস্কির বিখ্যাত কাব্য "ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন" তিনি সমগ্রভাবে অনুবাদ করে প্রকাশ করেছেন। অনুবাদে যেমন আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা আছে, তেমনি মায়াকভস্কির জোরালো কবিত্বও অনেকখানিই বাংলায় উপস্থিত হয়েছে।

কৃত্তিবাস ও শতভিষা

এই দুটি কবিতার পত্রিকাই প্রায় বছর পনেরো ধরে বেরুচ্ছে। শতভিষা কৃত্তিবাসের চেয়েও পুরোনো, সম্প্রতি বেরিয়েছে এর সাঁইতিরিশ নং সংকলন। কৃত্তিবাসের নতুন সংকলনটির নম্বর আঠাশ। কৃত্তিবাসের সম্পাদক বদল হয়ে গেছে, এখন এর ভার এসেছে যথেষ্ট তরুণ কবিদের হাতে, এখন সম্পাদক বেলাল চৌধুরী।

কৃত্তিবাসের নতুন সংখ্যায় প্রচুর কবির কবিতা, অনেকের লেখা এই প্রথম ছাপার অক্ষরে বেরুলো, তেজী, টগবগে, নিয়ম না-মানা রচনা। লেখাগুলো পড়লে যে বেপরোয়া শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, বাংলা কবিতায় এখন যে তার বিশেষ প্রয়োজন আছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে প্রবন্ধের অংশে 'কৃত্তিবাস' আগের মতনই কাঁচা।

শতভিষা সেই তুলনায় একটু রক্ষণশীল। অধিকাংশ রচনাই খ্যাতিমান কবিদের, নতুন কবিও কয়েকজন আছেন। কবিতায় মান ও শুদ্ধতা রক্ষার দিকেই অধিকাংশ কবি সচেতন।

সনাতন পাঠক

সাহিত্য আকাদমী পুরস্কার

সাহিত্যের আম্রকাননে শ্রেষ্ঠ কীর্তির জন্য ভারতীয় সাহিত্যের শ্লাঘ্যতম প্রতিষ্ঠান—সাহিত্য আকাদমী পূর্বে ভারতের যে তিনজন বিশিষ্ট সাহিত্যিককে এ বছর সম্মানিত করেছেন, সম্প্রতি জাতীয় গ্রন্থাগারে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে তাঁদের সম্বর্ধনা জানানো হয়। দিল্লীতে উপস্থিত হতে না পারায় এঁরা কলকাতায় পুরস্কার গ্রহণ করলেন।

সম্মানিত সাহিত্যিকদের মধ্যে ডঃ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'আকাদমীর ফেলো', শ্রীমতী নলিনীবালা দেবী ও শ্রীসূর্যনারায়ণ দাসকে 'আকাদমীর ফলক' দেওয়া হয়। সাহিত্য আকাদমীর সভাপতি, জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় নির্বাচিত সাহিত্যিকদের তাম্র ফলকে খোদিত মানপত্র প্রদান করেন।

সম্বর্ধনার প্রশস্তিপত্রে ডঃ তারাশঙ্কর সম্পর্কে বলা হয় : বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের মত তারাশঙ্করের সাহিত্য প্রতিভা বাংলা ভাষার সীমা অতিক্রম করে আজ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন 'ভারতের ভাষা অনেক, কিন্তু সাহিত্য এক।' শ্রীমতী নলিনীবালা দেবীর কাব্যগ্রন্থ শুধুমাত্র অসমীয়া সাহিত্যেই নয়; ভারতের সাহিত্য সাধনার ক্ষেত্রেও একটি আদর্শ আলোক-বর্তিকা। স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম যোদ্ধা, উৎকল সাংবাদিক সংগঠনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শ্রীসূর্যনারায়ণ দাস তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিতে যে কীর্তি স্থাপন করেছেন সমাজ-সাহিত্যের ইতিহাসে তা বিরল।

সম্বর্ধনার উত্তরে সাহিত্য আকাদমীকে ধন্যবাদ জানিয়ে ডঃ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বাংলার পল্লী অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মধ্যে যে প্রাণলীলা প্রত্যক্ষ করেছি, সাহিত্যে তাকেই রূপদানের চেষ্টা করেছি। আমার এই সাহিত্য যদি সাহিত্য-সরস্বতীর আশীর্বাদ লাভ করে তবেই আমি সার্থক।

শ্রীমতী নলিনীবালা দেবী আবেগজড়িত কণ্ঠে বলেন, ভারতীয় দর্শন আমার মনে গভীর প্রেরণা সৃষ্টি করেছে। আমি সেই দর্শনকেই কবিতার মাধ্যমে বন্দনার চেষ্টা করেছি। তাঁকে অসমীয়া ভাষায় রচিত 'অলকানন্দা' কাব্যগ্রন্থের জন্য 'সাহিত্য আকাদমী ফলক' দেওয়া হয়।

বিদগ্ধজনের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে শ্রীসূর্যনারায়ণ দাস বলেন, এই সম্মাননার গর্ব আমাকে কখনও যেন সৃষ্টি-বিমুখ করে না তোলে। 'ওড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাস' (ওড়িয়া ভাষায় রচিত) গ্রন্থের জন্য তাঁকে 'সাহিত্য আকাদমী ফলক' দেওয়া হয়।

এদিনের অনুষ্ঠানে "পথের পাঁচালী"র ইংরেজী অনুবাদের রয়ালটি বাবদ প্রাপ্ত প্রায় ৪ হাজার টাকার একটি চেক স্বর্গীয় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী শ্রীমতী রমা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেওয়া হয়।

সম্প্রতি সাহিত্য আকাদেমী কর্তৃক প্রকাশিত ৪১টি গ্রন্থ আনুষ্ঠানিকভাবে এদিন মুক্তি পেল।

বিভূতিভূষণের পৈতৃক ভিটা

'পথের পাঁচালী'-খ্যাত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৈতৃক ভিটা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। কলকাতা থেকে ৫০ মাইল দূরে বনগাঁর কাছে বারাকপুর গ্রামের এই পল্লী নিকেতনটি "বিভূতিভূষণ স্মৃতি সংগ্রহশালা" নামে অভিহিত হবে। এখানে থাকবে বিভূতিবাবুর লেখা চিঠিপত্র, পান্ডুলিপি এবং দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিসপত্র। পাশে থাকবে অতিথিশালা। বিভূতিবাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গীয় নুটবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে এর নামকরণ হবে। সেখানে কবি, সাহিত্যিক এবং সাহিত্যপ্রেমীরা অবসর সময় কাটাতে পারবেন। রাজ্য সরকার এরও কর্তৃত্বভার নেবেন।

বারাকপুরের বাসভবনে এক সাক্ষাৎকারে উপরোক্ত সংবাদ জানিয়ে শ্রীমতী রমা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, সম্ভবত আগামী জানুয়ারিতে আনুষ্ঠানিকভাবে রাজ্য সরকার এটি গ্রহণ করবেন। রমা দেবী বিভূতিবাবুর ঘাটশিলার বাড়িটিও রাজ্য সরকারের হাতে অর্পণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারের সঙ্গে সমস্ত রকম যোগাযোগ করছেন তাঁর ভাই শ্রীচন্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়।

সুজন চন্দ
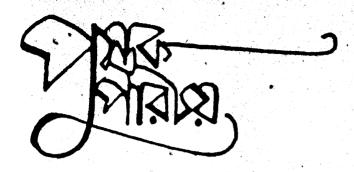
বিজ্ঞান

মানব-কল্যাণে রসায়ন। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। প্রকাশ ভবন, কলিকাতা-১২। সাত টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

আদিমতম কাল থেকে মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের সংগে সংগে বিজ্ঞানের যে শাখাটি বিশেষভাবে জড়িত রয়েছে তার নাম রসায়ন। কৃত্রিম উপায়ে আগুন সৃষ্টি, বিভিন্ন ধাতুর নিষ্কাশন পদ্ধতি আবিষ্কার, বনজ উদ্ভিদ থেকে ওষুধ অথবা খাদ্য সংগ্রহ প্রভৃতি উদ্ভাবনার মূলে ছিল বেঁচে থাকার তাগিদ। আর প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে বর্ণাঢ্য রং তৈরি করে ফিনিশিয় কাঁচের গায়ে বিচিত্র অলংকরণের কাজ করার পেছনে ছিল সম্ভবত মানুষের মধ্যে মন নামক যে জিনিসটি রয়েছে তাকে সজীব রাখার চেষ্টা। এরই এক নাম সংস্কৃতি বা কৃষ্টি। এরও মূল কথা রসায়ন।

মানব-কল্যাণে রসায়ন-এ শ্রীদেবেন্দ্র বিশ্বাস আদিকাল থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত রসায়ন জগতের সেই বিশেষ এবং ব্যাপক দিকের কথা পর্যায়ক্রমিকভাবে আলোচনা করেছেন যা মানুষকে সহজতর-ভাবে বেঁচে থাকতে সাহায্য করেছে; তার সংস্কৃতির মধ্যে এনেছে নব নব মূল্যায়ণ। মোট ষোলটি অধ্যায়ে লেখক আলোচনা করেছেন রসায়নের উদ্ভব, কৃষি-রসায়ন, ধাতু এবং সংকর ধাতু, বিভিন্ন জ্বালানি, রসায়ন এবং তড়িৎশক্তি থেকে আণবিক গঠন তত্ত্ব, হার্মোন এবং ভিটামিন প্রভৃতি আধুনিকতম বিষয়সমূহ। প্রাচীন কয়েকটি রাসায়নিক শিল্প সম্পর্কিত অধ্যায়টি সর্ব-সাধারণ পাঠকের মনে যথেষ্ট কৌতূহল সৃষ্টি করবে। আজকের দিনে রসায়ন শাস্ত্রের বহু বিস্তৃত ক্ষেত্রকে সীমিত পরিসরের মধ্যে তুলে ধরা খুবই কঠিন ব্যাপার। তবু লেখকের উদ্যম সার্থক হয়েছে এই কারণে যে, আলোচ্য গ্রন্থে লেখক সব সময়েই 'প্র্যাগমেটিস্ট'। তাই তাঁর বেশির ভাগ বক্তব্য শুধু সেই সমস্ত বিষয়কে ঘিরেই আবদ্ধ রয়েছে যাদের সংগে আমাদের সম্পর্ক অতি নিকটের। যদি কেউ 'দিয়াশলাই' সম্পর্কে জানতে চান, জানতে পারবেন। কৃষি-জগতের সংগে যাঁরা জড়িত তাঁরা জানবেন 'সার' কাকে বলে, সার কি কি কাজ করে, কখন এবং কেন দরকার। ভিটামিন সম্পর্কে সুন্দর একটি ধারণা এতে পাবেন। শুধু বিজ্ঞানের ছাত্রই নয়, বিজ্ঞান সম্পর্কিত জ্ঞান যাঁদের সীমিত অথচ বিজ্ঞান জানতে চান তাঁদের কাছেও বইটি যে যথেষ্ট সমাদর পাবে, বলাই বাহুল্য। ভাষা সহজ, উপস্থাপনায় কোন জটিলতা নেই। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চা প্রসারের নিমিত্ত রচিত এই বইটি সর্বশ্রেণীর পাঠকের কাছে সমাদর পাবে। তবে একটি বক্তব্য : এ ধরনের বই-এ আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে ভারতীয় রসায়নবিদদের কথা মাঝে মাঝে উল্লেখ করলে এ দেশীয় পাঠকের কাছে বইটির মূল্য অনেক বেশী হত। আচার্য প্রফুল্ল-চন্দ্র রায়-এর 'দি হিস্টোরি অব অ্যানসিয়েন্ট হিন্দু কেমিস্ট্রি' বইটির কথা এক্ষেত্রে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন হিন্দু যুগে কনাদ প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের অবদান অনস্বী-কার্য। বর্তমানেও ভারতের বিভিন্ন সরকারী বা বেসরকারী গবেষণাগারে রসায়ন বিদ্যার উপর বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য গবেষণা হচ্ছে। বিগত কয়েক দশকে এই বাংলা দেশেই এমন কিছু সংখ্যক রসায়নবিদ কাজ করেছেন যাঁরা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নমস্য। শ্রীবিশ্বাস যদি ফাঁকে ফাঁকে এঁদের কথা উল্লেখ করতেন অন্তত বাঙালী পাঠক-পাঠিকারা জানতে পারতেন বিজ্ঞান সাধনায় ভারতও কম অগ্রণী নয়। এতে করে বিজ্ঞান-চর্চার প্রসারের সংগে সংগে দেশীয় বিজ্ঞান-প্রচেষ্টা এবং বিজ্ঞানীদের কথা জেনে অনেকেই নিজেদের সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল হওয়ার অবকাশ পেতেন। আমাদের অনুরোধ, শ্রীবিশ্বাস ভবিষ্যতে এ দিকটির উপর একটু ভেবে দেখবেন।

মহাকাশ পরিচয় : শ্রীজিতেন্দ্রকুমার গুহ। কলুটির বিজ্ঞান পরিষদ, পি-২৩, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। পাঁচ টাকা।

গত দুই দশকে জ্যোতির্পদার্থবিদ্যার ক্রমোন্নতির সংগে সংগে মহাকাশ রহস্যের বহু 'আলো-আঁধারি' প্রশ্ন যেন অনেকটা সহজতর রূপে বিজ্ঞানীদের কাছে ধরা পড়ছে। সেই সংগে তাদের সমাধানও। মহাকর্ষের মধ্যে এসে কোন বস্তু কেন উপবৃত্তীয় পথে পরিক্রমণ করে? চাঁদের আসল স্বরূপটি কি? রাশি-চক্র, গ্রহের জন্মকথা, বর্ণালীবীক্ষণযন্ত্র, সুদূরে জ্যোতিষ্কের দূরত্ব নির্ণয়—মহাকাশ জগতের সংগে পরিচিত হতে গিয়ে এমন অনেক কিছুর কথাই এসে পড়ে। বিক্ষিপ্ত-ভাবে এদের পরিচয় কেউ কেউ রাখলেও এদের সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান অনেকেরই থাকে না। 'মহাকাশ পরিচয়' বাংলা ভাষার পাঠকের এই অভাবটি দূর করায় ব্যাপারে যে যথেষ্ট সহায়ক হবে একথা বলাই বাহুল্য। আলোচ্য গ্রন্থে শ্রীজিতেন্দ্রকুমার গুহ সহজ এবং সরলতম পদ্ধতিতে মহাকাশের সংগে সর্বসাধারণ পাঠক-পাঠিকার পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। মোট একুশটি অধ্যায়ে লেখক মহাকাশ সম্পর্কীয় প্রাচীন কিংবদন্তি নিয়ে যেমন পর্যায়ক্রমিক আলোচনা করেছেন, সেই সংগে জ্যোতি-র্বিজ্ঞানের আধুনিকতম বিষয়, যেমন, ব্রহ্মাণ্ডের প্রসারণ, সৃষ্টি এবং তার স্বরূপ, বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞান, নক্ষত্রের জীবন-প্রণালী প্রভৃতি জটিল বিষয়গুলির কথাও উল্লেখ করেছেন। ছায়াপথ এবং নীহারিকা সম্পর্কে যেটুকু তথ্য পরিবেশিত হয়েছে, এক কথায় তা অনবদ্য। এদের উপর এমন সুস্পষ্ট আলোচনা বাংলা ভাষায় বিরল। তবে মহাকাশ অভিযান বিষয়ক অধ্যায়টি আরও একটু বিস্তৃত হলে ভাল হত। রকেট পরিচালন এবং রকেটের গতিমুখ পরি-বর্তনের ব্যাপারে লেখকের বক্তব্য কিন্তু অস্পষ্ট এবং বেশ কিছুটা সংশয়পূর্ণ। তবে বলা চলে, শুধু অনুসন্ধিৎসুই নন, যাঁরা সাধারণভাবে মহাকাশ বিজ্ঞান এবং জ্যোতি-র্বিদ্যার বিভিন্ন বিষয়গুলি জানতে চান বইটি তাঁদের ভাল লাগবে। এর কিছু কিছু তথ্য রীতিমত চমকপ্রদ। কিছু কিছু আবিষ্কারের ঘটনা এত সাম্প্রতিক যে, তাদের খবর অনেকেই হয়ত রাখেন না।

অনুবাদ সাহিত্য

জগন্নাথের রথ। অজিত গঙ্গোপাধ্যায়। সেনগুপ্ত বুক হাউস, ৩০৩এ বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬। দাম তিন টাকা।

হ্যামলেট। অনুবাদঃ অজিত গঙ্গোপাধ্যায়। সেনগুপ্ত বুক হাউস, ৩০৩এ বিবেকানন্দ রোড, কলকাতা-৬। দাম তিন টাকা পঞ্চাশ।

বাংলাদেশে নাটক লেখা আর নাটক করা সবচেয়ে সোজা ব্যাপার। এখানকার হাওয়ায় এমন গুণ যে হু-হু করে নাটক জন্মায়। আজ ম্যাজিকলণ্ঠনের বৃষ্টি পাওয়া যায় তেমন কুলীন কুলতিলক নাটক নেই—এ অভিযোগও অনেক কালের। কেন নেই? সেকথা বলতে গেলে অনেক কথাই বলতে হয়। শুধু আলোচ্য দুটি নমুনা-নাটকে তার উত্তর খানিক খানিক রয়েছে। নাটক দুটির কোনটি মৌলিক রচনা নয়। 'জগন্নাথের রথ' নামে মালুম হয় নাটকটি দেশজ, কিন্তু বইয়ের ভিতর দিকে এক জায়গায় লেখা আছে: 'গল্‌সওয়ার্দি' অনুপ্রাণিত।' গলসওয়ার্দির কোন্ নাটক, নাট্যকার গোপন রেখেছেন কিন্তু আমরা জানি এটি 'জাসটিস'। কলেজের ছেলে-মেয়েরাও জানে, কেন না ওটা তাদের পাঠ্য। এখন, তারা যদি 'জাসটিস' পড়ার পর 'জগন্নাথের রথ' পড়তে যায় তাহলে তাদের কেমন লাগবে? সংলাপ, চরিত্র ঘটনা-বিন্যাসের বহর দেখে তারা কি খুশী হতে পারবে? হয়তো পারবে, জানি না।

'হ্যামলেট' শেক্‌সপীঅর-এর বঙ্গানুবাদ কিন্তু আসলে এটি আরো জটিল কর্মকাণ্ড। নাট্যকার শব্দ-সংগ্রহে প্রচুর পরিশ্রম স্বীকার করেছেন কিন্তু আদত শেক্‌সপীঅরে তিনি মোটে মন দেননি। ফলে এটি পয়ার হয়েছে, না আধুনিক গদ্যকাব্য হয়েছে তা (অবান্তর)। মূল হ্যামলেটের সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে চাইলে দেখা যাবে অনুবাদক প্রাণপণে শব্দের এক-দুর্ভেদ্য পাঁচিল তুলতে চেয়েছেন বটে কিন্তু এক্ষেত্রে যা হয়, শেক্‌সপীঅর যথারীতি স্ট্যাটফোর্ড-এ থেকে গেছেন, তাঁকে বিন্দুমাত্র উদ্ধার করা যায়নি। উপরন্তু বিখ্যাত বিখ্যাত লাইনের বাংলা চেহারা দেখে আঘাত পেতে হয়। চতুর্থ অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে ওফেলিয়া-র 'হাউ শুড আই ইওর টু লভ নো ফ্রম অ্যানাদার ওয়ন' গানের বঙ্গানুবাদ হয়েছে: 'অন্য লোকে মিথ্যা বাসে, তুমি আমার সত্যি ভালবাস।' প্রাচীন লোকগাথা ইত্যাদির খবরাখবর রাখা শেক্‌সপীঅর অনুবাদের আবিশ্যাক কর্তব্য। কেবল আক্ষরিক ভাবান্তর কি পরিমাণ বিড়ম্বনার কারণ হয় তা ওফেলিয়া-র আরেকটি গানের বঙ্গানুবাদে প্রকট: 'Hey nonny'-র শব্দগত কোন অর্থ নেই। কিন্তু এটি এক প্রাচীন ব্যালাড; ঘুম পাড়াবার ছন্দ। সেখানে অনুবাদক সোজাসুজি 'হে ননি' বসিয়ে দায়িত্বমুক্ত হয়েছেন। এইরকম ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত আছে। শেক্‌সপীঅর বহুদিন ধরে বঙ্গদেশে বধ হয়ে আসছেন; এখনো কি তাঁর প্রতি একটু ক্ষমার, ভদ্রিষ্ঠ হওয়া যায় না? হ্যামলেটের বাবার ভূত বলছে: 'পিটি মি নট, বাট লেন্ড দাই সিরিয়াস হিয়ারিং'। সেটি করতে গেলে দক্ষ আধুনিক কবিদের অনুবাদের কাজে লাগতে হয়।

কবিতা

পাখি জানে। মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত। সাহিত্য ১৮ পদ্মপুকুর রোড, কলকাতা-২০। তিন টাকা।

বাহান্নটি কবিতার সুগ্রথিত 'পাখি জানে' এই কাব্যগ্রন্থটিতে মলয়শঙ্কর দাশগুপ্তের ১৯৬৪-৬৫ সালের একটি সম্পূর্ণ ছবি ফুটে উঠেছে। মলয়শঙ্কর রোমাণ্টিক কবি, তাঁর কবিতায় তাই ফিরে ফিরে স্মৃতি আর স্বপ্নের উপন্যাস, প্রকৃতির স্বপ্নরূপ তার অনুভবে অপরূপ হয়ে উঠেছে। প্রেম অনেক সময়েই রোমাণ্টিক নস্টালজিয়ার কাতর—শৈশব-কৈশোর-যৌবনের দুর্লভ পংক্তির বর্ণাঢ্য আঁচড়ে। রসঘন অনুভব প্রত্যাবর্তনাকাঙ্ক্ষী। মলয়বাবুর কবিতা প্রেমের এই ব্যাকুলতায় প্রাণবন্ত।

মলয়বাবু চিত্রকর, তার স্পষ্ট প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর কবিতাগুলির অনেক পংক্তির বর্ণাঢ্য আঁচড়ে। রসয়ন অনুভব যেখানে একটি দুটি রেখার বন্ধনে স্মিতোজ্জ্বল ['রূপসী ব্যাধের তূণ অরণ্যে পাঠায় কুজশর']। সেই সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ অকপট বাচনভঙ্গি ['লালটু ঘুলটু পূর্ণিমার চাঁদ'] আমাদের নিকটবর্তী করে। তাঁর প্রেমের কবিতাগুলির পাশাপাশি সাংবাদিক সপ্রতিভতা, এবং চলমান পর্যবেক্ষণ অনেক কবিতায় সংবেদনশীল হয়ে উঠেছে। ইদানীং ক্রমশ এই হৃদ্যতা এবং মুগ্ধতা বাংলা কবিতায় কমে আসছে। 'পাখি জানে' কবিতার বই-এ একজন প্রতিশ্রুতিবান তরুণ কবির অটোগ্রাফ স্বযত্নে স্বাক্ষরিত হয়ে রয়েছে দেখতে পেলাম।

পত্রিকা

শতরূপা। সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৪ মাকড়দহ রোড, কদমতলা, হাওড়া-১।

ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র শতরূপার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা, (হেমন্ত-শীত, ১৩৭৬) আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অশীতিতম জন্মতিথিতে প্রকাশিত এবং তাঁরই পবিত্র নামে উৎসর্গীকৃত। এই ত্রৈমাসিক পত্রিকাটি হাতে নিলেই মনে হয় যে, শতরূপাকে সময়োপযোগী এবং সত্য-সুন্দর করে তোলবার জন্যে কর্তৃপক্ষ আগ্রহী। সর্বশ্রী পুষ্পিতারঞ্জন ভাগবত রত্নের 'শ্রীশ্রীরাসপূর্ণিমা', সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'মার্কসের শিল্পমানস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের 'রবীন্দ্রনাথ-সঙ্কলিত পদরত্না-বলী' গান্ধী জন্ম-শত বর্ষিকী দিবস উপলক্ষে রচিত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'একখানি জলভরা মেঘ' প্রভৃতি প্রবন্ধ বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এ ছাড়া স্বর্গত সঞ্জয় ভট্টাচার্য ও সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কবিতা সহ শতরূপা গল্প, নাটক ও ধারাবাহিক উপন্যাসে বেশ একটু নতুন নজির রেখে প্রকাশিত হয়েছে বলে বোধ হল। এই ত্রৈমাসিকের সফল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

পারাবত [মাসিক পত্রিকা] তৃতীয় বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, ১৩৭৬। সম্পাদক: আনন্দ বাগচী। প্রতাপবাগান, বাঁকুড়া।

রুচিশীল, পরিচ্ছন্ন এই মাসিক পত্রিকাটি বর্তমান সংখ্যায় যাঁরা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে সত্যেন্দ্র আচার্য, মানস রায়-চৌধুরী, মাণিকলাল সিংহ, চণ্ডীমণ্ডল, রবীন সুর শ্যামলকুমার মাইতি, রবীন্দ্র গুহ, শিপ্রা ঘোষ, বিবেকজ্যোতি মৈত্র, কালীপদ কোঙার, অবনী নাগ, কামাক্ষা সরকার, আরতি সেন, বীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যো-পাধ্যায়, বিমলকান্তি ভট্টাচার্য, অবিনাশ রায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

রঙ্গজগৎ

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র সপ্তাহ

ডোনট লেট দি এঞ্জেলস ফল

এই শীতে কলকাতায় ও আশেপাশে যথারীতি সার্কাসের তাঁবু পড়েছে। নতুন আর একটি সার্কাস হয়ে গেল—ফেস্টিভ্যাল ফিল্ম উইক অর্থাৎ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র সপ্তাহ। ব্যবস্থা হয়েছিল ভালই. পাঁচটি সিনেমা হলে দশটি ছবি। সাংবাদিকদের জন্য আলাদা শো'র ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু ফিল্ম সোসায়েটি ও ক্লাবের সভ্যরা বঞ্চিত হলেন কেন? তাঁদের জন্য কি কোন বিশেষ ব্যবস্থা করা যেত না? ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসায়েটিজ-এর অন্তর্ভুক্ত ক্লাবগুলির সদস্যদের জন্য বিশেষ প্রদর্শনী কিংবা অন্য সুবিধা থাকলে ফিল্ম সোসায়েটি আন্দোলনকে মর্যাদা দেওয়া হত। ফিল্ম সোসায়েটি মুভমেণ্ট সব সভ্য-দেশেই সরকারের কাছ থেকে স্বীকৃতি ও মর্যাদা পাচ্ছে। চলচ্চিত্র-বোধ তাঁরাই জন-সাধারণের মধ্যে সৃষ্টি করছেন। অস্বীকার করা যায় না, সিনে আর্প্রিসিয়েশন বলতে তো কলকাতায়ই আছে। এবং তার মূলে ফিল্ম ক্লাবগুলির দান কতখানি তা কি বিশেষ করে সরকারকে বোঝাতে হবে? ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসায়েটিজ যে কারো উপেক্ষিত হয়েছিলেন সেটা খুবই শোচনীয় ব্যাপার।

এবার সার্কাসের কথায় আসি। সার্কাসই তো। কলকাতার জন্য বরাদ্দ ছিল যে-কয়টি ছবি তার মধ্যে ভাল বলতে একটিই "ডোনট লেট দি এঞ্জেলস ফল।" ক্যানাডার ছবি। খুব, খুবই ভাল ছবি। ফ্রান্সের উঁচুদরের আধুনিক চিত্রের প্রায় সমগোত্রীয়। এ ছাড়া আর দুটি ছবির উল্লেখ করা যেতে পারে—"ডেজ অব ম্যাথু" (পোলাণ্ড) এবং "মাই লাভ ইন জেরুজালেম" (ইজরায়েল)। শেষের ছবিটিতে বিবাহিত জীবনে অসুখী এক শিক্ষিত ব্যক্তির যন্ত্রণা সোজাসুজি দেখানো হয়েছে। দম্পতি নিঃসন্তান। সদ্যোপরিচিত একটি মেয়ে তাকে যখন জিজ্ঞাসা করে—তোমার সন্তান-দের কে দেখাশোনা করে? তখন সে উত্তর দেয়, "দি পিলস"। অর্থাৎ ওই ব্যক্তি সন্তান চায়, স্ত্রীর মধ্যে চায় সেবিকা। মামুলী সমস্যা। এক্ষেত্রে ছবিটির বিশেষ

আরোগ্য নিকেতন : ছায়া দেবী, রবি ঘোষ ও সন্ধ্যা রায়

বিশ্বরূপায় নতুন নাটক "বেগম মেরী বিশ্বাস"-এর প্রস্তুতি কাজে ব্যস্ত তাপস সেন, নাট্যপরিচালক রাসবিহারী সরকার, মঞ্চসজ্জাকর সুরেশ দত্ত ও সংগীত পরিচালক অনিল বাগচী

কোন আকর্ষণ নেই। অনেকটা রিয়্যাল মনে হয়েছে ওই ব্যক্তির দুর্দম জীবন-বাসনার মুহূর্তে, যখন সে চাকুরিজীবী মেয়েটিকে নিয়ে হোটেলে এসে উঠেছে।

পোলাণ্ডের ছবির উপর ভরসা বেশি। "ডেজ অব ম্যাথু" সবটুকু আশা পূর্ণ করেছে তা নয় তবে ছবিটা কিছু পরিমাণে ভাবায়। আর কিছু না হোক, এক ব্যক্তি সব হারিয়ে, বোনকে হারিয়ে, নিঃসংগতার মুহূর্তে আত্মহননের পথই বেছে নেয়।

বরঞ্চ একালের চলচ্চিত্রবোধকে নাড়া দেবার মত বেশ কিছু লক্ষণ ক্যানাডার ছবিটিতে রয়েছে। যুগ-জটিলতার ছবি, বিশ্লেষণের বস্তু অস্থিরতা, সুখী হবার ইচ্ছা ও হতে না পারার যন্ত্রণা, নিঃসঙ্গতা, সমঝোতার অভাব ইত্যাদি। যুগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত রবার্ট হ্যারিসন এবং তার দুই ছেলে—একজন যুবক, অপরজন কিশোর। হ্যারিসনের কাছে বিবাহ অর্থহীন হয়ে গেছে অনেকদিন আগেই, তলে তলে ঘরও অসহ্য হয়ে উঠেছে। ট্র্যাজেডি যখন বিপুল আকারে চারিদিক ঢেকে ফেলেছে, তখন হ্যারিসন বলেছে পুলিশকে—একটা "টেরিবল" কিছু ঘটেছে এই বাড়িতে। ছেলেরাও তখন উধাও, অ্যালিয়েনেশন-এর বিষে বিষাক্ত তাদের মন।

ছবিটিতে বক্তব্য আছে, শেষে টেলি-ভিশনে সেই বক্তব্য উজ্জ্বল ও স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে। আর্টের দিক থেকে এখানেই ছবির খামতি। নতুবা পরিচালক জর্জ ক্যাসেণ্ডার আধুনিক চলচ্চিত্রের ভাষায় তাঁর বলবার বিষয় সুন্দরভাবেই উপস্থিত করেছেন।

আর সব ছবি সার্কাস, নানা রকমের কসরত, যৌন-খেলাও বাদ যায়নি। চলচ্চিত্র উৎসবে এক একটি ছবি যেন ক্লাউনের মত উপস্থিত, পরিচালক তাঁর কুশীলবদের দিয়ে কসরত দেখাতে গিয়ে হিমসিম। অর্থাৎ ভাল ছবি বিশেষ কিছুই আসেনি কলকাতায়। ভাল দুয়েকটি ছবি যাও ছিল পাঠানো হয়েছে অন্যত্র। অথচ ভাল ছবি দেখার দাবি কলকাতারই সব চাইতে বেশি এ-কথা কে বোঝাবে কাকে। আসলে দিল্লিতেই ভাল ছবি তেমন আসেনি। প্রথম শ্রেণীর পরিচালকদের তো নয়ই, সুইডেন বাদ। তবে আর এই ফেস্টিভ্যাল প্রহসন কেন?

টীকা-টিপ্পনী

এবারের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের মোট দশটি ছবি দেখানো হয়েছে কলকাতায়। তাও আবার সব ক'টি ছবিই হচ্ছে প্রতিযোগিতার বাইরের ছবি। উপরন্তু, এই মুষ্টিমেয় দশটি ছবির মধ্যেও দুটি আবার অনেকের দেখা ছবি। "টাট্টু" ও "ক্যাপ্রিসাস সামার" উৎসবের অনেক আগেই আমাদের দেখার সৌভাগ্য হয়ে গিয়েছে ফিল্ম সোসাইটি মারফৎ।

তবু ভালো, ব্যাপার-স্যাপার দেখে কলকাতার ফিল্ম ক্লাবগুলি আগে থেকেই "বয়কট" করেছিলেন এবারের ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। ওঁদের মধ্যে টিকিট বণ্টনের কার্পণ্য শেষ পর্যন্ত না ঘটলেও, হলপ করে বলতে পারি, কলকাতায় ছবি বন্টনের কার্পণ্য দেখে অবশ্যই ওঁরা নিরাশ হতেন। এমনিতেই প্রতিযোগী ছবি একটাও দেখানো হয়নি এখানে, তার উপর প্রতিযোগিতার বাইরের ওই মুষ্টিমেয় ক'খানি ছবির মধ্যেও আবার অধিকাংশই "ট্র্যাশ"। একমাত্র "ডোন্ট লেট দ্য এঞ্জেলস ফল" (কানাডা) ছাড়া এই মুহূর্তে একটা নামও মনে করতে পারছি না যে ছবি মনে দাগ কেটে আছে। বরঞ্চ, ১৯৬৫-র ৩য় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের ছবি-গুলিই এখনো মনে আছে। বার্গম্যান, ওয়াইদা কিংবা গদার তুল্য চিত্রনির্মাতার একখানা ছবি এবারের উৎসবে এল না কেন? আগের বারের মত এবারেও অবশ্য একাধিক ছবিতে দেখলাম কারণে-অকারণে নগ্ন দৃশ্যের ছড়াছড়ি। যথারীতি টিকিটের হাহাকারও ছিল আগের বারের মতই। সমঝদার দর্শক টিকিট পাচ্ছেন না, অথচ প্রমোদকর মুক্ত এক টাকার টিকিট নাকি বাইরে তিরিশ টাকাতেও কেনা-বেচা হয়েছে।

এদিকে ফেস্টিভ্যাল শুরু হওয়ার আগের মুহূর্তে পর্যন্ত জানা যায়নি কী ছবি দেখতে চলেছি। কর্মকর্তাদের প্রশ্ন করে অরণ্যে রোদনই সার হয়েছে। একগাল হেসে ওঁরা সাফ জবাব দিয়েছেন, 'ভগবান জানেন। দিল্লী থেকে কি কি প্রিন্ট আসছে আমরা কেউই জানি না।' মজার কথা, অপেরা সিনেমায় সকাল দশটায় শো, হঠাৎ শোনা গেল শো শুরু হতে দেরী হবে। কারণ? কারণ প্রিয়া সিনেমার প্রিন্ট এখানে চলে এসেছে, এখানকার প্রিন্ট প্রিয়ায়। এদিকে হাউসে দর্শকের শবরীর প্রতীক্ষা! ইতিউতি মৃদু গুঞ্জরন, 'আন-সেনসারড ছবি। না জানি কী দেখব!' আরেকটি অদ্ভুত দৃশ্য নজরে পড়ল। জনৈক দর্শকের হাতে পোর্টেবল ট্রানজিসটার। শো শুরু হয়ে গেছে, স্ক্রীনে ছবি চলছে, লো-ভলিউমে ট্রানজিসটারও বাজছে। ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার পঞ্চম টেস্ট ম্যাচের ধারাবিবরণী শুনছেন দর্শক মহাশয়। পর্দায় হঠাৎ একটি 'দেড়শ' ফিটের নগ্ন দৃশ্য, সঙ্গে সঙ্গে মহাশয়ের ট্রানজিসটার বাজানোও বন্ধ হয়ে গেল। দেড় মিনিট কাল যেন গোগ্রাসে গিললেন দৃশ্যটি, দৃশ্যান্তরের সঙ্গে সঙ্গেই আবার ট্রানজিসটার বেজে চলল।

বলা প্রয়োজন, ইনিও আমন্ত্রণ পেয়ে ফেস্টিভ্যালের ছবি দেখার সুযোগ পেয়েছেন।

—বিচক্র

চলচ্চিত্রে জাতীয় পুরস্কার

রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক আবার এসেছে বাংলায়। চলচ্চিত্রের জাতীয় পুরস্কার প্রতিযোগিতায় সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত হয়েছে সত্যজিৎ রায় কৃত "গুপী গাইন বাঘা বাইন"। এ নিয়ে সত্যজিৎ রায় পরিচালিত কাহিনীচিত্র চারবার স্বর্ণপদক পেল। ছবিগুলি হল: "পথের পাঁচালী" (১৯৫৫), অপুর সংসার (১৯৫৯), চারুলতা (১৯৬৪) এবং "গুপী গাইন বাঘা বাইন" (১৯৬৮)। এ ছাড়া, শ্রীরায়ের "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর" তথ্যচিত্রটিও রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক পেয়েছে।

"গুপী গাইন....." ছবির জন্য শ্রীরায় শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পুরস্কার পেয়েছেন। এই বিভাগীয় পুরস্কার গত বছর থেকে প্রবর্তিত হয়েছে। দুইবারই পুরস্কারটি পেয়েছেন সত্যজিৎ রায়। ১৯৬৭ সনের প্রতিযোগিতায় শ্রীরায় "চিড়িয়াখানা" ছবির জন্য শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পুরস্কার পেয়েছিলেন।

শ্রেষ্ঠ পরিচালক সত্যজিৎ রায় ফটো-দেশ

শ্রেষ্ঠ অভিনেতা অশোককুমার

প্রসংগত উল্লেখ্য, প্রযোজক শ্রীনেপাল দত্ত ও শ্রীঅসীম দত্তের ছবি পর পর দুই বছর স্বর্ণপদক পেয়েছে। গত বছর তাঁদের ছবি ছিল "হাটে বাজারে"। তারও আগের বছর ওই প্রযোজক-গোষ্ঠীর "ছুটি" সাহিত্যমূল্যের জন্য বিশেষ পুরস্কার পেয়েছিল।

এ বছর শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসাবে "ভরত পুরস্কার" পেয়েছেন অশোককুমার, "আশীর্বাদ" হিন্দী চিত্রে অভিনয়ের জন্য।

শ্রেষ্ঠ প্লে-ব্যাক শিল্পী হিসাবে জাতীয় পুরস্কার লাভ করেছেন মান্না দে, "মেরে হুজুর" ছবিতে গানের জন্য। মহিলা প্লে-ব্যাক শিল্পী হিসাবে সুশীলা (তামিল ছবি) পুরস্কৃত। শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালকের পুরস্কার অর্জন করেছেন কল্যাণজী আনন্দজী (সরস্বতীচন্দ্র)।

শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী নির্বাচিত হয়েছেন দক্ষিণ ভারতের শারদা (থুলা ভরম)। দক্ষিণ ভারতের মালয়ালম ছবি "জন্মভূমি" জাতীয় সংহতির আদর্শ রূপায়ণের জন্য পুরস্কৃত। পরিবার পরিকল্পনার উপর তোলা বোম্বাইয়ের ছবি "অঞ্চল কে ফুল" ছবিটিকে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

বাংলা দেশের আর একটি গর্বের কারণ শিশুচিত্র "হীরের প্রজাপতি"র প্রধানমন্ত্রীর স্বর্ণপদক লাভ। শান্তিপ্রসাদ চৌধুরী ছবিটি পরিচালনা করেছেন। বেবি রাণী ("নানহা ফরিস্তা" ছবির তামিল সংস্করণ)

শ্রেষ্ঠ কণ্ঠশিল্পী মান্না দে

শ্রেষ্ঠ শিশুচিত্র "হীরের প্রজাপতি"

পর পর দুবার রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদকজয়ী চিত্রের প্রযোজক নেপাল দত্ত স্বর্গত রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেনের হাত থেকে জাতীয় পুরস্কার নিচ্ছেন

শ্রেষ্ঠ শিশুশিল্পীর পুরস্কার পেয়েছে। মালয়ালম ছবি "থুলো ভরম" ১৯৬৮ সনের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ চিত্র নির্বাচিত। শ্রেষ্ঠ তথ্য-চিত্র হিসাবে ফিল্ম ডিভিশনের "এভারেস্ট" (অরুণ চৌধুরী প্রযোজিত) পুরস্কৃত। এ ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে "অনোখী রাত" (শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্য—পণ্ডিত আনন্দকুমার), "সরস্বতীচন্দ্র" (ফটোগ্রাফি—নরিম্যান ইরানি), ফিল্মস ডিভিশনের "অ্যান্ড আই মেক শর্ট ফিল্মস" (শ্রেষ্ঠ এক্সপেরিমেণ্টাল ছবি) "ওয়াটার" (সমসাময়িক সামাজিক সমস্যা সম্পর্কিত শ্রেষ্ঠ চিত্র), ফিল্মস ডিভিশনের "ফোর্টস অ্যান্ড দি ম্যান" (শ্রেষ্ঠ শিক্ষামূলক ছবি) প্রভৃতি ছবিগুলি পুরস্কৃত।

॥ চিত্র-সমালোচনা ॥

আরোগ্য নিকেতন

(অরোরা ফিল্ম করপোরেশন)

ফিল্মে সহজ করে, পরিচ্ছন্নভাবে গল্প বলা ভাল; আরও ভাল যদি মেলোড্রামা এড়ানো যায়। "আরোগ্য নিকেতন"-এর এই গুণ আছে, সেটা অন্য দিকে কিছুটা দোষেরও হয়েছে বটে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই কাহিনীতে নাটকের বেশ জোরালো উপাদানই আছে, ক্লাইম্যাক্সে যেখানে বিধবা সুধা আত্মপরিচয় দিয়ে শ্বশুর ঘরে, মশাইবংশে নিজের স্থান করে নিতে চায়, কিন্তু পারে না পুত্রের প্রবল আপত্তির জন্য। মাতা-পুত্রের মধ্যে এখানে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য, দ্বন্দ্ব। পরে অবশ্য তার মিলনান্ত সুখাবসান। জীবন মশাই পুত্রবধূকে আদর করে ঘরে নিয়ে গেছেন এবং প্রদ্যোৎ জীবনমশাইকে দাদু বলেও ডেকেছে। এই নাট্য-ভাগও পরিচালক-বিজয় বসু যথাসম্ভব নাটকীয়তার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে দেখাতে চেয়েছেন। সম্পূর্ণ হয়ত পারেননি। কারণ ট্রেন সবে চলতে যখন শুরু করেছে জীবনমশাই তখন বউমা বলে ডাকতে ডাকতে প্লাটফর্মে আছাড় খেয়ে পড়েছেন।

নাটকের উপকরণ আরও একটি ঘটনায়, প্রদ্যোতের বিয়ের ব্যাপারে। প্রদ্যোৎ পিতৃপরিচয় জানাতে অসম্মত বলে পাত্রীর বাবা বিয়ের প্রস্তাব ভেঙে দিয়েছেন, তাকে অপমানও করেছেন, বাড়িতে ঢুকতেও নিষেধ করেছেন। এই সব নাটকীয় ব্যাপার যা ছবিতে ঘটে গেল তাতে নাটকের প্রতিশ্রুতি ছিল, কিন্তু আস্বাদ মেলেনি। নাট্যকাহিনীই যখন ফিল্মের জন্য নেওয়া নেওয়া হয়েছে, তখন নাটককে এড়িয়ে গেলে চলবে কেন? আর্ট-ছবির মন্থরতায় নাটককে তরল করে দেওয়া কেন? পরিচ্ছন্নতা এবং শিল্পবোধ অটুট রেখেও নাটক জমানো যেত। অন্তত উপভোগ্যতার দিক থেকে এই কারণে দর্শকের আশা "আরোগ্য নিকেতন"-এ কিছুটা অপূর্ণ থাকবারই কথা। জীবনমশাইয়ের নিদান ও ভরুণ ডাক্তার প্রদ্যোতের বিজ্ঞান-ভিত্তিক প্রত্যয়ের বিরোধ বা দুই যুগের সংঘর্ষের চিত্রটিও ছবিতে আরও শক্তিসম্পন্ন ও প্রকট হয়ে উঠতে পারত। এই সংঘর্ষে সুধা বিচলিত, কিন্তু দর্শকের মনে শুধু একটি রুগী বাঁচল কী মরল এই কৌতূহল ছাড়া আর কোন বুদ্ধিগত উত্তেজনা থাকে না।

কাহিনীর স্বধর্মে আস্থা রেখে পরি-চালক ছবিটি তৈরি করেননি বলেই এবং বি-নাটকীকরণের প্রতি তাঁর ঝোঁক থাকার দরুণই এই ফ্যাসাদ। নতুবা সংযত ও পরিমিতিবোধসম্পন্ন চিত্রপরিচালনার কৃতিত্ব শ্রীবসু অনেকাংশেই দেখাতে পেরেছেন। খুব বেশি প্রশংসনীয় চিত্রনাট্য, অর্থাৎ দৃশ্যের পর দৃশ্য সাজানো। ফ্ল্যাশব্যাক-এর প্রয়োগে উঁচুদরের আর্ট-ফিল্মের লক্ষণ রয়েছে। এবং আশা করা যায়, মেলোড্রামার সংক্রমণের বাইরে সুন্দর, সত্যিকারের ফিল্ম তাঁর কাছ থেকে আমরা পাব। পরিচালনার নানারকম গুণ এবং আজকের দিনে হারিয়ে যাওয়া কিছু মহৎ মূল্যবোধ ও দার্শনিক চিন্তা ছবিতে রাখা হয়েছে বলেই, নাটকের পিপাসা পুরোপুরি না মিটলেও এবং ছবি মন্থর হওয়া সত্ত্বেও "আরোগ্য নিকেতন" দর্শকের ভাল লাগবে।

প্রধান চরিত্র জীবনমশাইয়ের ভূমিকায় বিকাশ রায়ের অভিনয়েও অতি নাটকীয়তার আঁচ নেই। চরিত্রটিকে শ্রীরায় অদ্ভুত দক্ষতায় বিশ্লেষণ করেছেন। জীবনমশাই শিল্পীর জীবনের একটি স্মরণীয় সৃষ্টি হয়ে থাকবে। খুব চমৎকার অভিনয় রুমা গুহঠাকুরতার, সাবলীল ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ।

মোহন রাকেশের হিন্দী নাটকের ভিত্তিতে বাসু ভট্টাচার্যের এক্সপেরিমেণ্টাল ছবি "অধে-অধুরে" : সুধা শিবপুরী

স্টারে "মর্জিনা"-র দুই শত অভিনয়ের স্মারক উৎসবে আশাপূর্ণা দেবীর হাত থেকে পুরস্কার নিচ্ছেন শৈলেন মুখোপাধ্যায়, জ্যোৎস্না বিশ্বাস ও বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়

ফটো-দেশ

তরুণ ডাক্তাররূপী শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় খুবেই স্বচ্ছন্দ, নতুন যুগের চিকিৎসকের প্রত্যয়ের সুরটিও তাঁর অভিনয়ে মেলে। চরিত্র অনুযায়ী জহর গাঙ্গুলি, ছায়া দেবী, সন্ধ্যা রায়, দিলীপ রায়, রবি ঘোষ, বঙ্কিম ঘোষ, শান্তি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সুঅভিনয় করেছেন।

গানের ব্যবহার অন্যান্য আমুদে ছবির মত নয়। এ জন্য পরিচালক প্রশংসা পাবেন। যদিও আধুনিক গান কিংবা বাঈজির গান তিনি এড়াতে পারেননি, তবু তা নিয়ে বাড়াবাড়ি করা হয়নি। গানের সুর রবীন চট্টোপাধ্যায় তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কৃতিত্বের সঙ্গেই দিয়েছেন, কিন্তু সব ছাপিয়ে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের "জীবন যখন শুকায়ে যায়" কানে লেগে থাকে।

প্রতিদান

(এম বি প্রোডাকশন্স)

"প্রতিদান" মূলত নাটকচিত্র। নাট্য-সুখ কত বেশি পরিমাণে দর্শককে দেওয়া যায় এই ছবিতে সেটাই ছিল কাহিনীকার পরিচালক অজিত গাঙ্গুলির একমাত্র চেষ্টা। তিনি শরৎচন্দ্রের বৈকুণ্ঠের উইল-এর দাদার মত ভূতনাথ চরিত্র (কালী বন্দ্যোপাধ্যায়) সৃষ্টি করেছেন, অশিক্ষিত ভূতনাথ শিক্ষিত অনুজ কাশীনাথকে (অনিল চট্টোপাধ্যায়) নিয়ে গর্বিত। পিতার মৃত্যুর পর শৈশব থেকে কাশীনাথকে মানুষ করে তুলেছে ভূতনাথ। ভূতনাথের স্বপ্ন সফল, কাশীনাথ ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছে (যদিও সে এস-ডি-ও, তবু ভূতনাথ এবং অন্যরা তাকে ম্যাজিস্ট্রেট বলেই উল্লেখ করেছে)।

মেলোড্রামার বীজ এইখানেই, এবং সেটাও পুরনো। যে-সমাজের সঙ্গে তাল রেখে এস-ডি-ও'কে চলতে হয় (যদি তা কাহিনীকার - পরিচালকের মতে অপরিহার্যই হয়ে থাকে) তার সঙ্গে মানিয়ে চলা ভূতনাথের পক্ষে সম্ভব নয়। তার উপর নাট্যবিরোধ সৃষ্টির জন্য কাশীনাথের "আলট্রা মডার্ন" মাসী-শাশুড়ীও (অনুভা গুপ্তা) এসে উপস্থিত। চরম নাটকীয় মুহূর্তে কাশীনাথ মুহূর্তের ক্রোধে দাদাকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলেছে। এই মুহূর্তে কাশীনাথের ব্যবহার অতি রূঢ় মনে হয়েছে। কাশীনাথের স্ত্রী (কাজল গুপ্ত) তা চায়নি, ভূতনাথকে সে দেবতার মত ভক্তি করে। যে ভূতনাথ ছোট ভাইকে মানুষ করে তোলার জন্য অসীম দুঃখ সয়েছে ও সর্বস্ব ত্যাগ করেছে সে কেন কাশীনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে এবং তার সাধ-আহ্লাদের জন্য নিজের কিছু সংস্কার বিসর্জন দিতে পারল না, এবং কাশীনাথের মাসী-শাশুড়ির সঙ্গে কয়েকদিনের জন্য অন্তত মিষ্টি ব্যবহার করল না সে অবশ্য ভিন্ন কথা। দুই ভাইয়ের বিচ্ছেদের পর পুনর্মিলন। মিলনের আগেও ভূতনাথ ছোট ভাইকে বাঁচাবার জন্য দাঙ্গায় নিজের পিঠে ছোরার আঘাত টেনে নিয়েছে। ওই দাঙ্গা, পুলিশ মোতায়েন, ফায়ারিং-এর আদেশ ইত্যাদি প্রসঙ্গ দেখে মনে হয়, কাশীনাথ এস-ডি-ও না হয়ে এস-ডি-পি-ও হলে ভাল হত।

"প্রতিদান": কালী বন্দ্যোপাধ্যায় ও রুমা গুহঠাকুরতা

আসল কথা, গল্পে যুক্তি ও সঙ্গতির অভাব অনেক। বেহালা ছেড়ে বয়লার ধরবার পর, অর্থাৎ যাত্রার দলে বেহালা বাজনা ছেড়ে ভাইয়ের লেখাপড়ার খরচ চালাবার জন্য কারখানার বয়লারে কয়লা ঠেলবার কাজ নেবার পর, ভূতনাথ তার প্রেয়সী সরলকে (রুমা গুহঠাকুরতা) একবারও দেখতে যেতে পারল না, সরল ভূতনাথকে টাকা দিয়েছে বলে হঠাৎ ননীকাকার (সরলের বাবার) দুর্ব্যবহার ইত্যাদি অযৌক্তিক মনে হয়। আর একটি ব্যাপার দর্শকের কাছে কেমন লাগবে জানি না—ভূতনাথ প্রথমে সুখেন দাস, বড় হবার পর কালী বন্দ্যোপাধ্যায়; সরল প্রথমে নবাগতা সুচেতা মুখোপাধ্যায়, পরে রুমা গুহঠাকুরতা (তখন অবশ্য বিধবা)। অর্থাৎ ভূতনাথ ও সরল যখন বেশ বড় হয়েছে, অরপর তাদের আরও বড় দেখাবার জন্য কালী বন্দ্যোপাধ্যায় ও রুমা গুহঠাকুরতাকে এই চরিত্রে দেখানো হয়েছে। দর্শকের মনে কিন্তু সুখেন দাস (ইনিও প্রতিষ্ঠিত শিল্পী) ও সুচেতার চেহারা বেশ মনে থাকে।

সে যাক। ত্রুটি-বিচ্যুতি যাই থাকুক, নাটকপ্রিয় দর্শকের চিত্তবিনোদন করতে যা বোঝায় "প্রতিদান"-এ তার প্রতিশ্রুতি আছে। নাট্য ঘটনা যত এগোয় দর্শকের চোখও ভিজে ওঠে। আধুনিক প্রসঙ্গও ছবিতে আছে। যেমন, একালে শিক্ষকদের দুর্দশা, মালিক-শ্রমিক বিরোধ ইত্যাদি। অভিনয় মোটামুটি সকলেরই ভাল, অর্থাৎ চিত্রনাট্যের প্রয়োজন সকলেই যথাযথ মিটিয়েছেন। বিশেষ প্রশংসনীয় কালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়।

গান এই ছবির একটি বড় আকর্ষণের বস্তু। গানের সুর সুন্দর (শৈলেন মুখোপাধ্যায়-কৃত)। ছবির শুরুতে যাত্রার আবহসংগীত সুকল্পিত। "পাপেট-শো" ছবিতে সুন্দরভাবে দেখানো হয়েছে। ওই সঙ্গে অসীম ভট্টাচার্যের গানও মনোগ্রাহী।

সাদার্ণ সমিতির রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠানে গুণী সংবর্ধনা

সাদার্ণ সমিতির বাৎসরিক বিচিত্রানুষ্ঠানে গুণী-সংবর্ধনা গত কয়েক বছরে বেশ সুনাম অর্জন করেছে। গুণীকে সত্যিকারের শ্রদ্ধা জানাবার জন্যই এই ব্যবস্থা। এবারেও দুইদিনব্যাপী অনুষ্ঠানে সমিতি গুণী সংবর্ধনার আয়োজন করেছিলেন। প্রথম দিন শ্রীবিকাশ রায় ও শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবীকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। ওইদিন শ্রীপাহাড়ী সান্যাল ও শ্রীকমল ভট্টাচার্যকেও সম্মান জানানো হয়। ওইদিন ছিল আধুনিক গানের অনুষ্ঠান। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, উত্তমকুমার, নির্মলেন্দু চৌধুরী, বনশ্রী সেনগুপ্ত, জহর রায়, মিন্টু দাশগুপ্ত,

আদর্শ সমিতির অনুষ্ঠানে ডঃ রমা চৌধুরীর হাত থেকে মানপত্র নিচ্ছেন শ্রীশান্তিদেব ঘোষ ফটো-দেশ

রবি ঘোষ প্রভৃতি ছিলেন প্রধান শিল্পী।

দ্বিতীয় দিনে শ্রীশান্তিদেব ঘোষকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সেদিন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ডঃ রমা চৌধুরী। সংবর্ধনার উত্তরে শ্রীশান্তিদেব ঘোষ সুন্দর কথা বলেন—"আমি গুরুদেবের সংগীত, নৃত্য ও নাটকের জীবনের অতি নগণ্য শিষ্য।...পাছে আমি তাঁর নির্দেশকে অমান্য করে বিপথে ধাবিত হই সেই আশংকায় তিনি মৃত্যুর কয়েক মাস আগে লিখিত পত্রে এই আদেশ করলেন যে, "এই আশ্রমে তুই মানুষ। কোন গুরুতর লোভেও নিজেকে যদি অশুচি করিস তাহলে আমার প্রতি ও আশ্রমের প্রতি অসম্মানের কলঙ্ক দেওয়া হবে। আমার গানের সঞ্চয় তোর কাছে আছে—বিশদভাবে সে গানের প্রচার করা তোর কর্তব্য হবে। আমি তোর পিতার পিতৃতুল্য, আশা করি আমার উপদেশ মনে রাখবি।"

ওইদিন অতুলপ্রসাদ ও নজরুলের গান, আবৃত্তি ও রবীন্দ্রসংগীতের অনুষ্ঠান। সুচিত্রা মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, সুপ্রভা সরকার, সবিতাব্রত দত্ত, কাজী সব্যসাচী, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বা সিংহ, সুমিত্রা মুখোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পীরা যোগ দেন।

সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ের ই-এম-পি রিক্রিয়েশন ক্লাব অভিনীত সিরাজদৌল্লা নাটকের একটি দৃশ্য

নাট্য-সমালোচনা

তারারা শোনে না

(গান্ধার)

অবোল-তাবোল বকলেই "অ্যান্টি-প্লে" হয় কি? নাকি কোন ফর্ম না মেনে চলাটাই "অ্যান্টি-প্লে"? দর্শকদের উদ্দেশে কিংবা দর্শকদের মধ্যে কোন ব্যক্তির কল্পিত উপস্থিতি নিয়ে যদি নাটকের পাত্র-পাত্রীরা কথা বলে তবে সেটা "প্লেই"ই। যদি পাত্র মঞ্চে থেকে মঞ্চের ভিতরকার লোকের সঙ্গে কথা বলে—যেমন, ওই জায়গাটা অন্ধকার করে দিন—তবু সেটা "প্লে"। কারণ এই নব্য-রীতির বাংলা নাটক আমরা হালে দেখেছি। আর একেবারে প্রথমেই দর্শকের সামনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ কথা বলে তারপর নির্দিষ্ট স্থানে অর্থাৎ মঞ্চে গিয়ে উঠে দাঁড়ানোর ব্যাপারটাও নতুন নয়। তবে "অ্যান্টি-প্লে"-র কোথায়। শুধু কথা, কথা আর কথায়?

অনর্গল কথা বলেছে রবীন্দ্রনাথের অমিট রে কিংবা বাঁশরি। তাদের কোন কথাই অনর্থক নয়, সব কথাতেই একটা অর্থ পরিস্কার হয়ে উঠেছে। সব কথাই আমাদের কোথাও না কোথাও পৌঁছিয়ে দিয়েছে। অর্থ দিয়ে চারিধারে বদ্ধ না হলেও তাদের কথা কখনও নিরর্থক মনে হয়নি। "তারারা শোনে না"-র (চাণক্য সেন রচিত) কথা-সর্বস্বতার মূলে মহত্তের অক্ষম অনুসরণ। তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু তা কী কথা? কতকগুলি পরিচিত নাম—লেখকের, তাদের বইয়ের, নেতার, চিত্রতারকার ইত্যাদি—কথার ফাঁকে, বাঁকে, বাঁকে জুড়ে করে বললেই দর্শক হেসে ওঠেন। সমসাময়িক অনেক কিছু—সাহিত্য, রাজনীতি, সংস্কৃতি, ধর্ম, মন্ত্রিত্ব ইত্যাদি—এবং ব্যক্তি-বিশেষকে নিয়ে রসাল মন্তব্য ও ব্যঙ্গাত্মক কথা বললেই দর্শক মজা পান। এর একটা আমোদ-মূল্য আছে। কিন্তু কথার মূল্য কতটুকু? এ তো "ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার"।

আসলে "তারারা শোনে না" নামে স্যাটায়ার তৈরি করতেই চেয়েছিলেন চাণক্য সেন। ভাল স্যাটায়ার-এ যে তীক্ষ্ণতা ও গভীরতা থাকে, এই নাটকে তা নেই। নাট্যকারের সমালোচনা, সিনিসিজম এবং রাগ অবশ্য প্রকাশ পেয়েছে বেশ ভালভাবেই। কিন্তু মাধবী যখন কান্নার সুরে বলছে, দেশের জন্য এত করেও নেতাজীর আদর্শ নিয়ে এত বক্তৃতা দিয়েও মন্ত্রী হতে পারলাম না তখন এই স্থূল ব্যঙ্গও দর্শককে খুব হাসায়।

কথাসর্বস্ব নাটকের ভূমিকালিপিতে যে চরিত্রটি 'আমি' সে সাহিত্যিক। বলা বাহুল্য, নাট্যকারের রাগ বিশেষ করে লেখক-সমাজের উপরই প্রকাশ পেয়েছে। পাঠক-সমাজও বাদ যাননি। নাটকে ঘটনা নেই। সাহিত্যিক ও মাধবীর কথার মধ্যেই মাধবীর জীবনের অতীত ঘটনার পরিচয়—ফ্লাশ-ব্যাকও আছে। অতএব মূলত ঘটনাবিহীন অ্যান্টি-প্লে নয় এই নাটক; পরে দ্বিতীয় অঙ্কে, সাহিত্যিকের সেক্রেটারি রয়েছে, তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে একাধিক ব্যক্তি। শেষের দিকে এসেছে মরমী—একজন মহিলা ফিল্ম প্রোডিউসর। তার কথায়ও অতীত ট্রাজিক ঘটনার আভাস। মরমী বলেছে, পেশাদার মঞ্চ কীভাবে তার মা ও বোনের জীবন গ্রাস করেছে। অতীতকালের অভিনেত্রীর জীবনের ট্র্যাজেডি তাদের কথার সারবস্তু—স্বামীপুত্র নিয়ে যে সুখের ঘর বাঁধতে চেয়েছিল সে হয়েছে রক্ষিতা। থিয়েটারের মালিকের ব্যভিচারের কথাও আছে। মরমী সগর্বে বলেছে তার আত্মীয়ার সংকল্পের কথা—যদি দেহ দিয়েই ভগবান ও

মানুষকে তুষ্ট করতে হয় তবে তাই করব লাভের হিসাব মিলিয়ে (এই রকম কী যেন একটা কথা)।" সাহিত্যিক বলেছে, আমাদের দেশে নাটক হয়নি। ধর্ষণ, রক্তিতা, আবেগ, দেশপ্রেম (এই ধরনেরই কথা, সব কয়টি শব্দ মনে নেই)—এসবই হয়েছে, নাটক হয়নি। মর্ত্যের তারা কী যেন বলতে চেয়েছিল আকাশের তারাকে। নাট্যকারের সিদ্ধান্ত : তারারা শোনে না।

এই মঞ্চের তারাদের কথা কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক দর্শক ("তারারা শোনে না" প্রাপ্তবয়স্কের জন্য কিনা) শুনেছেন, শুনে হেসেছেন, মজা পেয়েছেন। স্থূল কৌতুকেও তো মজা। পরিচিত কথা, পরিচিত মস্করা কিনা তাই শুনতে ভালই লেগেছে। শুনেছেন, কিছু ভেবেছেন কি? ফাঁকা কথা নাটক শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই হাওয়ায় উড়ে গেছে।

নামে অ্যান্টি-প্লে হলে কী হবে, নাটক

জেমিনি সার্কাসের একটি খেলা

জমাবার চেষ্টা এতে আছে—ফ্ল্যাশব্যাকে, অতীত স্মৃতিচারণে। এখানে আবার কনডেনশন-এর অনুসরণ। সেক্স-এর উপাদানও বাদ যায়নি। হতে পারে মাধবীর চরিত্র নিরাবরণভাবেই দেখাতে চেয়েছিলেন নাট্যকার, সে রাত্রে চুপি চুপি সাহিত্যিকের কাছে এসেছে দেহ দিতে (অতীত ঘটনা) কিন্তু তাতে জীবনের গভীরতর সত্যের স্পর্শ যত না মেলে তার চেয়ে বেশি রয়েছে দর্শকের চাহিদা পূরণের তাগিদ।

ভাল বস্তুও কিছু নাটকটিতে আছে। তা একেবারেই নাটকীয়। মাধবী ও প্রতাপের কাহিনীর মধ্যে জীবনবাসনার একটি অস্ফুট বাস্তব রূপ মেলে। মাধবীর আর্জি সাহিত্যিকের কাছে তাকে নিয়ে কেন

"সমান্তরাল" (পরিচালনা : গুরু বাগচী) ছবিতে মাধবী মুখোপাধ্যায়

সে গল্প লেখে। "পুনশ্চ"র সাধারণ মেয়ের মত নাট্যকার আঁকতে চাননি মাধবীকে —মাধবীর মধ্যে জটিলতা, স্খলিত জীবন-বাসনা; অনিয়মই সে ভালবাসে, মামাকেও মন্দ বাসেনি (নাটকে ভালবাসার অপর নাম মন্দবাসা)। মাধবীই তো নাটক, অ্যান্টি-প্লে কোথায়?

নাটকটি যে এত অকিঞ্চিৎকর বস্তু সত্ত্বেও ভাল লেগেছে সেটা প্রযোজনা ও অভিনয়ের গুণের জন্য। গান্ধারের প্রযোজনা সম্পর্কে কোন বিরূপ কথা বলবার নেই। দুই প্রধান শিল্পী অসিত মুখোপাধ্যায় ও গীতা চক্রবর্তী অভিনয়ের ক্ষমতা দেখিয়েছেন। শ্রীমুখোপাধ্যায় সুন্দরভাবে দ্রুতলয়ে কথাগুলি বলেছেন, কখনও গম্ভীর হয়েছেন। তাঁর অভিনয় সত্যি দেখবার মত। সংগীত (ভাস্কর মিত্র-কৃত) অতিরিক্ত কথার মাঝখানে নাটকের ভাব চমৎকারভাবে প্রকাশ করেছে। অতীত নাট্যশালার কথা প্রসঙ্গের সময়কার আবহসংগীত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। পিণ্টু বসুর আলোকনিয়ন্ত্রণ ও সুরেশ দত্তর মঞ্চসজ্জাও ভাল। এক কথায় উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা। নাটক পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারটা অবশ্য একান্তভাবেই গান্ধারের।

"শান্তি" (পরিচালনা : স্বদেশ সরকার) ছবিতে দিলীপ রায় ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

ফটো—দেশ

অরণ্যদেব ★ লী ফক

পাজী রাজা চার্লস বেরিয়েছেন বিশ্ব-সফরে ---

পাজী রাজা চার্লস ----
দেশ দেখতে ভাল লাগল?
হ্যাঁ পার্স। অনেক অদ্ভুত জিনিস কিনলুম।

তবে প্লেনের খরচা বড্ড বেশী। ভাবছি, নিজেই একটা এয়ার লাইন খুলব।
!
কথাটা পার্সের মনে যেন গেঁথে গেল।

তাই বলে প্রাণে মারবে? বেকুব হতচ্ছাড়া!

টেলিগ্রাফের তার ছিঁড়লে। আর একটু হলেই মারা পড়তুম।
যা টাকা দিয়েছ, তাতে আমার চাইতে ভাল পাইলট পাবেন কোথায়?

SEA BAR

আবার একটা প্লেন লুঠ হয়েছে!

অরণ্যদেব লী ফক

নাঃ। নিজের একটা প্লেন-কোম্পানি না-থাকলে সুখ নেই। কিন্তু শস্তায় প্লেন পাব কোথায়?
আজ আর-একটা প্লেন লুঠ হয়েছে। কর্তৃপক্ষ বলছেন, এইভাবে যদি…
?
GIRLS

পার্স, প্লেন লুঠের খবর কান দিয়ে শুনছ যে? ব্যাপার কী?
বিরক্ত করো না স্যাম, আমি ভাবছি।

আর-একটা প্লেন শূন্যপথে লুঠ হয়ে গেল
প্লেনের মুখ ঘোরাতে বলো!
আবার!

আজ আবার প্লেন লুঠ হয়েছে। এই নিয়ে মোট পনেরো প্লেন লুঠ হল……
আশ্চর্য, দিনের পর দিন এক কাণ্ড চলেছে! এটা বন্ধ করা যায় না?
যায় ডায়ানা। তার চেষ্টাও নিশ্চয় করা হচ্ছে।

…আবার প্লেন লুঠ…
ওহে পার্স, ব্যাপার কিছু বুঝছ?
ভাবছি… ভাবছি… ভেবেচিন্তে একটা…

…প্ল্যানও ঠিক করে ফেলেছি……
তাতে কাজ হবে?

চেষ্টা করে দেখি। যদি সফল হই তো রাতারাতি বড়লোক হয়ে যাব। তবে আগে এই জেল থেকে পালানো দরকার। জন দুয়েক লোক জোগাড় করতে পারবে?
তা নিশ্চয়ই পারব!

কয়েদীরা, এক জায়গায় জটলা করো না…
আমার প্ল্যানটা হচ্ছে এই…
!!

দিন কয়েক বাদেই জেল থেকে তারা পালাল—
টং
টং টং টং টং

শস্তায় যদি কিছু প্লেন পাই তো কিনি।
পাবে। প্রায় জলের দরেই পাবে। সেই ব্যবস্থাই হচ্ছে!

বোমবাইয়ের আজাদ ময়দানে নব কংগ্রেসের অধিবেশন এই সপ্তাহের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ২৫ ডিসেমবর নব-কংগ্রেস অধিবেশনের সূচনায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবং কংগ্রেস সভাপতি শ্রীজগজীবন রাম ঘোষণা করেন যে, তাঁদের দল এখন প্রতিক্রিয়াশীলদের সম্মিলিত আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য এবং জনগণের আশাকে বাস্তব রূপ দিতে এক গণতান্ত্রিক ফ্রনটের নেতৃত্ব নিতে চায়। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী বলেন যে, সাধারণ বীমা রাষ্ট্রীয়করণ, রাজন্যবর্গের ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বিলোপ প্রভৃতি পাঁচটি বিষয় দ্রুত কার্যকরী করার জন্য নব-কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি ১০ দফা অর্থনৈতিক কর্মসূচী থেকে বাছাই করে নিয়েছেন। বিষয় নির্বাচনী বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী বলেন : দেশের সামনে বর্তমানে যে বিরাট কর্তব্য তা হচ্ছে বেকার সমস্যার সমাধান এবং সেজন্য একটি পরিকল্পনা রচনা করা হয়েছে। কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেন : দেশকে সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁর দল সমস্ত বিরোধী শক্তির সঙ্গে লড়াই করবে। ২৯ ডিসেমবর প্রকাশ্য অধিবেশন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে নব-কংগ্রেসের অধিবেশনের পরিসমাপ্তি ঘটে। সভাপতি শ্রীজগজীবন রাম সদ্যসমাপ্ত এই অধিবেশনকে সংকল্প রূপায়ণের অধিবেশন বলে বর্ণনা করেন। ইহাই (নব) কংগ্রেসের ৭৩তম প্রকাশ্য অধিবেশন।

দেশী সংবাদ

২২ ডিসেমবর—গান্ধীনগরে আদি কংগ্রেসের তিনদিনব্যাপী পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন আজ শেষ হয়। অধিবেশনে গৃহীত এক প্রস্তাবে ১৯৭৫ সালের মধ্যেই প্রত্যেক ভারতবাসীর জীবনযাত্রা নির্বাহে ন্যূনতম দাবি পূরণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে। প্রস্তাবে সেজন্য একটি কমিশন গঠনের কথাও বলা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাসিসট্যানট পদে চাকরির জন্য আজ শতাধিক পরীক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে জমায়েত হন। কারণ কোথায় পরীক্ষা হবে, তা অ্যাডমিট কার্ডে লেখা ছিল না। এখানে তাদের জানানো হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন পরীক্ষা-কেন্দ্র নেই। কলকাতার ১৩টি স্কুলে এই পরীক্ষা হচ্ছে। পরীক্ষার্থীরা এতে অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হন এবং বিশ্ববিদ্যালয় অফিসের চেয়ার টেবিল দেওয়াল ঘড়ি টাইপরাইটার তিন-তলা থেকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে তাতে আগুন ধরিয়ে দেন।

২৩ ডিসেমবর—পশ্চিমবঙ্গের সি পি আই এম সদস্য শ্রীনীরেন ঘোষ আজ রাজ্যসভায় অভিযোগ করেন, কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাকৃতভাবে বৈষম্যমূলক আচরণ করেছে। শিল্প লাইসেনস মঞ্জুরীর ব্যাপারে এই আচরণ প্রকট। এই বৈষম্যের জন্য বিশ বছরের কংগ্রেসী শাসনে রাজ্যের আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থনৈতিক ঘাটতির জন্য চলতি (১৯৬৯-৭০) বছরের উন্নয়ন বাজেটের বরাদ্দ টাকা থেকে শেষ পর্যন্ত সোয়া চার কোটি টাকার মত ছাঁটাই করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এই খাতে বরাদ্দ ৫৫ কোটি টাকা খরচের পরিকল্পনা ছাঁটকাট করে ঠিক হয়েছে যে, এ বছর উন্নয়ন প্রকল্পগুলির জন্য ৫০ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকার বেশী খরচ করা যাবে না।

২৪ ডিসেমবর—রাজন্য ভাতা ও রাজন্য-বর্গের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা বিলোপের প্রশ্নে আজ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রী ওয়াই বি চবনের সঙ্গে প্রাক্তন নৃপতিবর্গের প্রতিনিধিদের যে আলোচনা হয়েছে, তাতে বিশেষ কোন ফল হয়নি। দুই পক্ষই নিজের নিজের বক্তব্য থেকে একচুলও নড়েননি বলে জানা গিয়েছে।

ইডেনে ক্রিকেট মাঠের বাইরে সাম্প্রতিক দুর্ঘটনায় নিহত তিনজন যুবকের ভ্রাতাদের কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা করতে সি এ বি রাজি হয়েছেন। এছাড়া নিহত ছয়জনের পরিবার-বর্গকেই আর্থিক সাহায্য দিতে তারা সম্মত। ক্রীড়ামন্ত্রী এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী সি এ বি-র সেক্রেটারির সঙ্গে আলোচনা করে এই দুটি ব্যবস্থা গ্রহণে তাঁকে রাজি করিয়েছেন।

২৫ ডিসেমবর—প্রধানমন্ত্রী আজ নব-কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের জানান, আগামী বাজেটের সঙ্গে সঙ্গে শহরাঞ্চলে সম্পত্তির সীমা বেঁধে দেওয়া হবে। সীমা যে কী হবে তা নাকি প্রধানমন্ত্রীরও এখন পর্যন্ত অজানা। বিষয়টি এখন অফিসারগণ বিচার-বিবেচনা করছেন।

আদি কংগ্রেস সম্পর্কে জনসংঘের দলীয় নীতি কী হবে তা স্থির না হওয়ায় জনসংঘের কার্যনির্বাহক কমিটি আজ দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর খসড়া প্রস্তাবটি অনুমোদন করতে পারেননি। দলের একাংশ শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে আদি কংগ্রেসকে সমমনো-ভাবাপন্ন দল হিসাবে সমর্থন জানাতে আগ্রহী। অপরাংশ তার বিরোধী।

২৬ ডিসেমবর—নিরাপত্তার অভাব এবং আর্থিক ব্যাপারে পোষাচ্ছে না বলে একদল বড় শিল্পপতি পশ্চিমবঙ্গ থেকে তাঁদের শিল্প ইউনিটগুলি তুলে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত করেছেন বলে জানা গিয়েছে। কিছু ব্যবসায়ী ইতিমধ্যে রাজ্য সরকারের কাছে তাঁদের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে অনুমতিও চেয়েছেন। জানা গেল এঁরা মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা ও দিল্লিতে শিল্পগুলি স্থানান্তর করতে চান।

২৭ ডিসেমবর—রাজ্য সরকার এখন ঢালাও-ভাবে শর্ট গানের লাইসেনস দিচ্ছেন। জেলা-শাসকগণই ওই লাইসেনস দিয়ে থাকেন তিন-চার বছর আগেই কেন্দ্রীয় সরকার শর্ট গানের লাইসেনস মঞ্জুরির কড়াকড়ি অনেকটা শিথিল করে দেওয়ায় ঢালাওভাবে ওই লাইসেনস দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

জনসংঘের ওয়ার্কিং কমিটি ভারতে অবস্থিত বৈদেশিক শিল্পগুলির অবিলম্বে রাষ্ট্রীয়করণের জন্য আজ দাবি জানান। সংঘের সাধারণ সম্পাদক সাংবাদিকদের কাছে বলেন, সঙ্ঘ আগেই ভারতে অবস্থিত বৈদেশিক ব্যাঙ্ক-সমূহের রাষ্ট্রীকরণের দাবি জানায়।

২৮ ডিসেমবর—আজ দ্বিতীয় পর্যায়ের অনশন শুরু করে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় বলেন বাংলা দেশে যে অরাজক অবস্থা চলছে, সেভাবে চললে যুক্তফ্রনট সরকার পাঁচ বছর টিঁকে থাকতে পারবে না। দেশে বিদ্রোহ হবে।

ফরওয়ারড ব্লক মনে করেন সি পি এম এর হামলাবাজি যুক্ত ফ্রনটের ভাবমূর্তি ম্লান করে দিয়েছে। আজ বারাসাত ফরওয়ারড ব্লকের রাজ্য সম্মেলনে বিভিন্ন বক্তা দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেন, ফরওয়ারড ব্লকের উপর হামলা করা হলে মোকাবিলা করা হবে পাল্টা আঘাতে। সম্মেলন উদ্বোধন করে সারা ভারত ফরওয়ারড ব্লকের চেয়ারম্যান শ্রীহেমন্ত বসু বলেন, ফরওয়ারড ব্লক দুঃসাহসিক অভিযান থেকে বিরত হবে না।

বিদেশী সংবাদ

২২ ডিসেমবর—আকাশবাণীর এক সংবাদে প্রকাশ : মার্কিনে এবার প্রচণ্ড শীত পড়তে আরম্ভ হয়েছে। এমন শীত নাকি এখানে গত ২০০ বৎসরের মধ্যে পড়েনি। এরূপ অবস্থা কদিন থাকবে তা বলা হয়নি।

২৩ ডিসেমবর—পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রেসিডেনট আয়ুব খাঁ বলেছেন, তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল হল পাকিস্তানের নাগরিকত্ব গ্রহণ। রাওয়ালপিণ্ডিতে তাঁর প্রাক্তন সহকর্মীদের কাছে কথা প্রসঙ্গে তিনি এই কথা বলেন।

২৪ ডিসেমবর—এ পি-র এক সংবাদে প্রকাশ : মার্কিন প্রতিনিধি সভায় গৃহীত একটি প্রস্তাবে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে অধিক উদার বাণিজ্যনীতি চালু করার জন্য মার্কিন সরকারকে চাপ দেওয়া হয়েছে, তবে এ ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির পুরো এক্তিয়ার থাকবে বলেও প্রস্তাবে বলা হয়েছে।

২৫ ডিসেমবর—চায়না মেল পত্রিকার খবরে জানা যায় যে, চীনের প্রধানমন্ত্রী শ্রী চু এন লাইকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য চেয়ারম্যান মাও সে তুং ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীলিন পিয়াও যুগ্মভাবে উদ্যোগী হয়েছেন।

২৬ ডিসেমবর—মাও বিরোধী একটি গুপ্ত রেডিও আজ এই সংবাদ প্রচার করেছে যে, মাওয়ের স্ত্রী চিয়াং চিংকে গুলি মেরে আহত করা হয়েছে। এই রেডিওরই খবর : চিয়াং চিং পিকিং-এর একটি হাসপাতালে আছেন। তবে তার আঘাত বা অবস্থা সম্পর্কে রেডিও কোন সংবাদ দেয়নি।

২৭ ডিসেমবর—নেপাল সরকার একজন পাকিস্তানী শিল্পপতিকে নেপালে একটি বস্ত্র-শিল্প স্থাপনের অনুমতি দিয়েছেন। নেপালের জাতীয় সংবাদ প্রতিষ্ঠান এ সংবাদ জানিয়েছেন।

২৮ ডিসেমবর—ভিয়েতনাম নিউজ এজেন্সির সংবাদে গতকাল বলা হয়েছে যে, ১৯৬৪ সাল থেকে আজ পর্যন্ত প্যাথেটলাও বাহিনী লাওসে ২ হাজার ৮ শত ৮৮টি মার্কিন বিমান ভূপাতিত বা ধ্বংস করেছে।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ : শ্রীঅলোক ধর

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৭ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১১
শনিবার ২৬ পৌষ ১৩৭৬

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহযোগী সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীসীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮৩ ২৩-৮৫৪১

চাঁদার হার
কলিকাতায়

বার্ষিক	... ২৫.০০
ষান্মাসিক	... ১২.৫০
ত্রৈমাসিক	... ৬.২৫

ভারতে

বার্ষিক সডাক	... ৩০.০০
ষান্মাসিক "	... ১৫.৫০
ত্রৈমাসিক "	... ৮.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	... ৩০.০০
ষান্মাসিক "	... ১৫.৫০
ত্রৈমাসিক "	... ৮.০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ ডাকে)

বার্ষিক সডাক	... ৫২.০০
ষান্মাসিক "	... ২৬.০০
ত্রৈমাসিক "	... ১৩.০০

আসাম অঞ্চলে
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	... ৩৯.০০
ষান্মাসিক	... ১৯.৫০
ত্রৈমাসিক	... ১০.০০

দাম ৫০ পয়সা
উত্তরবঙ্গ ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাসুল ৭ পয়সা

DESH

Saturday, January 10, 1970

দুই কলকাতা

শুনেছি, কবি ওআল্ট হুইট্‌ম্যানকে তাঁর এক ভক্ত সুহৃদ বলেছিলেন, আপনার লেখায় স্ববিরোধিতা আছে। জবাবে কবি বলেছিলেন, আমার মধ্যে রাশিকৃত জিনিস রয়েছে, স্ববিরোধিতা তো থাকতেই পারে। কোনো বড় কবি লেখক কিংবা বিরাট কোনো ব্যক্তিত্বের কথা উদাহরণস্বরূপ তুলে হয়ত এটা প্রমাণ করা যায় যে কম-বেশি স্ববিরোধিতা বড়দের একটি লক্ষণ; বৈশিষ্ট্যও হতে পারে। আর একটু অন্যভাবে দেখলে মনে হবে, বৃহৎ যা কিছু তার অধিকাংশের মধ্যে এই ধর্মটি লুকোনো আছে। যেমন ধরা যাক, আমাদের কলকাতা শহর। ভারতের মধ্যে এই শহরটি যে বৃহতের তালিকায় শীর্ষস্থানীয় তাতে সন্দেহ নেই। এতই বৃহৎ যে, একে সামলানোর দায় কোনো বিচক্ষণই নিতে চান না। কলকাতাও দিনে দিনে বেমানান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। এই কলকাতাও তার স্বভাবধর্মে কত বিচিত্র একবার ভেবে দেখুন। একেবারে হালের কথাই ধরা যাক : একদিকে প্রত্যহ কয়েক জোড়া খুন খারাপি, কোথাও না কোথাও পাড়ার দাঙ্গা, দু একটা ব্যাঙ্ক ডাকাতি, দু চার দফা পুলিসের লাঠি খেলা, ছোট বড় লঙ্কাকাণ্ড ইত্যাদি ইত্যাদি আর অন্যদিকে কার্জন পার্কের সুশোভিত প্যাণ্ডেলে অজয়বাবুদের অনশন (এখন অবশ্য অনশন প্রত্যাহৃত), কোথাও বা শিল্প বা সংস্কৃতি মেলা, বড় বড় গানের জলসা, নাট্য আন্দোলনের নাটক, সভাসমিতি যায় সার্কাস ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ এই বৃহৎ শহর কলকাতায় পাশাপাশি দুই-ই সমান তালে চলছে, সমাজ-বিরোধিতা, হই-রই আর সমাজ-সংস্কৃতিমূলক, নরম-গরম কাজকর্ম। মজার কথা, আমরা বিপরীত এই দুই স্রোতের মধ্যে দিব্য বেঁচে আছি।

স্বীকার করে নেওয়া যাক, এত বড় শহর, নানা ধরনের মানুষ, বিভিন্ন রকমের পেশা—কাজেই একদল ডাকাতিতে যেতে পারে, অন্য কোনো দল মেতে উঠতে পারে গানের জলসায়; এই বিরুদ্ধ মতিগতিকে কোথাও এক জায়গায় মেলানো দায়, সম্ভবও নয়; কাজেই এ-রকম হবে—একদিকে থাকবে অসামাজিক কাজকর্ম, অমানবিক ক্রিয়াকলাপ, অন্যদিকে থাকবে সামাজিক কর্মতৎপরতা, সংস্কৃতি চর্চা, মানবিক গুণাবলীর অনুশীলন। আমরা এ-সবই স্বীকার করে নিলাম। তবু প্রশ্ন করা যায়, যে হারে সমাজবিরোধিতা উচ্ছৃঙ্খলতা বাড়ছে তাতে কি মনে হয় না এই মন্দের প্রভাব ভালকে ছাপিয়ে যাচ্ছে!

ইদানীং কলকাতা, শহরতলী এমন কি পশ্চিম বাংলার কোনো কোনো এলাকা খুন, রাহাজানি, গুণ্ডামির এক একটা ঘাঁটি হয়ে দাঁড়িয়েছে। শোনা যায়, যুক্ত ফ্রণ্টের মন্ত্রীরা বলেন, ভারতের অন্যান্য শহরের চেয়ে এখানের অবস্থা অনেক সুশৃঙ্খল। হয়ত তাই। কিন্তু এটা তো তুলনা মাত্র : যেমন গল্পে আছে—দুই পাপী পরস্পরের পাপের হিসেব নিকেশ করতে গিয়ে বলেছিল—তুই দশটা মাথা কেটেছিস, আমি আটটা, তোর চেয়ে আমি কম পাপী। আমাদের কিন্তু মনে হয় না, পাপের হিসেব নিকেশে দশ আর আটের কোনো তফাত আছে।

কেউ কেউ নাকি বলছেন, পি ডি অ্যাক্ট উঠে যাবার পর যেসব সমাজ-বিরোধীরা ছাড়া পেয়েছে তাদের জন্যে হালে কলকাতা এবং অন্যত্র শান্তিভঙ্গ কিছু বেড়ে গেছে আচমকা। হতে পারে। তবে কথা হল, এই অবস্থার জন্যে সরকার কী করছেন? নীরবে বসে আছেন নাকি? অথবা নিজেদের ভেতরের গণ্ডগোল, ঝগড়া মন কষাকষি নিয়ে এতই ব্যস্ত যে, এদিকে চোখ ফেরাতে পারছেন না!

গত কয়েক দিনের কাগজ যাঁরা দেখেছেন—তাঁরা একবার মনে করে দেখুন কলকাতাতে তো বটেই বাইরেও কতগুলি হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছে। নিহত হয়েছে কজন? আহতের সংখ্যাই বা কত? আমাদের যদি নিতান্তই গা সওয়া না হয়ে গিয়ে থাকে তবে নিশ্চয় এই সংবাদে মর্মাহত হতে হবে।

মোট কথাটা এই যে, সামাজিক অনাচার, বিশৃঙ্খলা, হিংসা ইত্যাদিকে এত বড় শহর কলকাতায় এবং পশ্চিম বাংলায় কিছুটা স্বাভাবিক বলে অবহেলা করার মনোভাব নিলে সরকারের গৌরব বাড়বে না। বরং এই ব্যাপারে কিছুটা তৎপর হলে সাধারণে উপকৃত হবেন।
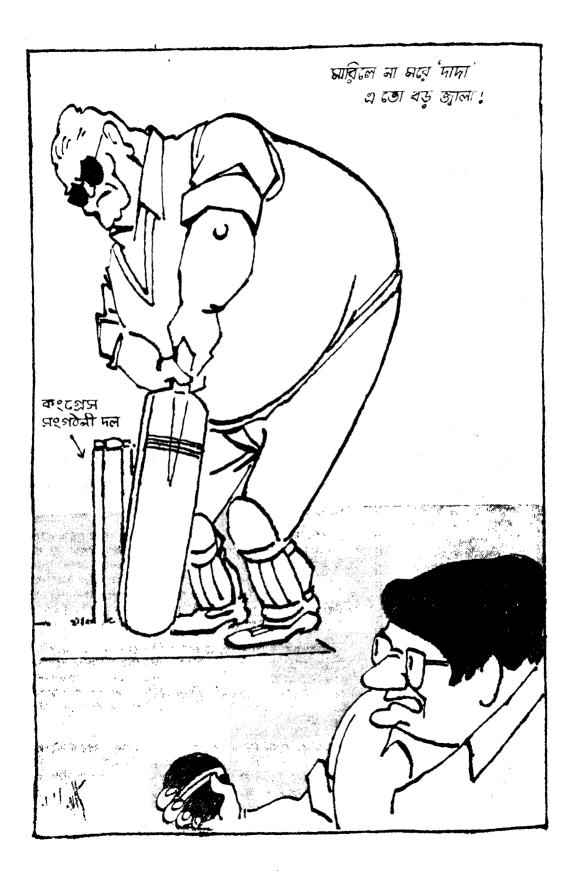
মারিলে না মরে 'দাদা'
এ তো বড় জ্বালা!
কংগ্রেস
সংগঠনী দল

[ইহা রাজনৈতিক ভাষ্য নহে, বেতারে প্রচারযোগ্য কমার্রসিয়াল বিজ্ঞাপনের আদর্শ নমুনা মাত্র।]

ঘোষক : সুসংবাদ! আর চিন্তা নাই। বায়ুশূন্য কৌটায় রক্ষিত আমাদের বোমবাই মার্কা ইনসট্যানট সোসালিজম্ (ভিটামিন বি কমপ্লেকস যুক্ত) এক চামচ ব্যবহার করুন। আপনার প্রত্যুষের দুর্বলতা এবং সায়াহ্নের অবসাদ মুহূর্তের মধ্যেই দূর হবে। [মিউজিক] আমাদের ট্রেড নাম বম্-সোসা! মনে রাখবেন আমাদের এই অত্যাশ্চর্য বলবর্ধক সামাজিক টনিকটির নাম বম্-সোসা, বোমবাই সোসালিজম।

কণ্ঠসঙ্গীত (কোরাস) : বেরিলি বাজারমে ঝুমকা গিরারে ঝুমকা গিরা
ঝুমকা গিরা ঝুমকা গিরারে

ঘোষক : আপনি কৃষক? [মিউজিক : সুর পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে]

কৃষক : আজ্ঞে।

ঘোষক : আপনার প্রত্যুষের দুর্বলতা এবং সায়াহ্নের অবসাদই আপনার প্রধানতম শত্রু, আপনি কি তা জানেন?

কৃষক : আজ্ঞে?

ঘোষক : জানেন না। তাই আপনি সারাদিন কঠিন মাটিতে হল চালনা করেন, [মিউজিক] রোদে পুড়ে [মিউজিক] জলে ভিজে (মিউজিক) শীতে ঠকঠক [এফেকট মিউজিক : দাঁত ঠকঠকের শব্দ] করে কাঁপতে কাঁপতে অমানুষিক পরিশ্রম করে যে সোনার ফসল ঘরে তোলেন, হায় তা আপনার ঘরে থাকে না। আপনার যে শুষ্ক মুখ, সেই শুষ্ক মুখই থাকে, আপনার পেটে যে তীব্র ক্ষুধা, সেই ক্ষুধার লেলিহান অগ্নিশিখা দাউ দাউ করে [মিউজিক : সুর দারুণ অগ্নিবাণে] আপনার উদ্যমকে, উদ্যোগকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দেয়। আপনার শিক্ষা নেই। আপনি অজ্ঞ। আপনি জানেন না কত ধানে কত চাল। তাই, ভাই, আমাদের পরমপ্রিয় কৃষক ভাই, ভারতের জীবনের জীবন, নয়নের মণি! আসুন, ছুটে আসুন! মুহূর্তমাত্র দেরি না করে এক চামচ, মাত্র এক চামচ বম্-সোসা ঈষদুষ্ণ জলে গুলে খেয়ে নিন। [বম্-সোসা জলে গুলে খাওয়ার শব্দ] ব্যস। ওই দূরে চলে গেল যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত [মিউজিক : সুর যা বৃষ্টি উড়ে যা লেবুর পাতায় করমচা] প্রত্যুষের দুর্বলতা। আসুন, এগিয়ে আসুন, কৃষক রমণী ভগিনী আমার, এক চামচ, মাত্র এক চামচ বম্-সোসা জলে গুলে পান করুন [এফেকট মিউজিক : বম্-সোসা জলে গুলে পান এবং রমণী কণ্ঠে পরিতৃপ্তিজনিত একটি সংলাপ : উঁ!] হ্যাঁ, ওই গেল আপনার [মিউজিক : সুর

উড় যা রে পন্‌ছি উড় যা।] সায়াহ্নের অবসাদ। এখন আপনারা নতুন মানুষ।

কৃষক ও কৃষক রমণীর কোরাস : (কৃষক হেমন্ত মুখুজ্জে ও কৃষক রমণী শ্রীমতী আশা ভোঁসলে ও অন্যান্য)

গীত : বোমুবে তোদের ডাক দিয়েছে
আয়রে ছুটে আয় আয় আয়

ঘোষক : আপনি শ্রমিক?

শ্রমিক : হ্যাঁ। [মিউজিক : সুর ইয়াহু কোই মুঝে জংলি কহে]

ঘোষক : আপনি জানেন, আপনার কে শত্রু?

শ্রমিক : নিশ্চয়ই জানি।

ঘোষক : আমি জানি, আপনি কি বলবেন? আপনি বলবেন মালিক। তাই না।

শ্রমিক : এ বিষয়ে আপনার কি কোনও সন্দেহ আছে? ওই —া—রাই [রেডিও বললেই প্রয়োজনীয় অক্ষর দুটো সেনসারড হল] তো শোষণ করে।

ঘোষক : হ্যাঁ তা ইয়ে আপনার কথা ঠিক, তবে পুরো ঠিক নয় আর কি, অর্থাৎ সাধারণ অর্থে মালিক শ্রমিকের শত্রু বটে তবে সব মালিকই শ্রমিকের শত্রু নয়। বর্তমানে সোসালিস্ট মালিকও যথেষ্ট উৎপন্ন হচ্ছে দেশে। যাক সে কথা। আপনি বোধ হয় জানেন না যে আপনার আসল শত্রু আপনার প্রত্যুষের দুর্বলতা এবং আপনার পরিবারের সায়াহ্নের অবসাদ। এবং আপনি এও বোধ হয় জানেন না যে আপনার এই ভীষণতম শত্রুকে ঘায়েল করার জন্য দারুণতম এক কার্যকর সামাজিক টনিক আবিষ্কৃত হয়েছে। এই যে সেই টনিক। বোমবাই মার্কা ইনসট্যানট সোসালিজম। যার ট্রেড নাম

বো—ম্—সো—সা

[লাউড মিউজিক : সুরে ঝিকু ঝিকু করিরে ঝিকু ঝিকু করিরে] হ্যাঁ বোম্-সোসা। এক চামচ, মাত্র এক চামচ, হে আমার প্রিয়তম শোষিত, নিপীড়িত, নির্যাতিত শ্রমিক ভাই এবং হে আমার প্রিয়তমা শোষিতা, নিপীড়িতা, নির্যাতিতা, শ্রমিকা, ভগিনী এই বোম্-সোসাই আপনাদের প্রত্যুষের দুর্বলতা এবং সায়াহ্নের অবসাদ বিদূরিত করবে। বোম্-সোসা সহজেই প্রস্তুত করা যায়। প্রথমে বায়ুশূন্য কৌটাটি খুলুন [এফেকট মিউজিক : কৌটা খোলা হল] তারপর মাত্র এক চামচ বোম্-সোসা নিয়ে জলপূর্ণ পাত্রে অর্থাৎ গেলাস, বাটি, চায়ের কাপ অথবা মাটির ভাঁড়ে মিশিয়ে দিন [এফেকট মিউজিক : চায়ের কাপে এবং চামচে ঠুনঠুন] হ্যাঁ, এইবার এক চুমুকে পান করুন [তরল পদার্থ পান করার এফেকট মিউজিক]

পুরুষ শ্রমিকের পরিতৃপ্তির সংলাপ : হুঁ-উ-উ।

নারী শ্রমিকের পরিতৃপ্তির সংলাপ : উঁ—উঁ—উঁ।

শ্রমিক ও শ্রমিক রমণীদের কোরাস (শ্রমিক কিশোর কুমার ও শ্রমিক রমণী সন্ধ্যা মুখুজ্জে ও অন্যান্য)

গীত : বোম্-সোসা বোম্-সোসা
সোসা সোসা বোম্ বোম্

পুরুষ : বো বো বো

নারী : সো সো সো

পুরুষগণ : বোম্ বোম্ বা

নারীগণ : সোস্ সোস্ সা

কোরাস : বোম্ সোসা সোসা বোম্

ঘোষক : বোম-সোসা এই ট্রেড নামের ইনসট্যানট সোসালিজমই সব থেকে দ্রুত ফল দেয়। আপনি কৃষক হোন শ্রমিক হোন, অথবা মধ্যবিত্ত সমাজের যে কোনও স্তরের বাসিন্দাই হোন, মনে রাখবেন আপনার প্রধান শত্রু প্রত্যুষের দুর্বলতা এবং সায়াহ্নের অবসাদ। এই আমাদের যাবতীয় দুর্গতির মূল। আসুন আজই দলে দলে সকলে এই মূল উৎপাটন করুন। এক চামচ মাত্র এক চামচ বোম্ সোসা ব্যবহার করুন। সাবধান, নকল হতে সাবধান। কৌটার গায়ে প্রিয়দর্শিনীর ছবিটি দেখে নিতে কখনোই ভুলবেন না। [মিউজিক]

স্থানীয় ডিলারদের কাছ থেকে আজই সংগ্রহ করুন।

১৯৭০

১৯৭০ শুরু হয়েছে। নতুন বছরে সকলেরই মনে প্রশ্ন, কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে দেশটা—যে রাজনৈতিক অস্থিরতা [illegible] সূচনা হয়েছে [illegible] চলতি [illegible]

[illegible] জ্যোতিষী ছাড়া আর কেউ [illegible] প্রশ্নের জবাব দিতে সাহস পাবেন বলেও মনে হয় না। জ্যোতিষীরা গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থিতি বিচার করে একটা জবাব দেওয়ার চেষ্টা করলেও করতে পারেন। কিন্তু কোনও রাজনৈতিক বিশ্লেষকের পক্ষে তেমন কোনও ভবিষ্যদ্বাণী করা অসম্ভব। কারণ কোনও রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকই এখনও পর্যন্ত সঠিকভাবে জানেন না যে ভারতের রাজনৈতিক আকাশের গ্রহনক্ষত্রগুলি এখন কোন্‌টি ঠিক কোথায় আছে। এবং কোনও গ্রহনক্ষত্রের বর্তমান অবস্থিতি সঠিক[illegible]

[illegible] সম্পর্কে [illegible] বা মোটামুটি সঠিক অনুমান করাও সম্ভব নয়।

কোনও কোনও রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক [illegible] চলতি বছরে দিল্লিতে একদলের [illegible]সনের অবসান ঘটবেই এবং শুরু হ[illegible] [illegible]য়ালিশন সরকারের এক নতুন অধ্যায় [illegible]

হয়ত তাই হবে। কিন্তু এটা এখন [illegible] করে কে বলতে পারেন যে, হ্যাঁ, এই [illegible]ন ঘটবেই। লক্ষণীয়, যে স[illegible] রাজনৈতিক জ্যোতিষী বা নেতা ওই রকমের ভবিষ্যদ্বাণী করছেন তাঁরা সকলেই প্রধানমন্ত্রীর বিরোধী। প্রধানমন্ত্রীর বিরোধীদের [illegible]ক্ষে এই কথাটা বলাই স্বাভাবিক। শ্রীমতী [illegible] ক্ষমতায় [illegible] [illegible] চাইবেনই [illegible]

[illegible]

হ্যাঁ যদি এটা ধরেই [illegible] প্রধানমন্ত্রী এক ঝটকায় মন্ত্রিসভা [illegible] করবেনই, তিনি রাজন্যভাতা বিলোপে [illegible] আইন আনবেনই, তিনি শহরের সম্পত্তির উচ্চতম সীমা বেঁধে দেবেনই, তিনি চণ্ডীগড়ের প্রশ্নে হরিয়ানাকেই বেশি খুশী করবেনই, তিনি মাদ্রাজ সরকারকে চটাবেনই, তিনি বাম-কমিউনিস্টদের খোঁচাবেনই তাহলে অবশ্য হিসাবটা করা খুবই সহজ যে তাঁর মন্ত্রিসভার পতন ঘটবেই। কারণ তাহলে তাঁর দলের কিছু বার্থ-মনোরথ এম-পি বেরিয়ে যাবেনই, কিছু [illegible] [illegible] [illegible] এম-পি [illegible] [illegible] পার্টি, ডি এম কে, [illegible] কমিউনিস্ট পার্টি [illegible] করবেনই।

কিন্তু শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যিনি এত খেলায় অতি সম্প্রতি এত পারদর্শিতা দেখালেন, তিনি এইভাবে সবাইকে একসঙ্গে চটিয়ে নিজের মন্ত্রিসভার পতন ঘটাতে উদ্যত হবেনই—এইটাই বা এত সহজে ধরে নেওয়া যায় কি করে? শ্রীমতী গান্ধী সম্ভবত অন্য সকলের চেয়ে একটু বেশি করেই জানেন যে একবার ক্ষমতাচ্যুত হলে তাঁর হালটা কি হবে। সুতরাং, তিনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার জন্য যে সর্বতোভাবে চেষ্টা করবেন সে সম্পর্কে কারু মনে কোনও সন্দেহ থাকা উচিত নয়। সকলেরই এটাও মনে রাখা উচিত যে আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী চিরকালই মূল লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য যে কোনও পথ এবং ব্যবস্থাকে ন্যায়সঙ্গত মনে করেন।

প্রধানমন্ত্রী যেন তেন প্রকারেণ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে চাইবেন এটা যেমন সত্য, তেমনি সত্য যে তাঁর সামনে নিত্য নূতন বিপদ এসে দাঁড়াবে। দলের অধিকাংশই তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন কিছু পাওয়ার আশায়। ডি এম কে, আকালি, দুই কমিউনিস্ট পার্টি এবং নির্দল সদস্যরাও তাঁর সরকারকে সমর্থন করছেন নিজেদের সুবিধার জন্য। এইসব গোষ্ঠী ও ব্যক্তিকে একই সঙ্গে খুশী করে রাখাটা খুব সহজ ব্যাপার নয়। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী চাইছেন

এবং সঙ্গে জনগণকে সন্তুষ্ট রাখতে এবং বড়লোকদের চটাতে। এটাও অত্যন্ত কঠিন কাজ।

এইজন্যই এক শ্রীমতী গান্ধীর অল্প সমর্থক ছাড়া আর কারু পক্ষেই দৃঢ়ভাবে বলা সম্ভব নয় যে এ সরকার টিকবেই—১৯৭০ সনের মধ্যে কিছুতেই এ সরকারের পতন ঘটবে না বা কোনও কোয়ালিশনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে না।

প্রধানমন্ত্রী যদি কোয়ালিশন করতে চান তাহলে অবশ্য সি পি আই ডি এম কে, মুসলীম লীগ প্রভৃতি দল সোৎসাহে এগিয়ে আসবেন। কিন্তু এদের সকলের সঙ্গে কোয়ালিশন করলে প্রধানমন্ত্রীর নিজের দল অটুট রাখাই আবার প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। সেইজন্যই এদের সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গঠন করাও তাঁর পক্ষে সহজ ব্যাপার নয়।

*

বিকল্প কোয়ালিশনের ছবিটাও মোটেই স্পষ্ট নয়। আদি কংগ্রেসের নেতাদের পক্ষেও সমস্বরে বলা অসম্ভব তাঁরা স্বতন্ত্র পার্টি এবং জনসংঘের সঙ্গে জোট বাঁধবেন। কারণ এ ব্যাপারে তাঁদের নানা মুনির নানা মত। তাঁরা এও জানেন, খোলাখুলি জনসঙ্ঘ ও স্বতন্ত্র পারটির সঙ্গে হাত মেলালে দেশের সাধারণ মানুষের একটা বড় অংশ মনে করবেন তাঁরা প্রগতি ও মুসলীম বিরোধী। তাঁদের সকলে এই ধারণাটা সৃষ্টি হতে দিতে চান না।

যদি আদি কংগ্রেস, জনসঙ্ঘ এবং স্বতন্ত্র পার্টি জোট বাঁধতে রাজি হনও তবুও অবশ্য বিকল্প সরকার গঠন সম্ভব হয় না। তিন পার্টি মিললেও অনেক বাকি থাকে।

বিকল্প সরকার হতে পারে যদি কোনও বেসরকারী সব দল হাত মেলাতে রাজি হন। কিন্তু তা যে কিছুতেই সম্ভব নয় এটাও পরিষ্কার। এস এস পি এবং পি এস পি-র কোনও কোনও অংশ যদিওবা আদি কংগ্রেস, জনসঙ্ঘ এবং স্বতন্ত্র পারটির সঙ্গে হাত মেলাতে রাজি হতে পারেন, কিন্তু দুই কমিউনিসট পারটি, মুসলিম লীগ, ডি এম কে প্রভৃতিরা যে কিছুতেই ওদের সঙ্গে একত্রে মিলিতে কোয়ালিশন করতে সম্মত হবেন না সেটা পরিষ্কার।

ভারতের বর্তমান অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কোনও অ-কংগ্রেসী দলের ভেতরেই স্থিরতা নেই। একমাত্র সি পি আই ছাড়া। সকলের বক্তব্যেই কিছু না কিন্তু, 'যদি' 'কিন্তু' আছে। অর্থাৎ সকলেই অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিতে চাইছেন। সকলেরই চেষ্টা কিভাবে এর ভেতর থেকে নিজের বেশি লাভ করে নেওয়া যায়।

সি পি আই অবশ্য স্থিরই করে ফেলেছেন, তাঁরা এখন যে কোনওভাবে ইন্দিরা সরকারের পতন রোধের চেষ্টা করবেন। তাঁদের এই সিদ্ধান্ত রুশ নির্দেশে না নিজেদের রাজনৈতিক বিশ্লেষণ অনুসারে সে বিতর্কে গিয়ে লাভ নেই। শুধু যেটা প্রকাশ্যে দেখা এবং শোনা যাচ্ছে, তার ভেতরই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা ভাল। পরিষ্কার দেখা দিয়েছে, জগজীবনবাবুর কর না দেওয়ার ব্যাপারেও তাঁরা ইন্দিরা-সরকারের পাশে। এমন একটা ব্যাপারেও যখন সি পি আই নয়া কংগ্রেসের সরকারকে পরিত্যাগ করেননি, তখন বাজেটেই বা তা করবেন কেন। যদি না ইতিমধ্যে পাল্টা কোনও রুশ নির্দেশ আসে বা নিজেদের রাজনৈতিক বিশ্লেষণ একেবারে পাল্টে যায়।

*

কেউ কেউ বলছেন, অন্তর্বর্তী নির্বাচনের মাধ্যমে এই সংকটের একটা জবাব পাওয়া যেতে পারে। তাঁদের অনেকেরই ধারণা, প্রধানমন্ত্রীও হয়ত চলতি বছরেই নির্বাচনের ডাক দেবেন।

প্রথমত, আমি বিশ্বাস করি না, নেহাত বাধ্য না হলে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের ঝুঁকি নেবেন। দ্বিতীয়ত, মনে করি না যে নির্বাচনের মাধ্যমে কোনও স্পষ্ট রাজনৈতিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে।

বাধ্য হলে অর্থাৎ নিজের সরকারের পতনের মুখোমুখি শ্রীমতী গান্ধী নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গের জন্য নির্বাচনের ডাক দিতে পারেন। কিন্তু তা না হলে তিনি কিছুতেই নির্বাচনের ডাক দেওয়ার মত বোকামি করতে যাবেন না। শ্রীমতী গান্ধীর আশপাশের যেসব স্তাবকরা বলছেন, 'নির্বাচন হলে আমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী' আমি প্রধানমন্ত্রীকে তাঁদের মত মূর্খ মনে করি না।

এটা নিরপেক্ষ যে-কোনও মানুষের [illegible]

লোকসভায় যত সদস্য আছেন, নির্বাচন হলে তাও থাকবে না। ১৯৬৭ সনে কংগ্রেস মোটামুটি সকল রাজ্যেই ক্ষমতায় ছিলেন দলও তখন অবিভক্ত ছিল—সেই অবস্থায়ই কংগ্রেস লোকসভায় সামান্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিলেন। আজ বহু রাজ্যেই কোনও কংগ্রেসী সরকার নেই। তার উপর দল বিভক্ত। এই অবস্থায় নির্বাচন হলে দু কংগ্রেসেরই মোট আসন সংখ্যা কমতে বাধ্য।

অনেকে বলেন, প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তায় দল নির্বাচনী বৈতরণী পার হয়ে যাবেন। এটা অত্যন্ত ভুল ধারণা। ১৯৬৯ সনের অন্তর্বর্তী নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ সহ বিভিন্ন রাজ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষ শ্রীমতী গান্ধীর নির্বাচনী সভাগুলিতে গিয়েছে। তাঁকে জয়ধ্বনি দিয়েছে। কিন্তু তাঁর দলের প্রার্থীকে ভোট দেয়নি। ভোট শুধু দলের প্রধানের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তায় হয় না। ভোটে সাফল্যের জন্য খুব মজবুত সংগঠনও একান্ত প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রীর সে সংগঠন নেই। অদূর ভবিষ্যতে সে সংগঠন হওয়ারও কোনও সম্ভাবনা নেই।

অন্তর্বর্তী নির্বাচন হলে পরবর্তী লোকসভার ছবিটা কি দাঁড়াবে তা এখন কারুর পক্ষেই অনুমান করা সম্ভব নয়। তবে, এটা বোধ হয় নির্ভয়ে বলা যায় যে, পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠবে। এখন তবু একটা দলে দু শ-র বেশি এম-পি আছেন। তখন কোনও দলে দেড় শ এম-পিও থাকবেন কিনা সন্দেহ। তখন কোয়ালিশনের প্রশ্ন আরও জটিল আকারে দেখা দিতে বাধ্য।

*

বর্তমান লোকসভার হিসাবেই বিচার করুন আর অন্তর্বর্তী নির্বাচনের ফলাফলের অনুমানেই বিশ্লেষণ করুন, একটা জিনিস পরিষ্কার—১৯৭০ সনে ভারতে রাজনৈতিক স্থিরতা ফিরে আসার কোনও সম্ভাবনা নেই। বরং, অস্থিরতা আরও বাড়বে। নানা রকমের জটিলতা নানা ভাবে গোটা দেশকে গ্রাস করতে আসবে।

এই সংকট থেকে আমরা কিভাবে বেরিয়ে আসতে পারব একমাত্র ভগবান ছাড়া কেউ বোধ হয় তা জানেন না।

নবারুণ গুপ্ত

দেবরাজ

সহজ জয়

শান্তের কলা দেখিয়ে জাপানের প্রধানমন্ত্রী অইসাকু সাতো দিব্যি নির্বাচনী বৈতরণী পার হয়ে গিয়েছেন ২৭ ডিসেম্বর। তাঁর দল যে জিতবেই সে সম্বন্ধে সন্দেহ বিশেষ কারু ছিল না। তবে হাজার হোক নির্বাচন হচ্ছে রাজনৈতিক জুয়া খেলা। তাতে কখন কার বরাত ফেরে, আর কার কপালেই বা আগুন লাগে তার কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই। যুদ্ধের পরে জাপানে নতুন সংবিধান তৈরি হয়েছে ১৯৪৭ সনে। তারপর এগারো বার নির্বাচন হয়েছে ওদেশে এবার নিয়ে। জিতেছে ফি বারই একই দল—উদার-গণতান্ত্রিক যাকে ইংরাজিতে বলা হয় লিবারেল-ডেমোক্র্যাট। সাতো সে দলেরই নেতা। সাবেকি নিয়ম বজায় রেখে জিতেছে এবারও তাঁরই দল। শুধু জেতেনি পার্লামেন্টে তাদের শক্তি আরও বেড়ে গেছে। ডায়েটের লোয়ার হাউস অর্থাৎ জাপানী লোকসভা ভেঙে দেবার আগে লিবারেল-ডেমোক্র্যাটদের আসন ছিল ৪৮৬র মধ্যে ২৭৭। নির্বাচনের পর তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৮৮তে। দলের শক্তি আসলে আরও বেশী। যাঁরা জিতেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন বারোজন নির্দল প্রার্থী যাঁরা উদার-গণতান্ত্রিক দলের সমর্থক।

এবার নির্বাচনের আসরে নেমেছিল সরকারী দল আর নির্দলীয় প্রার্থী ছাড়া আরও গোটা চারেক দল। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আর সবচেয়ে জঙ্গী হচ্ছে সোস্যালিস্ট অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক দল। অন্য তিনটে দল হচ্ছে ডেমোক্র্যাটিক সোস্যালিস্ট অর্থাৎ গণতন্ত্রী সমাজতান্ত্রিক দল, কোমাইতো আর কম্যুনিস্ট দল। জাপানে পয়লা নম্বর বিরোধী দল হচ্ছে সোস্যালিস্টরা। তারা কম্যুনিস্ট পুরো-পুরি না হলেও অনেকটা কম্যুনিস্ট ঘেঁষা। মার্ক্সিজমে তাদের অগাধ বিশ্বাস। সাতো সরকারের কোনও নীতিই তাদের পছন্দ নয়—না স্বরাষ্ট্রনীতি, না পররাষ্ট্রনীতি। দেশে ছাত্র অশান্তির জন্যে তারা দায়ী করেছে দক্ষিণপন্থী সরকারী নীতিকে, তাদের ধারণা তারই ফলে দেশে শ্রমিক আর মধ্যবিত্তদের মধ্যেও অসন্তোষ বেড়ে চলেছে। আমেরিকার সঙ্গে জাপানের এতটা মাখামাখি তারা চায় না, চায় না প্রজাতন্ত্রী চীনকে এড়িয়ে চলার নীতি। সোজা কথায় উগ্র না হলেও তারা রীতিমত বামপন্থী। তাদের আশা ছিল এবারে সাতোর দলকে হারাতে না পারুক তারা সে দলকে কোণঠাসা করে ফেলতে পারবে।

সোস্যালিস্টদের মনোবাঞ্ছা ভোটেশ্বরী পূর্ণ করেননি, বরঞ্চ তিনি তাদের ওপর বেশ অপ্রসন্নই হয়েছেন। তাদের ১৩৫টি আসনের ভেতর ৪৫টি তারা খুইয়েছে—রাখতে পেরেছে মাত্র ৯০টি। তাদের এ দুর্দশা হয়েছে ততটা তাদের প্রগতিশীল-নীতির জন্যে ততটা নয় যতটা সাংগঠনিক দুর্বলতার জন্যে। সোস্যালিস্ট দলের মধ্যে একতা আদৌ নেই, না নেতৃত্বে, না কর্ম-পদ্ধতিতে। উপদলীয় কোন্দলে দলের শক্তি নষ্ট হয়েছে, নির্বাচনে তাদের তাই হার হয়েছে কেন্দ্রের ওপর কেন্দ্রে। তা ছাড়া তারা না ঘরকা না ঘাটকা। তারা চীন দরদী অথচ কম্যুনিস্ট নয়। মার্ক্স তাদের পয়গম্বর অথচ কম্যুনিস্টদের সঙ্গে তাদের হৃদ্যতা নেই। কাজেই যারা বামপন্থী, কম্যুনিজমে বিশ্বাসী, তারা সোজাসুজি ভোট দিয়েছে কম্যুনিস্টদেরই। তাতেই কম্যুনিস্টদের শক্তি বেড়ে গিয়েছে—চারের জায়গায় তাদের আসন হয়েছে চোদ্দ। জাপানের কম্যুনিস্ট দল অবশ্য "নিউট্রাল" অর্থাৎ নিরপেক্ষ—তারা না মস্কোপন্থী, না পিকিংপন্থী।

বাকী দুটো দলের মধ্যে গণতন্ত্রী সমাজ-তান্ত্রিক দলের লাভও হয়নি, লোকসানও হয়নি। তাদের জমাও শূন্য খরচও শূন্য। আগের বারে তাদের দখলে ছিল ৩১টি আসন এবারেও তাই। কিন্তু সবাইকে তাক লাগিয়ে বেশ খানিকটা এগিয়েছে কোমাইতো। দলটা নতুন। তার পত্তন মাত্র পাঁচ বছর আগে। আগের বারে তারা পেয়েছিল কুল্লে ২৫টা আসন—এবার এক লাফে পৌঁছেছে ৪৫এ। বেশ বোঝা যায় তাদের প্রতিপত্তি ভোটারদের ওপর বাড়ছে। আর বাড়বে নাই বা কেন? ও দলের শ্লোগান হচ্ছে ক্লীন গভর্নমেন্ট অর্থাৎ কিনা সরকারকে দুর্নীতিমুক্ত করা। সৎ সরকার কোন্ দেশের লোকেরা চায় না বিশেষ করে যারা রাজনীতির কচকচির মধ্যে নেই? বড় কথা অনেকের মগজেই ঢোকে না তা সে তত্ত্ব ডানঘেঁষা হোক আর বাঁয়েঘেঁষাই হোক। কিন্তু সরকারে দুর্নীতি দেখা দিলে বিপদ যে সাধারণ লোকের এ বোধ সকলেরই আছে। তাই জাপানে কোমাইতোর বাড়বাড়ন্ত দেখা যাচ্ছে। সোকা গক্কাই হচ্ছে একটা বৌদ্ধদের ধর্মীয় সংগঠন। নতুন দলকে মদত দিচ্ছে এই সংগঠন।

জাপানী নির্বাচনের ফলাফল দেখে জাপানীদের চেয়েও বোধ হয় মার্কিনীরা বেশী খুশি। আর হবেই বা না কেন? প্রেসিডেন্ট নিক্সনের যে কম্প দিয়ে জ্বর ছেড়েছে। সাতোর দল যদি হেরে যেতো তা হলে তাঁর মাথায় হতো বজ্রাঘাত। কেননা সাতোর সঙ্গে তাঁর একটা বেশ মনের মিল হয়ে গিয়েছে। জাপানের যে আশ্চর্য রকম বৈষয়িক উন্নতি হয়েছে তাতে তাঁর যত না আনন্দ তার চেয়ে অনেক বেশী দুর্ভাবনা। জাপান যদি আগের মত মদমত্ত হয়ে ওঠে, তার জঙ্গী মনোভাব যদি আবার প্রকট হয় তা হলে তো তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ দেখতে দেখতে বেধে যাবে। সাতোর দলের হাতে যদি ক্ষমতা থাকে তা হলে তাদের তিনি সামলাতে পারবেন এই তাঁর আশা। সেই ভরসাতেই তিনি ওকিনাওয়া দ্বীপ থেকে পারমাণবিক ঘাঁটি তুলে নিয়ে ১৯৭২ সনের মধ্যে দ্বীপটা জাপানকে ফিরিয়ে দিতে রাজী হয়েছেন নির্বাচনের আগেই। জাপানের সঙ্গে আমেরিকার যে পারস্পরিক নিরাপত্তা চুক্তি রয়েছে তা নিয়েও প্রেসিডেন্ট নিক্সনের আর দুর্ভাবনা নেই। অন্য কোনও দল কী জোট ক্ষমতা দখল করলে হয়তো সঙ্গে সঙ্গে নোটিশ দিত ও চুক্তি বাতিল করার জন্যে। সাতো তো তা করবেন না।

সাতোর এ জিতের মূলে আছে তিনটে জিনিস। এক মার্কিন সরকারের কাছ থেকে ওকিনাওয়া আদায় করা। দুই, জাপানের আশ্চর্য বৈষয়িক উন্নতি। তিন, উগ্র বামপন্থীদের ভোট বয়কট। সাতো যে ঝানু রাজনীতিক তা তিনি প্রমাণ করেছেন ওকিনাওয়া ফিরে পাওয়ার ব্যবস্থা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পার্লামেন্ট ভেঙে দিয়ে নতুন নির্বাচন করে। ওকিনাওয়া সংক্রান্ত চুক্তির যত দোষই থাকুক না কেন হারানো ধন যে পাওয়া যাচ্ছে তাতেই জাপানীরা আহ্লাদে আটখানা। তাদের সে আনন্দ ভোট হয়ে ঝরে পড়েছে ভোটের বাক্সে। তার ওপর ইতিমধ্যেই জাপান হয়ে দাঁড়িয়েছে পৃথিবীর তিন নম্বর ধনী দেশ। লোকের আর ভাল খাওয়াপরার অসুবিধে নেই। কাজও পাওয়া যাচ্ছে। উগ্রপন্থী সমাজতান্ত্রিকদের তাই সরকার বিরোধী প্রচার চালাবার তেমন কোনও উপলক্ষ্য ছিল না। সেই জন্যে নির্বাচনে তারা সুবিধে করতে পারেনি। কিন্তু যাঁরা অতি সাবধানী তাঁরা বলছেন শতকরা তিরিশের ওপর ভোটার যে ভোট দেয়নি সেটা আদৌ শুভলক্ষণ নয়। ভোট দিলে তারা দিত সাতোর বিরুদ্ধেই আর তা হলে এত সহজে জেতা তাঁর পক্ষে সম্ভব হতো না। তাঁদের ধারণা সাতোর দলকে যারা বধ করবে তারা গোকুলে বাড়ছে।

'আমার বয়স—১৯৭০ সালে'

এই লেখাটা যখন আপনাদের কাছে পৌঁছুবে, তখন আর একটা নতুন বছর শুরু হয়ে গেছে। তার মানে, আপনাদের সকলের সঙ্গে সুনন্দরও আর এক বছর বয়স বাড়তে চলল।

তা বাড়বে—ওটাকে ঠেকানো যাবে না।

বুড়ো হলে রাজ্যপাল হবার যোগ্যতা জন্মায়

যেতো—যদি এই মুহূর্তে আমি কোনো স্পেস-শিপে অন্তত হাজারখানেক আলোক-বর্ষ দূরে—মহাশূন্যে ঘুরে বেড়াতে পারতুম। বৈজ্ঞানিকদের লেখায় পড়েছি সেখানে সময়ের হিসেব আলাদা—সূর্য-প্রদক্ষিণের নিয়মে সেখানে 'কৌমারং যৌবনং জরা' দেখা দেয় না; কিন্তু মানুষের সভ্যতাই এখনো সূর্যের গ্রহ-সাম্রাজ্যে—নিজের নিকটতম প্রতিবেশীর কাছে গিয়ে পৌঁছলো না—এই সুনন্দকে নিয়ে তারায় তারায় পাড়ি জমাবে কে? সুতরাং ১৯৭০ সালে আমার—আপনাদের—সকলেরই বয়স বাড়বে, অনিবার্যভাবে বাড়বে।

সময়কে ফাঁকি দেবার একমাত্র উপায়, তাকে না মানা। সুকুমার রায়ের 'হ য ব র ল'-র উদো বুড়ো বয়স বাড়লেই তাকে উলটো দিকে ঘুরিয়ে দিত; নইলে বুড়ো হয়ে মরব নাকি শেষ পর্যন্ত?' কিন্তু আমাদের হাতে তো স্বপ্নলোকের সেই চাবিটি নেই যে সেই অপরূপ জগতে পৌঁছে গিয়ে সময়ের চাকাটাকে উলটোমুখে ঘোরাব। আমরা কেবল চোখ বুজে, জোর করে বলতে পারি, বছরের পর বছর এগিয়ে যাক—আমরা রবীন্দ্রনাথের ফাল্গুনীর সেই নব যৌবনের দল—আমাদের বয়স বাড়ে না—কখনো না।

মেয়েরা বয়স কমাতে ভালোবাসেন, এ নিয়ে একটা মোটা রসিকতা চালু আছে পুরুষমহলে। কিন্তু বড়দার হাতের চাঁটি খেয়ে যে কিশোরটি গোঁজ হয়ে ভাবে রাতারাতি বড়দার চাইতেই বড়ো হতে পারলে এর জবাব দেওয়া যেত—কে আর বয়স বাড়াতে চায় সে ছাড়া? কিংবা 'এ'-মার্কা ফিল্ম দেখবার জন্যে কোনো কোনো বালকের সাময়িকভাবে সাবালক হওয়ার বাসনা জাগে।

এই যা। আর হয়তো আদালতে কোনো মামলায় প্রাণের দায়ে নাবালিকার বয়স

বাড়াতে হয়। নইলে—সেদিন ভারত-বিখ্যাত কোনো এক গুণী ব্যক্তিকে কথায় কথায় বলেছিলুম, 'শরীর এত খারাপ দেখাচ্ছে কেন? বয়স কত হল?'

তিনি বললেন, 'কম কী! এই তো—

তারপর যে বয়সটার উল্লেখ করলেন, সেটা অন্তত বছর ছয়েক কম। বোধ হয় ভুলে গিয়েছিলেন, তাঁর উদয়-লগ্ন থেকেই আমি তাঁকে চিনি—বয়সের হিসেবে আমরা প্রায় একই নৌকোর যাত্রী।

কিন্তু আশ্চর্য লাগল না। তিনি শিল্পী, তিনি গুণী—সারা ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে দোলা জাগিয়ে দেন। আসলে

বুড়ো হয়ে ভাব জমানো যায়

তিনি তো 'ফাল্গুনী'-রই একজন—চির-কালের নব-যৌবন। তিনি যদি বয়সটাকে আরো দু-দশক কমিয়ে দিতেন—কিছুমাত্র বিস্মিত হতাম না আমি। রবীন্দ্রনাথ যৌবনকে বয়সের সীমা থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন—শিল্পীদের বয়স বাড়ে না, বাড়া উচিতও নয়।

'বয়স চুরি'—না, কথাটা ঠিক হল না। আমরা বয়স চুরি করি না—তাকে অস্বীকার করি। আমরা দিন-রাত্রি, মাস-বছরের ডিকটেটরশিপের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ জানাই। চুলের রঙ বদলায় তো বদলাক না—মনের রঙ যদি বদলাতে না দিই—আমাদের বয়স বাড়ায় সাধ্য কার?

আর যদি 'চুরি'ই বলা যায়—তা হলে এর চাইতে বৈধ এবং জীবনসম্মত চুরি কী আর থাকতে পারে?

লিখতে লিখতেই চোখ পড়ল। বাড়ির পাশে—এক ফালি পড়ো জমি। দূরে যা

অদূর ভবিষ্যতে সেখানে কারো প্রাসাদ উঠবে, অব্যবহৃত জায়গাটিতে পাড়ার লোকের আবর্জনা জড়ো করবার অবাধ অধিকার। আর রয়েছে ঝাঁকড়া একটি টোপা কুলের গাছ—ঝেঁকে ফল এসেছে তাতে।

এদিকে দুটি কুল আগেই বড়ো হয়েছিল—রং ধরেছে তাদের। একটিকে কাল থেকে দেখা যাচ্ছে না—আগেভাগেই চুরি করেছে কেউ। আর একটি—

চোরকে আবিষ্কার করলুম এক্ষুনি। ঝুঁটি বাঁধা এক বুলবুলি চলে এল কোত্থেকে, টুপ করে দ্বিতীয়টিকেও ছিঁড়ে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে উড়ে পালালো। বস্তির যে বাচ্চাগুলো ফল দুটোর ওপর নজর রাখছিল, এখন তারা এ ওকে সন্দেহ করতে থাকবে।

এমন স্নিগ্ধ, এমন মনোহর চুরি বুঝি কখনো দেখিনি।

সেই একজনকে মনে পড়ল—যার হাতে থাকত ছোট্ট একটি নীল মলাটের গানের খাতা। কতদিন ভেবেছি খাতাটা চুরি করব। না—আমি গাইয়ে নই, তারই খাতা বলে চুরি করে রেখে দিতে চেয়েছিলুম। সব কটা গান তো তার গলাতেই রয়েছে, খাতা আর তার কী কাজে লাগবে?

এই চুরিটা নিশ্চয় অন্যায় হত না, চোরও যে ধরা পড়লে খুব শাস্তি পেতো তা নয়—তবু সাহসে কুলোল না। তারপর কত-কাল বাদে—কত বছর পেরিয়ে, হঠাৎ দেখা হয়ে গেল তার সঙ্গে।

'তোমার সেই বিশেষ রঙের শাড়ি কী হল?'

'এখনো ছেলেমানুষ নাকি? একটা ভারভারিক গিন্নী, তা জানো?'

'বাজে কথা। তিরিশ পেরুলে না—কিসের গিন্নী তুমি?'

'যাঃ, কী যে বলো! অত কম বয়স নাকি এখনো?'

'আচ্ছা—আচ্ছা, তিরিশই হল। কিন্তু তারই—'

সে হাসল। প্রতিবাদ করল না।

আমি জানি। তার সেই বাইশ বছরের দিনগুলো অনেক কাল আগে তিরিশ পেরিয়ে গেছে। কিন্তু আমি তাকে বড়ো হতে দিতে পারি না। গানের খাতাটা চুরি করতে পারিনি, কিন্তু তার কিছু বয়স অন্তত আমি চুরি করে নিলুম। সেদিন সে রাগ করেনি—আজও করল না। তার বয়স বাড়লে আমাকেও যে বাড়িয়ে যেতে হয়।

নমস্কা হাস্যরসিক [illegible] একটি বই উপহার দিলেন আমার ছেলেকে। তলায় লিখলেন, 'অমুক কাকা।'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'কাকা কি রকম! আপনি তো আমার চেয়ে অনেক—'

ভুরু কুঁচকে বললেন, 'কাকা লিখব না তো জ্যাঠা লিখব নাকি! ওসব জ্যাঠামো আমার ভালো লাগে না।'

ঠিক কথা—কী হবে জ্যাঠামো করে! আসুক ১৯৭০-৭১-৭২—আমি কিছুরই পরোয়া করি না। বয়সকে বাড়তে দেব না। চিরদিনের দুঃখযন্ত্রণার সঙ্গে তো আছেই, বয়সকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে, যৌবনকে জাগিয়ে রেখে—মোকাবেলা করে যাব জীবনের সঙ্গে।

চুলোয় যাক ম্যাট্রিকুলেশনের সার্টিফিকেট। ১৯৭০ সালের পয়লা জানুয়ারী সানন্দে বয়স ঠিক পঁচিশ। একদিনও বেশী নয়।

কবির বার্ধক্য

বড়ো বেশি দিন ধ'রে ভুগেছিলো অদ্ভুত ব্যামোতে :
যা-কিছু দরাজ দান জীবনের — এই আসে, এই চ'লে যায় —
সব তার মধ্য দিয়ে, তাকে ফ'ুড়ে, যেন চায় উদ্ভাসিত হ'তে
কোনো অস্বাভাবিক আঁধারের উজ্জ্বলতায়।

সুখ, সাধ, নির্বেদ, আক্রোশ, প্রেম — ইন্দ্রিয় বা হৃদয়ের
  যত অনুভূতি,
তারা যেন — সে-মুহূর্তে যা দেখায়, তা নয় আসলে;
দূরতর অন্তরালে রূপান্তর খ'ুজে পাবে ব'লে
দাবি করে তার সহকর্মিতা, প্রশ্রুতি।

কিন্তু সে এখন ভালো হ'য়ে গেছে। বুঝে নেয় অত্যন্ত সহজে
তাম্রশাস কেমন স্নিগ্ধ, তরুণীরা কত মনোরমা,
কেননা কিছুই আর ক'রে নিতে হয় না ভজ'না
বিপজ্জনকভাবে শব্দবন্ধে, প্রকুপিত পিত্তের গরজে।

তার দুই নিত্যসঙ্গী — কাম, ক্রোধ, সুন্দর শ্বাপদ,
যাদের খেলিয়েছিলো অক্ষরের আলোয় বলয়ে —
তারা হ'য়ে গেছে পোকা। সেজন্যে দুঃখও নেই। অন্য এক
  মসৃণ আশ্রয়ে
অধুনা সে অবস্থিত — নিজ গৃহে সনাতন ব্রাহ্মণের মতো
  নিরাপদ।

ছিলো তার কঠিন চেষ্টার চাপে বিস্ফারিত শিরা,
কু'জো পিঠ ছে'ড়া স্নায়ু, মাথা-ঠোকা দেয়ালে তন্নাশ;
ক্রমশ ও-সব কষ্ট মুছে নিলো নতুন বন্ধুরা —
দিবানিদ্রা, নাৎনিদের সঙ্গে লুডো, রহস্যোপন্যাস।

শেষ বিন্দু নিংড়ে নিয়ে কবে যে বেরিয়ে গেলো সেই মুক্তাফল,
যা তাকে আঁকড়ে ছিলো বহুকাল — নিষ্ঠুর, নাছোড়।
এতোদিনে স্বাস্থ্যবান, নিরুদ্বেগ, শান্ত ও নিশ্চল,

সমুদ্রের আন্দোলনে অবিরাম-ধ্বনিত সৈকতে
যে-কোনো পিকনিকে-আসা বালকের কৌতূহলী পথে
প'ড়ে আছে একটি খোলশমাত্র — লোকশ্রুত সত্তর বছর।

মুখটার দিকে এখন যেন তাকান যায় না। জলবসন্তের গোটাগুলো সারা মুখ ছেয়ে উঠেছে, মাত্র দুদিনের ভেতর বীভৎস হয়ে গেছে মুখটা। অবশ্য এমন কিছু ভাল নয় অংশুর মুখ। কেবল রংটা ফর্সা, আদল যাকে বলে সুদর্শন তা নয়। তাহলেও বনশ্রী কেমন সহজেই প্রেমে পড়ে গিয়েছিল। অংশুর কিন্তু সঠিক বিশ্বাস হত না, আজও বিশ্বাস হয় না পুরোপুরি।

তাদের দুজনার, অর্থাৎ অংশু ও বনশ্রীর বিয়েটা হবে-হচ্ছে করে আটকা পড়ে রয়েছে। সম্প্রতি স্থির হয়েছিল, আগামী দু' এক মাসের মধ্যে ওটা সেরে ফেলবে, তারপর যাকে বলে একত্রে সংসারযাত্রা। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে স্বয়ং বিধিই বাদ সাধছেন। নইলে হঠাৎ এমন একটা বাজে অসুখে ফেলে দেবেন কেন অংশুকে। চতুর্দিকে অংশুর নানান কাজ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সেইসব কাজ সুষ্ঠুভাবে সাজাতে গোছাতে, সেরে ফেলতে ঢের সময় লেগে যাবে, অসুখের জন্যে আরও বেশী সময় লাগবে। মাথার ঝকি না কাটিয়ে বিয়ে নামক বস্তুতে যেন সুখ নেই, শান্তি তো নেই-ই।

বনশ্রীর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করতে হবে, মনে মনে ভাবছিল অংশু। ডান হাতের মুঠোয় হাত-আয়নাটা ধরা। আয়নায় যে শ্রী প্রতিচ্ছবিটা পড়েছে, সেটার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হঠাৎ একটা জান্তব আক্রোশ বুক ঠেলে উঠে আসতে চাইল। রাতারাতি মুখটা যেন রাক্ষসের মুখ হয়ে গেছে। মানুষের মুখ কে বলে? প্রথম দর্শনে যে কেউ ভয় পেয়ে যাবে। বনশ্রী তো বটেই, ও যা ভীতু!

খুব ভীতু কি? আপনমনে অস্পষ্ট উচ্চারণ করল অংশু। আর ঠিক সেই মুহূর্তে বনশ্রী ঘরে এসে ঢুকল।

—ও মা!

চোখ দুটো ওপরে তুলে আর্তনাদ করে উঠল সে, যেন ভাতের ঢাকনা খুলতেই নজরে পড়েছে খাবারের উপর অসংখ্য লাল পিঁপড়ে। ছেয়ে ফেলেছে খাবার।—ইস্‌, এমনও হয়! বিছানার তফাতে যে চেয়ারটা পাতা সেখানে গিয়ে বসতে বসতে বলল বনশ্রী।

বনশ্রী বাড়ির সবার কাছেই পরিচিত, অর্থাৎ ইতিমধ্যে পরিচিত হয়েছে। তাই এ বাড়িতে আসতে, বসতে, গল্প করতে

বিশেষ সংকোচ অনুভব করে না। অংশুর বোন রমা তো একদিন দাদার সামনে ঠাট্টাই করে বসেছিল।

হাতের আয়নাটা বিছানার কোণে ছুঁড়ে ফেলল অংশু। প্রেম সম্পর্কে হঠাৎ কেমন অনাস্থা এসে যাচ্ছে।

বনশ্রীর প্রেম কেবল একটা মামুলি ঘটনা নয় তার কাছে একটা চ্যালেঞ্জ গোছের কিছু। যাকে কেবল চাইলেই পাওয়া যায় না, সাধনা করে অর্জন করতে হয়। তার ক্ষেত্রে সেই সাধনকার্যটিও কিছু স্বতন্ত্র। একটি মেয়ের মনোহরণ ব্যাপারে নিছক ভূষণ-চর্চা বা সাধারণ আচরণ-বিধির অনুশীলন ছাড়াও অনেক গুরুতর কিছু। তাকে আত্মগঠন করতে হয়েছে, করতে হচ্ছে। আত্মগঠনের কাজে সে গত দু'বছর ধরে অবিচ্ছিন্ন মনোযোগ দিয়েছে। কোনো না কোনো কল্পিত নায়কের সঙ্গে সর্বদাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। সর্বদাই মনে হয়েছে, বনশ্রীর কাছে সে অর্থাৎ অংশু রায়—সাধারণ জ্ঞানগুণরূপসমন্বিত ছ' ফুটের অংশু রায় যথেষ্ট নয়। তাকে আরও শক্তিমান হতে হবে অর্থাৎ অন্তর্নিহিতভাবে শক্তিমান হতে হবে, প্রেমিক হিসেবে এককথায় "সম্পদশালী" হতে হবে। নইলে কেমন ভয় হয় অংশুর, হয়ত কোনো বিশেষ মুহূর্তে বনশ্রী অভিজাত ফুলের শৌখিন গন্ধের মতো হারিয়ে যাবে। যেমন হারিয়ে গিয়েছিল বনশ্রী তার পূর্ব প্রণয়ী মিঃ ঘোষ-এর কাছ থেকে।

বন্ধু বিনয়ের কথাটা আজও খুব কানে বাজে। বিনয়ের কথাটার মূল্য আছে, একেবারে অসারবাক্য বোধ হয় না। বিনয় অংশুর হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু। ঘটনা দ্রুত এগুবার কালে একদিন অংশুকে আলাদা ডেকে বলেছিল—কাজটা কি খুব ভাল হবে রে অংশু! যে একজনাকে সহজে ছাড়তে পারে অন্যকে ছাড়তেও তার দেরি হয় না। একটু ভেবেচিন্তে এগুস্।

মৃদু মাথা নেড়ে, সায় দিয়ে, বন্ধুর মন রক্ষাও করেছিল অংশু। যুক্তির দিক থেকে কথাটা সমর্থন না করেও বা উপায় কি? কিন্তু গণ্ডগোল তো অন্যত্র গণ্ডগোল সেখানে যেখানে যুক্তি কাজ করে না, অর্থাৎ মনে। পাগলা মনটাকে নিয়েই তো বিপদ। বনশ্রীকে অংশুর দারুণ ভাল লেগে গেছে। বনশ্রীই এখন তার ধ্যান জ্ঞান, সর্বস্ব।

বনশ্রী যে স্কুলে কাজ করে সেই স্কুলের সেক্রেটারী অমিয়াদি অংশুর পূর্বপরিচিত। তাঁরই সূত্রে বনশ্রীর সঙ্গে আকস্মিকভাবে আলাপ। মিঃ ঘোষের সঙ্গে বনশ্রীর হৃদয়ঘটিত সম্পর্কের কথা তখন সে জানত না। এমনকি বেশ কিছুদিন পরেও নয়। ইতিমধ্যে বনশ্রীর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা অনেক বেড়ে গেছে, বিশেষ করে বনশ্রীদের স্কুলের চ্যারিটির ব্যাপারে। অংশুর চেনাশোনা লোক বিস্তর। শহরের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মুরুব্বীদের সঙ্গে তার জানাশুনো, খাতির। ওর সামান্য একটু তদ্বিরে অনেক কাজ সহজেই হয়ে যায়।

বনশ্রীর সাহায্যে সে যে অকৃপণ হবে এতো জানা কথা। বনশ্রীকে নিয়েই সে তার চ্যারিটির কাজে ঘুরত। রবীন্দ্রনাথের "শ্যামা" নিউ এম্পায়ারে অনুষ্ঠিত হবে। প্রচুর টিকিট বিক্রি করে দিয়েছিল অংশু। মাইক ভাড়া করে দেওয়া, সুভেনির ছাপিয়ে দেওয়া, বিজ্ঞাপন জোগাড় করা এমন অনেক কাজে সে এত সাহায্য করেছিল যে কেবল বনশ্রী নয়, স্কুল কর্তৃপক্ষের সবাই ব্যক্তিগতভাবে তাকে ডেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিল। কেবল স্কুলের দু-একজন তরুণী শিক্ষিকা বনশ্রীকে কৌতুক করে দু'একটি লঘু সরস মন্তব্য করেছিল, যার ছিটেফোঁটা অংশুর কানেও এসে পৌঁছেছিল; এবং স্বভাবতই কর্ণমূল আরক্ত করেছিল।

সেই চ্যারিটি শো'তেই মিঃ ঘোষ-এর সঙ্গে আলাপ। ভদ্রলোককে বেশ ভালই লেগেছিল অংশুর। বেশ শব্দ করে হাসেন, হাত খুলে খরচা করেন, সাধারণ ব্যবহারের দিক থেকেও পাঁচটা মানুষের থেকে উঁচু পর্যায়ের মনে হয়েছিল, এমন কি চেহারাটাও ভাল। বয়সটা কিছু বেশী, তবু বনশ্রীর সঙ্গে ভালই মানায়।

এমন লোকটিকে শেষ পর্যন্ত বনশ্রীর কেন ভাল লাগল না বনশ্রীই জানে। অংশু ভেবে কূল-কিনারা পায় না।

—তুমি নিমপাতা কিছু রাখ না কেন বিছানার পাশে? বনশ্রী প্রশ্ন করল।

—নিমপাতার এখন দরকার নেই, যখন চুমকি উঠবে তখন। তখনই ভয়ের কিনা?

—তখন বাপু আমাকে যেন আসতে বলো না। আমার ভীষণ ভয় করবে।

আসবে না? এত ভয়? দেখ না মা বিছানার উপর বসে আমার মুখে চন্দন লাগিয়ে দেয়, চাদর পাল্টিয়ে দেয়, কই মা'র ভয় করে না তো।

—মা'র কথা আলাদা।

—হ্যাঁ তা ঠিক, জীবনের সবক্ষেত্রেই মা'র কথা আলাদা। মা ভিন্ন দুনিয়ায় সবাই পর। কে কত আপন আজও পরীক্ষায় ধরা পড়ে যায়।

—সার বুঝেছ, একেবারে সার বুঝেছ। বনশ্রী সজোরে মাথা দুলিয়ে বলতে লাগল।

—ভাগ্যিস অসুখ হল, নইলে কী আর বুঝতে পারতাম। দীর্ঘ দশ হাত ব্যবধানে বসে থাকতে যার ভয় তাকে আপন বলে ভাবা ভুল ছাড়া আর কিছু কি? যাক্ গে—ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে যেতে অংশুর মুহূর্তের বেশী সময় লাগে না। এই ব্যাপারে বনশ্রীর একটু বিশেষ সুবিধা। এ ধরনের বিপদে পড়লে ঝামেলার সামনে বেশীক্ষণ দাঁড়াতে হয় না। অল্প সময়ের মধ্যেই প্রসঙ্গান্তরে চলে যায় অংশু। দোষের মধ্যে তার একটু খুঁতখুঁতে স্বভাব আছে। সবকিছুতেই জেরা করে, জবাবদিহি দিতে হয়। এই দোষটুকুর জন্য মাঝে মধ্যে লোকটাকে একেবারে অসহনীয়ও যে বোধ হয় না তা নয়। রাগের মুহূর্তে মনে হয়, দূর ছাই, অংশুকে আর প্রয়োজন নেই। অংশু বিনাই সে জীবন কাটাবে, একেবারে একা, নিশ্চিন্ত স্বাধীন। এই বয়সে কৈফিয়ত দেওয়া বনশ্রীর পক্ষে সত্যিই অসম্ভব।

—আমার চিঠিটা পোস্ট করেছিলে?

—হ্যাঁ।

—পথের মোড়েই ড্রপ করেছিলে।

বনশ্রী একটু চুপ করল। কারণ, সে সত্যিই সামনের পথের মোড়ের ডাকবাক্সে চিঠিটা ড্রপ করেনি। ফেলতে ভুলে গিয়েছিল। তাই দ্বিধামিশ্রিত স্বরে বলল—নু না। পরে।

—পরে কেন?

আসল কথাটা হয়ত তখনই প্রকাশ করতে পারত বনশ্রী, কিন্তু তুচ্ছ বিষয় নিয়ে এত প্রশ্ন তার ভাল লাগল না। সে তাই আসল তথ্য প্রকাশ করল না। কণ্ঠস্বরে উষ্ণতা মিশিয়ে বলল—পরে কেন কি; পরে—পরে। পরে হলে হয়েছে কি?

বনশ্রীর মুখের চেহারা পালটে গেল কথা বলতে বলতে।

বনশ্রীর মনোভাবের এই বিরূপ পরিবর্তন ভাল লাগল না অংশুর। সে-ও উত্তেজিত হয়ে উঠল। ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে মুখ বিকৃত করে বলল—পরে হলে হয়েছে কি? পরে না হলে পাড়ার ওই রাস্কেল ছোঁড়াটার সঙ্গে রসালাপ করার মূল্যবান সুযোগটা নষ্ট হয়ে যেত। রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বেহায়া মেয়ের মতো—।

জলবসন্তে মুখটা অংশুর এমনিতেই বেশ খারাপ হয়ে গেছে এর উপর ক্রুদ্ধ অবস্থায় তার বিকৃত মুখের চেহারা আরও কদর্য আকার ধারণ করল। আর সেই কুদর্শন মুখের প্রতি ইঙ্গিত করে বনশ্রী তার মনের অবরুদ্ধ উষ্মা বিস্ফোরণ ঘটাল—'যেমন ছোটলোকের মতো চেহারা, তেমন স্বভাব। চেহারা পালটাবে না, স্বভাবটাও নয়।'—বলে উঠে দাঁড়াল বনশ্রী।

অংশু বুঝল বনশ্রী এবার বিদায় নেবে। অন্য সময় হলে তাকে অনুনয় বিনয় করে বসাত। কিন্তু তার মনও অকস্মাৎ কে

বিরূপ হয়ে গেছে আজ। একটু আগেই হাত আয়নাটা দিয়ে সে তার মুখ দেখছিল। কী ভীষণ কদাকার হয়ে গেছে সে লক্ষ্য করেছিল। বনশ্রীকে রাগের কথাগুলো বলতে গিয়ে সেই মুখ যে আরও কুৎসিত হয়ে উঠেছিল এ বিষয়ে তার নিজেরও কোন সন্দেহ নেই।

এই ব্যাপারে বনশ্রীর ধারণা এবং মন্তব্যর খানিটা যে সত্য অর্থাৎ তার চেহারাটা যে ছোটলোকের মত তা অস্বীকার করা যায় না। আর সে এটাও লক্ষ্য করেছে যে বনশ্রীর হাতে এইটিই ব্রহ্মাস্ত্র, তার এই বিশেষ অক্ষমতাটুকু। একে ব্যক্তিগত অক্ষমতা বলা যায় কিনা তা নিয়ে মনুষ্যসমাজে যত বিতর্ক থাকুক, নিজে সে তার এই পরাভবটুকু আজও কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

সর্ব বিতর্ক আলোচনার অন্তিমে বনশ্রী এই ব্রহ্মাস্ত্রটি নিক্ষেপ করলেই অংশু ভগ্নশির সর্পের মতো ধরাশায়ী হয়ে পড়ে, বনশ্রীকে সমুচিতভাবে জব্দ করার কোন উপায়ই উদ্ভাবন করতে পারে না, উদ্ভাবনী শক্তিও হারিয়ে ফেলে যেন।

সেদিন বিদায় নিয়ে বনশ্রী পর পর দুদিন এল না। তৃতীয় দিনও বেশীক্ষণ অপেক্ষা করল না। অংশুর সঙ্গে সামান্য কয়েকটি কুশলবাক্য বিনিময় করে বিদায় নিল। বনশ্রীর প্রশ্নের উত্তরে অংশুও যৎপরোনাস্তি সংযম অবলম্বন করল। ব্যবহারে কোথাও একটুকু উৎসাহ দেখাল না।

চতুর্থ দিন বনশ্রী কিছু কমলা কিনে নিয়ে এল। পরিণামে কেবলমাত্র লজ্জা পেল। অংশুর বোন রমা বনশ্রীর হাতে কমলা দেখে হেসে গড়াগড়ি।—ও মা, দেখে যাও, বনশ্রীদি কমলা নিয়ে এসেছে। পক্ষ-এ কমলা খায় নাকি! এ মা! অংশু নিজের হাসি গোপন করতে সকালের বাসি খবরের কাগজখানা মুখের সামনে ধরল।

বনশ্রী সর্বদিকে তাকিয়ে মুহূর্তমধ্যে হতবিহ্বল হয়ে পড়ল। বুঝতে পারল কমলা নিয়ে এসে সে কী নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছে। নিজের অনভিজ্ঞতাকে দায়ী করে মনে মনে নিজেকে অভিসম্পাত দিতে লাগল। এবং সবশেষে নিতান্তই গোবেচারীর মতো ঘরের দূরতম প্রদেশে রাখা কাঠের চেয়ারটার উপর চুপ করে বসে রইল। অংশুর দিকে অস্পষ্টভাবে তাকিয়ে সভয়ে বলল—চুমকি উঠছে?

অংশু এবার সশব্দে হেসে উঠল।—চুমকি উঠবে মানে? গোঁফগুলো এখনো পাকেইনি।

—এখনো পাকেনি।

—না।

একটু থেমে বলল অংশু—দু-একটা পেকেছে অবশ্য। দেখবে?—বলে মাথাটা

এক ঝটকায় অন্যদিকে ঘ্ুরিয়ে ফেলল—অসভ্য।

বনশ্রী আতকে উঠল। কানের ঠিক পিছনে একটা উষ্ণ উস্‌সে হল্‌স ফোস্কা।

—বুকের সব বোতামগুলো এইরকম খেকে যাবে, তারপর শুকোবে, তারপর চুলকি উঠতে আরম্ভ করবে। সে এখন ঢের দেরি।

বনশ্রী আজ বেশ সেজেই এসেছে। একে তার চেহারা ভাল, তার সাজলে রীতিমত সুন্দরী দেখায়। আজ সাদা নাইলন জর্জেটের শাড়িখানায় তাকে অদ্ভুত মানিয়েছে। দীর্ঘ-গ্রীবা, সুযৌবনা, তরঙ্গায়িত দেহখানা নিয়ে সে যখন অংশুর ঘরে ঢুকেছিল তখনই তাকে রাজহংসী বলে সম্বোধন করতে লোভ হচ্ছিল অংশুর। আরও কপালে গোল টিপখানা চন্দনটিকার মত জ্বলছে।

কিছু মন্তব্য করার আগেই রমা ওই কলের প্রসঙ্গ তুলে তার এই রূপস্তুতির আয়োজন মাটি করে দিল।

তবু সে জিজ্ঞেস করল—এতো সেজেছ কেন?

—কেন, আমার বুঝি সাজতে নেই?

—আছে, কিন্তু অন্যের অর্ধেক সজ্জিত থাকলে কি ভাল দেখায়? টিপে টিপে হাসতে লাগল অংশু।

—তা ঠিক।

—ভয় নেই বলে বুঝি লিপস্টিকে অধর রঞ্জিত করেছ?

—এই অসভ্য।

—অসভ্যতামি করব নাকি?

—ই-স্‌।

—তবে খুব সুন্দর লাগছে তোমাকে।

—জানো, লতিকাদি বলছিলেন আমি প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে লোন পাবো। তিন বছর হয়ে গেলেই নাকি তিন মাসের বেসিক পে লোন পাওয়া যায়।—তার মানে ছ'শো টাকা।

দু'হাত উঁচুতে তুলে প্রায় নেচে উঠল অংশু। বল কি, ছ'শো টাকা? তা হলে তো প্রবলেম সল্‌ভড্‌। তোমার ছ'শো, আমার আট-শো, চোদ্দশো। এনাফ্‌—এনাফ্‌। স্টিম পাইপের মত এক বিচিত্র ধরনের ফস্‌ ফস্‌ শব্দ করতে লাগল অংশু।

—হ্যাঁ, এনাফ্‌? চোদ্দশোয় কী হবে? চোদ্দশোয় আবার বিয়ে হয় নাকি।

—হয় না মানে, নিশ্চয় হয়। আমরা ছোটোখাটো আয়োজন করব। দরকার কি হাজার লোককে খাওয়াবার।

—ক'জনকে খাওয়াবে শুনি। নিশ্চয় পাঁচজন কি দশজন নয়।

—হ্যাঁ, দরকার হলে তাই। আমাদের বিয়েটাই প্রধান।

—না, তা হয় না। শত হলেও কিছু লোককে বলতেই হয়। পরে অন্যের কাছে মুখ দেখাব কি করে!

—দয়াখো, বেশী বাড়াবাড়ি করো না। প্রয়োজনে সব কিছুই করতে হয়। জীবনটাই তাই, প্রয়োজনে নিষ্ঠুর কাজও করতে হয়।—যেমন তুমি...

—যেমন আমি, না, না? যেমন আমি করেছি। কথা টেনে নিয়ে উত্তর দিল বনশ্রী। একটু চুপ করে থেকে বলল, করেছি বলেই না কথায় খোঁচা দিতে পারছো।

মুখটা কেমন বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছিল বনশ্রীর। মিঃ ঘোষকে বর্জন করার ব্যাপারটা যারা জানে তারা প্রত্যেকে বনশ্রীকে একা অপরাধী ভাবে। এমন কি অংশুও। অন্তত অংশুর এইরকম মন্তব্য শুনে তাই তো মনে হয়। মনে না হয়ে উপায়ই বা কি? কিন্তু এক-এক সময় বনশ্রীর ইচ্ছে হয় প্রশ্ন করে অংশুকে, বা তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে যে, অংশু এবং বনশ্রী দুজনকেই সমান জানে, এমন কাউকে—যে মিঃ ঘোষকে বর্জন করে লাভ হয়েছে কার বেশী। অংশুর না বনশ্রীর। তার নিজের ভাগ্যের খাতায় লাভের কোঠায় কিছু পড়েছে কিনা সঠিক বুঝতে পারে না সে। বিশেষ করে আজ-কাল। আজকাল প্রতি কথায়, প্রতি কাজে অংশু কেবল তার ত্রুটিই দেখে, কোথাও কোনো তারিফ প্রশংসা করার মত কিছু দেখে না। তাদের দুজনার মনের এত অমিল আগে ছিল না। বিয়েটা যদিও এখনো ঘটেনি, তবু ভয় হয়—বিয়ে করার পর তাদের দুজনার সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত কী রকম দাঁড়ায়। ভেবে একটু আতঙ্কিত বোধ করে বইকি বনশ্রী। তার মনের এই সংশয় দুশ্চিন্তার অর্পণ করবার উপযুক্ত কোনো স্থানও নেই। নেই বলে নিজের মনের বোঝায় নিজেই নুইয়ে পড়ে। বোঝা টেনে টেনে মাঝে মাঝে ক্লান্ত বোধ করে।

অংশুর দিকে তীক্ষ্ণ কুপিত দৃষ্টিতে তাকায় বনশ্রী। স্পষ্টভাবে চোখে চোখ রাখে না, পাছে তার খারাপ দৃষ্টির ভাষা মুহূর্তে অংশু পড়ে ফেলে। অংশু মুখটা নিচু করে কাগজটা দেখছিল যখন, তখন তার দিকে সে ওই নিষ্করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে বনশ্রী।

একবার বলে, তোমার প্রাইভেট পড়ার কথায় কি ভাবছ?

—হঠাৎ এ কথা কেন?—ভ্রু দুটো কুঞ্চিত হল অংশুর।

—না, এমনি বলছি। আস্তে আস্তে বলল, ভবিষ্যতের কথা ভাবতে তো হয়।

এবার পাল্টা প্রশ্ন অংশুর।

—তুমি সারাদিন কি কর?

—তার মানে?

—তার মানে আগে তো আমার সঙ্গে টাং টাং করে ঘুরে বেড়াতে। এখন কি কর?

বনশ্রী কেমন হতচকিত হয়ে পড়ল। মুহূর্তের ভেতর সে কী জবাব দেবে খুঁজে পেল না। বলল—কেন, এইখানেই তো বসে থাকি।

—সে তো কতক্ষণ। স্কুল থেকে ফিরে দুপুর বেলায় কি কর? ঘুমোও?

একবার মনে হল ঝট করে বলে দেয়, হ্যাঁ ঘুমোই। কিন্তু তা বললে নির্জলা মিথ্যে বলা হয়। সত্যিই সে দুপুরবেলায় ঘুমোয় না। এমন কি অংশুর অসুখের পর এতদিন গেছে, একদিনও ঘুমোয়নি। ঘুমোবে কি, অভ্যাসটাই যে চলে গেছে, আর অভ্যাস চলে যাওয়ার জন্য অংশুই কি সর্বাংশে দায়ী নয়? তার সঙ্গে ঘুরে ঘুরেই তো অভ্যাসটা বদলে গেছে। কথাটা বোধহয় আবার ভুল বলা হল। মিথ্যে বলা হল। অংশু নয়, অংশুর আগে মিঃ ঘোষের সংসর্গেই তার অভ্যাসটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। রোজ দুপুরবেলা মিঃ ঘোষের অফিসে হানা দেওয়া একটা অভ্যাস দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। সে-সব কথা বনশ্রীর এখন মনে পড়ে না তাই। খেয়ে-দেয়ে ফিট্‌ফাট হয়ে ঠিক দুপুরবেলা ট্রাম-বাস যখন ফাঁকা, তখন সেই ফাঁকা ট্রামে-বাসে চড়ে মধুর একটা ভাবনা নিয়ে কে যেত মিঃ ঘোষের অফিসে, গোপন অভিসারে?

এত ঘন ঘন যেত যে তাকে স্লিপ দিতে হত না। রিসেপসনিস্ট দেখা মাত্র হেসে অভ্যর্থনা করে কাছে দাঁড়ান চাপরাশিকে বলত—মেমসাবকো লে যাও ঘোষ সাব্‌কা পাশ।

সেই ঘোষ সাবের কাছে ইতিমধ্যে এক দ্বিপ্রহরে বনশ্রী অকস্মাৎ চলেও গিয়েছিল। ঘটনাটা আকস্মিক, বনশ্রীর কোনো পূর্ব-প্রস্তুতি ছিল না। বলতে গেলে প্রায় অকারণেই উপস্থিত হয়েছিল মিঃ ঘোষের অফিসে। কিন্তু ঘটনাটা অংশুকে জানান কি ঠিক হবে? তাছাড়া, জানানোর প্রয়োজনেই বা কি?

দুপুরটা হাই তুলে তুলে যখন সময় কাটে না, একঘেয়েমিতে শরীর দুলিয়ে আসতে থাকে, তখন একদিন দুপুরবেলা রাস্তায় বেরিয়ে হঠাৎ ঠিক করে ফেলল, অরুণের কাছে যাওয়া যাক। অরুণ তো তাকে ভুলেই গেছে। তাকে বর্জন করে তার মনে যদি কোন এক সময় কিছু ব্যথা-বেদনা যন্ত্রণা দিয়ে থাকে, আজ আর তার কিছুই অবশিষ্ট নেই, এতদিনের দীর্ঘ অবকাশে সবকিছু নিশ্চয় ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

সে কথা অরুণ নিজেও স্বীকার করেছিল। অম্লান বদনে হেসে বলেছিল—বটেই তো। কে আর কাকে মনে রেখেছে।

তুমিই দেখছি ভুলতে পারনি। হঠাৎ কী ব্যাপার?

—ব্যাপার কিছুই না। সময় কাটছিল না দুপুরবেলা, তাই ভাবলাম একবার যাই অরুণের অফিসে। দুপুরবেলা তোমার এই কামরায় বসে নিচের কলকাতাকে দেখতে আমার খুব ভাল লাগত মনে আছে?

অরুণ একটু মাথা নেড়েছিল, অস্ফুট বলেছিল—হ্যাঁ মনে আছে।—বনশ্রীর এহেন কিছু কিছু রহস্যময় অভ্যেস এখনও তার মনে আছে।

বেয়ারাকে ডাকল, বনশ্রীকে বলল—চা খাবে?

—চা? না এখন কিছুই খাব না।

অফিস থেকে বেরিয়ে অনেকক্ষণ ঘুরেছিল অরুণের সঙ্গে বনশ্রী।

বড় গঙ্গার ধারে এসে পৌঁছতে এক-সময় বনশ্রী প্রশ্ন করেছিল অরুণকে—বিয়ে করেছ?

অরুণ চমকে ঘাড় ফেরায়। তাকিয়ে দেখে বনশ্রী মিষ্টি মিষ্টি হাসছে। হাসলে বনশ্রীর গালে টোল পড়ে, মুখটা আরও মিষ্টি হয়ে ওঠে। এমন মিষ্টি মুখের রসিকতাকে সে সহজভাবে নেবে ভেবেছিল, কিন্তু পারল না। অর্থাৎ পুরোপুরি পারল না। মুখে হাসি বজায় ছিল, এমন কি অক্লেশে বলেও ছিল—না করিনি, মানে প্রয়োজন বোধ করছি না। কিন্তু মনের কোথাও যে একটা তীক্ষ্ণ কণ্টক ফুটেছে, সেই গোপন তথ্যটুকু বাইরে থেকে বনশ্রী টের পাচ্ছিল।

—তুমি করেছ কি?

—আমিও না।

পরিহাসের হাসি তখনও মুখ থেকে মুছে যায়নি বনশ্রীর।

চোখের সামনে আকাশের গায়ে লঘু মেঘের ভেলা ভেসে যাচ্ছিল। সেইদিকে উদাস নেত্রে তাকিয়েছিল বনশ্রী। দেখে মনে হচ্ছিল মানুষের প্রেম জীবন সম্পর্কে তার মনোভাব ওই লঘু মেঘের আসা-যাওয়ার মতই অনিয়ন্ত্রিত ও মূল্যহীন। জীবনের স্রোতে ভাসতে ভাসতে একবার অরুণ এসেছিল, পরে অংশু। একজন চলে গেল, আরেকজনও যদি যায় ক্ষতি কি? হয়ত যাবে। হয়ত ফিরে আসবে অরুণ। আবার একদিন অরুণ চলে যাবে, ফিরে আসবে অংশু। জীবন জুড়ে কেবল এই লঘু-মেঘের খেলাই চলবে।

দুজনার ভেতর সাময়িক সম্পর্ক আরও কিছুটা সহজ হয়ে গেলে আশ্চর্যজনকভাবে এক সময় এইসব কথা বনশ্রী বলেও ফেলেছিল পরিহাসচ্ছলে।

অরুণও খুব সহজ মনে গ্রহণ করেছিল কথাগুলো, উপভোগ করেছিল। বলেছিল—রাইট ইউ আর। আমি ঠিক করেছি জীবনে কোথাও রেসিস্ট করব না। ভালও এলে নয়, মন্দ এলেও নয়। যত গণ্ডগোল রেসিস্ট করতে গেলেই। এই ধর, আমাকে ট্রান্সফার করে দেবে বলে উপরওয়ালা হুমকি দিচ্ছে। এতদিন তর্কাতর্কি কথা কাটাকাটি অনেক করলাম। এখন ভাবছি কি দরকার ঝগড়া করার! চলে যাব যেখানে বিদেয় করে। গেলে ক্ষতি কি। যেখানে পাঠাবে সেখানেও তো মানুষজন আছে, হাওয়ায় অক্সিজেন আছে, তৃষ্ণার জল আছে, ক্ষুধার খাদ্য আছে।

বনশ্রী অরুণের কথাগুলো খুব আগ্রহের সঙ্গে শুনছিল। কথা শেষ হলে স্মিতময় মেশানো গলায় বলেছিল—তুমি আগের চেয়ে অনেক বেশী ভাবুক হয়ে গেছ। একটু হেসে পরে বলেছিল—এই গঙ্গার পাড়ে ঘন ঘন আসছ নাকি আজকাল?

অরুণ বলেছিল—না, গঙ্গার পাড়ে আসি না, তবে তোমার মত ফাঁক পেলে জানলা দিয়ে নিচের কলকাতার দিকে তাকিয়ে থাকি।

—লাফিয়ে পড়বে না তো!

অরুণ হেসে ফেলেছিল।—কেন তোমার জন্যে? তারপর ভাঙাচোরা লাইনে কবিতার মিল দেবার মত বলেছিল—অত দুঃখ নেই গো তোমার জন্যে।

বনশ্রী কপট ক্রোধের ভঙ্গিতে একটা কিলও বসিয়েছিল তৎক্ষণাৎ অরুণের পিঠের উপর।

॥ ২ ॥

পরদিন বেলা দশটা নাগাদ দেওয়ানজীর কাছ থেকে আমাদের ডাক পড়লো। অনির্বাণ বললো, চলো দেওয়ানী খাসে যাওয়া যাক।

দেওয়ানী-ই-খাসে গিয়ে দেখি দেওয়ানজী ফরাসের উপরে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসে আছেন। প্রথমেই চোখে পড়বার মতো রাজা বাহাদুর ও তাঁর চেহারার মিল। দুজনেই সমান লম্বা, দুজনেরই রঙ ও বয়স সমান, মামাতো পিসতুতো ভাইয়ে এমন মিল বিরল নয়। দুজনেরই দীর্ঘ বলিষ্ঠ বয়সের ভারে কিছু নমিত। প্রভেদ কেবল চোখে। রাজাবাহাদুরের চোখ সংকোচহীন সরোবর, শান্ত গভীর; দেওয়ানজীর পুরু ভুরুতলে চোখ দুটো একজোড়া শ্বাপদের মতো শিকারের উপরে পড়বার জন্য উদ্যত। দীর্ঘকাল দেওয়ানি উপলক্ষ্যে মনুষ্য শিকার করতে করতে চোখের দৃষ্টি শ্বাপদের গুণ পেয়েছে।

আসুন, আসুন, আপনারা দুদিন এসেছেন অথচ অভ্যর্থনা করতে পারিনি, ব্রহ্মপুত্রে স্নানে গিয়েছিলাম, প্রত্যেক অমাবস্যা পূর্ণিমায় স্নানে যাওয়া অনেক কালের অভ্যাস কিনা।

আমি বললাম, তাতে ক্ষতি হয়নি, গোপীবাবু আর হারান আমাদের দেখাশোনা করছে।

এসেই ঐ দুজনের হাতে পড়েছেন, ওরা দুজনেই অপদার্থ।

না, না, ওরা বেশ তদ্বির করছে।

তা হবে, আপনারা যে পঞ্চাননবাবুর বন্ধু, আর কাউকে বড় গ্রাহ্য করে না ওরা।

এবারে অনির্বাণ আরম্ভ করলো, আচ্ছা, পঞ্চানন যে চুরি করেছে এ কি নিশ্চয়।

বিচার শেষ না হলে কেমন করে বোঝা যাবে। তবে সন্দেহের উপরে নির্ভর করে চলতে হয়।

সন্দেহের কি কারণ থাকতে পারে জানি না। দুদিন বাদে সমস্তই যার হবে সে কেন চুরি করতে যাবে। তাছাড়া রাজবাড়ির অন্য ধনরত্নের সঙ্গে মোতির মালাটা থাকতো তোষাখানায় যার দুটো চাবি একটা আপনার কাছে, আর একটা রাজাবাহাদুরের কাছে। পঞ্চানন চাবি পাবে কেমন করে?

এক সঙ্গে অনেক কথা বলে ফেললেন, একে একে উত্তর দিচ্ছি। চুরি সন্দেহ করবার অনেক কারণ থাকতে পারে। প্রথম কারণ, আমাকে অপ্রস্তুত করা। ভাবটা এই যে দেওয়ান বুড়ো হয়েছে, তেমন আর চৌকশ নেই, এখন ওকে বিদায় দিলেই ভালো। দ্বিতীয় কারণ, বয়স হয়েছে, টাকা পয়সার দরকার, বুঝতেই পারছেন। আরও কারণ চাই নাকি?

অনির্বাণ বললো, কিছু মনে করবেন না দেওয়ানজী, আপনি বয়োবৃদ্ধ নমস্য ব্যক্তি। কিন্তু আমি তো দেখছি কোন কারণটাই টেকসই নয়। চাবি থাকলো আপনার কাছে। সে চাবি নিশ্চয় সে পায়নি। তবে সিন্দুক খুললো কি করে? আপনি বলবেন রাজাবাহাদুরের চাবি দিয়ে। সে চাবিই বা পাবে কি করে? আর যদিই বা পায় অপ্রস্তুত হবেন তো রাজাবাহাদুর। আর দেখুন দ্বিতীয় কারণটা আরও কমজোরি। বিক্রির জন্যই যদি নেবে তবে অনায়াসে সোনা বা মোহর নিতে পারতো যা বাজারে নিয়ে গেলে ধরা পড়বার আশংকা নেই। আরও দেখুন, ঐ মোতির মালার সঙ্গে যে কিম্বদন্তী জড়িত তা নিশ্চয় সে জানে। ঐ মালা বিক্রয় উপলক্ষে হস্তান্তর হয়ে গেলে রাজ বংশের অবনতি হবে এ কথা জেনেও কেন সে হস্তান্তর করতে যাবে বাস্তব মালাটাকে।

দাঁড়ান, এ কথাটার উত্তর দিয়ে দিই। মোতির মালা তো হস্তান্তর হয়েই গিয়েছে।

কেমন?

মস্তক নিজেই কি রক্তের ঐক্য হয়!

ধরুন, আপনার কথাই যদি সত্য বলে মেনে নেওয়া যায়, তবু স্বীকার করতে হবে যে এখনো রাজাবাহাদুর জীবিত, কাজেই মোতির মালা ভিন্ন বংশে যায়নি।

ও এক রকম যাওয়াই। তাই দেখুন না কেন এই বংশ-নাশকর অনাচার ভিন্ন রক্তের সন্তানের দ্বারাই হ'ল।

দেওয়ানজী ভুলে যাচ্ছেন যে এখনো সেটা প্রমাণ হয়নি, অনুমান আর সন্দেহের ক্ষেত্রে আছে।

আমার কাছে অনুমান ও সন্দেহের অতীত।

বিচারক তো আপনি নন; এখনো মামলা বিচারাধীন।

তবে প্রশ্ন মোতির মালা গেল কোথায়?

আমারও তো সেই প্রশ্ন মোতির মালা গেল কোথায়?

আপনি যখন এতই জানেন আপনিই বলুন।

আমি জানলে অবশ্যই বলতাম, তবে এই পর্যন্ত বলতে পারি যে মোতির মালা হয় মসনবাড়ির মধ্যেই আছে নয় এমন লোকে নিয়েছে যে পত্তনকে চরম অপদস্থ করতে চায়।

তবে কি আপনি—

কথা শেষ হ'তে পারলো না, খাস খানসামা এসে বলল, হুজুর দারোগা সাহেব এসেছেন।

আচ্ছা নিয়ে এসো।

দারোগা এসে মস্ত সেলাম ক'রে দাঁড়ালো।

কি তমিজ মিঞা খবর কি?

তমিজ মিঞা এক গাল হেসে বলল, হুজুর সুখবর।

পেলে নাকি?

এক রকম।

এই বলে সে থলি থেকে কাগজে মোড়া একটা বস্তু বার করলো। তারপরে সন্তর্পণে কাগজ খুলতেই বের হ'য়ে পড়লো মখমলের একটা বাক্স। সেটা
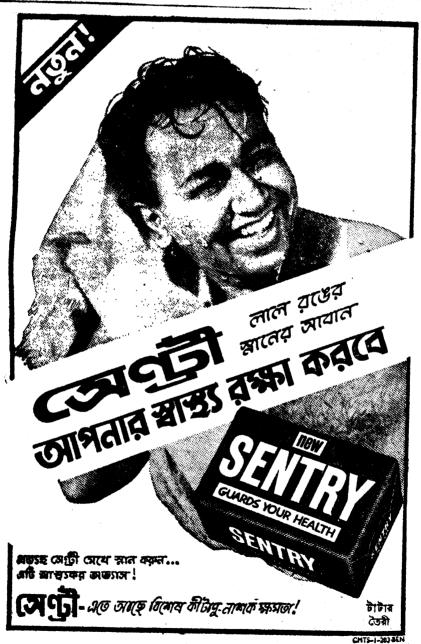
হুজুর, খোলস যখন পাওয়া গিয়েছে, শাঁসও অবশ্য পাওয়া যাবে

দেওয়ানজীর সম্মুখে কল্লশের উপর রাখলো।

এই তো সেই শাহী শিরোপার বাক্স। বাদশাহী মোহরের ছাপ রয়েছে। তা হ'লে সত্যিই পেয়েছো—ব্যগ্রহস্তে খুলে ফেললেন বাক্সর ডালা। ভিতরটা বেবাক শূন্য।

এ কি রকম হ'ল তমিজ্জ খাঁ?

হুজুর খোলস যখন পাওয়া গিয়েছে, শাঁসও অবশ্য পাওয়া যাবে।

খোলসে আমার দরকার নেই, শাঁস কোথায় তাই বলো।

তা কি ক'রে জানবো হুজুর।

ওদের মধ্যে যখন কথা চলছে আমরা বাক্সটা টেনে নিয়ে দেখতে শুরু করলাম। হাঁ, বাদশাহী ব্যাপার বটে। ভিতরে ভিতরে বাইরে দামী মখমলে মোড়া, চারদিক ঘিরে সোনা দিয়ে মিনে করা, বাইরে মস্ত সোনালী বাদশাহী মোহরের ছাপ। ভিতরে যেখানে মোতির মালাটা থাকবার কথা সেখানে প্রত্যেকটি মোতির জন্য একটি খাদ, এমন অনেকগুলো। পরে শুনেলাম একশ আটটা মোতি এই মালার।

কোথায় পেলে খুলে বলো।

হুজুর, রাজবাড়ির উত্তরে যে গড়খাই আছে তার কাছে পড়ে ছিল।

কে নিল, কেমন ক'রে গেল কিছু অনুমান করতে পারো।

বহুৎ খুব হুজুর।

কেমন?

কাছেই একজন বেদে আস্তানা গেড়েছে তারাই নেবে, আর কে নিতে আসবে হুজুর।

খানাতল্লাস করেছিলেন?

তখনি।

পেলে?

আজ্ঞে না, ওরা বলে ও বাক্সর খবর তারা জানে না। কেমন ক'রে ওখানে এলো জানে না। তখন তাদের মালমাত্তা তছনছ ক'রে ফেললাম, না: কোথায় কিছু নেই।

তবে?

ওরা আসল শয়তান।

তারপর কি করলে?

আগে শুনুন হুজুর, শয়তানকে শায়েস্তা করবার মন্তর জানি আমি তমিজ্জ খাঁ, আমার বাবা মস্ত গুণী ছিলেন কিনা।

তোমার বাবার খবরে আমার দরকার নেই।

সে কি হুজুর, আগে বাপ তারপরে তো ছেলে।

কি মুশকিলে পড়া গেল।

আপনি আর কি মুশকিলে পড়েছেন হুজুর। মুশকিল তো ওদের। সবগুলোকে গ্রেপ্তার ক'রে সদরে চালান ক'রে দিয়েছি।

কিন্তু মালাটা ওরা কি করলো, খেয়ে ফেলল নাকি?

খেয়ে ফেলবার মতোই জিনিস যে।

• তুমি দেখেছ নাকি?

বাক্সর মধ্যে খাদগুলো দেখেই বুঝতে পারছি, এক একটা মোতি যেন পায়রার ডিম।

দেওয়ানজী মনে মনে বিরক্ত হ'য়ে উঠেছিলেন, শুধালেন, তমিজ্জ মিঞা, তোমার মতো অফিসার আর কয়জন আছে সরকারের।

আমার মতো? একজনও নয়, তমিজ্জ মিঞা দুটি হবে না।

তবু রক্ষা। আচ্ছা এখন তুমি এসো।

তবে ঐ বাক্সটা এখন আপনার কাছেই থাক, মামলা উঠলে এগজিবিটের জন্য নিয়ে যাবো।

এই বলে আর এক প্রস্ত সেলাম ও হাসি ছড়িয়ে তমিজ্জ মিঞা বিদায় নিল।

এবারে অনিবার্ণ শুরু করলো,

দেওয়ানজী, এ তো সেই মোতির মালার বাক্স।

তাতে আর সন্দেহ নাই।

এতেই কি প্রমাণ হয় না যে এ কাজ পঞ্চাননের নয়।

কেন?

সে যদি নিত তবে বাক্সটা শুদ্ধই নিত, ওটা ফেলে দিতে যাবে কেন?

প্রমাণ লোপ করবার উদ্দেশ্যে।

দেওয়ানজী, কোন্ প্রমাণটা বড়, মোতির মালা না বাক্স।

বাক্সটা, ওর উপরে যে বাদশাহী ছাপ আছে।

কিন্তু এমন দুর্লভ মোতির মালা বাজারে পড়লে যে জানাজানি হ'য়ে যাবে।

যাবেই তো। কলকাতা বোম্বাই আর আর সব বড় শহরের জহরতের বাজারে জানিয়ে দিয়েছি। পুলিসেও জানিয়েছে, বাজারে পড়লেই যে নিয়ে যাবে তাকে গ্রেপ্তার করবে।

কিছু খবর পেয়েছেন?

কিছু না।

তার মানি যেই নিক সে এখনো বাজারে ফেলেনি।

বাজারে ফেলার উদ্দেশ্যেই পঞ্চানন কলকাতায় গিয়েছিল।

তার মালপত্তর তো পুলিসে নিশ্চয় তল্লাস করেছে।

করেছে কিন্তু পায়নি।

না নিলে পাবে কি ক'রে?

ঐখানেই তো আপনাদের সঙ্গে আমার তফাৎ। আপনারা ধরে নিচ্ছেন নেয়নি, আমরা ধরে নিচ্ছি সে ছাড়া কেউ নেয়নি।

আচ্ছা ওটা যে খোয়া গেছে জানলেন কি ক'রে? থাকে তো তোষাখানার সিন্দুকের মধ্যে।

কিঞ্চিৎ বিরক্ত হ'য়ে দেওয়ানজী বলে উঠলেন, ভালো জেরায় পড়লাম সকাল বেলাতেই।

তবে না হয় থাক।

থাকবে কেন? শুনে নিন। ওই শাহী শিরোপা বছরে একদিন বের ক'রে রাজবংশের ইস্টদেবতা রাধাগোবিন্দজিউর চরণে রাখা হয়। সেদিন সকালে সিন্দুক খুলে দেখা গেল শাহী শিরোপা উধাও। তার ঠিক দু'দিন আগে পঞ্চানন কলকাতায় গিয়েছে। এখন দুই আর দুয়ে যোগ ক'রে নিন, দেখুন চার হয় কিনা।

কিছু মনে করবেন না দেওয়ানজী, কিন্তু দুই আর দুই পাচ্ছি কোথায়? আমি তো দেখছি দুটো শূন্য। মোতির মালা থাকতো সিন্দুকের মধ্যে। চাবি থাকতো আপনার কাছে আর রাজাবাহাদুরের কাছে, সে চাবি কখনো বেপাত্তা হয়নি। পঞ্চানন নেবে কি ক'রে?

তবে কি বলতে চান আমি নিয়েছি।

আরে ছিঃ ছিঃ একি বলছেন।

এমন সময়ে রাজাবাহাদুরের খানসামা এসে তলব করায় বেঁচে গেলাম। রাজা বাহাদুর আমাদের ডেকে পাঠিয়েছেন।

দুজনে নিরিবিলি হওয়া মাত্র বললাম, কিছু বুঝলে।

বুঝেছি বই কি?

তার মানে সিদ্ধান্ত করেছ।

নিশ্চয়।

আগ্রহের সঙ্গে বললাম, কি?

সিদ্ধান্ত এই যে পঞ্চানন নেয়নি।

তবে নিল কে? দেওয়ানজীই হাত সাফাই করলেন নাকি?

অসম্ভব নয়, তবে এখনো সব সুতো-গুলো আমার হাতে আসেনি।

তাঁর স্বার্থ কি?

কী যে বলো। রাজাবাহাদুর বৃদ্ধ হ'য়ে পড়েছেন, তিনি মারা গেলেই পঞ্চানন হাঁকিয়ে দেবে দেওয়ানজীকে, কাজেই সময় থাকতে যা হাতিয়ে নেওয়া যায়।

এ অসম্ভব। কতকালের পুরানো কর্মচারী, আবার আত্মীয়ও বটে।

তবে তোমার কথা অনুসারে স্বীকার করতে হয় যে স্বয়ং রাজাবাহাদুরই নিয়েছেন।

হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলাম।

যত খুশি হাসো তবে প্রমাণের যে অবস্থা তাতে মনে হচ্ছে এ মালা রাজবাড়ির বাইরে যায়নি।

কিন্তু বাক্সটা!

সে তো খোলস, শাঁসটা ভিতরেই আছে।

ভাই অনির্বাণ, এ যে রহস্যের ভিতরে রহস্য।

মিথ্যা নয়, জল অনেক।

রাজাবাদুরের খাস কামরায় পৌঁছে অভিবাদন ক'রে দুজনে আসন গ্রহণ করলাম।

রাজাবাহাদুরের কাছ থেকে যখন ছুটি পেলাম তখন আমাদের গজভুক্তকপিত্থবৎ অবস্থা, ভিতরে আর সার পদার্থ বলে কিছু নেই। একটানা চার ঘণ্টা বক্তৃতা, মাঝে মাঝে দু'একটা প্রশ্ন করেছি বটে। আমি ওই ভরসায় যে বক্তৃতা থামতে পারে, অনির্বাণ কোন্ ভরসায় সে-ই জানে।

আমাদের পিছু পিছু চলছেন গুপী-বাবু, তাঁর উপরেই আমাদের তদারকের ভার। লোকটি অত্যন্ত শিষ্ট, রাজবাড়ির কায়দা কানুনে অভ্যস্ত, জিজ্ঞাসা না করলে কথা বলে না। কথা বললেও যথাসম্ভব সংক্ষেপে। তাঁর একটি মুদ্রাদোষ এই যে হাত দু'খানা বুকের কাছে তুলে জোড় করে থাকে, আর দুই হাতের আঙুলে মোচড়াতে থাকে, যেন অনুপস্থিত কোন মনিবের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছে।

গুপীবাবু রাজাবাহাদুরের কি এইভাবে একটানা কথা বলে যাওয়া অভ্যাস।

আপনারা তো তবু অল্পে ছাড়া পেয়েছেন।

তা বটে খাওয়ার সময় হ'য়েছে বলে বোধ করি দয়া ক'রে ছেড়ে দিলেন।

কতকটা তাই বটে।

সন্ধ্যাবেলা ধরলে বোধ করি সারারাত চালাতেন।

আজ্ঞে না, তখন অল্পেই ছাড়া পেতেন।

এমন সদয় কেন?

রাতের প্রথম প্রহরেই তিনি আসনে বসেন কিনা।

আসন আবার কিসের?

যোগ সাধনা করেন কিনা।

সারারাত চলে?

সারারাত, তখন তাঁর মহলে কারো যাওয়ার হুকুম নেই।

এমন কতদিন চলছে? এবারে প্রশ্নকর্তা অনির্বাণ।

আজ্ঞে রাণীমা গত হওয়ার পর থেকেই।

কিম্বা পঞ্চাননকে দত্তক নেওয়ার পর থেকে। ভালো করে ভেবে দেখুন।

ভাববার আর কি আছে! রাণীমা গত হওয়ার মাসখানেক আগে দত্তক হ'য়ে পঞ্চাননবাবু এলেন, সঙ্গে আমরাও এলাম।

আমরা কে কে?

আমি আর হারাণ। তখন থেকেই দেখছি আসনে বসেন, তার আগের কথা জানিনে।

আচ্ছা গুপীবাবু, দেওয়ানজী যোগটোগ করেন কি?

শুনেছি হুজুর তিনিও আসনে বসেন।

শুনেছেন, দেখেননি?

কেমন ক'রে দেখব, তাঁর মহলেও কারো যাওয়ার হুকুম নেই রাতের বেলায়।

আমি হেসে উঠে বললাম, এ রাজ্যের উন্নতি না হয়ে যায় না, রাজা ও মন্ত্রী দুজনেই যখন যোগী।

আচ্ছা গুপীবাবু, এ যোগ সাধনার তাৎপর্য কি অনুমান করতে পারেন।

এর মধ্যে আর তাৎপর্য কি আছে? বয়স হ'লেই ধর্মকর্মে মন যায়, দুজনেরই তো বয়স হ'য়েছে।

কে বড়?

রাজাবাহাদুর বছর দুয়েকের বড়। এক সঙ্গে এই বাড়িতেই দুজনে মানুষ হয়েছেন, দুজনে বড় সম্প্রীতি।

শুনেছি পঞ্চাননকে দত্তক না নিলে তিনি মালিক হতেন।

সেই রকম তো শুনেছি।

পঞ্চানন দত্তক হ'য়ে আসায় দেওয়ানজী নিশ্চয় খুশী হননি।

গুপীবাবু নিরুত্তর। তাকিয়ে দেখি যে তার করতল মোচড়ানো বৃদ্ধি পেয়েছে, মুখের ভাবটা মুই অতি দীনহীন তোমার প্রেমের কাঁবা জানি।

আমরা বুঝলাম যে গুপীবাবু এবারে মুখ বন্ধ করেছে, আর কোন কথা বের করবার আশা নাই। রাজবাড়িতে মুখের যথাযথ ব্যবহার না জানলে টেঁকা ভার, এ সত্য দেখতে পেলাম গুপীবাবুর আচরণে।

প্রসঙ্গান্তর করবার আশায় গুপীবাবু বলল, হুজুর পঞ্চাননবাবু আর কতকাল হাজত বাস করবেন।

যতকাল না মামলা ফয়শালা হয়—বলল অনির্বাণ।

কতদিনে ফয়শালা হবে মনে হচ্ছে।

কেমন ক'রে বলব।

লোকে তো বলছে আপনারা তদন্তের ভার নিয়ে এসেছেন।

অনির্বাণ হেসে উঠল, দুর্লভ অর হাসি —আমরা কি পুলিস না গোয়েন্দা।

অপ্রস্তুত হ'য়েছে এমন ভাব দেখিয়ে ঘন ঘন হাত কচলাতে লাগলো গুপীবাবু।

রাত্রে আহারান্তে শয্যা গ্রহণ ক'রে রাজাবাহাদুর কথিত বিবরণের রোমন্থন করতে শুরু করলাম। অনির্বাণ এখনো ঘুমোয়নি, চুরুটের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। সে বলে যে কখনো ঘুমোয় না, তবে মাঝে মাঝে চুরুটের গন্ধ পাওয়া যায় না কেন? হারাণ এখনো শুতে আসেনি, এলে একবার ঘরে টহল দিয়ে যায়।

রাজাবাহাদুর বলছেন, তাহেরগঞ্জ রাজ-বংশের আদিপুরুষ হরিনারায়ণ রায় অল্প বয়সেই আগ্রায় গিয়ে বাদশাহী ফৌজে ভর্তি হয়, তখন সিংহাসনে বাদশা আকবর। মানসিংহের ফৌজের সঙ্গে তিনি এলেন বাংলাদেশে। আপনি ভাবছেন মানসিংহ কেন তাঁকে সঙ্গে নিলেন।

আমি অবশ্য কিছুই ভাবিনে অথবা ভাবছিলাম যে যত শীঘ্র এ কাহিনী শেষ হয় ততই সুবিধা।

আরে হরিনারায়ণ রায় যে বাংলাদেশের লোক, এদেশের পথ ঘাট তাঁর সুবিদিত।

বুঝলাম অনির্বাণ বিশেষ অস্বস্তি অনুভব করছে রাজাবাহাদুরের সামনে চুরুট টানা চলবে না। এ বিষয়ে তাকে পরে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, সে বলেছিল যতটা অসুবিধা হওয়ার কথা ততটা হয় না

কেন?

রাজাবাহাদুরের অম্বুরি তামাকের গন্ধে অনেকটা ক্ষতিপূরণ হয়। তবে চুরুটের কাছে কেউ নয়।

অনেক চেষ্টায় মানসিংহ উড়িষ্যা জয় করলেন, হরিনারায়ণ রায় খুব বীরত্ব দেখালেন। বঙ্কিমচন্দ্র তার উল্লেখ করেননি।

বঙ্কিমের সমর্থনে কিছু বলা উচিত মনে করে বললাম বোধ হয় তাড়াতাড়িতে ভুলে গিয়েছেন।

আরে না, না। বাঙালী বাঙালীর ভালো দেখতে পারে না, তার চোখ টাটায়। এদেশের পাখী অবধি চোখ গেল চোখ গেল রব করে, পরের ভালো দেখতে পারিনে চোখ গেল। না, না, বঙ্কিম ওটা ইচ্ছা করেই বাদ দিয়ে গিয়েছে। রাঢ়ী ব্রাহ্মণ সহ্য করতে পারে না বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের গৌরব।

বুঝলাম যে চোরাবালুর উপর দিয়ে চলেছি খুব সন্তর্পণে পা ফেলতে হবে।

তা না পারুক আমাদের কোন ক্ষতি হয়নি। বাংলার বন্দোবস্ত ক'রে যখন মানসিংহ ফিরবার মুখে তখন খবর এলো উত্তর বাংলায় ডাকাতেরা রাজা মহারাজা উপাধি নিয়ে লোকের উপরে অত্যাচার করছে, না মানে তারা গৌড়ের পাঠান নবাবকে, না মানে হিন্দু জমিদারদের। মানসিংহ স্থির করলেন আগ্রায় ফিরবার আগে ও দিকটা শাসন ক'রে যেতে হবে। এ কথা শুনে হরিনারায়ণ রায় সেলাম ক'রে বলল, মহারাজ, বান্দা থাকতে আপনি কেন যাবেন কতকগুলো ডাকাতকে শাসন করতে, রাজা বা নবাব হলেও হতো।

মানসিংহ হেসে শুধালেন, পারবে তুমি।

হরিনারায়ণ রায় বলল, শির জামিন।

মানসিংহ বললেন, হাঁ তুমি পারবে।

তখন পাঁচশো শাহী ফৌজ নিয়ে হরি-নারায়ণ রায় উত্তরবঙ্গে রওনা হ'য়ে গেলেন, বলে গেলেন মহারাজ, আপনি গঙ্গাস্নান ক'রে বিশ্রাম করুন আমি লড়াই ফতে ক'রে ফিরে আসছি।

যে কথা সেই কাজ। তিনমাস অন্তে সেই গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল রাজা মহারাজাদের বন্দী ক'রে নিয়ে ফিরে এলেন হরিনারায়ণ রায়। তারা বাদশাহের জন্য কেউ এনেছে ভুটানী ঘোড়া, কেউ এনেছে গোয়ালপাড়ার হাতী কেউ এনেছে চন্দন কাঠ, কেউ দামী পাথর। মানসিংহ খুশী হ'য়ে বাদশাহের নামে তাদের খেলাৎ দিলেন। যার যার জমি-দারিতে বহাল রেখে বাদশাহী খাজনা নির্দিষ্ট ক'রে দিলেন।

আর হরিনারায়ণ রায়কে কি দিলেন?

বংশ গৌরবে জ্বল জ্বল ক'রে ওঠে রাজাবাহাদুরের চোখ দুটো, আহা সেই কথাতেই আসছি। হরিনারায়ণকে বললেন তোমাকে বাদশা স্বহস্তে খেলাৎ দেবেন। হরিনারায়ণ ফিরে চলল শাহী ফৌজের সঙ্গে আগ্রায়। ইতিমধ্যে আকবর বাদশার এন্তেকাল হওয়ায় সিংহাসনে জাহাঙ্গীর বাদশা। মানসিংহের মুখে বিবরণ শুনে হরিনারায়ণ রায়কে পদবী দিলেন সিংহ। হরিনারায়ণ রায় হল হরিনারায়ণ সিংহ রায়, সেই থেকে আমরা সবাই সিংহ রায়। আর যেখানে ডাকাত দলের সঙ্গে লড়াই হ'য়েছিল তার ফতেহাবাদ পরগনা নামকরণ ক'রে হরিনারায়ণ সিংহ রায়কে ইজারা দিয়ে রাজাবাহাদুর উপাধি দিলেন, পত্তন হ'ল তাহেরগঞ্জ রাজবংশের।

এইসব কথা ভাবতে ভাবতে বোধ করি ক্ষণেকের জন্য তন্দ্রাচ্ছন্ন হ'য়ে পড়েছিলাম এমন সময়ে তীব্র কণ্ঠের কান্নার শব্দে হকচকিয়ে জেগে উঠলাম। সেই পরিচিত ক্রন্দন। বেশ বুঝলাম এ নারী কণ্ঠের রোদন নয়, নারীর কান্না ব্যক্তিগত। এ যেন সমস্ত প্রাচীন জীর্ণ অট্টালিকাগুলোর বহুকালের চাপা দুঃখ কোন্ অতীতের গহ্বর থেকে কোন্ অজ্ঞাত রন্ধ্র পথে বেরিয়ে আসছে। ভাঙা অট্টালিকার বুকভাঙা দুঃখের বিলাপ। সমস্ত গা শিউরে ওঠে।

শুনছ অনির্বাণ!

না শুনে উপায় কি!

কে কাঁদছে?

তুমিও যেখানে আমিও সেখানে।

এমন কতদিন চলছে?

শুনেছি যে অনেক দিন।

কত কাল আর এমন চলবে?

যে কাঁদছে বলতে পারে।

কে কাঁদছে?

মনে করো না কেন ঐ রাজপুরীর ঐ প্রাচীন মহলগুলো।

কান্নার আওয়াজ মিলিয়ে গেল, এখন আর কিছুক্ষণ ঘুম হবে না। ভাবলাম রাজাবাহাদুর কথিত গল্পের খেই আবার অনুধাবন করা যাক।

কিন্তু তখনি সেই মুহূর্তে আর একটা বিকট আর্তনাদ উঠল, মনে হ'ল কোন ভীত সন্ত্রস্ত কণ্ঠ যেন ফুকরে উঠল, কর্তা...

বাস আর কোন শব্দ নেই, যদি আর কিছু ঐ অদৃশ্য কণ্ঠের থেকে থাকে তবে কণ্ঠনালীতেই চাপা পড়ে গিয়েছে।

ও আবার কি অনির্বাণ?

যা শুনলে।

শুনলাম কে যেন আর্তনাদে বলে উঠল কর্তা।

তবে তাই।

কে বলল, কাকে বলল, কেন বলল?

আমি তোমার পাশের ঘরে শুয়ে আছি কেমন ক'রে জানবো।

হারাণকে জিজ্ঞাসা করো না কেন, ঘুমোচ্ছে নাকি?

সে বিছানায় নাই।

কোথায় গেল?

আগের দু'রাত্রি যেখানে গিয়েছিল।

এত রাতে ও রোজ যায় কোথায়?

সে কথা ওই বলতে পারে।

না ভাই এ প্রেতের পুরীতে আর নয়, কালকেই ফিরে চলো।

আর দু'দিন থাকো।

ঐ কান্না আর সহ্য হয় না।

কান্না তো তোমাকে চেপে ধরছে না।

একটা দিন এখন আবার দুটো হ'ল।

দেখো না হয়তো একটাও থাকবে না।

তুমি কি ভাবছ তুমিই জানো।

হয়তো ক্রমে তুমিও জানতে পাবে।

বলাই নয়।

অনির্বাণ নিরুত্তর অবথা বাক্যব্যয় সে করে না।

ওই দুই বিকট আওয়াজের অবসানে রাজপুরী এখন দ্বিগুণ নীরব।

বুঝলেন ঐ পরগণা জায়গীর দিয়েই বাদশা ক্ষান্ত হ'লেন না। একদিন দেওয়ানী আমে ভরা দরবারে হরিনারায়ণ সিংহ রায়কে আড়াই হাজারি মনসবদার পদবী দিয়ে স্বহস্তে গলায় পরিয়ে দিলেন শাহী শিরোপা এক মোতির মালা। দরবারীগণ কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ রব করে উঠল। এতদিন তারা শুনেছে মছলিখোর বাঙালী বাপদাদের আর লড়াইয়ে নারাজ। এখন আর সে কথা বলবার উপায় রইলো না।

এক বড় বীরপুরুষের সমর্থনে কিছু বলা উচিত মনে করে বলে উঠলাম, বাঃ বাঃ চমৎকার। বাদশার যোগ্য বটে।

আর হরিনারায়ণ সিংহ রায়ের যোগ্য নয়।

অবশ্যই, অবশ্যই।

তবেই দেখুন, বাদশা কি যাকে তাকে খেলাৎ আর শিরোপা দেন।

তারপরে কি হ'ল বলুন।

তার আগে কি হ'ল শুনুন। বাদশা তাঁকে একশ আটটা আরবি ঘোড়া আর পাঁচটা হাতী বকশিস করলেন, বললেন, যাও তুমি বাদশার নামে পরগণা শাসন করো গিয়ে। ওখানে যতটা তুমি জয় করতে পারবে তোমার রাজ্য।

একটু থেমে আবার আরম্ভ করলেন, হরিনারায়ণ সিংহরায় ফিরে এসে ধীরে ধীরে রাজ্যের পর রাজ্য জয় করতে লাগলেন, ক্রমে তাঁর রাজত্বের সীমা দাঁড়ালো উত্তরে ভুটান, পূবে ব্রহ্মপুত্র, পশ্চিমে বিহার আর দক্ষিণে মায়াই নদী।

বুঝলাম যে ইতিহাস আর ভূগোল সম্বন্ধে রাজাবাহাদুরের কল্পনা নিরঙ্কুশ, তবে আপত্তি করা উচিত হবে না তাতে কাহিনীর দৈন্য বাড়বার আশঙ্কা।

অনেকক্ষণ বলে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছেন, আপনি বিশ্রাম করুন, পরে আবার শুনবো।

আরে না, না, পূর্বপুরুষের বীরত্ব কথায় কি ক্লান্তি আসে।

হায়, হরিনারায়ণ সিংহরায় তো আমাদের পূর্বপুরুষ নয়, আমাদের ক্লান্তি আসতে বাধা কি?

আসল কথাটাই তো এখনো বলা হয়নি। একশ আটটি মোতি সেই মালায়, আপনারা যাকে বলেন মুক্তো, সাহেবরা বলে পার্ল। সবগুলো সমান আকারের, একটিও ছোট বড় নয়। প্রত্যেকটির আকার পায়রার ডিমের মতো। আর রঙ!

বললাম দুধের মতো।

দুধেও একটু হলদে আভা থাকে, এতে তাও নেই। শাদা পাথরের থালায় কুয়োর জল রাখলে যেমন রঙ হয় তেমনি। নদীর জল রাখলে চলবে না, নদীর জলে ধুলো বালু থাকে। প্রত্যেকটিতে মুখ দেখে নিতে পারেন শাহী মোহরের ছাপ দেওয়া ইস্পাহানী কারিগরের সোনায় মিনা করা মখমলের খাপের মধ্যে সেই মালাটি দেখে লোভে মানুষের চোখ জ্বল জ্বল করে উঠত। আকবর বাদশাকে এই মালা ভেট পাঠিয়েছিল পারস্যের বাদশা। সেই মালা অবশেষে এলো, যেখানে আসা উচিত ছিল সেখানে, তাহেরগঞ্জ রাজবংশের আদি পুরুষ রাজাবাহাদুর হরিনারায়ণ সিংহ বাহাদুরের হাতে।

বেরিয়ে এসে অনির্বাণকে বলেছিলাম যে রাজাবাহাদুর গল্প বলতে জানেন বটে।

সে বলেছিল কেবল থামতে জানেন না।

ক্রমে তাহেরগঞ্জে রাজবাড়ি তৈরি হ'ল, মহলের মতন। একটা মহল পুরনো হয়, নূতন ফ্যাশানে আর মহল গ'ড়ে ওঠে। বাদশাহী আমল, নবাবী আমল, কোম্পানীর আমল, মহারাণীর আমল, নূতন আমলে নূতন মহল। পুরানো হ'লে ভাববার দস্তুর নেই, বুকের পাঁজর দিয়ে গড়া কিনা। নূতন গড়ে নিতে হবে, পুরানো কালের নিয়মে ধীরে ধীরে যখন ভেঙে পড়ে পড়বে।

এবারে তাহলে উঠি।

বিলক্ষণ। হরিনারায়ণ সিংহরায় বছরে একটা শুভদিন দেখে ব্রহ্মপুত্রে স্নান করতে যেতেন। এখনো সে রেওয়াজ আমাদের পরিবারে আছে। প্রবীণ হ'য়ে পড়ায় আমি আর এখন যেতে পারি না, আমার হ'য়ে দেওয়ানজী যায়, তার শরীরেও রাজবংশের রক্ত আছে কিনা এই রকম একযোগে হরিনারায়ণ সিংহরায় তো গিয়েছেন ব্রহ্মপুত্রে তীর্থস্নানে। স্নান সেরে উঠেছেন এমন সময়ে দেখতে পেলেন কাঠের কি একটা বস্তু ভেসে আসছে। কৌতূহলী হ'য়ে

সাঁতরে গিয়ে তুলে দেখলেন রাধা গোবিন্দজীউর দিব্যমূর্তি। আহা কি গড়ন, দেখলেই ভক্তি করতে ইচ্ছা করে। সেই মূর্তি মাথায় বহন করে তিনি তো উঠলেন তীরে। এমন সময় সম্মুখে এক সন্ন্যাসী, চারদিকে লোকলস্কর হাতি ঘোড়া, তার মধ্যে কোথা থেকে সন্ন্যাসী এলেন কেউ বলতে পারে না।

রাজাবাহাদুর সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলেন। সন্ন্যাসী আশীর্বাদ করে বললেন বৎস, তুমি মহা ভাগ্যবান, আজ স্বয়ং ইষ্ট-দেবতা ভেসে এসে তোমার কাছে ধরা দিয়েছেন। এ'রাই তোমার কুলদেবতা। যাও মন্দির তৈরি করে এ'র প্রতিষ্ঠা করো গিয়ে।

রাজাবাহাদুর করজোড়ে বললেন, প্রভু আপনার পায়ের ধুলো কি পড়বে না আমার কুটিরে। সে কথার উত্তর না দিয়ে তিনি বললেন, শোনো শাহী শিরোপা বলে যে মোতির মালা পেয়েছ তা সযত্নে রক্ষা করবে। রাসপূর্ণিমার রাতে একবার রাধা-গোবিন্দ জীউর চরণে স্পর্শ করাতে ভুলো না।

আমরা দুজন মন্ত্রমুগ্ধের মতো এই প্রাচীন দিনের কাহিনী শুনছি, মনে হচ্ছে আমরা যেন বিংশ শতাব্দী থেকে চলে গিয়েছি তিন শ' বছর আগে যখন সম্ভব অসম্ভব, বাস্তব দৈবের সীমানা এমন অটল ছিল না। অনির্বাণও নীরব, তবে সে কি ভাবছে দেবতাদেরও দুর্বোধ্য।

প্রভু, মাপ করবেন, আপনি কি ক'রে জানলেন যে শাহী শিরোপা আমি পেয়েছি।

সন্ন্যাসী কোন উত্তর না দিয়ে হেসে বললেন, যা বলছি মন দিয়ে শোনো। এই মোতির মালা তোমার সৌভাগ্যের চিহ্ন। যত-দিন এ মালা তোমার বংশে থাকবে, রক্তের সূত্রে পুরুষ পরম্পরায় চলে আসবে ততদিন তাহেরগঞ্জের রাজবংশের গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকবে। যদি কোনদিন এ মালা তোমাদের হস্তচ্যুত হয় কিম্বা ভিন্ন রক্তে চলে যায় তবে জানবে তোমাদের গৌরব সূর্য অস্তমিত হতে চলেছে। মনে রেখো, এখন যাও, রাধা-গোবিন্দ জীউর প্রতিষ্ঠা করো গে, মোতির মালা রক্ষা করো গে।

তখন সকলে রাধাগোবিন্দজীউর জয়-প্রণিপাত করলেন কিন্তু মাথা তুলেই দেখলেন যে সন্ন্যাসী অন্তর্ধান করেছেন। চার দিকে লোক লস্কর হাতি ঘোড়া তার মধ্যে অদৃশ্যভাবে কেমন করে বা এলেন আর কেমন করেই বা গেলেন।

কাছেই রাজপুরোহিত দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি মনে করিয়ে দিলেন মহারাজ, সমস্তই দেবতার লীলা, এ নিয়ে চিন্তা করা অনুচিত। ওরা কামচর। যখন খুশি যেখানে খুশি যাতায়াত করেন। আপনার মহা-সৌভাগ্য একদিনে কুলদেবতা ও মহা-পুরুষের সাক্ষাৎ পেলেন।

তখন সকলে রাধাগোবিন্দজীউর জয়-ধ্বনি করে রাজবাড়িতে ফিরে এলেন।

কিছু মন্তব্য করে বাধা দিলে গল্পের দুর্নিবার স্রোত থামতে পারে আশায় বললাম, এ সত্যই এক উপন্যাস।

উপন্যাস তো যে কেউ লিখতে পারে, বঙ্কিম লিখেছে, দামোদর মুখুজ্জে লিখেছে, সে আর এমন কঠিন কি। এ সত্য। রাধা-গোবিন্দ জীউ এখনো মন্দিরে বিরাজ করছেন, আর......

এই পর্যন্ত বলে অনেকক্ষণ আধাবদনে থেকে বললেন, শাহী শিরোপাও এত কাল ছিল।

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন, কোথায় গেল, কেমন করে গেল, কে নিল বলতে পারেন? প্রত্যেকদিন রাধাগোবিন্দ জীউর চরণে মাথাকুটে মরি, প্রভু, বলে দাও, বলে দাও, মালা ফিরে না পেলে যে রাজবংশ লোপ পায়।

তাঁর ক্ষণিক নীরবতার সুযোগে বললাম, আর যেই নিক পঞ্চানন নেয়নি।

নিশ্চয় নেয়নি, সমস্তই তো তার হবে তবে কেন সে নিতে যাবে।

তবে তাকে গ্রেপ্তার করলেন কেন?

সে-সব কথা রামসদয় জানে, দেওয়ানের উপরে কথা বলা কি মনিবের উচিত।

তবে কি মনিবের উপরে দেওয়ান।

আরে দেওয়ান তো নামে, তার মতো প্রভুভক্ত, রাজবংশের হিতৈষী আর কে আছে?

তাহলে তাহেরগঞ্জের যুবরাজ জেলে যাবে?

এরূপ কঠোর প্রশ্নের হতচকিত হয়ে উত্তর দিতে পারলেন না তিনি। কিছুক্ষণ নিরুত্তর থেকে শুধোলেন, আচ্ছা দত্তকপুত্র কি দত্তকগ্রহীতার সমরক্ত।

গোত্রান্তর হলেই সমরক্ত হয়, রক্ত অনুসারেই গোত্র।

নানা মুনির নানা মত, কার কথা বিশ্বাস করি বলুন।

তিনি যখন শাস্ত্র তুললেন অগত্যা আমাকেও শাস্ত্রনিক্ষেপ করতে হল. বললাম,

ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থা।

আমার মনের কথা বলেছেন বলে বৃদ্ধ আমাকে আলিঙ্গন করলেন। আচ্ছা, এখানে মহাজন শব্দটা কি অর্থে নেব?

এসব বিষয় কি আপনাকে বোঝাবার যোগ্যতা আমার আছে! তবে সাধারণ বুদ্ধিতে এই বুঝি শাস্ত্রকার বলছেন মতা-মত বিচারে যেয়ো না, থই পাবে না। দশ-জনে যা করছে করো।

দশজনেই বা মানে আমার জ্ঞাতিরা সবাই বুঝিয়েছিল যে দত্তক নাও, দত্তক পুত্র পিতার সমরক্ত, কাজেই তাহেরগঞ্জের রাজ-বংশ ভ্রষ্টরক্ত হবে না।

আমি সমস্ত জানা সত্ত্বেও ভালো মানুষের মতো জিজ্ঞাসা করলাম যে, দত্তক গ্রহণ না করলে উত্তরাধিকারী কে হতো?

রামসদয়, ও আমার পিসতুতো ভাই, কাজেই রক্তের যোগ আছে।

তবে বোধ করি দত্তক নেওয়াতে তিনি খুশী হননি।

না, না, ও খুব স্নেহ করে পঞ্চাননকে। তবে ওর ছেলেরা নিশ্চয় ওর কানভারি করেছে।

পঞ্চাননকে গ্রেপ্তার করাবার মূলে কি বাপের না হোক ছেলেদের মন্ত্রণা নেই।

এ প্রশ্নের সরাসরি উত্তর না দিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা ক'দিন হল?

বুঝতে পারলাম না কিসের হিসাব তখন তিনি নিজেই হিসাব করতে লাগলেন, আপনারা এসেছেন আজ তিন রাত, পথেও গিয়েছে একরাত, তারও আগে আর তিন রাত, কাজেই সপ্তাহ হতে চলল, আরও কতদিন হবে কে জানে?

এতক্ষণ পরে অনির্বাণ প্রথম মুখ খুলল, বলল জেল হলে অনেক রাত, অনেক দিন, অনেক বছর হবে।

বৃদ্ধ উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন, জেল হতেই পারে না, তাহেরগঞ্জের যুবরাজের জেল হতেই পারে না, আমার পঞ্চাননের—

আর বলতে পারলেন না, আর বলতে গেলে চোখের জল বাধা মানবে না। প্রাচীন অভিজাত পুরুষের পক্ষে অপরের সম্মুখে অশ্রুপাত জীবনপাতের মতো মর্মান্তিক। তবে ঐ অর্দোক্ত বাক্যে বুঝতে বাকি রইলো না যে পঞ্চানন তার কত আদরের পাত্র। কেবল যুবরাজ বলেই নয়, পঞ্চানন বলেই। ভাবলাম বৃদ্ধ কি কঠোর পরীক্ষাতেই না পড়েছেন। একদিকে রাজবংশের মঙ্গল ও স্থায়িত্ব, অন্যদিকে পঞ্চাননের প্রতি গভীর আকর্ষণ। পঞ্চাননকে ভালো না বেসে কেউ পারে না, তার দুই সাক্ষী আমরা। ভাল-বাসা আকর্ষণ করবার সহজাত সৌভাগ্য নিয়ে কোন কোন লোক জন্মগ্রহণ করে।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

যে মায়েরা যত্নের এতটুকুও ত্রুটি রাখতে চান না তাঁদেরই জন্যে

গ্ল্যাক্সো উৎপাদন

কাবুলিওয়ালা

বাপের 'শ্রাদ্ধ', মেয়ের বিয়ে, চাচার সাথে মামলা, মেয়েমানুষের ভৌলিভার্সি-কেস, গরিবের যোক্ষারোগ শখ-হলে-ভোটে দাঁড়ানো—এসব ব্যাপারে টাকা চাই। টাকা নেবার লোকের যেমন অভাব নেই, দেবার লোকেরও তেমনি অভাব আছে এমন ধারণা ঠিক নয়। প্রথমটি শর্তসাপেক্ষ না হলেই ভাল, দ্বিতীয়টি অবশ্যই শর্তসাপেক্ষ। সেজন্য টাকার যাবার পথটি বড় পিছল, আসার পথ বড় দুর্গম এবং বন্ধুর।

সেই দুর্গম ও বন্ধুর পথের গিরি-সংকট খাইবার উপত্যকা পার হয়ে এদেশে এসেছে আমাদের দুর্দিনের বন্ধু কাবুলি-ওয়ালারা, সঙ্গে কিছু হিং আর 'কোহতুর' পাহাড়পোড়া সুর্মা নিয়ে। শহরে, শহরতলীতে, শিল্প অঞ্চলে যারা আগে থেকে এসে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বসে আছে তাদের কাছে নিতে হয় প্রাথমিক আশ্রয়, আর্থিক সাহায্য, ব্যবসায়িক বুদ্ধিফিকির, ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষা উর্দু হিন্দি বাংলা শিক্ষা—আর সেই সঙ্গে সুর্মা-হিং বিক্রি করে বহুকাঙ্ক্ষিত রোজগারদারী। কোথায় কাবুল, কান্দাহার, হেরাত, মাইমানা মুসা-কালা, খিলুজাই, তাইরাম, গজনী আর কোথায় দিল্লী, বোম্বাই, বাঙ্গালোর, পাটনা কলকাতা, শিলং—সর্বত্র চলন্ত 'আফগান ব্যাঙ্ক' মাথায় চল্লিশ গজ কাপড়ের পাগড়ি জড়িয়ে লম্বা আলখাল্লার ওপর ফতুয়ে ওয়েস্ট কোট এঁটে, দশ গজ কাপড়ের শালোয়ারী পাজামা পরে, পায়ে ঠাকুরদাদার আমলের হাজার তাপ্পিমারা পেরেক ঝুনঝুন-করা পাঁচ সেরি চপ্পল লাগিয়ে ডান্ডা হাতে নিয়ে কারখানার গেটের পাশে বসে থাকা—লোক চেনা, তাদের পাকড়াও করা, ঝগড়া বচসা করে ভয় দেখিয়ে সুদ আদায় করা—বিচিত্র এক জীবন! পঁচিশ বছরের জোয়ান যুবক—সাদীর পর বউ রইল মুলুকে পড়ে আর চোখের জল মুছতে মুছতে কারো সঙ্গে চলে এল টাকার দেশ, সোনার মুলুক ভারতবর্ষে। কষ্ট-সহিষ্ণু পাহাড়ী জাত। এসেছে ব্যবসা করতে। সঙ্গে আছে পাশপোর্ট—নাম ধাম লেখা। মহামান্য রাজার অনুমতি স্বাক্ষরিত শীলমোহর মারা। ওরা কী ব্যবসা করতে আসে?

টাকা খাটাতে। সুদ খাটাতে। টাকার বাচ্চা বার করতে। ধর্ম কাবুলীদের ইসলাম। ইসলামের বিধানে সুদ খাওয়া মহাপাপ। সে পাপের শাস্তি 'জাহান্নাম' নামক নরকভোগ। এসব জানা সত্ত্বেও মুসলমান হয়েও কাবুলীরা সুদ খায়। ইসলামে বারণ থাকলেও মুসলমানরাই সুদের ব্যবসার শিকার হল এটি বড় দুঃখের। সুদ খাওয়া যে মুসলমানের জন্য কতটা খারাপ মিলাদ মহফিলে পেশাদার এক মৌলভীকে বয়ান করতে শুনেছিলাম এই রকম ক্ষুদ্র একটি কাহিনী :

'একটি মেয়ে তার একমাত্র ছেলের ব্যারামে হঠাৎ আল্লার কাছে মানসিক করে বসে যে সে 'গু' খাবে যদি তার 'ছাওয়ালে'র

সার বেঁধে শকুনের মতো বসে আছে কাবুলীরা

অসুখ ভাল হয়ে যায়! আল্লা তাকে পরীক্ষা করবার জন্যে তার ছেলের অসুখ ভাল করে দিলেন। কিন্তু বেটি আর কিছুতেই ঐ মানসিকের দ্রব্যটি খেতে চায় না! কিছু-দিন গত হলে সে স্বপ্ন দেখে তার ছেলের আবার ব্যাধি হবে যদি প্রতিজ্ঞা পালন না করে। তখন মেয়েটি নাচার হয়ে ফুরফুরা শরীফের পীরসাহেব বাবা সৈয়দ আবুবকর সিদ্দিকীর কাছে বিধান চাইলে তিনি বললেন, 'যে-কোনো সুদখোরের বাড়িতে মেয়েটিকে একবেলা আহার করতে বলুন, তাহলেই তার মানসিকের অভীষ্ট দ্রব্যটি ভক্ষণ করা হবে।' কাজেই বুঝে দেখুন, সুদখোররা গরিবের চোখের পানি ফেলা, বাস্তুভিটে হারানো টাকার বিনিময়ে যে খাদ্য ঘরে এনে খায় তা কি চীজ!'

ইসলামে প্রথম এবং ক্ষমাহীন পাপ 'শেরেক'। আল্লার অংশীদার দাঁড় করানো। দ্বিতীয়, 'জেনা'—অবৈধ স্ত্রী সংগম। তৃতীয়, সুদ। তারপর নরহত্যা, মিথ্যাকথন, বেইমানী ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু সুদ যে হারাম একথা বিরলা-পুরের বিখ্যাত পুঁজিদার কাবুলিওয়ালা গোলাম হোসেনকে বললে, সে বলে, 'হামরা তো ব্যাওসা করি। আদমী কো উবকারে রুপেয়া দেতা হ্যায়!'

'কেতনা সুদ লেতা হ্যায়?'

রুপেয়া মে চার আনা। এক মাহিনা মে চার আনা। দো আনা হামারা দালাল লেগা, দো আনা হামভি লেগা। খুদ আপ লোক লেগা তো দো আনা লাগে গা। দালাল, আদমী পাকড়কে লায়ে গা তো চার আনা দালালমে লিখাপড়হি হোগা। সমঝে?'

নৈহাটি, জগদ্দল, ইছাপুর, কাঁচরাপাড়া, বেলঘরিয়া, বরানগর, দাশনগর, শালিখা, দমদম, বাউড়িয়া, মেটিয়াবুরুজ, বজবজ, বিরলাপুর—কোথায় না কাবুলিওয়ালার অভাব? যেখানেই চটকল, সুতোর কল, কারখানা—অল্প পারিশ্রমিকের শ্রমিক মজুরের গাদাগাদি—সেখানেই বাজারের পাশে, গেটের ধারে সারি বেঁধে শকুনের মতো বসে আছে কাবুলীরা। আগে ইংরেজ আমলে এরা চাকরিবাসী শ্রমিকদের বাড়িতে এসে রীতিমতো মারধোর করত। খাতক না থাকলে, তার বউকে বলত : 'এরা বিবি জানানা' আয়া, ভাত রাঁধ, খানা পাকা! উধার ভাগা হ্যায়। আজ রাতমে তুমার ঘরে হামি থাকবে। তুমারে লিয়ে আসনাই করবে। হামরা মাফিক তাজা লেড়কা হোবে।'

এখন আর অতদূরে যায় না। দিনকাল পাল্টেছে। কাবুলিওয়ালাকে মার দেবে। তাই তারা নতুন কৌশল আরম্ভ করেছে। কিছু কিছু দালাল পুষে রেখেছে। সেসব লোক এদেশীয়। বাঙালী মুসলমান। তারা এসে সুদ আদায় করে নিয়ে যায়। তার দু-আনা, কাবুলীর দু-আনা। কাজেই কাবুলীকে মারতে গেলে তার পোষা দালালরা তোমাকে 'দোরস্ত' করে ছেড়ে দেবে। থানায় গিয়ে কাবুলী দারোগাকে কিছু 'ইনাম' বা নজরানা দিয়ে সাক্ষী সমেত কেস ঠুকে দিয়ে আসবে।

খাতকদের কাছে কাবুলিওয়ালাদের

প্রথমে ভাবা হল, 'আছল মৎ দেও, ছোদ' মিটা দো।'

যে টাকা নিয়েছে তার ভাইয়ের সংগে যদি দেখা হয়ে যায় তবে জনাব গোলাম হোসেনই বলবে, 'তুমি আচ্ছা আদমী আছ তুমহার ভাই, ওশালা হারামী কা বাচ্চা আছে!'

আর মজা দেখবার জিনিস হল, ওদের দেশ থেকে অথবা দূরে থেকে কেউ পরিচিত আত্মীয় এলে দু'জনে মিনিট পনেরো ধরে হাতে হাত দিয়ে অত্যন্ত দ্রুত এবং অনুচ্চস্বরে দোওয়া 'দরূদ' পাঠের মতন পোস্তু মিশ্রু বা ফুৎকিল মানুষা নি তুং 'বিং জ'া ইত্যাদি কি যে সব ফারসী না পস্তু বলে তা খাস কাবুলী অথবা আত্মার ফেরেশতা ছাড়া কার বাপে বোঝে।

কিন্তু চিত্রটি বড় হৃদ্য এবং উপভোগ্য। গোলাম হোসেন খাস কাবুল শহরের আদমী। ফরসী ভাষায় দোসরী কিতাব পর্যন্ত তার দস্তুর মতন পড়াশুনো আছে। সুর্মা টানা দীঘল চোখ। বাঁশির মতো নাক। কাঠির মতো পাতলা তন্বী চেহারা। দাড়ি গোঁফ কামানো। মাথায় বাবরি চুলের ওপর জরিদার পাগড়ি।

হাতে একটা বুলবাড়ি। মাঝে মাঝে শিশির ঘোষের চা আর মিষ্টি দোকানে তাকে সরব অভ্যর্থনার মধ্যে এসে বসতে দেখতাম। সাহিত্য রাজনীতির সংলাপ বন্ধ করে শিশির ঘোষ গোলাম হোসেনের দিকে মন দিতেন। 'আফগান চা' দিতে বলতেন। দাম ত্রিশ পয়সা। চায়ের ওপর একটা স্বর্ণাভ সর পড়ত আর ফ্যানের হওয়ায় তা মৃদু মৃদু কুঞ্চিত হয়ে কাঁপত। দ্রব্যটি লোভনীয়। কিন্তু দু-চারদিন খাবার পর ধরা গেল অম্বল ঢেকুর মারতে। নারকেল দুধের এই 'আফগান টি' সম্পূর্ণ শিশির ঘোষের আবিষ্কার। একেবারে ট্রেড মার্ক!

শিশিরবাবু বলেন, 'বেটা আফগানী বন্ধুরা খুব খুশী! তাদের নামের চা যে!' শিশিরবাবু তাদের সঙ্গে টাকা দেওয়া-নেওয়ার ব্যবসাও করতেন। খাতক মক্কেল ধরতেন। দু-আনা দালালী নিতেন। সেই থেকে তাঁর নিজেরও সুদের মূলে ব্যবসা চলছে। এক লাখ টাকার ইনসিওরেন্স মেম্বার করে দেবার পর তিনি মাসিক একটা লভ্যাংশ পান। কিছুদিন বুদ্ধ ছিলেন। বাংলা সাহিত্যের সুপাঠক, সমালোচক। রাজনীতিতে একটা মার্কা থাকলেও সুযোগমতো অন্য মার্কা হতে তাঁর আপত্তি নেই। তাঁর সংলাপ খুবই উপভোগ্য এবং বুদ্ধি তীক্ষ্ণ।

গোলাম হোসেন আমার সম্বন্ধেও হাঁড়ির খবর রাখে জেনে বিস্মিত হলাম। শুধোলাম, 'তুমি লেখাপড়া জানো?'

সে বললে, 'হাঁ জানি। তুমি কত লেখাপড়া জানো তাও জানি। তুমি 'কিতাব' লেখ। শায়েরী করো। তুমার শ্বশুরের নাম আহমদ মণ্ডল। বউয়ের নাম বেগম আসিরা খাতুন। বাড়ির ঠিকানা : গ্রাম—সাতগাছিয়া, পোঃ—বাওয়ালী, থানা—বজবজ, জিলা—২৪ পরগণা।'

শিশিরবাবু হাসতে লাগলেন। এসব তাঁরই কারসাজি।

বললাম, 'এ বেটা পাঠান বোকা নয়।'

গোলাম হোসেন বললে, 'বোকা তুমরাই আছ। হামারা এই ভারতবর্ষ চারশো বরস শাসন করেছি। হামারা তুমাদের জানি।'

এই পাঠান! আলাউদ্দিন খিলজীর বংশধর! কে আর তা অত মিলিয়ে মনে রেখেছে। একদিন ওরা আমাদের রাজা ছিল।

গোলাম হোসেন তার হাতের ঘড়িটা বার করে দেখলে। ঘড়িটি দামী। বললে সাড়ে চার শো টাকা দাম।

শুধোলাম, 'তোমরা গরুর গোশ্‌ত খাও?'

সে বললে, 'ও চামার আদমী খাতা হ্যায়!'

শিশিরবাবু আবার হাসতে লাগলেন। তিনি বললেন, 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্যাটায়ার মনে আছে? তাঁকে কে যেন শুধোয়, 'মুসলমানদের সম্বন্ধে আপনি কি বলেন?' তিনি বলেন, 'মুসলমানরা আর সবাই ভাল, কিন্তু যারা গরু খায় তারা নরাধম!'

কাবুলিওয়ালা গোলাম হোসেন বঙ্কিম-বাবুর চাইতেও নির্দয়। কারণ বঙ্কিম-বাবু রসিকতা করেছেন আর কাবুলিওয়ালা তার সিদ্ধান্তের কথা বলেছে।

কাবুলী গোলাম হোসেন খাসীর মাংস, চাপাটি, দুধ, কলা, ডালিম, আপেল, খেজুর, ডিম, পোলাও, কোর্মা খায়। তার রোজগার অনেক। প্রায় তিন লাখ টাকা তার নাকি ভারতের পাঁচশটা শহরে খাটছে। সে কাবুলিওয়ালাদের দেনা দেয়। বাংলা মুলুকের কয়েকটি শিল্প অঞ্চলেই মাসিক সুদ সে যা পায় তার পরিমাণ প্রায় চার হাজার টাকা।

শিশিরবাবু বলেন, 'গোলাম হোসেন ভারতে আসে সতেরো বছর বয়সে। ওর বাবার চারটে বিয়ে। শেষ পক্ষের ছেলে ও। প্রথম পক্ষের ছেলে, ওর প্রায় বাবার বয়সী, সে ভারতে এসে কয়েক হাজার টাকা সুদের ব্যবসায় ফেলে রেখে দেশে গিয়ে হঠাৎ মারা যায়। মারা যাবার কারণ সে এখান থেকে এক দুরারোগ্য যৌনব্যাধি নিয়ে যায়। কাবুলে তার অতি আশ্চর্য রকমের এক প্রতিকারের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। পাপের শাস্তির জন্য তাকে কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে রাখার বিধান দেয় সমাজের মৌলভীরা। তাকে খাওয়াতে যেত আর প্রদীপ জ্বেলে সারা রাত তার বউ সামনে বসে থাকত। স্ত্রীকে পাবার কি চরম আকুলি-বিকুলি! তারপর লোকটা সাতদিন পরে মারা গেল! সে মারা গেলে গোলাম হোসেন এসে তার ব্যবসা ধরে। এখন সে বহু লাখ টাকার মালিক। আমার সঙ্গে দারুণ ভাব, গোলাম হোসেনকে পরীক্ষা করার জন্যে জপাই, কোনো রাতের মোহিনীর কাছে নিয়ে যাবার জন্যে। সে শুনলেই তৌবা তৌবা করে। তার দাদার ট্রাজিডির কথা তার স্মরণ হয়ে যায়। বছর পাঁচেক ছাড়া দেশে যায় একবার করে। হিং খেয়ে খেয়ে সংযম করে। দেশে, কাবুল সিটির ওপরে গোলাম হোসেন দেড় লাখ টাকা খরচ করে আধুনিক প্যাটার্নের ইমারত করেছে। বাদশাহ্ জহির খাঁকে গৃহ-প্রবেশের দিনে নিমন্ত্রণ করে এনেছিল। ওর বড় ছেলে এখন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে!'

শেষ সংবাদটির জন্য আমি গোলাম হোসেনের সব পাপ বোধহয় ক্ষমা করেছি। তাকে নৃশংস বলেই জানতাম। সেটি শিশির-বাবুও সম্ভবত জানেন কাবুলীর মারফতে। সেই সূত্রেই গোলাম হোসেন আমার ঘরের খবর জানে। বেগমের নাম পর্যন্ত! কারণ বেগমের আব্বাজান তাঁর মধ্যম পুত্রের মাথায় নারকেল পড়ে যাওয়াতে এবং তাঁর সহ-ধর্মিণীর জীবনসংশয়ী 'হেমোরেজ' ব্যাধিতে অনন্যোপায় হয়ে ঐ গোলাম হোসেনের কাছে ঋণ গ্রহণ করেন। পাঁচ শত টাকা—টাকায় চার আনা করে মাসিক সুদ। তাহলে পাঁচশো টাকায় একশো পঁচিশ টাকা সুদ হয় প্রথম মাসেই। দিতে পারলেন না। চক্রহারে তা বৃদ্ধি পেতে লাগল। চক্রহার হল, দিতে না পারলে মাসিক সুদটা মূলধনের সঙ্গে যুক্ত হবে। তার মানে এক মাসেই ছ-শো পঁচিশ। দু মাসে সাত শো একাশি টাকা চার আনা। মাঝে মাঝে তিনি দু-চারশো টাকা দেন তাল পাতা, নারকেল, ধান বা ছোটখাটো দু-এক টুকরো জমি বিক্রি করে; বন্ধক দিয়ে। কাবুলী পীড়ন করলে অন্য কাবুলীর কাছ থেকে দেনা করে হয়তো কিছু দিয়ে দিলেন। কত থাকল, দেনার দায়ে মাথা গরম অবস্থায় হিসেব করে আর কে তার কূল পায়? হিসেব করতে গেলে দিন রাত যায়। সংসার খরচা আছে, তাঁর শ্যালক একজনের কালেজের মাইনে দিতে হয়। জামাইয়ের কাছে প্রতিশ্রুত জিনিসপত্র আর দেওয়া হয়ে ওঠে না। সব জমি পুকুর বন্ধক হয়ে যায়। ঘরের খোরাকী ছাড়াও দু-দশ মণ ধান যে বিক্রি হত, সে সব তো গেলই, উপরন্তু খোরাকিতে টান পড়ল। মিলের কাজ বন্ধ হল, পথে কাবুলীরা ধরবে। অপমান করবে। দাড়ি ধরে নাড়া দেবে। অগত্যা কারখানার কাজের 'সারভিস' ফাণ্ড তুলে নিয়ে কাবলীকে দান করতে হল। অন্য কারখানায় বদলিওয়ালা সাজতে হল। ছেলে তিনটে নতুন 'ওয়াডলুমে' কাজ শিখে কাজ পেতে কিছু সুরাহা হল। তিন চার হাত ফিরি করে বন্ধক দেওয়া জমিগুলি বিক্রি করে সহসা কাবুলীর সঙ্গে মারামারি করার পর থানা কেস ইত্যাদি হয়ে শেষ পর্যন্ত চার হাজার পাঁচ শো টাকাতে রফা হল।

গোলাম হোসেন এ হেন শ্বশুরের জামাইকে চিনবে না আবার! সে দেখা হলেই সাইকেল থেকে নামে। সালাম জানায়। চা খাওয়ায়। তার ছেলের পড়াশোনার খবর নিই। ছেলের কথা বললেই সে অন্যমনস্ক হয়ে যায়। হাতে হাত চেপে খানিকটা চুপ করে

ও দোনো ভি সুরা খাতা হ্যায়—
—মদ খাতা হ্যায়

থাকে। তারপর হঠাৎ গর্জে ওঠে: 'ছেলের কথা তুমি বোলো না ভাইসাহাব। দুসরা বাত বোলো। উ-হারামজাদা আছে। আংরেজি শিখে বদ-বখত হোয়ে গেছে। মেম সাদি কোরেছে। চিঠি দিয়েছে বাদশাহ জহির শাহ তাকে ভারতে 'এ্যামবাসাডর' কোরে পাঠাচ্ছেন। হামি ভারত ছেড়ে চলে যাবো।'

গোলাম হোসেনের চোখে জল টলটল করে। ক্ষোভে দুঃখে ফুলতে থাকে। সে বলে, 'হারামের পয়সাতে মানুষ, হারামী তো হোবেই সাহাব। এ আল্লার বিচার।'

'তবে এই সুদের ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে দেশে চলে যাও না। এত টাকা কি হবে তোমার? আর ছেলে বিলেতে পাশ করে মেম বিয়ে করেছে তো কি! মেমরা কি মানুষ না?'

'হাঁ সাহাব মানুষ তো আছে, লেকিন... ও দোনো ভি সুরা খাতা হ্যায়—মদ খাতা হ্যায়।'

'তুমি মদ খাও আবার নামাজ পড়ো!'

'হামি পাপ করি আউর উসলে দিই।'

'তোমার ছেলে 'সরাবন তহুরা' পান করে কেন জানো, ওটি বেহেশতে গেলে প্রচুর পরিমাণে পাবে, আর তার সদ্ব্যবহার করতে না পারলে খোদা ব্যাজার হবেন, তাই বোধ হয় দুনিয়াতে সুরাপান করে অভ্যাসটা রপ্ত করে নিচ্ছে!'

কাবুলী হেসে উঠল। হা—হা—হা......

হঠাৎ সে আমাকে বিস্মিত করে বললে, "না সাহাব, আমার ছেলে নাই, উসব ঝুটো বাত! শিশিরবাবুকে হামি মিছা কথা বানিয়ে বলেছিলাম। হামি দেখে নাই, কে হামার ছেলে তৈয়ারি করবে?'

বললাম, 'তেমন লোকের বড় অভাব বুঝি তোমাদের দেশে?'

গোলাম হোসেন চোখ ট্যারা করলে আমার দিকে।

সে উঠে চলে যাচ্ছিল। তার আলখাল্লা চেপে ধরলাম।

'সত্যি, তোমার ছেলে নেই?'

তখন গোলাম হোসেন তার সাতখানা জামার ভেতর থেকে বিলেতের একটা চিঠি বার করে দেখালে। ভেতরে ফারসী লেখা। ঠিকানা নাম ইংরেজিতে। ওর ছেলের নাম দীলওয়ার হোসেন! এই সেই দুর্ভেদ্য দুর্বোধ্য ফারসী ভাষা, যে ভাষায় কাব্য লিখে গেছেন ফেরদৌসী, শেখ সাদী, হাফিজ, ওমর খৈয়াম!

বললাম, 'দেখো ব্যাটা কাবুলী, এই ছেলের সঙ্গে তুমি বিরোধ করো না। তোমার সঙ্গে তার বনবে কেন? তোমাকে বাপ বলে যে পরিচয় দিচ্ছে সেইটাই তো তোমার ভাগ্য। কোনো ইংরেজকে বাপ বলে যদি সে-দেশেই থেকে যেত কি হত? সুযোগ সুবিধার জন্যে আধুনিক যুগে পিতৃপরিচয় পর্যন্ত গোপন করে, বদল করে। আধুনিক

বাপকে মেনে নাও। তোমাদের দেশও এ্যাড-ভান্স হচ্ছে। একটা মেম এসে তোমাদের জাতি করে ফেলছে সে তো তার ক্রেডিট।'

'মেম সাহাব কি মুসলমান হোবে?'

'মেয়েরা কি মুসলমান হয় কোনোদিন? তোমার বাপ মুসলমান, দাদা মুসলমান, তুমি মুসলমান, তোমার ছেলে মুসলমান, কিন্তু তোমার বউ মুসলমান নয়।'

'কাহে?'

'তার কি 'মুসলমানী' মানে 'হাজামত' অর্থাৎ 'খতনা' বা লিঙ্গচ্ছেদ হয়েছিল?'

কাবুলী হা হা হা করে আকাশ ফাটিয়ে হাসতে লাগল। এরপর সে চিঠিখানাতে চুমো খেয়ে মাথায় ঠেকিয়ে পকেটের মধ্যে তা পুরে নিয়ে চলে গেল।

কয়েকদিন পর ব্লক ডেভালপমেণ্ট অফিসে গিয়েছিলাম আমার ব্যক্তিগত একটি কাজের তাগিদে। বন্ধুবরেষু বি-ডি-ও রবীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় তরুণ, অমায়িক এবং অত্যন্ত কর্মঠ ব্যক্তি। তার সঙ্গে চাষ-বাস, শিল্প, সংস্কৃতি নিয়ে আলাপে মসগুল ছিলাম। হঠাৎ দেখলাম কয়েকজন কাবুলী এসেছে তাদের হিসেবপত্র দেখাতে। পাশ বই আর লম্বা সরু হিসেবের খাতা হাতে। খাতার সিরিয়াল নম্বর নেই। সবই ওদের ভাষায় লেখা। দেড় হাজার দু-হাজার টাকা মাত্র খাটাচ্ছে বলে সকলেই হিসেব দেখাচ্ছে। বি-ডি-ও বললেন, এসবের আমি কি বুঝব, ইংরেজি বা বাংলাতে লিখিয়ে আনো।' খাতা গুলোর পাতা খুলে নিয়ে নম্বর ফেলে আনতে পারবে সহজেই। ওদের ডবল খাতা থাকে। গোপনটাতে থাকে ২৫% সুদ দেবার লেখাপড়া। গোটা হাতের ছাপ মারা। দ্বিতীয়টাতে থাকে মাত্র ৪%—যে হারে সেভিং ব্যাঙ্ক সুদ দেয়। ফিকসড্ ডিপো-জিটের মতো হয়তো ৮% কারো কারো বা। মোদ্দা কথা ওরা ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দেয় প্রায় সকলেই।

গোলাম হোসেনকে একদিন বলেছিলাম 'আচ্ছা আমরা যদি দল বেঁধে তোমাদের এদেশ থেকে তাড়িয়ে দিই?'

সে বললে, 'হামাদের আপলোক ভাগানে সে হাম লোক ভি যাঁহা যাঁহা হামারা মুলুকমে হিন্দুস্থানকো কাপড়া কা কার-খানা হ্যায়—উসকো হঠা দেগা—ভাগা দেগা।'

এই জোঁকেদের কোনো ল্যাজ নেই যে আছাড় মারা যাবে, নুনেও জব্দ হবে না—এরা আমাদের রক্ত আর নোনা ঘাম শুষেই জীবিকা আহরণ করে। তা ছাড়া এই চলন্ত 'আফগান ব্যাঙ্ক'কে ধ্বংস করলে বাপের ছাজের সময় আমাদের ছেলের ই বা আমাদের ছাদ্দ করবে কেমন করে? তারপর আফগানের সঙ্গে আছে আমাদের সরকারের অকৃত্রিম মৈত্রী।

—আবদুল জব্বার

বিকৃত-দেহ সন্তান
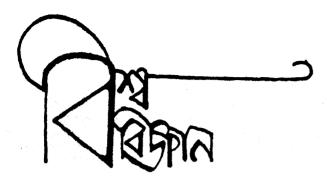
সম্প্রতি পশ্চিম জার্মানির রেজেনসবুর্গ শহরে ঐ দেশের ৪৩তম মেডিকেল কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। চিকিৎসা-সংকটের উপর সেখানে নানা ধরনের আলোচনা হয়েছে। কিন্তু যে আলোচনা-চক্র সবচাইতে বেশী বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে, সেটা ছিল বিকৃত-দেহী শিশুদের সম্পর্কে। সেইসমস্ত শিশু, যারা জন্মকাল থেকেই বিকৃত হয়ে পৃথিবীর আলো-বাতাসের রাজ্যে আগমন করেছে, জন্ম থেকেই যারা হয়ে গেছে অন্ধ, দুর্বল, পঙ্গু অথবা বিকৃতমস্তিষ্ক। এক কথায়, দেহ এবং মনে একটি পরিপূর্ণ মানুষরূপে বেঁচে থাকতে হলে যে সমস্ত গুণ থাকা দরকার, এদের তা নেই। পরিবারের কাছে এ শিশুরা অনাকাঙ্ক্ষিত, সমাজের কাছে এরা করুণার পাত্র এবং রাষ্ট্রের কাছে ভারবাহী বোঝা।

কংগ্রেসে যে সমস্ত বিশেষজ্ঞ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন, স্ব স্ব ক্ষেত্রে তাঁরা প্রত্যেকেই রীতিমত দিকপাল। বিকৃত-দেহী শিশুর জন্ম সম্পর্কে তাঁরা বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা করেন এবং এই আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধানের ব্যাপারেও বেশ কিছুটা আলোকপাত করা হয়।

কারণ সম্পর্কে কোন কোন বক্তা বলেন, অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার পর অতিরিক্ত ঘুমের ওষুধ খাবার ফলে অনেক সময় সন্তান ভ্রূণ অবস্থা থেকেই বিকৃত হয়ে যেতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে বংশ-গতি সুস্পষ্টরূপে সন্তানের পরিপূর্ণতা রোধের কারণ হয়ে থাকে। যুদ্ধোত্তর কাল অর্থাৎ বিগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কোন কোন সমাজ তথাকথিত আধুনিক (?) জীবনের কৃত্রিমতার কোপে পড়ে এমন নানা ধরনের ওষুধ খেতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন, যার, প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে বাবা বা মা'র শারীরিক বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দেখা দেয়। আর এই বিপর্যয়ের শিকার হয় ঐ বাবা-মা'র মধ্যে যারা জন্ম নিতে চলেছে, তারা নিজে। জেরহারড কস নামে জনৈক বক্তা জোর দেন মা-এর স্বাস্থ্যের উপর। এঁর মতো মা যখন অন্তঃসত্ত্বা থাকেন, তখন বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস তাঁর দেহে প্রবেশ করে মাতৃ-গর্ভ থেকেই সন্তানের দেহ বিকৃত করে তোলার কাজ শুরু করতে পারে। এর ফলে জীবন সৃষ্টির শুরু থেকেই জাতকের দেহ-কোষের ক্রোমোজমগুলি ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এবং সেই ব্যাধি ভবিষ্যৎ জীবনে তাকে পঙ্গু করে অবশেষে মৃত্যুর দিকেও ঠেলে দিতে পারে। মুনিখ-এর হানস-ডাইয়েট্রিখ পাখে বলেন, ১৯৬৭ সালে মুনিখ-এর শহরতলি হারলাসিঙ্গ-এ যে ব্যাপক বিকৃত শিশুর জন্মহার বেড়ে গিয়েছিল তার মূলে কারণ ছিল সিস্তেরাই নামে এক ধরনের বীজাণু।

বিভিন্ন রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার কথা ছেড়ে দিলেও 'জার্মান-হাম'এর মত সংক্রামক রোগও কিন্তু বিকৃত শিশু জন্মের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে যে কাজ করে, তারও নজির পাওয়া গেছে। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির দেহত্বকে লালচে বা গোলাপী রঙের গুটি বের হয়। ১৯৬৪ সালে শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই যে সমস্ত মা অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় এই রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেরই ছেলে মেয়ে বিকৃত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। এবং তার সংখ্যা পনের থেকে কুড়ি হাজারের মত। এদের কেউ জন্ম নিয়েছে চোখের হানি নিয়ে, কারুর হৃৎপিণ্ড যথাযথ আয়তন বা গঠন পেতে বঞ্চিত হয়েছে, কারুর অন্তঃকর্ণে বধিরতা, দাঁতের রোগ অথবা অত্যন্ত ছোট আয়তনের মাথার খুলি এবং দেহের বৃদ্ধি অত্যন্ত কম। একটি সমীক্ষার কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার এক মাসের মধ্যে মা যদি জার্মান-হাম রোগে আক্রান্ত হন, তেমন ক্ষেত্রে প্রায় শতকরা ত্রিশ ভাগ শিশুই বিকৃত অবস্থায় জন্মলাভ করে। দ্বিতীয় মাসে এই রোগ হলে এই হার নেমে আসে শতকরা পঁচিশ ভাগে। তৃতীয় মাসে দাঁড়ায় শতকরা নয় ভাগ।

টোকিওর আন্তর্জাতিক রঞ্জনরশ্মি-চিকিৎসাবিদ সম্মেলনে উন্নত ধরনের এই টোমোভিশন এক্স-রে যন্ত্রটির কার্যাবলী পরীক্ষা করে দেখছেন জনৈক বিশেষজ্ঞ। এই যন্ত্রে চিকিৎসকরা অপ্রয়োজনীয় অংশগুলি বাদ দিয়ে দেহের পরীক্ষাধীন জায়গাটি সরাসরি অনেক স্পষ্ট করে দেখানর ব্যবস্থা হয়েছে। যন্ত্রটির নির্মাতা সিমেন্স

অতি সম্প্রতি অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা গেছে কিছু কিছু রোগ অন্তঃসত্ত্বা হবার কিছুদিন আগে হলেও জাতকের দেহে বিকৃতি আসতে পারে। ভাইরাস সংক্রান্ত এক ধরনের ব্যাধির সন্ধান এ'রা উল্লেখ করেন। যতদিন শিশু মায়ের পেটে থাকে, ততদিন এই রোগের প্রভাব তার মধ্যে ধরা পড়ে না। জন্মের প্রায় এক বৎসর পর জাতকের দেহ-রসের মধ্যে এদের অস্তিত্ব ধরা যায়। তৎক্ষণ কাজও শুরু করে দেয় তারা। অর্থাৎ তখন থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায় শিশুর দেহ যেন ক্রমেই বিকৃত হতে শুরু করেছে। তার দেহ হচ্ছে শীর্ণ, হাত-পা যেন অহেতুক অশক্ত হয়ে যাচ্ছে, মানসিক বিকাশের অভাব, ইত্যাদি।

ডারেটরিখ পাথে মনে করেন, বেশির ভাগ বিকৃত-দেহী শিশুর জন্মের মূলে রয়েছে স্ত্রী দেহে বিভিন্ন রোগের প্রভাব। সন্তান ধারণের পূর্বে এবং অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় মেয়েদের দেহে যাতে সংক্রামক ব্যাধি না হয়, সে দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। ইতিমধ্যে জার্মান-হাম-এর টিকা বের করে ফেলেছেন মার্কিন দেশ এবং বেলজিয়াম। আগামী বছরের মধ্যে পশ্চিম জার্মানও সম্ভবত এই টিকা কাজে লাগাতে পারবে। এর মধ্যে অনেকে বলতে শুরু করেছেন, চোদ্দ পনের বয়েসের মেয়েদের দেহে এই 'হামে'র টিকা প্রয়োগ করা উচিত। এতে করে ভয়াবহ ঐ সংক্রামক রোগের হাত থেকে তাদের রক্ষা করা যাবে। সেই সঙ্গে সম্ভব হবে অনাকাঙ্ক্ষিত বিকৃত শিশুর জন্মরোধ। ডঃ পাথের মতে এই রোগটির হাত থেকে মায়েদের অবশ্যই রক্ষা করতে হবে শুধু এই কথা ভেবে যে, যাঁরা আজ মস্তিষ্ক-বিকৃতিতে ভুগছেন, তাঁদের শতকরা নব্বুই ভাগই জন্মলাভ করেছেন এই রোগ বা অনুরূপ কোন রোগে আক্রান্ত মায়ের কোলে। বধির হয়ে জন্মেছেন শতকরা একষট্টি ভাগ, অন্ধ শতকরা আটান্ন, হৃদপিণ্ডের জটিল ব্যাধিতে শতকরা পঞ্চাশ এবং শতকরা কুড়ি ভাগ অন্যান্য দুরারোগ্য রোগে।

পাকস্থলীর রোগ
নির্ণয়ে হরমোন

জটিল পাকস্থলীর রোগ যাতে সহজে ধরা যায় এবং অনেক আগে থেকে প্রয়োজনমত চিকিৎসা চালিয়ে অনিবার্য মৃত্যুর হাত থেকে রোগীকে যাতে সারিয়ে তোলা সম্ভব হয় তার জন্যে চিকিৎসকরা এবার হরমোনের সাহায্য নিতে চলেছেন। এ খবর সরবরাহ করেছেন Frankfurter Rundschau পত্রিকা তাঁদের নভেম্বর ৪, ১৯৬৯ সংখ্যায়। আটটি দেশের চিকিৎসাবিজ্ঞানী এবং বিশেষজ্ঞ ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ'রা মুখ্যত 'পেনটাগ্যাসট্রিন' পরীক্ষার উপর বেশী জোর দেন। পেনটাগ্যাসট্রিন পাকস্থলীর মধ্যে অম্লরস নিঃসৃত হতে সাহায্য করে। এই হরমোনটি কৃত্রিম উপায়েও তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

যাঁরা পাকস্থলীর রোগে ভুগছেন তাঁদের দেহে ইনজেকশনের সাহায্যে পেনটাগ্যাসট্রিন প্রবেশ করান হবে। এর দু ঘণ্টা পর রোগীর পাকস্থলীর অম্লরস পরীক্ষা করে বলে দেওয়া যাবে, তার পাকস্থলীতে কোন ক্ষত আছে কিনা, তার প্যানক্রিয়াস বা অগ্ন্যাশয় ঠিকমত কাজ করছে কিনা অথবা দুরারোগ্য রক্তাল্পতায় সে ভুগছে কিনা। অধ্যাপক ভেনরার ক্রেউতজফেল্ড মন্তব্য করেন : আমাদের মধ্যে প্রতি দশজনের মধ্যে অন্তত চারজন ভুগে থাকেন পাকস্থলী বা ক্ষুদ্রান্ত্রের রোগে। প্রতি দশজনের মধ্যে অন্তত একজনও তার জীবদ্দশায় কোন না কোন সময়ে পাকস্থলীর ক্ষত বা আলসার রোগের অভিজ্ঞতা লাভ করেন। হরমোন পরীক্ষায় দেখা গেছে, পাকস্থলীর ক্ষত বা অগ্ন্যাশয়ের বিপর্যস্ত কখনও কখনও অতি সহজেই ক্যানসার রোগ সৃষ্টিরও কারণ হতে পারে। পেনটাগ্যাসট্রিনের

সাহায্যে যেমন কোন রোগের সম্ভাবনা অনেক আগে থেকেই জেনে নিয়ে সাবধান হয়ে যাওয়া সম্ভব।

আলোচনা-চক্রে 'ইনক্রেটিন' নামে আর এক ধরনের হরমোনের কথা উল্লেখ করা হয়। এর অস্তিত্ব এখনও পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া না গেলেও, এঁদের অনুমান পরিপাকক্রিয়ার এই হরমোনটির প্রভাব অত্যন্ত বেশী। বিশেষ করে রক্তে চিনির মাত্রা এর দ্বারাই নির্ধারিত হয়। চিকিৎসকদের ধারণা, ইনক্রেটিনের সাহায্যে বহুমূত্র রোগের চিকিৎসা আরও সহজতর করা সম্ভব হবে।

স্লিমদের উদ্দেশে

যাঁদের রসনা মিষ্টি স্বাদ না পেলে তুষ্ট হয় না অথচ নিজেকে 'স্লিম' অর্থাৎ 'কৃশকায়' (কৃশকায়া দিকেই অবশ্য ঝোঁকটা বেশী) রাখতে চান তাঁরা দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাবার জন্য আজকাল ক্যালোরিবিহীন মিষ্টি চর্চায় অতিমাত্রায় আসক্ত হয়ে উঠেছেন। সুযোগটা ব্যবসায়ীরা অবশ্য পুরোমাত্রায় গ্রহণ করেছেন। রঙ-বেরঙী শিশিতে ভরা মনোহারী দোকান আজ পরিপূর্ণ। তাদের গায়ের লেবেলে লেখা 'ক্যালোরিবিহীন মিষ্টি'। স্লিম হওয়ার আদর্শ খাদ্য।' তারা ধরে চিনি হলেও গোড়ে যে 'স্যাকারিন', সেটা অবশ্য সকলেই জানেন। স্বাদে মিষ্টি হলেও চিনির কোন দৈহিক ধর্মই এর মধ্যে প্রকাশ পায় না। অতএব চিনি খেয়ে যাঁরা দেহে মেদ বৃদ্ধি করতে চান না, তাঁদের কাছে বস্তুটি অবশ্যই স্মরণীয়। শুধু তাঁরাও নন, যাঁরা বহুমূত্র রোগে ভোগেন অথচ মিষ্টি স্বাদটি ভুলতে পারেন না, তাঁরাও স্যাকারিন প্রয়োজনে কাজে লাগিয়ে থাকেন। বর্তমানে আইসক্রিম, বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি পানীয় বা খাদ্যেও প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা হচ্ছে।

কিন্তু স্বাদে মিষ্টি হলেও এর ফল যে মিষ্টি নয়, বরং যথেষ্ট তিক্ত পুরো তিন সপ্তাহ ধরে পরীক্ষা চালিয়ে সেটা প্রমাণ করে ফেলেছেন পশ্চিম জার্মানের গাইরেৎসেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন বিশেষজ্ঞ। বিশেষজ্ঞ দলে ছিলেন মোট নয়জন বিজ্ঞানী। পরিচালক অধ্যাপক হারেনরিখ হফম্যান। সাইক্লামেন নামে স্যাকারিন ধর্মী এক ধরনের রাসায়নিক যৌগ নিয়ে তিনি এবং তাঁর দল পরীক্ষা চালান কয়েকটি গিনিপিগের উপর।

প্রথম সপ্তাহে এই গিনিপিগদের প্রত্যেকটিকে প্রতিদিন তাঁরা পাঁচ গ্রাম করে সাইক্লামেন খেতে দেন। অধ্যাপক হফম্যানের মতে একজন লোক সাধারণত এই পরিমাণ স্যাকারিন জাতীয় পদার্থই প্রতি দিন খেয়ে থাকে। দ্বিতীয় সপ্তাহে গিনিপিগদের ঐ মিষ্টির মাত্রা বাড়িয়ে দেওয়া হল দশ গ্রামে। তৃতীয় সপ্তাহে পনের গ্রামে। দ্বিতীয় সপ্তাহে ... তাদের দশ গ্রাম করে সাইক্লামেন দেওয়া হল, দেখা গেল প্রায় অর্ধেক গিনিপিগ কিছু আর তেমন সাড়া দিচ্ছে না। এরা সকলেই বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আর বেশির ভাগ রোগই ধরা পড়ল পাকস্থলী বা ক্ষুদ্রান্ত্রে। তৃতীয় সপ্তাহে মাত্র গুটিকয় পশুর উপর পরীক্ষা চালান হল যেন কতকটা জুলুম চালিয়ে।

বিশেষজ্ঞরা লক্ষ করেছেন, অতিরিক্ত সাইক্লামেন খাওয়ার ফলে গিনিপিগদের দেহে বিশেষ এক ধরনের বস্তু তৈরি হয়ে যায়। এই বস্তুটি তাদের মূল স্নায়ুতন্ত্রের উপর ভীষণ রকমের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তারা তখন স্নায়বিক দৌর্বল্যে ভুগতে থাকে এবং কেমন যেন খিট খিটে মেজাজের হয়ে যায়। এবং এ ব্যাপারটা তখনই চোখে পড়ে যখন সাইক্লামেনের মাত্রা অনেক বেশী নেওয়া হয়।

এ থেকে অধ্যাপক হফম্যান সিদ্ধান্ত করেছেন, দৈহিক ওজনের কিলোগ্রাম প্রতি চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ মিলিগ্রামের বেশী এই ধরনের মিষ্ট দ্রব্য কারুর পক্ষে খাওয়া ঠিক হবে না। প্রসঙ্গক্রমে তাঁর বক্তব্য, শিশুদের পক্ষে এই বস্তুটি যথেষ্ট ক্ষতিকর। এর সামান্যতম অংশ শিশু খাদ্যের মধ্যে থাকলে শিশুর দেহের বৃদ্ধির ব্যাপারে গোলমাল দেখা দিতে পারে, খাদ্যে রুচি কমে যেতে পারে এবং তারা খোস, পাঁচড়া প্রভৃতি চর্ম রোগে আক্রান্ত হতে পারে। দেখা গেছে অনেক ক্ষেত্রে সাইক্লামেনে তৈরি মিষ্টি খাদ্য, আইসক্রিম বা লেমোনেড শিশুদের স্বাস্থ্য রক্ষার কাজটিকে ব্যাহত করেছে। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংস্থা এবং ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য দপ্তরও সাইক্লামেন-জাতীয় মিষ্টি দ্রব্যের ব্যবহারের ব্যাপারে চিন্তিত।

দীর্ঘ পাঁচ বছর গবেষণা চালিয়ে ব্রিটেনের সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ জয়ন্ত এবং অধ্যাপক জন ওয়েস্ট কোন রকম জোড়াতালি না দিয়ে শক্তিশালী চুম্বকের সাহায্যে ইচ্ছে মত কোন স্থানে লোহা বা অনুরূপ পদার্থকে স্থির করে রাখার একটি অভিনব পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। এর ফলে অদূর ভবিষ্যতে এমন ধরনের রেলগাড়ি তৈরি করা যাবে যা ঘণ্টায় তিন শ' মাইল বেগে ছুটতে পারবে। ঐ ট্রেনের ব্রেকের কাজ করবে ঘর্ষণবিহীন এই চুম্বক-ব্যবস্থা। ছবিতে অধ্যাপক ওয়েস্টকে দেখা যাচ্ছে। চুম্বকের সাহায্যে তিনি একটি লোহার রডকে শূন্যে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখে দিয়েছেন। এই পদ্ধতিতে বৈদ্যুতিক চুম্বক ব্যবহার করা হবে। তবে সেই চুম্বক তৈরি করা হবে নিরত (বা ডি সি) তড়িৎ প্রবাহের দ্বারা। একটি কমপ্লেক্স-... ভারসাম্যতা বজায় রাখা হয়।

ক্যানসারের রক্ত পরীক্ষা

দেহে অস্ত্রোপচার চালিয়ে প্রচলিত 'বাইওপসি' পরীক্ষা না সেরে কোন রোগীর রক্ত পরীক্ষা করেই এবার বলে দেওয়া সম্ভব হবে তিনি 'ক্যান্সার-ক্যানসার'-এ ভুগছেন

কিনা। এই রক্ত পরীক্ষার কাজটি চিকিৎসক অত্যন্ত সহজ পদ্ধতিতে তাঁর চেম্বারে বসেই সারতে পারবেন। 'মেলানোমা' নামে 'ত্বকের-ক্যানসার' নির্ণয়ের নতুন এই পদ্ধতিটির আবিষ্কারক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উটাহ্ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রোগ-প্রতিরোধক বিশেষজ্ঞ ডঃ নাদিম এম মুনা। ডঃ মুনার বক্তব্য : শুধু ত্বকের ক্যানসারই নয়, ভবিষ্যতে হয়ত আরও বিভিন্ন রকমের ক্যানসার রোগ এই একই পদ্ধতিতে নির্ণয় করা সম্ভব হবে। এবং ভবিষ্যতে জনস্বাস্থ্য নিরাপত্তার জন্যে সার্বজনীনভাবে পরীক্ষা চালিয়ে দেখে নেওয়া যাবে কারা ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হয়েছেন বা আক্রান্ত হতে চলেছেন।

ডঃ মুনার পদ্ধতিটি এই রকম : ত্বক-ক্যানসারের মূলে বীজে থাকে 'মেলানোমা অ্যান্টিজেন'। এই বস্তুটি দেহের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এক ধরনের রোগ প্রতিরোধক-কণিকা সৃষ্টি করে, যা ক্যানসার সৃষ্টি হতে বাধা দেয়। অ্যান্টিজেনের প্রকৃত স্বরূপ এখনও জানা যায় নি। তবে শরীরের মধ্যে এটি যে বিশেষ ধরনের প্রতিবীজাণু সৃষ্টি করতে সহায়তা করে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। এই প্রতি-বীজাণু বা অ্যান্টিবডিই অ্যান্টিজেনকে বাধা দিয়ে ক্যানসারের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে।

মেলানোমা রোগে আক্রান্ত হয়েছেন বলে যাকে সন্দেহ করা হয় এই পরীক্ষায় তেমন কোন রোগীর প্রতিবীজাণু ঘটিত রক্ত সংগ্রহ করে প্রথমে রাখা হয় একটি কাচের স্লাইডের ওপর। ঐ স্লাইডের উপর আগে থেকে রেখে দেওয়া হয় জানিত মেলানোমা রোগীর দেহ-কোষ এবং আরও কিছু বিশেষ ধরনের রাসায়নিক পদার্থ। প্রতি-বীজাণুগুলি অ্যান্টিজেনের সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গে এক ধরনের প্রতিপ্রভার সৃষ্টি করে এবং সেই আলো খালি চোখেই দেখা যায়। ফটোগ্র্যাফিক প্লেটেও তার ছবি তোলা যেতে পারে। যদি এই পরীক্ষায় কোন প্রতিপ্রভা চোখে না পড়ে, তা হলে বুঝতে হবে, স্লাইডের উপর যে ধরনের ক্যানসার কোষ রাখা হয়েছিল, সন্দেহজনিত ব্যক্তির অন্তত ঐ ধরনের ক্যানসারের কোন আশঙ্কা নেই।

ডঃ মুনা বলেছেন : বিশেষ বিশেষ ক্যান-সারের প্রতি-বীজাণু বিশেষ ধরনের হয়ে থাকে। তারা পরস্পর স্বতন্ত্র। অতএব কোন ক্যানসারে প্রতি-বীজাণু কি রকম এবং ক্যানসার বীজাণুর সঙ্গে তার প্রতিক্রিয়াই বা কি ধরনের হয়ে থাকে, যদি সেটা জানা যায় তা হলে ঐ একই পদ্ধতিতে হয়ত সরাসরি যে-কোন ক্যানসার রোগ নির্ণয় সহজেই করা যেতে পারে। আর যে কোন ক্যানসার ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠার আগে যদি ধরা পড়ে যায়, তাকে প্রতিরোধ করাও সম্ভব।

সমরজিৎ কর

জীবন যে-রকম

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ২০ ॥
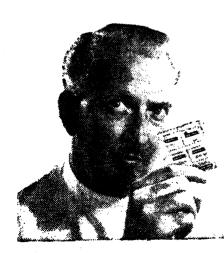
কাকে চাই?

শুভ্রা একেবারে রাসমোহনের মুখোমুখি পড়ে গেছে। রাসমোহন তখন সবে বাড়ি থেকে বেরুতে যাচ্ছিলেন, দরজার কাছে শুভ্রাকে ইতস্তত করতে দেখে তিনি তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলেন। শুভ্রা আর দ্বিধা না করে বললো, অপর্ণাদি আছেন?

রাসমোহন সোজা তাকিয়ে আছেন শুভ্রার চোখের দিকে। শুভ্রা বেশীক্ষণ চোখে চোখ রাখতে পারে না, চঞ্চলভাবে সরিয়ে নেয়। রাসমোহনকে দেখেই তার বুকে ঢিপঢিপ করতে শুরু করেছে কেন, তার কারণ সে নিজেই বুঝতে পারে না। সে তো আর কোনো অন্যায় করতে আসে নি। তবে মাধুরীর মুখে তার শ্বশুরের রাগের যা গল্প শুনেছে, সেই জন্যই হয়তো—

রাসমোহন বললেন, সে তো এ সময় বাড়ি থাকে না। মেয়েকে ইস্কুলে দিয়ে আসতে গেছে!

—কখন ফিরবেন? বেশী দেরি হবে?

—অন্তত আধ ঘণ্টা তো লাগবেই!

—অপর্ণাদির সঙ্গে আমার খুব দরকার ছিল দেখা করার।

—কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

শুভ্রা আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছে, নীলাঞ্জনদা কিংবা মাধুরীর কোনো উল্লেখ এঁর কাছে করা চলবে না। কিন্তু রাসমোহনের চোখের দৃষ্টি এমন প্রখর যে ওঁর সামনে চট করে মিথ্যে কথা বলতে ভরসা হয় না। শুভ্রা আমতা আমতা করে বললো, আমার দিদি অপর্ণাদির বন্ধু। অপর্ণাদির মাসীর বাড়ির পাশেই আমাদের বাড়ি।

—মাসীর বাড়ি মানে লেক রোড-তে?

—হ্যাঁ। আমার বাপের বাড়ি ওখানে।

—শ্বশুর বাড়ি কোথায়?

ইস, যেন ঠিক উকিলের মতন জেরা করছে। শুভ্রা বেলগাছিয়ার কথা উল্লেখ করতে সাহস পেল না। যদি তার থেকে আবার নীলাঞ্জনদার নাম ওঠে। বললো, শ্বশুর বাড়ি বর্ধমান। ঠিক মিথ্যে বলা হলো না, কারণ রতনদের দেশ বর্ধমানে।

রাসমোহন একবার বাইরে বেরুবার একটা ভঙ্গি করে বললেন, তা আধ ঘণ্টাটাক ঘুরে এলে ওর সঙ্গে দেখা হতে পারে!

এখান থেকে আবার হেঁটে ট্রাম রাস্তা, তারপর বাড়ি ফিরে যাওয়া। দেখা না-করে। শুভ্রা তাতে মোটেই রাজী নয়। এসেছে যখন। শুভ্রা এতক্ষণে ভয়ের ভাব অনেকটা সামলে নিয়েছে। এবার সে বুড়ো মানুষদের ভোলাবার উপযোগী করে মুখে একটা লাজুক-মধুর হাসি ফোটালো। চোখে আনলো সরল-অসহায় ভাব। বললো, মেসোমশাই, আমি আধ ঘণ্টা এখানে কোথায় ঘুরবো? এখানে তো আমি কিছু চিনি না! আমি বরং অপর্ণাদির জন্য অপেক্ষা করবো?

একতলার বসার ঘরটা খুব বেশী ব্যবহার করা হয় না। সোফা-কাউচগুলোর বয়েস অন্তত চল্লিশ বছর, ছাউনি পাল্টানো হয়নি বহুদিন। দেয়ালে শ্রীরামকৃষ্ণ, কাশ্মীরের ডাল হ্রদ, বাঘের পেটে পা দিয়ে দাঁড়ানো রাসমোহনের পিতার ছবি ও গত বছরের ক্যালেণ্ডারের সঙ্গে রয়েছে কোমরে তলোয়ার আঁটা সপ্তম এডোয়ার্ড। ছিটকিনি খুলে রাসমোহন আগে নিজে ঢুকলেন, ঘরটায় গুমোট গন্ধ, দুটো জানলা খোলার পর বেশ আলো হয়ে গেল। রাসমোহন বললেন, এসো, বসো এখানে।

রাসমোহন নিজেই বসার জায়গার ধুলো ঝেড়ে বললেন, তোমার নাম কি?

—শুভ্রা সরকার।

—ক' বছর বিয়ে হয়েছে?

—সাড়ে চার বছর।

—হুঁ। বর কি করে?

—পোর্ট কমিশনার্সে কাজ করে।

—আচ্ছা, বসো—

রাসমোহন কিন্তু আর বাড়ি থেকে বেরুলেন না, ঢুকে গেলেন বাড়ির মধ্যে। অথচ একটু আগে তিনি বেরুতেই যাচ্ছিলেন। শুভ্রা আগে দু-একবার এ বাড়িতে এসেছে, কিন্তু রাসমোহন তাকে চিনতে পারেন নি।

আগে কি রকম জমজমাট ছিল বাড়ি, অনেক লোকজন ছিল, এখন কি রকম নিস্তব্ধ। ওপর তলায় একটাও শব্দ নেই। শুভ্রার মনে হলো, সে যেন কোথাও চাকরির ইন্টার-ভিউ দিতে এসেছে। প্রতীক্ষার মধ্যে রয়েছে উৎকণ্ঠা। অপর্ণাদির সঙ্গে তার এমন কিছু ভাব ছিল না কোনো সময়। হঠাৎ এ রকম দেখা করতে আসায় অপর্ণাদি যদি বিরক্ত হন। আর অপর্ণাদিটাই কি? মাধুরীর মতন মেয়েকে ভালোবাসতে পারলেন না? এতদিনও তো যান নি দাদা-বৌদির সঙ্গে দেখা করতে। বাবার পক্ষ নিয়ে উনিও রইলেন রাগ করে।

বসে আছে তো বসেই আছে। হাতে ঘড়ি পড়ে আসে নি শুভ্রা, কত সময় কেটে গেল কে জানে। রান্নাবান্না অবশ্য মোটামুটি সেরে এসেছে, কিন্তু মাধুরী একা রয়েছে। ভয়ের কিছু নেই অবশ্য, কিন্তু বড্ড নার্ভাস হয়ে পড়েছে মাধুরী। এই সময়টা সব সময় ওর কাছে কাছে কারুর থাকা দরকার। আজ কাগজে নীলাঞ্জনদাদের অনশনের কোনো খবর বেরোয় নি। কাল রাত্রে ব্যারাকপুরের কাছে একটা গোলমালে তিনজন লোক মারা গেছে, সেই খবরই প্রাধান্য পেয়েছে। জেলের মধ্যে কয়েকজন অনশন করে আছে—তার আর গুরুত্ব নেই। খবরের কাগজওয়ালারা তো আর ঐ সব লোকদের মা-বাবা কিংবা বউ-ছেলেমেয়েদের কথা ভাবে না, তারা যে কি রকম ব্যাকুল হয়ে থাকে—

ভেতর থেকে পায়ের শব্দ আসছে। শুভ্রা ভাবলো, রাসমোহন বুঝি আবার খবর নিতে আসছেন। কিন্তু দ্রুত পায়ের শব্দে হনহন করে দীপু বেরিয়ে গেল বাইরে। দীপু এ ঘরের দিকে তাকায় নি, খেয়ালই করে নি। দীপুকে দেখে শুভ্রা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো, কিন্তু ডাকবার আগেই দীপু

বেরিয়ে গেছে। জানলা দিয়ে দেখলো দীপু অনেকখানি এগিয়ে গেছে। এখন ডাকতে গেলে রীতিমতন চেঁচাতে হয়, অথবা শুভ্রা কি ঘর থেকে বেরিয়ে ওর পেছন পেছন যাবে? কি করবে কি করবে না ভাবতে ভাবতেই দীপু বেঁকে গেল গলির মোড়ে।

মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল শুভ্রার। দীপুর সঙ্গে কথা বলার এ-রকম একটা সুযোগ ছিল! ওর বাবা ধারে কাছে নেই, দীপুকে নীলাঞ্জনদার খবরটা দিয়েই চলে যেতে পারতো অপর্ণাদির সঙ্গে দেখা না করে। ইস ছি ছি! শুভ্রা একবার ভাবলো, আর অপেক্ষা না করে চলে যাবে। কিন্তু কারুকে কিছু না বলে যায়ই বা কি করে। ঘরটা খোলা থাকবে। অপর্ণাদির এতক্ষণে এসে পড়া উচিত ছিল। মেয়েকে স্কুলে পৌঁছে নিশ্চয়ই অন্য কোথাও গেছেন। ইস এত বড় বাড়ি, ফাঁকা পড়ে আছে—আর নীলাঞ্জনদাকে বউ নিয়ে থাকতে হচ্ছে ভাড়া বাড়ির একখানা ঘরে। তাও শখ করে জেলে যাওয়া চাই, বউটার তখন কি অবস্থা হবে—

যেমন ব্যস্তভাবে বেরিয়ে গিয়েছিল, তেমনই ব্যস্তভাবে আবার ঢুকলো দীপু, হাতে একটা সিগারেটের প্যাকেট। এবার সে-ই শুভ্রাকে আগে দেখেছে, শুভ্রাই তখন অন্যমনস্ক ছিল।

দীপু রীতিমতন চমকে গিয়ে বললো, আরেঃ! তুই এখানে কি কচ্ছিস? তখনই আমার মনে হলো কে যেন একজন ভদ্রমহিলা বসে আছে!

শুভ্রা দীপুর শার্টের বোতাম খোলা বুকের দিকে তাকিয়ে বললো, তুই তখন তাহলে দেখতে পেয়েছিলি? একজন ভদ্র-মহিলাকে দেখেও দাঁড়ালি না?

—ভালো করে দেখিনি। সিগারেটের দোকানে দাঁড়িয়ে ভাবলুম কে হতে পারে? যদি শান্তা হয়?

—শান্তা এ বাড়িতে আসে বুঝি?

দীপুর উচ্চারণগুলো হঠাৎ অদ্ভুত হয়ে গেল। জিভটা সোজা না থেকে বেঁকে গেল মুখের মধ্যে। জড়ানোভাবে বললো, সাধারণত আসে না, তবে যদি দৈবাৎ হয়—

—আমাকে আগে দেখতে পেলে তুই বুঝি আর ফিরে আসতিস না?

—তুই হঠাৎ এলি কেন?

—ও কি বিচ্ছিরি ভাবে কথা হচ্ছে? ভালো করে একটু কথাও বলতে পারিস না?

দীপু একগাল হাসলো। জিভ সোজা করে বললো, হয়েছে কি জানিস, কাল রাত থেকে দাঁতের ফাঁকে একটা মাছের কাঁটা ফুটে আছে। কোন্ জায়গায় যে ফুটে আছে বুঝতে পারছি না—কিন্তু জিভ দিয়ে টের পাচ্ছি।

—বেশী ব্যথা করছে?

—না, ব্যথা বেশী নয়। সুড়সুড় করছে বরং

—তা হলে থাক্, কিছু করতে হবে না। আপনিই বেরিয়ে যাবে

—বার করার জন্য আমি মোটেই চিন্তিত নই। কাঁটাটার কাছে জিভ ছোঁয়ালে একটু ব্যথা ব্যথা করছে, আবার বেশ মজার একটা ভাবও হচ্ছে! তাই বার বার জিভটা চলে যাচ্ছে ঐ জায়গায়।

শুভ্রা আর কিছু না বলে চুপ করে রইলো। মুখখানা বিষন্ন হয়ে গেছে তার। দীপু আবার হালকাভাবে বললো, তোর কখনো এরকম হয়নি? কাঁটা ফুটে আছে—কিন্তু সেটা তুলতে ইচ্ছে করছে না। খানিকটা ব্যথা, খানিকটা সুড়সুড়ি—হয়নি এ রকম?

—জানি না!

—হঠাৎ আমাদের বাড়ির বৈঠকখানায় তোকে একা বসে থাকতে দেখবো—আশাই করিনি। আমাকে কিছু বলবি?

—আমি তোর সঙ্গে দেখা করতে আসিনি! আমি এসেছি অপর্ণাদির কাছে।

—মেজদির সঙ্গে তোর কি দরকার?

—সেটা তাকেই বলবো।

দীপু এতক্ষণ দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল, এবার ঘরে এসে ঢুকলো। একেবারে শুভ্রার মুখোমুখি এসে বিসদৃশভাবে ঝুঁকে লঘু স্বরে বললো, দেখি দেখি, আজকাল রাগ করলে তোকে কিরকম দেখায়?

শুভ্রা কাতরভাবে বললো, দীপু, কেন এরকম বিচ্ছিরি ব্যবহার করছিস আমার সঙ্গে! আমি তোর কি করেছি?

—তোর মনে আছে, শুভ্রা, একদিন রাগ করে তুই আমার হাতে কামড়ে দিয়েছিলি? তোর বরাবরই বেশী রাগ।

—না, আমার কিছু মনে নেই। আমি আর মনে রাখতেও চাই না।

—রেগে গেলে এখনও তোকে পুষি বেড়ালের মতন দেখায়।

—ঠিক আছে, আমি তোর সঙ্গে জীবনে আর কখনো কথা বলবো না—তাতে তুই খুশী হবি তো?

—পুষি বেড়াল, এবার একটু হাসো তো?

—কি হচ্ছে কি? এক্ষুনি তোর বাবা এসে পড়বে। বাইরে লোকজন—

—সত্যি কথা বলছি শুভ্রা, তোকে দেখে আমার খুব ভালো লাগছে আজ। ওভদ্রমান বুঝি তোকে এখানে বসিয়ে রেখেছে? তুই আমাকে ডাকিস নি কেন?

—সাহস হয়নি।

সদর দরজা দিয়ে ঢুকে থমকে দাঁড়ালো অপর্ণা। তাকে দেখে শুভ্রা ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, অপর্ণাদি, আমি আপনার জন্যই বসে আছি।

অবাক হয়েছে অপর্ণা, কিন্তু মুখে সে ভাব দেখালো না। হেসে বললো, অনেক দিন পর দেখলাম তোমাকে। কেমন আছো?

—ভালোই আছি। এদিকে এসেছিলাম, তাই দীপুবাবু বললেন, আপনি একটু বাদেই ফিরবেন

অপর্ণা হাসতে হাসতে বললো, দীপুকে আবার আপনি বলা শুরু করলে কবে থেকে? ও তো তোমার থেকে ছোটই হবে বোধ হয় এক বছরের। তোমার দিদিদের খবর কি?

রাসমোহনও নেমে এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়েছেন। অপর্ণাকে বললেন, তুই এত দেরি করলি কেন? এই মেয়েটি তোর জন্য বসে আছে—

অপর্ণা একটু অন্যমনস্কভাবে জিজ্ঞেস করলো, শুভ্রা তোমরা তো এখনো সেই বেলগাছিয়াতেই আছো?

রাসমোহন অন্য চোখে দেখছেন এখন শুভ্রাকে। একবার দীপুর দিকে চেয়ে আবার শুভ্রার সিঁদুর মাথা সিঁথি দেখে নিলেন, তারপর প্রশ্ন করলেন, কোথায় থাকে?

শুভ্রা বিব্রত হয়ে তাড়াতাড়ি বললো, হ্যাঁ, বর্ধমানে আমার শ্বশুর বাড়ি—এখানে বেল-গাছিয়ায় বাড়ি ভাড়া করে—অপর্ণাদি আপনার সঙ্গে আমার একটা আলাদা কথা ছিল।

আলাদা কথাটা যেন লক্ষ করলো না অপর্ণা। সেইরকম অন্যমনস্কভাবেই বললো, আমার দাদার সঙ্গে এক সঙ্গেই তো থাকো তোমরা?

দীপু তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, মেজদি, ওপরে চলো না। এখানে—

কিন্তু রাসমোহন তখন ঘরে ঢুকে এসেছেন। নিজের শরীরের চেয়ে আরও লম্বা হয়ে দাঁড়িয়ে গম্ভীর গলায় শুভ্রাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা নীলুদের সঙ্গে এক সঙ্গে থাকো?

—হ্যাঁ।

—সে কথা আমায় আগে বলোনি তো!

শুভ্রার একবার মনে হলো, সে যেন চোরের দায়ে ধরা পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সে ভয় ও লজ্জা কাটাবার জন্য ভাবলো, আমার কি এসে যায়? আমি কি কিছু দোষ করেছি নাকি? মানুষের সঙ্গে মানুষ দেখা করতে আসে না? কিন্তু মাধুরী তাকে এখানে আসতে বারণ করেছিল। নীলাঞ্জনদাও শুনলে বিরক্ত হবেন। সে এসেছে নিজের ঝুঁকিতে। সাহায্য পাবার আশায় সে দীপুর মুখের দিকে একবার চকিতে তাকালো। কিন্তু দীপু মুচকি মুচকি হাসছে, তার জিভ আবার দাঁতের ফাঁকে কাঁটা খুঁজছে।

শুভ্রা আর কোনো অজুহাত খুঁজে পেল না। আর মিথ্যে কথা বানাতেও ইচ্ছে করলো না, ঝপ করে বলে ফেললো, নীলাঞ্জনদা দুদিন ধরে বাড়িতে ফেরেননি।

সবাই এক সঙ্গে বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠবে, এরকম অবশ্য শুভ্রাও আশা করেনি, কিন্তু

কারুর মুখে কোনো রেখাই ফুটবে না—এরকমও সে ভাবেনি। তিনজনেই নিঃশব্দে অবিচলিতভাবে চেয়ে রইলো শুভ্রার দিকে।

শুভ্রা আবার বললো, অন্য কিছু হয়নি অবশ্য, থানায় আটকে রাখা হয়েছে।

অপর্ণা জিজ্ঞেস করলো, কেন? থানায় ধরে নিয়ে গেছে কেন?

—একটা মিছিলে

—ও

আবার সবাই চুপ। দীপু দাঁড়িয়ে আছে জানলার কাছে, বাইরের দিকে তার চোখ। শুভ্রার দারুণ অস্বস্তি লাগতে লাগলো। নিজের দায়িত্ব নিয়ে কেনই বা সে আসতে গিয়েছিল! এখন কোনোরকমে চলে যেতে পারলেই ভালো হয়। এক পা এগিয়ে শুভ্রা ফের অপর্ণার দিকে তাকিয়ে বললো, ওঁর বউ মাধুরীর শরীরটাও ভালো নয়—

—কি হয়েছে?

—বিশেষ কিছু না, মানে, এই—

রাসমোহন এতক্ষণ বাদে বললেন, সেই কি তোমাকে এখানে পাঠিয়েছে?

—না, না—সে কিছু বলেনি।

—ও। তার বাপের বাড়ির কেউ থাকে না এখানে?

—না, ওর বাপের বাড়ি তো জব্বলপুরে—

—সেখানেই চলে যেতে বলো। নিজের স্বামীকে যখন সামলাতে পারে না

কথা বলতে বলতেই রাসমোহন বেরিয়ে গিয়ে চলে গেলেন বাড়ির মধ্যে। স্পষ্ট শোনা গেল, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে তিনি তখনও আপন মনে কথা বলছেন। রীতি-মতন চেঁচিয়ে। দীপু তখনও জানলার কাছে দাঁড়ানো। অপর্ণা শুভ্রার খুব কাছে এগিয়ে এসে নরমভাবে জিজ্ঞেস করলো, কি হয়েছে মাধুরীর? খুব অসুখ?

—না, হয়তো ওর, ইয়ে, মানে বাচ্চাটাচ্চা হবে

—ক' মাস?

—দু'তিন মাস—

অপর্ণা শুভ্রার কাঁধে একটা হাত রাখলো, বললো, আমি বুঝতে পারছি—তুমি ওদের খুব ভালোবাসো। তুমিই একটু দেখাশুনো ক'রো—দাদা ক'দিন আর জেলে থাকবে! আমি হয়তো যেতাম তোমার সঙ্গে—কিন্তু বাবা চান না আমরা কেউ ওখানে যাই। ঐ যে তুমি বললে, মাধুরী তোমাকে এখানে পাঠায়নি—তার বদলে যদি বলতে মাধুরীই তোমাকে জোর করে পাঠিয়েছে—

—কিন্তু মাধুরী তো আমাকে বারণই করেছিল—

—ঐটাই তো—ভারী জেদ, দাদা কিংবা মাধুরী যদি আর একবার বাবার কাছে এসে নরমভাবে বলতো—তাহলে কি আর বাবার রাগ বেশী দিন থাকতো?

—কিন্তু আপনার বাবা না বললেও আপনি নিজে থেকে একবারও যেতে পারেন না?

—না। দাদাকে চিনি তো, দারুণ অভিমান। অন্য সময় যাইনি, এখন অসুবিধেয় পড়েছে বলে যদি যাই—আরও এমন রাগ দেখাবে

মাঝপথে অপর্ণার কথা থামিয়ে দিয়ে শুভ্রা একটু রূঢ়ভাবে বললো, আচ্ছা, আমি আজ চলি—

—তুমি রাগ করলে?

—না, আমি রাগ করবো কেন? আমি এসব বুঝতে পারি না, এই যা।

—তুমি একটু ওর দেখা শুনো করো এই কটা দিন। যদি টাকা পয়সার কিছু

শুভ্রা ভাবলো বলে ফেলে, আচ্ছা আপনাকে আর গায়ে-পড়া উপদেশ দিতে হবে না। কত পিতৃভক্ত মেয়ে!—কিন্তু সে কথা না বলে বললো, আমি যাচ্ছি তা হলে। দীপুর দিকে তাকিয়েও বললো, চলি। দীপু মুখে কোনো উত্তর দিল না—ঘাড় নেড়ে জানালো। তখনও জিভ দিয়ে কাঁটা খুঁজছে।

ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ, ট্রাম লাইন পর্যন্ত পৌঁছুতেই শুভ্রার ঘাম বেরিয়ে গেল। অনেক দূরের মধ্যে ট্রাম বা বাসের দেখা নেই। শুভ্রার এখন খুবই বিরক্তিকর লাগছে। শুধু শুধু এতদূর আসা—। কি যে মান অভিমান আর বংশের গর্ব—মাধুরীর মতন এত ভালো মেয়েকে ওরা চিনতে পারলো না! নিজের বড় ছেলের সন্তান হতে চলেছে, বুড়োর তাতেও—

দীপু সোজা রাস্তা পেরিয়ে এসে বললো, চল্, আমিও তোর সঙ্গে যাবো।

শুভ্রা খানিকটা ঝাঁঝালোভাবে বললো, হঠাৎ ইচ্ছে হলো যে?

—বেশী বকিসনি! ট্রাম-বাসে যাবি নাকি? অত কিপ্টে কেন রে, একটা ট্যাক্সি কর না! টাকা আছে?

—ডাক ট্যাক্সি। তোর কাঁটা বেরিয়েছে?

দীপু সারা মুখ জোড়া হাসি দিয়ে বললো, এইমাত্র বেরুলো। প্রায় আধ ইঞ্চি। তবে কি জানিস, কাঁটাটা এতক্ষণ আমার শরীরের মধ্যেই তো ছিল, তাই বার করবার পর ফেলতে কি রকম মায়া হচ্ছিল। এখন আবার জিভ দিয়ে ওটাকে খুঁজে না পেয়ে কিরকম ফাঁকা ফাঁকা লাগছে।

[ক্রমশ]

শীতের রং

এবার দেখে এলাম সারা ইউরোপ কমলালেবু রং-এ মেতে উঠেছে। রাজকুমার চার্লস প্রিন্স অফ ওয়েলস হবার যে উৎসব ঐতিহাসিক দুর্গে কারনারভনের ক্যাসেলে অনুষ্ঠিত হলো, তার অঙ্গসজ্জার রং কমলা বা নারাঙ্গী। দৃশ্যপটসজ্জার ভার ছিল রাণীর ভগ্নিপতি এন্টনি আর্মস্ট্রং জোনস বা লর্ড স্নোডনের উপরে। রাণীর ছোট বোন মার্গারেট এবং তাঁর স্বামী স্নোডন চলতি চালচলনের তোয়াক্কা করেন না বলে শোনা যায়। তাই নূতনত্বের আভাস এই নারাঙ্গী রং-এও ছিল। রাজকীয় রং নয়, একেবারে বেপরোয়া চমক। দুর্গের অন্দরে যাদের দর্শন অধিকার মিলে ছিল, তা ভিন্ন বাইরে ছিল অসংখ্য আসন। অসংখ্য বলে যে অল্প পয়সায় ব্যবস্থা তা নয়। মার্কিন যাত্রীরা দলে দলে পঁচিশ ডলার করে ঐ আসনের মূল্য দিয়েছিলেন, অন্যরাও অনেকে দিয়েছিলেন, বটে। রাজকুমারের অভিষেক। বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা, আর বিশেষ স্মরণীয় আয়োজন। সবচেয়ে বড় স্মারক সাধারণ পেয়েছিল আসনের কুশন। চমৎকার নারাঙ্গী গদি, নরম তুলতুলে। Souvenir হিসাবে তুলে নিয়ে যাবার অনুমতি আছে।

কারনারভনের দুর্গের কমলা রং-এর সঙ্গে সারা পশ্চিমী দুনিয়ার কমলাপ্রীতির কোন সাক্ষাৎ যোগ আছে কিনা জানি না। পর পর দেখার দরুন আমার মনে দারুণ সংযোগ বলে লেগেছিল। যেখানে গেছি সেখানে এই রং, আমাদের বসন্ত উৎসবে পীত বা বাসন্তীর মত নয়। আমাদের রং পালটায় না। কৃষ্ণলীলার পীত আজও বৃন্দাবনের বাঁকেবিহারিণীর মন্দিরের পুরোহিতের পরনে। এমন কি সেই যে বৃন্দাবনে বাঙ্গালী রসগোল্লার দোকান আছে তার কারিগরের পর্যন্ত পীতের ছোপ অঙ্গবস্ত্রে। কাপড়ের কলে সে এক-সময়ে কাজ করেছে। পয়সাও বেশ ভালই কামাতো। সব ছেড়েছুড়ে এসেছে রাধা-রাণীর পায়ের তলায়। তাই তার উত্তরীয় পীত। পশ্চিমের বর্ণ সচেতনত্ব আলাদা। প্রত্যেক মৌসুমে নূতনত্ব না হলে কারও মন উঠবে না। ৬।৭ বছর আগে ইউরোপের ফ্যাশন বর্ণ দেখেছিলাম নীল আর গোলাপী। আকাশের মত নরম নীল আর সদ্য ফোটা গোলাপের মত কোমল গোলাপী। কোটে বলুন, স্কার্টে ব্লাউজে বলুন, সান্ধ্য সাজে বলুন, সব যেন নীল আর গোলাপী। জমকালো করতে ইচ্ছু হলে জরি আছে রূপোলী আর সোনালী। এবারে কমলালেবু রং উজ্জ্বল উজ্জ্বল। তাই জরির চমক কম।

পশ্চিমের অনুকরণে আমরা রং রাঙ্গাও চাঙ্গা চেয়েছি। দেখুন বাজারে কত নূতন রং আর কত নূতন সব তার নাম। তবু ফ্যাশন রং-এর তেমন বিস্তৃত প্রভাব এখনও আসেনি। মাঝে দেখেছিলাম কফি রং রসিক। চতুরাদের মাঝে ঠাঁই পেয়েছে। রসজ্ঞ, বিদগ্ধ সমাজ এরকম মাঝে মধ্যে অন্য রং-এর বন্যা বহাবার চেষ্টাও করেছেন। কিন্তু রং আমাদের সে বন্যায় সায় দেয়নি। ঘরে ফিরে রং চেয়েছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে নিজেকে কায়েম করতে। তাই রং-এর বাজার অফুরন্ত। বিভ্রাট বেধেছে বেছে নেবার পর্যায়ে। সেখানে সুন্দরীদের আপন আপন রুচিবোধের কঠিন পরীক্ষা। রং যেমন মাতায়, রং তেমন বিপত্তি বাধায়। নারাঙ্গী রং-এর সাজের সঙ্গে লম্বা চুলের বাহার দিয়ে মার্কিন রসিক পুরুষ আনন্দ পেলে আমাদের আসে যায় না। আমাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিজেরা বদ না দিলেই হলো।

ভারতবর্ষে মৌসুমের মত এত মনো-মুগ্ধকর মৌসুমী পরিবর্তন দুনিয়ায় আর কোথাও নেই। তাই, বেশবাসের পরিবর্তন যুগের ফ্যাশন নয়, মৌসুমী মায়া। বর্ষার মেঘ মেদুর আকাশে রাধারাণী সেজেছেন নীলাম্বরে। আজও মেঘের মায়া নীলাম্বরীতে। গ্রীষ্মের তপ্তদিনের আশ্বাস আশমানীতে। তাই বলছিলাম শীতের রং তবে কি? সেকালের কবি নিদাঘের বর্ণনা করে নায়িকার সাজ উল্লেখ করেছেন কিন্তু পীত? অথচ আজ দেখুন শীতের বাহারই যেন সবচেয়ে বেশী। শালে, সোয়েটারে, কোটে শাড়িতে সমন্বয় শীতেই দরকার। বেড়াতে যাওয়া, উৎসব আনন্দ যেন শীতেই বেশী। মোলায়েম নীল, ধূসর, কোনও রকম পাণ্ডু বা পাংশুবর্ণ শীতের কুয়াশিকায় মানায় না। বরং সাজ পোশাকের রং খুঁজবেন উজ্জ্বল ও উষ্ণ বর্ণের মাঝে। যদি পোশাক গুছিয়ে তুলতে চান তবে ব্যবহারের জন্য হাতের কাছে রাখবেন যা আপনার আলমারিতে সবচেয়ে চটকদার। তুলে রাখা পুরোনো হলে ক্ষতি নেই। আমাদের তো ফ্যাশন রোজ পালটায় না। বেমানান না হলেই হলো। তবে পশ্চিমের আজকের ফ্যাশন কমলা রং কিন্তু শীতের সাজে চমৎকার। নারাঙ্গী যেরকমই হক হালকা গাঢ়, বর্ণবৈচিত্র্যের কোমল উজ্জ্বল সবই শীতে সুন্দর। গৃহসজ্জায় ব্যবহার করুন অন্ধকারে যেন ঝলমল করে উঠবে। সেখানে সাবধান হতে হবে সমন্বয় রক্ষায়। ঘরের বাকি সজ্জায় যেন বেমানান না হয়। শক্ত নয়, শুধুমাত্র রং-এর বিরোধ বর্জন করা দরকার। লাল বা হলদেও শীতেই পরা সম্ভব। শাল বা কার্ডিগানে পান্নাসবুজ, ঘোর নীল ইত্যাদি ভাল দেখায়। সেকালের কাশ্মিরী শালের বৈশিষ্ট্য আলাদাভাবে আলোচনার বিষয়। সে ঐতিহ্য বাদ দিলে লক্ষ করে থাকবেন আজকাল কম দামী শালে কারুকার্যের চেয়ে রং-এর বাহার কত বেশী।

ঘরের পর্দা, বিছানা ঢাকনি, তোয়ালে, টেবিল ঢাকা ইত্যাদিও সম্ভব হলে দুই

সাগর বেলায় পরিধেয় প্যান্ট-শাল-এর জোড়

প্রস্থ রাখতে পারলে ভাল। শীতের অবসরে ঘোর রং আর গ্রীষ্মে বর্ষায় নরম রং বৈচিত্র্য মাত্র আনবে না, আনবে গৃহকর্ত্রীর রুচিবোধের রেশ। শুনতে মনে হবে এতে খরচ কত বেশী কিন্তু একবার মূলধন নিয়োগ করতে পারলে, আখেরে খরচ কম কারণ খুব বেশী দিন ব্যবহারের আগেই বিশ্রাম দেওয়া যাবে।

কারনারভনে যাবার পথে আলাপ হয়েছিল ইতালীর মহিলা সাংবাদিক ডাঃ এস্তার দিনাচির সঙ্গে। দরদী মহিলা। দর্শন শাস্ত্রের ডাক্তার। গত মহাযুদ্ধে প্রণয়ী প্রাণ হারানোর পর সাংবাদিকতা অবলম্বন করে কাল কাটাচ্ছেন। সহযাত্রিনীদের মধ্যে নানা দেশের মহিলা সাংবাদিক, রেডিও টেলিভিশনের কর্মী সবাই ছিলেন। অনেকেরই বয়স কম। যুগের পার্থক্যে শ্রীমতী দিনাচির শান্ত আচরণ বিশিষ্ট বলে মনে হচ্ছিল। প্রগলভাদের একজন হঠাৎ বললেন, "তুমি ইতালিনী, বলে বসো না যেন তুমি মিসেস ফিয়াট" Fiat অর্থাৎ ইতালীর ফিয়াট গাড়ি। রসিকতায় সবাই গড়িয়ে পড়লেন। ডাঃ দিনাচি আরও চুপ করে গেলেন।

এত দিন পরে হঠাৎ ডাঃ দিনাচির এক চিঠি পেলাম। সঙ্গে একখানা ছবি। সেই কারনারভনের পথে ইয়োরোপীয় আধুনিকার ফ্যাশন আলোচনা করছিলুম। তাই এক ফ্যাশন প্রদর্শনীর ছবি পাঠিয়েছেন দেশ পত্রিকার পাঠিকা মহলে পেশ করবার জন্য। দেখুন আপনাদের কেমন লাগে।

টুকিটাকি

শীতের সময় অনেকেরই, বিশেষ যাদের ত্বক সাধারণত আর্দ্রতাবিহীন, তাদের মুখের চামড়ার কোমলভাব কমে যায়। কেমন একটা টান টান ভাব বোধ হয়। মুখই দেহের সবচেয়ে বেশী অনাবৃত অংশ বলে এরকম হয়। শীতের সময় সাবান ব্যবহার যথা সম্ভব কম করবেন। যতটা করবেন গ্লিসারিন সাবান অথবা বেশী পরিমাণ স্নেহ পদার্থ বিশিষ্ট সাবান ব্যবহার করা দরকার। যাঁদের বার বার হাত মুখ ধোবার অভ্যাস তাঁরা বেসম ব্যবহার করে দেখবেন উপকার হবে।

মুখ ও গলা কোল্ডক্রীম, দুধের সর, বাদামের তেল ইত্যাদির যে কোন একটা দিয়ে দিনে একবার মালিশ করবেন। রাত্রে শোবার আগে পাউডার ইত্যাদির প্রলেপ পরিপূর্ণভাবে পরিষ্কার করে তুলে মালিশ করলে সবচেয়ে ভাল ফল হয়। মালিশে সব সময় নীচে থেকে উপরের দিকে এবং চক্রাকারে হলে সুফল হয়।

কারও কারও নাকের ডগা বেশী ফাটে। অনেক চেষ্টাতেও সে কর্কশভাব কাটানো শক্ত হয়। তাঁরা যদি তেলাক্ত জিনিসের স্পর্শমাত্র দিয়ে পাউডার ইত্যাদি ব্যবহার করেন ভাল হয়। বেশী রুক্ষ ত্বকে সমস্ত মুখে সামান্য তেলাক্ত স্পর্শের আভাসমাত্র হলে ভালই হয়। তবে আভাসমাত্রই দরকার, একটুকু বেশী হলে পাউডার বিশ্রী ভাবে জমা জমা হয়ে যায়। কোথাও উঠেও যায়।

শীতের হাওয়া শুধু যে মুখে বা দেহ-ত্বকে দারুণ রুক্ষতা আনে তা নয়, চুলেও আনে কর্কশ ভাব। আর্দ্রতা কমে যাওয়ার দরুন চুল আলগা হয় ও বিবর্ণ হয়। বার বার ব্রাশ দিয়ে জোরে জোরে চুল ও চুলের গোছা চালালে সবচেয়ে সহজে সবচেয়ে বেশী উপকার হয়। রক্ত সঞ্চালন ভাল হলে ক্লান্ত, নিস্তেজ করোটির আবরণ নূতন জীবনসঞ্চারে সতেজ হয়ে ওঠে। চুলে আনে চিক্কণ কোমলভাব।

আমাদের দেশে আগে অল্প বয়সে মেয়েদের চুল একাধিক বার কামিয়ে দেওয়া হতো। তার উপর কাঁচা ডিমের মালিশ প্রশস্ত বলে পরিগণিত ছিল। চুলের স্বাস্থ্যের জন্য কাঁচা ডিম বিশেষ উপকারী। কাল পালটেছে। কাজেই এখন egg shampoo চলছে। তবে হাতে সময় থাকলে মাথা ঘষার আগে ডিমের কুসুম ঘষে দিতে পারেন। একটা ফলপ্রদ প্রলেপ হচ্ছে কুসুম, নারকেল তেল ও ওডিকোলোনের মিশ্রণ।

একটি ডিমের কুসুমে বড় চামচের এক চামচ নারকেল তৈল ও মাঝারি চামচের এক চামচ ওডিকোলোন মিশিয়ে নেবেন। ডিমের কুসুম বেশ ক্ষিপ্রহস্তে ফেঁটে তেল মেশাবেন, না হলে দই-এর মত হয়ে যাবে। এ প্রলেপ মিশিয়েই ব্যবহার করা উচিত, রাখলে নষ্ট হয়ে যায়।

মাথায় মেখে অন্তত পনেরো মিনিট পরে মাথা ঘষবেন। বেশ ভাল করে মালিশ করে করে লাগাবেন। মাথা ঘষা চুল শুকিয়ে গেলে খুব অল্প ভ্যাসেলিন হাতে ঘষে চুলের উপর চেপে দেবেন।

শ্রীমতী

ভারতের অর্থনীতি

অর্থনীতিতে টাকার ভূমিকার পুনর্মূল্যায়ন — বাহান্নতম অর্থনৈতিক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ

বাহান্নতম নিখিল ভারত অর্থনৈতিক সম্মেলন গত সপ্তাহে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ডক্টর সত্যেন্দ্রনাথ সেন। টাকার পরিমাণ এবং মূল্যান্তরের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে যে গবেষণা অতীতেও হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে সভাপতির ভাষণে ডক্টর সেন তার উল্লেখ করেন। ফিসার (Fisher), উইকসেল (Wicksell), কেইনস (Keynes), ফ্রিডমান (Friedman) এবং এইচ জি জনসন (H. G. Johnson) প্রমুখ অর্থবিজ্ঞানীগণ টাকার সঙ্গে মূল্যান্তরের সম্পর্ক নিয়ে যেসকল তত্ত্বের অবতারণা করেছেন তার উল্লেখ করে সভাপতি তাঁর ভাষণে বলেন, এই সম্পর্কে কোন ব্যাখ্যাই এখন পর্যন্ত সর্বজনস্বীকৃত এবং সব দেশের পক্ষে একই-ভাবে প্রযোজ্য নয়। টাকার চাহিদা কি কি উপাদানের উপর নির্ভরশীল তা নিয়ে বিস্তর গবেষণা হয়েছে। মূল্যান্তর নিরূপণে সামগ্রিকভাবে টাকার চাহিদা ও টাকার যোগানের ভূমিকা যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু মূল্যান্তর নির্ধারণে কোনটিই এককভাবে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পেরেছে বলে ডক্টর সেন মনে করেন না; তাঁর মতে এ বিষয়ে এখনও আরও গবেষণার অবকাশ আছে।

সভাপতির ভাষণে একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং বিতর্কমূলক বিষয়ের অবতারণা করা হয়। তা হচ্ছে, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে মুদ্রাস্ফীতি সহায়ক কিনা। সমস্যাটি নতুন নয়; কিন্তু এই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর আজও আমরা পাইনি। অধ্যাপক সেন তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেন, মুদ্রাস্ফীতি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে কমপক্ষে তিনটি মতবাদ বিশেষভাবে চালু আছে। প্রথম মতবাদ অনুযায়ী কোন কোন অর্থবিজ্ঞানী এই ধারণা পোষণ করেন যে, কোন দেশ যদি স্বল্প সঞ্চয় ও স্বল্প উৎপাদনী শক্তির চক্র থেকে বেরিয়ে আসতে চায়, তবে কিছু পরিমাণে মুদ্রাস্ফীতির (mild dose of inflation) ব্যবস্থা থাকা দরকার, যাতে ব্যবসায়ীদের মুনাফা, বিনিয়োগ-স্পৃহা এবং উৎপাদন বাড়াবার আগ্রহ বাড়ে। যাঁরা এই যুক্তিতে বিশ্বাসী, তাঁরা দেখিয়েছেন, কোন কোন দেশে মুদ্রাস্ফীতির খারাপ প্রভাব

ডক্টর সত্যেন্দ্রনাথ সেন

দেখা গেলেও মোটের উপর দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে মুদ্রাস্ফীতি সহায়ক। দ্বিতীয় মতবাদ অনুযায়ী মুদ্রাস্ফীতি অর্থনৈতিক উন্নয়ন-প্রচেষ্টার পক্ষে অনুকূল; তবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন আরও অনেকগুলি উপাদানের উপর নির্ভরশীল, যেমন, সঞ্চয়ের প্রবণতা, উৎপাদন বৃদ্ধির প্রেরণা, উন্নততর কলাকৌশল প্রভৃতি। কিন্তু উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে কিছু পরিমাণে মুদ্রাস্ফীতিরও সৃষ্টি হয়, এই মতবাদ অনুযায়ী অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল্য হিসাবে কিছু-না-কিছু মুদ্রাস্ফীতি হবেই। এই মতবাদে বিশ্বাসী অর্থবিজ্ঞানীদের "tolerationists" আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। তৃতীয় মতবাদ অনুযায়ী বহু অর্থবিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন, মুদ্রাস্ফীতি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধাস্বরূপ;— উন্নয়ন-প্রচেষ্টার ক্ষতিকারক বলেই মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করা দরকার, এই মতবাদে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁরা হলেন "traditionalists"; তাঁরা মনে করেন, মূল্যমানের স্থিতিশীলতা বজায় না রাখতে পারলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার দ্রুত বাড়বে না।

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, মুদ্রাস্ফীতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে সঠিক কী সম্পর্ক সে বিষয়ে সব দেশের পক্ষেই এক-জাতীয় তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব নয়; কোন কোন দেশে মুদ্রাস্ফীতির মধ্যেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার দ্রুততর হয়েছে; আবার কোন কোন দেশে যখন মুদ্রাস্ফীতির তীব্রতা বেড়েছে, তখন অর্থনৈতিক উন্নয়নের হারও কমের দিকে গেছে। ডক্টর সেনের মতে, আসল কথা হচ্ছে, মুদ্রাস্ফীতির স্বরূপ সব দেশেই এক প্রকার নয়; আবার সব দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো বা আর্থিক সঙ্গতিও এক প্রকার নয়। তাই এ বিষয়ে আরও গবেষণা না করে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছবার চেষ্টা করা উচিত হবে না। ১৯০০ সাল থেকে শুরু করে ১৯৪৯-৫০ সাল পর্যন্ত ভারতে উন্নয়ন হার এবং মুদ্রাস্ফীতির হার পর্যালোচনা করে তিনি দেখান যে, মুদ্রাস্ফীতি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে প্রতিবন্ধক এ ধরনের যুক্তি গ্রহণযোগ্য হয়নি; অথচ ১৯৪৯-৫০ সালের পর অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। মূল্যান্তরের স্থিতিশীলতার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন (Growth with stability) সর্বদাই কাম্য এ কথা উল্লেখ করে সম্মেলনের সভাপতি তাঁর ভাষণে বলেন, দেশের সঞ্চয় বাড়িয়ে এবং বর্ধিত সঞ্চয়ের সদ্ব্যবহার করে যদি বিনিয়োগ বাড়ানো যায় এবং নতুন মুদ্রা সৃষ্টি না করে যদি উন্নয়ন-প্রচেষ্টা চালানো সম্ভব হয়, তবে মুদ্রাস্ফীতি বর্জন করেই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন দ্রুত অর্জন করা সম্ভব। কিন্তু যখন আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের পরিমাণ প্রয়োজনের চেয়ে অনেক কম হয়, তখনই সরকারকে নতুন টাকা ছাপতে হয়। এই অর্থনৈতিক উন্নয়নের অর্থসংস্থানের জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতি অপরি-

ব্যর্থ হয়ে পড়ে। কিন্তু সভাপতির ভাষণে একবারও উল্লেখ করা হয় যে, কোন কোন অর্থবিজ্ঞানী (যাঁদের আমরা 'Structuralists' বলতে পারি, যেমন ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলিতে দেখা গেছে) মনে করেন, স্বল্প পরিমাণে রপ্তানি বৃদ্ধির হার এবং তার ফলে আমদানি করার সীমায়িত ক্ষমতা দেশের মূল্য-কাঠামোর উপর প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করতে পারে সে ক্ষেত্রে শুধু টাকার পরিমাণ কমিয়েই মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় না। কারণ, এ জাতীয় মুদ্রাস্ফীতির প্রধান কারণ দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোগত ত্রুটি-বিচ্যুতি (bottlenecks)।

ডক্টর সেন তাঁর ভাষণে বলেন, আয় ও ধনের বৈষম্যের কারণ হিসেবে বিভিন্ন দীর্ঘকালীন উপাদানগুলিকে উপেক্ষা করে শুধু মুদ্রাস্ফীতির নীতির উপরেই সব দোষ চাপানো যুক্তিযুক্ত কিনা সে বিষয়েও গবেষণা করা দরকার। মুদ্রাস্ফীতি হয়ত স্বল্পকালীন কারণ হিসাবে ধনী ও গরীবের মধ্যে পার্থক্য বাড়াতে পারে; কিন্তু এই অভিযোগ সম্পর্কেও আরও গবেষণা চালানো দরকার। আয় ও ধনের বৈষম্য অনেকগুলি উপাদানের দরুন হতে পারে। পরিকল্পনায় ভুলের জন্য এবং ঠিকভাবে পরিকল্পনা কার্যকর করার ক্ষেত্রে ব্যর্থতার জন্য (যেমনটি ভারতে হয়েছে) অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে; মূল্যক্ষেত্রও ঠিক তেমনি ভারসাম্য হারাতে পারে। যাঁরা বড়লোক তাঁদের বর্ধিত আয় যদি শুধু অনুৎপাদনমূলক বিলাস-সামগ্রী ক্রয়েই খরচ করা হয়, তবে তার পরিণতি হিসাবে জিনিসপত্রের দাম নিশ্চয়ই বাড়বে এবং গরীবদের তার খেসারত দিতে হবে। কিন্তু এ ধরনের অনুৎপাদনমূলক ভোগজনিত ব্যয় বন্ধ করার দায়িত্ব সরকারের রাজস্ব-বিষয়ক কর্তৃপক্ষের। সরকারের আয়-ব্যয় নীতি যদি ভ্রান্ত পথে চালিত হয়, তবে আয়ের বৈষম্য বাড়বে; এই বৈষম্যের মূলে কারণ মুদ্রাস্ফীতি কিনা সে সম্পর্কে গবেষণা চালাবার এখনও যথেষ্ট অবকাশ আছে বলে ডক্টর সেন অভিমত প্রকাশ করেন। যাঁরা মনে করেন, স্থিতিশীলতার সঙ্গে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন-প্রচেষ্টা চালানো উচিত, কিভাবে যে তা সম্ভব হবে সে সম্পর্কে তাঁরা এখনও সঠিক কর্মপন্থা দিতে পারেননি বলে তিনি অভিযোগ করেন।

বাহান্নতম নিখিল ভারত অর্থনৈতিক সম্মেলনের সভাপতির মননশীল এবং মৌলিক ভাষণ সম্মেলনে সমবেত প্রতিনিধিগণকে মুগ্ধ করে। সভাপতির ভাষণ ছাড়া সম্মেলনের আকর্ষণীয় বস্তু ছিল বিভিন্ন আলোচনা-চক্র। আন্তর্জাতিক মুদ্রা ব্যবস্থায় সাম্প্রতিক কালের সংকট এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা ব্যবস্থা (International Monetary System) নিয়ে আলোচনা-চক্রে সভাপতিত্ব করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অলক ঘোষ। সুষম আঞ্চলিক উন্নয়ন (Balanced Regional Development) সম্পর্কে আলোচনা-চক্রে সভাপতিত্ব করেন পুনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পি এন মাথুর। শ্রম-বহুল অর্থনীতিতে কর্মসংস্থান তত্ত্ব (Employment Theory in a Labour-surplus Economy) সম্পর্কিত আলোচনা-চক্রে সভাপতিত্ব করেন চণ্ডীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রঙ্গনেকার। ভারতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির আংশিক জাতীয়করণ সম্পর্কে আলোচনা করেন বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পি আর ব্রহ্মানন্দ।
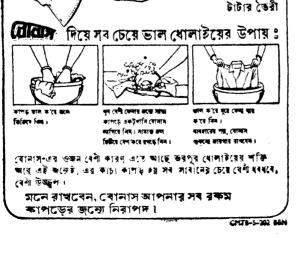
সুব্রত গুপ্ত

কত-না লিখেছি গল্প—বানানো সব গল্প। বানানো? সত্যি বানানো?... কোনোটায় অবশ্য দেখবেন পাত্রপাত্রী বাস্তবের, বিষয়টা কাল্পনিক; কোনোটায় আবার কাহিনী সত্য, বদলেছি শুধু কুশী-লবের নাম—মানহানির মোকদ্দমার আশঙ্কায়।

আজ কিন্তু লুকোচুরির পালা শেষ; পাপুর কথা এবার লিখতে চাই।

পাপুর দিদি

পাপুদের ঠিকানা জানি, পাপুদের বাড়িতে যাই, পাপুর দিদির সঙ্গে আমার ভাব। নাম তার সুস্মিতা, সবাই ডাকে বুনু বলে; পড়ে সে নিবেদিতা স্কুলে, দশম শ্রেণীতে।

হ্যাঁ, বুনুর প্রতি আমার পক্ষপাত। ওস্তাদের বাড়িতে সেতার শিখত সে; ঘরে ফিরে বাজাত ইমন, বাজাত বেহাগ আর দেশ—সঙ্গতে শ্রীপাপু। তবলা পাপু নিজেই শিখেছিল, মায়ের কাছে চেয়েছিল বঙ্গো, কেনার সময় হল না: "সময়ের বড় অভাব, ভাই..."

পাপু টুইস্ট করত, ঠিক সাহেবের বাচ্চার মতো টুইস্ট করত; মা রাগ করার ভান করতেন, মুচকি হাসি হেসে। পাপু গান করত—বাংলা গান, হিন্দী গান, সাউন্ড অব মুাজিক-এর গান।

একদিন বাড়ি হল পাপু-হীন। পাপু-হীন বাড়ি হল গান-ছাড়া। বুনুর সেতার পড়ে আছে আজ, সেতারের তার গিয়েছে ছিঁড়ে, জমেছে ধুলোর স্তূপ...। বকেছি বুনুকে [আর বকেছি বুনুর বাবা-মাকে], বলেছি: "কাল থেকে বাজাবে, বুঝলে?"

বুনু বলল, বুঝেছে, কাল থেকে বাজাবে।

পাপুর প্রদর্শনী

বুনু সেদিন আমাকে দেখাল এক খাতা—হালখাতার মতো বড় এক খাতা, পাপুর ছবির প্রদর্শনীর খাতা, আগন্তুকদের স্বাক্ষরে-মন্তব্যে ভরা। পাতা উল্টে দেখলাম, নিজের নাম ও ঠিকানার পাশে কেউ লিখেছে "সুন্দর", কেউ লিখেছে "চমৎকার"। পাতায় পাতায় বিশেষণের ফুলঝুরি: অপূর্ব, আশ্চর্য, বিস্ময়কর, বর্ণনাতীত, অসাধারণ, অবিস্মরণীয়...। কোন এক সাহেব শুধু লিখেছে: different।

একজনের মতে "আমাদের পাপু নীল আর্মস্ট্রং-এর আগে চাঁদে চলে গেছে; বলেছে, আর ফিরব না।" অন্য একজন কিন্তু মনে করে, পাপু ফিরবে: "আমি অপেক্ষায় আছি—সে আবার আসবে ছবি আঁকবে।" আর-এক জন্মান্তরবাদী দর্শকের বিশ্বাস: "নিশ্চয়ই কোনো নাম-করার মতো শিল্পী পুনরায় মাত্র কয়েক দিনের জন্য "পাপু" নামে ফিরে এসেছিলেন।"

তিক্ত মন্তব্য মাত্র এই একটি: "পাপুর ছবি দেখে একটি কথাই মনে হচ্ছে যে ভগবানের কোনো বিচার নেই"; আমার নিজের ধারনা উল্টো: ভগবান খাঁটি জিনিসটিই বুঝে নিয়েছেন।

কিছু কিছু বাংলা পদ্য চোখে পড়েছে: "মস্তিষ্ক আমার কিন্তু/কিছু কিছু বাঁকা/তাইতো বুঝি না সব/পাপুর আঁকা/তবু যদি লিখতে হয়/কি যে আমি লিখি/পাপুর কাছেতে যেন/কিছু কিছু শিখি।" আর আছে ইংরেজ গদ্য: I have become surprised how a boy ইত্যাদি...

পাপু

কেউ লিখেছে : "কি আর বলব ?" কেউ লিখেছে : "মুগ্ধ চোখে বাড়ি ফিরছি!" বাচ্চাদের বড় বড় অক্ষরে লেখা বক্তব্যও আছে : "খুব ভালো লেগেছে" কিংবা "পাপু দাদা আমি এসেছি।"

সাধারণ ছেলে

বীরপুজো আমরা চাই না, শিশুপুজোও না। পাপু ছিল সাধারণ মধ্যবিত্ত শিক্ষিত পরিবারের এক সাধারণ সন্তান : চিন্তা করত, কল্পনা করত আর পাঁচটি শিশুর মতো—তবে হ্যাঁ, যা চিন্তা ও কল্পনা করত, তা লেখার কলমে ও আঁকার পেন্সিলে সে প্রকাশ করতে জানত, ভালোবাসত।

পাপু ছিল লাজুক : তার ছবি দেখাত না সমবয়সী কোনো বন্ধুকে; অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য ওর মা যখন ওর খাতার কবিতা পড়ে শোনাতেন, ঘর থেকে সে পালিয়ে যেত।

আঁকত, লিখত, তবু স্কুলের পরীক্ষার, পাঠ্যবিষয়ে তেমন উজ্জ্বলতা সে দেখায় নি। ওর "পাঠোন্নতির বিবরণ" দেখে বাংলা দেশের শিশুরা সান্ত্বনা পাবে : তৃতীয় শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় সে পেয়েছিল

টিতে সে ৮৮, ইংরেজিতে ৬৮' স্বাস্থ্যবিদ্যা ও সাধারণ জ্ঞানে ৫৬; গণিতে ৪২; ভূগোল ও বিজ্ঞানে ৩০। আর বাংলা? বাংলায় ৬২-র বেশি সে পায়নি [বানান ভুল করত: দিপক, রাত্রী, বানো, গরু...]। আর চিত্রাঙ্কনে? চিত্রাঙ্কনে ৫৬ ["বাঁটি আঁকতে দিয়েছে, ছি !..."]। তবে ওর বাবামাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল: "ফেল আমি করব না।"

শিল্পী পাপু

পাপু ছিল লেখক, ছিল শিল্পী—বোধ হয় প্রধানতই শিল্পী। ওর লেখা পড়ে বিশেষজ্ঞরা বলে উঠবেন, "আট বছরের ছেলের এত পাকা লেখা!" ছবি দেখে শুধু বলবেন, "কি সুন্দর!" আট বছরের কথাটা বাদ দিয়ে।

শিল্পই বোধ হয় বাচ্চাদের আত্মপ্রকাশের যথার্থ বাহন: শিশুশিল্প কায়দা-কৌশল-নিরপেক্ষ অনুপ্রেরণার মুক্তাঙ্গন—শুধু চাই পেন্সিল আর রং, তুলি আর কাগজ। সাহিত্যক্ষেত্রে কিন্তু প্রয়োজন আছে টেকনিকের: ব্যাকরণ চাই, চাই শব্দ-ভাণ্ডার।

পাপু আঁকত খুব—আঁকত দেওয়ালে, আঁকত আলমারির গায়ে, আঁকত জানালার কাচে। আঁকত স্কেচ, আঁকত অংকের খাতায় কালীমার ছবি, আঁকত পোস্টার। প্যাডের কাগজে নারকোল তেল বুলিয়ে তার উপর ছবি এঁকে বলত: অয়েল-পেইন্টিং। লেখায় শুধু থাকতে পারত ধৈর্যের অভাব, তার সব কটা ছবি কিন্তু শেষ না করে সে ছাড়ে নি।

পাপু আবার ছিল ভাস্কর: মূর্তি খোদাই করে তার গায়ে কাঠকয়লা আর ইঁট গুঁড়ো লেপে দিত। মা বলতেন, "রঙ দেবে না?" উত্তর আসত: "অজন্তা-ইলোরার সময় কেনা-রঙ ছিল বুঝি?"

পাপুর বই

পুজোর সন্দেশ-এ পৃষ্ঠপোষকদের তালিকায় নিজের নাম দেখে পাপু মজা পেয়েছিল খুব; আজ সেই নাম সবাই চেনে "পাপুর বই" কিনেছে পাঁচ হাজার কৌতূহলী পাঠক, পাঁচ টাকা দাম দিয়ে।

অনুবাদের নাকি কথা হচ্ছে—বিদেশে। কিন্তু হায়! আট বছরের বাচ্চার লেখার অনুবাদ করবে কে? কার আছে অধিকার, ক্ষমতা কার আছে, আট বছরের আর এক বাচ্চার ছাড়া? আর বলুন দেখি "জলের আতঙ্ক...জেনারেল ফ্রাঙ্কো"-র য়ুরোপীয় অনুবাদ? ফ্রাঙ্কো-কে আমি করতাম চানকাই-চেক। আর মিল?...হ্যাঁ, সে এক সমস্যা বটে, মিল কি রাখবেন বলুন? I cheek, black cheek ধরনের কিছু?

"পাপুর বইয়ের আসল নাম ছিল "কবিতা লেখবার খাতা"। ওর যাবতীয় লেখায় সে কাকাকে দিয়ে সই করাত, নিজেও মাঝে মাঝে রচনার শেষে লিখত "[রচয়িতা] [শ্রী] সুব্রত সরকার"। মা ওকে বলেছিলেন তারিখ দিতে: "বড় হলে, পড়বে যখন, মজা পাবে!"

লেখাগুলোর শীর্ষ নাম নিয়ে পাপু ভাবত খুব; 'রাজবাড়ির' প্রথম নাম ছিল 'গোলমাল', 'ভয় দেখানো ভয়ানক'-এর আদি নাম ছিল 'স্বপ্ন', প্রথম নামান্তর 'শ্মশানে এক রাত্রি।' কোনো কোনো পাতায় শুধু আছে টাইটেল: পরীক্ষার পরে, জমিদার; সারা পৃথিবী। 'দীপু ও টমির কীর্তি'র আছে পাঁচটি লাইন; 'বাজার'-এর আছে পাঁচটি শব্দ ['প্রতিদিন সকালে যেতে হয় বাজারে...'], 'ছানা' ও 'বাবার মতো'-য় শব্দ সংখ্যা মাত্র দুটি। 'আকাশে ওড়া' কবিতাটির প্রথম আখ্যা ছিল গল্প। আর খুচরো কাগজে কালিতে লেখা সেই 'ক্লাসিক' গল্পকে পাপু প্রথমে ভেবেছিল নাটক নামই দেবে।

পাপুর কবিতা

পাপু যে আঠারটি কবিতা লিখেছে তার একটিও অসমাপ্ত নয়। আর 'পুজো'?... পুজো তো কবিতা-ই নয়, পাপু নিজে ওই দুটি লাইন কেটে দিয়েছিল।

পাপু জমাত মিল, বাচ্চারা যেমন জমায় স্ট্যাম্প: হাসি খাসি, মাথায় তাকায় গাছপালা রাজবালা। ওর প্রকাশিত কবিতায় সে মিলিয়েছে হাহাকার জলাকার, চাকর-বাকর পোকা মাকড়...। তার শেষ রচনাটি আবার ইংরাজি মিল নিয়ে খেলা: us bus; big pig; red, dead; most, post......

'ভয়' কবিতাতে "দেখল সে দূরে/সারা গায়ে সাদা চাদর মুড়ে" লাইন দুটির পরে ওর জেঠু লাল কালিতে যোগ দিয়েছিল "কে যেন দাঁড়িয়ে"। সংশোধনটা মনোনীত হল না, কেটে দিল কবি পাপু নিঃসংশয়ে।

খেলার সঙ্গী ছিল অনেক [এক গল্পে বাইশজনের নাম সে দিয়েছে দুটো তালিকায় —যেন এগারোজন খেলোয়াড়ের দুটো টীম] লেখার সঙ্গী ছিলেন একমাত্র তার মা। শুধু তাঁরই পরামর্শে কবিতা সে বদলাতে প্রস্তুত ছিল। একদিন রেডিওতে বাজছে শ্যামা-সংগীত, গুনগুন করে মা-ও গান করছেন। পাপু হঠাৎ বলল, "দেখি তোমার জন্য একটা কবিতা লিখি..." লিখতে বসল: "হে মা কালী...মা, তোর পায়ে পড়ি/তোর সঙ্গে নে আমাকে/তোরই সঙ্গে খেলা করি।" শেষ পংক্তিটি মায়ের পছন্দ হল না—একান্ত অসাহিত্যিক কারণে। পাপু তাই নতুন করে লাইনটি লিখল: "তোরই স্মরণ পুজো করি।"

আমার ভালো লাগে "সেদিন ময়দানে হল গরুদের মিটিং...গরুদের সভাপতি ডঃ মহেশ...কলকাতার অবস্থা দেখে এলেন ধর্মবীর..." কবিতাটা টুকছিলাম কি জানি কার কিংবা কিসের জন্য: "কেউ চলেছে সাইকেলে/কেউ চলেছে বোম্বে মেলে..." আমার [বিদেশী অবশ্য] কানে যেন ছন্দপতন ঠেকেছে/পাণ্ডুলিপি দেখে বুঝলাম: পাপু আসলে লিখেছিল "কেউ চলে বোম্বে মেলে।"

মাঝে মাঝে ছন্দ ব্যবহার চমকে দেয়। শুনুন নিষ্কলঙ্ক মুক্তক পয়ার: "রবিবার আসিবে কখন/তারই অপেক্ষায় আমি আছি/ভগবান, রবিবার দাও কাছাকাছি।" কখনো আভাস মেলে স্বরবৃত্তের: "ভয় পায় যারা/ভীষণ বোকা তারা/যেমন/তোমরা শুনবে কেমন?" তৃপ্তি দেয় মিলের খেলার সুস্বাদ ছেলেমানুষি: "ডাকা কল/পুতুল ডল/বই বুক/বাঘ ইংরেজি জানি না, কি করে দেখাব মুখ?" [বাঘ-এর ইংরেজি অবশ্য সে জানত, পংক্তিটির প্রয়োজন হয়েছিল বৈশিষ্ট্যের তাগিদে]।

আর 'বাবা ও সকাল'-এর টুকরো টুকরো কথোপকথনে আঁকা মধ্যবিত্ত বাঙালী ফ্ল্যাটের সেই বাস্তবনিষ্ঠ ছবি: "আটটায় সময় উঠেছিলাম, ভাই/উঠিয়া দেখি কলতলাটি বন্ধ/কি, বিপদ বলিলাম চেঁচাইয়া/কি হইল, বলিল দিদি/বলিল দাদা, কলতলায় যাইব/দিদি বলিল, ও বাদবদা/বাদবদা বলিল কি?/দিদি বলিল, বেরোন..." অফিসযাত্রী বাবার প্রতি কটাক্ষও আছে একটু: বাথরুমে ঢুকে বাবা "এক ঘণ্টা পরে বাহির হইল...কাগজ আসিয়াছে?" বলিয়া আর এক হুংকার...মা খাইতে দিল/খাইয়া বাবু অফিস চলিল।"

আমার ফেভারিট্ কবিতা কিন্তু 'দু ধারে' "দু ধারে জল, মধ্যিখানে স্থল...দু ধারে নাম, মধ্যিখানে বাড়ির থাম...দু ধারে, দুজন, মা আর বাপু, মধ্যিখানে আমি মহারাজ পাপু।" এই 'দু ধারে'-ই পাপুর জীবৎকালে প্রকাশিত একমাত্র রচনা।

পাপুর গদ্য

আমি অবশ্য পদ্য বুঝি না, বুঝি গদ্য। পাপুর এমন এমন লাইন আছে, আমার [বিদেশী অবশ্য] কানকে যা তৃপ্ত করে: "ভয় কাকে বলে তখন আমি জানতাম না, শুধু জানতাম ভূত বলে কিছু নেই" কিংবা "আজ মা-মণির বন্ধু নীলিমাদের জন্মদিন" [শিল্পী পাপু যেন দুর্ব্বর্ণের রঙ নিয়ে খেলছে] কিংবা "মন্টুর সাজা"-র "প্রত্যেক দিনের মতো মন্টু...[লেখাটা আর এগোয় না।]

শুনুন এবার অপ্রকাশিত 'একদিন রাত্রে'-র প্রথম লাইন: "দিনটা ছিল বুধবার, রাত্রি তখন নটা, এমন সময় বাড়ির বাইরে গেটে..." উল্লিখিত বুধবারে কি ঘটেছিল? পাপুর এক জেঠার কাছে প্রেরিত চিঠিতে জানা যায়: "আমাদের পার্কে একটি লোক গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে, কাজটা সে ভালো করে নি..."

পাপুর নাটক

প্রথম ও একমাত্র "একাঙ্ক নাটক" ['নাটিকা',

'পরিচয়-লিপি' 'আদালত' প্রভৃতি প্রক্ষিপ্ত সংযোজনের জন্য পান্ডুলিপির বিশেষ স্বাদটা কিছুটা লুপ্ত]। সংলাপের প্রথম লাইনগুলি সার্থক বলতে হবে : "ভদ্রভাবে পথ চলতে পারেন না বুঝি?...ভিড়ে আর কত ভদ্রতা করব?...নাইট ইন ইন্ডিয়া বইটার দাম কত?"

পাপ্পুর এক অসমাপ্ত নাটক অপ্রকাশিত : 'লাল কাপড়'—ইদানীং আবিষ্কৃত হয়েছে তার দিদির "ইংলিশ খাতার" পাতায় :

মিন্টু : মানু, তুই কালকে স্কুলে পড়া পারেস নি. তোর মাকে ব'লে দেব।

মানু : না ভাই. বলিস না. লক্ষ্মীটি তোকে আইসক্রীম খাওয়াব।

মিন্টু : তোর বাবার ব্যাগ থেকে পয়সা চুরি করে?

মানু : না।

মিন্টু : তোর আবার পয়সা আছে না কি যে খাওয়াবি?

আমাদের আশা

'কবিতা লেখবার খাতার' সম্পূর্ণ ও অসংশোধিত সংস্করণের উৎসুক প্রত্যাশায় রইলাম।
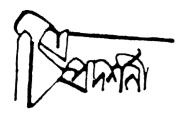
নৌকা —অমলেশ ঘোষ

শিল্পী দীপক ব্যানার্জি বিড়লা অ্যাকাডেমিতে একটি গ্রাফিক প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। গ্রাফিক শিল্পী হিসাবে শিল্পজগতে দীপক ব্যানার্জি সুনাম অর্জন করেছেন। ইতিপূর্বে তিনি ললিতকলা অ্যাকাডেমির জাতীয় পুরস্কার লাভ করেন ও দেশে ও বিদেশে নানা প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করে প্রশংসা অর্জন করেন। বর্তমানে তিনি বারাণসী বিশ্ব-

ফর্ম—৩ —দীপক ব্যানার্জি
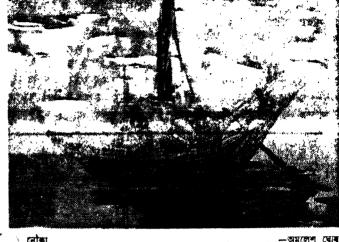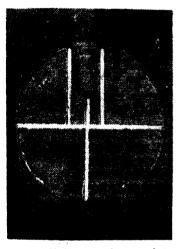
বিদ্যালয়ের কলা বিভাগে অধ্যাপক হিসাবে কাজ করছেন। প্রদর্শনীতে এচিং, উডকাট, কোলাজ ও প্লাস্টার খোদাইয়ের ৫০টি নিদর্শন দেখা যায়।

প্লেটের ওপর নানা সূক্ষ্ম খোদাই কাজের মধ্য দিয়ে শিল্পীর সচেতন মন ও বিমূর্ত রচনা সৃষ্টি করার ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষ করে বিভিন্ন স্থলে ও সূক্ষ্মতম খোদাই কাজ ও নানা রঙের মায়াজালের ভিতর দিয়ে প্রায় প্রত্যেক প্রিণ্টেই যেন ইমেজারির সৃষ্টি করেছেন। অনেক স্থলে গভীর ক্ষত (deep biting) সৃষ্টি করে ও সেটিকে বিশেষ কোনও রঙে প্রিণ্ট করে তিনি বিচিত্র রঙজালের আবরণ তৈরি করেছেন। সুতরাং বলা বাহুল্য যে, প্রিণ্টগুলি একান্তই অনুভূতিশীল। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই একটি জুর-এর মত আকারবিশিষ্ট ১৫নং প্রিণ্টের নাম করা যায়। এটির সূক্ষ্ম রেখা খোদাই কাজ লক্ষণীয়। চারটি প্যানেলে বিভক্ত লাল রঙ প্রধান লম্বমান ও সমান্তরালভাবে রচিত ২৯নং প্রিণ্টও সকলের চোখে পড়ে যায়। কয়েক ক্ষেত্রে শিল্পী সহজ ও সরল আকার অবলম্বন করে রসসঞ্চার করার চেষ্টা করেছেন—যেমন ফর্ম-৩। একটি বৃত্তের ওপর চারটি সরল রেখা বিভিন্নভাবে স্থাপন করে তিনি সুন্দর বিমূর্ত আকার সৃষ্টি করেছেন এবং বৃত্তমধ্যস্থিত প্লেটের অংশ ও কারুকার্যের প্রিণ্ট লাল রঙে নিয়ে সমকালীন অভিযানলব্ধ চন্দ্রবক্ষের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলেছেন। অতি সূক্ষ্ম রেখা-খোদাইয়ের মায়াজাল হিসাবে ৩৪নং প্রিণ্টও অনেকের চোখে পড়ে। কোলাজ নিদর্শন হিসাবে ৪৩নং-এ সুসংবদ্ধ কমপোজিশনের পরিচয় পাওয়া যায়। শিল্পীর প্লাস্টার খোদাই কাজের নিদর্শনগুলিতে নতুনত্ব আছে। এগুলি পরীক্ষামূলক বলেই মনে হয়, তা হলেও সুন্দর কমপোজিশন হিসাবে ৪৩ ও ৪৫নং প্রশংসা দাবি করতে পারে। উডকাটের নিদর্শন হিসাবে ৪৮নং প্রিণ্ট উল্লেখযোগ্য।

*

শিল্পী রাখাল দাস চৌরঙ্গীর মোড়ে এক পথপ্রদর্শনীর আয়োজন করেন। ইতিপূর্বে শহরের এই স্থানে ও অন্য গ্যালারীতে প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করে শিল্পী অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তবে এবারের প্রদর্শনীর বিষয়বস্তু সমকালীন। দেশের সমসাময়িক রাজনৈতিক অবস্থা ও নানা রাজনীতিক দল ও মতবাদকে তিনি ব্যঙ্গ করেছেন ও সেগুলি কয়েকটি প্যাস্টেলে আঁকা ছবির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। বলা বাহুল্য, ছবিগুলি কার্টুনাত্মক সুতরাং সে হিসাবে শিল্পীর ছবিগুলি অনেকের মনে কৌতূহলের উদ্রেক করে।

*

শিল্পী অমলেশ ঘোষ অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে তার প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। শিল্পী ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজে শিক্ষা শেষ করেন ও বর্তমানে ভারতীয় কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে শিল্পী হিসাবে কাজ করেন। প্যাস্টেলে আঁকা কয়েকটি ছবি দেখা যায়—সেই সঙ্গেই পেনসিল স্কেচও ছিল।

শিল্পী তরুণ। দৃশ্যমান জগতের যা কিছু তিনি দেখেছেন বা যা তাঁর ভাল লেগেছে তাই তিনি এঁকে গেছেন। শিল্পীর অঙ্কনরীতি আধুনিক, বিশেষ করে রঙ নির্বাচন বিষয়ে তিনি সচেতন। লাল ও হলুদ রঙ তিনি অবলীলাক্রমে ব্যবহার করে কয়েকটি ছবি যেন রঙে ডুবিয়ে দিয়েছেন—যেমন এ চার্মিং আফটারনুন ও মাই বিলাভেড ট্রী। সমান্তরালভাবে দীর্ঘ কয়েকটি ড্রাই ব্রাশ টানে শিল্পী কয়েকস্থলে আশানুরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। উদাহরণ হিসাবে শালকুঞ্জর নাম করা যায়। স্টাডির দিক থেকে নৌকা মন্দ নয়। তবে কয়েকটিতে শিল্পীর অস্পষ্টভাব বিশেষভাবে ধরা পড়ে, যেমন, ফিশিং-এ। শিল্পী বিমূর্ত জাতীয় দু একটি ছবি আঁকার চেষ্টা করেছেন, তবে দেখে বোঝা যায় যে সেগুলি নিছক পরীক্ষামূলক। শিল্পীর ন্যুড স্টাডি প্রশংসাযোগ্য।

*

ট্রামজিজম-এর পক্ষ থেকে বিড়লা অ্যাকাডেমিতে বাংলাদেশের সমকালীন শিল্পীদের এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। কর্তৃপক্ষের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল :

দিল্লীর শিল্পিমহলের সঙ্গে বাংলার শিল্পী দলের পরিচয় সাধন করা। দিল্লীতে প্রদর্শনীটি উদ্বোধন করার পূর্বে তাই মাত্র ৩।৪ দিনের জন্য এটি কলকাতায় আয়োজিত হয়। কর্তৃপক্ষের সাদর নিমন্ত্রণ সত্ত্বেও, দুঃখের বিষয়, অসুস্থতানিবন্ধন প্রদর্শনীটি দেখার সুযোগ হয়নি—সেজন্য ত্রুটি স্বীকার করি। তবে প্রদর্শনীভুক্ত শিল্পিবৃন্দের তালিকা ও যোগদানকারী কয়েকজন শিল্পীর অভিমত থেকে জানা যায় যে, কর্তৃপক্ষের শিল্পী তথা ছবি নির্বাচন পদ্ধতি সমীচীন হয়েছে। সমকালীন শিল্পীদের মধ্যে প্রায় সকলেই প্রদর্শনীতে যোগদান করেন ও বিশেষ করে এই প্রসঙ্গে সত্যেন ঘোষাল, নীরদ মজুমদার, সুনীল দাশ, গণেশ হালুই, সুনীলমাধব সেন, সুবেল পাল, মহিম রুদ্র, প্রকাশ কর্মকার, নির্মল দত্ত, রথীন মৈত্র, কুণাল কর ও অমিতাভ ব্যানার্জি'র নাম উল্লেখযোগ্য। বলা বাহুল্য, সুনির্বাচন পদ্ধতি দেখে বোঝা যায় যে, কর্তৃপক্ষের প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

চিত্রপ্রিয়

"আপনার কোচের চাকরীটা গেল।"

প্রশ্ন করলাম : "আমার অপরাধ?"

ভদ্রলোক বললেন, "ফুটবলারদের দিয়ে ডাম্বেল টানাতে দেখে আমাদের সেক্রেটারী ক্ষেপেছিলেন। 'ওতে নাকি ফুটবলার স্লো হয়ে যায়।'"

তখন বললাম : "গত মহাযুদ্ধের পর থেকে স্পোর্টস বিশেষজ্ঞদের গভীর পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে আজ খেলাধুলোয় শুধু যে নিত্য নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে তাই নয়, সেই সঙ্গে অনেক পুরোন ধারনাও বাতিল হয়ে গেছে। যেমন ধরুন, ভারী জিনিস নিয়ে ব্যায়াম অর্থাৎ 'ওয়েট ট্রেনিং সম্পর্কে' গত দু দশক আগেও বলা হত—এতে 'মাসল বাউন্ড' হয়ে শরীর তার গতি এবং চটপটে ভাব হারায়। তাই স্প্রিন্টার, হাইজাম্পার বা ফুটবলারদেরও শরীর হালকা রাখতে বলা হত। কিন্তু আজ প্রমাণ হয়েছে এ ভুল। কেননা তীব্রগতিতে দৌড়নর বা উঁচুতে লাফানর প্রধান প্রতিবন্ধকতা মাধ্যাকর্ষণ ও হাওয়া। এ দুটোকে কাটাতে হলে শরীরের যে অতিরিক্ত শক্তিটুকুর দরকার তা জোগাতে পারে দেহের বিশেষ কতগুলো পেশী..."

ভদ্রলোক মাঝ পথে আমায় থামিয়ে দিয়ে বললেন: "আপনার এ কথায় কেমন একটু ধোঁকা লাগছে। গত বছর টালা পার্কে কোনো এক 'বডি বিল্ডার্স' ক্লাবের সদস্যদের ভেতর এক ফুটবল ম্যাচ দেখেছিলাম। প্রায় সকলের পেশীবহুল স্বাস্থ্য দেখে গোড়ায় ভেবেছিলাম খেলাটা জমবে। কিন্তু পাঁচ মিনিট খেলা দেখেই হতাশ হলাম। ইংরেজী সিনেমায় যেমন দেখায়—প্রাচীন কালের বিরাট বিরাট জন্তুরা তাদের অতিকায় দেহ নিয়ে নড়তে চড়তেই রাত কাবার করে দিচ্ছে, এদের দেখেও অনেকটা তাই মনে হল।"

বললাম, "বডি বিল্ডার্সদের সমগ্র প্রচেষ্টা 'হাইপার ট্রফি' অর্থাৎ পেশীর মাপ বাড়াবার দিকেই থাকে বলে, খেলাধুলোয় এরা অচল। কিন্তু এদের দেখে ওয়েট ট্রেনিংকে বিচার করলে ভুল করবেন। গতির সঙ্গে প্রয়োজনীয় পেশীর শক্তি বাড়াতে বর্তমানে যে ওয়েট ট্রেনিং ফুটবলারদের করান হয় তাকে বলা হয় 'ডাইনামিক ওয়েট ট্রেনিং'। এ ছাড়া ওয়েট ট্রেনিং এর থেরাপিউটিক ভ্যালুও রয়েছে। পেশীর 'টোন' ফিরিয়ে আনতে, শরীরের ওজন বাড়াতে, কিংবা দেহের অতিরিক্ত চর্বি কমাতে, অর্থোপিডিক সার্জনরাও আজ এ ব্যায়ামের যথেষ্ট সাহায্য নেন।"

ওয়েট ট্রেনিং করবার আগে, কি জাতীয় যন্ত্র, সপ্তাহে কদিন, কতটা ওজন নিয়ে এবং শরীরের কোন কোন পেশীগুলোর শক্তি বৃদ্ধির দিকে নজর দিতে হবে, তা ফুটবলারের বিশেষভাবে জানা দরকার।

যে কোন সময়, প্রয়োজন মত ওজন বদলান যায় বলে, বারবেল বা ডাম্বেলকেই ওয়েট ট্রেনিং-এর আদর্শ যন্ত্র বলা হয়। এবং এতে অভ্যস্ত হবার জন্য প্রথম প্রথম বারবেলের রড (যার ওজন ১৫ পাঃ) দিয়েই শুরু করা উচিত। প্রত্যেক ফিগার

ক খ ঘ গ

একসঙ্গে দশবার করতে হবে এবং ইংরাজীতে একে 'রিপিটেশন' বা সংক্ষেপে 'আর' বলা হয়। এর 'আর' থেকে অন্য 'আর' এ যাবার সময় দু মিনিট বিশ্রাম নিতে হবে। এই রডের ওজন সহজ হয়ে এলে, ক্রমশ ওজন অল্প করে বাড়িয়ে যেতে হবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে—কোমরের ওপর কোন সময়েই হ্যাঁচকা ধাক্কা দিয়ে

২

যেন এ ব্যায়াম না করা হয়। এ ব্যায়াম একদিন অন্তর সপ্তাহে তিনদিন এবং ব্যায়ামের সময় শুরুতে আধ ঘণ্টা থেকে আরম্ভ করে, অবশেষে এক ঘণ্টার বেশী কিছুতেই যেন না যায়।

এই বারবেল বা ডাম্বেল ছাড়াও ফুটবলার ওয়েট ট্রেনিং করতে পারে। যেমন (১) নিজের ওজনের সমান কাউকে পিঠে কিংবা কাঁধে নিয়ে ধীরে ধীরে ৫০ গজ হাঁটা। (২) মাটিতে চিত হয়ে শুয়ে, দু হাঁটু বুকের কাছে এনে, নিজের ওজনের সমান কাউকে দু পায়ের পাতার ওপর বসিয়ে আস্তে আস্তে তাকে ওপরে তোলা (যতক্ষণ না নিজের দু হাঁটু সিধে হচ্ছে) এবং আবার আরম্ভের জায়গায় নামিয়ে নিয়ে আসা।

(৩) গোলপোস্ট কিংবা ৮ ফিট ওপরের লোহার রড জাতীয় কোন কিছু শক্ত জিনিস দু হাত দিয়ে ধরে, সমস্ত শরীরকে হাঁটু সোজা—যতক্ষণ চিবুক পোস্ট বা রড পার হয়ে যায় এবং ঐ অবস্থায় আবার আস্তে আস্তে ফিরে আসা। (৪) লোহার রোলার (যা দিয়ে মাটি সমতল করা হয়) হাল্কা হলে একা কিংবা দুজনে, ভারী হলে ৫।৬জন মিলে তীব্র গতিতে ৫০ গজ টেনে নিয়ে যাওয়া। (৫) ইটের শক্ত দেওয়ালকে দু হাত দিয়ে ফেলে দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করা। (৬) দু তলার সমান উঁচুতে মোটা দাড়ি টাঙিয়ে, সেই ধরে এবং হাঁটু না ভেঙে ওপরে উঠে যাওয়া।

ডেল্টয়েড, বাইসেপস, ট্রাইসেপস, ল্যাটিসিমাস, গ্লুটিয়াস, হ্যামস্ট্রিং, সোলাস গ্যাস্ট্রনেমাস, কোয়াড্রিসেপস, পেক্-টোরেলিস মেজর, রেক্টাস এবডোমিনাস (ছবিতে সবগুলির স্থান দেখান হয়েছে) প্রভৃতি পেশীগুলোর শক্তি বৃদ্ধির দিকেই ফুটবলারকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে।

এক নম্বর ফিগার করবার সময় দু পায়ের দূরত্ব থাকবে এক বিঘৎ। দৃষ্টি পুরোপুরি সামনে। হাঁটু ও কোমর ভেঙে এক লাইনে। প্রথমে থাইয়ের কাছে (ক) তারপরে বুকে (খ) দু হাতের কব্জি ঘুরিয়ে নিয়ে যাবার সময় হাঁটু অল্প ভাঙবে। তারপর সঙ্গে সঙ্গে হাঁটু (গ)-এর মত সিধে হয়ে যাবে এবং বারবেলকে মাথার ওপর তুলতে হবে।

বারবেল কাঁধে নিয়ে, সিধে হয়ে দাঁড়াও

৩

(কাঁধে তোয়ালে জড়িয়ে নিলে ভাল হয়)। এবার গভীরভাবে প্রশ্বাস নিয়ে ফুসফুস ভর্তি করে ২ নম্বর ছবির অবস্থায় এস এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে প্রারম্ভে ফের। মনে রাখবে পিঠ, মাথা এবং বুক সর্বদা সিধে থাকবে।

৪
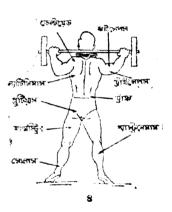
দু ইঞ্চি মোটা কোন জিনিসের ওপর পায়ের গোড়ালি রেখে দাঁড়াও। বারবেল থাকবে পিছনের মাটিতে। এবার দু হাত দিয়ে রড ধরে ৩ নম্বর ছবির মত বারবেলকে পাছার ওপরে নিয়ে যাও। এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রারম্ভে ফিরে যাও।

বারবেল কাঁধে নিয়ে, পা ফাঁক করে এবং হাঁটু না ভেঙে, ৪ নম্বর ছবির মত উপর দিকে লাফাও। মাটিতে নামবার সময় প্রথম-বারে পা ফাঁক করে পায়ের পাতার ওপর শরীরের ভর থাকবে। দ্বিতীয়বার নামবে পা জোড়া অবস্থায়—পায়ের পাতার ওপর।

বেঞ্চের ওপর উপুড় হয়ে শোও। একজন সঙ্গীকে তোমার পায়ের গোছক ধরতে বল। খুব শক্ত বা খুব আলগাভাবে সে যেন না ধরে। এইবার দু পাকে নিজের পাছার ওপর নিয়ে যাও।

আমায় তুমি চেনো না নারী...'

তাঁর পায়ের কাছে ভূলুণ্ঠিতা রাজমহিষী, ফুলে ফুলে কাঁদছেন। অনুনয় বিনয়, প্রার্থনার শেষ নেই। বুঝি চোখের জলে ভিজে যাচ্ছিল সন্ন্যাসীর পদযুগল। সমস্ত শরীর দিয়ে অযোধ্যা-রাজের প্রিয়তম মহিষী কাঁদছেন। নীরব, নিরুচ্চার গলা, তবু বুঝতে কষ্ট হয় নি হাজারো 'না'-ই তিনি বলে যাচ্ছেন প্রচণ্ড আঘাতে রুদ্ধ হয়ে যাওয়া গলায়।

'নারী...' দিগন্ত বিদীর্ণ-করা নিনাদে কণ্ঠস্বর বিস্ফোরণের মতনই ফেটে পড়ল। শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখাবয়ব, মাথায় জটাজুট, পরনে রক্ত-বস্ত্র, অলঙ্কার রুদ্রাক্ষ—দু' চোখ নিমেষে অগ্নিবর্ষক। তাবৎ ভূঁইকাঁপের কম্পন শরীরে টেনে নিয়ে তেজস্বী মহর্ষি ঊর্ধ্বে প্রসারিত করলেন দক্ষিণ হস্ত। 'আমি দ্বিতীয় স্বর্গের স্রষ্টা মহর্ষি বিশ্বামিত্র। তেত্রিশ কোটি দেবদেবী জানে আমি রুদ্র, ভয়ঙ্কর। তুমি আমায় জানো না, নারী...'

'জানি—', সন্ন্যাসীর পদতলে লুণ্ঠিত অযোধ্যা-সুন্দরী বিদ্যুৎ চমকের মতন নিমেষে ঋষিকে সরে এলেন। সুশ্লিষ্ট-সুরে-বাজা বীণার তারটি যেন ঝনাৎ করে ছিঁড়ে গেল। রাজমহিষী নয়, প্রজ্বলিত অগ্নিস্তূপের লোলজিহান শিখা। দু' নিমেষের

সূত্রধার
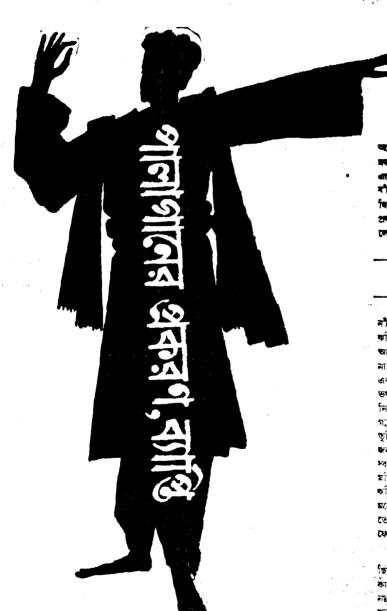
নীরবতা। 'আমায় তুমি জানো না ঋষি। তোমার অভিশাপ-অগ্নি আমার কেশাগ্রও স্পর্শ করবে না, কিন্তু সতী কৈকেয়ীর একটি অঙ্গুলি হেলনে তুমি ভস্মস্তূপে পরিণত হবে। নির্জনে, গভীর অরণ্যের গিরি-গুহায় তপস্যা করে পেয়েছ তুমি ঈশ্বরকরুণা। আর আমি জনারণ্যের সংসারে বসে স্বামীতে দর্শন করেছি সেই মহিমময়কে। শক্তি দেখিও না ঋষি, তেজ দেখিও না; আসলে, মনের অগোচরেই আমি তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফেলেছি...'

আমরা পাশাপাশি বসে ছিলাম। দৃশ্যটি শেষ হলে খুব কাছের মানুষটি তাঁর স্বাভাবিক নম্র অথচ মিঠে গলায় শুধোলেন, 'ডু ইউ এপ্রেসিয়েট ইটস ড্রামাটিক অ্যাপ্রোচ?'

মাথা নেড়ে কোন রকমের সার দিলাম। আসলে এতক্ষণ, এই প্রশ্নের মুখের সময় পর্যন্ত আমার ধারণা ছিল না, বাস্তবে আমি কোথায়। তাকিয়ে দেখি চারদিকে কয়েক হাজার দর্শক। সকলের চোখ অশ্রু-আপ্লুত। কেউ চোখের কোল মুছছেন, ভুলে গেছেন কেউ বা। দেখলাম, পাশে বসা মানুষটির বয়স্ক নেত্রকোণ পর্যন্ত আর্দ্র।

এই তো সেদিন, তেরশো চুয়াত্তর সালের কথা। ইছাপুর আনন্দমঠ-এর আসরে নট্ট কোম্পানির যাত্রা। চার দিনের। এ-দিন ছিল প্রথম রজনী। পালা 'মহীয়সী কৈকেয়ী'। নট্টর নামে আর পালার নামে ছয় হাজারী মণ্ডপ পরিপূর্ণ। আমরা একেবারে পুরোভাগে বসে। কাঁধ ছুঁয়ে বসেছেন বংশী বাদকের পশু পাল-সহ সুরপার্টি। মাঝখান দিয়ে হাত প্রসারিত করলে বুঝি ছোঁয়া যায় দশরথ, কৌশল্যা, রাম, সীতা, লক্ষ্মণ কি কৈকেয়ীকে। যাঁরা নিরলঙ্কার-যাত্রা-আসরে, কেবল অভিনয়ের মাধ্যমে আমাদের প্রত্যেককে নিয়ে গিয়েছিলেন অতীতের অযোধ্যায়।

সে বছর পয়লা মরশুমে হঠাৎ ভাঙন এলো নট্ট কোম্পানিতে। মরশুমের ডাকের পালা 'সুলতানা রিজিয়া' প্রায় বন্ধ হয় আর কি। কোলিয়ারী এলাকায় বিপর্যয় দেখা দিল। দল ছেড়ে চলে এলেন নট্টর দুই যশস্বী শিল্পী সুজিত পাঠক আর চপলরানী(১)। কোম্পানি ফিরে এলো কলকাতায়। যাত্রামোদীরা আশংকা করলেন নট্ট বুঝি বন্ধ হয়। কিন্তু হল না। সূর্যবাবু(২) আর মাখনের(৩) মতে রাধা-গোবিন্দর দল বন্ধ হবার নয়। আশ্চর্য, হলও তাই। ১৫ দিনের মাথায় নতুন শক্তি নিয়ে নট্ট কোম্পানি দাঁড়াল। দলে এলেন মহেন্দ্র গুপ্ত। চপলের অভাব? তামাম যাত্রামোদী ভেবেছিল, চপলের স্থান বা অভাব পূরণ হবার নয়। তাও হল। দলের ২৭ নম্বর পার্ট বলা ছেলে মণি(৪) রাজী হয়ে গেল। সূর্যবাবুর অক্লান্ত পরিশ্রমে আর মণির প্রবল আগ্রহনিষ্ঠায়, মণি হল 'কাঞ্চন'। মাত্র এক বছরে কাঞ্চন তামাম দেশে তার অসামান্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেল।

'মহীয়সী কৈকেয়ী' (ভরত বিদায়)র লেখক আগের মরশুমে এ-পালার কৈকেয়ী-রূপে চপলকে দেখেছিলেন। এই পরিবর্তনে তাঁর মনেও কম শংকা ছিল না। তাই ইছাপুরের আসরে কাঞ্চনের 'কৈকেয়ী' দেখতে এলেন তিনি। প্রথম তিনটি দৃশ্য শেষ হলে তাঁর স্বভাবগম্ভীর অথচ প্রশান্ত ঈষৎ গোলগাল মুখাবয়বে হাসির ছটা ফুটলো। কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললেন, 'ও আমাকে অবাক করে দিয়েছে। চপলের ছায়াটা পর্যন্ত [illegible] মনে পড়তে দিচ্ছে না।'

অবাক আমিও কিছু কম হই নি। পালা-প্রয়োজনা দেখে, কাঞ্চনের চরিত্রসৃষ্টি দেখে এবং সবচেয়ে বড় কথা পালা-রচনার কথা ভেবে। রামায়ণের চরিত্র ও অংশগুলির বহু ধরনের ব্যাখ্যার কথা জানি, পড়েছিও কিন্তু 'কুমতি কৈকেয়ী' কী করে 'মহীয়সী' হতে পারে, বলতে সংকোচ নেই তা অনুমান করতে পারি নি। তাই যত দেখছিলাম, তত অবাক হচ্ছিলাম। ভীষণ অভিভূতও। এখানে পালাকারের বক্তব্য : রামের কল্যাণের জন্য, সমগ্র আর্যশক্তি ও দেশের মংগলের জন্যেই 'কৈকেয়ী' রামচন্দ্রকে বনবাসে (নাট্যকারের মতে প্রকৃত মানব তৈরির পাঠশালা) পাঠালেন মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অনুরোধে, কুচক্রী মন্থরার কুপরামর্শে নিজপুত্র ভরতের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়। এখানে এই সত্যটি নাট্যে প্রতিষ্ঠিত : কৈকেয়ী ভরতের চেয়ে রামকেই বেশি ভালবাসতেন। এবং শিশু-কাল থেকে রাম কৈকেয়ীর কাছেই মানুষ। দুই চরিত্রের কথা দিয়ে বক্তব্যটি স্পষ্ট করার চেষ্টা করছি।

বিশ্বামিত্র : সমগ্র ভারতে অনার্যশক্তি ভয়ংকর ধ্বংসের কারণ হয়ে উঠেছে। এ শক্তি লুপ্ত না হলে আর্যসভ্যতার নাভিশ্বাস উঠবে। রাম ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ। অনার্যশক্তি ধ্বংসের জন্যে তাকে বাস্তব জগতের সকল অবস্থার সম্মুখীন হবার জন্য শিক্ষিত করা দরকার। সেই শিক্ষাক্ষেত্র অরণ্য, পর্বত। পাঠকাল চোদ্দ বছর।

কৈকেয়ী : ভয়ংকর অরণ্যে তার জীবন-হানি ঘটতে পারে।

বিশ্বামিত্র : সে ন র রূ পী নারায়ণ, মৃত্যুঞ্জয়ী।

কৈকেয়ী : শোকে দুঃখে আমার শিবতুল্য স্বামী বিগতপ্রাণ হবেন।

বিশ্বামিত্র : হোক। মাতৃভূমিকে অকলঙ্ক রাখতে, ভারতবাসীর মংগলের জন্যে এত বড় ত্যাগ এই ভারতে কেবল কৈকেয়ীই করতে পারে।

ফলত কৈকেয়ীর চরিত্র অভিনয়ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠেছে। তার এক মুখে সর্বদা দুই রূপ। এক মন রামের কল্যাণের জন্যে, দেশ ও মানুষ এবং মাতৃভূমির মংগল কামনায় সংকল্পে অটল। এই সংকল্পের যে আশ্চর্য শান্তিটুকু, নাটকে তা স্বার্থ-জনিত হর্ষে প্রকাশিত। অন্যমন নয়নমণি রামের জন্য পীড়িত।

ফাঁকে ফাঁকে কথা হচ্ছিল। কোন সিচুয়েশন কেন, এখানে গানের প্রয়োজন কি, ক্রাইসিস আর রেজোলিউশন কেন, টোটাল এবং চারিত্রিক দ্বন্দ্ব কি? এ-সব। কৈকেয়ী প্রসংগে বললেন, 'সী ইজ এ সিম্বল অভ কনশাস উইল এণ্ড সোস্যাল নেসেসিটি।'

উনি ইংরেজী বলছেন? ওটা খানিকটা অভ্যেস। অনেককে জানি, যাঁরা মনের কথা-টুকু—ভাবনা-চিন্তার কথাগুলো বাংলায় না বলে ইংরেজীতে বলেন। তাতে অল্পে বুঝি সব কথা বোঝানো যায়। আর ইনি, বাংলার শিক্ষাবিদ্‌দের অন্যতম ব্রজেন্দ্রকুমার দে তো বলবেনই। জীবনের সবচেয়ে বেশি অংশটাই যাঁর প্রধান শিক্ষকের আসনে বসে কেটেছে। বিস্তর পড়েছেন, পড়িয়েছেন। তাই বলে মাস্টারিভাবে এ-সব বলা নয়। কারণ, দে-মশাই যন্ত্র হয়ে যান নি। তাঁর মধ্যে যে শিল্পীমনটি শৈশব থেকে লালিত, তাকে বাদ দিলে আমি বলব, ব্রজেন্দ্রকুমার নামটি অসম্পূর্ণ থাকে।

পালা শেষ হল মধ্যরাত্রি পার হলে। তাঁর সংগে সাজঘরে এলাম। একটা বাক্সের উপর বসে কাঞ্চনকে ডাকলেন। বললেন, 'আমাদের যাত্রার যা ট্রাডিশন, তা বাঁচাতে তুমি এসেছ। মন দিয়ে কাজ কর। পারলে, তুমি পারবে।' সাজঘরে নায়েক পার্টির(৫) কিছু লোকজন; মাখন, সূর্যবাবু, শিল্পীদের অনেকে এসেছেন। তৃপ্ত, উৎসাহী দর্শকেরা ভিড় করেছে সাজঘরের বাইরে। ব্রজেনবাবু সকলের সংগে কথা বলছিলেন, ফাঁকে ফাঁকে আমার সংগেও। ভিড় কমলে আমার এক প্রশ্নের উত্তরে বললেন : এ প্লে ইজ এ মাইম্‌ড ফেব্‌ল্‌, অ্যান অ্যাকটেড এন্ড স্পোকেন স্টোরি। দি টেল ইজ প্রেজেন্টেড বিকজ ইট হ্যাজ এ মিনিং টু ইট্‌স ক্রিয়েটর।

কৈকেয়ী চরিত্র ও নাটকের নতুন ব্যাখ্যা প্রসংগে বাদানুবাদ হওয়া অসম্ভব নয়। এখানে আদিকাল থেকে চলে আসা বিশ্বাসের উপর অস্ত্রোপচার হচ্ছে না? উত্তরে বললেন, 'তা হওয়াও স্বাস্থ্যকর। না হলে আসল সত্যের প্রকাশ হয় না। আসলে দেখা জানা বোঝা, অনুভব এবং উপলব্ধি সকলের এক হতে হবেই এমন আইন তো কোথাও লেখা নেই। আমার বোধের কথা-টুকু কেবল আমি প্রকাশ করেছি। দি ট্রু ক্রিয়েটার টার্নস টু দি থিয়েটার্স হেরিটেজ ইন অর্ডার টু অ্যাটেন ফ্রিডম, টু সিলেক্ট অ্যাণ্ড ডেভেলপ মুড্‌স অভ এক্সপ্রেশন স্যুটেড টু হিজ নীড, টু গিভ রেলিভেন্স টু হিজ ভিশন অ্যাণ্ড সাবস্ট্যান্স টু হিজ ড্রিম।'

২।

যাত্রা জগতের মাস্টারমশাই দু'জন। একজন *ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ, যিনি বড় ফণী নামে বিখ্যাত ছিলেন, আর একজন ব্রজেন্দ্রকুমার দে। বড় ফণী ছিলেন অভিনয় শিক্ষক। আজকের অনেক শিল্পীই তাঁর কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত। ব্রজেনবাবু স্কুল শিক্ষক। দীর্ঘ উনচল্লিশ বছর যে হাতে দশটা-পাঁচটা ছাত্র শাসনের কঠিন বেত ধারণ

করেছেন, সেই হাতেই ধরেছেন লেখনী। ইছাপুর নর্থল্যান্ড হাই স্কুলের দায়িত্বশীল এই প্রধান শিক্ষকের দাপটের কথা সুপরিচিত। অনেকের মুখে শুনেছি, তাঁর কঠিন শাসন, নিয়মানুবর্তিতা, দায়িত্ব-বোধের পরশপাথর স্পর্শ করে অনেক লোহা সোনার অলংকারে পরিণত হয়েছে। তাঁর অসংখ্য কৃতী ছাত্র দেশব্যাপী ছড়ানো। এই যে চরিত্র তাকে শিল্পী হিসেবে ভাবতে বুঝি কষ্ট হয়।

ব্রজেনবাবু বলেছেন, 'একটি জাতীয় তথা সামাজিক কর্তব্য, আর একটি সম্পূর্ণ মনোজগতের ব্যাপার। যখন লিখি তখন অন্তর্মন বহুতে বিভক্ত, বাস্তব মনটি কিন্তু সজাগ। এ-লেখা উপন্যাস কি গল্প অথবা কবিতা নয়—নাটক। চরিত্র ও তার কার্য-কলাপ নিয়ে এই শিল্পরূপ। একই সঙ্গে রাজা, রাজমহিষী, সন্ন্যাসী, দৌবারিক সব চরিত্রে নিজে মিশে যেতে না পারলে নাটক রচিত হয় না। নাট্যকারের একটা মন অভিনয় করে, বিভিন্ন চরিত্রে। অন্য মন তাই প্রকাশ করে বাইরে, বিচার করে—তবেই না লেখা হয়। এ-সম্পূর্ণই কল্পজগতে চলে যাওয়ার ব্যাপার। একজন মানুষ বাড়িতে থাকে এক পোশাকে, অফিসে যায় আর এক পোশাকে, নিমন্ত্রণ কি সভা-সমিতিতে প্রয়োজনে সে ভিন্ন পোশাক পরিধান করে। আমাদের মনটাকে পোশাকের মতন করে তুলতে পারলেই সব হয়।'

নাটক কথাটা বারবার ব্যবহার করছি দেখে, উনি এক সময় ছোট্ট একটি অভিমানের কথা প্রকাশ করে ফেললেন। বললেন, 'নাটক আর কেন? আমার দেশ, আমাদের সরকার, এমন কি রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত এতকাল যাত্রাপালাকে 'নাটক' বলে স্বীকার করেন নি। আমরা তো সমাজে শূদ্রের আচরণ পেয়ে এসেছি। নাট্যকার দূরে যাক, ভদ্রলোক বলেই বা স্বীকার করেছেন ক'জন শিক্ষিত লোক?

প্রশ্ন : এ-জন্যে কি আপনার মনে ক্ষোভ আছে?

উত্তর : আগে ছিল। পরে প্রথম আশ্বস্ত হলাম, যখন দেখলাম যাত্রাকে শিল্পের মর্যাদা দিয়েছে আনন্দবাজার পত্রিকা। সে ১৯৫৯ সালের কথা, হঠাৎ এক বৃহস্পতিবার সকালে শেষের পাতায় দেখি যাত্রার আলোচনা। তারপর থেকে প্রায়ই। কী বলব, আনন্দে সেদিন আমি কেঁদে ফেলেছিলাম। এবং সেই প্রথম উপলব্ধি করলাম, যে যা বলে বলুক, শিক্ষিত, শহুরে মানুষের কাছে যাত্রা অচ্ছ্যুৎ হয়ে থাকে থাক, কিন্তু দেশের আপামর পল্লীর মানুষের মনে মনে তো আমরা বেঁচে আছি। সে বাঁচায় কিন্তু নাটক বাঁচে না। চল-চ্চিত্রও না। হ্যাঁ, চলচ্চিত্র শিল্প এক ধরনের চোখ-ধাঁধানো মোহের মতন মনে হয় গ্রাম্য মানুষের কাছে। অগ্নিশিখা আর পতঙ্গ যেমন। কিন্তু যাত্রা তাদের মনের মণিকোঠায়, ধমনীর রক্তস্রোতে। তাকে বর্জন করতে হলে এই দেহটাকেই যে বাদ দিতে হয়।

প্রশ্ন : শিল্প হিসেবে কোন্‌টিকে আপনি শ্রেষ্ঠ মনে করেন, মঞ্চ-নাটক না যাত্রা।

উত্তর : যাত্রা। আদিকালে আমাদের দেশে তো যাত্রাই ছিল দৃশ্যকাব্য। পরে মঞ্চ, মঞ্চ-নাটক। দুঃখের বিষয় কি জানেন, লেবেডেফ, যিনি মঞ্চ আর মঞ্চ-নাটকের প্রবর্তক, তাঁকে নিয়ে শিক্ষিত আর শহুরে মানুষের শ্রদ্ধার অন্ত নেই। আমি বলছি না অনুকরণ করা অপরাধ, কিন্তু আমাদের একটি গ্রাম্য কালো মেয়েকে যদি মিনি স্কার্ট পরানো হয়, তাকে কেমন দেখতে হয় মশাই? মঞ্চের ব্যাপারটা অনেকটা তাই। কেন, আমাদের মঞ্চ ভরতমুনি বর্ণিত সংস্কৃত মঞ্চের অনুকরণে হতে পারত না? হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম, লেবেডেফের শতবর্ষ প্রভৃতি এদেশে জাঁকজমকের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু যাত্রার কথা, যাত্রার যাঁরা পুরোধা পুরুষ, তাঁদের কথা কেউ স্মরণ করেন না। দীনবন্ধু মিত্র, মাইকেল মধুসূদন, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল এমন কি শিশির ভাদুড়ীর প্রতিই বা শ্রদ্ধার প্রদর্শন কোথায়? আসলে বিদেশীদের প্রতি একটি উৎকট আকর্ষণ অতীত থেকেই শহর-জীবনে রয়েছে। তাই বিদেশী মঞ্চে আমরা পালা ধরনের নাটক অভিনয় করেছি। সে নাটকে দেশের মাটির গন্ধ কম, দেশের মানুষের চেহারা অস্বচ্ছ। তবু অতীতে কিছু অন্তত ছিল, হালে ও বস্তুটি একেবারেই নেই। মঞ্চে কারা আসেন, কারা যান—তাঁদের কাউকে চিনি না, কেন আসেন, কেন যান বোঝার জো নেই। ভারতের 'আমি' সেখানে অনুপস্থিত। কিন্তু যাত্রা আমি-তুমি সকলের প্রতিরূপ। সে ভারতের কথা দিয়ে শুরু করে, ভারতের কথা বলে শেষ করে—কারণ, তার মূলে শিকড় যে এদেশের মাটিতেই প্রোথিত এবং তা এদেশের মাটিরই রস গ্রহণ করে বাঁচে। কিন্তু নাটক কি জানেন? তার শিকড়-বাকড় রয়েছে সাগরের ওপারে, গাছটা কেবল এদেশে।

ফর্ম হিসেবে যাত্রা খুব সহজ। ছল-চাতুরী, কলা-কৌশল দিয়ে লোক-ভোলানোর ব্যাপারটা বরাবর সে ঘৃণার সঙ্গে বর্জন করে এসেছে। অভিনয়কে যাত্রা আসল বস্তু মনে করে। এবং যাত্রা মনে করে কিছু গুণ না থাকলে সে অভিনেতার স্বীকৃতি পেতে পারে না। থিয়েটার অভিনেতা এবং অনভিনেতার পার্থক্য ঘোচাবার একটি চেষ্টা। অর্থাৎ আলো, দৃশ্য কলকব্জা পরিচালনা থেকে কিছু কৌশল• তাকে ৭৫ মাত্রা সাহায্য করে। আবহ সাহায্য করে কমপক্ষে ১০ মাত্রা। বাকি থাকল ১৫ মাত্রা। তার পাঁচ মাত্রা করতে পারলেই যথেষ্ট। ওখানে ব্যক্তিত্ব, মানসিক শক্তির প্রয়োজন নেই। যাত্রায় ওটা আসল। তা নইলে কথা দিয়ে ইমেজ তৈরি হয়? যাত্রার অভিনেতা যখন আসরকে বলে, এটা যুদ্ধক্ষেত্র, দর্শক তা স্বীকার করতে বাধ্য। যখন মধ্যরাত্রি, যাত্রার অভিনেতা বলছেন, এ প্রখর দ্বিপ্রহর—তাই সই। তা হলে বুঝুন বিশাল এক গণশক্তি তার ব্যক্তিত্ব, মানসিক শক্তির অধীন।

প্রশ্ন : তবু, অনেকে মনে করেন যাত্রা বহুলাংশে স্থূলে। মোটা ধরনের শিল্প-কর্ম। তাই কি?

উত্তর : অসম্ভব। যাত্রাপ্রকরণ এক বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বিষয় বড় নয়, রসটাই বড়। কেউ যদি বলেন, আপনার যা কিছু মালমসলা মনে হবে তাই নিয়ে আসুন, দেখুন আমি একটি অপূর্ব মূর্তি তৈরি করে দিচ্ছি, সে কি কম কথা। তা না হয়ে উৎকৃষ্ট মালমসলার একটি কিম্ভূত মূর্তির রূপ দিলাম—সেটা কি বিচারে আর্ট হবে? সূক্ষ্ম আর স্থূলের পার্থক্য এবং তার আসল মানে না জেনে অনেকে এরকম উক্তি করে থাকেন, জানি। তাকে বলুন, পার্থকাটা এঁকে দেখাও তো বাপু। নয় লিখে দাও। জানবেন, সে পালাবার পথ পাবে না। যাঁরা প্রকৃত যাত্রা দেখেন নি, এ-সব কথা তারা বলবেন। এটা আমাদের জাতীয় দোষ। পরখ করে বলি না, শুনে বলি। ধরুন যাত্রার 'বিবেক'। দেখেছেন নিশ্চয়, সে কখনও সাজঘর থেকে গান ধরে, কখনও প্রবেশ মধ্য থেকে, কখনও গেট থেকে—এবং কখনও আসরে ঢুকে। কেন? কেউ জানে না। আমি এ-সম্পর্কে আনন্দবাজার পত্রিকার 'আনন্দলোকে' প্রকাশিত একটি রচনা পড়ি। নাম 'যাত্রাপালার বিবেক'—অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি, সেখানে এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রাঞ্জলভাবে দেওয়া হয়েছিল। বেশি আর বলব না, যাত্রা যে কত সূক্ষ্ম শিল্পকর্ম—মঞ্চ নাটক এবং চলচ্চিত্রের তুলনায়, তাই একটি গ্রন্থ-রচনার বিষয়। তবে জেনে রাখুন, যাত্রা নিজে একটু সোচ্চার হলেও তার প্রতি মুহূর্তে সূক্ষ্ম শিল্পকর্মের স্বাক্ষর রয়েছে। আর্ট ইজ ইন এ মাইক্রোস্কোপিক ফর্ম, দি পারফেকশন নট ওনলি অভ ম্যানকাইন্ড বাট অভ দি ইউনিভার্স।

প্রশ্ন : ইউনিভার্স! এটা কি বাড়া-বাড়ি হচ্ছে না?

উত্তর : না। অণু-পরমাণু আসল। তাই দিয়ে জীব, জীবন। লক্ষ কোটি অণু-পরমাণুর প্রত্যেকটির কাজ আছে মনুষ্য দেহে। তেমনি মানুষ হচ্ছে সমাজের অণু-

পরমাণু। সমাজ হচ্ছে পৃথিবীর, পৃথিবী—ইউনিভার্সের। মানুষের শরীরের যে নিয়ম, ইউনিভার্সের নিয়ম তা থেকে আলাদা কি? সুতরাং যেখানে মানুষ—সেখানেই ইউনিভার্স। নাট্যশিল্প মানুষকে বাদ দিয়ে নিশ্চয় নয়।
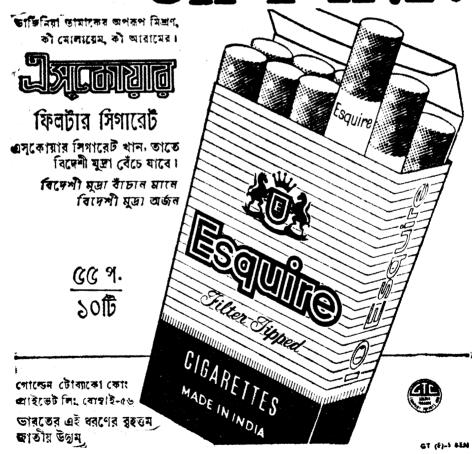
প্রশ্ন : শিল্পের কিছু সামাজিক দায়িত্ব আছে বলে অনেকে মনে করেন—যাত্রা তার কতটুকু পালন করেছে বলে আপনার বিশ্বাস?

প্রশ্ন শুনে ব্রজেন্দ্রকুমার হাসলেন। বললেন, 'এ তো মায়ের কাছে মামার বাড়ির গল্পের মতন হল। শিল্প-সাহিত্য এ-সত্যটি তেমন করে স্বীকার করল কবে? আমাদের দেশের যাবতীয় আর্ট ও আর্ট-ফর্মের মধ্যে যাত্রা এবং যাত্রাপালাই প্রথম অলিখিত শর্তটি মেনে নিয়েছিল যে, তার মূলে উদ্দেশ্য সামাজিক উন্নয়ন। এবং সে কর্তব্য একা সে যতটা পালন করেছে, তার শতাংশও পালন করতে পারে নি তামাম শিল্পরূপ। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সেই সমাজের কিছু বিধি-নিয়ম আছে, যা মানলে ব্যষ্টি ও বাষ্টির উন্নতি সাধন হয়। যাত্রাগান আদিকালে ধর্মপ্রচারের কাজ করেছে। তার মানে এমন সব দেব-চরিত্রের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছে, যা অনুকরণীয়। তা ছাড়া মানুষের 'মন' নামক বস্তুটি বড়ই জটিল। তাকে একটি বিশিষ্ট স্থানে আবদ্ধ রাখতে পারলে অঘটনের সংখ্যা কমে। আদিকালের এই যে ধর্মপ্রচারের ব্যাপারটি তাকে আমি বলব শিক্ষা। তখন থেকে ন্যায়-নীতি, সুস্থতাই ছিল যাত্রার লক্ষ্য। তারপর যাত্রা এল ইতিহাসে। এমনি করে, আজ আঠারো এবং উনিশ শতকের ভারতীয় মহাপুরুষ এবং বিশ্বের মনস্বীদের কথাও যাত্রা বলছে সকলের আগে। তুলনামূলক বিচারে যাত্রাপ্রকরণের যে দান, বলুন না তার সঙ্গে কার তুলনা চলে?

যাত্রা কেবল শিল্প কি আনন্দ উপকরণই নয়, এই ফর্মটি এত অ্যাকটিভ যে, যুগে যুগে, কালে কালে একে প্রচারের কাজেও লাগানো হয়েছে। বহু অতীতের কথা বাদ দিয়ে দেখি চণ্ডীদাস, পরে শ্রীচৈতন্যদেব যাত্রাকে নির্বাচন করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণমহিমা প্রচারের জন্যে। হালে, শুনেছি কিছু রাজনৈতিক দলের লক্ষ্যও পড়েছে এর উপর। এই লক্ষ্য বিশেষ ধরনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। কোনো কোনো রাজনৈতিক মতবাদ প্রচারের জন্য, নাম করব না, কিছু যাত্রাদল অর্থকরী সাহায্যও পাচ্ছেন বলে শোনা যাচ্ছে।

প্রশ্ন : তা যদি করেই তবে কি তা অপরাধের? ইন্টারন্যাশনাল ড্রামা কনফারেন্সে কয়েকটি দেশ তো বলেছেই, নাটক হচ্ছে হাতিয়ার তথা অস্ত্র।

উত্তর : খুব ভুল কথা। শিল্পের স্বাধীনতা বলতে যা বোঝায় আর কি। অর্থাৎ আর্টকে নিয়ে যা খুশি তাই করা। তা যদি করা হয়, তবে আর্টকে ক্ষুণ্ণ করা হবে, রস বলে কিছু থাকবে না। একটা উপমা দিচ্ছি, ধরুন আর্ট বস্তুটি রসগোল্লা। তাকে তৈরি করতে হয়। দুধ থেকে ছানা হয়, আখ থেকে চিনি হয়, কয়লা থেকে আগুন হয়—এইবার পরিমিতবোধের পরিচয় দিতে হবে। কতটা মাখতে হবে, কতটা জল দিতে হবে, কতটা ছানায় কত চিনি, আঁচ কোন্ পর্যায়ে উঠলে গোল্লা চড়াতে হবে ইত্যাদি। দেখবেন একটু যদি কম-বেশি হয়, রসগোল্লা হয় ফাটবে, নয় গোলা বাঁধবে না। সুতরাং পরিমাণজ্ঞান প্রয়োজন। রসস্থ হলে আর্ট নয়। নাটক হাতিয়ার হলে, ওই রসবস্তুটির অস্তিত্ব থাকবে না। বক্তৃতা আর শিল্প-সাহিত্যের মধ্যেকার ফারাক কমে যাবে।

প্রশ্ন : যাত্রা কি লোকনাট্য? অর্থাৎ ফোক-ড্রামা?

উত্তর : আমি বুঝি না, জানি না 'লোক' কথাটায় এই ধরনের কদর্থ কারা করেছে। লোক মানে অতীত নয়, গ্রাম নয়—শহরে কি মশাই লোকজন নেই? 'ফোক' কথাটার আভিধানিক অর্থ : লোক বা জাতি। লোক মানে মানুষ। সে মানুষ সকল কালের, সকল যুগের। সাহিত্য শিল্প যা কিছু বলেন, সবই তো মানুষেরই জন্য। তা হলে মঞ্চ-নাটকও লোকনাট্য, চলচ্চিত্রও লোকশিল্প। কথাটাকে যদি তবু কেউ জোর করে অতীতে টেনে নিয়ে যায়, 'প্রাচীন' বলে অভিহিত করে, তবে বলব, হ্যাঁ, সবই তো মশাই পুরনো। উদ্ভব বহুকাল আগে। কিন্তু যুগ ও কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যা পরিশীলিত হয় তাকে অপবাদ দিয়ে লাভ কি? যাত্রা কি এখনও সেই অনার্য যুগের রুড ফর্মই আছে? না। তবু যাঁরা যাত্রাকে 'জাতীয় আধুনিক দৃশ্যকাব্য' বলতে ইতস্তত করেন, হয় তারা কিছু জানেন না, নয় উদ্দেশ্যের বশে বলেন। বলতে পারেন আমাদের সকল আর্ট ফর্মের মধ্যে যাত্রার কারবারটা সবচেয়ে বেশি লোক নিয়ে। এবং তার বেশিরভাগই গ্রাম্য লোক নিয়ে ছিল। কিন্তু আজকের গ্রাম কি অনার্য যুগের গ্রাম আর আছে? যাত্রা অত্যাচারীর বিরুদ্ধে চিরকাল কাজ করেছে। অসৎ চরিত্রের নিন্দা করেছে, সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে মতবাদ প্রচার করেছে। শোষককে সে মহৎ বলে নি, শয়তানকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে মহান করে তোলে নি। স্বদেশী যুগ থেকে যাত্রা ভারতের স্বাধীনতার জন্য কাজ করেছে। শ্রেণী সংগ্রামের কথা পর্যন্ত বলেছে। তবে? তারপর ধরুন শহর। শোভাবাজার রাজবাড়ির যাত্রা উৎসব থেকে শুরু করে, কোম্পানি বাগানের উৎসব, বিশ্বরূপা মঞ্চ এবং রবীন্দ্র সদনের যাত্রা উৎসব পর্যন্ত আমরা প্রমাণ করেছি, এখানেও মঞ্চ নাটক কি চলচ্চিত্রের তুলনায় আমাদের জনপ্রিয়তা অনেক বেশি।

৩

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের পর কেবল ব্রজেন্দ্রকুমার দে ছাড়া আর কেউ 'সম্রাট' নামে ভূষিত হন নি। তাঁকে বলা হয় পালা-সম্রাট। সর্বমোট ১৩৭টি পালার রচয়িতা ব্রজেন্দ্রকুমারের জীবনে 'ব্যর্থতা' নেই বললেই চলে। এবং এ-কথা সত্য আজ পর্যন্ত বোধ হয় এত নাটকের অধিকাংশই সাফল্যের জয়মাল্যে ভূষিত হতে দেখা যায় নি কারো।

প্রথম নাট্য রচনার প্রেরণা যাত্রা থেকেই। খুব অল্প বয়স থেকে যাত্রা দেখেছেন। জন্ম ফরিদপুর জেলার মাদারিপুর মহকুমার গয়-ঘড় গ্রামে। এ-প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রকুমার বলেছেন : বঙ্গ সংস্কৃতি বলতে আমরা যাত্রাগানকেই জানতাম। গ্রামে যাত্রা হলে, বাড়ি বাড়ি কী চণ্ডীমণ্ডপে মাসাধিককাল সেই যাত্রা নিয়েই প্রত্যহ আলোচনা হত। যাত্রার একটা ভয়ানক ধরনের টান ছিল গ্রামজীবনে। মনে আছে যাত্রার দল আসবে শুনলে আমরা প্রায়শ নদীতীর ছাড়তে চাইতাম না। তারপর একদিন খবর এলো হঠাৎ, নাও আসছে যাত্রাদলের। ব্যস অমনি গ্রামের যত ছেলেমেয়ে তারা ছুটল। সেখানে দূরত্বের বাধা ছিল না। একবার মাঝরাতে খবর এসে পৌঁছলো নট্ট কোম্পানীর নৌকো পাশের গ্রামে এক ঘাটে রাত কাটাচ্ছে। খবরটা গ্রামে আসার পর, সব জেগে উঠল। ঘুম হলো না গোটা গ্রামের। আর আমরা খুব ভোর ভোর রাতে অসংখ্য বালক-বালিকা ছুটলাম পাশের গাঁয়ের দিকে। খিদে নেই, তেষ্টা নেই, রোদ-বাদল নেই—কীর্তিনাশা নদী ধরে ওদের নৌকো আসছে, আর আমরা পার ধরে কলরোল করতে করতে গ্রামে ফিরছি। পুব-বাঙলার বরকর্তা এবং সেকালীন জামাইবাবুদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বলছি, বরযাত্রীদের চেয়েও যাত্রাদলের মর্যাদা ছিল অনেক বেশি।

সাত বছর বয়সে ব্রজেন্দ্রকুমার যে যাত্রা দেখেছিলেন, এখনও তার হুবহু স্মৃতি মনে আছে। পালার নাম 'সাগরাভিষেক', পালা—অতুলকৃষ্ণ বসু মল্লিকের। 'মনে আছে সূর্যকুমার দত্তর অভিনয় দেখে সেই বয়সে কী পরিমাণ মুগ্ধ হয়েছিলাম বলতে কি, আমার মনে হচ্ছিল আমি অভিনয় করব। ওই যে কথাটি মনে ঢুকল ব্যস। অভিনয় করতে পারি নি বটে, কিন্তু পালা লিখতে শুরু করলাম।' ব্রজেনবাবু তারপর দেখেন মতিলাল রায়ের 'চিন্তায় চিন্তামণি' পালা। মনে আছে সেবার 'সাবিত্রী সত্যবান' যাত্রাভিনয় হচ্ছিল গ্রামে। তখন জুড়ি-গানের প্রবর্তন ছিল যাত্রায়। ওই পদ্ধতিটি এমনই ছিল যে, কথা নেই বার্তা নেই—হঠাৎ

জুড়িদারেরা উঠে এলো মঞ্চে। আরম্ভ হ'ল গান। উচ্চাঙ্গ সংগীতের কথা না কসরৎ। প্রশ্ন করলাম, তাতে নাটকের ক্ষতি হ'ত না? বললেন, 'অবশ্যই হ'ত। সেই ক্ষতিটুকু পূরণ করতে শিল্পীদের গলদঘর্ম হতে হ'তো।'

হ্যাঁ, 'সাবিত্রী সত্যবান' পালা হচ্ছিল সেবার। পালা জমে উঠেছে খুব। দর্শকেরা সব বরফ যেন। দৃশ্যটি ছিল সত্যবানের মৃত্যুর। সত্যবান মারা গেল। সাবিত্রী শোক করছে। এমন সময় আসরে উঠে এলো জুড়ির দল। ব্যাস সব মাটি। পালার গতি গেল, অভিনয়ের মেজাজ গেল—থাকল না আর কিছুই। সাবিত্রী বেচারী সত্যবানের মাথা কোলে নিয়ে রাগে-আক্রোশে ফুঁসছিল। প্রায় চল্লিশ মিনিট ধরে জুড়ির কসরৎ চলল। তারপর যমরাজের আবির্ভাব। আসরে যম ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে বিক্ষুব্ধ সাবিত্রী ছুটে এসে লুটিয়ে পড়ল যমরাজার পায়ে। বলল, 'আমার স্বামীর জীবন ফিরে চাইনে প্রভু, আপনি এই জুড়িব্যাটাদের হাত থেকে আমায় বাঁচান, বাঁচান। ওদের বেঁধে নিয়ে যান আসর থেকে।'

প্রশ্ন : **সেকালের বিখ্যাত শিল্পীদের মধ্যে কারা আপনার মনে ছাপ রেখে গেছেন?**

উত্তর : বনমালী মাস্টার, সূর্য দত্ত, চন্দ্র ভট্টাচার্য, কমলরানী, কালী গাইয়ে প্রভৃতি।

প্রশ্ন : **জীবন সম্বন্ধে আপনার নিজস্ব উপলব্ধি যদি কিছু থাকে তো বলুন।**

উত্তর : একটা কথা বলি, এই বিশ্ব-চরাচর, মহাজগৎ, গ্রহমণ্ডল অদৃশ্য এক মহান শক্তিধরের নির্দেশে চলে। মানুষ সেখানে খেলার পুতুল ছাড়া কিছু নয়। তার নিজের করবার কিছু নেই। কোন্ পথে সে চলবে তার কথাও সে জানে না। ধরুন আমি, আমার সারা জীবনটাই যা ভেবেছি তার উলটো হয়েছে। আমরা খুব গরীব ছিলাম। বাবা চাকরি করতেন কলকাতায়। ৫ টাকা মাইনের আড়তের সরকারের চাকরী। কাজেই বড় হতে হবে এই সংকল্প নিয়ে খুব মন দিয়ে পড়েছি। জানতাম এবং সকলের বিশ্বাস ছিল ম্যাট্রিকে স্কলারশিপ পাবো। কিন্তু পেলাম না। পড়বো আর্টস, কেন যে বিজ্ঞান নিয়ে আই এস সি পাশ করলাম বলতে পারব না। এম-এ-তে ঠিক করলাম এপ্লায়েড ম্যাথেমেটিকস পড়ব। কিন্তু কেন জানি না, টাকা জমা দিলাম বাংলা পড়ব বলে। জমা দিয়ে ফিরছি, হঠাৎ মতের পরিবর্তন হ'ল। নিলাম ইকোনমিকস। ইচ্ছে ছিল বি সি এস দেব, এগোলাম। হ'ল না। ইকোনমিকসে এম-এ ডিগ্রি নিয়ে ৩০ টাকা মাইনের মাস্টারি পেলাম। তার পরের বছর হলাম হেড মাস্টার। সেই থেকে টানা ৩৯ বছর আমি একই বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের কাজ করেছি। জীবনের আরও বহু অভিজ্ঞতা থেকে এই জীবন সত্যে পৌঁছেছি যে, হিংসা দ্বেষ, আস্ফালন, উচ্চাশা যা কিছু মানুষের কাম্য তা তার ইচ্ছায় পরিচালিত হয় না। হ'তে পারে না। সমাজ জড়জগৎ এক অলিখিত নির্দেশের অধীন।

ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র প্রথম পালা রচনা 'পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ'। দশম শ্রেণীতে পড়বার সময় পালাটি রচিত হয়। তারপর লেখেন 'রাজা গণেশ'। তৃতীয় পালা 'স্বর্ণ-লংকা'। ইনটারমিডিয়েট সায়েন্স পড়বার সময় ওটি রচিত। ১৯২৫ সালে। বেলেঘাটার বাণী নাট্য সমাজ সারারাত ধরে এ-পালা অভিনয় করেন। টানা ১২ ঘণ্টা। মাত্র ৫০ টাকায় তার কপিরাইট বিক্রয় করতে হ'ল সুধা প্রেসকে। তখন দুবেলা আহার জুটত না তাঁদের।

প্রশ্ন : **আপনার নাটকের প্রথম অভিনয় দেখতে দেখতে কিছু মনে হচ্ছিল কি আপনার? কোনো উপলব্ধি?**

উত্তর : হ্যাঁ, মনে হচ্ছিল, মাটির মানুষ তুচ্ছ। টানা বারো ঘণ্টা আমি ভিন্নতর এক জগতে ঘুরে বেড়িয়েছি। আসলে কি জানেন, সেকালের মন 'ম্যাটার' দেখত। ম্যানার নয়। কে কেমন সাজল, কি পোশাক পড়ল—সেটা বিচার হ'ত না। তাঁরা দেখতেন রস। আমার মতে আগের লোক অনেক বেশি রসজ্ঞ ছিলেন।

পেশাদারী যাত্রাদলে ব্রজেন্দ্রকুমারকে প্রথম নিয়ে আসেন ডায়মণ্ড লাইব্রেরির স্বত্বাধিকারী শ্রীকানাই শীল মশাই। দল গণেশ অপেরা। সে বছর অঘোরচন্দ্র কাব্য-শাস্ত্রীর সঙ্গে গণেশের মত ও মনান্তর ঘটেছে। গণেশ পালা নিল ব্রজেন্দ্রকুমারের। ১৯৩১ সালে 'বজ্রনাভ' পালা। সেই শুরু। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত সকল দলের জন্যেই তিনি পালা রচনা করেছেন। গণেশ,

বীণাপাণি, আর্য, মথুরে শা, ভাণ্ডারী, শশী অধিকারী, নট্ট, সত্যম্বর, রঞ্জন, তরুণ অম্বিকা, নাট্যভারতী, নিউ গণেশ, নিউ রয়েল, নিউ আর্য, নব রঞ্জন, ভারতী, জনতা, শ্রীরাধা মায় এ-মাকে প্রতিষ্ঠিত বৈকুণ্ঠ যাত্রা সমাজ পর্যন্ত। উপেন পাণ্ডা, ফণি মতিলাল (ছোট ফণী), প্রফুল্ল সেন, সুরেন মুখোপাধ্যায়, গোপাল পাল, বারধনা সরকার, ষষ্ঠী বন্দ্যোপাধ্যায় এঁরা পালাকার ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র অন্তরঙ্গ ছিলেন।

প্রশ্ন : **বাংলা থিয়েটারের সঙ্গে যাত্রার দ্বন্দ্ব কি চিরকাল?**

উত্তর : দ্বন্দ্ব! না, আদপে কোনো শত্রুতাই নেই। পিতাপুত্রে কি শত্রুতা হওয়া সম্ভব? আসলে যাত্রার সন্তান 'নাটক' বিদেশী পোশাক পরেছে বলে সে পর হয়ে যায় নি। যেতে পারে না। তবে কি জানেন, পিতারা একটু গোঁড়া হয়। এটা এক ধরনের মনস্তত্ত্ব। ধরুন আমাদের আকাশবাণী। পিতা বিখ্যাত শিল্পী, ওস্তাদ বাজিয়ে, সে 'এ' ক্লাশ পেলো না, পেলো পুত্র অথচ যোগ্যতায় পিতাই শ্রেষ্ঠ। তা হয়। হতেই পারে। তাই বলে পিতার মনে অভিমান হওয়া কি অন্যায়? তা নইলে সাধারণ থিয়েটারে আদান প্রদান বরাবরই ছিল। আমার 'বাঙালী' পালা মঞ্চে কাঙালী নামে অভিনীত হয়েছে। ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রীর 'নাগযজ্ঞ', 'জাহ্নবী' প্রভৃতি। আবার শচীনবাবুর নাটক যাত্রায় অভিনীত হতে দেখেছি। যাত্রাভিনেতারা মঞ্চে অভিনয় করেছেন, মঞ্চাভিনেতা যাত্রায়।

প্রশ্ন : **যাত্রা, নাটক এবং চলচ্চিত্রে তফাৎ কি?**

উত্তর : একটা কথা আমার মনে হয়। যাত্রাকে বলা যায় সামারি। নাটক-সাবস্ট্যান্স আর সিনেমা হচ্ছে প্রোস।

ব্রজেন্দ্রকুমার দে যাত্রাগানের যে এই পট-পরিবর্তন এবং জনপ্রিয়তা তার মূলে বিশেষ এক ব্যক্তির দানকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেন। বলেন, আনন্দবাজার পত্রিকার কাছেও আমরা যাত্রাশিল্প ঋণী। যদি তা কেউ কখনো অস্বীকার করে, তবে অন্যায় হবে।

প্রশ্ন : **কোন সময় থেকে এই পরিবর্তন সূচিত হয়েছে বলে আপনার মনে হয়?**

উত্তর : ১৯৫৯ সাল। যাত্রা নিয়ে যখন আনন্দবাজারে বিভিন্ন রচনা 'আনন্দলোক'-এ প্রকাশিত হতে থাকে। তারপর ১৯৬২-শোভাবাজার রাজবাড়ির যাত্রা উৎসব (বঙ্গীয় নাট্য সংগঠনী)। বিশ্বরূপা নাট্যোন্নয়ন পরিকল্পনার অন্যতম কর্ণধার শ্রীরাসবিহারী সরকার মশাই বিশ্বরূপায় নিয়মিত যাত্রাভিনয়ের সুযোগ দিয়েও অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করেছেন। শোভাবাজার রাজবাড়ির উৎসবের পর কোম্পানী বাগানে বিশাল এক যাত্রা উৎসবও শ্রীসরকারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। সহযোগিতা করেছিলেন সাতকড়ি পাল। হালে রবীন্দ্র সদন পরিচালকমণ্ডলী কুড়িদিনব্যাপী যাত্রা উৎসব করে দেশবাসীর কাছে নমস্য হলেন।

যাত্রাজগৎকে ব্রজেনবাবু তিন ভাগে ভাগ করেছেন। তার মতে এমন একটা সময় গেছে, যাকে বলা যায় 'অধিকারী প্রধান যুগ'। আদিতে অধিকারী অর্থাৎ স্বত্বাধিকারীদের অনেকে পালাও রচনা করেছেন। তাঁদের দাপট ছিল প্রধান। পরে এলো 'ম্যানেজার প্রধান যুগ'। তখন মালিকের তুলনায় ম্যানেজারদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আর এখন হচ্ছে 'অভিনেতা প্রধান যুগ'। যাত্রায় বক্স অফিস প্রথা চালু হওয়াতে অভিনেতাদের প্রাধান্য বেড়েছে। অত্যাচারও। এখন মালিক দুর্বল, ম্যানেজার কাহিল। কিন্তু কাল চক্রাকারে ঘোরে। দেখতে পাচ্ছি আবার মালিক প্রধান যুগ আসছে। তা না হলে যাত্রার অবনতি কেউ রুখতে পারবে না।

ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র শিল্পসৃষ্টি নিঃসন্দেহে গবেষণার বিষয়। পালা সাহিত্যে কি নাট্যসাহিত্যে এত বেশি সংখ্যক সফল রচনা আর কারও আছে কিনা সন্দেহ। তাঁর বিখ্যাত রচনার সংখ্যা শতাধিক। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য : স্বর্ণলঙ্কা, প্রবীরার্জুন, বঙ্গবীর, চাঁদের মেয়ে, কলঙ্কাবসান, চাষার ছেলে, গীতগোবিন্দ, আকালের দেশ, সমাজের বলি, দেবতার গ্রাস, রাজা দেবীদাস, শেষ আরতি, সোনার ভারত, প্লাবন, সোহরাব রুস্তম, জাহাঙ্গীর শাহ, শয়তানের চর, বাঙালী, দাসীপুত্র, রক্তের আলপনা, বর্গী এল দেশে, স্বর্ণময়ীর ঘর, যাদের দেখে না কেউ, সোনাই দীঘি, পতিতের ভগবান, ভাগ্যের বলি কবি চন্দ্রাবতী, উপেক্ষিতা, পরশমণি, কোহিনুর, গাঁয়ের মেয়ে, প্রতিশোধ, চণ্ডীমঙ্গল, নিষিদ্ধ ফল, চাঁদ সুলতানা, [illegible], যে অতীত কথা কও, মেঘে ঢাকা রবি, মহীয়সী কৈকেয়ী, সুলতানা রিজিয়া, ঝড়ের দোলা, লোহার জাল, পাপের ফসল, মুখের পাঁচালী, করুণাসিন্ধু বিদ্যাসাগর, দেশের ডাক, পতিঘাতিনী সতী, মৃত্যুঞ্জয় সূর্য সেন, কালাপাহাড়, শ্রীরামকৃষ্ণ সারদামণি প্রভৃতি।

চলচ্চিত্র নির্মাতাদের প্রতি ব্রজেন্দ্রকুমারের বিনীত অভিযোগ, ছবিতে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে যাত্রাদৃশ্য তাঁরা ব্যবহার করুন, আপত্তি নেই। কিন্তু যেন অভিজ্ঞতাপ্রসূত হয়। যাত্রা ঠাট্টা বা বিদ্রূপ করবার মতন শিল্পরূপ নয়। মানের দিক থেকে, আবেদনের দিক থেকে এবং জনপ্রিয়তায় সে যে ছায়াছবির তুলনায় কতখানি অগ্রগামী, আজকের কাল তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। তাঁর আবেদন যাত্রাকে সঠিক যথাভাবে যেন প্রদর্শিত হয়। না হলে দেশের মানুষ চলচ্চিত্রকেও ক্ষমার চোখে দেখবে না।

গেল অক্টোবরের এক সন্ধ্যায় আমাকে আরও অবাক করলেন ব্রজেনবাবু। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের মঞ্চে অভিনীত হল তাঁর 'শ্রীরামকৃষ্ণ সারদামণি'। বলেছিলেন, যাত্রায় অ্যান্টি ক্লাইম্যাক্স পালা রচনা করা সম্ভব। সেদিন বিশ্বাস করিনি। কিন্তু এ পালা দেখে মনে হল তাঁর পক্ষে অসাধ্য কিছু নেই। এই তো সেদিন অনেক রাতে পারক সারকাসের যাত্রা দেখে একসঙ্গে ফেরার পথে বললেন, 'আসলে বোধ, বিশ্বাস, উপলব্ধি আর পড়াশোনা থাকলে সব অসাধ্যই সাধন করা চলে। আসলে সব হচ্ছে মন, ইচ্ছা অর্থাৎ 'উইল'।' 'ইন-কনভেনশনাল সাইকোলজি, এ ডিস্টিংশন ইজ অফন মেড বিটুইন থ্রি আসপেক্টস অভ উইল : কোনাশন, উইল অ্যান্ড ভোলিশন। কোনাশন ইজ দি ব্রডেস্ট টার্ম, কভারিং দি থিওরেটিক্যাল এলিমেন্ট ফ্রম হুইচ দি উইল ইজ সাপোজড টু ওরিজিনেট, সচ অ্যাজ 'দি উইল টু লিভ'। উইল, ইন ন্যারোয়ার সেন্স, ইজ দি কম্বিনেশন অভ ইনটেলেকচুয়াল অ্যান্ড ইমোশনাল এলিমেন্টস হুইচ ব্রিং দি ডিজায়ার টু অ্যাক্ট টু দি লেভেল অব কনশাসনেস। ভলিশন ডেসক্রাইবস দি ইমিডিয়েট ইমপালস হুইচ ইনিসিয়েটস বডিলি অ্যাকটিভিটি'।

Cali–tut
special
ক্যালি-কট স্পেশাল

পাণ্ডিতের পিন ফোটাতে যাবেন না। বিবর্তন, পরিবর্তন—গোটা সৃষ্টির মূলে যে-নিয়ম এখানেও দোর্দণ্ড সেটাই। এই বিশ্বাস মাথা ব্যথায় অমৃতাঞ্জন। সকলকে শীতল করছে, আপনি একা জ্বলবেন কেন।

এই বিশ্বাসই চলন্ত সিঁড়ি—'এস্‌কালেটার।' দাঁড়িয়ে থাকলেও আপনাকে পৌঁছে দেবে সেখানে, যেখানে বরাভয় মুদ্রা ধরে দণ্ডায়মান সব সাঁই আর গোঁসাই—ধর্ম, গুরুবাদ মতবাদ। এমন-কী নিজস্ব জাতি সত্তা বিসর্জন দিয়ে অন্য ব্যক্তিপূজা। একটি কম্বলের তলায় ঢুকে যাওয়া অথবা অনেকে মিলে একটি লেপ-মুড়ি, তাতেও হি হি শীতে তুক্তুক্ 'ওম', নিরাবিল আরাম এবং শান্তি।

নিজের কথা নিজে ভাবতে মাথার দিব্য কেউ তো দেয়নি, প্রচলিত ধর্মবাণীগুলিকেই আউড়ে নিয়ে দেখুন না। "সর্ব ধর্মান্ পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"।—(গীতা)। "আমা দিয়ে না গেলে কেহ ঈশ্বরের নিকট যাইতে পারিবে না।"—(বাইবেল)। আমাদের পাপের ভারও তাঁরই মাথায় কাঁটারমুকুট। অথবা—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি" লক্ষ্য করুন, এখানেও "সংঘ", মানুষকে এককক্ষে স্থিত হতে বলেনি। যা "ধরে থাকি," ধর্মের একটা মানে শুনেছি এই। ধৃতি। কিছু ধরতে হলে বাকী সব ছাড়তে হয়। বাসের হ্যাণ্ডেল ধরে যখন ঝুলি, তখন যেমন ছাড়ি মাটি।

বুদ্ধিকে বরখাস্ত করে শুধু বোধি দিয়ে এই পর্যন্ত পৌঁছে দম নিচ্ছি। এই দিয়েই খুঁজে নেব মিছিলের মানে, কুম্ভে সাগর-সংগমে পীঠধামে-ধামে লক্ষ লক্ষ মানুষ মেলে কিসের টানে, সেই নম্র-নিরস্ত সমর্পণের অর্থ আবিষ্কার করব বলে অধীর হয়ে আছি। কখনও কোনও তীর্থে যদি যাই তবে পাণ্ডাকে সঙ্গী না করে গর্ভগৃহে যাচ্ছি না। মনোমত "গাইড্"-এর হাত না ধরে লখনউ-এর "ভুল ভুলাইয়াতে" আমি তো আর ঢুকছি না।

(২)

এই পর্যন্ত লিখে যাঁকে শোনালুম, তিনি বললেন, দেখুন, এত সাত-কাহন না লিখে মানুষের মূলে যদি তাকাতেন, তবে এত কথার কুহেলি তৈরী করার দরকারই হত না। সমষ্টি আর ব্যষ্টির মধ্যে চক্রাবৃত্ত মানুষ, জনতা আর নির্জনতা দুই-এর প্রতি আসক্তি নিহিত তার স্বভাবের গভীরে। মানুষ মানুষকে টানে আবার মানুষই মানুষকে ক্লান্ত করে, দেয় ঠেলে।

কোনও ছুটির দিনে, যেদিন কাজ নেই, বন্ধু-বান্ধব কেউ এল না, পরিচিত-অপরিচিত কেউ "কলিং বেল" টিপল না, সেদিন প্রথমে বলি "বাঁচা গেল" আর প্রায় তখন থেকেই ছটফট করতে থাকি। তারপর হয়ত বেরিয়ে পড়ি, অবোধ বিড়াল প্রভৃতি প্রাণী যেমন ঝোপে ঝাড়ে মাটি আঁচড়ে খুঁজে-পেতে নেয় নিজের ওষুধ, আমিও তেমনই সঙ্গসাহচর্যের বিশল্যকরণী খুঁজি। একটি আড্ডা একটি আশ্রয়, "কে কোথায় আছ"—এই আর্তস্বর।

সারা দিন গলদঘর্ম দুপুরে এখনও তো মেলায় মেলায় ঘুরি। কিসের অন্বেষণে? আজ তো খেলনা কিনি না, ছুঁয়েও দেখি না। চড়ি না নাগরদোলায়। তবে?

তবের উত্তর "মানুষ।" মানুষের ভিড়ে মিলে যাওয়া, তাদের গন্ধ, তাদের মুখ, তাদের ধুলি-ধুসর দেহ, তাদের দৃষ্টি। শুনি, শুঁকি, দেখি, সত্তা দিয়ে চাটি।

সেদিনই সন্ধ্যায়, ক্লান্ত, ঘরে ফিরে আলো নিবিয়ে হয়ত বা মনে মনে বলি, "এই মুহূর্তে আর কাউকে চাই না, হে ঈশ্বর। আজ যেন কেউ না আসে। এলানো এই একা-চেয়ারে খানিক চোখ বুজে নিজেরই ভিতরটা দেখি। অথবা আকাশ। অথবা বাতাস। মাখামাখি হয়ে চুপসানো অনুভূতিকে ভরপুর করি।"

মানুষ এই আসক্তি আর বিবিক্তি নিয়েই। কিংবা, কে জানে, হয়ত কোনো-কোনো পশুও। বন্যহস্তী যূথবদ্ধভাবে বিচরণ করে, আবার তাদেরই এক-একটা হঠাৎ দলছুট হয়ে, ভয়ঙ্কর শুঁড়ে ভেঙে-চুরে; ভারী পায়ে থেঁতলে, নিজের রাস্তা নিজেই সাফ করতে করতে ছোটে দেখেননি? মানুষের মধ্যেও সেই যৌথ এবং আপনাতে আপনি নিমজ্জিত বিরোধী দুই বৃত্তি আছে। সে-আবার নিজে থেকে নিজেই থিতোয়, শান্ত হয়ে আসে।

যেমন জীববিদ্যা মনোবিদ্যা বলে, পৌরুষ, আর রমণিত্বের সমাবেশ আছে প্রতিটি নর আর নারীর দেহে-মনে। সকলেই অর্ধনারীশ্বর হরগৌরী। তারতম্য অনুপাতে। শালপ্রাংশু মহাভুজ পুরুষ একটু বেশি পুরুষ, ললিত লবঙ্গলতারা একটু বেশি পরিমাণে নারী। কোনও পুরুষ আবার মেয়েলি, যেমন বহু রমণীর মধ্যে বেশ খোলাখুলি পুরুষালি।

এই তত্ত্বটাকে ব্যক্তিবোধ আর সমাজবোধের ব্যাখ্যাতেও বিস্তৃত করে দিন। দেখবেন, কোনও মানুষ হয়ত কিছু বেশিমাত্রায় সঙ্গলিপ্সু বহির্মুখী, কেউ-বা প্রকৃতিতে অন্তর্মুখী শম্বুক, কিন্তু বেশির ভাগই এই দুই মেরুর মধ্যবর্তী মহাদেশ-বাসী। সেই মানুষ আপন স্রোতে আপনি মত্ত, আবার সকলের সহিতও। একের বাসনা আর স্বার্থ আর অনেকের কল্যাণ আর পরমার্থ, এই দুইয়ের মধ্যে কখনও সংঘাত বাধে, কখনও সে দুটোকে মেলায়। ক্ষুরধারা সময়ের স্রোতের উপরে, দুই বিন্দুর মধ্যে মনে-মনে সাঁকো তৈরী করেছে যে-মানুষ, সেই মানুষই আবার কখনও সাঁকোটায় দাঁড়িয়ে কাঁপে, কেবলই কাঁপে।

এম এস শুভলক্ষ্মী

রেখা বড়ুয়া

এম এস ইংরেজি বর্ণমালার এই দুটি অক্ষরে কি যাদু মাখানো আছে তা দক্ষিণ ভারতে না এলে বোঝা যাবে না। নামের আদ্য অক্ষর দিয়েই দক্ষিণের অধিবাসীরা চেনেন তাঁদের অদ্বিতীয়া শিল্পী, সঙ্গীত জগতের রাণী এম এস শুভলক্ষ্মীকে। তামিলনাড়ু, অন্ধ্র কেরালা সর্বত্রই তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এত শ্রদ্ধা এত ভালবাসা খুব কম শিল্পীই পেয়েছেন সারা জীবনে। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে অপরিসীম অধিকার, অপূর্ব সুরেলা কণ্ঠ আর অদ্ভুত নিষ্ঠাই যশ এবং মর্যাদার শিখরে প্রতিষ্ঠিত করেছে শ্রীমতী শুভলক্ষ্মীকে।

মাদ্রাজে এসে স্বভাবত মনে একটু কৌতূহল জন্মেছিল এঁকে দেখবার। জানতে ইচ্ছা হয়েছিল কোন গুণে রাষ্ট্রীয় সম্মান "পদ্মভূষণ" ইনি পেয়েছেন, কোন যাদুমন্ত্রে জয় করেছেন ইনি সারা ভারতের সমস্ত সঙ্গীত পিপাসুর হৃদয়।

স্বামী শ্রীসদাশিবনের কাছে টেলিফোনে জানালাম আমার ইচ্ছা। আমি জানতাম যে এঁরা অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ। একেবারে একা পাওয়া প্রায় অসম্ভব। তবু তারই মধ্যে একদিন সময় স্থির হল। বাড়িতে অতিথি তবু এরই মধ্যে যেটুকু সময় পাওয়া যায় তাই বা মন্দ কি।

'কল্কি' দক্ষিণ ভারতের নামী সাপ্তাহিক; এঁদের নিজস্ব পত্রিকা। তাই কল্কি ভবন খুঁজে নিতে সময় লাগল না। বাড়িতে অনেক মানুষের ভিড়। আমেরিকান টুরিস্ট থেকে শহরের বহু গণ্যমান্য মানুষের দেখা পেলাম সেখানে। দোতলায় বারান্দায় সোফা বেতের চেয়ারে বহু অতিথি। অন্দরে বিরাট হলঘর জোড়া কার্পেট। সেখানে উপস্থিত মহিলারা। একটু হতাশ হলাম সন্দেহ নেই। জগৎ জোড়া খ্যাতির শিল্পীকে দেখবো মহিমময়ী রূপে, ভক্তমণ্ডলীর মাঝে। শিল্পীর আর আমার মাঝে স্বভাবতই থাকবে এক অদৃশ্য দেওয়াল। এভাবে কি মানুষকে জানা যায়? নাকি এতে মন ভরে।

এগিয়ে এলেন শ্রীসদাশিবন, হাত নেড়ে ডাকলেন এক কর্মব্যস্ত মহিলাকে। হয়ত আমি বিশেষ করে লক্ষ্যই করতাম না তাঁকে যদি না শ্রীসদাশিবন্ পরিচয় করিয়ে দিতেন,—এই আমার স্ত্রী লক্ষ্মী।

উজ্জ্বল ফরসা রং, মিষ্টি মুখশ্রী; মধ্য-বয়সী ভদ্রমহিলা। গাঢ় মেরুন রং-এর কাঞ্জিভরম শাড়ি পরনে, খোঁপায় ফুলের মালা, নাকে কানে হীরের ফুল। দক্ষিণী ব্রাহ্মণ পরিবারের এক সাধারণ গৃহিণী থেকে কোন তফাৎ নেই সাজে এবং ব্যবহারে। আর পাঁচজন অতিথির মত আমাকে নিয়েও ব্যস্ত হলেন গৃহিণী। কোথায় বসালে যোগ্য সমাদর হবে ভেবে পাচ্ছেন না। আমার কাছে এসে বসলেন অন্তরঙ্গ হয়ে, পরিচয় করিয়ে দিলেন অন্যদের সঙ্গে। ওঁর এক আত্মীয়া হেসে বললেন, আপনি ওঁর কথা শুনতে এসেছেন কিন্তু উনি ত' নিজের কথা কখনও মুখে ফুটে বলেন না। আমি শিল্পীকে বললাম দেশজোড়া আপনার খ্যাতি, আপনার গান শুনে মুগ্ধ হয়েছি, আজ তাই কাছ থেকে দেখতে এসেছি আপনাকে।

অপ্রতিভ হাসি হাসলেন শ্রীমতী শুভলক্ষ্মী। হাত নেড়ে বললেন—আমি কিছু নই। যা কিছু দেখছেন সবই ভগবানের আশীর্বাদে, আমি শুধু চেষ্টা করছি তাঁর সেবা করতে।

বিয়ে হয়েছিল চব্বিশ বছর বয়সে। সেকালের বিখ্যাত বীণা বাদিকা মার কাছ থেকে পেয়েছিলেন সঙ্গীতে উত্তরাধিকার প্রথম বিদ্যারম্ভ মার কাছে, অতঃপর এসেছেন ভারত বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞদের সংস্পর্শে। লাভ করেছেন এঁদের অকৃপণ দাক্ষিণ্য। এর পর এসেছে উন্নতি। কিন্তু তবুও সঙ্গীত জগতে প্রতিষ্ঠা পেতে কেটে গেছে অনেকগুলো বছর যা হিসেবে ধরা যায় না। দীর্ঘদিনের একনিষ্ঠ সাধনার পুরস্কার এসেছে অবশেষে। ভগবানে বিশ্বাসী শুভলক্ষ্মীর জীবনে ভগবানের আশীর্বাদ এসেছে সহস্র ধারায়। যশ, অর্থ সম্মান কোন কিছু আর না পাওয়া নেই। কিন্তু তবু এই শিল্পীকে দেখলে মনে হয় না যে উনি সচেতন সে সম্বন্ধে। নিজের ক্ষমতা নিয়ে কোন দম্ভ নেই, নেই কোন অহমিকা। ব্যক্তিগত জীবনে সন্তান এবং স্বামী নিয়ে অত্যন্ত সুখী ইনি। জীবনের বড় আকর্ষণ সঙ্গীত, সবচেয়ে বড় অবলম্বন ঈশ্বর। এই নিয়েই শ্রীমতী শুভলক্ষ্মীর জগৎ। নিজের সবচেয়ে বড় সম্পদ, কণ্ঠকে তিনি নিয়োগ করেছেন মানুষের কল্যাণে, যখনই ডাক এসেছে। সারাজীবনে বহু সাহায্য রজনীতে গান গেয়েছেন উনি নিঃস্বার্থভাবে। একমাত্র এই শিল্পীর সহযোগিতায় আনুমানিক চল্লিশ লক্ষ টাকার মত লাভ করেছে বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠান। ব্যক্তিগত দানও এঁর রয়েছে প্রচুর সারা দেশে। কর্ণাটকী সঙ্গীতের তিন দিকপাল ত্যাগরাজ, মুথুস্বামী দিক্ষিতর এবং শ্যাম-শাস্ত্রীর স্মৃতিরক্ষায় এঁর দানের কথা সঙ্গীত জগতে অক্ষয় হয়ে থাকবে।

দক্ষিণ ভারতের এই সঙ্গীত কুশলা হয়ত শুধু দক্ষিণ ভারতের শিল্পী হয়ে থাকতেন যদি না এঁর অপরিসীম আকর্ষণ থাকত হিন্দুস্থানী ভজন গানের প্রতি। 'মীরা' ছবিতে গাওয়া তাঁর হিন্দী ভজনগুলি তাঁকে প্রথম সারা ভারতের মানুষের কাছে পরিচিত করে তুলল। এর পর কবীর, তুলসীদাস, মীরাবাঈয়ের আরও অনেক ভজন উনি গেয়েছেন। গানগুলি কর্নাটকী সঙ্গীতের ভঙ্গি দ্বারা অল্পবিস্তর প্রভাবিত হলেও নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত পিপাসুদের হৃদয় জয় করেছে। স্বর্ণ কণ্ঠী শুভলক্ষ্মীর অপূর্ব স্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁর নিজস্ব ভক্তি ভাব, যা গানগুলিতে আরোপ করেছে এক অপূর্ব মাধুর্য। ভজন গানের প্রতি ওঁর নিজস্ব টান রয়েছে দেখলাম। বাংলা দেশের যূথিকা রায়ের ভজন ওঁর খুব প্রিয় জানালেন। ছবির কাজে যখন কলকাতা এসেছিলেন অনেক বছর আগে তখন পরিচয় হয়েছিল অনেক শিল্পীর সঙ্গে। শ্রদ্ধার সঙ্গে নাম করলেন কানন দেবী, পাহাড়ী সান্যাল, কৃষ্ণচন্দ্র দে'র। আর? বাঙালী আর কোন শিল্পীর সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে?

আর দিলীপদাদা, উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন শিল্পী। আমাকে ছোট বোনের মত দেখেন, উনি ত সারা দেশের। শুধু বাংলার নন। পণ্ডিচেরী থেকে উনি মাঝে মাঝেই আসতেন আমাদের কাছে, জানালেন শুভলক্ষ্মী।—সামনে জানুয়ারিতে দিলীপ দাদার জন্মতিথি প্রতিপালিত হবে কলকাতায়, আমরা যাচ্ছি তখন আপনার দেশে আপনিও আসুন না, হেসে বললেন উনি।

—হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ওপর আপনার আকর্ষণের কথা শুনেছি। একদিন কিন্তু সে গান আপনার মুখে শোনবার আকাঙ্ক্ষা রইল, বললাম আমি।

—না না, ও কথা বলবেন না, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের কতটুকু আর জানি আমি, শুধু কিছু খেয়াল, ঠুংরী মাত্র শিখেছি সিদ্ধেশ্বরী দেবীর কাছে, বললেন শিল্পী তাঁর স্বাভাবিসিদ্ধ নম্রতার সঙ্গে।

কথার ফাঁকে আমার খোলা কলমটা তুলে বন্ধ করে পায়েসের বাটিটা তুলে ধরলেন আমার সামনে,—আগে একটু খেয়ে নিন ভাই।

শ্রীশদাশিবন একটু হাসলেন, বললেন, আমার স্ত্রী একটু সেকেলে মানুষ, ঠিক আজকালকার মত নন। কথাটা হয়ত সত্যি। দিনের মধ্যে অনেকখানি কাটে এঁর পুজোর ঘরে। চাল-চলনও ঠিক ইওরোপ আমেরিকা ঘুরে আসা অন্য সব মানুষের মত নয়। দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত যে ইনি ইউ এন ও-তে পর্যন্ত বিস্ময় সৃষ্টি করে এসেছেন তাঁর অপূর্ব সঙ্গীত পরিবেশন করে।

এতদিন নাম শুনেছিলাম, এবার ঘনিষ্টভাবে দেখলাম এই নামী শিল্পীকে। এই এক রূপ। কিন্তু আরও এক রূপও কিন্তু এঁর আমি দেখেছি সঙ্গীতের আসরে। পাদপ্রদীপের আলোয় মৃদঙ্গ, বেহালা তানপুরার মাঝখানে মুখে মিষ্টি হাসি। শ্রোতাদের মধ্যে পরিচিত কারুকে দেখলে সে হাসিটুকু আরও স্পষ্ট হচ্ছে। তারপর কখন এক সময় তলিয়ে গেলেন সুরের সাগরে। মন্দ্র মধ্য সপ্তকে ভরাট সুরেলা কণ্ঠ, উজ্জ্বল জ্যোতির প্রকাশ তার সপ্তকে। সাবলীল পূর্ণ স্বর অক্লেশে ছুঁয়ে আসে তার সপ্তকের অনেকগুলি স্বরকে। কর্ণাটকী সঙ্গীতের অন্যতম প্রধান অঙ্গ হচ্ছে 'সরগম'। এর প্রয়োগ নৈপুণ্য মুগ্ধ হয়ে শোনবার মত। উর্ধ্ব ও নিম্ন শ্রুতির একত্র প্রয়োগে চঞ্চল আন্দোলনময় গতি হল দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতের একটি বৈশিষ্ট্য। কিন্তু তার মাঝেও ক্ষণে ক্ষণে যেন ধরা পড়ছিল হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ধ্যান রূপটি। স্থিত রূপে স্বরের প্রয়োগে যে উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত ধারার রেশ পাওয়া যাচ্ছিল মাঝে মাঝে তা শুনলে যে কোন সঙ্গীত রসিকের মনে হয়ত আশার সঞ্চার হবে। চকিতে একবার মনে প্রশ্ন জাগবে উত্তর ও দক্ষিণের দুই মহান সঙ্গীতের ধারার মিলনে কোন মহত্তর সঙ্গীতের সৃষ্টি কি একেবারে অসম্ভব?

আমার প্রশ্নে শিল্পী জানালেন সচেতন ভাবে এ কথা উনি এর আগে ভেবে দেখেন নি, তবে কথাটি ভাববার মত সন্দেহ নেই।

অতিথিদের নিয়ে ব্যস্ততার ফাঁকেও ধৈর্য ধরে যথাসাধ্য আমার সব প্রশ্নের জবাব দিলেন শ্রীমতী শুভলক্ষ্মী।—আপনার কাছে আমার যা শোনবার যা জানবার ছিল তা হয়েছে, তবু আর একটু কৌতূহল রয়ে গেল।

—বলুন?

আপনার জীবনে এমন কোন ঘটনার কথা আপনার কি এই ব্যস্ত মুহূর্তেও মনে পড়ছে যা সত্যি মনে রাখবার মত?

হ্যাঁ, তা আছে। শ্রীমতী শুভলক্ষ্মীর শিল্পী জীবনে এমন ঘটনা ঘটেছে যার স্মৃতি আজ এই মুহূর্তেও তাঁর মনে স্পষ্ট হয়ে আছে। আবেগ-প্রবণ সরল-প্রাণ শিল্পীর জীবনে সে স্মৃতি আজও মনে তীব্র বেদনার সৃষ্টি করে।

"হরি তুম হরো"—অতি প্রিয় গান মহাত্মা গান্ধীর। জাতির জনকের জন্মতিথি উপলক্ষে তাঁর প্রিয় অনেকগুলি ভজন রেকর্ড করলেন শুভলক্ষ্মী। "হরি তুম হরো" গানটি তার মধ্যে ছিল না। মহাত্মা বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশ করলেন ঐ গানখানি তাঁর বিশেষ স্নেহের পাত্রী শুভলক্ষ্মীর কণ্ঠে শোনবার জন্য। মধ্যরাত্রি পর্যন্ত আকাশবাণীর স্টুডিওতে থেকে অনেক পরিশ্রম করে মহাত্মার জন্মদিনের শ্রদ্ধার্ঘ হিসেবে গানখানি রেকর্ড করলেন শুভলক্ষ্মী। ২রা অক্টোবর সে গান শুনে মুগ্ধ হলেন মহাত্মা, আশীর্বাদ করলেন শুভলক্ষ্মীকে।

এরপর প্রায় তিন মাস কেটে গেছে। ৩০শে জানুয়ারী সন্ধ্যায় এক অবসর মুহূর্তে রেডিওর কাঁটা ঘুরিয়ে চলেছিলেন শুভলক্ষ্মী। সহসা হাত অবশ হয়ে গেছিল তাঁর।—ঘাতকের হাতে নিহত হয়েছেন জাতির জনক, স্তব্ধ হল বেতার ঘোষকের বেদনাক্ষুব্ধ স্বর আর সঙ্গে সঙ্গে সারা ভারতের সমস্ত কেন্দ্রগুলি থেকে বেজে উঠল এক আবেগময় কণ্ঠ—হরি তুম হরো—তিন মাস আগে বাপুর ইচ্ছা পূরণ করতে যে গান গেয়েছিলেন শুভলক্ষ্মী, এ সেই গান।

নিজের গাওয়া গান শুনে সেদিন চেতনা হারিয়ে ছিলেন শিল্পী। বার বার অভিশাপ দিয়েছিলেন নিজের কণ্ঠকে। এর পর দীর্ঘ দিনের মধ্যে কারও অনুরোধে এ গান গাননি তিনি।

স্থির হয়ে চিন্তা করলে ছোট বড় বহু স্মৃতিই ভিড় করে আসে। কিন্তু তার সময় কোথায়। পঞ্চাশ উত্তীর্ণ শুভলক্ষ্মী আজও অত্যন্ত ব্যস্ত শিল্পী। দিল্লী, বম্বে, বরোদা, কলকাতা—আজ এখানে। কাল আর এক জায়গায়। ভারতের বাইরেও বহুবার তাঁকে যেতে হয়েছে গানের তাগিদে।

—আজ আমার যা কিছু দেখছেন সবই ভগবানের কৃপায়। আবার বললেন শ্রীমতী শুভলক্ষ্মী, আর, একটু হাসলেন, সব কিছুর মূলে একটি মানুষ, তিনি হচ্ছেন আমার স্বামী। উনি না থাকলে আজ আমার কোন মূল্যই থাকত না, উনিই সৃষ্টি করেছেন আপনাদের স্নেহ ধন্য শিল্পী শুভলক্ষ্মীকে।

আমি বিদায় চাইলে দু হাত জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, আবার আসবেন ভাই, বড় আনন্দ হল আজ।

ফেরবার পথে শুধু একটি কথাই আমার মনে জেগেছে। নিজেকে শুধু বার বার বলেছি, প্রতিভার সঙ্গে নম্রতা আর বিনয়ের যোগ হলে তা এত সুন্দর, এত মহৎ হয় তা কি এর আগে এমন করে কখনও জেনেছি।

আলোচনা

"সবুজ বিপ্লব"

অধ্যাপক সুব্রত গুপ্ত 'ভূমি সংস্কার নীতির মূল্যায়ণ' প্রসঙ্গে (দেশ, ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৬৯) ভারত সরকারের সম্ভাব্য ভূমিনীতির বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করেছেন মাত্র—এ নীতির অর্থনৈতিক ফলাফল 'সবুজ বিপ্লব'কে কতখানি সবুজ করে রাখতে পারবে বা আদৌ পারবে কিনা এ কথাটা এড়িয়ে গেছেন। প্রথমেই বলে রাখা ভাল যে ভারত সরকার এখনো দু নৌকায় পা দিয়ে চলেছেন—তাদের ভূমি নীতির গুণগত পার্থক্য কিছু ঘটেছে বলে মনে হয় না। স্বাধীনতা লাভের ২২ বছর পরেও বলতে হচ্ছে জমির সর্বোচ্চ পরিমাণ বেঁধে দেওয়া হবে, উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টন করা হবে, মধ্য স্বত্বাধিকার লোপ করা হবে ইত্যাদি। তাদের এই বহু ঘোষিত নীতিগুলি কত ফাঁকা তারা ভেবে দেখছেন না। প্রথমত জমির সর্বোচ্চ পরিমাণ কতটা হবে এ প্রশ্নও সমস্যাবিহীন নয়। সরকার যে সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দিতে চাইবেন অনেক বামপন্থী নেতাদের কাছে তা বেশ উঁচু মনে হতে পারে সঙ্গত কারণেই। তাছাড়া জমির সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দিলেই অনেক উদ্বৃত্ত জমি সরকারের হাতে এসে পড়বে বলে মনে হয় না। বড়ো এবং ছোট পরিবার একই সীমার আওতায় থাকবে এটাও নীতিগত দিক থেকে সমর্থন যোগ্য নয়।

দ্বিতীয়ত, ভারতের বিপুল সংখ্যক ভূমিহীনদের প্রয়োজন মত জমি দিতে যে পরিমাণ উদ্বৃত্ত জমির প্রয়োজন পড়বে সরকারের হাতে সে পরিমাণ জমি আসবে কিনা ভেবে দেখা প্রয়োজন। অধ্যাপক গুপ্তের ধারণা—ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টিত জমির মালিকানার গ্যারাণ্টি থাকলে ভবিষ্যৎ ফলন বৃদ্ধি হতে পারে, মেনে নিতে পারছি না। বরঞ্চ এতে ফলন কমে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। বড়ো বড়ো জোতদারদের কাছ থেকে নেওয়া জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়ায় জমির বিখণ্ডন (fragmentation) বাড়াবে যা উন্নত ধরনের চাষের পরিপন্থী। তাছাড়া উন্নত প্রথার চাষে মূলধন ব্যবহারের আর্থিক সঙ্গতি ও দক্ষতা এবং বিভিন্ন উপাদানের কাম্য অনুপাতের ধারণা থাকা প্রয়োজন। একক-ভাবে চাষীদের উন্নত প্রথায় চাষের কোন সামর্থ্যই নেই। সদিচ্ছাই ফলন বৃদ্ধির একমাত্র কারণ হতে পারে না। তাই দীর্ঘ-কালীন সময়ে এ ব্যবস্থায় ফলন বৃদ্ধি স্থায়ী করা কোন ক্ষেত্রেই সম্ভব নয়। সুতরাং তথাকথিত 'সবুজ বিপ্লব'কে স্থায়ী করতে হলে আমাদের দুই পথের একটা বেছে নিতে হবে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মত বড়ো খামার প্রথায় জমি চাষ করতে হবে যেখানে খামার-মালিকের অধীনে বেতনভুক অনেক শ্রমিক কাজ করবে যারা কখনোই জমির মালিক হতে পারবে না। কিছু শ্রেণীর লোকের হাতে উৎপাদন ব্যবস্থা থাকলে এবং বণ্টনের কাঠামো সরকার বেঁধে দিলে দেখা গেছে, সংকটকালে একদল চোরাকারবারী ও কালোবাজারীর সৃষ্টি হয় এবং সরকারকে তখন অসহায় দর্শকের ভূমিকা নিতে হয়। তাই দ্বিতীয় পথ অর্থাৎ সমবায় প্রথায় চাষের কথা সরকারকে জোর গলায় বলতে হচ্ছে। শ্রীজওহরলাল নেহরুর আমলে এই প্রথায় চাষের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল, আজ তা প্রায় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। যেসব ভূমি-হীনদের সরকার জমি বিলি করবেন তারাও হয়তো সমবায় প্রথায় চাষ করতে রাজী হবে না। তাই সমবায় প্রথায় চাষ বাধ্যতামূলক করে আইন প্রণয়ন না করলে দেশের অধিকাংশ চাষযোগ্য জমি এর আওতার বাইরে থেকে যাবে এবং চাষীর সামর্থ্যের অভাব ও জমির বিখণ্ডন ফলন কমিয়ে অর্থনৈতিক অগ্রগতি ব্যাহত করবে। অথচ সমবায় প্রথায় চাষ বাধ্যতামূলক করার ঝুঁকি নিতে স্পষ্টতই সরকার দ্বিধাগ্রস্ত। আমাদের দেশে সরকারী ও আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির ছবি বড়োই করুণ। তার কারণও স্পষ্ট—এসব প্রতিষ্ঠানের শুধু মালিকানাই গেছে কিন্তু রয়ে গেছে আমলা-তান্ত্রিক উৎপাদন ও পরিচালন ব্যবস্থা। এ কথা ভাববার সময় এসেছে যে সরকারী উৎপাদন কাঠামোর সাফল্য না এলে, যিনি যত জোর গলায়ই বলুন না কেন, এদেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে না। ভূমিনীতির আমূল পরিবর্তন এবং বাধ্যতামূলক সমবায় প্রথায় চাষ তরান্বিত ও সফল করতে না পারলে 'সবুজ বিপ্লব' শুধু অনাগত দিনের ইচ্ছে হয়েই থাকবে। সরকার ঘোষিত ভূমি নীতির ইঙ্গিতে এ আশংকাই প্রকাশ পাচ্ছে।

বিনয়ভূষণ দত্ত
পশ্চিম দিনাজপুর।

পূর্ব বাংলার শ্রেষ্ঠ কবিতা

শক্তি চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিক 'পূর্ব বাংলার শ্রেষ্ঠ কবিতা'র আলোচনায় কয়েকটি লক্ষ্যণীয় বিষয় সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন মনে হচ্ছে। আলোচনা প্রসঙ্গে যেসব কবিদের উল্লেখ করা হয়েছে তা ছাড়াও এদেশের কবিতা সৃষ্টিতে আলাউদ্দিন আল-আজাদ, হাসান হাফিজুর রহমান, আহমদ রফিক, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর কয়েকটি প্রধান নাম —অথচ এদের সম্বন্ধে আশ্চর্য নীরবতা আমাদের বিস্মিত করেছে। তরুণদের মধ্যে আবদুল মান্নান, আবুবকর সিদ্দিক এবং বিশেষ করে গ্রাম বাংলার ঘনিষ্ঠ উত্তাপে সৃষ্ট আহমদ রফিকের নিসর্গ-প্রধান কবিতা সঙ্কলকের দৃষ্টি এড়িয়ে গেল কেমন করে—এবং কেন বোঝা কঠিন। বন্দে আলী মিঞা ঠিক বিভাগোত্তর পূর্ব বাংলার কবিতা ধারার প্রতিভূ নন কোন দিক থেকেই। জসীমউদ্দিন সম্বন্ধেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। তাছাড়া শহীদ কাদরীর মাতৃভাষা উর্দু—এই অদ্ভুত তথ্যটি লেখক কোথায় পেলেন, তা আমাদের বুদ্ধির অতীত।

এ ধরনের অসম্পূর্ণ, খণ্ডিত সংকলন 'পূর্ব বাংলার শ্রেষ্ঠ কবিতা' নামে নির্দিষ্ট করতে গিয়ে সঙ্কলক বেশ কিছু কবির প্রতি অবিচার করেছেন—অন্তত এ ধরনের প্রচেষ্টা কার্যকরী করে তুলবার আগে যোগাযোগ, সংগ্রহ প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি অধিকতর মনোযোগী হওয়া উচিত ছিল। আর সংকলনের আলোচনা প্রসঙ্গে দুইজন কবির দীর্ঘ, একাধিক উধৃতি এবং প্রতিষ্ঠা আরো বেশ কয়েকজনের সম্পর্কে নীরবতা আমাদের বিস্মিত করেছে। যাদের নাম উপরে উল্লেখ করেছি তাদের প্রত্যেকেরই এক এবং একাধিক কবিতা-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এবং বেশ কয়েক বছর আগেই।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ১০ই আশ্বিন, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ (২৭শে সেপ্টেম্বর—১৯৬৯) সংখ্যা 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত সনাতন পাঠকের লেখা সাহিত্য সংবাদ আমার এই চিঠির লক্ষ্য। এ চিঠি 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশ করলে খুশী হবো।

সৈয়দ আবুল মকসুদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর নানা দেশে আতিথ্য গ্রহণ করলেও অস্ট্রেলিয়াতে কখনো আসেন নি। গম, পশম এবং ক্যাঙারুর নামে পরিচিত এই জনবিরল দক্ষিণ মহাদ্বীপ বিদেশী কবি অথবা ভাবুকদের বড় একটা আকৃষ্ট করে না। তাছাড়া তৎকালীন অস্ট্রেলিয় সরকারের বর্ণবিদ্বেষের খবর বিশ্ব নাগরিক কবির

ভারতবন্ধু অস্ট্রেলিয়ান দার্শনিক আলেকজান্ডার বয়েস গিবসন

না জানবার কথা নয়। সম্প্রতি কিন্তু আকস্মিকভাবে সন্ধান পেয়েছি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একদা এদেশের সাময়িক সংযোগ ঘটেছিল এবং অনুমান করি বাংলা দেশের পাঠক-পাঠিকারা এ খবরে কিছুটা কৌতূহল বোধ করবেন।

মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতবিদ্যা বিভাগ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বছর দশেক আগে যাঁরা বিশেষ উদ্যোগী হন আমার প্রাক্তন সহকর্মী এবং বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু অ্যালেকজান্ডার বয়েস গিবসন (A Boyce Gibson) তাঁদের একজন। ১৯৩৫ থেকে ১৯৬৬ পর্যন্ত ইনি ছিলেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক; ফরাসী দার্শনিক দেকার্তের ওপরে লেখা এঁর প্রামাণ্য বইটির সঙ্গে সম্ভবত আপনাদের অনেকের পরিচয় আছে। এখানে আসার বছর খানেক পরে আমরা যখন মেলবোর্নে অস্ট্রেলিয়া-ইন্ডিয়া সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করি ইনি তার প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন। এঁর পিতাও এক সময়ে মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন, এবং ইংল্যান্ডে থাকাকালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয়ের সুযোগ ঘটেছিল।

কিছুদিন আগে পুত্র অ্যালেকজান্ডার বয়েস গিবসন পিতার পুরাতন কাগজপত্র গোছাতে গিয়ে একটি খামের ভিতরে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেছেন। কবিতাটির সঙ্গে গাঁথা আলাদা একটি কাগজের টুকরোয় পিতা বয়েস গিবসনের নিজের হাতে লেখা একটি নোট পাওয়া গেছে। সেই স্মারক পত্রের তর্জমা হচ্ছে এই :

"রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি স্বহস্তলিখিত কবিতা। শ্রীযুক্ত পিয়ার্সন যখন শ্রীযুক্ত এন্ড্রুজ-এর সঙ্গে অনেক বছর পূর্বে (১৫ ?) অস্ট্রেলিয়াতে আসেন তখন তিনি এটি আমাকে দেন।

এক সন্ধ্যায় তিনি আমাকে বটানিক্যাল গার্ডেন্স-এর প্রবেশ পথের সামনে ডোমেন রোডে এটি দিয়ে বলেন : 'আমি নিশ্চিত জানি আপনি এটি সযত্নে রক্ষা করবেন।'"

নোটে প্রশ্ন চিহ্ন থাকলেও এটি যে ১৯১৫ সালের ঘটনা তাতে সন্দেহ নেই কারণ ঐ সালের অক্টোবর মাসে ফিজিতে যাওয়ার পথে এন্ড্রুজ এবং পিয়ার্সন মেলবোর্নে আসেন।

(দ্রষ্টব্য, **Charles Freer Andrews: A Narrative by Benarsidas Chatur; vedi and Margorie Sykes, Alen & Union, 1950.**

রবীন্দ্রনাথের কাছে লেখা এন্ড্রুজের বিভিন্ন চিঠিতে এই ভ্রমণের নানা কৌতুকবহ বর্ণনা পাওয়া যায়। যে জাহাজে তাঁরা আসেন তাতে অনেক অস্ট্রেলিয়ান যাত্রী ছিলেন; পিয়ার্সন তাঁদের কাছে নাকি গম্ভীরভাবে প্রস্তাব করেন যে যেহেতু অস্ট্রেলিয়ার উত্তর অঞ্চলে খুব অল্প মানুষেরই বসবাস (এখনো এ অঞ্চলে মুখ্যত

১৯১৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় : বামদিক থেকে দক্ষিণে : এন্ড্রুজ, গান্ধী এবং পিয়ার্সন

আদিবাসীরাই থাকে) ঐ অঞ্চল সরাসরি ভারতবর্ষকে দিয়ে দেওয়া উচিত যাতে ভারতবর্ষের লোকেরা এখানে এসে উপনিবেশ স্থাপন করতে পারে। (রবীন্দ্রনাথের কাছে এন্ড্রুজের পত্র, ১০ই

An autograph poem of Rabin-
dranath Tagore
(15?)
given to me many years ago
by Mr Pearson when he visited Australia
with Mr Andrews.
He gave it to me one evening
in Domain Road, opposite the entrance to the Botanic Garden
and said: "I am sure it will be safe in your keeping".
W. R. B. G.

রবীন্দ্রনাথের কবিতার পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে অধ্যাপক বয়েস গিবসনের স্মারকপত্র।
(ফটো-কপি)

অক্টোবর ১৯১৫।। ইংরেজ সহযাত্রীর মুখে এই ভয়ঙ্কর প্রশংসার পরে অস্ট্রেলিয়ানরা যে কি পরিমাণে বিরক্ত হয়ে উঠেছিল অনুমান করা কঠিন নয়। অস্ট্রেলিয়ানদের অর্বাচীন স্বদেশপ্রীতি এবং বিশেষ করে মেলবোর্নবাসীদের মেলবোর্নের প্রতি অত্যুগ্র অনুরাগের যে বিবরণ এণ্ডুজ রেখে গেছেন তা এতই মজার যে বিনা তর্জমায় (কারণ এ ভাষায় তর্জমা আমার সাধ্যাতীত) তার কিছুটা উদ্ধার করে দেবার লোভ সামলানো গেল না।

"'Istory!" said one enthusiast, "what's 'istory? We don't care a rap for 'istory in Australia – we haven't got any. Now, that Westminster Abbey of yours in London: you think it's very fine, don't you? But do you think that I took the trouble to go inside it? Not I! We don't want none of your 'istory, we don't. We're a **young** country!....

".... But I'll tell you one thing that will surprise you—you can get a better afternoon tea in Melbourne than you can get in London; and you can get a whisky (sic) **one soda** cheaper in

রবীন্দ্রনাথের স্বহস্ত লিখিত ইংরেজি খসড়া অনুবাদের ফটো-কপি।

Thy trumpet lies in the dust.
The wind is weary, the light is dead. Ah the evil day!
Come fighters, carrying your flags and singers with your songs!
Come pilgrims hurrying on your journey!
The Trumpet lies in the dust waiting for us.

I was on my way to the temple with my evening offerings,
Seeking for the heaven of rest after the day's dusty toil;
Hoping my hurts would be healed and stains in my garment washed white;
When I found thy trumpet lying in the dust.

Has it not come the time for me to light my evening lamp?
Has not the night sung its lullaby to the stars?
O thou blood-red rose, my poppies have paled and faded.
I was certain my wanderings were over and my debts all paid
When suddenly I came upon thy trumpet lying in the dust.

Strike my drowsy heart with thy spell of youth!
Let my joy in life blaze up in fire.
Let the shafts of awakening fly piercing the heart of night and a thrill of dread shake the palsied blindness.
I have come to raise thy trumpet from the dust.

Sleep is no more for me – my walk shall be through showers of arrows:

Some shall run out of their houses to come to my side, — some shall weep.
Some in their beds shall ~~tremble~~ toss and groan in dire dreams.
For tonight thy trumpet shall be sounded.

From thee I had asked peace only to ~~get~~ find shame.
Now I stand before thee — help me to don my armour!
Let hard ~~blows~~ blows of trouble strike fire into my life.
Let my heart beat in pain — ~~beat~~ beating the drums of thy victory.
My hands shall be utterly emptied to take up thy trumpet.

Melbourne. It's a fine city, Melbourne—Sydney? Why, Sydney's a mere nothing to it. Melbourne's going to be the first city in the world some day. I'm a Melbourne man myself and I ought to know." The sun was just setting, spreading out its wing like a golden eagle. I said, "what a wonderful sunset!" He said, "oh, that's nothing to what you'll get in Melbourne!"

গত পঞ্চাশ বছরে এ দেশের অধিবাসীদের চরিত্রে অনেক পরিবর্তন হয়েছে, তাছাড়াও এই কাম্পাচিত্রের মধ্যে গড়পড়তা অস্ট্রেলিয়ানদের কিছুটা আদল এখনো চোখে পড়ে। তবে এদিক থেকে হয়ত খাস মেলবোর্নবাসীর সঙ্গে খাস দর্জিপাড়া অথবা বাগবাজারবাসীর বিশেষ তফাৎ নেই। তাঁরাই বা কোন ইতিহাসের ধার ধারেন এবং কোলকাতার কাছে কোথায় লাগে রোম কিম্বা প্যারিস!

যাইহোক সৌভাগ্যবশত মেলবোর্ন এবং সিডনীতে অন্য প্রকৃতির অস্ট্রেলিয়ানদের সঙ্গেও এণ্ড্রুজ এবং পিয়ার্সনের পরিচয়ের সুযোগ ঘটে। এণ্ড্রুজ লিখেছেন তিনি বিস্মিত আনন্দে আবিষ্কার করেন যে সুশিক্ষিত অস্ট্রেলিয়ানদের অনেকেই রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী গীতাঞ্জলির সঙ্গে পরিচিত, এবং তাঁরা দুজনে যে রবীন্দ্রনাথের বন্ধু এই সংবাদ রটার পর এ দেশী বিদগ্ধ সমাজের দরজা তাঁদের সামনে খুলে যায়।

পিয়ার্সনের মারফত যে লেখাটি বয়েস গিবসনের পিতা রবীন্দ্রানুরাগী অধ্যাপকের হাতে পৌঁছেছিল সেটি "বলাকা" কাব্যগ্রন্থের চতুর্থ সংখ্যক কবিতার ইংরেজী অনুবাদ। মূল বাংলা কবিতাটি ১৩২১ সালের ১২ই জ্যৈষ্ঠ রামগড়ে লিখিত, এবং এটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'শঙ্খ' নামে ঐ সনের "সবুজপত্রে" আষাঢ় সংখ্যায়। পরবর্তীকালে এই কবিতাটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে কবি লিখেছিলেন :

"বলাকার শঙ্খ বিধাতার আহ্বান শঙ্খ, এতেই যুদ্ধের নিমন্ত্রণ ঘোষণা করতে হবে — অকল্যাণের সঙ্গে, পাপের সঙ্গে, অন্যায়ের সঙ্গে। উদাসীনভাবে এ শঙ্খকে মাটিতে পড়ে থাকতে দিতে নেই। সময় এলেই দুঃখ স্বীকারের হুকুম বহন করতে হবে, প্রচার করতে হবে।" (রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, পৃঃ ৫৯৩।)

"বলাকার যুগে রবীন্দ্রনাথের মনে যে একটি গভীর পরিবর্তন শুরু হয়েছিল সে কথা সকলেই জানেন। "সবুজপত্রে" প্রকাশিত কবিতা, গল্প, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধাদির মধ্যে এই পরিবর্তন নানাভাবে প্রকাশ লাভ করে। এই যুগের অধিকাংশ লেখায় একটি প্রবল বিদ্রোহের সুর স্পষ্ট; প্রাচীন সংস্কার, প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা, সুপ্রতিষ্ঠিত অন্যায়ের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ। যে গভীর যন্ত্রণা এবং আত্মজিজ্ঞাসার ভিতর দিয়ে এই বিদ্রোহ জন্ম লাভ করে তার কিছু আভাস এণ্ড্রুজকে লেখা তৎকালীন চিঠিপত্রের মধ্যে পাওয়া যায়। 'শঙ্খ' কবিতা রচনার কয়েকদিন পূর্বে কবি একটি চিঠিতে এণ্ড্রুজকে লিখেছেন :

"I am struggling on my way through wilderness. My feet is bleeding and I am toiling with panting breath. Wearied I lie down upon the dust and cry and call His name. I know that I must pass through death. God knows it is the death pang that is tearing open my heart." (**Letters to a Friend, 21 May, 1914.**

"বলাকা" গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯১৬ সালের মে মাসে। ঐ বছরই অক্টোবর মাসে লণ্ডন থেকে ম্যাকমিলান কোম্পানী Fruit Gathering নামে রবীন্দ্রনাথের যে ইংরেজী কাব্যগ্রন্থ বার করেন তার অন্তর্ভুক্ত একটি কবিতা "বলাকার" 'শঙ্খ' কবিতাটির অনুবাদ (কবিতা সংখ্যা ৫০)। আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহে এই গ্রন্থটির যে সংস্করণ আছে সেটি ১৯১৮ সালে সেপ্টেম্বর মাসে নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত; এতে ইংরেজী গীতাঞ্জলি এবং ফ্রুট গ্যাদারিং একই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত এবং এটিতে অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, সুরেন কর প্রভৃতির আঁকা কয়েকটি রঙীন এবং অনেকগুলি সাদা-কালোয় ছাপা ছবি আছে। (Gitanjali

And Fruit Gathering by Sir Rabindranath Tagore with illustrations by Nandalal Bose, Surendranath Kar. Abanindranath Tagore and Nobendranath Tagore. The Macmillan Company, New York, 1918). *

এই সংস্করণে 'শঙ্খ' কবিতাটির যে অনুবাদ ছাপা হয়েছে (পৃঃ ১৪২-৪৪) পরবর্তী কালে ম্যাকমিলান প্রকাশিত Collected poems and plays of Rabindranath Tagore. সংস্করণে তার কোনো পরিবর্তন করা হয়নি (পৃঃ ১১১-১২)। কিন্তু পিতা বয়েস গিবসনের কাগজপত্রের মধ্যে কবির স্বহস্ত লিখিত যে পাণ্ডুলিপিটি পাওয়া গেছে তার সঙ্গে প্রকাশিত তর্জমার কয়েক ক্ষেত্রে পাঠভেদ আছে। এ অনুমান অসঙ্গত নয় যে পাণ্ডুলিপির পাঠ প্রকাশিত পাঠেরই অন্যতম পূর্ববর্তী খসড়া; দুই পাঠের মধ্যে উল্লেখ্য প্রভেদগুলির নীচে তালিকা দেওয়া গেল। (পঙ্‌ক্তি সংখ্যা প্রকাশিত পাঠ অনুযায়ী গোণা হয়েছে।)

প্রথম পঙ্‌ক্তি

পাণ্ডুলিপিতে Thy trumpet ... ছাপায় The trumet....

চতুর্থ পঙ্‌ক্তি

পাণ্ডুলিপিতে singers with your songs! ছাপায় Singers; with your war-Songs!

পঞ্চম পঙ্‌ক্তি

পাণ্ডুলিপিতে come pilgrims hurrying on...ছাপায় come, : pilgrims of the march, hurrying on....

সপ্তম পঙ্‌ক্তি

পাণ্ডুলিপিতে যা ছিল চারটি পঙ্‌ক্তি, ছাপায় তা একটি দীর্ঘ পঙ্‌ক্তিতে গ্রথিত হয়েছে। পাণ্ডুলিপির for the heaven of rest ছাপায় রূপান্তরিত হয়েছে a place of rest-এ।

অষ্টম পঙ্‌ক্তি

পাণ্ডুলিপিতে কিছু কাটাকুটির পর বাক্যের গঠন দাঁড়িয়েছিল : Has not the time come for me...ছাপায় বদলে হয়েছে : was it not the hour for me....

নবম পঙ্‌ক্তি

পাণ্ডুলিপিতে প্রথমে লিখেছিলেন : Has my evening nöt come to bring me sleep?
তারপর সেটি কেটে লিখেছেন Has not the night sung it lulla by to the stars? ছাপায় শেষ পর্যন্ত Has বদলে হয়েছে Had

দশম পঙ্‌ক্তি

পাণ্ডুলিপিতে my poppies have paled...ছাপায় my poppies of sleep have paled

চতুর্দশ পঙ্‌ক্তি

পাণ্ডুলিপিতে fly piercing the heart বদলে ছাপায় হয়েছে fly through the heart; পাণ্ডুলিপির shake the palsied blindness বদলে হয়েছে Shake blindness and palsy

বিংশ পঙ্‌ক্তি

পাণ্ডুলিপির I had...ছাপায় হয়েছে I have

একবিংশ পঙ্‌ক্তি

পাণ্ডুলিপির don my armour ছাপায় হয়েছে put on my armour

ত্রয়োবিংশ পঙ্‌ক্তি

পাণ্ডুলিপির beat in pain—beating the drum...সংক্ষেপিত হয়ে ছাপায় দাঁড়িয়েছে beat in pain, the drum...

কয়েকটি ক্ষেত্রে মনে হয় পাণ্ডুলিপির পাঠের তুলনায় প্রকাশিত পাঠে অতিকথনের দোষ এসেছে। যথা Songs-এর বদলে war songs; pilgrims-এর বদলে pilgrims of the march, কিম্বা poppies-এর বদলে Poppies of sleep তবে কোনো পাঠেই মূলের স্বাদ মেলে না। ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো তাঁর অসাধারণ স্মৃতিচিত্রে রবীন্দ্রনাথের স্বকৃত অনুবাদ সম্পর্কে যে বর্ধিত বিবরণ দিয়েছেন ("Tagore on the Banks of the river Plate in A Centenary Volume. পৃঃ ৪০—৪৪) 'শঙ্খ' কবিতাটির অনুবাদ পড়ে সে কথা বার বার মনে পড়েছে। 'রক্তজবার মালা' এবং 'রজনীগন্ধাকে blood-red rose এবং poppies of sleep-এ কবি নিজেই রূপান্তরিত করেছিলেন ভাবতে বড় কষ্ট হয়।

দুই

পিয়ার্সন যে বেশ বয়েস গিবসনকে এই কবিতাটি দিয়েছিলেন তা আমি জানিনা। পুত্র বয়েসগিবসনের অনুমান কবি স্বয়ং তাঁর পিতাকে এই স্বহস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিটি উপহার পাঠিয়েছিলেন। তবে সে সময়ে তিনি নিজে বালক মাত্র; এবং যদিও তাঁদের মেলবোর্নের গৃহে এণ্ড্রুজ এবং পিয়ার্সনের আসার কথা তাঁর অস্পষ্ট ভাবে মনে আছে, এবং যদিও তাঁর পিতা ইতিপূর্বেই ইংরেজী গীতাঞ্জলি পড়ে রবীন্দ্রনাথের অনুরাগী হয়েছিলেন, তবু কেন যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতাকে নিজের কবিতার অপ্রকাশিত তর্জমার অনুবাদ উপহার পাঠাবেন তার সপক্ষে যুক্তি পাওয়া কঠিন। হয়ত শান্তিনিকেতনে রক্ষিত কাগজপত্রের মধ্যে এ বিষয়ে কিছু তথ্য মিলতে পারে। তা না মেলা পর্যন্ত ধরে নেওয়া যায় পিয়ার্সন নিজে থেকেই (অথবা এণ্ড্রুজের সঙ্গে পরামর্শ করে) এই উপহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। (স্মরণীয় কবি 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থ পিয়ার্সনকে উৎসর্গ করেছিলেন।)

এই সূত্রে আমার নিজের যা অনুমান তা সংক্ষেপে পেশ করি। এণ্ড্রুজ এবং পিয়ার্সন দুজনেই শান্তিনিকেতন আশ্রমে যোগ দেন ১৯১৪ সালে। দুজনেই ধর্মপ্রাণ, আদর্শবাদী; দুজনেই আত্মানুসন্ধানের ফলে উপলব্ধি করেছিলেন যে জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে মানুষের সেবা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে অহিংস সংগ্রাম খৃষ্টধর্মের মূল বাণী; দুজনেই তার ফলে পরাধীন এবং অত্যাচারিত ভারতবাসীর সেবায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেন। শান্তিনিকেতনে যোগ দেবার ঠিক আগেই তাঁরা দুজনে দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজির সংগ্রামে সাহায্য করার জন্য সেখানে যান, এবং শান্তিনিকেতনে যোগ দেবার পরে মুখ্যত এণ্ড্রুজের উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধীর মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। (এ সম্পর্কে আমার সম্পাদিত Gandhi India and the world গ্রন্থে আলোচনা করেছি। এই বইটি মেলবোর্ন থেকে হথর্ন প্রেস এবং বম্বে থেকে নচিকেতা পাবলিকেশনস্ মার্চ নাগাদ বার করবেন।)

"বলাকা"-র যুগ থেকে রবীন্দ্রনাথের রচনায় যে সুরটি প্রবল হয়ে ওঠে তার সঙ্গে এণ্ড্রুজ এবং পিয়ার্সনের মনের গভীর মিল ছিল। এই সুরের ধাক্কাই সম্ভবত তাঁদের শান্তিনিকেতন থেকে বার করে ফিজির পথে রওনা করায়। ফিজিতে ভারতীয় কুলিদের ওপরে তৎকালে যে কঠিন অন্যায় এবং অত্যাচার হচ্ছিল এণ্ড্রুজ প্রথম তার বিস্তারিত বিবরণ পান রেভারেণ্ড জে

---

*এই সংস্করণে রঙীন ছবি আছে আটটি—অবনীন্দ্রনাথের আঁকা পাঁচটি, নন্দলালের দুটি, এবং সুরেন করের একটি। সাদা-কালোর তেইশটি—নন্দলালের এগারোটি, অবনীন্দ্রের সাতটি, সুরেন করের দুটি, নবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুটি এবং অসিত হালদারের একটি। 'শঙ্খ' কবিতাটির ওপরে ছবিটি অবনীন্দ্রনাথের আঁকা।

ডবলিউ বার্টনের Fiji of Today বইটি থেকে। কুলি ব্যবস্থার ভয়াবহ স্বরূপের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকাতেই এণ্ড্রুজ এবং পিয়ার্সনের প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটেছিল। ফিজির অবস্থা সম্পর্কে আরো নানা তথ্য সংগ্রহ করার পর তাঁরা সিদ্ধান্ত করেন যে নিজেরা সেখানে গিয়ে এই অন্যায় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনমত গড়ার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। এণ্ড্রুজ তাঁর অপ্রকাশিত স্মৃতিকথায় লিখেছেন যে এই সময়ে একদিন দুপুরে তিনি বারান্দায় চেয়ারে বসে এইসব কথা ভাবছেন, অকস্মাৎ তাঁর চোখের সামনে স্পষ্ট একটি মুখ ভেসে উঠল। নাটালে যে পলাতক কুলিটিকে তিনি দেখেছিলেন তার মুখ। দেখতে দেখতে সেই মুখ বদলে যীশু খৃস্টের মুখে রূপান্তরিত হল। এই জাগর স্বপ্নের অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি একটি কবিতা লেখেন, নাম: The Indentured Coolie:

> There he crouched,
> Back and arms scarred, like a
> hunted thing,
> Terror-stricken.
> All within are surged towards
> him.
> While the tears rushed.
> Then, a change.
> Through his eyes I saw Thy
> glorious face—
> Ah, the wonder!
> Calm, unveiled in deathless
> beauty,
> Lord of sorrow.

ফিজিতে ভারতীয় কুলি আমদানীর প্রধান হেতু ছিল সেখানকার বিবর্ধমান শর্করা শিল্প এবং এই চিনির ব্যবসা প্রায় পুরোপুরিই ছিল কলোনিয়াল সুগার রিফাইনিং কম্প্যানীর একচেটিয়া দখলে। এটি খাস অস্ট্রেলিয়ান কম্প্যানী, এবং তৎকালে অস্ট্রেলিয়াতে এটির প্রচুর প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল।* এণ্ড্রুজ এবং পিয়ার্সনের বুঝতে দেরি হয়নি যে ফিজিতে কুলীদের অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য শুধু ফিজিতে এবং ভারতবর্ষে আন্দোলন যথেষ্ট নয়, অস্ট্রেলিয়াতেও এই অন্যায় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা দরকার। কিন্তু জনমত গড়ার জন্য প্রয়োজন এমন কিছু স্থানীয় অধিবাসী যাঁরা চিন্তাশীল, হৃদয়বান এবং সামাজিক প্রভাবসম্পন্ন অথচ যাঁরা সম্ভবত নৈতিক আলস্যবশত এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে এতাবৎ উদ্যোগী হননি। 'অন্ধ' কবিতাটিতে এই নৈতিক আলস্যের বিরুদ্ধে যোদ্ধা প্রতিধ্বনিত; এবং হয়ত এটা একেবারে অসম্ভব নাও হতে পারে যে পিয়ার্সন এই উপহারের সূত্রে দার্শনিক গিবসনকে তাঁর নৈতিক দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করতে চেয়েছিলেন।*

১৯১৫ সালের অক্টোবরে এণ্ড্রুজ এবং পিয়ার্সন যখন এদেশে আসেন তখন কলোনিয়াল সুগার রিফাইনিং কম্প্যানীর নির্বিবেক শোষণের বিরুদ্ধে তাঁদের প্রচেষ্টা এদেশে কোনো সাড়া জাগায়নি। বরং তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে যে তাঁরা দায়িত্বজ্ঞানহীন "অ্যাজিটেটর" মাত্র। এণ্ড্রুজ রবীন্দ্রনাথকে লিখেছেন, যখন তাঁর মনে ব্যর্থতাবোধ প্রবল হয়ে উঠত তখন শহরের উদ্যানে লাইলাক আর গোলাপের সারির মাঝখানে বসে মনের প্রশান্তি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতেন—কিন্তু তারপর সারারাত কাটত বিনিদ্র যন্ত্রণায়। (রবীন্দ্রনাথের কাছে এণ্ড্রুজের পত্র ২৩শে অক্টোবর, ১৯১৫)। ফিজি এবং অস্ট্রেলিয়া থেকে ফেরার পর গান্ধীজীর সহযোগিতায় এণ্ড্রুজ কুলী রপ্তানী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ভারতবর্ষে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৯১৭ সালে তিনি আবার তদন্তের জন্য ফিজিতে যান; এই সময়ে ফিজির ভারতীয় কুলীদের সংগঠিত করার জন্য তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়েও যে অক্লান্ত উদ্যোগ করেন কালে তা ফলপ্রসূ হয়। ফিজির ভারতীয় কুলীরাই প্রথম তাঁকে "দীনবন্ধু" নামে অভিষিক্ত করে।

১৯১৭ সালে ফিজি থেকে ফেরার পথে এণ্ড্রুজ দ্বিতীয়বার অস্ট্রেলিয়া আসেন। এবারে কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার অনেক বিবেকবান স্ত্রীপুরুষ তাঁর প্রচেষ্টাকে প্রকাশ্যে সমর্থন করেন। সিডনী থেকে ফ্রিম্যানটল প্রতি শহরেই তিনি বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে সাড়া তোলেন। কয়েকজন অস্ট্রেলিয়ান মহিলা ফিজির ভারতীয় কুলী-স্ত্রীলোকদের মধ্যে স্বেচ্ছাসেবিকা হিসেবে কাজ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অস্ট্রেলিয়ান উইমেনস অ্যাসোসিয়েশন ফিজির কুলী ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সেখানে তাঁদের অনুসন্ধান কমিটি পাঠান, এবং এই কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর সুগার রিফাইনিং কম্প্যানীর ক্রিয়াকর্মের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ শুরু হয়। অস্ট্রেলিয়াতে থাকাকালেই এণ্ড্রুজ খবর পান যে ব্রিটিশ সরকার কুলী রপ্তানী নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অবশেষে ১৯২০ সালের পয়লা জানুয়ারী থেকে ফিজিতে কুলী ব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটে।

১৯১৭ সালে লেখা এণ্ড্রুজের চিঠিপত্র থেকে জানা যায় এ যাত্রা অস্ট্রেলিয়াতে পিয়ার্সনের বদলে তিনি সঙ্গে এনেছিলেন রবীন্দ্রনাথের সদ্যপ্রকাশিত কাব্যনাট্য The cycle of spring। এটি "ফাল্গুনীর" ইংরেজী অনুবাদ, সূচনা অংশ এণ্ড্রুজ নিজেই তর্জমা করেছিলেন অধ্যাপক নিশিকান্ত সেনের সহযোগিতায়। এর কিছু কিছু অংশ এখানকার কাব্যামোদীদের তিনি পড়ে শোনান। তাঁদের মনে কোনো দাগ পড়েছিল কিনা এখানকার পুরোনো পত্র-পত্রিকা ঘেঁটে তার প্রমাণ খুঁজে পাইনি বটে, কিন্তু কল্পনা করতে ইচ্ছে হয় যে ১৯১৭ সালে কুলী প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ অস্ট্রেলিয়ার শিক্ষিত সমাজে যে সমর্থন লাভ করেছিলেন দু বছর আগে পিয়ার্সনের আনা কাব্যোপহারের সঙ্গে তার হয়ত প্রচ্ছন্ন কোনো সম্বন্ধ আছে।

কৌতূহলী পাঠক পাঠিকার জন্য নীচের গ্রন্থপঞ্জী দেওয়া গেল।

রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র জীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য প্রবেশক, দ্বিতীয় খণ্ড।

Rabindranath Tagore, Fruit-Gathering, Macmillan, 1916.

Rabindranath Tagore, Letters To A Friend (a volume of Tagore's letters to C. F. Andrews written during 1913-1922), Allen & Unwin 1928.

B. Chaturvedi and M. Sykes, Charles Freer Andrews, Allen and Union, 1950.

C. F. Andrews, What I owe to Christ, Hodder & Stoughton, 1932.

C. F. Andrews, India and the Pacific, Allen & Unwin, 1937.

---

* 'অন্ধ' কবিতাটি লেখার সময়ে কবির মনে তাঁর নিজের নৈতিক দায়িত্ব সম্পর্কে কঠিন প্রশ্ন উঠেছিল। পরে রবীন্দ্রনাথকে লেখা একটি চিঠিতে সে বিষয়ে উল্লেখ আছে। "রামগড়ে যখন ছিলুম তখন থেকে আমার Conscience-এ কেবলি ভয়ানক আঘাত করছে যে বিদ্যালয় জমিদারি সংসার দেশ প্রভৃতি সম্বন্ধে আমার যা কর্তব্য আমি কিছুই করিনি।" (চিঠিপত্র, ২, পৃ ২৮)।

—শিবনারায়ণ রায়

অদ্বিতীয় ডন ব্রাডম্যান

মঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায়

ব্রাডম্যানের ওপর এত লেখা আছে, সেসব এক জায়গায় জড়ো করলে পিরামিডের চূড়ার সমান উঁচু হয়ে উঠবে, এ-কথা অস্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত ক্রিকেট লেখক রে রবিনসন আমাদের জানিয়েছেন। কিন্তু এত কথার ভিড়ের মধ্যে একটি উক্তিকে শ্রেষ্ঠ বলে বেছে নিতে আমার দ্বিধা নেই। সেটি নেভিল কার্ডাসের—"পম্পিয়াইকে ছারখার করে দিতে উদ্যত এক জ্বলে-ওঠা আগ্নেয়গিরি।" যে অগ্নিগর্ভ ব্যক্তিত্বে ব্রাডম্যান ক্রিকেটে অদ্বিতীয় তারই রূপ উদ্ঘাটনে কার্ডাস ঐ অপূর্ব মন্তব্য করেছেন।

সেই বহ্নি-বিস্ফোরণ কিভাবে ক্রিকেটের সাজানো পম্পিয়াইকে ছারখার করে দিয়েছিল, তা আধুনিক ক্রিকেট ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ ও গৌরবময় অংশ। সেই ইতিহাস থেকে এসেছে লিজেণ্ড। ব্রাডম্যান শুধু ইতিহাস স্রষ্টা পুরুষই নয় তিনি কিংবদন্তীর নায়কও।

ব্রাডম্যানকে যাঁরা দেখেননি তাঁরা কল্পনাও করতে পারবেন না তিনি কি ছিলেন—এ-কথা বলেছেন প্রত্যেকেই যাঁরা ব্রাডম্যানকে দেখেছেন। লারউড বলেছেন, আমি প্রায়ই নর্মান ওনীল, টেড ডেক্সটার ও স্যার ফ্রাঙ্ক ওরেলের সঙ্গে ব্রাডম্যানের তুলনা শুনি, কিন্তু আমার মতে এঁরা কেউই ব্রাডম্যানের সঙ্গে এক রাস্তায় দাঁড়াবার উপযুক্ত নন।

উইলফ্রেড রোডস সেই একদিনের স্মৃতি কখনো ভুলতে পারেননি। ব্রাডম্যান ইংলণ্ড সফরে একটি খেলায় একদিন সবে খেলতে নেমেছেন। স্বভাবতই তাঁর চোখ সেট হয়নি। তবু প্রথম বলটিই বাউণ্ডারীতে পাঠালেন। দ্বিতীয় বলেও আবার বাউণ্ডারী। তৃতীয় বলেও তাই। চোখ ঠিক হবার আগেই প্রথম তিনটি বলেই উপর্যুপরি বাউণ্ডারী। রোডস তাই সর্বদাই বলতেন, "হবস দ্বিতীয় হতে পারেন, ট্রাম্পার হয়তো তৃতীয়, কিন্তু ব্রাডম্যান নিঃসন্দেহে প্রথম।"

ক্রিকেট-ভাষ্যকার জিম সোয়ান্টন বিখ্যাত বই 'ক্রিকেটের ইতিহাস'-এ লিখেছেন, "ভিক্টর ট্রাম্পারের নিছক লাবণ্য, সব উইকেটে জ্যাক হবসের বহুমুখী পারদর্শিতা কিংবা গিলবার্ট জেসপের সংহারশীল অবৈজ্ঞানিকতা ব্রাডম্যানের হয়তো ছিল না, কিন্তু নিছক নির্মম দক্ষতায় উত্তর-গ্রেস যুগের কোন ক্রিকেটারের সঙ্গে তাঁর তুলনা হতে পারে না। অর্ধ শতাব্দীর 'পুড়ে যাওয়া জুনের দিনগুলি' থেকে যে অসংখ্য ছবি আমি আমার মনের অ্যালবামে সংগ্রহ করে রেখেছি, তার মধ্যে ডনের সবুজ টুপী-পরা শান্তগতি ক্ষুদ্র মূর্তির প্যাভিলিয়নের ছায়া থেকে সূর্যের আলোয় আগমন, চারিপাশের অজস্র মানুষের মনঃসংযোগ, উদ্দীপনা ও উৎকণ্ঠা তাঁর উপরে কেন্দ্রীভূত এবং একটি টেস্ট ম্যাচের ভাগ্য তাঁর হস্তে নিবদ্ধ—এর মত আর কোন দৃশ্য এত নাটকীয় বা প্রবলতর নয়।"

ব্রাডম্যান যতদিন মাঠে ছিলেন ক্রিকেটের ভোস্টনি ছিল তাঁর হাতে।

ব্রাডম্যান নিঃসন্দেহে একালের ক্রিকেটের বিরাটতম পুরুষ যেমন আদিকালের ক্রিকেটের শিরোমণি ছিলেন ডবলিউ জি গ্রেস, প্রতিভায়, ব্যক্তিত্বে, সাফল্যে ক্রিকেট ইতিহাসে যাঁর পাশেই ডনের স্থায়ী আসন। দুই যুগের দুই শ্রেষ্ঠ ক্রিকেটারকে পাশাপাশি রেখে তুলনামূলক আলোচনায় চমৎকার বলেছেন ইংরেজ লেখক টমসন—গ্রেসের সঙ্গে ডনের সাদৃশ্য অনেক। তিনি এক আশ্চর্য বস্তু, এক বিস্ময়, এক অতুলনীয় শক্তি এবং তিনি নিজেই তাঁর কিংবদন্তীর স্রষ্টা; চিত্তাকর্ষক প্রতিমূর্তি গড়ে তোলবার মত বিশাল দাড়ি, স্থূল আকৃতি কিংবা ভয়াবহ উপস্থিতি ডনের ছিল না, কেবল ছিল তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা এবং অনুপম নৈপুণ্য। দুটি মানুষের প্রকৃতিতেই একটা অন্তর্নিহিত নির্দয়তা ছিল; ডব্লিউ জি হয়তো অধিকতর সহৃদয় ছিলেন, কিন্তু তাঁকে সহৃদয় না হবার মত মেজাজে আনতে কেউ সাহস করত না; তিনি একটি দৃষ্টিতে বিদ্রোহীকে প্রশমিত করতে পারতেন। তাঁর হাতের তলা দিয়ে ক্রিকেটের উত্থান ও প্রসারের সময় তিনি সব রেকর্ডই সৃষ্টি করেছিলেন। ব্রাডম্যান প্রায় সমস্ত জানা রেকর্ডই ভেঙে দিয়েছিলেন এবং আরও রেকর্ড সৃষ্টি করেছিলেন, যা কখনো ভাঙবে না। ডব্লিউ জির মত তিনি তাঁর সমসাময়িক খেলোয়াড়দের অনেক ওপরে উন্নীত ছিলেন।

অপর কোন ক্রিকেটার ব্রাডম্যানের মত ক্রিকেট মাঠে এতখানি আধিপত্য বিস্তার করতে পারেননি। জনমানসে এতখানি উত্তেজনার শিহরণ আর কেউ জাগাতে পারেননি। দিনের পর দিন এরকম অবিশ্বাস্য বিপুল সাফল্য আর কারুর পক্ষে সম্ভব

হয়নি। ১৯৩৮ সালে অস্ট্রেলিয়ান দল নটিংহ্যাম স্টেশনে পৌঁছলে সেখানকার ক্রিকেট পাগল জনতা তাঁদের দুয়ো দিয়েছিল। কারণ ব্রাডম্যান ঐ দলের সঙ্গে আসেননি এবং পরের দিন নটিংহ্যামের বিপক্ষে কাউন্টি ম্যাচে ব্রাডম্যান খেলছেন না, এটাই ছিল জনতার বিক্ষোভের কারণ। অস্ট্রেলিয়াতে প্রায়ই দেখা যেত, যখনই কোন মাঠে ডন ব্যাট করছেন ও সে খবরটি ছড়িয়ে পড়েছে, অমনি ঝাঁকে ঝাঁকে লোক মাঠে ছুটে আসছে—ম্যানেজিং ডিরেক্টার, কেরানী, অফিসের ছোকরা টাইপিস্ট, দোকানের কর্মচারী এবং যাঁরা জীবনে একটিও ক্রিকেট ম্যাচ দেখেননি তাঁরাও—ব্রাডম্যান কস্তুটি কি তা দেখবার আশায়। কিংসটন লিখেছেন, প্রতি মাঠে যখন ডন খেলতেন, সেখানে একটি কার্নিভালের পরিবেশ সৃষ্টি হত, প্যাভিলিয়ান থেকে বার হবার সময় তাঁর প্রথম উপস্থিতির দৃশ্যই দর্শকদের আনন্দের মূর্ছনায় ভাসিয়ে নিয়ে যেত।

ব্রাডম্যান যতক্ষণ মাঠে থাকতেন, এক মুহূর্তও কারুর পক্ষে 'অন্যমনস্ক হবার উপায় ছিল না। সাংবাদিকরা একটুর জন্যও চা কিংবা ড্রিংকস-এর জন্য বাইরে যেতে সাহস করতেন না। কারণ তাঁরা জানতেন, ঐটুকু সময়েই হয়তো ব্রাডম্যান ৩০।৪০ রান করে ফেলবেন। আবার ডন যখনই আউট হয়ে গেলেন, অমনি দেখা যাবে দর্শককুল মাঠ ছেড়ে বাড়ি কিংবা অফিসের দিকে ফিরে চলেছে। ব্রাডম্যান ছিলেন মাঠের শ্রেষ্ঠ চুম্বক। তাই তাঁর অনুপস্থিতিতে খেলার সব আকর্ষণ অপসৃত হত।

সুতরাং ব্রাডম্যান অলৌকিক, অসামান্য, অভূতপূর্ব। খেলোয়াড়দের নিকট তিনি ছিলেন সমাধানের অতীত এক সমস্যা। লারউড তাঁর আত্ম-কাহিনীতে লিখেছেন, "এখনকার বল-ঠেলা ব্যাটসম্যানদের দেখে যাঁরা অভ্যস্ত তাঁরা কল্পনাও করতে পারবেন না ডন কার মত। আমাকে লোকে বল-হাতে খুনী বলে থাকে, কিন্তু তারা কি জানে ব্রাডম্যান ব্যাট হাতে ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় খুনী"। তাঁর হাতে আলগা বলের নির্মম মৃত্যুই শুধু নয়, ফাস্ট গুডলেংথ-বলও তাঁর ব্যাটের তাড়নায় কামানের গোলার মত বাউণ্ডারীতে ছুটে যাবে। অফের দিকে বল দিলে তিনি অন লেগে ঘুরিয়ে বাউণ্ডারীতে পাঠাবেন। বোলার বল দেবার আগেই অনেক সময় নিজেকে ঠিক স্থানে দাঁড় করিয়ে সঠিক মারের জন্য প্রস্তুত থাকবেন। কপিবুকের সকল মার ছাড়াও তাঁর নিজস্ব অনেক মার ছিল। দৃষ্টিশক্তি ও পদসঞ্চালনের দ্রুততায় ব্রাডম্যান ক্রিকেটের ইতিহাসে অনতিক্রান্ত। তাঁর এই প্রবল রান-গতির মাঝখানে কেউ সামান্যতম চান্সের সম্ভাবনা দেখতে পাবেন না।

'শীতল রক্তে হত্যা'—ডনের খেলা সম্বন্ধে এই বিশেষণ অতি সঙ্গতভাবেই প্রযুক্ত হয়েছে, যদিও ক্রিকেটের এক বিশেষজ্ঞের মত ডন 'খুনের সঙ্গে কবিতাকে মিশিয়েছিলেন (combined poetry with murder)'। তাঁকে বহিষ্কার করার একমাত্র রাস্তা—ক্লান্ত করে আউট করা। না, সেখানেও পথ বন্ধ। কেননা এতই অসাধারণ তাঁর জীবনীশক্তি আর অবিশ্বাস্য তাঁর মনঃসংযোগ। লীডসে একদিন ট্রিপল সেঞ্চুরী করে ব্রাডম্যান ফিরে আসছেন—ক্লান্ত দেহে বসাঁর ক্লেন্সরে নয়, নেভিল কার্ডাস বললেন, যেন সদ্য স্নানাগার থেকে পরিচ্ছন্ন হয়ে এসেছে, মাথার একটি চুলও অবিন্যস্ত নয়। চল্লিশটি বাউণ্ডারী অথচ একবিন্দু ঘাম নয়। এমনই ছিলেন ব্রাডম্যান।

ক্রিকেটকে তিনি রাজত্ব দিয়েছিলেন ঘূর্ণীঝড়ের মত। তাঁর প্রথম টেস্ট সিরিজে (১৯২৮-২৯ সালে) দুবার সেঞ্চুরী করেন। প্রথম ইংলণ্ডে যান ১৯৩০ সালে। ঐ সফরটিকেই ধরা যাক। জাহাজ থেকে নেমেই সফরের প্রথম খেলায় উস্টারের মাঠে ২৩৬ রান, যে মাসে হাজার রান পূরণ, প্রথম টেস্টে ১৩১ রান, দ্বিতীয় টেস্টে লর্ডসে ২৫৪, লীডসে তৃতীয় টেস্টে লাঞ্চের আগে সেঞ্চুরী ও একদিনে ট্রিপল সেঞ্চুরী, ওভালে শেষ টেস্টে ২৩২, টেস্ট সিরিজে ৯৭৪ রান, সমগ্র সফরে ২৯৬০ রান। এরপর তাঁকে পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি কোনদিন। তাঁর সাফল্যের রথ গড়িয়ে চলেছে অব্যাহতগতিতে, সেই সূর্যাস্তের শেষ ক্ষণ পর্যন্ত। প্রতিবার ইংলণ্ড সফরে দু হাজার রান, সমগ্র টেস্টে ৬৯৯৬ রান ২৯টি সেঞ্চুরী সমেত, তার মধ্যে দুটি ট্রিপল সেঞ্চুরী ও একটি ২৯৯, প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে ২৮ হাজার রান ও ১১৭টি তিন সংখ্যার ইনিংস, সর্বোচ্চ স্কোর ৪৫২, একটি টেস্টের দু ইনিংসেই শতাধিক রান—১৯৪৭ সালে ভারতের বিরুদ্ধে। সি বি ফ্রাই-এর পর পর ছটি সেঞ্চুরীর অবিশ্বাস্য রেকর্ডটি তিনিই একবার ধরে ফেলেছেন। গড়ে প্রতি তিন ইনিংসে একটি করে সেঞ্চুরী পৃথিবীর আর কোন ক্রিকেটার পারেননি। আরও কত কীর্তি, কত রেকর্ড তাঁর দখলে আছে,—কিছু পরে ভেঙেছে, কিন্তু কিছু কোনদিনই ভাঙবে না। সেসব পুরো বলতে গেলে একটি আলাদা বই লিখতে হয়, কেননা তারা এতই অসংখ্য। ব্রাডম্যানের এই সাফল্য কল্পনাকেও স্তম্ভিত করে।

ব্রাডম্যানের এই অবিস্মরণীয় প্রতিভা ও অতুলনীয় সাফল্যকে কেন্দ্র করে এক কিংবদন্তী গড়ে উঠেছে। তাঁর ব্যাটিং-এর প্রসঙ্গে 'যন্ত্র' কথাটি প্রায়ই উচ্চারিত হয়ে থাকে। ব্রাডম্যান নাকি ক্রিকেটের সর্বকালের সর্ববৃহৎ রানযন্ত্র। টাইসন বলেছেন, ব্রাডম্যানকে যদি যন্ত্র বলা হয়, তবে আমাদের মনে রাখতে হবে এটা সুন্দর যন্ত্রের যুগ এবং কোন যন্ত্র এত নিখুঁত ছিল না। এই প্রসঙ্গে ব্রাডম্যান লিজেণ্ডের বিশ্লেষণে নেভিল কার্ডাস আরও স্পষ্টভাবে বলেছেন, এ ধারণা বিস্তার লাভ করেছে যে, ব্রাডম্যান ছিলেন এক যন্ত্র-বিশেষ যিনি খেলার মধ্যে থেকে সকল অনিশ্চয়তা ও আকস্মিকতাকে নির্মূল করে দিয়েছেন; তাঁর অনতিক্রম্য ওস্তাদসুলভ পারদর্শিতার স্বীকৃতি ও সম্মানার্থে যদি একথা বলা হয়ে থাকে, তবে তা সত্য, কিন্তু যদি এর ব্যাখ্যা মনে হয় যে, ব্রাডম্যান একজন যান্ত্রিক ব্যাটসম্যান যিনি ক্রিকেটে উপস্থিতকালীন ছিলেন নীরস, কল্পনাশূন্য ও ঝুঁকিস্পর্শবর্জিত, তাহলে এ ধারণা সর্বৈব মিথ্যা।

অনেক বিশেষজ্ঞের মতে, ম্যাইন ও

সৌন্দর্যের দিক থেকে ব্রাডম্যানকে অনেকে ছাপিয়ে গেছেন—যেমন স্পুনার, উলী, ট্রাম্পার কিংবা তাঁরই সমসাময়িককালে আর্চি জ্যাকসন ও ম্যাককেব। বস্তুত ব্রাডম্যানের ক্রিকেটের বৈশিষ্ট্য স্টাইল নয়। অবশ্যই 'ক্রুশো' রবার্টসন গ্লাসগো ব্রাডম্যানকে বলেছেন, যা একটি স্মরণীয় উক্তি—প্রকৃতির এক বিরলতম সৃষ্টি, একজন শিল্পী, শিল্পীর মেজাজপ্রসূত অসুবিধা থেকে যিনি মুক্ত, এবং টমসনের মতে, শিল্পী ও বৈজ্ঞানিক—এই দুই সত্তার এমন বিরল নিখুঁত সমন্বয় আর কারুর ক্ষেত্রে দেখা যায়নি। তবুও রূপসন্ধানী দৃষ্টির ঐশ্বর্যে 'ক্রুশো' ও টমসনেরা যে নেভিল কার্ডাসের কাছে শিশুমাত্র ক্রিকেটের সেই অনতিক্রম্য কথাশিল্পী ডনকে 'প্রচলিত অর্থে স্টাইলিস্ট নন' বা 'আলঙ্কারিক অর্থে শিল্পী নন'

(His batting was dynamic rather than polished; he was not an artist, in ornamental sense.)

বলতে দ্বিধাবোধ করেননি।

রানই ছিল ডনের আরাধ্য বস্তু এবং সেই রান আহরণের নিপুণতায়, বিপুলতায় ও ধারাবাহিকতায় তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য। আজীবন তিনি যন্ত্রের মত রান করে গেছেন বটে, কিন্তু অন্যান্য অনেক ব্যাটসম্যানের মত যান্ত্রিক নীরসতায় কখনও আপ্লুত হন নি। তিনি নাকি জীবনে একটিও নীরস নেতিমূলক ইনিংস খেলেন নি। তাঁর রান কৃপণের সঞ্চয় নয়, কষ্টের সংগ্রহ নয়, রাজকীয় স্পর্ধায় খুশি মেজাজে অর্জন করা। 'তিনি রান করতেন যেভাবে একজন কুবের টাকা করেন।' তাঁর খেলা ছিল ধারাবাহিক রোমাঞ্চ, যার সঙ্গে জড়িয়ে থাকত তাঁর ব্যক্তিত্বের চমক, যা দর্শকদের সর্বদা সজাগ করে রাখত, কখনো অমনোযোগের অলস ঝিমুনিতে আচ্ছন্ন করত না। যে কয়েকজন ইংরেজ সমালোচক দিনের পর দিন ডনের বিরাট রান তোলার মধ্যে একঘেয়েমি ও বৈচিত্র্যহীনতা দেখেছেন বলে অভিযোগ করেছেন কার্ডাস তাঁদের ধমক দিয়ে বলেছেন, 'মাথামোটা ইংরেজ দেশপ্রেমিক।' তিনি স্বয়ং ডনের বহু দীর্ঘ আকারের ইনিংস স্বচক্ষে দেখেছেন কিন্তু কখনো এক মুহূর্তের জন্য ক্লান্তিবোধ করেন নি।

ব্রাডম্যান-কাহিনী পড়তে পড়তে আমরা ভুলে যাই যে তিনি আমাদের মতই রক্ত-মাংসের মানুষ ছিলেন। তাঁকে মনে হয়, যেন এক অতিমানব, যিনি সকল মানবিক শক্তির সীমার উর্ধ্বে এবং তাঁর এই সাফল্যও যেন অতি সহজ ও স্বাভাবিক যা তিনি নিরাবেগে ও অনায়াসে অর্জন করেছেন। রে রবিনসন বলতে চেয়েছেন যে, এইখানেই ব্রাডম্যানের প্রতি সবচেয়ে বড় অবিচার করা হয়েছে। তাঁকে মানবিক আবেদন থেকে বঞ্চিত করা অন্যায়।

ব্রাডমানের হিমালয়তুল্য সাফল্যের সৌধের দিকে তাকিয়েই আমরা স্তম্ভিত। কিন্তু কিভাবে তিল তিল করে কত পরিশ্রমে কত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কত যন্ত্রণায় সেই সৌধ তাঁকে গড়ে তুলতে হয়েছে তা কি আমরা মনে রাখি। জীবনের প্রথম টেস্টে তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন, করেছিলেন মাত্র ১৮ ও ১ রান যার জন্য পরবর্তী টেস্টে বাদ পড়ে গিয়েছিলেন। সেই প্রথম টেস্টে নিজ দলের বিরাট আকারের পরাজয় দেখেছিলেন। ১৯৩২ সালে বডিলাইন নামক অগ্নিপরীক্ষার সামনে তাঁকে দাঁড়াতে হয়েছিল। ক্রিকেট তো দূরের কথা, তাঁর জীবনের আশঙ্কা ছিল তাতে। প্রতি পদে মৃত্যুর বিভীষিকা হাতছানি দিয়েছিল। যে মানসিক যন্ত্রণা তাঁকে সেবার ভোগ করতে হয়েছিল তা কি কোন রেকর্ড বুকে লেখা আছে? বডিলাইন চক্রান্তের উদ্ভব হয়েছিল কেবলমাত্র তাঁকে খর্ব করার জন্যই।

ব্রাডমানের জীবন - পথ সর্বক্ষেত্রে কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। নিজের ব্যক্তি-জীবনেও অনেক দুঃখ ও বিপর্যয়ের তরঙ্গ তাঁকে আঘাত করে গেছে। স্বচক্ষে দেখেছেন স্ত্রীর দীর্ঘ কঠিন রোগভোগ, দেখেছেন সন্তানের মৃত্যু, পুত্রের রোগশয্যায় সুদীর্ঘ বন্দীদশা। টেস্ট ক্রিকেটে কঠিন দীক্ষা, পরবর্তীকালে বডিলাইনের মৃত্যুবাণ ও তার সঙ্গে এই দুঃখজনক পারিবারিক অভিজ্ঞতাকে মনে করলে ব্রাডম্যান আমাদের চোখে আরো বড় হয়ে ধরা পড়েন। দুঃখশোকের আঘাতকে কাটিয়ে ওঠাই মনুষ্যত্বের সাধনা। দুর্জয় মনোবল ও সংগ্রামী শক্তি দিয়ে নিজের জীবনকে গঠন করতে পারেন বড় চরিত্রের মানুষ যা ব্রাডম্যান নিশ্চিতরূপে ছিলেন। তাঁর অলৌকিক সাফল্যের পিছনে ছিল অলৌকিক প্রতিভা ও প্রস্তুতি দুই-ই। জনি ময়েস লিখেছেন, ডন ধারাবাহিক ও নিয়মবদ্ধভাবে অনুশীলন করতেন যেমন করে থাকেন একজন পেশাদার বীণাবাদক এই জেনে যে, তাঁর আঙুলের মসৃণতা ও স্পর্শের অভ্রান্ততার উপরই তাঁর সাফল্য নির্ভরশীল। নেভিল কার্ডাসের মতে ডনের খেলায় চিরদিন 'বাওরালের বালকটি' উঁকি দিয়েছে, যে রূপোর চামচ মুখে দিয়ে জন্মায়নি, বরং যাকে বলা যেতে পারে 'আত্মগঠিত ধনকুবের'। এই আত্মগঠন করতে হয়েছিল বলেই বোধহয় ব্রাডম্যান 'কোনদিন তাঁর সৌভাগ্যকে স্বতঃসিদ্ধ বা অপব্যয় করবার মত স্বাভাবিক বস্তু মনে করতে পারেন নি।' সেঞ্চুরীর পর তিনি নতুন করে গার্ড নিতেন। কোন সংখ্যাই তা যত বৃহদাকার হোক না কেন তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারত না। অপরিসীম ছিল তাঁর রানলিপ্সা, নির্মম তাঁর সংহার। ব্রাডম্যান স্বয়ং স্বীকার করেছেন, 'আমার কাছে প্রত্যেকটি বলই প্রথম বল, তা আমার রান শূন্যেই থাকুক বা দুশোই হোক।'

সুতরাং ব্রাডম্যান রান-উৎপাদনের এক বিরাট স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রমাত্র ছিলেন না। তিনি আমাদের আর পাঁচজনের মতই আশা, আকাঙ্ক্ষা, উদ্বেগ, আনন্দ, হতাশায় বারবার আন্দোলিত হয়েছেন, অপরকেও সেই আনন্দ বেদনায় ভাবিয়েছেন, ভরিয়েছেন। রবিনসন বলেছেন যে, ব্রাডম্যান-লিজেন্ডের উৎসস্থল কেবল স্কোরবুক নয়, যদি তা হত তাহলে এই কিংবদন্তী রক্তমাংসে এমন জীবন্ত হয়ে উঠত না। যারা তাঁকে দিনের পর দিন দেখেছে, তাঁর ব্যক্তিত্বে প্রভাবিত হয়েছে, তাঁর নৈপুণ্যে বিমুগ্ধ হয়েছে, তাঁর সাফল্যে বিস্মিত হয়েছে, তাঁর সাহসে শিহরিত হয়েছে, তাঁর ব্যর্থতায় হতবাক এমন কি আঘাত পর্যন্ত পেয়েছে, তাদের সম্মিলিত স্মৃতিই এই কিংবদন্তীকে জীবন দান করেছে।

কিসের জন্যে হেজলীন বিউটি ট্যাল্কের
এতো বিশেষত্ব?

HAZELINE
BEAUTY TALC

সাহিত্য সংবাদ

ইউনেসকো থেকে বাংলা বইয়ের ইংরেজি অনুবাদ

ইউনেসকো থেকে পথের পাঁচালীর যে **ইংরেজি অনুবাদ** বেরিয়েছে, সম্প্রতি সেটি **গ্রেট ব্রিটেনে একটি বিশেষ** সম্মান **লাভ করেছে। একটি বুক** ক্লাব—ফোলিও সোসাইটি অব গ্রেট ব্রিটেন—তাদের সদস্যদের মধ্যে **প্রচারের জন্য** সুন্দর বাঁধাই একটি **রাজ সংস্করণ প্রকাশ** করেছে। কোনো বুক ক্লাব থেকে মনোনীত হলে বইয়ের প্রচার সংখ্যা নির্দিষ্টভাবে বৃদ্ধি পায়। ইউনেসকো থেকে এ পর্যন্ত ১৩০টি বইয়ের ইংরেজি অনুবাদ বেরিয়েছে, তার মধ্যে একমাত্র পথের পাঁচালিই এইভাবে নির্বাচিত হয়েছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "পুতুল নাচের ইতিকথা"ও সদ্য ইংরেজিতে অনূদিত হয়ে বেরিয়েছে ইউনেসকোর উদ্যোগে। বাংলা সাহিত্যের এই বিখ্যাত উপন্যাসটি নিশ্চয় পাঠকদের কাছে আদৃত হবে। এই অনুবাদটি আমরা এখনো দেখিনি; খবরে প্রকাশ, ইংরেজিতে এর নাম দেওয়া হয়েছে 'দা পাপেট্‌স টেল'।

প্রেম চন্দের বিখ্যাত হিন্দী উপন্যাস গোদানও ইউনেসকো থেকে ইংরেজিতে অনূদিত হয়ে বেরিয়েছে। এবং লনডনের ন্যাশনাল লাইব্রেরি ফর দা ব্লাইনড-এর একটি ব্রেইল সংস্করণ প্রকাশ করবেন অন্ধদের জন্য। এই সংস্করণের জন্য কোনো রয়ালটি দেওয়া হয় না। ইউনেসকোর আর কোনো বই ব্রেইল পদ্ধতিতে বার করা হয়নি।

সমকালীন-এর দ্বি-শততম সংখ্যা

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত সম্পাদিত প্রবন্ধের মাসিক সমকালীন-এর দ্বি-শততম সংখ্যা সদ্য বেরিয়েছে। শুধুমাত্র প্রবন্ধের **মাসিকপত্র** প্রকাশ করার যে জিদ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত সতেরো বছর ধরে বজায় রেখেছেন, এ জন্য তিনি অবশ্য আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। গবেষণা ও তত্ত্বমূলক রচনা প্রকাশের জায়গা বাংলা দেশে ক্রমশই কম আসছে, এ রকম একটি পত্রিকার প্রয়োজন সেদিক থেকে অসামান্য।

দু'শোটি সংখ্যায় কি কি প্রবন্ধ বেরিয়েছে তার একটি তালিকা ছাপা হয়েছে এই সংখ্যায়। তালিকাটি বিস্ময়কর। বর্তমান সংখ্যাতে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে পুরোনো সংখ্যা থেকে নির্বাচিত প্রবন্ধ। এতে আছে ইন্দিরা ইন্দিরা দেবী ও হেমলতা ঠাকুরের স্মৃতি-কথার টুকরো, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এবং অতুলচন্দ্র গুপ্তের "বিজয়া" এবং "ডায়ালেকটিক্‌স্‌" প্রবন্ধ এবং অন্যান্য।

এক টুকরো কাগজের দাম

কিছুদিন আগে লনডনের একটি নিলামের দোকানে এক টুকরো ছেঁড়া ময়লা কাগজ এক লক্ষ সতেরো হাজার টাকায় বিক্রী হয়েছে। এক পাতার আর্ধেক মাত্র, জারমান মহাকবি গেটের নিজের হাতে 'ফাউসট'-এর ছাব্বিশ লাইন এতে লেখা আছে। "দি টাইমস্‌" পত্রিকা মন্তব্য করেছে যে, এই দাম যথেষ্ট বেশী হলেও অন্যায্য নয়, কারণ গেটের নিজের হাতের লেখা ফাউসটের পাণ্ডুলিপি খুবই দুর্লভ সামগ্রী।

হরকরা

বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের ছাত্ররা দল বেঁধে একটি মাসিকপত্র প্রকাশ করছেন, নাম হরকরা। এটি ছোটদের জন্য মাসিক খবরের কাগজ। ১লা জানুয়ারি বেরিয়েছে প্রথম সংখ্যা, দাম পঁচিশ পয়সা, প্রধান সম্পাদক পার্থ চট্টোপাধ্যায়। পত্রিকাটি প্রকাশের প্রথম দিনে এক অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অমিতাভ চৌধুরী।

এক মাসের বিশেষ বিশেষ খবর ছোটদের উপযোগী করে পরিবেশন করাই এই পত্রিকার উদ্দেশ্য। এতে কিশোর পাঠকরা যেমন বর্তমান সংবাদ সম্পর্কে অবহিত হবে, তেমনই এর পরিচালকবৃন্দ, সাংবাদিক বিভাগের ছাত্ররাও হাতে-কলমে কাজের সুযোগ পাবেন।

এই কাগজটি দেখে মনে পড়লো, আমাদের কৈশোরে বেরুতো একটি অনবদ্য সংবাদপত্র, নাম 'কিশোর', খগেন্দ্রনাথ মিত্র ছিলেন সম্পাদক। কিশোরদের জন্য সহজ চলতি ভাষায় পূর্ণ চার পাতার পত্রিকা ছিল, প্রতিদিন সকালে পাওয়া যেত। হরকরায় সেই স্বাদ খানিকটা পাওয়া গেল— এই কাগজটিই দৈনিক হতে পারলে বড্ড ভালো হতো।

ফ্ল্যাট বাড়ির সাহিত্য

"একটা জাহাজের মত মনে হয় বাড়িটাকে। বারোটা কামরা জাহাজের বারোটা কেবিন। কোনোটায় আলো জ্বলছে। কোনোটা অন্ধকার।...কোনো দরজার হা-খোলা, কোনোটার দুটো পাল্লাই ভেজানো। জানলা কারো খোলা, কোনোটার বন্ধ।...বাসন-কোসনের শব্দ হলে বোঝা যায় খাওয়াদাওয়া হচ্ছে। যে-ঘরে কোনো রকম শব্দ নেই..."। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর "বারো ঘর এক উঠোন" উপন্যাসের কয়েক লাইন। এবং এই উদ্ধৃতি দিয়ে শুরু হয়েছে একটি ছিমছাম সুরুচি-সম্মত স্মারক পত্রিকা।

কলকাতা এবং শহরতলীতে আজকাল **তৈরী হয়েছে অনেক ফ্ল্যাট বাড়ি।** এইসব অঞ্চলে, ভালো অর্থে, গড়ে উঠেছে এক ধরনের নতুন উপনিবেশ। মোটামুটি সমান উপার্জন, শিক্ষা দীক্ষা ও সামাজিক স্তরের মানুষ এসব জায়গায় পাশাপাশি থাকেন। এঁদের সমবেত সংস্থার নাম 'হাউসিং এস্টেট ইউনাইটেড ক্লাব'—এর উদ্যোগে বছরে একটি উৎসব এবং একটি স্মারক পত্রিকা বেরোয়। এবারের স্মারক পত্রিকাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে কয়েকজন খ্যাতনামা লেখক ও কবি ফ্ল্যাট বাড়িকে ভিত্তি করে কয়েকটি চমৎকার রচনা লিখেছেন। পত্রিকাটির পরিকল্পনা এবং সম্পাদনা করেছেন সেই অদ্ভুতকর্মা যুবকটি, প্রণব-কুমার মুখোপাধ্যায়। লিখেছেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সন্তোষকুমার ঘোষ, বিমল কর, রমাপদ চৌধুরী, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, মতি নন্দী, তারাপদ রায়, কবিতা সিংহ, অমিতাভ চৌধুরী, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রভৃতি। যাঁদের হাতে পত্রিকাটি পৌঁছুবার সম্ভাবনা নেই, তাদের জন্য অমিতাভ চৌধুরীর অনবদ্য একটি ছড়া উপহার দিই:

লেপকম্বল কোট সোয়েটার
ঝুলছে রোদে বারান্দায়
ধোঁয়ার চোখে চোখ অন্ধকার
ফ্ল্যাটের ভিতর দাঁড়ান দায়।

মিনি পত্রিকা

মিনি বুকের পর এবার মিনি পত্রিকা। নাম 'পত্রাণু'। উদ্যোক্তারা বলছেন, 'পৃথিবীর প্রথম মিনি পত্রিকা'। আমরা অবশ্য গোটা পৃথিবীর খবর জানি না, তবে পত্রিকাটি দেখতে বেশ, পড়তে বেশ। সাইজ এই লম্বায় তিন ইঞ্চি, চওড়া আড়াই—লিখেছেন অবশ্য বিরাট বিরাট লেখকরা যেমন, আশা-পূর্ণা দেবী, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবিরূপাক্ষ, চিরঞ্জীব সেন, শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। দাম কুড়ি পয়সা, সম্পাদক অমিয় চট্টোপাধ্যায় ও আশীষতরু মুখোপাধ্যায়।

সনাতন পাঠক

গ্রন্থে লেখকের ভাষার অসংখ্য কারসাজি এবং নিরর্থক কারিগরি সৃষ্টির নিষ্ফল চেষ্টা ছাড়া অন্য কিছু চোখে পড়বার মত নেই। ৩৮৯।৬৮

প্রবন্ধ

অর্থনীতিবিদ মার্কস। তরুণ সান্যাল। সারস্বত লাইব্রেরী, ২০৩, বিধান সরণী, কলিকাতা ৬। দাম ২·০০ টাকা।

আলোচ্য পুস্তকের গ্রন্থকার সারস্বত পত্রিকার পরিচালকমণ্ডলী কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে তাদের পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় মারকসবাদ সম্পর্কে যে প্রবন্ধটি লিখেছিলেন, তা-ই পরবর্তী কালে 'অর্থনীতিবিদ মারকস' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। রচনাটি সংক্ষিপ্ত হলেও লেখক এতে মারকসের অর্থনীতির মূল তত্ত্বটি এমনভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, যাতে পাঠকবর্গ অল্পায়াসে মারকসের অর্থনীতির প্রাথমিক সূত্র সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত হতে পারেন। মারকসের অর্থনৈতিক চিন্তা মূলত অ্যাডাম স্মিথ ও ডেভিড রিকারডোর দ্রব্য বা পণ্যের মূল্য বা ভ্যালু নিরূপণের আলোচনার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে মারকস দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের সাহায্যে তাঁর ক্যাপিটাল গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে মূলধনের সৃষ্টি, মূলধন সঞ্চালন, মূল ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ধারা এবং উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে যে আলোচনা করেছেন, লেখকের এই গ্রন্থখানি তারই সংক্ষিপ্ত সার। বর্তমান কালে এদেশে মারকসবাদ সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞানলাভ করার স্পৃহা ক্রমশ যেভাবে বেড়ে চলেছে—এ পুস্তকখানা আগ্রহী ব্যক্তিদের পক্ষে অবশ্য-পাঠ্যরূপে বিবেচিত হবে বলে আশা করা যায়। পুস্তকখানার আলোচ্য বিষয়বস্তু অত্যন্ত জটিল হলেও ভাষা সহজ ও সাবলীল।

১৯।৬৯

শিশু সাহিত্য

গাথা। প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ— অনুকণা খাস্তগীর। বাক সাহিত্য, ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা—৯। মূল্য যথাক্রমে ২·৫০ ৩·০০ টাকা।

লেখিকা কলকাতার কোন একটি প্রখ্যাত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কবিতার মাধ্যমে শিশুদের সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয়গুলি এমনভাবে এই পুস্তক দুখানার অংকিত হয়েছে যে, অল্পবয়স্করা এই পুস্তকের ছড়া বা কবিতা আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে অল্প সময়ে অনেক বিষয়ে জ্ঞানলাভ করতে সমর্থ হবে। উপদেশাত্মক এইসব ছড়া বা কবিতাগুলির সুললিত ছন্দ শিশুমনের উপর এমন প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হবে, যাতে তারা কবিতাচ্ছলে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি মনে রাখতে পারবে এবং সঙ্গে সঙ্গে উপকৃতও হবে। দ্বিতীয় ভাগের ছড়াগুলি সাধারণত স্কুলের পাঠ্যসূচীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই রচিত হয়েছে। ছড়াগুলির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ছবির সংযোজন ছড়াগুলিকে অধিকতর সহজবোধ্য এবং আকর্ষণীয় করে তুলেছে। বিশেষ করে প্রথম ভাগের ছড়াগুলি বালকবালিকাদের বাঁধিবুলি কথাগুলো বলতে পারার সঙ্গে সঙ্গে মুখস্থ করালে পরোক্ষে তাদের পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ বাড়াতে সাহায্য করবে বলে বোধ করি। এই দুই খণ্ড গাথা প্রণয়নে গ্রন্থকর্ত্রীর প্রয়াস সম্পূর্ণরূপে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে বলে মনে হয়। ছাপা এবং প্রচ্ছদপট প্রশংসনীয়। ২৬, ৫০।৬৯

নগ্ন পৃথিবী। আলোক ঘোষ। ৩এ, হরি ভট্টাচার্য লেন, কলিকাতা ২৬। মূল্য তিন টাকা।

লেখকের আলোচ্য পুস্তকখানাকে কি আখ্যায় অভিহিত করা যায়, তা ভেবে পাওয়া মুশকিল। কেননা এতে আছে খানিকটা উপন্যাসের আদল এবং কিছুটা রাজনীতির ছোঁয়াচ। কিন্তু কোনটাই এতে দানা বাঁধতে সমর্থ হয়নি। অত্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে এতে যে কয়টি চরিত্র সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাদের কার্যকলাপের হদিস এতে দেওয়া হয়েছে, তা অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত এবং বাস্তব জগতের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন। মুখ্য চরিত্র রাজা ব্যানার্জি এবং তার মাসতুতো বোন সুজাতার আবির্ভাব বেখাপ্প। এ

প্রবাদ গ্রন্থ

বাঁকা চোখা। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ৮২, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলিকাতা ২৬। মূল্য আট টাকা।

অসংখ্য প্রচলিত প্রবচন, প্রবাদ বাক্য বা চলতি কথার এ সংকলনখানির প্রবাদ বাক্যগুলি কিছুটা বাঁকিয়ে এবং কিছুটা খোঁচা দিয়ে ব্যবহার করা হয় বলে এ গ্রন্থখানির বাঁকা চোখা নাম দেওয়া হয়েছে। মেয়েদের কাছে এই প্রবচনগুলি শোলোক বা 'ফকসা' বলে পরিচিত। প্রবাদবাক্যগুলি সাধারণত সরস, সংক্ষিপ্ত, দূর অতীত কাল থেকে মুখে মুখে প্রচলিত প্রমাণিত সত্য। তবে এর কিছু কিছু ব্যতিক্রমও মাঝে মাঝে লক্ষ্য করা যায়। যেমন—"যার শিল যার নোড়া, তারই ভাঙি দাঁতের গোড়া।" এটা নিতান্ত সংক্ষিপ্ত নয়। কোন কোনটা আবার সুদূর অতীতেরও নয়। যেমন—"লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন।" এ ছাড়া এমন প্রবচনও আছে যা মাত্র প্রচলিত কিন্তু প্রমাণিত সত্য নয়। যেমন: "অতি বড় রূপসী না পায় বর" ইত্যাদি। সংস্কৃত ভাষাতেও এরূপ প্রবচনের অন্ত নেই। যেমন 'অভাবে স্বভাব নষ্ট', ন মূর্খ্তি, 'সর্বম অত্যন্তং গর্হিতং' ইত্যাদি। ইংরেজি ভাষায়ও এ জাতীয় প্রবাদ বাক্যের বহুলে প্রচলন দেখা যায়—যথা "Much ado about nothing. Riches have wings" প্রভৃতি। মনে হয় পৃথিবীর সর্বত্রই সব প্রচলিত ভাষাতে এরূপ প্রবচন থাকা সম্ভব। প্রবচনগুলির মর্মার্থ খুবই উপদেশপূর্ণ। মানুষ অনেক সময় এরূপ সামান্য একটি প্রবাদ বাক্যের মাধ্যমে অনেক বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়ের সমাধান অতি সংক্ষেপেই করে থাকে। বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো এই প্রবচনগুলি গ্রন্থখানার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

১৭।৬৯

বিবিধ

শতবর্ষ পূর্বের বাঙলা ও বাঙালী। শ্রীসতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী। দাম: বাঁধাই ৫, সাধারণ ৪।

পুস্তকটির সমাপ্তি পর্বে লেখক বলেছেন—"আমি গঙ্গা জলেই গঙ্গা পূজা করিলাম। পিতৃদেব জয়গোবিন্দের নিজ হস্ত

লিখিত ডায়েরী অবলম্বনেই তাঁহার জীবন আলেখ্য সুধীজনের অবগতির জন্য লিপিবন্ধ করিলাম।"

এই জয়গোবিন্দ রায়চৌধুরী ছিলেন একজন ভূম্যধিকারী এবং জমিদারি চর্চার দৈনন্দিন কাজের ভেতর নিয়মিত দিনপঞ্জী লিপিবন্ধ করতেন। শতাব্দী পূর্বের কাহিনীমূলক কিছু বিবৃতি এই ডায়েরীর মাধ্যমে পাওয়া যেতে পারে। অবিশ্যি যা একটি বিশেষ ভৌগোলিক সীমার মধ্যে নির্দিষ্ট, সামগ্রিকভাবে অখণ্ড বাংলা দেশের নয়। লেখারীতির প্রসাধনকলা লেখকের অনায়ত্ত বলে বস্তুবাদগুলি অতীতের মৃত-স্মৃতির মত নিষ্পৃহভাবে গ্রথিত। তবুও খণ্ডাংশভাবে এই তথ্যপঞ্জী সংবাদ হিসেবে কম মুখরোচক নয়।

প্রাপ্তি স্বীকার

গেরুয়া কন্যা—বীরভদ্র, করুণা প্রকাশনী—১১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১। মূল্য—৭·০০

অরণ্যদেব ✡ লী ফক

জেল থেকে—
টং-টং-টং-টং-টং
টং-টং-টং

কয়েদীরা পালিয়েছে!

ঠিক সময়ে গাড়িটাও পাওয়া গেছে!

এখানেই নেমে পড়া যাক!

জেল থেকে জন-কয়েক কয়েদী পালিয়েছে, মা এই খবর শুনে মহা ভাবনায় পড়ে গেছেলেন। তুমি আমার ভালই হল।

পার্স, এসে দেখছি রীতিমত শৌখীন পাড়া।
চটপট দরজাটা ভেঙে ফ্যালো।
MENS SHOP

উঃ, জামাকাপড়গুলো দারুণ দামী।
তাতে কী হয়েছে, আমাদের তো—
…দাম দিতে হচ্ছে না।
5/14

সব কটা রিভলবারই আমি নেব।
তা নিন। কিন্তু পুলিসের পারমিট তো চাই……

এই দেন পারমিট!
আঃ!
চটপট কিছু জিনিস হাতিয়ে এবারে সরে পড়া যাক।

আমাদের বেশ বড়লোক বড়লোক দেখাচ্ছে, তাই না?
তা দেখাচ্ছে

একটু বাদেই আমাদের কাজ শুরু করতে হবে।
ফলে এদের যাত্রাভঙ্গ হবে, কিন্তু উপায় কী?
কাজটা শুরু করলেই তো হয়।
এখন নয়, ডিনারের ঠিক পরে।
৪

[illegible]

[illegible] খেলাধুলো [illegible] তালে [illegible] অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দলের ভারত সফর এবং টেস্ট ক্রিকেটের দিকেই ক্রীড়ামোদীর দৃষ্টি ছিল বেশী। অন্য খেলাধুলো [illegible] গিয়েছিল দ্বিতীয় স্থানে। ইতিমধ্যে ব্যাঙ্গালোরে জাতীয় টেবল টেনিস কলকাতায় জাতীয় বাস্কেটবল এবং দিল্লিতে এশিয়ান টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের খেলা শেষ হয়ে গিয়েছে। বোম্বাইতে রোভার্স কাপের খেলা শেষ হবার পর [illegible] অস্ট্রেলিয়া [illegible] হল্যাণ্ড, [illegible] স্পেন, আর্জেন্টিনা এই [illegible] অংশ [illegible] মেক্সিকো [illegible] হকি চ্যাম্পিয়ন পাকিস্তান ও রানার্স অস্ট্রেলিয়া বোম্বাইয়ের আন্তর্জাতিক হকি আসরে অনুপস্থিত তবু যেহেতু আন্তর্জাতিক খেলাধুলোয় হকিই আমাদের বড় পরিচয় এবং সামনেই মিউনিক অলিম্পিক সেহেতু বোম্বাইয়ের আন্তর্জাতিক হকির গুরুত্ব অনেকখানি। এ আসর শুধু আমাদের প্রস্তুতির সহায়তা করবে না, ভুলত্রুটি শুধরে নেবারও সুযোগ দেবে।

জাতীয় বাস্কেটবল

কলকাতায় জাতীয় বাস্কেটবলের বিংশতি আসরে পুরুষ বিভাগে সার্ভিসেস দলের আবার পর্যাপ্ত প্রাধান্যের পরিচয়। মহিলা ও বালক বিভাগে আবার মহারাষ্ট্রের চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ।

'আবার' কথাটি এইজন্যই ব্যবহার করছি যে, ১৯৫৭ সালে জাতীয় বাস্কেটবলে অংশ গ্রহণের পর থেকে সার্ভিসেসের কাছ থেকে একবার ছাড়া কেউ জাতীয় সম্মান ছিনিয়ে নিতে পারেনি। গতবার ছিল ব্যতিক্রমের বছর। গতবার কোট্টায়ামে আয়োজিত জাতীয় আসরে উপর্যুপরি ১১ বছরের চ্যাম্পিয়ন সার্ভিসেস দলের কাছ থেকে চ্যাম্পিয়নশিপের সম্মান ছিনিয়ে নিয়েছিল ভারতীয় রেল দল। এবার ফাইনালে রাজস্থানকে ৮৪—৬৬ পয়েণ্টে হারিয়ে সার্ভিসেস ১২ বার জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করে।

মহিলা ও বালক বিভাগে মহারাষ্ট্রের চ্যাম্পিয়নশিপ লাভের ক্ষেত্রে 'আবার' কথাটির গুরুত্ব রয়েছে। কারণ এবার নি[illegible] মহিলা বিভাগে মহারাষ্ট্রের উপর্যুপরি চতুর্থবার চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ এবং বালক বিভাগে পাঁচবার বিজয়ী হওয়ার নজিরের মধ্যে একটানা তিনবার বিজয়ীর কৃতিত্ব মহিলা বিভাগের ফাইনালে মহারাষ্ট্রের মেয়েরা ৪৭—৩৫ পয়েণ্টে মহীশূরের মেয়েদের পরাজিত করেছে, বালক বিভাগের ফাইনালে মহারাষ্ট্রের ছেলেরা পরাজিত করেছে মহীশূরের ছেলেদের ৯৪—৬২ পয়েণ্টে।

জাতীয় বাস্কেটবলের আলোচনা প্রসঙ্গে স্বভাবতই বাংলার কথা এসে পড়ে। জাতীয় বাস্কেটবলের বালক বিভাগে বাংলা অবশ্য কোনবার বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেনি, কিন্তু অতীতে যে বাংলা দুবার (১৯৩৮ ও ১৯৪০ সালে) পুরুষ বিভাগে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে [illegible] বাংলার পুরুষ দল এবার গ্রুপ [illegible] খেলার সুযোগ [illegible] মহিলা দল ৮ বার জাতীয় [illegible] অধিকারিণী হলেও [illegible] সেমিফাইনালে মহীশূর [illegible] পয়েণ্টে হেরে [illegible] স্থান নির্ণয়ের খেলা [illegible] পয়েণ্টে পরাজিত করে তৃতীয় স্থান [illegible] করতে হয়েছে বাংলার বালক [illegible] অবশ্য পেয়েছে তৃতীয় স্থান।

পুরুষ মহিলা ও বালক [illegible] ১৬টি রাজ্যের ৪৩টি দলের ৮ দিনের

জাতীয় বাস্কেটবলে মহিলাদের ফাইনালে মহীশূরের পুষ্পা ও মহারাষ্ট্রের দুর্গানা নায়ারের বল দখলের চেষ্টা
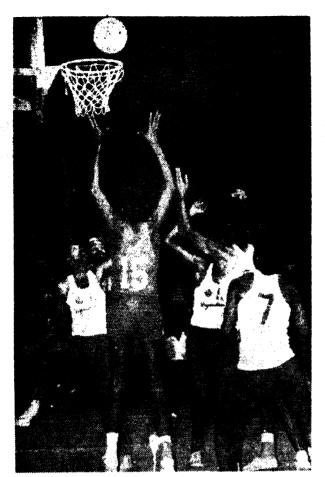
সার্ভিসেস ও রাজস্থানের মধ্যে জাতীয় বাস্কেট বলের ফাইনাল খেলায় সার্ভিসেস দলের দীর্ঘদেহী খেলোয়াড় ওমপ্রকাশ বল বাস্কেট করছেন

অনুষ্ঠানে কলকাতার ক্রীড়ামোদীদের মধ্যে আশানুরূপ সাড়া না জাগলেও ভারতে বাস্কেটবল খেলার মান যে ধীরগতিতে এগিয়ে চলেছে, এবারকার জাতীয় আসরের ক্রীড়াধারা তার এক উজ্জ্বল উদাহরণ। ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় ১৯৩৮ সনে কলকাতায় প্রথম জাতীয় বাস্কেটবলের আসর বসে। তারপর বাস্কেটবল ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় কলকাতায় জাতীয় আসর বসে ১৯৫৪ ও ১৯৬৩ সনে। যাঁরা অতীতে এই আসরে খেলা দেখেছেন এবং এবারকার আসরেও উপস্থিত ছিলেন তাঁদের অভিমত, খেলার প্রথাপ্রকরণে, নৈপুণ্যগত উৎকর্ষে, দৈহিক পটুতায় এবং পারস্পরিক যোগাযোগপ্রসূত ক্রীড়াধারায় ভারত অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছে। সত্যিই তাই। সার্ভিসেস দলের দীর্ঘদেহী খেলোয়াড় ওম প্রকাশ (দেহের উচ্চতা ৬ ফুট ৭ ইঞ্চি), হরি দত্ত, রাজস্থানের খুশিরাম, বিষ্ণু শর্মা ও কাচারিয়া, মহিলাদের মধ্যে মহারাষ্ট্রের অধিনায়িকা দুর্দানা নায়ার এবং মালা গাভাসকার, মহীশূরের অধিনায়িকা পুষ্পা এবং মোহিনী দেবী সারা প্রতিযোগিতার খেলায় যে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন তা অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবি রাখে।

তাছাড়া বাস্কেটবল তীব্র গতি এবং দৈহিক দক্ষতার এমন একটি খেলা, যাতে প্রতি মুহূর্তে দর্শকদের রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা, প্রতিনিয়ত আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণের মধ্যে ওঠা-পড়ার ছন্দোসুখ। কিন্তু দুঃখের কথা, কর্তৃপক্ষের সুব্যবস্থা এবং সারা ভারতের প্রথম সারির খেলোয়াড়দের সমাগম সত্ত্বেও জাতীয় আসরে আশানুরূপ দর্শক সমাগম হয়নি।

এশিয়ান টেনিস

দিল্লিতে সদ্য সমাপ্ত এশিয়ান টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে রাশিয়ার জয়জয়কার। রাশিয়ার এক নম্বর খেলোয়াড় আলেকজান্ডার মেত্রেভেলি মেনস ফাইনালে ভারতের প্রেমজিত লালকে ৬—৩, ৬—৪, ২—৬, ৩—৬ ও ৬—৩ গেমে হারিয়ে বিজয়ীর সম্মান পেয়েছেন। মহিলাদের ফাইনালে দুই রুশী তরুণীর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কুমারী অ্যাবাশেভ্‌জ কুমারী ইভানোভাকে হারিয়েছেন ৯—৭ ও ৬—৩ গেমে। মেত্রেভেলি শুধু পুরুষ বিভাগেই চ্যাম্পিয়নশিপ পাননি, মিক্সড ডাবলসের ফাইনালেও বিজয়ীর সম্মান পেয়েছেন কুমারী ইভানোভাকে সঙ্গে করে খেলে। মেত্রেভেলি ও ইভানোভা ৬—৩ ও ৬—৩ গেমে হারিয়েছেন হাঙ্গেরীর গুলিয়াস ও ভারতের কিরণ পেশোয়ারিয়াকে।

এবারকার এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা গতবারের চ্যাম্পিয়ন ভারতের জয়দীপ মুখার্জির সেমি-ফাইনালে মেত্রেভেলির কাছে স্ট্রেট সেটে পরাজয়। শুধু তাই নয়, তার চেয়েও বিস্ময়জনক ঘটনা ডাবলসের ফাইনালে জয়দীপ-প্রেমজিত জুটির পরাজয় তরুণ মিশ্র ও মিনোত্রা জুটির কাছে। কে ভাবতে পেরেছিল বহু অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জয়দীপ-প্রেমজিত স্ট্রেট সেটে শ্যাম মিনোত্রা ও শিব মিশ্রের কাছে এত সহজে হার স্বীকার করবেন ?

ভারতের টেনিসের অস্তগামী সূর্য রামনাথন কৃষ্ণনের পর এই জয়দীপ-প্রেমজিতই আমাদের আশার আলো ছিলেন। কিন্তু তাঁদের সাম্প্রতিক ক্রীড়া-ভূমিকা সত্যিই নৈরাশ্যের কারণ। যে রাশিয়া টেনিস র‍্যাকেট হাতে নিয়েছে মাত্র বিগত দশকে, সেই রাশিয়ার কাছে আমাদের এমন হেনস্থা কল্পনাতীত।

অবশ্য ফাইনালে প্রেমজিত লাল মেত্রেভেলির কাছে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেই পরাজিত হয়েছেন। মেত্রেভেলি দুটি সেট দখল করবার পর প্রেমজিতও পান দুটি সেট। পঞ্চম সেটে দুজনে ৩টি করে গেম পাবার পর মেত্রেভেলি এগিয়ে যান, প্রেমজিত আর একটি গেমও পান না। মহিলাদের মধ্যে গতবারের চ্যাম্পিয়ন নিরুপমা বসন্ত, যিনি এখন ক্রিকেট খেলোয়াড় অশোক মানকড়ের সহধর্মিণী, এশিয়ান টেনিসে প্রতিযোগিতা করেন নি। তবু এবারের এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতীয়দের ব্যর্থতা প্রকট।

জানুয়ারির ১২ তারিখ থেকে কলকাতার সাউথ ক্লাবে জাতীয় টেনিসের আসর বসছে। এখানেও বিদেশী ১২ জন খেলোয়াড় প্রতিযোগিতা করবেন, যার মধ্যে পুরুষ-নারী সহ রাশিয়ারই ৬ জন। তা ছাড়া পোল্যান্ড, যুগোস্লাভিয়া ও হাঙ্গেরীর খেলোয়াড়ও রয়েছেন। দেখা যাক, জাতীয় টেনিসেই বা ভারতের খেলোয়াড়রা কি ভূমিকা নেন।

জাতীয় টেবল-টেনিস

টেস্ট ক্রিকেটের ডামাডোলের মধ্যে ব্যাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত জাতীয় টেবল-টেনিসের বিস্তৃত বিবরণ আমাদের হাতে আসেনি। যেটুকু বিবরণ পাওয়া গেছে তাতে মনে হয়, ওই আসরের খেলা দেখে পরিচালকদের মনে আশা জেগেছে আগামী এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের তরুণেরা নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে পারবে।

গতবারের বিজয়ী অন্ধ্র প্রদেশের মীরকাশিম আলী এবারও উন্নত নৈপুণ্যের পরিচয় মহীশূরের কে জয়ন্তকে ফাইনালে পরাজিত করে আবার জাতীয় চ্যাম্পিয়নের সম্মান পেয়েছেন। মেয়েদের মধ্যে মহারাষ্ট্রের কাইটি চার্জম্যান পেয়েছেন ক্রিকেটের সম্মান। সিঙ্গলসে বিজয়িনীর গৌরব ছাড়াও মিক্সড ডাবলস এবং উইমেনস ডাবলসের বিজয়িনীর পুরস্কারও তাঁর হাতে গিয়েছে।

মহীশূরের কাবাড জয়ন্ত সারা প্রতিযোগিতায়ই ভাল খেলেছেন। অনেকে আশা করেছিলেন ফাইনালে তিনি মীরকাশিম আলীকে পরাজিত করে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হতে পারবেন। পারেন নি। তবে মীরকাশিমের সঙ্গে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে হার স্বীকার করেছেন। পাঁচ সেটের ফলাফলই তার প্রমাণ। মীরকাশিমের অনুকূলে খেলার ফলাফল ১৮—২১, ২২—২০, ২১—১৭, ১৯—২১ ও ২১—১৪ পয়েন্ট। রেলওয়ের জগন্নাথও জাতীয় টেবল-টেনিসে উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখিয়েছেন। মেয়েদের মধ্যে মহারাষ্ট্রের শৈলজা সালোকে এবং উষা সুন্দররাজ খেলায় উন্নতির পরিচয় মিললেও কাইটি চার্জম্যানের সঙ্গে কারও তুলনা চলে না। তবে উষা সুন্দররাজের হাতের মার এবং কোর্ট-ক্র্যাফট এখনও দেখবার মত।

টেবল-টেনিসে জাপান বিশ্বশ্রেষ্ঠ। সেই জাপানে আগামী এপ্রিল মাসে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের আসর। এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের খেলায় ভারতের অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত যখন পাকা এবং এখনও যখন চার-পাঁচ মাসের মত সময় হাতে আছে তখন আশা করব ভারতের খেলোয়াড়রা প্রস্তুতিতে ফাঁকি দেবেন না, অন্তত আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় তাঁরা যে অংশ গ্রহণের যোগ্য, নিজেদের যোগ্যতার দ্বারা তা প্রমাণ করবেন।

রাশিয়ার দলপতির চোখে

রাশিয়ার যুব ফুটবল দলের সঙ্গে পাঁচটি খেলায় ভারতের পাঁচটি দলেরই পরাজয় নিঃসন্দেহে ভারতীয় ফুটবলের পক্ষে আশার কথা নয়। যে দলের ১৭ জনই ছাত্র এবং তিনজন সাধারণ শ্রমিক, যাদের কোন খেলোয়াড় এখনও অলিম্পিকে বা রাশিয়ার প্রতিনিধিমূলক কোন খেলায় অংশ গ্রহণ করেনি তাদের সঙ্গে পাঁচটি খেলার ফলাফল কি? জলন্ধরে পাঞ্জাব একাদশ ৫—০ গোলে পরাজিত, কলকাতায় আই এফ এ একাদশ পরাজিত ৩—০ গোলে, ব্যাঙ্গালোরে প্রধানমন্ত্রীর একাদশের হার ৫—০ গোলে, হায়দরাবাদে হায়দরাবাদ একাদশের ৩—০ গোলে এবং দিল্লিতে ভারতীয় একাদশের ২—০ গোলে। সুতরাং, পাঁচটি খেলায় ১৮টি গোল করে এবং একটিও গোল না খেয়ে রাশিয়ার 'না-বালক' ফুটবল দল দেশে ফিরে গিয়েছে। যাবার আগে দলপতি মিঃ এ কোলিনিন মন্তব্য করেছেন, আন্তর্জাতিক ফুটবল মানে পৌঁছুতে হলে ভারতীয় ফুটবলকে এখনও অনেক পথ হাঁটতে হবে। অর্থাৎ সোজা কথায় 'না-বালক' ফুটবল দলের দলপতির মন্তব্য : 'ভারতীয় ফুটবল এখনও সাবালকত্বে পৌঁছায়নি।'

রোভার্স কাপ বিজয়ী ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব রোভার্স কাপ সহ হাওড়া স্টেশনে পৌঁছবার পর ফুটবল উৎসাহীদের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের অভিব্যক্তি। রোভার্স ফাইনালে ইস্ট বেঙ্গল ৩—০ গোলে মোহনবাগানকে পরাজিত করে

শ্রীকোলিনিন অবশ্য ভারতীয় খেলোয়াড়দের কলাকৌশলের প্রশংসা করেছেন। কয়েকজন খেলোয়াড়কে ব্যক্তিগত সাধুবাদও জানিয়েছেন। রক্ষণভাগের খেলাতেও তিনি দৃঢ়তার পরিচয় পেয়েছেন। কিন্তু চরম ব্যর্থতা দেখেছেন পুরোভাগের খেলায় এবং শুটিং-এ। পুরোভাগের মধ্যে নাকি যোগাযোগের অভাব এবং আক্রমণ-রচনার কোন প্ল্যানিং নেই।

কথাটা অবশ্যই মিথ্যে নয়। পুরোভাগের ব্যর্থতা ভারতীয় ফুটবলের চিরদিনের গলদ। এত পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং এত প্রশিক্ষণের পরও ভারতীয় ফুটবলের মান উন্নত হচ্ছে না কেন? আমরা যেখানে ছিলাম সেখানেই আছি? না, আরও পিছিয়ে পড়ছি?

একলব্য

কৃতীর ক্রীড়া ভূমিকা

প্রস্তাবনা

মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যেই রয়েছে খেলাধুলোর আসক্তি। শিশু জন্মগ্রহণের পর থেকেই স্বাভাবিক নিয়মে খেলাধুলো করে। হাত পা নাড়ে, ডিগবাজি খায়, হাসে কাঁদে। মা বলেন—মা ষষ্ঠীর সঙ্গে ছেলে খেলা করছে। গাঁয়ের বধূ কলসী কাঁখে জল আনতে গিয়ে পানা-পুকুরে সাঁতার কেটে আসে। বুড়ো দাদু ছোট নাতির ঘোড়া হয়ে মেঝেতে হামাগুড়ি দেন। কেউ তাসপাশা খেলে সময় কাটান। আবার রাখাল বালক থেকে আরম্ভ করে রাজা-উজির, রাষ্ট্রনায়করাও খেলাধুলোয় মেতে ওঠেন। সবই খেলাধুলোর মাধ্যমে চিত্ত বিনোদন। চিত্ত বিনোদনই খেলাধুলোর মূলে লক্ষ্য। কারো কারো মতে দেহের কান্তি বৃদ্ধি আর মনের আনন্দের মধ্যেই খেলাধুলোর সার্থকতা।

কিন্তু আধুনিক অলিম্পিকের প্রবর্তক ব্যারন পিয়ের দ্য কুবার্তা খেলাধুলোর মধ্যে এনেছেন বিশ্বমৈত্রীর বাণী, সততার তত্ত্ব, ন্যায়ের দন্ড। তাঁর মতে, জয়লাভ নয়—খেলাধুলোয় অংশ গ্রহণ করাই বড় কথা, সততার সঙ্গে ক্রীড়াক্ষেত্রে সংগ্রামই ক্রীড়াবিদের আদর্শ, পাঁচ মহাদেশের মানুষের মহামিলন এবং তাঁদের মধ্যে সৌভ্রাত্র ও সখ্যতার বন্ধন সুদৃঢ় করাই খেলাধুলোর মূল লক্ষ্য।

খেলাধুলোর উদ্দেশ্য ও মূল্যায়ন সম্পর্কে ফ্রান্সে যে হাণ্ট কমিটি গঠিত হয়েছিল তার রিপোর্টে খেলাধুলোর সংজ্ঞা সম্বন্ধে বলা হয়েছে :

যে-কোন দৈহিক কাজ, যার মধ্যে খেলাধুলোর গুণাগুণ আছে, যা নিজের সঙ্গে লড়াইয়ে পরিণত হয় বা অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতার রূপ ধারণ করে তাকেই 'ক্রীড়া' বলে।'

রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে—এই খেলা যদি প্রতিযোগিতায় রূপান্তরিত হয় তবে তা খেলোয়াড়সুলভ মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত। খেলাধুলো মানুষকে আনন্দমুখর পরিবেশে এবং অকপট আবহাওয়ায় মিলিত হতে সাহায্য করে। খেলাধুলো অপরকে জানতে ও শ্রদ্ধা জানাতে শিক্ষা দেয়, এক জাতি, এক প্রাণ, একতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে। ব্যক্তিগত লাভালাভের ঊর্ধ্বে থেকে মানুষকে সুমহান কর্তব্যে অনুপ্রেরণা যোগায় খেলাধুলো। খেলাধুলোই মানুষের দায়িত্ববোধ ও উৎসাহ বৃদ্ধির দ্যোতক। ব্যক্তিগত সামর্থ্য ও প্রয়োজনের ভিত্তিতে খেলাধুলো সংগঠিত হলে তা স্বাস্থ্য ও দেহের সুষম গঠনের সহায়ক। খেলাধুলো নিজেকে সম্পূর্ণভাবে জানতে এবং প্রকাশ করতে সাহায্য করে। খেলাধুলো সুশৃংখলভাবে কাজ করতে ও নিজের যোগ্যতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। দৈহিক প্রতিবন্ধকতা দূর করার পক্ষে খেলাধুলোর প্রয়োজন অনস্বীকার্য। তার চেয়েও বড় কথা, অনুশীলন, অধ্যবসায় ও সাধনা—শিক্ষা দেয় খেলাধুলো। শিক্ষা দেয় নিজের সংযত আচরণের, অপরের প্রতি সম্ভ্রম বজায় রাখার।

হাণ্ট কমিটির রিপোর্টে খেলোয়াড়ের আচরণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে—জয়লাভের জন্য সে যথাশক্তি নিয়োগ করবে, মরণপণ সংগ্রাম করবে। কিন্তু পরাজয়ের ফলে নিরুৎসাহ হবে না। জয়ে আত্মতৃপ্তি অনুভব করবে কিন্তু অহঙ্কার বর্জন করবে।

সংযুক্ত জাতিসঙ্ঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি শাখার অধিকর্তা মিঃ রেনে মাহেয়ু তাঁর 'চার্টার অব গেমস'-এ আধুনিক জগতে ক্রীড়াধারার প্রগতির চিত্র সকলের সামনে তুলে ধরে বলেছেন—বিশ্বব্যাপী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার দৈনন্দিন জীবনে যে-সমস্ত গুণাবলী প্রতিফলিত—যেমন, শিক্ষা, বিজ্ঞান, দর্শন, আনন্দানুষ্ঠান, বৃত্তি, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি—সব কিছুর সঙ্গে খেলাধুলো গভীরভাবে সংযুক্ত হয়ে পড়ে সারা বিশ্বব্যাপী স্বাভাবিক সামাজিক ধর্ম বলে গণ্য হয়েছে। খেলাধুলো এখন শুধু দৌড়ঝাঁপ বা খেয়াল চরিতার্থতার অঙ্গ নয়, সভ্যতার ভবিষ্যৎ নিরূপণকারী সমস্যাগুলির সঙ্গেও গভীরভাবে যুক্ত। খেলাধুলো সামাজিক প্রগতির ক্ষেত্রে প্রবেশ করে সেই প্রগতির মূলীভূত যে শক্তি ও সংগঠন তার সঙ্গেও যুক্ত ও একাত্ম হয়ে পড়েছে। জাতিগঠনের ক্ষেত্রে খেলাধুলোর ভূমিকা কি তা বিশেষভাবে চিন্তা করতে হবে। বিশেষভাবে চিন্তা করতে হবে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিবিকাশ, আত্মোন্নতির পথে খেলাধুলোকে কিভাবে কাজে লাগানো যায়।

ইউনেস্কোর শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তার অভিমত : খেলাধুলো শিক্ষাগত উৎকর্ষ লাভ করে তখনই যখন তা এক সঙ্গে ছাত্রদের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়তা করে। তাদের মধ্যে শৃংখলাবোধ জাগ্রত করে, বিনয়ী ও সুনাগরিক হবার শিক্ষা দেয়।

'কৃতীর ক্রীড়াভূমিকা' শিরোনামায় বৃহত্তর ক্ষেত্রে খেলাধুলোর উপযোগিতার অবতারণা 'ধান ভানতে শিবের গীত'-এর মত শোনাতে পারে। কিন্তু তার প্রয়োজন আছে ক্রীড়াভূমিকার উপক্রমণিকা হিসাবে।

যে খেলাধুলোর এত গুরুত্ব, সে খেলা অতীতে আমরা কিভাবে গ্রহণ করেছি? হেলাফেলাভাবে। ছেলেকে খেলাধুলো করতে দেখলে বলেছি—সারা দিন খেলা খেলা করে বেড়াবে, পড়াশুনা হবে কিভাবে? আবার চাকরীর দরখাস্তে বিশেষ গুণের পরিচয়ে লিখেছি—'আই অ্যাম এ গুড স্পোর্টসম্যান'। কেননা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে চাকরী পাওয়া না-পাওয়া নির্ভর করত ইংরেজের মর্জির উপর। এবং যেহেতু আমরা জানতাম ইংরেজরা খেলাধুলো ভালবাসে, খেলোয়াড়ের কদর করে, সেহেতু ওই কথাটি যোগ করতে ভুলে যেতাম না।

কিন্তু খেলাকে সত্যিই কি আমরা মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিলাম? না, নিতান্ত ঘটনাক্রমে অনেকে খেলোয়াড় হয়ে গিয়েছিলেন? আজ খেলাধুলোর এত ডামাডোলের মধ্যেও সত্যিকারের আন্তরিকতা কতজন খেলোয়াড়ের? তাঁদের আচার-ব্যবহারেই বা কতখানি খেলোয়াড়সুলভ মনোবৃত্তির পরিচয়? খেলার ছন্দ জীবনের ছন্দের সঙ্গে মিলিয়ে কতজনই বা কৃতী হতে পেরেছেন? অবশ্যই কৃতী পুরুষ ক্রীড়াভূমিকার সার্থক রূপায়ণে পুরোপুরি সফল। এ'দের মধ্যে কেউ বড় খেলোয়াড় না হতে পারেন, কিংবা অল্পস্বল্প খেলাধুলো করতে পারেন। কিন্তু ক্রীড়াধর্মকে জীবনবেদ জ্ঞান করে খেলোয়াড়সুলভ মনোবৃত্তি বজায় রেখে কর্মজীবনে সফল হয়েছেন কিংবা খেলাধুলোর মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। আগামী সপ্তাহ থেকে এ'দের কয়েকজনের কথাই ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করতে চেষ্টা করব 'কৃতীর ক্রীড়াভূমিকা' নিবন্ধে।

মুকুল

বিমল ভৌমিক ও নারায়ণ চক্রবর্তী পরিচালিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে তৈরি নাবিক প্রোডাকসন্স-এর "দিবারাত্রির কাব্য" ছবিতে মাধবী মুখোপাধ্যায়।

বাংলা ছবির এক বছর

বাংলা ছবির আরও একটি বছর পার হল। এক বছরের বাংলা ছবির দিকে তাকিয়ে উৎসাহিত হবার মত কারণ অবশ্যই আছে। নিরাশ হতে হয় শুধু ইণ্ডাস্ট্রির হাল-চালের দিকে তাকিয়ে। নিয়মিত যে-সব পরিচালকরা ছবি করেন, যাঁদের ছবি দেখবার জন্য দর্শকরা আগ্রহান্বিত তাঁরা কিন্তু মোটেই স্বস্তিতে নেই। একজন তো বললেন, ছবি তো তৈরি করছি। কিন্তু আমি কি জানি আমার ছবি কবে কোথায় রিলিজ হবে? বড় পরিচালকদের ছবি যদি পড়ে থাকে তবে সেটা ভয়াবহ ব্যাপার। বাংলা ছবির মান, সম্মান, মর্যাদা এখন নির্ভর করছে মাত্র কয়েকজন পরিচালকের উপর। তাঁরা যদি কাজে উৎসাহ না পান তবে সেটাই বাংলা ছবির বড় সংকট। তাঁদের অস্বস্তি কেন সে ভিন্ন প্রসঙ্গ. বারান্তরে আলোচনা করা যাবে। হালের বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের

সংবাদ যাঁরা রাখেন তাঁদের কাছে এই 'কেন'-র উত্তর জটিল নয়। মোদ্দা কথা, নতুন বছর প্রথম সারির পরিচালকদের মনে কোন আশার আলো জ্বালিয়ে আসেনি।

বাংলা ছবি আবার সারা ভারতে সেরা বলে প্রমাণিত হল। সত্যজিৎ রায়ের "গুপী গাইন বাঘা বাইন" রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক পেয়েছে। শ্রেষ্ঠ পরিচালকের জাতীয় পুরস্কার এবারও পেলেন সত্যজিৎ রায়। বাংলা শিশুচিত্র "হীরের প্রজাপতি" পেয়েছে স্বর্ণপদক। "গুপী গাইন......" সকল রেকর্ড ভেঙে ১০০ সপ্তাহ চলেছে —মে মাস থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত। এটাই আশার কথা। বড় শিল্পী ছাড়াও, শুধুই পরিচালনার গুণে এতদিন ধরে ছবি চলে।

বাংলা চলচ্চিত্র একজন উল্লেখযোগ্য নতুন শিল্পীকে পেলেন। তিনি গুপী-রূপী তপেন চট্টোপাধ্যায়। গত বছরে একজন নতুন চিত্রপরিচালকও এলেন। তিনি দীনেন গুপ্ত। তাঁর প্রথম ছবি "নতুন পাতা" স্টার-বর্জিত। এই ছবিও যে বেশ জনপ্রিয় হয়েছে সেটাও সুলক্ষণ। বাংলায় ডাব করা চারটি তেলুগু ছবি ছাড়া মোট ২৭টি ছবি ১৯৬৯ সনে মুক্তি পেয়েছে। ছবিগুলির নাম : গুপী গাইন বাঘা বাইন, পরিণীতা, তিন ভুবনের পারে, কমললতা, মন নিয়ে, সাবরমতী, পিতাপুত্র, নতুন পাতা, শুক-সারী, মা ও মেয়ে, অগ্নিযুগের কাহিনী, চিরদিনের দাদু, পান্না-হীরে-চুনী, শেষ থেকে শুরু, অপরিচিত, দুরন্ত চড়াই, বিবাহ বিভ্রাট, চেনা-অচেনা, আঁধার সূর্য, তীরভূমি, বন-জ্যোৎস্না, মায়া, তের নদীর পারে, আরোগ্য নিকেতন, বালক গদাধর, প্রতিদান।

উঁচুদরের ছবির সংখ্যা এবার কম।

উল্লেখ করার মত নতুন শিল্পী ও কলা-কুশলীর আগমনও এই এক বছরে তেমন ঘটেনি বলা চলে। তবে আরতি গাঙ্গুলি (নতুন পাতা) ও অজয় দাসের (পান্না-হীরা-চুনী-র সুরকার), কাজ দেখে দর্শকের মনে প্রত্যাশা জাগা স্বাভাবিক। অপর্ণা সেনকে নায়িকা রূপে পেয়ে দর্শকরা খুশি বলা যেতে পারে। এই বছরেও নায়ক হিসাবে সর্বাধিক ছবিতে দেখা গেছে উত্তমকুমারকে। তাঁর ছবির সংখ্যা ছয় (কমললতা, মন নিয়ে, সাবরমতী, শুক-সারী, চিরদিনের এবং অপরিচিত)। সর্বাধিক ছবিতে নায়িকা চরিত্রে অভিনয়ের গৌরব এবার দুজনের। সুপ্রিয়া ও মাধবী। সুপ্রিয়া অভিনীত ছবিগুলির নাম : মন নিয়ে, সাবরমতী এবং চিরদিনের। মাধবীর ছবি হল : অগ্নিযুগের কাহিনী, দুরন্ত চড়াই ও তীরভূমি। সর্বাধিক ছবিতে সংগীত পরিচালনার কৃতিত্ব এ বছর হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের। সাবরমতী, শুকসারী, চেনা অচেনা, পরিণীতা এবং মন নিয়ে—এই পাঁচখানি ছবিতে সুর দিয়েছেন তিনি।

যাত্রিক পরিচালিত "এখানে পিঞ্জর" ছবিতে দিলীপ মুখোপাধ্যায় ও উত্তমকুমার। ফটো—দেশ

॥ চিত্র-সমালোচনা ॥

বালক গদাধর

(তীর্থভারতী)

পৌরাণিক চিত্রে অলৌকিক ঘটনার আধিক্য থাকে জানি। কারণটিও দুর্বোধ্য নয়। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাল্যজীবন-চিত্রে যখন-তখন অলৌকিক ব্যাপার কেন? শুধুই অতিপ্রাকৃত বিষয় দিয়ে কি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাত্ম্য বাড়ানো যায়? "বালক গদাধর" চিত্রে অলৌকিক ঘটনা নাই বলে দর্শকের সবটাই না, বরং দুঃখের দিক থেকে কিছু তো থাকবেই। কিন্তু এই ছবিতে অলৌকিক বিষয়ের প্রতি পরিচালক হিরণ্ময় সেনের ঝোঁক যেন একটু বেশি।

অন্য দিকে গদাধরবেশে প্রথমে যে মেয়েটি অভিনয় করেছে শ্রা নেচেছে তার কথাবার্তা ও অভিব্যক্তিতে অকালপক্কতার লক্ষণ রীতিমত পীড়াদায়ক। ছবির দ্বিতীয় বিরক্তিকর বিষয় হল গান। সাধক-পুরুষদের মাতৃসংগীত শুনে যে ধর্মভাব জাগে, আধুনিক গীতিকারদের রচনায় তা মেলে না। তৃতীয়ত, "বালক গদাধর" চিত্রে ঠাকুরের পিতা ক্ষুদিরামের কাহিনী অনেক বেশি দেখানো হয়েছে। এত বিস্তৃত কাহিনীর দরকার ছিল কি? ছবির শেষে স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে, স্বামীজীর বাণীর সংগে একালের সমাজ-চিত্র দেখানো হয়েছে। তাতে নিরন্ন, গরীবদের দুর্দশাই বিশেষভাবে দেখানো হয়েছে। এবং আজকের সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা অনুযায়ীই স্বামীজীর বাণী নির্বাচন করা হয়েছে। ছবির শেষে স্বামীজীকে দেখাবার কল্পনাটি সুন্দর।

তবু বলি, "বালক গদাধর" ছবিটি সব মিলিয়ে ধর্মভাবাপন্ন দর্শকদের মনে রেখাপাত করবে। যুক্তি দিয়ে প্রতি দৃশ্য যাঁরা যাচাই করবেন না তাঁদের ছবিটি আরও ভাল লাগবে। শিশু গদাধর রূপে চুমকী রায়কে ভাল না লাগলেও পরে ওই চরিত্রে শিশু-শিল্পী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় বেশ মানিয়ে গেছে। কয়েকটি গান শুনতে ভাল, সুর দিয়েছেন অহীন ঘোষ।

"রাজকুমারী"র শুটিং শুরু

লোকনাথ চিত্র মন্দিরের নতুন ছবি "রাজকুমারী"র শুটিং আরম্ভ হয়েছে। স্বরচিত কাহিনী ও চিত্রনাট্য অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করছেন সলিল সেন। উত্তমকুমার ও তনুজা ছবির দুই প্রধান শিল্পী। অন্যান্য বিশিষ্ট ভূমিকায় আছেন ছায়া দেবী, দীপ্তি রায়, পাহাড়ী সান্যাল, অসিতবরণ, তরুণকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায় এবং রমেন চট্টোপাধ্যায়। রাহুল দেব বর্মণ ছবির সংগীত পরিচালক।

লোকনাথ চিত্র মন্দিরের নতুন ছবি "রাজকুমারী"র (পরিচালনা : সলিল সেন) শুটিং আরম্ভ হয়েছে; প্রথম দিনের শটে রমেন চ্যাটার্জি ও তনুজা। ফটো—দেশ

মঞ্জরী অপেরা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী নিয়ে অগ্রদূত "মঞ্জরী অপেরা" ফিল্ম তৈরি করছেন। ছবির শুটিং অনেকখানি এগিয়েছে। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য এ পর্যন্ত নির্বাচিত হয়েছেন : উত্তমকুমার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিম ঘোষ, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, অমর মল্লিক, বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়, সরযূবালা, বনানী চৌধুরী, গীতা দে, দেবী গুপ্ত, গৌরী শী প্রভৃতি। সুধীন দাশগুপ্ত সংগীত পরিচালক।

টলি-টিপ্পনী

ইংরেজী সত্তর সাল বাংলা ফিল্মের পক্ষে শুভ হবে কি? "এখনই" বলা যায় না। তবে ইন্ডাস্ট্রির অনেকের ধারণা, ঊনসত্তরের অনেক বিক্ষোভ, অনেক অশান্তির জের নাকি সত্তরে শান্তির ইঙ্গিত। ইংরেজী নতুন বছরে বাংলা ছবির প্রযোজকেরা কিছুটা নিশ্চিন্ত হতে পেরেছেন, স্টার নিয়ে ছবি না করলেও ওঁদের ছবি রিলিজ পেতে পারে। কনসাল-টেটিভ কমিটির সেন্সরভিত্তিক রিলিজ নীতিকে সকলেই স্বাগত জানিয়েছেন। সমস্যা এখন অন্যত্র। "সেন্সরভিত্তিক নীতি" চালু হবার পর থেকে সবাই এখন যে যার ছবির সেন্সর সেরে নিতে তৎপর হয়ে উঠেছেন। কোনো মতে শুটিং শেষ করে, ব্যাক-গ্রাউন্ড মিউজিক সংযোজনা না করেই সবাই এখন নিজেদের ছবির সেন্সর করিয়ে নিচ্ছেন। সেন্সর বোর্ডের নাকি নিয়ম আছে, ছবির "এফেক্ট সাউন্ড" ছাড়াই সেন্সর সার্টিফিকেট পাওয়া যেতে পারে। সুতরাং শুটিং শেষ হয়ে যাবার পর এখন আর কেউ ব্যাক-গ্রাউন্ড মিউজিকের কথা ভাবছেন না, সেন্সরটা তো আগে হয়ে যাক!

আমার অবাক লাগছে এই ভেবে, সেন্সর বোর্ডের মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা কেমন করে এরকম একটা নিয়ম রেখেছেন, "এফেক্ট সাউন্ড" ছাড়াই ছবি সেন্সরের ছাড়পত্র পেয়ে যেতে পারে? একটু তলিয়ে ভাবলেই দেখা যায়, ছবিতে "এফেক্ট সাউন্ডে"র ভূমিকা কিছু কম নয়। "পথের পাঁচালি" ছবিতে দুর্গার মৃত্যুর পর একটা মাত্র তারসানাইয়ের ঝংকার প্রেক্ষক-চিত্তকে কাঁদিয়ে ছেড়েছিল, এরকম আরও হাজার একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে ছবির "ব্যাক-গ্রাউন্ড মিউজিক" কিংবা "এফেক্ট সাউন্ড" ছবিকে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যায়। ডায়লগের চাইতে বেশী বই কম নয় এফেক্ট সাউন্ডের ভূমিকা। অনেক "সিচুয়েশন" ছবিতে তৈরি করা হয়ে থাকে যেখানে নায়ক-নায়িকার রোমান্টিক দৃশ্যে ইঙ্গিতপূর্ণ ধ্বনির ব্যবহার অনায়াসেই অর্থবহ হয়ে উঠতে পারে, সমগ্র দৃশ্যটি অশ্লীলতাদোষে দুষ্ট হয়ে উঠতে পারে। চুম্বনের দৃশ্য দর্শকমনে যতটা শিহরন জাগাতে পারে, সরাসরি কোনো চুম্বনের দৃশ্য না তুলেও শুধুমাত্র "চুম্বনের ধ্বনি"র ব্যবহারে দর্শকমনকে আরও বেশী বিচলিত করে তোলা যায়। অথচ আমাদের "সেন্সর বোর্ড" ধ্বনির ব্যাপারেই সম্পূর্ণ উদাসীন। "এফেক্ট সাউন্ড" ব্যতিরেকেই ছবি সেন্সরের ছাড়পত্র পেতে পারে।

—বিচক্র

শক্তি সামন্তর "আরাধনা" হিন্দী চিত্রে শর্মিলা ঠাকুর।

নাট্য-সমালোচনা

নয়ন কবিরের পালা

(নক্ষত্র)

নাটক-শেষের নাটক "নয়ন কবিরের পালা"। নাটক শেষ হয়ে গেছে, নাটকের দল গাড়ির অপেক্ষায়, গাড়ি এলেই তল্পি-তল্পা নিয়ে রওনা হবে। গাড়ি আসতে দেরি হচ্ছে। কী করা যায় এখন? নাটকের দুই ক্লাউনের ইচ্ছা, অবশিষ্ট দর্শকদের আরও কিছু তারা উপহার দেবে। কী দেবে তারা দর্শকদের? শুধুই নাটক? নাকি সত্যিকার জীবনের কথা?

এই নিয়ে দুই ক্লাউনের জল্পনা, অতীত জীবনের দিন-রাত্রিগুলি খুঁজে খুঁজে কিছু ঘটনা বের করবার চেষ্টা। সেটাই "নয়ন কবিরের পালা", দুই চরিত্রের ভিন্নধর্মী নাটক। নয়নচাঁদের দেখা একটি স্বপ্নকে ঘিরে ওদের দুজনের নাটক রচনার চেষ্টা, তারই মধ্যে রিয়্যালিটির প্রচ্ছন্ন প্রলেপ। এক ব্যক্তি স্বপ্নে এসে বলছেন নয়নচাঁদকে, তিনিই তার বাপ। নয়ন যাঁকে তার বাপ বলে জানে তিনি তার বাবা নয়। নয়নের এই সমস্যাকে ঘিরেই পালা রচনা, আরও প্রসঙ্গ আছে। এবং আছে অফুরন্ত সংলাপ। নাটক-রচনার প্রস্তুতিপর্বে এত বেশি কথা ক্লান্তিকর।

পরিকল্পনায় ও আঙ্গিকে নতুনত্ব যতই থাকুক, "নয়ন কবিরের পালা"য় এমন রসসঞ্চার নেই, যা দর্শককে আপ্লুত করে রাখতে পারে। দর্শকের কৌতূহল-ঝলসানো অভিনবত্ব আছে নাটকটিতে, মন-ভরানোর মতো শক্তি নেই। "এক্সপেরিমেন্টাল" নাটক সাধারণত তথাকথিত অর্থে উপভোগ্য হয় না জানি। কিন্তু এক্সপেরিমেন্টও তো দর্শককে আনন্দ দিতে পারে। তার মধ্যেও এমন কিছু থাকতে পারে, যা দর্শকের চেতনাকে অভিভূত করতে সক্ষম। "নয়ন কবিরের পালা"র সে শক্তি নেই। দুটি মাত্র চরিত্র নিয়ে নাটক রচনা দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা ঠিকই, কিন্তু সে ক্ষেত্রে শূন্যস্থানগুলি ভালভাবে পূর্ণ করা চাই, যাতে দুই চরিত্রই (তাও আবার নর-নারী নয়, দুই পুরুষ) যথেষ্ট হয়, বহুর অভাব মেটাতে পারে। সে চেষ্টাও দুই শিল্পী—শ্যামল ঘোষ (নয়ন) ও শ্যামলবরণ ঘোষ (ধর্মদাস) করেছেন। তাঁদের অভিনয়ও

উঁচু মানের। কিন্তু শুধু কথার বোঝা দিয়ে কি নাটক হয়? তা ছাড়া "লাইমলাইট"-এর ভাব অনুসরণে ক্লাউনের চোখে জল এলে কি যথেষ্ট? তবু চ্যাপলিন-অনুপ্রাণিত নতুন আঙ্গিকের এই নাটকের জন্য নক্ষত্র গোষ্ঠী সাধুবাদার্হ। প্রযোজনাটির এক বৈশিষ্ট্য মঞ্চসজ্জা। নাট্যকার নন্তেন্দু সে মঞ্চসজ্জায় দায়িত্ব পালন করেছেন। স্বরূপ মুখার্জির আলোকসম্পাত প্রশংসনীয়।

মাণপুর। নৃত্যকলা মন্দিরের অনুষ্ঠানে শাশ্বতী মুখার্জি, সুনন্দা চৌধুরী, রঞ্জনা চৌধুরী ও সোমা মজুমদার ফটো—দেশ

বিনয় - বাদল - দীনেশ
(নাট্যভারতী)

যাত্রা স্বধর্ম হারাতে বসেছে, থিয়েটার লক্ষণাক্রান্ত হয়ে উঠছে—এই অভিযোগ শুনতে পাই। নাট্যভারতীর "বিনয়-বাদল-দীনেশ" কিন্তু যাত্রাই, কাহিনী এ যুগের হওয়া সত্ত্বেও। ১৯৩০ সনের ঘটনা, রাইটার্স বিল্ডিং-এ তিন বিপ্লবী বিনয় বাদল ও দীনেশের দুঃসাহসিক অভিযান, বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স বা বি-ভি পার্টির বৈপ্লবিক কার্যকলাপ, টেগার্টের অত্যাচার ইত্যাদি ঘটনা তো সেদিনের। কিন্তু ঘটনাগুলি যাত্রা-পালার আঙ্গিকে পরিবেশনে কিছুটা আধুনিক পরিবেশীয় লক্ষণ এসে গেলেও "বিনয়-বাদল-দীনেশ" যাত্রা। এবং দীনেশের মুখে অনবরত রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি সত্ত্বেও মনে হয়নি আমরা আধুনিক নাটক দেখছি। এইখানেই নাট্যভারতীর বাহাদুরি।

মৃত্যুঞ্জয়ী তিন বিপ্লবী—বিনয় বাদল ও দীনেশের রাইটার্স বিল্ডিং আক্রমণ নাটকের প্রধান ঘটনা ও ক্লাইম্যাক্স হলেও "বিনয়-বাদল-দীনেশ"-এ তদানীন্তন বৈপ্লবিক কর্মধারা, টেরোরিজম এবং বিগত অগ্নিযুগের দিনগুলির পরিচয় মেলে। বড় কথা এই, নাট্যগঠনে ত্রুটি-দুর্বলতা যা-ই থাকুক, নাটকটি দর্শককে দেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত করে তোলে। এদিক থেকে নাট্যপরিচালক পঞ্চু সেন এবং নাট্যরচয়িতা নরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর কৃতিত্ব কম নয়। তবে পালাটিতে মহিলাদের উপর ব্রিটিশ পুলিসের অত্যাচার যেন একটু বেশি পরিমাণে দেখানো হয়েছে। অত্যাচারের ধরন আর একটু বিশ্বাসযোগ্য হলে দর্শকমনে তা আরও বেশি প্রভাব বিস্তার করতে পারত।

অভিনয় সকলেরই উঁচুদরের। বিশেষ প্রশংসা পাবেন বিনয়রূপী মনোজকুমার এবং দীনেশের বেশে অজিত সাহা। চাঁদবিবির ভূমিকায় জ্যোৎস্না দত্ত এবং হরিদাসের চরিত্রে মোহিত বিশ্বাসের চরিত্র-চিত্রণ চমৎকার। যাত্রাভিনয়ের মতোই অতি-নাটকীয় এবং আবেগসমৃদ্ধ। অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপকুমার, অভিজিৎ ভট্টাচার্য, অনিল ভট্টাচার্য প্রভৃতি। আবহসংগীতে দেশাত্মবোধক গানের সুর ব্যবহার প্রশংসনীয়। সংগীত পরিচালনার জন্য পঞ্চানন মিত্র সাধুবাদ পাবেন।

কলকাতায় নাচের আসরে রাজকুমার সেনারিক সিংহ

শরীর অশক্ত, দেহ গুরুভার, কিন্তু আজও কী আশ্চর্য সুনিপুণ ছন্দিত পদক্ষেপ। অশীতিপর রাজকুমার সেনারিক সিংহকে ২৯ ডিসেম্বরের সন্ধ্যায় একাডেমি অব ফাইন আর্টসের মঞ্চে স্বচক্ষে দেখে বুঝলাম ইনিই তিনি। তিনি—যিনি মণিপুরী নৃত্যকে প্রাদেশিকতার সীমানা থেকে মুক্ত করে সারা ভারতের নৃত্যাঙ্গনে পৌঁছে দিয়েছেন ইনিই তিনি—যিনি রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ ও প্রশ্রয়ে মণিপুরী নৃত্যকে বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনের অংগীভূত করে দিতে পেরেছেন। রবীন্দ্র-নৃত্যধারার একটা মুখ্য অংশে মণিপুরী নৃত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি। অংশত 'চিত্রাঙ্গদা'র এবং পূর্ণত 'শাপমোচন'-এর নৃত্য-রচনাও যে তাঁরই—এ কথাও সশ্রদ্ধায় স্বীকার করতে হয়।

খুরেম পারেঙ—মণিপুরী নৃত্যের বীজমন্ত্র। রাজকুমার সেনারিক তাঁর ছাত্রী সংঘমিত্রা সিংহের সঙ্গে এই নাচটি এই বয়সেও যে অবলীলায় পরিবেশন করলেন তা রীতিমত বিস্ময়কর। হাত, পা, মুখ ও কোমরের স্বচ্ছন্দ সঞ্চালনে আজও যেন তারুণ্য বিরাজমান। চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন।

অরণ্যের দিনরাত্রি : সিমি ফটো—দেশ

অরণ্য ...

মণিপুরী নৃত্যকলা মন্দির আয়োজিত সেদিনের অনুষ্ঠানে অজস্র ত্রুটি ও বিশৃঙ্খলার মধ্যেও দর্শকেরা যা পেয়েছেন, তার দামও কম নয়। 'বসন্ত রাস' পর্যায়ে নৃত্যে, গীতে ও বাদ্যে আশ্চর্য মেলবন্ধন। 'রাধা', 'বৃন্দাবন বন্দনা' ও 'কৃষ্ণ অভিসার' অংশগুলি সত্যিই তারিফ করবার মত। এছাড়াও তারিফ করবার মত 'হে রজনী নাগর' গানের সঙ্গে কৃষ্ণের ভূমিকায় রত্নতী মুখার্জি'র নাচ। 'নাচত শ্রীরাধা চন্দ্রবদনী' গানের সঙ্গে প্রধানা সখী সুনন্দা চৌধুরী দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। রাধা ... চৌধুরী উল্লেখযোগ্য ... করতালি নৃত্যে দীপ্ত মুখার্জি ... কুমার, অমিতা ব্যানার্জি শিল্পী দাস ও দয়াহুতি দেব এবং 'বলরাম কৃষ্ণ' নৃত্যে দেবযানী চৌধুরী ও ইন্দিরা দাসও দর্শকদের প্রশংসা পেয়েছেন।

... একটি ...

ধর্মের সঙ্গে সংগীতের সম্পর্কটি নিবিড়। সংগীতের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখতে পাই একদা ধর্মের নিগূঢ় বাণীকে প্রচার করবার জন্য সুর ও ছন্দের মাধ্যমটিকে প্রায় সব দেশেই বিশেষ উপযোগী বলে মনে করা হয়েছে। প্রাচীনকালে এগারিয়ান চান্ট কিংবা খেতুরীর মহোৎসবের কীর্তন কেবল শিল্পসৃষ্টির মর্যাদা নিয়েই সম্পূর্ণ নয়, মহৎ বাণীর বাহনরূপেও সার্থক। এখনও ...

... নজীরও কিছু আছে। এই কারণে গত ৪ঠা জানুয়ারী রবীন্দ্রসদনে কলকাতার বিশপ-মহাশয়, পরম পূজ্য লাকদাসা দি

"প্রেমপূজারী" হিন্দী চিত্রে দেব আনন্দ ও ওয়াহীদা রেহমান

...মেল প্রযোজিত যীশুখ্রীষ্টের জন্ম-বার্তা সংবলিত 'পরমলগ্ন' নৃত্যনাট্যটির প্রযোজনায় বিশেষ প্রশংসা করতে হয়। ভারতীয় সংগীতের আঙ্গিকে খ্রীষ্ট-ধর্মের শাশ্বত বাণীর এমন সমৃদ্ধ উপস্থাপনা এর আগে কখনও সম্পন্ন হয়েছে বলে মনে পড়ে না।

উপনিষদের শ্লোক যবনিকার অন্তরাল থেকে একটা দূরাগত অথচ স্পষ্ট ধ্বনির মতন শোনা গেল; অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে সুন্দর আবহ-সংগীত সহ সেই গানের সুনিয়ন্ত্রিত শব্দ অনুষ্ঠানের প্রারম্ভেই যে পরিবেশ রচনা করে দিল, সেইখানে বেথেলহেমে দেবশিশুর আবির্ভাবের

"পরমলগ্ন" নৃত্যনাট্যে সুনীত বসু ও মায়া ঘোষ

পূর্বাবর্তী ঘটনা দিয়ে নৃত্যনাট্যের সূত্রপাত। যীশুর জন্মের পরমক্ষণে নৃত্যনাট্যের সমাপ্তি।

'পরমক্ষণ'র নৃত্য এবং সংগীতের প্রয়োগ-পারিপাট্য সাম্প্রতিককালের মঞ্চে সুদুর্লভ। বালকৃষ্ণ মেনন নৃত্য-পরিকল্পনায় ভারতীয় নৃত্যকলার বিভিন্ন শাখার সুন্দর ব্যবহার করেছেন। জোসেফ, রাজা হিরোদ, এবং মেরীমাতার চরিত্রে শিল্পীদের সুদক্ষ নৃত্য এবং অভিব্যক্তি-পূর্ণ অভিনয় উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্র-সংগীতের সুপরিকল্পিত ব্যবহারে কয়েকটি অবিস্মরণীয় মুহূর্ত-ও গড়ে উঠেছিল। বিশেষত এই গানগুলির পরিবেশনায় আবহসংগীতের সমৃদ্ধ তথ্য পরিমিত প্রয়োগ মঞ্চ-প্রযোজনার ক্ষেত্রে একটি বিরল দৃষ্টান্ত। নৃত্যের আবহসংগীতে রেকর্ডিং-এর উন্নত মান এবং প্রয়োগ-প্রযত্ন বিশেষ প্রশংসনীয়। আবহসংগীত রচনা করেছেন তরুণ গাঙ্গুলি। বর্ণাঢ্য আলোক রচিত দৃশ্যপট প্রায় নিখুঁত। ঘূর্ণায়মান মঞ্চের সাহায্যে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ রচনা করে একটিমাত্র 'সেট'-এর মধ্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টির পরিকল্পনাটিও অভিনব।

আনন্দ বর্ধন

"আত্মদান" শুরু

অজয় করের পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথের কাহিনীর ভিত্তিতে চিত্রলিপি ফিল্মসের দ্বিতীয় ছবি "আত্মদান"-এর শুটিং আরম্ভ হয়েছে। বৈদ্যবাটিতে গঙ্গাতীরে এক গৃহে ছবির বেশ কয়েকটি দৃশ্য গৃহীত হয়েছে। তা ছাড়া, বীরভূম অঞ্চলেও আউটডোর দৃশ্য নেওয়া হয়েছে। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, নন্দিনী মালিয়া ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ছবির তিনজন বিশিষ্ট শিল্পী। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন মুখোপাধ্যায় ও গীতা দে ছবির অপর উল্লেখযোগ্য শিল্পী। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সুরকার।

দবীর খাঁর সম্বর্ধনা

গত ৩১শে ডিসেম্বর শ্রীসন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায় আকাদমি অব ফাইন আর্টস প্রেক্ষাগৃহে এবারের আকাদমি পুরস্কার-প্রাপ্ত প্রবীণ বীণকার দবীর খাঁ-কে সংবর্ধিত করে একটি সুন্দর অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানে সংগীতাংশে দবীর খাঁ স্বয়ং শ্রীসন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একটি দ্বৈত যন্ত্র-সংগীতের পরিবেশনা করেন এবং তারপর ছিল শ্রীমতী মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠ-সংগীত এবং মণিলাল নাগের সেতারের অনুষ্ঠান।

প্রথম অনুষ্ঠানটিতে সরস্বতী বীণা এবং সুরশৃঙ্গারে 'ইমন' রাগ বাজিয়ে শোনান দবীর খাঁ এবং সন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। শিল্পসৃষ্টিতে নয়, 'শিল্পী' স্রষ্টারূপে দবীর খাঁর খ্যাতি যে মিথ্যা নয়, সেদিনের সংবর্ধনা-সভায় 'ইমন' রাগের সুরে সুরে সুরশৃঙ্গারের তারের ঝংকারে সন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায় তার প্রমাণ দিলেন। অমলেশ চট্টোপাধ্যায়ের সংগতও উল্লেখযোগ্য। ভূপালিতে মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়ের খেয়াল এবং মণিলাল নাগের কৌশিকী কানাড়ায় সেতারও শ্রোতৃমণ্ডলীকে তৃপ্তি দিয়েছিল।

সংগীতানুষ্ঠানের আগে সংবর্ধনা-সভার ভাষণে শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরী এবং অন্যান্য বক্তা দবীর খাঁর বিভিন্ন কৃতী শিষ্যদের কথা উল্লেখ করে ভারতীয় সংগীতে তাঁর অবিস্মরণীয় অবদানের কথা স্মরণ করেন।

আনন্দ বর্ধন

রাজ্য সরকারের কাছে পে কমিশনের রিপোর্ট পেশ এ-সপ্তাহের **প্রধান আলোচ্য বিষয়।** গত ৩১ **ডিসেম্বর এই** রিপোর্ট **রাজ্য** সরকারের কাছে পেশ করা হয়েছে। এই সুপারিশ **কেবলমাত্র** পনের শ' টাকা মাস মাইনে অবধি রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বেসরকারী **কর্মচারীদের** সম্পর্কে পে কমিশনের সুপারিশ জানুয়ারি মাসের **মধ্যেই জমা** দেওয়া হবে **বলে** কমিশনের চেয়ারম্যান শ্রী কে কে হাজরা জানান। সুপারিশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য **বিষয়** হচ্ছে—বেতনেব সঙ্গে মহার্ঘ ভাতার সংযুক্তি, পেনসন বৃদ্ধি, ছুটির সুবিধা সেই সঙ্গে শিক্ষণ-ভাতা, চিকিৎসা-ভাতা, ঘর ভাড়া-ভাতা, নিয়োগ ও পদোন্নতির সুযোগ ও বৈষম্য দূর করা, পশ্চিমবঙ্গ ও কলকাতা পুলিসের **একীকরণ** প্রভৃতি। বহু বিষয়ে কমিশনের সদস্যদের মধ্যে মতৈক্য হয়। বেতনহার সম্পর্কে কিছুটা মতভেদ ছিল। প্রচলিত ৮১টি বেতনহার সংশোধন করে শ্রীহাজরা মোট ২৯টি বেতন-হারের সুপারিশ করেছেন। কমিশন সদস্য শ্রী পি কে বসু করেছেন ৩০টি বেতন-হারের সুপারিশ। বেশী বেতনের কর্মীদের মোট ১১টি বেতন-হার তাঁরা সংশোধন করেননি। অধিকাংশ সদস্য জেলা থেকে মহাকরণ পর্যন্ত কেরানী-দের জন্য **একই** বেতন-হার চালুর পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। এই বেতন-হার ১৯৬৯ সালের এপ্রিল থেকে চালু করার সুপারিশ করেছেন। রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের অবসর গ্রহণের বয়স ৫৮ বছর সুপারিশ করা হয়েছে। একমাত্র শিক্ষকদের ক্ষেত্রে ৬২ বছর করার ব্যবস্থা আছে। সে ক্ষেত্রে এক বছর করে চার বছর কাজের মেয়াদ বাড়ানো যেতে পারে। পুলিসদের ক্ষেত্রে রেশনের পরিবর্তে মূল বেতনের সাড়ে বারো ভাগ নগদ টাকা দেবার প্রস্তুতি করা হয়েছে।

দেশী সংবাদ

২৯ ***ডিসেম্বর***—*হিংসা ও হিংস্রতার বিরুদ্ধে বাংলা কংগ্রেসের শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধ* আন্দোলন চলবে। এই আন্দোলন বিরোধী কাজকর্মের অভিযোগে শ্রীসুকুমার রায় এবং অপর একজনকে সাময়িকভাবে সাংগঠনিক পদ থেকে অপসারিত করা হয়েছে।

বিশিষ্ট শিল্পপতি কর্মবীর আলামোহন দাস আজ রাত্রি ১২টা ৩৫ মিনিটে পরলোক-গমন করেছেন। গত শনিবার তিনি সেরিব্র্যাল থ্রম্বোসিস-এ আক্রান্ত হয়েছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বৎসর। তিনি পত্নী, তিন পুত্র ও পাঁচ কন্যা রেখে গিয়েছেন।

৩০ **ডিসেম্বর**—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী 'যে ভাবে যাঁর ইচ্ছামত' সাময়িকভাবে নিজ নিজ দফতর সহকর্মীদের হাতে দিয়ে যাচ্ছেন, তাতে রাজ্যপাল 'অত্যন্ত ক্ষুব্ধ'। জানা গেল, সম্প্রতি রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছেন যে, এই ধরনের কাজ আইন ও রীতি বিরুদ্ধ এবং সঙ্গে সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করেছেন, যেন ভবিষ্যতে এই 'সাময়িক দফতর হস্তান্তর বিধিমতই হয়।'

৩১ **ডিসেম্বর**—যুক্ত ফ্রন্ট ৯ অথবা ১০ জানুয়ারী এক পূর্ণাঙ্গ বৈঠকে বসে সব দলের সমস্ত অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগ শুনে মিটমাটের চেষ্টা করবেন। আজ মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় ও পঞ্চায়েত মন্ত্রী শ্রীবিভূতি দাশগুপ্তের মধ্যে আলোচনায় এটা ঠিক হয়েছে।

১ **জানুয়ারি**—মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় 'বিনাশর্তে' ফ্রন্টের অন্যান্য শরিক দলের সঙ্গে 'মিটমাটের' আলোচনায় বসতে রাজি হলেও সি পি এম অজয়বাবুর সঙ্গে বিনাশর্তে আবার 'ভাই ভাই হওয়ার' আলোচনায় বসতে রাজি নন। মারকসবাদী কমিউনিসটদের একটি আগাম শর্ত আছে। শর্তটি হল : অজয়বাবুকে স্বীকার করতে হবে সি পি এম-এর বিরুদ্ধে তিনি 'ডাকাতি', 'গুণ্ডামি' প্রভৃতি যেসব অভিযোগ এনেছেন তা সব অসত্য। অজয়বাবুকে এজন্য ক্ষমাও চাইতে হবে। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি এবং যুক্ত ফ্রন্ট রাজত্ব সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী যেসব

মন্তব্য করেছেন তাও প্রত্যাহার করতে হবে।

২ **জানুয়ারি**—আজ কলকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে সি পি এম নেতা শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত ঘোষণা করেছেন : অজয়-বাবু আমাদের এবং যুক্ত ফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে যে সব কটূক্তি করেছেন তা প্রত্যাহার না করলে আমরা 'ভাই ভাই'য়ের আলোচনা চালাতে রাজি নই। আবার এই দিনই প্রমোদ-বাবুর বক্তব্যের জবাব দিতে গিয়ে বাংলা কংগ্রেস নেতা শ্রীসুশীল ধাড়া বলেছেন : আমরা কোন ভুল করিনি। যা বলেছি পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে বলেছি। সুতরাং ত্রুটি স্বীকারের প্রশ্নই ওঠে না।

আজ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্তন অনুষ্ঠানে দুজন তরুণ স্নাতক—শ্রীদিলীপকুমার চক্রবর্তী আর একজন শ্রীশান্তনু গোস্বামী তাঁদের উপাধি প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁদের বক্তব্য : যে আমলাতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় কর্মসংস্থান হয় না, কেবল বেকার সৃষ্টি হয়, তার বিরুদ্ধে তাঁদের এই প্রতিবাদ।

৩ **জানুয়ারি**—প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আজ মেদিনীপুরে বলেন : পশ্চিম-বঙ্গের অবস্থা গোলমেলে। পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে যত কম বলা যায়, ততই ভাল। এক ঘরোয়া সাক্ষাৎকারে সাংবাদিকরা প্রধানমন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন : পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে এখন আপনার ধারণা কি?

আজ সকাল সওয়া দশটায় করপোরেশন ধাপার মাঠের দখল নিল—এই বোল তুলে ধাপার মাঠে ঢোল শহরৎ করে দিল চুলি। সেই সময় ধাপা রেল স্টেশনে ও ইজারদারদের কাছারি বাড়িতে পৌর কমিশনার দখলি নোটিস টাঙিয়ে দেন। সেখানে তখন মেয়র, ডেপুটি মেয়র, কাউনসিলার ছাড়া লাঠি, সড়কি বল্লম, ঝাণ্ডা নিয়ে কয়েক হাজার লোক ছিল।

৪ **জানুয়ারি**—এক পাকিস্তানীর সুন্দরী স্ত্রীকে কেন্দ্র করে চণ্ডীগড়ে ভারতীয় সরকারী ও বেসরকারী অফিসারদের এক মধুচক্র জমে ওঠে। প্রকাশ ওই মধুচক্রের মাধ্যমে পাকিস্তানে সামরিক তথ্য পাচার হয়েছে। পাকিস্তানী মাতাহারি সীমান্ত অতিক্রম করে চলে গেলে সংশ্লিষ্ট অফিসারদের সম্বিত ফিরে আসে। এতে বোঝা যায়—ভারতের নিরাপত্তা ব্যবস্থা অতিমাত্রায় শিথিল এবং সংশ্লিষ্ট ভারতীয় অফিসারদের আর যাই থাকুক, দেশপ্রীতি এবং যোগ্যতা নেই।

বিদেশী সংবাদ

২৯ **ডিসেম্বর**—ক্রেমলিনের জনৈক মুখপাত্র জানিয়েছেন যে, সোভিয়েতের প্রথম ডেপুটি বৈদেশিক মন্ত্রী ভ্যাসিলি কুজেনৎসব চীনের সঙ্গে সীমান্ত সমস্যা আলোচনার জন্য শীঘ্রই পিকিং আসবেন। অবশ্য কবে তিনি পিকিং রওয়ানা হবেন তা এখনো পাকাপাকিভাবে জানানো হয়নি।

৩১ ডিসেম্বর—এ পি-র সংবাদে প্রকাশ : তাস প্রচারিত একটি প্রবন্ধে বলা হয়েছে, চীনের কমিউনিসট পারটি থেকে পুরনো সদস্যদের বিতারণ চলছে এবং যে-সব ব্যক্তি মাও সে-তুং-এর প্রতি অন্ধ ভক্তি দেখিয়েছে তাদের নতুন পারটি সভ্য করা হচ্ছে। প্রবন্ধে আরও দেখানো হয়েছে যে, চীনের পারটি-জীবনে সামরিক বাহিনীর প্রাধান্য প্রতিনিয়তই বাড়ছে।

১ **জানুয়ারি**—গতকাল ফরাসী মন্ত্রিসভার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দুইজন প্রবীণ কর্ম-চারীকে সাসপেনড করার সিদ্ধান্ত করা হয়। ফ্রান্সে তৈরি ৫খানি গানবোট সেরবুর্গ বন্দর থেকে চুরি করে বেড়িয়ে পড়ে ইজরায়েলে গিয়ে পৌঁছয় এবং তার পরেই এই দুজন কর্মচারী সম্পর্কে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

২ **জানুয়ারি**—ইনফার সংবাদে জানা যায় : বাংলা দেশ এই নামে পূর্ব পাকিস্তানের নতুন নাম করণের যে দাবি উঠেছে তাকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলে নাকি আন্দোলন গুরুতর আকার নিতে চলেছে। প্রকাশ, পূর্ব-পাকিস্তানের সংবাদপত্রগুলিও নতুন নাম করণের দাবিকে সমর্থন জানিয়েছে।

৩ **জানুয়ারি**—এক সংবাদে প্রকাশ : ইজরায়েলী কম্যানডোরা একান্ত গোপনীয় একটি রেডার স্টেশনই চুরি করে নিয়ে নিয়েছে। রাশিয়ানরা সম্প্রতি মিশরকে ওই রেডার যন্ত্রটি দিয়েছিল। গত ২৬ ডিসেম্বর রাতে সুয়েজ বন্দরের ১১৫ মাইল দূরে ইজরায়েলীরা হানা দেয়। তারা হেলিকপটারে করে সমস্ত স্টেশনটি নিয়ে উধাও হয়।

৪ **জানুয়ারি**—১৮ ডিসেম্বর ঢাকার সমস্ত সংবাদপত্রে ১২ জন এডভোকেট ও সাংবাদিকদের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বাঙালীদের বাঙালী হিসাবে বেঁচে থাকবার এবং নিজেদের দেশকে বাংলা দেশ বলবার নিশ্চয়ই অধিকার আছে। পূর্ববঙ্গ ছাত্র সংসদ এই দাবিতে এক শোভাযাত্রা বের করে। ৩৬জন শিল্পী ও সাহিত্যিক এই দাবি সমর্থন করেন।

তৃপ্তি
দাম ১৭৫৲ অন্তঃশুল্ক সমেত
স্থানীয় কর স্বতন্ত্র
সিলিকন ৩২১ যাঁরা তৈরি করেছেন, তাঁরা আপনাদের এখন দিচ্ছেন এক অপূর্ব ২ ব্যাণ্ডের ট্রানজিস্টর যা আপনারা বহুদিন খুজছেন ! নেলকো 'তৃপ্তি'
এর দাম ১৭৫৲ টাকা অন্তঃশুল্ক সমেত। নেলকো'র তৃপ্তির, অন্যান্য অনেক ২ ব্যাণ্ডের ট্রানজিস্টরের চেয়ে দাম কম।
একবার শুনে দেখুন। যদি স্বরমাধুর্য চান, তৃপ্তি বাজান!
শুনে সুখ, পয়সারও সাশ্রয়।
তৃপ্তিতে পাবেন ৭টি ট্রানজিস্টর, ১টি ডায়োড, পুশবাটন ব্যাণ্ড সুইচ, ভার্টিক্যাল ডায়াল স্কেল এবং এক বিশেষ সার্কিট ডিজাইনের দরুন সামান্যতম ব্যাটারী ভোল্টেজেও সেরা আওয়াজ শুনতে পাবেন, তাছাড়া রয়েছে আরো অনেক সুবিধে।
তৃপ্তি'র দাম বেশী নয়, কিন্তু দামী ট্রানজিস্টরের মত আওয়াজ।
আর কি চান? আজই 'তৃপ্তি' শুনে তৃপ্ত হোন।
তাইতো চাইছিলেন।
নেলকো-এর তুলনা নেইকো
NE
NELCO

সূচিপত্র

ULKA-GBNT-4 BEN
নিরাপত্তা
যখন একটি তালা'র
ওপর নির্ভর করে
তার জন্যে একটিমাত্র
তালা আছে—
NAV-TAL
8 LEVERS

সূচিপত্র

সর্দির শুরুতেই ভিক্স ভেপোরাব লাগান। সর্দির সবরকম ভোগান্তি আপনি এড়াতে পারবেন। বুকে সর্দি বসার ভয় থাকবে না।

[illegible], বাচ্চার সবে সর্দি লেগেছে;—নাক দিয়ে জল পড়া শুরু হয়েছে—গলা খুস্ খুস্ করছে। তক্ষুনি যদি এর একটা ব্যবস্থা না করেন তাহলে এই সর্দি বুকে বসে গিয়ে শুরু হতে পারে নানান্ ভোগান্তি—নাক বন্ধ হয়ে নিশ্বাসের কষ্ট, গা ব্যথা, কাশি-কিছু আর বাকি থাকবে না-অযথা কষ্ট ভোগ করবে বেচারা।

সর্দির লক্ষণ দেখা দিলেই যদি ভিক্স ভেপোরাব লাগানো যায়, কোনো কষ্ট পেতে হয় না— বুকে সর্দি বসার ভয় থাকে না।

আর একটা কথা! ভিক্স ভেপোরাব লাগাতে হবে সেই সব জায়গায়-যেখানে ঠাণ্ডা বেশী লাগে,-যেমন নাকে, গলায়, বুকে, পিঠে।

খুবই সহজ কাজ! তেতো বড়ি বা, বিচ্ছিরি মিক্সচার খাওয়াতে হবে না।

ভিক্স ভেপোরাব কাজ করে সঙ্গে সঙ্গে,— সর্দির কষ্ট থেকে আরাম দেয় দু'ভাবে —

১)
বাইরে থেকে গায়ে

২)
ভেতর থেকে নিশ্বাসের সঙ্গে

১) বুকে পিঠে লাগালে গায়ের বেদনা দূর করে-

২) গায়ে লাগাতেই ভিক্স গলে যে ভাপ বেরোয় তাতে ভিক্সের যাবতীয় ওষুধের গুণ বজায় থাকে।

এই ভাপ নিশ্বাসের সঙ্গে ভেতরে গিয়ে, গলা আর বুকের সর্দি গলিয়ে দিয়ে আপনাকে সুস্থ ক'রে তোলে।

সব সময়ে মনে রাখবেন।

সর্দির শুরুতেই ভিক্স ভেপোরাব— নাকে, গলায়, বুকে, পিঠে ভাল ক'রে মালিশ করুন। যতক্ষণ না আরাম পাচ্ছেন, এই চিকিৎসা চালিয়ে যান।

সর্দি বসতে দেবেন না! সর্দি শুরু হলেই ভিক্স ভেপোরাব!

590C

প্রচ্ছদ : শ্রীঅজিত গুপ্ত

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৭ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১২
শনিবার ৩ মাঘ ১৩৭৬

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহযোগী সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রী[illegible] দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮৩ ২৩-৮৫৪১

চাঁদার হার

কলিকাতায়

বার্ষিক	২৫.০০
ষাণ্মাসিক	১২.৫০
ত্রৈমাসিক	৬.২৫

ভারতে

বার্ষিক সডাক	৩০.০০
ষাণ্মাসিক „	১৫.০০
ত্রৈমাসিক „	৮.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	৩০.০০
ষাণ্মাসিক „	১৫.০০
ত্রৈমাসিক „	৮.০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ ডাকে)

বার্ষিক সডাক	৫২.০০
ষাণ্মাসিক „	২৬.০০
ত্রৈমাসিক „	১৩.০০

আসাম অঞ্চলে
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	৩৯.০০
ষাণ্মাসিক	১৯.৫০
ত্রৈমাসিক	১০.০০

দাম ৫০ পয়সা
উত্তরবঙ্গ ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাসুল ৫ পয়সা

DESH

Saturday, 17 Jan., 1970

অপুষ্টি ও ব্যাধি

আমাদের দেশের মানুষের রোগ-ব্যাধি স্বাস্থ্যহীনতার কথা সর্বজনবিদিত। প্রাচ্য ভূখণ্ডে আমরা অন্যতম দরিদ্র দেশ, কিন্তু এমনই গুণে জাতি যে অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের স্বাস্থ্যহীনতা নিদারুণ; বোধ করি, মানের দিক থেকেও নিম্নতম জাতীয় স্বাস্থ্য আমরাই রক্ষা করি। এর একটা কারণ ভারতের জনসংখ্যা, এত বড় জনসংখ্যা যেখানে সেখানে স্বাস্থ্যরক্ষার বিবিধ চেষ্টা সফল হবার সম্ভাবনা কম। অন্তত সে সামর্থ্য যে আমাদের নেই তা স্বীকার করে নেওয়া যায়। যদি সামর্থ্য থাকত তবে যে দেশে পঞ্চাশ কোটি লোকের বাস সে দেশে তেইশ কোটি লোক অপুষ্টিজনিত রোগে ভুগত না।

খড়্গপুরে সম্প্রতি বিজ্ঞান-কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়ে গেল তাতে এদেশের স্বাস্থ্য সম্পর্কে কিছু কিছু সতর্কবাণী আমাদের চোখে পড়েছে। যেমন, অনেক গবেষকের মতে, ভারতে সাড়ে চার কোটি অন্ধের মধ্যে অন্তত অর্ধেক লোক পুষ্টি-হীনতার জন্যে অন্ধত্ব প্রাপ্ত হচ্ছে। দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতে বৎসরে প্রায় চোদ্দ হাজার শিশু অন্ধ হয়ে যাচ্ছে। শুধু অন্ধই নয় অপুষ্টির জন্যে দৈহিক ও মানসিক ব্যাধিও কিছু কম নয়, আর তার ফলে বিরাট একটি সংখ্যা ক্রমশই অপুষ্টিজনিত রোগের কবলে পড়ে মৃত্যুগ্রাসে পড়ছে।

ভারতের জনস্বাস্থ্য নিয়ে যাঁরাই চিন্তা করেন তাঁরাই বার বার একথা স্মরণ করিয়ে দেন যে, আমাদের জাতীয় স্বাস্থ্যের অবনতির একটি মূল কারণ পুষ্টির অভাব। অর্থাৎ শরীর-স্বাস্থ্যকে সবল ও সক্ষম রাখতে হলে যে ধরনের পুষ্টিকর খাদ্য আমাদের গ্রহণ করা উচিত তা আমাদের পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে না। আমাদের খাদ্যাভ্যাসের কিছু গোলযোগ আছে বটে তবে সেই গোলযোগ সত্ত্বেও এটা নিঃসন্দেহে সত্য যে, স্বাস্থ্যরক্ষার্থে শরীরের পক্ষে যেসব খাদ্যগুণের প্রয়োজন রয়েছে আমাদের পক্ষে তা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। যেমন—প্রোটিন ফুড বা আমিষ-জাতীয় খাদ্য। শুনলে অবাক লাগে, তবু একথা সত্য যে, এদেশের পঞ্চাশ কোটি লোকের মধ্যে একটি বিরাট অংশ, শতকরা পাঁচাত্তর জন নিরামিষাশী। অন্যান্য খাদ্যগুণেই বা সংগ্রহ করা যায় কি ভাবে? যেমন প্রয়োজনীয় ভিটামিন, লৌহ জাতীয় পদার্থ, আয়োডিন ইত্যাদি।

আধুনিক শরীর বিজ্ঞান যতই উৎপাত হোক তবু তার পক্ষে প্রাকৃতিক খাদ্য-গুণকে অস্বীকার করবার পথ নেই। যেসব খাদ্য থেকে আমরা সবরকম ভিটামিন পেতে পারি সে-সব খাদ্যের কথা আমাদের অল্পস্বল্প জানা থাকলেও আমরা খুব কমই বিচার করে তা গ্রহণ করি; আর যা করি—এমন ভাবে করি যাতে খাদ্যের গুণ নষ্ট হয়ে যায়। আবার নিজেদের শারীরিক অক্ষমতার জন্যে তা যথার্থভাবে স্বাস্থ্যের কাজে আসে না। পরিণামে এই দাঁড়িয়েছে যে, উদরের রোগ, স্নায়ুর রোগ, দৃষ্টিশক্তির রোগ, মানসিক ব্যাধি, রক্তাল্পতা—এ-সব আমাদের ঘরে ঘরেই দেখা যাচ্ছে।

অপুষ্টিজনিত রোগের শুরু হয় শিশু বয়স থেকেই। শহরবাসী হলে, আর্থিক সচ্ছলতা থাকলে ডাক্তারের পরামর্শে শিশুদের সে-রোগ নিবারণ করা যায়। কিন্তু গ্রামবাসী হলে কিংবা আর্থিক সংস্থান না থাকলে অপুষ্টিজনিত রোগ বাল্যকাল থেকেই শরীরের মধ্যে মৃত্যুর বীজ বুনে দেয়, ভবিষ্যতে তা শোধরানো দায় হয়ে ওঠে। তাছাড়া এদেশে শুধুই যে স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যাভ্যাস গড়ে ওঠার রেওয়াজ নেই তা নয়, খাদ্য সংরক্ষণের স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতিও পালন করা হয় না। মাছ, মাংস, দুধ, সব্জি, কোনো কিছুই এমনভাবে রক্ষা করা হয় না যা আমাদের শরীরের পক্ষে গ্রহণযোগ্য। সরকারীভাবে জনস্বাস্থ্য রক্ষার উদ্যম যদি এখনও না দেখা যায় তবে আমাদের জাতীয় স্বাস্থ্য যে আরও দীন হয়ে উঠবে তাতে সন্দেহ নেই।

অস্বীকার করা যাবে না, দেশ স্বাধীন হবার পর জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে কোনো ব্যবস্থা হয় নি। তবে যা হয়েছে তা ঠিক স্বাস্থ্য রক্ষার আয়োজন নয়। হাসপাতাল ও অন্যান্য সেবা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কিছু বেড়েছে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের সুযোগও অপেক্ষাকৃত সুলভ। ফলে দেশে মৃত্যুর হার নিশ্চয় কমেছে। এই নিম্ন হার অবশ্য আমাদের সন্তুষ্টির কারণ। কিন্তু, মৃত্যুর হার কমলেও অসু-স্থতার হার যে ক্রমশই বাড়ছে সেদিকেও নজর দেওয়া হচ্ছে কই। নয়ত জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক অপুষ্টিজনিত [illegible]

বুড়ো নাবিক সিন্দ্‌বাদ
ঘাড় থেকে নামতে চাইছে না।
মিনি-ফ্রন্ট
ভাবনা

কেরল ও পশ্চিমবঙ্গ, কমিউনিসটদের এই দুই শৈশবের লীলাক্ষেত্র, যৌবনের উপবন এবং বার্ধক্যের বারাণসীতে জনগণের স্বর্গরাজ্য যুক্ত ফ্রনট সরকারের শাসন কায়েম হবার পর থেকে জনগণের শত্রুরা কী জঘন্যভাবে যে যুক্ত ফ্রনট সরকারের বিরুদ্ধে কুৎসা রটিয়ে বেড়াচ্ছেন তা শুনলে মূর্ছা যাবেন না এমন জনগণভক্তের সংখ্যা এ-দেশে বিরল। সি পি আই এবং সি পি এম-এর সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমরাও যাতে আওয়াজ তুলতে পারি "জনশত্রুদের চিনে নিন, এই মাটিতেই কবর দিন", সেই কারণেই কেরল ও পশ্চিমবঙ্গে যুক্ত ফ্রনটের অথবা তার মেরুদন্ডসম শরিকদের বিরুদ্ধে (বলাই বাহুল্য, সি আই এ-র সহায়তায়) প্রচারিত কিছু কেচ্ছার নমুনা এবং রটনাকারীদের পরিচয় এখানে তুলে ধরা হল। যুক্ত ফ্রনট যুগ যুগ জীয়ো।

কেরল কান্ড

চাপান : "কেরালায় দক্ষিণপন্থী কমিউনিসটদের নেতৃত্বে গঠিত মিনি ফ্রনট সরকার কী পদ্ধতিতে রাজ্য শাসন করবেন তার আভাস ইতিমধ্যেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। জেলায় জেলায় শুরু হয়েছে পুলিশের এবং গুন্ডাদের নিষ্ঠুর নির্যাতন।

"মধ্য ত্রিবাঙ্কুরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এক সন্ত্রাসের রাজত্ব। আক্রমণ পরিচালিত হচ্ছে প্রধানত কৃষি-মজুরদের বিরুদ্ধে। সম্প্রতি কমরেড এ কে গোপালন, কমরেড সুশীলা গোপালন, কমরেড ই কে নায়নার এবং কমরেড কে এম আব্রাহাম মধ্য ত্রিবাঙ্কুরের কয়েকটি অঞ্চল পরিভ্রমণ করে যে বিবৃতি প্রচার করেছেন তাতে তাঁরা এই কথাই বলেছেন যে, সেখানে পুলিস এবং গুন্ডাদের রাজত্বই কায়েম হয়েছে—শ্রমিক ও কৃষি-মজুরদের নির্মমভাবে প্রহার করা হয়েছে, তাদের ঘরবাড়ির উপর হামলা চালানো হয়েছে, চালানো হয়েছে বেপরোয়া লুণ্ঠন; তাদের অনেককে খুন করা হয়েছে এবং চলেছে নারী নির্যাতন এবং এই পুলিসী হামলা ও গুন্ডাবাহিনীর বিরুদ্ধে যারাই রুখে দাঁড়িয়েছে তাদেরকেই গ্রেফতার করা হয়েছে, বিনা ওয়ারেনটে আটক রাখা হয়েছে এবং তাদের জামিনে মুক্তি দিতে অস্বীকার করা হয়েছে। এই নিষ্ঠুর নির্যাতন কেবলমাত্র ফ্যাসিসট শাসনেই খাপ খায়।"—**দেশহিতৈষী, ২৮ নভেম্বর, ১৯৬৯, পৃষ্ঠা তিন।**

ওতোর : "প্রমোদবাবু, আপনাকে আশ্বাস দিতে পারি আপনার ভাষ্যমত সাংঘাতিক কিছু ঘটছে না, ঘটবেও না কেরালায়। তবে অনেক কিছুই ঘটছে ও স্বাভাবিক নিয়মেই ঘটছে শ্রীঅচ্যুত মেননের নেতৃত্বে যুক্ত ফ্রনট মন্ত্রিসভার আমলে। এই অনেক কিছু সেখানকার মেহনতী জনগণেরই স্বার্থে, তাঁদেরই কল্যাণে। অথচ এ সবই তো ফ্রনটের কার্যসূচীতে ছিল—আর তাকেই আজকে রূপদান করা হচ্ছে..."—**সাপ্তাহিক কালান্তর, ৬ ডিসেম্বর, ১৯৬৯, পৃঃ ২।**

ধুয়া : যুক্ত ফ্রনট সরকার, সংগ্রামের হাতিয়ার। জনশত্রুকে চিনে নিন, এই মাটিতে কবর দিন। যুক্ত ফ্রনট যুগ যুগ জীয়ো।

ইতি কেরল কান্ডম্

পশ্চিমবঙ্গ কান্ড

চাপান ১নং : "কিছু দিন পূর্বে বেলঘরিয়া রথতলার কাছে একটি ব্যাঙ্কের সামনে শ্রীউজ্জ্বল ব্যানারজীকে খুন করা হয়। এই হত্যাকান্ডের উপযুক্ত তদন্ত দাবি করে উজ্জ্বলের বোন বেলঘরিয়া রথতলা প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী পুষ্পলতা ব্যানারজী মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠি দিয়েছেন। শ্রীমতী ব্যানারজী মনে করেন রাজনৈতিক মতপার্থক্য এবং নিজেদের দুষ্কৃতি চাপা দেওয়ার জন্য উজ্জ্বলকে খুন করা হয়েছে। ব্যারাকপুরের এস ডি ও, ও এস ডি পি ও'র কাছে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করে চিঠি দেওয়া সত্ত্বেও পুলিস কোন এক অদৃশ্য শক্তির (অর্থাৎ পুলিস-প্রভু সি পি এম) চাপে কিছুই করছে না।" ...**সাপ্তাহিক কালান্তর, ৬ ডিসেম্বর, ১৯৬৯, পৃঃ ৬।**

চাপান ২নং : "সম্প্রতি লাভপুর থানার অধীন বামুনী গ্রামে সি পি এম-এর দলের সমর্থকগণ একটি রক্ষী বাহিনী—হালিম স্কোয়াড গঠন করিয়াছে। গত ৩।৪ মাসে তাহারা এইসব কাজ করিয়াছে : (১) গত ১০-৯-৬৯ তারিখে এই স্কোয়াডের সশস্ত্র সদস্যগণ কুসুমগ্রামনিবাসী মোকরম হোসেনের বাড়ি চড়াও হইয়া তাহাকে জবাই করিবার ভীতি প্রদর্শন করে ও অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করে। (২) তাহার লটকোনা দোকান জোরপূর্বক দখল করে এবং ৫-৬ শত টাকার মালপত্র ও নগদ টাকা লুঠ করে। (৩) পরদিবস কুসুমগ্রাম-নিবাসী একজন গরীব কৃষকের ১০।১২ কাঠা জমির কচু জোরপূর্বক তুলিয়া লইয়া যায়। (৪) এই ঘটনার কয়েক দিন পর দুবরাজপুর থানার একজন দরিদ্র মুসলমান মোকরম হোসেনের বাড়ি আসিয়াছিল। হতভাগ্য লোকটি যখন বাড়ি ফিরিয়া যাইবার জন্য রাস্তার ধারে বাসের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিল তখন তাহাকে জোরপূর্বক ধরিয়া লইয়া গিয়া একটি গাছের সঙ্গে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া রাখা হয় এবং সারা রাত্রি অমানুষিকভাবে প্রহার করা হয়। সংবাদ পাইয়া পুলিস ঘটনাস্থলে আসিলে নিপীড়িত মানুষটিকে পুলিসের হাতে সমর্পণ করিতে অস্বীকার করা হয়। পর-দিবস নিরপরাধ ও নিরীহ লোকটিকে চোরের মত কোমরে দড়ি বাঁধিয়া লাভপুর থানায় লইয়া যাওয়া হয় এবং স্কোয়াডের নেতার নির্দেশমত হাজতে রাখার পর সিউড়িতে চালান দেওয়া হয়। (৫) গত ২৪-১০-৬৯ তারিখে লাভপুর থানার অধীন মোরদীঘি গ্রামনিবাসী ৭০ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ আবু আহম্মদ কুসুমগড়িয়া গ্রামে তাঁহার আত্মীয়ের বাড়িতে আহারের পর যখন বিশ্রাম করিতেছিলেন তখন স্কোয়াডের সদস্যগণ আসিয়া তাঁহাকে জোর-পূর্বক বাড়ি হইতে ধরিয়া লইয়া যায় এবং ৩।৪ ঘণ্টা যাবৎ অমানুষিক নির্যাতন ও প্রহার করে। এই হতভাগ্য বৃদ্ধ শিক্ষক অমানুষিক নির্যাতনের হাত হইতে প্রাণ-রক্ষার জন্য তাঁহার ছাত্র সিরাজুল হকের পা ধরিয়া কাতর আবেদন করা সত্ত্বেও কোনও ফল হয় না। উপরন্তু জবাই করার ভীতি প্রদর্শন করা হয় এবং পিপাসার্ত শিক্ষক মহাশয়ের মুখে প্রস্রাব করিবার নির্দেশ দেওয়া হয়।..."—**সাপ্তাহিক কালান্তর, ৩ জানুয়ারি, ১৯৭০, পৃঃ ১০।**

উপর চাপান : "পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে যশোবন্তরাও বলবন্তরাও চবনের শিরঃপীড়ার গূঢ় রহস্য আছে। যুক্ত ফ্রনট সরকার গঠিত হবার সময় যে পারটির প্রতিনিধির হস্তে রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতর ন্যস্ত হয়েছিল সেই মারকসবাদী কমিউনিসট পারটির বিরুদ্ধে কুৎসার বাণ নিক্ষেপ করে চবন সাহেব বলেছিলেন যে, মারকসবাদী কমিউনিসট পারটি যুক্ত ফ্রনটের অন্যান্য শরিকগুলিকে গ্রাস করে ফেলবে।... তাঁর বুকে বল এসেছে কেরালায় দক্ষিণপন্থী কমিউনিসট নেতাদের...কংগ্রেসের সমর্থনে বিশ্বাসঘাতক মিনি ফ্রনট সরকার গঠনে।" —**দেশহিতৈষী, ২৮ নভেম্বর, ১৯৬৯, পৃঃ ১।**

ধুয়া : যুক্ত ফ্রনট সরকার, সংগ্রামের ইত্যাদি ইত্যাদি

ইতি পশ্চিমবঙ্গ কান্ডম্

বস্তুচেতনা

প্রদোষ দত্ত

আমার বুকের দুয়ার এ'টে মহড়া দেয় পাখি
গাইতে জানে তবুও তার বুস্তে বিরাট ফাঁকি
ধ্বনির বুকে প্রতিধ্বনি
প্রতিধ্বনির পরে
অন্তবিহীন শূন্যতাবোধ
বিন্দু বিশাল নাকি?

বাইরে আকাশ সমুদ্র আর
পাখপাখালির ভিড়
হাটবাজারে নীল-নিয়নের আলো
অন্ধকারের নেপথ্যে কোন্ চিরকুমার কাঁদে?
উচ্চারণের বিভিন্নতায় অর্থবহুমুখী!

আমার বুকের দুয়ার এ'টে মহড়া দেয় পাখি
বাইরে বিশাল শূন্যতাবোধ; বুস্তে বিরাট ফাঁকি!

প্রতিদান

পিনাকেশ সরকার

এই যে তুমি সেলামি দাও
মালিক চাকর খাসবেয়ারা সবার কাছে
কারুকর্মী জারুল ফুলের সামনে নত হও
এই যে তুমি গর্ভগৃহে গভীর হাতে ভোগ বানিয়ে
সিঁড়ির উপর
শত্রু এবং ইয়ার বন্ধুর সামনে এনে দাও
এই যে তুমি সাচনাতেই মুচকি হেসে
টেক্কা বিবি রংগুলি সব
অসাবধানে দেখিয়ে ফেলো

এমনি করেই খেলা ভাঙে
যানবাহনও থমকে থাকে সমস্ত দিন ব্রিজের ওপর
তোমার এমন ছন্নছাড়া আহাম্মকি
কাজের দরুন
দিকে দিকে ধর্মঘট ও জিগির মিছিল
ফুলের ভিতর রাজসমাসীন ভ্রমর বলে

'মান্যবন্ধু! ঐ কবিকে ঠান্ডা মাথায় পেছন থেকে হত্যা করুন।'

আমি চাইনি

প্রতিমা ঘোষ

আমি কেবল এক আঁজলা জল চেয়েছিলাম,
চেয়েছিলাম সমুদ্রের ধারে পড়ে থাকা
বিচিত্র বর্ণের ঝিনুকগুলো কুড়িয়ে নিয়ে
হাতের ঝুলিতে ভরতে—
আমি তো কোনদিনই ডুব-জলে নেমে
অবগাহন স্নানে ইচ্ছা করিনি।

কোনদিন ফেনার মধ্যে দু হাত রেখে
সমুদ্রের উত্তাল বুকে সাঁতার কাটতে কাটতে
জলকন্যাদের মত ভেসে যেতে চাইনি।
কিংবা রাত্রির সমুদ্রে ফসফরাসের দ্যুতি দেখতে দেখতে
সিক্ত চুল আর আঁচলে নোনা জলের ছোঁয়া
পেতে চাইনি।—

শুধু পাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে দূর থেকে সাতটা রঙের মেলা
আর সোনালী লাল সূর্যের মুখ দেখে দেখে
কিছুক্ষণের জন্য পৃথিবীর সব কিছু
ভুলতে চেয়েছিলাম।

তা ছাড়া আমি তো কোনদিন
আলো-ঝলকানো ঢেউ-এর মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে
সমুদ্রের হৃদয় দেখতে চাইনি।

সি বি গুপ্ত

উত্তরপ্রদেশের সি বি গুপ্ত আপাতত আর একবার জিতে গেলেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ঠিক এখনই গুপ্ত মন্ত্রিসভার পতন ঘটাতে পারলেন না।

শ্রীমতী গান্ধী অবশ্য চেষ্টায় কোনও ত্রুটি রাখেন নি। যেদিন থেকে তিনি বুঝেছেন, সি বি গুপ্ত তাঁর সঙ্গে এলেন না, সেদিন থেকেই তিনি নব-পর্যায়ে গুপ্ত ও গুপ্ত মন্ত্রিসভাকে খতম করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছেন। এখন সমস্ত দিল্লি দরবার উত্তরপ্রদেশের মন্ত্রিসভার পতন ঘটাবার মহৎ কার্যে নিয়োজিত। কিন্তু তবু সি বি গুপ্ত জিতে গেলেন। বেঁচে গেলেন।

গুপ্ত মন্ত্রিসভা ঠিক কতদিন এভাবে বেঁচে থাকতে পারবে, কেউ তা জানে না। এই সেদিন প্রধানমন্ত্রীর কংগ্রেসেরই এক মহানায়ক বলছিলেন : আমরা বারবার চেষ্টা করে যাব। সর্বতোভাবে চেষ্টা করে যাব। এবং গুপ্ত মন্ত্রিসভাকে ফেলবই। দিল্লির যত শক্তি আছে, এখন শ্রী সি বি গুপ্তের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীভূত।

ক্রান্তি দলের চরণ সিং এবং প্রধানমন্ত্রীর দলের কমলাপতি ত্রিপাঠিকে একজোট করা হয়েছে। সি পি আই প্রভৃতি ছোটখাটো দলগুলি এদের সঙ্গে সমবেত হয়েছেন।

সি বি গুপ্তও পাল্টা হাত মিলিয়েছেন জনসংঘ এবং এস এস পি-র সঙ্গে। জনসংঘ এবং এস এস পি-র সম্মিলিত শক্তিই আপাতত গুপ্ত মন্ত্রিসভাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা খুলতে এখনও কিছু দিন বাকি আছে। এই কদিনে সি বি গুপ্ত যেমন চেষ্টা করবেন তাঁর শক্তি আরও বাড়াতে, প্রধানমন্ত্রী তেমনি চেষ্টা করে যাবেন তাঁর শক্তি খর্ব করতে। দিল্লি এবং উত্তরপ্রদেশের খবর : প্রধানমন্ত্রী এখন গুপ্ত-গোষ্ঠীর প্রত্যেক এম এল এ-কে ব্যক্তিগতভাবে ধরছেন। প্রলোভন এবং ভীতি-প্রদর্শন দুটোই নাকি একসঙ্গে চলছে।

✻

সি বি গুপ্ত চিরকালের কংগ্রেস রাজনীতিতে বিস্ময়। আমেদাবাদে যখন আদি কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, তখন ওয়ারকিং কমিটির সহকর্মীরা একদিন সি বি গুপ্তকে জিজ্ঞেস করেছিলেন : বাঁচাতে পারবেন সরকার? সি বি গুপ্ত হেসে জবাব দিয়েছিলেন : পারি কিনা দেখে নেবেন। পিতৃদেব আমাকে হারাতে পারেন নি, কন্যা কোন্ ছার! সহকর্মীরা সকলেই একটু অবিশ্বাসের হাসি হেসেছিলেন।

সি বি গুপ্তের সঙ্গে পণ্ডিত নেহরুর বিরোধ সুবিদিত। নেহরু রফি আহমেদ কিদোয়াই-র সহযোগিতায় বছরের পর বছর ধরে চেষ্টা করেছেন সি বি গুপ্তকে খতম করতে। কিন্তু পারেন নি। নেহরুর জীবনের শেষ দিকে সি বি গুপ্তই একমাত্র কংগ্রেস নেতা যিনি নেহরু-বিরোধিতা করেও টিঁকে গিয়েছেন। আর সকলে যখন নেহরুর ভয়ে কম্পিত, সি বি গুপ্ত তখন নেহরুর নিজ প্রদেশে প্রকাশ্যে নেহরু-বিরোধী কংগ্রেসী রাজনীতি করেছেন।

আমার একটা ঘটনা মনে পড়ে। ১৯৬৪ সালে ভুবনেশ্বরে কংগ্রেস ওয়ারকিং কমিটির নির্বাচন হচ্ছে। সি বি গুপ্তও দাঁড়িয়েছেন। নেহরু ইন্দিরা মারফত দলের অন্যান্য নেতাদের জানালেন : সি বি গুপ্ত যদি কোনও মতে ওয়ারকিং কমিটিতে আসে, আমি সে ওয়ারকিং কমিটিতে বসব না। নেতারা, অর্থাৎ কামরাজ, লালবাহাদুর শাস্ত্রী, অতুল্য ঘোষ, সঞ্জীব রেড্ডি, সকলে মিলে সি বি গুপ্তকে হারাবার জন্য লেগে গেলেন। সি বি গুপ্ত হারলেনও। কিন্তু তারপরও উত্তরপ্রদেশের রাজনীতিতে সি বি গুপ্তকে খতম করা যায়নি।

সোজা এবং বাঁকা পথে নানাভাবে সি বি গুপ্তকে খতম করার জন্য নেহরু চেষ্টা করেছেন। কামরাজ পরিকল্পনায় তাঁকে মুখ্যমন্ত্রিত্ব থেকে সরিয়ে নেহরু নাকি একবার মনেও করেছিলেন এইবার আপদ বিদায় গেল। কিন্তু তাতেও হল না। সি বি গুপ্ত ঠিকই বেঁচে রইলেন। শোনা যায়, শ্রীমতী গান্ধী মাঝে-মধ্যে আক্ষেপ করে বলেন : বাবাকে জ্বালিয়েছে, আমাকে কতদিন জ্বালাবে কে জানে!

শ্রীমতী গান্ধী কিন্তু প্রথমে সি বি গুপ্তকে জয় করার প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। সি বি গুপ্ত প্রকাশ্যে বলেছেন : আমি প্রধানমন্ত্রীর মুখের উপর বলেছি, কংগ্রেস রাজনীতিতে আপনার চেয়ে নীচ কাজ করতে আমি কাউকে দেখিনি।

✻

ছোট্টখাট্টো লোকটি এই সি বি গুপ্ত। চেহারায়, কথাবার্তায় কোনও ব্যক্তিত্বের ছাপ খুঁজে পাওয়া যায় না। ভিড়ে হারিয়ে যাওয়া গোছের মানুষ। চালচলনে সাদাসিধে। আমি যখন প্রথম এক কংগ্রেস অধিবেশনে সি বি গুপ্তকে দেখি, তখন আমার মনে হয়েছিল, কে এই লোকটা যার পেছনে পেছনে এগুলি হোমরাচোমরা ভদ্রলোক ঘুরে বেড়াচ্ছে!

আগে নাকি হাফ প্যান্ট পরে ঘুরে বেড়াতেন। এখন মালকোঁচা মেরে মোটা খদ্দরের ধুতি পড়েন। মাথায় গান্ধী টুপি, হাতে ছোট্ট লাঠি। চোখা চোখা কথা বলেন।

অনেকেই বলেন, সি বি গুপ্ত ডাকাতের মত রাজ্য চালান। কিন্তু কেউ বলেন না যে, সি বি গুপ্ত নিজের জন্য কিছু গুছিয়ে নিয়েছেন। সম্ভবত এখন সি বি গুপ্তই একমাত্র কংগ্রেস নেতা যিনি শুকনো রুটি খেয়ে এবং চারপাইয়ে শুয়ে দিন কাটিয়ে দিতে পারেন।

১৪।১।৭০

নবারুণ গুপ্ত

রবীন্দ্রনাথ ও রোম্যা রোলাঁ

রবীন্দ্রনাথ ও রোলাঁর ঘনিষ্ঠতা এবং আদর্শগত সহযোগিতা ঘটেছিল দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী দুটি বিক্ষুব্ধ এবং সংকটসংকুল দশক জুড়ে। আজ তা অনতিদূরবর্তী হলেও অতীত কাহিনী এবং সেই জন্যই যেমন একদিকে কিংবদন্তীর পরগাছাজালে তার সমাচ্ছন্ন হবার সম্ভাবনা, তেমনি বিশেষ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত বিকৃতির আশংকাও বিদ্যমান। সম্প্রতি কোনো কোনো পত্র-পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ও রোলাঁর সম্বন্ধটি নিয়ে কিছু জল্পনা-কল্পনার মধ্যে এই রকম বিকৃতি ও অপব্যাখ্যার আভাস দেখা গেছে। সেইজন্যই তথ্যনিষ্ঠ আলোচনার দ্বারা এই সম্বন্ধটির যথার্থ স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীসৌরীন্দ্র মিত্র। আগামী সপ্তাহ থেকে এ-রচনা ধারাবাহিক প্রকাশিত হবে।

—সম্পাদক

দেবরাজ

বড়দিনের ডালি

যীশু খ্রীস্ট জাতে ইহুদি হলে কী হয় তাঁর জন্মক্ষণকে তাঁর যারা স্বজাত তারা কিন্তু পরমলগ্ন বলে মনে করে না, তাঁর জন্মদিনে উপহার দেওয়া-নেওয়ার রেওয়াজ তাদের মধ্যে নেই। কিন্তু এবার তারা যে চমৎকার বড়দিনের উপহার পেয়েছে তা তাঁর ভক্তদের কারু ভাগ্যে জোটেনি। তাও আবার মিলেছে রোমান ক্যাথলিক ফ্রান্স থেকে সরকারী বিধি-নিষেধের বেড়া ডিঙিয়ে। একটা নয় দুটো নয় পাঁচ পাঁচটা গানবোট অর্থাৎ ছিপ জঙ্গী জাহাজ—যা থেকে ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়ে শত্রুদের বিরাট বিরাট সুদৃশ্য জাহাজকেও ঘায়েল করে দেওয়া যায়—ফরাসী দেশের শেরবুর্গ থেকে বড়দিনের ভোরে বেরিয়ে নির্বিঘ্নে এসে পৌঁচেছে বছরের শেষদিনে ইস্রায়েলি বন্দর হাইফাতে। জাহাজগুলো ইস্রায়েল অর্ডার দিয়েই তৈরি করিয়েছিল কিন্তু টাকা আগাম দিয়ে। ফরাসীরা একরকম সাধাসাধি করেই ইহুদিদের কাছ থেকে অর্ডারটা যোগাড় করেছিল।

ও ধরনের রুশী জঙ্গী জাহাজ মিশরের গোটা কুড়ি আছে। তারই একটা থেকে ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়ে মিশরীরা ১৯৬৭ সনে ইহুদিদের একটা প্রকাণ্ড যুদ্ধ জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছিল। তখনই ইস্রায়েল পণ করেছিল এর শোধ তারা তুলবে ওই ধরনের গানবোট যোগাড় করে। কথা ছিল পশ্চিম জার্মানির কাছ থেকে ও জিনিস তারা পাবে। শেষ পর্যন্ত কিন্তু পশ্চিম জার্মানি রাজী হয়নি। অগত্যা অন্য দেশ থেকে গানবোট কেনার বন্দোবস্ত করতে হলো ইস্রায়েলকে। বরাত পেলো ফ্রান্সের শের-বুর্গের জাহাজ তৈরির কারখানা। কিস্তিতে কিস্তিতে জাহাজ সরবরাহ করার ব্যবস্থা হলো, গোটা পাঁচেক জাহাজ ইহুদিরা পেয়েও গেল। কিন্তু হঠাৎ গোল বাধলেন প্রেসিডেন্ট দ্য গল। ১৯৬৮ সনের ২৮ ডিসেম্বর ইহুদি হানাদারেরা লেবাননে বেরুট বিমানবন্দরের ওপর চড়াও হয়ে তেরোটা বিমান তছনছ করে দেওয়ার পর খাপ্পা হয়ে উঠলেন দ্য গল—কড়া হুকুম দিলেন যুদ্ধে লাগতে পারে এমন কোনও জিনিস নগদ কড়ি দিলেও ইস্রায়েলকে দেওয়া চলবে না।

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো ইহুদিরা। অবশ্য হুকুম জারি হতে না হতেই আরো গোটা দুই জাহাজ তারা বের করে নিয়ে আসতে পেরেছিল। কিন্তু বাকী পাঁচটাতে তখনও তো কাজ চলছে। দ্য গল ভীষণ দুঁদে লোক। তাঁকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব নয়। তবু চতুর ইহুদিরা হাল ছাড়লো না। তক্কে তক্কে রইলো কী করে কাজ হাসিল করা যায়। জাহাজগুলো যে লড়াইয়ে লাগবে একথা তারা অবশ্য স্বীকার করেনি। তারা বলেছিল ওগুলো মাছ ধরার জাহাজ—এখনও তাই বলছে। দ্য গল তাদের সে কথায় কান দিলেন না, তবে জাহাজগুলো তৈরির কাজ সমানে চলতে লাগলো। ইতিমধ্যে দ্য গল ইস্তফা দিলেন, নতুন প্রেসিডেন্ট হলেন পঁপিদু। ইস্রায়েলের আশা হলো হাকিম যখন নড়েছে হুকুমও বুঝি এবার নড়ে। পঁপিদুরও তাতে খুব আপত্তি ছিল বলেও মনে হয় না। কিন্তু বেঁকে বসলো গালিস্ট দল।

সোজা পথে কাজ হলো না দেখে তারা ধরলে বাঁকা পথ। বলে না হলে ছলে কাজ বাগিয়ে নিতে তারা ওস্তাদ। একবার এক ভুয়ো ফিল্ম কোম্পানি তৈরি করে তারা বিলিতী কর্তাদের চোখে ধুলো দিয়ে গোটা চারেক জঙ্গী বিমান বিলেত থেকে দেশে নিয়ে গিয়েছিল। এবারে ফরাসী সরকারকে বোকা বানানো হয়েছে গোটা দুই ভুয়ো কোম্পানি খাড়া করে—একটা পানামায় আর একটা নরওয়েতে। তার আগে জঙ্গী জাহাজগুলোর স্বত্বস্বামিত্ব ছেড়ে দিলে ইহুদিরা লেখাপড়া করে। টাকাও ফিরিয়ে নিলে। তখন আসরে উদয় হলো পানামার এক তেল কোম্পানির তরফ থেকে নরওয়ের এক জাহাজী দালাল, সমুদ্দুরে তেল খোঁজার জন্যে নাকি তাদের ওই ধরনের জাহাজ চাই। চটপট নতুন চুক্তি হলো, টাকাও পাওয়া গেলো। তারপর বড়দিনের ভোরে জাহাজ পাঁচটা শেরবুর্গ থেকে পগার পার। তাদের যারা খালাসী কিংবা অফিসার কস্মিনকালে তারা কেউ নরওয়ের লোক নয়—সবাই ইহুদি। বন্দর তারা ছাড়লো চুপিসাড়ে নয়, ধীরে সুস্থে আস্তে আস্তে। কেননা তাদের কাগজপত্র জালও নয়, ফাঁকি দিয়ে আদায় করাও নয়, যদিও পুরো ব্যাপারটাই একটা সাংঘাতিক জালিয়াতি। মানুষ-গুলোও জাল, আবার যে কোম্পানির লোক বলে তারা নিজেদের জাহির করেছিল তাও ভেজাল।

এ জালিয়াতি এমন খোলাখুলিভাবে হয়েছিল যে শেরবুর্গে কারুর তা অজানা তো ছিলই না দেশে বিদেশেও ব্যাপারটা রটে গিয়েছিল। চেষ্টা করলে আরবদের বন্ধু অনেক দেশই তাদের পথে আটক করতে পারতো, অন্তত তাদের যাওয়ায় বাগড়া দিতে পারতো। তাদের শেরবুর্গ থেকে বেরিয়ে আসাও যেমন আশ্চর্য তেমনই আশ্চর্য তাদের নির্বিঘ্নে ঠিকানায় পৌঁছুনো। পাঁচ গানবোটের পাড়িকে রীতিমত একটা অ্যাডভেঞ্চার বলা বোধ হয় ঠিক হবে না। কেননা ফ্রান্স থেকে ইস্রায়েল পর্যন্ত লম্বা পাড়িতে বাধা তো তাদের কেউ দেয়নি। কিন্তু কেন? ব্যাপারটা দেখে সকলে কী এমন হকচকিয়ে গিয়েছিল যে যারা বাধা দেবে তারা সকলেই অবশ হয়ে পড়েছিল? অবশ তারা হয়েছিল ঠিকই, তবে দেখেশুনে মনে হয় তার কারণ বিস্ময়ের ঘোর নয়, আর কিছু। ইস্রায়েলের এই জাহাজ উদ্ধার পালা একেবারে নিখুঁত, তাদের বন্দোবস্তে এতটুকু ফাঁক কোথাও ছিল না। যেখান থেকেই বাধা আসবার সম্ভাবনা সেখানেই তারা এমন ব্যবস্থা করেছিল যাতে সে বাধা আর বাধা না থাকে। কী কৌশলে তা সম্ভব হয়েছে তার হদিস কেউ দেয়নি বটে, তবে বোঝা যায় টাকা তাদের বিস্তর খরচ করতে হয়েছে আর তার সঙ্গে যোগ হয়েছে রাজনীতির জটিল খেলা।

চক্রান্তের জাল পাতা হয়েছিল গোটা ফ্রান্সে। তাতে ধরা পড়েছিলেন চুনোপুঁটি শুধু নয়, বিস্তর রাঘব বোয়াল। প্রেসিডেন্ট পঁপিদু, প্রধানমন্ত্রী শাবা দেলমাস আর বৈদেশিক মন্ত্রী শুমান এ কেলেঙ্কারির বিন্দুবিসর্গও জানতেন না, জানতেন না প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মিশেল দেবরে। কিন্তু জানুন আর নাই জানুন ফরাসী সরকার এখন হয়ে দাঁড়িয়েছেন সারা দুনিয়ার উপহাস আর তামাসার পাত্র। পঁপিদু অবশ্য রেগে আগুন হয়েছেন। তাঁর আঁতে ঘা লেগেছে বিশেষ করে এই জন্যে যে লোকে ভাবছে দ্য গল থাকলে কিন্তু এমনটি হতে পারতো না। একটা কিছু তিনি করতেনই। পঁপিদু কিছু যে করছেন না তা নয়। ইস্রায়েলে অস্ত্রশস্ত্র না পাঠাবার যে নির্দেশ আছে তা আরও জোরদার করা হচ্ছে। কিন্তু চোর পালালে বুদ্ধি তো সকলেরই বাড়ে, তাতে চুরির যে ক্ষতি তা তো আর দূর হয় না। দুজন ফরাসী জেনারেলকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে, ফ্রান্স থেকে চলে যেতে বলা হয়েছে ইহুদিদের হয়ে যিনি অস্ত্রশস্ত্র সওদা করেন সেই জেনারেল মোর্দেকাই সিমনকে। ইস্রায়েলের রাষ্ট্র-দূতের সঙ্গে পঁপিদু বাক্যালাপও বন্ধ করেছেন। কিন্তু ইস্রায়েলের তাতে কী এসে যায়? মাল তো ঘরে সে দিব্যি তুলেছে।

নয়, বিশেষ কোনো ব্যাপারের সংক্ষিপ্ত বা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ নয়, কোনো কিছুর সারমর্ম আহরণ করাও নয়। আমাদের জীবনে অনেক উপলব্ধি, অনেক সত্যবোধ, অনেক অভীপ্সা, অনেক প্রকৃতি আসে বিদ্যুচ্চমকের মতো—আসে ক্ষণ-দীপ্তি হয়ে। ওই মুহূর্তের উদ্ভাসনেই তারা সুন্দর, ক্ষণিকের লীলাতেই তারা আমাদের আলো করে দেয়। ভালো উইট তো এই মুহূর্তেরই দীপ্তি। যেমন দেখি রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা'য়, তাঁর 'লেখনে', তেমনি এই আলোর ছটা পাই হিলেয়ার বেলক কিংবা ডরোথী পার্কারের কবিতায়। লিখতে লিখতে আমার বেলকের একটা দ্বিপদী মনে পড়ে গেল, বাংলায় তার মোটামুটি এমনি একটা তর্জমা করা যায়:

প্রেমে আমি ক্লান্ত বেজায়...
ক্লান্ত আরো পদ্য লেখাতে
অলক্ষ্যটায় কাটি যেমন
ঘাটতি নাকো টাকার বেলাতে।

এই চাতুর্যের জন্য এটুকু জায়গাই যথেষ্ট। কিন্তু কেবল লঘু সুর নয়, নিছক উইটিসিজম নয়—অনেক গভীর কথা—নিবিড় বেদনা—প্রবল আবেগ এইভাবে তীক্ষ্ণ-চিহ্নিত প্রদীপ্ত হয়ে আসে। আয়তনের ভার ভাবের জন্য নয়, বিস্তৃতি তারা সইতে পারে না।

আমার আশা হচ্ছে, 'পত্রাণু' হবে এই সব উজ্জ্বল মুহূর্তের সাহিত্য। এমনি চকিত অনুভবের গল্প, ক্ষণ-প্রকাশের কবিতা, দীপ্ত মনস্বিতার স্ফুলিঙ্গ। এই রকম রচনাকে যাঁরা লিখবেন তাঁদের এই জাতীয় লেখাগুলোকে আর এখন পত্রিকার পাতা ফাঁপাতে হবে না, দুটি উজ্জ্বল পংক্তির জন্যে অকারণে ষোলো লাইন জুড়তে হবে না কবিতার সঙ্গে। বাংলা সাহিত্যে নিটোল মুক্তোর মতো ছোট কবিতার অবশ্য অভাব নেই—কিন্তু 'পত্রাণু' সেই ধারাকে শক্তি দেবে, সমৃদ্ধ করবে। আর ছোট্ট গল্প, ছোট্ট প্রবন্ধ ছোট্ট আলোচনার একটা নতুন দিগন্ত খুলে যাবে—যার জাত আলাদা, রীতি আলাদা, স্বাদ আলাদা। ঠিক যেমন করে একদা উপন্যাসের সাম্রাজ্য থেকে ছোট গল্প ছুটে বেরিয়ে এসেছিল।

'পত্রাণু'র এই আণবিক সাহিত্যের পূর্বসূরী হিসেবে রসিক 'শিবরামের' একটি দ্বিপদী স্মৃতি থেকে উদ্ধার করছি। যদি ভুল থাকে, আশা করি পাঠকেরা ক্ষমা করবেন। তবে কবিতাটির রসাস্বাদনে তাতে বিঘ্ন ঘটবে না বলেই মনে হচ্ছে:

আমি কি লিখেছি অনেক কবিতা?
আমি তো কখনো লিখিনি,
একজন ছিল লেখিকা, এবং
আমি ছিনু তার লেখনী!

পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট্ট পত্রিকার পরের সংখ্যাটির জন্যে আমি অপেক্ষা করব।

ফোটোগ্রাফ

বনফুল

ওদের শান্ত শিষ্ট হ'তে বলছে তারা
সেই পাষণ্ড পাজির-পা-ঝাড়ারা
সেই ভাড়া-করা গ্রামোফোনের দলরা
সেই উপদেশ-বিতরণের কলরা—
বলছে তাদের
সেই অভাগাদের
যারা খেতে পায় না, পরতে পায় না, শুতে পায় না
বসতে পায় না, দাঁড়াতে পায় না, ঘুমুতে পায় না
যাদের ট্রামে বাসে ঝুলে ঝুলে চড়তে হয়
স্কুলে কলেজে ঘুষ দিয়ে পড়তে হয়
পড়েও যারা বিদ্যার বদলে সার্টিফিকেট পায়
সে সার্টিফিকেট এক টুকরো বাজে কাগজ শুধু
যা অন্ন বস্ত্র জোটাতে পারে না ; যাদের চোখে সব ধু ধু—
ঘুষ আর ট্যাক্স দিতে দিতে যারা সর্বস্বান্ত
তাদের বলছে—হও ভদ্র শিষ্ট শান্ত।
যাদের আশা নেই, ভাষা নেই, আনন্দ নেই
সুখ নেই, স্বাচ্ছন্দ্য নেই
আছে শুধু বুক-চাপড়ানি
আর কাতরানি
যাদের শুষছে পিষছে দলছে—আইনরূপী বে-আইন
যাদের জীবন 'কিউ' আর 'লাইন'
যাদের প্রত্যহ নুন আনতে ফুরুচ্ছে পান্ত
তাদের বলছে—হও ভদ্র শিষ্ট শান্ত!
তারা কি মানুষ ? তারা কেঁচো তাই পায়ে দলছ
তাই উপদেশের ফাঁকা বুলি বলছ
ওরা মানুষ হলে তোমাদের আপেল গাড়ি উলটে
ক'রে দিত ছাতরাখাতরা।
তোমাদের মধুভাণ্ডে ঢেলে দিত আলকাতরা।
কিন্তু কেঁচোরা তা পারবে না, হবে না এখন সে খেল
পুড়বে না এত তেল
নাচবে না রাধাও
সুতরাং যদ্দিন পার চালিয়ে যাও।

আমি যখন জেগে থাকি সে আমার কাছে আসে না। যখন আধো ঘুমের ভেতরে চলে যাই সে নিঃশব্দে কবাট খুলে আমার শিয়রের কাছে চলে আসে। সে আসবে বলে কোনদিন কবাটে খিল তুলি না, সিঁড়ির কাছের বাতিটা জেবলে রাখি সারা রাত। অবশ্য সে যে রোজ আসে এমন না। কোন কোনদিন আসে। যখন আসে না মনে হয় সে কোথাও পথ হারিয়ে ফেলেছে। সারারাত তার কথা ভেবে চোখের জলে আমার বালিশ ভিজে যায়।

যেদিন আসে, তার আসা এমন নিঃশব্দ যে আমার ঘুমোতে একটুও অসুবিধা হয় না। আমার ঘুমন্ত মুখের সামনে ঝাঁকড়া চুল সমেত মাথাটা ঝুঁকিয়ে এনে ফিস্‌ফিস করে সে ডাকে, ঘুমিয়ে পড়েছ?

অনেকদিন যেমন তার অপেক্ষায় থেকেও সে আসছে না দেখে আমি বুঝে নিতাম সে নির্ঘাত ভুল পথে চলে গিয়ে আমার নাম ধরে একা একা ডেকে ফিরছে, এত বড় শহরে নাম শুনে চিনতে পেরে কেউ তাকে 'ওই তো ওই ঘরে সে থাকে', বলে আমার ঘর চিনিয়ে দেবে না—সেই সব দিনগুলিতে তার

কথা ভেবে আমার চোখের ঘুম চলে যেতো। মনে হত আমার এই ঘরে পেঁছোবার চব্বিশটা গলির মোড়ে কেন আমি আগে থেকে চব্বিশখানা রুমাল বিছিয়ে রাখিনি, তাহলে সে রুমাল কুড়োতে কুড়োতে ঠিক আমার ঘরে পেঁছে যেতো। তেমনি, যখন আসে, মনে হয়, সে ইচ্ছে করলেই আসতে পারে, রুমাল বিছিয়ে না দিলেও পারে—শুধু আমাকে দুঃখ দেবার জন্যেই আসে না। হয়ত আমার ওপরে তার মান অভিমান অনেক জমে আছে—কেন যে অভিমান তা আমি ভালভাবে সবটুকু জানিও না—সে দূরে বসে এখন তার শোধ নিচ্ছে।

যখন আসে, লক্ষ করেছি, রোজ তার পরনে এক রঙের হাফ প্যাণ্ট আর আধ ময়লা একটা হাফ শার্ট থাকে, চুলে কখনো চিরুনির দাগ পড়ে না। মুখখনা শুকনো, হরিতকির মতন। সব মিলিয়ে এক রকম জন্ম-দুঃখী চেহারা, যেন এ সংসারে তার কেউ নেই। আমার মাঝে মাঝে ইচ্ছে করত স্নানের ঘরে নিয়ে গিয়ে তাকে স্নান করিয়ে আনি, যত্ন করে চুল আঁচড়িয়ে দিই যেমন করে আমার মা আমায় ছেলেবেলায় দিত। তারপর আয়নার সামনে ফুটন্ত মুখখানা তুলে ধরে শুধোই, দেখ তো, চিনতে পার কি না? কিন্তু ইচ্ছে জাগত ওই পর্যন্ত। কখনো ইচ্ছে মত সাজাতে পারিনি। তাছাড়া, আমি চাইলেই সে আমার সামনে মাথা পেতে দেবে তার ওপরে এতখানি অধিকার আজ আর আমার নেই। এই সঙ্গে কতগুলি অসুবিধার কথাও মনে পড়ত। তার মাপের প্যাণ্ট শার্ট ঘরে কোথায়, যে তাকে পরতে দেবো। সে বোধ হয় আমার কাছ থেকে এগুলি নিতও না। সে যে বিশ-বাইশ বছরে একটুও বদলায়নি দেহের মাপে কিংবা দুঃখী চেহারায় এইটাই তো সবচেয়ে বড় প্রমাণ যে, সে আমার হাত থেকে কোনো দয়ার দান কোনদিন আর নেবে না।

ফোটেনি সেদিন। স্নেহের কুটো গাছটি ভেসে গেছে অশ্রু নদীতে।

সেদিন শেষ রাতের দিকে বড় অলৌকিক আর প্রাচীন এক চাঁদ উঠেছিল পদ্মের মাঠে। যেন সে আমার জন্মক্ষণ থেকে ওইভাবে পদ্মের মাঠে জলার বুকে তার অসম্ভব প্রাচীন শরীর নিয়ে জেগে আছে। তার আগে, তখনও ভালভাবে চাঁদ ওঠেনি, সে একবার আমার জানালায় উঁকি মেরে জিজ্ঞেস করেছিল ঘুমিয়ে পড়েছ?

আমি সাড়া দিয়েছিলাম, না ঘুম আসছে না।

সে মৃদু হেসে বলেছিল, নতুন জায়গায় এ রকম হয়। একটা রাত না হয় না ঘুমিয়ে কাটালে। আর কিছুক্ষণের মধ্যে তোমার চলে যেতে হবে, মনে আছে তো?

আমি ঘাড় নেড়ে বলেছিলাম, মনে আছে। কিন্তু তুমি কোথায় চললে এত রাতে?

সে মাথা নিচু করে ঘরের ভেতরে চলে এসেছিল। বললে, পুকুরের জলে চাঁই পেতে এসেছি, এখন মাছ কুড়োতে যেতে হচ্ছে। একলাও ফেরা হয়নি, যাবে আমার সঙ্গে?

—না। আমি বলেছিলাম।

সে যেতে যেতে আমায় ফিস ফিস করে বলেছিল, তুমি ছায়ায় ছায়ায় গা ঢাকা দিয়ে থেকো। কেউ ডাকলে সাড়া দিও না।

—আচ্ছা। আমি মাথা নেড়েছিলাম।

তার ছায়ায় ছায়ায় আমি চলছিলাম। সে একলাই চলেছে, পেছনে তারই শরীরের ছায়া অলৌকিক চাঁদের আলোয় দীর্ঘ হয়ে ভেসে চলেছে। চতুর্দিকে ঝোপ-ঝাড়, আগাছা, আমার পা ফেলতে কষ্ট হচ্ছিল। সে পুকুরের পশ্চিম পাড়ে উঁচু বাঁধের ওপর দিয়ে জলের দিকে নেমে যাচ্ছিল। অন্ধকারে কুলকুল করে জলস্রোত পুকুরে ঢুকছে, সেই সঙ্গে উজানী মাছেরা তার চাঁইয়ের ফাঁদে আটকা পড়ে যাচ্ছে।

সে যখন নিচু হয়ে চাঁই তুলছে ওপারের চাঁদে ভরা মাঠ থেকে কার গলা ভেসে এল, চাঁই তোলে কে রে?

—আমি গো দাদা। সে সাড়া দিল।

—তোর পেছনে কাকে যেন দেখলুম? আর কে আছে তোর সঙ্গে?

—কই কে? আমি তো একা এয়েছি গো। তুমি চাঁদের আলোয় ভুল দেখেছ। সে বড় অদ্ভুত গলায় হাসল।

—হতে পারে, কিন্তু দিনকাল বড় ভাল নয়, দেশে নাকি শত্রুর চর নেমেছে।

খোকা তার মাঠের দাদার উদ্দেশে বলল হ্যাঁ গো দাদা, ধর যদি সেই লোকটা এখন আসে?

—কোন লোকটা রে? কার কথা বলছিস তুই? মাঠের দাদা বিস্ময়ের সঙ্গে শুধলো।

—সেই লোকটা গো, যে এক কুড়ি বছরের ওপারে চলে গেছে, ধর যদি এসে বলে সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে চলে এলুম, আমাকে তুই আশ্রয় দে। তাকে তুমি কি বলবে, শত্রু?

অনেকক্ষণ মাঠের দাদার গলা আর শোনা যায় না।

খোকন পাড়ের ওপরে মাছগুলি চাঁদের আলোয় ছড়িয়ে দিয়েছিল। টুকরো চাঁদের মতন মাছগুলি ঘাসের ওপরে লাফাতে থাকল।

সে বিমনা, একরকম গলা করে বলল, জানো দাদা, ক'দিন ধরে সেই লোকটাকে আমি স্বপ্নে দেখছি। আধখানা শরীর নিয়ে সে বড় দুঃখে আছে।

—আধখানা শরীর? কি সব তুই বলছিস আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

—কেন বুঝতে পারবে না? এই যে তুমি এ গাঁয়ে আছ, যদি হুকুম হয় তুমি এ গাঁয়ে আর থাকতে পারবে না তখন কি তোমার মনে হবে না, মন কি শরীর যা-ই বল আধখানা তার পড়ে রইল এ গাঁয়ে, তুমি ভিন গাঁয়ে যাচ্ছ বাকী আধখানা নিয়ে?

লোকটা সংশয়ী গলায় বলল, তা মনে হতে পারে বটে কিন্তু সে কথা আসছে কোথেকে? সে লোকটা তো আর সত্যি ফিরে আসছে না।

—ধর যদিই আসে?

—হ তুই খেপে গেছিস। তোর হাতে মাছ রয়েছে, ভূতে পেয়েছে তোকে। শিগগির বাড়ি যা। লোকটা আপনমনে হা হা করে হাসতে লাগল।

ঘরে ফিরে এসে সে আমায় বলেছিল, জান, তোমার জন্যে একটা জিনিস আমি লুকিয়ে রেখেছি।

—কি জিনিস? আমি লোভীর মত তার সামনে হাত পেতে বলেছিলাম দাও। যেন আমার এক মুহূর্ত দেরী সইছিল না। সারা জীবন আমি তার হাত থেকে এই দানটি নেবো বলে অপেক্ষা করে আছি। আমি আবার বললুম, কই দাও।

সে অনেক খুঁজে পেতে আমার হাতে শুকনো কতগুলো পাতা এনে দিয়েছিল। খুলে দেখি সেটা একটা কাঠাল পাতার মুকুট, জীর্ণ আর বিবর্ণ। আমার মনে পড়েছিল, কবে এই মুকুট পরে আমার এই ঘরে আমি একদিন রাজা সেজেছিলাম। সেই একদিন—তারপর মুকুট খুলে ভিখিরীর বেশে চলে গেছি। রাজা কি ভিখিরী কোনো বেশেই আর কোনদিন ফিরিনি।

সে বললে, তোমার কোনো চিহ্নই তো রইল না, এই চিহ্নটা আমি যত্ন করে তুলে রেখেছিলাম, তুমি এলে তোমায় দেবো বলে।

সহসা বাইরে নজর পড়াতে দেখি চার-দিক ফরসা হয়ে আসছে। তার কথা আমার মনে ছিল। সে যে বলেছিল, রাত পোহালে তোমায় বলে যেতে হবে, মনে হল, সে যেন আমায় মুকুটটা হাতে দিয়ে বলছে, ভিখিরীর বেশে এসেছিলে, এবার রাজবেশ পরে ফিরে যাও।

মাঠের মধ্যে শেষ প্রহরের ক্ষয়ে যাওয়া একটুখানি চাঁদের দিকে চোখ পড়ে। অলৌকিক, অপার্থিব এক ক্ষুধা যেন তার গা বেয়ে চুইয়ে নামছে। আমি সেই পাতার মুকুট মাথায় দিয়ে ছুটে মাঠের মধ্যে চলে গেলাম। যেন তখন আমার চার পাশে অসম্ভব এক ঢোলের বাজনা বেজে উঠল। সেই শব্দে এক পায়ে নাচতে নাচতে—যেমন করে বুবুদের বাড়ি বহুরূপীর সঙ নাচত অবিকল তেমনি পাঁচখানা গাঁয়ের ঘুমন্ত মানুষকে শুনিয়ে আমি চীৎকার করে বলতে লাগলাম, আমার হাতে আর সময় নেই, তোমরা দেখে নাও আমি এসেছিলাম। সেই অশ্রুনদীর ওপার থেকে ভিখিরীর বেশে আমি এসেছিলাম, যে নদীতে মানুষ পারাপার করে না শুধু তার ওপর দিয়ে স্মৃতিগুলি ভেসে বেড়ায় বারো মাস। আমার লজ্জা গ্লানি আর পরাজয় সব আমার এই বাঁ পায়ের নিচে চাপা আছে, আরেক পা মুক্ত। যেমন মুক্ত শেষ রাতের ওই লোভী চাঁদের আলো যে একসঙ্গে আমার দুটো শরীরকেই গ্রাস করেছে। আমি এসেছিলাম, আমার সেই অর্ধেক শরীরের খোঁজে—পূর্ণ মানুষটির সন্ধানে, রাজার তলোয়ার যার আধখানা একদিন এইখানে কেটে রেখে দিয়েছিল, সঙ্গে নিতে দেয়নি।

—খোকন, তুমি আছো? আকুল গলায় আমি ডাকলুম।

অন্ধকারে কেউ কোনো সাড়া দিল না। শুধু অবিরাম বৃষ্টির শব্দ ভেসে এলো দূর থেকে।

সে যে এসেছিল একমাত্র বুকের ভেতরে ছাড়া আর কোথাও তার কোনো চিহ্ন রেখে যায়নি।

Yaounde-এর কাছাকাছি এক পল্লী অঞ্চলে সকালবেলা হাট দেখতে গেলাম। নানারকম ফল ও সবজি ঝাঁড়ি করে নিয়ে মেয়েরা বসেছে। মাঝে মাঝে মাংস ও খাবারের দোকান। মেয়েদের পরনের কাপড়ে বিচিত্র নকশা, গলায় কাঠের মালা। ছবি তুলতে গেলাম, তারা উঠে দৌড়ে পালাতে লাগল ও কয়েকজন আমার সঙ্গিনীদের রাগ করে কি যেন বলতে লাগল। শুনেলাম, গ্রামের লোকেরা ছবি তোলা অপছন্দ করে, ভাবে ছবির ভেতর ওদের আত্মা বন্দী হয়ে যাবে, তাই ক্যামেরাকে ওদের ভয়। পরে লক্ষ করে দেখেছি, বিদেশীদের ক্যামেরাকে ওরা ভয় করে, কিন্তু দেশীয় লোকেরা ছবি তুললে কিছু মনে করে না। পরের দিন একটি ছোট্ট বিমানে (মাত্র চারজন ধরে) আমরা বামেণ্ডা অভিমুখে যাত্রা করলাম।

এবারে আমাদের যাত্রাপথ গভীর অরণ্যের ওপর দিয়ে। অনেক জায়গাতেই গাছপালা ভেদ করে মাটি দেখা যায় না, অনেক দূরে দূরে একটু করে পরিষ্কার জায়গা। জঙ্গলের মধ্যে, সেখানে পাতায় ছাওয়া কুঁড়েঘর চোখে পড়ল। ক্রমে দূরের পাহাড় কাছে এসে গেল, দু পাশে পাহাড়, মাঝখান দিয়ে আমাদের বিমান উড়ে চলেছে, পাহাড়গুলি ভয়াবহরূপে কাছে মনে হতে লাগল। বালি এয়ারপোর্টে এসে নামলাম। এয়ারপোর্ট বলতে যা বোঝায় তার কিছু নেই, জঙ্গল পরিষ্কার করা খানিকটা সমতল জায়গা, এক ধারে একটি খড়ের চালা ঘর। এখানেও চার পাশে বহু নারী ও পুরুষের জমায়েত। বড় বড় ঢাক বাজছে ও সঙ্গে সঙ্গে ছোট দল করে, গোল হয়ে মেয়েরা নাচছে। অতিথিকে এমন আনন্দপূর্ণ সম্বর্ধনা জানাতে অন্য কোন দেশে দেখিনি। বালি থেকে বামেণ্ডা মোটরে প্রায় এক ঘণ্টার পথ। মাটির রঙ লাল, রাঙামাটির পথ এঁকেবেঁকে পাহাড়ের উপর উঠে গেছে। দু ধারের বড় বড় গাছের ডালপালা মিলে পথের উপর সবুজ চাঁদোয়ার সৃষ্টি করেছে।

সেদিন বিকেলে স্থানীয় বিভিন্ন উপজাতির নাচ দেখলাম। এদেশে 'হাইলাইফ' বলে একটি নাচ আধুনিক সমাজে প্রচলিত। নাচটি পাশ্চাত্য নাচের ধরনের অথচ খুব সহজ, তালে তালে পা ফেলা। পরের দিন ভোরবেলা আমরা এই অঞ্চলের কয়েকজন দলপতি (ট্রাইবেল চীফ)-দের সঙ্গে দেখা করতে বের হলাম। তাঁদের সহযোগিতা ছাড়া এদেশে কোন আন্দোলন বা সংস্থা চলতে পারে না। এবারে পশ্চিম ক্যামেরুনের প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী মাদাম জুয়াও আমাদের সঙ্গী হলেন।

ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে অনেকখানি পথ পার হবার পর, পাহাড়ের উপর থেকে দলপতির 'ফন'-এর প্রাসাদ চোখে পড়ল। দলপতিকে এদেশে 'ফন' বলে অভিহিত করা

মহিলা সমিতির কাজ

হয়। ফনদের প্রাসাদ সাধারণত গভীর জঙ্গলের মধ্যে হয়, কারণ আগেকার দিনে যখন প্রতিনিয়ত উপজাতিদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বিবাদ হতো, তখন যাতে সহজে শত্রুর দল অন্য পক্ষের দলপতিকে বন্দী করতে না পারে, তারই জন্য এই সাবধানতা। এবারে

উপজাতির নৃত্য—কম্বা

দেখা করেছিলাম। এদেশে এখনও পুরুষের বহুবিবাহ প্রথা আছে। আধুনিক মেয়ে-পুরুষের মত বদলাতে শুরু করেছে, কিন্তু প্রাচীনপন্থীদের মুখে শুনেছি, সপত্নী থাকলে চাষবাস ও ঘরের কাজ করতে নাকি সুবিধা হয়। স্বামীর প্রথমা স্ত্রীকে পরবর্তী স্ত্রীরা যথেষ্ট সম্মান দেখান। এদেশে মেয়েদের সন্তান সংখ্যা আমাদের দেশের মত বেশি, পাঁচ ছয়টি সন্তান বেশির ভাগ মায়েরই। এদেশে পতিতাবৃত্তি প্রায় নেই বললেই চলে, একমাত্র ডুয়ালা ছাড়া এবং সেটি সম্ভবত বন্দর বলে।

এবারে আমাদের গন্তব্যস্থল হলো পশ্চিম কামারুনের রাজধানী বুইয়া (Buea) এখানে নারী দিবস উপলক্ষে বিরাট অভিপ্রদর্শনী হলো। এই জমায়েত-এ হাজার হাজার মেয়ে পশ্চিম কামারুনের বিভিন্ন অংশ থেকে এসেছিলেন। পরনে নানারঙের বিভিন্ন পোশাক। কারো কারো দেহের উপরিভাগ সম্পূর্ণ নগ্ন, কিন্তু নানা-রঙের বিচিত্র নকশায় ঢাকা। ঢাকের বাজনার তালে তালে তারা মার্চ করল ও পরে নানা-ধরনের উপজাতির নাচ। কর্মীদের ভাল কাজের জন্য পুরস্কার দেওয়া হলো। পরের দিন মহিলা সংস্থা পরিচালিত শিশুবিদ্যালয় ও মহিলা সমিতির অধিবেশন দেখলাম। মায়েদের অজ্ঞতার ফলে, এদেশে শিশু-মৃত্যুর হার খুব বেশি। সেইজন্য শহর ও গ্রামাঞ্চলে মহিলা সমিতির মাধ্যমে শেখানো হয় কেমন করে সদ্যপ্রসূত শিশুকে স্নান করাতে হয়, বিভিন্ন বয়সে শিশুদের কি খাদ্য হওয়া দরকার, প্রাথমিক চিকিৎসা, খাদ্যমূল্য বিচার ইত্যাদি। সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশে জন্ম থেকে পাঁচ বছর বয়সের মধ্যে শতকরা ৪০ ভাগ শিশুর মৃত্যু হয়। তাই ওদেশে বিশেষ করে শিশুপালন সম্বন্ধে মেয়েদের শিক্ষা দেবার প্রচেষ্টা।

এদেশের কাঠের উপর কারুকার্য খুব সুন্দর এবং হস্তশিল্প ও কাপড়ের উপর পুঁতির কাজ দেখবার মত। বুইয়া থেকে আরও গভীর জঙ্গলে অবস্থিত কুম্বা অঞ্চলে গিয়েছিলাম। আমরা ছিলাম বারুম্বি হ্রদের ধারে পাহাড়ের উপর। বারুম্বি হ্রদ নাকি ঠান্ডা হয়ে যাওয়া আগ্নেয়গিরি তাই এর তল নেই। হ্রদে খুব কুমীর, ভয়ে কেউ স্নান করতে নামে না। চারি পাশে গভীর জঙ্গল আর পাহাড়গুলির চূড়ো ছুঁচলো। ভোরের আলোয় মনে হতো যেন সমুদ্রের বিরাট ঢেউগুলি পাথর হয়ে জমে গেছে। যতদূর দৃষ্টি যায়, এমনি জমে যাওয়া সমুদ্রের ঢেউ আর বিশাল গাছ ও লতা ঘেরা জঙ্গল আমাদের ঘিরে রেখেছিল। এই অঞ্চলে জিপে করে গভীর অরণ্যের মধ্যে পল্লী সংস্থাগুলি দেখতে গিয়েছি। সেখানে দেখেছি কি নিষ্ঠার সঙ্গে মেয়েরা কাজ করছে; পাতায় ছাওয়া প্রায় অন্ধকার ঘরে বা গাছের তলায় বসে শিক্ষা বিস্তার ও কল্যাণ কর্মের প্রতি তাদের আগ্রহের কথা ও কাজের প্রসারের বিভিন্ন উপায় ও পথের কথা আলোচনা করে মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নতুন আশা মনে জেগেছে।

এ অঞ্চলে অনেক জায়গাতেই গ্রামের বাড়িগুলি পথের দু পাশে লম্বা সার বেঁধে তৈরি কারণ হিংস্র জন্তুর ভয়ে জঙ্গলের মধ্যে বাড়ি করতে কেউ সাহস করে না। এখান থেকে বুইয়া হয়ে আমরা ভিক্টোরিয়াতে গেলাম। ভিক্টোরিয়া সমুদ্রের ধারে, এখানকার প্রধান বন্দর। শহরটি ছোট, কিন্তু পাহাড় ও সমুদ্রের মিলনে চার পাশের দৃশ্য বড় সুন্দর।

এবার আমার বিদায়ের সময় ঘনিয়ে এলো। এদেশের বন্ধুরা উলুধ্বনি করে বিদায় দিলেন, আর সঙ্গে দিলেন, গরিলার চামড়ার ব্যাগ, বহুবিধ কারুকার্য করা শিল্প সামগ্রী। যে আন্তরিকতা ও বন্ধুত্ব, সভ্যতা ও কৃষ্টির ব্যবধান ও পথের দূরত্ব ঘুচিয়ে মানুষকে মানুষের নিকট বন্ধু ও আপন-জন করে তোলে, সেই অপূর্ব আত্মীয়তার স্পর্শ, সুদূর কামারুনের নারী সমাজের কাছে পেয়েছিলাম।

সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশে সত্যকারের দারিদ্র্য নেই, আছে শিক্ষা ও জ্ঞানের অভাব। এই দেশগুলির মানুষের অতীত ঘন অরণ্যের মতই অন্ধকার। কৃষ্টি ও সভ্যতার কোন প্রাচীন ইতিহাস নেই। আফ্রিকার রত্ন ভাণ্ডারের সন্ধান পেয়ে গিয়েছে বিদেশী বণিকের দল, সাম্রাজ্যবাদীর দল, ক্রমে তারা ওদের জীবনে যেমন একদিকে শিক্ষা ও সভ্যতার আলো এনে দিয়েছে, তেমনি অন্য দিকে ওদের উপর প্রভুত্বের কড়া পাহারা বসিয়ে, দাসত্বের শৃংখল পরিয়ে রেখেছে বংশপরম্পরা ধরে। ক্রমে মানুষ জেগে উঠেছে, স্বাধীন রাষ্ট্র হয়ে যেতে শুরু করেছে দেশগুলি। পাশ্চাত্য ও আফ্রিকার জীবন ধারার মিশ্রণে একটা নতুন সভ্যতা গড়ে উঠেছে। শিশুর মত স্বচ্ছন্দ চিত্তে, দ্বিধাহীনভাবে নতুন চিন্তা ও জীবনধারাকে গ্রহণ করবার স্বাভাবিক ক্ষমতা ওদের আছে, তাই মনে হয় প্রগতির পথে আফ্রিকার মানুষের এগিয়ে যেতে বেশি সময় লাগবে না।

অন্ধ্র প্রেক্ষাগৃহে। প্রথম শিল্পী কুমারী তপতী সরকার। আলাপ ও ধ্রুপদ শোনালেন ইমন কল্যাণ রাগে। সংগে পাখোয়াজ বাজালেন চঞ্চল ভট্টাচার্য। দুজনেই অল্প-বয়সী। তাতে ধ্রুপদের গাম্ভীর্য সৃষ্টি হতে পারেনি বটে। কিন্তু প্রয়াসে বেশ নতুনত্ব ছিল। রাগ রূপায়ণ মামুলী। দ্বিতীয় শিল্পী কানপুরের কাশীনাথ বেদোস। খেয়াল গাইলেন। রাগ সাওনী ও বাহার। পরে মারাঠী ভাষায় ভক্তিমূলক ভাওগীত। এ'র গলা বেশ জোরালো এবং সুরেলা। তবে গভীরতা কম। আন একঘেয়ে ধরনের। বাহার মন্দ লাগেনি। তবলায় ছিলেন চন্দ্রভান। এদিনের অধিবেশনে শেষ দুটি শিল্পীকণ্ঠে মানিক বর্মা, আর সেতারে বিমল মুখোপাধ্যায় শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছেন। মানিক বর্মা শ্যাম কল্যাণে খেয়াল, মাঝখানে ঠুমরী ও শেষে ভজন শোনালেন। তৃতীয় দিনেও এ'র প্রোগ্রাম ছিল। সেদিন গেয়েছেন পূরিয়া কল্যাণ আর দেশ। এ'র খেয়াল পরিবেশন খুবই ভাল। চমৎকার সুরেলা মেজাজ। তানে যদিও বৈশিষ্ট্য নেই। কিন্তু পরিচ্ছন্নতা আছে। প্রথম দিনে শ্যাম কল্যাণের বিলম্বিত (জীও মরে লাল) বেশ লেগেছিল। তবে খেয়ালের চাইতে ঠুমরীই ইনি বেশি ভাল গেয়েছেন। দু দিনই। তাঁর দ্বিতীয় অনুষ্ঠানের ঠুমরী কানে লেগে থাকার মতন। ভজন জমেনি। এ'র সংগে তবলা ও সারেংগীতে ছিলেন প্রথম দিনে শঙ্খ চট্টোপাধ্যায় ও সগীর-উদ্দিন; দ্বিতীয় দিনে—মহাপুরুষ মিশ্র ও লছমন খান।

এবারে তানসেনের সবচেয়ে নৈরাশ্য-জনক খবর—ভীমসেন আসেননি। শুনলুম, তিনি অসুস্থ। তাঁর দ্রুত আরোগ্য ও সুস্বাস্থ্য কামনা করি। বছর বছর অনেক নতুন শিল্পী আসেন। বরাবরই দেখে আসছি। মাঝে কয়েক বছর দেশে ছিলুম না। ফিরে এসে দেখছি, কিছু নতুন মুখ। কিন্তু সংকোচের সংগেই বলছি। নতুন মুখ চোখকে তৃপ্তি দিতে পারে কানকে দেয় না। কণ্ঠসংগীতের আসরে সেই দুটি একটি প্রবীণ জাঁকিয়ে বসে আছেন, (তাঁদের সিদ্ধির দাপটেই বসে আছেন, কারো দাক্ষিণ্যে নয়) তাঁদের নড়ানো তো দূরের কথা, তাঁদের পাশাপাশি আসন নেবার মতই কেউ নেই। ভীমসেন যোশী বয়সের দিক দিয়ে হয়তো ঠিক প্রবীণ নন। কিন্তু তিনিও পুরোন শিল্পী প্রায় পাঁচ বছর তাঁর গান শুনিনি। কিন্তু এবার কলকাতার যে সব নতুন শিল্পীদের (আমার কাছে নতুন) গান শুনলুম, তাতে বলতে পারি, একযুগ আগে ভীমসেন যোশী যেমন গাইতেন, এ'রা তার ধারে কাছেও যান না।

আমার এই প্রসঙ্গ তোলার একটা কারণ আছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ভাষণে, সংঘ

ওস্তাদ আমীর খাঁ

ও সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তা বলেছিলেন—পুরোনো শিল্পীদের পাশাপাশি নতুনদের স্থান করে দেওয়ার সংকল্পের কথা। ভারী প্রশংসনীয় এ উদ্যম। বিশেষ করে উদীয়মান তরুণ প্রতিভাদের এভাবে তুলে ধরার প্রচেষ্টা একটা আদর্শ স্থাপনা করবে কিন্তু সেই সঙ্গে সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের দায়িত্ব থাকবে সাচ্চা জহুরী হ'য়ে ওঠার। শিল্প কেনা-বেচার হাট থেকে যে-কোনো ভিনদেশী মাল নিয়ে এসে পসরা সাজালেই চলবে না। রত্নের প্রসাদগুণ থাকতে হবে। নইলে কিসের প্রদর্শনী। কলকাতার বাইরে থেকে যেসব শিল্পীরা আসছেন, তাঁদের কাছে স্থানীয় শ্রোতারা আশা করবেন হয় কিছু নতুনত্ব নয় কোনো সাধনালব্ধ ঐশ্বর্যের স্বাক্ষর। আর তা না হ'লে খুব সংগত প্রশ্ন জাগবে স্থানীয় লোকের মনে—'এই শহরেই কি অনেক গাইয়ে নেই ?'।

বয়েসে নতুন অনেক শিল্পী ছিলেন এবারের তানসেনে। তাঁদের কৃতিত্ব ও উৎকর্ষের তারতম্য সত্ত্বেও এক কথায় বলব কেউ নিরাশ করেননি। কেউ অধৈর্য করেননি। কথক নৃত্যশিল্পী সুমিত্রা মিত্রকে আমার অভিনন্দন জানাই। তাঁর নাচের সাবলীল ভঙ্গিমা, কঠিন আয়াসলব্ধ মুদ্রার স্বচ্ছন্দ প্রকাশ আমাকে খুবই মুগ্ধ করেছে। তবলায় বসেছিলেন সোমেন ঘোষ ও রাম-গোপাল মিশ্র। সারেংগীতে রামনাথ মিশ্র।...

বহিরাগত যে সব শিল্পী ইদানীং কল-কাতায় গান গেয়ে সুনাম অর্জন করেছেন বলে শুনেছি, তাঁদের কেউ কেউ এবারও তানসেন সম্মেলনে গেয়েছেন এ'দের মধ্যে বারাণসীর এম আর গৌতম আর দিল্লীর হাফিজ আমেদ খাঁর নাম উল্লেখ্য। শ্রোতারা নিশ্চয়ই এ'দের গান পছন্দ করেন। না হ'লে উদ্যোক্তারা এ'দের আমন্ত্রণ করবেনইবা কেন ? আমার এ'দের গান পছন্দ হয়নি। তা ব'লে কলকাতার নাগরিক হিসেবে এই অতিথিদের স্বাগত জানাতে আমি দ্বিধা করব না। গৌতম খেয়াল গাইলেন, ললিতা গৌরী ও দেবশাখ রাগে। আর গাইলেন পিলু ঠুমরী। পূর্বী থাটের অতিবিশিষ্ট রাগ ললিত। এর সংগে অন্য রাগের মিশ্রণে সৃষ্ট কোনো তৃতীয় রাগ যদি স্বকীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠা না পায়, তবে সেটা বিড়ম্বনার ব্যাপার। এই ধরনের মিশ্র রাগ কেউ কখনো গান না, বাজান না, কি গাইবেন না, বাজাবেন না, তা বলছি না। আমি বলছি এর পরিবেশনে এমন দক্ষতার প্রকাশ থাকা চাই, যাতে ওই মিশ্র রাগের একটা নিজস্ব আবহাওয়া গড়ে ওঠে।

ললিতাগৌরী সায়ংকালীন রাগ। এর জাতি সম্পূর্ণ। ললিতের সঙ্গে এর রূপের সাদৃশ্য থাকলেও উত্তরণে ন ঋ র পরিবর্তে সুর থেকে কোমল ঋষভে যাওয়ার রীতি। আর অবরোহণে পঞ্চম লাগছে। গৌতম এই রাগের রূপায়ণে যান্ত্রিক প্রয়োগ কুশলতা দেখিয়েছেন। তানে রসাভাব। পরবর্তী খেয়াল দেবশাখ—মামুলী। পিলুঠুমরী নিষ্প্রাণ। অবিশ্যি একটা কথা, লছমন খাঁর সারেঙ্গী সম্ভবত এ'র মেজাজ নষ্ট হওয়ার একটা কারণ।

হাফিজ আমেদের প্রোগ্রাম ছিল দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ অধিবেশনে। একটি অনুষ্ঠানে ইনি গাইলেন দরবারী ও সাহানা। দরবারী কানাড়া, মালকোষ, মেঘ, শ্রী ইত্যাদি বেশ কিছু রাগ আছে, যাতে চপলতার অবকাশ নেই। এই সব রাগের প্রকাশে কোনো চটুল ছন্দ, কিংবা ত্বরিতগতিকে আশ্রয় করলে রাগের চরিত্রহানি ঘটে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে হাফিজ সাহেব যেভাবে মধ্যসপ্তকের ক্ষিপ্র চড়াই-উতরাই শেষ ক'রে তারার সুরে পৌঁছলেন, তাতে দরবারীর মত রাগের রস গাঢ় হতে পারেনি। আরো স্থৈর্য চাই। আরো প্রশান্ত বিলম্বিত।

স্থানীয় শিল্পীরা অনেকে গেয়েছেন। শৈলেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা মুখো-পাধ্যায়ের খেয়াল (বিশেষত ঠুমরী) উপভোগ্য হয়েছে। শিবকুমার চট্টোপাধ্যায়ের খেয়াল চলন সই। তাঁর গাওয়া নিধুবাবুর টপ্পা বেশ লেগেছে। সুনন্দা পট্টনায়েক দুই দশকের গাইয়ে। শুধু সময়ই শিল্পীকে পরিণতি দেয় না। সুসমঞ্জস সাধনাও প্রয়োজন। সুনন্দাদেবীর সুবর্ণমুখী শুনতে শুনতে বারবার একথা মনে হচ্ছিল। রাগটি যতদূর শুনেছি (আমার ভুলও হতে পারে) শিল্পীর নিজের সৃষ্ট। নন্দ, দেশ, আরো অনেকগুলি রাগের সংগে এর সাদৃশ্য। আমার ইচ্ছে ছিল শিল্পীর সংগে সাক্ষাৎ ক'রে এই রাগের রূপ, ধীম এবং থাট

ওস্তাদ আলী আকবর

সম্পূর্ণে। এর আরোহে রে বর্জিত। খাঁ সাহেবের বাজনায় রাগের বিশ্লেষণ এবং স্বরসমূহের সুবিন্যস্ত চলা-ফেরা চরিত্রের সাযুজ্যে যেমন নতুন সাধকদের পক্ষে শিক্ষণীয় তেমনি আবার এর স্বরগাম্ভীর্য রসোৎসুক শ্রোতার পক্ষে উপভোগ্য।

পদ্মভূষণ ওস্তাদ আলি আকবর খান তানসেন সম্মেলনের দুটি অধিবেশনে বাজিয়েছেন। এঁর বাজানো রাগগুলি ছিল —দরবারী কানাড়া, চন্দ্রনন্দন, মারোয়া মাঝ খামাজ, সুভাবতী। প্রথম রাত্রের মারোয়া ও দ্বিতীয় রাত্রের দরবারী শ্রোতাদের মনের গভীরে দাগ রেখে গেছে। তাঁর সংগে সংগতে ছিলেন যথাক্রমে স্বপন চৌধুরী ও শংকর ঘোষ। মারোয়া রাগে খাঁ সাহেবের নিস্পন্দ তন্ময়তা, কোনো কোনো মুহূর্তে সকলের ভাবলোককে এমন নিবিড় একাত্ম হয়ে উঠেছিল যে, বাজনা থেমে যাবার পরেও প্রেক্ষাগৃহে একটা অবিচল স্তব্ধতা কয়েক সেকেণ্ড পর্যন্ত একটা উচ্ছ্বসিত হর্ষধ্বনির জন্যে প্রতীক্ষা করছিল। তাঁর মাঝখামাজ ও সুভাবতী রাগ দুটি আকাশবাণী থেকে রিলে করা হয়। শেষ অধিবেশনের দরবারী কানাড়া এক সমাহিত শিল্পীর আত্ম-অন্বেষণের মতন লেগেছে। কে কোথায় কার জন্যে কী বাজাচ্ছে এসব কথা এক এক সময় ভুল হয়ে গেছে। সময়ের জোয়ার ভাটা স্থগিত। ব্যক্তি চেতনার বিপণনবোধ আত্মবিস্মৃত। সমস্ত চেতনায় কেবল কয়েকটি তারের আলোড়ন, দরবারী কানাড়া। সব কটি আলোর নিচে কেবল একটিমাত্র উপস্থিতি, আলি আকবর।

তানসেন সংগীত সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ।

নন্দন বিহারী

জীবন যে-রকম

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ২১ ॥

দুখানা ঘর যেন দীপুর কাছে দু'রকম জগৎ। মাধুরীর ঘরটা এলোমেলো, একখানা বড় খাট ছাড়া আর বিশেষ কোনো আসবাব নেই। আলমারি নেই, আলনা নেই,—এ কি রকম সংসার! দেয়ালে একটা আয়না—নীলাঞ্জন জিনিসপত্তর দেখে কিনতে পারে না—এই আয়নাটাতে একটু দূর থেকে দেখলে নিজের মুখকে ঢেউ খেলানো মনে হয়। অমন সুন্দর মুখ মাধুরীর—তবু এ রকম বিশ্রী আয়না কেনার জন্য নীলাঞ্জনকে সে গঞ্জনা দেয়নি। দেয়ালে গাঁথা র‍্যাকেটে অগোছালো ভাবে ঝুলছে জামা কাপড়, একটা নড়বড়ে শেলফে গাদা করা বই পত্র—অধিকাংশই রাজনীতির—খাটের তলায় ঢোকানো দুটি স্যুটকেস। বিছানাটাও একটুও পরিপাটি করে গোছানো নয়—চায়ের কাপ, চিরুনি, স্নানের তোয়ালে—সবই পড়ে থাকে ওর ওপরে, চাদরে মশা-মারা রক্তের দাগ। ঘরের চেহারা দেখলে মনে হয় যেন রেল স্টেশনের ওয়েটিং রুমে অস্থায়ী সংসার পেতেছে মাধুরী—শিগগিরই অন্য কোথাও চলে যাবে।

শুভ্রারও এক ঘরের সংসার, কিন্তু কি সুন্দর গুছোনো। অনেক জিনিসপত্তর—অথচ জবরজং গাদাগাদি হয়ে নেই। ড্রেসিং টেবলের পালিশ কিংবা আয়নাটা ঝকঝকে, আলনায় জামা কাপড় তো বটেই, নিচের র‍্যাকে রতনদা আর শুভ্রার পাঁচ জোড়া জুতো নিখুঁত ভাবে সাজানো। বিছানার ওপর সুজনিটা—আজকাল যাকে সবাই বেড কভার বলে, সেটা কোথাও কুঁচকে যায় নি। স্টিলের আলমারিটা সুদৃঢ় স্থায়িত্ব এবং নিরাপত্তার গ্যারান্টি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দেয়ালে স্বামী-স্ত্রীর এক সঙ্গে বাঁধানো ছবি। দুপুর হলেই শুভ্রা সব কটা জানলা বন্ধ করে রাখে, ঘরে রোদ ঢুকতে দেয় না। একটা জানলার খসখসের পর্দা। আলমারির মাথা থেকে মানি প্ল্যান্টের ডগা চলে গেছে শিলিং পর্যন্ত। শুভ্রার ঘরে ঢুকলেই একটা ঠান্ডা মোলায়েম ভাব আসে।—এ ঘরে ঢুকলেই মনে হয়, এ ঘরের মানুষ জীবনের সারমর্ম জেনে গেছে। এখানে কোনো ব্যস্ততা নেই।

দীপুর মনে পড়লো, গিরিডিতে ও শিউনন্দন মিশ্র নামে এক ভদ্রলোকের ঘর দেখেছিল। মিশ্রজী নিজের বাড়িতে ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য অবৈতনিক স্কুল করেছেন, সারাদিন ঐ নিয়ে থাকেন। সন্ধেবেলায় প্রত্যেকদিন বাগানে বসে গীতার ব্যাখ্যা শোনান—জনা পনেরো লোক ওঁকে ঘিরে থাকে। ঐ দুটি কাজ নিয়েই মিশ্রজী জীবনটা কাটিয়ে দিতে চান—স্ত্রী পুত্র কন্যা নেই, সংসারের আর কোনো বন্ধন নেই। মাইকা মাইনসের ওভারসীয়ার অলোকবাবু দীপুকে নিয়ে গিয়েছিল মিশ্রজীর কাছে। তখন প্রায় সন্ধে হয়ে এসেছে, মিশ্রজী তন্ময় হয়ে গীতার একাদশ অধ্যায় থেকে পড়ছেন। দীপু কিছুক্ষণ বসে শুনলো। গীতার ব্যাখ্যা শুনে সে কোনো আমোদ পেল না, কোনো নতুন উপলব্ধি হলো না, এমনকি এ কথাও একবার মনে হলো, এ আর নতুন কথা কি। এ তো জানাই—। তবে, মিশ্রজীর গলার আওয়াজটা তার খুব পছন্দ হয়েছিল। কারুর কারুর গলার আওয়াজ শুনেই বোঝা যায়, মানুষটি খুব সৎ। মিশ্রজী সম্পর্কেও তার সে কথা মনে হয়েছিল।

খানিকটা বাদে মিশ্রজী ওদের নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন। বাড়িটার গোটা একতলায় স্কুল বসে, দোতলায় একখানা মাত্র ঘর, সেখানে মিশ্রজী থাকেন। ঘরখানা দেখে দীপু মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। ঘরখানার দেয়াল ধপধপে সাদা, মাঝখানে একটা খাটিয়া পাতা, তার ওপর একটি শুধু সাদা চাদর—তোষক টোষক কিছু নেই, বালিশ নেই। এবং ঘরখানার আর কিছু নেই। দেয়ালে কোনো ছবি না, কোনো আসবাব না। শুধু শোওয়ার জন্য একটা খাট আর সীমানার জন্য চারটে দেয়াল। মিশ্রজীর অন্য ব্যবহার্য টুকিটাকি জিনিস সিঁড়ির পাশে একটা জায়গায় রাখা আছে, দীপু লক্ষ্য করেছিল, কিন্তু ঐ ঘরখানার নগ্ন শুভ্রতা দেখে সে অভিভূত না হয়ে পারে নি। দীপু জিজ্ঞেস করেছিল, আপনি রাত্রে এই ঘরে থাকেন? মিশ্রজী বলেছিলেন, হ্যাঁ। কেন? দীপু বলেছিল, কিছু না, এমনি। দীপুর মনে হয়েছিল, ঐটা একজন সত্যিকারের গৃহী-সন্ন্যাসীর ঘর। ও-রকম ঘরে থাকলে মনটা পরিষ্কার হয়ে যায়। আকস্মিকভাবে তার একথাও মনে হয়েছিল, হো চি মিন বোধহয় এ রকম একটা ঘরে থাকেন। দীপু কোনোদিন অবৈতনিক স্কুল চালাতে পারবে না, বিকেলবেলা বাগানে বসে গীতার ব্যাখ্যা শোনাতে পারবে না, কিন্তু মিশ্রজীর মতন ঐ রকম একটা ঘরে থাকার খুব লোভ হয়েছিল তার।

এক এক সময় দীপুর সেই ঘরটার কথা মনে পড়ে। তখন ভাবে, জীবনে অনেক কিছুই আমি পাবো না, তার মধ্যে ঐ রকম একটা ঘরে শোওয়ার সুযোগও কখনো পাবো না। কখনো ইচ্ছে হয় বটে, নিজের ঘরখানায় ঐ রকম ব্যবস্থা করে নিলেই তো হয়। কিন্তু অত সহজ নয়। তার জন্য অনেক প্রস্তুতি দরকার।

দীপুর বুকের গেঞ্জি সরিয়ে শুভ্রা সেখানে ঠোঁট ঘষছে। সেই আসবাবে ঠাসা আধো-অন্ধকার নরম মোলায়েম আবহাওয়ার ঘর। মাধুরী এখন বাথরুমে।

শুভ্রার তুলনায় দীপু অনেক লম্বা। শুভ্রার মাথা দীপুর থুতনিও ছোঁয় না। দীপু আঙুল দিয়ে শুভ্রার মুখটা উঁচু করে জিজ্ঞেস করলো, শুভ্রা, তুই আমার সঙ্গে এ রকম করছিস কেন?

—কি রকম?

—এই যে, তুই আমাকে আবার লোভ দেখাচ্ছিস!

—দীপু, আজ হঠাৎ অনেকদিন আগের কথা মনে পড়ছে। সেই যখন তুই,—তোর তখন সবে গোঁপ উঠেছে—

দীপু শুভ্রার ঠোঁটের ওপর আঙুল বোলাতে বোলাতে বললো, তুই জোর করে

আমাকে চুমু খেয়েছিল। তার আগে কারুর মুখে মুখ দেওয়া তো দূরে থাক, কারুর এ'টো খাওয়ার কথা ভাবলেই গা গুলিয়ে বমি করতো। একবার ভুল করে কাকার খাওয়া জলের গেলাসে—

—দীপু—

—আজও আমার খুব ইচ্ছে করছে—

—দীপু—

শুভ্রার ঠোঁটে আঙুল রেখেই দীপু বললো, না, রতনদা'র এ'টো—

—দীপু, তোর জন্য এখনও আমি—

—জানিস, শান্তাকে এখনো আমি চুমু খাইনি একবারও—

—ছেলেদের বুঝি এ'টো হয় না?

—শান্তাকে...তার কারণ, রমেনদা একদিন...

হঠাৎ দীপুর সারা শরীর ঝাঁ ঝাঁ করে উঠলো। রমেনদার প্রতি একটা অসম্ভব রাগ চড়াৎ করে ঝলসে উঠলো। চোখ দুটো খরসান। এতদিন রমেনদার ব্যাপারটা সে যুক্তি দিয়ে মেনে নেবার চেষ্টা করছিল—এখন ভেসে গেল সব যুক্তি টুক্তি, ইচ্ছে হলো এক্ষুনি রমেনদার কাছে ছুটে যায়। গিয়ে, রমেনদার টুঁটি টিপে ধরে। দীপুর মনে হলো, সত্যিই যেন রমেনদা তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, মুখে সেই রকম বিগলিত হাসি। ঠিক আছে, ঐ হাসি আমি মুছে দেব।

শুভ্রার আলিঙ্গন ছাড়াবার চেষ্টা করে বললো ছাড় আমার এসব ভালো লাগে না।

উত্তেজনায় ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে শুভ্রার, বুকটা উঠছে নামছে। ভেজা ভেজা দুটি ঠোঁট, চোখ দুটোও ভেজা, ফিসফিস করে খানিকটা কাতরভাবে জিজ্ঞেস করলো, আমাকে আর তোর ভালো লাগে না?

দীপু এ প্রশ্নের উত্তর দিতে চায় না। একজন মানুষকে ভালো লাগে না—এ কথা আমার বলা যায় না কি? তা ছাড়া, শুভ্রাকে তার ভালো না লাগবেই বা কেন? মানুষকে ভালো না-লাগা পাপ। কিন্তু শুভ্রাকে এক কথায় কি উত্তর দেবে? শুভ্রা অন্যরকম ভালো লাগার কথা বলছে। এখনও তার শরীর ছুঁয়ে আছে শুভ্রার শরীর, স্পষ্ট উত্তাপ। দীপু বললো, চল আমরা ও ঘরে গিয়ে বসি।

—না, তোকে একথার উত্তর দিতেই হবে। কেন তুই আজকাল আমায়—

—শুভ্রা, শোন্—

—দীপু—

—ধাৎ তেরিকা! না, আমার ভালো লাগে না এইসব। বউদি বাথরুমে রয়েছে এই ফাঁকে একটু......এ রকম চোরের মতন ভাব ভঙ্গী আমার আমার বিশ্রী লাগে—দেয়ালে রতনদার ছবি—আর তার বউয়ের সঙ্গে...আমি এসব অত্যন্ত অপছন্দ করি—

শুভ্রা দীপুর কাছ থেকে দূরে সরে গেল। বিছানার ওপরে কল্পিত ধুলো ঝাড়ার ভঙ্গি করে খুব ম্লান গলায় বললো, আমি জানি তোর জন্য সারাজীবন আমাকে দুঃখ পেতে হবে। আমি একবার অন্যায় করেছিলাম—

—অন্যায় আবার কি?

—সে যাই হোক, তুই এটা জেনে রাখিস, আমি কোনোদিন শান্তাকে হিংসে করবো না। আমার ইচ্ছে করে ওর সঙ্গে ভাব করতে, ওকে নিজের হাতে সাজাতে। তুই তোর রতনদাকে হিংসে করিস বলে আমিও যে শান্তাকে—

—হিংসে? রতনদাকে আমি হিংসে করবো কেন? মাথা খারাপ হয়েছে নাকি তোর?

—নিশ্চয়ই তুই হিংসে করিস! তুই প্রত্যেক কথায়—

—ধুস্! তোরা মেয়েরা খালি বুঝিস ভালোবাসা কিংবা হিংসে—এই ধরনের ছোট ছোট জিনিসগুলো। আরও যে অনেক ব্যাপার থাকতে পারে—এ ঘরে তোর সঙ্গে ঐ সব করলে যে রতনদার প্রতি অন্যায় করা হয় সেটা আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না। এর মধ্যে হিংসের কথা কোথা থেকে এলো? মেয়েদের মত সব—

—মেয়েরা শুধু হিংসে করে? শান্তাও বুঝি কারুকে হিংসে করে।

—শান্তা? শান্তা যদি অন্য সাধারণ মেয়ের মতন হতো, তা হলে আমি ওর সঙ্গে একদিনও মিশতাম না।

—ইস্—সৃ, শান্তা একেবারে অসাধারণ মেয়ে! দুটো হাত না চারটে হাত?

—বাঃ বাঃ, এই যে বললি শান্তাকে তুই হিংসে করিস না?

—করি না ই তো!

মাধুরী স্নান করে বেরিয়েছে, এখন শুভ্রা গেছে বাথরুমে। দীপু এ ঘরে চলে এসেছে। সেই টেবিল তোলা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে মাধুরী, খাটের ওপর থেকে ভিজে তোয়ালেটা সরিয়ে দীপু বসেছে সেখানে।

চিরুনি থেকে কয়েক গাছা চুল ছাড়িয়ে মাধুরী বললো, ইস্, দেখেছো দীপু, আমার কি রকম চুল উঠে যাচ্ছে!

—উঃ, ক! তোমার এত চুল, দু এক গোছা উঠে গেলে কোনো ক্ষতি হবে না।

—মোটেই আমার এখন বেশী চুল না। এক সময় ছিল অবশ্য। ওঠা চুলগুলোকে পাকিয়ে একটা গিঁট বাঁধলো, তারপর তাতে একটু থুতু দিয়ে জানলা গলিয়ে ফেলে দিল মাধুরী।

দীপু হেসে বললো, বউদি, তোমার তো বেশ কুসংস্কার আছে।

—কেন? কিসে দেখলে?

—ঐ যে চুলে থুতু দিলে?

—ওমা, তুমি কিছু জানো না। চুলে থুতু দিয়ে না ফেললে, চুল উড়ে উড়ে বেড়ায়, খাওয়ার সময় পাতে এসে পড়ে।

—সত্যি তো, এটা তো জানতাম না।

—দীপু, তুমি খেয়ে আসো নি নিশ্চয়ই? আমাদের সঙ্গে খেয়ে যাও।

—কি রান্না করেছো আজ?

—এই ক'দিন তো শুভ্রা আর আমি এক সঙ্গেই রান্না করছি। আজ বোধহয় পাবদা মাছ এনেছেন রতনদা।

—পাবদা মাছ?

পাবদা মাছের নাম শুনেই দীপুর মাথার মধ্যে রিনরিন করে উঠলো। কি যেন একটা মনে পড়ার কথা। এই মাছের সঙ্গেই কি যেন একটা ঘটনা...ও হ্যাঁ! দীপুর মনে পড়ে গেল। চাইবাসায় দুপুরবেলা পাবদা মাছ দিয়ে ভাত খাওয়ার সময় বাবার অসুখের টেলিগ্রামটা এসেছিল। বাবা মারা গেলে দীপু বেশ কয়েকদিন মাছ খেতে পারে না ভেবে অরূপ নিজের মাছ দীপুর পাতে তুলে দিয়েছিল। পরমেশ কি করছে এখন? একটাও চিঠি লেখা হয়নি ওকে। অরূপের সঙ্গেও দেখা নেই অনেকদিন—অরূপ তাকে চাকরি দিতে চেয়েছিল!

দীপু হেসে বললো, পাবদা মাছ অবশ্য আমি তেমন ভালোবাসি না। কি রকম ভ্যাতভেতে। তা যাই হোক—

এই সামান্য সময়ের ব্যবধানে মাধুরীও একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। সিঁথিতে সিঁদুর লাগাতে লাগাতে আয়নায় নিজের মুখের দিকেই তাকিয়ে সে আত্মবিস্মৃত ভাবে বললো, আচ্ছা, তিনদিন না খেয়ে থাকলে মানুষের খুব কষ্ট হয়?

—কি জানি! আমি তো কখনো পুরো একটা দিনও না খেয়ে থাকিনি। তবে মহাত্মা গান্ধী তো মাঝে মাঝে...ও, তুমি দাদার কথা ভাবছো? দাদা তো আগে প্রায়ই রাগ করে একদিন দেড়দিন না

খেয়ে...দাদা খুব ... তাছাড়া, ...

দাদাদের অনশন তো শেষ হয়ে গেছে!

—শেষ হয়ে গেছে? যাঃ! তুমি কি করে জানলে?

—আমি জানি! বাঃ, তোমরা আজ সকাল ন'টায় রেডিও'র খবর শোনো নি? তাতে শুনলাম, দাদার নাম পর্যন্ত বলেছে।

—সকাল ন'টায় আবার খবর বলে নাকি?

—কিছুই জানো না! স্বামী জেলে গেছে, মন দিয়ে যে একটু রেডিও শুনবে—

এ সব মিথ্যে কথা বলার সময় দীপুর মুখের একটি রেখাও বদলায় না। সারল্য ও বিস্ময় বেশ সুন্দর খেলাতে জানে। অবশ্য মাধুরীকে বিশ্বাস করানোর জন্য খুব নিপুণ অভিনয়েরও দরকার হয় না।

দীপু বললো, দাঁড়াও, দাদা এখন ঠিক এই মুহূর্তে কি করছে, তোমাকে বলে দিচ্ছি।

—কি করে বলবে?

—তুমি বুঝি জানো না, আমি অনেক দূরের জিনিস দেখতে পাই? অনেক জন্ম আগে আমার নাম ছিল সঞ্জয়, আমি বহু দূর থেকে বসে কুরুক্ষেত্রর গোটা যুদ্ধ দেখে দেখে ধৃতরাষ্ট্রকে শুনিয়েছিলাম।

—আচ্ছা হয়েছে, হয়েছে। তোমাকে আর পাকামি করতে হবে না।

দীপু ম্যাজিসিয়ানদের মতন হাতের ভঙ্গি করে তীব্র চোখে আয়নার দিকে তাকালো। তারপর বললো, শোনো বলছি, দাদা এখন কি করছে। এই তো দেখা যাচ্ছে, বেশ বড় ঘর, যথেষ্ট আলো হাওয়া আছে, দেয়ালগুলো ধপধপে সাদা, ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা খাটিয়া—তাতে একখানা সাদা চাদর পাতা—আর কোনো কিছুই নেই সে ঘরে...সিনেমায় যে-রকম জেলখানার ছবি দ্যাখো আসলে কিন্তু সে রকম ভয়ানক কিছু নয়, বেশ ভালো ব্যবস্থা। পলিটিকাল প্রিজনারদের তো যথেষ্ট আরামে রাখে—দাদা খাটে শুয়ে আছে, চোখ বোজা, কিন্তু ঘুমোয় নি, কিছু ভাবছে, কারুর কথা ভাবছে খুব মন দিয়ে —বউদি, তুমি আজ ক'বার জিভ কামড়েছো?

মাধুরী মনের ভাব একদম লুকোতে জানে না। ধরা পড়ে যাওয়া লাজুক হাসির আভা ছড়িয়ে পড়লো তার মুখে। হাসতে হাসতে বললো, কেন, জিভ কামড়ালে কি হয়?

—হঠাৎ জিভ কামড়ালে বোঝা যায়, কেউ তার কথা খুব বেশী ভাবছে। দ্যাখো, ধরে ফেলেছি কি না, তোমার আজ এ-রকম—

—আহা, এটা বুঝি কু-সংস্কার নয়?

—কু নয়, এমনি সংস্কার বলতে খারাপ নয়। দাদা আজ বিকেলেই কিংবা কাল ছাড়া পাবে।

—থাক্, আর বেশী বেশী—

দীপু তখন চট্ করে ভেবে নিচ্ছে যে, শেষ পর্যন্ত অরূপের বাবার কাছেই যেতে হবে। অরূপের বাবা দারুণ ইনফ্লুয়েনশিয়াল লোক, উঁচু মহলের অনেকের সঙ্গে চেনাশুনো, পুলিশেও নিশ্চয়ই—ওর থ্রু দিয়েই দাদার খবরটা—

মুখে বললো, দেখো, আমার কথা মেলে কি না। কাল রাত্তিরের মধ্যে যদি ছাড়া না পায়—

মাধুরী বললো, আমি এমন কিছু ভেঙে পড়িনি যে ছেলেমানুষের মতন আমাকে সান্ত্বনা দিতে হবে।

মুখে ক্রিম মাখতে মাখতে শুভ্রা ঘরে ঢুকে বললো, মাধুরী, তোর দ্যাওরকে আমাদের সঙ্গে খেতে বলবি নাকি?

—বলার আগেই রাজী হয়ে গেছে!

শুভ্রা দীপুর দিকে আলগাভাবে তাকিয়ে বললো, রান্না অবশ্য বিশেষ কিছু হয়নি। তোমার হয়তো ভালো লাগবে না।

দীপু মুখ টিপে হাসলো। লোকের সামনে শুভ্র আজকাল তাকে কখনো আপনি কখনো তুমি বলে গুলিয়ে ফেলছে। হাসতেই হাসতেই দীপু বললো, শুভ্রাদি, আপনার হাতের রান্না ডাঁটার চচ্চড়িও আমার ভালো লাগে।

খেতে বসে শুভ্রা বেশ গম্ভীর। বিশেষ কথা বললো না। খাওয়ার পরই মাথা ধরার কথা বলে শুতে চলে গেল। দীপু আরও কিছুক্ষণ বসে গল্প করলো মাধুরীর সঙ্গে, জব্বলপুরের গল্প, দাদার ছেলেবেলার গল্প—এমনকি তার মায়ের মৃত্যুর গল্পও আর একটু হলে বলে ফেলছিল।

চোখ ভারী হয়ে এসেছে মাধুরীর, কিন্তু কিছুতেই ঘুম পাওয়ার কথা স্বীকার করবে না। দীপু যতবার উঠতে চায়, তার হাত ধরে জোর করে বসায়। তবু এক সময় দীপু উঠে পড়লো। বললো, বউদি, তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও, আমি আবার হয়তো সন্ধেবেলা আসবো। তুমি দরজা বন্ধ করে দাও।

মাধুরী নিজের দরজা বন্ধ করে দেবার পর দীপু বাইরে দু' এক মুহূর্ত দাঁড়ালো। তারপর কি ভেবে পা টিপে টিপে এলো শুভ্রার বন্ধ দরজার সামনে। ভেজানো, ঠেলতেই খুলে গেল। নিঃশব্দে এসে দীপু দাঁড়ালো শুভ্রার শিয়রের কাছে।

ঘুমিয়ে পড়েছে শুভ্রা, হয়তো সত্যিই তার মাথা ধরেছিল, মুখে একটা অস্বস্তির ছাপ। দীপু খাটের ওপর বসলো, মচ করে একটা শব্দ হলো, তবু শুভ্রার ঘুম ভাঙলো না। বাঁ দিকে পাশ ফিরে শুয়ে স্বাস্থ্যের আভা, মনে হয় এই শরীর ঘুমকে খুব উপভোগ করে।

দীপু আলতো করে তার কপালে হাত রেখে ফিস ফিস করে ডাকলো, শুভ্রা, শুভ্রা—

তিন ডাকে চোখ মেললো। খানিকটা অবাক, কিন্তু ধড়মড় করে উঠে বসলো না। চোখ দুটো বড় বড় করে বললো, কি?

—শুভ্রা, তোকে আমার খুব ভালো লাগে। তুই আমার ওপর রাগ করেছিস? এক সময় তোতে আমাতে এত ভাব ছিল, এখন সেটা নষ্ট হয়ে যাবে কেন?

—দীপু—

—শোন, তোর ওপর আমার কোনো রাগ নেই। রতনদাকে আমি হিংসে করি না। পৃথিবীর কারুকেই আমি হিংসে করি না। আমি যদি তোকে কোনো কষ্ট দিয়ে থাকি—

শুভ্রা দীপুর হাতটা মুঠো করে ধরে বললো, দীপু, তোকে আমার খুব কাছে পেতে ইচ্ছে করে। তুই আমার পাশে শুয়ে পড় না! দুজনে শুয়ে শুয়ে গল্প করি। মাধুরী ঘুমিয়েছে?

দীপু খাট থেকে উঠে দাঁড়ালো। কাতর অনুনয়ের মতন বললো, শুভ্রা, আমি শান্তাকে সত্যি ভালোবাসি। বিশ্বাস কর, অসম্ভব ভালোবাসি। শান্তা ছাড়া অন্য কোনো মেয়ের কথা আমি এখন ভাবতেই পারি না! তুই ঘুমো, আমি যাই—

[ক্রমশ]

এবং তার উপর আন্তর্জাতিক মুদ্রা রিজার্ভের ভারসাম্য বজায় রাখার দায়িত্ব অর্পণ করা যেতে পারে। কিন্তু সদস্য-দেশগুলি বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময় হার নির্ধারণ করার নিজস্ব অধিকার আন্তর্জাতিক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হাতে সমর্পণ করতে রাজী হবে তা মনে হয় না। আবার অনেকে মনে করেন, সোনার আন্তর্জাতিক দাম বাড়িয়ে অথবা বিকল্প-ভাবে ডলারের আন্তর্জাতিক মূল্য হ্রাস করে আন্তর্জাতিক মুদ্রা সংকটের সমাধান করার চেষ্টা করা যেতে পারে; কিন্তু সেক্ষেত্রেও অনেক বাস্তব অসুবিধা আছে। বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ জাতীয় ব্যবস্থায় রাজী নাও হতে পারে। তাই আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারকেই অনেকটা আন্তর্জাতিক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ন্যায় কাজ করে আন্তর্জাতিক মুদ্রা সংকট দূর করার চেষ্টা করা উচিত। Special Drawing Rights-এর ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে একটি ভাল ব্যবস্থা। কিন্তু এ ব্যবস্থাই আন্তর্জাতিক মুদ্রা সংকটের বা বৈদেশিক মুদ্রা ঘাটতির প্রতিকার নয়।

সুব্রত গুপ্ত

চাঁদের পাথর কলকাতায়

ডাঃ **নরোজী ৩, ১৯৭০ জানুয়ারি মাসে এক একান্ত সাক্ষাৎকারে ভারতীয় ভূ-পদার্থ-বিজ্ঞানী ডাঃ কে গোপালন বলেন, 'চাঁদের বয়স সাড়ে চারশ কোটি বছর বলে যে সংবাদ প্রচারিত হয়েছে সেটা হয়ত ঠিক নয়। চাঁদ সম্পর্কে আমাদের সমস্ত জ্ঞান যেখান থেকে কুড়িয়ে আনা কয়েক টুকরো পাথরের মধ্যে পুরোপুরির বিশেষ রয়েছে এমন ধারণা নিতান্তই অবিজ্ঞান-সম্মত। যে বয়সের কথা আমরা বলেছি সেটা চাঁদের নয়, চাঁদ থেকে কুড়িয়ে আনা কোন কোন পাথরের টুকরোর বয়স।'**

ইংরেজী নবেম্বরের প্রথম দিনে বিকেল পাঁচটায় কলকাতার ইডেন উদ্যানের ইনডোর স্টেডিয়ামে অ্যাপলো-১২র নভোচরদের নিয়ে আসা চাঁদের এক টুকরো পাথরের সার্বজনীন প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করা হয়েছিল এক সপ্তাহের জন্যে। প্রথম দিনের দর্শকের তালিকায় ছিলেন বিজ্ঞানী, বিশেষ অতিথি, লেখক এবং সাংবাদিক। পরবর্তী কয়েক দিনে হাজার হাজার দর্শকের ভিড়। ভেতরে ঢুকতে প্রথমেই চোখে পড়ল ভারতীয় কুম্ভকারীর হাতে তৈরী সেই বহু কথিত লুনার মডুল বা চাঁদের ভেলার একটি প্রমাণ সাইজের মডেল।

তার পাশেই একটি কক্ষ। রঙীন কাপড়ে মোড়া। আলো-আঁধার। রুদ্ধশ্বাসে আমরা ভেতরের দিকে এগিয়ে গেলাম। ঠিক মাঝখানে একটি বিশেষ মঞ্চের উপর বসান রয়েছে প্লাস্টিকের তৈরি একটি আধার। তার মধ্যে প্লাটিনাম-রঙের একটি ধাতব ধারকের উপর বসান চাঁদের পাথর। হ্যাঁ, আরমস্ট্রং-অলড্রিনের নিয়ে আসা বহু টুকরো পাথরের একটি অংশ। মার্কিন দেশের বাইরে বিভিন্ন দেশে যে ছয়টি পাথর সর্বসাধারণের প্রদর্শনীর জন্যে পাঠানো হয়েছে, এটি তারই একটি। যে প্লাস্টিকের আধারটির মধ্যে পাথরটিকে রাখা হয়েছে সেটি নাইট্রোজেন গ্যাসে পূর্ণ। সাধারণ বাতাসের অক্সিজেন বা জলীয় বাষ্প প্রভৃতি যাতে পাথরটির উপর কোন প্রতিক্রিয়া ঘটাতে না পারে, তার জন্যেই রাসায়নিক-নিষ্ক্রিয় নাইট্রোজেন আবহাওয়ার মধ্যে একে রাখা। মৃদু আলোয় এর রঙ ধূসর। কিছুটা কালচে। বাইরের তলটা দেখে মনে হল যেন খানিকটা পালিশ করা হয়েছে। বেশ মসৃণ। বিজ্ঞানীদের বক্তব্য, পৃথিবীর ভূস্তরে বায়ুপ্রবাহ বা জল এবং বৃষ্টির দরুন নিয়ত যে অবক্ষয় ঘটে থাকে, ঠিক তেমন ধরনের অবক্ষয় চাঁদের ভূত্বকে ঘটার সম্ভাবনা অবশ্য নেই। তবে কোটি কোটি বছর ধরে তার বুকের উপর দিয়ে পারমাণবিক কণিকা অথবা উল্কাণুর নিয়ত প্রবাহ যে মৃদু ঘর্ষণ সৃষ্টি করে চলেছে তার ফলে তার ভূত্বকের উপর বেশ কিছুটা অবক্ষয় ঘটে গেছে। চন্দ্র শিলার মসৃণতার এটাই অন্যতম কারণ।

চাঁদ থেকে নিয়ে আসা পাথর বা ধূলিকণা সম্পর্কে আরও অনেক কথা জানিয়েছেন ডাঃ গোপালন। একত্রিশ বছর বয়স্ক তরুণ এই বিজ্ঞানী বাঙ্গালোরের ভারতীয় বিজ্ঞানাগারের ডক্টরেট। ডক্টরেটের বিষয় ভূ-রাসায়ন বিজ্ঞান। ১৯৬৬ থেকে এ পর্যন্ত উনি লস-অ্যাঞ্জেলেসের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূ-পদার্থ বিজ্ঞানের গবেষকরূপে কাজ করেছেন। যে সমস্ত আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানী চন্দ্রশিলার উপর

চাঁদের পাথর কলকাতায়

চাঁদের পাথর দেখছেন বাঁ দিক থেকে: মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়, উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু, রাজ্যপাল শ্রী এস এস ধাবন, কলকাতার মার্কিন কন্সাল জেনারেল মিঃ গর্ডন এবং শ্রীমতী রাজ্যপাল

গবেষণার জন্যে মনোনীত হন, ডঃ গোপালন তাঁদের একজন। চান্দ্রশিলার এই প্রদর্শনী উপলক্ষে তিনি ভারতে এসেছেন এবং এর উপর কলকাতা এবং খড়্গপুরে অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের অধিবেশনে বক্তৃতা করেন। ডঃ গোপালনের সঙ্গে আমার একান্ত সাক্ষাৎকার এখানে উদ্ধৃত করছি :

প্রশ্ন : ডঃ গোপালন, সম্প্রতি হিউস্টন থেকে প্রচারিত একটি ইস্তাহারে বলা হয়েছে, অ্যাপলো-১১র নভোচরেরা তাঁদের তন্দ্রাসাগর থেকে যে পাথর কুড়িয়ে আনেন তাদের মধ্যে বেশ কিছু পরিমাণ আগ্নেয় শিলা পাওয়া গেছে। আর সেই আগ্নেয় শিলার সঙ্গে পৃথিবীর ভূ-স্তরের আগ্নেয় শিলার যথেষ্ট মিল রয়েছে। প্রশ্নটা লক্ষ্য করুন। ওঁরা বলছেন, 'যথেষ্ট মিল'। তার মানে এই দাঁড়াচ্ছে, পুরোপুরি মিল খুঁজে পাওয়া যায়নি। কতটা মিল এবং পার্থক্যই বা কতটা, এ সম্পর্কে আপনার কি অভিমত?

ডঃ গোপালন: চাঁদ থেকে নিয়ে আসা এক ধরনের আগ্নেয় শিলার উপর আমি নিজে পরীক্ষা চালিয়েছিলাম, যাকে আমাদের পৃথিবীর 'বেসল্ট' শ্রেণীর পাথরেরই পর্যায়ভুক্ত বলা চলে। উভয় শিলারই গঠন প্রকৃতি প্রায় এক। বেসল্টের মত চাঁদের ঐ পাথরের মধ্যেও টাইটানিয়াম, ক্রোমিয়াম, ইট্রিয়াম এবং জারকোনিয়াম পাওয়া গেছে। কিন্তু সব চাইতে আশ্চর্যের ব্যাপার, পৃথিবীতে পাওয়া ঠিক ঐ ধরনের শিলার মধ্যে সব চাইতে বেশী যতটা পরিমাণ ক্রোমিয়াম পাওয়া যায়, চাঁদের শিলার মধ্যে সে তুলনায় ক্রোমিয়ামের পরিমাণ প্রায় দশ গুণ বেশী। চাঁদের কেলাসিত আগ্নেয় শিলার মধ্যে অনেক বেশী পরিমাণ অর্থাৎ শতকরা বারো ভাগের মত টাইটানিয়াম অক্সাইড পাওয়া গেছে। কিন্তু পৃথিবীতে পাওয়া অনুরূপ আগ্নেয় শিলার মধ্যে এই অক্সাইডটির সর্বোচ্চ পরিমাণ এ পর্যন্ত কখনই শতকরা সাড়ে চার ভাগের বেশী আমাদের চোখে পড়েনি। আরও একটি কথা। চাঁদের আগ্নেয় শিলার মধ্যে সবচাইতে বেশী শুধু সেই সমস্ত পদার্থ চোখে পড়েছে যাদের গলনাঙ্ক অনেক বেশী। কম তাপমাত্রায় গলে, যেমন সিসে, বিসমাথ, সোডিয়াম এবং পটাসিয়াম নেই বললেই চলে। অথচ পৃথিবীর পাথরে এদের প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

প্রশ্ন : এতে করে আপনার কি এই মনে হয়েছে যে, চাঁদ এবং পৃথিবীর ভূ-ত্বকের গঠনের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে?

ডঃ গোপালন : [illegible] রয়েছে, তাতে

ডঃ কে গোপালন

বিস্ময়ের কোন কারণ নেই। কারণ সেখানকার ভূ-স্তরের মধ্যে একটি অদ্ভুত ব্যাপার আমাদের অনেকেরই চোখে পড়েছে। পৃথিবীর কথা একবার ভাবুন। হ্যাঁ, আমি সেই পৃথিবীর কথা বলছি যখন পুরোপুরি সে একটি গলন্ত অগ্নিপিণ্ডের মত বিরাজ করছিল। ধীরে ধীরে গলন্ত পিণ্ডটি ঠাণ্ডা হতে শুরু করল। এবং সেই সময় তার বেশীর ভাগ ভারী পদার্থগুলিই ভূ-স্তরের উপর থেকে নীচে নেমে যেতে লাগল। পরিবর্তে হাল্কা পদার্থগুলি স্তরের উপরের অংশে ভেসে উঠল। লক্ষ্য করুন, পৃথিবীর উপরিভাগে হাল্কা পদার্থের পরিমাণই কিন্তু সবচাইতে বেশী। সিলিকন, অ্যালুমিনিয়াম, পটাসিয়াম, সোডিয়াম প্রভৃতি পদার্থের কথাই আমি বলছি। কিন্তু চাঁদের ভূ-ত্বকের উপরে এই হাল্কা পদার্থগুলির একান্তই অভাব। বরং আপাতত তার উল্টোটাই সেখানে চোখে পড়ছে। হাল্কার পরিবর্তে সেখানে ক্রোমিয়াম প্রভৃতি ভারী পদার্থ চোখে পড়ছে বেশী। এতে করে এই মুহূর্তে দুটি সিদ্ধান্তে আমরা আসতে পারি। এক, গলন্ত অবস্থায় থেকে যে ধরনের তরল পদার্থ ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে জমাট পাথর সৃষ্টি করেছে তার মূলে গঠন প্রকৃতিই পৃথিবীর গলিত তরল পদার্থের থেকে ভিন্ন ছিল। দুই, ঠিক যে পদ্ধতিতে সেখানে গলিত পদার্থ সৃষ্টি হয়েছিল ঠিক সেই পদ্ধতিতে পৃথিবীর গলিত পদার্থ সৃষ্ট হয়নি। অবশ্য যে পাথরের টুকরোগুলি আমি পরীক্ষা করেছি তারা যদি চাঁদের নিজস্ব অংশ বলে পরিগণিত হয়।

প্রশ্ন : আপনার এই দুই নম্বর অভিমতটি আরও একটু পরিষ্কার করুন, ডঃ গোপালন।

ডঃ গোপালন : আপনি নিশ্চয় আমার শেষের মন্তব্যটি লক্ষ্য করেছেন, মিঃ কর। আমার বক্তব্য, যে পাথরগুলির কথা আমি বলছি, তারা যে আগ্নেয় শিলা সে ব্যাপারে আমরা একমত। পৃথিবী তার উত্তপ্ত গলন্ত অবস্থা থেকে শীতল হয়ে জমাট বেঁধে যে পাথর তৈরী করেছিল, তারই নাম আগ্নেয় শিলা। চাঁদের পাথর, অর্থাৎ যে পাথর অ্যাপলো-১১র নভোচরেরা নিয়ে এসেছেন, সেগুলিও যে একদিন ঐ একইভাবে সৃষ্টি হয়েছিল সে সম্বন্ধে আমাদের কোন দ্বিমত নেই। এখন আমাদের সামনে দুটি প্রশ্ন এসে দাঁড়িয়েছে। এক, পৃথিবীর বুকে ঠিক যে পদ্ধতিতে আগ্নেয় শিলা তৈরী হয়েছিল, চাঁদের বুকেও ঠিক ঐ একই-ভাবে ঐ শিলা তৈরী হয়েছে। অর্থাৎ গলন্ত চাঁদ ক্রমে ঠাণ্ডা হয়ে তৈরি করেছে তার আগ্নেয় শিলা; যে শিলাখণ্ডগুলি আমি পরীক্ষা করছি, অবশ্য তাদের কথাই আমি বলছি। আবার এমনও হতে পারে চাঁদের মহাকাশ থেকেই একদিন প্রচণ্ড বেগে ছুটে এসে চাঁদের বুকে আঘাত করেছিল অতিকায় কোন উল্কাপিণ্ড। প্রচণ্ড সেই আঘাতের ফলে যে উত্তাপ সৃষ্ট হয়, সেই উত্তাপ চাঁদের ভূ-স্তরকে গলিয়ে ফেলে। উল্কা নিজেও গলে যায়। পরে উল্কা এবং চাঁদের গলিত ভূ-ত্বকের মিশ্রণের ফলেই তৈরি হয়েছে, আমরা যে পাথরের উপর পরীক্ষা চালিয়েছি সেই পাথর। অর্থাৎ আগ্নেয় শিলা। উল্কা মোটামুটিভাবে দু রকমের। স্টোন মেটিওরাইটস বা প্রস্তরবৎ-উল্কা; আইরন মেটিওরাইট বা ভারী ধাতুঘটিত উল্কা। তন্দ্রাসাগর থেকে আনা পাথর এই দ্বিতীয় ধরনের উল্কার মিশ্রণে তৈরী হওয়ায় হয়ত তার মধ্যে ভারী এবং উচ্চ তাপমাত্রায় গলে এমন পদার্থের ভাগ এত বেশী। কম তাপমাত্রায় গলে এমন পদার্থ বাষ্প হয়ে অন্যত্র ছড়িয়ে পড়েছে। এদের ব্যাপারে অবশ্য এখনও পর্যন্ত আমরা কিছুই জানতে পারিনি। যদি সত্যিই এমন কিছু ঘটে থাকে তাহলে এই মুহূর্তে বলা শক্ত, চাঁদের ভূ-তাত্ত্বিক গঠন সম্পর্কে এখনও আমরা অন্ধকারেই পড়ে আছি। কিন্তু এই শিলাখণ্ড যদি চাঁদেরই ভূ-ত্বকের মূল উপাদান হয়, তাহলে ব্যাপারটা আরও জটিল হয়ে পড়বে। বিভিন্ন জায়গা থেকে আরও পাথর, ধুলো প্রভৃতি এনে তবেই বলা যাবে মূল রহস্যটি কোথায়। কেন সেখানকার আগ্নেয় শিলায় অত বেশী টাইটানিয়াম। অথবা সোডিয়াম, সিসে প্রভৃতি অতই বা কম কেন?

প্রশ্ন : হিউস্টনের পর্যবেক্ষকরা একথাও

কলকাতার মানুষ ইডেনে চাঁদের পাথর দেখছেন

বলেছেন, তাঁরা নাকি চাঁদের পাথরের মধ্যে চৌম্বক ধর্মী কণিকার সন্ধান পেয়েছেন। তেমন কোন কণিকা আপনিও কি—?
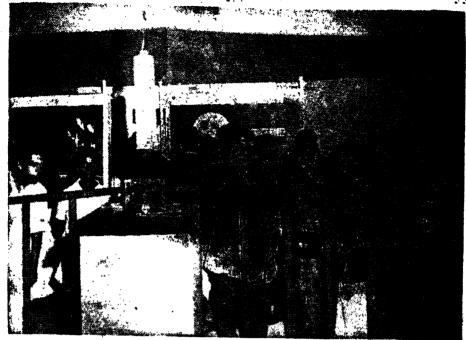
ডঃ গোপালন : না। তেমন কোন কিছুর সন্ধান আমি অন্তত পাইনি। অবশ্য এই একই প্রোগ্রামে আরও অনেকেই তো কাজ করছেন। তাঁদের সব খবর আমার জানা নেই।

প্রশ্ন : ডক্টর, প্রখ্যাত সোভিয়েত বিজ্ঞানী ডঃ কোজিরেভ-এর মতে চাঁদের বুকে প্রায়ই নাকি কিছু কিছু সাময়িক ঘটনা ঘটে থাকে। সম্প্রতি এ পি এন-এর জনৈক সাংবাদিকের কাছে একথা তিনি ব্যাখ্যাও করেছেন। (দেশ, নভেম্বর ৮, ১৯৬৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। ১৯৫৮ সালে অ্যালফোনসাস গহ্বরের মধ্যেকার একটি পাহাড়ের চূড়ায় তিনি নাকি একটি ধোঁয়ার মত বস্তু দেখতে পান। আলোক-বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে সেই ধোঁয়ার মধ্যে নাকি কার্বন অণুর সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। পৃথিবীতে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে যে ধোঁয়া নির্গত হয় তার মধ্যেও কার্বন অণু দেখতে পাওয়া যায়। এ থেকে ডঃ কোজিরেভ সিদ্ধান্ত করেছিলেন, চাঁদে জীবন্ত আগ্নেয়গিরি আছে। ডক্টর, চাঁদের পাথরের মধ্যে আপনি কি কার্বনের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছেন?

ডঃ গোপালন : আমার চোখে পড়েনি। কেউ কেউ পেয়েছেন। তবে তার পরিমাণ খুবই কম। এক কোটি গ্রাম পাথরের মধ্যে এক গ্রাম। এ থেকে এখনই বলা যায় না, চাঁদে জীবন্ত আগ্নেয়গিরি রয়েছে কিনা। তা ছাড়া এ ধরনের কথা একমাত্র অ্যাল-ফোনসাস সম্পর্কেই শোনা গেছে। এবং শোনা গেছে একমাত্র সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে। আর কেউ এ সম্পর্কে কিছু জানেন বলে আমার জানা নেই।

প্রশ্ন : ডক্টর, আমি আবার একটু পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে যাচ্ছি। চাঁদের পাথর পরীক্ষা করে বলা হয়েছে, চাঁদের বয়স নাকি প্রায় সাড়ে চারশ কোটি বছর। আমার কাছে ব্যাপারটা একটু যেন গোল-মেলে ঠেকছে। ধরুন, চাঁদে যদি কোন জীব থাকত এবং সেখানকার জীব পৃথিবীতে এসে হিমালয় পর্বতমালার কোন অংশে নেমে সেখানকার কিছু পাথর নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখল সেই পাথরের বয়েস কুড়ি কোটি বছর। তাহলে সে কি সিদ্ধান্ত করে নেবে পৃথিবীর বয়েস কুড়ি কোটি বছর? দাক্ষিণাত্যের পাথর কুড়িয়ে নিয়ে পরীক্ষা চালালে সে পাথরের হয়ত বয়স দাঁড়াবে পাঁচশ কোটি বছর। অতএব—।

ডঃ গোপালন : এ ধরনের কোন সিদ্ধান্তের কথা আমার জানা নেই। এভাবে চাঁদের বয়েস নির্ধারণ এখনই সম্ভবও নয়। সম্ভবত ওঁরা বলে থাকবেন, যে পাথর-গুলি অ্যাপলো-১১র নভোচররা সংগ্রহ করে এনেছেন তাঁদের বয়েস সাড়ে চারশ কোটি বছর। চাঁদের প্রকৃত বয়স জানতে হলে আমাদের আরও অপেক্ষা করতে হবে। তবে চাঁদের বুকে বড় বড় উল্কাপিণ্ডের আঘাত যে ঘটেছিল সে ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত।

প্রশ্ন : এই বয়স নির্ধারণ, অর্থাৎ আমি ঐ পাথরের কথাই বলছি, আপনার প্রোগ্রামেরও তো একটি অংশ ছিল। এ ব্যাপারে আপনি কিভাবে কাজ করেছেন?

ডঃ গোপালন : ইটস এ ভেরি টেকনিক্যাল কোশ্চেন। খুব সহজ কথায় বলা চলে, এ ব্যাপারে যে পদ্ধতি আমরা কাজে লাগাই সেটা সংক্ষেপে এই রকম। ধরুন কোন এক টুকরো পাথরের মধ্যে কতটা স্ট্রনসিয়াম রইল সেটা আমরা মেপে নিলাম। এখন এই স্ট্রনসিয়াম আসলে রুবিডিয়াম নামে এক ধরনের মৌলিক পদার্থেরই রূপান্তর। আমি তেজস্ক্রিয় রুবিডিয়ামের কথা বলছি। তেজস্ক্রিয় রুবিডিয়াম তার স্বতঃস্ফূর্ত অবক্ষয়ের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হয় স্ট্রনসিয়ামে। কতটা রুবিডিয়াম কত সময়ে রূপান্তরিত হয়ে কি পরিমাণ স্ট্রনসিয়াম তৈরী করে সে হিসেবটা আমাদের জানা আছে। অতএব পাথরের

জাদুঘরের বাইরে চাঁদের-পাথরের দর্শনার্থী হাজার হাজার মানুষ

মধ্যে কতটা স্ট্রনসিয়াম আছে তা মেপে নিতে পারলেই পাথরটির বয়স অনুমান করা যেতে পারে। এই পদ্ধতির নাম রুবিডিয়াম-স্ট্রনসিয়াম ডেটিং পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতেই আমি চাঁদ থেকে আনা আগ্নেয় শিলার উপর পরীক্ষা চালাই। এবং এতে করে ঐ পাথরের বয়স প্রায় সাড়ে চারশ কোটি বছরের মত ধরা পড়েছে। অন্যান্য গবেষকদের কেউ কেউ পটাসিয়াম-আরগন পদ্ধতি, থোরিয়াম-সিসে (২০৮), ইউরেনিয়াম (২০৮)—সিসে (২০৬) পদ্ধতি প্রভৃতি কাজে লাগিয়েছেন। কিন্তু সকলের গণনা একই ফল দেয়নি।

প্রশ্ন : বলা হয়েছে, অ্যাপলো-১১র নভোচররা ধুলোর মত যে গুঁড়ো মাটি নিয়ে এসেছেন তার শতকরা পঞ্চাশ ভাগই নাকি কাচের মত এক ধরনের সামগ্রী। এগুলি কি 'টেকটাইটস' বলে আপনার মনে হয়? পৃথিবীরও স্থলভাগের কোন কোন অঞ্চলে এবং বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়ার উপকূল থেকে দক্ষিণ আমেরিকা পর্যন্ত মহাসাগরের নীচে মাটির বুকে এই ধরনের এক ধরনের কাচের মত পদার্থ ছড়িয়ে রয়েছে দেখা গেছে। কেউ কেউ মনে করেন পৃথিবীর বুকে কোন কোন ধূমকেতু আছড়ে পড়ে চূর্ণ হয়ে যায়। অবশ্য লক্ষ লক্ষ বছর আগে। সেই ধূমকেতুর বস্তু-সামগ্রীই নাকি কাচের মত ঐ পদার্থ, যার নাম 'টেকটাইটস'।

ডঃ গোপালন : চাঁদের বুক থেকে আনা কাচের মত পদার্থ টেকটাইটস নয়।

প্রশ্ন : বলা হয়েছে চাঁদের পাথরের মধ্যে শতকরা বারোভাগের মত টাইটানিয়াম অক্সাইড রয়েছে। আরও কোন অক্সাইড কি আপনি দেখেছেন?

ডঃ গোপালন : সব ধাতুই তো প্রায় অক্সাইড হয়েই রয়েছে? যাকে আপনি যদি একটা অর্ধ ধাতু বলেন, তার পরমাণু অল্পই খুঁজে পাবেন।

প্রশ্ন : আপনি কি মনে করেন ঐ অক্সিজেনকে গ্যাস হিসেবে পৃথক করে ভবিষ্যতের চন্দ্রচারীরা নিজেদের কাজে লাগাতে পারবেন? এ ব্যাপারে সৌর শক্তিকে কাজে লাগান যেতে পারে?

ডঃ গোপালন : তত্ত্বের দিক দিয়ে সম্ভব। তবে কাজে কতটা তা করা সম্ভব হবে বলা কঠিন।

প্রশ্ন : আপনি কি চাঁদের পাথরের মধ্যে হাইড্রাইড বা হাইড্রোক্সাইড খুঁজে পেয়েছেন? সে ক্ষেত্রে ঐ সমস্ত বস্তুর হাইড্রোজেন সংগ্রহ করে অক্সাইডের অক্সিজেন যোগ করে সেখানে জল তৈরি করা যেতে পারে?

ডঃ গোপালন : আমি কোন হাইড্রাইড বা হাইড্রোক্সাইড পাই নি। পেলেও ঐভাবে জল তৈরি করার কথা আপাততঃ সহজ হবে বলে মনে হয় না।

প্রশ্ন : ডক্টর গোপালন, এবার আমার শেষ প্রশ্ন। বিজ্ঞানীরা বলছেন, চাঁদের ভূতাত্ত্বিক গঠন সম্পর্কিত আমাদের জ্ঞান পৃথিবী সংক্রান্ত বহু সমস্যার সমাধান করতে পারবে। আসলে ওঁরা কি বলতে চান, অনুগ্রহ করে সংক্ষেপে একটু বলুন।

ডঃ গোপালন : দেখুন পৃথিবীর ভূতত্ত্ব, আবহাওয়া মণ্ডল, তাপ সঞ্চারণ এমন অনেক কিছুর কথাই আজ আমাদের নতুন করে ভাবতে হচ্ছে। এর সঙ্গে আমাদের অর্থনৈতিক সম্পর্কও জড়িত। আজও আমরা ভাল ভাবে বলতে পারব না, পৃথিবীর ভূ-ত্বকের মাত্র হাজার ফুট নীচে সর্বত্র কি কি ধরনের পদার্থ আছে। তার গঠন প্রকৃতিই বা কেমন। চাঁদ হয়ত আমাদের সাহায্য করবে আমাদের এই গ্রহের ভূ-গর্ভস্থ সম্ভার সম্পর্কে নতুন ঠিকানা যোগাতে, যা নিঃসন্দেহে আমাদের উপকারেই লাগবে। প্রচলিত পদ্ধতিতে এ সমস্ত জানা খুবই কঠিন। তা ছাড়া আরও মৌলিক অভিজ্ঞতাও আমরা পাব যাতে করে আমাদের ভালই হবে। এখনই অত উতলা হচ্ছেন কেন? আরও কিছুদিন অপেক্ষা করুন, ফল খারাপ হবে না।

সংবাদ : চান্দ্রশিলার উপর গবেষণার তথ্যে জানা গেছে, চাঁদের বুকে কোন ব্যাকটেরিয়ার অস্তিত্ব পাওয়া যায় নি। কোন জীবাণুও ধরা পড়ে নি যাতে করে বলা চলে কোন সময় এর বুকে প্রাণীজগত বিরাজ করেছে। চাঁদের মাটির স্পর্শ জীবজগতের পক্ষে ক্ষতিকর নয়।

সমরজিৎ কর

ঘরে বাইরে

[illegible]জন্ম নিরোধে কোটি কোটি বটিকার জন্ম

এমন নিরন্তর জন্ম-প্রবাহ [illegible] Birth-quake-এর আগেও মানুষ জন্ম নিরোধ করতে চেয়েছে। বাইবেলের সেই নোয়ার নৌকার মত আর বন্যার আশ্রয় খুঁজে ফিরতে হয়নি, সৃষ্টিকে বাঁচাবার প্রয়াস পাবার প্রয়োজন হয় নি কিন্তু নূতন বন্যার ভাবনা হয়েছে। নূতন বন্যা লোক সংখ্যার বন্যা। বন্যা যখন এমন প্রচন্ড রূপ ধারণ করেনি তখনও লোক রহস্য করে রটিয়েছে, "বসন্তের নূতন সঞ্জীবনী স্পর্শের আগে ডজন দুই ব্যাঙাচি ধরে খেলে, বছর পাঁচেক সন্তান জন্মের ভাবনা থাকবে না!" অথবা হাসি-তামাসার সঙ্গে বলেছে "পারা তেলে ভাজ ২৪ ঘণ্টা তারপর বদরী ফলের আকারে বটিকা বানিয়ে খাও, নিশ্চিন্ত থাক, জীবনেও গর্ভ সঞ্চার হবে না।" পরিহাস বা রসিকতার অন্তরালে যে ইচ্ছা থাকতো তার [illegible] বহু প্রচার ছিল [illegible] এরপর IUCD [illegible] নানা ধরনের [illegible] সমাজের সকল [illegible]।

১৯৫৬ সালে ব্যাপকভাবে পোর্টোরিকোর মেয়েদের মধ্যে বটিকা পরীক্ষা হয়। তার আগে ব্যাপকভাবে খরগোসের উপর পরীক্ষা চলেছিল। ডাঃ গ্রেগরী পিকাস্ প্রথম সাহস করে ঘোষণা করেন যে নারীর শরীরেও ঠিক খরগোসের মতই পিল-এর ক্রিয়া হবে। দারুণ দুঃসাহসিক ঘোষণা বটে। তার উপর ইনজেক্শন নয়, কোন শারীরিক প্রয়োগবাধ নয়, মাত্র একটি করে ট্যাবলেট মাসে বিশ দিন রজোদর্শনের পঞ্চম দিন থেকে আরম্ভ করে পঁচিশ দিনের দিন পর্যন্ত। পোর্টোরিকো মার্কিন দেশের গরীব এলাকা। তারা অত্যন্ত বিশ্রী এবং নোংরা পল্লীতে বাস করে। সম্ভব হলে এদিক ওদিক দিয়ে দু'পয়সা রোজগারের চেষ্টা দেখে। তাদের জন্ম-সংখ্যার হার খুব বেশী। তাই তাদের মধ্যেই প্রথম পিল-এর প্রচার হয়। গরীব মেয়েরা আগে যে অন্যান্য গর্ভ-নিরোধক ব্যবহার করেননি তাও নয়। কেউ কেউ মনে করেছিলেন পোর্টোরিকোর মত পিছিয়ে পড়া সমাজ-এর মেয়েরা কখনই পিল-এর ব্যবহার করতে পারবে না। আশ্চর্যের বিষয় যে পিলই সবচেয়ে বেশী চলন হ'লো সেখানে। জন্মহার নামতে আরম্ভ করলো। অধিক সন্তানের অসহায় অবস্থা যাঁরা গর্ভপাতের পথ খুঁজতেন তাঁরা আনন্দে মেনে নিলেন নূতন ব্যবস্থা। কখনও বা প্রতিক্রিয়ার পরীক্ষার জন্য বেশী মাত্রায় কড়া পিল দেওয়া হ'লো। প্রতিক্রিয়ার নাকি সবচেয়ে বড় লক্ষণ বমিভাব। পোর্টোরিকোর মেয়েরা দমলেন না। বমিভাব, স্তনদেশে সামান্য অস্বস্তি, আলস্য, মাথাধরা এবং কিছু ওজন বৃদ্ধি কারও কারও ক্ষেত্রে হ'লো। তবে অনেক ক্ষেত্রেই মাস তিনেক কাটলে বহু উপসর্গ কমে যায়। বিশেষজ্ঞরা বলেন সামান্য উপসর্গ স্বাভাবিক কারণ হরমোন প্রয়োগে কৃত্রিম গর্ভলক্ষণ হতে পারে।

[illegible]রবার পরিকল্পনা ও "পিল"

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশন নানা নিদানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা বহু করার পরে রায় দিয়েছেন। জন্মনিয়ন্ত্রণ বটিকে স্বীকার করেছেন। কিন্তু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও বটিকা বা পিল [illegible] সম্যক জনপ্রিয় হয়নি। পৃথিবীর বহু দেশে বটিকাই প্রধান নিরোধক। মধ্য প্রাচ্যে পর্যন্ত বটিকা অবলম্বন করে পরিবার পরিকল্পনার আয়োজন হয়েছে। সরকার সর্বভারতীয় এক অনুসন্ধান সমীক্ষার সূত্রপাত করলেন প্রথম ১২১টি কেন্দ্রে। পরে কেন্দ্র সংখ্যা কিছু বাড়ানো হয়। ১৯৬৯ সালের ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত ১৪৪টি কেন্দ্র থেকে যে রিপোর্ট এসেছে তার উপর ভিত্তি করে [illegible] একটি বিবরণ পেশ করেছেন।

প্রথম লক্ষ করার কথা [illegible] কেন্দ্রেই বটিকা ব্যবহারের [illegible] কেন্দ্র ছিল না। IUCD-র আনুষঙ্গিক [illegible] মাত্র ছিল "পিল"। যাঁরা কোন কারণে IUCD-র ব্যবহার করতে পারবেন না তাঁদের উপরেই পরীক্ষা হবে বটিকার। যে সামান্য আয়োজন হয়েছিল তা থেকেও বোঝা যায় বটিকা ব্যবহারকারিণীরা কিছুদিন ব্যবহার

গেল কেন? এমন কি দেখল যে আঁতকে উঠে মারা গেল? তবে কি সত্যসত্যই ভূত আছে বাড়িটাতে? আর কিসে এমন ভয় পাওয়া যায় যে একটা আস্ত জোয়ান লোক আঁতকে উঠে পড়ে মরে? গা ছমছম করতে লাগলো। ভাবলাম হারাণের বিছানাটা গুটিয়ে দিয়ে আসি। শুতে আসবার সময়ে দেখেছিলাম যে বিছানা পাতাই রয়েছে তোলবার কথা কারো মনে পড়েনি।

হারাণের ঘরে যেতে গিয়ে দেখি যে অনির্বাণের শয্যা খালি। ও আবার কোথায় গেল? ওর আবার কিছু বিপদ না ঘটে। এ কোন্ অজগর পুরীতে এসে কি সঙ্কটেই না পড়লাম। ভাবলাম হোক একবার ওর শিক্ষা। হারাণের বিছানা পা দিয়ে গুটিয়ে দিয়ে ফিরে এসে অনেকখানি জল খেয়ে শুয়ে পড়লাম। ভাবলাম অনির্বাণ না ফেরা পর্যন্ত জেগে থাকবো। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি কালো মখমলের মতো অন্ধকার, আকাশময় তারার ফুলঝুরি। এই ঘনান্ধকারে কোথায় গেল অনির্বাণ। কোথায় গেল?

হঠাৎ অনুভব করলাম কে যেন ঠেলা দিচ্ছে। তাকিয়ে দেখি ভোরের আলো আর অনির্বাণ।

ওঠো, ওঠো, আজ কলকাতা রওনা হতে হবে।

সত্যিই তো, বলে উল্লাসে লাফিয়ে শয্যাত্যাগ করলাম।

ঠিক যাবে তো।

নিশ্চয়।

গাড়ি তো সেই রাতের বেলায়।

তবে তখনই।

তবে চলো গোছগাছ করে ফেলা যাক।

গোছগাছ পরে হবে, এখন মুখ হাত ধুয়ে নাও, রাজাবাহাদুরের কাছে বিদায় নিয়ে আসি।

পঞ্চানন তাহলে হাজতেই পচবে।

অদৃষ্টলিপি কে খন্ডাতে পারে বলো।

কিছুই করতে পারলে না?

তাই তো দেখছি।

তখন দুঃখিত মনে রাজাবাহাদুরের সঙ্গে দেখা করবার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হতে লাগলাম।

ওকি, গায়ে আবার শাল চাপালে কেন?

বলো কি, রাজদরবারে যাচ্ছি, যোগ্য পোশাক পরতে হবে না।

এর আগে কি রাজদরবারে যাওনি?

আজ যে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় গ্রহণ।

তবে আমিও আনুষ্ঠানিক পোশাক পরে' নি।

এই বলে একখানা শাল গায়ে দিয়ে বললাম, তাহলে পঞ্চানন হাজতেই থাকলো।

কি আর করা যায়।

আমার মনে ভরসা ছিল তুমি একটা বিহিত করতে পারবে।

আমি কি জাদু জানি নাকি?

অন্তত অসাধারণ বুদ্ধিমান বলে ধারণা ছিল।

তবে সে ধারণা বর্জন করো আর তোমার নোটবুকে বড় বড় অক্ষরে লিখে রাখো অনির্বাণ রায় অসাধারণ নির্বোধ।

হঠাৎ বিনয় কেন? ও গুণটি তোমার ছিল না তো?

ঘটনার মুখোমুখি পড়ে হয়েছে। নাও চলো এখন।

দুজনে যখন রাজাবাহাদুরের খাস কামরায় এসে উপস্থিত হলাম দেখলাম রাজাবাহাদুর ও দেওয়ানজি দুজনেই উপস্থিত। তাঁরা আগেই জানতেন যে আজ সকালে বিদায় নিতে আসবো।

নমস্কার ক'রে অনির্বাণ বলল, রাজাবাহাদুর, আমরা বিদায় নিতে এসেছি।

আর দু দিন থাকলে হ'তো না। এ দিকে অনেক কিছু দেখবার আছে। বৈকুণ্ঠপুরের অরণ্য, দেবীগড়, ব্রহ্মপুত্র নদী। কিছুই দেখলেন না।

এর পরে আর একবার এসে দেখে যাবো। পঞ্চানন না থাকলে বেড়িয়ে আনন্দ নেই।

পঞ্চাননের প্রসঙ্গে রাজাবাহাদুরের চোখ ছলছল ক'রে এলো। বুঝলাম আভিজাত্যের কঠোর আত্মসংযমের সঙ্গে চোখের জলের লড়াই চলছে। কিছুক্ষণ পরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন বিচারে কি হবে জানি না আপাতত হাজতেই থাকলো।

অনির্বাণ বলল, হাজতে থাকবে কেন? ছাড়িয়ে নিয়ে আসুন।

পুলিসে ছাড়বে কেন?

ছাড়বে এই জন্যে যে আদৌ চুরি হয়নি।

এবারে প্রথম দেওয়ানজি কথা বললেন; ও কথা তো অনেকবার বলেছেন, শুধু অনুমান বা স্নেহের দাবী তো পুলিসে মানবে না।

তবে শাহী শিরোপাটা দেখিয়ে দেবেন।

শাহী শিরোপাটাই যদি থাকবে তবে এত জল ঘোলা হল কেন?

কারো কারো অভ্যাস জল ঘোলা না ক'রে খায় না।

দেওয়ানজি বললেন, মিছা কথা কাটাকাটি ক'রে লাভ নেই, যদি যত্রা করাই স্থির ক'রে থাকেন তবে স্নানাহার সেরে নিতে হয়।

মজ্জমান ব্যক্তি যেমন তৃণখন্ড অবলম্বন করে সেইভাবে রাজাবাহাদুর বলে উঠলেন, আপনি কি সত্যই মনে করেন শাহী শিরোপা চুরি হয়নি।

ধীরভাবে অনির্বাণ বলল, আমি সত্যই মনে করি।

কোথায় আছে দাবী করলেন দেওয়ানজি।

আরও ধীর ভাবে অনির্বাণ বলল, যেখানে ছিল।

ছিল তো মখমলের বাক্সটায়।

তবে সেখানেই আছে।

সেটা তো কালকে দেখেছেন।

আবার দেখতে ক্ষতি কি?

দেওয়ানজি বললেন, মিছে সময় নষ্ট করছেন।

তদুত্তরে অনির্বাণ শুধালো, কোথায় আছে সেই বাক্সটা।

তোষাখানায় সিন্দুকের উপরে।

উপরে কেন? ভিতরে নয় কেন? সাবধানে রাখা উচিত ছিল।

আমি তো তার ধীরতা দেখে ও কথা শুনে তাজ্জব বনে গেলাম। অনির্বাণ করছে কি?

খালি বক্স সিন্দুকে রাখা নিরর্থক।

খালি কি ভরা একবার দেখুন না।

অনেকবার দেখেছি।

আমার অনুরোধে আর একবার দেখুন।

চলই না রামসদয়, দেখাই যাক না।

চলুন যাচ্ছি, সকাল বেলাতেই সময় নষ্ট, বলে নিতান্ত অপ্রসন্ন মনে তোষাখানার চাবি আনতে বললেন। রাজাবাহাদুর সিন্দুকের চাবি আনালেন, দেওয়ানজিও। আগেই বলেছি সিন্দুকের দুটো চাবি দুজনের কাছে থাকতো। তার পরে তাদের অনুসরণ ক'রে আমরা চললাম তোষাখানার দিকে।

পুরোনো মহলের দিকে তোষাখানা, একতলার পাকা ইমারত। একজন দরোয়ান তোষাখানার প্রকান্ড তালাটা খুলে ফেলল, অমনি পাওয়া গেল, ভ্যাপসা গন্ধ, উপরের গোটা দুই ঘুলঘুলি দিয়ে বেশ আলো এসে পড়েছিল, অন্য জানলার বালাই নেই। ভিতরে ঢুকতেই মনে হল দু-তিন শ' বছর আগেকার যুগে পদার্পণ করলাম, পল্বলে যেমন জল বদ্ধ হয়ে আটকে থাকে তেমনি অষ্টাদশ শতক এখানে স্থির হয়ে আছে। পায়ের শব্দে গোটা কয়েক চামচিকে বিরক্ত হয়ে ফরফর করে ঘুরে ঘুরে উড়তে লাগলো। ঘরটার উত্তর দিকে দেয়ালে গাঁথা মানুষ সমান এক প্রকান্ড সিন্দুক। সিন্দুকের উপরেই চোখে পড়লো সেই শাহী শিরোপার মখমলের বাক্সটা। শূন্য বাক্স, ভিতরে রাখবার উদ্যম হয়নি। আমরা কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই দেওয়ানজি বললেন, ঐ দেখুন বাক্স, বিশ্বাস না হয় খুলে দেখতে পারেন।

অনির্বাণ বলল, সে না হয় দেখলেই হবে। কিন্তু দেওয়ানজি ছাদের এ কি অবস্থা, যে কোন দিন ধ্বসে পড়তে পারে।

আমি ছাদের দিকে তাকালাম, সত্যি অবস্থা ভাল নয়, ছোট ছোট টালির মতো ইঁটের সীমানাগুলো ফাঁক হয়ে গিয়েছে, কয়েকটা জায়গায় চিড় খেয়েছেও বটে।

দেওয়ানজি ও রাজাবাহাদুর ছাদের দিকে নজর করতে লাগলেন।

রাজাবাহাদুর বললেন, রামসদয় এবার বর্ষার আগেই যা হয় করো, এখনি লোক লাগিয়ে দাও।

হাঁ, আর দেরী করা উচিত নয়, আর পূব দিকের দেয়ালে গোটা দুই পিলার গাঁথতে হবে, ওদিকের দেয়ালটা কিছু জখম হয়েছে মনে হচ্ছে।

যা হয় তাড়াতাড়ি করো।

সকলেই বাড়িটার অবস্থা দেখে বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন, আমি তাদের উদ্বেগ লক্ষ্য করছি।

কিছুক্ষণ পরে দেওয়ানজি বললেন, আচ্ছা, এবারে বাক্সটা খুলে দেখুন অনির্বাণবাবু।

কষ্ট করে আপনিই খুলুন না।

সকাল বেলাতেই এক বৃথা ঝামেলা জুটলো, বলে পণ্ডশ্রম করছেন মনে করে দেওয়ানজি অনভ্যাভরে মখমলের বাক্সটা খুলে দেখলেন। খুলে দেখতেই ভিতরে কি একটা বস্তু জ্বল জ্বল করে উঠল। সেই মোতির মালা। একশ আটটা মোতি আলো আঁধারি ঘরের সবটুকু আলো কুড়িয়ে নিয়ে স্থির দীপ্তিতে জ্বলতে লাগলো। আর যে বিস্ময় অবিশ্বাসের অধিক, যে আনন্দ আনন্দের অধিক সেই বিশ্বাসে আনন্দে জ্বলতে লাগলো আমাদের তিনজনের চোখ। কারো মুখে কথা জোগালো না, সকলেই চিত্রার্পিতবৎ বিস্ফারিত নেত্র।

অনেকক্ষণ পরে প্রথমে চটকা ভাঙলো রাজাবাহাদুরের। আভিজাত্যের অভ্যস্ত সংযম ভুলে গিয়ে তিনি উচ্চ স্বরে বলে উঠলেন, রামসদয়, এ যে অসম্ভব সম্ভব হল।

রামসদয়ের অবিশ্বাসটাই সবচেয়ে বেশি ছিল, তা ছাড়া তারই পরামর্শে পঞ্চানন গ্রেপ্তার হয়েছিল, তার অপ্রস্তুতের ঘোর তখনো পুরো কাটেনি, একবার স্পর্শ করে বুঝলো, না সত্যি মালাটা যথাস্থানে আছে। মৃদু স্বরে বলছ, তাই তো, কেমন করে কি হল।

আমিও কম বিস্মিত হইনি, তবে বুঝলাম মালা হারানোর রহস্যের চেয়ে মালা আবিষ্কারের রহস্য কম গভীর নয়। ভাবলাম এখন থাক, পরে অনির্বাণের কাছ থেকে শুনে নেবো, এখন আসল কথা সে বলবে না।

দেওয়ানজি বললেন, অনির্বাণবাবু, আপনি কি জাদু জানেন নাকি?

আজ্ঞে না জাদুবিদ্যা জানা নেই, তবে জানা আছে যুক্তি শাস্ত্রের একটা অবাধ্য নিয়ম।

কি সেটা?

[illegible] একটা বস্তুবিশেষের পক্ষে একই সঙ্গে একাধিক স্থানে থাকা সম্ভব নয়। মোতির মালাটা যখন পঞ্চানন নেয়নি, আর অন্য প্রকারেও রাজবাড়ীর বাইরে যায়নি, তখন নিশ্চয় রাজবাড়ীর মধ্যেই আছে। আর রাজবাড়ীতেই যখন আছে, তখন যথাস্থানেই থাকবে।

দেওয়ানজি বললেন, যথাস্থান বলতে তো ঐ বাক্সটা, সেটা তো শূন্য ছিল আপনি নিজেও দেখেছেন।

তবে সেই দেখাটাই ভুল ছিল, আজকের দেখা তো ভুল হতে পারে না।

রামসদয়, তর্ক রাখো। মোতির মালা ফিরে পেয়েছে এই কি যথেষ্ট নয়।

এই বলে সেই অভিজাত সংযমী বৃদ্ধ মালাটা বের করে নিয়ে একবার মাথায় রাখেন, একবার কপালে ঠেকান, একবার গলায় পরেন। নানাভাবে স্পর্শ ও ব্যবহার করে বস্তুটা যে মায়া নয়, যথার্থই পাওয়া গিয়েছে তাই যেন সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করতে চেষ্টা করেন।

রামসদয়, সেই সন্ন্যাসীর কথা মনে আছে তো! এ মালা হারালে তাহেরগঞ্জের রাজবংশ লোপ পেতো। সে ভয় আর নেই, সে ভয় আর নেই। জয় রাধা গোবিন্দজীউ। রামসদয়, ষোড়শোপচারে পূজার ব্যবস্থা করো, আর তাঁদের চরণে স্পর্শ করিয়ে ভালো করে সিন্দুকে তুলে রাখো। আর হাঁ, পঞ্চাননকে হাজত থেকে আনিয়ে নেবার বন্দোবস্ত করো। আজই, এখনি আর দেরী নয়। বুঝতে পারছ কত বড় ভুল, কত বড় অন্যায় হয়ে গিয়েছে।

রাজাবাহাদুর, যা কিছু হয়েছে সমস্তই তো রাজবংশের কল্যাণ কামনায় হয়েছে।

না, না, আমি কি তোমাকে দোষ দিচ্ছি। তা নয়। কিন্তু এখন যখন প্রমাণ হল যে, সে সম্পূর্ণ নির্দোষ, তাকে আনিয়ে নেবার আয়োজন করো।

রামসদয় বললেন, আমি নিজেই যাচ্ছি।

আমাকেও যেতে হবে, বললেন রাজাবাহাদুর।

আমাদেরও—বলল অনির্বাণ।

আপনারা কোথায় যাবেন?

কলকাতায়। অমনি যাওয়ার পথে রংপুরে গিয়ে পঞ্চাননের সঙ্গে দেখা করে যাবো।

আরে না, না, এমন আনন্দের দিনে আপনাদের ছাড়ছে কে? আপনারা এসে আমাদের চোখ ফুটিয়ে দিলেন বলেই তো মালাটা পাওয়া গেল, এতদিন তো অন্ধকারে হাতড়ে মরছিলাম অথচ যেখানকার জিনিস সেখানেই ছিল।

কণ্ঠস্বরে দৃঢ় সংকল্প জ্ঞাপন করে অনির্বাণ বলল, মাপ করবেন রাজাবাহাদুর। আমাদের যেতেই হবে। আরও এক কথা, পঞ্চাননকেও আমাদের সঙ্গে ছেড়ে দিন।

সে কি একটা কথা হল?

হল বই কি! যুবরাজের নামে এত বড় একটা অপবাদ, অবশ্য অপবাদ মিথ্যা, তবু তো অপবাদ, যতই চেপে রাখুন কিছু জানাজানি নিশ্চয় হয়েছে, অন্ততঃ রাজবাড়ীর লোকে নিশ্চয় জেনেছে, এ হেন সময়ে এখানে এলে সে খুব অস্বস্তি বোধ করবে। এখন কিছুদিন দূরে থাকাই ভালো, দু দিনে সবাই ভুলে যাবে, তখন যুবরাজ সগৌরবে প্রত্যাবর্তন করবেন রাজবাড়ীতে।

কি বলো রামসদয়, অনির্বাণবাবুর কথা তো মিথ্যা নয়।

আপনি যদি ভালো মনে করেন, তবে তাই হোক। সবাই মিলে রংপুরে গিয়ে তাকে খালাস করে নিয়ে ওদের সঙ্গে কলকাতায় পাঠিয়ে দিই।

অনির্বাণবাবু, কি দিয়ে আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবো ভেবে পাচ্ছি না।

আশীর্বাদ দিয়ে রাজাবাহাদুর, আশীর্বাদ দিয়ে।

আশীর্বাদ যে করে না চাইলেই সে করে।

যদি সত্যি খুশি হয়ে থাকেন, তবে একটি প্রার্থনা আছে।

তোমাকে অদেয় আমার কি থাকতে পারে।

আপনার কাছে সিন্দুকের যে চাবিটি আছে, সেটি দেওয়ানজিকে দিন। এখন থেকে দুটি চাবিই তাঁর কাছে থাকবে। হাজার হোক আপনি প্রবীণ হয়ে পড়েছেন তো, ভুল ভ্রান্তি—

তাঁর বাক্য শেষ হতে পারলো না, রাজাবাহাদুর বলে উঠলেন, ভুল ভ্রান্তি বলে ভুল ভ্রান্তি, মালা যথাস্থানে আছে অথচ চারদিকে খুঁজে মরছি। এর কি ক্ষমা আছে? এই নাও রামসদয়, এখন থেকে এ চাবিটা তুমিই রাখো।

অনির্বাণের প্রস্তাবে বিস্মিত হয়ে গেলাম। এতদিন তার কথা শুনে মনে হয়েছিল দেওয়ানজিকেই সে চোর ঠাউরেছে—এখন আবার তার হাতেই চাবি তুলে দেওয়ার প্রস্তাব। অনির্বাণ ক্রমেই অধিকতর রহস্যময় হয়ে উঠছে।

সকালের দিকেই আহারান্তে সকলে রংপুর যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলাম। রংপুর মাইল পনেরো। রাজবাড়ীর দুটি হাতী সজ্জিত হল, একটিতে রাজাবাহাদুর ও দেওয়ানজি। অপরটিতে অনির্বাণ ও আমি।

হাতিতে উঠবার সময়ে দেওয়ানজি বললেন, আপনাদের মাহুতকে কিছু বলবার দরকার হলে গায়ে ঠেলা দিয়ে ইশারায় বুঝিয়ে দেবেন। ও কানে একেবারে শুনতে পায় না, তবে ইশারায় সব বোঝে।

আগে রাজহস্তী, পিছনে আমাদেরটা, আগে পিছে দশ বারো জন ঘোড়সোয়ার। আমরা রংপুরে চলেছি। দেওয়ানজি আশ্বাস দিয়েছেন ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই পৌঁছে যাবো।

শীতের পূর্বাহ্ন, রোদটি মধুর, দৃশ্যটি মনোরম। বিশ্বপট যেন চিত্রকরের মমতা ও মাধুরী মিশিয়ে অঙ্কিত। রাজহস্তীটা এগিয়ে চলেছে, আমাদের হাতীটা অপেক্ষাকৃত মন্থর। হাওদার গদিতে হেলান দিয়ে দুজনে চুপ করে আছি, গত কয়দিনের উদ্বেগের পরে ভারি আরাম বোধ করছিলাম।

বেশ কিছুক্ষণ পরে আমি বললাম, অনির্বাণ, এবারে বুঝিয়ে বলো তো কি করে কি হল? আমার কাছে যুক্তিশাস্ত্রের তর্ক তুলে আসল কথা চেপে গিয়ে লাভ নেই।

বেশ, তবে যুক্তিশাস্ত্র থেকেই শুধু করা যাক। এটা তো স্বীকার করো যে, কোন একটা বস্তুর পক্ষে একসঙ্গে একাধিক জায়গায় থাকা সম্ভব নয়।

বললাম, এ কথাটার উপরে এত জোর দেওয়ার দরকার? এ তো অত্যন্ত মামুলী সত্য।

বেশ তবে এই মামুলী সত্য থেকেই শুরু করা যাক, বুঝতে গোল হবে না। জগবন্ধু, বেশ মন দিয়ে শুনে যেয়ো। কোথাও ঘটনার শৃঙ্খলে গিঁঠ আলগা থাকলে চেপে ধরতে ভুলো না। ঐ মোতির মালা কে নিল? অর্থাৎ কার কার পক্ষে নেওয়া সম্ভব? রাজাবাহাদুর, দেওয়ানজি ও পঞ্চানন ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়। পঞ্চানন অবশ্যই নেয়নি।

কি করে বুঝলে?

পঞ্চাননকে জানি বলেই বুঝলাম। তা হলে বাকি থাকলো রাজাবাহাদুর আর দেওয়ানজি। রাজাবাহাদুর কেন নিতে যাবেন? অতএব শেষ পর্যন্ত একজন মাত্র বাকি থাকলেন, দেওয়ানজি। কি ঠিক হচ্ছে তো?

যুক্তিতে চমৎকার শৃঙ্খলা।

তোমার মাথা আর আমার মুণ্ডু। এখনি দেখতে পাবে আমার মতো নির্বোধ ভূভারতে দ্বিতীয়টি নাই।

কেন?

যথাসময়ে টের পাবে। সমস্ত ঘটনার অঙ্গুলি দেওয়ানজির দিকে।

অথচ তাঁরই জিম্মায় দিলে রাজাবাহাদুরের চাবিটা।

ধীরে রজনী ধীরে। ধৈর্য ধারণ করে শ্রবণ করো। দেওয়ানজি যে নিয়েছেন, তার পক্ষে প্রমাণ সুপ্রচুর। তিনিই উদ্যোগী হয়ে পঞ্চাননকে গ্রেপ্তার করিয়েছেন নিজের দোষ ঢাকবার আশায়। পঞ্চাননের কাছে শুনেছিলাম যে, তিনি পঞ্চাননের উপরে খুশী নন; পঞ্চানন দত্তক হয়ে না এলে তিনি বা তাঁর পুত্রগণ তাহেরগঞ্জ রাজ্যের মালিক হতেন, আর মোতির মালাটাও শেষ পর্যন্ত সমরক্তের বাইরে যেতো না। গুপীবাবু আর হারাণের কথাতেও এর সমর্থন পেয়েছ। তবে তিনি যে মালাটা নিয়েছিলেন ঠিক লোভের তাড়নায় নয়। মালাটা তার হাতে থাকলে সমরক্তে থাকতো, তাহেরগঞ্জের রাজবংশ লোপ পেতো না—অনেক পরিমাণে এই উদ্দেশ্য ছিল।

অর্থাৎ তুমি বলতে চাও এ চুরিটা পরহিতায়।

সবটা নয়, অনেকটা।

বেশ, তারপরে।

এখানে আসবার আগেই একরকম স্থির করেছিলাম যে, একমাত্র দেওয়ানজির পক্ষেই এ মালা নেওয়া সম্ভব। তারপরে গুপীবাবু ও হারাণের কথায় তা দৃঢ়তর হল। এবারে মনে করে দেখো রাতের অন্ধকারে আবছায়া মূর্তির পুরানো মহলে ঘোরাফেরা। রাজবাড়ীর অনেকেই দেখেছে, তুমিও দেখেছ। তারা মনে করতো কোন অশরীরী সত্তা। হারাণ বলেছিল এই অশরীরী মূর্তির দেওয়ানজির মতো উঁচু। মনে পড়ছে।

হাঁ, বলে যাও।

তখন আমার মনের পূর্ব ধারণা প্রত্যয়ে পরিণত হল যে, মালাটি দেওয়ানজি সরিয়েছেন, চুরি শব্দটা ব্যবহার নাই করলাম। তাঁর রাতের অন্ধকারে পুরানো মহলের দিকে যাতায়াত দেখে বুঝলাম মালাটা ওখানেই কোথাও লুকিয়ে রেখেছেন, রাতের বেলায় দেখে আসেন খোয়া গেল কিনা। হচ্ছে?

এ পর্যন্ত ঠিক হচ্ছে, কিন্তু ঐ গভীর রাতে বুক ফাটা কান্না?

প্রথমে মনে হয়েছিল রাজবাড়ীর অধিবাসীদের ভয় দেখাবার উদ্দেশ্যে দেওয়ানজির ওটা অভিনয়।

ভয় দেখাবার উদ্দেশ্য?

যাতে ও মহলটায় কেউ না যায়।

কিন্তু এমন বুকফাটা করুণ ক্রন্দন কি অভিনয় হতে পারে?

কেন হতে পারবে না? থিয়েটারে কি সীতা শৈব্যা এদের কান্না শোননি।

পরে এ থিওরি পরিত্যাগ করেছিলে?

হাঁ।

আর হারাণের মৃত্যু এবং অস্পষ্ট চীৎকার।

তার চীৎকারটা গোড়াতে অস্পষ্ট লেগেছিল বটে, তবে পরে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল।

খুলে বলো।

দেখো ঐ রাজবাড়ীর সমস্ত অধিবাসীর মধ্যে একমাত্র ঐ হারাণ আঁচে অন্দাজ খানিকটা বুঝেছিল।

তাই বুঝি সে রাতের বেলায় না ঘুমিয়ে ঐ মহলটায় যেতো?

তাই তার মৃত্যু।

হত্যা?

মৃত্যু। এইসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইঙ্গিতের রাই কুড়িয়ে বেল তৈরি হয়ে উঠল। আর আমার সন্দেহমাত্র রইলো না যে, মালাটি দেওয়ানজি নিয়েছেন আর রাজবাড়ীর মধ্যেই কোথাও আছে। এই জন্যেই বারে বারে মনে করিয়ে দিয়েছি যে, কোন বস্তুর পক্ষে একই সময়ে দুই জায়গায় থাকা সম্ভব নয়।

কিন্তু তিনি যদি মালাটা নিলেনই তবে বাজারে দিলেন না কেন?

সর্বনাশ। ও মালার পরিচয় দেশের সমস্ত জহুরী জানে। যে নিয়ে যাবে সে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার হবে।

তবে নেবার উদ্দেশ্য কি?

আগেই বলেছি মালাটা সমরক্তে রাখা, সেই সন্ন্যাসীর উক্তিকে এরা সবাই বেদবাক্য মনে করতো। আর একটা উদ্দেশ্য পঞ্চাননকে জব্দ করা।

আচ্ছা, তারপরে বলো।

আমরা তো তিন দিন মাত্র হারাণকে

দেখেছি, চতুর্থ দিনে অর্থাৎ চতুর্থ দিনের রাতের বেলায় তার মৃত্যু হল। হারাণ রাতে উঠে বের হয়ে যেতো। তুমি নিশ্চয় ভেবেছিলে অভিসারে যায়। আমি লক্ষ্য করেছিলাম ছায়া মূর্তিকে অনুসরণ করে যায় পুরানো মহলের দিকে। তখন ভেবেছিলাম যে, পরদিন রাতে আমি তাকে অনুসরণ করবো। কিন্তু সে সুযোগ আর পেলাম না, তার হঠাৎ মৃত্যু হল। অর্ধোক্ত চীৎকারে সে কি বলতে চেয়েছিল বুঝতে পারলে সুবিধা হতো—

কিন্তু তুমি যে এই মাত্র বললে যে, সে চীৎকার স্পষ্ট হয়েছে তোমার মনে।

এখনো হয়নি, পরে হয়েছে, পরের কথা পরে।

আচ্ছা তা হলে আগের কথা বলো।

পরের দিন রাতে নিয়মিত সময়ে সেই ছায়ামূর্তি ধীরে ধীরে পুরানো মহলের দিকে গিয়ে মিলিয়ে গেল। আমি অলক্ষ্যে সেইদিকে চললাম। রাস্তা ছিল অন্ধকার, কাজেই ছায়ামূর্তির আমাকে দেখবার উপায় ছিল না। আর চাঁদের আলো থাকলেও আমাকে দেখতে পেতো না। কারণ কি করে সে ভাববে যে, কেউ তাকে অনুসরণ করছে, রাজবাড়ীর সবাই তাকে অশরীরী মনে করে ভয়ে সরে থাকতো।

অনির্বাণ তন্ময়ভাবে বলে চলেছে।

দিনের বেলায় তুমি যখন ঘুমোচ্ছিলে, আমি একবার ওদিকে গিয়ে গলি-ঘুঁজিগুলো দেখে এসেছিলাম। তাই পথ চলতে অসুবিধে হয়নি। কিছুদূর যেতেই দেখতে পেলাম ছায়ামূর্তি অতি সন্তর্পণে এগিয়ে চলেছে, আগে পিছে ডাইনে বামে কোনদিকে নজর নাই। কেনই বা থাকবে? পথঘাট যার নখদর্পণে, লক্ষ্য যার সুবিদিত আর অনুসরণের ভয় যার মনে নেই, সে কেন এদিকে ওদিকে তাকাবে। আমিও অন্য কোনদিকে লক্ষ্য করছি না, সেই ছায়া শরীরীর দিকে আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ। সে যে দেওয়ানজি, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ মাত্র রইলো না। অবশ্য আগেই নিঃসন্দেহ হয়েছিলাম, সেই শীর্ণ দীর্ঘ দেহ, মাথার সেই খাড়াই। এখন আমার একমাত্র লক্ষ্যের বিষয় হল, কোথায় গিয়ে উপস্থিত হয় এবং কি করে। সেই মালাটা যথাস্থানে লুক্কায়িত আছে কিনা দেখতেই সে নিত্য রাত্রে ছায়া-শরীরীর অভিনয় করে থাকে বুঝলাম। আমিও পিছে পিছে আর একটি ছায়া শরীরীর মতো তাকে অনুসরণ করতে থাকলাম।

দেখতে পেলাম ছায়ামূর্তি অতি সন্তর্পণে এগিয়ে চলেছে

ইতিমধ্যে আকাশে কোথাও টুকরো চাঁদ উঠেছে, তারই আলো সেই ভাঙা বাড়ির ছাদ প্রাচীর থামের মধ্যে দিয়ে বেঁকেচুরে এসে পড়েছে, আমার নজর চলবার কিছু সুবিধা হল বটে। তবে আমি যাতে নজরে না পড়ি সেই জন্যে ছায়া ঘেঁষে থাম ও প্রাচীরের আড়াল রক্ষা করে চলছিলাম। আমি অতিথি হয়ে তাকে অনুসরণ করছি এ অত্যন্ত গর্হিত সন্দেহ নাই। এমন সময়ে দেখলাম ছায়ামূর্তি একটা ভাঙা দেয়ালের কাছে গিয়ে থামলো। অনেকক্ষণ নিষ্ক্রিয় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, তারপরে দেয়ালের একটা কুলুঙ্গি থেকে একখানা ইঁট সরিয়ে কিছু বের করলো, কি দেখবার উপায় ছিল না, আমি পিছন দিকে আছি কিনা। তবে শেষ পর্যন্ত হতাশ হতে হল না, সেই বস্তুটা হাতে নিয়ে উঁচুতে তুলে ধরলো, অমনি তার উপরে পড়লো চাঁদের আলো। সেই মোতির মালা, পূর্ণিমার চাঁদ থেকে কুঁদে তৈরি প্রত্যেকটি দানা, এমনি শুভ্র এমনি স্বচ্ছ এমনি উজ্জ্বল। একবার সেটা নিয়ে গলায় পরলো, একবার মাথায় রাখলো, মনে হল একবার বুকে চেপে ধরলো, এমন চলল কিছুক্ষণ। সমস্ত ইন্দ্রিয় ও দেহ দিয়ে সেটা যেন অনুভব করতে চায়, তার সত্যতা যেন পরীক্ষা করতে চায়। তারপরে, বেশ কিছুক্ষণ পরে আবার সেটা কুলুঙ্গির মধ্যে সযত্নে রেখে কুলুঙ্গির মুখে ইঁট চাপা দল। এতক্ষণ সে অনড় ছিল এবারে নড়ে উঠল, বুঝলাম ফিরবে। পাছে মুখোমুখি হয়ে আমাকে চোখে পড়ে যায় আমি একটা থামের আড়ালে লুকোলাম, ভাবলাম, সবই তো দেখলাম, এখন আমাকে না দেখে ফেলে। স্থির করলাম, দেওয়ানজি খানিকটা এগিয়ে গেলেই মালাটা বের করে নিয়ে, চোরের উপরে বাটপাড়ি সমাধা করে নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে শুয়ে পড়বো।

মূর্তিকে এখন আর দেখতে পাচ্ছি না, তার পায়ের সন্তর্পিত চলার শব্দ শুনে বুঝতে পারছি এ যেন স্বপ্নগ্রস্তের পদধ্বনি, জাগ্রতের নয়।

এবারে মূর্তিটা আমার কাছে এসে পড়েছে, আমি নিঃশ্বাস রোধ করে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। এমন সময়ে চাঁদের

বাঁকা আলো তার মুখের উপরে এসে পড়লো।

এইবার অনির্বাণ থামলো। আমি এতক্ষণ রুদ্ধনিশ্বাসে শুনছিলাম, বললাম, থামলে কেন?

সে বলে উঠল, জগবন্ধু, জগবন্ধু, আমি নির্বোধ, আমি নিরেট আকাট ভরাট নির্বোধ, সুয়েজ খালের পূব দিকের জগতে এতবড় নির্বোধ আর নাই।

হঠাৎ কি হল? কি দেখলে?

কি দেখলাম বলো তো। কিছুক্ষণ থেমে বলল, তুমি বলবে কি করে?

আহা, কি দেখলে বলোই না।

সে মূর্তি দেওয়ানজির নয়।

সাগ্রহে বলে উঠলাম, তবে কে?

রাজাবাহাদুর।

রাজাবাহাদুর! কি বিশ্বাস হচ্ছে না। তোমাকে দোষ দিই না, চোখে দেখেও আমার বিশ্বাস হয়নি না।

আলো আঁধারিতে নিশ্চয় ভুল দেখেছ।

নিশ্চয় ভুল দেখিনি, হাত দুই দূরে থেকে দেখেছি।......কিন্তু সে কি মুখ!

কেন?

সে মুখে যেন নিদারুণ প্রতিহিংসার মুখোশ পরানো।

একটু থামলো, তারপরে, বলে উঠলো, সেই মুহূর্তে বুঝলাম হারাণের মৃত্যুর রহস্য।

মূর্তি কি তাকে খুন করেছে?

খুন করবার প্রয়োজন হয়নি। মুখের উৎকট বীভৎসতায়, অপ্রত্যাশিত সত্য উদ্ঘাটনে আঁতকে উঠে সে মারা গিয়েছে। মরবার আগে অজান্তে তার মুখ দিয়ে বের হয়েছিল, কর্তা—বাকিটুকু আর শেষ করতে পারেনি।

আমি বললাম, এখন মনে হচ্ছে কর্তা বলেই সে আর্তনাদ করে উঠেছিল।

হারাণের মরা মুখটা মনে পড়ছে? তাতে ছিল নিদারুণ আতঙ্কের ছাপ।

ছিল বটে।

যাক, কি দেখলে ভাই তুমি?

কি দেখলাম! দেখলাম পিশাচের মুখ।

কিন্তু রাজাবাহাদুরের মুখ তো প্রশান্ত প্রসন্ন দেবতুল্য মুখ।

দেবতা ও পিশাচ অবস্থাবিশেষে বড় কাছাকাছি।

এ যে মোতির মালা চুরির চেয়েও ঘন-তর রহস্য।

মিতান্ত মিথ্যে বলোনি।

তারপরে?

ঐ শোনা, এই অঘ্রাণ মাসেও কোকিল ডাকছে। বাংলা দেশের কোকিল পঞ্জিকা মেনে চলে না।

ও সব কবি কল্পনা এখন থাক।

থাকবে কেন। এখনি তো কবি কল্পনার সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। যে কল্পনা কবিতা লেখায় সেই কল্পনাই স্টীম এঞ্জিন উদ্ভাবন করে। যে কল্পনা জীবন রহস্য উদ্ধার করে সেই কল্পনাই উদ্ধার করে মোতির মালা। দীপ জ্বালাতেও আগুন, আবার ঘর জ্বালাতেও আগুন।

বিরক্ত হয়ে বলে উঠলাম, আবার অসহিষ্ণু শ্রোতাকে জ্বালাতেও আগুন। এখন দয়া করে রহস্যটাকে পরিষ্কার করো, হঠাৎ রাজাবাহাদুরের দেব মুখে পিশাচের মুখোশ কেন?

বলছি শোনো। জানো তো যে মানুষের মনের দুটো অংশ, একটা জাগ্রত চৈতন্য, আর একটা মগ্ন চৈতন্য। একটাকে বলতে পারি চৈতন্যের উপরতলা আর একটা নীচের তলা।

ও সব দর্শনে পড়েছি।

তুমি দর্শনে পড়েছ, আমি স্বচক্ষে দর্শন করলাম। এই দুই তলায় সব সময় বনিবনাও হয় না। মানুষ যখন রোগে শোকে বা নিদ্রায় দুর্বল হয়ে পড়ে তখন নীচের তলার চৈতন্য প্রবল হয়ে ওঠে, প্রবল হয়ে উঠে বের হয়ে আসে আর জাগ্রত চৈতন্যকে অভিভূত করে ফেলে নিজের অধিকার কায়েম করে। তখন মানুষ এমন সমস্ত কথা বলে বা কাণ্ড করে বসে তাকে পাগলামি বলে মনে হয় কিম্বা তার স্বভাবের ব্যতিক্রম বলে মনে হয়। তখন মানুষ যেন আর একটা ব্যক্তিতে পরিণত হয়ে যায়। সেই রাধা-মাধবপুরের জোতদারের ঘটনার কথা স্মরণ করে দেখো। মনে আছে তো?

এতক্ষণ ছিল না, এবারে মনে পড়ছে।

সে লোকটা রাতের বেলায় নিজের গোলা থেকে ধান চুরি করতো, আর দিনের বেলায় হা হুতাশ করে মরতো, কে ধান চুরি করলো ভেবে।

এখানে তার অনুরূপ কোথায় দেখলে?

রাজাবাহাদুরের মুখের পরিবর্তনের মুখোশে। এ দুই মানুষ এক নয় আবার

ভিন্নও নয়। সেই সন্ন্যাসীর ভবিষ্যদ্‌বাণী স্মরণ করো। যতদিন এই মোতির মালা তাহেরগঞ্জের রাজবংশের সমরক্ষে থাকবে ততদিন তাহেরগঞ্জের রাজবংশের ধারা থাকবে অক্ষুন্ন। কয়েক পুরুষের বিশ্বাসের ফলে এই ধারণা রাজবংশের রক্তধারায় গেঁথে গিয়েছে, ইচ্ছা করলেও তাকে বর্জন করবার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে এই রাজবংশের লোকে, বর্তমানে রাজাবাহাদুর।

তাই যদি হয় তবে পঞ্চাননকে দত্তক না নিলেই পারতেন।

ঐখানে জাগ্রত চৈতন্যের কারসাজি। কথাটা সে বিশ্বাস করে না। লোকে রাজাবাহাদুরকে মনে করিয়ে দিয়েছে দত্তক গ্রহণ না করলে, তা হলে মোতির মালা চলে যাবে বংশান্তরে। জাগ্রত চৈতন্য কথাটা হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। তারপরেই আরম্ভ হয়েছে মগ্ন চৈতন্যের লীলা।

কিন্তু পঞ্চাননকে দত্তক তো নিয়েছেন অনেককাল! এতদিন পরে কেন?

সেটাই স্বাভাবিক। দীর্ঘকাল দুই চৈতন্যে লড়াই চলেছে রাজাবাহাদুরের মনের মধ্যে। বিশেষ তখনো রাজাবাহাদুরের স্বাস্থ্য ভাল ছিল, শীঘ্র মারা যাবেন এমন আশংকা ছিল না, কাজেই মগ্ন চৈতন্য তার নীতি সম্পূর্ণ কায়েম করতে পারেনি। তারপরে ইদানীং যখন তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়লো, আর বেশী দিন জীবিত থাকবেন এমন আশা রইলো না, সুযোগ পেলো মগ্ন চৈতন্য। সে বাধ্য করলো রাজাবাহাদুরকে মোতির মালাটা চুরি করে লুকিয়ে রাখতে। সে বোঝালো, তা হলে মালাটা পঞ্চাননের হাতে পড়বে না।

কিন্তু রাজাবাহাদুরের মৃত্যু হলেই যে রাজবংশ লোপ পাবে, তখন অন্য বংশের লোকের হাতে মালাটা পড়া-না-পড়া সমান হয়ে যাবেনা কি!

এত কথা বোঝে কে? মগ্ন চৈতন্যের যুক্তিশাস্ত্র আর জাগ্রত চৈতন্যের যুক্তিধারা এক নয়। দেখো ভগবন্ধু, আমরা যে লজিক পড়ি তা জাগ্রত চৈতন্যকে নিয়ে। কোনদিন যদি মগ্ন চৈতন্যের লজিক লিখিত হওয়া সম্ভব হয় তবে তোমার প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে। জাগ্রত চৈতন্যে রাজাবাহাদুর পঞ্চাননকে সত্যই ভালবাসে আর মগ্ন চৈতন্যে তাকে পরম শত্রু বলে মনে করে। রাতের বেলায় সে-ই তাকে শত্রুতাসাধন করিয়েছে পঞ্চাননের বিরুদ্ধে।

অনির্বাণ, তোমার এই যুক্তিধারা সবাই মানবে বলে মনে হয় না।

কিন্তু যে সেই বিভীষণ মুখ একবার দেখেছে বিশ্বাস না করে তার উপায় কি?

কি রকম দেখলে আর একটু বিস্তারিত করে বলো।

দেখলাম তো এক মুহূর্তের জন্যে, তারপরে তিনি স্বপ্নচালিতের মতো অন্দর মহলের দিকে চলে গেলেন।

তবু—

দেখে মনে হল, তাহেরগঞ্জের রাজবংশের বিগত দশ-বারো পুরুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা বংশরক্ষার উগ্র সংকল্প ঘনীভূত হয়ে শানিত ছুরি হাতে দেখা দিয়েছে রাজাবাহাদুরের মুখের প্রত্যেকটি মাংসপেশীতে। ও আর রক্তমাংসে গড়া নয়, ও যেন কঠিন ইস্পাতে নির্মিত। মানুষের মুখ যে এমন ধাতবগুণসম্পন্ন হতে পারে না দেখলে বিশ্বাস হতো না। অথচ এই মানুষটিই দিনের বেলায় পঞ্চাননের হাজতবাস স্মরণ করতে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠ হয়েছে।

তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, সুযোগ পেলে মগ্ন চৈতন্যের প্রেরণায় রাজাবাহাদুর খুন করে ফেলতে পারেন পঞ্চাননকে।

পারেনই তো। সেই জন্যেই প্রস্তাব করেছি পঞ্চাননকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার, অবশ্য তার অন্য কারণ দর্শিয়েছি।

আমি আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করলাম, তার পরে?

আট দশ মিনিট লাগলো অসম্ভবকে পরিপাক করতে। অপ্রত্যাশিতের চমক কাটলে একছুটে গিয়ে সেই কুলুঙ্গি থেকে মোতির মালাটা বের করে পকেটস্থ করলাম, তারপরে তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে এলাম, দেখলাম তুমি অঘোরে নিদ্রা যাচ্ছ। আশা করি, এবারে ঘটনাশৃংখল বেশ পরিষ্কার হয়েছে।

কেবল একটা বিষয় ছাড়া—

কি, বলো?

মালার সেই বাক্সটা গড়খাইয়ের ধারে পাওয়া গেল কি করে?

ওটা অপরিষ্কার থেকেই যাবে, কেননা, হারাণের মৃত্যুর সঙ্গে ব্যাপারটা জড়িত। আমার মনে হয়, ঐ কুলুঙ্গিতে বাক্সসুদ্ধ মালাটি ধরেনি, তাই রাজাবাহাদুর মালাটা কুলুঙ্গিতে রেখে বাক্সটা বাইরে ফেলে দিয়েছিলেন। হারাণ সেটা কুড়িয়ে পায়, তবে সেটা নিজের কাছে রাখা নিরাপদ মনে করেনি, তার কাছে পাওয়া গেলে পঞ্চানন যে মালা নিয়েছে এ ধারণা নিশ্চিত বলে প্রমাণিত হবে, তাই সে লুকিয়ে গিয়ে গড়খাই-এর কাছে ফেলে দিয়েছিল। হারাণ অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও বিশ্বাসী। এমন ভৃত্য অনেক ভাগ্যে মেলে। আর কিছু জানতে চাও?

আপাতত আর কিছু নয়। ভাই অনির্বাণ, তুমি কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়ে এটাকেই পেশা হিসাবে গ্রহণ করো। শখের কবিতার চেয়ে শখের গোয়েন্দাগিরি অনেক লাভজনক। কবিতা লিখে কার কি লাভ হয়?

সেটাও যে গোয়েন্দাগিরির অংশ। কবিতা লেখায় বুদ্ধিতে শান পড়ে, তারপরে সেটা খাটাই গোয়েন্দাগিরিতে। আরে ঐ শোনো কোকিলটা এখনো ডেকেই চলেছে।

ওটা অন্য কোকিল, ইতিমধ্যে রাজহস্তী অনেক পথ অতিক্রম করেছে।

পৃথিবীর সব কোকিলই এক। কীটসের নাইটিংগেল কবিতাটি মনে করে দেখো।

পরিশিষ্ট

পঞ্চাননকে নিয়ে আমরা কলকাতায় ফিরে এসেছি। সে এখন আমার বাড়িতেই আছে। বলা বাহুল্য, মোতির মালা চুরির রহস্য তাকে বলিনি, বলেছি যে মালাটা যথাস্থানেই ছিল, বাকি সমস্তই দৃষ্টিবিভ্রম-জনিত। জানি না, ও বিশ্বাস করেছে কি না। দিন পনেরো পরে পঞ্চাননের নামে টেলিগ্রাম এলো, রাজাবাহাদুর হঠাৎ মারা গিয়েছেন, শীঘ্র এসো। তিনজনেই রওনা হলাম, পঞ্চানন আমাদের ছাড়লো না। তাহেরগঞ্জে গিয়ে শুনলাম যে, রাতের বেলায় হঠাৎ তেতালার ছাদ থেকে পড়ে রাজাবাহাদুর মারা গিয়েছেন। অনির্বাণ আমাকে আড়ালে বলল, এরকম কিছু হবে বলেই আশঙ্কা করেছিলাম।

শেষ পর্যন্ত সেই সন্ন্যাসীর ভবিষ্যদ্বাণীটাই সফল হয়েছে। তাহেরগঞ্জ রাজের আর সে জৌলুস নাই, বড় বড় অনেক পরগণা হস্তান্তরিত হয়ে গিয়েছে, আজ রাজবাড়িটা আর সামান্য কিছু সম্পত্তি আছে যাতে কোন রকমে দিনাতিপাত করা সম্ভব। কালাশৌচ অন্তে পঞ্চানন বিবাহ করলো। এখন সে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে একজন অফিসার। কলকাতাতেই থাকে, কালেভদ্রে যায় তাহেরগঞ্জে। ইতিমধ্যে অনেক কিছুরই পরিবর্তন হয়েছে, অপরিবর্তিত কেবল অনির্বাণের চুরুট, যা সর্বদা অনির্বাণ-এর সমান দীপ্তিমান।

[সমাপ্ত]

পুস্তিকা পাঠ করিয়া আমি যৎপরোনাস্তি মুগ্ধ হইয়াছি। দয়াপূর্বক আমাকে ধর্ম-শিক্ষা ও দীক্ষা দিবেন—ডাকযোগে। নমস্কারান্তে।

ভবদীয়া বার্বারা

চিঠিটা পেয়ে ওরিজেন তাঁর সেক্রেটারিকে ডেকে পাঠালেন, বললেন, "এই চিঠিটা একবার পড়ে দেখুন তো...আমি আর কি করে যাব...আপনি যদি..."

"আচ্ছা, যাব..." সেক্রেটারি বললেন। সেক্রেটারির নাম ছিল বাজিল—যাজক বাজিল।

"যাজকীয় আলখাল্লা পরে যাবেন না...ছদ্মবেশে যাবেন। নইলে বার্বারার সংকীর্ণ-মনা পিতা আপনাকে সন্দেহ করবেন...। এখন প্রশ্ন : কি রকম ছদ্মবেশ পরে যাবেন?"

"রাজমিস্ত্রি সাজলে কেমন হয়?..."

"হয় না...একে তো ওই কারাগারে কোনো রাজমিস্ত্রির কোনো প্রয়োজনই নেই; তাতে আবার আপনি রাজমিস্ত্রিই নন।"

"তাহলে বাগানের মালী?..."

"পাগল না মাথা খারাপ?..." ওরিজেন উত্তর দিলেন; [সুধী পাঠক মনে রাখবেন, যাজক বাজিল শুধু যাজক নন, ওরিজেনের সেক্রেটারি—আর তাঁর বন্ধুও বটে, কাজেই ওই অশোভন সম্বোধনটা যতখানি কানে লাগে ততখানি আপত্তিজনক ছিল না] "বাগানের মালী হলে কি কৈফিয়তে প্রবেশ করবেন মিনারের ভিতরে?...পাঁচ তলা-নিবাসী বার্বারাকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে শিক্ষা দেবেন?...আর দীক্ষাস্নানের জলই বা কেমন করে ঢালবেন ওর কপালে...hose দিয়ে?"

"তা-ই তো..." বাজিল মাথা নাড়লেন। হঠাৎ তাঁর মগজে একটা বুদ্ধি খেলল : "ডাক্তার সেজে যাব..."

"বাঃ, এই তো..." ওরিজেন বললেন, "আর যাজকমাত্রই তো ডাক্তার—আধ্যাত্মিক চিকিৎসক। একটু দাঁড়ান, আমি বার্বারার কাছে একটা চিঠি লিখে দিই : ওর সংকীর্ণমনা বাবাকে ও বলুক ওর অসুখ করেছে...। আর সত্যিই তো ওর আধ্যাত্মিক অসুখ হয়েছে।"

বার্বারা যখন কাঠের এক বাক্স সন্দেশের অন্তরালে চিঠিটা আবিষ্কার করল, তখন তার আনন্দ দেখে কে!... ওরিজেনের সই-টা কেটে বার্বারা ওর অটো-গ্রাফের খাতায় সেঁটে নিল; তারপর, ওর পাঁচ তলার ঘরের কোণে যে 'প্রয়োজনের ঘণ্টা' রাখা ছিল, তা দু হাতে বাজাতে লাগল—জানালার সামনে দাঁড়িয়ে।

দিয়োস্কোরাস বাগানের এক বেঞ্চিতে বসে, দৈনিক সংবাদপত্র পড়ছিলেন অভিনিবিষ্ট হয়ে। ঘণ্টা শুনে মুখ তুলে দেখলেন, ওঁর চোখের মণি বন্দিনী বার্বারা ওঁকে কিছু বলতে চাচ্ছে।

"কি হল, বার্বারা?" চেঁচিয়ে জিগ্যেস করলেন।

"আমার যেন কেমন কেমন লাগছে..."

পাঠক লক্ষ্য করে থাকবেন, বার্বারা আমার শরীর ভালো নেই বলল না; বলল শুধু, 'আমার কেমন কেমন লাগছে...' শরীর নয়, আত্মা-ই তার অসুস্থ।

দিয়োস্কোরাস এবার বিপদে পড়েছেন... প্রথমে ভাবলেন, "এ পি সি ট্যাবলেট কলকের বড়িতে পাঠাব...", পরে ভাবলেন "এ পি সি না, কোডোপাইরিন..." ভাবতে ভাবতে হঠাৎ দেখলেন, কে যেন ঐদিকে এগিয়ে আসছে।

"এদিকে কোথায় যাচ্ছেন, মশায়?..."

রূঢ় কণ্ঠে তিনি বললেন, "ফাগানের ফটকে বিজ্ঞাপন দেখেননি : প্রবেশ নিষেধ?..."

"হ্যাঁ...না...মানে...এমনি ঘুরছিলাম রোগীর খোঁজে...আমি চিকিৎসক কিনা..."

"চিকিৎসক?...আপনি সত্যি সত্যি চিকিৎসক?" এখনকার মতো মনঃসঙ্কীর্ণতা ঝেড়ে ফেলে দিয়োস্কোরাস বললেন, "তাহলে জলদি আসুন, আমরা এই মিনারের দেওয়ালে সিঁধ কাটি..."

সিঁধ কাটা অবশ্য চিকিৎসকের বৈশিষ্ট্য নয়, তবে পাঁচ তলার মিনারের দরজাটার তালাটা অনেক দিন হাত না দেওয়ার অব্যবহার্য হয়ে উঠেছিল; তা ছাড়া মরচে-ধরা তালাটার চাবিও বহু কাল থেকে নিখোঁজ।

বাজিল শাবল চালাতে চালাতে জিগ্যেস করলেন : "ব্যায়াম হিসেবে সিঁধ কাটার উপযোগিতা বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ; কিন্তু...আপনার আসল অভিপ্রায়টি কি, বলুন তো?"

"কি আবার...আমার চোখের মণি বার্বারার কেমন কেমন করছে। আমার ইচ্ছা, আপনি যদি ওর একটু দেখাশোনা করেন... দু' তিন দিন থাকবেন...তারপর আমি আবার দেওয়ালটা টাইট করে বন্ধ করে দেব।"

বাঁকানো সিঁড়ি বাইতে বাইতে বাজিল ধাপগুলো গুনে চললেন : "এক শো উনিশ, এক শো কুড়ি, এক শো একুশ...নমস্কার... তাড়াতাড়ি একটা চেয়ার দিন, আমার মাথা ঘুরছে।"

চেয়ার ছিল না বলে বার্বারা বাজিলকে বসাল নিজের খাটে। হাতপাখায় বাতাস করতে লাগল। বাজিল চা খেয়ে, দুধ খেয়ে একটু তাজা যখন বোধ করলেন, বার্বারা সহসা বলল, "দিনরাত আমাকে পড়াবেন... কড়া কফি আপনাকে খাওয়াব...তিন দিনের মধ্যেই আমার ধর্মশিক্ষা যাতে শেষ হয়..."

ছাত্রী ছিল বুদ্ধিমতী : তিন দিনের দিনই শিক্ষা সমাপ্ত হওয়াতে বার্বারা বাজিলের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করল।

হঠাৎ শোনা গেল দিয়োস্কোরাসের কণ্ঠ : "কেমন লাগছে আজ, বার্বারা?"

"অনেক ভালো, বাবা..."

"এবার তাহলে তোমার চিকিৎসককে নমস্কার জানিয়ে বিদায় দাও...নইলে ওঁর বাড়িতে সবাই ভাববে উনি হারিয়ে গেছেন।"

"আবার আসবেন..." বলে বার্বারা বাজিলকে প্রণাম করে বিদায় দিল।

অগ্নিপরীক্ষা

দিয়োস্কোরাস এবার বিলিতি মাটি আর বালি মেশাতে লাগলেন—দেওয়ালের মেরামতের জন্য। বার্বারা কিন্তু আবার ঘণ্টা বাজাল : "বাবা, এক কাজ করবে আমার জন্য?...আমার এই পাঁচ তলার ঘরে দুটো জানালা আছে, আর একটা করে দিলে ভালো হয়..."

"মানে?"

"তিনটে জানালা থাকলে ত্রিপুরুষ পরমেশ্বরের কথা ভাবতে সুবিধে হত : পিতা, পুত্র, আত্মা..."

"কি?..." দিয়োস্কোরাস গর্জন করে উঠলেন, "তুমি খ্রীষ্টানের মতো কথা বলছ?"

"হ্যাঁ, বাবা, আমি খ্রীষ্টান বলেই খ্রীষ্টানের মতো কথা বলি।"

দিয়োস্কোরাস রাগে উন্মাদ হয়ে, তরবারি হাতে, সেই বাঁকানো সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলেন। এত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন যে সিঁড়ির এক অন্ধকার কোণে লুকিয়ে-থাকা বার্বারাকে তিনি দেখতেই পেলেন না। তন্ন তন্ন করে পাঁচ তলার সেই ঘরটাকে খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু বৃথা... বার্বারা ইতিমধ্যে গোধূলির আলো-ছায়ায়, কালো একটা চাদর পরে, নিকটবর্তী এক জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েছে।

একদিন এক কাঠুরে তাকে দেখতে পায়; বকশিশের লোভে সঙ্কীর্ণমনা দিয়োস্কোরাসের কাছে খবর দেয়। দিয়োস্কোরাস তাঁর তরবারিতে শান দিলেন, ছুটলেন ওই জঙ্গলের দিকে, বার্বারার অনুসন্ধানে।

দূর থেকে তাকে দেখতে পেলেন, সন্তর্পণে এগুতে লাগলেন। ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে দেখলেন, হাঁটু গেড়ে বসে আছে বার্বারা একটা গাছের সামনে; সেই গাছের গুঁড়িতে সে এঁকেছে এক ক্রুশ-মূর্তি। হাত জোড় করে প্রার্থনা করছে বার্বারা : "...আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর, প্রভু, আমরা যেমন আমাদের অনিষ্টকারীদের ক্ষমা করেছি...আর আমার বাবার মন ফেরাও, প্রভু...উনি যেন বোঝেন, আমি তোমার সেবিকা বলে তাঁকে কম ভালোবাসি না, কম শ্রদ্ধা করি না...কিন্তু সর্বোপরি ভালোবাসি, সর্বোপরি শ্রদ্ধা করি তোমাকেই, প্রভু!"

সুধী পাঠক নিশ্চয়ই ভাবছেন, সেই তো কপট খাঁটি উপসংহার, সেই প্রচলিত মিলনাত্মক যবনিকা-পতন : এখুনি দিয়োস্কোরাস অশ্রুসিক্ত চোখে তাঁর কন্যাকে আলিঙ্গন করে বলবেন, "আদুরী মেয়ে আমার...কত নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছি তোমার সঙ্গে...কিন্তু আর না...আজ থেকে আমার সর্বপ্রকার স্বার্থপরতা পরিত্যাগ করে তোমার প্রতি আমি [illegible] ভালোবাসা দেখাব; খ্রীষ্টান হয়ে সুখী হব, বার্বারা... আর আমার জন্য প্রার্থনা করো, আমি যেন [illegible] ... [illegible] পারি, পালন করতে শিখি...।"

কিন্তু না, দিয়োস্কোরাস [illegible] এখনও অন্ধ : [illegible] তুমি [illegible] হাতে [illegible] প্রাণ দেবে...।"

বার্বারা অস্বীকার করাতে দিয়োস্কোরাস তার চুল ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন গভীর জঙ্গলে। যখন আর পারলেন না, থামলেন...বার্বারা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ওঠার আগেই, তার পিতার তরবারির আঘাতে ধুলোতে লুটিয়ে পড়ল তার শির।

বাচ্চুর বোনটি বলল, "জানেন, আমাদের ক্লাসের টীচারের নামও বার্বারা; উনিও খ্রীষ্টান। মানুষটা খুব রাগী আর খিটখিটে ...ভাবি, ওঁর কি বাবা নেই?...নাকি তিনি সঙ্কীর্ণমনা নন?...নাকি ছোরা-ছুরি একটাও নেই বাড়িতে?"

সেদিন কথায় কথায় দিলীপ বলছিলো—
“আমি জেতাতে মার সেকি আনন্দ যদি দেখতেন!”
Cadbury's
Bournvita
the ideal food drink for strength and vigour
450g

সোসাইটি অব কনটেম্পোরারী আর্টিস্টস-এর সভ্যবৃন্দ সম্প্রতি বিড়লা অ্যাকাডেমিতে তাদের একাদশ বার্ষিক প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করেন। কলকাতার বিভিন্ন শিল্পী সংস্থার মধ্যে সোসাইটি অব কনটেম্পোরারী আর্টিস্টস একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। তার কারণ

দি পার্টি —বিকাশ ভট্টাচার্য

সংস্থার প্রায় প্রত্যেক সভ্যই আপন আপন শিল্পকর্মের জন্য সুনাম অর্জন করেছেন। সবচেয়ে বড় কথা প্রত্যেকে নানা মাধ্যম ও রীতিতে নিয়মিতভাবে কাজ ও পরীক্ষা করে যান, অথচ প্রত্যেকের রচনাতেই আপন আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে চলেন। এই সংস্থার আর একটি বিশেষত্ব এই যে, সভ্যগণ সকলেই প্রগতিবাদী ও সমকালীন ধারার মধ্য দিয়ে বক্তব্য প্রকাশ করার চেষ্টা করেন। তাই প্রদর্শনীতে পদার্পণ করা মাত্রই আধুনিক কলাধারার বিভিন্ন রীতি ও আঙ্গিক দর্শকমনে দাগ কাটে। আরও একটি বিষয়ের কথা বলা চলে—সেটি হল নির্বাচন পদ্ধতি। দু'চারটি ছাড়া প্রায় প্রত্যেক রচনাই সুনির্বাচিত। প্রদর্শনীতে ১২ জন শিল্পী সভ্যের ৪৪টি নিদর্শন দেখা যায়। সাতটি গ্রাফিক প্রিণ্ট, দুটি কোলাজের কাজ ছাড়া প্রদর্শনীতে তেলরঙে আঁকা ছবির সংখ্যাই অধিক, যদিও গুয়াশ ও টেম্পারায় আঁকা ছয়টি ছিল। রীতি হিসাবে বিমূর্ত, সমবিমূর্ত ও সমসাররিয়ালিস্টিক নিদর্শন দেখা যায়।

প্রথমেই চোখে পড়ে সোমনাথ হোড়ের উডপ্রিণ্টগুলি। সুনির্বাচিত কয়েকটি রঙে নীরেট কাঠের ব্লকের প্রিণ্টের মধ্য দিয়ে শিল্পী যেন তাঁর কাজে আকার ও আয়তনিক রূপের সমন্বয় ঘটিয়েছেন। যেমন, লাল, নীল ও গ্রে রঙ প্রধান ২১ নং প্রিণ্ট। এই শিল্পীর প্রধান গুণ, তিনি প্রিণ্টে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেন কিন্তু আকারকে অধিক প্রাধান্য দেন। বিকাশ ভট্টাচার্য সমসাররিয়ালিস্টিক রচনার পক্ষপাতী। বলিষ্ঠ চিন্তাধারা তথা অঙ্কন কৌশল গুণে তাঁর দুটি রচনা দৃষ্টি আকর্ষণ করে—শী ও দি পার্টি। প্রথমটিতে একটি যুবতী, সুন্দরী নারীর মুখের সঙ্গে কঙ্কালসর্বস্ব দেহ এঁকে শিল্পী সম্ভবত রূপ যৌবনের অসারতা ব্যাখ্যা করেছেন। দ্বিতীয়টি কোলাজ—উচ্ছৃঙ্খলতার ক্ষেত্রে সমাজের বঞ্চিতদের প্রতিক্রিয়া ও তার

স্কেচ —সুচিত্রা মিত্র

বিভিন্ন প্রতীকগুলির সু-সংস্থাপনই এটির বিশেষত্ব। সনত করের রচনা সমবিমূর্ত শ্রেণীর—পশ্চাদ্ভূমির অধিকাংশ স্থান শূন্য রেখে রেখামাধ্যমে তিনি দৃশ্যমান বস্তুর অবতারণা করেছেন। সব কয়টি ভাল না হলেও ২৪ নং চোখে পড়ে। সাধারণের পক্ষে ড্রিমারস জটিলতর বলে মনে হয়। দীপক ব্যানার্জীর গ্রাফিক প্রিণ্টের মধ্যে ইমেজারী ও খোদাই কাজের দিক থেকে লাল রঙ প্রধান ১১ নং উল্লেখযোগ্য। টেম্পারা ব্যবহারে গণেশ পাইন স্বকীয়তা বজায় রেখেছেন। রঙ ব্যবহার প্রণালীর মধ্য দিয়েই তাঁর শিল্প-নৈপুণ্য ফুটে ওঠে—যেমন অরেঞ্জ ইন রেন। সম্ভবতঃ জন্মাষ্টমীর বৈশিষ্ট্যটুকুই তিনি নতুনভাবে রূপায়িত করেছেন। তাঁর আর একটি কাজ সকলকে মুগ্ধ করে—

পোস্টার —সুব্রত বসু

ফেস্টিভ্যাল। সুহাস রায়ের রচনা রীতি-মুখর, এবং এদিক থেকে বিচার করলে চার্চ একটি সুন্দর সৃষ্টি। আকাশের বুকে রাত্রির মায়াময়ীর চাঁদ, পাদভূমিতে আলঙ্কারিক রীতিতে আঁকা গাছ ও তারই পেছনে আলোকস্নাত গীর্জা। সুনীল দাশের রচনাগুলি ইতিপূর্বে দেখেছি—বিরাট রচনাক্ষেত্রটি শূন্য রেখে তিনি প্রতীক-মূলক নানা চিহ্ন সিঁদুর রঙে ফুটিয়ে তুলেছেন (২৭ ও ২৯ নং)। মানু পারেখের সাম্প্রতিক রচনায় রঙ ব্যবহার রীতির পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। রঙ নির্বাচন ও প্রতীক সু-সংস্থাপনের জন্য ৩৯ ও ৪০ নং মন্দ লাগে নি। লালু শ-র কাজে লোক-চিত্রের প্রভাব দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে প্রতীকমূলক ৩৩ নং উল্লেখযোগ্য। রঙ ও রেখা মাধ্যমে রচনাক্ষেত্র ভরিয়ে ফেলার

সামঞ্জস্য সমন্বয়ের বৈশিষ্ট্য। সু-নির্বাচিত ও উজ্জ্বল রঙ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে "উইন্ডচার্জার"-এ শিল্পী বক্তব্যটুকু প্রকাশ করেছেন। শৈলেন মিত্রের আধুনিকতম কম্পোজিশন রঙ ব্যবহাররীতি বিশেষভাবে চোখে পড়ে। তাঁর ব্রাশের টানে গতিবেগ ফুটে উঠেছে—যেন জিপসীর নাচের মত। তিনি বৃত্ত ও অর্ধ বৃত্তাকারে রঙের রেখা এঁকেছেন, আবার কোথাও বা রঙ ছড়িয়ে ও ছিটিয়ে দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে কালো, হলুদ ও লাল রঙপ্রধান ১নং কমেপোজিশনের নাম করা যায়। তবে ৩৮ নং অপেক্ষাকৃত দুর্বল। অনিলবরণ সাহা চাপা ও উজ্জ্বল দুই-ই ব্যবহার করেছেন। অপরগুলি রসোত্তীর্ণ না হলেও এজিং নাম অনেকের ভাল লাগে। বিশেষ করে হলুদ রঙের সুকৌশল ব্যবহাররীতির জন্য এটির স্বাতন্ত্র্য ধরা পড়ে।

*

নিয়মায় বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান দেওয়া হয় ও শিক্ষার্থীগণ নিজ নিজ শিক্ষাধারায় স্বাধীনভাবে আপন আপন রুচি ও চিন্তাধারা অনুযায়ী কাজ করতে পারেন তার পরিচয় পাওয়া যায় সম্প্রতি অনুষ্ঠিত কলকাতা সরকারী আর্ট কলেজের বার্ষিক প্রদর্শনীতে। বিভিন্ন বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী রচিত পাঁচ শতের অধিক নিদর্শন প্রদর্শনীতে দেখা যায়। সব বিভাগের কাজের নানা নিদর্শন দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ড্রয়িং তথা উল্লেখযোগ্য ছবির প্রতিলিপি অংকনপ্রথার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দান করা হয়। তেল ও জলরঙের ছবি দেখে মনে হয় যে, আধুনিক চিন্তা বা

কমপোজিশন-৩ —কাঞ্চন দাশগুপ্ত

অংকনধারায় উদ্বুদ্ধ হলেও ছাত্র-ছাত্রীরা অহেতুক নতুন কোনও স্টান্ট সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন নি। রীতির দিক থেকে, বিমূর্ত, সর্মাবিমূর্ত ইম্প্রেশানিস্টিক রচনা অনেক দেখা যায়। সবচেয়ে বড় কথা, দু'চারটি উৎকৃষ্ট নিদর্শনও চোখে পড়ে যেগুলি অন্য কোনও বার্ষিক প্রদর্শনীতে অনায়াসে পুরস্কার লাভ করত। কলকাতা আর্ট কলেজের একটি নিজস্ব ঐতিহ্য আছে। নিদর্শনাদি দেখে বোঝা যায় যে সুযোগ্য অধ্যক্ষ শ্রীচিন্তামণি কর ও তাঁর সহশিল্পী শিক্ষকবৃন্দ সেই ঐতিহ্যই বজায় রেখে চলেছেন।

জলরঙ, গ্রাফিক ও স্কেচ বিভাগে ক্ষুদিরাম মাইতির ল্যান্ডস্কেপ, গোবিন্দ রায়ের সানলাইট ফ্লো, সুনন্দা সিংহের দুটি স্কেচ ও গ্রাফিক প্রিণ্ট, দীপক দাসের রীতিজাদুঘর লিথোপ্রিন্ট রথযাত্রা, মাধবী ভকতের নীলরঙপ্রধান গ্রাফিক প্রিণ্ট ও সুস্মিতা ... স্কেচের নাম করা যায়। ছাত্র-ছাত্রীরা যে যত্ন সহকারে প্রাথমিক অঙ্কনবিদ্যা আয়ত্ত করেছেন ইণ্ডিয়ান পেণ্টিং বিভাগের নানা কাজ দেখে তা বোঝা যায়। পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক কাহিনী থেকে শুরু করে উপকথা ও কল্পনাশ্রিত নানা বিষয়বস্তু ছাত্র-ছাত্রীরা জলরঙে ভারতীয় রীতিতে এঁকেছেন। তাদের মধ্যে স্বপন সেন (প্রিন্সেস অন হংস), অনুকণা বসু (কমপোজিশন), নীলিমা মুখার্জী (রাগিণী) ও শিজন সামন্ত (রেড প্যাভিলিয়ন) প্রশংসা দাবী করতে পারেন। ড্রয়িং ও পেণ্টিং বিভাগে সমকালীন ও রিয়ালিস্টিক দুই শ্রেণীর রচনা দেখা যায়, সেই সঙ্গে কয়েকটি প্রতিকৃতি ও লাইফ স্টাডি নজরে পড়ে। বিমূর্ত সর্মাবিমূর্ত ও সমকালীন কমপোজিশনে বিশ্বপতি মাইতি (১৫৭) সুস্মিতা নন্দী (১৬১, ১৬২), গীতা বর্মণ (১৬৭), শিখা ব্যানার্জী (১৬৫), কাঞ্চন দাশগুপ্ত (১৫০) ও আনন্দ রায় (১৩৬) কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। অল্প সংখ্যক হলেও প্রচার চিত্র বিভাগে ১৭৯ (জ্যোতির্ময় চ্যাটার্জী), ১৭০ (মাধব দাশ) ও ১৭৮ (কাঞ্চন দাশগুপ্ত) প্রশংসার যোগ্য। মাত্র দশটি নিদর্শন দেখা গেলেও ভাস্কর্য বিভাগের বিশেষত্বটুকু সহজেই ধরা পড়ে। কাঠ, সিমেণ্ট ও মাটি মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা কাজ করেছেন, তবে প্রায় প্রত্যেকটির মধ্য দিয়ে সমকালীন ভাস্কর্যের চিন্তাধারা ও গঠন কৌশল প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষ করে কাঠের কাজে নেগেটিভ ফর্মের ওপর প্রাধান্য দান নিদর্শনগুলিতে এক নতুন রূপ আরোপিত করেছে। এই প্রসঙ্গে জ্যোতির্ময় বিশ্বাস (৩২৫), ফণী জানা (৩২৮, ৩৩২, ৩৩৩)-র নাম করা চলে।

রঙীন ও রুচিসম্মত নানা প্রাচীরপত্র, জ্যাকেট, ক্যালেণ্ডার, শো কার্ড দেখে বোঝা যায় যে, কমার্শিয়াল বিভাগের ছাত্রছাত্রীরাও আধুনিক যুগের প্রচারশিল্পের চাহিদা অনুযায়ী নানা জিনিস উদ্ভব করতে শিখছেন। এই বিভাগে সুব্রত বোস (২১৭), প্রেমকিশোর ঘোষ (১৯০), মঞ্জুলা রায় (২২০), মলয় ভট্টাচার্য (২৫০), সুব্রত দাশ (২৭০), শেখর সিংহ (২৮২), ডালিয়া বসাক (২৮৪) ও সংঘমিত্রা বিশ্বাস (২৭৩) রুচি, প্রতিভা ও চিন্তাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। কারুকলা বিভাগে চামড়া ও কাঠের নানাবিধ ব্যবহারযোগ্য বস্তু ও বাটিকের বিভিন্ন নিদর্শন দেখা যায়। কারুকার্যখচিত (embossed) চামড়ার সুদৃশ্য ছোট বড় মানিব্যাগ থেকে শুরু করে ভ্যানিটি ব্যাগ, হাতঘড়ির বন্ধনী ও বিশেষ করে দেশলাই ও ট্রানজিস্টার কভার উল্লেখযোগ্য। কয়েকটি অ্যালবাম ও প্যাডের ডিজাইনে আধুনিক রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে রত্না দত্ত, অসীম রায় ও সুদিন মাইতির নাম করা চলে। বাটিক বিভাগে কয়েকটি ছবির—বিশেষ করে মোম ব্যবহার রীতির জন্য সুদিন মাইতি ও দেবাশীষ সরকার প্রশংসা দাবি করতে পারেন। কাঠের তৈরী নানা বস্তুর মধ্যে ফুলদানী, ট্রে ও খেলনা অনেকের ভাল লাগে।

চিত্রপ্রিয়

একটি সেণ্টিমেণ্টাল জার্নি

কৃষ্ণা বসু

যে কোন ভারতীয়ের পক্ষে আন্দামান যাওয়ার একটা আলাদা সেণ্টিমেণ্টাল মূল্য আছে। কারণ, আন্দামানের সঙ্গে আমাদের অনেক দুঃখ বেদনা ও গৌরবের স্মৃতি জড়িত। আমরা আন্দামান চলেছি শুনে বয়সে যাঁরা প্রবীণ তাঁরা সভয়ে বললেন, ওরে বাবা! কালাপানি। এত জায়গা থাকতে ওখানে কেন? আর বয়সে যারা নবীন, স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনগুলি যাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় নেই, শুধু ইতিহাসের পাতায় আছে, তারা বললে, শুনেছি সে একটা বিউটিফুল প্লেস, আইডিয়াল ফর হানিমুন, তা তোমরা কি হানিমুনে চললে নাকি? আমাদের মনে কিন্তু কালাপানির বিভীষিকাও ছিল না, হানিমুনের স্বপ্নও নয়। পুণ্যলোভাতুর তীর্থযাত্রীর মন নিয়ে আমরা আন্দামান গিয়েছিলাম। আন্দামান যাত্রা আমাদের কাছে ছিল এক ধরনের একটি সেণ্টিমেণ্টাল জার্নি।

আমাদের বিমান যখন পোর্ট ব্লেয়ার বিমানঘাঁটিতে অবতরণের উদ্যোগ করছিল তখন মনের মধ্যে এক অবর্ণনীয় উত্তেজনা অনুভব করছিলাম। দিগন্তবিস্তারিত নীল সমুদ্রের উপর দিয়ে উড়ে এসে সবে তখন কিছুক্ষণ হল আন্দামানের গাঢ় সবুজ তীরভূমি চোখে পড়েছে। এরোপ্লেনের মধ্যে ক্যাপ্টেনের কণ্ঠস্বর ভেসে এল—

Now I'll give you a good view of Port Blair if you look to the left of the aircraft—

...সচকিত হয়ে নীচে তাকাতেই চোখে পড়ল সুউচ্চ সেলুলার জেল আন্দামানের নগর-পটভূমির ওপর সদর্পে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। কত দিনের ছবিতে দেখা আজ চোখের সামনে দেখতে পেলাম। তুলনাটা বেমানান হবে কিন্তু লুভরে যখন মোনালিসার সামনে দাঁড়ালাম তখন যেমন মনের ভাব হয়েছিল একেবারেই অন্য পরিপ্রেক্ষিতে হলেও সেই রকমই মনের ভাব হল।

আন্দামানের ঘর বাড়ি সব কাঠের তৈরী। তার মধ্যে এই সাতমহলা বিরাট তিনতলা ইঁটের বাড়ি বানিয়েছিল কেমন করে ভাবতে আশ্চর্য লাগে। সহযাত্রী বললেন, শোনা যায় রেঙ্গুন থেকে জাহাজ বোঝাই হয়ে ইঁট এসেছিল আর কয়েদীর মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এই অট্টালিক [illegible] করেছিল। এখন অবশ্য তিনটি উইং অবশিষ্ট আছে। বাকী চারটে ভেঙে ফেলা হয়। এমন একটা ঐতিহাময় বাড়ি ভেঙে ফেলা হল শুনে আশ্চর্য হলাম। সেলুলার জেলের ইতিহাস তো আজকের নয়। সিপাহী বিদ্রোহের "বিদ্রোহী"দের দ্বীপান্তর দেবার উদ্দেশ্যেই প্রথম আন্দামানে পেনাল সেটেলমেন্ট বা দণ্ডিতদের বসতি গড়ে তোলা শুরু হয়। তারপর স্বাধীনতা সংগ্রামের এক একটি ঢেউ এসে আন্দামানের তটভূমিতে আঘাত করেছে আর কত বিপ্লবীদের পদচিহ্ন পড়েছে তার কুখ্যাত কারাগারে তার ঠিকানা নেই। কবি বায়রনের ভাষায় বলতে ইচ্ছে হয়—

May none those marks efface!
For they appeal from
tyranny to God.

আমাদের এরোপ্লেন বার কতক রানওয়ের ওপর আগুপিছু করে স্থির হয়ে দাঁড়ালো। প্লেন থেকে নেমে মাটিতে পা দিয়ে চারদিকে চোখ মেলে দেখলাম। ভারী আশ্চর্য বোধ হল। মনে হল জায়গাটা আমার চেনা। যেন স্বপ্নে দেখা কোন দৃশ্য বা দূরে শৈশবের স্মৃতির মত। তিন দিকে পাহাড়ে ঘেরা মাঝে খানিকটা সমতল ভূমির ওপর এই এয়ারস্ট্রিপ। জনৈক প্রবীণ শিখ পুলিস-কর্মী বোঝাচ্ছিলেন, এই বিমানঘাঁটি জাপানীরা তৈরি করেছিল। ব্রিটিশ আমলে সবে একটি ছোট কাঁচা স্ট্রিপ তৈরী

আন্দামান উপকূলে নেতাজী

রেয়ারের নাগরিকদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ভোরবেলা থেকে অধিক রাত্রি পর্যন্ত সকলেরই এই দিনটি কর্মব্যস্ততায় কেটে গেল। সকাল ৭টায় বিমানবন্দরের লাউঞ্জটি লোকজনে ভরে গেল, বাইরের বারান্দা, মাঠেও কিছু লোক উপচে গেল। লাউঞ্জের বাইরে বাগানে রঙীন ফুলের সমারোহ। দূরে মাঠের মধ্যে এরোপ্লেন দাঁড়িয়ে আছে। ট্যাক্সিগুলো সোজা গিয়ে এরোপ্লেনের গা ঘেঁষে দাঁড়াচ্ছে। সাধারণত এরোপ্লেনদের যেমন একটা অ্যারিস্টো-ক্রেটিক মেজাজ থাকে এখানে যেন তা নেই। সমস্ত বিমান বন্দরে ঘরোয়া পরিবেশ। লাউঞ্জের ভিতর একদিকে ইন্দিরা গান্ধী ও জাকির হোসেনের ছবি। নূতন প্রেসিডেণ্টের ছবি এখনো যোগাড় হয়নি—সলজ্জ হেসে এয়ার পোর্টের অফিসার জানালেন। অপর দিকে দেওয়ালে লেসের পর্দা হাওয়ায় দুলছে। কাঁটায় কাঁটায় সাতটায় শঙ্খধ্বনির মধ্যে পর্দা সরে গেল। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল সেই ঐতিহাসিক চিত্রটির। হাত তুলে অভিবাদনরত দৃপ্ত ভঙ্গিতে এগিয়ে আসছেন নেতাজী। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে মেইনল্যান্ড থেকে অনেকে এসেছেন। একটি সর্বদলীয় পার্লামেন্টারি ডেলিগেশনও এসেছে। কিছু চেনা মুখ নজরে পড়ছিল। কংগ্রেসী, ডান কম্যুনিস্ট, বাম কম্যুনিস্ট, পি এস পি, ফরোয়ার্ড ব্লক ইত্যাদি ইত্যাদি। ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলেন সমর গুহ এম পি—আওয়াজ তুললেন, নেতাজী জিন্দাবাদ। মুহূর্তে তার প্রতিধ্বনি উঠল শতকণ্ঠে পাহাড়ের গায়ে গায়ে।

পোর্ট ব্লেয়ার বিমানবন্দরটি ছাব্বিশ বছর পরেও একই রকম আছে, কালের পরিবর্তনের কোন ছাপ তাতে পড়েনি। সেলুলার জেলের বেশির ভাগ পরিবর্তনই ঘটেছে মানুষের হস্তক্ষেপে—সাতটি উইং-এর মধ্যে চারটি তো ভেঙেই ফেলা হয়েছে। কিন্তু অন্তত এক জায়গায় প্রকৃতিও পরিবর্তন ঘটিয়েছে। জেলের গেট দিয়ে ঢুকেই নেতাজী দাঁড়িয়ে আছেন, তার পাশে একটি সতেজ গাছ, ওঁর মাথা ছাড়িয়ে অল্প একটু উঁচু হয়ে আছে—নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর দপ্তরের এই ছবি—বর্তমানে আমাদের গাইড মিঃ সেনের পকেটে। ছবির সঙ্গে জায়গাটি মিলিয়ে নিয়ে দেখা গেল, সবই মিলছে। কিন্তু গাছ কই? ছাব্বিশ বছর আগের সেই তরুণ বৃক্ষ আজ বিরাট মহীরুহে পরিণত। আজ সেখানে দাঁড়িয়ে ছবি তুললে শুধু মোটা কাঠের গুঁড়িই চোখে পড়বে।

আর একটি গাছের সন্ধানে আমাদের বিস্তর সময় ব্যয় হয়েছিল। বেশী মিউ-জিয়াম-মাইনডেড এবং ইতিহাস-সচেতন লোকেদের সঙ্গে কোথাও যাওয়ার এই এক

সেলুলার জেলের করিডর

বিপদ। আন্দামানের সমুদ্র-উপকূলে দাঁড়িয়ে নেতাজী ভারতবর্ষের দিকে চেয়ে রয়েছেন—এক পাশে একটি সোজা, অন্য পাশে অল্প হেলে থাকা একটি নারকেল গাছ—ছবিটির নাম-লুকিং টুওয়ার্ডস ইন্ডিয়া। পোর্ট ব্লেয়ারের উপকূলরেখার যে-কোন জায়গাতেই ছবিটি হতে পারত। কিন্তু তা তো নয়, ডান পাশে রস আইল্যান্ড দেখা যাচ্ছে আর ওই বিশেষ ভঙ্গীতে হেলে থাকা নারকেল গাছ? অতএব খোঁজ নারকেলগাছ। এবার্ডিন জেটি থেকে, জিমখানা ময়দানের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত কোথাও পাওয়া গেল না সেই গাছ।

জিমখানা ময়দানের এই শ্যামল প্রান্তর ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল দিনের নীরব সাক্ষী। ১৯৪৩ সালের ৩০শে ডিসেম্বর এইখানে নেতাজী ভারত-বর্ষের স্বাধীনতার প্রথম পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। ইম্ফলের মৈরাঙেরও অনেক আগে পোর্ট ব্লেয়ার এই সম্মান লাভ করেছিল। আজাদ হিন্দ সরকারের নেতৃত্বে ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীন ভূখণ্ড। ছবির মত সুন্দর আন্দামান ক্লাবের কাঠের বাড়ি। ক্লাবের সামনেই ছিল বক্তৃতামঞ্চ। তার উপর থেকে নব্বুই মিনিট ধরে উর্দুমিশ্রিত হিন্দুস্থানীতে নেতাজী উদ্দীপনাময় ভাষণ দিয়েছিলেন। আন্দামানের বাসিন্দাদের অনেকেরই সেই দিনটির কথা স্মরণে আছে।

এবার্ডিন জেটি থেকে স্পীড বোটে করে নেতাজী রস আইল্যান্ডে চলে গিয়েছিলেন। সেখানে প্রাক্তন চীফ কমিশনারের বাড়িতে তাঁর বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল। সে বাড়িতে সেদিন তিনরঙা জাতীয় পতাকা উড়তে দেখে নেতাজীর মনের ভাব কি হয়েছিল তা তিনি বলে গেছেন—

"রস আইল্যান্ডে প্রাক্তন ব্রিটিশ চীফ কমিশনারের বাসভবনে আমাদের তিনরঙা জাতীয় পতাকা উড্ডীয়মান—আমাদের পক্ষে সে এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা।"

১৮৫৮ সাল থেকেই রস আইল্যান্ড আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের হেড কোয়ার্টার্স। এখানে আছে চীফ কমিশনারের বাড়ি, সুন্দর গথিক গির্জা, সৈন্যদের ব্যারাক, লাইট হাউস। ইংরেজ অফিসারদের পক্ষে কয়েদীদের কাছ থেকে দূরে রস আইল্যান্ডে থাকাই নিরাপদ ছিল। কিছু কি বলা যায়? লর্ড মেয়ো সেলুলার জেল দেখতে এসে আততায়ীর হাতে প্রাণ হারালেন। এই রস আইল্যান্ডেই ব্রিটিশ চীফ কমিশনার জাপানীদের কাছে আত্ম-সমর্পণ করেন। লোকমুখে শোনা যায়, জাপানী প্রশ্নোত্তরের চাপে তাঁর মাথা খারাপ হয়ে যায়। সে যাই হোক, নানা কারণেই রস আইল্যান্ডের চীফ কমিশনারের বাড়িটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব যথেষ্ট। বাড়িটি একটি সুন্দর পুরনো ধরনের, ইংলিশ ভিলা। কাঠের দেওয়ালে চমৎকার কারুকার্য। এক-তলায় প্রশস্ত বলরুমের মেঝে মসৃণ, সুন্দর। এখানে নেতাজী আন্দামানের বিশিষ্ট নাগরিক ও সামরিক অফিসারদের মস্ত ডিনার দিয়েছিলেন। বাড়ির কাঠামো আজো অটুট আছে। কিন্তু দেওয়াল, কাঠের দরজা, জানলা সবই ভেঙে খুলে নেওয়া হচ্ছে। বাড়িটি ব্যবহারযোগ্য করে রাখলে ক্ষতি কি? রস আইল্যান্ড এখন আমাদের নৌবহরের অধীনে। নৌবহরের অফিসারদের বাসভবন হিসেবেও তো বাড়িটি ব্যবহার হতে পারে। এমন সুন্দর বাড়ি ভেঙে ফেলে কাঠগুলো জ্বালানি করে ব্যবহার করা হচ্ছে শুনে সমাগত পার্লামেন্ট সদস্যরা মহাকলরব শুরু করলেন।

সেলুলার জেল ঘুরে আমাদের সব কিছু দেখিয়ে দিচ্ছিল এক তরুণ প্রহরী। আমাদের উৎসাহে সেও উৎসাহিত। "এই দেখুন ফাঁসির মঞ্চ, তিনজনকে একসঙ্গে ফাঁসিতে লটকে দেবার ব্যবস্থা। এইখানে দাঁড়াবে সুপারিনটেনডেনট, ডাক্তার, জল্লাদ। নীচের তক্তা সরে গেলে ডেড বডি ভিতরে পড়ে গেল। ওপাশের দরজা দিয়ে উঁকি মেরে দেখুন বডি বের করে আনার পথ।" আমার মাথা ঝিমঝিম করে উঠল, থাক, আর দরকার নেই। ততক্ষণে সে বার করে এনেছে সাবেককালের ফাঁসিরজ্জু, মোটা দড়ির ফাঁস, দলের একজন গলায় পরে পরখ করে দেখলেন। আমি দূরে সরে গিয়েছিলাম। প্রহরী ডেকে বললে, যাবেন না, ওদিকটা এখনো জেলখানা হিসেবে ব্যবহার হয়। আর এ পাশটায় থাকে মেণ্টাল আওরত। মেণ্টাল আওরত—সে আবার কি বস্তু! একে স্ত্রীলোক, তায় মেণ্টাল কেস, সর্বনাশ! মন্তব্য করলেন একজন।

জেলখানার ওপরতলায় ওঠার সিঁড়ি কিন্তু বেশ। ছোট ছোট ধাপ। ওপরে

উঠে লম্বা টানা গরাদ দেওয়া কারিডর। মনে হয়, কান পেতে থাকলে সন্ধ্যাবেলার প্রহরী গরাদের ওপর ঝনঝন আওয়াজ তুলে পরীক্ষা করে যাচ্ছে শুনতে পাওয়া যাবে। ছোট ছোট কুঠুরিগুলো শীতল। একটিতে দেওয়ালে বীর সাভারকরের ছবি ঝুলছে। এখানে তিনি শাস্তি পেয়ে একক বন্দী-শালায় ছিলেন। জেলখানা ভেঙে ফেলে পিছন দিকে একটি ছোট আধুনিক হাসপাতাল হয়েছে—নাম তার গোবিন্দবল্লভ পন্থ হাসপাতাল। পন্থজী নমস্য ব্যক্তি। কিন্তু আন্দামানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক তো ঠিক বোঝা গেল না। আন্দামানের সঙ্গে সম্পর্ক যাঁদের নিবিড় তাঁদের নামের টাবলেট লাগানো হয়েছে জেলের সেণ্ট্রাল টাওয়ারে। ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম তাঁদের নামের লম্বা ফিরিস্তি। ভারতবর্ষের সব প্রদেশের উৎসর্গীকৃত প্রাণ। বাংলা দেশের মুখ উজ্জ্বল করে প্যানেলের পর প্যানেল জুড়ে বাংলার সন্তানদের নাম। আমরা আন্দামানে থাকতে থাকতেই শুনলাম, তখন সেখানে সেলুলার জেল কমিটির সভ্যদের বৈঠক চলছে। সেলুলার জেলের ভবিষ্যৎ কি হবে তাই আলোচ্য। এই কারাগারকে জাতীয় স্মরণশালায় পরিণত করতে হবে এ নিয়ে প্রশ্নের অবকাশ নেই। ঐতিহাসিক ও গবেষক এখানে পাবেন চিন্তার খোরাক আর আজকের দিনের উদভ্রান্ত তরুণদের এ দিতে পারে প্রেরণা।

আমাদের জেলরক্ষী বন্ধুর কাছে এবার বিদায় নেবার পালা। কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করলাম, কত দিন হল আন্দামানে? সে বললে, আমার তো জন্মই এখানে। তরুণ প্রহরী তার নিষ্পাপ, সরল চোখ আমার দিকে তুলে বললে, আমার বাবা বন্দী ছিলেন কিনা। আমি শুধু বললাম, ও।

আমার সোর্ট মণ্টাজ জার্নি অসম্পূর্ণ থেকে যেত যদি আমি আন্দামানের উদ্বাস্তু কলোনীগুলো দেখবার সুযোগ না পেতাম। পূর্ব বাংলার এই মানুষদের আন্দামানে পুনর্জন্ম ঘটেছে। এদের দেখে মনে হল আন্দামানের শুধু অতীত আছে তাই নয় এর ভবিষ্যৎও আছে।

১৯৪৩ সালে নেতাজী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন—"এই দ্বীপের এবং এর প্রাকৃতিক সম্পদের যেটুকু আমি দেখেছি, আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, স্বাধীন ভারতবর্ষের অঙ্গ হিসেবে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ মুক্ত, সংস্কৃতিবান, প্রগতিশীল নরনারীর যোগ্য বাসভূমিতে পরিণত হবে।"

সেদিন সন্ধ্যায় পোর্ট ব্লেয়ারে নেতাজী প্রদর্শনী উদ্বোধন হয়ে গেছে। বৃষ্টি মাথায় করেও শত শত নরনারী প্রদর্শনী ভবনে জড়ো হয়েছেন। "আন্দামান নেতাজী" প্যানেলটির সামনে ভিড় সব-চাইতে বেশী। প্রদর্শনীর উদ্বোধনের পর কর্মকর্তাদের মুখের ভাব অনেকটা কন্যাদায়-মুক্ত পিতার মত। প্রদর্শনী ভবনের ঠিক উল্টো দিকে অন্নপূর্ণা ক্যাফেটেরিয়াতে বসে চা খেতে খেতে হঠাৎ প্রস্তাব হল, কাল মোটরে চড়ে বেড়িয়ে পড়া যাক, সাউথ আন্দামান যতটা সম্ভব দেখে নিতে হবে। চৌধুরী সাহেব তাঁর গাড়ি নিয়ে তক্ষুনি তৈরি। আন্দামানে তাঁর মস্ত কাঠের ব্যবসা। ব্যবসাপত্র রইল পড়ে, আমাদের নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন।

দু ধারে নারকেলের বন, কোথাও বা রাবার প্ল্যানটেশন। গাছের গা বেয়ে সাদা দুধের মত রাবার গড়িয়ে পড়ছে। সব জায়গাতেই একটা সচ্ছলতার ভাব, প্রকৃতির প্রসন্ন বদান্যতা। কোথাও হাতি কাঠের গুঁড়ি সুন্দর করে সাজিয়ে দিচ্ছে। কোথাও প্লাই-উডের ফ্যাক্টরি, মানুষ ও যন্ত্রে সম্মিলিত কাজ। দু ধারে ক্ষেত, মাঝে সুন্দর রাস্তা। মধ্যে মধ্যে উদ্বাস্তুদের ছোট ছোট গ্রাম। ইস্কুল বাড়ি দেখলাম কয়েকটা। অপ্রত্যাশিতভাবে সুভাষচন্দ্রের এক সহপাঠীর দেখা পেলাম এক গ্রামে, সেখানকার স্কুলের তিনি হেডমাস্টার। স্কটিশ চার্চে এক সঙ্গে পড়তেন। তাঁর ঘরে বসে ছাত্রজীবনের গল্প শুনলাম অনেকক্ষণ। পোর্ট ব্লেয়ার শহরে নেতাজী প্রদর্শনী চলছে, গ্রামে গ্রামে এই বার্তা রটে গেছে। চারিদিকে উদ্দীপনা। সবাই বলছে দেইখ্যা আসুম গিয়া।

আন্দামান ছেড়ে যাবার আগের সন্ধ্যায় মোটরবোটে চড়ে ভারত মহাসাগরের জলে ভেসে পড়লাম। সেদিন লক্ষ্মীপূর্ণিমা, সোনার থালার মত চাঁদ উঠল আকাশে। চাঁদের আলোয় রুপোলী জল চিক চিক করতে লাগল—হঠাৎ ডরোথী ওয়ার্ডস-ওয়ার্থের বর্ণনা মনে পড়ল—like herrings in water, দূরে দাঁড়িয়ে Yerawa জাহাজ—ডেকে কেবিনে আলো ঝলমল করছে। দূরে চ্যাটহ্যাম জেটিতে বাঁধা আছে স্টেট অব বম্বে—কলকাতাগামী জাহাজ। আরো দূরে পোর্ট ব্লেয়ারের উপকূলরেখা। শেষ পর্যন্ত সেলুলার জেলের নীচে সমুদ্রতীরে আমরা খুঁজে পেয়েছিলাম সেই হেলে-থাকা নারকেল গাছ—যেখানে নেতাজীর ছবি—মার্চিং টুওয়ার্ডস ইণ্ডিয়া।

চাঁদের আলোয় মায়াময় সেই উপকূল-রেখার দিকে চেয়ে মনে হল, হয়ত একদিন জলের ওপর এখানে মাথা তুলে দাঁড়াবে নেতাজীর বিরাট স্ট্যাচু। নিউইয়র্কে যেমন আছে স্ট্যাচু অব লিবার্টি বা হামবুর্গে বিসমার্কের প্রতিকৃতি। ভারত মহাসাগর বেয়ে যত জাহাজ যাবে, যাত্রীরা ডেকে দাঁড়িয়ে দেখবে সেই বিরাট মূর্তি। তখন কি তাদের মনে পড়বে না নেতাজী এই দ্বীপের নাম "শহীদ" রেখে কি বলেছিলেন—

"প্যারিসে যেমন ফরাসী বিপ্লবের সময় বাস্তিল কারাগার সর্বপ্রথম মুক্ত করে দিয়ে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয় তেমনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে, যেখানে আমাদের দেশপ্রেমিকেরা নির্যাতিত হয়েছেন সেই আন্দামানই প্রথম মুক্ত হল—'

মাংস এবং কসাই

কাঁচা তাজা রক্ত!
এক কেজি নয়, দু-কেজি নয়, তিন কেজি নয়, চার, পাঁচ, ছয়; সাত; আট: নয়, দশ—এক-শ কেজি দু-শ কেজি-রক্ত। কাঁচা! তাজা! গড়িয়ে চলেছে থক থক করে একটা নালা বেয়ে!

স্বপ্ন দেখছিলাম। রকেটে চড়ে যেন পিছনের অতীতের অন্ধকার যুগে চলে গিয়েছিলাম। বেদ-এর যজ্ঞবাশরীতে মন্ত্র-পাঠ হচ্ছে। বৈদিক রাজা রন্তু, তাঁর গোশালার সন্নিকটে আমি দাঁড়িয়ে আছি। আর বধ্যভূমি থেকে রক্ত গড়িয়ে চলেছে। রক্তের নদী বয়ে চলেছে। রাজ-অতিথিরা কচি বাছুরের মাংস খেয়ে পরিতৃপ্ত হবে!...মধুপর্ক দান করতে হবে তাদের।

রামায়ণ মহাভারত যাঁরা লিখেছিলেন তাঁরাও কি মাংসভোজী ছিলেন? গোমেধ যজ্ঞ তখনো কি ছিল? তারপর ঋষি মনুর সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি দক্ষিণ ভারতে বিন্ধ্যাচলের সন্নিকটে একটি চিকিৎসক সম্মিলনীতে বক্তৃতা করলেন, 'গোমাংস হিন্দুদের জন্য নিষিদ্ধ। মহা-পাপ। গোহত্যা ব্রাহ্মণ হত্যার সমতুল্য। কারণ ভারতীয় আবহাওয়ায় এই মাংস নিষিদ্ধ এইজন্য যে, এদেশের মানুষদের এ থেকে নানা রোগ জন্মায়। আয়ুর্বেদীয়-গণ বলছেন, এ থেকে কুষ্ঠ, যক্ষ্মা, চর্মরোগ, কৃমি, অম্লশূল, পিত্তবমন ইত্যাদি দুরারোগ্য ব্যাধি হচ্ছে। এবং গো-সম্পদও ধ্বংস হচ্ছে। এখন থেকে আমার বিধান, কোনো হিন্দু গোমাংস ভক্ষণ করলে মহা-পাতক হবে। গরুর দুধ মেধ্য। সে কারণে দুগ্ধদাত্রী গোধনকে মাতা রূপে সেবা করবে।'

ফাটা বাটা স্বপ্ন। এসব কি সত্যি! আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আবার স্বপ্ন দেখছি। বাটার কারখানার মধ্যে হাজার হাজার কর্মী চামড়ার জুতো তৈরি করছে। সিলেন্ডার ঘুরছে, সিঙ্গার মেশিন চলেছে ঘর ঘর শব্দে—লক্ষ লক্ষ জুতো তৈরি হয়ে বের হয়ে যাচ্ছে! এক ব্রাহ্মণ বন্ধু বললেন, মনুর কথা বাদ দিন তো মশায়! তাঁকে যদি হঠাৎ হাওড়ার পুলের ওপর তোলা যেত তিনি ভয়ে একটা বিধান দিয়ে যেতেন, 'বাছা হিন্দু ছেলেরা তোমরা যেন কস্মিন-কালেও এই শূন্যে ঝুলন্ত পর্বতটার ওপরে কেউ উঠো না কখনো!'

বন্ধুর হাসির লহরা ধরে হঠাৎ আমি বালিগঞ্জ আর শিয়ালদার রেল লাইনের ওপারে গিয়ে মুচিদের আড্ডায় পড়লাম। দুর্গন্ধে চোদ্দ পুরুষের পেট থেকে অন্ন উঠে আসতে চায়। স্বপ্ন ছুটে গেল।

বড় বড় গরুর চামড়ার মধ্যে নুন জল ভরে সেলাই করে ঝুলনো রয়েছে হাজার হাজার। ট্যানিং হচ্ছে! ট্যানিং হবার পরে আসছে ফিয়ার্স লেনের কাছাকাছি সব চামড়ার জাব্‌দাদারদের গোডাউনে! মালিকরা সবাই মুসলমান। এখানে দুর্গন্ধের রাজ্য!

বেদ বর্ণিত রাজা রন্তুর গোহত্যার রক্ত আজো গড়িয়ে চলেছে ট্যাংরায়, মেটিয়াবুরুজে, বাঁকড়ায়, আখড়ায়, চন্দননগরে।

স্বপ্ন নয় তাহলে?

কিন্তু মুনিঋষি মনুর কথা কি লঙ্ঘন হতে পারে? যারা তাঁর কথা মানে না তারা যদি মুসলমান, খৃস্টান হয় তবে আর কি বলার আছে? মনু তো মুসলমান খৃস্টান কী তা দেখে যাবার সৌভাগ্য লাভ করেন নি? পণ্ডিত রাহুল সাংস্কৃত্যায়ন তো ভূরি ভূরি প্রমাণ দেখাচ্ছেন, হিন্দুরা বৈদিক যুগে প্রচুর গোমাংস ভক্ষণ করত।

অহিংসা পরমধর্ম বলে যে অহিংসুকরা মাছ মাংস খায় না এমন নয়। তারা আইনের ফাঁক রাখে, বলে মাছটা মেরে দাও। আর কসাইখানায় 'ডেড বডি সেলিং' তো হয়ই। হিন্দু থেকে বৌদ্ধ এবং বৌদ্ধ থেকে যারা মুসলমান হল তারা টিকি ছেড়ে ন্যাড়া, ন্যাড়া ছেড়ে দাড়িতে এল কিন্তু হিন্দুরা এই ভাসমান পরগাছাদের ম্লেচ্ছ বলতে শুরু করলে। এরা গোমাংস খায়। তপশীলী হিন্দুও এদের সঙ্গে মুসলমান হয়ে মিশে গেল। এদের শিক্ষার ব্যবস্থা কিছু হল না। ফলে এরা না হল মুসলমান না হল হিন্দু। তারাই, আমাদের শুনতে খারাপ লাগলেও এটা সত্য যে চীন দেশের হিন্দুরা আজো গরু খায় আর নিকোবর দ্বীপের মুসলমানরা খায় শূকর।

হিন্দুরা যা খেয়ে দেখে-শুনে খারাপ জেনেই ত্যাগ করল তা আবার অন্য সম্প্রদায় খেতে গেল কেন?

মুসলমানরা সব দেশেই গরু খায় একথা ঠিক নয়। মধ্যপ্রাচ্যের আরব, সিরিয়া, মিশর, ইরান, আফগানিস্তানে গরু নেই এবং তারা তা খায়ও না। ভারতের আবহাওয়ায় এ মাংস নিষিদ্ধ বলা সত্ত্বেও মুসলমান খৃস্টানরা তা খেলো কি শুধু সম্প্রদায়গত ভিন্নতা রক্ষার জন্যে?

পৃথিবীর আদি ধর্ম পৌত্তলিকতা। হিন্দু থেকে আমরা এসেছি এ কথা স্বীকার করতে লজ্জায় মাথা কাটা যাবার কি আছে? ইহুদি থেকে খৃস্টান এবং মুসলমান এসেছে। হিন্দু থেকে বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, মুসলমান ইত্যাদি হয়েছে ভারতে। ভারতীয় মুসলমানদের বিশেষ করে বাঙালী মুসলমানদের পোশাক আচার চেহারা ভাষায় এখনো আধাআধি হিন্দুত্ব বর্তমান। তাই প্রেসিডেণ্ট আইয়ুব খাঁ বলেছিলেন, 'বাঙালী মুসলমানরা খাঁটি মুসলমান নয়।' কথাটা সত্য। পূর্ব পাকিস্তানের বিখ্যাত চিন্তাশীল সাহিত্যিক সৈয়দ মোতাহের হোসেন চৌধুরীকে আমি একবার চিঠি লিখে জানতে চাই তিনি 'চৌধুরী' হলে 'সৈয়দ' হন কেমন করে? তিনি লেখেন, 'কথাটি ভাববার। এবার থেকে আমি 'সৈয়দ' ত্যাগ করলাম। আমি বাঙালী তাই চৌধুরী হওয়াই স্বাভাবিক।'

আমরা যে হিন্দু ছিলাম তার চিহ্ন বর্তমান, কিছু কিছু সৈয়দ বাড়ির বধূরা এখনো সিঁথিতে সিঁদুর দেন। মেয়েরা মানত দিতে যায় হিন্দু দেবদেবীর পীঠ-স্থানে। কিন্তু গো-মাংস ভক্ষণের কথা তুললে প্রায় মুসলমান যুবকই হিন্দুদের কাছে মিথ্যে কথা বলে।

যাহোক, এসব স্বপ্ন দেখছিলাম গরুর মাংস খবার পর পেটটা গরম হয়েছিল বলে। আমি গো-মাংস ভক্ষণকারীদের বিরুদ্ধে কিছু বলতে চাইছি না। কিন্তু কতকগুলি ব্যাপারে আমি প্রত্যক্ষদর্শী। দেশের কল্যাণে সেগুলো বলা দরকার।

যেসব মুসলমান বন্ধুরা মনে করেন মুসলমানদের এখানে যথেষ্ট অধিকার দেওয়া হচ্ছে না আমি একটি ব্যাপারে তার প্রতিবাদ করি। আমাদের গ্রামগুলিতে আসুন, দেখবেন, 'ঘো-ই-স' শব্দ করে মাথায় গরুর মাংসের বাজরা নিয়ে চলেছে পাড়ায় পাড়ায় কসাইরা। যে গ্রামে শতকরা ৭৫জন হিন্দু সেখানেও। দশটা বাড়ি নিয়ে একটা মুসলমান পাড়া, সেখানে মোড়ের মাথায় গো-মাংসের বাজরা নামিয়ে কসাইরা মাংস বিক্রি করছে দেড় টাকা সাত সিকে কেজি দরে। এ মাল আসছে উলুবেড়িয়ার হাট থেকে কেনা খাপড়ের হড়মা-সার গরু কিনে মরবার আগে জবাই করে এনে। নিতান্ত শকুনের সঙ্গে আড়ি করে খাওয়া। পাড়ার লালমনের মা, সফুরার চাচী, জিয়াদ আলী

'অসিদ্ধ মাংস হারাম।' তার কারণ আর কিছু নয়, হজম হবে না বলেই ঐ ফরমাস। খৃস্টান সাহেবরা বিফ খান, পর্ক খান কিন্তু তাঁরা বিয়ার খান।

হাসপাতালে আসুন, যক্ষা, কুষ্ঠ, চর্ম-রোগ, ক্রাঁম, চক্ষু রোগ, পেটের পীড়া এসব রোগীদের সংখ্যা দেখুন। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে এখানেও মুসলমানদের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা! কিন্তু সবাই কি আর আসে? যারা পর্দার মধ্যে রয়েছে? যারা 'উজ্‌ড়ি' বা 'বট' খায়? 'উজ্‌ড়ি' কি জিনিস এ কথা বলে দিলে অনেক গোঁড়াপন্থী, যারা স্ব-সম্প্রদায়েরও মঙ্গল চায় না, তারা ব্যাজার হবে! হিন্দুরা আদৌ এ ব্যাপারটা জানে না। 'উজ্‌ড়ি' হল গরুর নাড়ীভুঁড়ি! ময়লা পরিষ্কার করে এই দুর্গন্ধযুক্ত নাড়ীভুঁড়ি খায় মুসলমান মেয়েরা। খায় দুর্গন্ধ শুঁটকি মাছ। তারা নানা রোগে পর্দার অন্তরালে ভুগছে। ক'জন আর হাসপাতালে আসছে? হয়তো তাদের সংগতিরও অভাব। আর অশিক্ষার অন্ধকারে ঘুরপাক খাচ্ছে।

কিন্তু গরুর মাংস খাওয়া বন্ধ করলে মেটিয়াবুরুজের দর্জিদের চলবে কেমন করে? কলকাতার বস্তিবাসী চামার মুচি মেথর, নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানরা খাবে কি? এ যে তাদের দৈনন্দিন খাদ্য। এতো শখের খাবার নয়। কলকাতায় কত মুসলিম পাইস হোটেল চলছে? শত শত। গ্রাম থেকে হাজার হাজার হিন্দু ছেলেরা কলেজে পড়বার জন্যে গিয়ে থাকে। কিন্তু তারা খাবে কি? হিন্দু হোটেলে দু-বেলায় পাঁচ টাকা না খেলে উদরপূর্তি সম্ভব নয় কিন্তু মুসলমান ছেলেদের পাইস হোটেলে সে জায়গায় লাগবে বেলাকে ৭৫ পয়সা করে দেড় টাকা। আট আনার ভাত, চার আনার মাংস। অথচ তারা প্রোটিন পাচ্ছে। হিন্দু ছেলেদের হয় মেসে থাকতে হবে নয়তো পেয়িং-গেস্ট হতে হবে।

কিন্তু পাইস হোটেলগুলো এত নোংরা যে এই নোংরামির জন্য হোটেল মালিকদের দোজখে যাওয়া উচিত। সরকারও কিছু বলতে গেলে সম্প্রদায়িকতার অভিযোগ আসা বিচিত্র নয়। এই সব হোটেলে আসে মাংসের ছাঁট মাল। যা খারাপ। যা বিক্রি হল না। পচাও। সস্তা দামের ঝাল মশলা। পচা পিঁয়াজ আলু। সরষের তেলের বদলে খইল। তরকারি ঝাল মশলায় তীব্র স্বাদ-যুক্ত। সপ্তাহ খানেক খেলেই আমাশা ধরবে, পেটের ব্যামো অনিবার্য। তাই কথায় বলে, 'হোটেলে কোনো ভদ্রলোক বিপদে না পড়লে কখনো খায় না।'

একটা অন্ধকার জগত আছে, তা পতিতালয়। একটা অন্ধকার সমাজ আছে তা দুরারোগ্য রোগে ভরা নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানদের। উচ্চ শ্রেণীর বিত্তবান মুসলমানরা অবশ্য গো-মাংস ভক্ষণ করে না। ভারতের পশ্চিম ঘাট পর্বতাঞ্চলের মলয়ালমবাসীরা ভীষণ গো-খাদক। উত্তর ভারতের মুসলমানরাও। তারা নীল গাইও খায়। এ এক রকমের হরিণ। বাংলার মুসলমান—যারা নিম্ন শ্রেণীভুক্ত এবং মাঝারী সম্প্রদায়ও, তারা গরু খায়।

এবার একটি চিত্রে আসা যাক!

একটি কুষ্ঠরোগী পথের ধারে বসে ভিক্ষা চাইছে আলীপুরে গোপাল নগরের মোড়ে। হাত পায়ের আঙুল খসে গেছে। রস ঝরছে। ন্যাকড়া জড়ানো। তাকে শুধোলাম: 'তোমার নাম কি?'

বললে, 'সেখ আলম।'

'এই কুষ্ঠরোগ তোমার হল কি করে?'

'বাবু, আমি ছিলুম কসাই। আমার বাপও ছিল কসাই। তার নাম ধনরুদ্দি। সে কীল খানায় গরু জবাই করত। গরু পিছু পেত চার আনা করে। রোজ ভোরে ছোরায় শান দিয়ে নিয়ে চলে যেত কীল খানায়। আঠারোটা কুড়িটা গরু রোজ সে জবাই করত। একটা দড়িতে পায়ে পায়ে গরু-গুলোর বাঁধা থাকত। দু' দিকে সিমেন্ট করা চাতাল। উঁচু থেকে নিচুর দিকে মুখ করে গরুগুলো শোয়ানো দু' দিকে। মাঝ-খানে নালা। বাবা ধনরুদ্দির সঙ্গে আমি যেতুম। সে এক একটার গলায় 'বিসমিল্লাহে আল্লাহু আকবারু' বলে ছোরা চালাত। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে গা হাত মুখ বুক ভরে যেত। একটা লোক কাছা সেঁটে দু-হাতে বাগিয়ে ধরে থাকত গরুর গলার নলীটা। তার ধরার অসুবিধা হলে বাবা মুখ খারাপ করে গাল দিত। ধরা ঠিক না হলে রক্ত গায়ে লাগবেই। পাশের জীবন্ত গরুগুলো তাদের হত্যার দৃশ্য দেখে গাঁক গাঁক করে চিৎকার করত। রক্ত—কাঁচা তাজা রক্ত—গড় গড় হড় হড় করে গড়িয়ে গিয়ে পড়ত নালা বেয়ে একটা চৌবাচ্চায়। তা কি হল জানো বাবু, বাবার হাতে ঐ কাঁচা

আম্পায়ারের চেয়ারে ম্যাচটির পরিচালনার ভার পড়েছিলো আমার ওপর। কিছুক্ষণ আগে থাকতেই একটি বিকৃত-মস্তিষ্ক যুবকের উল্লাস আর মুহুর্মুহু চীৎকার আমার পক্ষে খেলা পরিচালনা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ছিল। বাধ্য হয়ে ঘটনাটি আনি কর্তৃপক্ষের নজরে। ফলে যুবকটিকে আয়ত্তে এনে চ্যাম্পিয়ানসিপ হলের বাইরে নিয়ে যেতে সময় লাগে পাঁচ মিনিটেরও বেশী। এই অপ্রীতিকর পরিবেশে সাময়িক বিরতির পর খেলা যখন আবার শুরু হোল, দিওয়ান তখন ফিরে পেয়েছেন নিজের ওপর পূর্ণ বিশ্বাস। তাঁর সাবলীল ভঙ্গিমায় মারের চটকের বিপক্ষে নাগরাজ আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতাই গ'ড়ে তুলতে পারলেন না এবং শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করলেন ২-৩ গেমে। আকস্মিক দুর্ঘটনায় খেলার মাঝে যদি না ছেদ পড়তো তাহলে ফলাফল কি হোত তা কে জানে?

ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ানসিপের কোয়ার্টার ফাইনালে জয়ী হ'তে মাত্র একটি পয়েন্টের প্রয়োজন; কিন্তু নাগরাজ সেটি স্কোর করতে পারলেন না—ন্যাশনাল টাইটেল যখন প্রায় করায়ত্ত, তখন অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে তার 'মুড' গেলো নষ্ট হয়ে, খেলার মোড় গেলো ঘুরে; লক্ষ্যে পৌঁছানো আর হোল না। এই দুর্ভাগ্যের মনে হয় একমাত্র উপমা হোল, "ডেসডিমোনা কেন রুমাল হারালেন—"। তবু টেবল টেনিস অনুরাগী দর্শক একথা নিশ্চয়ই নির্দ্বিধায় স্বীকার করবেন যে, অনেক চ্যাম্পিয়ানের নাম হয়তো তাঁদের স্মৃতি থেকে একদিন মুছে যাবে কালের অমোঘ প্রভাবে কিন্তু ফাইটার নাগরাজের খেলার দ্যুতি ও চমক তাঁরা কি কোনদিন ভুলতে পারবেন?

অসিত মুখার্জি

পরাজিত হলেও নাগরাজের টেবিল টেনিস জীবনের যথার্থ সার্থকতা এইখানেই!

*

মহীশূরের একটি একহারা গড়নের মেয়ে। শারীরিক পটুত্বের বেশ অভাব; কিন্তু মনে দুর্জয় বাসনা নামী খেলোয়াড় হবার। সাধনায় সঙ্গে শরীরকে সামাল দেওয়া কিন্তু শক্ত হ'য়ে পড়ে; তাই ম্যাচ খেলতে গিয়ে তাকে বারবার হ'তে হয় নানা বাধার সম্মুখীন। ভেঙ্গে কিন্তু সে পড়ে না—দ্বিগুণ উৎসাহে এগিয়ে চলে সিদ্ধির পথে। এই ঐকান্তিক নিষ্ঠা কখনও বিফল হতে পারে না। সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে উষা সুন্দররাজ পরিগণিত হলেন এক সময়ে ভারতের দুই নম্বর স্থানাধিকারিনী হিসাবে। ১৯৬০ সনে এশিয়ান চ্যাম্পিয়ানসিপের খেলা শুরু হচ্ছে বম্বেতে। উষার মন তখন আনন্দে উদ্বেল। কারণ নিজের দেশে আন্তর্জাতিক ম্যাচে দুই নম্বর খেলোয়াড় হিসাবে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু মহীশূরের এই সরল মেয়েটি একটি কথা শুধু জানতেন না যে, এই দেশে খেলার রাজ্যে পঙ্কিল রাজনীতির কারসাজি চলে। তাই উষা একদিন বিস্ফারিত চোখে চেয়ে দেখলেন ভারতের ছয় ও সাত নম্বরী খেলোয়াড়েরা ভারতীয় দলে তার আগে স্থান পেয়ে গেলেন আর তিনি শেষ অবধি হলেন বাতিল!

এতবড় আঘাতকে উষা সুন্দররাজ মেনে নিলেন, কিন্তু পিছু হটলেন না। নীরবে এক হাতে চোখের জল মুছে অন্য হাতে শক্ত করে ব্যাট ধরে প্রতিজ্ঞায় জ্বলে উঠলেন এই অন্যায় অবিচার ও অপমানের উপযুক্ত জবাব দিতে। পরের বছর থেকে ১৯৬৮ সন পর্যন্ত অন্যূন চারবার তিনি নাম খোদাই করলেন ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ানসিপ কাপ-এ। কিন্তু ভারতীয় দল থেকে খারিজ হবার সেই অভিশপ্ত দিনটিকে বর্তমান টেবল টেনিস সম্রাজ্ঞী উষা সুন্দররাজ কি আজও ভুলতে পেরেছেন? মনের গভীরে বঞ্চনার ক্ষত থেকে এখনও কি মাঝে মাঝে রক্তক্ষরণ হয়ে তাঁকে অস্থির করে তোলে না?

*

অল ইণ্ডিয়া টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়ানসিপের সর্বপ্রথম আসর বসলো ১৯৩৮ সনে কলকাতায়, ক্যালকাটা রেঞ্জার্স ক্লাবে। ইউনিভার্সিটি ল' কলেজের ছাত্র বাংলার ছেলে অসিত মুখার্জি একের পর এক কুশলী খেলোয়াড় কমল ব্যানার্জি, খুরশীদ কাপাডিয়া প্রমুখদের পরাজিত ক'রে উন্নীত হলেন ফাইনালে। কয়েক মাস পরেই কায়রোতে ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ানসিপে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করা সম্বন্ধে সুনিশ্চিত অসিত মুখার্জি সেই রাতের শেষে সুখ-স্বপ্নে বিভোর। পরের দিন মহম্মদ আয়ুবের বিপক্ষে ফাইনালে অবতীর্ণ হওয়ার প্রাক্ মুহূর্তে কোন সতীর্থ খেলোয়াড়ের কাছ থেকে তিনি জানতে পারলেন 'পেন-হোল্ড গ্রিপ'-এ খেলার দরুনে (এই গ্রিপে খেলার নাকি কোন ভবিষ্যত নেই!) তিনি ভারতীয় দল থেকে বাতিল হয়েছেন। এই মর্মান্তিক আঘাতে পর্যুদস্ত হ'য়ে ফাইনালে অসিত মুখার্জি সরাসরি তিন গেমে পরাজিত হলেন।

এরপর অতিবাহিত হ'য়েছে সুদীর্ঘ তিরিশ বছর। স্পোর্টসম্যান অসিতদা পেন-হোল্ড গ্রিপ ত্যাগ করে আজও নিয়মিত খেলে যাচ্ছেন নতুন 'সেক-হ্যাণ্ড গ্রিপ'এ খেলাকে আন্তরিক ভালবেসে। বঞ্চনার পুঞ্জীভূত ব্যথা, বেদনার আজ সার্থক উত্তরণ হ'য়েছে খেলার আনন্দের মাধ্যমে। কিন্তু পঞ্চাশোত্তীর্ণ ইণ্ডিয়ান অক্সিজেন কোম্পানীর অন্যতম ডাইরেক্টর কর্মব্যস্ত অসিত মুখার্জি দিবাবসানে অস্তাচলগামী সূর্যের সোনালী রশ্মির পরশে কখনও কি আনমনা হ'য়ে ডুব দেন না অতীতের গহ্বরে? অন্তরের অন্তস্থল থেকে উত্থিত একটি দীর্ঘশ্বাস কি অজান্তে পড়ে না এই কথা মনে ক'রে যে, যে পেন-গ্রিপ-এর অজুহাতে তিনি ভারতীয় দল থেকে নাকচ হয়েছিলেন, আজ দেড় যুগ ধরে ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ানসিপের প্রায় প্রত্যেকটি বিভাগকেই করতলগত ক'রে রেখেছে চীন ও জাপান—সেই 'পেন-গ্রিপ'কে হাতিয়ার ক'রে। তাই আজও অদৃষ্টের নির্মম পরিহাসের কথা স্মরণ করে অসিতের মুখে ফুটে ওঠে ম্লান, বিষণ্ণ হাসি।

সুদেবের
সাফল্যের
চাবিকাঠি

সুদেব এবারেও পারলো না
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

" পারলাম না কেন ?
... আমার গুণ কিছু কম নেই।
... আমি চালাকচতুর।"

পরে
"...আলবৎ!
কিন্তু তোমার
জুতোজোড়ার
এ কী হাল?"

সত্যি, চেরী দিয়ে পালিশ না করলেই নয়।

পরের বার
"অভিনন্দন"

চাবিকাঠিটি কী?
চেরী ব্লসম।

CHERRY BLOSSOM
BOOT POLISH
চেরী ব্লসম জুতোর পালিশ আপনার
জুতোর চেকনাই দীর্ঘস্থায়ী করবে।

স্কেয়ারউডিংএর ব্যাট করার পালা। তিনি আস্তে আস্তে প্যাভিলিয়নের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক চেয়ে নিকটবর্তী দর্শকদের জিজ্ঞেস করলেন, "দাদা, বলতে পারেন খেলাটা কোথায় হচ্ছে?"

✻

আর একটি খেলায় জ্যাক নিউম্যান ব্যাট করতে নামলেন। অপরদিকের ব্যাটসম্যান ছিলেন লর্ড টেনিসন। তিনি নিউম্যানকে বললেন, "আলো বড় কম, খেলা বন্ধের জন্য আপীল কর।"

তার উত্তরে নিউম্যান বললেন, "মাই লর্ড, আপনার কথা আমি শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু আপনি কোথায়, আপনাকে আমি দেখতে পাচ্ছি না যে......।"

✻

[illegible] যখন Harrow স্কুলের ছাত্রদের ক্রিকেট খেলা শেখাচ্ছেন। প্রত্যেকটি খেলা যাতে বৈজ্ঞানিকসম্মতভাবে খেলে সে দিকে তিনি খুব কড়া নজর রাখছেন। একবার একটি ১৫ বছর বয়সের ছাত্র তাঁর নির্দেশ অমান্য করে পা বাড়িয়ে [illegible] ব্যাট চালিয়ে দিল। [illegible] বল মাঠ পেরিয়ে একেবারে বাউণ্ডারী। [illegible] খুব বিরক্ত হলেন। তিনি ছেলেটির কাছে এসে বললেন, "কি করছ কি, দেখ দেখি তোমার পা দুটো কোথায়!"

"[illegible]" ছেলেটি উত্তর দিল, "আপনি বরং দেখুন ত বলটা কোথায় পাঠিয়েছি।"

✻

[illegible] খেলোয়াড় [illegible] হয়েছিল [illegible] খেলাটি [illegible] হচ্ছিল।

[illegible] জিজ্ঞেস করল, "দাদা, সব ডাক্তারি ঐ সবুজ [illegible] কেন, তাদের কি [illegible] খেলতে ভাল লাগছে না?"

✻

[illegible] বিরুদ্ধে খেলায় [illegible] ক্লোজ [illegible] ক্যাচ [illegible] একটি [illegible] মার্টিন [illegible] করলেন, বলটি ক্লোজের কপালের [illegible] দিকে চলে গেল। [illegible] ক্যাচটি ধরে ফেললেন।

ক্লোজের খুব লেগেছিল, তা সত্ত্বেও তিনি মাঠেই রইলেন। বিরতির সময় প্যাভিলিয়নে ফিরে আসতে দর্শকেরা সোৎসাহে সমবেদনা জানিয়ে বললেন, "আপনার খুব লেগেছে নিশ্চয়ই, যাক, ভালো ভাল, বলটা চোখে এসে সোজা লাগেনি, তাহলে যে কি হত?"

"তাহলে ক্যাচটা যেত কভারে," গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন ব্রায়ান ক্লোজ।

✻

ভারহাম ও পিটারবরো-মাটিজউইকের কর্পোরেশনের কাউন্সিলারদের প্রতি বছর একটি প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলা হয়। ভারহামের মেয়র ১৫ বছর ধরে এই খেলায় অংশ গ্রহণ করে এসেছেন, রান করেছেন ১৭টি, উইকেট নিয়েছেন দুটি, কিন্তু ১৫ বছরে একটিও ক্যাচ ধরতে পারেননি।

ষোড়শ বছর খেলার সময় বিপক্ষ দলের দুটি উইকেট পড়ার পর ব্যাট করতে এলেন মাটিজউইকের মেয়র। তিনি প্রথম বলেই ব্যাট চালালেন, বলটি অনেক উঁচুতে ক্যাচ উঠল, ঠিক ভারহামের মেয়রের মাথার ওপর। ক্যাচ ধরার উৎসাহে তিনি নার্ভাস হয়ে পড়লেন, আর বলটি হাতের কাছে আসার মুহূর্তে তাঁর চোখ দুটি বুজে ফেললেন, তা সত্ত্বেও বলটি তাঁর হাতের মধ্যে জমে গেল। আনন্দে আত্মহারা হয়ে বল আকাশে ছুঁড়ে, মাটিতে গড়াগড়ি খেয়ে, বল কপালে ঘষে তিনি প্রথম ক্যাচ ধরার আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলেন। শেষকালে হাত উঁচু করে বলটি সকলকে দেখালেন, সতীর্থদের প্রশংসা পাবার জন্যে।

আর সহ্য করতে না পেরে একজন ফিল্ডসম্যান বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন, "দোহাই আপনার, বলটা দিয়ে দিন, ওটা নো-বল, এর মধ্যে ওরা সাতটা রান নিয়ে নিয়েছে, দয়া করে বলটা ছুঁড়ে দিন।"

আলোচনা

'দৃশ্যপট' প্রসঙ্গে

গত ২০ ডিসেম্বর, ১৯৬৯ দেশ পত্রিকায় 'দৃশ্যপটে' শ্রীনবারুণ গুপ্ত পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে 'ছাত্র পরিষদের' ভূমিকার কথা উল্লেখ করায় আমরা স্বাভাবিকভাবেই আনন্দিত। কিন্তু ছাত্র পরিষদের নেতৃস্থানীয় কর্মীদের পক্ষ নেওয়ার ব্যাপারে এবং সাধারণ কর্মীদের দিক্‌ভ্রান্তির ব্যাপারে নবারুণবাবু যে উল্লেখ করেছেন সেটা ঠিক নয়। কংগ্রেসের দুই অংশের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেসের পক্ষ নেওয়ায় পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র পরিষদ একমত। পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র পরিষদের কার্যকরী সমিতি একমত হয়ে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি সমর্থন জানিয়েছে। কংগ্রেসের বম্বে অধিবেশনে ছাত্র পরিষদের প্রায় চার শ' কর্মী গিয়েছিলেন, যার মধ্যে ছাত্র পরিষদের সভাপতিও ছিলেন। ছাত্র পরিষদ ভাগ হয়ে গেছে এই বলে 'সিণ্ডিকেট পন্থীরা' যে প্রচার চালাচ্ছেন, সেটা তাদের অন্যান্য চক্রান্তের মধ্যে একটা। এই প্রচার যাতে বন্ধ হয়, তার জন্যে এই চিঠি ছাপাতে আপনাদের অনুরোধ জানাই।

কংগ্রেস ভাগ হয়ে থাকার পরও ছাত্র পরিষদ বর্ধমান ও রায়গঞ্জে হরতাল ডেকেছে। আমাদের শক্তি যে অটুট আছে এবং বাড়ছে, আশা করি সেটা জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি থেকে আমাদের পরবর্তী কার্যক্রম শুরু হলেই সবাইকে বুঝিয়ে দিতে পারে।

সৌগত রায়
পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র পরিষদ
সাধারণ সম্পাদক,

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ

দেশ-এর কয়েকটি সংখ্যাতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সম্পর্কে যে সব মন্তব্য দেখতে পেলাম তাতে পরিষদ সম্পর্কে আশান্বিত হওয়া যায়।

জানি না কিসের অভাবে পরিষদের সামগ্রিক রূপটা রংচটা, চুনবালি খসে পড়া, ধুলোপড়া এবং তেলচিটে হয়ে গিয়েছিল। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের জন্মশতবার্ষিকীর সময়, জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় একটা মন্তব্য করেছিলেন যে, ত্রিবেদী মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার্থে পরিষদ এযাবৎ তৈলচিত্র এবং ছয়খণ্ডে রচনা প্রকাশ করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারেননি। অথচ বাংলা সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্যই ঐ পরিষদ তৈরি করতে ত্রিবেদী মহাশয় কি পরিশ্রমই করেছিলেন তা কে না জানে? পরে দেশের অন্যত্র আরও অনেক সাহিত্য সংস্থা গড়ে ওঠে এবং সাহিত্য পরিষদ ক্রমশ ধুলোজমা বইগুলো আর বালবগুলোর হলুদ আলো নিয়েই দিন কাটাতে থাকে। তার ওপর অর্থনৈতিক অভাব এসে, পরিষদকে পথচারির কাছে 'ওটা কি বাড়ি?' 'ওখানে কি হয়?' জাতীয় কৌতূহলের উদ্রেককারী হয়েই থাকতে হয়। অথচ এরই অনুসরণে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ গড়া হয়েছে এবং মনে হয় এঁদের অবস্থা ভালই।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, সাহিত্যের academic দিকটায় জোর দিয়ে একটা মাসিক পত্রিকা বের করতে পারে। যারা পরিষদকে revitalization-এর কাজে নেমেছেন তাঁদেরকে উপরোক্ত অনুরোধ জানাচ্ছি। এঁদের আলোচনা চক্রের প্রস্তাবও মন্দ নয়, ত্রিবেদী মহাশয়ের লেখায় Philosophy of Science-এর বিভিন্ন বিষয়ে প্রভাব দেখা যায় একটু বেশী পরিমাণেই। ঐ বিষয়ে একটা আলোচনা করার প্রস্তাব দিচ্ছি। সম্ভব হলে তার proceedings পেলে ধন্য বোধ করব। মাসিক পত্রিকাটি ঐ proceedings record করার কাজে লাগান যেতে পারে। মনে হয় এসবের ফলে সাহিত্য পরিষদের নব-যৌবন প্রাপ্তি ঘটান সম্ভব হতে পারে।

বিশ্বনাথ রায়
নয়াদিল্লি-১৬

ইতিহাস চিন্তা

অধ্যাপক অম্লান দত্তের ইতিহাস চিন্তা পড়িয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলাম। দেশের যে স্বল্পসংখ্যক মনীষী স্বীয় গবেষণার গণ্ডিতে যূথবদ্ধ নাই, অধ্যাপক দত্ত তাঁহাদের অন্যতম। অর্থনীতি বিষয়ে নিশ্চয় তাঁহার মৌলিক অবদান ও গবেষণা বিশেষজ্ঞের নিকট স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে, তবে কিছুদিন হইল তিনি ভারতের ভবিষ্যৎ তথা মানবজাতির ভবিষ্যৎ লইয়াই বিশেষ চিন্তাক্লিষ্ট, এবং বিষয়ে অত্যন্ত সারগর্ভ প্রবন্ধাদিতে তাঁহার জ্ঞান ও মৌলিক চিন্তার পরিচয় দিতেছেন। মনে হয় সামান্য অর্থনীতির পরিসর হইতে তিনি গত ১০/১৫ বছরে চিন্তাশীল দার্শনিকের পথে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছেন। এ প্রসঙ্গে কিছুদিন পূর্বে দেশে প্রকাশিত "মানুষ! মানুষ!" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

তাঁহার এই আন্তরিক প্রচেষ্টা বিশেষ সমর্থনের প্রয়াসী। বিশেষ একটি বিষয়ে নিজেকে আবদ্ধ রাখিয়া কি লাভ! বিশেষ করিয়া অর্থনীতির মত প্রচণ্ড গতিশীল বিষয়ে নতুন কাজ ক্রমাগত করিয়া যাওয়াও তো একটু অসুবিধাজনক। অবশ্য তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রধান এবং তিনি নিশ্চয় নিজের বিষয়ে মৌলিক প্রবন্ধাদি দেশে বিদেশে প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং কিছু বিষয়ে চিন্তাশীল পণ্ডিত বলিয়া ছাত্র সমাজে তাঁহার খ্যাতি বহু বিস্তৃত। সমাজ ও পৃথিবীর ভবিষ্যৎ লইয়া যে সব মূল্যবান রচনাদি তিনি প্রকাশ করিতেছেন তাহাতে ছাত্র সমাজে তাঁহার খ্যাতি বিস্তৃততর হইবে এবং পণ্ডিত সমাজে তাঁহার সম্পর্কে পূর্ব ধারণার স্থায়িত্ব লাভ করিবে। আমরা আশা করি তথাকথিত পণ্ডিত সমাজের অনেকেই তাঁহার মত জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁহাদের বিচরণের পথ সুগম করিবেন। অধ্যাপক দত্ত শুধু অর্থনীতিবিদ নহেন, তিনি সমাজতাত্ত্বিক, দার্শনিক, ভবিষ্যদ্রষ্টা। তিনি যথার্থই বিশ্বপথিক! তাঁহার এই সাধু চেষ্টা ও চিন্তার অগ্রসর বিশেষভাবে অনুধাবন করিব।

অশোকদেব চৌধুরী
নয়াদিল্লী-১৬

কলকাতার একটি পোলো খেলায় গোল করছেন জয়পুরের মহারাজা

চক্র বজায় রাখার ঐকান্তিক আগ্রহ! এবং খেলোয়াড়দের, বিশেষ করে একটু প্রতিষ্ঠিত এবং প্রভাবশালী খেলোয়াড়দের অন্যায় ও অযৌক্তিক আচরণের ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের অক্ষমতা।

মেক্সিকো অলিম্পিকে হকি খেলোয়াড়-দের আচরণ সম্পর্কে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। কলকাতায় ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলার আগের রাত্রে ক্রিকেট খেলোয়াড়দের অত্যধিক পান-ভোজন এবং তাদের আচরণের কথাও কারো অজানা নেই। এবং বলবার কথা খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে শৃংখলাহীনতার এ অভিযোগ নতুন নয়। কিন্তু খেলাধুলার প্রশাসকরা কারো ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করেননি। খেলাধুলোয় উন্নত যোগ্যতা দেখা-বার জন্য শারীরিক যোগ্যতার দরকার সর্ব-প্রথম। অত্যধিক পান-ভোজনে শরীরটাই যদি ম্যাজমেজে হয়ে পড়ে, তবে তাদের কাছ থেকে নৈপুণ্য আশা করা যায় না।

যাক সে কথা। যে জন্য ক্রীড়ামান উন্নত না হবার এই প্রস্তাবনা সেই কথায় ফিরে আসা যাক।

হালফিল নজির

আগেই বলেছি, খেলাধুলার উন্নতির জন্য প্রশাসকদের প্রচেষ্টা বহু ক্ষেত্রে গাছের গোড়া কেটে আগায় জল ঢালার মত। তার হালফিল একটি নজির কলকাতার ফুটবল লীগে দল বাড়াবার সিদ্ধান্ত।

ফুটবলের যাঁরা বিজ্ঞ কোচ, এমন কি ফুটবল সম্বন্ধে যাঁদের কিছুটা অভিজ্ঞতা আছে তাঁরা সবাই স্বীকার করেছেন, কলকাতার ফুটবলের মান উন্নত করতে হলে প্রথম ডিভিসনে দলের সংখ্যা কমাতে হবে, খেলার সংখ্যা কমাতে হবে। উপযুক্ত কোচিংয়ের মাধ্যমে খেলোয়াড়দের বেশী অনুশীলন মান উন্নয়নের সহায়ক, কিন্তু বেশী খেলা মান অবনতির পরিপোষক। অসম প্রতিযোগিতাতেও ক্রীড়ামান নীচের দিকে নেমে যায়, উপরে উঠতে সাহায্য করে না। একথা স্বীকার করেও কিন্তু আই এফ এ পরিচালকমণ্ডলী সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তে প্রথম ডিভিসনে দলের সংখ্যা বাড়াবার ব্যবস্থা করেছেন। এবং যেভাবে জরুরী সভা আহ্বান করে এই প্রস্তাব পাশ করা হয়েছে তাতে মনে হয় ফুটবলের স্বার্থ বলি দিয়ে গোষ্ঠী-চক্রের স্বার্থই প্রশাসকরা বড় করে দেখেছেন।

কয়েকটি অযোগ্য দলকে প্রথম ডিভিসনে জীইয়ে রাখার চক্রান্তে গোষ্ঠীচক্রের ভোটের জোরে যখন লীগ থেকে ওঠা-নামার প্রথা রদ হয় তখন ফুটবল হিতৈষীরা তার প্রতিবাদ করেছিলেন। তারপর ওঠা-নামার পুনঃ প্রবর্তন করে (একটি দল নামবে, দুটি দল উঠবে) সুকৌশলে যখন প্রথম ডিভিসনে দল বাড়াবার প্রস্তাব পাশ করিয়ে নেওয়া হয় তখন ফুটবলের উন্নতিকামীরা প্রতিবাদ জানাতে কসুর করেননি। তবে, সে প্রস্তাবে ছিল উনিশশো বাহাত্তর পর্যন্ত প্রথম ডিভিসনে ২০টি ক্লাব হবে এবং দুটি গ্রুপ ভাগ হয়ে লীগ খেলা পরি-চালিত হবে। কিন্তু প্রশাসকদের আর উনিশ শো বাহাত্তর পর্যন্ত সবুর সইল না, দুটি গ্রুপও হল না। জরুরী সভায় প্রস্তাব পাস হয়ে গেল—এ বছর থেকেই প্রথম ডিভিসনে ২০টি ক্লাব হবে এবং কোন দুটি 'ভাগ্যবান' ক্লাব প্রথম ডিভিসনে আসবে তা নির্ভর করবে আই এফ এর মর্জির উপর।

বলিহারি ব্যবস্থা! ভোটের জোর থাকলেই কি ইচ্ছেমত সব জিনিস করা যায়? করা হয়তো যায়। কিন্তু তার ফল একদিন ভোগ করতে হয়। বৃহত্তর ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে, দেশের শাসন ব্যবস্থায় কংগ্রেস তার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের জোরে এমন অনেক কিছু করেছে বলেই আজ দেশের এই দুর্দশা। আমাদের খেলাধুলোর দুর্দশার কারণ খুঁজতে গেলেও দেখা যাবে মহাজনদের স্বেচ্ছাচার মতিগতি, সেই যে একটি কথা আছে, 'যা করলে ভাল না হয় তাই করো'। খেলাধুলোতেও যেন ঠিক তাই যা করলে ভাল হয় তা না করে যা করলে ভাল না হয় তাই করে চলেছেন খেলাধুলোর প্রশাসকরা।

কারা প্রশাসক?

কিন্তু একটি জিনিস আমরা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না। কারা প্রশাসক? অন্তর্ভুক্ত ক্লাবের প্রতিনিধিদের নিয়েই খেলাধুলোর প্রশাসন ব্যবস্থা। আই এফ এ প্রশাসনেও ক্লাব প্রতিনিধিদের ভোটাধিকার এবং তাঁদের ভোটের উপর নির্ভর করে

প্রস্তাব পাশ হওয়া ও না হওয়ার ব্যাপার।

অবশ্য ক্লাব প্রতিনিধি ছাড়াও আই এফ এর পরিচালকমণ্ডলীতে এমন কিছু প্রতিনিধি আছেন যাঁদের সঙ্গে ক্লাবের স্বার্থ জড়িত নয়। এবং বলা বাহুল্য, এঁদের নিয়েই গোষ্ঠী-চক্র। প্রথম ডিভিসনে দল বাড়াবার প্রস্তাব করে তলবী সভা আহ্বানের জন্য যে ১৫ জন প্রতিনিধি সই করেছেন তাঁদের মধ্যে ক্লাব প্রতিনিধি কত জন? মাত্র ৩ জন। তাও আবার কোন নামকরা ক্লাবের প্রতিনিধি নয়। অথচ প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল। প্রথম ডিভিসনে যাঁরা খেলেন সেই সব ক্লাবের বহু প্রতিনিধি সভায় হাজির হলেন না, কেউ হাজির হয়েও মুখ খুললেন না, কেউ মামুলিভাবে মৃদু আপত্তি তুললেন। তাঁদের ক্ষীণ কণ্ঠ ডুবে গেল সংখ্যাগরিষ্ঠের গলার আওয়াজে।

আমি জোর করে বলতে পারি, যাঁরা ফুটবলের উন্নতিকামী যদি তাঁদের মতামত চাওয়া হয়, যদি মতামত চাওয়া হয় প্রতি ক্লাবের পরিচালকবর্গের এবং প্রতিষ্ঠিত খেলোয়াড়দের তবে সবাই একবাক্যে বলবেন আই এফ এ ভুল পথে চলছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় বড় বড় ক্লাবের বড়কর্তারা মুখ খুলছেন না। তাঁদের তুষ্ণীভাবে এবং গোষ্ঠীচক্রের প্রভাবে ভুল পথেই চলছে কলকাতার ফুটবল। এবং যেহেতু কলকাতা ভারতীয় ফুটবলের পীঠভূমি সেহেতু এর প্রতিক্রিয়া সারা ভারতের ফুটবলের উপর। বোধ করি এইসব কারণেই ভারত এশিয়ার ৮টি দেশের মধ্যে অষ্টম।

স্টেডিয়ামের পরিকল্পনা

যেমন না আঁচালে নেমন্তন্ন খাওয়ায় বিশ্বাস নেই তেমন ইডেনের উপর খাড়া হয়ে না দাঁড়ানো পর্যন্ত স্টেডিয়ামেও বিশ্বাস নেই ক্রীড়ামোদীর স্বপ্নস্মৃতি আমাদের কাছে এমনই নিশার স্বপ্নের মত। তবু ইডেনে ২ কোটি ৮৯ লাখ টাকার স্টেডিয়াম গড়ার পরিকল্পনাকে সাধুবাদ জানাচ্ছি।

ইডেনে কম্পোজিট স্টেডিয়াম রচনারই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ ক্রিকেট, ফুটবল এবং অন্যান্য খেলাধুলোরও ব্যবস্থা থাকবে এই স্টেডিয়ামে। স্টেডিয়াম সাব কমিটির প্রথম সভায় এর সঙ্গে একটি ইনডোর স্টেডিয়ামও জুড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যেখানে টেবল টেনিস, সাঁতার, বাস্কেটবল প্রভৃতি খেলাধুলোর ব্যবস্থা থাকবে। আর থাকবে সিনেমা ও থিয়েটারের উপযোগী একটি অডিটোরিয়াম। এই সভায় ইডেনে একটি কংক্রিট ক্রিকেট পিচ তৈরীর কথাও আলোচিত হয়েছে। খুবই ভাল কথা। প্রস্তাব পরিকল্পনা অনেক হয়েছে এবং শুনতে শুনতে ক্রীড়ামোদীরা হাঁপিয়ে উঠেছে। এখন তারা সত্যিই একটি স্টেডিয়ামের বাস্তব রূপায়ণ চায়।

এই প্রসঙ্গে ক্রীড়ামন্ত্রী শ্রীরাম চ্যাটার্জিকে সভাপতি করে যে সাব কমিটি গঠিত হয়েছে সেই কমিটি সম্পর্কে আমার কিছু বক্তব্য আছে। কমিটির যাঁরা সদস্য হয়েছেন তাঁদের যোগ্যতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন তুলছি না, তাঁদের আন্তরিকতায়ও সন্দেহ নেই।

আলিগঞ্জে ক্যালকাটা ক্রিকেট মাঠে বি ও এ সি আয়োজিত প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলায় বোম্বাই জিমখানা দলে পাতৌদির নবাব, ফারুক ইঞ্জিনিয়ার, আব্বাস আলী বেগ প্রভৃতি কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত খেলোয়াড় অংশ গ্রহণ করেন। ছবিতে দেখা যাচ্ছে ফারুক ইঞ্জিনিয়ার উৎসাহী দর্শকদের মাঝ দিয়ে ইনিংসের সূচনা করতে যাচ্ছেন

কিন্তু স্টেডিয়াম সাব-কমিটিতে এমন একজন লোক নেওয়া হয়নি স্টেডিয়াম সম্পর্কে যাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে। এই প্রসঙ্গে আমি কলকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের প্রাক্তন চেয়ারম্যান এবং রাজ্য ক্রীড়া পরিষদের প্রাক্তন সম্পাদক শ্রীশৈবাল গুপ্তের কথা মনে করিয়ে দিতে চাই। যে আকারেরই হোক, এই ভদ্রলোকই কলকাতাকে একটি সুরম্য স্টেডিয়াম উপহার দিয়েছেন। এবং দিয়েছেন বহু বাধা-বিপত্তির মধ্যে। খেলা-ধুলায় তাঁর আগ্রহ ও আন্তরিকতার কথাও সর্বজনবিদিত। স্টেডিয়ামের ব্যাপারে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তো রয়েছেই। প্রখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার দেবরঞ্জন সেনের কথাও বলা যেতে পারে। স্টেডিয়ামের পরিকল্পনা তৈরী করার জন্য ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ইতালীয়ান স্থপতি অ্যানিবেল ভিটেলজিকে যখন কলকাতায় আনিয়েছিলেন তখন শ্রীসেনই সহকর্মী হিসাবে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। ভিটেলজির ধ্যান-ধারণা এবং পরিকল্পনা সম্পর্কেও শ্রীসেনের বাস্তব অভিজ্ঞতা রয়েছে। আর কারোও স্টেডিয়াম সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থাকতে পারে। তবে অনেক সন্ন্যাসীতে আবার গাজন নষ্ট না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার। মোট কথা এবার যেন স্টেডিয়াম বারত্তা নিশার স্বপন সম না হয়।

বাস্কেটবলের ভবিষ্যৎ

এশিয়ান বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় ভারতের ক্রমোন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব স্পোর্টসের বাস্কেটবল কোচ জোসেফ সাম বলছেন, ভারতীয় দল অনায়াসেই ১৯৭১ সালের এশিয়ান বাস্কেটবলে দ্বিতীয় স্থান দখল করে বিশ্ব অলিম্পিকে খেলার অধিকার পেতে পারে।

অবশ্য তার জন্য ভারতীয় খেলোয়াড়দের কঠিন প্রস্তুতি চাই, আর চাই আন্তর্জাতিক মানের খেলার উপকরণ ও পরিবেশ। ভারতে বাস্কেটবল খেলা হয় ঘাসের কোর্টে, কাঠের বোর্ডে এবং চামড়ার বলে। কিন্তু বিদেশে কাঠের তৈরী কোর্টে, ট্রান্সপারেন্ট অর্থাৎ স্বচ্ছ বোর্ডে এবং রবারের বলে খেলা হয়। তার ফলে ভারতীয় খেলোয়াড়দের অসুবিধায় পড়তে হয়। আশা করি ভারতীয় বাস্কেটবল ফেডারেশন খেলোয়াড়দের অসুবিধার কথা চিন্তা করে আন্তর্জাতিক মানের কোর্ট ও উপকরণে খেলার ব্যবস্থা করতে উদ্যোগী হবেন।

কিন্তু কথা হচ্ছে আন্তর্জাতিক মানের কোর্ট এবং উপকরণ পেলেও বাস্কেটবলে ভারতীয় খেলোয়াড়রা কতদূর পর্যন্ত যেতে পারেন? নিশ্চয়ই বেশীদূর নয়। কারণ বিদেশী বাস্কেটবল খেলোয়াড়দের দৈহিক অবয়বই তাঁদের বড় সম্পদ। বাস্কেট-বল এমন একটি খেলা যেখানে নৈপুণ্য এবং দৈহিক পটুতার উপরও প্রয়োজন দীর্ঘ দেহ। অলিম্পিক বাস্কেট বলে আমেরিকা কোন দিন হার স্বীকার করেনি তার কারণ আমেরিকার খেলোয়াড়রা মাথায় ৭ ফুটেরও বেশী উঁচু। ভারতের খুশিরাম, ওমপ্রকাশ প্রভৃতি মাথায় উঁচু বলেই বাস্কেটবলে এতখানি প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। যদি খেলোয়াড়দের উচ্চতা অনুযায়ী গ্রুপ ভাগ করে খেলার ব্যবস্থা না হয় তবে আন্ত-র্জাতিক বা অলিম্পিক বাস্কেটবলে ভারত কোন কালেই সুবিধা করতে পারবে না, খেলোয়াড়দের নৈপুণ্য যতই থাক।

এখন ভারতীয় বাস্কেটবল ফেডারেশনের সামনে দুটি সমস্যা। এক, মাথায় উঁচু খেলোয়াড়দের আবিষ্কার করে তাঁদের কোচিং দিয়ে পটু করে তোলা। দুই উচ্চতা অনুযায়ী গ্রুপ ভাগ করে খেলার ব্যবস্থার জন্য আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের কাছে দাবি জানানো। দাবিটা অন্যান্য দেশ থেকেও উঠেছে। শুধু তাই নয়, মল্লক্রীড়া, মুষ্টি-যুদ্ধ, ভারোত্তোলনে যেমন শ্রেণীবিভাগ আছে দৈহিক ওজন ও উচ্চতা অনুযায়ী অ্যাথলেটিকসেও শ্রেণী বিভাগের দাবি আস্তে আস্তে দানা বাঁধছে।

একলব্য

কৃতীর ক্রীড়া ভূমিকা

'কৃতীর ক্রীড়াভূমিকার' যখন প্রস্তাবনা লিখছিলাম তখন ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারিনি আমাদের 'কালুদা'র কথাই প্রথম লিখতে হবে। অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাস, আমাদের জ্যেষ্ঠ সহোদরসম সহকর্মী পরলোকগত কালুদার ক্রীড়া ভূমিকার স্মৃতি তর্পণই আজ প্রথম করতে হচ্ছে।

শুধু আমাদেরই 'কালুদা' নন, বলা যায় কলকাতার কালুদা, বাংলার ক্রীড়া-মহলের কালুদা। এমন কি ভারতীয় ক্রীড়া ক্ষেত্রেও 'কালুদা' কালুদা নামেই পরিচিত ছিলেন। কালুদা হিসাবেই তাঁর সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, ডাঃ ললিত ব্যানার্জী, সুরেশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি কয়েকজন আর সমসাময়িক বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে পঙ্কজ গুপ্ত, বলাই চ্যাটার্জি, গোষ্ঠ পাল, ইউ কুমার, মুষ্টিযুদ্ধের জনক পি এল রায় প্রভৃতি কয়েকজন ডাকতেন 'কালু' বলে। বাদবাকিদের কাছে —কলকাতার কাউন্সিলারদের কাছে, বহু মন্ত্রীর কাছে, পুলিসের বড় কর্তাদের কাছে, এমন কি বহু বর্ষীয়ান সাংবাদিকের কাছেও তিনি ছিলেন প্রিয় 'কালুদা'। অনেকে হয়তো জানতেনই না তাঁর পুরো নাম পৃথ্বীশ্বর মিশ্র।

আসল নাম যেমন অনেকের কাছে গোপন ছিল তেমন গোপন ছিল রাশভারী বিরাট চেহারার আড়ালে তাঁর স্বভাবের সারল্য, হৃদয়ের উত্তাপ। সমভাবে কালুদার ক্রীড়া-ভূমিকাও হয়তো অনেকের কাছে অজানা।

প্রথম ডিভিসন ক্লাবে ফুটবল খেললেও খেলোয়াড় হিসাবে প্রতিষ্ঠার চেয়ে ক্রীড়া-সংগঠন এবং ক্রীড়া-পরিচালক হিসাবেই তাঁর প্রতিষ্ঠা সমধিক। বহু ক্রীড়া-সংস্থার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল। কয়েকটি সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সদস্যও। এরিয়ান ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে, ফুটবল খেলায় দৃঢ়চেতা রেফারি হিসাবে এবং পরবর্তীকালে রেফারি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হিসাবে তাঁর ভূমিকা অবশ্যই স্মরণীয়। কিন্তু মুষ্টি-যুদ্ধের প্রসার প্রচারে এবং বহু বাধা-বিপত্তির মধ্যেও অলিম্পিকে বা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ভারতের দল প্রেরণের মধ্যেই তাঁর সংগঠন শক্তির প্রভূত পরিচয়। মৃত্যু পর্যন্ত বাংলা ও ভারতীয় মুষ্টিযুদ্ধ-ক্ষেত্রে কালুদাই ছিলেন প্রাণ-পুরুষ, দুই সংগঠনের সম্পাদক।

হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকার ক্রীড় সাংবাদিক হিসাবে কালুদা কলম ধরেছেন দীর্ঘ ত্রিশ বছর। কিছুদিন পি টি আই-এর সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। কিন্তু সাংবাদিকতা জীবনের একমাত্র বৃত্তি হিসাবে বেছে নেননি। অথচ যে-কোন পরিবেশে, যে-কোন সূত্র থেকে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও সংবাদ সংগ্রহ করার তাঁর যে ক্ষমতা ছিল সেই গুণে প্রতিষ্ঠিত সাংবাদিকের মর্যাদা পেতে পারতেন। ফুটবলের রেফারি হিসাবে যেখানে কালুদার অসাধারণ খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা সেখানেও পেয়েছি নির্লিপ্ততার পরিচয়। হয়তো কাপড় পরেই মাঠে নেমেছেন। না হয় পরিচালনার ডাক পেয়েও সে ডাকে সাড়া দেননি। এসব ক্ষেত্রে কালুদার ছিল আগ্রহ ও অনাগ্রহের মিশ্র মনোভাব।

পি মিশ্র

হয় হল, না-হয় না হল এমন একটা ধারণা।

কিন্তু খেলাধুলোর সংগঠনে কোন ফাঁকি ছিল না। অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন মুষ্টিযুদ্ধের সংগঠনকে। জীবনভর সেই সংগঠনকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছেন। মুষ্টিযুদ্ধের প্রসার-প্রচার এবং উন্নতির মধ্যে আনন্দ পেয়েছেন। আর আনন্দ পেয়েছেন পরহিতব্রত পালনের মধ্যে। বিপদের সাহস-বিস্তৃত বক্ষপটে আশ্রয় খুঁজেছেন। হৃদয়টা বড় ছিল বলেই বোধ করি কোন বড় কাজে তাঁকে পেছপা হতে দেখিনি।

বলা বাহুল্য, কোন কাজেই কালুদাকে বড় একটা ব্যর্থ হতে দেখিনি। এখানেই কালুদা কৃতী পুরুষ। শিক্ষা, বিজ্ঞান, ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প, সাহিত্য, রাজনীতি প্রভৃতি যে কোন বিষয়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয়ই কৃতী পুরুষের সংজ্ঞা। খেলাধুলোয় বিশেষ কৃতিত্বে কৃতী খেলোয়াড়। খেলোয়াড় হিসাবে কালুদা অবশ্যই গোষ্ঠ পাল বা ইউ কুমার হননি, খেলাধুলোর সংগঠনেও পঙ্কজ গুপ্ত নন। তবু জীবনের সব কিছু মিলিয়ে কালুদা কৃতী পুরুষ।

অলৌকিক কাহিনীর মত কালুদার অনেক ঘটনার কথা মনে পড়ছে।

ডন ব্র্যাডম্যান ফিরছেন ইংলণ্ড থেকে অস্ট্রেলিয়ায়। দমদম বিমান ঘাটিতে ঘণ্টা-খানেক অবস্থান করবেন। কাগজে খবর বেরোতেই রক্তমাংসের ক্রিকেট দেবতাকে দেখতে দমদমে হাজার হাজার ভক্ত সমাগম। কার সাধ্য জনতা নিয়ন্ত্রণ করে? কালুদা এগিয়ে গেলেন। উচ্ছৃঙ্খল জনতার সঙ্গে একা লড়াই করে নির্বিঘ্নে ব্র্যাডম্যানকে নিয়ে গেলেন ভি আই পি বিশ্রামকক্ষে।

উনিশ শো ছেচল্লিশের ভয়ঙ্কর দিনের কথা। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মানুষ তখন মানুষের রক্তের জন্য মেতে উঠেছে। প্রাণের মায়ায় মানুষ পুলিসের আশ্রয় খুঁজছে। সেই দুর্যোগের মধ্যে কালুদা বেরিয়ে পড়লেন বাড়ি থেকে। খেলাধুলোর দৌলতে ফোর্ট উইলিয়াম কেল্লার উচ্চপদস্থ মিলিটারী অফিসারদের সঙ্গে তাঁর দোস্তি ছিল। সেখান থেকে নিয়ে এলেন রাইফেল-ধারী লালমুখো দুই মিলিটারীকে। তাঁদের সাহায্যে কয়েক দিন ধরে চললো বিপন্নের উদ্ধার ও নিরাপত্তার পালা।

স্বাধীনতা লাভের পর ইডেনে অল ইণ্ডিয়া ইণ্ডাস্ট্রিয়াল একজিবিশনের সংগঠক জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর সহকর্মী কালুদা। বিনোদন বিভাগে কালুদার ব্যবস্থাপনায় মহিলা কুস্তিগীরদের মল্লক্রীড়ার আয়োজন। একজন মহিলা কুস্তিগীর, নাম বোধ হয় হামিদা বানু, যখন যে-কোন পুরুষকে তাঁর সঙ্গে মল্লযুদ্ধের আহ্বান জানালেন, দর্শক-দের মধ্য থেকে কে যেন বলে উঠলেন, 'কালু মিশ্র ছাড়া আর কোন পুরুষের ওর সঙ্গে লড়াইয়ের সাহস নেই।' হাসির রোল উঠল।

না, রসিকতার কথা নয়। সত্যিই অসম-সাহস আর অসাধারণ আত্মবিশ্বাসের অধিকারী ছিলেন কালুদা। না হলে দুর্ধর্ষ মহমেডান স্পোর্টিং-এর অধিনায়ককে মহমেডান দলের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ে 'মার্চিং অর্ডার' দিতে পারেন? নাকি ভয় থাকলে পারেন আই এফ এ শীল্ড সেমি-ফাইনালে পুলিস দলের ৩জন খেলোয়াড়কে মাঠ থেকে বের করে দিতে?

বলব না সব সিদ্ধান্তে তিনি নির্ভুল ছিলেন। ভুল অবশ্যই করেছেন। কিন্তু ভুলের ক্ষেত্রেও বাঁশির এমন আত্মবিশ্বাসী সুর ছিল যে, সেই সুরেই সুর মিলিয়েছে হাজার হাজার দর্শক। ক্রীড়া সংগঠনে, রেফারির কর্তব্যে ফুলের মুকুটের চেয়ে মাথায় কাঁটার মুকুটই ওঠে বেশী। কালুদার ক্ষেত্রে কিন্তু ফুলের মালাই বেশী উঠেছে। তাই খেলাধুলোর কৃতী সংগঠক ও খ্যাতিমান পরিচালক বিশ্ব-পরিচালকের অদৃশ্য বাঁশির সংকেতে যখন ভব-ক্রীড়া সাঙ্গ করেছেন তখন মরদেহের উপরও পড়েছে রাশি রাশি ফুলের মালা আর পুষ্পস্তবক।

মুকুল
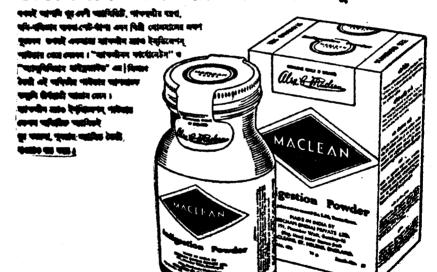
আর ডি বনসালের "চৈতালি" (পরিচালনা : সুধীর মুখার্জি) ছবিতে তনুজা

ভারতের চলচ্চিত্র উৎসবের পুরস্কার

ভারতের চতুর্থ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের প্রতিযোগিতায় "ভুবন সোম" কেন সর্বোচ্চ পুরস্কার পেল না তা নিয়ে তর্ক করতে চাই না। তর্কে প্রবৃত্ত হওয়া যুক্তিসঙ্গতও নয়। কারণ প্রতিযোগিতা-শাখার ছবি আমরা দেখিনি, "দি ড্যামড" কেমন ছবি জানি না। তবে উৎসবের পুরস্কার সম্বন্ধে জুরীবোর্ডের অন্যতম ভারতীয় সদস্য রাজ কাপুর কিছু মন্তব্য করেছেন। বলা বাহুল্য, তাঁর উক্তিগুলি, যদি রিপোর্ট সত্য হয়, রীতিমত হাস্যকর। তিনি নাকি বোম্বাইয়ের জনৈক সাংবাদিককে বলেছেন, ভুবন সোম-এর শিল্পী সুহাসিনী মুলে বিচারকদের অন্তর জয় করেছেন। শ্রীমতী মুলে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কারও

পেতে পারতেন, তবে তিনি শৌখিন শিল্পী এবং পুরস্কারটি পেশাদার শিল্পীর ("প্রোফেশানালস্") জন্য। অতএব রাজ কাপুরের বক্তব্য, পুরস্কার তাঁর কপালে জুটল না।

কে শৌখিন শিল্পী কে পেশাদার তা দেখে উৎসবের পুরস্কার দেওয়া হয় নাকি? অভিনয় কে কেমন করলেন সেটা তা হলে বড় কথা নয়? রাজ কাপুরের যুক্তির উপর মন্তব্য চলে না। "ভুবন সোম" সম্পর্কে রাজ কাপুরের উক্তি : হ্যাঁ, "ভুবন সোম"-এ ফিল্ম তৈরির কিছু পাশ্চাত্য-বৈশিষ্ট্য আছে তবে তিনি নিজে নাকি এর চাইতেও ভাল ছবি তৈরি করেছেন।

এক্ষেত্রেও মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। তবে জুরীবোর্ডে রাজ কাপুরের মত সমঝদার ব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও যে 'ভুবন সোম' বিশেষ "সাইটেশন" বা সপ্রশংস স্বীকৃতি পেয়েছে সেটাই সান্ত্বনা। "গার্ডিয়ান" কাগজে সমালোচক ফ্র্যান্সিস কোভাল "ভুবন সোম" সম্পর্কে যা বলেছেন তা রাজ কাপুরের জ্ঞাতার্থে উল্লেখ করছি। তিনি দিল্লিতে এসে ছবিটি দেখে গিয়েছেন। শ্রীকোভাল বলেছেন,

On seeing his (Mrinal Sen's Bhuvan Shome we all instantly fell under its spell. In the perspective of the Indian cinema, this was an historic moment—comparable to the premiere of Pather Panchali at the Cannes Festival.

॥ চিত্র-সমালোচনা ॥

সমান্তরাল

[শ্যাডো মুভীজ]

গল্প যেখানে আরম্ভ হতে পারত ছবিটি সেখানেই শেষ হয়েছে। পাহাড়ী অঞ্চলের এক মাতৃসদন থেকে অশোক (অনিল চট্টোপাধ্যায়) যখন তার দ্বিতীয় স্ত্রী সুনন্দা (লোলিতা চ্যাটার্জি) ও নবজাতককে নিয়ে রওনা হয়, তখন দূরে দাঁড়িয়ে মাতৃসদনের মাট্রন কমলা (মাধবী চক্রবর্তী), অশোকেরই প্রথম স্ত্রী। দুটি সমান্তরাল রেখা একবিন্দুতে এসে মেলে না, অশোকের জীবনেও কমলা ও সুনন্দা মিলিত হতে পারল না। অশোক ও কমলা পরস্পরকে ভালবাসত, কিন্তু বড়লোকের ছেলের সঙ্গে গরীবের মেয়ের শাস্ত্রমতে লৌকিক বিয়েও সিনেমায় অনেক সময় কেমন অসিদ্ধ থেকে যায়, সেই অদ্ভুত কারণের পুনরুল্লেখের প্রয়োজন আছে কি? একমাত্র ছেলের বিরাট বড়লোক বাবা এ রকম বিয়ে সাধারণত স্বীকার করেন না, টাকার জোরে তা বানচাল করে দিতে পারেন। তিনি (কমল মিত্র) করেছেনও তাই, বিয়ের পরেই ছেলের অনুপস্থিতিতে মেয়ের মামাকে প্রচুর টাকা দিয়ে ভাগনী সহ তাদের কলকাতা শহর ছাড়তে বাধ্য করেছেন। অশোক বাবার অবাধ্য হয়ে কমলাকে গ্রহণ করবে বলে এসে দেখে বাড়ির দরজায় তালা। কমলা ব্যাপারটা জেনেও স্বামীর জন্য অপেক্ষা করার কিংবা তার সঙ্গে কোন রকম যোগাযোগের চেষ্টা করেনি।

'সমান্তরাল' কাহিনীটি (প্রবোধ চৌধুরী রচিত)। সুরেশার [illegible] কমলার পূর্বজীবনের ঘটনা দেখানো হয়েছে ফ্লাশব্যাকে, স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ পর্যন্ত। পরে যখন চিত্রনাট্য আবার মাতৃসদনে, তখন স্বামী অশোকের সঙ্গে অন্তঃসত্ত্বা সুনন্দা সেখানে উপস্থিত। অশোক সেখানে আবার সাময়িক কমলাকে ভুল বুঝেছিল, কমলার সন্তান বলে পরিচিত মিঠুকে দেখে। পরে জানা গেল এই মিঠু সুনন্দারই প্রাক-বিবাহিত জীবনের অবৈধ সন্তান। ভুল বোঝাবুঝির অন্তে যখন অশোক আবার কমলাকে কাছে পেতে চায়, তখন কমলার পক্ষে, একান্তরে স্বামীর জন্য গভীর প্রেম সত্ত্বেও, বিবাহিত জীবনে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। মানুষের জীবনের সত্যিকার দ্বন্দ্বের আভাস যখন, তখনই ছবি শেষ। নায়ককে দুবার বিয়ে না করিয়ে নায়িকা-স্ত্রীর সঙ্গে তার মিলনের মামুলি গল্প যে 'সমান্তরাল' নয়, ট্র্যাজেডির আঙ্গিকে যে তা তৈরি সেটা অবশ্যই ভুল কথা। কিন্তু অশোক কমলার বিচ্ছেদ অনিবার্য ছিল কি? সবই তো সাজানো ঘটনা। বড়লোক বাবাকে যেন অতিরিক্ত নির্মম করতে হবে বলেই করা হয়েছে। পুত্রস্নেহের বিন্দুমাত্র স্পর্শ যেন ওই চরিত্রে নেই, এমনও মনে হয় যেন ছেলের বাবা নয়, অন্য কেউ কী যেন মতলব হাসিল করার জন্য বদ্ধপরিকর, স্ত্রীর কথায়ও কর্ণপাত করেন না। তা ছাড়া, বিয়ের পর প্রেমিক-যুগলের সাক্ষাৎ হওয়া-না-হওয়ার ব্যাপারটা তো পরিচালকের হাতে। এত কৃত্রিম উপায়ে যে ট্র্যাজেডি গড়া তা দুঃখ-সুখের স্বাদ দেবে কেমন করে?

তবে পরিচালক গুরুদাস বাগচী নাটকের খাতে ছবিটি সুপরিচালনা করেছেন বলে, এবং যেহেতু ছবিটির গতিও আছে, এই 'সমান্তরাল' নাটকপ্রিয় দর্শকের কাছে সমাদর পাবে। অভিনয়ে মাধবী চক্রবর্তীর সুন্দর অভিনয় তো আছেই। অন্যরাও চিত্রনাট্যের উদ্দেশ্য সুষ্ঠুভাবে পূর্ণ করেছেন। স্বর্গত কালী সরকারের (কমলার মামা) অভিনয় দেখবার মত। গানের ব্যবস্থাও আছে, সুরকার শ্যামল মিত্রও তাঁর সুনাম বজায় রেখেছেন। টেকনিক্যাল কাজের মধ্যে ফটোগ্রাফি (দিলীপরঞ্জন মুখোপাধ্যায়-কৃত) বিশেষ প্রশংসনীয়।

"নন্দ ডাকাত" ছবিতে বোম্বাইয়ের চাঁদ ওসমানি

"সমান্তরাল" : মাধবী চক্রবর্তী ও শিশুশিল্পী মলয়

আরাধনা

(শক্তি ফিল্মস)

প্রেম, বঞ্চনা, দুঃখ, মৃত্যু, আত্মত্যাগ ইত্যাদি বস্তুগুলি মিথ্যা বা অবাস্তব নয়, কিন্তু সাধারণত হিন্দী ছবিতে যেভাবে এইসব দেখানো হয় তাতে বাস্তবের লেশমাত্র থাকে না। "আরাধনা"র নায়ক-নায়িকা, অরুণ ও বন্দনা হিন্দী সিনেমার প্রথাসিদ্ধ নিয়মেই প্রেমে পড়েছে লৌকিক বিয়ের আগে (যদিও তা ঠিকই ছিল) দেবালয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে মালাবদল করেছে এবং তারপর সেই প্রচলিত নিয়মেই একদিন ঝড়-বৃষ্টির রাত্রে এক বাংলোয় (?) রাত্রিবাস করেছে। অভিজ্ঞ দর্শকের অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে অতঃপর নায়িকা গর্ভবতী হলেই নায়কের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ ঘটবে। হয়েছেও তাই, তবে তা নায়কের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্সের পাইলট অরুণ প্লেন দুর্ঘটনায় মারা গেছে

'জনতার আদালত' (পরিচালনা : মধুকর) ছবিতে শুভেন্দু চ্যাটার্জি ও রত্না ঘোষাল

রায় ও শুভেন্দু চ্যাটার্জীর ছবিও ছাপা হয়েছিল। এখন শুনছি, ছবিটি আপাতত হচ্ছে না। শ্রীমতী অরুন্ধতী নাকি ইতিমধ্যে আরেকখানি নতুন ছবির পরিকল্পনা করে ফেলেছেন। শ্রীমতী লীলা মজুমদারের লেখা ছোটদের গল্প "পদী পিসির বর্মী বাক্স" অবলম্বনে গড়ে উঠছে তাঁর নতুন ছবির চিত্রনাট্য। চিত্রনাট্য, সংগীত ও পরিচালনা তিনটিরই দায়িত্ব নিয়েছেন শ্রীমতী অরুন্ধতী। প্রযোজক হেমেন গাঙ্গুলীর সহযোগিতায় ছবিটি নাকি প্রযোজনাও করবেন তিনিই। তাঁর নবগঠিত নিজস্ব চিত্রসংস্থা অনিন্দ্যচিত্রম-এর ব্যানারে আগামী ১ মার্চ থেকে শুরু হবে শুটিং, জানালেন অরুন্ধতী। সমগ্র ছবিটিই নাকি আউটডোরে তোলা হবে এবং এর কিছু অংশ হবে রঙীন। ছবির মুখ্য চরিত্রে থাকছে বছর দশেকের একটি নতুন মুখ। এবং দুটি বিশিষ্ট ভূমিকার শিল্পী হবেন ছায়া দেবী ও চিন্ময় রায়।

পরিচালকের সূচীপত্রে রঞ্জন মজুমদার একটি নতুন নাম। ওঁর প্রথম ছবি "দৃষ্টি দর্পণ" অনেক কাল বন্ধ। মাধবী-অনিল অভিনীত এ ছবির শুটিং শুরু হয়েছিল মাধবীর বিয়ের আগে। ইতিমধ্যে মাধবী মা হয়েছেন, "দৃষ্টি দর্পণ" এখনও শেষ হয়নি। ইতিমধ্যে শ্রীমজুমদার আরেকখানি নতুন ছবির পরিকল্পনা করেছেন। একদল গরীব টেকনিসিয়ান্সের হয়ে উনি ছবি করছেন, "মেঘের ওপরে প্রাসাদ"। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ঐ নামেরই কাহিনী অবলম্বনে বিশ্বরূপায় নাটক হয়েছিল "ঘর"। "ঘর"-এরই চিত্ররূপ "মেঘের ওপরে প্রাসাদ।" ইতিমধ্যে নাকি দিন কয়েকের শুটিংও করেছেন, জানালেন রঞ্জন। উত্তমকুমার নাকি ছবির মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করবেন।

সুপ্রিয়া দেবীর জন্মদিনে ময়রা স্ট্রীটে এবারেও এক রাজকীয় পার্টি অনুষ্ঠিত হয়। ৮ জানুয়ারীর ওই পার্টিতে ফিল্মের অনেকের সঙ্গে দেখা। পাহাড়ী সান্যাল বললেন, নতুন ছবি ওঁর হাতে একটাও নেই। হাতে যা ছিল, সবই এখন শেষ। নতুন ছবি বলতে একমাত্র "রাজকুমারী"। অঞ্জনা ভৌমিকও নতুন কোন খবর দিতে পারলেন না। প্রযোজক ডি এন ভট্টাচার্য বললেন, "এখন"ই জানাবার মত ওঁর কোন নতুন পরিকল্পনা নেই। দিলীপ ভট্টাচার্য এবং অসীমা ভট্টাচার্যও আপাতত কিছু বলতে

পারছেন না। সংগীত শিল্পী শ্যামল মিত্র ও শচীকেন্তা ঘোষের সঙ্গেও সেখানেই দেখা। ও'রা গান করলেন। পার্টিতে সুপ্রিয়া দেবী সারাক্ষণই ইতিউতি ছোটাছুটি করছিলেন দামী বেনারসী পরে।

—বিচক্র

কথাচিত্রমের "কস্তুরী মৃগ" ছবিতে অনিল চট্টোপাধ্যায় ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

"সোনা বৌদি"

"পান্না-হীরে-চুণী"র পর দীনেশ চিত্রম তাঁদের পরবর্তী প্রচেষ্টা "সোনা বৌদি"র প্রারম্ভিক কাজ শেষ করে এনেছেন। সুখেন দাসের কাহিনী অবলম্বনে ছবির পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন পীযূষ গাঙ্গুলী। সংগীত পরিচালনা করবেন অজয় দাস। ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম ভাগ থেকে ছবির নিয়মিত সুটিং শুরু হবে।

মেকসিকোয় ভারতীয় ছবির বাজার তৈরীর চেষ্টা

মেকসিকোতে যাতে ভারতীয় ছবি দেখানো যায় এবং সেখানে যাতে ভারতীয় ছবি রপ্তানীর বাজার তৈরি করা যায় তার জন্য ইনডিয়ান মোশান পিকচার্স এক্সপোর্ট কর্পোরেশন বিশেষভাবে চেষ্টা করছেন বলে জানা গেছে। তাঁরা ওখানকার ভারতীয় দূতাবাসকে এ ব্যাপারে সাহায্য করবার জন্য অনুরোধ করেছেন। কয়েক বছর আগে মেকসিকোর এক পরিবেশক মেহবুব খানের "মাদার ইণ্ডিয়া" ছবিটি ওদেশে দেখিয়ে ভালই ব্যবসা করেছিলেন। কর্পোরেশন মেকসিকো ছাড়া স্পেনেও অনুরূপ বাজার সৃষ্টির চেষ্টা করছেন।

বোম্বাই বিচিত্রা

যে ছবির পাত্রপাত্রীরা বাংলা ভাষার কথা বলে, যে ছবিতে বাঙালী-জীবনের চিত্র চিত্রায়িত হয়, সে ছবিকে আমরা বাংলা ছবি বলি। মারাঠি ছবির ব্যাপারেও সেই একই কথা। তামিল, তেলেগু, ওড়িয়া, অসমীয়া বা গুজরাতি ছবির ক্ষেত্রেও ঐ একই নিয়ম। এ নিয়মের ব্যতিক্রম কেবলমাত্র হিন্দী ছবির ক্ষেত্রে।

হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হবার পর তার চেহারা এবং চরিত্রে পরিবর্তন এসেছে। এবং এ পরিবর্তন প্রকট হয়েছে হিন্দী উর্দুর বিরোধে। হিন্দী ছবির প্রথম যুগ থেকেই তার চরিত্রেরা যে ভাষায় কথা বলে, তা না হিন্দী, না উর্দু। সাধারণত যে ভাষা হিন্দী ছবিতে এযাবৎকাল ব্যবহৃত হয়ে আসছে, তাকে অনেকে হিন্দুস্থানী ভাষা বলে থাকেন। এ ভাষা, মানে হিন্দী ফিল্মের ভাষা ভারতের কোন প্রান্তেরই কথ্য ভাষা নয়, তবু কালক্রমে ভারতের প্রায় সর্বত্র বোধ্য এবং গ্রাহ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু বর্তমানে হিন্দী ভাষার যাঁরা পৃষ্ঠপোষক তাঁরা এ ভাষাকে হিন্দী ভাষা বলে স্বীকার করেন না। তবু এই ভাষায় তোলা ছবিকে আমরা হিন্দুস্থানীয় ছবি না বলে হিন্দী ছবি বলে থাকি।

হিন্দী ছবির ক্ষেত্রে আর একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্যণীয়। হিন্দী ছবির শৈশব থেকেই তার লালনপালন হয়েছে অহিন্দী পরিবেশে। দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া হিন্দী চলচ্চিত্র জগতের যে সামান্য কয়েকটি নাম চলচ্চিত্রের ইতিহাসের পাতায় মুদ্রিত হবার মর্যাদা পেয়েছে বা পেতে যাচ্ছে, সে নাম-গুলি হয় বাঙালীর, নয় মারাঠির নয়তো পাঞ্জাবীর। হিন্দী চলচ্চিত্রের দর্শক যে সব খ্যাতিসম্পন্ন চিত্রনির্মাতার নামকে খাতির করে থাকে, সেগুলিও সাধারণত হিন্দী-ভাষী কোন প্রচণ্ড সজ্ঞাত নাম নয়।

প্রত্যেক প্রকৃত ভাষার একটা নিজস্ব দাবী থাকে। এবং সে দাবী সার্থকভাবে মেটাতে পারে একমাত্র উক্ত ভাষাভাষী। এর যে ব্যতিক্রম হতে পারে না এমন কোন কথা নেই। তবে সাধারণত এইটেই নিয়ম।

স্বাধীনতা-পূর্ব ভারতে ভাষা হিসেবে

নির্মল মিত্র পরিচালিত "প্রথম বসন্ত" ছবিতে অনিল চট্টোপাধ্যায় ও মাধবী চক্রবর্তী

"মেঘ ও রৌদ্র" (পরিচালনা : অরুন্ধতী দেবী) ছবিতে স্বরূপ দত্ত — ফটো—দেশ

হিন্দীর না ছিল তেমন কদর, না ছিল তার মর্যাদা। স্বাধীনতা অর্জনের পর দু যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে। আজ হিন্দী রাষ্ট্রভাষা। তার আশা এবং আকাঙ্ক্ষা এখন সর্বব্যাপী। তার কলেবর ক্রমশ হৃষ্টপুষ্ট হচ্ছে। হিন্দী-ভাষী জনজীবনে এখন এক নতুন জাগরণের সৃষ্টি হয়েছে। হিন্দী সাহিত্য এখন দানা বাঁধতে শুরু করেছে। হিন্দী নাটক এখন রামলীলা বা নৌটাঙ্কির জগতকে পেছনে রেখে বর্তমান জীবনের রঙ্গমঞ্চে মর্যাদার সঙ্গে পদার্পণ করেছে। হিন্দী পত্রপত্রিকার চেহারা পাল্টাচ্ছে হু হু করে। সুতরাং হিন্দী এখন চলচ্চিত্র জগতেও প্রবেশ করতে চাইছে একটি বিশেষ ভাষার সমস্ত দাবী নিয়ে। সাধারণ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অহিন্দীভাষীদের হাতে এ দাবী সার্থকভাবে মিটবে বলে মনে হয় না। যাঁদের হাতে এ দাবী সার্থকভাবে মিটতে পারে, হিন্দী চলচ্চিত্রের জগতে এখনও তাঁদের সাক্ষাৎ ঘটছে না। অর্থাৎ হিন্দীভাষার বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এখনও সক্রিয়ভাবে হিন্দী চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে প্রবেশ করেননি।

হিন্দী চলচ্চিত্রের শৈশবোত্তর যুগে কয়েকজন হিন্দী সাহিত্যিক এবং কবি হিন্দী ছবির নির্মাণকার্যে লিপ্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে একজনও শেষ অবধি সার্থকতা, সাফল্য বা নিষ্ঠার ধোপে টেঁকেননি। হিন্দী চলচ্চিত্র জগত মাঝে মাঝে হিন্দী সাহিত্যের কিছু ফসল নিয়ে চিত্র-নির্মাণে প্রবৃত্ত হয়েছে, কিন্তু সে প্রবৃত্তি নিয়মের পর্যায়ে পৌঁছোতে পারেনি। গত দশ-বারো বছরে মাত্র কয়েকটি ছবি হয়েছে হিন্দী সাহিত্য ভিত্তিতে। তার মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য কৃষণ চোপরার 'হীরামোতি' (লেখক প্রেমচাঁদ), 'গবন'। 'গবন'কে মাঝপথে রেখে কৃষণ চোপরার অকাল মৃত্যু হয়, তারপর গবন শেষ করেন হৃষিকেশ মুখার্জি। বি আর চোপরা আচার্য চতুর সেনের 'ধর্মপুত্র' নির্মাণ করেন। ত্রিলোক জেটলি প্রেমচাঁদের বিখ্যাত রচনা 'গোদান' চিত্রায়িত করেন। বাসু ভট্টাচার্য করেন ফণীশ্বরনাথ রেণুর 'তিসরি কসম'। এ ছাড়া বিমল রায় প্রডাকসনস থেকে চন্দ্রধর শর্মা গুলেরীর 'উসনে কহা থা' করেছিলেন মণি ভট্টাচার্য! গত এক যুগে মাত্র এই কটি হিন্দী ছবি হিন্দী সাহিত্যের ভিত্তিতে তৈরী হয়েছে।

কিন্তু গত বছর অর্থাৎ উনিশশো উনসোত্তর এক উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। গত বছরের শেষের দিকে অর্থাৎ অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে তিনটি হিন্দী ছবি তৈরী হয়েছে, হিন্দী সাহিত্য থেকে বিষয় চয়ন করে। এই তিনটি ছবিই সব দিক থেকে হিন্দী চলচ্চিত্রের গড্ডলিকাপ্রবাহে এক-একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম! এই তিনটি ছবির দুটি প্রখ্যাত হিন্দী নাট্যকার সাহিত্যিক মোহন রাকেশ লিখিত। একটি নাটক 'আধে-অধুরে', অন্যটি ছোট গল্প 'উসকি রোটি'। তৃতীয় চিত্রটি রাজেন্দ্র যাদব লিখিত উপন্যাস 'সারা আকাশ' অবলম্বনে। এই তিনটি ছবির একটিতেও হিন্দী কমার্শিয়াল সিনেমার উপস্থিতি নেই। তিনটি ছবিই তথাকথিত স্টার এবং সঙ্গীত বিহীন। তিনটি ছবিরই এক মাসের মধ্যে শ্যুটিং শেষ হয়েছে। সর্বপ্রথম শেষ হয়েছে 'আধে-অধুরে' এটি পরিচালনা করেছেন বাসু ভট্টাচার্য। 'আধে-অধুরে' সম্ভবত ভারতের প্রথম নাটক চিত্র, যে নাটক চিত্রায়িত হয়েছে মঞ্চের মূল অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়ে, এবং এ ছবিতে গান তো নেই-ই সম্ভবত আবহসঙ্গীতও থাকবে না। দ্বিতীয় ছবি 'সারা আকাশ' শেষ করে-ছেন বাসু চ্যাটার্জি। আগ্রায় লোকেশন শ্যুটিং করে এক মাসের মধ্যে এ ছবি শেষ করেছেন শ্রীচ্যাটার্জি। তৃতীয় ছবি 'উসকি রোটি' শেষ করছেন পুণা ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন ছাত্র মণি কৌল, এ ছবিটিও সম্পূর্ণ হচ্ছে লোকেশনে। লোকেশন পাঞ্জাব!

অর্থাৎ এতদিন বাদে হঠাৎ হিন্দী সাহিত্য হিন্দী চলচ্চিত্রের জগতে প্রবেশ করেছে পরীক্ষানিরীক্ষার পথ দিয়ে সাহস এবং সঙ্কল্পের হাত ধরে। এ ছবিগুলির ফলাফলের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এ ছবিগুলির নির্মাতা একজনও প্রকৃত অর্থে হিন্দীভাষী নন।

সরল শর্মা

"মৌসুমী মন" চিত্রের নায়িকা শিবানী বসু

সুঅভিনীত "ভুশণ্ডীর মাঠে"

প্রয়াসী নাট্য সংস্থা গত ১০ জানুয়ারি কলামন্দিরের মিনি প্রেক্ষাগৃহে পরশুরাম বিরচিত "ভুশণ্ডীর মাঠে" অভিনয় করলেন। মূল গল্পে রঙ্গরসের পরিমাণ যতটা, নাটকে তা আরও কিছু অধিক। এ কৃতিত্বের সিংহভাগ নাট্যকার অমিতাভ চৌধুরীর প্রাপ্য। জুড়িগানের মাধ্যমে কাহিনীর নান্দিমুখ, বাকি ঘটনার বিস্তার ছড়াগানে আর কিছু সংলাপে। হাস্যরসের যে প্রবাহ সারা প্রেক্ষাগৃহে তা নিঃসন্দেহে ওই ছড়া-গানেরই দান।

নাটকের সেই জমাট রঙ্গরসটি আঙ্গিকের কিছু কিছু ত্রুটি সত্ত্বেও প্রয়াসী গোষ্ঠীর শিল্পীবৃন্দ কর্তৃক সুন্দরভাবে পরিবেশিত। ছড়াগানের সঙ্গে শাঁকচুন্নি (জয়দেব দাশগুপ্ত) ও পেত্নীর (বুবু দত্ত) ভৌতিক নৃত্য দর্শকরা অট্টহাস্যে উপভোগ করেছেন। কারিয়া পিরেতের (শ্যামল ভট্টাচার্য) দেহাতী সংলাপের মজাদার উচ্চারণ এবং ডাইনীর

(সিতীন্দ্র রায়চৌধুরী) রোমান্টিক লজ্জাও পরম উপভোগ্য। 'কালিদাসের ভায়রাভাই' যক্ষের ভূমিকায় সোমেন রায়ের ভুঁড়ি-বিলাস এবং বাচনভঙ্গী শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে। তুলনায় নাটের গুরু বেম্মদত্যি শিবু ভট্চাজ (কিশোরীমোহন সিংহ) কিছুটা হতাশ করেছেন। জুড়িগানে পিনাকী মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠস্বর এবং গাওয়ার ভঙ্গী খুবই সুন্দর। তুড়িদার আনন্দ ঘোষ বেশ খানিকটা পিছনে থেকে তাঁকে অনুসরণ করেছেন।

আঙ্গিকের পরিকল্পনাটি এ নাটকের ভালই, কিন্তু তার প্রয়োগ সুষ্ঠু নয়। বিশেষ করে সংগীতের ক্ষেত্রে। মঞ্চসজ্জা এবং রূপসজ্জার প্রশংসা করতেই হয়। সব কিছুর যোগ-বিয়োগের পরও যা পাওয়া যায় তার জন্য পরিচালক বিক্রম সেন প্রশংসাই পাবেন।

প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা' থেকে "নতুন পুতুল" অভিনীত হয়। এ নাটকেরও আঙ্গিক পরিকল্পনা উল্লেখযোগ্য কিন্তু প্রয়োগ যথাযথ নয়। বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দিয়েছেন স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবানী বসু, রবীন বসু, সিতীন্দ্র রায়চৌধুরী ও মিহির ভট্টাচার্য।

'প্রথম বসন্ত'র মুক্তি আসন্ন

ছায়ারূপার ছবি প্রতিভা বসুর কাহিনী অবলম্বনে তৈরি "প্রথম বসন্ত"র চিত্রগ্রহণ নির্মল মিত্রের পরিচালনায় শেষ হয়েছে।

বিভিন্ন চরিত্রে আছেন মাধবী চক্রবর্তী, অনিল চ্যাটার্জি, অঞ্জনা ভৌমিক, অজয় গাঙ্গুলী, অনুপকুমার, লিলি চক্রবর্তী, বিকাশ রায়, পাহাড়ী সান্যাল, মঞ্জিনা দেবী, ভানু ব্যানার্জি, ভারতী দেবী প্রভৃতি। রবীন চ্যাটার্জি ছবির সংগীত পরিচালক।

'হরবোলা' ছবির নায়ক নবাগত জয়দীপ বসু

বাসু ভট্টাচার্যের "অনুভব" হিন্দী চিত্রে তরুণ ঘোষ ও তনুজা

সি-এল-টি'র উৎসব

রামেন্দ্রসুন্দর বলেছিলেন মহাকাব্যের দিন গত হয়েছে। তা হয়তো হয়েছে। এ যুগে নতুন করে মহাকাব্য রচনার সম্ভাবনা হয়তো সত্যিই নেই। কিন্তু পুরোন দিনের মহাকাব্য এ যুগের গল্প উপন্যাসের ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যেও যে অশথ গাছের মতন শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে অক্ষয় মহিমায় বিরাজমান, তা তো অস্বীকার করবার উপায় নেই। বিশেষত ছোটদের কাছে রামায়ণ-মহাভারতের বিচিত্র গল্পকথাগুলো যেন স্বপ্নলোকের চাবিকাঠি এনে উপস্থিত করে। সি এল টি-র এবারকার উৎসবে তাদের সর্বাধুনিক প্রযোজনা এই রামায়ণ-এর নৃত্যনাট্য রূপায়ণে সেই চাবিকাঠিই যেন শিশু দর্শকদের কাছে পেঁছে দিয়েছে সি এল টি-র কিশোরী শিল্পীর দল। রাম-সীতা-লক্ষ্মণের গল্পের কথবস্তুর মধ্যে নতুন আর কি থাকতে পারে। কিন্তু তার উপস্থাপনার মধ্যে যে কতখানি নূতনত্ব আনা যেতে পারে, তার এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত সি এল টি-র 'রামায়ণ'। কোনো-রূপ ধারাভাষ্য বর্জিত কেবলমাত্র নৃত্য-ভঙ্গিমা এবং সংগীতকে আশ্রয় করে রাম কথার এমন অভিব্যক্তিময় প্রাঞ্জল পরিবেশনা খাঁটি 'ব্যালে'র একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মঞ্চের শিল্পীরা কেউ-ই পরিণত বয়স্ক নয়, অথচ রামায়ণের গভীর অনুভূতিময় এবং ঘটনাবহুল মুহূর্তগুলি যেমন পরিপূর্ণ সার্থকতার সঙ্গে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল তাতে শিল্পী হিসেবে তাদের পরিণতির কোনো অভাব ছিল না। রাম, রাবণ, মন্থরা —এই তিনটি চরিত্রসৃষ্টি যদিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কিন্তু অন্যান্য চরিত্রের অভিনয়ও কোন অংশেই দুর্বল নয়।

'রামায়ণ' নৃত্যনাট্যের প্রধান স্থপতি অবশ্য নিঃসন্দেহে, এর আবহ-সুর-রচয়িতা তিমিরবরণ। প্রধানত ভারতীয় রাগসংগীতকে আশ্রয় করে 'রামায়ণ'এর কাহিনীকে সুরে ও ছন্দে তিনি কতখানি জীবন্ত এবং মর্মগ্রাহ্য করে তুলেছেন প্রায় দু' ঘণ্টাব্যাপী প্রযোজনায় নব নব সুরের আলিম্পনে রামায়ণের উপাখ্যানগুলিকে কীভাবে প্রমূর্ত করে তুলেছেন, তা ভাবলে অবাক হতে হয়। গল্পের গতির সঙ্গে আবহসুর ও রাগ থেকে রাগান্তরে, এক ছন্দ থেকে আর এক ছন্দে অবলীলাক্রমে সঞ্চারিত হয়ে প্রতিটি মুহূর্তের অন্তর্নিহিত সুরকে এভাবে সেতারে-সরোদে বা বাঁশিতে কি এস্রাজে ফুটিয়ে তোলবার মধ্যে যে দুর্লভ কল্পনা-শক্তি এবং রচনানৈপুণ্যের প্রয়োজন, 'রামায়ণ'-এর সুরসৃষ্টিতে তার পরিপূর্ণ পরিচয় ছিল। মঞ্চসজ্জা রূপসজ্জা এবং আলোকসম্পাতের দিক থেকেও প্রযোজনাটি বিশিষ্ট।

রামায়ণ ছাড়া এবারকার অন্যান্য অনুষ্ঠানগুলি পূর্ববর্তী উৎসবে একাধিকবার প্রযোজিত হয়েছিল। সাত ভাই চম্পা, জিজো, আণ্ডার দি সি, প্রভৃতি নৃত্যনাট্য-গুলির এবারকার উপস্থাপনা আগের তুলনায় যেন কিছুটা দুর্বল বলে মনে হল।

আনন্দ বর্ধন

'সিন্দুর' ছবিটি পুনর্বার

পরিচালক কিশোর সাহু চল্লিশের দশকে "সিন্দুর" নামে একটি ছবি তৈরী করে আলোড়ন তুলেছিলেন। আলোড়নটি উঠেছিল ছবির বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে। আমাদের ভারতীয় সমাজের এক তরুণী বিধবার পুনর্বার বিবাহ ছিল ছবির কাহিনী। চল্লিশের দশকে এই বিষয়বস্তু নিয়ে ছবি করা ছিল অবশ্যই সাহসের ব্যাপার।

শ্রীসাহু তাঁর ওই কাহিনীর ভিত্তিতে এখন যে ছবিটি করছেন, সেটির নামও "সিন্দুর"। এবারে নায়ক-নায়িকা জিতেন্দ্র

সুবোধ মুখার্জির "অভিনেত্রী হিন্দী চিত্রে বেলা বোস ও শশী কাপুর

ও সায়রা বানু। আগেকার ছবিটি ছিল সাদা-কালোয়, এবারে রঙীন। শঙ্কর জয়কিষণের সুরে লতা মঙ্গেশকরের যে গানটি তিনি সম্প্রতি পিকচারাইজ করেছেন, পুরোনো সংস্করণে সেটি গেয়েছিলেন স্বর্গত কেশরবাঈ কেরকার।

কিশোর সাহুর এই ছবিটি শেষ হতে এক বছরেরও বেশি সময় লাগবে এবং খরচ হবে আনুমানিক ৪০ লক্ষ টাকা। পূর্বতন ছবিটিতে খরচ হয়েছিল ৭ লক্ষ টাকা এবং তুলতে সময় লেগেছিল মাত্র পাঁচ মাস।

মার্চেণ্টের পরের ছবি

প্রযোজক ইসমাইল মার্চেণ্ট তাঁর চতুর্থ ছবির কাজ শুরু করেছেন। ছবিটির এখনও নামকরণ হয়নি। পরিচালনা করছেন জেমস আইভরি। এই রঙীন ছবিটির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছেন বোম্বাইয়ের শশী কাপুর ও তাঁর স্ত্রী জেনিফার, বাংলাদেশের অপর্ণা সেন এবং আন্তর্জাতিক খ্যাত ভারতীয় অভিনেতা জিয়া মোহিউদ্দিন। শ্রীমহিউদ্দিন ইতিপূর্বে "লরেন্স অফ অ্যারাবিয়া", "খার্টুম", "ডেডলিয়ার দ্যান দি মেল", "দে কেম ফ্রম বিয়নড স্পেস" এবং "এ প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া" প্রভৃতি বিদেশী ছবিতে অভিনয় করে সুনাম অর্জন করেছেন। বস্তুতপক্ষে "এ প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া" ছবিতে শ্রীমোহিউদ্দিনের অভিনয় দেখে ইসমাইল মার্চেণ্ট ও জেমস আইভরি তাঁদের এই ছবিতে অভিনয়ের জন্য তাঁকে নির্বাচন করেছেন।

এ ছবির কাহিনী লিখেছেন প্রাউয়ার ঝাবভালা। শশী কাপুরের পত্নী জেনিফার এ ছবিতে এক বৃটিশ 'ট্র্যাসি' ঔপন্যাসিকের চরিত্রে অভিনয় করছেন—যিনি ভারত সফরকালে বোম্বাই চিত্রজগতের এক অভিনেতার প্রেমে পড়বেন। অভিনেতাটির চরিত্রে রূপ দিচ্ছেন শশী কাপুর। ১৫ জানুয়ারি থেকে একটানা ১১ সপ্তাহ বোম্বাই এবং তার চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এ ছবির শুটিং শুরু হবার কথা। সংগীত পরিচালনা করছেন শঙ্কর জয়কিষণ এবং চিত্রগ্রহণের দায়িত্ব নিয়েছেন সুব্রত মিত্র।

লক্ষ্ণৌয়ে সর্বভারতীয় পূর্ণাঙ্গ বাংলা নাটক প্রতিযোগিতা

গত ১৮ থেকে ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত লক্ষ্ণৌয়ে স্থানীয় বেঙ্গলী ক্লাব অ্যাণ্ড ইয়ংমেনস অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় সপ্তম বার্ষিক প্রকাশচন্দ্র ঘোষ স্মৃতি সর্বভারতীয় পূর্ণাঙ্গ বাংলা নাটক প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল শ্রীবেণুগোপাল রেড্ডি। এই উপলক্ষে সাহিত্যিক শ্রীসমরেশ বসুর ভাষণটি খুবই হৃদয়গ্রাহী হয়।

প্রতিযোগিতায় দশটি দল যোগ দেয়। প্রযোজনায় শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান পান দিল্লীর 'শনিচক্র' গোষ্ঠী—তাঁদের প্রযোজিত রবীন্দ্রনাথের কাহিনী অবলম্বনে 'জ্যাঠামশাই' নাটকের জন্য। এঁরা প্রকাশ স্মৃতি শীল্ড, নটরাজ মূর্তি ও ৫০১ টাকা পুরস্কারস্বরূপ পেয়েছেন। ওই গোষ্ঠীরই শ্রীঅমর হোড় শ্রেষ্ঠ পরিচালক এবং শ্রীজয়ন্ত দাশ শ্রেষ্ঠ অভিনেতার সম্মান পান, ওই একই নাটকে। শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর সম্মান পান বৈদ্যবাটি সান্ধ্য সমিতির শ্রীমতী মুণু ব্যানার্জি, 'কালের বিচার' নাটকে অভিনয় করে। প্রযোজনায় দ্বিতীয় পুরস্কার পান, মজফরপুরের 'চতুরঙ্গ' গোষ্ঠী কিরণ মৈত্রের 'নাম নেই' নাটকের জন্য। অভিনেতা হিসাবে দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছেন বারাণসীর হরিহর সমিতির শ্রীঅনিমেষ ভট্টাচার্য 'বন্দর' নাটকে এবং অভিনেত্রীর দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীমতী জয়া ঘোষ, 'কালের বিচার' নাটকে অভিনয় করে।

বাংলা নাট্য আন্দোলনের পটভূমিতে 'নবান্ন' নাটকের ২৫ বছর আগেকার সেই দিনটিকে স্মরণ করে এই প্রতিযোগিতার পরিকল্পনা করা হয়। পুরস্কার বিতরণের দিন গুণী-সংবর্ধনার আসরে নবনাট্য আন্দোলনের পুরোধা শ্রীবিজন ভট্টাচার্যকে সম্মান জানানো হয়। প্রধান অতিথিরূপে এই সভায় অধ্যাপক শমিক বন্দ্যোপাধ্যায় ভাষণ দেন। অনুষ্ঠান শেষে বেঙ্গলী ক্লাব ও যুবক সমিতির প্রযোজনায় মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'রাক্ষস' নাটকটি অভিনীত হয়।

কানাডায় বাংলা নাটক

গত ২৯ নভেম্বর টোরোণ্টো-তে ইণ্ডিয়া ড্রামা গ্রুপ পৃথ্বিশ সরকারের 'লবণাক্ত' নাটকটি রমেন গাঙ্গুলীর ব্যবস্থাপনায় এবং সুখেন্দু রায়চৌধুরীর পরিচালনায় স্থানীয় প্রেক্ষাগৃহে মঞ্চস্থ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত বছর তাঁরা 'উল্কা' নাটকটি অভিনয় করে প্রশংসা অর্জন করেন। "লবণাক্ত" নাটকের অভিনয়াংশে ছিলেন মাণিক রায়, প্রবীর চক্রবর্তী, রথীন ঘোষ, নীতিন মজুমদার, সুভাষ রায়, সুবোধ রায়, গৌরী ভদ্র, আবু গোলাম, অরবিন্দ গুহ, সুখেন্দু রায়চৌধুরী, নীলাদ্রি চাকী, দিব্যেন্দু ঘোষ, ইলা রায়, ফল্গু দাশগুপ্তা, সবিতা গুহ, সুব্রত দাশগুপ্ত, সুশীল চ্যাটার্জি, প্রদীপ ব্যানার্জি, তপেন্দ্র চ্যাটার্জি, প্রাণেশ্বর কর্মকার ও সত্যরঞ্জন ঘোষ। আলোকসম্পাতে ছিলেন নির্মল সিনহা ও সংগীত পরিচালনায় ছিলেন পণ্ডিত রণদেব ও দেবী ঘোষ। বহির্ভারতে বাংলা নাটকের প্রসারে কানাডাপ্রবাসী বাঙালীদের এই উদ্যম প্রশংসনীয়।

বিবেক যাত্রা সমাজ

নবগঠিত বিবেক যাত্রা সমাজের প্রথম নাট্যার্ঘ্য "শোন রে মালিক" এবং "রাইফেল"। নাট্যরচনা ও পরিচালনা করেছেন উৎপল দত্ত। শ্রীদত্তের নাটক যাত্রা জগতে ইতিমধ্যে সাড়া জাগিয়েছে। "শোন রে মালিক" ও "রাইফেল"-এর সুরসৃষ্টির দায়িত্ব নিয়েছেন প্রশান্ত ভট্টাচার্য। আসরে গান গাইবেন নির্মলেন্দু চৌধুরী। শিল্পীদের মধ্যে আছেন শোভা সেন, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিতাভ মাইতি, ইন্দিরা দে, অমর মুখোপাধ্যায়, অসিত বসু, উৎপল দত্ত, চিত্ত দে, সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

অরণ্যদেব

লী ফক

পাইলট কথা বলছি। আমরা এখন অতলান্তিক মহাসমুদ্রের প্রায় অর্ধেক পেরিয়েছি।

প্লেনে উঠে কী জানি কেন আমি ঠিক স্বস্তি পাই না।
তা অস্বস্তির কারণ মাঝে মাঝে ঘটে বই কী।

এখন?
দাঁড়াও, কফিটা শেষ করি।

খাবারগুলি ভাল ছিল তো?
বিলক্ষণ, এত চমৎকার খাবার গত সাত বছর আমি খাইনি।
?!

সবাই চুপ করে বসে থাকো। আমরা এই প্লেনের দখল নিচ্ছি।
???

এই প্ল্যান অনুযায়ী প্লেন চালাও। নইলে গুলি করব।
আর হ্যাঁ, বেতারে খবর পাঠাবার চেষ্টা করো না।
5/25

ওই সেই প্লেন, ইমার্জেন্সি ল্যানডিংয়ের জন্য খবর পাঠিয়েছিল।
রানওয়ের অত দূরে নামছে কেন?

সবাই নেমে গেছে, পার্জ।
আমাদের লাগেজের কী হবে?
এখন লাগেজ নামাবার সময় নেই।

যাক, আমাদের প্রাণে মারেনি, এই ভাগ্যি।
এবারে যাব চার্লের রাজ্যে।
কোথায়?

পাজি রাজা চার্ল .....
দ্যাখো দ্যাখো, মস্ত একটা প্লেন।
আমার রাজ্যের উপর দিয়ে ওড়ার অধিকার তো ওর নেই। দাঁড়াও মামলা ঠুকে দেব।